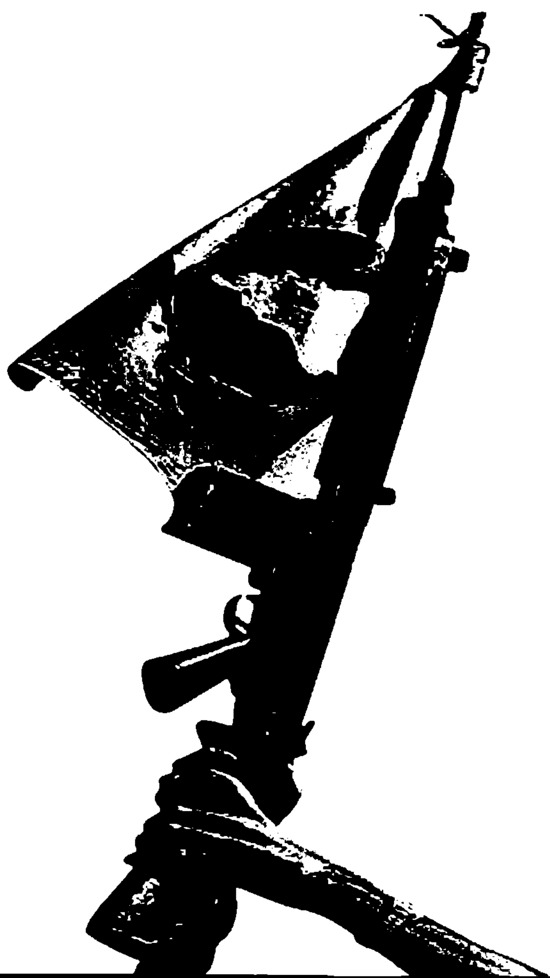
আ লে ম মু ক্তি যো দ্ধা র খোঁ জে

একাত্তরের

চেপে রাখা ইতিহাস

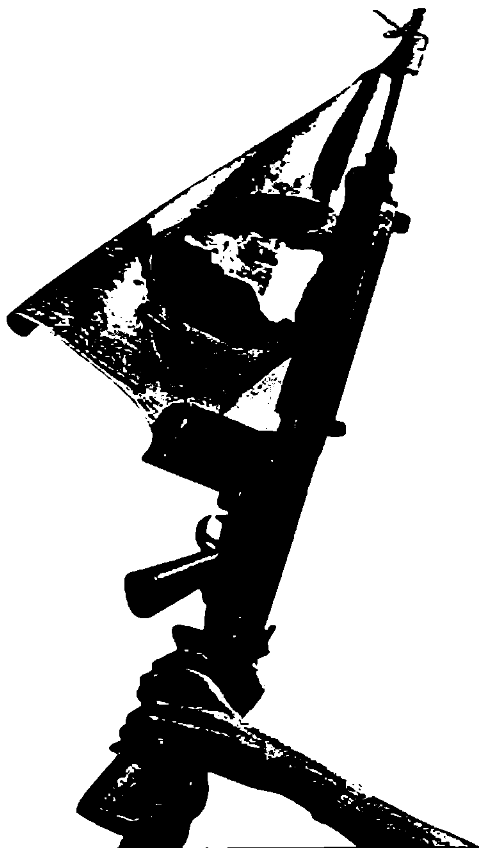
আলেম মুক্তিযোদ্ধার খোঁজে

শাকের হোসাইন শিবলি



সাবাস বাংলাদেশ, এ পৃথিবী অবাক
তাকিয়ে রয়, জ্বলে-পুড়ে-মরে
ছারখার, তবু মাথা নোয়াবার নয়

সুকান্ত ভট্টাচার্য

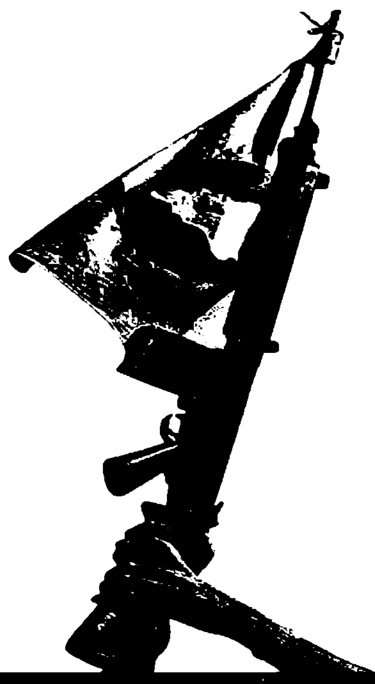


ইয়াহিয়া হিটলারকেও লজ্জা দিয়েছে

এই বীভৎস নিধনযজ্ঞ এই নৃশংসতম হত্যাকাণ্ডের সামনে অন্যসব নৃশংসতাই ম্লান হয়ে গেছে। গণহত্যা ও ধ্বংসলীলার কলঙ্কময় ইতিহাস খুঁজলে হিটলারের নিধন শিবির অথবা চেঙ্গিস খান বা তৈমুর লঙের নৃশংসতার কাহিনীতেও এরূপ হত্যাকাণ্ডের মিল পাওয়া দুষ্কর হবে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার প্রকাশিত মুক্তিযুদ্ধকালীন একটি পোস্টার

—সংগ্রহ : মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর



একাত্তরের

চেপে রাখা ইতিহাস

আলেম মুক্তিযোদ্ধার খোঁজে ১

শাকের হোসাইন শিবলি

আল-এছহাক প্রকাশনী

প্রথম প্রকাশ : জুন ২০০৮

একাত্তরের
চেপে রাখা ইতিহাস
আলেম মুক্তিযোদ্ধার খোঁজে : শাকের হোসাইন শিবলি

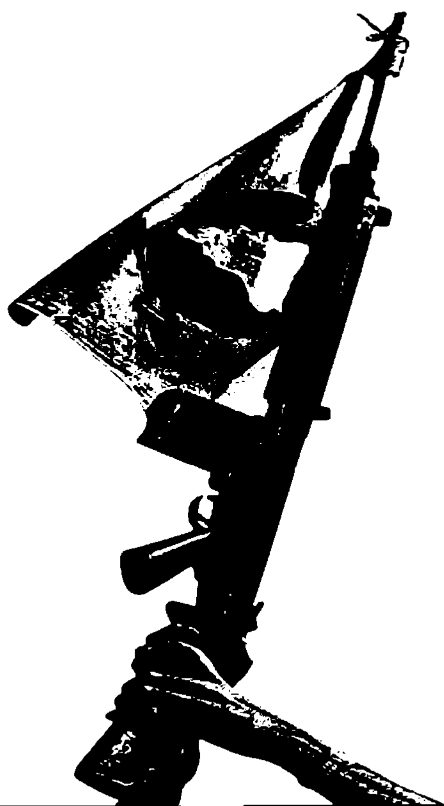
প্রকাশক : তারিক আজাদ চৌধুরী
আল-এছহাক প্রকাশনী, বিশাল বুক কমপ্লেক্স
(দোকান নং-৪৫) ৩৭, নর্থব্রুক হল রোড
বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০।
ইসলামী টাওয়ার দোকান নং-৩
১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
৭১২৩৫২৬, ০১৯১৬-৭৪৩৫৭৭, ০১৫৫৬-৩৩৪০৭৫

বর্ণ বিন্যাস : আইডিয়াল কম্পিউটার
বানান সংশোধন : ঝন্টু চৌধুরী
প্রচ্ছদে ব্যবহৃত হস্তাক্ষর : নিয়াজ চৌধুরী তুলি
প্রচ্ছদ : নাজমুল হায়দার
ভেতরের সাজগোজ : নাজমুল ও তৌকির আহমেদ রুবেল

মূল্য : ৪০০ টাকা (নির্ধারিত মূল্যে ক্রয় করুন)



ISBN-984-70094-0005-6



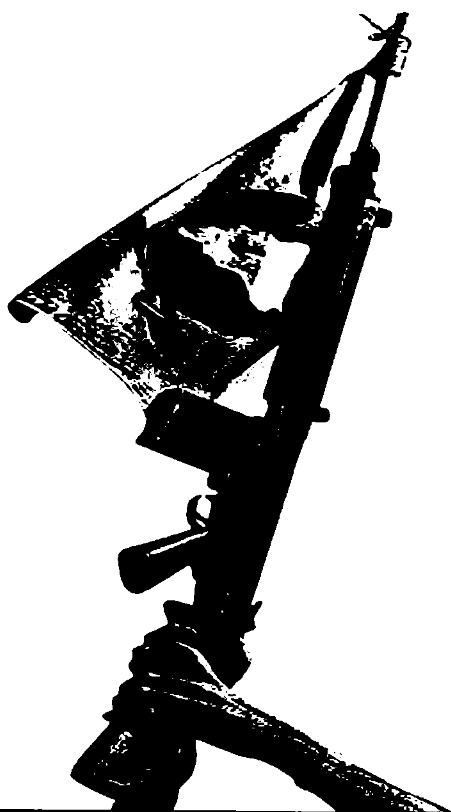
'অরক্ষিত স্বাধীনতাই পরাধীনতা'র প্রবক্তা

মরহুম মেজর এম এ জলিল

ও

দৈনিক যুগান্তরের উপ-সম্পাদক **শাহজাহান সরদার**-

যার সঙ্গে [illegible] করে এ বইটি লেখা



সহযোগিতায়

নূর খান ফারাজুল হক, মুফতি [illegible] উল্লাহ, সালাহউদ্দিন [illegible]

ইমদাদুল হক [illegible], [illegible]

[illegible] রহমান ও [illegible]

চাই পরমতসহিষ্ণুতা...

"এখন বিএনপি-আ'লীগ যারা করেন তাদের স্টাডি নেই– পরমতসহিষ্ণুতা নেই। এরা ভিন্নমতাবলম্বীদের কথা ধৈর্য ধরে শুনতে চান না, বরং জোর করে দমিয়ে রাখতে চান। অথচ দেখেন, কোনো আদর্শ কেন দুনিয়ার কোনো কিছুই কখনোই কেউ দমিয়ে রাখতে পারেনি। এটা সম্ভবও না। লাদেনের ব্যাপারটাই ধরুন। অস্ত্রের মুখে তাকে দমন করতে চেয়েছিল বুশ এবং তার কিছু মুসলিম মিত্র। তা কি পেরেছে? বরং লাদেন দিন দিন আরও দুর্বিনীত হচ্ছে। সারাবিশ্বে সে এখন হিরো কিংবা ভিলেন। এক লাদেন থেকে দেশে দেশে লাখো লাদেন তৈরি হচ্ছে।

"আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা দু'টি ভাগে বিভক্ত এবং উভয়টিই সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী। মাদরাসা পড়ুয়ারা কেন শহীদ মিনার, স্মৃতিসৌধে যায় না, ফুল দেয় না, জাতীয় সঙ্গীত গায় না এসব ব্যাপারে একবারও কি আমাদের নেতা-নেত্রীরা তাদের কাছে গিয়ে জানতে চেয়েছে? বুঝতে চেষ্টা করেছে এরা আসলে কি চায়, কেন চায়? বরং দূর থেকে কেবল তাদের মৌলবাদী, সন্ত্রাসী, গোঁড়া ইত্যাদি বলে গালমন্দ করেন। এর দ্বারা দূরত্ব আরও বেড়ে যায় এবং সমস্যা যেখানে ছিল সেখানেই থেকে যায়। যদি বসা হতো তাহলে উভয়েরই মঙ্গল হতো। আমাদেরটা যদি যুক্তি দিয়ে ভুল প্রমাণিত করতে পারে তাহলে তাদেরটা গ্রহণ করতে আমাদের তো কোনো আপত্তি থাকার কথা নয়। আর আমরা যদি আমাদেরটা যুক্তি দিয়ে বুঝাতে পারি তাহলে তাদেরও তো তা মানতে আপত্তি থাকার কথা নয়..."

–সাবেক এমপি শাহ হাদিউজ্জামান
১৯৭০, '৭৩, '৮৬, '৯১ ও '৯৬-এ আ'লীগের টিকিটে নির্বাচিত এমপি।
বঙ্গবন্ধুর অত্যন্ত স্নেহধন্য এবং
যশোরের নোয়াপাড়া পীরের বড় ভাই



ওরা মহেশখালী দ্বীপের ইসলামিয়া আজিজিয়া কাছেমুল উলুম মাতারবাড়ি মাদ্রাসায় পড়ে। দ্বীপে বেড়াতে গিয়ে ক্যামেরা হাতে মাদ্রাসায় ঢুকতেই ওদের সে কী উচ্ছ্বাস। আঁরার মদ্রাসাত সাম্বাদিক আসি্য, আঁরার ফটো তুলিবো (আমাদের মাদ্রাসায় সাংবাদিক এসেছে, আমাদের ছবি তুলবে) এই ছেলেগুলোর বয়স কতই বা হবে? গড়ে আট কি দশ। ওরা মুক্তিযুদ্ধ দেখেনি। বুঝেও না। কিন্তু একটা সময়ে গিয়ে ওদের গায়েই 'রাজাকার' তকমা এঁটে দেয়া হবে। কি অপরাধ ওদের?

আলেম মানেই রাজাকার নয়

"তখন সাড়ে সাত কোটি বাঙালির মধ্যে ৭ কোটি ৩০/৪০ লাখ মানুষই মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। কেউ মনে-প্রাণে, কেউ বুদ্ধি-পরামর্শ দিয়ে, কেউবা সশরীরে। ঢালাওভাবে কাউকে রাজাকার বলা ঠিক নয়। আলেম সমাজের সবাই রাজাকার ছিলেন এটা ভুল। নানা, চাচাসহ আমাদের আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে অনেক আলেম আছেন। কই তারা কেউ তো রাজাকার ছিলেন না। কয়েকটি রাজনৈতিক দল আদর্শিক কারণে পাকিস্তানের পক্ষে ছিল। কারও আদর্শ যদি পাকিস্তানকে টিকিয়ে রাখার পক্ষে থাকে সেটা দোষের কিছু নয়। কিন্তু তাদের ২৫ মার্চের পরের কর্মকাণ্ড ঠিক হয়নি। সুতরাং তারা অপরাধী এবং এজন্য অবশ্যই তাদের বিচার হওয়া উচিত।"

–মেজর (অবঃ) শোয়াইব

সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বর্তমান সিকিউরিটি অফিসার

রিভিউ কমিটির মন্তব্য

স্বীকৃতি না পাওয়ায় আলেম মুক্তিযোদ্ধাদের মনে দুঃখ আছে কিন্তু হতাশা নেই

সঞ্জীব চৌধুরী
সহকারী সম্পাদক, দৈনিক আমার দেশ

মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস লেখা হয়নি এবং হচ্ছে না বলে আমরা প্রায়ই হায়-আফসোস করি। কিন্তু নিজেদেরকে অত্যন্ত যোগ্য ও মহাপণ্ডিত মনে করলেও এ কাজে ব্যক্তিগতভাবে উদ্যোগ নেয়ার গরজ আমাদের মধ্যে দেখা যায় না। অন্তত নিজের কথা বলতে পারি যে, মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে লেখালেখির যে কাজ আমার করা উচিত ছিল আমি তার সিকি ভাগও করিনি। এই অনুজপ্রতিম শিবলি যখন তার ঢাউস সাইজের বই 'আলেম মুক্তিযোদ্ধার খোঁজে'র পাণ্ডুলিপিটি আমার সামনে হাজির করে বলল, আদ্যোপান্ত পড়ে কেমন লাগল তা নিয়ে দু'চার কথা লিখতে হবে। তখন আমি রীতিমত চমকে উঠেছিলাম। প্রথমত, এ ধরনের একটা কাজ সম্পন্ন করতে পারাটাই এক বিরাট সাফল্য; দ্বিতীয়ত, শিবলি এ কাজ করতে গিয়ে স্রোতের বিরুদ্ধে এগিয়েছে; তৃতীয়ত, মুক্তিযুদ্ধের পরে জন্ম নেয়া শিবলি কাজটি করেছে বলে তার লেখায় নিরপেক্ষতার একটা ছাপ আশা করা যায় এবং পাঠক তা অনুভব করবেন বইটির পাতায় পাতায়।

বইটির উপজীব্য চিত্তাকর্ষক। আধুনিক বলে কথিত এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীর কল্যাণে এমন একটা মিথ্যা আমাদের সমাজে প্রায় সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে এ দেশের আলেম সমাজের কোনো সক্রিয় ভূমিকা ছিল না। তারা হয় রাজাকার হয়েছে নতুবা গোপনে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছে। অথচ ইতিহাস সাক্ষী, একাত্তরের রাজাকারদের মধ্যে টুপি-দাড়িওয়ালা লোকের চেয়ে দাড়ি কামানো 'আধুনিক' লোকের সংখ্যা অনেক বেশি ছিল। যারা এ ধরনের অপবাদ দিয়ে অভ্যস্ত তারা আলেম সমাজকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতে ভালোবাসে। তাদের কথায় আলেমরা কাঠমোল্লা, অশিক্ষিত হুজুরের দল ইত্যাদি বিশেষণে পরিচিত। এ আলেম সমাজ যে মহান মুক্তিযুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে, তাদের অবদান ও আত্মত্যাগ যে অন্যদের চেয়ে বেশি ছাড়া কম নয় এটা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য শিবলিকে প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়েছে। তিন দশক আগের ঘটনা মানুষের স্মৃতি খুঁচিয়ে জাগিয়ে তোলা একজন পরিশ্রমী তরুণের জন্যও কঠিন কাজ। স্বেচ্ছায় এ কাজে হাত দিয়ে শিবলিকে টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া অর্থাৎ গোটা দেশ চষে বেড়াতে হয়েছে। তার ফলস্বরূপ আমরা হাতে পেয়েছি

একাত্তরের ইতিহাসের এক অকথিত বিবরণ। এ বিবরণ এ দেশের আলেম সমাজের দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগে ভাস্বর। বইটিতে মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী থেকে শুরু করে পটিয়ার মৌলভী আবদুস সোবহান পর্যন্ত অনেকের কথাই উঠে এসেছে। কেউ নিজে বলেছেন, কিছু অন্যের কাছ থেকে শোনা। প্রতিটি বিবরণ পড়ে একটা বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে : দেশ মুক্ত হবে– এ কামনা ছাড়া অন্য কোনো প্রত্যাশাকে আলেম মুক্তিযোদ্ধারা কখনও প্রশ্রয় দেননি। তাই স্বীকৃতি না পাওয়ায় তাদের মনে দুঃখ আছে কিন্তু হতাশা নেই। ধর্ম বিশ্বাস যে মানুষের ইহজাগতিক কর্তব্য পালনে কতটা অপরিহার্য, বইটি পড়লে পাঠকের মনে তা সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠবে। আমার মনে হয় এখানেই লেখক শাকের হোসাইন শিবলি সার্থক।
শেষ কথা হিসেবে বলতে চাই, এমন কিছু পাঠক আছেন যারা মনে করেন বইয়ের পরিশিষ্টভাগটুকু না পড়লেও তেমন ক্ষতি নেই। এ বইয়ের বেলায় সে সিদ্ধান্ত একেবারেই সঠিক হবে না। পরিশিষ্ট যে একটা বইকে কতটা সমৃদ্ধ করতে পারে শিবলির লেখা বইটি তার এক চমৎকার দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

মুক্তিযুদ্ধের ওপর অসাধারণ একটি কাজ

উবায়দুর রহমান খান নাদভী

সহকারী সম্পাদক, দৈনিক ইনকিলাব

মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ, বিপক্ষ ও নিরপেক্ষ অবস্থান নিয়ে বহু প্রকাশনা রয়েছে। সাংবাদিক শাকের হোসাইন শিবলি মুক্তিযুদ্ধের ওপর নতুন আঙ্গিকে অসাধারণ একটি কাজ করেছেন। এই নতুন আলোক প্রক্ষেপণ অনুদঘাটিত একটি সত্যকে উজ্জ্বলতা দান করবে। বাংলাদেশের জনগণের নিকট আপনজন গ্রামে-গঞ্জের আলেম-মৌলভী, ইমাম, মুয়াজ্জিন, হাফেজ ও পীর-মুর্শিদ শ্রেণী শত শত বছর ধরে এ দেশবাসীর সুখ-দুঃখের পরীক্ষিত সাথী। ক্ষেত্রবিশেষ কিছু অস্পষ্টতা বা ব্যতিক্রম থাকলেও সাধারণ মানুষ সমাজের সবাইকে ভালো করেই চিনে। কারো মুখের কথায়, মিডিয়ার প্রোপাগাণ্ডায় বা কৃত্রিম ধারণা নির্মাণ প্রয়াসে সাধারণ মানুষ ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয় না। মুক্তিযুদ্ধ-উত্তর বাংলাদেশে জনগণের নানামুখী স্বপ্ন ও চাহিদা পূরণ বহুলাংশে ব্যর্থ হওয়ার জন্য নেতৃত্ব, প্রশাসন বা দায়িত্বশীল শ্রেণীকে যতই দায়ী করা হোক– মূলত এর দায় জাতিগতভাবে আমাদের আদর্শ কর্মনীতি ও দক্ষতার দার্শনিক ভিত্তি রচয়িতাদের। আমাদের সমবয়সি বা কিছু ছোট-বড় স্বাধীন রাষ্ট্রগুলোর উন্নয়ন ও অগ্রগতির তুলনায় আমাদের অবস্থান বিশ্লেষণ করলে এ কথা স্পষ্ট হয়ে যাবে। স্বাধীনতার ৩৮ বছর পরও আমরা

এই দীনতা থেকে বেরুতে পারছি না। হীন রাজনীতির পাকচক্রে জাতি যেমন আটকে গেছে, দেশও অনিশ্চয়তায় নাভিশ্বাস টানছে। মুক্তিযোদ্ধারা একে একে চলে যাচ্ছেন, মনে তাদের স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণা নিয়ে। শাকের হোসাইন শিবলির বই কি আমাদের পথে আলো জ্বালাতে পারবে?

খুদে মাওলানার কাণ্ড

আহমাদ উল্লাহ

সাবেক সিনিয়র সহ-সম্পাদক, দৈনিক যুগান্তর

মাওলানা রুমি রহমতুল্লাহি আলাইহি তাঁর মসনবীতে বলেন–

কানে উদী দরতু আগর আতশ জনন্দ
জাহানারা আজ আতর ও রায়হান পোর কুনন্দ ॥

মানুষ হচ্ছে আতর আগরের খনি। তাঁর আত্মায় আগুন ধরিয়ে দিতে পারলে পৃথিবীকে সে প্রেম শরাবে পরিপূর্ণ করে দেয়।

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর প্রেম পান করিয়ে যেভাবে মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাহেলদের জাগিয়ে দিয়েছিলেন। জাহেল যখন আগর হয়ে উঠল, নিজে পুড়ে সে দ্বীনের সুবাস ছড়িয়ে দিল বিশ্বময়। এই তো বিশ্ব উম্মতের ইতিহাস।

মাওলানা শাকের হোসাইন শিবলি নামক আগর কাঠিতে দিয়াশলাইয়ের কাঠি ছুঁইয়ে দিয়েছিলেন হাফেজ আহমাদ, যুগান্তর, ইসলাম ও জীবন।

নতুন শতক। দু'হাজার সাল। নদী বাঁক পাল্টাল। নড়ে উঠল বন-বনানী। মধ্যরাতের চাঁদ জিকির করল তারাদের আসরে। বনে বনে ফুটল নতুন ফুলের কলি। নতুন এই ফুলকলিরা হচ্ছেন আলেম সমাজের কলম। প্রভু যখন কুন ফায়াকুনের কলম ধরেন তখন নদী বয়ে চলে ছন্দে সুরে। অথই সাগর সৃষ্টি করে প্রেমের উর্মিমালা। এভাবে যুগ-যুগান্তরের ইতিহাস সৃষ্টি করে প্রভুর কলমে প্রভুই লেখেন প্রভুর মতো করে।

কলম সৈনিক হয়ে উঠছে আলেম সমাজ। শামস্ তাবরিজের ইশকে যুগান্তরজয়ী গ্রন্থ লিখেছিলেন রুমি। তেমনি এক ঐতিহাসিক গবেষণাধর্মী গ্রন্থ সাজিয়ে ফেলেছেন আমাদের খুদে মাওলানা শাকের হোসাইন শিবলি।

কলি থেকে আলেম সমাজের ফুল হয়ে ফুটে ওঠার এ এক আলোকিত অধ্যায়।

লিখে মুগ্ধ হলো কলম কলাম,
লেখককে জানাই শ্রদ্ধা সালাম ॥

অতি প্রয়োজনীয় কাজটি দেরিতে হলেও সম্পাদিত হলো

মনযূর আহমদ
সম্পাদক, সাপ্তাহিক জাগো প্রহরী ও মাসিক রহমত

'আলেম মুক্তিযোদ্ধার খোঁজে' একটি বই হচ্ছে– বছর খানেক আগে সংবাদটি শুনছিলাম এক সুহৃদের কাছে। আলেম সাংবাদিক শাকের হোসাইন শিবলি ছোট একটি টিম নিয়ে সারাদেশের আলেম মুক্তিযোদ্ধাদের খুঁজে খুঁজে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। শুনে আন্দোলিত হয়েছিলাম, আশান্বিত হয়েছিলাম– অতিপ্রয়োজনীয় কাজটি দেরিতে হলেও সম্পাদিত হচ্ছে, জাতির দায় কেউ একজন শোধ করে দিচ্ছে। এখন থেকে দলিলসহ অপরিহার্যভাবে মুক্তিযোদ্ধার কাতারে আলেম-ওলামা শামিল হবে। স্বাধীনতায় আলেমদের ত্যাগের কথা ছাপার হরফে জাতির সামনে জ্বলজ্বল করবে। আশা করি একটি মহলের উদ্দেশ্যমূলক অপপ্রচারণাও বন্ধ হবে।

শিবলির পাণ্ডুলিপিটি পড়ে একথা বলতে কোনো দ্বিধা নেই যে, আমাদের সবার আশাকেই ছাড়িয়ে গেছেন তিনি। মাত্র এক বছরের মাথায় ইতিহাসের এমন একটি সুবিশাল দস্তাবেজ দাঁড় করানো কি করে সম্ভব হলো এটাও আরেক বিস্ময়।

একটি স্বাধীন দেশ হচ্ছে সুরম্য অট্টালিকার মতো। যে কোনো ভবন নিয়মিত ঝাড়মোছা না করলে সেখানে ধুলা জমে। ভবনটি সৌন্দর্য হারিয়ে মলিন হয়ে যায়। স্বাধীন দেশের মানুষ হয়েও যদি কেন আমরা স্বাধীন হলাম, কীভাবে আমাদের স্বাধীনতা আসল, সেসব কথা আলোচনা না করি, মনে না রাখি, আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে না জানাই, তবে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের অস্তিত্বও মলিন হয়ে যাবে। দেশের মানুষ যদি স্বাধীনতার মূল্য না বোঝে তবে আমাদের জন্য ঘোর অমঙ্গল নেমে আসতে পারে। আমরা বিশ্বাস করি, এ মূল্যবান বইটি জাতিকে একথাগুলো বুঝতে সাহায্য করবে।

আরেকটি কথা, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ ছিল জালিমের বিরুদ্ধে মজলুমের জান মাল ইজ্জত আব্রু বাঁচানোর লড়াই। সে লড়াইয়ে যাতে মজলুম জনতার বিজয় হয় তার জন্য এ দেশের ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে, আল্লাহর দরবারে কেঁদে কেঁদে ফরিয়াদ জানিয়েছে। রাব্বুল আলামিন সব সময় মজলুমের পক্ষে থাকেন। আমাদের ফরিয়াদও তিনি কবুল করেছেন। তাই আমরা স্বাধীন হতে পেরেছি। আমাদের স্বাধীনতা আল্লাহর রহমত।

শিবলি আমাদের ঋণ মুক্ত করেছেন

মুহাম্মদ যাইনুল আবিদীন
সব্যসাচী লেখক

'আলেম মুক্তিযোদ্ধার খোঁজে' একাত্তরের চেপে রাখা ইতিহাসের এক হীরক অধ্যায়। আমাদের জানা মতে এ বিষয়ে এটিই গ্রন্থবদ্ধ প্রথম প্রয়াস। 'মুক্তিযুদ্ধ ও আলেম সমাজ' আমাদের ইতিহাসের একটি সাধনা-সৃষ্ট ধূমায়িত দিক। তাই এই বইয়ের কথা ও দাবি কারো কাছে কিছুটা অপরিচিত কিংবা লালিত ধারণার পরিপন্থী মনে হতে পারে। আমি মনে করি এ গ্রন্থের গুরুত্ব এখানেই। শোনা ধারণার চাইতে দেখা সত্যের মূল্য যদি বেশি হয়ে থাকে তাহলে উদার পাঠকের কাছে এই গ্রন্থও সমাদর পাবে। অবশ্য তথ্যপূর্ণ ভিন্ন মতের মর্যাদাও কোনো অংশে কম নয়।
আমাদের কর্তব্য ছিল স্বাধীনতা যুদ্ধে আলেম সমাজের অবদানকে জাতির সামনে তুলে ধরা। আলেম সাংবাদিক শাকের হোসাইন শিবলি সেই কর্তব্য পালন করে আমাদের ঋণ মুক্ত করেছেন আর বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে করেছেন ঋণী।

ইতিহাসের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন

মুজাহিদ হুসাইন ইয়াসীন
কথাসাহিত্যিক

মা-অন্তপ্রাণ এক সন্তান। সে যদি অপচক্রের শিকার হয়, আপন মাকে খুনের দায়ে অন্যায়ভাবে দণ্ডিত হয় কিংবা আসল খুনিদের সঙ্গে যদি এই নিরপরাধ সন্তানের নামও গুলিয়ে ফেলা হয়, এর চেয়ে ট্রাজেডি-নৃশংসনীয় ঘটনা আর কি হতে পারে। এ দেশের আলেম সমাজও দেশ-মার জন্য সব সময় উৎসর্গীকৃত প্রাণ এবং দেশ-মার জন্য নিখাদ প্রেমের দীক্ষা নিয়ে বেড়ে ওঠে সেই শেকড় থেকেই। তবুও দেশ-মার এ সন্তানরা বড় হতাভাগা। দেশমাতৃকার আসল খুনিদের সঙ্গে ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় তাদের নামও গুলিয়ে ফেলা হচ্ছিল গত তিন যুগ ধরে। নির্মমতার এই জগদ্দল আর কতদিন তাদের বয়ে বেড়াতে হবে?
না, আর বয়ে বেড়াতে হবে না। মিথ্যার অপলাপে সাজানো পত্র একদিন না একদিন সত্যের মৃদু ঝটকাতেই ছিন্ন হয়। এটা মহাকালের এক অলংঘনীয় ধারা। 'আলেম মুক্তিযোদ্ধার খোঁজে' শীর্ষক বইটি সে ধারারই মোহরাঙ্কিত সত্যায়ন পত্র। পুরো আলেম সমাজের অস্তিত্ব ও সম্ভ্রমবোধের দলিল।
কলম যতই নির্লিপ্ত রাখি তবুও বলতে হয়, এ যেন মহাকালের অদৃশ্য তত্ত্বাবধানে শাকের হোসাইন শিবলির হাতে ইতিহাসের অমোঘ এক অধ্যায় রচিত হয়েছে। পুরো বইটাই একটা আবিষ্কার। ইতিহাসের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন। লেখক যে আঙ্গিকে মুক্তিযুদ্ধ ও আলেম মুক্তিযোদ্ধাদের এখানে তুলে এনেছেন বাংলাদেশে এ ধরনের প্রয়াস প্রথম তো বটেই। গতানুগতিকতার বাইরে ভিন্ন দৃষ্টিকোণে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে এমন আত্মপ্রত্যয়ী কাজের পরিকল্পনাও ইতিপূর্বে আর কারো উপলব্ধিতে এসেছে বলে শোনা যায়নি। সন্দেহ নেই ইতিহাসের সার্বিক গতিপথ নির্মাণে এ বইটি মূল উৎসের ভূমিকা পালন করবে। নড়েচড়ে বসতে বাধ্য হবেন ইতিহাসবেত্তাগণ।

ভূমিকা

মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসঊদ
সাবেক পরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ

বিসমিল্লাহির রাহীম,
আদম ছানী, দ্বিতীয় আদম হযরত নূহ আলাইহিস সালামের প্রপৌত্র বং এর আবাদ করা আমার পুণ্যময়ী প্রিয় জন্মভূমি বাংলা– বাংলাদেশ। চিরদিনই এর মানুষ, এর মনন, এর চেতনা প্রেমে কোমল, আর্দ্র; দ্রোহে কঠোর, অনমনীয়। উদার আকাশ, দিগন্ত প্রলম্বিত মাঠ একদিকে যেমন করেছে তার চেতনাকে উদার, অসাম্প্রদায়িক, অপর দিকে কালবৈশাখের ঝড়ো নির্মম বাতাস, চৈত্রের বিশুষ্ক কঠিন মাটি করেছে তাকে রুদ্র ও সমরে আহবে দৃঢ়। অসম সাহসী ও নির্ভীক প্রত্যয়ে সব প্রতিকূলতাকে দলে যাওয়ার শক্তিশালী ও হার না মানা দৃঢ়চিত্ততা। সেই নাম না জানা প্রাচীনকাল থেকেই কেউ তাকে পরাভূত করে রাখতে পারেনি শত চেষ্টায়ও। পূর্বের অসম সাহসী যে বীরদের অমিত তেজের কথা শ্রবণে আলেকজান্ডারের বাহিনী ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে আর এগুতে সাহস পায়নি সে জাতি তো ছিল এই বঙ্গবাসীরাই।
বীর বলে খ্যাত আর্যরা ইরান, তুরান, সিন্ধ, হিন্দ সব পদানত করার দীর্ঘদিন পরেও বঙ্গভূমির কিনারাও ঘেঁষতে না পেরে তাদের পবিত্র কিতাবে বঙ্গভূমে গেলে রৌরব নরকের ভীতি প্রদর্শন ছিল কী আর সাধে? কী পরিমাণ ঠেলা গুঁতা খাওয়ার পর এই ফতওয়া তাদের কণ্ঠ নিঃসৃত হয়েছিল তা সহজেই অনুমেয়।
যারা এখানে এসেছে, আবাস হিসাবে গ্রহণ করেছে এই পবিত্র ভূমিকে তাদের রক্তেও এই দ্রোহের দ্যোতনা সম্প্রসারিত হতে দেখা যায়। মোগল সাম্রাজ্য অভিসারীরা এই বঙ্গভূমির জল বিস্তারে হাওর প্রান্তরে এসে মুখ থুবড়ে পড়েছিল বাঙালি ভূঁইয়াদের তেজোশক্তির সামনে। এগার সিন্ধুর ব্রহ্মপুত্রের বালুচর কি এখনও এর সাক্ষ্য বহন করছে না? মানসিংহের মৃত্যু বিহ্বল ফ্যাকাশে চেহারা তো এখনো নজরে ভাসে। সীমাহীন শঠতা, কূটকপটতা, প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতাকে সঙ্গী করে ব্রিটিশ বেনিয়ারা সিঁদ কেটে ঢুকে পড়েছিল বঙ্গভূমির ভেতরে। কিন্তু পরদিন থেকেই বঙ্গবাসীরা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল দেশমাতৃকার মুক্তি আন্দোলনে। একদিনের জন্যও স্বস্তিতে থাকতে দেয়নি বেনিয়া সাম্রাজ্যবাদীদের এই বঙ্গ সন্তানরা। এর পরের ইতিহাস তো রক্তস্নানের ইতিহাস। বালাকোট হয়ে ১৮৫৭-এর মহাবিদ্রোহ। কোথায় নেই এই বঙ্গ সন্তানদের রক্তসিঞ্চন?
নানা শঠতায় মিথ্যা স্বপ্ন দেখিয়ে জন্ম হলো এক অলীক দেশ পাকিস্তানের। বং-এর আকিদা-বিশ্বাস ও সংস্কৃতির অনুসারী গরিষ্ঠ বঙ্গ সন্তানদের এই প্রবঞ্চনা বুঝতে বেশি দেরি লাগেনি। মওলানা ভাসানী বজ্র নির্ঘোষে বিদায়ী

সালাম জানালেন পাকিস্তানি শঠদের কাগমারী সম্মেলনের বহু আগেই। সংস্কৃতির মূল উপাদান ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় বজ্রমুষ্ঠি করে দাঁড়াল সবজনতা এক কাতারে। বায়ান্নর ফাগুন মাতাল হাওয়ায় জান দিয়ে দিল রাজপথে। শুরু হলো বিজয়ের স্বাধিকার আন্দোলন। উনসত্তরের কাল বেয়ে একাত্তরে সাত সাগর রক্ত ঢেলে ছিনিয়ে আনল স্বাধীনতার রক্তিম সূর্য এই বঙ্গ-এর দামাল সন্তানরা। পৃথিবীতে গড়ল এক অবিনাশী ইতিহাস।

কিন্তু সেই উজ্জ্বল সোনালি ধারার অপর দিকে এক অশুভ জালেম আগ্রাসীদের পদলেহী পশুশক্তির কালো ছায়া সহযোগী হয়ে দাঁড়াল বর্বর আগ্রাসীদের। জগৎশেঠ মীরজাফররা থাকে সবখানেই সব যুগেই। ইসলামী লেবাসের আড়ালে রাজাকারী মওদুদীবাদী জামায়াতি দুর্বৃত্তরা নিষ্ঠুর নির্মমতার চেঙ্গীজী দোসররা ইসলাম ও জাতির মুখে কলঙ্ক লেপন করতে যেয়ে মূলত নিজেদেরকেই করল কলঙ্কিত। মওদুদী'র এই অনুসারীরা পাকিস্তানি পশুদের সঙ্গে মিলে যে নারকীয় তাণ্ডব সৃষ্টি করেছিল মুক্তি সংগ্রামের সেই নয় মাসে তা নজিরবিহীন।

এই দুর্বৃত্তরা ইসলামি লেবাস ও চেহারা নকল করে সব দোষ চাপিয়ে দেয় টুপি-দাড়িওয়ালাদের ওপর আর নিজেরা টুপি-দাড়ি ফেলে দিয়ে আত্মগোপন করে আঁধারে। সাধারণভাবে ভুল বোঝাবুঝি হলো এই দুর্বৃত্তরা ছিল বুঝি সব দাড়ি-টুপিওয়ালারাই। আলেম সমাজ সঙ্গত কারণেই দাড়ি-টুপির সঙ্গে মোনাফেকি করা সম্ভব ছিল না। ফলে ধরে নেয়া হলো আলেম-ওলামারা বুঝি স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে ছিলেন না। আলেম-ওলামারা বক্র দৃষ্টির শিকার হলেন এবং হতে থাকলেন। অথচ প্রকৃত সত্য হলো এর বিপরীত। এ দেশের আলেম-ওলামা, পীর-মাশায়েখরা সব সময়ই জনচেতনার সঙ্গে থেকেছেন, নেতৃত্ব দিয়েছেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন এর জ্বলন্ত সাক্ষী। এ দেশের মানুষ কি ভুলতে পারবে বাঁশের কেল্লার শহীদ তিতুমীরের কথা? অজানা কি আজ হাজী শরীয়তুল্লাহ, পীর দুদুমিয়া, ফকীর মজনু শাহ এবং আরো আরো অগণিত মুক্তি সংগ্রামী আলেম-ওলামা ও পীর-মাশায়েখের কথা? বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনে মওলানা ভাসানী ও মাওলানা তর্কবাগীশ প্রমুখ দেওবন্দী আলেমের সংগ্রামী ও দ্রোহী অবদানের ইতিহাস কি মিথ্যা? চুয়ান্নর নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের ভোট যুদ্ধে হক, সোহরাওয়ার্দীর পাশাপাশি ফখরে বাঙাল মাওলানা তাজুল ইসলাম, মাওলানা সিদ্দীক আহমদ, মাওলানা আতহার আলীর কথা কেউ অস্বীকার করতে পারবে কি? ছয় দফা আন্দোলনের অকুতোভয় সেনানী মাওলানা ওলীউর রহমানের কথা কী মুছে যাওয়ার? স্বাধীনতা সংগ্রামের সেনানী ও রক্তক্ষয়ী আহবে আলেম-ওলামা কেবল সমর্থনই করেননি লিপ্ত হয়েছেন পাকিস্তানি বর্বরদের মোকাবেলায়। মরেছেন, মেরেছেন, শহীদ হয়েছেন। মহান মুক্তিযুদ্ধে ওদের সংখ্যা এক-দু'জন নয় দৃষ্টির সীমা প্রলম্বিত সেই তালিকা।

হাজারো আলেম ও পীর-মাশায়েখ নিজ নিজ এলাকায় সংগঠিত করেছেন মুক্তিযোদ্ধাদের। সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন লাখোজন। সত্য সত্যই। সত্য

চাপা থাকতে পারে না কখনও, সময়ে তা উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে নিজ ঔজ্জ্বল্যে। সেই চেপে রাখা ইতিহাসের কিছু বিদ্যুৎছটা নিয়ে কিছু সুগন্ধী পুষ্প পাপড়ি দিয়ে বক্ষমাণ নৈবদ্যটি সাজিয়েছেন তরুণ আলেম, গবেষক, সাংবাদিক তথ্যানুসন্ধানী লেখক শাহোশি (শাকের হোসাইন শিবলি) সাহসী চিত্তে প্রোজ্জ্বল লিপিকায়। প্রতিটি ছত্রে ছত্রে তার পরিশ্রমী ও ক্লান্তিহীন তথ্যানুসন্ধানের স্বাক্ষর স্পষ্ট। নিভৃত পল্লী পল্লী চষে বেড়িয়েছেন তথ্য সংগ্রহে। এ তো সমুদ্র সেচে মুক্তো আনার মতো। এতে বিধৃত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের সমকালীন আলেম-ওলামা ও পীর-মাশায়েখের আত্মদানের সোনাঝরা ইতিহাস। প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎকারে আরো তা বাস্তবমুখী হয়েছে নিঃসন্দেহে। এটি ইতিহাস গ্রন্থ নয় বটে তবে ইতিহাসের এক সমৃদ্ধ তথ্য ভাণ্ডার হিসেবে স্বীকৃত হবে নিঃসন্দেহে। এর বাইরে বহুজন রয়ে গেছেন যাদের পর্যন্ত পৌঁছতে পারেননি আমাদের 'শাহোশি'। তবে আগামী গবেষকরা এই আলোকে স্পষ্ট এক পথে এগিয়ে যাওয়ার হিম্মত পাবেন সন্দেহ নেই। এ কেবল একটি গ্রন্থ নয় পথিকৃত । সমাজকে এক বিরাট দায় থেকে মুক্ত করলেন এই তরুণ তথ্যানুসন্ধানী। তাকে সাধুবাদ ও মোবারকবাদ জানানোই শেষ হবে না। প্রণাম করা জায়েজ থাকলে হয়তো তাই করতাম নিভৃতে মুক্তিযুদ্ধের দায় বয়ে বেড়ানো অধম এই আমি। শাহোশি'র তালিকায় এলাকায় রাজাকার হিসেবে প্রসিদ্ধ কিছু নামও দেখলাম। হয়তো তথ্যের অভাব বা অসাবধানতা বা সাধারণ মানুষদের বাঁচাতে রাজাকারী করেছিলেন এরা। আল্লাহ মালুম।

তথ্য সংগ্রহ ক্ষেত্রে বহু স্থানে যেতে হয়েছে লেখককে। লেখায় তার ক্লান্ত চেহারা ভেসে ওঠে মাঝে মাঝে। বিশেষ করে লোক প্রছন্দ নেতিকিলার কথাসাহিত্যিক হু. আহমেদের হেঁয়ালীপনায় তার ক্ষুব্ধতা স্পষ্ট। কিছু তীক্ষ্ণ মন্তব্য বিধৃত হয়েছে তার লেখায়। মহান মানবিক গুণসম্পন্ন শ্রদ্ধেয় আলেম তাঁর দাদাজান সম্পর্কে হেঁয়ালি হয়তো পছন্দ হয়নি স্পষ্টভাষী শাহোশির। মহান আলেম সর্বজন শ্রদ্ধেয় বুজুর্গ তার দাদাজান সম্পর্কে হু. আহমেদ কি অবচেতন মনে লজ্জাবোধ করেন? আল্লাহই জানেন। বক্ষমাণ সাক্ষাৎকার গ্রন্থটির পরিশিষ্ট অত্যন্ত মূল্যবান ও ঐতিহাসিক দলিলসমৃদ্ধ। একসঙ্গে একই পরিসরে পাওয়া পাঠকদের জন্য দুর্লভ সুযোগ। পরিশিষ্টটি পাঠে একজন পাঠক স্পষ্ট জানতে পারবেন স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস। পাকিস্তানি নেতা ও জেনারেলদের মানসিকতা, বিদেশি সত্যনিষ্ঠ মশহুর সাংবাদিকদের তথ্যসমৃদ্ধ খবরাখবর, ঘোষক নিয়ে বিতর্কের আসল তথ্য। পরাজিত পাকিস্তানিদের অনুশোচনাবোধ এবং আরও বহু তথ্যের সমাহার এই মূল্যবান সংযোজনটি।

পরিশেষে আত্মনিঃসৃত দোয়া জানাই এই শাহোশি কলমসৈনিককে। আল্লাহপাক কবুল করুন আমাদেরকে, আমাদের স্বাধীনতাকে, আমাদের আমজনতাকে। সমৃদ্ধির পথে, কল্যাণ ও হেদায়েতের পথে পরিচালিত করুন আমাদের সকলকে।

রফিক উদ্দীন মাসউদ
২/০৪/০৮

পাকিস্তান শরিয়া বোর্ডের সাবেক প্রধান বিচারপতি, বর্তমান মুসলিম বিশ্বের খ্যাতিমান আলেম মুফতি মোহাম্মদ তকী উসমানীর মন্তব্য

"বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালীন ও এর আগের বেদনাদায়ক ইতিহাস শোনার পর আমার এ বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়েছে যে, এ যুদ্ধে পাকিস্তানিদের পরাজয়বরণ আমাদের সৈন্যদের অসৎ ও অপকর্মেরই শাস্তি"

সিলেটের কাসেমুল উলূম মাদরাসা আমাকে নিমন্ত্রণ জানায়। তা রক্ষার্থে এক সপ্তাহের সফরে বাংলাদেশে যেতে হয়। পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন হয়ে বাংলাদেশ হওয়ার পর সে দেশে অধমের এই প্রথম সফর। সর্বশেষ চৌদ্দ বছর আগে এখানে এসেছিলাম। চৌদ্দ বছর পরের এই সফরের জন্য আমাকে পাসপোর্ট-ভিসার আনুষ্ঠানিকতা রক্ষা করতে হয়েছে। তারপর ঢাকা এয়ারপোর্টে নেমে ইমিগ্রেশন ও কাস্টমসসহ অন্যান্য অফিসিয়ালি বিষয়গুল সম্পন্ন করার সময় মনের মধ্যে যে চিনচিনে অব্যক্ত এক বোধ অনুভূত হচ্ছিল তা কোনো ভাষায় ব্যক্ত করা সম্ভব নয়। তারপরও আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছি, দীর্ঘ এক বন্ধ্যাত্ব সময় অতিক্রম করার পর এখন তো পরিবেশ এতটুকু বান্ধব হয়েছে যে, দু'প্রান্তের মানুষজন পরস্পরের চেহারা-সুরত দেখতে পাচ্ছে।

ঢাকার পথ-ঘাট দেখে ধাক্কা খেলাম। পুরো দুনিয়াই পাল্টে গেছে। মাত্র চৌদ্দ বছরের ব্যবধানে না জানি কতগুলো প্রলয়ের ঝাঁকুনি সইতে হয়েছে এ শহরকে। কত বিপদাপদ ও সংকটের পাহাড় এখানে ভেঙে পড়েছে! কত বিপ্লব আর ভাঙাগড়ার ভয়াবহ দৃশ্য এখানে চিত্রায়িত হয়েছে।

এর মধ্যে অভিভাবকতুল্য অনেক মহান ব্যক্তিত্বও আজ নেই। যাদেরকে দু' দণ্ড দেখার কথা মনে পড়লেই ঢাকার সফর বড়ই আকর্ষণীয় হয়ে উঠত। যাদেরকে কৈশোর উত্তীর্ণ দেখে গিয়েছিলাম তারা এখন যৌবন ঝলমলে সুপুরুষ। যাদেরকে যুবক ও শক্ত-পোক্ত গড়নের দেখে গিয়েছিলাম তাদের কেউ ভগ্ন স্বাস্থ্যের, কেউ পৌঁছে গেছে প্রৌঢ়ত্বে। আগের বার যখন বিভিন্ন দ্বীনি প্রতিষ্ঠানে গিয়েছি প্রায় প্রত্যেককে বলতে শুনেছি, আমি আপনার বাবার [মুফতি শফী (রহঃ)]-এর ছাত্র। আর এবার অধিকাংশকেই বলতে শুনছি, আমি অমুক সালে আপনার সহপাঠী ছিলাম। কিংবা আপনার কাছে পড়েছি।

বাংলাদেশে অবস্থানের সময় এবং এর পরেও ১৯৭০-'৭১-এ পশ্চিম পাকিস্তানের পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি অন্যায় আচরণ, এরপরে সংঘটিত মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে বন্ধুবান্ধব ও শুভার্থীদের মুখে অনেক কিছুই শুনেছি। যতটা কল্পনায় ছিল বা ভেবেছিলাম এর

চেয়ে আরো ভয়াবহ ভূ-কম্পনের ভেতর দিয়ে যেতে হয়েছে এদেশের মানুষকে। আসল বাস্তবতা হলো, এই ভূখণ্ডের ওপর জুলুম, অত্যাচার আর অবিচারের উলঙ্গ নাচ প্রদর্শিত হয়েছে এবং তার পেছনে এত নানামুখী ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত নেপথ্যে কাজ করেছে; আর তাও এত দীর্ঘকাল ধরে যে, এর চূড়ান্ত ইতিহাস নানা জটিলতার আবর্তে ঘুরপাক থাকবে। আর এর দায়দায়িত্ব এত নানামুখী শক্তি ও চক্রের ওপর বর্তায় যার সঠিক তালিকা ও ইতিহাস নির্ণয় করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। কারণ, দক্ষিণ এশিয়ার কোনো দেশেই কখনো একেবারে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে কোনো ঘটনা-দুর্ঘটনা পর্যবেক্ষণ করার মতো দূরদর্শী ও দুঃসাহসী চোখ আমরা দেখেতে পায়নি।

উপরন্তু পুরো বাংলার প্রতিটি এলাকায় অনবরত জুলুম নির্যাতনের দগদগে ঘায়ের এত ঘন কালো ছাপ পড়েছে যে, তারও শুমারি করা ইতিহাসবেত্তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তবে স্বাধীন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালীন ও এর আগের বেদনাদায়ক ইতিহাস শোনার পর আমার এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়েছে যে, বাংলাদেশের মানুষ যে আক্রান্ত হয়েছিল এবং যুদ্ধে পাকিস্তানিরা পরাজয়বরণ করেছে তা ছিল আমাদের সৈন্যদের অসৎ ও অপকর্মেরই শাস্তি। না হয় পৃথিবীর ইতিহাসে এমন নজির নেই যে, দুর্ধর্ষ নব্বই হাজার মুসলিম সেনা কারো কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। আল্লাহর পক্ষ থেকে এ এক পরম শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত ছাড়া আর কিছু ছিল না।

বিচারপতি মুফতি মোহাম্মদ তকী উসমানীর ভ্রমণবিষয়ক বিখ্যাত গ্রন্থ 'জাহানে দিদাহ'র 'বাংলাদেশে কয়েকদিন' অধ্যায় থেকে

এ এক অদ্ভুত দর্শন। জীবনভর কোমর বেঁধে ইসলামের সঙ্গে বিদ্রোহ করে যাও। ইসলামের প্রতিটি বিষয়ে, প্রতিটি পদক্ষেপে বাধার প্রাচীর দাঁড় করাও। শরাব ও কাবাবের আসর মাত করতে থাকো। ঘরে ঘরে নাচ গানের বিস্তার করে উন্মাদনা ছড়িয়ে দাও। উলঙ্গতা ও অশ্লীলতার বাজার চাঙ্গা করে জাতিকে উলঙ্গপ্রিয় করে তুলতে থাকো। পর্দা-আব্রুহীনতাকে সভ্যতা ও সংস্কৃতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য বানিয়ে সম্ভ্রম ও চারিত্রিক পবিত্রতার এক একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গকে বিচ্ছিন্ন করতে থাকো। অফিস-আদালতে-কর্মক্ষেত্রে সুদ, ঘুষ, কাজে ফাঁকি, দুর্নীতিকে জীবনের আসল বৃত্তি বানিয়ে নাও। পথেঘাটে, হাটেবাজারে ধোঁকা, প্রতারণা, পরিমাপে চৌর্যবৃত্তি, কালোবাজারি, অবৈধ গুদামজাত, সিন্ডিকেটের অভিশপ্ত চোরা পথ খোলে দাও। শিক্ষাক্ষেত্রে খোলামেলাভাবে খোদাদ্রোহী মনোভাব বিস্তার করে দাও। মসজিদকে জনমানবহীন করে নাইট ক্লাবকে জনাকীর্ণ করে তোলো। পরিশ্রম, অধ্যবসায়, সৎ প্রতিযোগিতাকে বিদায় সালাম জানিয়ে বিলাসিতা ও আরামপ্রিয়তাকে জাতির বৈশিষ্ট্য বানিয়ে নাও। দরিদ্র জনমানুষকে প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করে তাদের দেহের শেষ রক্ত বিন্দুটুকুও নিংড়ে নাও। ঐক্য ও সম্প্রীতির স্থলে প্রাদেশিক ও আঞ্চলিকতার বিদ্বেষ উস্কে দিয়ে দেশের শান্তি ও নিরাপত্তার ওপর হাতুড়ি পেটা করো। তারপর যখন এ সব ঘৃণ্য অপকর্মের পরিণামে পরাজয় ও লাঞ্ছনার খোদায়ী আজাব নাজিল হবে তখন এই বলে সটকে পড়ো যে, ইসলাম আমাদের সঙ্গে 'অফাদারি'– সকৃতজ্ঞ কোনো আচরণ করল না; ভালো কিছু দিল না।

এ তো মহান আল্লাহতায়ালারই অপার অনুগ্রহ। আমাদের মধ্যে এমন সুস্থ-সুবোধ লোকেরও অভাব নেই। স্বাধীনতাকামী মুক্তিযোদ্ধার কাছে পাকিস্তানের এই পরাজয়, শোচনীয় লাঞ্ছনা আর অপদস্থতাকে নিজেদেরই অপকর্ম ও অপচক্রের স্বউপার্জিত ফলাফল স্বীকার করে অনুতপ্ত হয়। কিন্তু কিছু বর্ণচোরা সাংবাদিক-বুদ্ধিজীবী ও সাহিত্যজীবী এখন এমন অপপ্রচার চালানোরও চেষ্টা করছে যে, এই পরাজয়ের সঙ্গে ধর্মীয় অসৎকর্ম ও ধর্ম ব্যবহারের কোনো সম্পর্ক নয়। এর পক্ষে অদ্ভুত ও হাস্যকর যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপন করে। বলে থাকে, আমাদের মধ্যে যদি মদপায়ী ও উলঙ্গপনার ধ্বংসাত্মক চরিত্র মহামারির আকার পেয়ে থাকে তাহলে তো মুক্তিযুদ্ধের মিত্রশক্তি ভারতীয় সেনারাও ফেরেশতা ছিল না। যেসব অপকর্ম ও চরিত্রহীনতার দণ্ড আমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে থাকে তা তো আমাদের চেয়ে ভারতীয়দের মধ্যে কয়েকগুণ বেশি পাওয়া যায়। তারপরও কেন তাদের পরাজয় ঘটল না?

কিন্তু এ যুক্তি খেজুর বৃক্ষের তরল রসকে কূপের পানির সঙ্গে তুলনা করার মতোই নির্বুদ্ধিতা। দুনিয়ার হাজার হাজার বছরের ইতিহাস সাক্ষী, বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী এই দুই জাতির মধ্যে যেমন বিশ্বাসগত ও চিন্তাগত অবস্থানের দিক দিয়ে আকাশ-পাতাল পার্থক্য রয়েছে তেমনি এই দুই জাতির সঙ্গে প্রকৃতির আচরণ ব্যবহারও একেবারেই স্বতন্ত্র। অন্য ধর্মাবলম্বীরা তো শরাব কাবাবের আসর সাজিয়ে ভোগ বিলাসে মত্ত থেকে ক্ষণকালের পার্থিব জীবনেই আমোদ-প্রমোদের স্বাদ ভোগ করতে পারে।

কিন্তু যে জাতির ভিত্তিই আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র নামের ওপর স্থাপিত হয়েছে, যে মুসলমান তার জীবনের সব অঙ্গনে আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্যের অঙ্গীকার করেছে, নিজের বাহ্যিক উপায়-উপকরণের চেয়ে আল্লাহর অপার সাহায্যের প্রতি যার সীমাহীন আস্থা, সে যদি ইসলামকে স্বার্থসিদ্ধির জন্য ব্যবহার করে, ইসলামের প্রকৃত আবেদনকে পদদলিত করে, তার কপালে অপমান অপদস্থতা ছাড়া আর কিছুই জুটবে না। এটা তাঁর চিরন্তন রীতি। তাঁর প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্য থাকলে সামান্য উপায়, উপকরণ ও নগণ্য সমর শক্তির লড়াকু যোদ্ধাদের বড় বড় পরাশক্তির বিরুদ্ধে বিজয় দান করেন। আর তাঁর অবাধ্য হলে বিশাল সমরশক্তি, সর্বাধুনিক অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত হওয়া সত্ত্বেও ছোট কোনো যুদ্ধশক্তির হাতেও চরম মার খাওয়াতে পারেন।

ইসলামের গণ্ডির বাইরে থেকে আপনি রণাঙ্গনের সামগ্রিক ব্যাপারের সঙ্গে পাপ-পুণ্য, সততা-অসততাকে অপ্রাসঙ্গিক ও অপ্রয়োজনীয় বলতে পারেন। কিন্তু যে পর্যন্ত আপনি ইসলামের গণ্ডিতে রয়েছেন সে পর্যন্ত পার্থিব উপায় উপকরণের মতো আপনার ধর্মীয় কর্মকাণ্ড যুদ্ধের ময়দানের জয়-পরাজয়ের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত থাকবে।

মূলনীতির তাৎপর্যে কথাটা মনে রাখতে হবে। বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষের সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছে যান। সাধারণ অস্ত্রশস্ত্র, বিমানই শুধু আপনার কাছে নেই, এটম বোমা, হাইড্রোজেন বোমাও আপনি তৈরি করুন। যুদ্ধ বিমান ও যুদ্ধ জাহাজসহ সর্বাধুনিক রাডার যন্ত্র নিয়ে আপনার প্রতিরক্ষা শক্তিকে আজকের দুনিয়ার চেয়ে দশগুণ অধিক

শক্তিশালী করে তুলুন। কিন্তু যদি ইসলামের পালনীয় অনুষঙ্গগুলোকে এখান থেকে বিদায় করে দিয়ে ইসলামের সামগ্রিকতার নাম-নিশানা মুছে দেন তখন পূর্ণ নিশ্চয়তা ও আস্থার সঙ্গে বলব, তারপরও একদিন না একদিন চরম লাঞ্ছনাদায়ক পরাজয়ের মুখ আপনাকে দেখতে হবে।

তাই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের কাছে পাক বাহিনীর পরাজয়ের কারণ যদি অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ ও সেনা শৃংখলার ত্রুটি-বিচ্যুতির মধ্যে খুঁজতে যান তাহলে কোনো অংকই তখন মিলবে না। নিজেদের অপকর্ম ও অন্যায়-জুলুম নির্যাতনের জন্য অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থী হোন, মজলুমের কাছে নতি স্বীকার করুন, দেখবেন সব জটিলতার নিরসন হয়ে গেছে। বিবেকের দংশন থেমে গেছে। 'আল্লাহর প্রতি শর্তহীন আনুগত্য'-এর বিষয়টি রণাঙ্গন ও প্রতিরক্ষা শক্তির সঙ্গে অপ্রাসঙ্গিক মনে করে পুরো সেনা ছাউনি থেকে বের করে দিতে চায় যারা তারা নিঃসন্দেহে পুরো জাতিকে উল্টো পথে পরিচালিত করেছেন। যে পথের শেষে অনিবার্য ধ্বংস আর বিপর্যয় ছাড়া আর কিছু নেই।

বিচারপতি মুফতি মোহাম্মদ তকী উসমানীর ধর্মতত্ত্ব ও আন্তর্জাতিক বিষয়াদির তুলনামূলক বিশ্লেষণধর্মী গ্রন্থ 'আস্‌রে হাজির মে ইসলাম কেয়সে নাফেজ হো'র 'ঢাকার পতন এবং দ্বি-জাতিতত্ত্ব' অধ্যায় থেকে

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : মুফতি মুহাম্মদ উবায়দুল্লাহ, মুজাহিদ হুসাইন ইয়াসীন

সাহসের সমাচার

পঁচিশে মার্চের দুঃখগাথা

বর্বর পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর নৃশংস হত্যাযজ্ঞের আনুষ্ঠানিক সূচনা ঘটেছিল আজ দিবাগত রাতে। স্যাটেলাইট চ্যানেল 'আরটিভি'র সান্ধ্য খবরে সেই দৃশ্য দেখানো হলো। এমন নৃশংসতা দুনিয়ার ইতিহাসে আর কয়টি ঘটেছে তা আমার জানা নেই।

বাংলাদেশ জন্মের সময় পৃথিবী নামক গ্রহে আমার অস্তিত্বই ছিল না। স্বাধীন-সার্বভৌম এ দেশটির বয়স যখন সাত তখন আমি জন্মলাভ করি। তাই স্বাধীনতা আমার কাছে দূরস্মৃতি। আমাদের প্রজন্ম ইতিহাস পাঠেই জেনেছে কেন আমরা স্বাধীন হলাম, কীভাবে আমাদের স্বাধীনতা এলো সেসব কথা। আমরা জেনেছি, পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানিরা আমাদের ওপর শোষণ করেছে, কর্তৃত্ব করেছে। '৫২-তে মায়ের ভাষার অধিকার আদায় করতে গিয়ে বাঙালির রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে। '৭০-এর নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে বাঙালিরা যখন ক্ষমতায় যেতে চেয়েছে তখনই তাদের ওপর নেমে এসেছে অবর্ণনীয় নির্যাতন-নিপীড়ন। ইয়াহিয়ার সামরিক বাহিনী হিংস্র হায়েনার মতো ঝাঁপিয়ে পড়েছে পূর্ব পাকিস্তানের নিরীহ-নিরস্ত্র জনগণের ওপর। এতে লাখো বাঙালি প্রাণ দিয়েছে। মা-বোনেরা হয়েছে ধর্ষিতা। কেন, কি অপরাধ করেছিলাম আমরা? অপরাধ একটিই —বাঙালিরা পশ্চিম পাকিস্তানিদের শাসন করবে।

ইয়াহিয়া খান পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি মুসলমানদের বলত মচ্ছড় অর্থাৎ মশা! দেশের প্রেসিডেন্টের মানসিক বহর যদি এমন হয় তাহলে একাত্তরের ঘটনাবলি নিয়ে আশ্চর্য হওয়ার কি আছে। টিক্কা খানের মতো জন্তু-জানোয়ার তো বলতেই পারে **'হাম আদমি নেহি মেট্টি মাঙতে হ্যায়— আমি মানুষ না জমিন চাই'**। **একাত্তরে কি ঘটেছিল তা প্রমাণ করার জন্য টিক্কা খানের এই একটি বাক্যই তো যথেষ্ট।**

"বাঙালিদের শায়েস্তা করার বিষয়টি যদি আইয়ুব খানের সময় হতো তবে ব্যাপারটি আরও ভীষণ হতো। কারণ আইয়ুব খান বাঙালিদের খুবই অপছন্দ করতেন। বলতেন, এরা হচ্ছে নিচুমানের মানুষ; মানসিকভাবেই স্বাধীনতাকে ভোগ করার উপযুক্ত এরা নয়। এরা পরাজিত জাতি, আর এদের ওপর প্রভুত্ব করার জন্যেই পশ্চিম পাকিস্তানিরা আছে।" –(ম্যাসাকার : রবার্ট পেইন, পৃষ্ঠা : ৩০)

'পাকিস্তান কি মতলব কেয়া — লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' কালেমার স্লোগানে জন্ম হয়েছিল যে পাকিস্তানের মাত্র চব্বিশ বছরের মাথায় সেই পাকিস্তানি সৈন্যদের বর্বরতা কাফের হিটলারের নাৎসি বাহিনীকেও হার মানিয়েছে। প্রিয় পাঠক, পাকিস্তানি মুসলমান সৈন্যদের চারটি ঘটনা তুলে ধরছি প্রয়াত কথাসাহিত্যিক শওকত ওসমানের একাত্তরের ডায়েরি 'স্মৃতি খণ্ড মুজিবনগর' গ্রন্থ থেকে। একাত্তরে এভাবেই ওরা ইসলামের নাম নিয়ে আমাদের ওপর নির্যাতন চালিয়েছিল।

"১৯৭১, ৭ আগস্ট : আজ এক মুক্তিযোদ্ধার মুখে যেসব ঘটনা শুনলাম তা বিশ্বাস করা দায়। কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে স্বীকারোক্তি আদায় করতে শিকারি কুকুর ব্যবহৃত হয়। বাগে না এলে কুকুরগুলো মজলুমকে ধীরে ধীরে ছিঁড়ে ফেলে।

ঢাকা শহরের বংশালের এক যুবককে স্বীকারোক্তি আদায়ে তিরিশ ঘণ্টা ঝুলিয়ে রেখেছিল। পা শূন্যে, মাথা নিচে। মুখ দিয়ে রক্ত ঝরল ফোঁটা ফোঁটা। নামানোর পর মরে গেল। হাতের নলি পর্যন্ত ছুরি দিয়ে চামড়া চেঁছে চেঁছে অন্যদের দেখাল। কথা বলো, না হয় এই শাস্তি। নাৎসি বর্বরতা ঢের মোলায়েম এর কাছে। পাঞ্জাবি মুসলমানেরা ও আমরা এক জাতি। যৌথ আন্দোলনে সৃষ্টি হয়েছিল পাকিস্তান।"

"১৯৭১, ১৯ আগস্ট : হাতিরপুল মসজিদের ইমাম ২৬ মার্চের ভোরে বেরিয়েছিল আজান দিতে। আজানই তার জীবিকা অর্জনের উপায়। মসজিদ প্রাঙ্গণেই তিনি গুলি খেয়ে লুটিয়ে পড়েন। ইসলামি রাষ্ট্রের ধার্মিক নাগরিক। কী চমৎকার পরিণাম।"

"১৯৭১, ২০ অক্টোবর : আজ সন্ধ্যায় মুক্তিবাহিনীর এক যোদ্ধার কাছ থেকে একটি ঘটনা শুনলাম। অকুস্থল শেরপুর, ময়মনসিংহ। ধর্মপ্রাণ হাজী সাহেবের পুত্রবধূকে পাকিস্তানি মিলিটারিরা ধরে নিয়ে যায়। পরদিন তিনি গ্রামবাসীদের বললেন, 'আল্লাহ আছেন কি-না, আল্লাহ জানেন। এই জানোয়ারদের হত্যা করাই এখন ইসলাম।'
মুসলিম লীগের এই বৃদ্ধ এখন গেরিলা বাহিনীর প্রধান সাহায্যকারী।"

"১৯৭১, ৫ ডিসেম্বর : মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় জওয়ানদের অগ্রগতির ফলে পরিত্যক্ত এলাকা থেকে জঙ্গি পাকিস্তান বাহিনীর অনেক ক্রিয়াকলাপের সংবাদ পাওয়া গেছে। যশোরের নিকটস্থ পোস্টাপিস থেকে এক ধর্ষণ-উন্মাদ অফিসারের চিঠি পাওয়া গেছে। বলাবাহুল্য, পোস্টাপিস বর্তমানে অধিকৃত। অফিসারের নাম আফজাল খান সাকীব। সে তার বন্ধু মেজর মোহাম্মদ ইকবাল খান-কে লিখছে, ... "বাংলাদেশে বাঙালি মেয়েদের ওপর বলাৎকার প্রশংসার কাজ বৈকি।... এভাবে এক প্রজন্মে ওদের জাতীয় চরিত্র বদলে দেওয়া যাবে।"

পত্রে অন্যত্র- "I was not surprised about the news of bengal tigers being tamed by Roshid. It is a must to change their next generation. You must also plan carefully to tame bitches there. (এক বাঙালি বাঘিনীকে পোষ মানিয়েছে রশীদ। এই সংবাদে আমি অবাক হইনি। ওদের পরবর্তী প্রজন্ম বদলে দিতে এটাই হচ্ছে একদম লাজেমী

(অবশ্য-কর্তব্য) কাজ। তুমি কুন্তী পোষ মানাতে ওখানে খুব যত্নের সঙ্গে প্ল্যান করো।")

যাদের ত্যাগে পাকিস্তান পেলাম

পাকিস্তান জন্মের সঙ্গে বাঙালি মুসলমানদের একটা ঐতিহাসিক সম্পর্ক রয়েছে। সেটা কি?

১. নিখিল ভারত মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা —

১৯০৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর ঢাকায় উপমহাদেশের মুসলিম নেতৃবৃন্দের এক সম্মেলনে নবাব সলিমুল্লাহর প্রস্তাব অনুসারে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা হয়।

২. ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব—

১৯৪০-এর লাহোর অধিবেশনে শেরেবাংলা একে ফজলুল হক ঐতিহাসিক এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন যা পরবর্তীতে 'লাহোর প্রস্তাব' হিসেবে পরিচিতি পায়। এ প্রস্তাব অনুসারেই ভারতবর্ষে পাকিস্তান আন্দোলন গর্জে ওঠে। এবং

৩. মুসলিম লীগের পক্ষে আন্দোলন-সংগ্রাম —

১৯৪৬ সালে বাংলার মুসলমানরা হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর নেতৃত্বে মুসলিম লীগকে নির্বাচনে একচেটিয়াভাবে ভোট দিয়ে বিজয়ী করার ফলেই পাকিস্তান রাষ্ট্র বাস্তবে রূপ নিয়েছে।

ভাবতে অবাক লাগে, যে দেশের জন্ম হয়েছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালির সীমাহীন ত্যাগ-তিতিক্ষায় সেই তাদের সঙ্গেই কি-না এমন পৈশাচিক আচরণ!

গোড়ায় গলদ

এর একটা ঐতিহাসিক কারণ আছে। যা ইচ্ছে করলেও তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেয়া যায় না। ভারত উপমহাদেশের আজাদির অন্যতম প্রধান রূপকার মওলানা আবুল কালাম আজাদের বিখ্যাত আত্মজৈবনিক গ্রন্থ 'ইন্ডিয়া উইনস ফ্রিডম'-এর শেষ প্যারা দুটি এক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

"মি. জিন্নাহ ও তাঁর অনুসারীরা বুঝতে পারেননি যে, ভৌগোলিক অবস্থা তাঁদের প্রতিকূলে। ভারতীয় মুসলমানরা এমনভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল যে, একক একটি এলাকায় তাদের নিয়ে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠন করা সম্ভব ছিল না। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা ছিল উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্বে। এ দুটো অঞ্চলের মধ্যে কোনো প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল না। একমাত্র ধর্ম ছাড়া এ দু' অঞ্চলের জনগণ সব দিক দিয়ে পুরোপুরি ভিন্ন। শুধুমাত্র ধর্মীয় ঐক্যের ভিত্তিতে ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক, ভাষাগত এবং সংস্কৃতিগতভাবে পৃথক বিভিন্ন এলাকা একত্রিত করে রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব দেয়াটা জনগণের সঙ্গে এক দারুণ প্রতারণা। এটা সত্য যে, ইসলাম এমন এক সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চায় যা বর্ণ, ভাষা, অর্থনীতি এবং রাজনীতির সীমা অতিক্রম করে যাবে। কিন্তু ইতিহাস প্রমাণ করেছে যে, প্রথম কয়েক দশক কিংবা নিদেন

পক্ষে প্রথম শতাব্দীর পর শুধুমাত্র ধর্মের ভিত্তিতে ইসলাম কখনো মুসলিম দেশগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করতে সক্ষম হয়নি।

এই ছিল অতীতের অবস্থা আর বর্তমানের অবস্থাও তাই। কেউ আশা করতে পারে না যে, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান তাদের সমস্ত মতপার্থক্য মুছে একটি মাত্র জাতি সৃষ্টি করতে পারে। এমনকি পশ্চিম পাকিস্তানের তিনটি প্রদেশ — সিন্ধু, পাঞ্জাব এবং সীমান্ত প্রদেশের মধ্যেও অভ্যন্তরীণ অসঙ্গতি রয়েছে এবং তারা ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য ও স্বার্থ নিয়ে কাজ করছে। তবু নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তান আজ এক বাস্তব সত্য। ভারত ও পাকিস্তানকে তাদের উভয়ের স্বার্থেই বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে এবং পারস্পরিক সহযোগিতার মধ্য দিয়ে কাজ করে যেতে হবে। অন্য ধারার কাজ কেবল আরও অসুবিধা, দুর্ভোগ এবং দুর্ভাগ্যের পথ সুগম করবে। অনেকে মনে করেন যে, যা ঘটেছে তা অবশ্যম্ভাবী ছিল। অন্যরা সমান দৃঢ়তার সঙ্গে বিশ্বাস করেন যে, যা ঘটেছে তা ভুল এবং তা এড়ানো যেত। আজ বলা যাচ্ছে না কাদের মূল্যায়ন সঠিক ছিল। আমরা বিচক্ষণ ও সঠিক কাজ করেছি কি-না সে সিদ্ধান্ত একমাত্র ইতিহাসই দেবে।"

জিন্নাহর ভুল

হ্যাঁ, মওলানা আজাদের ভবিষ্যদ্বাণীই অক্ষরে অক্ষরে প্রতিফলিত হয়েছে। প্রখ্যাত সাংবাদিক, সাহিত্যিক ও রাজনীতিক আবুল কালাম শামসুদ্দীন তাঁর 'পলাশী থেকে পাকিস্তান' গ্রন্থের শেষ অংশ 'পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ' অধ্যায়ে লিখেছেন, "কায়দে আজম জিন্নাহ কোনো ভুল করেন নি, এমন নয়। যত বড় গণতন্ত্রমনা নেতৃত্ব ও কুশাগ্রবুদ্ধি ব্যক্তিত্বের অধিকারীই তিনি হোন না কেন, তিনিও যেহেতু নশ্বর দুনিয়ার মানুষ ছিলেন, ছিলেন না যেহেতু ভুল-ভ্রান্তির অতীত কোনো দেবতা বা ফেরেশতা, কাজেই তিনিও স্বভাবতই ভুল-ভ্রান্তি করে বসবেন, এতে বিস্মিত হওয়া চলে না। তিনিও করে বসে ছিলেন দুটি মারাত্মক ভুল। তাঁর প্রথম ভুল ছিল — (১) লাহোর প্রস্তাবের সংশোধন। আর দ্বিতীয় ভুল ছিল (২) উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্র ভাষা হিসাবে ঘোষণা করা।

জাতির নেতা হিসাবে তাঁরই পরামর্শানুসারে রচিত ও গৃহীত লাহোর প্রস্তাবে ছিল সুস্পষ্টভাবে উত্তর-পশ্চিম ভারতে ও উত্তর-পূর্ব ভারতে দুইটি মুসলমান প্রধান স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার কথা। এ প্রস্তাবটি গৃহীত হয়েছিল ১৯৪০ সালে লাহোরে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগ অধিবেশনে। এরই মাত্র ছয় বছর পরে ১৯৪৬ সালে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারি কনভেনশনে এই দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের পরিকল্পনাকে সংশোধন করে একটি সম্মিলিত স্বাধীন রাষ্ট্রের পরিকল্পনা বলে পাস করে নেয়া হয়। তাঁর এ প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ না হয়েছিল এমন নয়। বঙ্গীয় মুসলিম লীগের তদানীন্তন সেক্রেটারি মরহুম জনাব আবুল হাশেম এ প্রস্তাব লাহোরের মূল প্রস্তাববিরোধী বলে প্রতিবাদ করেছিলেন। কিন্তু কায়দে আজমের

নেতৃত্বের প্রভাব তখন এমন উত্তুঙ্গে উঠেছিল জনাব মি. আবুল হাশেমের প্রতিবাদ সে পার্লামেন্টারি লীগ কনভেনশনে কোনোরূপ আলোড়নেরই সৃষ্টি করতে পারেনি। তাছাড়া জিন্নাহ সাহেব এক স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্রের সংশোধনী প্রস্তাবটি বাংলার তদানীন্তন পার্লামেন্টারি নেতা জনাব হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী কর্তৃক কনভেনশনের সামনে উত্থাপিত করেছিলেন। কাজেই একরূপ বিনা প্রতিবাদেই প্রস্তাবটি গৃহীত হয়ে যায়।

কিন্তু এ প্রস্তাব গ্রহণ যে মারাত্মক ভুল হয়েছিল, তা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রথম দিকে ধরা না পড়লেও, পরবর্তীতে তা বিস্তর রক্তপাতের ভিতর দিয়ে বাস্তবে রূপায়ণ লাভ করেছিল। স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার ভিতর দিয়ে নির্ভুলভাবে প্রতিপন্ন হয়েছিল যে, জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীর প্রস্তাবিত দিল্লি-পরিকল্পনা না, মূল লাহোর পরিকল্পনাই ছিল সত্যকার সমাধান, কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ভিত্তি ভূমি লাহোর প্রস্তাব নয়, দিল্লি-পরিকল্পনা। এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য মৌলিক এবং দুর্লঙ্ঘ্য। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ চব্বিশ বছর পরে ১৯৭১ সালে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার ভিতর দিয়েই লাহোর প্রস্তাবের সত্যকার বাস্তবায়ন সম্ভব হয়।*

*** পাকিস্তান হচ্ছে আমার জীবনের বৃহত্তম ভুল : মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ**

দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান সৃষ্টি হলেও জিন্নাহ মৃত্যুর আগে তাঁর ভুল বুঝতে পেরেছিলেন। পাকিস্তান লাভের পর দাঙ্গা আর রক্তের স্রোতে সিক্ত পাকিস্তানের চিত্র দেখে জিন্নাহ আঁৎকে উঠেছিলেন। নেতৃত্বের মোহ ছেড়ে ভেতরের মানুষটি না-না বলে চিৎকার করে উঠেছিল। – সূত্র : Guilty Men of India's Partition : রাম মনোহর লোহিয়া।

পাকিস্তান রাষ্ট্রের স্রষ্টা ও তার প্রথম গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ পাকিস্তান কায়েমের এক বছর এক মাস পর ১১ সেপ্টেম্বর মারা যান। তিনি তাঁর শেষ জীবন মরণাপন্ন হয়ে প্রথমে কোয়েটা ও পরে কোয়েটা থেকে আরও ৪০ মাইল দূরে 'জিয়ারত' নামক স্থানে চিকিৎসাধীন ছিলেন। তখন তাঁর ব্যক্তিগত চিকিৎসক ছিলেন কর্নেল এলাহী বক্‌স। তার বর্ণনায় জিন্নাহর জীবনের শেষ দিনগুলোর করুণ চিত্র পাওয়া যায়। জিন্নাহর মতো একজন প্রখর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নেতার জন্য শেষ জীবনে সবচাইতে বেদনাদায়ক ব্যাপারটি ছিল অসুস্থ জিন্নাহর প্রতি প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের সহযোগিতা ও আনুগত্যের অভাব। এলাহী নেওয়াজ তাঁর লেখা 'দি লাস্ট ভেইজ অব দি কায়েদে আজম' গ্রন্থে লিখেছেন, 'জিয়ারতে কায়েদে আজমের ওষুধগুলো শেষ হয়ে গেলে আবার ওষুধ আনার জন্য সাত থেকে দশ দিন অপেক্ষা করতে হতো। আমি একটির পর একটি টেলিগ্রাফ করেছি, টেলিফোন করেছি। কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছিল না। আমার দুশ্চিন্তার শেষ ছিল না। যদি কায়েদে আজমের কিছু হয়ে যায় আমি কি জবাব দিব! আমি একটা ফাইল খুললাম। আমার পাঠানো সব ক'টি টেলিগ্রাফের রশিদ আমি যখন যে টেলিগ্রাফ করেছি তার তারিখ এবং সব কিছু লিখে রাখতাম ওই ফাইলে। আমি সরকারের কাছে চিঠি লিখে পাঠাই আমার জন্য আর একজন সাহায্যকারী চিকিৎসক চেয়ে। আমি আমার কর্তব্যের কোনো অবহেলা করছি না তার জন্য একজন সাক্ষী রাখা ভালো মনে করেছিলাম। ডা. রিয়াদ আলীকে পাঠানো হয়েছিল।

কায়েদে আজম মারা গেলে তাঁর মৃত্যুর কারণ বা কিভাবে মারা গেলেন তা আমাকে কেউ কোনো দিন প্রশ্ন করেননি। অথবা কেউ কোনোদিন জিজ্ঞাসাও করেননি। জিয়ারতের মতো এত সুদূর ও পরিত্যক্ত স্থানেইবা কেন তাঁকে নিয়ে আসা হয়েছিল যেখানে তিনি মৃত্যুর আগের দিনগুলো অসম্ভব দুর্ভোগের মধ্যে কাটিয়েছিলেন। তাঁর শরীরের ওজন ৮০ পাউন্ডে নেমে এসেছিল।'

ভুলের পরিণতি

মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর উপরোক্ত ভুল দুটির পরিণতি পরবর্তীকালে সত্যই ভয়াবহ হয়ে উঠেছিল, ২৪ বছরেই পাকিস্তান খণ্ডিত হয়ে পড়ল। ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে পাক-ভারত দিখণ্ডিত হয়ে স্বাধীন ভারত ও স্বাধীন পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা হয়, কিন্তু নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধের অসংখ্য শহীদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসে পাকিস্তান খণ্ডিত হয়ে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে।"

একাত্তরে ইসলামপন্থিদের ভূমিকা

একাত্তরে ইসলামী দল ছিল তিনটি — জামায়াতে ইসলামী, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম এবং নেজামে ইসলাম পার্টি। জামায়াতে ইসলামী এবং নেজামে ইসলাম পার্টি সরাসরি মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করে। তবে একাত্তরে জামায়াতে ইসলামী মাঠে-ময়দানে যতটা সক্রিয় ছিল নেজামে ইসলাম ততটা নয়। সাংগঠনিকভাবে জামায়াতের চেয়ে নেজামে ইসলাম অত্যন্ত দুর্বল ছিল। ঢাকা, চট্টগ্রামের মতো হাতেগোনা চার-পাঁচটি শহরেই কেবল এর কার্যক্রম সীমাবদ্ধ ছিল।

ডা. এলাহী তাঁর বইতে লিখেছেন, 'জিয়ারতে অসুস্থ থাকা অবস্থায় একদিন তাঁকে দেখতে এলেন প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান। আমি প্রধানমন্ত্রীকে বারান্দায় অভ্যর্থনা জানালাম। পরে ঘরের ভেতরে নিয়ে এলাম। প্রথম কক্ষটি শূন্য। পরের কামরাটিতে কায়েদে আজম শায়িত আছেন। লিয়াকত আলী কায়েদে আজমের মাথার দিক দিয়ে অগ্রসর হলেন। আমি তাঁর শয্যার পায়ের কাছের দিকে গিয়ে দাঁড়ালাম। লিয়াকত কায়েদে আজমকে সম্ভাষণ জানালেন। কায়েদে তার কোনো প্রতিউত্তর দিলেন না। লিয়াকত তখন আমাকে কায়েদের কুশল জিজ্ঞাসা করলেন। তখন অসুস্থ কায়েদে রেগে ফেটে পড়লেন লিয়াকতের ওপর। বলেন, 'তুমি নিজেকে খুব মস্তবড় মাতব্বর মনে করতে শুরু করেছ। আসলে তুমি নাথিং। আমি তোমাকে প্রাইমমিনিস্টার বানিয়েছি। তুমি ভাবতে শুরু করেছ যে, তুমি পাকিস্তান বানিয়েছ। পাকিস্তান বানিয়েছি আমি। কিন্তু এখন আমি নিঃসংশয়ে বুঝতে পারছি যে, 'পাকিস্তান বানিয়ে আমি আমার জীবনে বড় ভুল করেছি। আমি যদি এখন সুযোগ পেতাম তবে দিল্লী যেতাম। জওহরলালকে বলতাম, অতীতের ভুল-ভ্রান্তি সব ভুলে যাও। এসো আবার উভয়ে বন্ধু হই।' কায়েদে রাগে কাঁপছিলেন। তাঁকে খুবই ফ্যাকাশে দেখাচ্ছিল। চিকিৎসক হিসাবে আমি ঘাবড়িয়ে গিয়েছিলাম। লিয়াকত আলীর হাত চেপে ধরে বলেছিলাম, রোগীর উত্তেজনা ভালো না। এর পরিণতি ভয়াবহ হতে পারে। লিয়াকত অবিচল ছিলেন। তিনি ঘুরে দাঁড়ালেন। মন্থর পায়ে অপর কামরাটিতে পৌছলেন। তার পরে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। সেখানে এসে তিনি সিগারেট ধরিয়ে একগাল ধোঁয়া ছেড়ে হো হো করে হেসে উঠে বললেন, 'বৃদ্ধ এখন তাঁর ভুল আবিষ্কার করছেন।' আমি লিয়াকতকে সেখানে রেখে কায়েদের কাছে ছুটে এলাম। দেখলাম কায়েদের চোখ দু'টো বন্ধ। দু'পাশ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। তাঁকে খুবই ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। মিস ফাতেমা জিন্নাহ বিছানার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'লিয়াকত নিজের চোখে দেখতে এসেছিলেন, আমার ভাই আর কতদিন বাঁচবেন।'

পাকিস্তান অর্জিত হবার পর তার স্বরূপ দেখে জিন্নাহ হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। তিনি ওই সময় হায়দারাবাদের নিজাম বাহাদুরের প্রধানমন্ত্রী মীর লায়েক আলীর সঙ্গে কথা বলছিলেন। 'আপনি বিমান বন্দর থেকে আসার পথে উদ্বাস্তুদের করুণ অবস্থা দেখেছেন?' কথাগুলো বলার

জমিয়ত ছিল স্বাধীনতার পক্ষে। তবে এ দলটির তৎকালীন পদত্যাগী সভাপতি পীর মুহসেন উদ্দিন দুদু মিয়া ছিলেন পশ্চিমাদের সহযোগী। এ হলো ইসলামী দলগুলোর ভূমিকা। আলেম-উলামা, পীর-মাশায়েখ এবং সাধারণ ধর্মপ্রাণ জনগণ ইসলামপন্থিদের সংজ্ঞায় তো এরাই অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু ইসলামপন্থিদের সবাই কি ইসলামী দল করেন? তাহলে পরিসংখ্যান করা যাক।
এদেশে এখনও পঁচানব্বই ভাগ মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষক (কওমি মাদ্রাসা, ক্ষেত্র বিশেষ আলিয়াও) রাজনীতি থেকে দূরে থাকে। তাদের একটা অংশ হয় মসজিদ-মাদ্রাসায় পড়ে আছে, কেউ হয়তো তাবলিগ করে, আবার কেউ-কেউ পীর-মুরিদী নিয়ে আছে। **তখন এবং এখনো ইসলামী দলগুলোর প্রদত্ত ভোট হিসাব করলে দেখা**

সময় মীর লায়েক আলী বলেছেন, জিন্নাহর চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল। –সূত্র : Muhammad Ali Jinnah a political study : মতলুবুল হাসান সাঈদ
আমেরিকার লাইফ পত্রিকার সাংবাদিক ও ফটোগ্রাফার মার্গারেট বৌরক হোয়াইট, ভারত বিভাগ ও মানবীয় দুর্দশার চিত্র লেখার জন্য যিনি বিশ্ববিখ্যাত হয়েছেন তার সঙ্গে মিস ফাতেমা জিন্নাহর বন্ধুত্ব ছিল। তিনি দেশ ভাগের তিন মাস পরে জিন্নাহর অন্তরঙ্গ পোর্ট্রেট এঁকেছিলেন। তিনি তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন, 'বঞ্চিত দেশপ্রাপ্তির কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই জিন্নাহর মন থেকে তাঁর দেবতুল্য উত্তুঙ্গ আশা-ভরসা অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। এমনকি তুচ্ছতম সিদ্ধান্ত নেবার ব্যাপারেও তার মধ্যে একটা পক্ষাঘাতগ্রস্ত অক্ষমতা সৃষ্টি হয়েছিল। নিজেকে বিস্ময়করভাবে একটা কোটরের মধ্যে আবদ্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে জিন্নাহ এমনকি তাঁর মন্ত্রীদের সঙ্গেও দেখা করতেন না। জিন্নাহর ছবি নেবার সময় ফাতেমা জিন্নাহ আমাকে বলেছিলেন, আমি যেন জিন্নাহর খুব কাছ থেকে কোনো ছবি না নেই বা কাছে না যাই। আমি যখন তাঁর মুখমণ্ডল দেখলাম তখন ওই পরামর্শের কারণ বুঝতে পারলাম। সে মুখমণ্ডলে ভীতিজনক পরিবর্তন ঘটে গেছে। মনে হলো, চৈতন্যের এক ধরনের অসারতার আবরণের তলে আতঙ্কের কাছাকাছি একটা ভাব সংগুপ্ত রয়েছে। আমি ফটো নেয়া শুরু করলাম এবং প্রতিটি ফটো নেয়ার ফাঁকে ফাঁকে ফাতেমা জিন্নাহ ভাইয়ের সামনে এসে তাঁর মরিয়া হওয়া মুষ্টিবদ্ধ হাত ধীরে ধীরে খুলে দেবার চেষ্টা করলেন। জিন্নাহর মাথার টুপিটা বদলে দেবার জন্য আমি ফাতেমা জিন্নাহকে অনুরোধ করলে একগাদা টুপির মধ্যে থেকে একটা বেছে নিয়ে মাথায় পরিয়ে দেয়ার উদ্যোগ নিতেই বিখ্যাত নেতা বিরক্তিসহকারে হাত নেড়ে পশমের ফেজগুলোসহ তাঁর বোনকে দূরে থাকতে বললেন। অবাধ্য শিশুর মতো তিনি না না বলতে লাগলেন। এটাই বোধহয় তাঁর শেষ পোর্ট্রেট ছিল।
জিন্নাহর মুখমণ্ডলে আমি যে উৎপীড়িতের ছবি দেখেছি তা নিয়ে আমি অনেক চিন্তা করেছি। আমার বিশ্বাস জীবন সায়াহ্নে নিজের কার্যকলাপের তিনি যে হিসাব-নিকাশ করেছেন এ তারই আভাস। উচ্চতরের বিশ্লেষণী ক্ষমতা ও মেধার অধিকারী হবার জন্য তিনি বুঝতে পেরেছিলেন তিনি কি করেছেন। ড. ফাউস্টের মতো তিনি নিজের সঙ্গে একটা চুক্তি করেছিলেন যার শর্ত থেকে কখনও তিনি মুক্ত হতে পারেননি। সংগ্রামের চূড়ান্ত উত্তেজনার মুহূর্তে কুসংস্কারের যাবতীয় নারকীয় শক্তিসমূহের সহায়তা নেয়া ও এই রক্তাক্ত বিজয় তাঁর মুখে বিষাদ ঠেকেছিল। – সূত্র : ইতিহাসে বাঙ্গালি : এস এম আজিজুল হক শাহজাহান ❐

যায় আলেম-উলামার মধ্যে ইসলামী রাজনীতি করে শতকরা দশ ভাগ আর সাধারণ ধর্মপ্রাণ জনগণ পনের থেকে বিশ ভাগ। তাহলে বাকি সত্তর ভাগ হয় স্বাধীনতার পক্ষে ছিল না হয় নিরপেক্ষ ছিল।

উত্তালস্রোতের বিপরীতে এরা দাঁড়াল কেন?

পশ্চিম পাকিস্তানিদের শোষণ, বঞ্চনা আর জুলুমের মোকাবেলায় প্রায় পুরো বাঙালি জাতি যখন ঐক্যবদ্ধ তখন ক্ষুদ্র এ শ্রেণীটি বিরুদ্ধ ভূমিকায় অবতীর্ণ হলো কেন? এর উত্তরে মোটামুটি তিনটি কারণ খুঁজে পাওয়া যায়।

১. প্রায় সব ক'টি ইসলামী দলের কেন্দ্রীয় কর্মস্থল ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। যেমন জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা আবুল আলা মওদুদী পশ্চিম পাকিস্তানে থাকতেন এবং সেখান থেকে দল পরিচালনা করতেন। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই তিনি পশ্চিম পাকিস্তানিদের স্বার্থ অগ্রাধিকার দিতেন এবং সবকিছু সে দৃষ্টিতেই দেখতেন। আর এসবই আমিরের আনুগত্যের নামে তার এদেশীয় কর্মীরা অন্ধভাবে মেনে নিতো।

২. পীর-মুরিদী। যেমন নেজামে ইসলাম পার্টির প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা আত্হার আলী ছিলেন হাকিমুল উম্মত মাওলানা শাহ আশরাফ আলী থানভীর বিশেষ স্নেহধন্য মুরিদ-খলিফা। মাওলানা থানভী ছিলেন পাকিস্তানের অন্যতম স্বপ্নদ্রষ্টা আর মুরিদরা সাধারণত পীরের নির্দেশই পালন করে থাকে, এরই একটি উদাহরণ 'আশরাফ আলী থানভীর রাজনৈতিক চিন্তাধারা' গ্রন্থ থেকে।

"উপমহাদেশে দেওবন্দি ওলামাদের মধ্যে মাওলানা আশরাফ আলী থানভীর ভক্ত, মুরিদ ও মুতাআল্লিকীনদের সংখ্যা লাখ লাখ। একথাও বলার অপেক্ষা রাখে না যে, কোনো সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যাপারে মুরিদ ও মুতাআল্লিকীনগণ কখনও পীর ও মুর্শিদের বিপরীত পক্ষে মতামত দেন না। পাকিস্তান ও অখণ্ড হিন্দুস্তানের বিষয়টিকে কেন্দ্র করে যখন উলামাদের মধ্যে মতবিরোধ তুঙ্গে উঠে তখন উপমহাদেশের অসংখ্য ধর্মপরায়ণ মুসলমান, মুরিদ ও মুতাআল্লিকীন মাওলানা থানভীর কাছে রাজনৈতিক প্রশ্নে কোন পক্ষ অবলম্বন করা উচিত, জানার জন্য চিঠি ও যোগাযোগ করতে শুরু করেন। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে মাওলানা থানভী সুস্পষ্টভাবে মুসলিম লীগের পক্ষে ও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে শরিক হওয়ার জন্য মুরিদ ও মুতাআল্লিকীনদের পরামর্শ দেন। তাঁর নির্দেশে মাওলানা শাব্বির আহমদ উসমানী, মাওলানা জাফর আহমদ উসমানী, মুফতি মোহাম্মদ শফি, মাওলানা আত্হার আলী, মাওলানা সিদ্দিক আহমদ প্রমুখ উলামায়ে কেরাম পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন।" একাত্তরে ঠিক একই কারণে কিছু কিছু আলেম এবং তাদের ভক্ত-মুরিদগণ জালেম পাকিস্তানিদের পক্ষাবলম্বন করেন। এবং

৩. ইসলামী হুকুমত কায়েমের অলীক কল্পনা—

পাকিস্তান রাষ্ট্রটি প্রতিষ্ঠা হয়েছিল কালেমার স্লোগান নিয়ে। অর্থাৎ এদেশে কোরআনী আইন চালু হবে। শুধু এ আশায়ই এদেশের অসংখ্য-অগণিত আলেম নিজেদের সর্বস্ব

দিয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্রটি কায়েমে প্রভূত ভূমিকা রেখেছেন। ইসলামী রাষ্ট্র তো কায়েম হয়ই নি বরং দীর্ঘ ২৪ বছরের আমাদের ওপর পশ্চিম পাকিস্তানিদের ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ দেখেও তাদের চৈতন্যোদ্দয় হয় নি যে, যাদের ভেতর ন্যূনতম মানবিকতা নেই তাদের দ্বারা ইসলামী রাষ্ট্র কায়েমের আশা করা যায় কি করে? এমনই এক স্বপ্নচারী আলেমের একটি ঘটনা 'বৃহত্তর মোমেনশাহী উলামা ও আকাবির' গ্রন্থ থেকে নেয়া। ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন ইত্তেফাকুল উলামা বৃহত্তর মোমেনশাহীর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা খালেদ সাইফুল্লাহ সাদী।

"১৯৭০ সন রমজান মাস। পাকিস্তানের পরিষদের সর্বশেষ জাতীয় পরিষদ নির্বাচন। জোর প্রস্তুতি চলছে। ছোট বাজার ও স্বদেশী বাজারের মোড়ে বিকাল বেলায় মাওলানা মঞ্জুরুল হক (রহঃ)-এর সঙ্গে আমার দেখা। পাকিস্তান জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের জয়েন্ট সেক্রেটারি মাওলানা আরিফ রব্বানী (রহঃ) মোমেনশাহী সদর ও মুক্তাগাছার সম্মিলিত আসনে জাতীয় পরিষদের নির্বাচন করছেন। সেই নির্বাচনী পোস্টারের এক গাদা তাঁর কাঁধে।

জিজ্ঞাস করলাম, 'মিয়া ভাই! এ বুড়ো বয়সে এত বড় বোঝা বইছেন কেন? নির্বাচনের হাওয়া যা বইছে তাতে আপনাদের বিজয় হওয়ার সম্ভাবনা কত অংশ?' উত্তরে তিনি বললেন, 'বিজয়ের সম্ভাবনা দিয়ে কি করি। আল্লাহর দীনের হুকুমত কায়েমের অঙ্গীকার নিয়ে যে পাকিস্তানের জন্ম হলো তার বাস্তবায়ন আজও হয় নি, এর জন্য কোশেশকারীদের অংশীদার হবার জন্যই এ বোঝা বহন করছি। বিজয়ী হলাম কি হলাম না, হাশরের ময়দানে নিশ্চয় এ প্রশ্ন করা হবে না। কোশেশ করে যাচ্ছি। এতটুকুই কি আমার জন্য যথেষ্ট নয়।' যুক্তির ক্ষেত্রে তিনি পরপারে চলে গেছেন বুঝতে পেরে কেটে পড়লাম। সামনে প্রশ্ন করার আর কোনো সুযোগ ছিল না বলেই চুপ করে গেলাম।"

ইসলাম সব সময়ই মজলুমের পক্ষে

বিখ্যাত হাদিস গ্রন্থ মুসলিম শরিফে আছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "ওগো আল্লাহ! আমার উম্মতের কর্তৃত্ব লাভ করে যে তাদের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করে, তুমিও তার প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিও এবং যে কেউ তাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করবে, তুমিও তাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করিও।"

মানবতার ধর্ম, সাম্যের ধর্ম ইসলাম সবসময়ই মজলুমের পক্ষে থেকেছে। একাত্তরে আমরা ছিলাম মজলুম আর পশ্চিম পাকিস্তানিরা ছিল জালেম। ত্রিশ ভাগ ইসলামপন্থি সেদিন জালেমের পক্ষাবলম্বন করলেও বাকি সত্তর ভাগই মজলুমের পাশে এসে দাঁড়িয়ে ছিল। সেদিন পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামী যেমন তার পশ্চিম পাকিস্তানি গুরু আবুল আলা মওদুদীর নির্দেশে জালেমের পক্ষ হয়ে গণহত্যা ও নারী ধর্ষণে সহযোগিতা করেছিল অপর দিকে পূর্ব পাকিস্তান জমিয়তে ওলামায়ে ইসলামের মতো সংগঠন পশ্চিম পাকিস্তানের হাই কমান্ডের নির্দেশে মজলুমের

পাশে এসে দাঁড়িয়ে ছিল। ইতিহাস থেকে এ সত্য কি মুছে ফেলা যাবে? পশ্চিম পাকিস্তান জমিয়তের সেক্রেটারি মুফতি মাহমুদ ২৬ মার্চের আগে স্বয়ং ঢাকা এসে এ অংশের নেতৃবৃন্দদের বলে গিয়েছিলেন 'আপনারা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কথা বলুন, দেশের মানুষকে মুক্তিযুদ্ধের জন্য উৎসাহিত করুন।'

অপরদিকে অরাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও হাকিমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভীর বিশেষ খলিফা মাওলানা মোহাম্মদুল্লাহ হাফেজ্জি হুজুর একাত্তরে মাতৃভূমির পক্ষেই ভূমিকা রেখেছিলেন। তিনি তাঁর ভক্ত-মুরিদদের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন। আলেম মুক্তিযোদ্ধা মাওলানা ইমদাদুল হক আড়াইহাজারী বলেন, "আমি হাফেজ্জি হুজুরের খুব ভক্ত ছিলাম। যুদ্ধ চলাকালীন অনেক ছাত্র ট্রেনিং নিচ্ছিল। আমি হাফেজ্জি হুজুরের কাছে পরামর্শ চাইলাম। আমিও ট্রেনিংয়ে যাব কি-না? বা এখন আমি কি করবো? তিনি আমাকে বললেন, 'পাকিস্তানিরা বাঙালিদের ওপর অত্যাচার করছে। সুতরাং তারা জালেম। জুলুম আর ইসলাম কখনও এক হতে পারে না। তুমি যদি খাঁটি মুসলমান হও, ইসলাম মানো তবে পাকিস্তানিদের পক্ষে যাও কিভাবে? এটা তো ইসলামের সঙ্গে কুফরের যুদ্ধ নয় বরং এটা হলো জালেমের বিরুদ্ধে মজলুমের প্রতিবাদ-প্রতিরোধ। বাঙালিরা মজলুম সুতরাং বাঙালিদের পক্ষে কাজ করো।' আমার মুক্তিযোদ্ধা হয়ে উঠার পেছনে এটাই হলো মূল উৎস-প্রেরণা।"

এছাড়া কারও নির্দেশের অপেক্ষা না করে এদেশের অসংখ্য আলেম শুধু বিবেকের তাড়না থেকে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিল। যাদের একটি ক্ষুদ্র তালিকা আলোচ্য গ্রন্থে উঠে এসেছে।

'আলেম মুক্তিযোদ্ধার খোঁজে'

অনেকটা কৌতূহল নিয়েই দৈনিকগুলোতে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম রাজাকার বলে কথিত মোল্লা-মৌলভীদের মধ্যে কেউ যদি মুক্তিযোদ্ধা থেকে থাকে তাঁরা যেন যোগাযোগ করেন। সারাদেশে এমন বিপুল সংখ্যক আলেম মুক্তিযোদ্ধা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছেন আমার কল্পনাকেও তা হার মানিয়েছে। গেরিলা কমান্ডার, মুজিব বাহিনীর দুর্ধর্ষ কমান্ডার, গেরিলা যোদ্ধা, সশস্ত্র যোদ্ধা, গোয়েন্দা মুক্তিযোদ্ধা, 'রাজাকার' মুক্তিযোদ্ধা, বুদ্ধিবৃত্তিক মুক্তিযোদ্ধা সবই আছেন এই তালিকায়। সেদিন বহু পীর-মাশায়েখ, মাদ্রাসা ছাত্র-শিক্ষক, মসজিদের ইমাম, মুয়াজ্জিন, খাদেম, তাবলিগ জামাতের আমির-সাধারণ তাবলিগি, হাফেজে কোরআন শুধু মাতৃভূমির টানে নরপশু পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন।

উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে

একাত্তরে কি শুধু ইসলামপন্থিরাই রাজাকার ছিল— এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে দুটি গ্রন্থের সাহায্য নেয়া হয়েছে —১. ড. আহমদ শরীফ, কাজী নূর-উজ্জামান ও

শাহরিয়ার কবির সম্পাদিত 'মুক্তিযুদ্ধ চেতনা বিকাশ কেন্দ্র' থেকে প্রকাশিত 'একাত্তরের ঘাতক ও দালালরা কে কোথায়' এবং ২. রমেন বিশ্বাস সংকলিত নাঈমুল ইসলাম খান সম্পাদিত দৈনিক আজকের কাগজে প্রকাশিত 'ঘাতকের দিনলিপি' (পরে এ নামেই গ্রন্থাকারে প্রকাশিত)। 'একাত্তরের ঘাতক ও দালালরা কে কোথায়' গ্রন্থের ৮৫-৮৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত হয়েছে,

"আমাদের জাতি সত্তার উন্মোষে যে দুজনকে স্থপতি বলে ধরা হয় তাঁরা হচ্ছেন হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী এবং শেরেবাংলা একে ফজলুল হক, এঁদের সন্তানরাও স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পাকবাহিনীর গণহত্যাকে সমর্থন জানিয়েছিলেন। সোহ্‌রাওয়ার্দী কন্যা আখতার সোলায়মান একজন মুখ্য স্বাধীনতাবিরোধী। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর গণহত্যায় সক্রিয় সহায়তা প্রদান ছাড়াও তিনি আওয়ামী লীগের বিশ্বাসঘাতক নেতৃবৃন্দকে নিয়ে একটি নতুন দল এবং রাজাকার বাহিনীর অনুরূপ একটি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন।

শেরেবাংলার ছেলে প্রাক্তন মন্ত্রী একে ফায়েজুল হকও ছিলেন একজন মুখ্য স্বাধীনতাবিরোধী। স্বাধীনতা সংগ্রামের নয় মাসে তিনি পাকবাহিনীর গণহত্যার সমর্থন সংগ্রহের জন্য সারাদেশ সফর করে বেড়িয়েছেন। স্বাধীনতা যুদ্ধে তার ভূমিকার পরিচয় দেবার জন্য ১১ এপ্রিল তারিখে তার দেয়া বিবৃতির অংশবিশেষ উদ্ধৃত হলো—

'আমি আমার পূর্ব পাকিস্তানি ভাইদের আমাদের এবং প্রশাসন যন্ত্রের ওপর আস্থা রাখার জন্য আবেদন জানাচ্ছি। যারা এখনো কোনো কারণবশত কিংবা কোনো মোহে পড়ে কাজে যোগদান করেননি, তাদের আমি শুধু বলবো সময় দ্রুত বয়ে যাচ্ছে এবং আমরা যদি আমাদের নিজেদের সঠিক পথে ফিরে যাই তাহলে প্রত্যেকটি মিনিটের নিজস্ব একটি মূল্য রয়েছে। ঐক্যবদ্ধভাবে একই মানুষ হিসেবে ছ' বছর আগে আমরা যেমন ভারতের নগ্ন আক্রমণকে রুখে দাঁড়িয়ে ছিলাম এখনো তেমনভাবে তাদের নগ্ন আক্রমণের মোকাবিলার জন্য আমাদের প্রস্তুত করতে হবে। আমরা আমাদের স্বার্থ ও আদর্শের জন্য সংগ্রাম করছি। ইনশাআল্লাহ জয় আমাদের সুনিশ্চিত।'

শেরেবাংলার কন্যা রইসী বেগমও মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে নয় মাস ধরে সাংগঠনিক তৎপরতা চালিয়েছেন। সে সময় প্রদত্ত তার বহু সংখ্যক বিবৃতির একটির অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত হলো। এই বিবৃতি তিনি দেন ২ মে তারিখে—

"১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ আমাদের ৭ কোটি পূর্ব পাকিস্তানির জন্য মুক্তির দিন। এদিনে আমরা এক উগ্র মতবাদ থেকে মুক্তিলাভ করেছি। এ মতবাদ ইসলাম ও পাকিস্তানি আদর্শের সম্পূর্ণ বিপরীতে— পাক সীমান্তেরে অপর পারের সংঘবদ্ধ সাহায্য পুষ্ট ও প্ররোচিত মুষ্টিমেয় দেশদ্রোহীর দ্বারা আমরা সন্ত্রস্ত ও ধ্বংসের সম্মুখীন হয়েছিলাম, কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ নির্যাতিত অসংখ্য মুসলমানের প্রার্থনা আল্লাহ

শুনেছেন এবং পাকিস্তানকে আসন্ন ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেছেন। পূর্ব পাকিস্তানের সাত কোটি মানুষের পক্ষে আমি আমাদের অদম্য সশস্ত্র বাহিনীর বীর সেনানীদের সালাম জানাই।

রইসী বেগম আরও বলেন, আলহামদুলিল্লাহ, শেখ মুজিবুর রহমান ও তার অনুচরেরা চিরদিনের জন্য মঞ্চ থেকে অপসারিত হয়েছে। শয়তানী শক্তিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করার শক্তি যেন আমাদের অজেয় সশস্ত্র বাহিনীকে আল্লাহ দান করেন।...

হিন্দুরা কিভাবে মুসলমানদের নিধন করেছে আপনারা তাও জানেন। আপনাদের অবস্থাও সেরকম হতো যদি না আমাদের সেনাবাহিনী যথাসময়ে শেখের দুরভিসন্ধিকে নস্যাৎ করে দিত। আল্লাহর নামে ইসলাম ও পাকিস্তানের প্রতি ঐক্যবদ্ধ হোন।"

একই গ্রন্থের ৮৩ পৃষ্ঠায় বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট নেতা বিশুদ্ধানন্দ মহাথেরো সম্পর্কে উল্লেখিত হয়েছে—

"প্রেম এবং অহিংসার বাণী নিয়ে পৃথিবীতে এসেছিলেন মহামানব গৌতম বুদ্ধ। বৌদ্ধ ধর্মে অহিংস হল পরম ধর্ম অথচ বাংলাদেশে গণহত্যার সমর্থনে দালাল মওলানাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন দেশের বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট নেতা বিশুদ্ধানন্দ মহাথেরো। স্বাধীনতা যুদ্ধের নয় মাস বিশুদ্ধানন্দ পাকসেনাদের কার্যকলাপকে অভিনন্দন জানিয়ে বহু বিবৃতি দিয়েছেন। পাকসেনার জন্য সমর্থন আদায়ের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থান সফর করেছেন। ৬ মে তারিখে তিনি পাকিস্তানের তৎকালীন সরকারি প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ও সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল আব্দুল হামিদ খান এবং লে. জেনারেল টিক্কা খানের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হন।

স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় বিশুদ্ধানন্দ মহাথেরোর ভূমিকা সম্পর্কে ধারণার জন্য ২৪ জানুয়ারি ১৯৭২ তারিখের দৈনিক আজাদ পত্রিকার 'এই মীর জাফরদের ক্ষমা নেই' শীর্ষক ধারাবাহিক উপসম্পাদকীয়র অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা যেতে পারে—

'১৯৭১ সালের ৩ জুন বিশ্ব জনমতকে ধোঁকা দেয়ার জন্য মহামান্য মহাথেরো খান চক্রের সমন্বয়ে যে বিবৃতি দিয়েছিলেন আমরা পাঠকদের জন্য তা তুলে ধরছি—

'পাকিস্তান বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘের প্রেসিডেন্ট মহামান্য বিশুদ্ধানন্দ মহাথেরো প্রদত্ত এক বিবৃতিতে বলেন যে, পাকিস্তান ৫ লাখ বৌদ্ধের প্রিয় জন্মভূমি হিসেবে টিকে আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। তিনি বলেন যে, বৌদ্ধ যারা এখানে আবহমানকাল ধরে বসবাস করবে তারা দেশের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য নিজেদের শেষ রক্তবিন্দু দানে প্রস্তুত রয়েছে।

'মহামান্য বিশুদ্ধানন্দ চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রধানত বৌদ্ধ অধ্যুষিত স্থানগুলোতে ১৭ দিনে দুই হাজার মাইল পথ সফরান্তে আজ সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে প্রসঙ্গত বলেন, আমি আমার কর্মী দলসহ ১৬ মে থেকে ১ জুন পর্যন্ত উত্তরে রামগড়, দক্ষিণে টেকনাফ, পূর্বে রাঙ্গামাটি, পার্বত্য চট্টগ্রামের বান্দরবান এবং

পশ্চিমে ধুম এলাকা সফর করি। আমার সফরকৃত দুই হাজার মাইল এলাকার মধ্যে অন্যান্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে প্রধানত বৌদ্ধরাই বসবাস করে। বর্তমান পরিস্থিতিতে আমি পাকিস্তানের সংহতি এবং সকলের বিশেষত পাকিস্তানের বৌদ্ধদের কল্যাণ কাজে অংশগ্রহণের চেষ্টায় ত্রুটি করি নাই। তিনি তার সফরের অভিজ্ঞতা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, পাকিস্তানের বৌদ্ধরা ঐক্য, সংহতি এবং সকলের বিশেষত পাকিস্তানের মর্যাদা রক্ষা করতে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ এবং বর্তমান পরিস্থিতিতে আমার লোকদের কাছে আমার উপস্থিতি সকল বৌদ্ধদের মনে স্থায়ী শক্তি ও সম্প্রীতির অনুভূতি যোগানোর পক্ষে গভীরভাবে সহায়ক হবে। মহামান্য মহাথেরো প্রসঙ্গত বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের বান্দরবানে মি. মংসুয়ে প্রু চৌধুরীর সক্রিয় আগ্রহ ও উপস্থিতি আমাকে অভ্যর্থনাকারী বিরাট বৌদ্ধ সমাবেশ এটাই প্রমাণ করে যে, বৌদ্ধরা পাকিস্তান ত্যাগ করে নাই।"

১৩৯-৪০ নং পৃষ্ঠায় 'দালাল বুদ্ধিজীবীদের নেতৃস্থানীয় কয়েকজন' এই শিরোনামে উল্লেখিত হয়েছে— ... ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর ড. মীর ফখরুজ্জামান ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শান্তি কমিটির সাধারণ সম্পাদক। বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের নায়ক জেনারেল রাও ফরমান আলীর মেয়ে তার বিভাগের ছাত্রী ছিল। সেই সূত্রে রাও ফরমান আলীর সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা হয় এবং শেষ পর্যন্ত তিনি তার মুখ্য সহচর হিসেবে কাজ করেন।...'

গণিত বিভাগের অধ্যাপক এ এফ এস আব্দুর রহমান আরও একজন উল্লেখযোগ্য পুনর্বাসিত স্বাধীনতাবিরোধী।...'

১২১ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখিত হয়েছে— 'বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ছাড়াও বিভিন্ন কলেজ-স্কুলের একশ্রেণীর শিক্ষকও পাক বাহিনীর দালালীতে তৎপর ছিলেন। তেজগাঁও কলেজের অধ্যক্ষ তোফায়েল আহমদ চৌধুরী এ ধরনের স্বাধীনতাবিরোধী শিক্ষকদের একটি দৃষ্টান্ত হতে পারেন।...'

১৪২ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখিত হয়েছে— 'এক শ্রেণীর সাংবাদিকও স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরোধিতায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এদের মধ্যে ইত্তেফাকের খোন্দকার আব্দুল হামিদের প্রসঙ্গটি এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে।

১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে লুকিয়ে থাকা খোন্দকার আব্দুল হামিদ গ্রেফতার হবার পর ১১ ফেব্রুয়ারি '৭২ তারিখের পূর্বদেশ পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় 'এ্যালায় কেমুন বুঝতাছেন' শিরোনামের সংবাদটিতে লেখা হয়, "দালাল খোন্দকার আব্দুল হামিদকে গতকাল বৃহস্পতিবার রাত ৯টায় নিউ এলিফেন্ট রোড থেকে লালবাগ পুলিশ গ্রেফতার করে। তিনি দৈনিক ইত্তেফাকের সহকারী সম্পাদক হিসেবে গত সেপ্টেম্বর মাসে পাকিস্তান সরকারের পক্ষে প্রচার চালানোর জন্য বিদেশ গমন করেন। এছাড়া তিনি রেডিও পাকিস্তানের 'ব্রাহ্মণ, ক্ষমা কর' স্পষ্ট ভাষণের লেখক ছিলেন।"

এর পরের পৃষ্ঠাগুলোতে ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত হয়েছে এমন কয়েকটি শিরোনাম—'৫৫ জন বুদ্ধিজীবীর বিবৃতি', 'চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৩ জন অধ্যাপকের বিবৃতি', 'বেতার ও টেলিভিশনে অংশগ্রহণকারীদের সম্পর্কে নীলিমা ইব্রাহীম কমিটির রিপোর্ট', 'দালাল আমলাদের তালিকা' ইত্যাদি। এ তালিকাগুলোতে উল্লেখিত প্রায় সবাই দেশের আলোচিত বুদ্ধিজীবী, লেখক-সাহিত্যিক, সাংবাদিক, শিল্পী। আবার এদের অনেকেই এদেশের প্রগতিশীল রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত। এছাড়া এ গ্রন্থের শুরু দিকে সবুর খান, শাহ আজিজুর রহমান, খাজা খয়ের উদ্দিন, ফজলুল কাদের চৌধুরী, সালাহ উদ্দিন কাদের চৌধুরীর মতো মুখ্য ও জাতীয়ভাবে পরিচিত রাজাকারদের তৎকালীন ও বর্তমান কর্মকাণ্ডের বিস্তারিত আলোচনা উঠে এসেছে। এবার 'ঘাতকের দিনলিপি' থেকে কয়েকটি উদ্ধৃতি—

"২৬ জুলাই সোমবার : ... আওয়ামী লীগের টিকিটে নির্বাচিত সংসদ সদস্য এস বি জামান আজ পশ্চিম পাকিস্তানে সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, '৬ দফা বর্তমানে কতিপয় বিচ্ছিন্নতাবাদীর মস্তিষ্কে রয়েছে। অধিকাংশ আওয়ামী লীগ সদস্যেরই মোহমুক্তি ঘটেছে। তারা অযোগ্য ঘোষিত সদস্যদের তালিকা প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে।' তিনি দেশের বর্তমান অবস্থার জন্যে শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগের বিচ্ছিন্নতাবাদী সদস্য এবং ভাসানী, আতাউর রহমান ও অধ্যাপক মোজাফফর আহমদকে দায়ী করেন। তিনি বলেন, 'এরা পাকিস্তানকে বিভক্ত করার জন্যে ষড়যন্ত্র করছে। নকশালপন্থীরাও এ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত।' তিনি এসব 'তথাকথিত বাংলাদেশ' সমর্থকদের বিচার দাবি করেন।

এস বি জামান জানান, 'বেআইনী ঘোষিত আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচিত ১০৯ জন এমপিএ এবং ৭০ জন এমএনএ জহিরুদ্দীনের নেতৃত্বে একত্রিত হয়ে একটি নতুন দল গঠন অথবা পিপলস পার্টিতে যোগ দেয়ার চিন্তা ভাবনা করছে।' তিনি এ সফরকালে ভুট্টোর সঙ্গে দু' দফা সাক্ষাৎ করেন এবং তাকে জহিরুদ্দীনের একটি পত্র দেন বলে জানান। — পৃষ্ঠা : ১৩৩

তথ্যসূত্র : দৈনিক পাকিস্তান, আজাদ, পূর্বদেশ এবং সংগ্রাম ২৬, ২৭ ও ২৮ জুলাই ১৯৭১।

"২৮ জুলাই, বুধবার : ... আওয়ামী লীগের ভেতর থেকেও ঘাতক বাহিনীর দালাল তালিকায় শরিক হওয়ার প্রক্রিয়া অব্যাহত ছিল এ সময়। আজ মাদারীপুরের আব্দুল মান্নান শিকদার, মুন্সিগঞ্জের রেকাবী বাজার ইউনিয়নের সদস্য আবু বকর মৃধা, চট্টগ্রাম শিল্প ও বণিক সমিতির সিনিয়র সহ-সভাপতি নুরুল ইসলাম, ২২৯ ফিরিঙ্গী বাজারের এম জানে আলম দোভাষ আওয়ামী লীগের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করে পিডিপিতে যোগ দেন। তারা দেশের সংহতি রক্ষায় সার্বক্ষণিকভাবে কাজ করে যাওয়ার অঙ্গীকার করেন।"— পৃষ্ঠা -১৩৫

তথ্যসূত্র : দৈনিক পাকিস্তান ও পূর্বদেশ ২৯ ও ৩০ জুলাই ১৯৭১।

"২ সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার : ... এদিন আওয়ামী লীগের হালুয়াঘাট থানার ভাইস প্রেসিডেন্ট এডভোকেট হাকিম আলী বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনে যোগ দিয়ে যারা নিরীহ জনগণের শান্তি ভঙ্গ করছে তাদের কার্যকলাপের নিন্দা করেন।"— পৃষ্ঠা-১৭১ তথ্যসূত্র : দৈনিক পাকিস্তান ও সংগ্রাম ৩ ও ৬ সেপ্টেম্বর ১৯৭১।

"৯ সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার : ... নেত্রকোনার ৪ জন আওয়ামী লীগ নেতা এ সময় দল ত্যাগ করে পাকিস্তানি হানাদারদের সহযোগীদের খাতায় নাম লেখায়। এরা হলেন নেত্রকোনা থানা আওয়ামী লীগের সভাপতি নূরুল ইসলাম খান, কালিয়ালাত ইউনিয়ন শাখার সেক্রেটারি ডা. গিয়াস উদ্দীন আহমেদ, শহর শাখার সদস্য সোহরাব হোসেন ও মহকুমা আওয়ামী লীগের সদস্য এমদাদুল হক।"— পৃষ্ঠা : ১৭৮ তথ্যসূত্র : দৈনিক পাকিস্তান, আজাদ ও সংগ্রাম ৯, ১০ ও ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৭১।

দেখা যাচ্ছে একাত্তরের মহান স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরোধী ভূমিকায় সব শ্রেণী পেশার লোকই ছিল।* তাহলে বর্তমান সমাজে স্বাধীনতাবিরোধী হিসেবে কেবল ইসলামপন্থি বা দাড়ি-টুপি, আলেম-ওলামাদের চিহ্নিত করা হয় কেন? এর নামই তো 'উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে'।

সোহ্‌রাওয়ার্দী ও শেরেবাংলার ছেলে-মেয়েদের একাত্তরের স্বাধীনতাবিরোধী ভূমিকার কারণে এই দু' নেতাকে কি কেউ স্বাধীনতাবিরোধী বলে?

মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী সংগঠন আওয়ামী লীগের ওইসব বিদ্রোহী ও বিশ্বাসঘাতক এমপিএ, এমএনএ ও অন্যান্য নেতা-কর্মীদের একাত্তরের ভূমিকার জন্য কৈ আওয়ামী লীগকে তো কেউ রাজাকারী সংগঠন বলে না। তাহলে একাত্তরের মাত্র দশ পার্সেন্ট আলেমের (বুঝে অথবা না বুঝে) নেতিবাচক ভূমিকার কারণে পুরো আলেম সমাজকে রাজাকার গালি শুনতে হবে কেন? **মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস বিভিন্ন বাহিনী গঠন ও সক্রিয়ভাবে নানা অপকর্মে লিপ্ত ছিল ইসলামী সংগঠনগুলের মধ্যে কেবল জামায়াতে ইসলামীই। শুধু ইসলাম শব্দের সঙ্গে মিল থাকার কারণে জামায়াতের অপরাধের দায়ভার অন্যান্য ইসলামিক দল বা পরবর্তী প্রজন্ম নেবে কেন?**

একাত্তরে জামায়াতের বিরুদ্ধে যেসব গুরুতর অভিযোগ রয়েছে তৎকালীন অপর ইসলামী সংগঠন নেজামে ইসলামের একজন নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধেও কি আজ পর্যন্ত কেউ ওই জাতীয় কোনো অভিযোগ উত্থাপন করতে পেরেছে? পারেনি। পারবেও না। কারণ কোনো সত্যিকার আলেম এ জাতীয় অপরাধে জড়িত হতে পারেন না। এমন কি একাত্তরের মালেক গর্ভনরের মন্ত্রী সভার নেজামে ইসলাম পার্টির একমাত্র

---

* 'ঘাতকের দিনলিপি' থেকে এ জাতীয় স্বাধীনতাবিরোধীদের একটি বিশাল তালিকা এ গ্রন্থের পরিশিষ্টে দেয়া হয়েছে। উৎসুক পাঠক সেখান থেকে পড়ে নেবেন।

সদস্য বর্ষীয়ান আলেম মাওলানা মোহাম্মদ ইসহাক তাঁর তৎকালীন ভূমিকার জন্য সম্প্রতি জাতির কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। যে সৎসাহস আজ পর্যন্ত জামায়াতে ইসলামী দেখাতে পারেনি।

ইতিহাস সাক্ষী, একাত্তরে জামায়াত ছাড়া আর কোনো ইসলামী সংঠনই আল-বদর, আল-শামসের মতো রাজাকারী বাহিনী গঠন করেনি। গোলাম আযম, নিজামী, মাওলানা এ কে এম ইউসুফ, মুজাহিদ, কামারুজ্জামান, আঃ কাদের মোল্লা গংদের এই বাহিনীর কারণে আজকে নিরীহ হুজুরদের আল-বদর, আল-শামস্ গালি শুনতে হয়।

কারও আদর্শ যদি পাকিস্তানকে টিকিয়ে রাখার পক্ষে থাকে সেটা দোষের কিছু নয়। কিন্তু তাদের পঁচিশে মার্চের পরের কর্মকাণ্ড ঠিক হয় নি। সুতরাং ওই নেতারা অপরাধী এবং এ জন্য অবশ্যই তাদের বিচার হওয়া উচিত। হানাদার পাকিস্তানিদের বিপক্ষে সেদিন যেসব বাঙালি অস্ত্র ধরেছে, প্রাণ দিয়েছে পাকিস্তানিদের দৃষ্টিতে তারা কি অপরাধী, বিশ্বাসঘাতক এবং ঘৃণার বস্তু নয়? তাহলে সেই পাকিস্তানি বর্বরদের পক্ষ হয়ে একাত্তরে যারা রাজাকারী করেছে আমাদের দৃষ্টিতে তারা অপরাধী হবে না কেন? বরং তারা তো আরও বড় অপরাধী। কারণ, তারা স্বজাতির বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিল। একাত্তরের মহান স্বাধীনতাপ্রেমী ও বুজুর্গ আলেম মরহুম হাফেজ্জি হুজুর-এর বিশেষ মুরিদ ও মুক্তিযুদ্ধকালীন ৯ নং সেক্টর কমান্ডার মরহুম মেজর এম এ জলিল তাঁর বহুল আলোচিত গ্রন্থ 'অরক্ষিত স্বাধীনতাই পরাধীনতা'য় লেখেন—

"বাঙালি হয়ে যারা বাঙালির ঘরে আগুন দিয়েছে, বাঙালি মা-বোনদের ওপর পাশবিক নির্যাতনে শরিক হয়েছে, অহেতুক হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে তারা যে পক্ষেরই হোক না কেন মানবিক দিক থেকে তারা অপরাধী। অপরাধীদের কোনো পক্ষ নেই। অপরাধীদের অবস্থান যেখানেই হোক না কেন, তাদের একমাত্র পরিচয়ই হচ্ছে তারা অপরাধী। অপরাধের বিচার কাম্য— এটা নৈতিক, সামাজিক, মানবিক এবং প্রচলিত আইন-প্রশাসনেরই দাবি। কোনো অপরাধের বিনা বিচারে ক্ষমা প্রদর্শন একটি ক্ষমাহীন অপরাধই বটে।"

ইসলাম ধর্ম অপরাধকে ঘৃণা করতে শিখিয়েছে। একাত্তরে রাজাকারী সাইন বোর্ডে যারা এসব অপরাধের সঙ্গে জড়িত ছিল একজন ধর্মপ্রাণ মুসলমান হিসেবে, ধর্মকে ভালোবাসি বলেই এসব রাজাকারদের ঘৃণা করি এবং এদের বিচার কামনা করি।

২৭ ডিসেম্বর ২০০৭ দৈনিক প্রথম আলোর প্রথম পৃষ্ঠায় বক্স আইটেম হিসেবে একটি খবর ছাপা হয়। খবরটি শিরোনাম ছিল 'একাত্তরে হানাদার বাহিনীর গণহত্যা : বাংলাদেশীদের কাছে দুঃখ প্রকাশ করেছে পাকিস্তানের বিভিন্ন পেশার মানুষ'। সঙ্গে একটি ছবিও ছাপা হয়েছে। ছবিতে দেখা যায় ব্যানার হাতে কিছু লোক দাঁড়িয়ে আছে। ব্যানারে ইংরেজি হরফে লেখা রয়েছে— DEAR BANGLADESHI'S / SORRY FOR 71, GENOCIDE / FROM PAKISTANI MEDIA AND LAWYERS.

স্বাধীনতার তিন যুগ পেরিয়ে হানাদার পাকিস্তানিরা নিজ দেশের রাজপথে নেমে আমাদের কাছে প্রকাশ্যে ক্ষমা প্রার্থনা করলেও তাদের এদেশীয় অন্যতম দোসর জামায়াতে ইসলামীর ঘাতকরা বলছে অন্য কথা।

'বাংলাদেশে কোনো যুদ্ধাপরাধী নেই এবং স্বাধীনতাবিরোধী নেই এবং কখনো ছিল না। এটা বানোয়াট এবং কল্পনাপ্রসূত' ।— আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদ। সেক্রেটারি জেনারেল, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ (২৬ অক্টোবর ২০০৭, দৈনিক ইত্তেফাক)

তিন যুগ কম সময় না। এদেশীয় যুদ্ধাপরাধীরা এতো দিন আমাদের সঙ্গেই ছিল। তারা সংশোধনের অনেক সুযোগ পেয়েছে। কিন্তু কৃতকর্মের জন্য এরা ক্ষমা প্রার্থনা করেনি এবং নিজেরা সংশোধনও হয়নি। বরং উল্টো স্বাধীনতা ও মুক্তিযোদ্ধাদের কটাক্ষ করে। তাই এদের ক্ষমা পাওয়া উচিত হবে না।

ঐতিহাসিক মক্কা বিজয়ের পর আমাদের মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করলেও আটজন গুরুতর অপরাধীকে বিচারের আওতায় এনেছিলেন। এ ঘটনা থেকেও রাষ্ট্রপক্ষকে শিক্ষা নিতে হবে।

যুদ্ধাপরাধীদের বিচার, ইসলামী রাজনীতি নিষিদ্ধকরণ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা

২৭ ডিসেম্বর ২০০৭ দৈনিক যায়যায়দিনের শেষ পৃষ্ঠার একটি সংবাদ শিরোনাম 'যুদ্ধাপরাধীরা শুধু জামায়াত নয়, আছে বিভিন্ন দলে : ইসি'। নির্বাচন কমিশনকে ধন্যবাদ এমন একটি সমপোযোগী বক্তব্য দেয়ার জন্য। **আমাদের বুদ্ধিজীবী, সুশীল সমাজ এবং বিভিন্ন দল পূজারীরা যুদ্ধাপরাধীদের বিচার দাবি করতে গিয়ে বরাবরই দুটি ভুল করে থাকেন। প্রথমটি হলো, যুদ্ধাপরাধী বলতে তারা কেবল জামায়াতকেই চিহ্নিত করেন। কেন? একাত্তরে কি শুধু জামায়াতীরাই যুদ্ধাপরাধী ছিল? ইতিপূর্বে সন-তারিখ দিয়ে উল্লেখিত হয়েছে যে, কম-বেশি সব দলের লোকেরাই স্বাধীনতাবিরোধী ছিল, খোদ আ'লীগেরই তৎকালীন বহু এমপিএ, এমএনএ এবং নেতা-কর্মী সক্রিয়ভাবে স্বাধীনতাবিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল। তাহলে আমরা শুধু জামায়াতীদের বিচার চাব কেন? বিচার হলে সবারই হতে হবে। কারণ অপরাধী তো সবাই। শুধু রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ হওয়ার কারণে যদি জামায়াতকে চেপে ধরি তাহলে অন্যান্য দলের অপরাধীদের নাম কি ইতিহাস থেকে মুছে ফেলা যাবে?**

তারা দ্বিতীয় যে ভুলটি করেন তাহলো, যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের পাশাপাশি ইসলামী রাজনীতি নিষিদ্ধেরও দাবি তুলেন।

কেন? একাত্তরে যে দুইটি ইসলামী সংগঠন স্বাধীনতাবিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল তার একটি নেজামে ইসলাম পার্টি। ত্রিধাবিভক্ত এ সংগঠনটি এখন শুধু সাইনবোর্ড নিয়েই বেঁচে আছে। অপর সংগঠন জামায়াত আছে প্রবল প্রতাপ নিয়ে। সুতরাং যদি নিষিদ্ধ করতেই হয় তাহলে কেবল এই দুটি সংগঠনই নিষিদ্ধ হতে

পারে। এই দুটি ইসলামী সংগঠনের কারণে অন্য দশটি ইসলামী সংগঠন নিষিদ্ধের দাবি উঠবে কেন? তাদের অপরাধটা কোথায়? এরা একাত্তরে হয় স্বাধীনতার পক্ষে ছিল নতুবা কোনো পক্ষেই যায়নি। তাহলে ব্যাপারটাকে এভাবে গুলিয়ে ফেলা হয় কেন?

মনে রাখতে হবে, জামায়াতের ইসলাম আর অন্যান্য ইসলামী দলের ইসলাম এক নয়। জামায়াত বিশ্বাস করে, লালন করে তাদের তাত্ত্বিক গুরু মওদুদীর ইসলামকে আর অন্যান্য ইসলামী সংগঠনগুলো অনুসরণ করে মদীনার ইসলামকে। শুধু বাংলাদেশ নয় গোটা উপমহাদেশের হক্কানি আলেম সমাজ জামায়াতকে তার জন্মলগ্ন থেকেই ইসলামের শত্রু হিসেবে আখ্যায়িত করে তাদের সংস্রব বিষবৎ পরিত্যাজ্য বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। সুতরাং নিষিদ্ধ হলে কেবল জামায়াতের তথাকথিত ইসলামী রাজনীতিই নিষিদ্ধ হতে পারে।

ইসলামী রাজনীতি নিষিদ্ধের দাবি যারা তোলেন তারা নাকি সে দাবি তুলেন মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে! তাহলে এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের মাধ্যমে এদেশ থেকে ইসলাম উৎখাত করা হয়েছে। সত্যিই কি তাই? তাহলে আবারও ফিরে যেতে হচ্ছে ইতিহাসের কাছে। একজন সেক্টর কমান্ডারের মুখ থেকেই সেটা শুনব। মুক্তিযুদ্ধের ৯ নং সেক্টর কমান্ডার মেজর এমএ জলিল বলছেন সেসব কথা তাঁর রচনাবলিতে—

"মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আসলে বস্তুটি কি এবং কোথায় ছিল সে সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা বা ব্যাখ্যা কারো কাছেই পাওয়া যায় নি। তবে মুক্তিযুদ্ধের পরে অনেক মহারথিরাই মুক্তিযুদ্ধের চেতনার এক এক ধরন ব্যাখ্যা দাঁড় করাবার প্রয়াস নিচ্ছেন। বিদ্যা-বুদ্ধির দৌড় তো আমাদের কম নয়। সুতরাং কোনো কিছুর সংজ্ঞা বা ব্যাখ্যা দাঁড় করাতে আর কতক্ষণ লাগে! ঘটেছেও ঠিক তাই। যার যার মতন সবাই সংজ্ঞা বা ব্যাখ্যাও দিয়ে যাচ্ছেন। তবে বক্তব্য-বিবৃতিতে সকলেরই এক কথা— মুক্তিযুদ্ধের চেতনা রক্ষা করতে হবে। অতি বিজ্ঞতাসুলভ ভঙ্গিতে সকলেই ওই এক কথাই আওড়িয়ে যাচ্ছে।...

মুক্তিযুদ্ধের একজন সেক্টর কমান্ডার হিসেবে আমি কেবল প্রয়াস চালাচ্ছি প্রকৃত সত্য জানতে ও বুঝতে। আমার জানা এবং বুঝার মধ্যে ভুল-ত্রুটি থাকতে পারে, কিন্তু তা হবে আমার অজ্ঞতারই কারণে, অসততার কারণে নয়। 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা'—এর ব্যাখ্যা আমার বর্তমান জ্ঞান ও চেতনার স্তরে পৌঁছে কিভাবে দাঁড় করাই তাতে কিছু যায় আসে না, তবে আজ থেকে ১৭ বছর পূর্বে মুক্তিযুদ্ধকে আমি কোন চেতনায় অনুভব করেছিলাম সেটাই হচ্ছে প্রধান কথা। আমার ব্যক্তিগত চেতনার কথা আমি পরেই বলব। তবে মুক্তিযুদ্ধের একজন সেক্টর কমান্ডার হিসেবে আমি যুদ্ধের

ময়দানে, কর্মক্ষেত্রে এবং আমার বিভিন্ন সংযোগের মাধ্যমে বাস্তবে আমি দেখেছি, অনুভব করেছি তা আমি আবেগ-বর্জিতভাবেই তুলে ধরতে চাই এখানে।...

আমি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাই, যখন আমাদের কিছু কিছু বুদ্ধিজীবী, চিন্তাবিদ, তাত্ত্বিক, রাজনীতিবিদ এবং পদমর্যাদাসম্পন্ন লোক ইসলাম সম্পর্কে ঢালাও মন্তব্য করেন এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে কুৎসিত অপপ্রচারেও লিপ্ত হন। তাদের 'ইসলাম এলার্জি' যে সুনিশ্চিতভাবেই সংকীর্ণ স্বার্থভিত্তিক সেরূপ সন্দেহ করার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। অতীতে ইসলামের দোহাই দিয়ে যে প্রচুর প্রতারণা হয়েছে এ কথা সত্য, যেমন হয়েছে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের নামেও। সে কারণে প্রকৃত অপরাধী কিম্বা অপরাধী মহল কলংকিত এবং আক্রান্ত হতে পারে না। ব্যক্তি কিংবা গোষ্ঠীর অপরাধের কারণে আদর্শকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর পেছনে নিশ্চিতভাবেই ষড়যন্ত্র থাকতে পারে, তবে সদিচ্ছা কিম্বা জনকল্যাণ চিন্তা কস্মিনকালেও নয়। এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি এবং আচরণ দেশ ও জাতির জন্য আত্মঘাতী। আর একটি বিষয় এখানে উল্লেখযোগ্য যে, বিশেষ একটি মহলের ধারণা ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে রাজনীতিতে ধর্মের বিশেষ করে ইসলাম ধর্মের ভূমিকা কি হবে তার মীমাংসা হয়ে গেছে। এ ধরনের উদ্ভট খেয়ালী মন্তব্য কেবল দুঃখজনকই নয় বিবেক এবং জ্ঞান-বিবর্জিতও বটে। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী এবং নেতৃত্বদানকারী একজন সেক্টর কমান্ডার হিসেবে আমি ওই সকল বন্ধুদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, ১৯৭১ সনে আমরা বাঙালি জনগণ পাক হানাদার বাহিনী কর্তৃক আকস্মিকভাবে চাপিয়ে দেয়া একটি অঘোষিত যুদ্ধের বিরুদ্ধে আমাদের ন্যায্য অধিকার আদায় এবং রক্ষা করার জন্যই যুদ্ধ করেছি কেবল। এটা ছিল স্বাধীনতা আদায়ের যুদ্ধ কোনো ধর্মযুদ্ধ নয় যে, যুদ্ধ বিজয়ের পরবর্তীকালে বিশেষ কোনো ধর্মকে পরাজিত বলে বিবেচনা এবং বর্জন করতে হবে। স্বাধীনতা যুদ্ধের আওতায় ধর্ম সংকুচিত কিম্বা পরাভূত হতে যাবে কেন, কোন্ যুক্তিতে? মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় ধর্মীয় অনুপ্রেরণা মোটেও অনুপস্থিত ছিল না। প্রতিটি যোদ্ধার শ্বাসে-নিঃশ্বাসে, রণক্ষেত্রের প্রতিটি ইঙ্গিতে স্মরণ করা হয়েছে মহান স্রষ্টাকে, তাঁর কাছে কামনা-প্রার্থনা করা হয়েছে বিজয়ের জন্য, নিরাপত্তার জন্য। অধিকাংশ যোদ্ধাই যেহেতু ছিল এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগণেরই সন্তান, সেহেতু যুদ্ধ ক্ষেত্রে শত্রুর বুলেট, মর্টারের সম্মুখে আল্লাহ এবং রসূলই ছিল তাদের ভরসা[১], সুতরাং '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় ইসলাম অনুপস্থিত ছিল বলে

১. আলেম মুক্তিযোদ্ধা মাওলানা আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী আল আজহারী বলেন, "দেশটাকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসি, তাই আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা। আর মুক্তিযুদ্ধ মানেই ধর্মের প্রতি বিদ্রোহ নয় যে, দাড়ি-টুপি বিসর্জন দিয়ে প্রগতিশীল সাজতে হবে। বরং আমার ধর্মীয় মূল্যবোধই আমাকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে, জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্বুদ্ধ করে। আর এ জিহাদের সময়ও আমি ধর্মেরই শিক্ষা অনুযায়ী রোজ কোরআন তেলাওয়াত

যারা যুক্তি দাঁড় করাচ্ছেন, তারা কেবল বাস্তবতাকে অস্বীকার করছেন। তারা অস্বীকার করছেন যুদ্ধ চলাকালীন বাস্তবতাকে যখন কেবল ইসলামই নয়, প্রত্যেকটি যোদ্ধাই যার যার ধর্মীয় অনুশাসন আন্তরিকতার সঙ্গেই মেনে চলেছে। মোদ্দাকথা, ধর্মীয় চেতনার উপস্থিতি বিশেষভাবেই পরিলক্ষিত হয়েছে মুক্তিযোদ্ধাদের ব্যক্তি আচরণে।[২] তবু যারা মুক্তিযুদ্ধে ধর্মীয় চেতনার অনুপস্থিতি আবিষ্কার করতে চান, তাদের অবস্থান মুক্তিযুদ্ধের ধারেকাছেও ছিল না।

... যারা সজোরে এবং সগর্বে বলতে চান যে, '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে অনেক জটিল সমস্যারই মীমাংসা হয়ে গেছে, তারা হয় আত্মপ্রবঞ্চনায় ভুগছেন, না হয় তারা কোনো অদৃশ্য প্রভুর নিছক মনোরঞ্জনের জন্যই কলের পুতুলের মত বগল বাজিয়ে যাচ্ছেন। আমার সেই সকল আত্মভোলা বন্ধুদের আমি অতি বিনয়ের সঙ্গেই অবগত করতে চাই যে, '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে কেবল একটি প্রশ্নেরই মীমাংসা হয়ে গেছে এবং তা হচ্ছে আমাদের এই ভূখণ্ডের একচ্ছত্র শাসক কে থাকবে, পাঞ্জাবি পুঁজিপতি গোষ্ঠী, না উঠতি বাঙালি পুঁজিপতি গোষ্ঠী? ব্যাস! কেবল এ প্রশ্নটিরই মিটমাট হয়েছে।

.... কারো পূর্ব-পরিকল্পনা খতিয়ে দেখার সময় আমার ছিল না। আমার সম্মুখে ছিল দায়িত্ব, আমি তা কেবল পালন করেছি। যুদ্ধের মাধ্যমে মানবতার সেবা কতটুকু হয়েছে জানি নে, তবে অপরাধীদের মোকাবেলা আমি সক্ষমভাবেই করেছি।

তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসী হিসেবে আমি নিপীড়িত ছিলাম। সেনাবাহিনীতে আমাকে ভেতো বাঙালি বলে উপহাস ও কৌতুক করা হত। '৭০-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয়ের পরে আমি ব্যক্তিগতভাবে দারুণ উচ্ছ্বসিত হয়েছিলাম। রাজনীতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে হাতেখড়ি না থাকলেও আমি চেতনাহীন

করে, নামাজ পড়ে পড়ে আল্লাহর দরবারে বিজয় কামনা করেছি। যুদ্ধের সময়ও ব্যাংকারে শুয়ে শুয়ে মুক্তিযোদ্ধারা আমারই অনুজের মুখে স্বাধীন বাংলা বেতারের কোরআনের তেলাওয়াত শুনেছে।" – আলেম মুক্তিযোদ্ধার খোঁজে : পৃষ্ঠা : ১৮৩

২. আলেম মুক্তিযোদ্ধা মাওলানা আব্দুর রব বলেন, "একদিন আমাদের ক্যাম্পে একটি জানাজা এলো। জানাজা কে পড়াবে এ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা শুরু হয়ে গেল সবার মাঝে। আমার মুখে হালকা হালকা দাড়ি। নিয়মিত নামাজ পড়তাম সেখানে। আমাদের চৌদ্দশ' সাথীর ভেতর থেকে হঠাৎ আমাকে ডেকে বসলেন দেবীদ্বার কলেজের প্রিন্সিপ্যাল স্যার। বললেন, তুমিই নামাজ পড়াবে। আমি মনে মনে খুশি হয়ে বললাম, স্যার কি গায়ে দিয়ে নামাজ পড়াব? আমার গায়ে যে পোশাক আছে তা খুবই ময়লা। তাছাড়া পাঞ্জাবি ছাড়া নামাজ পড়াব কেমন করে? স্যার বললেন, তোমার কাছে কি অন্য কোনো পোশাক নেই? বললাম, আছে। আবার স্যার বললেন, তাহলে তাই পরে নাও। আমি তখন লুকিয়ে রাখা পাঞ্জাবি-পাজামা পরে ফেললাম।"– আলেম মুক্তিযোদ্ধার খোঁজে : পৃষ্ঠা : ১৮৭ ❐

ছিলাম না। বাঙালির জীবনের দুঃখ-কষ্ট আমাকে ভাবিয়ে তুলত, বাঙালি-বিহারি, বাঙালি-পাঞ্জাবি দ্বন্দ্ব আমাকে পীড়া দিত। পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার অর্থনৈতিক বৈষম্য আমাকে লাঞ্ছিত করত। তাই '৭০-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ঐতিহাসিক বিজয়ের মধ্যে আমি খুঁজে পেয়েছিলাম আমার অবিকাশিত সত্তার মুক্তির প্রচ্ছন্ন ইংগিত। সত্য অনুসরণে আমার নিষ্ঠা থাকলেও প্রতিহিংসার অনল আমাকে অহরহ দহন করেছে। এ অনল আমি জ্বলতে দেখেছি প্রত্যেকটি সাধারণ বাঙালির বুকে। এই প্রতিহিংসার দাবানল বিস্ফোরিত হল আওয়ামী লীগের নির্বাচনী বিজয়ের মধ্য দিয়ে। বিহারি তাড়াও, পাঞ্জাবি তাড়াও এক কথায় অবাঙালি পূর্ব পাকিস্তান থেকে তাড়াও এই চেতনাটি অত্যন্ত স্বতঃস্ফূর্তভাবেই বিকশিত হতে লাগল। সত্তরের শেষ এবং একাত্তরের শুরুর সেই অগ্নিঝরা দিনগুলোতে পূর্ব পাকিস্তানের সংগ্রামী জনগণের মাঝে বিজাতীয়দের প্রতি চরম ঘৃণা ও বিদ্বেষ পরিলক্ষিত হলেও ইসলাম ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ মোটেও পরিলক্ষিত হয়নি, অথবা ধর্মহীনতা আমাদের পেয়ে বসেনি। তৎকালীন সময়ে কট্টর আওয়ামী লীগ বলে পরিচিত নেতাকর্মীদের মুখে 'ধর্মনিরপেক্ষতার'* নাম-গন্ধও আমি শুনতে পাইনি। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী দামাল তরুণ-যুবকদের অধিকাংশই ছিল এদেশের ধর্মপ্রাণ মুসলমানের সন্তান-সন্ততি। যুদ্ধের রক্তাক্ত ময়দানেও আমি মুক্তিযোদ্ধাদের দেখেছি বাকায়দা নামাজ পড়তে, দরূদ পাঠ করতে। তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের শাসককুল পবিত্র ইসলাম ধর্মকে বিভিন্ন সময়ে তাদের হীন স্বার্থে ব্যবহার করেছে বিধায় তাদের বিরুদ্ধে জনগণ সোচ্চার ছিল বটে, তবে প্রকাশ্যে পবিত্র ইসলাম ধর্মের প্রতি কোনো মহলই ঘৃণা কিম্বা বিদ্বেষ প্রদর্শন করেনি। **ইসলাম ধর্মের বিষয়টি আমি এখানে এ কারণে উল্লেখ করেছি যে, আমাদের মুক্তিযুদ্ধের পূর্বের ইসলাম এবং মুক্তিযুদ্ধের পরের ইসলাম, এর মধ্যে হঠাৎ করে এমন কি ঘটে গেল যাতে ইসলামের কথা শুনলেই কোনো**

*** ধর্ম ও রাজনীতিকে আলাদা করে দেখার সুযোগ নেই**

মোহাম্মদ হানিফ বাংলাদেশের রাজনীতিতে একটি উজ্জ্বল নাম। বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক সাহচর্যে বেড়ে ওঠা মোহাম্মদ হানিফ স্বাধীনতার পর তাঁর এপিএস হিসেবে কাজ করেন। বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর পরও তিনি জড়িত ছিলেন আওয়ামী রাজনীতির সঙ্গে। ছিলেন পরবর্তী জীবনে, ৯০ দশকের শুরুর দিকে, বিএনপি শাসনামলে, বিরোধীদলীয় প্রার্থী হিসেবে সরাসরি ভোটে ঢাকার মেয়র নির্বাচিত হন তিনি। এর আগে থেকেই তিনি ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। এছাড়া আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় ওয়ার্কিং কমিটির গুরুত্বপূর্ণ সদস্যও ছিলেন। ৭ অক্টোবর ২০০৫ দৈনিক আমার দেশকে এক সাক্ষাৎকারে দলের গঠনতন্ত্রের চার মূলনীতির একটি— ধর্মনিরপেক্ষতাকে বাদ দেয়ার প্রস্তাব উত্থাপনের মাধ্যমে রাজনৈতিক অঙ্গনে ব্যাপকভাবে আলোচিত তিনি। সাক্ষাৎকারটির চুম্বকাংশ—

কোনো মহল পাগলা কুকুরের মত খিঁচিয়ে ওঠেন। যে দেশের শতকরা নব্বই জনেরও অধিক পবিত্র ইসলাম ধর্মের অনুসারী, সে দেশে এ করুণ অন্ধ উন্মাদনার মধ্য দিয়ে ইসলাম ধর্মের নিকুচি করা কি আদৌ যুক্তিসম্মত? এই দুঃখজনক এবং লজ্জাকর অধ্যায়ের জন্য দায়ী কে বা কারা? বাস্তবতার অস্বীকৃতিই প্রতিক্রিয়াশীলতা নয় কী? অপরদিকে বাস্তবতার স্বীকৃতিই প্রগতির শর্ত এবং দাবি নয় কী? তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের গর্ভেই বর্তমান বাংলাদেশ ভূমিষ্ঠ হয়েছে। সেই পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসীর আচার-আচরণ, উৎসব-অনুষ্ঠান, সাংস্কৃতিক-ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ মুক্তিযুদ্ধের এক খোঁচায়ই কি বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে? এটা কি কারো খেয়াল-খুশির ওপর নির্ভরশীল, না বাস্তব-নির্ভর? আমাদের বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ, আমাদের সততাই কেবল আমাদের জাতীয় জীবনকে সুষ্ঠুভাবে বিকশিত করতে সক্ষম। সত্যানুরাগই কেবল আমাদের মুক্তির দিশারী হতে পারে, অন্যথায় আমাদের ধ্বংসের জন্য আমরাই যথেষ্ট।"

—ধর্মনিরপেক্ষতা বিষয়ক আপনার একটি মন্তব্য নিয়ে বিভিন্ন মহলে বেশ আলোচনা হচ্ছে। আসলে আপনি কী বলেছিলেন?

: আওয়ামী লীগের গঠনতন্ত্রে রয়েছে ধর্মনিরপেক্ষতা। এ ধর্মনিরপেক্ষতার সঙ্গে এ কথাও লেখা আছে— 'তথা ধর্ম-কর্মের স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ'। আমি যেটা বলতে চেয়েছিলাম, এই 'ধর্মনিরপেক্ষতা' শব্দটাই ডিলিট করে দেয়া হোক। এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে যে 'ধর্ম-কর্মের স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ'-এর কথা লেখা আছে, সেটাকেই ধর্মনিরপেক্ষতার জায়গায় বসানো হোক। এ সংশোধনীর কথাই আমি বলেছি। অর্থাৎ পরের অংশটিকে সামনে নিয়ে আসা, আর সামনের অংশটুকু মুছে ফেলা হোক।

—মূল শব্দটিকে বাদ দিয়ে আপনি কেবল ব্যাখ্যাটিকে রাখতে বলছেন। কিন্তু কেন? মূল শব্দ এবং তার ব্যাখ্যার মধ্যে কি আপনি কোনো বিরোধ দেখতে পাচ্ছেন?

: হ্যাঁ, পাচ্ছি।

—সেই বিরোধটা কী?

: শব্দটা হচ্ছে— ধর্মনিরপেক্ষতা। যেহেতু আমি একটা ধর্মে বিশ্বাস করি, তাই আমি ধর্মনিরপেক্ষ হতে পারি না। কেবল আমিই নয়, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান— সবাই নিজ নিজ ধর্মের প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট এটা হতেই হবে, এটাই স্বাভাবিক।

—এই পক্ষপাতটি কি ব্যক্তিগত জীবনাচরণে নাকি রাষ্ট্রীয় বা প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে?

: সব জায়গায়। আপনি তাকালেই দেখতে পাবেন, এটা ব্যক্তি জীবনে যেমন হচ্ছে তেমনি হচ্ছে রাষ্ট্রীয় জীবনেও।

—আপনি এক সময় ঢাকার মেয়র ছিলেন। তাহলে তখন যদি আপনার কাছে একই কাজের জন্য একজন হিন্দু এবং একজন মুসলমান যেত, তাহলে কি মুসলমান লোকটি আপনার কাছে বেশি সুবিধা পেত?

: না, তা হবে কেন? সেখানে তো পক্ষপাত করার কোনো সুযোগ নেই। সেখানে সবাই সমান সুযোগ, সমান সুবিধা পেয়েছে।

আলেম সমাজকে বলছি

১৪ ডিসেম্বর। ১৯৭১-এর এদিনে পাক বাহিনী তাদের এ দেশীয় দোসরদের সহযোগিতায় আমাদের শ্রেষ্ঠ সন্তান বুদ্ধিজীবীদের ধরে নিয়ে নির্মমভাবে শহীদ করে। সেসব শহীদদের স্মৃতি চিহ্ন নিয়ে দেশে একাধিক স্তম্ভ গড়ে উঠেছে।

গেল ১৪ ডিসেম্বরে রায়ের বাজার বধ্যভূমি থেকে ফোন দিলেন লালমাটিয়া-মোহাম্মদপুরের আলেম মুক্তিযোদ্ধা উসমান গনি। বেলা এগারটা হবে। জানালেন, কাল রাত থেকেই তারা এখানটায় আছেন। শহীদদের উদ্দেশ্যে কোরআন খতম করেছেন রাত জেগে, সবাইকে নিয়ে মোনাজাত করেছেন সকালে। একরাশ বিস্ময় নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, মাওলানা, এটা কী করে সম্ভব হলো? উসমান

—তাহলে আপনার কাছে হঠাৎ করে ধর্মের ভিত্তিতে পক্ষপাত করার বিষয়টি মনে হলো কেন?

: মনে হলো শুধু ওইখানে, যেহেতু আমি নিজেই একটা পক্ষ। নিরপেক্ষ শব্দের অর্থ হচ্ছে যার কোনো পক্ষ নেই। কিন্তু আমি নিজেই যেখানে একটা পক্ষ, সেখানে আমার পক্ষে নিরপেক্ষ হওয়া সম্ভব কীভাবে? মনের এই দুর্বলতার কথা কেন আমি অস্বীকার করব? আমি মসজিদে যাচ্ছি, আর একজন মন্দিরে যাচ্ছেন, কেউ যাচ্ছেন গির্জায়। এ থেকেই দেখা যাচ্ছে আমাদের পৃথক পৃথক গন্তব্য আছে। কাজেই আমি তো নিরপেক্ষ নই, আমি একটা পক্ষ। যারা কোনো ধর্মকে বিশ্বাস করে না তাদের পক্ষে হয়তো ধর্মনিরপেক্ষ হওয়া সম্ভব।

—যদি দলের স্বার্থেই হয়, তাহলে কী আপনি বলবেন— এতদিন ধর্মনিরপেক্ষতাকে দলীয় অন্যতম মূলনীতি হিসেবে রেখে দল কি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে?

: দল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কী হয়নি সেটা তো বিচারসাপেক্ষ বিষয়। তবে আমি মনে করি, এ শব্দটিকে নিয়ে আমাদের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ বাংলাদেশের ধর্মপ্রাণ মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছে। সেই বিভ্রান্তির বেড়াজাল থেকে মুক্ত করার জন্যই আমার এ প্রচেষ্টা।

—এতে কি আপনার রাজনৈতিক জীবন ক্ষতিগ্রস্ত হবে না?

: আমার কী ক্ষতি হবে, না হবে তা নিয়ে আমার কিছু আসে যায় না।

—তার মানে আপনি আপনার ব্যক্তিগত জীবনটাকে রাজনীতির চাইতেও উর্ধ্বে মনে করছেন?

: আমার ব্যক্তিগত জীবন বলেন আর রাজনৈতিক জীবন বলেন, সব কিছুই কিন্তু ধর্মীয় অনুশাসনে চলবে বলে আমি মনে করি। এই যে অনেকে বলেন রাজনীতি আর ধর্ম আলাদা— এটা আমি বিশ্বাস করি না। এটা মিথ্যা কথা। ধর্মের সঙ্গে রাজনীতি মিশানো যাবে না— এই তত্ত্ব যিনি দিচ্ছেন, তিনি আসলে মিথ্যা কথা বলছেন। যদি তিনি মুসলমান হন, তাহলে এ কথা তিনি বলতে পারেন না। মনে রাখতে হবে, ইসলাম একটা পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। মানুষের জীবনে যা যা দরকার আছে, সেই ঘুমুতে যাওয়া থেকে নিয়ে আবার ঘুম থেকে ওঠা পর্যন্ত, যা কিছু আছে সব বিষয়েই বিস্তারিত বলা আছে ইসলামে।

গনী উত্তরে বললেন, অন্যান্য বছরের মতো এবারও মোহাম্মদপুর-লালমাটিয়া মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড সংসদের পক্ষ থেকে শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসের অনুষ্ঠানে তাঁকে অমন্ত্রণ জানানো হয়। কিন্তু এবারের আমন্ত্রণ পেয়ে বেঁকে বসেন মাওলানা গনি। মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডের নেতাকে সাফ জানিয়ে দেন— বেদিতে ফুল দেয়া, এক মিনিট দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন এসব শিরকি কাজে তিনি যেতে পারবেন না। কমান্ড নেতা শুধালেন, তাহলে আপনি কিভাবে করতে চান? উসমান গনী বললেন, শহীদদের জন্য কোরআন খতম এবং সবাইকে নিয়ে মোনাজাত হতে পারে। নেতা মেনে নিলেন, ঠিক আছে, তাই হবে।

আশা করি মাওলানা উসমান গনীর মতো দেশের আলেম সমাজও ইসলামী রীতি অনুযায়ী আমাদের জাতীয় দিবসগুলো উদযাপনে এগিয়ে আসবেন। একটি স্বাধীন দেশে বাস করে স্বাধীনতা ভোগ করতে পারলে যাদের ত্যাগে এ ভূখণ্ডটি পেলাম তাদের জন্য কি আলেম সমাজের কিছুই করার নেই। দিবস উদযাপনের প্রচলিত পদ্ধতিকে বিজাতীয়-শিরকি আখ্যা দিয়ে ঘরে বসে না থেকে ইসলাম অনুমোদিত প্রথা চালু করে দিলে একদিকে দেশপ্রেম প্রকাশ পাবে অপর দিকে ইসলাম অননুমোদিত প্রথাও ধীরে ধীরে দূর হয়ে যাবে।

—তাহলে যেহেতু রাজনীতিও মানুষের জীবনের একটি অংশ, তাই রাজনীতিও ধর্মের মধ্যেই থাকতে পারে?

: অবশ্যই। শুধু রাজনীতি কেন কোনো কিছুই ধর্মের বাইরে নয়।

— ধর্ম মানলে পুরোটাই মানতে হবে। নিজের সুবিধা অনুযায়ী কিছুটা মানলাম, আর কিছুটা মানলাম না— সেটা সম্ভব নয়।

: ঠিক তাই। ধর্ম মানলে পুরোটাই মানতে হবে। আংশিক মানার কোনো সুযোগ নেই।

—ইসলাম নিয়ে যে আপনি এত কথা বলছেন, আপনি নিজে কি ব্যক্তি জীবনে ইসলামকে পরিপূর্ণভাবে মেনে চলেন?

: আমি চেষ্টা করি। কিন্তু আমি পারি না।

—এই না পারা নিয়ে আপনার মধ্যে বেদনা কাজ করে?

: বেদনা কাজ করে। অনুশোচনা দেখা দেয়। চেষ্টা করতে করতে আল্লাহ হয়তো একদিন আমাকে হেদায়েত করবেন।

— তাহলে দেখা যাচ্ছে একটা বড় লক্ষ্য নিয়ে আপনি মাঠে নেমেছেন। যেন পুরো রাষ্ট্র ব্যবস্থাতেই আপনি পরিবর্তন আনতে চাইছেন। তো এই লক্ষ্য অর্জনে আওয়ামী লীগের ওই একটি লিখিত নীতিতে পরিবর্তন আনতে পারাই কি যথেষ্ট?

: ধীরে ধীরে আমাকে আগাতে হবে। একসঙ্গে যদি সব ধরি তাহলে এলোমেলো হয়ে যাবে। আগে শুরু তো করি। আমি একটা দলের মধ্যে আছি, তাই সেখান থেকেই শুরু করতে চাচ্ছি। এই দলের মধ্যে প্রথম যে জিনিসটির পরিবর্তন আনা আমার কাছে সবচেয়ে বেশি জরুরি মনে হয়েছে— সেটা এই ধর্মনিরপেক্ষতা। হোয়াই শুড আই বি ধর্মনিরপেক্ষ? হোয়াই? ❒

এখন এর জন্ম সম্পর্কে দু'চারটে কথা। ঠিক বছরখানেক আগে এ মাসে দেশের একটি শীর্ষ দৈনিকে কাজ করতে গিয়ে একজন আলেম মুক্তিযোদ্ধার সন্ধান পাই। তাঁর সন্ধান দেন তরুণ লেখক মিরাজ রহমান। ওর কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ দৈনিক যুগান্তরের উপ-সম্পাদক জনাব শাহজাহান সরদারের কাছে। অপরাধীকে অপরাধী বলার 'অপরাধে' তিনি আমার চাকরিটা না খেলে যে এ বইয়ের অস্তিত্ব কল্পনাও করা যেত না।

'আলেম মুক্তিযোদ্ধার খোঁজে' 'যুগান্তর'-এর লেখাটি এ শিরোনামেই ছাপা হয়েছিল। পরে আলেম মুক্তিযোদ্ধাদের খোঁজ পাওয়ার জন্য এ শিরোনামেই পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম। ফলে কিছু দিনের মধ্যেই সবার মুখে মুখে এটি শ্লোগান আকারে প্রচার হয়ে যায়। তাই শেষ পর্যন্ত বইয়ের নাম হিসেবে এ শ্লোগানটিই রেখে দেয়া হলো।

এ বইয়ে আলোকিত প্রত্যেক মুক্তিযোদ্ধার কাছে আমি ঋণী। তাদের স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতা না পেলে আজকের এই ভূমিকা লেখা কোনোভাবেই সম্ভব হতো না। বইয়ের কলেবর আমাদের কল্পনাতীত বেড়ে যাওয়ায় শেষ মুহূর্তে যারা যোগাযোগ করেছেন তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করতে পারিনি বলে আন্তরিকভাবে দুঃখিত। এমনি প্রায় অর্ধশত নাম আমার হাতে রয়েছে। তাঁদের নিয়ে যথাশিগগির এর দ্বিতীয় খণ্ডের কাজ শুরু করব— ইনশাআল্লাহ।

আমার সহযোগীদের নাম বইয়ের শুরুতে আলাদা করে উল্লেখ করা হয়েছে। তাই দ্বিতীয়বার এখানে তাঁদের নামগুলো উল্লেখ করা হচ্ছে না। তবে কিছু বলার আছে। সেই বলাটা হচ্ছে, তাঁদের কাছে আমার ঋণ জীবনেও শোধ হওয়ার নয়।

স্বনামখ্যাত ছ'জন লেখক-সাংবাদিককে দিয়ে পাণ্ডুলিপিটি রিভিউ করা হয়েছে। স্ব-স্ব ক্ষেত্রে অত্যন্ত ব্যস্ত তাঁদের প্রত্যেকেই পাণ্ডুলিপিটি আদ্যোপান্ত পড়ে অতি মূল্যবান একটি করে মন্তব্যও লিখে দিয়েছেন। এছাড়া প্রখ্যাত আলেম, লেখক ও সাহিত্যিক মাওলানা ফরিদ উদ্দিন মাসউদ এ বইয়ের জন্য একটি দীর্ঘ ভূমিকা লিখে দিয়েছেন। এজন্য আমি তাঁদের প্রত্যেকের কাছে কৃতজ্ঞ।

মুক্তিযুদ্ধের ওপর প্রকাশিত দেশি-বিদেশি বইগুলো আমাকে প্রভূত সাহায্য করেছে। এ বইয়ের দীর্ঘ পরিশিষ্টটি মূলত এসব বই থেকেই নেয়া। স্ব স্ব স্থানে বই এবং লেখকদের নামও উল্লেখ করে দেয়া হয়েছে। 'গ্রন্থপঞ্জি' শিরোনামে সবশেষে সবগুলো বইয়ের তালিকাও দিয়ে দেয়া হয়েছে।

এ বইয়ের প্রকাশক দেশের ঐতিহ্যবাহী ধর্মীয় প্রকাশনী 'আল-এছহাক প্রকাশনী'র কর্ণধার জনাব আলহাজ তারিক আজাদ চৌধুরী এমন একটি 'অপ্রথাগত' প্রকাশনার দায়িত্বভার গ্রহণ করে যে দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন এজন্য তিনি দেশবাসীর কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

জাতীয়ভাবে অর্থনৈতিক দুর্যোগের এ দুঃসময়ে তাঁর উদার হাত সম্প্রসারিত না হলে অতি ব্যয়বহুল এ প্রজেক্টটি মুখ থুবড়ে পড়ে থাকত। তাই প্রয়োজনীয় এ কাজটি

যথাসময়ে শেষ করতে পারার সবটুকু কৃতিত্ব মূলত তাঁরই।

"Dear Shibli vai.

Thanks for your holy attempt of find out the alim martyres of our Independence war in 1971. I heartly wish for your succes and also wish you have a happy . . .

Raihan

A Monthly Rahmat reader

Manikgonj."

আমার পাঠক-ভক্ত, শুভাকাঙ্ক্ষী ও বন্ধু-বান্ধবের কাছেও আমার কিছু ঋণ আছে। বই বের হওয়ার আগেই ফোনে, ম্যাসেজে, আলোচনায়, সাক্ষাতে তাঁদের ঔৎসুক্যের কথা তাঁরা আমাকে যেভাবে জানিয়েছেন, তাতে আমি সত্যিই অনুপ্রাণিত। আমি জানি, এটা আলেম মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য তাঁদের ভালোবাসারই উৎসারণ। আলাদা করে আমি আর তাঁদের নাম বলতে চাই না, তাঁরা নিশ্চয় এ লেখা থেকেই আমার কৃতজ্ঞতাটুকু গ্রহণ করে নেবেন।

আমার বিরুদ্ধে আমার স্ত্রীর গুরুতর অভিযোগ— কৃতজ্ঞতার নামে আমি আমার বইয়ে তাঁকে নাকি 'ডুবাই'। তাই তাঁর কড়া নির্দেশ— এ বইয়ে তাঁর নামে কিছুই লেখা যাবে না। কেবল এক শর্তেই লেখা যাবে যদি সেটা তাঁকে দেখিয়ে নেই।

তথাস্তু,

এ মাটি, মানুষের ঋণ শোধ করতে গিয়ে গত এক বছরে তোমাকে বহু বৈধ অধিকার থেকে বঞ্চিত রেখেছি। ক্ষমা করে দিও আমাকে।

তুমি ভালো থেকো, এ দেশবাসী ভালো থাকুক। আল্লাহ আমাদের সবার মঙ্গল করুন।

শাকের হোসাইন শিবলি

মিয়াজি মঞ্জিল

কোনাপাড়া, ডেমরা, ঢাকা

প্রকাশকের কথা

জালেমের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো, মজলুমের পক্ষে প্রতিবাদ-প্রতিরোধমুখর হয়ে ওঠা সকল ধর্ম ও শ্রেষ্ঠ মতাদর্শগুলোর প্রাণকথা। আর ইসলাম তো এ ব্যাপারে শতভাগ আপোষহীন। তাই ইসলামের সত্য, সুন্দর এবং মানবতা ও শান্তির ধারকবাহক ওলামায়ে কেরাম সব সময় জালেমের বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে আপোষহীন থেকে মানব সমাজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে। এমনকি সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ বেনিয়াদের জুলুম অত্যাচারে যখন আক্রান্ত উপমহাদেশ, ওলামায়ে কেরামের কণ্ঠ চিড়েই সর্বপ্রথম ইংরেজ খেদাও আন্দোলনে সংগ্রামী ডাক এসেছিল। ভারত উপমহাদেশ 'দারুল হরব'-শত্রু কবলিত এই এক ফতোয়া টলিয়ে দিয়েছিল ইংরেজদের মসনদ। এসবই ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ। সাম্রাজ্যবাদের দোসররা যা ছাই চাপা দিয়েও চেপে রাখতে পারেনি।

১৯৭১ সালে পশ্চিম পাকিস্তানিদের দ্বারা পূর্ব পাকিস্তান তথা এই বাংলাদেশের নিরীহ মানুষ আক্রান্ত হয়েছিল নির্মমভাবে। পাক জালেমদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন এদেশের লড়াকু আমজনতার সঙ্গে আলেম সমাজও। প্রতিরোধ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। এটা ইতিহাসের অবিসংবাদিত সত্য- অবিচ্ছেদ্য অধ্যায়। স্বাধীনতার পর ৩৭ বছর পর্যন্ত এ সত্যকে পদদলিত করা হয়েছে। ইতিহাসের পবিত্র দেহকে করা হয়েছে ক্ষত-বিক্ষত। আলেম সমাজসহ সাধারণ জনগণ যারা ধর্মের কারণে দাড়ি-টুপি ব্যবহার করে তাদের গায়ে সেঁটে দেয়া হয়েছে রাজাকার, আল-বদরের অভিশপ্ত ফলক। তারা প্রজন্ম '৭১-এর পরে জন্ম হলেও।

জনপ্রিয় লেখক, সাংবাদিক শাকের হোসাইন শিবলি ইতিহাসের অনিবার্য সত্যকে স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। উন্মোচিত করেছেন চেপে রাখা এক অধ্যায়ের। এজন্য তিনি বাংলাদেশের প্রতিটি শহর গ্রাম ঘুরে বেড়িয়ে কষ্টিপাথরে যাচাই করে রচনা করেছেন এই প্রামাণ্য গ্রন্থ **'আলেম মুক্তিযোদ্ধার খোঁজে'**। এমন একটি গ্রন্থের মহতি প্রকাশনার সঙ্গে জড়িত থাকতে পেরেছি বলে আল্লাহর দরবারে শোকরিয়া জ্ঞাপন করছি। আশা করি এ গ্রন্থের মাধ্যমে উপমহাদেশের হক্কানি আলেম সমাজ সম্পর্কে সৃষ্ট ভুল ধারণার চির অবসান ঘটবে। কথায় কথায় ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, ব্যঙ্গাত্মক অপবাদ আরোপ করেন যারা তারা তাদের লালিত ভিত্তিহীন ধারণা থেকে সরে আসবেন এবং সংশোধনের পথকে প্রাধান্য দেবেন। তাহলেই আমাদের প্রকাশনা সার্থক হবে।

বিনীত

তারিক আজাদ চৌধুরী

স্বত্বাধিকারী

আল-এছহাক প্রকাশনী

লেখকের প্রকাশিত গ্রন্থ

- প্রখ্যাত আলেম ইসলামী রাজনীতিক ও পীর মাশায়েখের সাক্ষাৎকার- ১
  বাড কম্প্রিন্ট এন্ড পাবলিকেশন্স
- প্রখ্যাত আলেম ইসলামী রাজনীতিক ও পীর মাশায়েখের সাক্ষাৎকার- ২
  বাড কম্প্রিন্ট এন্ড পাবলিকেশন্স
- কাকরাইল থেকে বিশ্ব ইজতেমা
  দারুল উলূম লাইব্রেরী
- চোরে শোনে না ধর্মের কাহিনী
  খান প্রকাশনী
- খতিবে আজম মুনাজেরে জমান তরজুমানে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত মাওলানা নূরুল ইসলাম ওলীপুরীর বক্তৃতা সংকলন মাওয়ায়েজে ওলীপুরী (সম্পাদিত)
  আনোয়ার লাইব্রেরী
- বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রন্থ ও অমুসলিম মনীষীদের দৃষ্টিতে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (সম্পাদিত)
  আল-এছহাক প্রকাশনী
- বুশের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল ইরাক (সম্পাদিত)
  বাড কম্প্রিন্ট এন্ড পাবলিকেশন্স
- রক্তাক্ত আফগানিস্তান (সম্পাদিত)
  সিদ্দিকীয়া পাবলিকেশন্স
- ভোট কেন দেবেন কাকে দেবেন (অনূদিত)
  আল-এছহাক প্রকাশনী

সূচিপত্র

পরিশিষ্ট



মওলানা ভাসানী : প্রোফেট অব ইন্ডিপেনডেন্স

ঢাকা থেকে ৪০০ কিলোমিটারের পথ। পড়ন্ত বিকেল। দারুন্নাজাত মসজিদ করিডোর। আছর ও মাগরিবের মাঝামাঝি সময়। দিনের ব্যস্ততা গুটিয়ে আসছে ক্রমাগত। সেই করিডোরে দাঁড়িয়ে আছেন মাওলানা মাহতাব উদ্দীন। নামাজে আমাদের সালাম ফেরানো শেষে তিনি নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, আমি মাহতাব উদ্দীন, আপনারা নিশ্চয়ই ঢাকা থেকে এই কুড়িগ্রামে এসেছেন আলেম মুক্তিযোদ্ধার খোঁজে...। হ্যাঁ, ঠিক তাই— আমরা ঠিক স্থানেই এসেছি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়া মহান আলেম মুক্তিযোদ্ধাদের সান্নিধ্য পেতে। কুড়িগ্রামের সীমান্তবর্তী একটি থানা নাগেশ্বরী। আমি ও ফায়জুল আলেম মুক্তিযোদ্ধার খোঁজে উত্তরাঞ্চল সফরের এ প্রান্তে এসে নাগেশ্বরী বাজারের দারুন্নাজাত মসজিদে দাঁড়িয়ে, যেটা কিনা সেই ৫০-এর দশকে তৎকালীন ফুরফুরার পীরের ভিত্তিপ্রস্তরে প্রতিষ্ঠিত। পুরো বাজার এলাকায় একটা ধর্মীয় আবহ আছে। আছে একাধিক মসজিদ, মাদরাসা। আরো আছেন বেশ কয়েকজন আলেম মুক্তিযোদ্ধা। সময় গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে একে একে সাক্ষাৎ হলো আলেম মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে। সন্ধান পেতে থাকলাম শহীদ আলেম মুক্তিযোদ্ধাসহ একাধিক আলেম মুক্তিযোদ্ধার। এক পর্যায়ে সব কিছুকে ছাপিয়ে গেল মাওলানা মাহতাব উদ্দীনের একটি বাক্য— 'পার্শ্ববর্তী ভুরুঙ্গামারী থানায় মওলানা ভাসানীর খানকা আছে।' এই এক বাক্য আমাদের জন্য হাজার বাক্য সন্ধানের উৎস হয়ে গেল। আমাদের জাতীয় নেতা, স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্বপ্নদ্রষ্টা মওলানা আবদুল হামিদ খানের আদি বাস এখানে— একথা শুনে রীতিমত আমরা অভিভূত। জানতে চাইলাম- সত্যিই কি ভাসানীর খানকা, বাড়িঘর আছে এখানে? জনাব মাহতাব উদ্দীন বললেন, আমি কখনও সেখানে যাইনি। তবে ভাসানীর মুরিদান, ভক্তকুল নিয়মিত সেই খানকায় যান বলে আমরা জানি। একথা শুনে আশা-নিরাশার একটা দোলাচালে দুলতে থাকলাম। মনে সুপ্ত অনুসন্ধিৎসু শক্তিটা জেগে উঠতে থাকল। জাগ্রত নব শক্তি শপথ নিল— খুঁজে বের করতে হবে মওলানা ভাসানীর খানকা- তিনি যে আমাদের মহান আদর্শ, মহান পুরুষ, মহান এক আলেম মুক্তিযোদ্ধা।



ভুরুঙ্গামারীতে মওলানা ভাসানীকে খুঁজে ফেরা...

ভুরুঙ্গামারীতে এসেও ভাসানীর খানকায় আসা হলো না সেদিনটায়। কারণ, এদিকে আরেক বীর মুক্তিযোদ্ধা মাওলানা শামছুল হক বায়না ধরে আছেন– রাতটা কাটাতে হবে তাঁর বাড়িতে। সেই বাড়ি থেকে ১০ কি.মি. পথ পেরুলেই পৌঁছা যাবে ভুরুঙ্গামারীতে। রাতে মাওলানা শামছুল হকের বাড়িতে ঘুম আসছে তো আসছে না! ভাবছি তো ভাবছি না– সত্যিই কি ভুরুঙ্গামারীতে মওলানা ভাসানীকে খুঁজে পাওয়া যাবে? আমরা তো জানি– তাঁর খানকা, মাজার, পরিবার সবকিছুই টাঙ্গাইলের সন্তোষে। দেশের সীমান্তবর্তী এ রকম একটা প্রত্যন্ত থানায় নাকি আবার ভাসানীর এক ছেলেও বাস করেন– এটাও কি সত্য হতে পারে? এত মহান ব্যক্তির ছেলে, পরিবার এখানে থাকবেন– এমনটা ভাবা আপাতত কঠিন বৈকি! তারপরও খোঁজ নিতে বিপত্তি কোথায়!

পরদিন সকালে আমাদের সফরসঙ্গী হলেন নাগেশ্বরীর সেই বীর মুক্তিযোদ্ধা মাওলানা শামছুল হক। তিনি প্রথমে আমাদের রিকশাযোগে নিয়ে গেলেন নাগেশ্বরীর আরেক মুক্তিযোদ্ধা মাওলানা আমজাদ হোসেনের বাড়িতে। সেখান থেকে দেড় ঘণ্টার রিকশা ও বাস যাত্রার পর পৌঁছলাম ভুরুঙ্গামারীতে। তিনজনের কেউ জানি না ভুরুঙ্গামারীর ঠিক কোথায় মওলানা ভাসানীর বাড়ি। বাসে একটা মজার ঘটনা ঘটে গেল। মাওলানা শামছুল হক তার পরিচিত একজনকে দেখতে পেয়ে বললেন, আপনি কোথায় যাচ্ছেন? সে লোকটিও জানতে চাইল– আমরা তিনজন কোথায় যাচ্ছি। এ সুযোগে মাওলানা শামছুল হক জানতে চেয়ে বললেন– আমরা ভুরুঙ্গামারীতে ভাসানী বাড়ি যাব, আপনি চেনেন তাকে? – পঞ্চাশোর্ধ্ব লোকটা মুচকি হেসে বলল, ভাসানীর হাতে আমার জন্ম, আর আমাকে বলছেন আমি ভাসানীকে চিনি কি-না! আপনারা আমার পীরের দরবারে যাবেন– তাই তো। এখন যাওয়া একেবারে সহজ। বাস থেকে ভুরুঙ্গামারীতে নেমে যে কোনো রিকশাকে বলবেন, ভাসানী দরগায় যাব– রিকশাই আপনাদের নিয়ে যাবে সেখানে। লোকটার কথায় আশ্চর্য না হয়ে পারলাম না। ভাসানীর হাতে তার জন্ম, ভাসানী তার পীর, আবার দেহ গঠন, স্বাস্থ্যেও অনেকটা ভাসানীর মতো। ব্যাপারটা বুঝে উঠতে চেষ্টা করলাম। তিনি জানালেন, তার বাবা ছিলেন মওলানা ভাসানীর মুরিদ। বাবা-মা ছিলেন নিঃসন্তান। অনেক চেষ্টা-তদবির করেও কোনো ফল হয়নি। শেষ পর্যন্ত বাবা তার পীর ভাসানচরের মওলানাকে ধরলেন আল্লাহর কাছে বিশেষভাবে দোয়া করতে যেন তাদের সন্তান হয়। আল্লাহ ভাসানী পীরের দোয়া কবুল করলেন। যে রাতে তিনি পৃথিবীতে আলোর মুখ দেখেন ঘটনাচক্রে মওলানা ভাসানী সেদিন তাদের বাড়িতেই ছিলেন। আসামের ভাসানচরে তার জন্ম। জন্মের পর মওলানা ভাসানী তাকে কোলে নিয়ে নিজের নামেই তার নাম রেখেছেন— আবদুল হামিদ খান। ভাসানচরে থাকাবস্থায় গ্রামের মানুষের পীর বনে যান মওলানা ভাসানী। সেখান থেকে ভাসানী ভুরুঙ্গামারীতে চলে এলে তার বাবাও এপারে এসে বসতি গাড়েন। লোকটার কথায় যথেষ্ট আশ্বস্ত হয়ে উঠলাম বটে। এখন বিশ্বাস জন্মাতে থাকল সত্যিই ভাসানীর বাড়ি, দরগাহ আছে এখানটায়। বাস এগিয়ে চলল। সামনের স্টপেজে নেমে পড়ল সেই লোকটা। আমরা নামলাম ভুরুঙ্গামারী বাস স্টপেজে।

ভাসানী বাড়ির এক দুপুর

রিকশা চলেছে ভাসানী বাড়ির দিকে। ভুরুঙ্গামারী এখন একটি থানা, যার তিন দিকেই ভারতীয় সীমান্ত। থানা সদর পেরিয়ে সীমান্ত গ্রামের দিকে চলছে রিকশা আঁকা-বাঁকা, কাঁচা-পাকা পথ পেরিয়ে। গ্রামের শেষ প্রান্তে এসে থামল রিকশা। সামনেই মওলানা ভাসানীর বাড়ি— বললেন রিকশাওয়ালা। ভরা দুপুরে শূন্য বাড়ি নয় তো এটি! দু'তিনটা টিন শেডের ঘর দাঁড়িয়ে আছে। একটার আবার বেড়া নেই। গ্রামের সাদামাটা বাড়ি যেমন হতে পারে ঠিক তেমন-ই। কয়েকজন লোক ধান নেয়ার কাজ করছেন। তাদের কাছ থেকে জানতে পারলাম এখানে মওলানা ভাসানীর এক নাতি থাকেন নিজ পরিবার নিয়ে। কিন্তু এ মুহূর্তে সেই নাতি বাজারে আছেন। কিছুক্ষণের মধ্যে তিনি চলে আসবেন বলে জানানো হলো। এ সময়টাতে বুঝতে চেষ্টা করলাম পুরো পরিবেশটা। জানতে চাইলাম মওলানা ভাসানী কি নামে পরিচিত তাদের কাছে। একজন বললেন, তিনি তো আমাদের পীর ছিলেন। সামনের এ ঘরটা দরগাহ। এখানে প্রতি বছর ওরস হয়। এখানে বসেই মুরিদদের ওয়াজ করতেন তিনি। দরগার পাশেই দেখা গেল একেবারে ছোট একটি টিনের ঘর– চাল দুটি টিনের আর বেড়াগুলো মুলির। জানা গেল এটিই ছিল মওলানা ভাসানীর ইবাদতখানা। তখন এটি ছিল কুঁড়েঘর। অন্য থাকার ঘরগুলোর ঠিক এতটুকুই পরিবর্তন ঘটেছে। কুঁড়েঘর থেকে এখন টিনের ঘর হয়েছে। পাওয়া গেল মওলানা ভাসানীর নাতিন বউকে। একেবারে অতি সাধারণ গৃহবধূ তিনি। ভাসানীর স্মৃতি বিজড়িত খাট, চেয়ার, টুপি দেখালেন তিনি। ছোট মিষ্টি মুখের ভাসানীর ৪র্থ প্রজন্ম অর্থাৎ নাতির ঘরের পুতি খালি গায়ে খালি পায়ে খালি উঠানে খেলা করছে। ভাসানীর বাঁধাই করা ছবিটা হাতে ধরিয়ে দিলাম শিশুটার। ফায়জুল মুহূর্তের মধ্যে ক্যামেরায় ক্লিক করতে কার্পণ্য করলেন না।



ভাসানীর নাতি হাসরত খান ভাসানী সাইকেল চালিয়ে বাড়ি ফিরছেন। ভাসানীর পোট্রেট হাতে তাঁর প্রপৌত্র। ভাসানীর ভুরুঙ্গামারী বাড়ি থেকে নেয়া

এরই মধ্যে দেখা গেল ভাসানীর নাতি আসছেন। বাবা বাবা বলে দৌড়ে যাচ্ছে পুতি। সাইকেলে করে লুঙ্গি-পাঞ্জাবি পরা নাতি ফিরলেন বাড়ি। দেশের ক'টা প্রতিষ্ঠিত রাজনীতিকের নাতি গাড়ির বদলে বাড়ি ফেরেন সাইকেলে চড়ে! আমাদের পরিচয়টা পরিষ্কার হয়ে গেল প্রথম পর্বেই তার কাছে। তারপর জানতে চাইলাম কিভাবে এ রকম একটা প্রত্যন্ত গ্রামে এসে বাড়ি বাঁধলেন তার দাদা। জানালেন, ৬০ বছর আগে যখন এখানে দাদা প্রথম আসেন তখন চারদিকে জঙ্গল ছিল। দাদা বলেছিলেন, এখানে জনবসতি হবে, সড়ক হবে, স্কুল-কলেজ হবে। এখন ঠিক তাই হয়েছে। বড় মহাসড়ক, ঘন জনবসতি, স্কুল-কলেজ সবই হয়েছে। গ্রামটির পূর্ব নাম কামাতআঙ্গারিয়া। ভাসানী নগর নামে গ্রামটির পরিচিতিকরণের চেষ্টা করছেন তারা। হাত উঁচিয়ে নাতি মনিরুজ্জামান খান ভাসানী বললেন– নদীর ওই পাশটা হলো ভারতের আসাম। এ পাশের এ গ্রামটি বাংলাদেশের শেষ গ্রাম। ওই পাশের ভাসানচরে বসবাস করতেন দাদা ভাসানী। দাদি দাদার সঙ্গে ভাসানচরে থাকা অবস্থায় এক আনা, দু'আনা করে জমাতেন। সেই জমানো টাকা দিয়ে এক ভক্তের সহায়তায় নদীর এপারের এ বাড়িটি ক্রয় করান। তিনি তখন বুঝতে পেরেছিলেন যে, আমার দাদার স্থায়ী কোনো ভিটা নেই যেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করা যায়। সেই চিন্তা থেকে এখানে বাড়ি কেনা। ১৯৪৭ সালে ভারত-পাকিস্তান বিভক্ত হলে দাদা এ বাড়িতে ওঠেন। দাদার অবশ্য এখানে বেশি দিন থাকা হয়নি। দেশে দেশে মানুষের হয়ে সভা সমাবেশ, ওয়াজেই বেশি সময় চলে গেছে। মনিরুজ্জামান খান ভাসানী মওলানা ভাসানীর তৃতীয় বা শেষ স্ত্রী হামিদা খানম-এর একমাত্র পুত্র আবুবকর খান ভাসানীর বড় ছেলে। আবু বকর খান ভাসানীর অন্য দুই ছেলে হলেন– হাসরত খান ভাসানী ও আজাদ খান ভাসানী।

মওলানা ভাসানীর পারিবারিক জীবন সম্পর্কে যা জানা যায় তা হলো–

তিনি বগুড়া জেলার বন্যাদুর্গতদের সেবাকর্ম পরিচালনা করে পাঁচবিবি থানার বীরনগরের প্রভাবশালী জমিদার শামসুদ্দিন আহমদ চৌধুরীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁর সাহস ও প্রতিবাদী শক্তি দেখে জমিদার শামসুদ্দিন ভাসানীকে তার জমিদারি দেখাশোনা করার অনুরোধ জানান। ভাসানী এ সময় বিপ্লবী দলের সদস্য ছিলেন এবং পুলিশ তাঁর পিছু নিয়েছে। ভাসানী তাঁর সহকর্মী ভগবান দাশকে নিয়ে জমিদার বাড়িতে আশ্রয় নেন। এদিকে পুলিশের চাপ কমে যায়। জমিদার বাড়ির মক্তবে তিনি শিক্ষকতা শুরু করেন। এ সময় তিনি জমিদার কন্যা আলেমা খাতুনকে পড়াতেন।

মওলানা ভাসানী জমিদারবিরোধী ছিলেন, কিন্তু শামসুদ্দিন চৌধুরী ছিলেন প্রজাবৎসল। প্রজাদের মঙ্গলের জন্য মওলানা ভাসানী জমিদারের সঙ্গে আলোচনা করতেন। জমিদারির কাজে তাঁকে কলকাতা যেতে হতো। সেখানে তিনি কংগ্রেস ও বিপ্লবী নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন। জমিদারি পরিচালনায় মুগ্ধ হয়ে জমিদার শামসুদ্দিন তাঁর ১৯ বছরের মেয়ে আলেমাকে ১৯২৫ সালে মওলানা ভাসানীর সঙ্গে বিয়ে দেন। এ সময় মওলানা ভাসানীর বয়স ছিল ৪৫ বছর।

১৯২৬ সালে আলেমাকে নিয়ে মওলানা ভাসানী আসামের ধুবড়ীতে বসতি স্থাপন করেন। সেখানে ছিলেন ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত। আলেমা খাতুনের গর্ভে জন্ম নেয় ৩ ছেলে ও দু' মেয়ে। প্রথম ছেলে আজিজুল হক ছোটবেলায় আসামে মারা যায়। সেখানেই তার

❝

আশি পেরিয়ে যাওয়া এক মুরিদের সাক্ষাৎ পাওয়া গেল পাশের বাড়িতে। বয়সের ভারে একেবারে নুয়ে পড়েছেন এ মুরিদ। ভাঙা ভাঙা অস্পষ্ট কণ্ঠে বললেন, ভাসানী হুজুরের ভুরুঙ্গামারীর এ বাড়ি আমার হাতেই পত্তন হয়। আসাম থেকে তিনি আমাকে পাঠান এখানে বাড়ি করার জন্য। আমার আদি বাড়ি আসামেই। মুরিদ হিসেবে কি আমলের নির্দেশ পেতেন আপনি? এ প্রশ্নের উত্তরে বললেন, বাতিনী কিছু আমল আছে, সেটা বলা যাবে না

❞



কবর হয়। অন্য দু' ছেলে ও দু' মেয়ে হলেন– রিজিয়া খানম, আবু নাসের খান ভাসানী, গোলাম কিবরিয়া খান ভাসানী এবং মাহমুদা খানম। প্রায় সব ছেলে-মেয়ের জন্ম আসামে। সারাদিন রাজনৈতিক কর্মী-নেতা ও মুরিদগণ মওলানা ভাসানীকে ঘিরে থাকত। তাঁকে অধিকাংশ সময় ছেলেমেয়েদের থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে হতো। তাদের ভালো খাওয়া, ভালো স্কুল-কলেজে পড়ানোর প্রতি তিনি ছিলেন উদাসীন। বাংলার শতকরা ৮০ জন কৃষকের সন্তানরা যেভাবে বেড়ে ওঠে এবং শিক্ষার যে সুযোগ পায়, সেভাবেই তাঁর ছেলেমেয়েরা বড় হয়েছে। প্রথম মেয়ে রিজিয়া খানমের বিয়ে হয় পাবনা জেলার আইনজীবী আবদুস সবুর সরকারের সঙ্গে। আবদুস সবুর আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএ ও এলএলবি ডিগ্রি লাভ করেন। ছোট মেয়ের বিয়ে হয় টাঙ্গাইলের প্রভাবশালী ব্যবসায়ী শামসুল হকের সঙ্গে। শামসুল হক টাঙ্গাইল পৌরসভার চেয়ারম্যান ছিলেন। আবু নাসের খান ভাসানী রাজনীতি করতেন। তিনি এরশাদ আমলে সংসদ সদস্য ও প্রতিমন্ত্রীও ছিলেন। ১৯৯১ সালে তিনি মারা যান।

ভাসানী দ্বিতীয় বিয়ে করেন টাঙ্গাইলের দিঘুলিয়া গ্রামের আবদুর রহমান মীরের কন্যা আকলিমা খাতুনকে। জমিদারবিরাধী আন্দোলনের কারণে ব্রিটিশ সরকার তাঁকে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে টাঙ্গাইল ত্যাগ করার নির্দেশ প্রদান করেন। তিনি সরকারের নির্যাতনের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তার এক মুরিদকন্যাকে বিয়ে করেন। এ স্ত্রী ছিল অসুস্থ এবং মৃত্যুপথযাত্রী। স্ত্রীর দেখাশোনা ও মক্তবের সম্পত্তি সংরক্ষণের জন্য তাঁকে টাঙ্গাইল থাকতে হবে এ আর্জি জানালে সরকার বাধ্য হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে বহিষ্কার আদেশ প্রত্যাহার করে। বিয়ের ছ'মাস পরে এ স্ত্রীর মৃত্যু হয়। ভাসানীর দ্বিতীয় বিয়ে ছিল 'রাজনৈতিক বিয়ে', কারণ এ বিয়ে না করলে তাঁর টাঙ্গাইলে থাকা সম্ভব হতো না।

মওলানা ভাসানী তৃতীয় বিয়ে করেন বগুড়া জেলার আদমদিঘি থানার কাঞ্চনপুর গ্রামের মোহাম্মদ কাসেম আলী সরকারের আদুরে কন্যা হামিদা খানমকে। কাসেম আলী ভাসানীর চেয়ে ১৮ বছরের ছোট ছিলেন। বিয়ের সময় হামিদা খানমের বয়স ছিল ১৩ বছর। হামিদা খানমের গর্ভে এক ছেলে, দুই মেয়ে— আবু বকর খান ভাসানী,

আনোয়ারা খানম ও মনোয়ারা খানম। আনোয়ারা খানমের বিয়ে হয় নওগাঁর মোতাহার হোসেনের সঙ্গে। তিনি জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হন। দ্বিতীয় মেয়ে মনোয়ারা খানমের বিয়ে হয় নওগাঁ জেলার বালীনগর থানার করজ গ্রামের মোজাহার হোসেনের সঙ্গে। মোতাহার ও মোজাহার আপন দুই ভাই।

তৃতীয় স্ত্রী ভুরুঙ্গামারীর বাড়িতে থাকতেন। ১৯৬৪ সালের ২৮ ডিসেম্বর এখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। প্রথম স্ত্রী আলেমা ভাসানী দীর্ঘদিন জীবিত ছিলেন। তিনি ১৯৯৯ সালে সন্তোষের বাড়িতে মৃত্যুবরণ করেন।

মনিরুজ্জামান খান ভাসানী বলেন, তার দাদা তাদের উপদেশ দিয়ে গেছেন– "যদি কিছু শিখতে চাও, তবে গ্রামে যাও। জীবনে সফল হতে হলে সবচেয়ে দারিদ্র্য-ক্ষুধাপীড়িত এলাকা থেকে উঠে আসো।" দাদার এ উপদেশ পালনের জন্যই অতি সাদামাটা গ্রামীণ জীবনযাপন করছেন বলে জানালেন ভাসানী নাতি। দরগার সামনের ছোট একটা পুকুর। সে পুকুরের সামনে দাঁড়িয়ে নাতি জানালেন, দাদা নিজে মাটি কেটে এ পুকুর তৈরি করেছেন মুরিদানদের ওজু, গোসলের সুবিধার জন্য। বাড়ি থেকে বের হতে গাছে ঝুলানো পুরনো জীর্ণ-শীর্ণ একটা সাইনবোর্ড চোখে পড়ল। তাতে লেখা– 'খোদা-ই-খেদমতগার' মওলানা ভাসানীর আদর্শে মেহনতি ও মজলুম মানুষের সার্বিক উন্নয়নমূলক সংস্থা। জানা গেল, এটি মওলানা ভাসানীর শেষ জীবনে প্রতিষ্ঠিত একটি অরাজনৈতিক সংস্থা। স্রষ্টার সৃষ্টিজীবের সেবাই এর প্রধান উদ্দেশ্য। সাইনবোর্ডের বেহাল দশাই বলে দিচ্ছিল মওলানা ভাসানীর মহৎ উদ্যোগগুলো কিভাবে ধুঁকছে প্রতিনিয়ত অস্তিত্বের সন্ধানে।

দরগায় ১৭ নভেম্বর প্রতি বছর ওরসের আয়োজন চলে। সীমান্তের এপার-ওপার থেকে ভক্তকুল আসেন দরবারে। আশি পেরিয়ে যাওয়া এক মুরিদের সাক্ষাৎ পাওয়া গেল পাশের বাড়িতে। বয়সের ভারে একেবারে নুয়ে পড়েছেন এ মুরিদ। ভাঙা ভাঙা অস্পষ্ট কণ্ঠে বললেন, আমার পীর কেবলার কথা কী বলব, তিনি যা বলতেন, যা চাইতেন তাই করতে পারতেন। একসঙ্গে কয়েক স্থানে একই সময়ে সভা করতেন, না খেয়ে থাকতে পারতেন দিনের পর দিন। ভাসানী হুজুরের ভুরঙ্গামারীর এ বাড়ি আমার হাতেই পত্তন হয়। আসাম থেকে তিনি আমাকে পাঠান এখানে বাড়ি করার জন্য। আমার আদি বাড়ি আসামেই। মুরিদ হিসেবে কি আমলের নির্দেশ পেতেন আপনি? এ প্রশ্নের উত্তরে বললেন, বাতিনী কিছু আমল আছে, সেটা বলা যাবে না। প্রকাশ্য আমল বলতে নামাজ, রোজা, কোরআন তেলাওয়াত, জিকির, দোয়া ইত্যাদি ছিল। ভাসানী মুরিদ তাঁর পীরের হাত ধরে আসাম থেকে এখানে এসে বসতি গাড়েন। সেই গ্রামে এরকম অনেক ব্যক্তি আছেন, যারা মওলানা ভাসানীর সোহবত পেতে বাংলাদেশে এসে এখানেই থেকে গেছেন।

মানুষ শেকড়কে আঁকড়ে ধরে কখনো বিফলে যান না, তার একটা জ্বলন্ত প্রমাণ হয়ে আছেন মওলানা ভাসানী। ভাসানীর আদি বাড়ি তারই চাক্ষুষ প্রমাণ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সীমান্তের গা ঘেঁষে থাকা এ গ্রামটিতে। সবিনীত বিদায় জানালেন শেকড় আঁকড়ে থাকা ভাসানী নাতি মনিরুজ্জামান। ভুরুঙ্গামারীর ভাসানী বাড়ি থেকে এবার যাত্রা হবে



ভাসানীর আদি বাড়ি ভুরুঙ্গামারীর মসজিদ। ইনসেটে মওলানা ভাসানীর ব্যবহৃত ঐতিহাসিক বেতের টুপি

টাঙ্গাইলের ভাসানী বাড়িতে। সেখানেই আছেন মনিরুজ্জামানের আরো দুই ভাইসহ বাবা, চাচা। ভুরুঙ্গামারী ছাড়ার আগে মাওলানা শামছুল হকের মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত বর্তমানে কাঁটাতারের বেড়া দেয়া বাঘভাণ্ডার সীমান্ত অঞ্চল দেখে এলাম শামছুল হককে সঙ্গে করে।

টাঙ্গাইলের সন্তোষে শান্তির ভুবন

শান্তি আর স্বপ্নের সাধকে আস্বাদনের মিলনমেলা টাঙ্গাইলের সন্তোষে আমরা দু'জনে গিয়ে পৌঁছলাম পরদিন বিকেলে। এখানে আবার ভিন্ন জগৎ, ভিন্ন ভুবন। হাজারও ভক্তের পদচারণায় মুখরিত এখানকার দরবার হল। এখানেই শুয়ে আছেন আমাদের মহান নেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। মাজার শরীফ ও দরবার হলকে কেন্দ্র করে প্রাণচঞ্চল পুরো ভুবন। আসন্ন ওরসকে কেন্দ্র করে সাজসাজ রবে জেগে উঠছে মহান নেতার স্বপ্নে ঘেরা দরবার হল, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়-কলেজসহ গোটা পরিবেশ। মাজার-মসজিদ প্রবেশ পথে দুলছে 'চরভাসানের মওলানা তোরণ' স্লোগানের তোরণ। মাজারে পাশাপাশি শুয়ে আছেন মওলানা ভাসানী ও আলেমা ভাসানী। মাজার কক্ষে ছোট দুটি ঘর। যার একটি কুঁড়েঘর। এ দু'টি ঘরে বসেই মওলানা ভাসানী ইবাদত করতেন। ছনের ছাউনিতে তৈরি কুঁড়েঘর লম্বায় ১১ হাত। প্রস্থে ৭ হাত। কুঁড়েঘরের সামনেই লেখা আছে মওলানা ভাসানীর অবিসংবাদিত বাণী– 'যে কৃষক-মজুর, কামার-কুমার, জেলে-মাঝি, তাঁতি-মেথর প্রভৃতি মেহনতি মানুষের মুক্তির স্বপ্ন দেখিয়াছি ও সেজন্য সংগ্রাম করিয়াছি তাহা আজও সুদূর পরাহত রহিয়া গিয়েছে। তাই আমার সংগ্রামের শেষ নাই।'

মাজার শরীফের কিছুটা দূরে আছে বড় দরবার হল। ওরসে এখানে লোক সমাগম হয়। পীর ভাসানীর গদিনসীন তাঁর ছেলে আবু বকর খান ভাসানী বর্তমান পীর হিসেবে ওরস পরিচালনা করেন। দরবার হলের সামনেই বড় সাইনবোর্ডে লেখা 'আমার আত্মকথা'। দরবার হল নিজেই নিজের পরিচয় দিয়ে বলছে–

"আমার আত্মকথা

আমার নাম দরবার হল। এ নাম রেখেছেন আমার নয়নমণি মওলানা ভাসানী। কি শ্রম আর কি যত্নেই না তিনি আমাকে গড়েছেন। ১৯৭০ সনের এপ্রিল হতে আগস্ট, এ ৫ মাসে, আমার ৮ চাল গড়া হয়। আমার সবটুকুই তাঁর। স্টেজটি বিশেষ করে তাঁর এ স্টেজে বসে তিনি আমাকে ধন্য করেছেন বহুবার। তাঁর সুঘ্রাণ আজও আমি পাই। ১৩৯০ হিজরি ৬ রজব অর্থাৎ ১৯৭০ সনের ৮ সেপ্টেম্বর বিশাল কৃষক সমাবেশ আর জিকির মাহফিলের মাধ্যমে তিনি আমাকে উদ্বোধন করেন। ১৯৭১ সনের ৯ জানুয়ারি আমার দরবারে হয় স্বাধীন বাংলাদেশের লক্ষ্যে প্রথম সর্বদলীয় সম্মেলন। ১৯৭১-এর ২৭ ফেব্রুয়ারি সন্তোষ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে জাতীয় শিক্ষা ও কৃষ্টি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তারপর শুরু হয় মহান মুক্তিযুদ্ধ। তখন পাকিস্তানি সৈন্যরা আমাকে পুড়িয়ে ফেলতে একাধিকবার ব্যর্থ চেষ্টা করে। দেশ স্বাধীন হয়। দীর্ঘ ১০ মাস পর আমার নয়নমণিকে আমি প্রাণ ভরে দেখি। তারিখটি ২২/০১/১৯৭২। আবার আমার অভ্যন্তরে সভা-সমাবেশ শুরু হয়। ১৯৭৩-এ তিনি আমাকে ১৬ চালার কাঠামোয় রূপদান করেন। এবারে হয় জোয়ান শিবির সম্মেলন, শিক্ষা সম্মেলন, ন্যাপ ও কৃষক সমিতির সম্মেলন। সে আমলে যিনি রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন ১৯৭৫-এর ৮ মার্চ তিনি এসে এ দরবারে হাজির। শুনলাম তাঁর নাম শেখ মুজিবুর রহমান। আমার নয়নমণি তাকে খুব আদর করলেন, সম্মান দেখালেন, তাঁকে এখানেই খাওয়ালেন। ১৯৭৬-এর ২৭ ফেব্রুয়ারি জানলাম নয়নমণি পিজি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ১৬ মে শুনলাম, অসুস্থ অবস্থায়ই লাখো মানুষের মিছিল নিয়ে তিনি ফারাক্কার পথে। মহাবিদ্রোহী রণক্লান্ত হয়ে শেষবারের মতো আমার স্টেজে এসে বসলেন ১৩ নভেম্বর ১৯৭৬। হাজার হাজার ভক্ত অনুসারীর জমায়েতে তিনি বিদায় নিলেন, আর বললেন, তোমরা জেহাদ করে মানুষের অধিকার নিয়ে বেঁচে থেকো। ১৭ নভেম্বর সন্ধ্যা-রাতে আমি কেঁপে উঠলাম। নয়নমণি আর বেঁচে নেই। সারাদেশে সে কি মাতম! ১৮ নভেম্বর বিকেলে তিনি আমার মুখোমুখি সমাহিত হলেন। সেই হতে অন্তরে হাহাকার, নিঃশব্দ কান্না নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। আমার দরবারে আজো সমাবেশ মাহফিল অনুষ্ঠান ইত্যাদি হয়। কিন্তু একটি মানুষ নেই বলে সবকিছুই যেন জ্যোতিহীন মনে হয়। তাই ভাবি, 'আর কি ফিরে পাব সে জীবন!'

পথিক! পাঠক!! আমার প্রিয় কবিতার কিছু ছত্র তোমাকে শুনাই।

ব্যস্ত কিষাণ শুনেছ কি চর ভাসানের মওলানা নেই
ক্লান্ত মজুর শুনেছ কি তোমার নেতা হারিয়ে গেছে
গুমরে ওঠা বুকের ব্যথা বলবে না কেউ আর কোনোদিন
বিদ্রোহী সে কণ্ঠ যে হায় স্তব্ধ হল আজকে নিজেই।"

ভাসানীর স্বপ্ন ভুবনে কী নেই বলুন! হেফজখানা, মাদরাসা, স্কুল, কলেজ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়– সবই এখানে আছে। আরো আছে ভাসানী রিসার্চ


ভাসানীর ছেলে আবু বকর ছিদ্দিক খান ভাসানী এবং দুই নাতি হাসরত খান ভাসানী ও আজাদ সোবহান খান ভাসানী

সেন্টার, জাদুঘর, লাইব্রেরি। জাদুঘরের পাশে আছে পুরনো এক ট্রাক্টর। যেখানে লেখা 'এ ঐতিহাসিক ট্রাক্টর ১৯৬৭ সনে মহাচীনের মহান নেতা মাও সে তুং মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানীকে উপঢৌকন হিসেবে দান করেন'। মওলানা ভাসানী যে স্বপ্ন নিয়ে বুনেছেন আপন ভুবন তা কতটা আশার আলো জ্বালিয়েছে, ভাসানী প্রজন্ম ভাসানীকে কিভাবে লালন করে চলেছেন– এসব জানতে চলছি এখন ভাসানী পরিবারের দ্বারে। ব্যক্তি ভাসানী, রাজনীতিবিদ ভাসানী, ধর্মীয় নেতা ভাসানী, মহান মুক্তিযুদ্ধে ভাসানী প্রভৃতি পরিচয়ে পরিচিত হতে হাজির হলাম ভাসানী বাড়ি।

ভাসানী পরিবারে খোঁজে পাওয়া নতুন ভাসানী

'মাওলানা (হবে 'মওলানা'। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এ অজ্ঞতা নিয়ে ভাসানী নাতিরা ক্ষোভ প্রকাশ করলেন) ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়'-এর নতুন নির্মিত সুরম্য দেয়ালের পাশ ঘেঁষে ভাসানী পরিবার যে বাড়িতে থাকেন সেখানে যেতে চাইলাম। প্রথমে ঠিক বুঝেই উঠতে পারিনি এখানে ভাসানী পরিবার থাকেন। সাধারণ মানের টিনের চৌচালা ঘর বড্ড বেমানান বড় পাকা দেয়ালের বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশে। কিন্তু ভাসানী পরিবার রুক্ষ কর্কটময় ক্রঙ্কিট দেয়ালের জঞ্জাল থেকে কতটা যে মুক্ত বাতাসে বিকশিত তা অনুভব করা গেল ভাসানী বাড়িতে পৌঁছার পর। চাকচিক্য, জৌলুসের লোভনীয় কুৎসিত অবয়ব ভাসানীর কাছে যেভাবে হার মেনেছে, হয়তোবা ঠিক সেভাবেই পরাজয় বরণ করেছে তাঁর পরিবারের কাছে। গ্রামীণ জীবনের সবটুকু সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে ভাসানী পরিবারকে ঘিরে। প্রথমেই দেখা হলো– মওলানা ভাসানীর কনিষ্ঠ নাতি আজাদ খান ভাসানীর সঙ্গে। তাঁর দাদা মওলানা ভাসানী সম্পর্কে কি জানেন তিনি— তাই ছিল আমাদের প্রথম জিজ্ঞাস্য। আজাদ খান ভাসানী ধীরে ধীরে বলতে থাকলেন নিজ দাদার গৌরবময় সব ইতিকথা। তার ভাষায়, আমার দাদার পূর্ব পুরুষদের বাস ছিল বাগদাদে। ব্যবসার উদ্দেশ্যে মূলত বাংলাদেশে আসা হয়। কলকাতায় ছিল পূর্বপুরুষদের জুতার মূল ব্যবসা। সিরাজগঞ্জে যমুনা নদী তীরে খোলা

হয় জুতার নতুন দোকান। সেই সূত্রে সিরাজগঞ্জে বসবাস করতে থাকেন দাদার পূর্বপুরুষ। সিরাজগঞ্জের ধানগড়া গ্রামে ১৮৮০ সালে জন্ম দাদার। হাজী শরাফত আলী খানের চার সন্তানের অন্যতম আবদুল হামিদ খান ওরফে চেগা মিয়া। ছোটবেলা থেকেই অন্য আট-দশটা ছেলের চেয়ে আলাদা ছিলেন তিনি। তখন ধোয়া গানের আসর বসত এ অঞ্চলে। এ গানের প্রতি অকৃত্রিম দুর্বলতা ছিল তাঁর। গান গাইতেন, গান করতেন, গান শুনতেন। এমনি এক খেয়ালি ছেলেবেলায় একদিন বাবার বকুনি খেয়ে হেঁয়ালি মনে বেরিয়ে পড়লেন সিরাজগঞ্জের জন্ম ভিটা থেকে। ময়মনসিংহের কলপা গ্রামে এসে দেখা পেলেন ইসলাম প্রচাররত শাহ নাসির উদ্দিন বোগদাদীর। তাঁর সান্নিধ্যই ভাসানীকে করে তোলে ধর্মীয় আধ্যাত্মিকতায় মহীয়ান। বাবা মারা গেছেন এ সংবাদ জানার পর শাহ নাসির উদ্দিন বোগদাদীর সঙ্গী হয়ে চলে যান আসামে। দীর্ঘ আঠারো বছর বোগদাদীর সহচর হিসেবে কাজ করার মধ্য দিয়ে নিজেকে সত্যিকার একজন ধর্মপ্রেমিকরূপে গড়ে তোলার সুযোগ পান। শাহ নাসির উদ্দিন বোগদাদী ভাসানীর আগ্রহ ও প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে তাকে উচ্চতর ধর্মীয় শিক্ষা দেয়ার লক্ষ্যে পাঠিয়ে দেন 'দেওবন্দ মাদরাসায়'। সেখানে মওলানা ভাসানী ইসলামী দর্শনের দিক্ষা নেন। এই দিক্ষাই তার মাঝে সত্যিকার মজলুম জননেতা হিসেবে আত্মপ্রকাশের বীজ রোপণ করে দিয়েছিল। দেওবন্দ মাদরাসার শিক্ষক আল্লামা আজাদ সোবহানী ভাসানীর মনে জাগিয়ে দিয়েছিলেন এই চিরন্তন চেতনা– দুঃখী মানুষের জন্য কাজ করতে না পারলে সমাজে শোষণ থেকে যাবে, শোষিত সমাজে ইসলাম চর্চা করা যায় না। শোষণ আর ইসলাম একসঙ্গে চলতে পারে না। আল্লামা আজাদ সোবহানী, মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী প্রমুখ ভারত বিখ্যাত ইসলামী মনীষীর সোহবতে পূর্ণাঙ্গ ধর্মীয় জ্ঞান সাধক হওয়ার মর্যাদা লাভ করেন মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। মূলত দেওবন্দ মাদরাসায় অধ্যয়নকালেই সামাজিক জীবনের কঠিন বাস্তবতা ও ইসলামী জীবন দর্শনের সুমহান শিক্ষা সম্পর্কে তিনি ব্যাপক জ্ঞান লাভ করেন। এরই ভিত্তিতে গড়ে ওঠে ভাসানীর পরবর্তী রাজনৈতিক ও ধর্মীয় জীবন চেতনা।

মওলানা ও ভাসানী উপাধি পাওয়ার গল্পটাও কম মজার নয়। বাবার কাছ থেকে শোনা নাতি আজাদ খান ভাসানী গল্পচ্ছলেই বললেন ঘটনাটা। মওলানা ভাসানী দেওবন্দ মাদরাসা পাস করে আবার ফিরে এলেন শাহ নাসির উদ্দিন বোগদাদীর খেদমতে। গুরু-শিষ্য মিলে নেমে গেলেন ধর্ম প্রচারে। যুবক ভাসানী দিনে মাঠে কাজ করতেন জীবিকার তাগিদে আর রাতে মানুষকে ধর্ম, সাম্য শিক্ষা দিতেন শোষণমুক্ত সমাজ গড়ার প্রেরণায়। ধীরে ধীরে নাম ছড়িয়ে গেল আবদুল হামিদ খানের। গরিবের ভাষায় গরিবকে বোঝানোর অমীয় ক্ষমতা দ্রুত জনপ্রিয়তার আসনে নিয়ে যায় তাকে। আসামের ঘাগমারির ভাসানচর নতুন করে ভেসে ওঠা চর। এখানেই বসতি গড়ে ইসলাম প্রচারের দায়িত্ব পেলেন ভাসানী। একদিন এক বিশাল গণজমায়েতের আয়োজন করা হলো। প্রধান বক্তা আবদুল হামিদ খান ভাসানী সেখানে এক হৃদয়স্পর্শী বক্তৃতা দিলেন। সেই থেকে জনপ্রিয়তায় আর পিছিয়ে যেতে হয়নি তাকে। লোকমুখে ভাসানচরের মওলানা নামে পরিচিত হয়ে যান দেশে দেশে। সেদিনের ভাসানচরের মওলানা থেকেই মওলানা ভাসানী। গুরুর আদেশে ভাসানচরের ঝোপঝাড় পরিষ্কার

করে গড়ে তুলেন বসতি। তৈরি হয় হাজারও ভক্তকুল। মুরিদানরা গড়েন খানকা। চলে ধর্ম শিক্ষার আসর। ধর্মে-কর্মে পরিপূর্ণ মহানায়ক হয়ে ওঠেন মওলানা ভাসানী। মুরিদানদের নিয়ে গড়ে তোলেন কৃষক আন্দোলন, ভূমি অধিকার আন্দোলন, জমিদারবিরোধী আন্দোলন। মুরিদানদের অধিকার আদায়ে সক্রিয় হয়ে ওঠেন রাজনীতিতে। যোগ দেন মুসলিম লীগে। সেই যৌবনেই ক্ষমতার মোহ বশ করেছেন তিনি। সে সময়েই মুসলিম লীগের হয়ে নির্বাচন করে পার্লামেন্টে যান। একদিন মাত্র ছিলেন পার্লামেন্টে। পার্লামেন্ট থেকে ফিরে বললেন, 'এই ক্ষমতার রাজনীতির পার্লামেন্টকে আমি লাথি মারি'।

আজাদ খান ভাসানী নিজ দাদা সম্পর্কে এত গভীর জ্ঞান রাখেন তা ভাবতেই অবাক লাগে। এসব গুরুত্বপূর্ণ জানা-অজানা তথ্য তিনি তার বাবার কাছ থেকে পেয়েছেন বলে জানালেন সবে মাত্র মাস্টার্স পাস করা ভাসানী নাতি। আলোচনা জমে ওঠার এই ফাঁকে আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন তারই বড় ভাই হাসরত খান ভাসানী। এবার জানতে চাইলাম টাঙ্গাইলে কিভাবে এলেন মওলানা ভাসানী। এখানেও একটা মজার গল্প তুলে ধরলেন আজাদ খান ভাসানী। বললেন, দাদার পীর শাহ নাসির উদ্দিন বোগদাদী বার বার বাংলায় আসার সুবাদে আগে থেকেই জানতে পেরেছিলেন, টাঙ্গাইলে হিন্দু জমিদাররা মুসলমানদের জায়গা দখল করে নিয়েছে। সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময় সন্তোষে বাস করত একজন বড় পীরে কামিল। পীর হজরত শাহজামান (রহঃ)। তাঁর দোয়ায় অসুস্থ আওরঙ্গজেব একবার ভালো হয়ে ওঠেন। আওরঙ্গজেব এই পীরে কামিলের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে এখানে একটি ইসলামী মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। মিশনের নামে পুরো ১৪৫০ একর জায়গা বরাদ্দ ছিল। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইন করে জায়গাটা হিন্দু জমিদারদের দিয়ে দেন। হিন্দু জমিদাররা স্থানীয় কৃষকদের ওপর শোষণ করে নিজেদের জমিদারি টিকিয়ে রাখেন। এ ঘটনা ভাসানীকে জানিয়ে শাহ নাসির উদ্দিন বোগদাদী তাকে এখানে পাঠান ইসলাম প্রচার ও শোষিত কৃষকের হয়ে আন্দোলন করার জন্য। মওলানা ভাসানী যথারীতি তার অদম্য সাহসিকতা দিয়ে সব কিছু মোকাবেলা করেন। হিন্দু জমিদারের বাড়ির পাশ দিয়ে জুতা পায়ে ছাতা মাথায় দিয়ে হাঁটা নিষিদ্ধ ছিল। মওলানা ভাসানী শুধু জমিদার বাড়ির পাশ দিয়ে হাঁটলেন-ই না, মুসলমানদের হাত থেকে দখল হওয়া জমিদার বাড়ি উদ্ধারের পদক্ষেপও নিলেন। পুরনো দলিলপত্র ঘেঁটে বের করলেন সত্যিই এ ১৪৫০ একর জমি ছিল মুসলমানদের। কোলকাতা আদালতে মামলা ঠুকে দিলেন তিনি। দিগ্বিদিক হারিয়ে ব্রিটিশ সরকার নতুন ফাঁদ পাতলেন। ভাসানীকে বললেন, তুমি মামলা করার কে? তুমি তো টাঙ্গাইলের নাগরিকই নও? আইনী বৈধতা প্রমাণ করার জন্য তাঁর এক অসুস্থ মুরিদ কন্যাকে বিয়ে করলেন তিনি। এ বিয়ে না হলে ব্রিটিশ সরকার তাকে আসামে পাঠিয়ে দিত। বৈবাহিক সূত্রে নাগরিক হওয়ার পর আন্দোলন তীব্র করে তুললেন। কোলকাতা আদালতে আইনি লড়াইয়েও জয়ী হলেন। ভাসানী মুরিদদের তীব্র আন্দোলনের মুখে জমিদার বাড়ি ছাড়তে হলো শোষকশ্রেণীর।

বাঙলা দেশ

বর্ষ ১ ॥ সংখ্যা ৪ | কলিকাতা, শুক্রবার, ২১শে মে ১৯৭১ | দামঃ ৩০ পয়সা

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতিঃ বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

ভাসানী কলকাতাতেই অন্তরীণ, কিন্তু সরকার নীরব !

দিশেহারা পুত্র পিতার খোঁজে কেঁদে কেঁদে ফিরছেন

(রাজনৈতিক সংবাদদাতা)

মওলানা ভাসানীকে কলকাতায় অন্তরীণ করে রাখার সংবাদ এপার বাংলার সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে দারুণ উদ্বেগ ও উত্তেজনার সৃষ্টি করেছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, বিশেষ করে যুব ও ছাত্র সংগঠন এই সংবাদে অত্যন্ত বিচলিত এবং এ-সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহের জন্য তাঁদের চেষ্টার বিরাম নেই।

ভাসানী কোথায় এবং কিভাবে আছেন জানতে চেয়ে মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট নেতা শ্রীহরেকৃষ্ণ কোঙার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় যে প্রশ্ন করেছিলেন, তার উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী যা বলেছেন, তাতে উদ্বেগের অবসান তো হয়-ই নি, অনেক মহলে বিভ্রান্তি বেড়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য এই যে, সংবাদটি জানাজানি হবার পর কোনো একটি স্বার্থসংশ্লিষ্ট মহল থেকে তৎপরতার সঙ্গে প্রচার করা হয় যে, মওলানাকে বাংলা দেশের কোন এক জায়গায় মুক্ত অবস্থায় দেখা গিয়েছে। অথচ মাত্র কয়েকদিন আগে বাংলা মন্ত্রিসভার জনৈক প্রভাবশালী সদস্য মওলানার এক অন্তরঙ্গ সহকর্মীকে জানান যে, মওলানা ভাসানী কলকাতায় এসেছেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার একজন বিশিষ্ট সদস্যও মওলানার সহকর্মীকে একই কথা বলেছিলেন।

আর একটি নির্ভরযোগ্য মহল থেকে বলা হয়েছে যে, মওলানা ভাসানী কলকাতায় তাঁর পুত্র ও পুত্রবধূর সন্ধানে এসেছিলেন, কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে অন্যায়ভাবে সন্দেহ করা হয় যে, তিনি কিছু ভিন্ন মতাবলম্বী রাজনৈতিক কর্মীর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। তারপর থেকে তিনি অন্তরীণ।

যাতে তিনি সর্বসমক্ষে উপস্থিত হতে না পারেন সেই জন্যই নাকি এই ব্যবস্থা। সংবাদে আরও বলা হয়েছে যে, এখানেও

(১৬র পাতায় দেখুন)



১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় বাংলাদেশের সমর্থনে লণ্ডনের হোয়াইট হলে বিক্ষোভরত লুলু বিলকিস বানু, ফিরোজা বেগম প্রমুখ

একাত্তরে কলকাতা থেকে প্রকাশিত একটি পত্রিকা

মওলানা ভাসানীর ইসলামী সমাজতন্ত্র!

মওলানা ভাসানীর রাজনৈতিক দর্শন নিয়ে আলোচনা শুরু হতেই দুই নাতি বললেন, মওলানা ভাসানীকে যেভাবে বই ও গণমাধ্যমে উপস্থাপন করা হয় ঠিক সেই ধারার লোক ছিলেন না তিনি। আমাদের দাদার প্রথম পরিচয় হলো তিনি একজন ধর্মীয় নেতা। লাখ লাখ মুরিদ ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল দেশের বিভিন্ন প্রান্তে। মওলানা ভাসানীর রাজনৈতিক দর্শন ছিল 'হুকুমতে রাব্বানি'। মহান রবের হুকুমত প্রতিষ্ঠাই ছিল মূল কথা।

তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, মানুষের দ্বারাই মানুষ শোষিত, বঞ্চিত, নির্যাতিত হচ্ছে। ক্ষমতার মোহ মানুষকে শোষণের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। তাই সকল হুকুমত হবে মহান আল্লাহর। সব মানুষ হবে সমমানের সমক্ষমতার। মানুষে-মানুষে কোনো ভেদাভেদ থাকবে না। শোষণ থাকবে না, বঞ্চনা থাকবে না, অর্থনৈতিক বৈষম্য থাকবে না। এমন একটি সমাজের স্বপ্ন দেখতে গিয়ে তিনি রাজনীতিতে আসেন। তার এই রাজনৈতিক ভাবনা সমাজতান্ত্রিক রাজনৈতিক ভাবনার সঙ্গে কিছুটা মিলে যায় বলে এটা বলা যাবে না যে, ভাসানী সমাজতান্ত্রিক ধারায় অনুপ্রাণিত হয়েছেন। ভাসানীর রাজনৈতিক দর্শন ছিল স্বতন্ত্র। প্রচলিত সমাজতান্ত্রিক দর্শনের সঙ্গে একদিক থেকে এর কোনো মিল নেই। সমাজতান্ত্রিক দর্শনে শোষিত মানুষের কথা বলা হলেও সেখানে হুকুমতে রব্বানিয়াত নেই। মানুষের হাতেই ক্ষমতা ঘুরপাক খায়। ফলে চূড়ান্ত পর্যায়ে মানুষ শোষিতই থেকে যায়। ভাসানীর দর্শন হলো মানুষের হাতে ক্ষমতার হাতিয়ার ঘুরপাক খাবে না। আল্লাহই হবেন সকল হুকুমের কেন্দ্রবিন্দু। মানুষ হবে সেই হুকুমের খলিফা বা প্রতিনিধি। আজাদ খান ভাসানী তার দাদার এ দর্শনকে ইসলামী সমাজতন্ত্র বলে উল্লেখ করেছেন। ইসলামী সমাজতন্ত্রের অন্যান্য দর্শনের সঙ্গে প্রচলিত সমাজতন্ত্রের মিল আছে বলে ভাসানী এক সঙ্গে আন্দোলন করেছেন। কিন্তু তিনি হুকুমতে রব্বানিয়াত প্রশ্নে কোনো আপস করেননি। ১৯৬৭-তে মাও সে তুং-এর সঙ্গে চীনে বৈঠকে বসলে সমাজতন্ত্রের নানা দিক নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি সেই বৈঠকেও হুকুমতে রব্বানিয়াতের কথা তুলে ধরেছেন বলে জানালেন অপর নাতি হাসরত খান ভাসানী।

সাংবাদিক ও মানবাধিকার কর্মী শাহরিয়ার কবির লিখেছেন, "মওলানা ভাসানী কম্যুনিস্ট ছিলেন না, যদিও কম্যুনিস্ট চারিত্রিক গুণাবলির অধিকাংশই তাঁর ভেতর ছিল, যে কারণে তিনি মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত কম্যুনিস্টদের একজন অকৃত্রিম বন্ধু ও সহকর্মী ছিলেন। কম্যুনিজমকে পছন্দ করতেন না তিনি একটি মাত্র কারণে– 'তারা ধর্ম মানে না' বলে। মাও সে তুং ও কম্যুনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে চীনের অভাবনীয় সাফল্যে তিনি বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়েছিলেন। এই বিস্ময় ও মুগ্ধতা এবং এদেশের কম্যুনিস্ট বিপ্লবীদের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এ কারণেই সম্ভব হয়েছিল যে, তিনি আন্তরিকভাবেই শোষণহীন সমাজের কথা ভেবেছিলেন। গোটা উপমহাদেশে তাঁর সমসাময়িক বুর্জোয়া, পেটিবুর্জোয়া রাজনৈতিক নেতাদের আর কারো ভেতরই মেহনতি মানুষের জন্য এই দরদ ছিল না। এর ফলে বিভিন্ন সময়ে যখন তাঁর দল ক্ষমতায় গিয়েছে, যখন তিনি বুঝতে পেরেছেন এর দ্বারা শোষিত মেহনতি মানুষের কল্যাণ সাধন করা সম্ভব নয়, তখনই তিনি তার বিরোধিতা করেছেন– তা সে আসাম মুসলিম লীগের সাদুল্লাহ্ মন্ত্রিসভা হোক কিংবা যুক্তফ্রন্টের

ফজলুল হকের মন্ত্রিসভা হোক অথবা আতাউর রহমানের আওয়ামী লীগ কোয়ালিশন সরকারের মন্ত্রিসভাই হোক।"

সাংবাদিক মুন্শী মান্নান লিখেছেন, "ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিতেই তিনি বিশেষভাবে ঘনিষ্ঠ হন বামপন্থিদের সঙ্গে এবং এক পর্যায়ে তিনি কমিউনিস্ট আন্দোলনের নিবিড় সান্নিধ্যে চলে যান। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি কমিউনিস্ট ছিলেন না। এর প্রথম ও প্রধান কারণ অবশ্যই তাঁর ইসলাম সম্পর্কিত ধ্যান-ধারণা। তাঁর বিশ্বাস ছিল প্রকৃত ইসলাম কমিউনিজমের চাইতেও ঢের বেশি বিপ্লবী। এ বিশ্বাস তাঁর এত প্রবল ছিল যে তিনি মাও সে তুং-এর সঙ্গে আলোচনায়ও তাঁর এ বিশ্বাসের কথা ব্যক্ত করেছিলেন নির্দ্বিধায়। নিজে কমিউনিস্ট না হয়েও তিনি কমিউনিস্টদের সঙ্গে কাজ করেছেন, সহযোগিতা করেছেন তাদের দীর্ঘদিন ধরে। কারণ কমিউনিস্টদের মধ্যে সে দিন তিনি দেখেছিলেন নির্যাতিত মানুষের জন্য তাদের মমত্ববোধ, দেখেছিলেন আদর্শের জন্যে আত্মত্যাগের অদ্ভুত প্রবণতা। কিন্তু এ আন্দোলনের গভীরে যখন তিনি প্রবেশ করেন তখন তার মোহ ভঙ্গ হয় চরমভাবে। ইসলামের নামে যারা পাকিস্তানে রাজনীতি করতেন তাদের অধিকাংশের প্রতি তার ছিল সীমাহীন ক্রোধ। কারণ, তারা ধর্মের নামে ব্যবসা করতেন। কমিউনিস্ট আন্দোলনের নিকট সান্নিধ্যে এসে তিনি দেখলেন, এখানেও এক শ্রেণীর লোক সমাজতন্ত্রের নামে নতুন ব্যবসার প্রয়াসী। কমিউনিস্ট আন্দোলন সম্পর্কে তার মোহ ভঙ্গ হলো আর একটি কারণেও। এক শ্রেণীর কমিউনিস্টের মধ্যে তিনি দেখলেন, স্বদেশের চাইতে বিদেশের স্বার্থ রক্ষায় তারা বেশি উদগ্রীব এবং বিদেশী শক্তিগুলোও এদের বিচ্যুতিতে মদদ যোগাচ্ছে। যিনি একদিন বলেছিলেন, আমি সমাজতন্ত্র না দেখে মরব না। তিনি শেষ পর্যন্ত কমিউনিস্টদের ভণ্ডামীতে অতিষ্ঠ হয়ে বলেছিলেন, যখন তোমাদের আশ্রয়স্থল ছিল না তখন আমি তোমাদের আশ্রয় দিয়েছি। এখন তোমরা আর আমাকে না জ্বালিয়ে নিজেদের দল গড়। আমাকে কমিউনিস্ট বানাবার বৃথা চেষ্টা করো না। আমার ইসলাম তোমাদের কমিউনিজমের চেয়ে অনেক বেশি প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক, আমি মুসলমান হিসেবে মরব, কখনো কমিউনিস্ট হবো না।

জীবনের শেষ পর্যায়ে মওলানা গঠন করেছিলেন 'হুকুমতে রব্বানিয়া সমিতি'। এই সমিতির মাধ্যমেই তিনি দেশে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন কমিউনিজমের চেয়ে প্রগতিশীল ইসলামকে, তিনি বিশ্বাস করতেন, মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও খোলাফায়ে রাশেদিনের বিপ্লবী ইসলামই প্রকৃত প্রস্তাবে মানুষের কাঙ্ক্ষিত মুক্তি এনে দিতে পারে। তাঁর এ প্রত্যয় ও অসাধারণ বিশ্বাসের মূলে কাজ করেছে তাঁর সেই বিপ্লবী জীবন দর্শন যা তিনি লাভ করেছিলেন এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তাবিদ ও দার্শনিক আল্লামা আজাদ সোবহানীর কাছ থেকে। এ দর্শন রবুবিয়াতের দর্শন। যার মূল কথা হলো : বিশ্ব পালক যেমন জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে গোটা বিশ্ব মানবতাকে পালন করেন, মানুষের কর্তব্য দুনিয়ায় সেই সার্বজনীন প্রতিপালন ব্যবস্থা কায়েম করা। মওলানা এ দর্শনে তার দীক্ষার কথা স্মরণ করেছিলেন এভাবে—

১৯৪৬ সাল। আসন্ন নির্বাচনের নমিনেশান পেপার সাবমিট করে গোহাটিতে আটকে পড়লাম। আমাকে খুঁজতে খুঁজতে আল্লামা আজাদ সোবহানী সেখানে এসে হাজির।

রাতে দু'জনের দেখা। কথা হলো অনেক। সামনে ধূমায়িত একটা অ্যাশট্রের মধ্যে আমার আঙুল চেপে ধরে আল্লামা সোবহানী বললেন, মনে করো এটাই কাবা শরীফ, এটাকে ছুঁয়ে তুমি প্রতিজ্ঞা করো যে, তুমি রবুবিয়াত কায়েম করবে।"

১৯৭৪-এর মে মাসে এ ব্যাপারে মওলানা ভাসানীর একটি বিবৃতি প্রণিধানযোগ্য। ভাসানী ন্যাপের অভ্যন্তরে 'চরম বাম' ও 'সমন্বয়পন্থি'দের দ্বন্দ্ব চূড়ান্ত রূপ লাভ করে ১৯৭৪ সালের জানুয়ারি মাসে সন্তোষে দলের কাউন্সিল অধিবেশনে। মে মাসের তৃতীয় সপ্তাহে 'চরম বামপন্থিরা দলের তলবি সভা আহ্বান করে এবং মওলানা সম্পর্কে প্রকাশ্য কটুবাক্য উচ্চারণ করে। 'চরম বাম'দের উক্তির জবাবে মওলানা ভাসানী ২৩ মে এক বিবৃতিতে বলেন,

"তথাকথিত বিপ্লবী নামধারী কম্যুনিস্টরা গত ৩০ বছর যাবাৎ আমার ঘাড়ে সওয়ার হইয়া রাজনীতি করিতে চাহিয়াছে, কিন্তু সে আশা তাহারা পূরণ করিতে পারে নাই, কারণ কোনোকালেই আমি কম্যুনিস্ট ছিলাম না এবং বর্তমানেও না। ইনশাআল্লাহ ভবিষ্যতেও হইব না। আমি আজীবন ইসলামের জন্য এবং শোষণ ও জুলুমের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছি। ইনশায়াল্লাহ জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাহাই করিয়া যাইব।

তথাকথিত বিপ্লবীদের আমি আগেও বলিয়াছি, আমার পিছনে কম্যুনিজম প্রচার করিয়া কোনো লাভ হইব না। তোমরা নিজস্ব আদর্শ অনুযায়ী পৃথক সংগঠন গরিয়া তুলিতে চেষ্টা করো। একই ব্যক্তি কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য ও ভিন্ন একটি রাজনৈতিক দলের সদস্য হইয়া সমাজকে ধোঁকা দেওয়া ছাড়া আর কোনো ফল হইবে না।

চিরাচরিত নিয়ম অনুযায়ী আমার ছত্রছায়ায় যাহারা রাজনীতি করে তাহারাই আবার পরে আমাকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে। তাহাতে আমি মোটেই দুঃখিত নই।"

নাতি হাসরত খান ভাসানী আরও জানান, '৪৭-এর পর যখনই বুঝতে পারলেন মুসলিম লীগ দিয়ে হুকুমতে রব্বানী তো নয়ই বরং মানুষ আরো শোষিত, বঞ্চিত হবে তখনই মুসলিম লীগ থেকে বেরিয়ে আসেন তিনি। টাঙ্গাইলে দরগাহ তখন বেশ জমে উঠেছে। সে সময় ১২ থেকে ১৫ লাখ মুরিদ তৈরি হয়ে গিয়েছিল বলে জানালেন হাসরত খান ভাসানী। এরই সুবাদে স্বতন্ত্র রাজনৈতিক দল গড়ার চিন্তার ফসল ছিল আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা। কিন্তু প্রতিবাদসুলভ ভাসানী বিরোধে জড়ান সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে। সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে সখ্য আছে এ অভিযোগ তুলে বেরিয়ে আসেন আওয়ামী লীগ থেকে। এর পরই ১৯৫৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে হয়ে গেল ঐতিহাসিক কাগমারী সম্মেলন। ৫২টা তোরণ নির্মাণ করা হয় এ সম্মেলনকে কেন্দ্র করে। প্রথম তোরণের নাম ছিল মোহাম্মদ (সঃ) তোরণ। আর শেষ তোরণের নাম ছিল কায়দে আজম তোরণ। লক্ষাধিক লোকের সমাগম ঘটেছিল এখানে। দেশি-বিদেশি অতিথিরা এসেছেন, আলোচনা করেছেন। সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে বিরোধের জের ধরে যে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনের সূচনা তারই প্রতিকৃতি হয়ে ওঠে কাগমারী সম্মেলন। পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে এখানেই প্রথম তিনি 'আস্‌সালামু আলাইকুম' বাক্য

উচ্চারণ করেন। এ বাক্যের মাধ্যমেই স্বাধীনতার বীজ রোপণ করে দেন প্রতিটি বাঙালির মনে মওলানা ভাসানী। সময় গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে সেই বীজে বৃক্ষ হলো। ডালপালা ছড়াল। ফল দিতে শুরু করল '৭০-'৭১-এ।

'ওরা কেউ আসে নাই'

'৭০-এর ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়ের পরও রাজনীতিকরা যখন ভোট ভোট খেলায় মত্ত হতে চাইল তিনি তখন ছুটে এলেন ঘূর্ণি দুর্গত মানুষের পাশে। সাহায্যের হাত বাড়ালেন। ফিরে এসে ২৩ নভেম্বর পল্টন ময়দানে জনসভায় ভাষণ দিলেন। পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীকে ইঙ্গিত করে বললেন, 'ওরা কেউ আসে নাই'। '৭০-এর ঐতিহাসিক-এ জনসভা নিয়েই কবি শামসুর রাহমান লিখেছেন তার বিখ্যাত 'সফেদ পাঞ্জাবি' কবিতাটি।

শিল্পী, কবি, দেশী কি বিদেশী সাংবাদিক
খদ্দের, শ্রমিক, ছাত্র, বুদ্ধিজীবী, সমাজসেবিকা,
নিপুণ ক্যামেরাম্যান, অধ্যাপক, গোয়েন্দা, কেরানী
সবাই এলেন ছুটে পল্টনের মাঠে, শুনবেন
দুর্গত এলাকা প্রত্যাগত বৃদ্ধ মৌলানা ভাসানী
কী বলেন, রৌদ্রালোকে দাঁড়ালেন তিনি, দৃঢ়, ঋজু,
যেন মহাপ্লাবনের পর নূহের গভীর মুখ
সহযাত্রীদের মাঝে ভেসে ওঠে, কাশফুল-দাড়ি
উত্তরে হাওয়ায় উড়ে। বুক তার বিচূর্ণিত দক্ষিণ বাংলার
শবাকীর্ণ হু হু উপকূল, চক্ষুদ্বয় সংহারের
দৃশ্যাবলীময়, শোনালেন কিছু কথা, যেন নেতা
নন, অলৌকিক স্টাফ রিপোর্টার। জনসমাবেশে
সখেদে দিলেন ছুঁড়ে সারা খাঁ খাঁ দক্ষিণ বাংলাকে।
সবাই দেখলো চেনা পল্টন নিঃশেষে অতিশয়
কর্দমাক্ত হয়ে যায়; ঝুলছে সবার কাঁধে লাশ
আমরা সবাই লাশ, বুঝি-বা অত্যন্ত রাগী কোনো
ভৌতিক কৃষক নিজের সাধের আপনকার ক্ষেত
চকিতে করেছে ধ্বংস, পড়ে আছে নষ্ট শস্যকণা।

ঝাঁকা মুটে, ভিখারী, শ্রমিক, ছাত্র, সমাজসেবিকা,
শিল্পী, কবি, বুদ্ধিজীবী, দেশী কি বিদেশী সাংবাদিক,
নিপুণ ক্যামেরাম্যান, ফেরিঅলা, গোয়েন্দা, কেরানী
সমস্ত দোকানপাট, প্রেক্ষাগৃহ, ট্রাফিক পুলিশ

ধাবমান রিকশা, ট্যাক্সি, অতিকায় ডবল ডেকার,
কোমল ভ্যানিটি ব্যাগ আর ঐতিহাসিক কামান,
প্যান্ডেল, টেলিভিশন, ল্যাম্পপোস্ট, রেস্তোরাঁ, দপ্তর
যাচ্ছে ভেসে; যাচ্ছে ভেসে ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ বঙ্গোপসাগর
হায়; আজ এক মন্ত্র জপলেন মৌলানা ভাসানী!
বল্লমের মত ঝলসে ওঠে তার হাত বার বার
অতি দ্রুত স্ফীত হয়; স্ফীত হয় মৌলানার সফেদ পাঞ্জাবি।

যেন তিনি ধবধবে একটি পাঞ্জাবি দিয়ে সব
বিক্ষিপ্ত বেআব্রু লাশ কী ব্যাকুল ঢেকে দিতে চান!

এরপর তার মুখ থেকে বেরিয়ে এলো সেই ঐতিহাসিক ঘোষণা, 'আজ হইতে ১৩ বছর পূর্বেই ষড়যন্ত্র, অত্যাচার, শোষণ আর বিশ্বাসঘাতকতার নাগপাশ হইতে মুক্তি লাভের জন্য দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে 'আস্‌সালামু আলাইকুম' বলিয়াছিলাম, হয়তো বঙ্গবাসী সেইদিন নাটকের সব কয়টি অংক বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই। আজ আশা করি, সচেতন ও শুভ বুদ্ধিসম্পন্ন কোনো বাঙালিকে বুঝাইতে হইবে না যে, মানবতাবর্জিত সম্পর্কের মহড়া চূড়ান্ত পর্যায়ে উঠিয়াছে। এইবার নেমেসিসের অন্যায়ের সমুচিত শাস্তি বিধানের অপেক্ষায়ই আমরা আছি। যাহা হইবার তাহাই হইবে। বাঙালি জাতির মুক্তি সংগ্রামকে রুখিতে পারে পৃথিবীতে এমন কোনো শক্তি নাই। সাফল্য আমাদের সুনিশ্চিত'।

১৩ বছর আগে স্বাধীনতার যে স্বপ্ন দেখিয়েছেন ভাসানী, '৭১-এ এসে এখন তাই বাস্তবে রূপ নিল। শুরু হলো মহান মুক্তিযুদ্ধ।

মওলানা ভাসানীর মুক্তিযুদ্ধ

'৭১-এর জানুয়ারি হতে ২৫ মার্চ পর্যন্ত মওলানা ভাসানী সারাদেশে জনসভা করে জনগণকে সশস্ত্র যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। ২৫ মার্চ তিনি সন্তোষে অবস্থান করছিলেন। ২৬ মার্চ পাকবাহিনীর আক্রমণের প্রতিবাদে সারাদেশে যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। ঢাকার খবর জানার জন্য মওলানা ভাসানী তাঁর একান্ত সচিব সৈয়দ এরফানুল বারীকে ৩০ মার্চ ঢাকা পাঠান। তিনি ঢাকার পরিস্থিতি জেনে ২ এপ্রিল মওলানা ভাসানীকে রিপোর্ট পেশ করেন। ইতিমধ্যে দু'জন শ্রমিক নেতা তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করে গেছেন।

৩ এপ্রিল পাকবাহিনী টাঙ্গাইল আক্রমণ করে। আবদুল কাদের সিদ্দিকী টাঙ্গাইলের মাটিয়াচরায় তাদের বাধা দিলে তুমুল যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে ১৬ জন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ এবং পাকবাহিনীর শতাধিক সৈন্য আহত ও নিহত হয়। ৪ এপ্রিল পাকসেনারা মওলানা ভাসানীকে হত্যার জন্য সন্তোষ আক্রমণ করে। তিনি তখন সন্তোষে ছিলেন না। তিনি ছিলেন সন্তোষ থেকে দুই মাইল দূরে বিন্যাফৈর গ্রামে। এ সময় (৩ এপ্রিল) রাশেদ খান মেনন ও হায়দার আকবর খান রনো মওলানা ভাসানীর সঙ্গে যোগাযোগ ও পরামর্শের জন্য কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ ও মুক্তাগাছা হয়ে টাঙ্গাইল আসেন। এর মধ্যে

সোনার বাংলা শ্মশান কেন?

বৈষম্য বিষয়	বাংলাদেশ	পশ্চিম পাকিস্তান
রাজস্ব খাতে ব্যয়	১৫০০ কোটি টাকা	৫০০০ কোটি টাকা
উন্নয়ন খাতে ব্যয়	৩০০০ কোটি টাকা	৬০০০ কোটি টাকা
বৈদেশিক সাহায্য	শতকরা ২০ ভাগ	শতকরা ৮০ ভাগ
বৈদেশিক দ্রব্য আমদানী	শতকরা ২৫ ভাগ	শতকরা ৭৫ ভাগ
কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরী	শতকরা ১৫ জন	শতকরা ৮৫ জন
সামরিক বিভাগে চাকুরী	শতকরা ১০ জন	শতকরা ৯০ জন
চাউল মণ প্রতি	৫০ টাকা	২৫ টাকা
আটা মণ প্রতি	৩০ টাকা	১৫ টাকা
সরিষার তৈল সের প্রতি	৫ টাকা	২.৫০ পয়সা
স্বর্ণ প্রতি ভরি	১৭০ টাকা	১৩৫ টাকা

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় নির্বাচনী প্রচার দপ্তর থেকে আবদুল মমিন কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত।

মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রচারিত একটি বিখ্যাত পোস্টার

খবর আসে পাকবাহিনী টাঙ্গাইলের কাছাকাছি এসেছে। ভাসানী বিন্যাফৈরে ছিলেন। মেনন ও রনো বিন্যাফৈরে মওলানার সঙ্গে দেখা করেন। ৪ তারিখে পাকবাহিনী সন্তোষে মওলানার বাড়িঘরে আগুন দেয় এবং অনেককে হত্যা করে। রাশেদ খান মেনন স্মৃতিচারণে বলেছেন :

"জিজ্ঞেস করলাম, হুজুর কি করবেন। কাগজ আর কলম হাতে নিয়ে বললেন, উথান্টের (জাতিসংঘের মহাসচিব) কাছে একটা টেলিগ্রাম লেখ। এর মাঝেই দেখা গেল পাকসেনারা সন্তোষের বাড়িতে আগুন লাগিয়েছে। সব মাটির ঘরবাড়ি হলেও মূল কাঠামো থেকে ধোঁয়া উঠছে। উৎকণ্ঠিত প্রশ্ন আমাদের, হুজুর সরে যাবেন না? কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, যেতে হলে ভারতে যেতে হয়। নেহরু আমার বন্ধু ছিল। ইন্দিরা আমাকে আদর করে রাখবে। কিন্তু সুভাষও দেশ ত্যাগ করে কিছু করতে পারেনি।... বললেন, বাইরে গিয়ে দেখ তো সন্তোষের ধোঁয়া দেখা যায় কি-না। কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে দেখি মওলানা নেই। একটু উঁচু করে লুঙ্গি ধরে মওলানার একাকী মূর্তি দূরের ধানক্ষেত দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে।"

ভাসানী পাশের গ্রামে আশ্রয় নেন। তাঁর স্ত্রী, ছেলেমেয়ে, নাতি-নাতনি চরে আশ্রয় নিয়েছে। ভাসানীর সব ঘর পুড়িয়ে ফেলেছে। একটি আওরঙ্গজেবের হাতের লেখা কোরান শরীফ পুড়ে গেছে। পাকসেনারা তাকে খুঁজছে এবং জিজ্ঞেস করছে– 'কাফের ভাসানী কোথায়।' ৫ এপ্রিল টাঙ্গাইলের গ্রামে হত্যা ও অগ্নিসংযোগ চলে। ৬ এপ্রিল বিকেল ৪টায় নিরাপদ স্থান থেকে জরুরি কারণে বিন্যাফৈর গ্রামে আসতে হয়েছিল। নানা কৌশলে পাকবাহিনীর দৃষ্টি এড়িয়ে কোষ নৌকায় ১০ এপ্রিল সিরাজগঞ্জে পৌছেন। সিরাজগঞ্জ ন্যাপ (মোজাফফর) সভাপতি সাইফুল ইসলামকে সংবাদ দেন। তিনি যমুনা ঘাটে নৌকায় মওলানার সঙ্গে দেখা করেন। ভাসানী তাকে বললেন তাঁর সঙ্গে ভারতে যেতে হবে। তিনি অন্য দলের হলেও ভাসানীর ভক্ত। নৌকায় উঠলেন। ইতোমধ্যে মোরাদুজ্জামানও নৌকায় উঠেছে। তারা নৌকায় রংপুর হয়ে ব্রহ্মপুত্র দিয়ে আসাম যাবেন।

মার্চের শেষে পাক-সীমান্ত চৌকি প্রায় শূন্য হয়ে পড়ে। কাজেই অতি সহজে সীমান্ত অতিক্রম সম্ভব। মওলানা ভাসানীকে রংপুর জেলার নামাজের চরে এক মুরিদের বাড়িতে রেখে সাইফুল ইসলাম ও মুরাদ ভাসানীর নির্দেশে তার মুরিদ আসাম সীমান্তের সামাদের বাড়ি পৌছেন। সামাদ তাদের নিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতের বাড়ি যান। তিনি ভাসানীকে সীমান্তের এপার আনতে সাহস পাননি। কারণ তিনি আওয়ামী লীগার নন। আসাম সরকার ভাসানীর ওপর খুশি নয়। কারণ তিনি আসামকে পূর্ব বাংলার অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছিলেন। সামাদ তাদের জানালেন যে, আগামীকাল শিশুমারী হাই স্কুলে মন্ত্রী মইনুল হক চৌধুরী জনসভা করবেন। মুরাদ ভাসানীর কাছে চলে যান এবং সাইফুল ইসলাম শিশুমারী হাই স্কুলে মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন। ভাসানীর আগমনে মন্ত্রী খুশি হলেন। সাইফুল ইসলাম মন্ত্রীর সঙ্গে ফুলবাড়ী রেস্ট হাউজে যান। মন্ত্রী দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে ফোনে আলাপ করেন। ইন্দিরা গান্ধী মওলানাকে ভারতে

আসার অনুমতি দিলেন। ১৫ এপ্রিল ভাসানী রংপুরের নামাজের চর থেকে ফুলবাড়ী রেস্ট হাউজে আসেন। মন্ত্রী তাকে আন্তরিকভাবে অভ্যর্থনা জানান। মওলানা যখন আসাম মুসলিম লীগের সভাপতি তখন মইনুল হক চৌধুরী এর সম্পাদক ছিলেন। মন্ত্রীর সঙ্গে গোপন বৈঠক হলো। ভাসানী ও তাঁর দু' সফরসঙ্গীকে হলদীগঞ্জ বিএসএফ ক্যাম্পে থাকতে হবে। ১৫ এপ্রিল মওলানা ভাসানী দু' সহযোগী নিয়ে আসামের সীমান্ত অতিক্রম করেন।

ভারতের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মইনুল হক চৌধুরী ভাসানীকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য অপেক্ষা করছিলেন তাঁর অসামান্য ব্যস্ততার মধ্যেও। এ সম্পর্কে সাইফুল ইসলাম লিখেছেন :

"এককালীন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে তাঁর এককালীন সেক্রেটারির মোলাকাত হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশেই অনুষ্ঠিত হলো ব্যক্তিগত ও পারিবারিক খোঁজখবর ও কিছুক্ষণ স্মৃতিচারণের মধ্য দিয়ে। এক সময় দু'নেতা একান্ত নির্জনে কথাবার্তা বললেন। সুতরাং একান্তে কি আলাপ হলো জানি না। মন্ত্রীর সচিব ভাসানীর সচিবকে [সাইফুল ইসলামকে] জানালেন, আমরা হলদীগঞ্জ বিএসএফ-এর ক্যাম্পে যাচ্ছি। আপাতত ওইখানেই থাকতে হবে। পরবর্তী গন্তব্যস্থল পরে জানানো হবে।"

সৈয়দ আবুল মকসুদ তার গ্রন্থে লিখেছেন, ২৬ মার্চের পর ভারতের মাটিতে এতদিনে এমন একজন বাংলাদেশের নেতাকে পাওয়া গেল যাঁকে ভারতের মানুষ চেনে। ভাসানীর ভারত প্রবেশের খবর মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়ল সর্বত্র— মুখে মুখে ও সংবাদমাধ্যমে। পরদিনই আনন্দবাজার পত্রিকা মওলানার খবর প্রকাশ করে, যে সংবাদ চলমান মুক্তিযুদ্ধে আরও গতিবেগ সঞ্চার করে। 'সীমান্তের এপার ভাসানী– সজল চক্ষে সাহায্য প্রার্থনা' শীর্ষক সংবাদে লেখা হয় :

"পূর্ব বাংলার অশীতিপর বৃদ্ধ নেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী গতকাল মাঝরাতে সীমান্তের এপারে এসে কোনো এক জায়গায় কেন্দ্রীয় শিল্পোন্নয়ন মন্ত্রী শ্রী মৈনুল হক চৌধুরী ও আসামের তথ্য ও জনসংযোগ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী সৈয়দ আহমেদ আলীর সঙ্গে দেখা করেন। বাংলাদেশের জনগণের ওপর পাকিস্তানি জঙ্গী ফৌজের নির্যাতন বন্ধের জন্য তিনি ভারত সরকারের সাহায্য প্রার্থনা করেন, আজ এখানে সরকারি মহলে এ কথা জানা গিয়েছে। আকাশবাণী গৌহাটি কেন্দ্র থেকে আজ একথা প্রচার হয়।"

আরও একটি খবরে জানা যায়, "জাতীয় ('ন্যাশনাল' হবে) আওয়ামী দলের ('পার্টি'র হবে) প্রধান শ্রী ভাসানী করজোড়ে ও সজল চোখে ভারতীয় নেতাদের কাছে আবেদন জানান : "বাংলাদেশের জনগণ তাদের এই অগ্নিপরীক্ষার সময়ে নিজেদের অসহায় বোধ করছেন। তাকিয়ে আছে ভারতের দিকে একমাত্র সাহায্যের ভরসা হিসেবে।"

সব দেশের পত্র-পত্রিকারই নিজস্ব নীতি, পরিভাষা, ও উদ্দেশ্য থাকে। একই দিনের আনন্দবাজার পত্রিকা 'মৈনুল হক চৌধুরীর বিবৃতি' নামে আরও একটি খবর ছাপে, সেটি এ রকম :

"শিলং, গতকাল (১৬ এপ্রিল) মাঝরাতে আসাম-বাংলাদেশ সীমান্তের কাছাকাছি কোনো এক জায়গায় তিনি মওলানা ভাসানীর সঙ্গে দেখা করেন। তাঁরা তিন ঘণ্টা কথাবার্তা বলেন।

শ্রী হক চৌধুরী জানান, বাংলাদেশকে নৈতিক সমর্থন ও সাহায্য— সব রকম সাহায্য করার জন্য মওলানা ভাসানী ভারতের কাছে আবেদন জানিয়েছেন।

শ্রী হক চৌধুরী আরও বলেন, অবিলম্বে স্বীকৃতি দেয়ার জন্য ভারত সরকারের কাছ আরজি জানাতে ৮৪ বছরের বৃদ্ধ ভাসানী সাশ্রুনয়নে আমাকে অনুরোধ জানান।

শ্রী হক চৌধুরী তাঁর গৌহাটির বাড়ি থেকে টেলিফোনে একথা বলেন। তিনি জানান, মওলানা ভাসানী বলেছেন, তাঁকে পিকিংপন্থি বলে যে বদনাম দেয়া হয়, তা মনে রাখা উচিত নয়।

ওই দিনই সরকারি ও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ এবং সাংবাদিকদের সঙ্গে ভাসানীর কথাবার্তা হয়। তাঁর তখন একই বক্তব্য– স্বাধীনতা এবং স্বাধীনতা এবং পাকিস্তানি বর্বরতার হাত থেকে বাংলাদেশের মানুষকে বাঁচানো। 'পাকিস্তানি কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের লড়াই' শিরোনামে প্রেস ট্রাস্ট অব ইন্ডিয়া (পিটিআই) পরিবেশিত আর একটি খবর আনন্দবাজারে প্রকাশিত হয়। সেটি এ রকম :

"গৌহাটি, এপ্রিল ১৭, পিটিআই, জাতীয় ('ন্যাশনাল' হবে) আওয়ামী পার্টির নেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী বলেন, 'স্বাধীন বাংলাদেশের দাবি বিচ্ছিন্নতাবাদীদের দাবি নয়, বরং পশ্চিম পাকিস্তানের কায়েমী স্বার্থের বর্বর আক্রমণের বিরুদ্ধে এ এক পবিত্র সংগ্রাম।'

মওলানা ভাসানী ভারতের জনসাধারণের উদ্দেশ্যে লিখিত এক চিঠিতে আজ এ কথা বলেন... ।"

এই চিঠিতে বলা হয়েছে, "পাকিস্তানের স্বৈরাচারী জেনারেল ইয়াহিয়া খানের বর্বর সৈন্যগণ হাজার হাজার নিরস্ত্র অসহায় নিরপরাধ কৃষক, শ্রমিক, তাঁতী, জেলে, ছাত্র, জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচিত সদস্যগণ, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত অধ্যাপকগণ, স্কুল শিক্ষক ও অন্যান্য বুদ্ধিজীবীদের কামান, ট্যাংক ও অন্যান্য আধুনিক মারাত্মক অস্ত্রের দ্বারা হত্যা করা হচ্ছে। তারা আগুন লাগিয়ে অসংখ্য ব্যক্তিগত বাসগৃহ ও জনসাধারণের প্রতিষ্ঠানগুলিকে ধ্বংস করছে। তারা নির্বিচারে পূর্ব বাংলার হিন্দু-মুসলমান-খ্রিস্টান সকল সম্প্রদায়ের লোকদের নিধন করছে... ।"

১৭ এপ্রিল স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার শপথ গ্রহণ করে। ফলে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক অধিকার লাভ করে। এ সময় মওলানা ভাসানী ভারতে অবস্থান, পত্রিকায় বিবৃতি ও ভাষণে মুক্তিযুদ্ধকে সুদৃঢ় করার জন্য ভারতীয় জনগণ ও বিদেশী রাষ্ট্রসমূহকে অনুপ্রাণিত করেন। তাঁকে পেয়ে বাংলাদেশ সরকার ও ভারত সরকার উৎসাহিত হয়। তাঁকে চীনপন্থী বলা হতো– সে অপবাদ থেকে তিনি মুক্ত হন। ২৩ এপ্রিল ভাসানীর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবৃতি আনন্দবাজারসহ অনেক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল :

"বর্তমান দুর্যোগের মুহূর্তে মানবজাতির কাছে বাংলাদেশের জ্বলন্ত প্রশ্ন : বর্বর পশুশক্তির কাছে কি ন্যায়সঙ্গত মহান সংগ্রাম চিরতরে নিষ্পেষিত হবে?"

মওলানা ভাসানীর বাংলাদেশের গোপন ঘাঁটি হতে এ বিবৃতি বিশেষ দূত মারফত বাংলার এপারে পৌঁছে দেয়া হয়েছে।

তিনি ভাষণে বলেন, "১৯৭১ সালের বাঙালির এই বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম বহিঃশক্তির শোষণ, শাসন ও বাঙালিদের স্বাধীনতা হরণের বিরুদ্ধে ন্যায়সঙ্গত সংগ্রাম। পশ্চিম পাকিস্তানি অসুর শক্তি বাহির থেকে বল প্রয়োগ করে বাঙালিদেরকে দাসে পরিণত করে নয়া সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার জঘন্য সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে পড়েছে।" তাঁর আকুল কণ্ঠের জিজ্ঞাসা– "এই মারণযজ্ঞে বিশ্ব জনমতের কি কিছুই করার নেই? গণতান্ত্রিক বিশ্ব কি অহেতুক অজুহাতে হত্যাযজ্ঞকে সমর্থন জানাবে?"

১৬ এপ্রিল একজন কর্মকর্তা জানাল তাদের কলকাতার পথে গৌহাটি বিমানবন্দরে যেতে হবে। পূর্বে ভাসানীর ব্যাপারে কেউ জানতে পারুক তা সরকার চায় না। ১৭ এপ্রিল রাতে ভাসানী দমদম বিমানবন্দরে পৌঁছেন। বিমানবন্দর থেকে তারা পার্ক সার্কাসের পার্ক স্ট্রিটের কোহিনূর প্যালেসের পাঁচতলার একটি ফ্ল্যাটে ওঠেন। এক কক্ষে ভাসানী এবং মুরাদ। অন্য কক্ষে ভাসানীর একান্ত সচিব সাইফুল ইসলাম। পরদিন তাদের গুরু সদয় দত্ত রোডের গোয়েন্দা দপ্তরে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাদের কিছু প্রশ্ন করা হয়। কলকাতায় তাদের দেখাশোনার ভার ছিল মি. মুখার্জীর ওপর। ভাসানীকে কলকাতা প্রেসক্লাবে আহ্বান করা হয়। তিনি না গিয়ে সাইফুল ইসলামকে পাঠান। তিনি ভাসানীর পক্ষে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন।

'যাদু আমাকে বেইচতে কসুর কইরবে না'

ন্যাপের সেক্রেটারি মশিউর রহমান যাদু মিয়া কলকাতা এসেছেন এবং থাকছেন টাওয়ার হোটেলে। ১৯৫৫ সালে ভাসানী টাওয়ার হোটেলে ছিলেন। মওলানার সঙ্গে দেখা করবেন। এ সংবাদে সাইফুল ইসলাম মওলানা ভাসানীকে বলেন :

হুজুর আপনার সেক্রেটারি জেনারেল যাদু ভাই এখন কলকাতায়।

– তা হইলে তুমি বিদায় নিবার চাও নাকি?

দলের সেক্রেটারিকে তাঁর যথাবিহিত স্থান ছেড়ে দিতে হয়।

– যাদু দলের সেক্রেটারি, তুমি আমার সেক্রেটারি।

মওলানা ভাসানীর মুখে মিটিমিটি হাসি।

দলের কাউকে সাথে আনিনি। তোমাকে আনছি। তুমি অন্তত আমাকে বেইচা খাইবা না।

হুজুর এ কথা বলছেন যে?

দেখ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কাজে আমার ১৭ জন সেক্রেটারি ছিল, তোমাকে দিয়া ১৮ জন। এরা বেশিরভাগ আমার নাম ভাঙ্গাইয়া খাইছে। যাদু উঠছে কোথায়?

টাওয়ার হোটেলে।...

টাওয়ার লজেই নাকি দেবেন সিকদার, রনো, মেনন অন্যান্যের সঙ্গে যাদু মিয়ার বৈঠক হচ্ছে।

—তা হোক, ওরা একটা পথ বাহির কইরতে পাইরলে করুক। স্বাধীনতার লড়াই নানান ফ্রন্টেই হয়। কিন্তু সেটা করবে কে সেটাই ভাবতেছি।

তিনি তো আপনার সাথে দেখা করতে চান।

—না যাদুর সাথে দেখা করা যাইব না।

তিনি আপনার সেক্রেটারি জেনারেল, তার সঙ্গে দেখা করা যাবে না কেন হুজুর?

—যাদু, যাদু জানে। তেলেসমাতি যাদু। ও আইছে আমাকে ফিরাইয়া নেয়ার জন্য। এখন ওর সাথে দেখা হইলে সত্যি-মিথ্যা নানা ধরনের গুজব রইটবে। নানান মহল যার যার সুবিধামতো তা ব্যবহার কইরবে। যাদুরা আমাকে বেইচতে কসুর কইরবে না।

যাদু ভাই আপনাকে ফিরিয়ে নিয়া যাবার জন্য এসেছেন কথাটা আমি বুঝতে পারলাম না!

আমি বিস্ময়ের সঙ্গে প্রশ্ন করলাম।

—ওরা আমার হিন্দুস্তানে আসার বিরোধী ছিল।

ওনারা কি আপনাকে দেশে থাকতে বলেছিলেন, দেশে থাকলে আপনার জীবন বিপন্ন হতো না?

—ওরা আমাকে চীনে নিয়ে যাইবার চাইছিল। চীনা দূতাবাসের লোকজন তিন তিনবার আমার সঙ্গে দেখা কইরছে।

কেন হুজুর?

—তাদের কথা হইল পাকিস্তানকে সমর্থন করো। তা যদি না পারো তা হইলে চুপচাপ থাকো। পূর্ব পাকিস্তানে থাকা অসুবিধা বোধ কইরলে চলো তোমাকে চীনে নিয়ে যাই।

আপনি কি জবাব দিলেন?

—আমি বইলা দিছি, পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণা কি মজিবরের না আওয়ামী লীগের? ওটা আমার ঘোষণা কাগমারী থাইকাই। সেদিনও পল্টনের মিটিংয়ে আমি সরাসরি ঘোষণা দিছি।

মওলানা ভাসানী মশিউর রহমান যাদু মিয়ার সঙ্গে দেখা করলেন না। দু'দিন পর যাদুর খেলা দেখিয়ে তিনি পূর্ব পাকিস্তানে ফিরে যান এবং পাকবাহিনীর সঙ্গে হাত মেলান।

ভারত নয় যেতে হবে লন্ডন

মওলানা ভাসানীর লক্ষ্য ছিল লন্ডন। লন্ডন থেকে তিনি স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠন করবেন। সেই সরকারের মাধ্যমে তিনি স্বাধীনতা ও অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনে তার

নকশা অনুযায়ী লড়বেন। এই স্বপ্ন বুকে নিয়ে তিনি যমুনার বুকে ভেসেছিলেন। নায়ে চড়ে লন্ডন রওনা হয়েছিলেন। কিন্তু মাঝপথে ভারতে আটকে গেলেন। তিনি ভারতে বসে বলতেন–

"ভারত কবিগুরু, গান্ধী, চিত্তরঞ্জন, সুভাষ, নেহরু, মওলানা আজাদের দ্যাশ। নেহরুর সাথে আমার ঘনিষ্ঠতা ছিল। ইন্দিরা তাঁর মেয়ে। স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারত সরকার সাহায্য কইরবো– এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত। তবে সে সাহায্য এদের নকশা মোতাবেক। তার সাথে হয়তো আমার চিন্তা-ভাবনা মিলান যাইবে না। তবু ভারত এখন আমাদের বন্ধু। বিপদের বন্ধু। আজ যে চীনের সাথে এত দোস্তি ছিল, দুর্দিনে তারা সইরা দাঁড়াইল। মুখ ফিরায় নিল।"

কলকাতা পার্ক স্ট্রিটের কোহিনূর প্যালেসের পাঁচতলায় স্বাধীন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদের স্ত্রী জোহরা তাজউদ্দিন ও তাদের সন্তানরা উঠেছেন। এখানে মওলানা ভাসানীর সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার জন্য মাঝে মাঝে আসতেন। তবে খুব কম আসতেন। তিনি রাতে ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে থাকতেন না। তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, বাংলাদেশ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত দাম্পত্য জীবনযাপন করবেন না। তাজউদ্দিন আহমেদ মওলানা ভাসানীর সক্রিয় সহযোগিতা ও আশীর্বাদ কামনা করলেন। তিনি প্রধানমন্ত্রীর আবেদনে সাড়া দিয়ে বলেন–

তাজউদ্দিন, সংগ্রামটা মিটিং, মিছিল, হরতাল আর প্রস্তাব পাসের নয়। অস্ত্র হাতে লড়াই, রক্ত, ঘাম, আগুন, জীবনবাজি আর কূটনীতির। ভিতর বাইরে জঙ্গীদের হামলা। দোস্তের লেবাসের তলায় শানিত ছুরি, তুমি একলা পারবা?

হুজুর তো আছেই, আপনার দোয়া, পরামর্শ, সহযোগিতা সব সময়ই চাইব।

২৫ মে ভাসানী সংবাদপত্রে এক বিবৃতি দেন :

"... বাংলার সাড়ে ৭ কোটি নির্যাতিত মানুষের জীবন রক্ষার্থে প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতবর্ষ ও ভারতের জনসাধারণ মানবতার প্রশ্নে নিঃস্বার্থভাবে যে সাহায্য প্রদান করিতেছে তজ্জন্য শুধু আমি নহি বাংলার হিন্দু মুসলমান জাতি ধর্ম নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষ কৃতজ্ঞ এবং চিরকাল ইহা স্মরণ রাখিবে। জাতির এই বিপদের মুহূর্তে স্বৈরাচারী ইয়াহিয়া সরকার ও তাহার তল্পিবাহক দালালরা পূর্ব বাংলার হিন্দুদিগের প্রতি মুসলমানদেরকে নানাভাবে মিথ্যা ও জঘন্যতম প্রচারের মাধ্যমে উত্তেজিত করিয়া আবার সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প ছড়াইতে চেষ্টা করিতেছে। তারা প্রচার করিতেছে ভারতের অর্থে পূর্ব বাংলার হিন্দুদিগের সহযোগিতায় কিছুসংখ্যক দুষ্কৃতকারী এই গোলযোগ তৈরি করিয়া ইসলাম, মুসলমানের ঈমান-আমান নষ্ট করিবার জন্য পাকিস্তান ধ্বংসের চেষ্টা করিতেছে। এই মিথ্যা রচনা অজুহাত সৃষ্টি করিয়া পূর্ব বাংলায় হিন্দু-বিদ্বেষী বিষ ছড়াইয়া বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামকে জামায়াত, মুসলিম লীগ ও ইয়াহিয়ার দালালেরা নস্যাৎ করিয়া দিবার জঘন্যতম চেষ্টায় মাতিয়াছে। ইয়াহিয়া টিক্কার অত্যাচার হইতে জীবন ও মানসম্ভ্রম বাঁচাইবার জন্য যে সকল বাঙালি ভারতে আশ্রয় লইয়াছে ভারত সরকার যখন এই সকল হতভাগ্য নর-নারীকে খাওয়াইয়া-পরাইয়া বাঁচাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছে,

সেটাই হইতেছে ভারতের দোষ। কিন্তু ইয়াহিয়ার নিকট আমি প্রশ্ন করি গত বৎসরে পূর্ব বাংলায় সামুদ্রিক ঝড়ে যখন লাখ লাখ মুসলমান মারা পড়িল, ক্ষতিগ্রস্ত হইল তখন ইয়াহিয়া খান কোন লজ্জায় কাফের ও শত্রু ভারতের প্রদত্ত ১ কোটি টাকা সাহায্য লইয়াছিলেন। কাফেরের সাহায্য লইয়া তো তিনি নিজে কাফের হইয়া যান নাই? উপরন্তু সে টাকা পশ্চিম পাকিস্তানেই রহিয়া গিয়াছে, উপদ্রুত অঞ্চলের মরণাপন্ন জনসাধারণের হাতে পৌঁছায় নাই।

বাংলার জনসাধারণ আজ সচেতন। তাহারা মুসলমান নামধারী পশ্চিম পাকিস্তানি অত্যাচারী শাসক হালাকুয়াদের ইসলাম, মুসলমান সংহতির জিগির, হিন্দু পোষণ, কাফের ভারতের কারসাজির নামে ধোঁকাবাজীতে তাহাদিগকে আর ভুলানো যাইবে না। রক্ত, জীবন, সম্পদ, সম্ভ্রম– সবকিছুর বিনিময়ে তাহাদের চোখ খুলিয়া গিয়াছে। ব্রিটিশের অত্যাচার, মহাজন ও জমিদার হিন্দুর শোষণের হাত হইতে বাঁচিবার জন্য পাকিস্তান অর্জন করিয়া ২৩ বৎসরের মুসলমান মহাজন, পুঁজিপতি, সামন্তপ্রভু, আমলা ও সামরিক পশুদের শোষণ, শাসন, অত্যাচারে তাহাদের নব উপলব্ধি আসিয়াছে। সে উপলব্ধি হইতেছে শ্রেণীহীন শোষণমুক্ত স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলার।

বাংলার মাটি, বাংলার প্রান্তর, নদী নালা শহর বন্দর আজ ১০ লাখ বাঙালির রক্তে প্লাবিত। এই রক্তের নদী বহিয়া নিশ্চিতভাবে বাংলার স্বাধীনতা আসিবে। তাই জীবন যৌবন সুখ সম্পদ সবকিছু বাজী রাখিয়া বাংলার মানুষ তাহাদের দেশকে আক্রমণকারী তথা কথিত মুসলমান পশ্চিম পাকিস্তানি জঙ্গী কুত্তাদের বিরুদ্ধে লড়িতেছে। এ লড়াই শুধু রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের লড়াই নয় ইহা অর্থনৈতিক অসাম্য দূর করিবার লড়াইও বটে। তাই কোনো আপসের মাধ্যমে নহে— বাংলাকে স্বাধীন করিয়া তথায় শোষণমুক্ত সুখী সমৃদ্ধিশালী জাতি গড়িয়া তুলিয়া তবেই ইহা সমাপ্ত হইবে। তাহার আগে নহে। ইহার জন্য আমরা কোনো দেশের সাহায্য-সহযোগিতা পাই আর না পাই, ইহার জন্য যত দিন যত রক্ত যত ত্যাগ তিতিক্ষা যত কষ্টই স্বীকার করিতে হোক– বাংলার কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, জনতা, মধ্যবিত্ত, কামার, কুমার, ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, কুটির শিল্প, বুদ্ধিজীবী ও মুক্তিফৌজেরা সবাই স্বীকার করিতে প্রস্তুত হইয়াই এ লড়াইয়ে নামিয়াছে। আপস নয় রক্তের পথ বাহিয়াই আমাদের মুক্তি আসিবে এবং সে মুক্তি হইবে সত্যিকার নিশ্চিত মুক্তি।

মোঃ আবদুল হামিদ খান ভাসানী

মৈমনসিং

২৫/৫/৭১"

(মৈমনসিংয়ের ঠিকানা উল্লেখ হলেও কলকাতা পার্ক স্ট্রিটের কোহিনূর প্যালেসের কক্ষে লিখিত হয় এবং কলকাতা হতে প্রকাশিত হয়)

এর আগে ২১ এপ্রিল তিনি জাতিসংঘ, চীন ও অন্যান্য রাষ্ট্রের কাছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে সাহায্য করার জন্য আবেদন জানান। ২৩ এপ্রিল তিনি এক দীর্ঘ বিবৃতি প্রদান করেন। ২৫ এপ্রিল রাশিয়ার সাহায্য কামনা করে তিনি রুশ নেতাদের তারবার্তা পাঠান। ৩১ মে এক বিবৃতিতে বলেন, "বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি লোক পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর সঙ্গে জীবন-মরণ সংগ্রামে লিপ্ত। তারা মাতৃভূমি রক্ষার জন্য বদ্ধপরিকর। তারা এ সংগ্রামে জয়লাভ করবেই।"

মুজিবনগর সরকার বিভিন্ন সময় তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করে। বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ কলকাতায় একাধিকবার তাঁর পরামর্শ নিয়েছেন। বিশেষ করে খন্দকার মোশতাক আহমদের গ্রুপ তাজউদ্দিনের বিরুদ্ধে যখন ষড়যন্ত্র করতে থাকে। তারা যখন পাকিস্তানের সঙ্গে সমঝোতার জন্য চেষ্টা চালায় তখন ভাসানী তাজউদ্দিন আহমেদকে সঠিক পরামর্শ দেন।

২৪ জুন মওলানা ভাসানীর বিবৃতি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হয়। তিনি দিল্লীতে ভারতের প্রদানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা সম্পর্কে আলোচনা করেন। মুজিবনগর সরকার মুক্তিযুদ্ধ চালিয়ে নেয়া এবং বাংলাদেশ সরকারকে পরামর্শ প্রদানের জন্য ভাসানীকে সভাপতি করে সর্বদলীয় উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটিতে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ, কমরেড মনি সিংহ, অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ, মনোরঞ্জন ধর, খন্দকার মোশতাক আহমদ সদস্য ছিলেন।

'আমাদের মিলিত সংগ্রাম/মৌলানা ভাসানীর নাম'

মওলানা ভাসানীকে নিয়ে প্রখ্যাত সাংবাদিক ও একুশে গান রচয়িতা আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী লেখেন তার সাড়া জাগানো কবিতা 'আমাদের মিলিত সংগ্রাম, মৌলানা ভাসানীর নাম'।

> শহরে বন্দরে গ্রামে ঘরে
> হৃদয় নগরে
> মুখের ভাষায় শুনি, বুকের সাড়ায় শুনি, চোখের তারায় দেখি নাম
> মৌলানা ভাসানীর নাম।
> পাঁচ কোটি মানুষের প্রাণের কালাম—
> কণ্ঠে শুনি তার। হতবাক সবিস্ময়ে দেখি
> জীবনে জীবনে একী
> মিলিত প্রাণের গতি; কলকণ্ঠে আকাশ মুখর
> বজ্রে আর ঝড়ে শুনি স্বচ্ছ স্বর
> মুখের ভাষায় শুনি নাম।
> মৌলানা ভাসানীর নাম ॥

এই নাম শুনে যেন আশা পাই বুকে
দুঃখে সুখে
ঝড়ে ভগ্নধ্বজা দেখে শিবিরের বলি নিজ হৃদয়কে ডেকে–
"উদয়ের পথে শুনি কার বাণী ভয় নাই ওরে ভয় নাই,
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান, ক্ষয় নাই, তার ক্ষয় নাই।"
এ তিমিরের রাত্রি হলে শেষ
যে নতুন প্রাণের উন্মেষ
আজ তারই রক্তঋণে, হতাশার সংক্রমণে ভীত—
অগণিত
মানুষের মুখে দেখি, বুকে দেখি, চোখে দেখি তারার জ্যোতির—
মৃদু রেখা। এক ডাকে দৃঢ় সংহতির—
উত্তরণ আশা যেন শুভ্র পাখা নতুন বলাকা
এ মিছিলে আসেনি যে তারও চোখে সংগ্রামের অগ্নিরেণু মাখা।
কত না দুঃখের পথে এই দুঃস্থ দেশের জনতা
পেয়েছে আপন নেতা
সুবচনি রথ নয় তার,
নয় মিথ্যা অভিনয়ে মানুষের সাথে ব্যভিচার
তাঁর যৌবনে শিখা
কারাগারে, হাটে, মাঠে রেখেছে প্রাণের লিখা
নক্ষত্র সন্ধ্যের মত মূঢ়, মূক মানুষের জামাতে জামাতে
দিনে রাতে—
বজ্রের আওয়াজ কেড়ে গড়েছেন নতুন কালাম
মানুষ শুনেছে সেই নাম।
মৌলানা ভাসানীর নাম।
দেখেছি রাত্রির কালো পাখা
(দেখেছি পিশাচ সিন্ধু ঈগলের থাবা)
দেখেছি শ্যামল নীল আকাশের রক্তপটে আঁকা—
দুঃশাসন
সময়ের সঙ্কেত হরণ
হাত তার ঘোরে দেশময়
সে হাতের তীক্ষ্ণ ছোরা সারা প্রাণময়।
কলম, লেখনী বন্ধ, গান স্তব্ধ, নাস্তি নাস্তি হৃদয় কন্দরে
মুক্তির ফসল কেটে কে যেন তা কারাগারে ভরে।
সাহিত্য কলঙ্কবতী, শিল্প দুস্থ, মানুষের দাস
পলাতক স্তাবকেরা এবার শিল্পের ছদ্মবেশে

সাহিত্যের ছদ্মবেশে
বাজারে জমাট
দুদিনের খেলার আসরে, তারা আজ শিল্পের সম্রাট।
তখন ক্রন্দন শুনি। হৃদয়ের শিল্পী ওঠে কেঁদে
মাঝে মাঝে ক্ষোভে, রোষে যে কলম হাতে তোলে
হৃদয়কে তবু রাখি বেঁধে।
হতাশায় মর্মরিত হওয়ার নিঃশ্বাসে
অথবা আকাশে
পাঁচ কোটি মানুষের রুদ্ধরোষে দেখি ভেসে
আমার হৃদয়ে এসে মেশে।
বলি নিজ হৃদয়কে ডেকে—
"বীরের এ রক্ত স্রোত, মাতার এ অশ্রুধারা
এর মত মূল্য সে কি ধরার ধূলায় হবে হারা?
স্বর্গ কি হবে না কেনা
বিশ্বের ভাণ্ডারি শুধিবে না এত ঋণ
রাত্রির তপস্যা সে কি আনিবে না দিন?'
তখন হৃদয়ে পাই ভাষা,
দেখি তিনি মানুষের সকলের এমন কি আমাদের আশা।
নক্ষত্র সঙ্ঘের মত মানুষের জামাতে জামাতে
দেখি তিনি রাখী হাতে।
আমাদের মিলিত সংগ্রাম
মৌলানা ভাসানীর নাম।

'মানবজাতির কাছে বাংলাদেশের জ্বলন্ত প্রশ্ন'

মুক্তিযুদ্ধকালে আমেরিকা ও চীন বাংলাদেশের বিরোধিতা ও পাকিস্তানকে সমর্থন করেছে। মওলানা ভাসানী তাদের কৃত অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছেন। ভাসানী লাল চীনপন্থি বলে পরিচিত। চীনপন্থি কমিউনিস্ট পার্টির একাংশ বিচ্ছিন্নভাবে পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে– আর একাংশ আওয়ামী লীগ ও মুক্তিযোদ্ধাদের ভারতের দালাল আখ্যায়িত করে তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছে। মুজিবনগরে চীনপন্থিরা আলাদা সশস্ত্র বাহিনী গড়তে চেয়েছিল। ভাসানী তার বিরোধিতা করেন। তিনি তাঁর দল বা চীনপন্থিদের সহায়তা না করে বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে তাঁর অভিভাবক হিসেবে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করেছেন।

সৈয়দ আবুল মকসুদ এই প্রসঙ্গে বলেন, "এর এক সপ্তাহ পরে মওলানার এক সুদীর্ঘ বিবৃতি প্রকাশিত হয় ভারতের পত্রপত্রিকায় ও প্রচার মাধ্যমে যেমন আকাশবাণীতে। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার মাত্র তিন সপ্তাহ পরে তাঁর এ বিবৃতি মুক্তিযোদ্ধা ও ভারতীয়

নাগরিকদের কাছে অসামান্য আবেদন সৃষ্টি করে। সে সময় বাংলাদেশে সত্যিকারে কি ঘটছে সে সম্পর্কে বহির্বিশ্বের মানুষের বিশেষ ধারণা ছিল না, অন্তত ভারতীয় প্রধান পত্রিকাগুলো পড়লে তাই মনে হয়। ইতিমধ্যে আওয়ামী লীগের প্রায় সব প্রধান নেতা কলকাতা গিয়ে পৌঁছেছিলেন, তাঁরাও দেশের ভেতরের বর্বতার প্রকৃত চিত্র সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত ছিলেন না। ১৭ এপ্রিল মুজিবনগর সরকার শপথ নেওয়ার পর থেকে তাজউদ্দিন আহমেদ প্রমুখ ভারত সরকারের সঙ্গে কথাবার্তা বলার নৈতিক অধিকার অর্জন করেন এবং তাঁরাই বাংলাদেশের একমাত্র আইনসঙ্গত প্রতিনিধি বলে বিবেচিত হন। তা সত্ত্বেও মুক্তিযুদ্ধের প্রথম মাসে দুই বাঙালি নেতাদের মধ্যে একমাত্র ভাসানীর বক্তৃতা-বিবৃতি-সাক্ষাৎকারই ভারতের পত্রপত্রিকায় সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। যদিও অনেক পত্রিকাই তাঁকে 'চীনপন্থী' বলে আখ্যায়িত করতে ভুল করেনি। ২৩ এপ্রিল ভাসানীর এক অসামান্য বিবৃতি আনন্দবাজার পত্রিকা প্রথম পাতায় অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করে, ইংরেজি-বাংলা অন্য পত্রিকাও কিছুটা সংক্ষিপ্ত করে ছাপে। আনন্দবাজার লিখে :

"বর্তমান দুর্যোগের মুহূর্তে মানবজাতির কাছে বাংলাদেশের জ্বলন্ত প্রশ্ন : বর্বর পশুশক্তির কাছে কি ন্যায়সঙ্গত মহান সংগ্রাম চিরতরে নিষ্পেষিত হবে?

বাংলাদেশের এক গোপন ঘাঁটি থেকে এক স্বাক্ষরিক বিবৃতির মাধ্যমে বেদনাবিক্ষুব্ধ কণ্ঠে এই প্রশ্ন তুলেছেন পূর্ব বাংলার অশীতিপর বৃদ্ধ ন্যাশনাল আওয়ামী লীগ [পার্টি হবে] নেতা মওলানা ভাসানী। মওলানা ভাসানীর বিবৃতিটি বিশেষ দূত মারফত বাংলার এই সীমান্তে পৌঁছে দেয়া হয়েছে।"

মওলানা ভাসানী বিবৃতিতে বিগত ২৩ বছর ধরে পূর্ব বাংলার ওপর পশ্চিম পাকিস্তানি সুবিধাবাদী শিল্পপতি, সামরিক জনতা, সামন্তপ্রভু ও স্বেচ্ছাচারী আমলা কর্তৃক শোষণ ও শাসনের তীব্র সমালোচনা করে বলেন : ১৯৭১ সালের বাঙালির এই বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম বহিঃশক্তির শোষণ, শাসন ও বাঙালিদের স্বাধীনতা হরণের বিরুদ্ধে ন্যায়সঙ্গত সংগ্রাম। পশ্চিম পাকিস্তানি অসুরশক্তি বাহির থেকে বল প্রয়োগ করে বাঙালিদিগকে দাসে পরিণত করে নয়া-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার জঘন্য সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। তাঁর আকুল কণ্ঠের জিজ্ঞাসা– এই ব্যাপক মারণযজ্ঞে বিশ্ব জনমতের কি কিছুই করবার নেই? গণতান্ত্রিক বিশ্ব কি অহেতুক অজুহাতে হত্যাযজ্ঞকে সমর্থন জানাবে?

'তাঁহারা নিপীড়িত শোষিত মানুষের বন্ধু?'

মুক্তিযুদ্ধে চীনের ভূমিকা সম্পর্কে মওলানা ভাসানী তাঁর লিখিত বিবৃতিতে বলেন :

"চীনসহ সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া সব সময়ই শোষিত-নিপীড়িত জনসাধারণের অধিকার প্রতিষ্ঠার মহান সংগ্রামে সর্বপ্রকার মদদ যোগাইয়াছে। কিন্তু আজ পূর্ব বাংলায় সাড়ে সাত কোটি নিপীড়িত-নিষ্পেষিত-শোষিত মজলুম মানুষের দীর্ঘ ২৩ বৎসরের সংগ্রামের যে চূড়ান্ত সংগ্রামী রূপ পূর্ব বাংলার মাটিতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, বাঙালিদের এই মহান সংগ্রামের ও স্বাধীনতার প্রশ্নে তাঁহারা কী ভূমিকা গ্রহণ করিবে? স্বৈরাচারী

ইয়াহিয়াকে সমর্থন করিয়া তাঁহারা বিশ্বজনমতকে কীভাবে বুঝাইবেন যে, তাঁহারা নিপীড়িত-শোষিত মানুষের বন্ধু?"

গোয়েবলসীয় প্রচারণা...

মওলানা ভাসানীর জিজ্ঞাসা বিশ্বের বিভিন্ন জাতি বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বের দরবারেও। তিনি প্রশ্ন করেন :

"বিশ্বের বিভিন্ন জাতি, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ও ধর্মীয় গোষ্ঠী বাঙালীর স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার মহান দাবি সমর্থন করিবে, না যে স্বৈরাচারী শোষক অত্যাচারী মানবতাবিরোধী নির্বিচার গণহত্যার মাধ্যমে যাহারা একটা জাতিকে চিরতরে দাস বানাইতে চায় সেই ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রকে সমর্থন জানাইবে? মুসলমান ইয়াহিয়া ও তাহার বর্বর সৈন্যরা ধর্মের দোহাই তুলিয়া আজ মুসলমান হইয়া অসংখ্য মসজিদ বিনষ্ট করিতেছে, নামাজ পাঠরত মুসলমানকেও হত্যা করিতে কুণ্ঠাবোধ করিতেছে না। মানবতাবিরোধী এইসব কাজের জন্য মুসলিম বিশ্ব কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে? তাঁহারা কি ইয়াহিয়ার অনৈসলামিক মানবতাবিরোধী জঘন্য কার্যক্রম সমর্থন করিবেন? নাকি জালেমের বিরুদ্ধে মজলুমের পক্ষে দাঁড়াইয়া মহান ইসলাম ধর্মের সত্য, ন্যায়, প্রীতির প্রতি সমর্থন জানাইবেন? গণতান্ত্রিক বিশ্বের কাছে বাঙালির প্রশ্ন— গণতন্ত্র হত্যার এই মারণযজ্ঞে তাঁহারা কি ইয়াহিয়া খানকে সমর্থন জানাইবেন, না পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে বাজে অজুহাতে নিরপেক্ষ থাকিয়া বর্বর অত্যাচারকেই প্রকারান্তরে সমর্থন করিবেন?"

মওলানা ভাসানী বলেন, "ইয়াহিয়া সরকার ও তাহার জালেম সমর্থকরা ভাবিয়াছে এইরূপ নজিরবিহীন অত্যাচার কিছুদিন চালাইতে পারিলে বাংলার জনসাধারণ ভীত হইয়া স্বাধীন বাংলার দাবি চিরতরে ছাড়িয়া দিবে এবং বাঙালিদের শিরদাঁড়া চিরতরে ভাঙ্গিয়া দেওয়া যাইবে। কিছু দালাল সংগ্রহ করিয়া তাহাদের দিয়া দুনিয়ার মানুষকে ধোঁকা দিবার জন্য সারা দুনিয়ায় প্রচার করা হইবে স্বাধীন বাংলা সংখ্যাগরিষ্ঠের দাবি নহে, পাকিস্তানের মহাশত্রু ভারত সরকার পূর্ব বাংলায় মুষ্টিমেয় দুষ্কৃতকারীদের নিযুক্ত করিয়া সর্বতোভাবে সাহায্য দিয়া এই আন্দোলন সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু এইরূপ মিথ্যা প্রচারে দুনিয়ার মানুষ বিভ্রান্ত হইবে না।"

মওলানা ভাসানী বলেন, "পাকিস্তানের মূল ভিত্তিকে নস্যাৎ করিয়া দিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালিদের ওপর পশ্চিম পাকিস্তানি শাসন ও শোষণ রাখার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের কতিপয় মুখচেনা বাঙালি দালালদিগকে নানা প্রলোভনে হাত করিয়া পশ্চিম পাকিস্তানি সামন্তপ্রভু, পুঁজিপতি, আমলাগণ পূর্ব বাংলার ন্যায়সঙ্গত দাবি আদায়ের সংগ্রামকে বারবার নস্যাৎ করিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। কিন্তু দুর্জয় মনোবল ও রাজনৈতিক সচেতনতার অধিকারী পূর্ব বাংলার সংগ্রামী জনতা নানা অত্যাচার ও শোষণ-শাসনের ভ্রূকুটিতে না দমিয়া স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার সেই মহান সংগ্রামকে ২৩ বৎসর যাবৎ অব্যাহত রাখিয়া আসিয়াছে। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র সংগ্রাম তাহারই চূড়ান্ত রূপ।

তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান ১৯৪৯ সালে পূর্ব বাংলার দাবি নস্যাৎ করিয়া এক আজগুবি শাসনতন্ত্র চাপাইয়া দিতে চেষ্টা করিলে পূর্ব বাংলার সংগ্রামী কৃষক শ্রমিক ছাত্র-জনতা তাহা অঙ্কুরেই বিনষ্ট করিয়া দেয়। সাড়ে সাত কোটি তথা পাকিস্তানের নিরবচ্ছিন্ন সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালির মুখের ভাষাকে ধ্বংস করিবার ষড়যন্ত্রে স্বয়ং জিন্নাহ সাহেব ব্রতী হইয়াছিলেন। ঢাকার বুকে রক্তের গঙ্গা বহাইয়া দিয়া অসংখ্য ছাত্র-জনতা ও নেতৃবৃন্দকে জেলে পুরিয়া স্বৈরাচারী শাসকগোষ্ঠী বাংলা ভাষার ন্যায়সঙ্গত ও মহান সংগ্রামকে চিরতরে স্তব্ধ করিবার অপচেষ্টায় ব্যর্থ হইয়াছে। ১৯৫২ সালের পূর্ব বাংলার মাতৃভাষা আন্দোলন তাহারই জ্বলন্ত নিদর্শন।"

তিনি বলেন, "১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নৌকার প্রতীকে ভোট দিয়া বাংলার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা জানাইয়া দিয়াছেন যে, লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে বাঙালিরা স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলা প্রতিষ্ঠার মহান সংগ্রামে বদ্ধ পরিকর। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে নৌকার প্রতীকে নির্বাচিত সদস্য ছিলেন শতকরা ৯৮ জন, ১৯৭০ সালের নির্বাচনে নৌকার প্রতীকে নির্বাচিত হইয়াছেন শতকরা ৯৯ জনেরও বেশি। নির্বাচনের এই ঐতিহাসিক বিজয়ের মূল কারণ হইতেছে, শোষিত ও নিষ্পেতি জনগণের প্রাণপ্রিয় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সোনালি স্বপ্ন। পশ্চিম পাকিস্তানি শাসক ও শোষকগোষ্ঠী নির্বাচনের পূর্বে স্বাধীনতার প্রশ্নে বাঙালিদের এই অপূর্ব একতার কথা উপলব্ধি করিতে পারে নাই। ফলে নির্বাচনের ঐতিহাসিক ফলাফল শোষক ও শাসকগোষ্ঠীর মাথা বিগড়াইয়া দিয়াছে। তাহারা বিকারগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে এবং বিকারগ্রস্ত মন লইয়া গণহত্যায় ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে।

সাড়ে সাত কোটি মজলুম বাঙালির গণতান্ত্রিক অধিকার নস্যাৎ করে দেয়ার জন্য কুখ্যাত জেনারেল ইয়াহিয়া খান আলোচনার অজুহাতে প্রস্তুতির সময় নিয়ে তার বর্বর সৈন্যদেরকে বাঙালিদের বিরুদ্ধে অমানুষিক অত্যাচার চালাইয়া হত্যা করিবার জন্য ২৫ মার্চ নির্দেশ প্রদান করেন। রাত্রি ১২টায় গুপ্ত অবস্থায় পূর্ব বাংলা হইতে পিন্ডি পলায়ন করেন। টিক্কা খানের নেতৃত্বে ২৫ মার্চ রাত্রি সাড়ে দশটা হইতে ঢাকায় পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড শুরু করা হয়। নগরের ছাত্র, যুবক, শিক্ষক, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর, শ্রমিক, সরকারি কর্মচারী, বুদ্ধিজীবী, বাঙালি ব্যবসায়ী ও অন্যান্য জনসাধারণকে কামান, ট্যাংক, মর্টার, মেশিনগান প্রভৃতি উন্নত ধরনের মারাত্মক মারণাস্ত্র দ্বারা হত্যা করিতে থাকে এবং শহরের অসংখ্য স্কুল, কলেজ, মসজিদ, মন্দির, ছাত্রাবাস, ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান, শ্রমিক বস্তিসহ অসংখ্য বাড়িঘর জ্বালাইয়া এবং উড়াইয়া দেয়া হয়। তার পর ২৬ তারিখ হইতে চিটাগাং, রাজশাহী, খুলনা, যশোর, রংপুর, পাবনা, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, বগুড়া, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ প্রভৃতি বহু শহরে নির্বিচারে গুলি চালাইয়া বিমান হইতে বোমা মারিয়া ও বিমানের সাহায্যে আকাশ হইতে গুলি চালাইয়া অসংখ্য নিরপরাধ, নিরস্ত্র ও অসহায় জনগণকে হত্যা করিতে থাকে। শুধু শহরেই এ হত্যাকাণ্ড, লুটতরাজ, বাড়িঘর জ্বালানো সীমাবদ্ধ রাখা হয় নাই। যেখান দিয়ে নারকীয় পশু ইয়াহিয়ার সৈন্যবাহিনী গিয়াছে সেই পথের ধারে দুই পার্শ্বের গ্রাম ছারখার করিয়া দেওয়া হইয়াছে। মন্দির, মসজিদ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভাঙা হইয়াছে। নির্বিচারে গণতহত্যা

চালানো হইয়াছে। নারী ও শিশুরাও রক্ষা পায় নাই। মেয়েদিগকে সতীত্বহানি ও তাহাদের উপর পাশবিক অত্যাচার করা হইয়াছে। গ্রামে কৃষকের বীজধান, চাল, ডাল, গরু-বাছুর, ছাগল, হাঁস-মুরগি, তরিতরকারি ইত্যাদি লুটিয়া লওয়া হইয়াছে। শহরের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের তালা ভাঙ্গিয়া মূল্যবান দ্রব্যাদিসহ নগদ টাকা-পয়সা লওয়া হইয়াছে এবং বহুসংখ্যক ব্যাংক ও সরকারি কোষাগার এ বর্বর সৈনিকেরাও লুটতরাজ করিয়াছে। শহরের স্কুল-কলেজের মেয়েদিগকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। হতভাগিনীদের ভাগ্যে কি ঘটিয়াছে– কে জানে? এরূপ নির্মম অত্যাচারের মর্মন্তুদ ঘটনা কোনো দেশে কোনো কালে ঘটিয়াছে বলিয়া কাহারো জানা আছে কি? ইতিহাস এরূপ বর্বর নির্মম অত্যাচারের সাক্ষ্য দেয় না।"

"পূর্ব বাংলা কৃষক-শ্রমিক, কামার-কুমার, মাঝি-তাঁতী, কুটিরশিল্পী, ছাত্র, ব্যবসায়ী, বুদ্ধিজীবীসহ আপামর জনসাধারণের কাছে মওলানা ভাসানীর আবেদন– "আপনারা ইস্পাতদৃঢ় ঐক্য গড়িয়া তুলুন। পূর্ব বাংলার মুখচেনা কতিপয় সুবিধাবাদী দালাল সাজিয়া ধর্মের নামে, তথাকথিত সংহতির নামে, মিথ্যা প্রচার চালাইয়া আপনাদিগকে বিভ্রান্ত করিতে অপচেষ্টা চালাইতেছে। পূর্ব বাংলার এসব মীরজাফরগণ গত ২৩ বৎসর যাবৎ বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পিছনে ছুরিকাঘাত করিয়াছে। এ বিশ্বাসঘাতকদের কথায় আপনারা কান দিবেন না। বর্তমান মুহূর্তে একতা আর মনোবল ও জ্বলন্ত দেশপ্রেমই হইতেছে আমাদের একমাত্র অস্ত্র। জয় আমাদের সুনিশ্চিত। আল্লাহ জালেমকে ঘৃণা করেন। আমাদের মহান সংগ্রামের পক্ষে আল্লাহর সাহায্য নিশ্চিত পাইব এবং পূর্ব বাংলাকে সুখী-সমৃদ্ধিশালী স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ হিসেবে গড়িয়া তুলিব।"

'মওলানা ভাসানীর নিক্সনকে চিঠি'

একই দিনে ভাসানী চীনের চেয়ারম্যান মাও সে তুঙ, প্রধানমন্ত্রী চৌএন লই এবং আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সনের কাছে ব্যক্তিগত বার্তা পাঠিয়ে বাংলাদেশে



মওলানা ভাসানীকে দেয়া মাও সে তুং-এর ট্রাক্টর

গণহত্যার ভয়াবহতা সম্পর্কে অবহিত করেন এবং পাকিস্তানকে অস্ত্র সরবরাহ বন্ধের দাবি জানান। ভারত সরকার তাঁর এসব চিঠিপত্র-তারবার্তা যথাস্থানে পাঠানোর ব্যবস্থা নেন। পত্র-পত্রিকাতেও এসব সংবাদ আসে ফলাও করে। যেমন 'আর অস্ত্র দেবেন না'। 'মওলানা ভাসানীর নিক্সনকে চিঠি' শিরোনামে আনন্দবাজারের সংবাদ এ রকম :

"চীনের চেয়ারম্যান মাও সে তুঙ এবং প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই শুধু নন প্রেসিডেন্ট নিক্সনকেও মওলানা ভাসানী এক ব্যক্তিগত বার্তা পাঠিয়েছেন।

আমেরিকার রাষ্ট্রপতির কাছে মওলানা ভাসানীর আবেদন : "চীনের ও আপনাদের দেয়া সামরিকসম্ভার দিয়ে স্বৈরাচরী একনায়ক জেনারেল ইয়াহিয়া 'বাংলাদেশে' লক্ষ লক্ষ নিরীহ নর-নারী-শিশুকে নির্মমভাবে হত্যা করছে। আপনি অবিলম্বে পাকিস্তানকে নতুন অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ করুন। আপনাদের দেয়া অস্ত্রশস্ত্রও যাতে তারা বাঙালিদের বিরুদ্ধে ব্যবহার না করতে পারে তার ব্যবস্থা করুন। 'বাংলাদেশ' প্রজাতন্ত্রকে অবিলম্বে স্বীকৃতি দিন। তাদের সর্বপ্রকারে সাহায্য করুন।

বিভিন্ন সংবাদ সংস্থার বিদেশী সাংবাদিকরা যাতে বাংলাদেশের ভিতর পরিভ্রমণ করে পশ্চিম পাকিস্তানিদের দ্বারা বাংলাদেশে লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ, গুণ্ডামী, গণহত্যা ও নারী নির্যাতনের প্রকৃতি ও বহর স্বচক্ষে দেখে বিশ্ববাসীর সামনে বাংলাদেশের মর্মন্তুদ কাহিনীর প্রকৃত চিত্র তুলে ধরতে পারেন আপনি তার ব্যবস্থা করলে আমি বাধিত হবো।"

'চেয়ারম্যান মাও সে তুঙ, পিকিং, চীন'

মাও সে তুঙকে তিনি লিখেন :

চেয়ারম্যান মাও সে তুঙ, পিকিং, চীন :

"সমাজতন্ত্রের আদর্শ হচ্ছে অত্যাচার নিপীড়নের বিরুদ্ধে লড়াই করা। একনায়ক জেনারেল ইয়াহিয়া খানের সামরিক চক্রের বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের উপর যে বর্বর অত্যাচার চলিতেছে তা থেকে তাদের বাঁচাবার জন্য আমি আপনার নিকট আবেদন করছি। আপনার সরকারের সরবরাহ করা আধুনিক যুদ্ধাস্ত্রের সাহায্যে ইয়াহিয়ার সামরিক গভর্নমেন্ট নিষ্ঠুর ও নৃশংসভাবে বাংলাদেশের নিরপরাধ, নিরস্ত্র, অসহায়, কৃষক-শ্রমিক, ছাত্র-বুদ্ধিজীবী, নারী ও শিশুদের হত্যা করছে। পশ্চিম পাকিস্তানের কায়েমী স্বার্থের সাহায্যে সামরিকচক্র বাংলাদেশের অত্যাচারিত জনগণের উপর পশুর মতো যে বীভৎস আক্রমণ চালিয়েছে আপনার সরকার যদি তার প্রতিবাদ না করে তবে বিশ্ববাসীর এ ধারণা হবে যে, আপনি অত্যাচারিত জনগণের বন্ধু নন।

বাংলাদেশের নিরপরাধ জনগণের উপর সামরিকচক্র যে নির্যাতন চালিয়েছে তার তুলনা আপনার দেশে চিয়াং কাইসেকের, রাশিয়ার জারের এবং স্বাধীনতা পূর্ব ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শাসনকালেও পাওয়া যাবে না। সম্প্রতি দুর্ভাগা বাংলাদেশে প্রকৃতপক্ষে যে বর্বরতা ও নৃশংসতা চলছে তার প্রচণ্ডতা ও প্রকৃতির সামান্য ভগ্নাংশমাত্র বিবরণ বিভিন্ন ভারতীয় সূত্রে প্রকাশিত হচ্ছে। যে কোনো দেশের, এমনকি ইয়াহিয়া সরকারের

সঙ্গে বন্ধুভাবাপন্ন কোনো দেশের বুদ্ধজীবী ও রাজনীতিকরা যদি সরেজমিনে সবকিছু দেখে যান, তাহলে বিশ্ববাসী বর্বরতার যথার্থ চিত্র ও যথার্থ প্রকৃতি এবং আমার অভিযোগের সত্যতা জানতে পারেন।

আপনি ভালোভাবেই জানেন যে, স্বাধীন বাংলাদেশের সরকারের পিছনে যে প্রকাশ্য জনসমর্থন রয়েছে, কম্বোডিয়ার সিহানুক সরকারের পিছনেও ততোখানি সমর্থন নেই। তাই আপনার নিকট আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ, বাংলাদেশের স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক সরকারকে আপনি সমর্থন করুন, স্বীকৃতি দিন ও সর্বপ্রকারের সাহায্য করুন।

পাক-ভারত উপমহাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের এবং পাকিস্তানের জনগণের অধিকার আদায়ের জন্য আমাকে ৩১ বছর কারাবাস করতে হয়েছে। বর্তমানে আমি ৮৯ বছরের বৃদ্ধ। আমার এ বয়েসে ইয়াহিয়া খানের বর্বর সৈন্যরা আমার সামান্য বাসগৃহ পুড়ে ছাই করে দিয়েছে। বিভিন্ন দেশ থেকে সংগৃহীত আমার মূল্যবান বইগুলোও তারা পুড়ে দিয়েছে। আমার বাড়িতে আগুন লাগাবার পর আমার পরিবারবর্গের ভাগ্যে কী ঘটেছে আমি জানি না।

ইতি

মওলানা ভাসানী।"

সোভিয়েত রাশিয়াকে ধন্যবাদ জানিয়ে...

২৫ এপ্রিল সোভিয়েত নেতাদের কাছে ধন্যবাদ জানিয়ে তারবার্তা পাঠান এবং তা আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয় :

"অসহায় মানুষের উপর ইয়াহিয়া খানের ফৌজের বর্বরোচিত অত্যাচার বন্ধের জন্য জাতীয় (ন্যাশনাল) আওয়ামী দলের (পার্টির) নেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী সোভিয়েট রাশিয়াকে আরো কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন। রুশ প্রেসিডেন্ট পদগর্নী বাংলাদেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে যে কথা বলেছেন, মওলানা ভাসানী তাকে স্বাগত জানিয়ে শনিবার একটি বিবৃতিতে বলেন, "শুধু ওই কথাতেই সব হলো না, অবিলম্বে বসে একটি কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া দরকার।"

'ইয়াহিয়া খাঁকে ভাসানীর চ্যালেঞ্জ'

আনন্দবাজার পত্রিকার ১৬ মে সংখ্যায় 'ইয়াহিয়া খাঁকে ভাসানীর চ্যালেঞ্জ' শিরোনামে একটি বড় প্রতিবেদন ছাপা হয়। সেই সঙ্গে মুদ্রিত ভাসানীর একটি বিরাট প্রতিকৃতি, যার নিচে শিরোনাম 'সে কি অত্যাচার। দেখলে কেউ সুস্থ থাকতে পারে না', 'শনিবার বাংলাদেশের কোনো এক জায়গায় এ ছবি তুলেছেন শ্রী হিরেন সিংহ, আমাদের স্টাফ ফটোগ্রাফার'। রিপোর্টের অংশবিশেষ তুলে ধরা হলো :

"বাংলাদেশ, ১৫ মে। বিশ্বের সকল রাষ্ট্র এবং বিশেষ করে ইয়াহিয়া খাঁর প্রতি মওলানা ভাসানীর চ্যালেঞ্জ, যদি কারো মনে বাংলাদেশের মানুষের প্রাণে দাবি সম্পর্কে কোনো সন্দেহ থাকে তাহলে জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশে গণভোটের ব্যবস্থা করতে পারেন। দেখবেন বাংলার শতকরা ৯৯ জনের বেশি লোক স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের প্রতি সমর্থন জানাচ্ছে।

শনিবার বিকেলে বাংলাদেশের কোনো এক এলাকায় বাংলাদেশের প্রবীণ নেতার সঙ্গে আমি দেখা করি। বুড়ো হয়েছেন ভাসানী সাহেব। বয়স ৮৯। কিন্তু তিনি শারীরিক এবং মানসিকভাবে সম্পূর্ণ সজাগ।"

৩১ মে আনন্দবাজারের আরও একটি রিপোর্টের অংশবিশেষ :

"মুজিবনগর (বাংলাদেশ) ২৯ মে : পিকিংপন্থী জাতীয় (ন্যাশনাল) আওয়ামী দলের (পার্টির) নেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি লোক পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর সঙ্গে জীবনমরণ সংগ্রামে লিপ্ত। তারা মাতৃভূমি রক্ষা করার জন্য বদ্ধপরিকর। তারা এ সংগ্রামে জয়লাভ করবেই।"

৮ জুন আনন্দবাজারে একটি বড় রিপোর্টের শিরোনাম 'রক্তস্নানের মধ্য দিয়ে বাংলার স্বাধীনতা আসবে– মওলানা ভাসানী'।

"বাংলাদেশের কোনো এক স্থান থেকে ৭ জুন, জাতীয় (ন্যাশনাল) আওয়ামী পার্টির নেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী আজ বলেন : বাংলাদেশ যদি অন্যান্য দেশ থেকে সহযোগিতা ও সাহায্য আর না পায়, যতদিন প্রয়োজন হবে তারা লড়াই চালিয়ে যাবে।

বাংলাদেশের কোনো এক স্থান থেকে প্রচারিত এক বিবৃতিতে মওলানা ভাসানী বলেন : বাংলাদেশের সব অঞ্চল আজ দশ লক্ষ বাঙালির রক্তে স্নাত এবং এ রক্তস্নানের মধ্যদিয়েই বাংলার স্বাধীনতা আসবে।"

'বাংলাদেশ জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম সমন্বয় কমিটি'

৩০ ও ৩১ মে কলকাতার বেলেঘাটায় প্রবাসী বামপন্থি রাজনীতিকদের এক দু'দিনব্যাপী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বরদা চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সে সম্মেলনের শেষে ১ জুন গঠিত হয় মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে 'বাংলাদেশ জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম সমন্বয় কমিটি'। গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত থাকার কারণে ভাসানী সে সম্মেলনে উপস্থিত থাকতে পারেননি। ওই সম্মেলনে যাঁরা যোগদান করেছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ডা. সাইফ-উদ দাহার, ডা. মারুফ হোসেন, কাজী জাফর আহমদ, দেবেন শিকদার, আবুল বাশার, অমল সেন, নজরুল ইসলাম, শান্তি ঘোষ, রাশেদ খান মেনন, হায়দার আকবর খান রনো, মোস্তফা জামাল হায়দার, নাসিম আলী প্রমুখ। সম্মেলনের ঘোষণাপত্রে বলা হয় :

"সম্প্রতি মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানী ঐক্যবদ্ধভাবে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামকে অগ্রসর করে নেয়ার যে আহ্বান ও নির্দেশ দিয়েছেন, তাকে অবলম্বন করে বাংলাদেশের ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে পরিচালিত), কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটি, পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি (দেবেন শিকদারের নেতৃত্বে), শ্রমিক-কৃষক কর্মী সংঘ, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (হাতিয়ার), পূর্ব বাংলা কৃষক সমিতি, পূর্ব বাংলা শ্রমিক ফেডারেশন, বাংলাদেশ শ্রমিক ফেডারেশন (পূর্ব পাকিস্তান শ্রমিক ফেডারেশন) এবং পূর্ব বাংলা বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন প্রভৃতি রাজনৈতিক

ও গণসংগঠনের প্রতিনিধিরা এক সম্মেলনে মিলিত হইয়া 'বাংলাদেশ জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম সমন্বয় কমিটি' গঠন করিয়াছেন।...

এ সমন্বয় কমিটির আশু লক্ষ্য হইল সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি ও কর্মপদ্ধতির ভিত্তিতে বাংলাদেশের সরকারের ও মুক্তি সংগ্রামরত সকল শক্তির সাথে সংযোগ ও সমন্বয় সাধন করিয়া জাতীয় মুক্তিযুদ্ধকে সাফল্যের পথে অগ্রসর করিয়া লওয়া। আমরা বিশ্বাস করি বাংলাদেশের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামকে সফল করিয়া তুলিবার জন্য প্রয়োজন সকল দলমত ব্যক্তির সমবায়ে গঠিত একটি সুসংহত ও ঐক্যবদ্ধ জাতীয় মুক্তিফ্রন্টের। তাই এ সমন্বয় কমিটির তরফ হইতে আমরা আওয়ামী লীগসহ স্বাধীনতাকামী অন্যান্য সকল রাজনৈতিক দল, গ্রুপ, গণসংগঠন, শ্রেণীসংগঠন ও দেশপ্রেমিক ব্যক্তিবর্গের নিকট এরূপ একটি জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট গঠনের আহ্বান জানাইতেছি।"

কোহিনূর প্যালেসের বৈঠক

এপ্রিলের শেষে কোহিনূর প্যালেসের একটি কক্ষে মওলানা ভাসানীসহ প্রবাসী সরকারের মন্ত্রিপরিষদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে কমরেড মনি সিং, অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ, শ্রী মনোরঞ্জন ধর উপস্থিত ছিলেন। স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী দলগুলোর পরস্পরের সমঝোতার ভিত্তিতে কলকাতায় অবস্থিত রাজনৈতিক ও ছাত্র সংগঠনগুলোর সংগ্রাম ও দায়িত্বের সমন্বয় সাধন সম্পর্কে আলোচনা হয়।

'তাজউদ্দিন আপোসহীন, তার চিন্তাভাবনা সাফ'

মন্ত্রিসভার সদস্যদের মধ্যে ঐক্যের অভাব ছিল। এছাড়া ছিল পররাষ্ট্রমন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমদের সঙ্গে সিআইএ ও পাকিস্তানের গোপন আঁতাত; যার ফলে স্বাধীনতাযুদ্ধ ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। মওলানা ভাসানী এ সঙ্কটে প্রবাসী সরকারকে সহযোগিতা প্রদান করে মুক্তিযুদ্ধের গতি সঞ্চার করেন।

মওলানা সমন্বয় কমিটির প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেছিলেন–

"ওরা মনে করে আওয়ামী লীগ, মোজাফফর ন্যাপ, মনি সিংহ-এর কমিউনিস্ট পার্টি ও কংগ্রেস ছাড়া আর দ্যাশভক্ত দল নেই। সব মৌরসীপাট্টা, তাও আবার মন্ত্রিসভার মধ্যেই বিরোধ। এ মনোভাব নিয়া স্বাধীনতা লড়াই কত দূর আগাইয়া নিয়া যাইবার পারিবে সন্দেহ আছে।

আপনি কি বলতে চান হুজুর?

— কি আর বলার চাব। মন্ত্রিসভার কেউ কাউকে মানে নাকি? নজরুল, মনসুর আলী, মোশতাক কেডা ছোট কেডা বড়? তাজউদ্দিন প্রধানমন্ত্রী, খুশি কেউ না। মজিবর থাকলে এ সমস্যা দাঁড়াইত না। আওয়ামী লীগের ভিতরকার কোন্দল বহুত ক্ষতি হইবে।

এর দু'দিন পর প্রধানমন্ত্রী আবার কোহিনূর প্যালেসে এলেন। মওলানা ভাসানীর সঙ্গে রুদ্ধদ্বার আলাপ করলেন। যাবার সময় তার ব্যক্তিগত সচিব সাইফুল ইসলামের কক্ষে এসে টুকটাক কথা প্রসঙ্গে বললেন–

সাইফুল সাহেব, আমার চেয়ারের পায়া নড়বড়ে। ব্যাপারটা মওলানা সাহেবকে বোঝাবেন।

তারপর প্রধানমন্ত্রী যা আভাস দিলেন তা শুধু তার নেতৃত্বের বিরুদ্ধে অনাস্থার ষড়যন্ত্রের কথাই নয়...। মন্ত্রিসভার পররাষ্ট্রমন্ত্রীর মার্কিন ও পাকিস্তান লবির সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে ওঠার খবর তখন বাতাসে উড়ে বেড়াচ্ছে।... হুজুর এ সঙ্কট উত্তরণের জন্য আপনাকে সমর্থন যোগাতে হবে। নইলে স্বাধীনতা সংগ্রাম বিপন্ন হবে।

– তাজউদ্দিন আপসহীন, তার চিন্তাভাবনা সাফ। কিন্তু তাকে ফালায় দেওয়ার জন্য চক্রান্ত চলিতেছে, তা সামাল দেয়া কঠিন...।

– মোকাবিলার একটি পথ স্বাধীনতার পক্ষের সব দল মিলামিশা কাজ করা। মন্ত্রিসভাতে না হইলেও উপদেষ্টা পরিষদে সব দলকে নেয়া উচিত।...

– এমন ছুঁৎ কর্মা নিয়ে স্বাধীনতা যুদ্ধ চলে না। হিটলারের বিরুদ্ধে কমিউনিস্ট আর অকমিউনিস্টরা একসাথে যুদ্ধ করে নাই! চিয়াং কাইশেকের মতো প্রতিক্রিয়াশীল মানুষও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য জাপানের বিরুদ্ধে কমিউনিস্ট পার্টির সাথে হাত মিলাইছিল। ভিয়েতনামে বাম-ডান বাইশ দল একসাথে লড়িতাছে। প্যালেস্টাইনে ইহুদিদের বিরুদ্ধে নরম-গরমেরা একাট্টা হয় নাই? ইতিহাস থাইকা এরা শিক্ষা নিব না। আর স্রেফ আওয়ামী লীগের দোষ দিয়া কি হইব, এত বড় একটা মহাসঙ্কটে বামপন্থীরাই এক হওয়ার পাইরল না। মিটিং-এ বইসলে আমি কই এক কথা, আর মনি-মোজাফফর কয় আর এক কথা। খালি আমাকে বুঝাইয়া কি হইবে, তোমার নেতাকে বুঝাও মেননদের কমিটিতে নিক।"

'মওলানা আঃ হামিদ খান ভাসানীর আবেদন'

ভাসানী রনো-মেননকে পত্র লিখেছেন। খন্দকার মোশতাক ভাসানীর সঙ্গে দেখা করতে আসেন। তার দল যুদ্ধ নিয়ে তেমন আলোচনা না করে এড়িয়ে গেলেন। 'জয় বাংলা' পত্রিকার প্রধান সম্পাদক আবদুল মান্নান এমএনএ তার সঙ্গে দেখা করে 'জয় বাংলা' পত্রিকার জন্য বিবৃতি চাইলেন। তিনি নিচের বিবৃতি দিলেন :

"লাখ লাখ নিরপরাধ মানুষকে হত্যা, অগণিত নারীর ইজ্জত হরণ করিয়া, ঘরবাড়ি পোড়াইয়া, ধন-সম্পত্তি ধ্বংস করিয়া, নারী-শিশু, নরঘাতক বর্বর পাকিস্তান হানাদারেরা বাংলাদেশে ভয়াবহ রক্তাক্ত তাণ্ডবলীলা অব্যাহত রাখিয়াছে। জীবন ও মান-সম্ভ্রম বাঁচাইবার তাগিদে লাখ লাখ মানুষ বাড়ি-ঘর সয়-সম্পত্তি ছাড়িয়া সীমাহীন দুর্গতি দুর্ভোগ সহিয়া সীমান্ত অতিক্রম করিতে বাধ্য হইতেছে। সেই জল্লাদদের সাথে কোনো প্রকার মধ্যস্থতা করার কোনো প্রশ্নই উঠিতে পারে না। এ গণঘাতকদিগের সহিত কোনো প্রকার রাজনৈতিক সমঝোতা শুধু অবাস্তব ও অবান্তরই নহে, ইহা হইবে জাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার শামিল। যদি কোনো দল বা ব্যক্তি এরূপ হীন প্রচেষ্টা চালায় তবে তাহারা জাতীয় বিশ্বাসঘাতক বলিয়াই চিহ্নিত হইবে। নিক্ষিপ্ত হইবে ইতিহাসের আঁস্তাকুড়ে। যুদ্ধই একমাত্র সমাধান। স্বাধীনতার জন্য এ ন্যায়সঙ্গত যুদ্ধে হয় আমরা জিতিব না হয় নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইব। ইহা ছাড়া আর কোনো বিকল্প নাই।"

এ বক্তব্যের সঙ্গে তিনি সমগ্র বাঙালি জাতিকে একাত্ম হয়ে পাক হানাদারদের বিরুদ্ধে লড়ে যাবার আহ্বান জানান। পরবর্তীতে এ বিবৃতির সঙ্গে সংযোজন করে আর একটি বিস্তৃত বিবৃতি– "মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর আবেদন"– এ শিরোনামে ছাপিয়ে মুক্তিযোদ্ধা শিবির এবং শরণার্থী শিবিরে বিতরণ করা হয়। এ বিবৃতি হলো মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে ভারত প্রবাসকালীন লিখিত বিস্তৃত ও মূল দলিল।

সর্বদলীয় উপদেষ্টা কমিটি

মওলানা ভাসানী মুজিবনগর সরকারকে সমর্থন ও সহযোগিতা করেন। তিনি বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে বাংলাদেশ সরকার পরিচালনায় প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। মুজিবনগর সরকার ও বিভিন্ন দলের সঙ্গে তাঁর বৈঠক হয়। সভায় ভাসানীর প্রস্তাব অনুসারে মুক্তিযুদ্ধ ও সরকার পরিচালনার নীতি নির্ধারণ সংক্রান্ত একটি সর্বদলীয় উপদেষ্টা কমিটি গঠন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ভাসানীর নেতৃত্বে চারটি প্রগতিশীল দলের প্রতিনিধি নিয়ে কমিটি গঠন করা হলো।

মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী	সভাপতি	ন্যাপ
তাজউদ্দিন আহমেদ	সদস্য	আওয়ামী লীগ
খন্দকার মোশতাক আহমদ	সদস্য	আওয়ামী লীগ
কমরেড মনি সিং	সদস্য	কমিউনিস্ট পার্টি
শ্রী মনোরঞ্জন ধর	সদস্য	কংগ্রেস
অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ	সদস্য	ন্যাপ (মোজাফফর)

সভায় সিদ্ধান্ত হয়, তাজউদ্দিন আহমেদ সভার বৈঠক আহ্বান ও পরিচালনা করবেন। এদিকে খন্দকার মোশতাকের নেতৃত্বে একটি উপদল আমেরিকার সিআইএ'র মাধ্যমে পাকিস্তানের সঙ্গে সমঝোতার এবং প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে একটি অনাস্থা প্রস্তাবের ষড়যন্ত্র শুরু হয়। ভাসানীর নেতৃত্বে সর্বদলীয় কমিটি করার ফলে মুজিবনগর সরকার রক্ষা পায়। ভাসানীর সাহসী ভূমিকা স্বাধীনতা সংগ্রামকে শক্তিশালী ও গতিশীল করে বিজয়ের পথে নিয়ে যায়।

মওলানা ভাসানী জেদ ধরলেন...

মওলানা ভাসানী আবার জেদ ধরলেন। তিনি কলকাতায় থাকবেন না। আসাম যেতে চান। মি. চ্যাটার্জী ভাসানীকে কলকাতায় থাকার পরামর্শ দেন। ভাসানী কলকাতার বাইরে যাবেনই। এক সপ্তাহের মধ্যে ভাসানী কলকাতা ছাড়লেন। পশ্চিমবঙ্গ থেকে আসামের পথে কুচবিহারের পুণ্ডিবাড়িতে একটি বাড়িতে তার থাকার ব্যবস্থা হলো। এখানেও বাংলাদেশ থেকে অনেক শরণার্থী এসেছে। শরণার্থীদের সংখ্যা যত বাড়ছে সমস্যা তত বাড়ছে। পশ্চিম বাংলার মুসলমান ও নকশালরা বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম পছন্দ করে না। তারা চীনপন্থি। বাংলাদেশের চীনপন্থি কমিউনিস্ট পার্টি মুক্তিযুদ্ধ সমর্থন করেনি। তাদের মধ্যে যারা সমর্থন করেছে তারা যুদ্ধ করার সুযোগ পায়নি। তাদের অস্ত্র দেয়া হয়নি।

পুণ্ডিবাড়ি অবস্থানকালে মওলানা ভাসানী অসুস্থ হয়ে পড়েন। ভারত সরকার তার সুচিকিৎসার জন্য ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান দিল্লির অল ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব মেডিকেল-এ পাঠানোর ব্যবস্থা করে। বাগডোগারা বিমানবন্দর হতে দিল্লি পালাম বিমানবন্দরে এসে পৌঁছলেন। তাঁকে সরাসরি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এ সময় ছিল গ্রীষ্মকাল। মে-জুন মাস খুব গরম থাকে। কেরালার ডা. ট্যান্ডানের চিকিৎসায় মওলানা দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠলেন। পূর্ণ আরোগ্য লাভের জন্য তাঁকে দেরাদুনের শৈলাবাসে পাঠানো হবে। দেরাদুনে এক সুন্দর সার্কিট হাউজে ভাসানী ও তার সঙ্গীদের নিবাস। তারা দেরাদুনে বেশকিছু দিন ছিলেন।

দিল্লি থেকে খবর এলো কলকাতায় উপদেষ্টা পরিষদের সভা হবে। ভাসানীকে অবশ্য সে সভায় যেতে হবে। অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি কলকাতায় যাননি। তিনি মুজিবনগর সরকারের সব কাজে সন্তুষ্ট ছিলেন না। দ্বিমত হতে পারে– এ কারণে উপদেষ্টা পরিষদের সভায় না যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

মওলানা ভাসানীকে ইন্দিরার ঈদ উপহার

প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী মওলানা ভাসানীকে ঈদ উপহার পাঠিয়েছিলেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তিনি দেখা করলেন। প্রধানমন্ত্রী তাঁর সফদর জং রোডের কার্যালয়ে কক্ষের দরজায় এসে দু'হাত জোর নমস্কারে মওলানা ভাসানীকে অভ্যর্থনা জানালেন। ভাসানী তাঁকে সালাম জানালেন। তিনি উর্দু ভাষায় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করেন। আলোচনাকালে তিনি বলেন, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর সঙ্গে পরিচয় ছিল। এলাহাবাদ আনন্দ ভবনে তিনি গেছেন এবং ইন্দিরাকে ছোট দেখেছেন। স্বাধীনতাযুদ্ধে তার সরকারের সাহায্যের জন্য শুকরিয়া জানালেন। বিশেষ করে তাকে মেহমানদারি করার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানান।

মওলানা ভাসানী ইন্দিরা গান্ধীকে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানের অনুরোধ জানান। ইন্দিরা উত্তরে বলেন, সময় হলে অবশ্যই বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়া হবে।

স্বাধীন বাংলাদেশের সীমারেখা

ভারত সরকারের পররাষ্ট্র বিষয়ের সমন্বয় কমিটির চেয়ারম্যান ডিপি ধর মওলানা ভাসানীর সঙ্গে আলোচনা করতে চান। বিশেষ কারণে ডিপি ধর আসেননি। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি মি. নাগ্রানী মওলানা ভাসানীর সঙ্গে দেখা করতে এলেন। তিনি প্রথমে তাঁর ব্যক্তিগত সচিব সাইফুল ইসলামের সঙ্গে আলোচনা করেন। নাগ্রানী স্বাধীন বাংলাদেশের সীমারেখা সম্পর্কে জানতে চাইলেন। পরে তিনি ভাসানীর সঙ্গে আলোচনা করেন। আলোচনার এক পর্যায়ে ভাসানী বলেন, ... আমি ১৯৫৭ সালে পশ্চিম পাকিস্তানকে 'আসসালামু আলাইকুম' বলেছিলাম। বলেছিলাম পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানের ভিত্তিতেই আমি প্রথমে স্লোগান তুলেছিলাম স্বাধীন পূর্ববঙ্গের। পূর্ববঙ্গের সীমারেখা আপনারা জানেন, আমরাও জানি।

প্রকৃতপক্ষে ভারতের ভয় ছিল, ভাসানী ও মুজিবনগর সরকার আসাম ও পশ্চিম বাংলা দাবি করতে পারে। ১৯৪৬-'৪৭ সালে তিনি আসামকে পূর্ব পাকিস্তানভুক্ত করার জন্য আন্দোলন করেন। সে জন্য ভারতের ভয় ছিল যে আসামের ওপর মওলানার কোনো দাবি আছে কি-না। স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার প্রথম থেকে সরকারের পতাকায় বাংলাদেশ মানচিত্র অঙ্কিত করে যুদ্ধ শুরু করে। সুতরাং বাংলাদেশের মানচিত্র সম্পর্কে কোনো ভুল বোঝাবুঝি থাকতে পারে না।

৫ একর জমি ও ৪ খানা টিনের ঘরের আবেদন

মওলানা ভাসানী আসামে স্থায়ীভাবে বাস করার জন্য আসামের ধুবড়ীর গ্রামে ৫ একর জমি বরাদ্দ ও ৪ খানা টিনের ঘর নির্মাণের জন্য এক পত্র লেখেন। ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করে পত্রটি প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর কাছে পাঠানো হয়। ভাসানীর নিজ হাতে লেখা চিঠিটি তুলে ধরা হলো :

প্রিয় শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী,

প্রধানমন্ত্রী।

"আমার আন্তরিক আশীর্বাদ ও ভালোবাসা জানিবেন। আমার পত্রের উত্তর মি. কাউলের ম্যাসেজে বিস্তারিত অবগত হইয়া যারপরনাই খুশি হইলাম।

আমার বাল্য জীবনের আদর্শ ৮৯ বছর যাবৎ অটুট রাখিয়াছিলাম। স্বৈরাচারী এহিয়া সরকারের অমানুষিক অত্যাচারে তা লঙ্ঘন করিতে হইল। বর্তমানের রাজনীতিবিদ কংগ্রেসের কর্মীদেরকে যে যাহাই বলুক কিন্তু তাহাদের মতো বিলাসিতাশূন্য জীবন যাপন ও নির্মল চরিত্র অনেকেরই নাই। আমি চিরদিন সাধারণ গৃহে সাধারণভাবে নির্জন পল্লীতে থাকিয়া দেশের সেবা করিয়াছি। কিন্তু এবারই তাহার ব্যক্তিক্রম হইল। গত ৭ মাসে শহরে প্যালেসেস সার্কিট হাউসে বাস-আহারাদী, বিলাসপূর্ণ। তাই আমার মৃত্যুকাল পর্যন্ত যাহাতে বাল্য জীবনের আদর্শ বহাল থাকে তাহারই জন্য ৫ একর জমি ও সাধারণ ধরনের ৪ খানা ঘরের ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। আমার প্রথম পুত্রের মৃত্যু হয় ধুবড়ীর গ্রামে। তাই আমার বৃদ্ধা স্ত্রীর আশা তাহার শেষ দাফন ধুবড়ীর কোনো গ্রামে হয়। আমার শেষ সংগ্রাম বাংলাদেশকে স্বাধীন করা, সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠা, ভারতের সাথে কনফেডারেশন। এ তিন কাজের সাধন ইনশাআল্লাহ আমার জীবিতকালে দেখার প্রবল ইচ্ছা অন্তরে পোষণ করি।

বাধা যতই আসুক, আমার আন্তরিক আশা ও বিশ্বাস আপনাদের আশীর্বাদে অবশ্যই পূর্ণ হইবে। আমার আন্তরিক আশীর্বাদ আপনার আদর্শানুযায়ী সমাজতন্ত্র শুধু ভারতে নয় এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকায় অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত হইবে। যখন দরকার মনে করেন দিল্লিতে ডাকাইলেই হাজির হইব।"

এ প্রসঙ্গে ব্যক্তিগত সচিব সাইফুল ইসলাম বলেন :

"মওলানা সাহেবের নিজ হাতে লেখা এ খসড়া বারবার পড়লাম। এ মুহূর্তে মওলানা ভাসানীকে রহস্যময় মনে হলো। রানীক্ষেত্রে তিনি নিজ হাতে এ ধরনের আরও একটি

খসড়া দাঁড় করিয়ে আমাকে দিয়েছিলেন। অনুবাদ করে ভারতের প্রধানমন্ত্রী বরাবর পাঠিয়ে দিতে। আসামেও আমাকে দিয়ে এ ধরনের একটা খসড়া দাঁড় করিয়েছিলেন। রানীক্ষেত্র ও আসামের খসড়ায় তিনি ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীকে এ নিশ্চয়তা দিয়েছিলেন, তাকে আসামে থাকতে দিলে তিনি আসাম ও ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামাবেন না এবং ভারত সরকারকে তার খরচ বহন করতে হবে না। অবশ্য ওই দুটো চিঠিতে ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের কনফেডারেশনের কথা উল্লেখ করেছিলেন।"

সাদা প্যাডের সই নিয়ে মহাজালিয়াতি

৩ অক্টোবর মওলানা ভাসানী ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে এক ঐতিহাসিক পত্র লেখেন :

"সম্মানীয়া মহোদয়া,

আপনার জন্য আমার অশেষ ভালোবাসা এবং আশীর্বাদ গ্রহণ করবেন। পুনরায় আপনার অমূল্য সময় হতে কয়েক মিনিট অপচয় করার কারণে আশা করি আপনি নিজ গুণে ক্ষমা করবেন।

আপনার সরকার সাধ্যমত উত্তম চিকিৎসা করা সত্ত্বেও পুরানো জ্বালাটা অনুভব করছি। ছয় মাস পেরিয়ে গেছে আমি আমার স্ত্রী এবং নাতনিদের কোনো সংবাদ জানি না। তাদের কোনো প্রকার খবরাখবর না জানায় আমার বেদনাদায়ক অনুভব আপনি বুঝতে পারছেন– এ সম্পর্কে আমি নিশ্চিত।

বাংলাদেশের প্রথম কাতারের নেতারা যারা স্বাধীনতার জন্য কাজ করছেন তাদেরও সততা সম্পর্কে আল্লাহই জানেন। আমি পুনরায় ওয়াদা দিচ্ছি আওয়ামী লীগ যতক্ষণ বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য লড়বে আমি তাদের সমর্থন দিয়ে যাব।

সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে যখন আমি কলকাতায় ছিলাম তখন কতিপয় আওয়ামী লীগ নেতা আপনার বরাবর একটি লেখা টাইপ করে নিয়ে এসেছিলেন যে, অসুস্থতার দরুন আমি আপনার সাথে দেখা করতে সক্ষম হব না। চিঠির পুঙ্খানুপুঙ্খ না পড়ে কেবলমাত্র বিশ্বাসে তাতে সই দিয়েছিলাম। ওর পেছনে কি মতলব আছে আমি তা জানি না। তারা ওয়াদা করেছিলেন যে ওই চিঠির কপি আমাকে দেবেন। কিন্তু তারা কথা রক্ষা করেননি। আমার রাজনৈতিক জীবনে আমি ১১ বছর যাবৎ আসাম মুসলিম লীগের সভাপতি ছিলাম এবং স্বাধীনতা উত্তরকালে আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠা করে ৮ বছর যাবৎ তার সভাপতি ছিলাম এবং আমি ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি এবং কৃষক সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। এ পদে গত ১২ বছর যাবৎ কাজ করে যাচ্ছি। দীর্ঘকাল এ রাজনৈতিক জীবনে বিভিন্ন সংগঠনের সভাপতির কাজে আমার পরিচালনায় কম করে হলেও ১৬ জন সেক্রেটারি কাজ করছেন। কিন্তু আমি গ্রামেই বাস করি। ফলে জরুরি রাজনৈতিক চাহিদা মুকাবিলা করার জন্য আমার সাদা প্যাডে বহু সহি তাদেরকে দিয়েছি। এসব আমি ভালোভাবে উপলব্ধি করছি তারা বিশ্বাসঘাতকতা করে আমার সরল বিশ্বাসের বহু মওকা গ্রহণ করেছে। ফলে আমার রাজনৈতিক সহযোগিতার উপর আমার বিশ্বাস চটে গেছে। এ কারণে আমার মানবিক বেদনার জন্যই এসব অবান্তর কথা আপনাকে লিখছি।

বিশ্বশান্তি, নিপীড়িত মানুষের মুক্তি এবং আল্লায় বিশ্বাসসহ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় আপনার মহৎ সংগ্রাম আপনি অব্যাহত রাখবেন বলে আমি আশা ও বিশ্বাস করি এবং আমি খোলামনে আপনার প্রতি সকল বিশ্বাসের স্বীকারোক্তি করছি। যদি কোনো বিষয়ে আমি আপনার সাথে দ্বিমত পোষণ করি তবে ব্যক্তিগতভাবে আপনার সাথে সাক্ষাৎ করে সেই পয়েন্ট নিয়ে আলোচনা করব। আপনার মূল্যবান উপদেশ ব্যতীত আমি কোনো সিদ্ধান্ত নেব না, কোনো কাজ করবো না। যদি আমার বিরুদ্ধে আপনার কাছে কোনো রিপোর্ট পেশ হয়ে থাকে তবে বিশ্বাস করুন আমি জীবনে কাউকে ঠকাইনি এবং শেষ জীবনেও ঠকাবো না। আমার দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে আমি সক্রিয়ভাবে কাজের সাথে জড়িত আছি। আপনি যদি আমাকে সক্রিয়ভাবে কাজের সাথে জড়িত রাখার ব্যবস্থা করতে পারেন তবে আমি সুখী ও আনন্দিত হবো। বৃদ্ধ বয়সের জন্য অনুগ্রহ করে আমাকে অবহেলা করবেন না। যদি কাজ করার এ আজীবন অভ্যাস হতে দূরে রাখা হয় তবে আশঙ্কা করছি তা আমার স্বাস্থ্যের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া করবে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সপক্ষে জনমত সৃষ্টির জন্য কিছুদিন আগে মি. ডিপি ধরের নিকট কিছু লেখা পাঠিয়ে তা ইংরেজি, বাংলা, চীনা, আরবি, উর্দু, ফরাসি, রাশিয়ান, জার্মান প্রভৃতি ভাষায় ছাপিয়ে ওই সকল দেশে বিতরণের জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলাম। অনুরোধ মোতাবেক কাজ হলে আমি সুখী হবো। রমজান মাসে আমি পশ্চিমবঙ্গ অথবা আসামের কোনো স্থানে থাকতে চাই। পবিত্র মাস শেষে আমি আবার এখানে ফিরে আসতে চাই।

আমি আপনাকে এ নিশ্চয়তা দিতে পারি যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন এবং ভারতের সাথে স্বাধীন বাংলাদেশের কনফেডারেশন গঠন করার লক্ষ্যে আমি আমার সংগ্রাম অক্ষুণ্ন রাখবো।

এ বুড়ো বয়সে স্ত্রী ও নাতনিদেরকে নিয়ে আসামের ধুবড়ী মহকুমার যে কোনো স্থানে বাস করার জন্য যদি আপনি পাঁচ একর জমিসহ ক'টি টিনের ঘরের ব্যবস্থা করে দেন তাহলে এ বদান্যতার জন্য আমি আপনার নিকট কৃতজ্ঞ থাকবো। আসামের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে আমি কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ করবো না। আপনার এবং আসাম সরকারের নিকট আমি এ প্রতিজ্ঞা করছি। ছয় মাস যাবৎ আমার থাকা, খাওয়া, পরার জন্য আপনার উপর নির্ভরশীলতার দরুন অত্যন্ত লজ্জাবোধ করছি। যদি ধুবড়ী থাকতে আমাকে অনুমতি দেয়া হয় তাহলে সরকারী তহবিল হতে আমার জন্য অর্থ খরচের দরকার পড়বে না। যেই আমাকে প্র-চাইনীজ বলে আপনার কাছে চিহ্নিত করতে অপচেষ্টা করুন, ইনশাআল্লাহ আমি ভারত ও আপনার অবাধ্য হবো না।

সর্বাধিক সম্মান সহকারে,

আপনার বিশ্বস্ত

মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী"

তিনি রানীক্ষেত্র ও আসামে বসে এমনি চিঠি লিখেছিলেন। তিনি প্রধানমন্ত্রীকে নিশ্চয়তা দেন যে, তাকে আসামে থাকতে দিলে তিনি আসাম ও ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করবেন না।

মওলানা ভাসানী দেরাদুনে এসে মাও সে তুং ও জাতিসংঘের মহাসচিবের কাছে কয়েকটি টেলিগ্রাম পাঠান। তিনি বাংলা লিখতেন এবং তার একান্ত সচিব তা ইংরেজিতে অনুবাদ করে পাঠাতেন।

অষ্টাবামের বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে নাসের খান ভাসানী স্ত্রী-ছেলেমেয়ে নিয়ে দিল্লিতে ভাসানীর সঙ্গে দেখা করতে আসেন। তিনি ছেলের অভিযোগের ওপর তেমন গুরুত্ব দেননি।

'প্রোফেট অব ইন্ডিপেনডেন্স'

মওলানা ভাসানী একস্থানে বেশি দিন থাকতেন না। তার মন ছিল অস্থির-একদিকে মুজিবনগর সরকারের সঙ্গে তাদের মতের তেমন মিল ছিল না, অন্যদিকে বামপন্থী ও তার নিজের দলের ওপরও সন্তুষ্ট ছিলেন না। বিশেষ করে তার প্রিয় চীন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করছে এবং পাকিস্তানকে সহায়তা করছে।

মওলানা ভাসানী রানীক্ষেত্রে যাবেন। বিএসএফের পরিচালক মি. সিনহা সব ব্যবস্থা করছিলেন। দেরাদুনে ভাসানীর দিনগুলো ভালো কেটেছে। তিনি বিভিন্ন স্থান ঘুরে দেখেছেন। তিনি তার দু'মেয়েকে নিয়ে ঘুরেছেন। দেরাদুনে সামরিক একাডেমি ব্রিটিশ যুগ থেকে খ্যাত। সামরিক কর্মকর্তাদের এখানে ট্রেনিং হয়। স্বাধীন বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ এখানে চলেছিল। দেরাদুনে জেনারেল রুদ্রের সঙ্গে ভাসানীর দীর্ঘ আলোচনা হয়। রুদ্র তার সংগ্রামী জীবন কাহিনী শুনে বলেন, আপনি দেশের কিংবদন্তির নায়ক। ইউরোপিয়ান বলে ফায়ার ইটার মওলানা, প্রফেট অব ভায়োলেন্স। এখন দেখছি আপনি প্রোফেট অব ইনডিপেনডেন্স।

মওলানা ভাসানী জেনারেল রুদ্রের বাসভবনে গেলেন এবং তার দু'দিন পর রানীক্ষেত্রে চলে আসেন। পথে তিনি রামপুর এক রাত কাটান। ভাসানী অক্টোবর মাসে রানীক্ষেত্রে ছিলেন। এ সময় এ অঞ্চলে প্রচণ্ড শীত পড়ে। এখান থেকে হিমালয়ের সাতটি শৃঙ্গ– কাঞ্চনজঙ্ঘা, গৌরি শৃঙ্গ, নন্দাদেবী, ধবলগিরি প্রভৃতি একসঙ্গে দেখা যায়। অপরূপ রানীক্ষেত্র আসলেই রানী।

মুজিবনগর সরকার উপদেষ্টা পরিষদের সভার জন্য কলকাতা আসার অনুরোধ জানায়। বারবার তাগিদ আসছে। কিছুদিন পর রানীক্ষেত্র থেকে উপদেষ্টা পরিষদের আহ্বায়ক ও প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদকে ভাসানী এক টেলিগ্রাম পাঠালেন–

"প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় হাঁপানী ধরনের কাশিতে ভুগছি। রমজান মাসে কাশিও থাকার কথা আছে। চব্বিশ বছরের আন্দোলনের অভিজ্ঞতায় এটি নিশ্চিত বুঝেছি যে, কোনো প্রকার আপসের মাধ্যমে নয় পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা না হয় মৃত্যুবরণ– এ আমার শেষ কথা।" টেলিগ্রামের কপি দিলেন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ও ভারতের পররাষ্ট্রনীতি সমন্বয় কমিটির চেয়ারম্যান ডিপি ধরকে। ফলে উপদেষ্টা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়নি।

আ. লীগের একলা চলো নীতি

মওলানা ভাসানী আসামে থাকতে চান; কলকাতা থাকায় তার অনীহা। কারণ তিনি মনে করতেন, মুজিবনগর সরকারে তার অবস্থান গুরুত্বহীন। আওয়ামী লীগের একলা চলো নীতির ফলে মওলানা ভাসানী নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখেন। বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রাম সমন্বয় কমিটির কোনো প্রতিনিধি উপদেষ্টা পরিষদে নেয়া হয়নি। তারা থাকলে ভাসানীর হাত শক্ত হতো। তিনি বিশ্বাস করতেন ভারত-পাকিস্তানের যুদ্ধের ওপর নির্ভর করে যদি বাংলাদেশ স্বাধীন হয়, তার ভিত্তিমূল দৃঢ় হবে না। স্বাধীনতা এলেও মুক্তি আসবে না। অর্থনৈতিক মুক্তি ছাড়া রাজনৈতিক স্বাধীনতা হবে অর্থহীন। ভাসানী বলতেন–

"আমি হিন্দুস্তানের সাহায্য-সহযোগিতা চাই; কিন্তু নির্ভরশীল হইবার চাই না।"

মওলানা ভাসানী রানীক্ষেত্র থেকে দেরাদুনে ফিরে আসেন। দেরাদুন থেকে তিনি কলকাতা যাবেন। বিমানবন্দরে বিদায় দিতে এলেন লভরাজ দম্পতি, ক্যাপ্টেন ফাত্তাহ বানু ও মি. সর্মা। সাহারানপুর বিমানবন্দর হতে একটা বিশেষ বিমানে ভাসানী ও তার সঙ্গীরা কলকাতা এলেন।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের মাটিতে প্রথম শহীদ

মওলানা ভাসানী কলকাতায় হাজরা স্ট্রিটের একটি বাড়িতে উঠলেন। এ সময় ন্যাপ (মোঃ) নেতা দেওয়ান মাহবুব আলী দিল্লিতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। তার মৃত্যুতে ভাসানী ভেঙে পড়েন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের মাটিতে প্রথম শহীদ দেওয়ান মাহবুব আলী।

ক্ষমা নেই, বিশ্বাসঘাতকদের

হাজরা স্ট্রিটের বাসভবনে উপদেষ্টা পরিষদের সভা বসল। মওলানা ভাসানী বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন। পর দিন বৈঠকের সচিত্র সংবাদ পত্রিকায় ছাপা হলো এবং মুক্তিযোদ্ধারা উৎসাহিত হলো। এ সময় মুক্তিযুদ্ধ তীব্র হচ্ছে– অন্যদিকে গোপনে ষড়যন্ত্র চলছে। তিনি এক বিবৃতিতে বলেন–

"বাংলাদেশর সর্বাঙ্গীণ মুক্তি সংগ্রামকে পাশ কাটাইয়া যাহারা আপসকামিতার গোঁজামিলে এহিয়া খানের সাথে হাত মিলাইবার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র চালাইতেছেন তাহারা জাতীয় গাদ্দার। তাহাদের চরম পরিণতি কেহ ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবে না। লক্ষ লক্ষ নর-নারীর রক্তদানে, আত্মত্যাগ, ইজ্জতদান, কোটি কোটি মানুষের চরম দুর্দশা কোনোদিনই এই গাদ্দারদিগকে ক্ষমা করিবে না। আমি তাহাদের জাতির প্রতি এ জঘন্য বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে চরম হুঁশিয়ারি জ্ঞাপন করিতেছি।"

অবশেষে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এলেন

এবার মওলানা ভাসানী কলকাতায় অল্পদিন ছিলেন। ভারত সরকার তাকে আসামে যাওয়ার অনুমতি দিলেন। দমদম বিমানবন্দর থেকে সামরিক বিমানে ভাসানী আসামের হাসিমারা বিমানঘাঁটিতে অবতরণ করেন। সেখান থেকে গৌরীপুর রেস্ট হাউজে। পূর্ব ব্যবস্থা অনুসারে গৌরীপুর রেস্ট হাউজ থেকে ভাসানী গেলেন চরভাসানে। চরভাসানে

তাঁর প্রতিষ্ঠিত হাই স্কুলে আশ্রয় নিলেন। এখানে নিজ হাতে তৈরি মাদরাসা, এতিমখানা আছে। দু'যুগ পরে ভাসানের চর হয়ে উঠল আসামের বাঙালিদের তীর্থ স্থান। পীরের দর্শন লাভের জন্য হাজার হাজার লোকের সমাবেশ। পানিপড়া, তেলপড়া চলছে। রাতভর জিকির চলছে। কাগমারীতে এক টাকা চৌদ্দ আনায় নির্মিত প্রথম বসত নদীতে বিলীন হয়েছে। ধুবড়ীতে প্রথম সন্তানের কবর জেয়ারত করলেন। আসামের দিনগুলো ছিল ভাসানীর ভারত প্রবাসের সবচেয়ে আনন্দঘন দিন।

মওলানা ভাসানী ও তাঁর সহযাত্রীরা আসাম ত্যাগ করে দেরাদুনে রওনা দেন। প্রথমে তারা হেলিকপ্টারে গৌরীপুর থেকে বাগডোগরা, বাগডোগরা থেকে বিমানে সাহরানপুর পৌছেন। বিমানবন্দরে ব্রিগেডিয়ার লবরাজ, জয়নাভরাজ, ক্যাপ্টেন ফাত্তাহ বানু খান ও শর্মা ভাসানীকে অভ্যর্থনা জানান। তিনি দেরাদুন সার্কিট হাউজে উঠলেন। তাঁর অবর্তমানে অনেক চিঠি জমেছে। চিঠিগুলো অক্টোবর মাসে লেখা। লন্ডন থেকে লিখেছেন– ফজলুল হক, চেয়ারম্যান ন্যাপ ভাসানী লন্ডন, দেবী প্রসাদ, সেক্রেটারি ওয়ার রেজিস্ট্রেশন ইন্টারন্যাশনাল, মিসেস বারবার হক। চিঠিগুলোর প্রধান বিষয়বস্তু ছিল– মওলানা ভাসানী মুক্ত না বন্দি। তার অবস্থান অনেক চেষ্টা করেও জানা যায়নি। দেরাদুনে মওলানা ভাসানী গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। দিল্লি থেকে একদল বিশেষজ্ঞ ডাক্তার হেলিকপ্টারে দেরাদুনে এলেন। হেলিকপ্টারে তাকে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্স সংলগ্ন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ডা. ট্যান্ডন তাঁর চিকিৎসা করছেন। তিনি সুস্থ হলেন। তিনি দিল্লির শাহী মসজিদে ঈদের নামাজ আদায় করেন। পরদিন পত্রিকায় তার ছবি ছাপা হয়।

৩ ডিসেম্বর পাকিস্তান ভারত আক্রমণ করে। যুদ্ধ শুরু হলো। ভারতীয় বাহিনী ও মুক্তিবাহিনী একত্রে মিত্র বাহিনী গঠন করে পাকবাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। যুদ্ধের মধ্যে মওলানা ভাসানী হাসপাতাল ছেড়ে দিল্লির যমুনা নদীর তীরে এক বাংলোতে ওঠেন। দেশে ফেরা পর্যন্ত তিনি এই বাংলোতেই ছিলেন।

মওলানার আরও একজন সহকারী সিরাজগঞ্জ ন্যাপ নেতা মোরাদুজ্জামান তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দেশে রওনা দেন।

মুক্তিযুদ্ধের মুখপত্র 'গণমুক্তি' সম্পাদক মওলানা ভাসানী

ভারতে থাকা অবস্থায় ভাসানী অর্থ সংগ্রহ করে তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র আবু নাসের খানের মাধ্যমে পশ্চিম দিনাজপুরের একটি ছাপাখানা থেকে গণমুক্তি নামে একটি সাপ্তাহিকীর আত্মপ্রকাশ করেন। পত্রিকায় লেখা ছিল– 'প্রতিষ্ঠাতা মওলানা ভাসানী– ঢাকা, টিপু সুলতান রোডের ঠিকানা থাকলেও গণমুক্তি প্রকাশিত হতো প্রাচ্য ভারতীয় রোড, বালুরঘাট, পশ্চিম দিনাজপুর থেকে। গণমুক্তির প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল '৭১-এর ১ নভেম্বর।

মওলানা ভাসানীর মনোব্যথা

দেশ স্বাধীন হয়েছে– এবার দেশে ফেরার পালা। কথা প্রসঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সচিব সাইফুল ইসলামকে বললেন–

"তামাম জিন্দেগীভর রাজনীতি করলাম। একের পর এক দল গড়লাম, কিন্তু কোনো দলই আমার রাজনীতি রূপ দিবার পারিল না। আওয়ামী লীগ দাবি করিতেছে দ্যাশ স্বাধীন করিছে, কিন্তু মুক্তি তো আইনতে পারিল না।"

ভাসানী মুক্ত না বন্দি

মুক্তিযুদ্ধের শেষ ক'মাস মওলানা ভাসানী মুক্ত ছিলেন না বন্দি ছিলেন তা নিয়ে বিতর্কের কমতি নেই। মুক্তিযুদ্ধের শেষ সময়কার ভাসানীর লেখা চিঠিগুলো পড়ে বুঝাই যাচ্ছিল ভারত সরকার তাকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দিচ্ছে না। ইন্দিরা গান্ধীকে বারবার অনুরোধ করে আসাম যেতে চাইলেও তিনি তা দিয়েছেন অনেক পরে অল্প কয়েকদিনের জন্য খুবই সতর্কভাবে। ভাসানীকে এভাবে বন্দীর করে রাখল কেন ভারত সরকার– এ প্রসঙ্গও উঠে এসেছিল ভাসানী নাতিদের সঙ্গে আমাদের আলোচনায়। কয়েকটি কারণে ভাসানীর প্রতি কড়া নজর রাখা হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধের প্রথম দিকে বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে অস্থায়ী সরকারের প্রধান শক্তি হয়ে উঠেছিলেন ভাসানী। বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে তার নেতৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হতে চলছে দেখে ভারত সরকার তাকে নেতৃত্ব দেয়া থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চেয়েছিল। মওলানা ভাসানী আওয়ামী লীগ করতেন না। তাই তাকে সহজে বিশ্বাসও করতে চাইত না ভারত। বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে সদ্য স্বাধীন হতে চলা বাংলাদেশের মহানায়ক যদি ভাসানী হন তবে বিপদ ভারতেরই। কারণ, ভাসানী হক কথা বলতে কোনো বাচ-বিচার করেন না। এতে করে ভারতের স্বার্থহানি হবার সুস্পষ্ট সম্ভাবনা ছিল। ভাসানী এক সময় আসাম ও পশ্চিমবঙ্গকে বাংলাদেশের সঙ্গে একত্রীকরণের দাবিতে আন্দোলন করেছিলেন। বাংলাভাষাভাষীর প্রতি তাঁর এ অমীয় দরদ '৭১-এও ভাবিয়ে তুলেছিল ভারত সরকারকে। বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের যে কোনো নেতার চেয়ে ভাসানীর বিবৃতি, বক্তৃতা গণমাধ্যমে বেশি প্রচারিত হতো। দেশে-বিদেশে ভাসানীর ধর্মীয় আবেদন ছাড়িয়ে যাওয়া যে কোনো পক্ষের জন্য কঠিন চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াতে পারে। এ আশংকায় ভাসানীকে আর সামনে থেকে নেতৃত্ব দিতে দেয়া হয়নি। ভাসানী যখন বুঝে উঠতে পারলেন তাকে নানাভাবে অবদমিত করে রাখা হয়েছে তখন তিনি ঠিকই স্বভাবসুলভভাবে প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠলেন।

'আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি'

মওলানা ভাসানীকে নিয়ে কবি আবু জাফর উবায়দুল্লাহ লিখেছেন বিখ্যাত 'আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি' কবিতাটি। মওলানা ভাসানীর কথা লিখতে গিয়ে এ কবিতাটির পুনরাবৃত্তি না করে পারাই যায় না।

আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি
আমি আমার পূর্ব পুরুষের কথা বলছি।
তাঁর করতলে পলিমাটির সৌরভ ছিল
তাঁর পিঠে রক্ত জবার মত ক্ষত ছিল।
তিনি অতিক্রান্ত পাহাড়ের কথা বলতেন

অরণ্য এবং শ্বাপদের কথা বলতেন
পতিত জমি আবাদের কথা বলতেন
তিনি কবি এবং কবিতার কথা বলতেন।

জিহ্বায় উচ্চারিত প্রতিটি সত্য শব্দ কবিতা
কর্ষিত জমির প্রতিটি শস্য দানা কবিতা।

যে কবিতা শুনতে জানে না
সে ঝড়ের আর্তনাদ শুনবে,
যে কবিতা শুনতে জানে না
সে দিগন্তের অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে।
যে কবিতা শুনতে জানে না
সে আজন্ম ক্রীতদাস থেকে যাবে।

আমি উচ্চারিত সত্যের মত
স্বপ্নের কথা বলছি
উনোনের আগুনে আলোকিত
একটি উজ্জ্বল জানালার কথা বলছি,
আমার মায়ের কথা বলছি।
তিনি বলতেন প্রবহমান নদী
যে সাঁতার জানে না তাকেয়ো ভাসিয়ে রাখে।

যে কবিতা শুনতে জানে না
সে নদীতে ভাসতে পারে না
যে কবিতা শুনতে জানে না
সে মাছের সঙ্গে খেলা করতে পারে না
যে কবিতা শুনতে জানে না
সে মা'য়ের কোলে শুয়ে গল্প শুনতে পারে না।

আমি বর্তমানের কথা বলছি
আমি বিচলিত স্নেহের কথা বলছি
গর্ভবতী বোনের মৃত্যুর কথা বলছি
আমি আমার ভালবাসার কথা বলছি।
ভালবাসা দিলে মা মরে যায়
যুদ্ধ আসে ভালবেসে মায়ের ছেলেরা চলে যায়।
আমি আমার ভাইয়ের কথা বলছি।

যে কবিতা শুনতে জানেনা
সে সন্তানের জন্য মরতে পারে না
যে কবিতা শুনতে জানে না
সে ভালবেসে যুদ্ধে যেতে পারে না
যে কবিতা শুনতে জানে না
সে মা'য়ের কোলে শুয়ে গল্প শুনতে পারে না।

আমি বর্তমানের কথা বলছি
আমি বিচলিত স্নেহের কথা বলছি।
ভালবাসা দিলে মা মরে যায়
যুদ্ধ আসে ভালবেসে মায়ের ছেলেরা চ'লে যায়।
আমি আমার ভাইয়ের কথা বলছি।

যে কবিতা শুনতে জানে না
সে সন্তানের জন্য মরতে পারে না
যে কবিতা শুনতে জানে না
সে ভালবেসে যুদ্ধে যেতে পারে না
যে কবিতা শুনতে জানে না
সে সূর্যকে হৃৎপিণ্ডে ধ'রে রাখতে পারে না।

আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি
আমি আমার পূর্বপুরুষের কথা বলছি।
তাঁর পিঠে রক্ত জবার মত ক্ষত ছিল
কারণ তিনি ক্রীতদাস ছিলেন।

আমরা কি তাঁর মত কবিতার কথা বলতে পারবো,
আমরা কি তাঁর মত স্বাধীনতার কথা বলতে পারবে!
শ্রোতৃবর্গ, আমি তোমাদের বলছি
যেদিন প্রতিটি শব্দ সূর্যের মত সত্য হবে
সেই ভবিষ্যতের কথা বলছি,
আমি আমার মায়ের কথা বলছি
বোনের মৃত্যুর কথা বলছি
ভাইয়ের যুদ্ধের কথা বলছি
আমি ভবিষ্যতের কথা বলছি।

আমরা কি তাঁর মত স্বাধীনতার কথা বলতে পারবো
আমরা কি তাঁর মত কবিতার কথা বলতে পারবো!

রাজনীতিকে 'আস্‌সালামু আলাইকুম'

ভাসানী পরিবারের ঘরে প্রবেশ করতেই চোখে পড়ল সাজানো চেয়ার-টেবিল, তার ওপরে ব্যানারে লেখা 'খোদা-ই-খেদমতগার' ঠিক ততটাই অবাক হওয়ার মতো ব্যাপার, বাইরে থেকে ভাসানী বাড়ি দেখে যতটা অবাক হওয়া যায়। একেবারে ঘরেই রাজনৈতিক মঞ্চ তৈরি করে নিয়েছেন ভাসানী পরিবার– যেমনটা ভেবেছিলাম মোটেই কিন্তু তা নয়। ভাসানী নাতি খোলাসা করে বললেন এভাবে– 'খোদা-ই-খেদমতগার' একটি অরাজনৈতিক সংগঠন। এর উদ্দেশ্য হলো মহান স্রষ্টার সৃষ্টিজীবের সেবা করা। মানুষসহ অন্যান্য প্রাণীকুলের খেদমত করার উদ্দেশ্যে মওলানা ভাসানী একেবারে শেষ জীবনে এসে এটি গঠন করেন। ১৯৭৬ সালে অসুখে-অসুখে হাসপাতালে দিন যাচ্ছিল ভাসানীর। মৃত্যুর এক সপ্তাহ আগে কিছুটা শারীরিক স্বস্তিবোধ করলে টাঙ্গাইলের সন্তোষে আসেন তিনি। ডাকেন ধর্মসভা। হাজার হাজার ভক্ত যোগ দেয় সে সভায়। মওলানা ভাসানী ঘোষণা করেন, এতদিন আমি যে রাজনীতি করেছি তা আজ থেকে নিষিদ্ধ, খোদা-ই-খেদমতগার হবে মানবসেবার একমাত্র অরাজনৈতিক সংগঠন। সারা জীবন রাজনীতি করে জীবনের শেষ প্রান্তে এসে রাজনীতিকে এভাবে 'আস্‌সালামু আলাইকুম' কেন জানালেন ভাসানী? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে নাতিদ্বয় বলেন, দাদা সারা জীবন রাজনীতি করে ফল পেয়েছেন শূন্য। শেষ জীবনে এসে তাঁর উপলব্ধি হয়েছে যে, রাজনীতি অন্তঃসারশূন্য ছাড়া আর কিছু নয়। তিনি যে আদর্শ ও সামাজিক পরিবর্তনকে সামনে রেখে রাজনীতিতে সক্রিয় হন তা চোখের সামনেই গুড়েবালি হতে দেখেছেন। রাজনৈতিক জীবনের তিক্ত ও যন্ত্রণাদায়ক অভিজ্ঞতা তাকে রাজনীতি বিমুখ করেছে। তাই তো তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন রাজনীতি দিয়ে নয় সৃষ্টিসেবা দিয়েই সমাজের কল্যাণ করতে হবে। রাজনীতিকে নিষিদ্ধ করায় ভাসানী পরিবার এখন রাজনীতিমুক্ত বলে দাবি করে বলেন, আমরা পারিবারিকভাবে দাদার প্রতিষ্ঠিত ন্যাপ বা আওয়ামী লীগ কোনো রাজনীতি করি না। অন্যরা করে থাকলেও সেখানে আমাদের কোনো ভূমিকা নেই। দাদার নির্দেশমতো সব রাজনীতি থেকে মুক্ত হয়ে আমরা ধরে রেখেছি তাঁর হাতে গড়া সংগঠন 'খোদা-ই-খেদমতগার'।

উপমহাদেশের অনেক বিখ্যাত রাজনীতিকই শেষ জীবনে এসে রাজনীতিকে 'গুড বাই' জানিয়েছেন। দীর্ঘ রাজনৈতিক তিক্ততা ভাসানীকেও এই একই সিদ্ধান্ত নিতে প্রভাবিত করেছিল। রাজনীতিতে শেষ কথা বলে কিছু নেই। এখানে আদর্শের কোনো বালাই নেই। স্বার্থ, অর্থ, ক্ষমতা এসবই রাজনীতির মূলকথা। এমন রাজনীতিকে ভাসানী তো 'আস্‌সালামু আলাইকুম' বলবেনই। ভাসানী সমালোচকরা বলে থাকেন, ভাসানী অস্থিতি প্রকৃতির রাজনীতিবিদ, একেক সময় একেক দল গড়েছেন। কিন্তু ভাসানীর মূল বৈশিষ্ট্যই ছিল নিজ আদর্শের সঙ্গে আপস না করা। যখনই যে ক্ষেত্রে নিজ আদর্শের সঙ্গে সংঘাত হয়েছে তখনই স্পষ্টবাদী ভাসানী আলাদা হয়ে গেছেন অন্যদের থেকে। রাজনীতি থেকে তিনি আদর্শের কোনো জয় পাননি। পেয়েছেন আদর্শহীনতা, সংঘাত, স্বার্থসিদ্ধি, দুর্নীতির জয়। এটাই ভাসানীকে বাধ্য করেছে রাজনীতিবিমুখ করতে।

স্বাধীনতার ৩৬ বছর পর এখনও যদি বেঁচে থাকতেন ভাসানী, তবে হয়তো রাজনীতি না করার আহ্বান জানাতেই রাজনীতি করতেন!

তিরোহিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

স্বাধীন বাংলাদেশে জীবনের সব আশা-আকাঙ্ক্ষা ছাড়িয়ে আরো সুদূর স্বপ্নে বিভোর ছিলেন বলেই হয়তো মওলানা ভাসানী এমন এক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বপ্ন বুনেছিলেন মনে, যে বিশ্ববিদ্যালয়ে মুসলমান ছাত্ররা কেবল ধর্মীয় জ্ঞানে নয়, আধুনিক জ্ঞানেও সমৃদ্ধ হবে। নাতির ভাষায়, দাদা চেয়েছিলেন এখানে এমন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় হোক যেখানে ছাত্ররা কোরআন চর্চা করে বের করবে কিভাবে এবং কোন পদ্ধতিতে অধিক ধানের চাষ হবে। কেরোসিন তেল ও লবণ ছাড়া বাকি সব কিছুই বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে ছাত্রদের উৎপাদন করে নিতে হবে। মওলানা ভাসানী এমন একটা পূর্ণাঙ্গ প্রতিষ্ঠানের স্বপ্ন দেখেছিলেন, যেখানে একটা আধুনিক ইসলামী প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ বিদ্যালয় থাকবে, ইসলামী গবেষণা কেন্দ্র থাকবে, আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার থাকবে। এজন্য তিনি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনির্দিষ্ট কাঠামো, অর্থনৈতিক ভিত্তি, প্রশাসনিক ও শিক্ষাগত বৈশিষ্ট্য এসবের বিস্তারিত নকশা দাঁড় করিয়েছিলেন। যে নকশায় ভর করে শিশু-কিশোর-তরুণরা একাধারে আধুনিক ও ইসলামী দীক্ষায় দীক্ষিত হয়ে সময়োপযোগী নাগরিকে পরিণত হয়ে দেশ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করবে। কিন্তু সেই স্বপ্ন এখন একেবারে ভেঙ্গে খান খান হয়ে গেছে বলে জানালেন ভাসানী নাতিদ্বয়। নাতিদের ভাষায়, তিনি যে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বপ্ন দেখেছিলেন তা উদ্দেশ্যমূলকভাবে হতে দেয়া হয়নি। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়কে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় টেকনিক্যাল কলেজ করা হয়েছে। মনোগ্রাম থেকে 'রাব্বি জিদনি ইলমা' বাদ দেয়া হয়েছে। হেফজখানা ও মাদরাসাকে ক্রমাগত দুর্বল করে ফেলা হয়েছে। এলাকার ক্ষমতাধর ব্যক্তিরা ট্রাস্টসহ যাবতীয় কিছু নিয়ন্ত্রণ করত বলে জানালেন হাসরত খান ভাসানী। ভাসানী পরিবারের সঙ্গে ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়সহ পুরো কমপ্লেক্স পরিচালনা পরিষদের কোনো সম্পর্ক নেই। এমন কি তারা ভাসানীর দর্শন, চিন্তা, স্বপ্ন এসব বিষয়েও একেবারে অজ্ঞ। ভাসানীর নাম ভাঙিয়ে নিজেরা আঙুল ফুলে কলা গাছ হয়েছেন বলে অভিযোগ করলেন হাসরত খান ভাসানী। আমরাও ঘুরে ভাসানী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের করুণ হাল প্রত্যক্ষ করলাম। দেখলাম ভাসানী প্রতিষ্ঠিত মাদরাসাকে কিভাবে হেলায় হেলায় ধ্বংস করে দেয়া হচ্ছে।

এসব কিছুর মাঝেও সংগ্রাম করে যাচ্ছেন ভাসানী প্রজন্ম। মওলানা ভাসানীর উপদেশ তারা মেনে চলার চেষ্টা করেন। দাদার উপদেশ অনুযায়ী ভাসানীর রেখে যাওয়া এত বিশাল সম্পত্তির কোনোটাই নিজেরা ভোগ করেন না। দাদা দরগার যাবতীয় আয় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ব্যায়ের কথা বলেছেন। তারা এখন তেমনটাই করছেন। দাদা অতি সাধারণ জীবনযাপন করা, সাধারণ মানে চলার যে উপদেশ দিয়েছেন তাই পালন করে চলেছেন ভাসানী পরিবার।

ভাসানী দরগার বর্তমান গদিনসীন ভাসানী পুত্র এবং আজাদ খান ভাসানী ও হাসরত খান ভাসানীর পিতা আবু বকর খান ভাসানী বয়সের ভারে একেবারে নুয়ে পড়েছেন।

বোধশক্তিও অনেকটা হারিয়ে ফেলেছেন। তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চাইলেও সেভাবে বলা হয়ে ওঠেনি। উঠানে পাটিতে বসা অবস্থায় যখন ভাসানী পুত্রকে দেখলাম তখন মনে হচ্ছিল ভাসানী স্বয়ং বসে আছেন এখানে। ভাসানীর দুই নাতিকে অনুরোধ জানালাম, বাবার কিছু ছবি নিতে চাই। সম্মতি পেয়ে ফায়জুলের হাতে ক্যামেরা ধরিয়ে দিয়ে নাতিদের সহায়তায় ভাসানী পুত্রকে চেয়ারে বসিয়ে দিলাম শোয়া থেকে। ইতিমধ্যে ক্লিক ক্লিক শব্দে ক্যামেরা কয়েকবারই ঝলকে উঠল। ভাসানী পুত্রবধূ তথা আজাদ খান ভাসানীর মা কিন্তু একেবারে নাছোড়বান্দা। তিনি আমাদের ডেকে বললেন, বাবা, আমাদের সঙ্গে খেয়ে যেতে হবে কিন্তু, আমার শ্বশুর বলে গেছেন– 'পীর-মুরিদ সবাই ভাই ভাই। কোনো পীর মুরিদের বাসায় গেলে না খাইয়ে দেয় না।' একইভাবে তোমাদের বাসায় কোনো মুরিদ বা মেহমান আসলে না খাইয়ে দেবে না। মায়ের অনুরোধ ফেলবার শক্তি আমাদের ছিল না। ভাসানীর দুই নাতির সঙ্গে আমাদেরকেও ঠিক সেভাবে খাইয়ে দিলেন যেভাবে মা তার সন্তানদের একসঙ্গে বসিয়ে খাবার খেতে দেয়। ভাসানী বাড়িতে মাটিতে শীতল পাটিতে ডাল-ভাতের খাবারে এত যে স্বাদ তা কি আর আগে জানা ছিল! এক ফাঁকে নাতিদ্বয়কে জিজ্ঞেস করে বসলাম, আচ্ছা, মওলানা ভাসানী তালের আঁশের টুপি পরতেন কেন সব সময়? বাবাকে দেখিয়ে দিয়ে বললেন, তিনিই এ ব্যাপারে ভালো বলতে পারবেন। 'নানান ব্যস্ততার কারণে আব্বার মাথা সবসময় গরম থাকত, বাতাস ঢোকার সুবিধার্থেই এই টুপি পরতেন তিনি'– অসুস্থ আবু বকর খান ভাসানী কাঁপা কাঁপা গলায় আমাদের জানালেন। অথচ মওলানা ভাসানীর এ টুপি নিয়ে কত কিংবদন্তিই না প্রচলিত আছে।

বাইরে আঁধারের চাদরে ঢেকে গেছে সবকিছু। আমরাও মায়ের আঁচল ছেড়ে ঢেকে গেলাম আঁধারের সেই চাদরে। বিদায়বেলা মায়ের মতোই আকুতি– ওরসে আসতে যেন ভুল না হয়!

শোকের চাদরে ঢাকা যে ওরস

১৭ নভেম্বর ঠিকই গিয়ে হাজির হলাম ওরসে। এবার আমার সঙ্গী হলেন বন্ধু শাহজাহান ভূঁইয়া। ইউনিভার্সিটি খোলা থাকায় ফায়জুল আসতে পারলেন না। এ নিয়ে ওর আফসোসের শেষ নেই। ভাসানীকে নিয়ে আমার মতো শাহজাহান ভূঁইয়ারও সীমাহীন কৌতূহল। পাশাপাশি ওরসের প্রতি রয়েছে তার এক ধরনের দুর্বলতা।

সন্তোষ পৌঁছতে দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে গেল। গাড়ি চালকের হেঁয়ালীপনায় এ রকমটা হলো। ভাসানী নাতি আজাদ খান ভাসানীর সঙ্গে আগেই আলাপ ছিল, ওরসে এলে তিনি আমাদের সময় দেবেন, ভাসানীর হাতের লেখা কিছু চিঠি দেবেন, বই দেবেন এবং ঘুরে দেখাবেন ভাসানীর স্মৃতিবিজড়িত স্থানগুলো।

সন্তোষ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশমুখে মাথার ওপরে একটি কালো ব্যানার টানানো। তাতে লেখা– "স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে ওরসে একসঙ্গে ১৫-২০ জনের বেশি প্রবেশ করা যাবে না, কোনো সভা-সমাবেশ, মিটিং-মিছিল করা যাবে না, মাইক ব্যবহার করা নিষেধ...!"

সেখানে বন্দুক হাতে দাঁড়িয়ে আছেন কয়েকজন পুলিশ সদস্য। শুরুতেই ধাক্কা খেলাম, তাহলে মৃত ভাসানীকে নিয়েও এত ভয় শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে। একটু সামনে এগুতে

দেখা হলো আজাদ খান ভাসানীর সঙ্গে। হাত ধরে ঘুরে ঘুরে দেখালেন পুরো ওরস প্রাঙ্গণ। দরবার হল গমগম করছে মুরিদ-ভক্তদের পদচারণায়। বিশাল দরবার হলের কোথাও চেয়ার-টেবিল নেই, নেই জৌলুসপূর্ণ কোনো স্টেজ। সিমেন্ট-বালি-কংক্রিটের তৈরি মেঝেতে খড় বিছিয়ে নারী-পুরুষের ছোট ছোট জটলা এদিক-ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। এরা সবাই মওলানা ভাসানীর সারা জীবনের স্বপ্নের সেই 'মেহনতি মানুষ'। মাজারে গিয়ে ফাতেহা পাঠ করলাম। কবরের চারপাশে আলো জ্বালিয়ে বসে আছেন সেই মেহনতি মানুষগুলোই। বছরের এই দিনটাতেই তারা তাদের প্রিয় ভাসানী পীরের সান্নিধ্য পেয়ে থাকেন। মাজার-মসজিদের পূর্ব দিকে ভাসানীর বর্ণাঢ্য জীবনের স্মৃতিবহ দেশ-বিদেশের নানান ছবির প্রদর্শনী হচ্ছে। বাজানো হচ্ছে তার ভাষণের রেকর্ডিং। ভাষণ নয় যেন আগ্নেয় গোলার মতো প্রতিটি বাক্যবাণ ছুটে আসছে আমাদের দিকে। একটু পরপরই উত্তাল জনসমুদ্রকে থামিয়ে দিচ্ছেন 'খামোশ' বলে। আমার মতো ভাসানী নাতি আজাদ খান ভাসানীরও এক বুক বেদনা– আহা, ইতিহাসের এ মহানায়ককে দেখার সৌভাগ্য হলো না। চর্মচক্ষু দিয়ে তাঁকে দেখতে পেতাম যদি!

আগেই খিচুরির দাওয়াত দিয়ে রেখেছিলেন আজাদ খান ভাসানী। সোজা চলে গেলাম ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন তাদের সেই বাড়িতে। যেখানটায় বসে মায়ের হাতে রাতের খাবার খেয়ে বিদায় নিয়েছিলাম আগেরবার। বাড়ির ভেতরে সে এক এলাহি কাণ্ড। এক পাশে খিচুড়ি রান্না হচ্ছে, আরেক পাশে কলাপাতায় বিতরণ হচ্ছে। ভক্ত-মুরিদরা যে যার মতো খেয়ে বিদায় নিচ্ছে। কোনো হৈ-হুল্লোড় নেই। মায়ের সঙ্গে দেখা হতেই তাঁর মমতামাখা প্রশ্ন – আসছেন বাবা, খেয়ে যাবেন কিন্তু!

এক্সক্লুসিভ ভাসানী

সদ্য প্রয়াত বিশিষ্ট সাংবাদিক হেদায়েত হোসাইন মোরশেদ তার দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ডানায় ভর করে মওলানা ভাসানীকে দেখেছেন খুব কাছ থেকে। শুনেছেন তাঁর রক্তঝরা



টাঙ্গাইলের সন্তোষে শুয়ে আছেন মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানী

অসংখ্য ভাষণ-বক্তৃতা। মওলানা ভাসানীকে নিয়ে স্মৃতিচারণমূলক এক লেখায় সেসব ভাষণ থেকে কয়েকটি ছত্র তুলে ধরেছেন তিনি সুনিপুণভাবে। মোরশেদের লেখার চুম্বকাংশ–

"ভাসানী ঘরানা' প্রসঙ্গে আরেকটি কথা। যে শব্দগুচ্ছ বা যে বাক্যের ওপর মওলানা বেশি গুরুত্ব আরোপ করতে চাইতেন তা তিনি পরপর তিন বার উচ্চারণ করতেন। সাধারণত বাক্যের শেষাংশে এই 'দোহরান'-এর কাজটি তিনি করতেন। এটাও ছিলো মওলানার একটি অভ্যাস। অথবা স্টাইল। মওলানার বক্তৃতার স্টাইল বা প্যাটার্ন বা ম্যানারিজম বা অভ্যাসকে লিখিতভাবে তুলে ধরা সম্ভব নয়। তবুও আমি নিচে কয়েকটি নমুনা দিচ্ছি।

স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ের কথা। মওলানা ভাসানীর রাজনীতির বক্তৃতার প্রধান টার্গেট ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। শেখ মুজিবকে উদ্দেশ করে মওলানার বক্তৃতার কিছু নমুনা। এসব বক্তব্য আমি ক্যাসেটে ধারণ করে রাখিনি। হুবহু এসব বাক্য মওলানা উচ্চারণ করেছিলেন তা কিন্তু নয়। তবে মওলানার বক্তৃতার প্যাটার্ন বা অভ্যাস এবং কিছু কিছু বহুল আলোচিত বাক্য এতে তুলে ধরা হচ্ছে–

(ক) বাংলাদেশের তিনশো একচল্লিশটি ইউনিয়নের এক হাজার নয়শো পাঁচটি গ্রামের মানুষ আইজ কচু খাইয়া ঘেঁচু খাইয়া জীবন ধারণ করতাছে। মজিবর, তোমার সোনার বাংলা এখনো শ্মশান কেন? এখনো এই সোনার বাংলায় এতো ভুখা নাঙ্গা বনি আদম কেন? তুমি আমার ছাওয়াল মজিবর; আমার বাবুর বড় ভাই। তোমার সোনার বাংলায় এখন হেলেঞ্চা আর মেলেঞ্চাও মানুষে খায়বার পায় না। চাইরদিকে আহাজারি আর রোনাজারি চলছে। তোমার চাইর পাশে কম্বল চোর আর রিলিফ চোর। মনহুস যদি হও মজিবর তাহলে হুঁশ করো। রিলিফ চোর কম্বল চোরগো দল থায়কা বার কয়রা দাও। শায়েস্তা করো। খাদ্যদ্রব্যের দাম কমাও। জিনিসপত্রের দাম কমাও। নইলে তুমি ধ্বংস হয়া যাবা, ধ্বংস হয়া যাবা, ধ্বংস হয়া যাবা (স্লোগান উঠলো) খা-মো-শ...

(খ) তুমি আমার সেকরেটারি ছিলা মজিবর। মুড়ি খাওনের জইন্য তোমারে আমি দুই আনা পয়সাও দিতে পারি নাই। সাইকেলে প্যাডেল মায়রা তুমি আমার জন্যই ঘোরতা মজিবর। লোকে বলে তুমি নাকি ইন্দিরার সেবাইত। তোমার ক্বেবলা কোথায় বয়লা দাও মজিবর। ইন্দিরার বাছুর হওয়া সম্মানের কাজ না মজিবর। তুমি আমার ছাওয়াল; তোমারে আমি বহুত পেয়ার করতাম। লোকে কয়, আওয়ামী লীগ আওয়াম চেনে না; পরদেশী মুনিবাইন চেনে। এইটা শুনলে মনে বড়ো আফসোস লাগে মজিবর। আমার সঙ্গে তুমি চীনে চলো। এখনো সময় আছে। চৌ এন লাই-এর সঙ্গে কথা বলো। অবস্থা বুঝায়া বলো। শাহনেওয়াজ ভুট্টোর বিতর্কিত ছাওয়াল জুলফিকার ভুট্টোর কাছে টেলিগ্রাম পাঠাও মজিবর। পাওনা টাকা আদায় করো। আমার কথা শোনো মজিবর। মনে রাখবা 'শয়তান বেঈমান লুটিতে ঈমান চেষ্টিত অবিরত সাধু সাবধান'। যদি মনে না রাখো মজিবর তাহইলে তাবাহ।

(গ) দেশে এখন কয়ডা বাহিনী আছে মজিবর? লোকে বলে তোমার আপার চেম্বার নাকি মাঝে মাঝে খালি হয়া যায়। তোমার আওয়ামী রক্ষী বাহিনী খুন করতাছে। জুলুম করতাছে। লাল বাহিনী কেন বানায়লা মজিবর? লাল বাহিনী নীল বাহিনী কয়রা সোনার বাংলার স্বাধীন বাংলাদেশের কি লাভ হবে? লাল বাহিনীর কালা জুলুম চলছে। রোখো ভাইয়ো সিকসটিনথ ডিভিশন (স্লোগান উঠলো) খা-মো-শ...

(ঘ) ইন্দিরার বাবা পণ্ডিত জহুর লাল নেহেরুর সঙ্গে আমার খাতির ছিলো। তাঁর বাবা মতিলাল নেহেরু ছিলেন ভালো পলিটিসিয়ান। তাঁর সঙ্গেও আমার পরিচয় ছিলো। নেহেরু ডায়নাষ্টিরে আমি চিনি মজিবর। ইন্দিরা গান্ধী আগে আমাকে খুব শ্রদ্ধা করতো মজিবর। এখন ইন্দিরা প্রিয়দর্শিনীর শ্রদ্ধার গোডাউন খালি হইয়া গেছে কিনা আমি বলতে পারি না। ইন্দিরার সঙ্গে তুমি চুক্তি করলা মজিবর। কেন করলা? গোলামীর মর্টগেজ বাংলাদেশের মানুষ মায়না নেবে না। মনে রাখবা, ওদের মুখে এক আর পেটে আরেক। বাংলাদেশের দিকে তাকায়া তাকায়া মনে মনে কেবল ধুন গাইতাছে— দে দে রাম/দিলাদে রাম/ঝুলি ভর দে সীতারাম। উহারা ভালো লোক নয় মজিবর। তুমি আমার সেকরেটারি ছিলা মজিবর। তুমি আমার ছাওয়াল। আমার কথা শোনো মজিবর। উহাদের হইতে সাবধান থাকো। ষোলই ডিসেম্বরের পর ইন্ডিয়ান আর্মি বাংলাদেশে থায়কা শত শত ট্যাঙ্ক কামান; লাখো লাখো বন্দুক আর কার্তুজ; বিশাল পরিমাণ মালসামান সয়সম্পত্তি লয়া গেছে। ট্যাঙ্ক কামান বন্দুক মালসামানের লিস্ট করো মজিবর। ইন্দিরারে গিয়া কও, আমার ট্যাঙ্ক কামান বন্দুক মালসামান ফেরত দাও ইন্দিরা প্রিয়দর্শিনী। গোলক মজুমদার নামে ইন্ডিয়ান একটা লোকের কথা শুনতে পাই। লোকটা কে মজিবর? হুঁশিয়ার হো সাবধান। দেশে আবার ইন্নালিল্লাহ শুরু হয়া গেছে। কেন শুরু হইলো মজিবর। তোমার ডিআইবি সিআইবি কি তোমারে সব খবর দেয়? সাবধান হয়া যাও নইলে মিসমার হয়া যাবা, ধ্বংস হয়া যাবা, ধ্বংস হয়া যাবা, ধ্বংস হয়া যাবা (স্লোগান উঠলো) খা–মো–শ...

(ঙ) বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে অবিবাহিত মাইয়ারা এখন যৌবন জ্বালায় জ্বলতাছে। তাদেরকে বিবাহ করার লোক পাওয়া যায় না। দেশের হাজার হাজার বেকার যুবক যৌবন জ্বালায় জ্বলতাছে। শাদী করার মতো তাদের তাকত নাই। যৌবন জ্বালা বড় জ্বালা মজিবর; তুমি কি তা জানো না? পুলিশ ভাইয়ো, আপনাদেরও যৌবন জ্বালার কিছু কিছু খবর আমি পাই। রক্ষী বাহিনীর যৌবন জ্বালার খবর আমি পাই। তোমার আপার চেম্বার ঠুনঠুনা হয়া যাইতেছে মজিবর। হুঁশ করো মজিবর হুঁশ করো। খোদাই খেদমতগার হয়া যাও। মাথা থায়কা বিষ্টা সাফ কয়রা মগজের কালচার করো। হুঁশ করো মজিবর। হুঁশিয়ার হো সাবধান...

আগ্নেয় গোলার মতো ছুটে আসা সেই 'হুঁশিয়ার হো সাবধান' বলার লোক আজ আর বাংলাদেশে নেই। 'ধ্বংস হয়া যাবা, ধ্বংস হয়া যাবা, ধ্বংস হয়া যাবা' বলে গণবিরোধী

শাসকের গদিমোড়া কুরসিতে কাঁপন ধরিয়ে দেয়ার মতো হুংকার ছাড়ার লোক আজ বাংলাদেশে নেই। 'মনহুস হইলে হুঁশ কইরা চলো' বলে বজ্রনির্ঘোষে শব্দাবলি উচ্চারণ করার মতো লোক আজ আর নেই। লোভী ভারতের মুখোশ টেনে খোলার জন্যে 'দে দে রাম দিলাদে রাম ঝুলি ভর দে সীতারাম' শব্দাবলির শ্লেষাত্মক আঁকশী নিয়ে জনসভাকে মাতিয়ে তোলার মতো লোক আজ আর বাংলাদেশে নেই। কোনো গণবিরোধী শাসকের বিরুদ্ধে জনগণকে প্রাণিত করার জন্যে 'ঘেরাও করো/ঘেরাও করো' বলে আহ্বান জানানোর কোনো লোক নেই আজ বাংলাদেশে। অপর নেতৃত্বের প্রতি সহমর্মিতার হাত প্রসারিত করে 'তুমি আমার ছাওয়াল, আমার সঙ্গে তুমি চলো, কথা শোনো' বলে পিতৃসুলভ আদেশ করার লোক নেই আজ বাংলাদেশে। জনতাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে, আকাশ-বাতাসকে গমগম করা তরঙ্গে প্লাবিত করে আর কেউ এখন বলবে না– 'খা–মো–শ'।"



ভাসানী, মুজিব, হাসিনা— এ তালিকায় তর্কবাগীশ কি বেমানান?

যখন তোমার কেউ ছিল না তখন ছিলাম আমি...

দেশের প্রধান দু'টি দলের একটি আ'লীগ। এ বৃহৎ বা প্রধান দলটি প্রতিষ্ঠার এক যুগ পেরুনোর আগেই যখন নিদারুণ সংকটে পতিত হয় তখন মাওলানা তর্কবাগীশ শক্ত হাতে হাল ধরেন। শেখ মুজিব তখন আ'লীগের সাধারণ সম্পাদক। মাওলানা তর্কবাগীশ একটানা দশ বছর সর্বোচ্চ আসনে বসে দলটিকে বেশ শক্তিশালী অবস্থানে নিয়ে যান। অসহযোগ আন্দোলন, খেলাফত আন্দোলন, সাতচল্লিশের পাকিস্তান আন্দোলন, বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলন, চুয়ান্নোর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলন, উনসত্তরের আইউববিরোধী গণ-অভ্যুত্থান, একাত্তরের অসহযোগ ও মুক্তিসংগ্রামসহ জাতির প্রতিটি দুর্যোগেই তর্কবাগীশ পালন করেছেন সংগ্রামমুখর ও আপসহীন নির্ভীক সিপাহির ভূমিকা।



আমাদের নতুন প্রজন্মকে জিজ্ঞেস করলে বলে, আমরা জীবনে তার নামই শুনিনি। কেন? এটা কার ব্যর্থতা, নাকি নতুন প্রজন্মকে ইতিহাসের আলো থেকে দূরে রাখার ষড়যন্ত্র? দেশের এ মহান অভিভাবককে নিয়ে মিডিয়াগুলো উদাসীন, নাকি আওয়ামী লীগ তাকে চেপে রাখতে চায়? ভাসানী, মুজিব, হাসিনা— এ তালিকায় তর্কবাগীশ কি বেমানান?

এ এক নতুন ইতিহাস

মাওলানা তর্কবাগীশ সম্পর্কে প্রথম যে দিন জানলাম সে দিন থেকেই বিস্ময় ও প্রশ্ন একযোগে আমাকে তাড়া করে ফিরছে।

আলেম মুক্তিযোদ্ধার খোঁজে উত্তরবঙ্গের সফরের অংশ হিসেবে ফায়জুলকে নিয়ে হাজির হই মাওলানা তর্কবাগীশের জন্মস্থান সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়া থানার তারুটিয়া (রশিদাবাদ) গ্রামের বাড়িতে। বিশাল বাড়ি। পুকুর। গাছের সারি। বিশাল আঙ্গিনা। মনে হলো কোনো জমিদার বাড়ি। কি নেই এই বাড়িতে! মসজিদ, মাদরাসা, প্রাথমিক বিদ্যালয়, ডাকঘর, মুসাফিরখানা, দাদার মাজার। প্রায় ছ'শ' বছরের পুরনো এ বাড়িকে

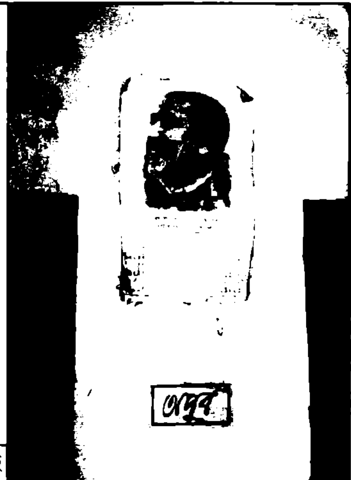
বর্তমান আদলে নিয়ে আসেন তর্কবাগীশ নিজে। এত বিশাল বাড়ি অথচ কেউ নেই সেখানে। অনেক খোঁজাখুঁজি করে পাওয়া গেল একজন কেয়ারটেকার। তার কাছ থেকে জানতে পারলাম মরহুম মাওলানা তর্কবাগীশের তিন ছেলে। সৈয়দ নূরুল আলম, সৈয়দ শামসুল আলম (হাসু) ও সৈয়দ বদরুল আলম। সবাই ঢাকা থাকেন। মাঝেমধ্যে এসে বাড়িঘর দেখে যান। কেয়ারটেকারের কাছ থেকে সৈয়দ শামসুল আলম (হাসুর) বাসার ঠিকানা এবং মোবাইল নম্বর সংগ্রহ করি। কেয়ারটেকারের সঙ্গে পুরো বাড়ি ঘুরে ঘুরে দেখি। ঘরের দেয়ালে বঙ্গবন্ধুর ছবি ঝুলছে। আরও আছে তর্কবাগীশ, তার স্ত্রী, ছেলে ও নাতি-নাতনিদের ছবি। ক্যামেরাবন্দি করি প্রয়োজনীয় কিছু দৃশ্য। বিদায় নিয়ে ফিরে আসি ঢাকা। পরে একদিন মোবাইলে যোগাযোগ করে হাজির হই মাওলানা তর্কবাগীশের মেজ ছেলে সৈয়দ শামসুল আলম হাসুর কলাবাগান ডলফিনের গলির বাসায়। সঙ্গে সে দিন তাজুল ফাত্তাহ।

সৈয়দ শামসুল আলম (হাসুর) বয়স পঁয়ষট্টি ছুঁই ছুঁই। তিনি খুব কাছ থেকে দেখেছেন বাবার সংগ্রামী জীবনকে। মনে শক্তি পেলাম। যাক, মাওলানা তর্কবাগীশকে না পাওয়া গেলেও আরেক জীবন্ত কিংবদন্তি আছে না! একাত্তর ও তর্কবাগীশ প্রসঙ্গে দীর্ঘ সময় কথা বলি জনাব হাসুর সঙ্গে। উদ্ধার করি আমাদের অজানা বিশাল এক অধ্যায়। নতুন আরেক ইতিহাস।

বড় পীরের হাত ধরে

বড় পীর হযরত শাহ সৈয়দ মহিউদ্দীন আবদুল কাদের জিলানী (রহঃ)-এর বংশে জন্মগ্রহণ করেন শাহ সৈয়দ দরবেশ মাহমুদ (রহঃ)। বাদশাহ আলাউদ্দিন খিলজীর আমলে (১৩০৩ সালে) দরবেশ মাহমুদ বাগদাদ থেকে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে বাংলায় আসেন। এ পীর বংশেই জন্ম নেন তর্কবাগীশের পিতা হযরত আবু ইসহাক (রহঃ)। তর্কগাবীশের মাও ছিলেন বেশ পুণ্যবতী। নাম বেগম আজিজুন নেছা। তর্কবাগীশের দাদা ছিলেন পীরানে পীর মাওলানা সৈয়দ শাহ জিন্নাতুল্লাহ।

> দেশের প্রধান দু'টি দলের একটি আ'লীগ। এ বৃহৎ বা প্রধান দলটি প্রতিষ্ঠার এক যুগ পেরুনোর আগেই যখন নিদারুণ সংকটে পতিত হয় তখন মাওলানা তর্কবাগীশ শক্ত হাতে হাল ধরেন। শেখ মুজিব তখন আ'লীগের সাধারণ সম্পাদক। মাওলানা তর্কবাগীশ একটানা দশ বছর সর্বোচ্চ আসনে বসে দলটিকে বেশ শক্তিশালী অবস্থানে নিয়ে যান



মাওলানা তর্কবাগীশের ঘরের দেয়ালে বঙ্গবন্ধুর ছবি ঝুলছে

মাওলানা আঃ রশীদ তর্কবাগীশ ১৯০০ সালের ২৭ নভেম্বর (১১ অগ্রহায়ণ ১৩০৭) ব্রিটিশ ভারতের পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ মহকুমার (বর্তমানে সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়া থানার) তারুটিয়া (বর্তমানে রশিদাবাদ) গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১২ বছর বয়সে তিনি পিতাকে হারান।

আবদুর রশীদ তর্কবাগীশের লেখাপড়ায় হাতেখড়ি ওঠে বৌদ্ধদোগাছি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। এরপর গিয়ে ভর্তি হন শেরপুরের ডায়মন্ড জুবিলী ইংলিশ হাই স্কুলে। পরবর্তীতে তিনি দেওবন্দ ও লাহোরের এশাআতুল ইসলামে অধ্যয়ন করেন। সেই ছোট্ট বেলা থেকেই মাওলানা তর্কবাগীশের ভেতর আন্দোলনের মনোভাব সৃষ্টি হয়। ডায়মন্ড জুবিলীর যখন কিশোর ছাত্র। বয়স মাত্র চৌদ্দ। তখনই তিনি স্থানীয় প্রভাবশালী জমিদারদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যান। এলাকার নিপীড়িত, দরিদ্র কৃষকদের একত্রিত করে তাদের অধিকার রক্ষার স্বার্থে সফল আন্দোলন গড়ে তুলেন। এর পরের বছর তিনি আরো বড় ধরনের আন্দোলনে ইতিহাস সৃষ্টি করেন। শেরপুরের সেই একই এলাকায় কেল্লাকুশিতে বাৎসরিক মেলা বসত। মেলায় স্থানীয় জমিদার ও ব্যবসায়ীদের প্রত্যক্ষ মদদে দেহ ব্যবসা চলত। এটা দীর্ঘদিন থেকে চলে আসছিল। ধীরে ধীরে এটা মহামারীর আকার ধারণ করে যুব সমাজের মাঝে বেশ ব্যাপকতা লাভ করে। কিশোর আবদুর রশীদের মনে তখন বিষয়টি বেশ তোলপাড় সৃষ্টি করে। তিনি এলাকার কৃষক ও দুধ বিক্রেতাদের সঙ্গে নিয়ে এই অসামাজিকতাকে উৎখাত করেন। 'খিলিপট্টি ও কুড়েপট্টি'র ব্যবসা বন্ধ করে দেন। তার প্রতিরোধের তোপে এলাকার মাতব্বররা পিছু হটতে বাধ্য হয়।

১৯১৯ সালে মাওলানা তর্কবাগীশ এন্ট্রান্স পরীক্ষার্থী। তখন খেলাফত আন্দোলনে উপমহাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গন বেশ সরগরম। ছাত্র তর্কবাগীশ ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ব্রিটিশদের শিক্ষা বর্জন করেন। তাঁর ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন চলতে থাকে পুরো দমে। ১৯২২ সালের জানুয়ারি মাসের ২৮ তারিখে সলঙ্গা হাটে ব্রিটিশ পণ্য বর্জনের তথা ব্রিটিশবিরোধী অসহযোগ আন্দোলন শুরু করেন। যেটা ঐতিহাসিক সলঙ্গা বিদ্রোহ হিসিবে খ্যাত। তাঁর সাহস দেখে ব্রিটিশদের গা জ্বলে ওঠে। সশস্ত্র বাহিনী লেলিয়ে দেয় ব্রিটিশরা তাঁর ওপর। তারা গুলি চালায়। বুলেটের আঘাতে জর্জরিত হয়ে শত শত বাঙালি সে দিন মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। আহত-নিহত হয় হাজার হাজার মানুষ। মাওলানা তর্কবাগীশও আহত হন তখন। গ্রেফতার হন। মুক্তি পান তিনি দীর্ঘ এক বছর পর।

'তর্কবাগীশ' খেতাব পেয়ে...

মুক্তির পর থেকে তিনি আবার নিজেকে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণে নিয়োজিত রাখেন ১৯২৭ সাল পর্যন্ত। তখন তিনি যুক্ত প্রদেশের বেরেলী সাহারানপুর, দেওবন্দ মাদরাসা ও পরে লাহোরের এশাআতুল ইসলাম কলেজে অধ্যয়ন করেন। এ এশাআতুল ইসলামেই তিনি 'তর্কবাগীশ' উপাধিতে ভূষিত হন। কলেজের সাপ্তাহিক বাহাস (তর্ক) অনুষ্ঠানে তিনি পাকা তার্কিকে পরিণত হলে, পাঞ্জাবে এবং পাঞ্জাবের আশেপাশে বড়

বাহাসে তাকে বিভিন্ন আমন্ত্রণে যেতে হতো। পরপর এগারোটি বাহাসে জিতে গেলে তাকে 'তর্কবাগীশ' উপাধি দেয়া হয়। এই কলেজ থেকে তাকে ইসলাম প্রচারের জন্য পশ্চিমা দেশগুলোতে পাঠানোর সিদ্ধান্ত যখন গৃহীত হয়, তখন তার মায়ের অসুস্থতার খবর পেয়ে তিনি গ্রামের বাড়ি সিরাজগঞ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যান।

মাওলানা তর্কবাগীশ ১৯৩৩ সালে রাজশাহীতে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সভাপতিত্বে প্রথম 'ঋণ শালিশী আইন' প্রণয়নের দাবি উত্থাপন করেন। এই দাবির পক্ষে তিনি দুর্বার আন্দোলনও গড়ে তোলেন। তখন ব্রিটিশ সরকার তাঁর সভা, সেমিনারের ওপর ১৪৪ ধারা জারি করে। এ সময় দরিদ্র কৃষকদের দাবি আদায় করতে গিয়ে তিনি গ্রেফতারও হন। ১৯৪৬ সালে তিনি বিপুল ভোটে জয়ী হয়ে বঙ্গীয় আইন সভার সদস্য নির্বাচিত হন।

'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি'

মাওলানা তর্কবাগীশের কাছে বাংলাদেশী ও বাংলাভাষীরা চিরকৃতজ্ঞ। রফিক, জব্বার, সালাম, বরকত, শফিউর এসব মহান ভাষা শহীদের নামের পাশাপাশি এদেশের মানুষের চেতনা ফলকে আরও যাদের নাম খোদিত তাদেরই একজন মাওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ। বায়ান্নর একুশে ফেব্রুয়ারিতে ব্যবস্থাপক পরিষদে যিনি গর্জে উঠেছিলেন নিরীহ বাঙালির বুকে পশ্চিম পাকিস্তানি হায়েনাদের রক্তাক্ত পৈশাচিকতার বিরুদ্ধে। মায়ের ভাষার মর্যাদা রক্ষায় তাঁর ত্যাগ প্রাতঃস্মরণীয় হয়ে থাকবে অনন্তকাল।

একুশে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ সাল। ঢাকায় ১৪৪ ধারা। আগের দিনই নূরুল আমীন সরকার মাতৃভাষা আন্দোলনের তীব্রতার মুখে জারি করে ১৪৪ ধারা। ওই দিনই ডাকা হয়েছে পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থাপক পরিষদের বাজেট অধিবেশন। সকালে মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারি পার্টির বৈঠক চলছে পরিষদ ভবনে। বর্তমানে জগন্নাথ হল যেখানটায় অবস্থিত সেখানটায় ছিল পরিষদ ভবন। পরে ওই ভবনটি ব্যবহৃত হয় জগন্নাথ হলের অডিটোরিয়াম হিসেবে। যথারীতি উপস্থিত রয়েছেন মুসলিম লীগ দলীয় সদস্য মাওলানা তর্কবাগীশ। এর আগে অসুস্থ শরীর নিয়ে তিনি গ্রামের বাড়িতে অবস্থান করছিলেন। অসুস্থতা নিয়েই তিনি বাজেট অধিবেশনে যোগদানের জন্য ঢাকায় আসেন। পার্লামেন্টোরি পার্টির বৈঠক চলাকালে সহসা ভেসে এলো গুলির শব্দ। চমকে উঠলেন মাওলানা। কেঁপে উঠল তাঁর অন্তরাত্মা। অবাক বিস্ময়ে তিনি দেখলেন, উপস্থিত সদস্যদের অনেকেই বিচলিত। কিন্তু মন্ত্রীরা নির্বিকার। মাওলানা আর এক মুহূর্তও থাকতে পারলেন না। তিনি বেরিয়ে পড়লেন। পরিষদ ভবনের সামনে রাজপথ জনশূন্য। অদূরে মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেল থেকে ভেসে আসছে মাইকে ছাত্রদের অন্তর্ভেদী চিৎকার। তাঁরা ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্যদের উদ্দেশে জানাচ্ছেন অধিবেশন বর্জনের আহ্বান। মাওলানা ছুটে চললেন সেইদিকে। হোস্টেল প্রাঙ্গণে এসে দেখলেন এক হৃদয়বিদারক দৃশ্য। বুলেটে ঝাঁঝরা হয়েছে কয়েকটি তাজা তরুণের বুক। দেহ তাঁদের রক্তাপ্লুত। মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করছেন। তিনি দেখলেন, ইতিমধ্যে নিভে গেছে কয়েকটি প্রাণপ্রদীপ। সহযোদ্ধা বন্ধুদের মৃত্যু চিৎকার আর রক্তের ফিনকি ছাত্র

যুবকদের বুকের ভেতর জ্বেলে দিয়েছে যেন অগ্নিশিখা। চোখে মুখে তাদের প্রদীপ্ত শোকের আগুন। সেই আগুন ছড়িয়ে পড়ল মাওলানার ভেতর। বুকের ভেতর তীব্র দহন আর চোখে তাঁর বেদনার অশ্রু। তিনি হয়তো তাঁর জবাব দিয়েছেন, কার এই রক্ত। এই বিক্ষোভ এই চিৎকার সে তো আমার সন্তানের। মাওলানার ভেতর জেগে উঠল এক বিদ্রোহী প্রাজ্ঞ-যুবক। জেগে উঠল ১৯২২ সালের সলঙ্গা বিদ্রোহর নায়ক তরুণ আবদুর রশীদ। মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেলে তিনি ছাত্রদের সঙ্গে কথা বললেন। শোনালেন সাহসের বাণী। এরপর তিনি ফিরে এলেন পরিষদ ভবনে। বয়ে নিয় এলেন দ্রোহ ও দহন।

বিকেল ৩:৩০ মিনিটে বাজেট অধিবেশন শুরু হবে। স্পিকার জনাব আবদুল করিম আসন গ্রহণ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে গেলেন মাওলান তর্কবাগীশ। উল্লেখ্য যে, পরিষদের প্রচলিত বিধান অনুযায়ী স্পিকারের আসন গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে যদি কোনো সদস্য দাঁড়িয়ে যান, তাহলে তিনি না বসা পর্যন্ত পরিষদের কোনো কাজ চলতে পারে না। এ সুযোগটিই গ্রহণ করলেন মাওলানা তর্কবাগীশ। তিনি দাঁড়িয়ে বললেন,

বাহান্নোর পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদে স্পিকার বনাম মাওলানা তর্কবাগীশ

(পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদের কার্যবিবরণীর সপ্তম খণ্ডের ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৬০, ৮৪, ৮৫ এবং ৮৬ পৃষ্ঠা থেকে হুবহু পত্রস্থ করা হলো)

২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২

The Assembly met in the Legislative Chamber.
Legislative Buildings, Ramna,
Dacca, on Thursday, the 21 February 1952 at-3-30 P.M.
(Discussion on Police firing)
Maulana Abdur Rashid Tarkabagish :

জনাব স্পিকার সাহেব, প্রশ্নোত্তরের পূর্বে আমি আপনার কাছে একটি নিবেদন করতে চাই। যখন দেশের ছাত্ররা যারা আমাদের ভাবী আশা ভরসার স্থল, পুলিশের গুলির আঘাতে জীবনলীলা সাঙ্গ করছে সেই সময় আমরা এখানে বসে সভা করতে চাই না। প্রথমে enquiry তারপর হাউস চলবে।

Mr. Speaker :

Order, Order. I hope you will proceed according to the rules of business of the House.

Maulana Abdur Rashid Tarkabagish :

Leader of the House আগে গিয়ে দেখে এসে বিবৃতি দিবেন তা না হলে আমরা Houes চলতে দেব না। সেখানে কি অবস্থা হয়েছে আগে জানতে চাই।...

Mr. Speaker :

I hope, honourable member will proceed in a regular way. If the members want to hear the Leader of the Houes in the matter, I would ask him if he has got anything to say.

Maulana Abdur Rashid Tarkabagish :

আপনার order বুঝি না আপনার order মানব না। ... Leader of the House প্রথমে গিয়ে দেখে এসে বিবৃতি দেবেন তারপর Assembly বসবে।

Order, Order, You have no right to disobey the chair. Pleases take your seat.

Maulana Abdur Rashid Tarkabagish :

Leader of the House আগে গিয়ে দেখে এসে বিবৃতি দিবেন তারপর House-এর কাজ চলবে।

Mr. Speaker :

Order, Order, Do you mean to say that you not allow any body else to speak? You are obstructing the proceeding of the House.

Maulana Abdur Rashid Tarkabagish :

Leader of the House গিয়ে enquiry করে আসুন তারপর House বসবে তার পূর্বে নয়।

Mr. Speaker :

Order, Order. Mr Tarkabagish I am very sorry. I may be compelled to take action under rule 16 (2) of the East Bengal Legislative Assembley Procedure rules. If you do not obey the chair.

Maulana Abdur Rashid Tarkabagish :

যে কোনো action নিতে পারেন। আমাদের দাবি Leader of the House গিয়ে দেখে এসে বলুন পরিস্থিতি কি?

Mr. Speaker :

Order, Order. Please take your seat. I request you not to prevent others from speaking ... (The House was then adjourned for fifteen minutes).

After adjournment :

Maulana Abdur Rashid Tarkabagish :

যখন আমাদের বক্ষের মানিক, রাষ্ট্রের ভাবী নেতা ৬ জন ছাত্র রক্ত শয্যায় শায়িত তখন আমরা পাখার নিচে বসে হাওয়া খাব এ আমি বরদাস্ত করতে পারি না। আমি জালেমের এই জুলুমের প্রতিবাদে পরিষদ গৃহ পরিত্যাগ করছি এবং মানবতার দোহাই দিয়ে আপনার মধ্যস্থতায় সকল মেম্বারের কাছে পরিষদ গৃহ ত্যাগের আবেদন জানাচ্ছি।

(Then Maulana Abdur Rashid Tarkabahish withdrew from the House)

২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২

The assembly met in the Legislative Chember on Friday the 22nd Februry, 1952 at- 4 : 15 p.m.

(Adjournment motion)

Maulana Abdur Rashid Tarkabagish :

Sir, I beg to move that the business of the House be adjourned.

Mr. Speaker :

Order, Order.

Maulana Abdur Rashid Tarkabagish :

Sir, I beg to move that the business of the House fixed for today, the 22nd February, 1952, do stand adjourned to discuss a definite matter of urgent Public importance and of recent occurance namely Assault on the peaceful citizens, students and passerby at the Medical College gate on the 21st February at about 1 p. m. causing serious bodily injuries and several deaths by the Police firing.

Mr. Speaker :

Is there any objection?

The Hon'ble Mr. Nurul Amin :

Yes Sir, I object. I oppose this adjournment motion.

Mr. Speaker :

I have got to ask for leave of the House.

Mr. Monoranjan Dhar :

But, Sir, before asking for leave of the House the statement has got to be read out by yourself under rule 100 of the Assembly Procedure Rules.

Mr. Speaker :

This is the statement of Maulana Tarkabagish : "An order under section 144 Cr. P. C. was imposed on the city of Dacca banning public meetings and processions. Yesterday wa the day of protest demanding Bengali to be one of the state languages. Some students of the University and Medical College without violalings the order uttered slogans 'Rashrtra Bhasa Bangla Chai' within the University compound and Medical College compound. This certainly does no tentamount to breaking of the order under section 144 Cr. P. C. The police without any reason whatsoever assaulted the boys and fired indiscriminatedly on them a the gate of the Medical College and used thar gas in the compound. This has create a sensational situation and in order to discuss this, the adjournment motion is sought to be moved."

(Mr. Speaker then requested those members who sppored the motion to rise in their places. As less than thirtyfive members rose, the member had not the leave of the House.)

Mr. Speker :

As the member has not got the leave of the House the adjournment motion folls through.

তরজমা :

২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২

জনাব স্পিকার, প্রশ্নোত্তরের পূর্বে আমি আপনার কাছে একটি নিবেদন করতে চাই। যখন দেশের ছাত্ররা যারা আমাদের ভাবী আশা-ভরসার স্থল, পুলিশের গুলির আঘাতে জীবনলীলা সাঙ্গ করছে, সেই সময় আমরা এখানে বসে সভা করতে চাই না। প্রথমে ইনকোয়ারি তার পর হাউস চলবে।

জনাব স্পিকার : অর্ডার, অর্ডার। আমি আশা করব আপনি পরিষদের কার্যবিধি অনুসরণ করে কাজ করবেন।

মাওলানা তর্কবাগীশ : লিডার অব দি হাউস, আগে গিয়ে দেখে এসে বিবৃতি দেবেন। তা না হলে হাউস চলতে দেব না। সেখানে কি অবস্থা হয়েছে আগে জানতে চাই।

জনাব স্পিকার : আমি আশা করব মাননীয় সদস্য মহোদয় বিধিসম্মতভাবে অগ্রসর হবেন। যদি সদস্যরা এ ব্যাপারে পরিষদের নেতার কাছ থেকে শুনতে চান সেক্ষেত্রে আমি পরিষদের নেতাকে বল যে, তাঁর কিছু বলার আছে কিনা।

মাওলানা তর্কবাগীশ : আপনার অর্ডার বুঝি না। আপনার অর্ডার মানব না। লিডার অব দি হাউজ, প্রথম গিয়ে দেখে এসে বিকৃতি দেবেন। তারপর এসেম্বলি বসবে।

জনাব স্পিকার : অর্ডার, অর্ডার। এই চেয়ারকে অবমাননা করার আপনার কোনো অধিকার নেই। দয়া করে আসন গ্রহণ করুন।

মাওলান তর্কবাগীশ : লিডার অব দি হাউস, আগে গিয়ে দেখে এসে বিবৃতি দেবেন। তারপর হাউসের কাজ চলবে।

জনাব স্পিকার : অর্ডার, অর্ডার। আপনি কি বলতে চান যে আপনি কাউকে কথা বলতে দেবেন না? আপনি পরিষদের কার্যক্রমে বাধার সৃষ্টি করছেন।

মাওলানা তর্কবাগীশ : লিডার অব দি হাউস, ইনকোয়ারি করে আসুন, তারপর হাউস বসবে, তার পূর্বে নয়।

জনাব স্পিকার : অর্ডার অর্ডার। জনাব তর্কবাগীশ আমি খুবই দুঃখিত, আপনি যদি এ চেয়ারকে মান্য না করেন তাহলে আমাকে পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থাপক পরিষদের কার্যবিধি ১৬ (২) নং অনুচ্ছেদ মোতাবেক বাধ্য হয়েই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

মাওলানা তর্কবাগীশ : যে কোনো একশন নিতে পারেন। আমাদের দাবি দেখে এসে বলুন পরিস্থিতি কি?

জনাব স্পিকার : অর্ডার, অর্ডার। দয়া করে আসন গ্রহণ করুন। অন্যের কথা বলতে বাধা না দেয়ার জন্য আমি আপনাকে অনুরোধ করছি।

(মাওলানা তাঁর দাবিতে অবিচল। তাঁর এক কথা— লিডার অব দি হাউস, আগে গিয়ে দেখে আসুন তারপর হাউস চলবে। তার পূর্বে নয়। অনুরোধ, আবেদন, শেষে পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থাপক পরিষদের কার্যবিধির ১৬(২) নং অনুচ্ছেদ প্রয়োগের হুমকি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এ ধারা অনুযায়ী সদস্যপদ বাতিল, ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা ও ৬ বছর কারাদণ্ড দেওয়ার বিধান রয়েছে। কিন্তু এ হুমকিতে মাওলানা তর্কবাগীশকে অবদমন করা সম্ভব হয়নি। এমতাবস্থায়, ১৫ মিনিটের জন্য অধিবেশন মুলতবি ঘোষণা করা হয়। ১৫ মিনিট পর অধিবেশন শুরু হলে আগের মতো দাঁড়িয়ে) তর্কবাগীশ জলদগম্ভীরকণ্ঠে বললেন, যখন আমাদের বক্ষের মানিক আমাদের রাষ্ট্রের ভাবী নেতা ৬ জন ছাত্র রক্তশয্যায় শায়িত, তখন আমরা পাখার নিচে বসে হাওয়া খাব এ আমি বরদাস্ত করতে পারি না। আমি জালেমের এই জুলমের প্রতিবাদে পরিষদ দৃহ ত্যাগের আবেদন জানাচ্ছি।

২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২

২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ বিকেল ৪ : ১৫ মিনিটে সংসদ অধিবেশন বসল।

মাওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ : স্যার, আমি সংসদ কার্যক্রম মুলতবি করার অনুরোধ করছি।

জানব স্পিকার : অর্ডার, অর্ডার।

মাওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ : স্যার, আমি অনুরোধ জানাচ্ছি ২১ ফেব্রুয়ারির ১টায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ গেটে পুলিশি হামলায় শান্তিপূর্ণ নাগরিক, ছাত্র ও

পথচারীদের ওপর যে নারকীয় হত্যাযজ্ঞ চালানো হয়েছে তা অতি জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিধায় সংসদের নির্ধারিত কার্যক্রম স্থগিত করে এ নিয়ে আলোচনা করা হোক।

জনাব স্পিকার : এ বিষয়ে কোনো আপত্তি?

পরিষদ নেতা নূরুল আমিন : হ্যাঁ স্যার, আমি আপত্তি করছি। আমি এ মুলতবি আবেদনের বিরোধিতা করছি।

জনাব স্পিকার : আমি পরিষদ গৃহ ত্যাগের আবেদন পেয়েছি।

জনাব মনোরঞ্জন ধর : কিন্তু স্যার, আপনি পরিষদ গৃহ ত্যাগের যে আবেদন পেয়েছেন তা সংসদ কর্যবিধি ১০০ ধারা মোতাবেক আগে পাঠ করে শুনাতে হবে।

জনাব স্পিকার : এ আবেদনপত্রে মাওলানা তর্কবাগীশ উল্লেখ করেছেন, "গতকাল ছিল রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে প্রতিবাদ দিবস। ঢাকায় মিটিং ও মিছিলকে নিষিদ্ধ করে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ ক্যাম্পাসে কিছু ছাত্র কোনো প্রকার সহিংসতা ছাড়া শান্তিপূর্ণভাবে রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই স্লোগান দিচ্ছিল। হঠাৎ করে বিনা কারণে মেডিক্যাল কলেজ গেট ও ক্যাম্পাসে ছাত্রদের ওপর হামলা চালায়। গুলি বর্ষণ করে, টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করে। যা খুবই স্পর্শকাতর ঘটনার জন্ম দেয়। এজন্যই সংসদ মুলতবি রেখে এ বিষয়ে আলোচনা করা হোক।"

তারপর স্পিকার এ প্রস্তাবের পক্ষে-বিপক্ষে হাত তোলার জন্য পরিষদ সদস্যদের আহ্বান জানান। ৪৫ জনেরও কম সদস্য হাত উত্তোলন করে। ফলে প্রস্তাবটি আর গৃহীত হয়নি।

জনাব স্পিকার : সদস্যদের না সম্মতির কারণে পরিষদ গৃহ ত্যাগের আবেদন গৃহীত হলো না। "

মাওলানা তর্কবাগীশ একাই পরিষদ গৃহ ত্যাগ করে রাজপথে নামলেন। অন্য কেউ তার সমর্থনে বের হলেন না। সোজা চলে এলেন মেডিক্যাল কলেজে। ছাত্ররা তাকে পুনরায় পেয়ে স্লোগান দিতে দিতে একটি কক্ষে নিয়ে গেলেন। সেখানে তিনি ছাত্রদের উদ্দেশ দীর্ঘ বক্তৃতা করলেন। ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রাম এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানালেন।

২৩ ও ২৪ ফেব্রুয়ারি পরিষদের অধিবেশন ভিন্ন কারণে মুলতবি থাকে। ২৩ ফেব্রুয়ারি শনিবার মাওলানা তর্কবাগীশ মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারি পার্টি থেকে পদত্যাগ করেন। পদত্যাগপত্রে তিনি লেখেন, "বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দান করতে হবে, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের এ সর্বাত্মক দাবির আওয়াজ তোলার অপরাধে নূরুল আমীন সরকার বিগত ২১ ফেব্রুয়ারি হতে রাজধানী ঢাকার বুকে পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর দ্বারা বেপরোয়াভাবে গুলিবর্ষণের মাধ্যমে শিশু, কিশোর, যুবক, প্রৌঢ় নির্বিশেষে যে হত্যাকাণ্ড চালিয়েছেন, সভ্য জগতের ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল।

"আমার বিবেচনায় জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে এ সরকার গদিতে অধিষ্টিত থাকতে পারে না– এ অধিকার আর তাদের নেই।

"এ সম্পর্কে পরিষদ ভবনে আমি যে প্রতিকার দাবি করেছিলাম সরকারি পক্ষ তাতে কর্ণপাত করেননি। কাজেই এ সরকারের সমর্থক সদস্য হিসেবে নিজেকে যুক্ত রাখতে আমি আর ইচ্ছুক নই। আমি ঢাকার এ নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে মুসলিম লীগ পরিষদ দল হতে অদ্য পদত্যাগ করলাম। সবচাইতে মজার ব্যাপার হলো, যে দাবি উত্থাপন করতে গিয়ে আজ আমাদের ছেলেরা পুলিশের গুলিতে শহীদ হয়ে চলছে, নুরুল আমীন সরকার গতকল্য পরিষদে সেই দাবিই যে কোনো কারণেই হোক ন্যায়সঙ্গত বলে মেনে নিয়েছেন। তবে কি আমাদের এটাই মনে করতে হবে যে, একই কথা মন্ত্রী সাহেবরা বললে হবে পবিত্র আর দেশের লোক বললে হবে অপবিত্র ও অপরাধ। আর তার বদলা দিতে হবে অসংখ্য তরুণ-এর তাজা প্রাণ দিয়ে? এ পরিস্থিতে একটা কথাই পরিষ্কার হলো যে, ন্যায্য অধিকার বা মানবিক অধিকার বলতে কোনো কিছুর অস্তিত্ব এই সরকার দেশে রাখাতে চান না। আমি শহীদানের উদ্দেশ্যে গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি এবং জনগণের এসব দাবির যৌক্তিকতা ঘোষণা করে মুসলিম লীগ হতে বিদায় গ্রহণ করছি।"

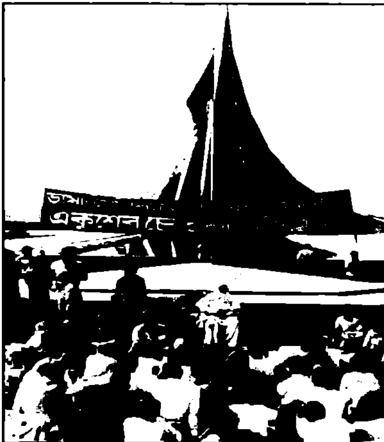
মুসলিম লীগ থেকে পদত্যাগের পাশাপাশি ২৩ ফেব্রুয়ারি মাওলানা ব্যবস্থাপক পরিষদ দপ্তরে নুরুল আমীন সরকারের প্রতি অনাস্থা প্রস্তাব পেশ করেন। ২৫ ফেব্রুয়ারি অধিবশনে উত্থাপিত হবে এ প্রস্তাব। এদিকে এ প্রস্তাবের অনুকূলে সারাদেশে শুরু হলো মিছিল, মিটিং। ছাত্ররা এমএলএ (মেম্বার অব লেজিসসলেটিভ এসেম্বলি)দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ওই প্রস্তাব সমর্থনের জন্য চাপ সৃষ্টি করতে লাগলেন। অন্যদিকে মাওলানাকে নিবৃত করার জন্য নুরুল আমীন সরকার গ্রহণ করলেন ভিন্ন কৌশল। তর্কবাগীশ মাওলানার কাছে পাঠানো হলো লোভনীয় প্রস্তাব। মাওলানা যাতে অনাস্থা প্রস্তাব প্রত্যাহার করেন সে জন্য দেখানো হলো লোভ-লালসা। আর সরকারের পক্ষ থেকে এ লোভনীয় প্রস্তাব নিয়ে এলেন মাওলানার অন্যতম বন্ধু প্রধানমন্ত্রী নুরুল আমীনের পার্লামেন্টারি সেক্রেটারি এসকান্দার আলী খান। বন্ধুর প্রস্তাবে মাওলানা বিস্মিত হলেন, ক্ষুব্ধ হলেন। বললেন, তুমি এমন জঘন্য প্রস্তাব করবে, তা আমি কল্পনাও করতে পারিনি। এ হচ্ছে ২৪ ফেব্রুয়ারি দুপুরের ঘটনা। ওইদিন বিকেলে খান সাহেব আবারো এলেন সেই একই প্রস্তাব নিয়ে। উল্লেখ্য, এসকান্দার খান সাহেবের প্রস্তাবের মধ্যে ছিল সরকারের রিকুইজিশন করা কয়েকটি বাড়ি এবং মোটা অংকের টাকা দেওয়ার লোভ। কিন্তু মাওলানা আগের মতোই ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করলেন এসব প্রস্তাব। ২৪ ফ্রেব্রুয়ারি রাতে গভর্নর ফিরোজ নুন বিশেষ ক্ষমতা বলে অর্ডিন্যান্স জারি করে ব্যবস্থাপক পরিষদের অধিবেশন বন্ধ ঘোষণা করেন এবং ওই রাতেই মাওলানাকে গ্রেফতার করা হয়। তাঁর সঙ্গে আরও যাদের গ্রেফতার করা হয়েছিল তাঁরা হলেন, আবুল হাসিম, খয়রত হোসেন, মনোরঞ্জন ধর এবং গোবিন্দলাল ব্যানার্জী। তার সঙ্গে তার জ্যেষ্ঠ পুত্র সৈয়দ নুরুল আলমকেও গ্রেফতার করা হয়। দীর্ঘ ১৮ মাস কারাভোগের পর ১৯৫৩ সালে ৩১ জুন মাওলানা তর্কবাগীশ মুক্তি লাভ করেন।

তিনি যখন মুক্তি পান তখন দেখেন সরকার তার সবই নিয়ে গেছে। গ্রামের জমিজমা নিলামে তুলে দিয়েছে সরকার।

'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই'

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন নিয়ে মাওলানা তর্কবাগীশ নিজে লিখেছেন–

"১৯৫২-এর মহান ভাষা আন্দোলনে এদেশের সর্বস্তরের মানুষ কোনো না কোনোভাবে অংশগ্রহণ করেছেন এবং তা করেছেন অত্যন্ত স্বতঃস্ফূর্তভাবে। তবে ওই ভাষা আন্দোলনের চূড়ান্ত বিস্ফোরণ বায়ান্ন সালে হলেও আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে অনেক আগে। পাকিস্তান আন্দোলন যখন তুঙ্গে তখনই রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নটি নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছিল। ১৯৪৮ সালে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার আন্দোলন জোরদার হয়ে ওঠে মূলত পাকিস্তানি শাসকের রাষ্ট্র ভাষা সংক্রান্ত বিমাতাসুলভ ঘোণার ফলে। আর এ ঘোষণা দিয়েছিলেন স্বয়ং জনাব মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকায় এসে। ঢাকাসহ দেশের বড় বড় শহরগুলোতে ছাত্র-জনতা 'উর্দু হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্র ভাষা' জিন্না সাহেবের এ ঘোষণার প্রতিবাদে উত্তেজিত হয়ে ওঠে। ১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলনের কিছুটা রূপ আমি ব্যক্তিগতভাবে দেখেছি রাজশাহীতে গিয়ে। সেটা ছিল নভেম্বর মাস। হঠাৎ খবর পেলাম আমার জ্যেষ্ঠপুত্র এসএম নুরুল আলম (তখন রাজশাহী সরকারি কলেজের ছাত্র) রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে অংশ নিতে গিয়ে পাকিস্তান সরকারের গুণ্ডা বাহিনীর হাতে মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে। ১৯ নভেম্বর তৎকালীন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান রাজশাহী সফরে এলে ছাত্ররা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানিয়ে স্লোগান দেয় এবং বিরাট শোভাযাত্রা বের ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। নুরুল আলম তাতে অংশ নেয় এবং সরকারি গুণ্ডা বাহিনীর হাতে আরো অনেকের সাথে মারাত্মকভাবে জখম হয়। আহত পুত্রকে দেখার জন্য আমি রাজশাহী পৌঁছার পর রাজশাহীর আন্দোলনরত ছাত্ররা এক বিশাল সমাবেশে জমায়েত হয়। পাকিস্তানি শাসকচক্র যে এক মারাত্মক দুরভিসন্ধি নিয়ে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ন্যায্য অধিকার পদদলিত করার তৎপরতায় লিপ্ত হতে যাচ্ছেন তা অনেকটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল এবং তারই প্রথম আঘাত বাংলা ভাষার ওপর। সেদিন সেই সমাবেশে আমি বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবির সারবত্তা তুলে ধরে বক্তৃতা করেছিলাম। ছাত্ররা



> মাওলানা তর্কবাগীশের কাছে বাংলাদেশী ও বাংলাভাষীরা চিরকৃতজ্ঞ। '৫২-এর একুশে ফেব্রুয়ারিতে ব্যবস্থাপক পরিষধের যিনি গর্জে উঠেছিলেন নিরীহ বাঙালির বুকে পশ্চিম পাকিস্তানি হায়েনাদের রক্তাক্ত পৈশাচিকতার বিরুদ্ধে। মায়ের ভাষার মর্যাদা রক্ষায় তাঁর ত্যাগ প্রাতঃস্মরণীয় হয়ে থাকবে অনন্তকাল

জাতীয় স্মৃতিসৌধে ভাষা-সৈনিকদের মহাসমাবেশে বক্তৃতা করছেন ভাষা-সৈনিক মাওলানা তর্কবাগীশ

মুহুর্মুহু করতালি দিয়ে বাংলা ভাষার প্রতি তাদের যে আন্তরিকতা ও আবেগময়তার পরিচয় দিয়েছিল– তা আমাকে তখন রীতিমতো আশান্বিত করে তোলে। আমার ধারণা জন্মে এ পৃথিবীর কোনো শক্তিই বাংলা ভাষার কাঙ্ক্ষিত মর্যাদা ক্ষুণ্ন করতে পারবে না। বাংলা ভাষার এ আন্দোলনে ছাত্র-যুব সমাজ পালন করেন সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। সরাসরি ছাত্রযুব সমাজের সাথে না থাকলেও যাদের নাম জেনেছি তাদের মধ্যে খালেক নেওয়াজ খান, শামসুল হক, অলি আহাদ, মোহাম্মদ তোয়াহা, আবদুল মতিন, কাজী গোলাম মাহবুব, এসএম নূরুল আলম, আজিজ আহম্মদ, আবদুল আউয়াল প্রমুখের নাম এ মুহূর্তে স্মরণ করছি। আমি তখন পূর্ব বাংলার আইন পরিষদের সদস্য। কিন্তু ২০ ফেব্রুয়ারিতেই সরকার ঢাকায় জারি করেন ১৪৪ ধারা। জনসভা মিছিল, মিটিং ইত্যাদি নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। রাস্তায় রাস্তায় মোতায়েন করা হয় পুলিশ ও মিলিটারি। এরই মধ্যে বেলা ২টার দিকে এসেম্বলি হাউজে মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারি পার্টির সভা বসে। আমার মনে পড়ে একুশে ফেব্রুয়ারি পরিষদের সভা আহ্বান করা হয়। তখন বাইরে অবিরাম রাইফেলের গর্জন, কিন্তু কোনো মন্ত্রী কিংবা পরিষদ সদস্যের ভেতরেই দেখলাম যেন কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। কারও কোনো উদ্বেগ নেই। মাঝে মাঝে গুলি ও কাঁদানে গ্যাস, শেল বর্ষণের প্রচণ্ড শব্দে আমি শিউরে উঠেছিলাম। এক সময়ে হাউস থেকে বেরিয়ে আসি, দেখি রাজপথ জনশূন্য। রাইফেল ও লাঠি হাতে স্থানে স্থানে দাঁড়িয়ে রয়েছে পুলিশ। আমি মেডিকেল কলেজের দিকে অগ্রসর হলাম।

কলেজের কাছাকাছি এসে যে দৃশ্য দেখলাম তাতে অশ্রু সংবরণ করতে পারিনি। ছাত্ররা চিৎকার করছে, দূর থেকে তারা গলা ফাটিয়ে আইন সভার সদস্যদের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে, বেরিয়ে এসে অবস্থা দেখার জন্য, আহত ছাত্ররা আর্তনাদ করছে। কারো কারো কাপড়ে ফেনাযুক্ত তাজা রক্ত দেখতে পেলাম, বহু ছাত্র হতাহত হয়েছে। ব্রিটিশ আমলে আমার সক্রিয় রাজনীতির চল্লিশ বছরের জীবনে হাসপাতালের অভ্যন্তরে পুলিশের গুলিবর্ষণের এমন ঘটনা আর দ্বিতীয়টি দেখিনি, মর্মান্তিক এ দৃশ্য সহ্য করতে পারলাম না। হাউসের কাছে প্রতিবাদ জানাবার জন্য অবস্থা বিবৃত করার জন্য ছুটে এলাম এসেম্বলি হাউসে। বিকাল তখন তিনটা ত্রিশ মিনিট, স্পিকার জনাব আবদুল করিম আসন গ্রহণ করলেন। আমি তখন উঠে দাঁড়ালাম। জনাব স্পিকার, প্রশ্ন-উত্তরের পূর্বে আমি আপনার কাছে একটি নিবেদন করতে চাই। ভবিষ্যতের আশা-ভরসা দেশের ছাত্ররা যখন পুলিশের গুলিতে জীবন দিচ্ছে, তখন আমরা এখানে বসে সভা করতে পারি না। আমার বক্তব্য সম্পর্কে প্রথমে ইনকোয়ারি হোক, তারপর হাউস বসবে। এ নিয়ে স্পিকারের সঙ্গে আমার দীর্ঘ বাক-বিতণ্ডা হয়। তিনি বারবার আমাকে এসেম্বলির আইন তোমাবেক আচরণ করতে বলছিলেন। আমারও এক কথা যে সরকার আমাদের সন্তানদের গুলি করে হত্যা করেছে সেই সরকারের আইন মানা যায় না, আমি মানবো না। আগে প্রধানমন্ত্রীকে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে হাউসে বিবৃতি দিতে হবে, তারপর অধিবেশন চলবে, তার আগে নয়। তুমুল বাক-বিতণ্ডার এক পর্যায়ে স্পিকার অধিবেশন মুলতবি ঘোষণা করেন। মুলতবির পর অধিবেশন পুনরায় শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এক বিবৃতির মাধ্যমে এহেন জুলুমের প্রতিবাদ জানিয়ে আমি পরিষদ ভবন ত্যাগ করি এবং চিরতরে মুসলিম লীগ ত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়ে লিখিত এ বিবৃতিটি প্রদান করি, "বাংলাকে

পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দান করতে হবে, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ এ সর্বাত্মক দাবির আওয়াজ তোলার অপরাধে নূরুল আমীন সরকার বিগত ২১ ফেব্রুয়ারি হতে রাজধানী ঢাকার বুকে পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর সদস্যদের দ্বারা বেপরোয়াভাবে গুলিবর্ষণের মাধ্যমে শিশু, কিশোর. যুবক, প্রৌঢ় নির্বিশেষে যে হত্যাকাণ্ড চালিয়েছেন, সভ্য জগতের ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল। আমার বিবেচনায় জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে এ সরকার গদিতে অধিষ্টিত থাকতে পারে না— সেই অধিকার আর তাদের নেই।

এ সম্পর্কে পরিষদ ভবনে আমি যে প্রতিকার দাবি করেছিলাম সরকার পক্ষ তাতে কর্ণপাত করেননি। কাজেই এ সরকারের সমর্থক সদস্য হিসেবে নিজেকে যুক্ত রাখতে আমি আর ইচ্ছুক নই। আমি ঢাকার এ নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে মুসলিম লীগ পরিষদীয় দল হতে অদ্য পদত্যাগ করলাম। সবচাইতে মজার ব্যাপার হলো, যে দাবি উত্থাপন করতে গিয়ে আজ আমাদের ছেলেরা পুলিশের গুলিতে শহীদ হয়ে চলেছে, নূরুল আমিন গতকল্য পরিষদে সেই দাবি যে কোনো কারণেই হোক ন্যায়সঙ্গত বলে মেনে নিয়েছেন। তবে কি আমাদের তাই মনে করতে হবে যে, একই কথা মন্ত্রী সাহেবরা বললে হবে পবিত্র আর দেশের লোক বললে হবে অপবিত্র ও অপরাধ, আর তার বদলা দিতে হবে অসংখ্য তরুণের তাজা প্রাণ দিয়ে? এ পরিস্থিতিতে একটা কথাই পরিষ্কার হলো যে, ন্যায্য অধিকার বা মানব অধিকার বলতে কোনো কিছুর অস্তিত্ব এ সরকার দেশে রাখতে চান না। আমি শহীদানের উদ্দেশ্যে গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি এবং জনগণের এসব দাবির যৌক্তিকতা ঘোষণা করে মুসলিম লীগ হতে বিদায় গ্রহণ করিতেছি।" মুসলিম লীগ থেকে পদত্যাগের অব্যবহিত পরই জনাব খয়রাত হোসেন খান সাহেব ওসমান আলি, আনোয়ারা বেগম প্রমুখকে নিয়ে গঠন করি পার্লামেন্টের বিরোধী গ্রুপ— যদিও তখন এর কোনো নামকরণ করা হয়নি।

পরিষদ ভবন ত্যাগের পূর্বে মানবতার দোহাই দিয়ে অন্য সদস্যদের প্রতিও পরিষদ থেকে বেরিয়ে আসার আহ্বান জানাই। হাউস থেকে সোজা চলে আসি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে, এখানে এসে ছাত্রদের মিছিলে যোগ দেই। মিছিল সহযোগে বিশ্ববিদ্যালয় যাওয়ার পথে যেখানে বর্তমান শহীদ মিনার অবস্থিত, সেখানে যে টিনের হোস্টেল ছিল তার বারান্দায় একজন শহীদ ছাত্রের মাথার খুলি বুলেটের আঘাতে উড়ে গেছে। মগজ পড়ে আছে অন্যত্র। ছেলেটির মুখ পোড়া বেগুনের মতো হয়ে গেছে। ছাত্রদের মধ্যে চরম উত্তেজনা, হোস্টেলে ছাত্র-জনতার উদ্দেশ্যে আমাকে বক্তৃতা করতে হলো। বক্তৃতায় আমি শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে আন্দোলন অব্যাহত রাখার আহ্বান জানালাম। পরে পুলিশের বুলেটে আহত ও নিহত অন্যদের দেখার জন্য বের হলাম। পরদিন ২২ ফেব্রুয়ারি যথারীতি অধিবেশন বসেছে পরিষদের। আমি প্রস্তাব উত্থাপন করলাম অধিবেশন মুলতবির, এ প্রস্তাবের প্রতি ৩৫ জন সদস্যের সমর্থন আছে কি-না তা সদস্যদের কাছে স্পিকার জানতে চাইলেন, কিন্তু খয়রাত হোসেন, খান সাহেব ওসমান আলি, অলি আহাম্মদ খান, আনোয়ারা খাতুন, মনোরঞ্জন ধর, ধীরেন দত্ত,

গোবিন্দ বল্লভ ব্যানার্জি, বসন্ত কুমার দাস, আকবর আলী আকন্দ, শামসুদ্দিন আহাম্মদ, ডা. ভোলানাথ বিশ্বাস ও শ্রী হারান চন্দ্র বর্মণ ছাড়া আর কেউ এ প্রস্তাব সমর্থন করলেন না। ফলে মুলতবি প্রস্তাব স্পিকার নাকচ করে দিলেন। অতঃপর আমি নূরুল আমিন সরকারের প্রতি অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করলাম। ২৩ ও ২৪ ফেব্রুয়ারি অধিবেশন মুলতবি রাখা হলো। ঘোষণা দেওয়া হলো ২৫ তারিখে মুলতবি অধিবেশনে নূরুল আমিনের প্রতি অনাস্থা প্রস্তাব আলোচিত হবে। এদিকে ঢাকাসহ সারাদেশে নূরুল আমিন সরকারের বিরুদ্ধে দাউদাউ করে জ্বলছে আগুন। আন্দোলন গতি লাভ করতে থাকে তীব্র থেকে তীব্রতর বেগে। এদিকে ছাত্ররা পরিষদের সদস্যদের প্রতি আমাকে সমর্থন দেওয়ার জন্য প্রভাবিত করার জোর চেষ্টা চালাতে থাকে। এতে সরকার ভীত হয়ে পড়েন। ২৪ ফেব্রুয়ারি রাত ৩টার দিকে আমার দরজায় ঠকঠক শব্দ হয়। জিজ্ঞেস করলাম কে? দারোয়ান বলল, আপনার কাছে লোক এসেছে, আমি দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে একজন জবরদস্ত পুলিশ ইন্সপেক্টর আমাকে জাপটে ধরল। আমি বেতমিজ-বেয়াদব বলে ধমকে উঠলাম। সঙ্গে সঙ্গে এসপি এবং ডিএসপি এগিয়ে এলেন। বললেন, আমরা দুঃখিত, আমরা আপনাকে গ্রেফতার করার জন্যই এসেছি। আমার পাশের কামরায় তখন খয়রাত হোসেন থাকতেন। তিনি পুলিশের আওয়াজ পেয়ে আমার কক্ষে এলেন, জানতে চাইলেন কেবল মাওলানা সাহেবের বিরুদ্ধেই গ্রেফতারি পরোয়ানা, না আর কারো বিরুদ্ধেও আছে। তৎক্ষণাৎ অফিসারটি জানালেন, আপনাকেও গ্রেফতার করা হলো। প্রথমে আমাদের কোতোয়ালি থানায় নিয়ে যাওয়া হলো। সেখানে দেখলাম শ্রী মনোরঞ্জন ধর ও গোবিন্দ্র বল্লভ ব্যানার্জীকে আগেই আনা হয়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখলাম একজনের কাঁধে হাত রেখে আবুল হাসিম এসে হাজির, তিনিও এসেছেন গ্রেফতার হয়ে। অতঃপর আমরা পরস্পরের কুশল বিনিময় করলাম। ওই রাতেই আমাদের নিয়ে যাওয়া হলো ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে, জেলগেটে রাতের আঁধার কেটে গেছে। সেখানেই আমি ফজরের নামাজ আদায় করলাম। যতদূর মনে পড়ে, আমাদের ৫ নং খাঁচায় রাখা হয়। দেখলাম সমস্ত জেলখানায় উত্তেজনা, গ্রেফতার করে আনা হয়েছে বহু ছাত্র কর্মীকে। তারা মুহুর্মুহু রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই স্লোগানে প্রকম্পিত করে তুলছে কারাগারের চার দেয়াল। এমনই সময় একদিন দেখলাম আমার বিশিষ্ট বন্ধু নারায়ণগঞ্জ থেকে নির্বাচিত পরিষদ সদস্য খান সাহেব ওসমান আলি ও তার পুত্রকে গ্রেফতার করে আনা হয়েছে। শুনলাম পাঞ্জাব রেজিমেন্টের এক ব্যাটালিয়ান পদাতিক সৈন্য ১৪ ঘণ্টা অবরোধ করে রেখে তাঁর বাসভবন তছনছ করেছে। এমনকি পুলিশ লাঠিচার্জ করে তার বৃদ্ধা মায়ের একটি হাত ভেঙে ফেলেছে। বন্ধুর এহেন দুঃসংবাদ শুনে কোনো সান্ত্বনা দেওয়ার ভাষা আমার ছিল না। মাতৃভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে আমাদের যে সূর্য সন্তানেরা জীবন দিয়েছে, তাদের ত্যাগের তুলনায় বন্ধু ওসমান আলীর ক্ষতি তেমন কিছু নয়। তবুও মনে প্রশ্ন জেগেছে, এ কোন স্বৈরাচারের দুঃশাসনের কবলে নিপতিত হলো এই জাতি? ১৯০৫ সালে ভাগ কর, শাসন কর নীতির ভিত্তিতে ব্রিটিশ বঙ্গ বিভাগ করে। কিন্তু পূর্ববঙ্গের মানুষ বঙ্গভাগকে স্বাগত জানায়। কারণ তাদের অভিজ্ঞতা হয়েছিল যে, শিক্ষা-দীক্ষাসহ আর্থ-সামাজিক

সকল ক্ষেত্রেই তারা নিষ্পেষিত-বঞ্চিত। প্রতিবেশী সম্প্রদায়ের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানে বাঙালি মুসলমানদের কোনো অনীহা ছিল না। কিন্তু বাস্তবতা ছিল ভিন্নতর। ব্রিটিশের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ সহযোগিতায় প্রতিবেশী সম্প্রদায় বাঙালি মুসলমানদের প্রতি যে মনোভঙ্গির প্রকাশ ঘটান, তা ছিল সাম্প্রদায়িক দোষে দুষ্ট। ফলে অত্র এলাকার মানুষকে বঞ্চনার শিকার হতে হয়। এ কারণেই এ এলাকার মানুষ বঙ্গভাগকে স্বাগত জানান। ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনেও অনুরূপ চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অল্পকিছুদিন পরই এদেশের মানুষ উপলব্ধি করল যে, মানচিত্র ও পতাকা বদল হলেও বঞ্চনার অবসান হয়নি। তারা যে তিমিরে ছিলেন সেই তিমিরেই আছেন। ভাষা সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য নিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এমতাবস্থায় ১৯০৫ ও ১৯৪৬ সালের চেতনায় আবারও তারা উজ্জীবিত হয়ে ওঠেন এবং বিস্ফোরণ ঘটে ৮ ফাল্গুন, ২১ ফেব্রুয়ারি। '৫২-এর ভাষা আন্দোলনের তাৎপর্য ব্যাপক, তাই আংশিক হলেও লক্ষ যে অর্জিত হয়েছে একথা সন্দেহাতীতভাবে বলা যায়।

বাংলা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে সাংবিধানিক স্বীকৃতি পেয়েছে, যদিও জীবনের সর্বস্তরে এখনো চালু হয়নি। না হবার কারণ স্বদেশী চেতনার পরিপন্থী মানসিকতা ও ঔপনিবেশিক আমলের ঘুণে ধরা আমলাতন্ত্র। '৫২-এর একুশে ফেব্রুয়ারি আমাদের ঐতিহাসিক ধারানুক্রমে একটি মাইলস্টোন। এখান থেকে আমাদের পরবর্তী গন্তব্যে উত্তরণের পথ আবিষ্কৃত হয়েছে। সেই পথ ধরেই আমরা '৭১-এর রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে লাভ করেছি স্বাধীনতা। অবশ্য চূড়ান্ত গন্তব্যে এখনো পর্যন্ত আমরা উপনীত হতে পেরেছি কি-না ভেবে দেখার বিষয়। আমার মনে হয় '৫২-এর পথ ধরে আমাদের আরও হাঁটতে হবে চূড়ান্ত গন্তব্যে পৌঁছার জন্য। অসংখ্য নেতা-কর্মী, ছাত্র এবং যুব সমাজ যার যার অবস্থান থেকে ভাষা সংগ্রামে ভূমিকা রেখেছে, আমিও রাখতে চেষ্টা করেছি। আমার সে দিনের বন্ধুদের আজ অনেকেই বেঁচে নেই। জানি না আগামী দিনের মানুষ আমাদের ভূমিকাকে কিভাবে মূল্যায়ন করবে। তবে এটুকু বলে যেতে চাই যে, আমরা সেদিন কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মতবাদে প্রভাবিত ছিলাম না। যা কিছু করেছি স্বতঃস্ফূর্তভাবেই করেছি। অন্তরের তাগিদে করেছি। সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে সে দিন যে চেতনা কাজ করেছে, আমার মধ্যেও সেই একই চেতনা কাজ করেছে বলে আমার বিশ্বাস। আবুল হাশিম, খয়রাত হোসেন, গোবিন্দ ব্যানার্জী, ধীরেন দত্ত, খান সাহেব ওসমান আলি, অজিত গুহ, মুনির চৌধুরী এদের যে কেউ বেঁচে থাকলে অনুরূপ কথাই বোধ করি বলতেন।"

পাকিস্তান গণপরিষদে প্রথম বাংলা বক্তৃতা

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান হওয়ার পর পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সদস্যদের নিয়ে পাকিস্তান গণপরিষদ গঠিত হয়। এ পরিষদের দীর্ঘ ৮ বছর অর্থাৎ ১৯৫৫ সালে ১১ আগস্ট পর্যন্ত ইংরেজি ও উর্দুই গণপরিষদের ভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু নাগরিক বাঙালির মাতৃভাষা বাংলায় কোনো সদস্য এই ৮ বছর গণপরিষদে বৃক্তৃতা করেননি। এমনকি সংখ্যাগুরু পাকিস্তানির ভাষা বাংলা পরিষদের অন্যতম ভাষা হওয়া উচিত এ কথাও কেউ তোলেননি। সবাই ইংরেজি, উর্দুতে বক্তৃতা রাখত। যদিও

মাওলানা তর্কবাগীশ উর্দু জানতেন অনেক উর্দুভাষীর চেয়েও ভাল। বাংলা-উর্দু ছাড়াও তিনি ইংরেজি, আরবি, হিন্দি, ফার্সি ও পাঞ্জাবি ভাষায় বক্তৃতা দিতে পারতেন অনর্গল। মাওলানা তর্কবাগীশ সর্বপ্রথম পাকিস্তানের গণপরিষদে বাংলায় বক্তৃতা করেন এবং বাংলাকে গণপরিষদের অন্যতম ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য করেন



পাকিস্তানের গণপরিষদে বাংলায় বক্তৃতারত মাওলানা তর্কবাগীশ

তাদের অনেকের উর্দু ছিল রীতিমত হাস্যকর। আর মাওলানা তর্কবাগীশ উর্দু জানতেন অনেক উর্দু ভাষীর চেয়েও ভালো। বাংলা-উর্দু ছাড়াও তিনি ইংরেজি, আরবি, হিন্দি, ফার্সি ও পাঞ্জাবি ভাষায় বক্তৃতা দিতে পারতেন অনর্গল। মাওলানা তর্কবাগীশ সর্বপ্রথম পাকিস্তানের গণপরিষদে বাংলায় বক্তৃতা করেন এবং বাংলাকে গণপরিষদের অন্যতম ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য করেন। পাকিস্তান গণপরিষদের কার্যবিবরণী থেকে গণপরিষদে মাওলানা তর্কবাগীশের বাংলায় প্রদত্ত কয়েকটি ঐতিহাসিক বক্তৃতার কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করা হলো।

জনাব স্পিকার!

চার কোটি বাইশ লক্ষ লোকের মাতৃভাষায় আমি আপনাকে ধন্যবাদ দেয়াটা আমার নিজের জন্য গৌরবজনক বলে মনে করি। জানি না তা আপনি নিজের জন্য গৌরবজনক মনে করবেন কি-না। তাছাড়া আপনার চেহারা একজন সত্যিকার মুসলমান আলেমের মতো। এ চেহারার আবরণে আজ ১৩০০ বছর পর্যন্ত বহুলোক ইসলাম ও মুসলমানকে ফাঁকি দিয়েছে। আমি আশা করি, আপনার এ চেহারা, এ আদর্শ চেহারা সত্যিকার ইসলাম ও মুসলমানেরই চেহারা হবে। আমি বিশ্বাস করি, আপনি সর্বপ্রথম আমাদেরকে যে অধিকার দিবেন সেই অধিকার, এই পরিষদে বাংলা ভাষায় বক্তৃতা দেয়ার অধিকার। এ কয়েক দিন আমি কিছু বলতে পারিনি। তার কারণ, যিনি চেয়ারম্যান ছিলেন, জনাব গুরমানী তিনি আমার যুক্তি বুঝতে পারতেন না কিন্তু আপনি আমার যুক্তি বুঝতে পারবেন। গণপরিষদের স্পিকার হয়ে নিশ্চয়ই আপনি বাংলা ভাষা ভুলে যাবেন না– এ আশা করি। কাজেই আমার কথা আপনি বুঝতে পারবেন সে বিশ্বাসেই আজ আমি আপনাকে ধন্যবাদ দিতে দাঁড়ালাম (১১ আগস্ট ১৯৫৫)।

জনাব স্পিকার!

একটি স্বাধীন গণতান্ত্রিক দেশের গণপষিদে গণতন্ত্রের ভিত্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে সে দেশের অধিকাংশের রায় অনুযায়ী যাতে সকল কাজ সম্পন্ন হয় তজ্জন্য অধিকাংশের

মাতৃভাষা উর্দু, পুস্তু বা বাংলা যাই হোক— আইনত এবং যুক্তিসঙ্গতভাবে সেই ভাষায় বক্তৃতা করতে বাধ্য। যেহেতু আমি উর্দু জানি সেহেতু আমাকে উর্দুতে বক্তৃতা করতে হবে এর কোনো অর্থ হয় না। জমহুরিয়াত বা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চাইলে অধিকাংশ নাগরিকের ভাষাকেই পরিষদের ভাষা হিসেবে গুরুত্ব দিতে হবে। সেহেতু অধিকাংশের ভাষায় আমি বক্তৃতা দেয়া অপরিহার্য বলে মনে করি।

এই পাকিস্তানের চার কোটি বাইশ লক্ষ লোক বাস করে পূর্ব বাংলায়। যদি আপনারা জমহুরিয়াতে মানতে চান, তাহলে স্বীকার করতে হবে, আপনাদেরকে মেনে নিতেই হবে অধিকাংশের রায়। এটা কি যুক্তিসঙ্গত নয় যে, চার কোটি বাইশ লক্ষ লোকের যেখানে বাস, সেই পূর্ব বাংলায় আপনাদের পাকিস্তানের রাজধানী হবে। কিন্তু তা হয় নাই। অস্বাভাবিকভাবে রাজধানী হয়েছে করাচিতে, দেড় হাজার মাইল দূরে (২০ সেপ্টেম্বর ১৯৫৫)।

জনাব স্পিকার!

আমি জানি যাদের বুকে-কানে মোহর লেগে আছে, তাদের জন্য আমার বক্তৃতা নয়। তারা কৌতুক করতে পারেন আমার সামনে। পাকিস্তান গণপরিষদের মাত্র এ ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠই নয় আমার সামনে আমার বিরাট জনতা, দেশের দুঃখী সর্বহারা মানুষ আমার চোখে আজ ভেসে উঠছে। বেদনায় মুচড়ে পড়ছি।

পাকিস্তানের শতকরা ৫৬ জন নাগরিকের মাতৃভাষায় বক্তৃতা দেয়া আমি গৌরব বলে মনে করি। শুধু তাই নয়, যে ভাষার দাবিকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে সেদিন আমার সন্তানেরা এই জালেম সরকারের গুলির সম্মুখীন হয়েছিল, আমার সন্তানেরা নিজেদের উত্তপ্ত শোণিতধারা ঢাকার মাটিতে ঢেলে দিয়েছিল, আজ সেই মাতৃভাষায় বক্তৃতা দিতে যারা লজ্জাবোধ করে, আমি বলতে দ্বিধাবোধ করবো না যে, তারা নিজ জাতির সঙ্গে গাদ্দারী করছে...।"

ভাষা আন্দোলনের জন্য কারা ভোগ থেকে মুক্তি পেয়ে তিনি ওই বছরই পাকিস্তান কৃষক সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হন। '৫৪-এর নির্বাচনে তিনি বিপুল ভোটে বিজয়ী হন।

১৯৫৭ সালের শেষ দিকে আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। '৬২ সালে তিনি হোসন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টের হয়ে দেশব্যাপী সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলন গড়ে তোলেন। '৬৬ সালে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ দুই ভাগ হয়ে যায়। তবে দলের প্রতিষ্ঠাতা প্রবীণ নেতৃবৃন্দ মাওলানা তর্কবাগীশকেই সভাপতি হিসেবে গ্রহণ করেন, তার সঙ্গে থাকেন। '৭০-এর নির্বাচনে তিনি পৃথক দু'টি আসন থেকে বিপুল ভোটে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। '৭১-এর স্বাধীনতা যুদ্ধে ছিল তার দীপ্ত পদক্ষেপ। সাহসী ভূমিকা।

লিখনী হাতে...

মাওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি, জ্ঞানচর্চা, ধর্মীয় অনুশীলন সব কিছুতেই আছে তার দীপ্ত পদচারণা, সাহিত্যাঙ্গনেও তিনি বিরাট ভূমিকা রেখেছেন। কিছু দিন আগেই তো পড়লাম, ঢাকা থেকে প্রকাশিত একটি প্রথম সারির জাতীয় দৈনিকে একটি জরিপের ফলাফল। দেশে

সবচেয়ে বেশি বই কেনে-পড়ে ছাত্ররা। আর কেনা দূরে থাক—পড়েও না এমনকি বই থেকে সবচেয়ে বেশি দূরে অবস্থান করে বর্তমান রাজনীতিকরা। বর্তমান রাজনীতিকদের সঙ্গে প্রচণ্ড সাংঘর্ষিকতা রয়েছে মাওলানা তর্কবাগীশের। তিনি শুধু বই কিনে পড়তেনই না, পাঠক সমাদৃত বহু গ্রন্থের প্রণেতাও তিনি। কেবল নামগুলো পড়েই বোঝা যায় তার সাহিত্যের কারিশমা। শিরাজী স্মৃতি, সমকালীন জীবনবোধ, স্মৃতির সৈকতে আমি (আত্মজীবনী), ইসলামের স্বর্ণযুগের ছিন্ন পৃষ্ঠা, শেষ প্রেরিত নবী, সত্যার্থ প্রকাশে সত্যার্থ, সত্যার্থে ভ্রমণে, কোরআন, বিজ্ঞান ও বেদ ইত্যাদিসহ অসংখ্য প্রবন্ধ-নিবন্ধ তাঁর কলমের খোঁচায় সৃষ্টি হয়েছে। সমৃদ্ধ হয়েছে আমাদের বাংলা ভাষা।

তর্কবাগীশ স্বাধীনতাবিরোধী ছিলেন!

একাত্তরে অখণ্ড পাকিস্তানের পক্ষে রেডিওতে আপনার বাবার ভাষণ প্রচারিত হয়েছে। বিভিন্ন পত্রিকায় বিবৃতি এসেছে... ? আমাদের মুখ থেকে একথা শুনে আঁৎকে উঠলেন হাসু। বললেন, আমার বাবা সম্পর্কে এই প্রথম শুনলাম এ জাতীয় কথা। এও কি সম্ভব? মুক্তিযুদ্ধের ন'মাস বাবার সঙ্গে সঙ্গে আমি ছিলাম। মুক্তিযুদ্ধে তাঁর কী ভূমিকা ছিল সেটা আমিই ভালো জানি। তর্কবাগীশ যদি স্বাধীনতাবিরোধী হন তাহলে এদেশে কেউই মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে দাবি করতে পারবে না।

একাত্তরে যদি তাঁর কোনো ভাষণ প্রচারিত হয়ে থাকে সেটা '৬৫-এর ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময়ের রেকর্ডিংটাই হবে। বাবা তখন আ'লীগের সভাপতি ছিলেন। সঙ্গতকারণেই সে যুদ্ধের সময় ভারতের বিরুদ্ধে তিনি জোরালো বক্তব্য দিয়েছিলেন। সেটাকেই সেন্সর করে একাত্তরের যুদ্ধে প্রচার করেছে ধুরন্ধর ইয়াহিয়া সরকার। পত্রিকায় বিবৃতির ব্যাপারটাও ঠিক এরকমই। তখন সব ক'টি পত্রিকার সম্পাদকের হাত বাঁধা ছিল সামরিক সরকারের বন্দুকের নলের মাথায়। সুতরাং কে কার নামে কী বিবৃতি পাঠিয়েছে তা যাচাই করার তাদের সুযোগ কোথায়?



লেখায় মগ্ন মাওলানা তর্কবাগীশ

লাল-সবুজের পতাকা হাতে...

একাত্তরের ২৫ মার্চের আগের কথা। ২৩ মার্চ। মাওলানা তর্কবাগীশ শেখ মুজিবকে বললেন, সময় দিন দিন খুব খারাপ হচ্ছে। আরো হবে। তাই আমি মনে করি এখন তোমার স্বাধীনতার ঘোষণা দেওয়া ছাড়া কোনো বিকল্প পথ নেই। এতদিন এসব কথা গোপন ছিল। এখন স্পষ্ট...। মাওলানা তর্কবাগীশের সেই ২৩ মার্চের কথাই শেষ পর্যন্ত মেনেছিলেন শেখ মুজিবসহ দেশের সব নেতাই। তবে তত দিনে অনেক সময় পার হয়ে গেছে। খেসারতও দিতে হয়েছে প্রচুর। তর্কবাগীশ ভারতের হস্তক্ষেপের বেলায় ছিলেন বেশ সতর্ক। বলতেন, আমরা ইন্ডিয়ার সাহায্য চাইতে যাব না। পরে পুরোটাই হারানোর ভয় আছে।

একাত্তরের দিনগুলোতে তিনি পুরো উত্তর বঙ্গ ঘুরে বেড়ান। বিভিন্ন কৌশলে মানুষকে যুদ্ধের প্রতি উৎসাহিত করেন। বাড়ি বাড়ি যান। মিটিং করেন। বুঝান। দেশ স্বাধীন করতে হবে। অস্ত্র ধরতে হবে। এর কোনো বিকল্প নেই। তার সে আহ্বানে একটা সাড়া পড়ে যায় উত্তরবঙ্গে। প্রচুর লোকের সমাগম ঘটতে থাকে প্রতিটি মিটিংয়ে। আ. লীগের সাবেক তথ্য প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক আবু সাঈদও উপস্থিত ছিলেন পাবনার বেড়ায় আয়োজিত এক মিটিং-এ। তিনি জনগণকে যুদ্ধের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত করে ট্রেনিং-এর জন্য বিভিন্ন ক্যাম্পে পাঠিয়ে দিতেন। তাই ধীরে ধীরে পাকহানাদারদের কাছে মাওলানা তর্কবাগীশ একটি মূর্তিমান আতংক হয়ে ওঠেন। পাকসৈন্য হন্য হয়ে তাকে খুঁজতে থাকে। বাড়িতে হানা দেয়। তাকে না পেয়ে তার বাড়িঘর জ্বালিয়ে ছাই বানিয়ে ফেলে পাকিস্তানি সৈন্যরা। তখন তার ছ'শ বছরের পুরনো বাড়ির সঙ্গে ইতিহাসের শত শত উপাদান তারা জ্বালিয়ে দেয়। ২৫ খণ্ডের একটি 'ইসলামের ইতিহাস' ছিল। যে বইটি লিখেছিলেন তর্কবাগীশের দাদা নিজে। সংগ্রহে থাকা পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষার আল-কোরআন।

মাওলানা তর্কবাগীশের অবস্থান একবার আর্মিরা জেনে ফেলে। তিনি চলনবিলে আছেন। সঙ্গে তার মেজ ছেলে হাসু। আর্মিরা সংবাদ পাওয়া মাত্র তাদেরকে ঘিরে ফেলে। শ'য়ে শ'য়ে আর্মি। হাসু যখন আর্মিদের উপস্থিতি টের পেলেন চুপি চুপি অস্ত্রের ব্যাগটা এক বাড়ির মুরগির খোঁয়াড়ে লুকিয়ে ফেলেন।

তিনি নিজেও আত্মগোপন করেন এক জঙ্গলে। আর্মিরা আস্তে আস্তে মাওলানা তর্কবাগীশের কাছাকাছি চলে আসে। আর্মি অফিসার তর্কবাগীশকে দেখেই ঘাবড়ে যায়। বেশ উঁচা, লম্বা, স্বাস্থ্যবান। মুখ ভরা সফেদ চাপদাড়ি, ফর্সা-দীপ্তিময় উজ্জ্বল চেহারা, দেখে মনে হয় ফেরেশ্‌তা। আর্মি অফিসার যখন তার পরিচয় জানল, তিনি পাকিস্তান মাখাদা শরীফের পীর সাহেবের আত্মীয়, পীর ভাই। আরো বেশি দুর্বল হয়ে গেল। বলল, হুজুর আপনার জন্য আমরা কী করতে পারি? হেলিকপ্টার আনি, আপনাকে বাড়িতে বা শহরে পৌঁছে দেই? মাওলানা তর্কবাগীশ বললেন– না, কিছু লাগবে না আমার। আমি চাই, তোমরা এলাকা ছেড়ে চলে যাও, এটাই সবচেয়ে বড় খেদমত হবে।

একাত্তরে মাওলানা তর্কবাগীশের গ্রামের বাড়িসহ ঢাকার ৩০ বনগ্রাম লেনের বাড়িটিও ধ্বংস হয় পাকিস্তানিদের হাতে। স্বাধীনতার পর অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট সৈয়দ নজরুল ইসলাম তর্কবাগীশকে বলেন, 'আপনার দু'টি বাড়িই তো শেষ হয়ে গেছে, কী আর করা বঙ্গভবনে উঠুন পরিবার নিয়ে'। তখন জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত বঙ্গভবনেই অবস্থান করেন মাওলানা তর্কবাগীশ। পরবর্তীতে এমপি'র বেতন দিয়ে বনগ্রাম লেনের বাড়িটি মেরামত করে নিজ বাড়িতে ওঠেন। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের জাতীয় পরিষদের তিনি প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হন।

'৭৫-এ বাকশাল গঠনের মাধ্যমে শেখ মুজিব এদেশে একদলীয় শাসন ব্যবস্থা কায়েম করে। শেখ মুজিবের এ প্রদক্ষেপ ছিল জাতির জন্য এক বেদনার কারণ। মাওলানা তর্কবাগীশ বাকশালের ঘোর বিরোধিতা করেন। এতে যোগদান থেকে বিরত থাকেন। পরে '৭৬-এর অক্টোবরে তার হাতেই প্রতিষ্ঠিত হয় 'গণ-আজাদী লীগ'। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি এ দলেরই সভাপতি ছিলেন। শাসকশ্রেণীর অন্যায়ের বিরুদ্ধে তিনি সোচ্চার ছিলেন সব সময়ই। সংকোচনহীন সত্য বলতেন। দেশকে ভালোবাসতেন, তার ভালোবাসায় কোনো খাদ ছিল না। আজকাল যে বড়ই অভাব একজন নিখাদ দেশপ্রেমিকের। মাওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ ১৯৮৬ সালের ২০ আগস্ট পরপারে পারি জমান।

এক্সক্লুসিভ তর্কবাগীশ

শামসুল আলম হাসু কথার ফাঁকে উঠে গিয়ে বুক সেল্‌ফ খুলে দেন। বের করে করে দেখান বাবাকে নিয়ে প্রকাশিত অনেকগুলো স্মারক গ্রন্থ, জীবনী, তার স্বরচিত বই, '৭১-এ আগুনে পোড়া কয়েকটি কোরআন শরীফের অংশবিশেষ। আরো অনেক সংগ্রহের উপকরণ।

জানতে চাইলাম, 'আরো কিছু আছে'? তিনি একটু ভেবেই বললেন, হ্যাঁ, আছে, '৭১-এর একটি ডায়েরি আছে বাবার। 'কোথায়?'– জাদুঘরে। এলিফ্যান্ট রোডের খায়ের ম্যানশনে 'বাংগালী সমগ্র'-এ সংরক্ষিত আছে ওটা। হাসুর কাছে ডায়েরির এক কপি ফটোকপি চাই, বলি, বইয়ে ছাপাব। সপ্তাহখানিক পরেই তিনি আমার হাতে তুলে দেন ইতিহাসের ধূসর পাণ্ডুলিপিটি। মুক্তিযুদ্ধের ন'মাস মাওলানা তর্কবাগীশ কোথায় ছিলেন, কেমন ছিলেন, কী করেছেন তা উঠে এসেছে অত্যন্ত বিশ্বস্ত অবয়বে। তারই চুম্বকাংশ (যেটুকু উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।)

এপ্রিল-'৭১

(১৬)

রশিদাবাদ।

(১৭)

রশিদাবাদ।

মুজিব নগর সরকার গঠন।

(১৮)

রশিদাবাদ।

(১৯)
রশিদাবাদ।

(২০)

রশিদাবাদ।

(২১)

রশিদাবাদ।

(২২)

রশিদাবাদ

(২৩)

রশিদাবাদ।

রাত ১টায় নওগাঁ রওয়ানা গেদু এবং...।

(২৪)

নওগাঁ...

(২৫)

(নওগাঁ)

আজ আমাদের দেশের বাড়ি-ঘর পোড়ান ও নর হত্যার সংবাদ পেলাম। বোম বন্দুক কামান... আওয়াজ অগ্নি শিখা ও

... এখান হতে দেখা গেল। অনুমান সকাল ৮.০০টা হতে এই নারকীয় কাণ্ড আরম্ভ হল। পরে জানতে পারলাম আল্লাহর দয়ায় আমার আসার... পুত্রগণ ও কন্যা এবং নাতীরা বাড়ি ত্যাগ করে।

করালীদের বাড়িতে আশ্রয় নেয়। আল্লাহর দয়ায় বাড়ি নাকি অক্ষত আছে। আলহামদুলিল্লাহ।

(২৬)

(নওগাঁ)

আজও সারা দিন নানা দিক হতে আওয়াজ ও অগ্নি সংযোগের লক্ষণ পরিদৃশ্য হতে লাগলো। বুকের জ্বালা কিছু লাঘব হত যদি বেদনা প্রকাশের উপযুক্ত ভাষা থাকত। হে আল্লাহ, দুঃখ তোমার দেওয়া দয়া। আজ বাড়ি হতে কাহারো আসার কথা ছিল। কেউ আসল না। কাউকে পাঠাতে পারলাম না। আমার কাছে আমার জীবন বিড়ম্বনা এমনভাবে কমই বোধ করেছি। সূর্য উঠিল, ডুবিল। রাতও পোহাল।

(২৭)

(নওগাঁ)

আজ রহমত নূরু আসল। হাসুর হাতের ... বাড়ি অক্ষত আছে। নিরাপদ আশ্রয়ে আছে। সবাই ভালো আছে। গেদু বাড়ির আশপাশে আছে কিন্তু পত্র দেয় নাই। অজানিত আশংকায় কত কথাই রহমতকে বললাম। ভালো আছ বলে... প্রকারে সকল

কথার জওয়াব দিল। সেজদায় পড়ে তাহাদের মঙ্গল কামনা করলাম। রহমতরা চলে গেল। তাহাদিগকেই দেখার জন্য মন পাগল হল। রাস্তায় বের হয়ে চেয়ে রইলাম। কিন্তু দেখা গেল না।

(২৮)

(নওগাঁ)

এই সব সময়ে মানুষ চিনিবার মাহেন্দ্রক্ষণ। কামাল মজিবরের মত... আছে। আজীজ... মত মানুষও আছে। এ যেন আল্লাহরই ইচ্ছা। মানুষের পাশে শয়তান না থাকলে সে অতিশয় সুন্দর দেখাতো না। আমার মহান শ্বশুর-শাশুড়ি আমাকে জামাই ভোজনে পরিতৃপ্ত করছেন। কিন্তু হায়, আমার ছেলে মেয়ে, নাতীরা কোথায় কীভাবে আছে। আমার দেশের অগণিত মানুষ কোথায় কী খাচ্ছে। এত যত্নের উপাদেয় খাদ্য গলায় যেতে চায় না।

(২৯)

(নওগাঁ)

আজ বাদ ফজর মীর জাফর জাতীয় জীবগুলার চক্ষের আড়াল হবার জন্য সোনার সোনা মানিকগুলার অন্যতম আজীজের বাড়ির এক নির্জন ঘরে আসলাম। বেশ স্বস্তিবোধ করলাম।

মে'-৭১

(৪)

(নওগাঁ)

ইস্তাজ মিয়াকে প্রেরণ। ৪্

পরে ১

(৫)

(নওগাঁ)

হাসু, বড় জামাতা আসলেন

হাসু-১০০্

অক্টোবর-'৭১

(২২)

(কাছটীয়া)

আজ হতে রোজা। আজ বাপজান আলমের পত্রে তাদের কুশল অবগত হলাম। আলমের কাছে লিখিত ... অসংযত পত্র ও জামাইয়ে কাছে লিখিত... পত্র পড়লাম। সাদা-কালো মিশ্রিত কি বিচিত্র জগৎ।

(২৩)

(কাছটীয়া)

(২৬)

আজ ভোর ছয়টায় কাছটীয়া ত্যাগ। সকাল ১১টায় (বারুহাস) নার্গিসের জামাইয়ের কাছে... সন্তানসম্ভবা মেয়ের শুভ খবর পেলাম— আলহামদুলিল্লাহ। বাপজান আলম দাদা শুভ্রদের কুশল পেলাম।

বাপজান হাসু ও স্নেহের আপা আমাকে আনার জন্য কাছটীয়ায় গিয়াছে। হায় অযথা তাদের কষ্ট হচ্ছে। হে দয়াল আল্লাহ, তাহাদিগকে নিরাপদে ফেরৎ আন। রাত ৯টায় হাসুও আমার নৌকার মাঝিটি আসল।

(২৭)

(বারুহাস)

বিপ্লব-উর্মী-ঝঞ্ঝা-প্রলয়-বিদ্রোহ-ধ্বংস।

নভেম্বর -'৭১

(১)

(বারুহাস)

অর্থাৎ– "বিজ্ঞান যে পর্যন্ত কার্যকারণ বিধিকে মানিয়া চলিবে এবং যে পর্যন্ত বুঝিবে যে এই বিশ্ব আপনা আপনি সৃষ্টি হয় নাই সে পর্যন্ত তাহাকে এই সিদ্ধান্তে আসিতেই হইবে যে, ইহার পশ্চাতে নিশ্চয়ই এমন একটি কারণ আছে যাহা আমাদের বিশ্ব... দৃষ্টি সীমার বাহিরে রহিয়াছে। যদি এই আদি কারণ কোনো (আল্লাহ) হয়, তবে একথা সত্য যে বিজ্ঞান নাস্তিকতাকে অসম্ভব করিয়া তুলিয়াছে।

(২)

(বারুহাস)

(৩)

(বারুহাস)

(১৪)

(বেড়াবাড়ি)

আজ সারা দিন রাত বেড়াবাড়ি অবস্থান।

(১৫)

(ঠেঙ্গা পাকড়িয়ায়)

বাহাদুরের জামা-৫। আজ সারাদিন এখানে অবস্থান। অদ্য রাতেই ঠেঙ্গা পাকড়িয়া হতে ৮টায় রওয়ানা হয়ে রাত ৯টায় খোলাবাড়িয়া পৌছিলাম। স্মৃতির কোলে হাকিম উদ্দিন।

(১৬)

(খোলাবাড়িয়া)

(১৭)

(খোলাবাড়িয়া)

(১৮)

(খোলাবাড়িয়া)

(১৯)

(খোলাবাড়িয়া)

এখানে ঈদের চাঁদ কেউ দেখতে পেল না। রেডিওতে সর্বত্র আগামী কল্য নামাজ হবে বলে ঘোষিত হলো। আগামী কল্য রোজা হবে বলে সেহেরী খাওয়া হল। আজ খবর আনিল বাড়ি হতে পত্র এসেছে।

(২০)

(খোলাবাড়িয়া)

আজ কোনো স্থানে ঈদ হল কোনো স্থানে ঈদ হল না। এখানে কেউ ঈদের নামাজ আজ পড়ল না। ঈদের নামাজ আমি আজ হলেও যাব না কাল হলেও যাব না। তবে আমার মতে ঈদের নামাজ আজই হওয়া ঠিক। কাজেই আমি আজই রোজা ছেড়ে দিলাম। আজ রাতে বাপজান আলম ও আমার বাপজান গেদুর পত্র ও তার প্রেরিত পেঁপে এবং বারুহাস হতে নাস্তা দিয়ে গেল। বাপজান গেদুর প্রেরিত ১৮/১১এর পত্র আমার ১৮/১১ তারিখেই এনেছিল। গতকল্য আবার বাড়ি চলে গেছে। হাসুও তিনজনের জন্য তিনটি পাঠাইছি।

(২১)

(খোলাবাড়িয়া)

কোনো জায়গায় আজও ঈদের নামাজ হল। ঈদের নামাজ হল– ঈদের আনন্দ নাই। প্রায় ৪০/৪৫ বৎসর হয় ঈদের জামাতে ইমামতি করে আসছি। আজ ব্যতিক্রম হল। হয়তো বড়ই আশা করে বাড়ি হতে বাপজান গেদু মিয়া নতুন টুপী ও পাঞ্জাবী পাঠায়েছে আজ পরব বলে। তাই গোছল করে তাদের প্রেরিত টুপী পাঞ্জাবী পরে তাদের ইচ্ছা পালন করছি বলে সান্ত্বনা পাচ্ছি।

দূর পূর্ব-দক্ষিণ দিক হতে গোলাগুলির আওয়াজ পাওয়া যায় বলে রাতে বাপজান হাসু নানা...

(২২)

(খোলাবাড়িয়া)

(২৩)

(খোলাবাড়িয়া)

(২৬)

(খোলাবাড়িয়া)

আজ বাপজান হাসুর নামে ১৯/১ তারিখের লিখিত বাপজান গেদুর পত্র পড়লাম। সকলের ছোট তবুও সকলের চেয়ে কিছুটা বাস্তববাদী। বাপজান হাসু খেজুরের গুড় কলা পাঠায়াছে।

(২৭)

(খোলাবাড়িয়া)

(২৮)

(খোলাবাড়িয়া)

বাপজান আলম প্রেরিত ১ সের চিনি ১২টা ডিমসহ চিঠি পেলাম। এসব কিছুই এখানে দরকার করে না তবুও এ অসহায় অবস্থার মধ্যে থেকে এসব কেন পাঠায়। কাঁচি, ব্লেড ও খাতাও পেলাম।

রাত ১টায় এ স্থান ত্যাগ করলাম।

(২৯)

(বারুহাস)

ডিসেম্বর-'৭১

(৪)

(বারুহাস)

আজ মিলিটারি ভোরে এসে বাড়ি ঘেরাও করে তল্লাসী করল। ম্যাজবরের সাথে আলোচনা করলাম। শান্তি কমিটি ও রাজাকাররা ব্যক্তিগত দুষমনী করে তাদিগকে হয়রান করছে এবং দেশে অশান্তি সৃষ্টি করছে– বুঝাতে সক্ষম হলাম।

কালামকে বৈকালে বাড়ি পাঠালাম।

মানুষ চিনিলাম– তার মধ্যে ছালামকে বেশি করে।

(৫)

(বারুহাস)

কাসেম বাড়ি হতে কুশল সংবাদসহ বিকালে ফিরিল।

(৬)

(বারুহাস)

আজ সকালবেলায় ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিল বলে ঘোষণা করল। আজ বৈকালেই পাকিস্তান ভারতের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করল বলে ঘোষণা করল।

(৭)

(বারুহাস)

গত বৎসর আজকের এই দিনে কত আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়া উৎসাহ উদ্যম নিয়াই না জাতীয় পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

(৮)

(বারুহাস)

(৯)

(বারুহাস)

আজ রাত ১২টায় এ স্থান ত্যাগ করলাম। বাপজান হাসু আজ আবার ব্যাটারী দিয়ে ট্রানজিস্টার ঠিক করে দিল।

(১০)

(খোলাবাড়িয়া)

(১১)

(খোলাবাড়িয়া)

(২২)

(রশিদাবাদ)

আলহামদুলিল্লাহ, দীর্ঘ ২৪৩ দিন পূর্বেই রশিদাবাদ হতে রাত ১টায় আত্মগোপনের জন্য বের হয়েছিলাম। আজ সকাল ১১টায় দিনের আলোকে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উড়ায়ে মিছিলসহ বাড়িতে প্রত্যাবর্তন করলাম। দয়াময় প্রভু হে, তোমার মহিমা ধারণাতীত

... তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক। ...



শহীদ বুদ্ধিজীবী মাওলানা অলিউর রহমান শুধু আলেম হওয়াতেই কি তার প্রতি এই অবহেলা?

চট্টগ্রাম টু খোরাসান

চট্টগ্রাম থেকে খোরাসান কত দূর বলছি না। বলছি সেই খোরাসান থেকে এসে দ্বীন-ধর্মের প্রচার ও প্রসারের মধ্য দিয়ে যে মাটিকে পুণ্যভূমিতে রূপান্তর করেছেন তার কথা। হ্যাঁ, ঠিক ধরেছেন। পুণ্যভূমি সিলেটেই যাচ্ছি আলেম মুক্তিযোদ্ধার খোঁজে। সিলেটের টুকেরবাজারে আজ বিকেল নাগাদ পৌঁছে যাব, যেখানে এক খোরাসানী পরিবার ৩৬ বছর ধরে খুঁজে ফিরছেন তাদের এক পূর্বপুরুষকে। যে পূর্বপুরুষের বংশধররা হযরত শাহ জালাল ইয়ামেনী (রঃ)-এর হাত ধরে পারস্যের খোরাসান থেকে এখানে এসে বসতি গড়েছিলেন দ্বীন ইসলামের দাওয়াতে।



কাক ডাকা ভোরে রিমঝিম বৃষ্টিতে চট্টগ্রাম রেল স্টেশনে হাজির হলাম ফায়জুলকে নিয়ে। রাতটা কিন্তু আমরা বেশ ভালোই কাটিয়েছি চট্টগ্রাম সফরে আগা-গোড়ায় সহায়তা করে আসা আলেম মুক্তিযোদ্ধা পুত্র মাহমুদুল হাসানের বাসায়। সকাল আটটায় ছেড়ে চলা ট্রেন সিলেটে গিয়ে পৌঁছাবে বিকেল পাঁচটায়। এ সময়টায় আমার সঙ্গী হয়ে রইল অ্যান্থনি ম্যাসকারেনহাস-এর সেই সাড়া জাগানো বই 'বাংলাদেশ রক্তের ঋণ'। আর ফায়জুলের সঙ্গী ট্রেনের শটাল শব্দ, ঝাঁকুনি, বাইরের পাহাড়, চা বাগান, খাল-বিল, নদী আর গ্রামের পর গ্রামের অপার সৌন্দর্য। চট্টগ্রামের হালিশহরে প্রথম এ্যাসাইনমেন্টে পাওয়া বাদামের থলিটা এখানেও যথারীতি মুঠোবন্দি ফায়জুলের। কাঁচা বাদামের স্বাদ আর জানালা দিয়ে আসা রৌদ্রস্নাত বাতাস সারাদিনের জার্নিটাকে ভিন্ন মাত্রায় নিয়ে গিয়েছিল বৈকি?

পাঁচটার আগেই ট্রেন গিয়ে থামল যথাযথ গন্তব্যে। সিলেট শহর থেকে কিছুটা দূরে টুকেরবাজার। সিএনজি করে পৌঁছে গেলাম টুকেরবাজারে। এখানকার হাইস্কুলের শিক্ষক জুনায়েদ স্যারের বাসায় যেতে হবে এবার। ষাটোর্ধ্ব এক প্রবীণকে জিজ্ঞেস করতেই বললেন, ও আচ্ছা, জুনায়েদ স্যারের বাসা। এখনই আপনাদের লোক দিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি। আমাদের সমবয়সি এক যুবক ডেকে বললেন– তাদের দু'জনকে

খোরাসানী মাজার শরীফে নিয়ে যাও। এই প্রথম 'খোরাসানী' শব্দটা শুনলাম। মাজারের প্রতি দুর্বলতা চাঁটগামী আর সিলেটীদের ঐতিহ্যগত বিষয়। খোরাসানী শব্দটা শুনে কৌতূহল আরো বেড়ে গেল সন্দেহ নেই। খোরাসানী মাজারটা আসলে খোরাসান যাবার মতোই দূরে। সন্ধ্যা হয়ে এলো। তবু পথ ফুরাবার নয়। পথিমধ্যে মাগরিবের নামাজ পড়ে নিলাম মসজিদে। এবার আর হেঁটে নয়। রিকশা করেই বাকি পথটা পার করলাম। এ এক এলাহী কাণ্ড। এ রকম একটা গায়ে এত কিছু ঘটে চলেছে। মাজারের ভেতরটায় চলছে মোরাকাবার আসর। বাইরে ভক্তদের চলা-ফেরা, থাকা-খাওয়ার কত কী আয়োজন। হাতের কাছে পাওয়া গেল এক ভক্তকে। তার কথা শুনে তো ফায়জুল একেবারে নির্বাক। এ ভক্ত ঢাকার কেরানীগঞ্জ থেকে এক বছর আগে এসেছেন তার দলের সঙ্গে তার ভাষায় তার মরহুম বাবার দরবারে। ওরসকে সামনে রেখে এখন তার মহাব্যস্ততা। জুনায়েদ খোরাসানী আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে পারবেন না। তিনি মোরাকাবায় আছেন– স্রেফ জানিয়ে দিলেন এ মুরিদ। তাহলে কখন দেখা হবে? মুরিদের উত্তর– মোরাকাবা শেষ হলে মাজারে বাতি জ্বলে উঠবে। তখন একে একে সবাই বেরিয়ে আসবে। আনুমানিক আরো ঘণ্টাখানেক সময় তো লাগবেই। এ সময়টা তাহলে কি করা যায়? চট করে ফায়জুল বলে উঠল– চলুন না আমরাও গিয়ে বসি মোরাকাবায়, ফায়েজ হলেও হতে পারে। জুতা খোলে মোরাকাবায় বসলাম। শিশু-কিশোর মিলিয়ে জনা পঞ্চাশেক মানুষের মোরাকাবা। চারপাশে অন্ধকার। ইয়া বাবা খোরাসানী! ইয়া বাবা খোরাসানী!! ধ্বনি চারদিকে। এক পর্যায়ে মোনাজাতের মধ্য দিয়ে মোরাকাবা শেষ হলো। বাতি জ্বলে উঠল। একেক করে কবর তাওয়াফ করে আসলেন অনুরক্তগণ। শেষ পর্যন্ত দেখা হয়ে গেল জুনায়েদ স্যারের সঙ্গে। তিনি তাঁর দাদা হুজুরের মাজারে মোরাকাবায় সঙ্গ দিয়েছিলেন নিজেকে। প্রতি সপ্তাহে এভাবে দাদার কবরের সামনে দাঁড়ান। কিন্তু বাবার কবরের সামনে...! না আর কথা আসছে না, ভাষা হারিয়ে যাচ্ছে।

এই যা– আপনারা এখনও বাইরে দাঁড়িয়ে, বাসায় বসে কথা বলি চলুন– জুনায়েদ সাহেবের মিনতি। মনে মনে আমাদের আকুতি— রাত ঘনিয়ে আসছে, যত দ্রুত সম্ভব তথ্য জেনে নেয়া। কিন্তু বিশ্বাস করুন– এ এমন এক পরিবেশ ও অনুভূতি যা ছেড়ে দ্রুত চলে আসা কঠিন। শুরু হলো আলোচনা। আজ যে জুনায়েদ সাহেবের সামনে বসা, সে জুনায়েদ সাহেবের বয়স তখন মাত্র দুই। বাবা মাওলানা অলিউর রহমানের মনে সে সময় স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্ন। যে স্বপ্ন লালন করে আসছেন দীর্ঘদিন ধরে। স্বপ্নের পক্ষে লিখেছেন বইয়ের পর বই। পত্রিকা, ম্যাগাজিনে ছেপেছেন একাধিক কলাম, ফিচার।

বলতে পারেন বাবার কবরটা কোথায়?

বাবাকে ঠিক কিভাবে হারালেন– এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন—

১৯৭১ সালে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর তার শুভাকাঙ্ক্ষীরা ঢাকা-কেরানীগঞ্জ থেকে সিলেটে চলে আসার জন্য পরামর্শ দেন কিন্তু তিনি তা শুনেননি। বাসা থেকে দোকানে আসার

পথে অনেক সময় পাকিস্তানি সৈন্যদের সঙ্গে দেখা হয়েছে। সৈনিকরা তখন মাওলানা সাহেব বলে সম্বোধন করেছে। তার কোনো ক্ষতি করেনি। বরং পাকিস্তানি সৈন্যরা তাকে বুক ফুলে চলার জন্য পরামর্শ দিয়েছে। যত সময় গিয়েছে ততো তার রাজনীতির কথা প্রকাশ পেয়েছে। আমার মা ভয় পেয়ে সকল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের ডকুমেন্টসহ বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে অনেক ছবি জ্বালিয়ে ফেলেন। যুদ্ধের মাঝামাঝি সময়ে আমাদেরকে নিয়ে সবার কথামতো সিলেট চলে আসেন। এগুলো আমার তেমন মনে নেই। তবে আবছা আবছা কিছুটা মনে হয়। তারপরও মার কাছ থেকে শুনেছি। সিলেট বেশ কিছুদিন থাকার পর বাবা চলে যান ঢাকায়। ঘরের আসবাবপত্র আর ফার্মেসির জিনিসপত্র আনার জন্য। ঢাকায় গিয়ে সকল আসবাবপত্র বড় একটি নৌকায় তুলে দেন সিলেট নিয়ে আসার জন্য। মাঝিরা তাকে অনুরোধ করেছিল তাদের সঙ্গে সিলেট চলে যাওয়ার জন্য। কিন্তু কষ্ট হবে ভেবে তিনি যাননি। পরে প্লেনের টিকিট করলেন, তখন ফ্লাইট বন্ধ হয়ে গেল। ট্রেনের টিকিট করলেন, কিন্তু ততক্ষণে ভৈরবের ব্রিজ উড়িয়ে দেয়া হয়েছে। বাসেও চলাচল বন্ধ হয়ে গেল। তার আর সিলেট আসা হলো না। তারপর সিলেট আসার কথা বাদ দিয়ে ঢাকায় বিভিন্ন জায়গায় থাকতেন। বেশিরভাগ লালবাগ এলাকায় থাকতেন। হাজী সাহাবুদ্দিনের বাসায়। তখন ডিসেম্বর মাস ১৯৭১ সন। শেষ শুক্রবার ১০ তারিখ। জুমার নামাজ আদায় করতে মসজিদে গেলেন। সবাই বারণ করেছিলেন মসজিদ না যাওয়ার জন্য। কিন্তু কার কথা কে শুনে। বলেছিলেন, জুমার নামাজ কিভাবে মিস করবেন। কিছু হবে না। ওই দিন মসজিদ থেকে তাকে ফলো করে এদেশের আল-বদর রাজাকাররা। ১১ ডিসেম্বর শনিবার রাতে তাকে ধরে নিয়ে যায়। সঙ্গে তার সহযোগী হাজী সাহেবকেও। কনকনে শীতে, দিনের বেলা কুঠরিতে রাতে রায়েরবাজার বধ্যভূমিতে নিয়ে রাখতো বলে জানা যায়। দু'দিন তিনরাত রাখার পর স্বাধীনতার ঠিক দু'দিন আগে ১৪ ডিসেম্বর মঙ্গলবার অন্যান্য দেশবরেণ্য বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে রায়েরবাজার বধ্যভূমিতে বেয়নেট চার্জ করে তাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। তিনি শহীদ হয়ে যান। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। হাজী সাহেব ছাড়া পেয়ে যান। তার কাছ থেকে মূলবান তথ্যগুলো জানা যায়। অনেক খোঁজাখুঁজির পরও তার লাশ পাওয়া যায়নি। তার ছোট ভাই আমার শ্রদ্ধেয় চাচা অধ্যাপক সফিউর রহমান তখন অনেক খুঁজেছেন। পত্রিকায় নিখোঁজ সংবাদ দিয়েছেন। বুড়িগঙ্গায় জাল ফেলেছেন। ডুবুরি দিয়ে চেষ্টা করেছেন। তারপরও লাশ পাওয়া যায়নি। কেউ কেউ অবশ্য বলেছেন কিছু মুরুব্বিরা লাশ দেখতে পেয়ে আজিমপুর গোরস্থানে দাফন করেছেন। তবে এর সত্যতা বা ঠিকানা আমি আজও পাইনি। প্রায় এক মাস পর তার একটি চিঠি পাওয়া যায়। সিলেট না আসার বর্ণনা দিয়ে। আজ সেই চিঠিটাও নেই। হারিয়ে গেছে তার সাথে সাথে। এখনও মনে মনে খুঁজে ফিরি বাবাকে। বলতে পারেন বাবার কবরটা কোথায়?

বাবা রাজনীতিতে কিভাবে জড়ালেন, তার উত্তরে ছেলে জনাব জোনায়েদ বলেন,

ধর্ম প্রচার ও সাহিত্য চর্চার সঙ্গে সঙ্গে তিনি রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। ভাষা আন্দোলনেও তিনি সোচ্চার ছিলেন। ভাষা আন্দোলনে সিলেটের গবিন্দপার্কে (বর্তমান

হাসান মার্কেট) মাওলানা অলিউর রহমানের সভাপতিত্বে মিটিং-মিছিল হয়েছে। তমদ্দুন মজলিসের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন। তিনি অকুতোভয় একজন সংগঠক। যে কোনো চ্যালেঞ্জ গ্রহণ ছিল তার স্বভাবজাত।

ঢাকায় গিয়ে তার শুরু হয় রাজনৈতিক জীবন। প্রথমে সে সময়কার জামায়াতের ইত্তেহাদুল উলামা নামক সংগঠনের প্রাদেশিক সহ-সভাপতি ও ঢাকা জেলা শাখার সভাপতি ছিলেন। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে দল করা সে উদ্দেশ্যের কোনোটিই প্রতিফলিত হয়নি দলের কার্যকলাপে। তাই বাধ্য হন দল ছাড়তে। নিজেকে গুটিয়ে চলে যান ঢাকার অদূরে কেরানীগঞ্জের কাঠুরিয়া গ্রামে। সেখানে পরিচিত মহলে আলোচনা করে পৃথক ব্যানারে রাজনৈতিক দল গঠন করেন। ১৯৬৬ সালের ছয় দফা আন্দোলনকে সমর্থন করেন। অল্প কয়েকদিনেই তিনি বিরাট কর্মী বাহিনী গঠন করে দলের নাম আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেন। তার দল "আওয়ামী ওলামা পার্টি" নামে পরিচিতি লাভ করে। এ নিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে আলোচনা হয়। মাওলানা অলিউর রহমান পাকিস্তানি শাসকদের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে ওইসব আলেম সমাজের বিরোধিতা করে প্রকাশ্যে আওয়ামী লীগের সমর্থনে দল গঠন করেন। এই দল গঠনে চারটি উদ্দেশ্যের কথা তখন বলা হয়েছিল–

* তৎকালীন পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রে অর্থ, শিল্প, বাণিজ্য, স্বরাষ্ট্র, পররাষ্ট্র প্রভৃতি দপ্তরের মতো 'স্বতন্ত্র ধর্ম দপ্তর' প্রতিষ্ঠা এবং এর মাধ্যমে আলেমদের চাকরির সুযোগ সৃষ্টির জন্য সরকারের কাছে প্রস্তাব পেশ।

* আলেম সমাজকে অর্থনৈতিক দুর্গতির হাত থেকে রক্ষা করে তাদেরকে অধিকার সচেতন করে গড়ে তোলা।

* পাকিস্তানের উভয় অংশের মধ্যে ধন-সম্পদের ও ক্ষমতার সুষম বণ্টনের পরিপ্রেক্ষিতে শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ঘোষিত ছয় দফার সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া এবং

* সমাজ দেহের সর্বাধিক শোষণ ও কলুষ হতে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে যাবতীয় অন্যায় কাজ– সুদ, জুয়া, ঘুষ, কালোবাজারি, অত্যাচার, অনাচার, ব্যভিচার ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম চালানো।

যেমন বলা তেমন কাজ। দল গঠন করার পর ১৯৬৯ সালে স্বাধিকার আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তখন তার ভূমিকা অনেককেই স্তম্ভিত করেছিল। সেই থেকে আওয়ামী লীগের সঙ্গে একই প্লাটফরমে, আবার কখনো তার নিজস্ব ব্যানারে বক্তৃতা দিয়েছেন সত্তরের নির্বাচন অবধি; টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া পর্যন্ত। সংগঠিত করেছেন বাঙালি জাতিকে। তার সুরেলা কণ্ঠের বক্তব্য শুনে মুগ্ধ হয়েছেন এদেশের অবহেলিত জনগণ। তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে অংশগ্রহণ করেছে নিজেদের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে। স্বাধিকার আন্দোলনের অংশ হিসেবে সিলেটে শেষ বড় জনসভা হয় 'আওয়ামী ওলামা পার্টির' ব্যানারে। সেই জনসভায় পার্টির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হিসাবে মাওলানা অলিউর রহমান সভাপতিত্ব করেন এবং প্রধান অতিথি হিসাবে ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান! আরো ছিলেন চার নেতাসহ জেনারেল ওসমানী। বঙ্গবন্ধু শেখ

মুজিবুর রহমানের ছয় দফাকেন্দ্রিক তার লেখা পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। পুস্তিকাগুলো হলো:

* শরিয়তের দৃষ্টিতে ৬ দফা।
* ৬ দফা ইসলামের বিরোধী নহে।
* যুক্তির কষ্টিপাথরে ৬ দফা।
* স্বতন্ত্র ধর্ম দপ্তর একটি জাতীয় প্রয়োজন এবং
* জয় বাংলা ও কয়েকটি স্লোগান প্রসঙ্গ।

এ পুস্তিকাগুলো দেশব্যাপী সাড়া জাগায়। স্বাধিকার আন্দোলনে মানুষের মাঝে উৎসাহ উদ্দীপনা বাড়িয়ে দেয়। তিনি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিরাট চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হন। 'আওয়ামী ওলামা পার্টি'র প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হিসাবে যোগ্যতা ও দক্ষতার পরিচয় দেন।

শহীদ বুদ্ধিজীবী ডা. মাওলানা অলিউর রহমান খোরাসানী ১৯৩২ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি সিলেট জেলার সদর থানার টুকেরবাজার ইউনিয়নের মইয়ারচর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পূর্বপুরুষগণ পারস্য দেশের খোরাসান নগরের অধিবাসী ছিলেন। সুলতানুল আউলিয়া হযরত শাহ্ জালাল মুজাররাদে ইয়ামেনী (রহঃ)-এর সঙ্গে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে সিলেট আগমন করেন। দুই ভাই শাহ্ কামাল উদ্দিন ওরফে কাঙালি শাহ্ এবং শাহ্ আলাউদ্দিন রফে আলাদি শাহ্ দিল্লি হয়ে সিলেট আসেন এবং মইয়ারচরে বসবাস করেন।

যেমন ছাত্র তেমন শিক্ষক

শহীদ বুদ্ধিজীবী ডা. মাওলানা অলিউর রহমান একাধারে একজন প্রতিভাবান ছাত্র। স্বনামধন্য শিক্ষক এবং গণবরেণ্য লেখক ও ওয়ায়েজ-বক্তা ছিলেন। ছেলে জুনায়েদ খোরাসানী কর্তৃক লেখা প্রাপ্ত তথ্যাদি থেকে জানা যায়–

মাওলানা ওলিউর রহমান ১৯৪৯ সালে মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড থেকে আলিম পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে ২য় স্থান লাভ করেন এবং পাশাপাশি উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসেবে অংশ নিয়ে ১৯৫০ সালে ১ম বিভাগে দশম স্থান লাভ করেন। ১৯৫১ সালে ফাজিল পরীক্ষায় ১ম বিভাগে ৩য় স্থান এবং ১৯৫৩ সালে মুহাদ্দিস (টাইটেল) পরীক্ষায় ১ম বিভাগে ৩য় স্থান দখল করেন। তারপর জীবিকার অবলম্বন হিসেবে ১৯৬৫ সালে পাকিস্তানের লাহোরের অধীনে হোমিওপ্যাথিক পরীক্ষায় ২য় স্থান লাভ করেন। এরপর ইংলিশের উপর আলাদা কোর্স কৃতিত্বের সঙ্গে ১ম বিভাগে শেষ করেন।

১৯৫৩ সালে বরিশালের আহমদিয়া মাদরাসায় সুপারিনটেনডেন্ট পদে চাকরি নেন। এর আগে তিনি টেকনাফ হাইস্কুলের প্রধান মৌলভী পদে শিক্ষকতা করেন। তার ছেলের ভাষায় অনেক ছাত্রের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। তিনি নাকি অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় ছড়ায়-ছড়ায় ছন্দে-ছন্দে ছাত্রদের পড়াতেন। ছাত্ররা মুগ্ধ হয়ে শুনত। পড়ার ফাঁকে ফাঁকে বাস্তবসম্মত গল্প বলতেন। নবী-রাসূলদের জীবনী আলোচনা করতেন। যার জন্য ছাত্ররা মনোযোগী থাকত তার ক্লাসে। এক সময় বরিশালের চাকরি ছেড়ে চলে আসেন নিজের

জন্মস্থান সিলেটে। ১৯৫৪ সালে সিলেট আলিয়া মাদরাসায় অধ্যাপনা করেন। এখানে তিনি ১৯৫৯ সালের নভেম্বর মাস পর্যন্ত চাকরি করেন।

১৯৬০ সালে বাংলা একাডেমীতে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর তত্ত্বাবধানে উর্দু ও আরবি অর্থনীতির অনুবাদক হিসেবেও কাজ করেন।

এছাড়া জীবনের শেষ পর্যন্ত ঢাকার কেরানীগঞ্জের আগানগর গ্রামে 'আরোগ্য কুটির' নামে চেম্বার নিয়ে ডাক্তারি পেশায় নিয়োজিত হন। সেখানে দু'বেলা রোগী দেখতেন তিনি। বিনা পয়সাও অনেক রোগী দেখেছেন এবং ওষুধ দিয়েছেন।

অমর বুদ্ধিজীবী মাওলানা অলিউর রহমান

সত্যিই অমর বুদ্ধিজীবী মাওলানা অলিউর রহমান। ৫০ ও ৬০-এর দশকে তিনি যে আধুনিক ও মননশীল জ্ঞান ও প্রজ্ঞার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছিলেন তা এখনকার আলেম সমাজে পাওয়া বড় ভার। আজ আমরা যে ধর্ম মন্ত্রণালয় দেখছি তার স্বপ্নদ্রষ্টা এই মাওলানা অলিউর রহমান। তিনিই প্রথম ৬০-এর দশকে 'স্বতন্ত্র ধর্ম দপ্তর : একটি জাতীয় প্রয়োজন' বই লিখে তার বহু কাঙ্ক্ষিত স্বপ্নের জানান দেন। বহু আলেম-উলামা যখন পাকিস্তান ও ইসলামকে একীভূত করে দেখছিলেন আর পূর্ব পাকিস্তানের বিচ্ছিন্ন হয়ে বাংলাদেশের অভ্যুত্থানকে ইসলামের এদেশ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে বলে ভাবতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন ঠিক সে মুহূর্তে অসংখ্য আলেম-ওলামার মধ্য থেকে বের হয়ে এসে বীর বিক্রমে তিনি স্বাধীনতার ও স্বাধিকারের স্বপক্ষে আত্মপ্রকাশ করেন। তিনিই একমাত্র আলেম, যিনি 'শরীয়তের দৃষ্টিতে ৬ দফা' বই লিখে আলোড়ন সৃষ্টি করেন। হালকা পাতলা ছিপছিপে গড়নের মাওলানা অলিউর রহমান কিশোর বয়স থেকেই 'সিলেট কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদ'-এর সঙ্গে জড়িত ছিলেন বলে দেওয়ান মুহাম্মদ আজরফ, অধ্যাপক শাহেদ আলী প্রমুখ জাতীয় ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্য পেয়েছিলেন। এ সান্নিধ্যই মূলত তাকে সাহিত্যমনা ও স্বাধিকারমনা হিসেবে গড়ে তুলেছিল। ওয়ায়েজ বা বক্তা হিসেবেও কম যাননি মাওলানা ওলিউর রহমান। আধুনিকতার পরম ছাপ রেখেছেন তাঁর ওয়াজ-বক্তৃতায়। তাঁরই ছাত্র আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী তাঁর জীবন সাহিত্য নিয়ে রচনা করেছেন গ্রন্থ "মুক্তিযুদ্ধের অনন্য শহীদ ধর্ম মন্ত্রণালয়ের স্বাপ্নিক মাওলানা অলিউর রহমান : জীবন ও সাহিত্য"। এ বইতে তিনি উল্লেখ করেন, মাওলানা ওলিউর রহমান সম্পর্কে ভাষা আন্দোলনের স্থপতি প্রিন্সিপ্যাল আবুল কাসেমের মূল্যায়ন ছিল এরকম– "কোনো আলেম যে জীবন ও জগৎ সম্পর্কে এত আধুনিক জ্ঞান ও চিন্তা-চেতনার অধিকারী হতে পারেন এবং এত বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জল বাংলা ভাষায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা বক্তৃতা দিতে পারেন তা তাঁর বক্তৃতা শোনার আগে আমি কোনো দিন কল্পনাও করতে পারিনি। বইটিতে মাওলানা ওলিউর রহমানকে নিয়ে আরো অনেক স্মৃতিকথা গ্রন্থিত হয়েছে। উপস্থাপন করা হয়েছে তাঁর অনেক হারানো লেখা। বইটিতে অধ্যক্ষ দেওয়ান মুহাম্মদ আজরফ-এর মূল্যায়ন ছিল এ রকম– "এদেশের অনেক সোনার ছেলে স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রাণ হারিয়েছে। মাওলানা অলিউর রহমান তারই মধ্যে একজন। কিন্তু যারা তাকে বধ করেছে তাদের সে বোধশক্তি বোধহয় ছিল না যে মাওলানা

ওলিউর রহমানের মতো একজন প্রতিভাবান, জ্ঞানী ও সাহসী ব্যক্তির স্বাধীন বাংলাদেশে বেঁচে থাকার প্রয়োজন ছিল অনেক বেশি।"

মাওলানা অলিউর রহমানের লেখা, প্রজ্ঞা ও ভাষাশৈলীর সঙ্গে পাঠককে পরিচয় করিয়ে দিতে তাঁর 'শরীয়তের দৃষ্টিতে ৬ দফা', 'স্বতন্ত্র ধর্ম দপ্তর : একটি জাতীয় প্রয়োজন' এবং 'জয় বাংলা ও কয়েকটি শ্লোগান প্রসঙ্গ' বইগুলো থেকে কিছু বিশ্লেষণ তুলে ধরছি।

'শরীয়তের দৃষ্টিতে ৬ দফা'

প্রতিটি দফা ইসলামের দৃষ্টিতে মাওলানা ওলিউর রহমান ব্যাখ্যা করেছিলেন এভাবে

১ নং দফা

এ দফায় ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনা করে পাকিস্তানকে সত্যিকার ফেডারেশনরূপে গড়ে তোলার প্রস্তাব করা হয়েছে। এতে পার্লামেন্টারি ধরনের সরকার থাকবে। সকল নির্বাচন সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের সরাসরি ভোটে অনুষ্ঠিত হবে। আইনসভাসমূহের সার্বভৌমত্ব থাকবে।

মাননীয় শেখ সাহেব এ সম্পর্কে দেশবাসীর সামনে প্রশ্ন তুলে ধরেছেন, তার ভাষায় 'এতে আপত্তির কি আছে।' আমিও তার সুরের সঙ্গে সুর মিলিয়ে বলতে চাই, এতে শরীয়তের বিপরীত কি আছে?

তবে কি আপত্তিকারীরা দেশে একনায়কত্ব কিম্বা বাদশাহী কায়েম করতে চান ? মনে রাখবেন, আমরা যে ইসলামে বিশ্বাস করি তা হচ্ছে মদীনার ইসলাম। দিল্লী, দামেস্ক ও বাগদাদী ইসলাম নয়। আমাদেরকে যথাসম্ভব মদীনার শাসনতন্ত্রেরই অনুসরণ করতে হব। দিল্লী, দামেস্ক ও বাগদাদের নয়।

কথাটির ব্যাখ্যা এভাবে বুঝতে চেষ্টা করুন। হযরত নবী করীম (স.)-এর মহান খলিফাগণ জনসাধারণের উপর রাজা অথবা সম্রাট হিসেবে রাজত্ব করেননি; তারা জনগণের প্রতিনিধি এবং বিশেষ করে রসূলের আদর্শের রক্ষাকারী হিসেবে জনগণের উপর শাসন ক্ষমতা প্রয়োগ করে গিয়েছেন। প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা.) খলিফা নির্বাচিত হওয়ার পরই উদাত্ত কণ্ঠে আহ্বান জানাচ্ছিলেন— "ভাইসব! তোমরা আমাকে খলিফা মনোনীত করেছ। অথচ আমি তোমাদের চাইতে উত্তম নই। যদি আমি সোজা পথে পরিচালিত হই, তোমরা আমাকে সাহায্য করবে, আর যদি আমি ভুল পথে পরিচালিত হই, তোমরা আমাকে সোজা পথ দেখিয়ে দিও।"

মানুষের ব্যক্তি ও বাক -স্বাধীনতার স্বীকৃতির চেয়ে মহান নজীর কি হতে পারে? হযরত ওমর (রা.) জুমার নামাজের সময় বক্তৃতা করে বললেন, যদি আমি ভুল পথে পরিচালিত হই, তোমাদের মধ্যে কে আছ যে আমাকে সোজা পথ দেখিয়ে দেবে! অমনি এক বৃদ্ধ লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে বললেন, ওমর এ লাঠি দ্বারা তোমাকে শায়েস্তা করে দেব। হযরত ওমর দু' হাতে বৃদ্ধকে জড়িয়ে ধরলেন আর বললেন, যে সমাজে এ ধরনের সত্যভাষী লোক বর্তমান, সে সমাজ কখনও নষ্ট হতে পারে না।

মহান খেলাফতে রাশেদার আদর্শ ছিল এই। পরবর্তীকালে দিল্লী, দামেস্ক, বাগদাদ মুসলমান রাজা-রাজড়ারা রাজত্ব করেছেন। তাদের সবাই মন্দ ছিলেন এমন নন, কিন্তু

ইসলামী শাসনতন্ত্রের সঙ্গে তাদের এ রাজতন্ত্রের বিন্দুমাত্র সম্পর্ক ছিল না, এটি স্থির নিশ্চিত।

বর্তমান সময়ে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার এবং পার্লামেন্টারি ধরনের শাসন পরিষদ গঠনের ভেতর দিয়েই মহান খেলাফতের পূর্ণ না হোক আংশিক প্রকাশ ঘটতে পারে। ডিক্টেটরশীপ বা একনায়ককত্বের ভেতরে এর কিছুই থাকে না। সুতরাং এই দফায় বিরোধিতা করা মূর্খতা ছাড়া আর কিছু হতে পারে না।

২ নং দফা

এ দফাকে ফেডারেশন সরকারের এখতিয়ারে দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্রীয় ব্যাপার এ দুটি বিষয় থাকবে এবং অবশিষ্ট বিষয়সমূহ প্রাদেশিক সরকারের এখতিয়ারে অর্পণ করা হবে, এরূপ প্রস্তাব করা হয়েছে।

আমি প্রশ্ন করতে চাই, এটি কি শরীয়তের বিপরীত? হযরত রাসূলে করীম (স.) ও মহান খলিফাগণের সময় মুসলিম সাম্রাজ্য কিভাবে পরিচালনা করা হতো; চিন্তা করে দেখেছেন কেউ ? এতে কি ফেডারেটিং ইউনিটসমূহের হাতে দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্র দপ্তর ছাড়া বাকি সমস্ত বিষয়ই অর্পিত ছিল না?

যদি তাই না হবে, তাহলে মজলিসে শূরা তথা পরামর্শ পরিষদের সব সদস্যের সর্বসম্মতরূপে নির্বাচিত খলিফা হযরত আলী কাররামাল্লাহু অজহাহুর বিরোধিতা, সিরিয়ার শাসনকর্তা আমির মোয়াবিয়া এবং মিশরের শাসনকর্তা আমর বিন আস করতে পারলেন কিভাবে? তলিয়ে দেখেছেন কেউ?

এতে কি কতগুলো কথাই প্রমাণিত হয় নি?

১. মুসলিম সাম্রাজ্য কতগুলো ফেডারেটিং ইউনিটে বিভক্ত ছিল।

২. কেন্দ্রীয় খেলাফতের নির্বাচন কেবলমাত্র কেন্দ্রীয় কমিটির ভোট দ্বারাই সম্পন্ন হত। সমস্ত সাম্রাজব্যাপী তার জন্য কোনো ভোট গ্রহণ করা হত না।

৩. প্রাদেশিক সরকার স্বাধীনভাবে প্রাদেশিক কর্তব্য কর্মাদি সম্পাদন করতেন। তাদেরকে কেবলমাত্র জনসাধারণের আপত্তির পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় খেলাফতের কাছে জবাবদিহির জন্য প্রস্তুত থাকতে হত।

৪. দেশরক্ষা ও যুদ্ধাদি পরিচালনা কাজ কেন্দ্রীয় খেলাফত নিয়ন্ত্রিত করতেন; কিন্তু এ ব্যাপারে বিশেষ কোনো বাধ্যবাধকতা ছিল না। প্রাদেশিক সরকার সেনাবাহিনীর গতিবিধি রদবদল এবং তাতে ইচ্ছামত দেশীয় সৈন্য ভর্তি করতে পারতেন।

সুতরাং উলামায়ে কেরাম এ দফার বিরুদ্ধে যাবেন কোন যুক্তিতে ? আমি মনে করি তারা অবশ্যই যেতে পারেন না।

৩নং দফা

এ দফায় মাননীয় শেখ সাহেব আন্তঃদেশীয় মুদ্রা পাচার বন্ধ করার উদ্দেশ্যে দুটি বিকল্প প্রস্তাব পেশ করেছেন–

১. পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য দুটি স্বতন্ত্র অথচ সহজ বিনিময়যোগ্য মুদ্রার প্রচলন করতে হবে। কারেন্সী আঞ্চলিক সরকারের হাতে থাকবে এবং দুই অঞ্চলের জন্য দুটি স্বতন্ত্র স্টেট ব্যাঙ্ক থাকবে।

২. উভয় অঞ্চলের একই কারেন্সী থাকবে, তবে এটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক নামে একটি ব্যাংকের দ্বারা পরিচালিত হবে এবং তার অধীনে আঞ্চলিক পর্যায়ে দুটি পৃথক রিজার্ভ ব্যাংক থাকবে এবং শাসনতন্ত্রে এমন একটি সুনির্দিষ্ট বিধান থাকবে, যাতে এক অঞ্চলের মুদ্রা অন্যায়ভাবে অন্য অঞ্চলে পাচার হতে না পারে এবং প্রতি অঞ্চলের মুদ্রার জন্য পৃথক চিহ্ন বর্তমান থাকবে।

উলামায়ে কেরাম বলতে পারেন! শরীয়তের দৃষ্টিতে এদের কোন কাজটি জঘন্যতম অপরাধ? এটি কি সত্য নয় যে, স্বয়ং হযরত নবী করীম (স.) এবং তার প্রধান খলিফা হযরত আবু বকর (রা.)-এর সময় পর্যন্ত মুসলিম দেশসমূহে একই সঙ্গে ইরানীয় ও রোমীয় দুটি মুদ্রারই প্রচলন ছিল। হযরত নবী করীম (স.) এবং তার প্রথম খলিফা হযরত আবুবকর (রা.) এদের নাকচ করে নিজস্ব কোনো টাকশাল নির্মাণের প্রয়োজন পর্যন্ত মনে করেন নি।

অর্থনৈতিক লেনদেনের ব্যাপারে মানুষের সর্বাত্মক সুবিধার প্রতিই তাদের লক্ষ্য ছিল সর্বাধিক।

জনাব শেখ সাহেবের প্রস্তাব গ্রহণ না করে দেশে মুদ্রা পাচার অব্যাহত রাখার প্রচেষ্টাই কি নিন্দনীয় এবং শরীয়তের দৃষ্টিতে জঘন্যতম অপরাধ নয়?

৪ নং দফা

এ দফায় যাবতীয় ট্যাক্স-খাজনা-কর ধার্যের ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের পরিবর্তে আঞ্চলিক সরকারের হাতে ন্যস্ত থাকবে, এরূপ প্রস্তাব করা হয়ছে। তবে সঙ্গে সঙ্গে শাসনতন্ত্রের মধ্যে এরূপ একটি বিধান রাখার সুপারিশও করা হয়েছে, যাতে আঞ্চলিক সরকার কর্তৃক আদায়কৃত রেভিনিউ-এর একটি অংশ কেন্দ্রীয় তহবিলে অটোমেটিক্যালি জমা হয়ে পড়ে।

শরীয়তের দৃষ্টিতে এ ধরনের প্রস্তাব কোনো অবস্থাতেই নাজায়েজ হতে পারে না। যেহেতু ট্যাক্স-খাজনা-কর ধার্যের ব্যাপারে শরীয়তের দৃষ্টিভঙ্গী হলো, যেন এতে কোনো প্রকার জুলুম বা বে-ইনসাফী দেখানো না হয়। সুতরাং কর ধার্যকারী ব্যক্তিবর্গ যত সাক্ষাৎভাবে জনসাধারণের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে সক্ষম হবেন, কর ধার্যের ব্যাপারে জুলুম বা বে-ইনসাফীর সম্ভাবনাও তত কম হবে।

এ পর্যায়ে চিন্তা করতে গেলে কর ধার্যের ক্ষমতা কোনোকালেই কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকা উচিত নয়, তা আঞ্চলিক সরকারের হাতেই নিহিত থাকা উচিত। কারণ, একথা চরম সত্য যে, চিরস্থায়ী সয়লাব ও ঝড়-ঝঞ্ঝায় বিধ্বস্ত পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসীদের উপর কি পরিমাণ করের বোঝা চাপান যেতে পারে, তার ধারণা মারী অথবা ইসলামাবাদের শৈল নিবাসসমূহে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে বসে সম্ভবপর হয় না; তার

জন্য হাতে বৈঠা বা কাঁধে লাঙ্গল নিয়ে হাওর-নদী-বিল এবং মাঠে-জমিতে নামতে হবে। অন্যথায় ইনসাফ কায়েম হবার সম্ভাবনা সুদূর পরাহত থেকে যাবে।

শরীয়ত অনুযায়ী জাকাত, ওশর প্রভৃতি যে সমুদয় কর কেন্দ্রীয় সরকার ধার্য করতে পারেন তাও আঞ্চলিক পর্যায়ে স্থানীয় বায়তুলমালসমূহকে সংরক্ষিত করার বিধান শরীয়তে রয়েছে। ওই সমুদয় 'বায়তুলমাল' আঞ্চলিক ব্যয়ভার মিটানোর পরেই কেবল অবশিষ্টাংশ কেন্দ্রীয় 'বায়তুলমালে' প্রেরণ করবেন, মহান খলিফাগণের সময় এ ছিল আইন।

ফয় (যুদ্ধলব্ধ দ্রব্যাদি), রিকাজ (গুপ্তধন, খনি) প্রভৃতির ব্যাপারে স্বয়ং নবী করীম (স.) 'খমস' বা একপঞ্চমাংশ মাত্র গ্রহণ করেছেন, অবশিষ্টাংশ তাঁরই আদেশ অনুযায়ী সৈন্য ও জনসাধারণের মধ্যে বণ্টন করে দেয়া হয়েছে।

সুতরাং শরীয়ত অনুযায়ী এ দফাটির বিপক্ষে বলার মত কিছুই নেই, যার কারণে তথাকথিত এক শ্রেণীর আলেম আপত্তি তুলতে পারেন।

৫ নং দফা

এ দফায় বেশ কতগুলো কথা বলা হয়েছে যার সারমর্ম হচ্ছে— ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে বিদেশের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদনের। বিদেশে ট্রেড মিশন স্থাপনের এবং বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক লেনদেন ও আমদানি-রপ্তানির দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের পরিবর্তে আঞ্চলিক সরকারের হাতে থাকবে।

এটি কি শরীয়তের বিপরীত হল? ইসলামের ইতিহাসের পাঠকদের কাছে জানতে ইচ্ছে হয়, মহান খোলাফায়ে রাশেদার শাসনকালে মুসলিম সাম্রাজ্যে বাণিজ্যিক চুক্তি ও লেন-দেনের ব্যবস্থা কি ধরনের ছিল? এটি কি সম্পূর্ণরূপে আঞ্চলিক সরকারের হাতে নিহিত ছিল না?

কেন্দ্রীয় সরকার শুল্ক সম্পর্কীয় আইন রচনা করেছেন সত্য, কিন্তু শুল্ক আদায় ও তৎসম্বন্ধীয় খুঁটিনাটি যাবতীয় ব্যাপার– এছাড়া প্রতিবেশী দেশসমূহের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন, বাণিজ্যিক মিশনসমূহের আদান-প্রদান ইত্যাদি সমুদয় ব্যাপারই কি আঞ্চলিক সরকারের তত্ত্বাবধানে সমাধা করা হয় নি? সুতরাং শেখ মুজিবুর রহমান সাহেবের মত একজন ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তির মুখ দিয়ে এ ধরনের প্রস্তাব বের হওয়ার অপরাধেই কি তা অনৈসলামী হয়ে গেল?

অনুরূপভাবে ব্যাঙ্ক, বীমা, পাট, চা ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসাসমূহকে জাতীয়করণ করে দেশ থেকে কার্টেল প্রথার অবসান ঘটানোর মধ্যে শরীয়তের বিপরীত কি থাকতে পারে; তা আমি বুঝতে অক্ষম।

দুঃখের বিষয়, আমাদের তথাকথিত এক শ্রেণীর আলিমদের বিদ্যার দৌড় উর্দু ভাষায় লিখিত কতগুলো চটি বই পুস্তকের বঙ্গানুবাদ পাঠ করা পর্যন্তই। আরবি ভাষা ও বিষয়সমূহ অধ্যয়ন ও তার অনুশীলনের ক্ষমতা ক'জনইবা রাখেন।

সুতরাং এটি ঈমান, ইসলাম ও শরীতের দোষ নয়, দোষ আমাদের তথাকথিত আলেমগোষ্ঠীর বিদ্যার বহরের।

৬ নং দফা

এ দফায় পূর্ব পাকিস্তানে মিলিশিয়া বা প্যারা-মিলিটারী রক্ষী বাহিনী গঠনের সুপারিশ করা হয়েছে। এখানে অধিক সংখ্যক বিমান ঘাঁটি স্থাপন করা হোক, নৌবাহিনীর হেড-কোয়ার্টার এ অঞ্চলে নিয়ে আসা হোক, এখানে একাধিক অস্ত্র নির্মাণ কারখানা গড়ে উঠুক, বহুগুণে শক্তিশালী প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের মোকাবেলায় এ অঞ্চলকে অধিক শক্তিশালী করে তোলা হোক, ইত্যাদি দাবি এ দফার অন্তর্ভুক্ত।

এ সব কি অন্যায়? শরীয়তের দৃষ্টিতে এ দাবিগুলো কি অসঙ্গত? তবে কি এ অঞ্চলকে দুর্বল হতে দুর্বলতর করে তুলে, ক্রমে ভারত কর্তৃক জবরদখল করিয়ে নিতে পারলেই আমাদের বন্ধুগণ সন্তুষ্ট হবেন! আল্লাহ তাদেরকে হেদায়েত করুন।

আল্লাহতায়ালা কোরআন শরীফে বলেছেন—

"আল্লাহর দুশমনদের ভয় প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে তোমরা যথাসাধ্য শক্তি সঞ্চয় করো।" (ভাবার্থ)

সুতরাং শক্তি সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে চেষ্টা করতে আপত্তি কিসের? বিগত সেপ্টেম্বরের যুদ্ধের অভিজ্ঞতার পরও কি এ সম্পর্কে নতুন করে ভাবার কোনো অবকাশ রয়েছে?

সুতরাং ৬ দফার বিরুদ্ধে আলেম সমাজের চিন্তা করেই কথা বলা উচিত বলে আমি মনে করি।

বর্তমান সময়ে মওদুদী-লুন্দখোর-খান-কাইউম-নসরুল্লারা যেভাবে ৬ দফার বিরুদ্ধে উঠেপড়ে লেগেছেন তাতে তাদের উদ্দেশ্যের সততায় যথেষ্টই সন্দেহ করার রয়েছে। অন্ততপক্ষে এ কাজের জন্য আমি তাদের প্রশংসা করতে পারলাম না।

পাকিস্তান জমিয়তে ইত্তেহাদুল ওলামা আলেমদের একটি প্রতিষ্ঠান।

ইতোপূর্বে কিছুদিন আমি তাদের সঙ্গে বিভিন্ন দায়িত্বপূর্ণ পদে কাজ করেছি। জামায়াতে ইসলামী, জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের সঙ্গেও নানা সময়ে কাজ করার আমার সুযোগ ঘটেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এদের সবাই কেন্দ্রীয় কর্মস্থল পশ্চিম পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত থাকায় পূর্ব পাকিস্তানে তথা বাংলাদেশের প্রতি কেউ সুবিচার প্রদর্শন করতে পারছেন না বলে আমার বিশ্বাস।

তাই বর্তমানে স্বতন্ত্র উলামা দল গঠন অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে। যারা শরীয়তের প্রকৃত ব্যাখ্যা, সেই সঙ্গে গতিশীল রাজনীতির সঙ্গে জনগণকে সত্যিকারভাবে পরিচিত করে তুলতে সক্ষম।

পাকিস্তান আওয়ামী উলামা পার্টি গঠনের যৌক্তিকতা এখানেই।

স্বতন্ত্র ধর্ম দপ্তরের স্বপ্নদ্রষ্টা

উদাহরণ ও প্রাঞ্জল যুক্তিশৈলীর মাধ্যমে স্বতন্ত্র ধর্ম দপ্তর প্রতিষ্ঠার স্বপ্নকে তিনি তুলে ধরেছিলেন এভাবে–

একই ঘরের দুটি ছেলে যাদের একজন সাধারণ শিক্ষা এবং অন্যজন ধর্মশিক্ষা অর্জন করতে বের হয়। দীর্ঘ ক' বছর পর্যন্ত সমান উদ্যমে ও সমান পরিশ্রমে উভয়েই শিক্ষা

লাভ করতে থাকে। অবশেষে পড়া শেষ হয়। দু'জনই কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ লাভ করে। কিছুদিনের মধ্যেই দেখা যায় উভয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য হয়ে পড়েছে। একজন ত্রিশ টাকা বেতনে মসজিদের ইমাম কিংবা ত্রিশ টাকা বেতনে মাদরাসায় চাকরী পাচ্ছে, অন্যজন সাড়ে তিন হাজার টাকা বেতনের উচ্চ চাকরীপদ লাভ করেছে। এই যে ব্যবধান তা অবলোকনের পর ধর্মশিক্ষা ও ধর্মচর্চার প্রতি আর মানুষের উৎসাহবোধ থাকতে পারে না।

স্বতন্ত্র ধর্ম দপ্তরের মাধ্যমে আমি চিরতরে এর অবসান কামনা করেছি। এজন্য উক্ত দপ্তরের অধীন আমি পৃথক সার্ভিস ক্যাডার বা উচ্চ চাকরী পদেরও প্রস্তাব করেছি যা ধর্ম দপ্তর প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে আপনাআপনি হয়ে পড়বে।

আজকাল মাদ্রাসা ছাত্ররা আরবি বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি দাবি তুলেছে। কারণটি তো অর্থনৈতিক বটেই কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাস করে যেখানে ছাত্ররা সরকারের স্বরাষ্ট্র, পররাষ্ট্র, অর্থ, বাণিজ্য, শিক্ষা, শিল্প ও প্রাকৃতিক সম্পদ বিষয়ক দপ্তরসমূহের চাকরীগুলোতে ঢুকে পড়বে, সেখানে আরবি বা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা চাকরীর সন্ধান করবে কোন দপ্তরে? এর জন্য কি আলাদা দপ্তর থাকা উচিত নয়? আমার প্রস্তাবিত স্বতন্ত্র ধর্ম দপ্তর এসব ছাত্রদের আশি ভাগ চাকরীর সংস্থান করতে সক্ষম হবে। অবশিষ্ট বিশ ভাগ ছাত্র অন্যান্য দপ্তরে প্রবেশ লাভ করতে পারবে। এমনটিই আমার ধারণা।

এ প্রসঙ্গে আমি আলেমদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ সম্পর্কে দুটি কথা বলব। পাকিস্তানের একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবে প্রত্যেকের যেমন রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করার অধিকার আছে আলেমগণেরও তেমন অধিকার রয়েছে। পাক-ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে আলেমদের অসামান্য ত্যাগ, শত শত উলামার স্বেচ্ছায় ফাঁসিকাষ্ঠে আত্মদান এক বে-নজীর ইতিহাস যা উইলিয়াম হান্টারের মত ইংরেজ লেখককে পর্যন্ত বিমূঢ় করে তুলেছিল। সর্বোপরি পাকিস্তান আন্দোলনে মাওলানা শাব্বির আহমদ উসমানী ও মওলানা আকরম খাঁর নেতৃত্বে আলেম সমাজ কর্তৃক কায়দে আজমের বলিষ্ঠ সহায়তার বিষয়টিকে কে অস্বীকার করতে পারবেন? সুতরাং আলেম সমাজ রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে পারেন। অন্তত তাদের এ অধিকার রয়েছে এটিই আমার প্রথম কথা। কিন্তু দ্বিতীয় কথা এবং যা বহু তিক্ত অভিজ্ঞতার পর আমার অর্জন হয়েছে তাই হল দলীয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করার আগে আলেমদেরকে অবশ্যই অর্থনৈতিক দৈন্যের কবল-মুক্ত হতে হবে। জাকাত ও কোরবানীর চামড়া ভিক্ষা করে যে রাজনীতি হয় না, সে অভিজ্ঞতা আমার আছে। আমার প্রস্তাবিত স্বতন্ত্র ধর্ম দপ্তর যদি প্রতিষ্ঠা লাভ করে তবে আলেমগণ একদিন সকল অর্থনৈতিক দৈন্যের নাগপাশ হতে মুক্তি লাভ করে সচ্ছল জিন্দেগীর স্বাদ গ্রহণ করতে পারবেন। তখন কিভাবে রাজনীতি করতে হবে, নতুন করে তাদেরকে আর তা বলে দিতে হবে না।

একটি কথা অনেকেই বুঝেন না, বলে থাকেন, ধর্ম কর্ম তো ঠিক মতই চলছে আবার ধর্ম দপ্তরের আবশ্যকতা কি ? জিজ্ঞেস করি–

খ্রিস্টান মিশনারীরা আপনার দেশে তাদের ধর্ম প্রচার করার জন্য কোটি কোটি টাকা খরচ করছে। বিগত তেইশ বছরে আপনি তাদের দেশে কত টাকা খরচ করে ধর্ম প্রচার করেছেন? ধর্ম প্রচারের ভারসাম্য তাহলে কোথায় রইল?

আবার জিজ্ঞেস করি— আপনার গ্রামে একটি মসজিদ করতে হবে। গ্রামবাসী সকলেই দরিদ্র, কিন্তু দরিদ্র বলে নামাজ জামাতে তো মাফ নয়; তাই মসজিদ করতেই হবে কিন্তু মসজিদ করতে হলে কয়েক হাজার টাকার প্রয়োজন। গ্রামবাসী সামান্য টাকা দিতে পারে বাকী টাকার ব্যবস্থা কে করবেন ? আপনি কি রশিদ বই আর চাঁদা আদায়ের বাক্স নিয়ে ট্রেনে, স্ট্রিমারে ঘুরতে বলেন? কেন? ইউনিয়ন কাউন্সিলের ঘর নির্মাণের জন্য যদি সরকারী টাকার অভাব না হয়, মসজিদের জন্য অভাব হবে কেন? মুসল্লিরা কি পাকিস্তানের নাগরিক নন ? তাদের প্রতিষ্ঠান কি জাতীয় প্রতিষ্ঠান নয়? সুতরাং টাকা পাওয়ার জন্য দপ্তর চাই, অফিস চাই।

থানার বড় দারোগা যেমন কেরোসিন তেলের লাইসেন্সের মালিক নন; স্বতন্ত্র ধর্ম দপ্তর ছাড়া আর কেউই তেমনি ধর্মীয় কাজে টাকা দিবার মালিক হবেন না, এটিই ঠিক। তাই চাই স্বতন্ত্র ধর্ম দপ্তর। আলেম সমাজের দাবি; জনগণের দাবি স্বতন্ত্র ধর্ম দপ্তর, স্বতন্ত্র ধর্ম দপ্তর; এটি একটি জাতীয় প্রয়োজন। আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দকে ধন্যবাদ তারা এর প্রতি পূর্ণ সহানুভূতি প্রদর্শন করেছেন।

'জয় বাংলা...'

জয়বাংলা শ্লোগান অনৈসলামিক নয়– এর ব্যাখ্যা তিনি দাঁড় করিয়েছিলেন এভাবে–

অনেকেরই একথা জানা নেই যে, জয় বাংলা শ্লোগানটি আওয়ামী লীগের শ্লোগান নয়, তা সিন্ধু নেতা জি.এম. সৈয়দের জয় সিন্দ শ্লোগানের প্রতিধ্বনি মাত্র। আওয়ামী লীগের মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সাহেব তার বর্তমান পশ্চিম পাকিস্তান সফরেও এ কারণে উচ্চারণ করে এসেছেন, জিয়ে বাংলা, জিয়ে সিন্দ, জিয়ে পাঞ্জাব, জিয়ে বেলুচিস্তান, জিয়ে সরহদ, জিয়ে পাকিস্তান। পাকিস্তানের একটি বৃহৎ জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে আওয়ামী লীগ শুধু জয় বাংলা বলতে পারে না, তাকে পাকিস্তানের অন্যান্য প্রদেশেরও চিন্তা করতে হবে। আওয়ামী উলামা পার্টির অবস্থাও তাই। যেহেতু আওয়ামী উলামা পার্টি পাকিস্তানের উভয় অংশেই তার শাখা বিস্তার করেছে।

জয়বাংলা ছাত্রদের একটি শ্লোগান, যার মধ্যে রয়েছে।

১. কায়েমী স্বার্থবাদীদের সব ধরনের বাধাদান সত্ত্বেও ভাষা আন্দোলনে বাংলার জয়।

২. আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দ্বারা বাংলার গণমানুষের প্রাণের দাবি ৬ দফা আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দেয়ার সব প্রচেষ্টা সত্ত্বেও গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে বাংলার জয়।

নিশ্চয়ই বিষয় দুটি এমন নয়, যেখানে বাংলার পরাজয় হয়েছে। সুতরাং শ্লোগান জয় বাংলা হবে না তো কি রাহুর বাংলা হবে?

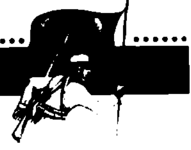
হয়তো পথিক করবে দোয়া দেখবে যখন কবরটাকে...

হিংস্র হানাদারদের হাতে বন্দি হবার ক'দিন আগে শহীদ বুদ্ধিজীবী মাওলানা অলিউর রহমান ছন্দ এঁকেছিলেন এভাবে–

আমায় তোরা দিস গো ফেলে হেলা ভরে পথের ধারে,
হয়তো পথিক করবে দোয়া দেখবে যখন কবরটাকে।

ওরা কবরটাকেও চিহ্নিত করে রেখে যায়নি মাওলানা অলিউরের। তাতে কি! এক পথিক নয়, হাজারো পথিক, লাখো জনতা দোয়া করছে মাওলানা অলিউর রহমানসহ সকল বুদ্ধিজীবীর জন্য। দুঃখ এটাই, ওরা যেভাবে কবর রেখে যায়নি আমরা সেভাবে এখনও যথাযথ মর্যদায় সম্মান করিনি এই অমর বুদ্ধিজীবীকে। ১৯৭২ সালে প্রণীত বুদ্ধিজীবী তালিকায় মাওলানা অলিউর রহমানের নাম থাকলেও মিরপুর শহীদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে বুদ্ধিজীবীদের নামের তালিকায় তাঁর নাম নেই। আলেম শহীদ বুদ্ধিজীবী মাওলানা অলিউর রহমানকে ১৯৭২-এর বুদ্ধিজীবী তালিকায় হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার অলিউর রহমান হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ আলেম ও মাওলানা হিসেবেই তিনি তাঁর বর্ণাঢ্য বুদ্ধিবৃত্তিক ক্যারিয়ার গড়ে তুলেছিলেন। ডাক্তার পরিচয়ের চেয়ে মওলানা পরিচয়েই তিনি লিখেছেন তাঁর সকল সাহিত্যকলা, প্রবন্ধ ও গ্রন্থ। আমরা সেসব বুদ্ধিজীবীদের কেমন উত্তরসূরি যে, তাদের পরিচয়টাই ঠিকমত তুলে ধরতে পারি না আমাদের মাঝে।

হ্যাঁ, রাত কিন্তু এদিকে অনেক হয়ে গেছে। মন যেতে না চাইলেও যে যেতে হয়। এক অনন্য সাধারণ অভিজ্ঞতা নিয়ে মাজার প্রাঙ্গণ ত্যাগ করলাম। জুনায়েদ সাহেব আমাদের এগিয়ে দিলেন টুকেরবাজারের মহাসড়ক পর্যন্ত। আবারো সিএনজিতে চড়ে বসলাম। কিন্তু ফায়জুল পাশ থেকে ডেকে বলল, শিবলি ভাই, বাদামের থলিটা তো জোনায়েদ সাহেবের বাসায় রয়ে গেল। আচ্ছা তাই নাকি! হাতের মোবাইলটা চেপে দিলাম। জোনায়েদ সাহেব রিসিভ করতেই আমি বললাম, এরই নাম রিজিক, বাদামের থলিটা আপনাদের জন্য ভুলে রয়ে গেল বাসায়। তিনি মোটরসাইকেলে করে থলিটা দিয়ে যাওয়ার কথা বললেন। আমি সবিনয়ে বললাম, হাতিয়া থেকে অনেক হাতবদল হয়ে আপনাদের হাতে পৌঁছেছে। এবার তো বাদামগুলোকে রেহাই দিন! সিএনজি ততক্ষণে পৌঁছে গেছে সিলেট শহরে। এরই মাঝে ফায়জুল অবশ্য ভুলে কোনো কিছু রেখে আসার একটা মনোবিজ্ঞানী ব্যাখ্যা দাঁড় করানোর চেষ্টা করছিল– বন্ধু বন্ধুর বাসায় কোনো কিছু রেখে আসে তখনই, যখন মনটা বন্ধুর বাসায় থেকে যায়, দেহটা চলে আসে।



আলেম মুক্তিযোদ্ধা দুই ভাই—
মাওলানা উবায়দুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী ও মাওলানা আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী

সারাদেশে টালমাটাল অবস্থা ৬ দফাকে কেন্দ্র করে। ফুঁসে উঠেছে চারদিক ৬ দফার সমর্থনে। এমনি সময় বঙ্গবন্ধু এলেন সিলেটে। দেখা হলো, পরিচয় হলো। সেই থেকে শুরু, এগিয়ে নিলেন নিজেকে। গড়ে তুললেন মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে আলেমদের জনমত। তারপর ইতিহাসের পাতা উল্টে গেছে অনেকগুলো। নিজেকে জড়িয়েছেন মহান মুক্তিযুদ্ধের মহান আন্দোলনে। কখনো স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে, কখনো মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক কর্নেল আতাউল গণি ওসমানীকে যুদ্ধকালীন সঙ্গ দিয়ে স্বাধীনতা অর্জনে অসামান্য অবদান রেখেছেন মাওলানা শেখ উবায়দুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী। তাঁরই অগ্রজ সময়, মেধা, শ্রম দিয়ে সাহায্য করেছেন ছোট ভাইকে, জীবন বাজি রেখে পক্ষ নিয়েছেন মুক্তিযুদ্ধের। অনুপ্রেরণা ও উৎসাহের উপলক্ষ হয়েছেন স্বাধীনতাপ্রেমী এবং ধর্মপ্রাণ মুসলমানের।



মুক্তিযুদ্ধের সেই চাঞ্চল্যকর দিনগুলোর কথা তাদের মুখ থেকে শোনার একটা স্বপ্ন বাসা বেঁধেছিল অনেক দিন থেকেই আমার মনে। স্বপ্নের হাতছানি পাবার সুযোগটা আরো পাকাপোক্ত করে দিলেন ঢা.বি.'র গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষার্থী মুহাম্মদ ফায়জুল হক। অনেকটা আবেগপ্রবণ হৃদয়েই ব্যাকুল হয়ে তাকে তাড়া করে ফিরছিলাম বারবার– কীভাবে দ্রুত সেই দুই ভাইয়ের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। যথারীতি যোগাযোগ। তারপর একদিন বৈশাখী উতলা রোদ আর খরতাপ মাথায় নিয়ে দুজনই চেপে বসলাম বাসে। ছোট ভাই মাওলানা শেখ উবায়দুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী থাকেন ঢাকার আসাদ গেট এলাকায়। প্রথম গন্তব্য সেখানটায়। তারপর বড় ভাই মাওলানা আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী আল-আজহারীর বাসা পল্লবীতে ফিরতে হবে। সঙ্গে আছে মুক্তিযুদ্ধের গা শিরশির করা দিনগুলোকে জানার অসম্ভব রকম মানসিক প্রস্তুতি।

নীরবে সরব হে তুমি!

আসাদ গেট-এর নিউ কলোনীতে থাকেন মাওলানা জালালাবাদী। দরজায় কড়া নাড়তেই তাঁর ছোট ছেলে বরণ করে নিলেন আমাদের। আলাপচারিতার একটা

চমৎকার পরিবেশ। চারদিকে নীরবতা। এরই মাঝে কথার আখড়া যেন জমে উঠতে শুরু করেছে একটু একটু করে। সেটা ক্রমেই রূপ নিল প্রাণবন্ত আড্ডায়। আড্ডার ফাঁক গলিয়ে কথাচ্ছলে বেরিয়ে এলো মুক্তিযুদ্ধের সেই উত্তাল দিনগুলোর কথা।

দু'জনেই একাকার হয়ে গেলাম আলেম মুক্তিযোদ্ধার সঙ্গে কথার ভাঁজে ভাঁজে একাত্তরের দিনগুলোকে মনের মণিকোঠায় ঠাঁই দিতে দিতে। একেবারে শুরু থেকেই শুরু করার আবেদন জানালাম তাঁকে। মাওলানা জালালাবাদী শুরু করলেন, কীভাবে নিজেকে ধীরে ধীরে জড়ালেন মহান মুক্তিযুদ্ধে— পাকিস্তানিদের শাসনামলে এদেশের মানুষকে ব্যবসা-বাণিজ্য, সরকারি চাকরি, দেশের প্রতিরক্ষায় সেনাবাহিনী, বিমানবাহিনী, নৌবাহিনী তথা সর্বক্ষেত্রে বাঙালিদের বঞ্চিত করা হচ্ছিল। এসব করা হতো পবিত্র ধর্ম ইসলামের দোহাই দিয়ে এবং পাকিস্তানের সংহতি ও অখণ্ডতার বুলি আউড়িয়ে। ইসলাম ধর্ম এসব বেইনসাফি অনুমোদন করে না, তা সত্ত্বেও এখানকার কিছু সংখ্যক ধর্মীয় রাজনৈতিক দল ও তাদের নেতারা পশ্চিমাদের অন্ধভক্ত, অনুরক্ত, অনুসারীরূপে কাজ করত। এসব বেইনসাফির বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে ১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি লাহোরে পাকিস্তানের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা পাকিস্তান নেজামে ইসলাম পার্টির সভাপতি চৌধুরী মোহাম্মাদ আলীর বাড়িতে অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় বৈঠকে বাঙালির মুক্তির সনদ ৬ দফা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উপস্থাপন করেন।

মিথ্যা দিয়ে সত্যকে বেশি দিন ঢেকে রাখা যায় না

বঙ্গবন্ধু যখন ৬ দফা কর্মসূচি পেশ করেন, তখন এদেশের কতিপয় ধর্মীয় দল, আলেম-ওলামা এবং পাকিস্তানের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে কয়েকটি গণভিত্তিহীন রাজনৈতিক দল ৬ দফার বিরুদ্ধে উঠেপড়ে লাগে। প্রচারণা শুরু করে এই বলে যে, এই ৬ দফা কর্মসূচি ইসলামের পরিপন্থী, জাতীয় ঐক্য ও সংহতিবিরোধী ইত্যাদি। মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ)-এর ভাগনে মাওলানা এহতেশামুল হক থানভীসহ বড় বড় আলেমরা এই ৬ দফার বিরোধী ছিলেন। আসলে আমাদের দেশে মাদরাসায় পাঠানো হয় তাদেরই যারা অন্য ভাইদের তুলনায় কম প্রতিভাবান হয়। আর গরিবদের সংখ্যাই মাদ্রাসায় বেশি হয়।

একবার আমি হোটেল শাহবাগে (বর্তমানে যা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ব বিদ্যালয়ে রূপান্তর হয়েছে) মাওলানা এহতেশামুল হক থানভীর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। আমি তাঁকে বললাম, আপনারা জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে একাট্টা হয়ে কেন ৬ দফার বিরোধিতা করছেন? উত্তরে তিনি বললেন, জামায়াতে ইসলামীকে তারা কোনো ধর্মীয় রাজনৈতিক দলই মনে করেন না। কিন্তু কেবল আওয়ামী লীগ বিরোধিতার জন্য তাদের সঙ্গে আছেন। আমার একথা সেদিন সাংবাদিক মারফত প্রেসে চলে গিয়েছিল। যা বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করে। পরে অবশ্য তাদের নেজামে ইসলাম পার্টির পক্ষ থেকে সংশোধনীমূলক বিবৃতি দেন। যাই হোক, অনেক আলেম অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অন্ধ পাকিস্তানপ্রীতির বশে ৬ দফার বিরোধিতা করেছিল তখন।

বঙ্গবন্ধুর হাতে হাত রেখে...

৬ দফা ঘোষণার পরপরই বঙ্গবন্ধু সিলেটে এলেন। পরিচয় হয় তাঁর সঙ্গে। তিনি তখন আমাকে ঢাকা গেলে তাঁর সঙ্গে দেখা করার কথা বলেন। ঢাকায় এসে তাঁর ধানমন্ডি ৩২ নম্বর রোডের বাড়িতে আমি দেখা করি। বঙ্গবন্ধু আমাকে জিজ্ঞেস করেন, ৬ দফায় ইসলামের বিরুদ্ধে কিছু আছে কি-না? প্রতিউত্তরে আমি বললাম, আপনি ৬ দফা কর্মসূচির মাধ্যমে পূর্ব-পাকিস্তানের বাঙালিদের ন্যায্য অধিকার প্রাপ্তির দাবি জানিয়েছেন, এটা ইসলামের পরিপন্থী তো নয়ই বরং সহায়ক। ইসলাম ন্যায়ের ধর্ম, শোষণের বা কাউকে তার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করার ধর্ম নয়। এরপর বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে ইসলামের দৃষ্টিতে ৬ দফা কর্মসূচি যে ন্যায্য, সঙ্গত তা জনমনে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই আমি 'আওয়ামী উলামা পার্টি' গঠনের উদ্যোগ নিই। সিলেট সরকারি আলিয়া মাদ্রাসার প্রাক্তন শিক্ষক তাজুল মুফাসসিরিন ও তুখোড় লেখক মাওলানা উলিউর রহমানকে এর সভাপতি করা হয়। আমার তত্ত্বাবধানে সেই সময় 'ইসলামী বিপ্লবী পরিষদ' প্রতিষ্ঠিত হয়। আমি ছিলাম এর সভাপতি। আমাদের পক্ষ থেকে ৬ দফা কর্মসূচির সমর্থনে 'শরীয়তের দৃষ্টিতে ৬ দফা কর্মসূচি' নামে পুস্তিকা লিখে তার হাজার হাজার কপি দেশব্যাপী ধর্মপ্রিয় জনগণের হাতে পৌঁছানো হয়। ফলে ৬ দফা কর্মসূচি যে পবিত্র ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে কোনো কার্যক্রম নয় এটা বুঝতে জনগণের বেশি সময় লাগেনি। ৬ দফার পক্ষে আমাদের বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণের ফলে দেশের ধর্মপ্রাণ জনগণ ১৯৭০-এর সাধারণ নির্বাচনে ৬ দফা কর্মসূচিকে সমর্থন জ্ঞাপন করে আওয়ামী লীগকে একচেটিয়াভাবে ভোট প্রদান করে।

রাজনীতি করে বটতলার উকিল আর বাটপাররা!

বঙ্গবন্ধু আমাকে '৭০-এর নির্বাচনে সিলেট থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্যে বলেছিলেন। আমি তখন বেশ সিদ্ধান্তহীনতায় পড়ে যাই। তখন আমার বয়সইবা কত? এদিকে ঢাল তলোয়ার নেই, নেই কর্মী, কিভাবে যাই নির্বাচনী ময়দানে! শেষ পর্যন্ত পিছপা হই।



জালালাবাদী ভাতৃদ্বয়

সেদিন ইতিবাচক সিদ্ধান্ত নিলে নিশ্চিত ছিল আমার জয়। সারাদেশে তখন জয় জয় রব আওয়ামী লীগের।

আমার তখনকার অবস্থা ন্যাপ নেতা অধ্যাপক মুজাফফর আহমদের '৫৪-এর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের মতো হয়েছিল। ঘটনাটা তাঁর মুখ থেকেই শোনা। খোন্দকার মুশতাক ছিলেন তাঁর বাল্যবন্ধু। মুজাফফর সাহেব ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ২২। মুশতাক গিয়ে তাঁকে অফার দিলেন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার। মুজাফফর সাহেব এতে বিপাকে পড়ে যান। তিনি নাকি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন তাঁর এলাকারই তার বাবার গুরু জনাব মফিজউদ্দিন আহমদকে। নির্বাচন করার কথা যখন প্রথম তাঁর বাবাকে শুনালেন তখন তিনি বললেন, 'তুই বাবা শিক্ষিত মানুষ, তুই কেন রাজনীতিতে নামবি। শিক্ষিতরা কি রাজনীতি করে? রাজনীতি করে উল্লুক, বাটপার, বটতলার উকিল যারা তারা! ন্যাপ নেতা মুজাফফর আহমদ পিতার সঙ্গে সমঝোতায় শেষমেশ নির্বাচন করলেন এবং জয়ী হয়েই বাড়ি ফিরলেন।

'জেএমবি'র অস্তিত্ব ছিল সব যুগেই

এই তো কিছুদিন আগেও গোয়েন্দা সংস্থা থেকে আমাকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছিল, জেএমবির লিস্টে নাকি আমার নাম আছে। তারা আমাকেও হত্যা করে ফেলবে। এ রকম হুমকি আমি তখনও অনেকবার পেয়েছি। ৬ দফা ইসলামের বিপক্ষে কোনো কর্মসূচি নয় তা যখন প্রচার করতে লাগলাম তখন ঘোষণা করা হলো, যে ব্যক্তি আমাকে হত্যা করতে পারবে সে শহীদ, সোজা জান্নাতে চলে যাবে। কতটা অজ্ঞ আর ধর্মহীন হলে একজন মানুষ বলতে পারে অন্য মানুষকে হত্যা করলে সে জান্নাতে যাবে। যাই হোক আমাকে তখন হত্যার চেষ্টা ব্যর্থ হয়। তারা বুঝতে পারে হত্যা মানেই জেল-ফাঁসি ইত্যাদি। তখন তাঁদের আক্রমণ থেকে বেঁচে গেলেও এবার কিন্তু তারা ঠিকই আমাকে মনে করে আমার অগ্রজের উপর আক্রমণ করে বসে। যা দীর্ঘদিন জাতীয় পত্র-পত্রিকায় আলোচিত হয়।

বেলুচিস্তানের কসাই!

১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের কোনো এক বিকালে তৎকালীন হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল (বর্তমানে শেরাটন)-এ অবস্থানরত পাকিস্তানবিমান বাহিনীর প্রতিষ্ঠাতা প্রধান এয়ার মার্শাল আসগর খানের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে তিনি আমাকে জানান যে, পাকিস্তান সামরিক শাসকেরা টিক্কা খানকে গভর্নর ও আঞ্চলিক সামরিক প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ দিচ্ছে বলে তিনি অত্যন্ত বিশ্বস্ত সূত্রে জানতে পেরেছেন এবং তা যদি বাস্তবায়িত হয় তাহলে পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ জনগণের ওপর অত্যাচার, নির্যাতন, গণহত্যা শুরু করার আশংকা রয়েছে। এর কারণ হিসেবে তিনি বলেন, এর আগে (ষাটের দশকের শুরুর দিকে) টিক্কা খান যখন বেলুচিস্তানের সামরিক প্রশাসক ছিলেন তখন সেখানে ঈদের দিনে ঈদের জামাতে নামাজরত মুসল্লিদের ওপর বিমান থেকে বোমাবর্ষণ করে বহু নামাজিকে নির্মমভাবে হত্যা করেছিল। এমন নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোককে যখন এখানে সামরিক প্রশাসকের দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হচ্ছে তখন এর পরিণতি খুব খারাপ হবে বলে তিনি আমার কাছে তার আশঙ্কার কথা ব্যক্ত করেন। বেলুচিস্তানে গণহত্যা সংঘটনের পর থেকে এ পাষাণ হৃদয়ের লে. জেনারেল



মওলানা ভাসানীর সঙ্গে কিশোর জালালাবাদী। একাত্তরের আগে সিলেটে ওঠানো ছবি

'বেলুচিস্তানের কসাই' হিসেবে সারা দুনিয়ায় কুখ্যাতি কুড়িয়েছিল। তা আমি নিজেও জানতাম। এ সংবাদে আমি নিদারুণভাবে চিন্তিত হয়ে পড়ি। ১ মার্চ ১৯৭১, আমাকে বরিশালের মাওলানা নুরুজ্জামান, যিনি পূর্ব পাকিস্তান পিপলস পার্টির চেয়ারম্যন ছিলেন, জাতিসংঘের মহাসচিব উথান্টের একটি বার্তা আমাকে পড়ে শুনান। এর মূল কথা ছিল, পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থানরত সকল জাতিসংঘের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে অবিলম্বে পূর্ব পাকিস্তান ত্যাগ করার জন্য নির্দেশ দিচ্ছে। এর ফলে আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ি।

লাশের ওপর দিয়েই ছুটছে মানুষ, ছোপ ছোপ রক্ত ...

২৫ মার্চ বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে ৫১ নং পুরানা পল্টন আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আমি ছিলাম। হামলা শুরু হলে বিভিন্ন স্থান থেকে মানুষ ফোন করে জানতে চাইছিলেন এই মুহূর্তে তাদের কী করণীয়? সেই গভীর রাতে আওয়ামী নেতাদের সেখানে কেউই উপস্থিত ছিলেন না। টেলিফোন কলগুলো আমাকেই রিসিভ করতে হতো। আমি তাদের প্রত্যেককেই মরণপণ যুদ্ধ চালিয়ে যাবার পরামর্শ দিতে থাকি। হঠাৎ টেলিফোন লাইন বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। চারদিকে লেলিহান আগুনের শিখা। ট্রেসার বুলেটের ভয়ংকর আলো আর কামানের বিকট শব্দ কাঁপিয়ে তুলছিল আমাকে বারবার। পরের দিন ২৬ মার্চ ছিল শুক্রবার। সকাল সাড়ে আটটা কি পৌনে ন'টার দিকে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে অগ্নি সংযোগ করে তা একেবারে পুড়িয়ে দেয়। কোনোরকমে সেই অফিসের পেছন দিক থেকে লাফিয়ে নিজেকে রক্ষা করি। আওয়ামী লীগ অফিসের পাশে লেবারকোর্টের নিচে দুই টয়লেট। এই দুই টয়লেটের মাঝে নিজেকে লুকিয়ে রাখি। গায়ে জামা নেই, শুধু গেঞ্জি। ক্ষুধায় জীবন যায় যায়। দুপুর দেড়টার দিকে আমাকে দেখে একজন ডাক দেয়। আমি কোনো সাড়া দেই না। আমি তাকে চেনা সত্ত্বেও আমার ভেতরে এই আশংকা কাজ করছিল যে, না জানি আবার কে না কে ডেকে নিয়ে ধরিয়ে দেয় পাকসেনাদের হাতে। পরে দেখলাম আওয়ামী

অফিসেরই পিয়ন নোয়াখালীর আবদুল ওয়াহ্হাব আমাকে ডাকছে। বলল, মিলিটারি চলে গেছে, আপনি উঠে আসেন। সেখান থেকে গেলাম পাশেরই নির্মাণাধীন এক বিল্ডিং-এ । কে কার খবর রাখে। লোকজন ছুটছে, যার যার জান নিয়ে সবাই ব্যস্ত। বিল্ডিং-এর তিন তলায় চুপিচুপি বসে আছি। দিন শেষে রাতের বেলা দোতলার এক কাজের ছেলে আমাকে দেখে বলল, আপনি হয়তো না খেয়ে আছেন, চেহারায় তা বুঝা যায়। আমার কাছে সামান্য ভাত আছে। আমি আপনাকে এনে দেই? তার সে সময়ের কৃপায় কিছু রিজিক জুটল। সেদিন কারফিউ জারি থাকায় মসজিদে জুমার নামাজ আদায় করা যায়নি। ২৭ মার্চ কিছুক্ষণের জন্য কারফিউ তুলা হলে ঢাকা শহরের মানুষ যে যেদিকে পারে সপরিবারে ছুটতে থাকে। আমি সেই মুহূর্তে ঢাকা বিশ্যবিদ্যালয়ের ইকবাল হল, জগন্নাথ হল, ঢাকা হল, কাপ্তান বাজার, ঠাটারী বাজার, ঢাকা স্টেডিয়াম, কমলাপুর রেল স্টেশন, সদরঘাট, রাজারবাগ ইত্যাদি জায়গা ঘুরেফিরে দেখি। লাশের ওপর লাশ পড়ে আছে। লাশের ওপর দিয়েই ছুটছে মানুষ। আপন জীবন বাঁচাতে পায়ের নিচে পড়ছে সেই নিজেদেরই লাশ। আর ছোপ ছোপ রক্ত। ঢাকা স্টেডিয়ামের পাশের পুকুরে লাশ টেনে নিয়ে পানিতে ফেলছে পাক পাষাণরা। টানতে গিয়ে রক্তে ভরে গেছে গোটা পথ। আরেকটি দৃশ্য কখনো ভুলবার নয়। ঠাটারি বাজারে দেখলাম, মা গুলি খেয়ে সন্তানকে ঢেকে রেখেছেন যেন নিজের প্রাণের বিনিময়ে হলেও সন্তানটি বাঁচে। মা-সন্তান একই সঙ্গে শুয়ে আছে লাশ হয়ে। মায়ের কোলের নিচে সন্তানের লাশ। নবাবপুর রেল ক্রসিংয়ের ওখানে ধানমন্ডির হাফেজ যাকারিয়ার সঙ্গে দেখা হলো। তিনি সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

এসব কথা বলতে বলতে চোখে প্রায় পানিই এসে পড়ছিল মুক্তিযোদ্ধা মাওলানা জালালাবাদীর। তার চোখের ভাষাই বলে দিচ্ছিলো কত ভয়ানক ছিল সেই অগ্নিঝরা দিনগুলো। আমাদের আলোচনার মাঝে ইতিমধ্যেই যোগ দিয়েছেন সাপ্তাহিক 'রক্তকেতু'-এর সম্পাদক সাঈদ এ. সিকদার। ষাটোর্ধ্ব লোকটি আরো বেশি আবেগতাড়িত হয়ে উঠছিলেন। বারবারই আবেগসূচক ভঙ্গিমা প্রকাশ পাচ্ছিল তার মাঝে। নিজেকে নিয়ে যাচ্ছিলেন সেই দিনগুলোতে অনেকটা বেদনাকাতর হৃদয়ে।

অজানার পথে ছুটছি তো ছুটছিই

জনাব জালালাবাদী পুরো মাত্রায় মিশে গেছেন সেই দিনগুলোর সঙ্গে। আমরাও প্রবল আগ্রহী হয়ে উঠলাম তারপর কী হলো তা জানতে। জিজ্ঞেস করে বসলাম— এরপর আপনি কী করলেন? কোথায় গেলেন? ভেজা ভেজা কণ্ঠে তিনি বলতে থাকলেন, ওইদিন সন্ধ্যায় আমি ঢাকা শহরের অপর পারে জিনজিরার কাঠুরিয়ায় বসবাসরত মাওলানা অলিউর রহমানের ওখানে গিয়ে উঠি। তিনি আমাকে অক্ষত অবস্থায় দেখতে পেয়ে সেই দুর্দিনেও খুশি হলেন। বললেন, ভাতিজা, আমি তোমার জন্য খুবই চিন্তিত ছিলাম। যাই হোক তুমি এসেছ, এখন থেকে আমি আর তুমি এখানে একত্রে কাটাব। এখানেই এভাবে কয়েকদিন অতিবাহিত হবার পর ২ এপ্রিল শুক্রবার ভোর রাতে খানসেনারা জিনজিরায় আক্রমণ চালায়। ফলে সেখানে থাকাও নিরাপদ নয় ভেবে আমি চাচাকে বলি, আমরা দুই 'অপরাধী'ই যদি একত্রে থাকি তবে খানরা আরো তাড়াতাড়ি খবর পেয়ে যাবে। তার চেয়ে বরং ভালো হয় আমি অন্য কোথাও চলে যাই। এই কথা

বলে তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ঢাকায় চলে আসি। সেদিন বিকেলে নবাবপুর রেল ক্রসিং-এর কাছে দেখা হয়ে যায় মাসিক মদীনা সম্পাদক মাওলানা মুহিউদ্দীন খানের সঙ্গে। সামনাসামনি দেখে তিনি আমাকে বলে উঠলেন, আরে আপনি এখনো ঢাকায়? তাড়াতাড়ি ঢাকা ছেড়ে যান। ওরা দেখতে পেলে আপনাকে মেরে ফেলবে। তখনই আমি সিদ্ধান্ত নেই, যে করেই হোক ঢাকা ছাড়তে হবে। সোজা চলে গেলাম ডেমরাতে। সেখান থেকে শীতলক্ষ্যা নদী ফেরিতে পার হয়ে তারাবো হয়ে অন্য একটি বাসে নরসিংদী পৌঁছাই। নরসিংদী নদীঘাটে গিয়ে দেখি, একটি ছোট লঞ্চ অপেক্ষা করছে যাত্রীর জন্য। তাতে করেই চলে যাই কুমিল্লার নবীনগরে। রাতে নবীনগরের জনগণ অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে ঢাকা থেকে পালানো যাত্রীদের স্বাগত জানাল। পরের দিন লোকমুখে খবর পাই, খানসেনারা খুব কাছাকাছি চলে এসেছে, সুতরাং সেদিনই সেখান থেকে একটা ছোট লঞ্চে করে ভৈরবের দিকে রওনা দেই। সন্ধ্যায় ভৈরব পৌঁছে জানতে পারি, খানসেনারা ভৈরব ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় স্যাবারজেট বিমানের মাধ্যমে বোমা বর্ষণ করছে। সেই রাতেই সৌভাগ্যক্রমে সিলেটের আজমিরিগঞ্জগামী একটি যাত্রীবাহী লঞ্চ পেয়ে যাই। তাতে করে সারারাত চলার পর পরের দিন বিকেলে সেখানে পৌঁছাই। এখান থেকে আবার ভিন্ন লঞ্চে করে চলে যাই সিলেটের শেরপুরে। পথিমধ্যে বিভিন্ন জায়গায়, মাঠে, ঘাটে, বাজারে দেখতে পাই অসংখ্য যুবক যুদ্ধের জন্য প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। শেরপুরে গিয়ে খবর পাই, কমান্ডেন্ট মানিক চৌধুরীর নের্তৃত্বে একদল মুক্তিযোদ্ধা এই অঞ্চলটিকে তাদের নিয়ন্ত্রণে রেখেছেন। তাঁর সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা থাকলেও আর দেখা পাওয়া যায়নি। তবে ভিন্ন একটি উপকার হয়েছে। শেরপুরে যাদের আশ্রয়ে ছিলাম তারা আমাকে নিয়ে নানা গুঞ্জন করছিল— মুখে দাড়ি, লম্বা পাঞ্জাবি পরা লোকটি আবার মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের হয় কী করে? আমার মুখে মানিক চৌধুরীর নাম শুনতেই তারা বুঝতে পারলো লোকটা সত্যিই দেশের হয়ে কাজ করতে চাইছেন। যাই হোক, শেরপুর



বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে শেরেবাংলার মাজার জিয়ারতে মাওলানা জালালাবাদী

থেকে পায়ে হেঁটে সিলেটে আমার নিজ গ্রামের বাড়িতে পৌঁছাই।

চোখ এড়িয়ে সীমানা পেরিয়ে...

বাড়িতে বৃদ্ধ পিতা মৌলভী মোঃ সাঈদ উল্লাহ ঢাকা শহরে খানসেনাদের ধ্বংসযজ্ঞের খবর পেয়ে আমার জীবিত থাকা নিয়ে খুবই উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠেন। আব্বার পা ছুঁয়ে সালাম করলাম, জড়িয়ে কাঁদলাম দু'জনেই। কিন্তু সামনে যে আরো মহাবিপদ। বাড়িতে থাকাটাই একেবারে দায় হয়ে গেছে। কারণ এই এলাকার মানুষের মাঝে তখনো পাকিস্তানপ্রীতি কাজ করছিল। আমার চাচা মাওলানা আব্দুর রশিদের নেতৃত্বে আন্দোলন সংগ্রাম করে গণভোটে জয়লাভ করে সিলেটকে আসামের অংশ থেকে মুক্ত করে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। তিনিই প্রথম পাকিস্তানের পতাকা নিজ হাতে উত্তোলন করে সিলেটকে ব্রিটিশ শাসনমুক্ত করেন। তার ভাতিজা হয়ে পাকিস্তান বিরোধিতা অনেকেই সহজভাবে মেনে নিতে পারেনি। অতএব আমার নিজ ঘরেও সে সময় আমি নিরাপদ বোধ করছিলাম না। তখন আমার ভাই এনায়েতউল্লাহ (মরহুম) যাতে কেউ জানতে না পারে সেজন্য সবার অগোচরে রাতের বেলায় আমাকে মসজিদে নিয়ে যান। আমি সেই রাতটি মসজিদে কাটিয়ে খুব ভোরে আমার বড় ভাই মাওলানা আবদুল্লাহ বিন সাঈদকে নিয়ে আমার নানার বাড়ি 'চাতলে' চলে যাই। সেখান থেকে আমার মামা নসরুল্লাহকেপথপ্রদর্শক হিসেবে সঙ্গে নিয়ে সালুটিকর ঘাটে অবস্থানরত পাকসেনাদের এড়িয়ে সারাদিন হেঁটে গোয়াইনঘাটের অপর পারের নগর নামের গ্রামটিতে সন্ধ্যায় পৌঁছি। সেখানে জনৈক তরিকুল্লাহর বাড়িতে রাত কাটাই। পরদিন পায়ে হেঁটে আমরা তিনজন রাধানগর জাফলং হয়ে খাসিয়া-জৈন্তা পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত ভারতের ডাউকি বাজারে গিয়ে পৌঁছাই। ২/৩ দিন ডাউকিতে অবস্থানের পর ভারতীয় বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের একটি জিপযোগে আমরা দুই ভাই শিলং-এ যাই। সেখানে আমাদেরকে 'পাইনউড' হোটেলে রাখা হয়।

অজানা শঙ্কা : আমরা কি গৃহবন্দি?

পাইনউড হোটেলে আমরা পৌঁছার দুই দিন পর ঢাকার কালিয়াকৈরের নবনির্বাচিত পরিষদ সদস্য জনাব শামসুল হক, পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক নির্বাচনের নবনির্বাচিত সদস্য শ্রীপুরের জনাব ছফির উদ্দিন আহমেদ, পার্বত্য চট্টগ্রামের তৎকালীন এডিসি জনাব এসএসামাদ (যিনি পরবর্তীতে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মুখ্য সচিব হিসেবেও কাজ করেছেন) প্রমুখ সেখানে গিয়ে পৌঁছেন। ফরিদপুরের জনাব আব্দুল মজিদ সেখানে আগে থেকেই অবস্থান করছিলেন। কয়েকদিনের মধ্যেই সেখানে আরও যারা আসেন তাদের মধ্যে মরমি কবি হাসন রাজার নাতি দেওয়ান উবায়দুর রাজা চৌধুরী এমএনএ, ছাতক থেকে নির্বাচিত সদস্য জনাব আবদুল হক, দৈনিক সংবাদের সিনিয়র সাংবাদিক জনাব বজলুর রহমান ও তার স্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী, কৃষক নেতা শ্রী জিতেন ঘোষ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া আওয়ামী লীগ নেতা জনাব লুৎফুল হাই সাচ্চু। অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়া (সিপিআই)-এর নেতৃবৃন্দ জনাব বজলুর রহমান ও তার স্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী এবং শ্রী জিতেন ঘোষকে তাদের নিজেদের দলের অতিথি হিসেবে আগরতলায় সরিয়ে নেয়। 'পাইনউড' হোটেলে অবস্থানকালেই একদিন প্রবীণ কংগ্রেস নেতা অবিভক্ত আসামের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী

সুনামগঞ্জের শ্রী অক্ষয়কুমার দাস আমাদের দেখতে আসেন। তিনি আমাদের সঙ্গে কুশল বিনিময়ের পর আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, সময় কেমন কাটছে? এমন সময় হঠাৎ করে আমাদের নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত আসাম পুলিশের ডি. এস. পি. সেখানে এসে বাবু অক্ষয় কুমার দাসকে আমার কামরায় বসে থাকতে দেখে ধমকা-ধমকি শুরু করে এবং তার প্রতি মারমুখী হয়ে ওঠে। অক্ষয়বাবু নিজের পরিচয় তুলে ধরা সত্ত্বেও সে নিজের তর্জন-গর্জন চালিয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত অক্ষয় বাবুকে সেখান থেকে ওঠাতে না পেরে সে গিয়ে তার উর্ধ্বতন কর্তা এসপি ফুকনকে ডেকে নিয়ে আসে। এসপি ফুকন বাবু অক্ষয় কুমার দাসের পরিচয় পেয়ে তাঁকে স্যালুট দেয় এবং বলে, দাদু আমি যখন প্রাথমিক স্কুলে পড়ি তখন আপনি মন্ত্রী হিসেবে একবার আমাদের স্কুলে ভিজিটিং-এ এসেছিলেন। তখনই প্রথমবারের মতো আমি আপনাকে দেখি।

কড়া নিরাপত্তা দেখে বারবার মনে উঁকি দিচ্ছিল একটি কথা– আমরা কি এ মুহূর্তে নজরবন্দি?

একদিন এক মজার ঘটনা ঘটল। একদিন আমি চুল কাটানোর জন্যে নিরাপত্তা রক্ষীদের কিছু না বলেই তাদের চোখে ফাঁকি দিয়ে সিলং-এর বড় বাজারের একটি সেলুনে চলে যাই। সেলুন থেকে ফিরে এসে দেখি নিরাপত্তা রক্ষীরা আমাকে হোটেলে দেখতে না পেয়ে একেবারে তুলকালাম কাণ্ড বাজিয়ে দিয়েছে। গোটা শহর তারা আমাকে খুঁজে খুঁজে শেষ। ঘটনাটাতে আরো পরিষ্কার হয়ে গেল– আমরা আসলে নজরবন্দি। ১১ এপ্রিল ১৯৭১, সকালে আমাদের প্রধান সিকিউরিটি অফিসার পুলিশের ডিআইজি মিস্টার মেহদী আমাকে জানালেন যে, গতকাল ১০ এপ্রিল কোলকাতায় বঙ্গবন্ধুকে রাষ্ট্রপ্রধান করে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রবাসী সরকার গঠন করা হয়েছে। আমরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠি। আল্লাহর কাছে হাজার হাজার শুকরিয়া জানাই। এ সুসংবাদ নিয়ে আমি ও অক্ষয় বাবু যাই আসামের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী শ্রী মহেন্দ্র মোহন চৌধুরীর কাছে। শ্রী মহেন্দ্র মোহন চৌধুরী ছিলেন অক্ষয় বাবুরই এককালীন শিষ্য। অক্ষয় বাবু শ্রী মহেন্দ্র মোহন চৌধুরীকে পরামর্শ দিলেন যে, তিনি যেন আমাদেরকে কোলকাতায় পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। কারণ, আসামে আমাদেরকে ঘিরে তখন নিরাপত্তা বেষ্টনী তৈরি করা হয়েছিল যে, আমাদের আর বুঝতে বাকি রইল না আমরা একরকম নজরবন্দি হয়ে আছি। আমাদের থাকা, খাওয়া, চলা-ফেরার কোনো স্বাধীনতাই ছিল না। ব্যাপারটা উপলব্ধি করে মহেন্দ্র মোহন চৌধুরী আমাদেরকে বিএসএফ-এর জিপে করে গৌহাটিতে পাঠান। সেখান থেকে এয়ার ইন্ডিয়ার একটি বিশেষ ফ্লাইটে আমাদের কোলকাতা পাঠিয়ে দেন।

যুদ্ধে যখন নেমেছি দেশকে শত্রুমুক্ত করেই তবে বাড়ি ফিরবো

কোলকাতায় আমাদের নিয়ে যাওয়া হয় মহাত্মা গান্ধী রোডের ইন্ডিয়া হোটেলে। সেই সময় ইন্ডিয়া হোটেলে খুলনার এমএনএ শেখ আব্দুল আজিজ, সাতক্ষীরার সৈয়দ কামাল বখত সাকী এমএনএ, নাটোরের আশরাফুল ইসলাম এমএনএ, বেগম বদরুন্নেসা আহমাদ এমএনএসহ আরো অনেকে অবস্থান করছিলেন। কয়েকদিন পরে সিলেটের দেওয়ান ফরিদ গাজী এমএনএও সেখানে পৌঁছেন। হোটেল থেকে প্রথমেই যাই



জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম পাকিস্তানের তৎকালীন সভাপতি মাওলানা শাহ আহমদ নূরানী একাত্তরে যিনি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ছিলেন। ১৯৯২-তে জাকার্তায় এক অনুষ্ঠানে তাঁর সঙ্গে মাওলানা জালালাবাদী

পার্ক-সার্কাস এলাকার ৯, সার্কাস এভিনিউস্থ নবঘোষিত বাংলাদেশ মিশন-এ। এ মিশনটি গঠিত হয়েছিল কোলকাতাস্থ পাকিস্তানি ডেপুটি হাই কমিশনার হিসেবে কর্মরত জনাব এম, হোসেন আলীর নের্তৃত্বে। তাঁর অধীনেই কোলকাতাস্থ পাকিস্তানি হাই কমিশনার-এর ৭০ জন বাঙালি কর্মচারী পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে নবঘটিত স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে। পরে আমি কোলকাতায় অবস্থানরত প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের নেতৃবৃন্দ সৈয়দ নজরুল ইসলাম, জনাব তাজউদ্দিন আহমদ, জনাব এম. মনসুর আলী, জনাব কামরুজ্জামান, জেনারেল এম. এ. জি. ওসমানী প্রমুখের সঙ্গে দেখা করি।

পাকিস্তানি খানসেনাদের ভয়াবহ আক্রমণে জর্জরিত হয়ে, সর্বস্ব হারিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থান থেকে এক কোটিরও অধিক মানুষ তখন প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতে আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য হয়। এমতাবস্থায় পাকিস্তান সরকার বিশ্বব্যাপী প্রচারণা চালাচ্ছিল এই বলে যে, ভারতীয় দুর্বৃত্তরা তথাকথিত বাংলাদেশের নামে তাদের নিজস্ব লোকজন দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে গোলযোগ সৃষ্টি করছে। এর সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই। এসব প্রচারণা মোকাবেলা করার জন্যে অস্থায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দিন আহমদ আমাকে আফগানিস্তান, ইরান, ইরাক, সৌদি আরব, মিসর প্রভৃতি দেশে বাংলাদেশের সরকারের ভ্রাম্যমাণ বিশেষ দূত হিসেবে পাঠানোর কথা ভাবেন। কিন্তু আমার কোনো পাসপোর্ট না থাকায় পাসপোর্টের বিকল্প হিসেবে তাৎক্ষণিকভাবেই 'সার্টিফিকেট অব আইডেনটিটি' তৈরি করানোর দরকার হয়ে পড়ে। তাজউদ্দিন সাহেব আমার নামে 'সার্টিফিকেট অব আইডেনটিটি' ইস্যু করানোর জন্যে আমাকে বালিগঞ্জস্থ 'ভারতীয় মিনিস্ট্রি অব এক্সটারনাল এফেয়ার্স'এর মিস অরুন্ধতি ঘোষ-এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেন। আমি কথামতো মিস অরুন্ধতি ঘোষ-এর সঙ্গে যোগাযোগ করি। কিন্তু নানা পদ্ধতিগত জটিলতার কারণে আমার 'সার্টিফিকেট অব আইডেনটিটি' ইস্যু হতে দেরি হচ্ছিল। ইতিমধ্যে পাকিস্তানি প্রোপাগাণ্ডা

মোকাবেলার সুবিধার্থে এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রচার জোরদার করার উদ্দেশ্যে তাজউদ্দিন সাহেব নবগঠিত বাংলাদেশ সরকারের জন্যে একটি বেতার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেন। সেই অনুযায়ী মুক্তিযুদ্ধের দ্বিতীয় ফ্রন্ট হিসেবে 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র' প্রতিষ্ঠিত হয়। আমি তাজউদ্দিন সাহেবের কাছে জানতে চাইলাম, সরাসরি যুদ্ধফ্রন্টে গিয়ে লড়াই করব, না বেতার ফ্রন্টে লড়াই করব। তিনি আমাকে অনুরোধ করে বললেন, বেতারে ইসলামি অনুষ্ঠান করার জন্যে আপনিই বেশ যোগ্য লোক, আপনি এখানে থেকে ইসলামি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধাদের অনুপ্রাণিত করুন। তিনি আমাকে 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র'র ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের প্রস্তাব দিতেই আমি রাজি হয়ে যাই। ১৯৭১-এর ২৫ মে দ্বিতীয় পর্যায়ে ৫০ কিলোওয়াট শক্তিসম্পন্ন 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র' চালু করা হয়। প্রথম পর্যায়ে ২৬ মার্চ চট্টগ্রামের কালুরঘাট থেকে 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র' চালু করা হয়েছিল। কিন্তু খানসেনাদের আক্রমণে সেটার স্থায়িত্ব হয়েছিল মাত্র কয়েকদিন। 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে' আমার কাজ ছিল কেন্দ্রের অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত, তরজমা এবং ইসলাম ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পরিচালনা করা। কোলকাতা সরকারি আলিয়া মাদ্রাসার হেড মাওলানা ও বহু ইসলামী গ্রন্থের লেখক মাওলানা তাহের সাহেবের বিশেষ স্নেহধন্য শাগরিদ নোয়াখালীর লক্ষ্মীপুরের জয়পুর গ্রামের আদি বাসিন্দা মাওলানা আব্দুল বারী সাহেবও মুক্তিযুদ্ধের সময় আমাদের পক্ষে কাজ করেন। তিনি চব্বিশ পরগনা জেলার 'ভাঙ্গর হাই স্কুল'এর হেড মৌলভী হিসেবে তখন কর্মরত ছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ কোলকাতায় পৌঁছার পর প্রথম দিকে যে বাড়িতে থাকতেন সে বাড়িটি 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র' পরিচালনার জন্যে আমাদেরকে ছেড়ে দেন। একই বাড়িতে জনাব জিল্লুর রহমান, চট্টগ্রামের দৈনিক আজাদীর সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মদ খালেদ ও জনাব তাহেরউদ্দিন ঠাকুর থাকতেন। আমাদের স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের রেকর্ডিং স্টুডিও ছিল কোলকাতার ৫৭/৮, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড-এ। সার্কুলার রোডের এই বাড়িতে স্টুডিও বলতে যা বোঝায় তার কিছুই ছিল না। দোতলার একটি রুমে মেঝেতে বসে একটি সাধারণ টেপ রেকর্ডারে করে সব কিছু রেকর্ড করা হতো। অনুষ্ঠান রেকর্ডিং-এর জন্যে দেয়ালে চটের বস্তা লাগিয়ে রাখা হয়েছিল। কারণ সেখানে 'সাউন্ড প্রুফিং-এর কোনো ব্যবস্থা ছিল না। আমি থাকতাম বাংলাদেশ মিশনে কর্মরত নোয়াখালী লক্ষ্মীপুরের পালপাড়ার জনাব আব্দুর রবের ১৫, ম্যাকলিয়ড স্ট্রিট, মল্লিকবাজার পার্ক সার্কাস এলাকায়। এই বাড়িতে থেকেই ১৯১২-১৩ সালে ভারতীয় কংগ্রেসের সভাপতি মওলানা আবুল কালাম আজাদ তাঁর সম্পাদিত বিখ্যাত 'আল হেলাল' ও 'আল-বালাগ' পত্রিকা প্রকাশ করতেন। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে কাজ করতে করতে হঠাৎই আমি টাইফয়েড জ্বরে আক্রান্ত হয়ে যাই। তখন আমি আমার বন্ধু চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ কর্মী এবং বঙ্গবন্ধুর অত্যন্ত স্নেহভাজন জনাব মাওলানা নুরুল ইসলাম জিহাদী (মরহুম)কে অনুরোধ করি আমার পরিবর্তে কোরআন শরীফ তেলাওয়াতের জন্যে। তিনি আমার বিকল্প হিসেবে কয়েকদিন কাজ করেন। এরপর আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতে আমি সুস্থ হয়ে উঠলে আবার অনুষ্ঠানে ফিরে যাই। এর কিছুদিন পর আমার বন্ধু ঝিনাইদহ এলাকার অধিবাসী মাওলানা খায়রুল ইসলাম যশোরী (মরহুম)ও সেখানে গিয়ে উপস্থিত হন। তাঁকেও আমি

আমাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে নিয়ে আসি। এছাড়া আমাদের অনুষ্ঠানের 'ইসলামের দৃষ্টিতে' নামের কথিকা পাঠ করতেন সৈয়দ আলী আহসান। একবার আমার অনুপস্থিতির কারণে নোয়াখালীর জনাব মোহাম্মদ উল্লাহ সূরা ফাতিহা পাঠ করে কোনোরকমে অনুষ্ঠান শুরুর কাজ চালিয়ে গিয়েছিলেন। পবিত্র কোরআনের আলোকে কয়েকটি আলোচনা অনুষ্ঠানও প্রচারিত হয়েছিল। এসব অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আমরা দেশমাতৃকার প্রতি মানুষের দায়িত্ববোধ জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেছি। ইসলামের দৃষ্টিতে মুক্তিযুদ্ধকে আমরা তুলে এনেছি বারবার। এতে অনুপ্রাণিত হয়েছে হাজারো ধর্মপ্রাণ মুক্তিযোদ্ধা।

ভাইয়ে ভাইয়ে যুদ্ধ!

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন ভারতীয় মুসলমানরা আমাদের খুব একটা সুনজরে দেখতেন না। কলকাতার ধর্মতলায় ফুরফুরার পীর সাহেব জনাব মাওলানা আব্দুল হাই সিদ্দিকীর (মরহুম) খানকাতে যখনই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যেতাম তখনই তিনি আক্ষেপের সুরে আমাকে পরামর্শ দিতেন, আমরা বহু কষ্টে মুসলমানদের স্বার্থেই পাকিস্তান বানিয়েছি। আপনারা ভাইয়ে-ভাইয়ে ঝগড়া করে দেশটাকে ভাঙবেন না। 'সুলেহ' বা আলাপচারিতার মাধ্যমেই আপোষ মীমাংসা করে ফেলুন! তাঁর এই কথার জবাবে আমি তাঁকে বারবারই বলেছি, হজুর! এর জন্যে যাবতীয় দায়দায়িত্ব তো পাকিস্তানি সামরিক শাসকদের। আমরা তাদের জুলুমের শিকার, তাদের জুলুম থেকে বাঁচতেই আমাদের লড়াই করতে হচ্ছে। কোলকাতার এক বিহারি মুসলমান কাপড়ের দোকানদার তো আমাকে একবার বলেই ফেলল, তোমরা আগে মুসলমান ছিলে এখন বাঙালি হতে চাও? পাকিস্তানি সেনারা বাঙালি নিধন করছে, খুব ভালো কাজ করছে, আরো বেশি করে করুক এটা শুধু তার একারই মনোভাব ছিল না, ভারতীয় মুসলিম জনগোষ্ঠীর অধিকাংশই আমাদের সম্পর্কে এ ধরনের মনোভাব প্রকাশ করতেন। এমন কি অনেক হিন্দু ধর্মাবলম্বী এমন ধারণা করতেন যে, বাঙালি আর মুসলমান কখনো এক হতে



জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের কেন্দ্রীয় সেক্রেটারি জেনারেল এবং তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানি নেতা মুফতি মাহমুদ একাত্তরে আমাদের মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন করেছিলেন। তাঁর পুত্র পাকিস্তানের বিশিষ্ট রাজনীতিক মাওলানা ফজলুর রহমানের সঙ্গে মাওলানা জালালাবাদী

পারেন না। আমাকে পশ্চিমবঙ্গের অনেক হিন্দু ধর্মাবলম্বী বাঙালি বিভিন্ন সময়ে বলেছেন, দাদা, আপনি বাঙালিদের মতোই কথা বলেন, যদিও আপনি মুসলমান! তাদের কথাবার্তায় বিভিন্ন সময় আমি বিব্রতবোধও করেছি। কিন্তু তাদেরকে বুঝানোর চেষ্টা করেছি আমরা ইসলাম ধর্মের অনুসারী হলেও আমাদের মাতৃভাষা বাংলা। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন ভারতীয় আলেমদের সবচেয়ে বড় সংগঠন 'জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ' এবং এর নেতৃবৃন্দ বাংলাদেশ সৃষ্টির পক্ষে ছিলেন। যেসব বরেণ্য ভারতীয় মুসলিম ব্যক্তিত্ব বাংলাদেশ সৃষ্টির পক্ষে কাজ করেছিলেন তাদের মধ্যে কয়েকজন হলেন– শায়খুল ইসলাম মাওলানা সাইয়্যেদ হোসাইন আহমদ মাদানী (রহঃ)-এর পুত্র ভারতীয় লোকসভার সদস্য মাওলানা সাইয়্যেদ আসআদ মাদানী, কোলকাতা আলিয়া মাদ্রাসার হেড মাওলানা মাওলানা মুহাম্মদ তাহের, করিমগঞ্জের এম. পি. মাওলানা আব্দুল জলিল, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে যে আজাদি হিন্দ ফৌজ গঠন করেছিলেন তার প্রধান সেনাপতি কর্নেল শাহ নেওয়াজ, জনাব ফখরুদ্দিন আলী আহমদ, জনাব মইনুল হক চৌধুরী প্রমুখ। এরা প্রায় অধিকাংশই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন অথবা উত্তর প্রদেশের দেওবন্দ মাদ্রাসায় পড়ুয়া আলেম ছিলেন কিংবা ভারতীয় আলেমদের সংগঠন 'জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ'-এর সদস্য বা সমর্থক ছিলেন।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন আগস্টের এক সন্ধ্যায় আমরা কয়েকজন মাঠে বসে আলাপ আলোচনা করছিলাম। সেখানে ঐতিহাসিক রানী ভবানীর নাতি এবং নাটোরের এককালীন জমীদার ও নবনির্বাচিত জাতীয় পরিষদ সদস্য শ্রী শঙ্কর গোবিন্দ চৌধুরী আমাকে বলেন, 'মাওলানা সাহেব, আপনার জন্যেই আজ আমাদের এ দুর্গতি! আপনি আওয়ামী লীগের ৬ দফার পক্ষে বক্তৃতা-বিবৃতি দিয়ে ও দেশব্যাপী বই-পুস্তক প্রচার করে যদি ধর্মপ্রাণ বাঙালি মুসলমান জনগণকে আওয়ামী লীগের পক্ষে উদ্বুদ্ধ না করতেন তাহলে ১৯৭০-এর জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে পারতো না এবং আমরাও এরূপ ভোগান্তির শিকার হতাম না! কথাগুলো হয়তোবা তিনি মজা করার জন্য বলেছেন, কিন্তু এর প্রতিটি শব্দই বাস্তবসম্মত। কারণ আমাদের মুসলিম জনগণ খুবই ধর্মভীরু। তাদেরকে আমাদের সঠিক ধর্মীয় ব্যাখ্যা নিশ্চিতভাবে প্রভাবিত করেছিল।

বিজয় কেতনের শেষ দিনগুলো

ডিসেম্বর মাসের প্রথম থেকেই মুক্তিবাহিনীর আক্রমণে বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকা হানাদার খানসেনা মুক্ত হতে থাকে। পাকিস্তানি বাহিনী ঢাকার দিকে পালিয়ে আসতে শুরু করে। ৩ ডিসেম্বর শুক্রবার, বিকেল ৫টায় কোলকাতার গড়ের মাঠে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সেই বিশাল জনসভায় আমিও উপস্থিত ছিলাম। সূর্যাস্তের পূর্বক্ষণে মিসেস গান্ধী বক্তব্য দেয়া শুরু করেন। তিনি পাকিস্তানকে দোষারোপ করে অনেক কথাই বলেছিলেন। কিন্তু ঠিক তখনই পাকিস্তান ভারতকে আক্রমণ করেছে শুনে বক্তৃতা সমাপ্ত করে তাড়াতাড়ি দিল্লি রওনা হয়ে যান। মিটিং শেষে আমি আমার বাসায় ফিরে আসি। তখনই শুনতে পাই যে, ভারতের

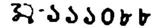


স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করছেন শব্দ-সৈনিক মাওলানা জালালাবাদী

রাষ্ট্রপতি ভি. ভি গিরী দেশে জরুরি অবস্থা জারি করেছেন। আকাশবাণী থেকে বারবার ঘোষণা চলতে থাকে যে, প্রধানমন্ত্রী শিগগির জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেবেন। রাত একটায় তিনি তার দেয়া ভাষণে বলেন, 'ভারতীয় ভূখণ্ড পাকিস্তানিদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। পাকিস্তান সেনাবাহিনী ভারতের পশ্চিম সীমান্তের অমৃতসর, পাঠানকোট, শ্রীনগর, যোধপুর, আম্বালাসহ বেশ ক'টি জায়গায় আক্রমণ চালিয়েছে। তিনি বলেন, আজকে বাংলাদেশের যুদ্ধ ভারতের যুদ্ধে পরিণত হয়েছে। এ যুদ্ধ আমার সরকার ও ভারতীয় জনগণের ওপর বিরাট দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছে। দেশকে যুদ্ধ মোকাবেলা করার জন্য তৈরি করা ছাড়া আর কোনো বিকল্প নেই। আমাদের জওয়ান ও অফিসারদের দেশের প্রতিরক্ষার জন্যে সীমান্তে পাঠানো হয়েছে। আমরা যে কোনো আক্রমণ প্রতিহত করতে প্রস্তুত।

৪ ডিসেম্বর শনিবার বাংলাদেশের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ এক পত্রের মাধ্যমে যৌথভাবে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দানের অনুরোধ জানান। এ প্রেক্ষিতে ৬ ডিসেম্বর সোমবার সকাল সাড়ে দশটায় লোকসভায় ইন্দিরা গান্ধী ঘোষণা করলেন, 'ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দান করছে।' ভারতের স্বীকৃতি প্রদানের ফলে আমাদের মনোবল অনেক বেড়ে যায়। দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে একে একে হানাদার বাহিনী পালাতে থাকে। ৬ ডিসেম্বর স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন। পরদিন তাজউদ্দিন আহমদও জাতির উদ্দেশে বক্তৃতায় দেশের প্রাথমিক করণীয় সম্পর্কে দিকনির্দেশনা দান করেন। ১৩ ডিসেম্বর জেনারেল ওসমানী সাহেবের সঙ্গে ৮ নং থিয়েটার রোডস্থ তাঁর সদর দফতরে আমি সাক্ষাৎ করলে তিনি আমাকে বলেন, আগামীকাল ১৪ ডিসেম্বর খুব সকালে আপনি চলে আসবেন। আমরা এক জায়গায় যাব। পরের দিন সকালে আসলে তিনি আমাকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর জিপে ওঠেন। জিপে উঠে আমাকে একটা বস্তু ধরিয়ে দিয়ে বললেন, এটা মহামূল্যবান বস্তু। আপনার সঙ্গে রাখুন। আমি তখনো বুঝতে পারিনি

এটা আসলে কোরআন শরীফ। পরে তার কথায় বুঝলাম, তিনি এটা সব সময় তাঁর সঙ্গে রাখতেন। জিপে আমাদের সঙ্গে ছিলেন বঙ্গবন্ধু তনয় ও ওসমানী সাহেবের তৎকালীন এ. ডি. সি. শেখ কামাল এবং পি. আই. এ-এর সিনিয়র ক্যাপ্টেন আব্দুল খালেক। জিপটি দমদম বিমানের রানওয়েতে গিয়ে থামল। তখনই বুঝলাম হয়েতো দূরবর্তী কোনো গন্তব্যের দিকে আমরা যাচ্ছি। আমি আবার ওসমানী সাহেব কোনো কথা বললে দ্বিরুক্তি না করেই তা পালন করতাম। তিনি যা করতেন ও যা বলতেন তা পালনই ছিল আমার মূল লক্ষ্য। এজন্যই আর জিজ্ঞেস করা হয়ে ওঠেনি আমাদের গন্তব্যের কথা। জানতে চাইনি কোথায় যাব। কেন যাব? ইত্যাদি কোনো কিছুই। জিপ থেকে আমার আর শেখ কামালের সুটকেস নামাচ্ছিলেন ক্যাপ্টেন খালেক। তা দেখে শেখ কামাল বলে ওঠেন, হায়, হায়, এসব করছেন কী? আপনি ৬০ হাজার টাকা বেতনের দেশের সেরা পাইলট, আমাদের গুরুজন। এই বলে কামাল তাড়াতাড়ি নিজ হাতে তার সুটকেস তুলে নেন। সঙ্গে সঙ্গে আমিও খালেক সাহেবের হাত থেকে আমার সুটকেসটি নিয়ে নেই। বিমান চলাচলের প্রাথমিক যুগের সেকেলে একখানি 'ডকোটা' বিমান ভারত সরকার ওসমানী সাহেবকে ব্যবহার করতে দিয়েছিলেন। ক্যাপ্টেন খালেকই সেই বিমানের চিফ পাইলট ছিলেন। ক্যাপ্টেন আলমগীর ছাত্তারসহ আরও কয়েকজন ছিলেন তার সহযোগী। এই বিমানে করেই ওসমানী সাহেব আমাদের নিয়ে রণাঙ্গন পরিদর্শনে যান। প্রথমে আমরা বাগডোগরায় যাই। সেখানে অবতরণ করে ওসমানী সাহেব মুক্তিযোদ্ধাদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেন। সেখান থেকে রওনা দিয়ে আমরা পশ্চিম দিনাজপুরের বালুরঘাট বিমানবন্দরে পৌঁছি। সেখানে নবনির্বাচিত এমএনএ জননেতা আব্দুর রহিম আমাদেরকে অভ্যর্থনা জানান। একই স্থানে ওসমানী সাহেব 'বেঙ্গল রেজিমেন্ট'-এর মুক্তিযোদ্ধা সমাবেশে বক্তব্য রাখেন। এরপর ওখান থেকে রওনা দিয়ে রাতে গৌহাটিতে পৌঁছি। কোলকাতা থেকে আসার সময় বিমানে আমাদের সঙ্গী হিসেবে ন্যাপ নেতা শ্রী সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত, জনাব মোস্তফা আল্লামা, ভারতীয় বিমানবাহিনীর ব্রিগেডিয়ার উজ্জ্বল গুপ্ত প্রমুখও ছিলেন। শ্রী সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত গৌহাটিতে অবতরণের পর আমাকে তার বোনের বাড়িতে রাত্রি যাপনের জন্য আহ্বান জানালেন। তাদের কষ্ট হবে ভেবে প্রতিউত্তরে তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বোনের বাসায় যাওয়ার জন্য বিদায় দেই। ক্যাপ্টেন খালেক, আমি ও শেখ কামাল একটি মিলিটারি রেস্ট হাউজে রাত্রি যাপন করি। পরদিন ১৫ ডিসেম্বর সকালে বিমানে উঠে ওসমানী সাহেব আমাকে বললেন, তিনি গৌহাটি থেকে রওয়ানা হয়ে আগরতলা যাবেন এবং সেখানে থেকে আমাকে নিয়ে ১৬ ডিসেম্বর হেলিকপ্টারে করে সিলেটের শাহজালাল (রহঃ)-এর দরগাহ শরীফের সামনে অথবা 'নাইয়র পুল'স্থ তাঁর নিজ বাড়িতে নামবেন। আমি প্রতিউত্তরে ওসমানী সাহেবকে আমার ভয় ও আশঙ্কার কথা ব্যক্ত করে বলি, 'স্যার, খানসেনারা আপনাকে মেরে ফেলবে। তারা এখনো সিলেটে অবস্থান করছে। সেখানে প্রবেশ করাটা মোটেই ঝুঁকিমুক্ত হবে না। তারা হেলিকপ্টারকে গুলি করে ফেলতে পারে।' তিনি আমার কথায় কর্ণপাত না করেই সিলেটের অভ্যন্তরে ঢুকার ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ থাকেন। তিনি আরো জানান যে, পাকিস্তান বাহিনী ১৬ তারিখে



ম-১১১০৮৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

স্মারক নং মু, বি, ম/সা/সিলেট-৪ /প্রঃ-৩/৫৫/২০০২/১৮৩৩

তারিখ ১৫.১১.১৪১২ বাং
২৭.০২.২০০৬ ইং

সাময়িক সনদপত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, জনাব/বেগম মাওলানা শেখ উবায়দুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী পিতা/স্বামী মৌঃ মোঃ সাঈদ উল্লাহ গ্রাম/ওয়ার্ড টুকেরগাঁও ডাকঘর টুকের বাজার উপজেলা/থানা কোতয়ালী জেলা সিলেট একজন মুক্তিযোদ্ধা। সরকার মহান স্বাধীনতাযুদ্ধে তাঁর অবদান কৃতজ্ঞতার সাথে স্বীকার করছে। তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য প্রযোজ্য সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্য হবেন।

সচিব
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

প্রতিমন্ত্রী
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

মাওলানা জালালাবাদীর মুক্তিযুদ্ধের সার্টিফিকেট

ঢাকায় আত্মসমর্পণ করবে বলে তাঁর কাছে খবর রয়েছে। বঙ্গবীর জেনারেল উসমানীর এমন দৃঢ়তা দেখে এবং সিলেটে প্রবেশের ব্যাপারে বদ্ধ পরিকর দেখে আমি তাকে বিনীতভাবে বলি, তিনি যদি আমাকে 'কাছাড়' জেলার 'কুম্ভিগ্রাম' বিমানবন্দরে নামিয়ে দেন। তাহলে আমি করিমগঞ্জ হয়ে সিলেটে প্রবেশ করতে পারবো। ওসমানী সাহেব আমার অনুরোধে বিমান ঘুরিয়ে কাছাড়ের কুম্ভিগ্রাম বিমানবন্দরে আমাকে নামিয়ে দেন। এরপর ওসমানী সাহেব একই বিমানে করে আগরতলায় চলে যান। অপরদিকে কুম্ভিগ্রাম থেকে একটি সামরিক জিপে করে শিলচর হয়ে বিকালের দিকে আমি করিমগঞ্জে পৌঁছি। পরদিন ১৬ ডিসেম্বর বিমানবাহিনীর অফিসার সুলতান মাহমুদ-এর পরিচালনায় একটি হেলিকপ্টারে করে ওসমানী সাহেব আগরতলা থেকে সিলেটে ফেরার সময় হেলিকপ্টারের ওপর গুলি বর্ষিত হলে কপ্টারটি ভূপাতিত হয়। আর সেদিনই এলো আমাদের সেই স্মরণীয় ঐতিহাসিক মুহূর্ত। আমার মনে হয়, উদ্দেশ্যমূলকভাবেই ওসমানী সাহেবের কপ্টারে গুলি ছুঁড়া হয়েছিল, তিনি যেন রেসকোর্সে ময়দানের আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে যোগদান করতে না পারেন। যাই হোক সেদিনটি আমাদের জন্য পরম গৌরবের। বাঙালিদের মহা সৌভাগ্য যে, যে স্থান থেকে বঙ্গবন্দু ৭ মার্চ ভাষণ দিয়ে মুক্তির সংগ্রামের সূচনা করেছিলেন সেই স্থানেই খানসেনারা অত্যন্ত অপমানজনকভাবে ২৮৪ দিন পরে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়।

৭ মার্চই তো বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা করেছিলেন

অত্যন্ত বিতর্কিত একটি বিষয় চলে এলো কথায় কথায়। মাওলানা জালালাবাদী বলেন, ৭ মার্চই তো বঙ্গবন্ধু এক রকম স্বাধীনতার ঘোষণা করে গেছেন। ৭ মার্চের রেসকোর্স ময়দানের ঐতিহাসিক সমাবেশ আমার কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমেই শুরু হয়। ২৭ মার্চ ঢাকায় যখন আমি ছিলাম তখন লোকমুখে চট্টগ্রাম কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা শুনেছিলাম। আমার মনে হয়, চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ কর্মী আব্দুল হান্নান স্বেচ্ছায়ই সেদিন স্বাধীনতার ঘোষণা করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু ২৫ মার্চের রাতে স্বাধীনতার ঘোষণা করতে পেরেছিলেন কি-না তা নিয়ে কিছুটা অস্পষ্টতা রয়েছে আমার। ২৬ মার্চ আওয়ামী লীগ অফিসে যখন ছিলাম তখন পর্যন্ত আমাদের কাছে সেখানে এ রকম কোনো তথ্য পৌঁছেনি যে, বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা করেছেন। হয়তোবা ঘোষণা করতে পারেন নি বা পারলেও সেই মেসেজ চট্টগ্রাম পর্যন্ত পৌঁছেনি।

হায়, জামায়াতের মাওলানাকে হাসিনা ডেলিগেশনে পাঠালেন!

স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে যথার্থ মূল্যায়ন কি করা হয়েছে আপনাদের? এ প্রশ্ন করতেই থেমে গেল জনাব জালালাবাদীর দুই ঠোঁটের সঞ্চালন। বন্ধ হয়ে আসল সব বাকশক্তি। পরিবর্তিত এ অবয়ব দেখেই উত্তরটা পেয়ে গেছি আমরা। কিছুক্ষণ পরে বললেন, আমি মাত্র একটা উদাহরণ দিব আপনাদের। যে আওয়ামী লীগের হয়ে এত কিছু করলাম সেই আওয়ামী লীগের শেখ হাসিনার আমলে টেলিভিশনের ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির ভাষ্যকার হিসেবে পরিচিত জামায়াতে ইসলামীর মাওলানা আবুল কালাম আজাদকে সরকারের পক্ষ থেকে ১৩ বার ডেলিগেশনে পাঠানো হয়েছে, আমাকে একবারও নয়।

অথচ এই জামায়াতে ইসলামী ছিল আমাদের স্বাধীনতার পক্ষে প্রধান অন্তরায়। তারা পাকিস্তান রক্ষাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছিল। আব্দুল মালেকের নেতৃত্বে আলাদা মন্ত্রিসভা গঠন করেছিল। লুটপাট, নির্যাতন, অত্যাচার তো ছিলই।

এও কী সম্ভব?

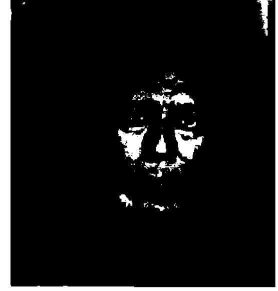
স্বজনপ্রীতি বা এলাকাপ্রীতি বলে একটা কথা আছে না? মাওলানা আবুল কালামের বাড়ি তো ফরিদপুরে! এসব নিয়ে অবশ্য এখন আর দুঃখবোধ নেই। কারণ বঙ্গবন্ধুর আমলে সুযোগ থাকা সত্ত্বেও কিছুই নেইনি। সত্যি কথা বলতে কী, ব্যক্তিগত প্রাপ্তির জন্যে স্বাধীনতা যুদ্ধে জড়াইনি বরং দেশকে শত্রুমুক্ত করাই ছিল আমাদের প্রধান লক্ষ্য। অবশ্য বঙ্গবন্ধু ধর্মীয় যে কোনো ব্যাপারে আমার পরামর্শ নিতেন এবং তাঁর অধিকাংশই কার্যকর করতেন। আমার পরামর্শেই বঙ্গবন্ধু ইসলামিক একাডেমি এবং বায়তুল মোকাররম সোসাইটিকে একীভূত করে বর্তমান ইসলামিক ফাউন্ডেশনে রূপান্তর করেন।

মাওলানা বলেই তালিকা থেকে নামটা বাদ পড়ে গেল!

মাওলানা অলিউর রহমান শহীদ বুদ্ধিজীবী। ১৪ ডিসেম্বর হানাদার বাহিনী তাদের এদেশীয় দোসরদের সহযোগিতায় অন্য বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে নৃশংসভাবে তাঁকেও হত্যা করে। অথচ সরকারিভাবে শহীদ বুদ্ধিজীবীদের তালিকায় তার নাম রাখা হয়নি। হয়তো মাওলানা বলেই! এসব ভেবে খুবই আফসোস হয়।

মাওলানা আবদুল্লাহ্ বিন সাঈদ জালালাবাদী

আসাদ গেট থেকে পল্লবী। দুপুর গড়িয়ে বিকেল। বিকেল পেরিয়ে সন্ধ্যা। এ এমন এক নেশা কিভাবে যে দিনটা চলে গেল বুঝাই গেল না। পল্লবীতে আরেক মুক্তিযোদ্ধার বাসায় যখন পৌঁছলাম তখন সময় হয়ে গেছে মাগরিবের নামাজের। হাতের কাছের মসজিদটাতে নামাজ সেরে ফিরলাম আসল গন্তব্যে। এরই ফাঁকে কথায় কথায় দু'জনেই দু'জনা থেকে জেনে নিতে চাইলাম এ আলেম মুক্তিযোদ্ধা সম্পর্কে। জনাব সাঈদ জালালাবাদী আল-আজহারী কর্মজীবনে সচিবালয় ও গণভবন সরকারি মসজিদের খতিব ছিলেন। এছাড়া ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন গবেষণা কাজ করেছেন। আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এ মুক্তিযোদ্ধা। আমাদের প্রাথমিক ধারণার ভাণ্ডার এখানেই ফুরিয়ে এলো। বাকিটা নিজের মুখ থেকে বের করানোর ইচ্ছে নিয়েই উঠলাম মাওলানা আল-আজহারির বাসায়।



নিজেকে চেনো!

পথে যেখানে গিয়ে থেমেছিলাম, সেখান থেকেই শুরু করার মতো করে জানতে চাইলাম নিজের সম্পর্কে। ধীরে ধীরে জীবনের বিভিন্ন পর্বের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে নিজেকে চেনানোর চেষ্টা করে গেলেন স্মৃতির পাতা আওড়ে যত দূর যাওয়া যায়। জানালেন। ছাত্রজীবন থেকেই তিনি লেখক ও সংগঠকরূপে সুপরিচিত। পূর্বপাক জমিয়তে তালাবায়ে আরাবিয়ার নির্বাহী সভাপতি ছিলেন। '৬২-'৬৩ সালের ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় আন্দোলনের সূচনা তাঁরই হাতে। '৭২ সালে জমিয়াতুল মুদার্‌রেসীনকে সংগঠিত করেন এবং এর সভাপতি হন। '৭২-এর সেই দিনগুলোর কথা মনে করে তিনি বলেন, সে সময় স্বাধীন বাংলাদেশে ধর্মীয় শিক্ষা বাঁচিয়ে রাখা খুবই জটিল হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় অনেক আলেম আমার হাত ধরে একটা কিছু করার অনুরোধ করেন। আমি মাদরাসার প্রিন্সিপালদের আহ্বান করে সমাবেশ ডাকলাম বায়তুল মোকাররমে। গঠন করলাম ইসলামী শিক্ষা সংস্কার সংস্থা। এরই ধারাবাহিকতায় জমিয়াতুল মুদার্‌রেসীনকে পুনর্গঠিত করলাম। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে মাদরাসা শিক্ষার অনুমোদন, অনুদান, অর্থের ব্যবস্থা করলাম। আমার হাত ধরেই রেডিও, টিভিতে আসল কোরআন তেলাওয়াত। ঘটনাটা ঘটেছে এভাবে– বঙ্গবন্ধুকে অনুরোধ জানালাম, বাংলাদেশ সিরাত মজলিস-এর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদানের জন্য। তিনি তা কবুল করলেন। অনুষ্ঠান শুরুর একদিন আগে আবার বঙ্গবন্ধুর কাছে গেলাম। বললাম, আপনি পাঞ্জাবি টুপি পরে অনুষ্ঠানে যাবেন। সেখানে কোরআন তেলাওয়াত হবে। প্রচার হবে তা সরাসরি রেডিও-টিভিতে। হঠাৎ করে কোরআন তেলাওয়াত শুনে দর্শক-শ্রোতা

অবাক হয়ে যাবে। বরং তার আগে একটা কাজ করুন। রেডিও-টিভিতে কোরআন তেলাওয়াত চালু করে দিন আজ থেকে। সবকিছু তখন স্বাভাবিক মনে হবে। সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গবন্ধু তথ্যমন্ত্রীকে ফোন করে দিয়ে দিলেন কোরআন তেলাওয়াত প্রচারের আদেশ। একইভাবে আরেকদিন বললাম, আরব বিশ্বে বাংলাদেশের পক্ষে জনমত তৈরির জন্য দরকার আরবি অনুষ্ঠান। রেডিওতে আরবি অনুষ্ঠান প্রচারের ব্যবস্থা করুন। সেই থেকে তাঁর আদেশে সংযোজন করা হলো আরবি অনুষ্ঠান।

৬ দফার পর

৬ দফা ঘোষণা করার পর কোথায় গেলেন, কি করলেন ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তরে মাওলানা জালালাবাদী বলেন, আমরা অনেক আগে থেকেই বুঝতে পেরেছিলাম যে, পাকিস্তান আসলে কোনো ইসলামী রাষ্ট্র নয়। আমি নিজ থেকে স্বভাবসুলভভাবে অনেক ভেবে-চিন্তে দেখলাম পাকিস্তান আমাদের কোনো উপকারেই আসবে না। না এতে ইসলাম রক্ষা হবে, না আমরা রক্ষা পাব। আমি অন্যদের প্রশ্ন করতে থাকি– পাকিস্তান থেকে আমরা কী সুবিধা পাই? আমরা কেন এটা রক্ষা করব? মাওলানা জাফর আহমদ ওসমানী, যিনি প্রথম ঢাকায় পাকিস্তানের পতাকা উড়ান, তিনি এবং মাওলানা শাব্বির আহমদ ওসমানীসহ প্রখ্যাত আলেমদের সঙ্গে জিন্নাহর ওয়াদা ছিল পাকিস্তান ইসলামী রাষ্ট্র হবে। তারা আমাদের সঙ্গে ওয়াদা ভঙ্গ করেছে, আমরা কেন সেই রাষ্ট্র রক্ষা করব? এসব জিজ্ঞাসার প্রতি-জিজ্ঞাসার মাঝে আমার ছোট ভাই মাওলানা উবায়দুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী আমারই শিক্ষক মাওলানা অলিউর রহমানকে প্রধান করে 'আওয়ামী ওলামা পার্টি' গঠন করে। আমি মাওলানা অলিউর রহমানের সঙ্গে দেখা করে আশ্বাস ও সাহস যোগিয়ে যাই এই বলে, আপনি এগিয়ে যান, আমি আপনাকে সাহায্য করে যাব পেছন থেকে। ৬ দফা যে ইসলামবিরোধী নয় এবং পাকিস্তানি শোষকের বিরুদ্ধে যে রুখে দাঁড়ানো ধর্মীয় দায়িত্ব তার প্রচারাভিযানে আমার ভাই ও মাওলানা অলিউর রহমানকে নানাভাবে সাহায্য করে যেতে থাকি। ভাইকে নিয়ে যথেষ্ট উৎকণ্ঠাও ছিল আমার। তাঁর খ্যাতি যত বাড়তে থাকল তাকে নিয়ে ঝুঁকিও তত বাড়তে থাকল। মওদুদীবিরোধী বক্তব্য-বিবৃতি এবং অন্যান্য কর্মকাণ্ডের জন্য বরাবরই আমরা দু'ভাই জামায়াতীদের চোখের বালি ছিলাম। ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে এক মঞ্চে উঠল ছোট ভাই। কোরআন তেলাওয়াত করল। ২৫ মার্চের সে কালো রাতে আওয়ামী লীগ অফিসে ছিল। আমি তখন সিলেটে। খবর শুনতে পাচ্ছি– সবকিছু জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দেয়া হচ্ছে ঢাকায়। আমার ভাইটি কি বেঁচে আছে? বেঁচে থাকলে আসতে পারবে কি বাড়িতে? আর বাড়িতে আসতে পারলে-ইবা কী? আপন ঠিকানায়ও যে কোনো কিছু নিরাপদ নয়!

আপনে এমন-ই পর

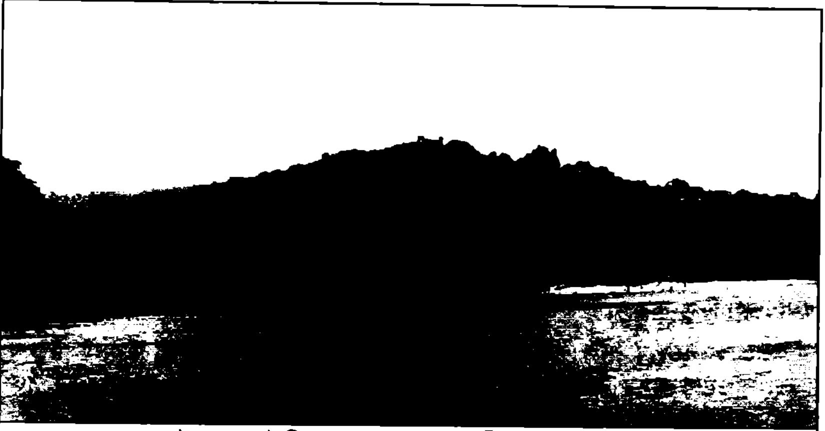
আমার অনুজ যখন ৪ এপ্রিল একাত্তরে সিলেটের টুকের গাঁওয়ে আমাদের গ্রামের বাড়িতে গিয়ে পৌঁছল, তখন আমাদের বাড়িতে ঈদের খুশি। চারদিক থেকে লোকজন এসে জমায়েত হয়েছিল আমাদের বাড়িতে। সবাই প্রত্যক্ষদর্শীর মুখ থেকে ঢাকার অবস্থা শুনতে চায়। কারণ, ঢাকার রেডিও পাকিস্তান দেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে কোনো

খবরই প্রচার করছিল না। ভারতের আকাশবাণী সেই পঁয়ষট্টির যুদ্ধকাল থেকেই বৈরী বলে পরিচিত। বি. বি. সি. রেডিও অস্ট্রেলিয়া এবং ভয়েস অব আমেরিকা একটা ভয়াবহ হত্যাযজ্ঞের খবর দিয়ে যাচ্ছিল। গ্রাম বাংলার মানুষ তখনো ঠাহর করে উঠতে পারছিল না যে রাজধানী শহরে কী একটা ভয়াবহ কাণ্ড ঘটে গেছে। যোগাযোগ ব্যবস্থাও প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল, তাই চট করে কেউ দেশের বাড়িতে গিয়ে ঢাকার সঠিক সংবাদ পরিবেশন করবে, তারও কোনো সম্ভাবনাই ছিল না। এমতাবস্থায় একেবারে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় অফিসে গোলাবারুদের মুখে বসবাসকারী একজন প্রত্যক্ষদর্শী পেয়ে দেশবাসী পরম আগ্রহভরে তার কাছ থেকে প্রকৃত বিবরণ শুনবার জন্যে এসে ভিড় করল।

এর আগের ঈদে (ঈদুল ফেতরে) অনুজটি যখন বাড়ি গিয়েছিল, তখনই ঈদের খাওয়া-দাওয়ার সময় একই দস্তরখানে বসে যখন আমরা আমাদের অশীতিপর বৃদ্ধ বাবার সঙ্গে নানারূপ পারিবারিক কথাবার্তা বলছিলাম, তখন বাবার সামনেই আমি তাকে লক্ষ্য করে বলেছিলাম, নির্বাচন শেষ হয়েছে, আওয়ামী লীগ তথা বাঙালি জাতীয়তাবাদ জিতে গেছে, ব্যস, এবার তুমি রণে ক্ষান্ত দাও! আওয়ামী লীগ অফিসে আর বাস করার প্রয়োজন নেই। ওখানে থাকা নিরাপদও নয়। ভোটে জিতলেই যে পার্টি ক্ষমতায় যাবে, তারও কোনোই নিশ্চয়তা নেই। এমনও তো হতে পারে যে, সব ক'টি এমএনএকে জেলে পুরে পার্টিকে একেবারে গুঁড়িয়ে দেয়া হবে। দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট লোকজনকে জেলে পুরে দেয়া হবে। অযথা এত বড় একটা ঝুঁকির মধ্যে বসবাস করে লাভ কি? আব্বাও সেদিন আমার কথায় সায় দিয়েছিলেন। আর আব্বার সঙ্গে এটাই ছিল আমার অনুজ মওলানা জালালাবাদীর শেষ ঈদ। সে বাড়িতে ফিরে বলেছিল, সীমান্তের কাছ দিয়েই সে সিলেট গিয়েছে। সঙ্গীসাথীরা সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ওপারে আগরতলায় চলে গিয়েছে। আমি কেবল আব্বার সঙ্গে শেষ দেখাটা করে যাওয়ার জন্যে বাড়িতে এসেছি। কি জানি, পরিস্থিতি শেষ পর্যন্ত কী পর্যন্ত গড়ায়। কি জানি বাড়িতে ফিরে আর বাবাকে দেখা হয়ে উঠবে কি-না। সত্যি সত্যি এটাই ছিল আব্বার সঙ্গে তার অন্তিম সাক্ষাৎ। আমাদের দু'ভাইয়ের দুটি ভবিষ্যদ্বাণী আর আশঙ্কা যে এমনি অক্ষরে অক্ষরে ফলে যাবে, তা কল্পনাও করিনি।

ঠাঁই নেই ঠাঁই নেই !

কিন্তু আমাদের সে আনন্দ ছিল খুবই ক্ষণস্থায়ী। আমাদের বাড়িতে লোকজনের ভিড় আমার জন্যে দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াল। আশেপাশের প্রতিবেশীদের পক্ষ থেকেই আমার ভাইটির তথা গোটা পরিবারের সমূহ বিপদ ঘটার আশঙ্কা ছিল। চাচা মওলানা আবদুর রশীদ ছিলেন সেই উনিশ শ' পঁয়তাল্লিশ থেকে পঁয়ষট্টি পর্যন্ত দীর্ঘ কুড়ি বছরকাল সিলেট জেলা মুসলিম লীগের সভাপতি। তিনি ছিলেন আসলে উত্তর সিলেট তথা সদর সিলেট মহকুমা মুসলিম লীগের সভাপতি। গোটা ভারতবর্ষের মধ্যে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ এই একটি মহকুমাকে দিয়েছিল জেলার মর্যাদা। কারণ, গণভোট সংগ্রামের রণক্ষেত্র ছিল তৎকালীন আসাম প্রদেশের এ সিলেট জেলা। আর সিলেট জেলার সদর দফতর হিসেবে সদর সিলেট বা উত্তর সিলেট মুসলিম লীগের গুরুত্ব ছিল অত্যধিক। তাই আমাদের আত্মীয়-স্বজন পাড়া-প্রতিবেশীদেরকে মুসলিম লীগের হয়ে


ওপারে পাহাড়ের উপরে ডাউকি শহর। জালালাবাদী ভ্রাতৃদ্বয় একাত্তরে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে এ শহরে গিয়ে উঠেছিলেন

এত ত্যাগ স্বীকার ও সংগ্রাম করতে হয়েছে যে, পাকিস্তান এদের রক্তে-মাংসে এমনভাবে মিশে গিয়েছিল যে, এর বিরুদ্ধে কোনো কথা কেউ শুনতে বা মেনে নিতে কখনো রাজি ছিলেন না। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কোনো কথা বলাটাই আমাদের এলাকায় ছিল দেশদ্রোহী জাতিদ্রোহীদের ষড়যন্ত্র- মহাপাপের শামিল। আমারই ভাইটি আওয়ামীলীগ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে মিলে পাকিস্তানবিরোধী যড়যন্ত্রে লিপ্ত একথা তারা কোনো মতেই মেনে নিতে পারছিল না। এমনকি জামায়াতে ইসলামী ও মওদুদীবিরোধী ফতোয়া বা বিবৃতি কেন জালালাবাদীর নামে পত্রপত্রিকায় প্রচারিত হয়, তাও ছিল জামায়াতপন্থি আত্মীয়-স্বজন ও পাড়াপড়শীদের একটা বিরাট প্রশ্ন। এমনকি সামাজিকভাবে পঞ্চায়েত বসেও এ সম্পর্কে তারা কয়েক বার শলাপরামর্শ করেছে। কিন্তু তখন দেশের বাড়িতে আমার উপস্থিতির দরুন কেউ এ নিয়ে বেশি সুবিধা করে উঠতে পারেনি। কিন্তু তখন ছিল এক পরিস্থিতি আর এখন অন্যরূপ। কেউ পার্শ্ববর্তী আখালিয়ায় অবস্থিত মিলিটারি ক্যাম্পে খবর পৌঁছিয়ে দিলেই কয়েক মিনিটের মধ্যেই মিলিটারি জিপ আমাদের বাড়িতে এসে পৌঁছবে। কারো কোনো যুক্তিতর্ক উত্থাপনের অবকাশও থাকবে না। তাই পরিস্থিতি ছিল অত্যন্ত নাজুক। রাতের বেলা ভাইকে কোথায় শুইতে দেই এটাই দুর্ভাবনার কারণ হয়ে দাঁড়াল। চারদিকে খবর রটে গেছে, জালালাবাদী বাড়ি এসে পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালিয়ে গোটা দেশবাসীকে ক্ষেপিয়ে তুলছে। এমতাবস্থায় বাড়িতে শোয়া মোটেও নিরাপদ ছিল না। মধ্যরাতের পর তাকে গ্রামের মসজিদেই বিছানা দেয়া হলো। ফজরের আগে ঘরে ফিরে নাশতা করে ভাইটিকে নিয়ে চললাম দুই মাইল দূরবর্তী চাতাল গ্রামে অবস্থিত নানাবাড়িতে। আব্বাকে বললাম, ওকে বাড়িতে এমনকি পাকিস্তান সীমানার মধ্যে রাখা আদৌ নিরাপদ নয়। যে করেই হোক, দেশের সীমা পার করে ওপারে পৌঁছিয়ে দিতে হবে। কিন্তু আমাদের ওখান থেকে ওপার বলতে তো ডাউকী-খাসিয়া পাহাড়। একান্তই অপরিচিত বন্য পাহাড়ি পরিবেশ। পরিচিত একটা মুখও সেখানে পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। অথচ

ভাইটির বয়স তখনো পঁচিশও হয়নি। দেশব্যাপী তার ডাকনাম ও পরিচিতি থাকলেও আমার কাছে তো সেই ছোট ভাইটিই। আব্বার কাছে মামার কাছে সে তাঁদের আদুরে খোকা। আব্বা পরিস্থিতি সম্পর্কে খুবই সচেতন ছিলেন, তাই তাকে পার করে দিয়ে আসার সময় অনুমতি পেতে বেগ পেতে হলো না। কিন্তু মামা কোনোমতেই এ অপরিচিত পাহাড়-জঙ্গলের দেশে তার কচি দুটি ভাগ্নেকে একা যেতে দেবেন না। ঘটনাচক্রে আমাদের সীমান্ত এলাকা মানে খাসিয়া জৈন্তা পাহাড়ের পাদদেশের এলাকাটা ছিল তাঁর জানাশোনা এবং তার বেশ কিছু পরিচিত লোকজন সেখানে রয়েছেন বিধায় আমাদেরকে অন্তত দেশের সীমানা পার করে দিয়ে আসাটাকে তিনি নিজের নৈতিক দায়িত্ব বলে মনে করলেন। অথচ তখন বর্ষাকালও ছিল না যে নৌকায় করে পথ চলা যাবে, আবার উত্তরের পাহাড়ের দিকে এগুতে হলে রীতিমত কোনো স্থলপথ বা যানবাহনও নেই। এপ্রিল মাস। মাথার ওপর বেশ কড়া রোদ। নিচে চষা মাটি। মাঝে মাঝে প্রবহমান পাহাড়ি ঝরনা।

অনিশ্চয়তার পথে!

সেই চষা মাটি ভেঙে প্রায় ত্রিশ মাইল পথ পায়ে হেঁটে সত্তরোর্ধ্ব একজন বৃদ্ধ আপন ভাগ্নেদেরকে নিয়ে অনিশ্চয়তার পথে এগিয়ে চললেন। পাঁচ এপ্রিল ভোরে সিলেটের খাদিম নগর ইউনিয়নস্থ চাতল গ্রাম থেকে রওয়ানা করে সারাদিনে আমরা গোয়াইনঘাট থানার নিকটবর্তী নগর গ্রামে গিয়ে পৌছলাম। মামার সঙ্গে এক আত্মীয় তরীকুল্লাহর বাড়িতে গিয়ে যখন উঠলাম তখন রাত হয়ে এসেছে। সারাদিন চষা মাটির ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এতই ক্লান্ত হয়েছিলাম যে খুব সহজেই ঘুম পেয়ে বসল। তারপর সকালে জেগেই আবার নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে আমরা পাহাড়ের ঢালুপথ অতিক্রম করতে করতে রাধাগঞ্জ চা বাগানের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চললাম। ছয়-সাত মাইল পথ হাঁটতে পারলেই ডাউকী সীমান্ত। ডাউকীর পাহাড়ি নদীর এপারে পূর্ব পাকিস্তান, ওপারে ভারত। পূর্ব পাকিস্তানে জীবন অনিশ্চিত কিন্তু ওখানে আশ্রয়ের আশা আছে। প্রায় একটায় গিয়ে আমরা ডাউকীতে পৌছলাম। সীমান্তরক্ষী জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাবেন, বি,এস,এফ দফতরে, নাকি থানায় ? বি,এস,এফের সঙ্গে আগে কোনো পরিচয়ই ছিল না। আসলে ওটা হলো ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী– আমাদের বর্তমানের বি.ডি.আর এর মতো। নতুন বস্তুর প্রতি কৌতূহলের বশে আমি বলে বসলাম, বি.এস.এফে যাব। একজন নিয়ে গিয়ে পাহাড়ের ওপর বি.এস.এফের অধিনায়ক কানপুরের জনৈক হিন্দু কর্নেলের কাছে উপস্থিত করল। পাঞ্জাবী-সেলোয়ার পরা শ্মশ্রুমণ্ডিত ধর্মীয় চেহারার তিনজন মুসলমান আগন্তুককে দেখে ওদের সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণও ছিল। তাই আমার পকেটস্থ মোটা প্রেসিডেন্ট কলমটা পর্যন্ত তিনি আমারই হাতে খুলিয়ে তন্ন তন্ন করে দেখলেন। আমি বললাম, না ওতে কোনো অস্ত্র বা যন্ত্র নেই, নিছক একটা মোটা কলম। আমার এ ব্যঙ্গাত্মক কথায় কর্নেল কিছুটা সঙ্কোচিত হলেন। বললেন, ওটা আমাদের পেশাগত দায়িত্ব, কিছু মনে করবেন না যেন। নদীয়া শান্তিপুরের সুখশ্রাব্য বাংলার মতো কানপুর লক্ষ্ণৌর মিষ্টি উর্দু শুনতেই মনটায় শান্তির পরশ পেলাম। কিছুটা

আশ্বস্ত বোধও করলাম। যাক, একটা ভদ্রলোকের কাছে আসা গেছে। জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় থাকবেন, আমাদের এখানে, না থানায়? মুখে বললাম, আমরা তো এখন আপনাদের ঘরে অতিথি, যেখানে রাখবেন, সেখানেই থাকতে হবে। কিন্তু মনে মনে ভাবছিলাম, যদি পাহাড়ের ঢালুতে ওই নিচের মসজিদে থাকতে পারতাম, তাহলে নিজস্ব পরিবেশে যেমন থাকা যেত, তেমনি দু' একজন মুসলমানেরও হয়তো দেখা পাওয়া যেত। কিন্তু কথাটা মুখে বলতে চাইলাম না। বললেন, 'বেশ, আমাদের সৈন্যদের সঙ্গে আমাদের ক্যাম্পেই থাকুন না!' বললাম, স্পষ্ট বলুন, এখন আমরা স্বাধীন মেহমান, না আপনাদের হাতে বন্দি? বললেন, বন্দি হবেন কেন? আপনারা স্বাধীন। বললাম, ধর্মকর্মের ব্যাপারেও আমরা স্বাধীন তো? বললেন, অবশ্যই। বললাম, কিন্তু আমাদের ধর্মে যে পাহাড়ে-জঙ্গলে বা প্রান্তরে– বিয়াবানে নামাজ পড়তে হলে আজান দেয়ার বিধান রয়েছে! ফজরের সময় যখন আমরা আল্লাহু আকবার বলে আজানের উচ্চরব তুলব তখন রাম রাম করে আপনাদের জওয়ানরা যবন মারবার জন্যে ধেয়ে আসবে না তো? কানপুরের কর্নেল। তাই মুসলমানদের আজানধ্বনি তাঁর কাছে অপরিচিত নয়। তিনি একটু চিন্তিতই হয়ে পড়লেন। পরক্ষণেই বললেন, ওই তো পাশে মসজিদ সেখানে গিয়ে আপনারা নামাজ পড়ে আসবেন।

মসজিদে আজান ধ্বনি!

আমরা পাহাড়ে ওঠা-নামায় আদৌ অভ্যস্ত নই, ওই একবারই উঠেছি। বিশেষ করে আমরা এখন খুবই ক্লান্ত। ছাত্রজীবনে বিএ না পড়ে আমি উর্দু ডিপ্লোমা ও উচ্চতর ডিপ্লোমা পড়েছিলাম, তাই কর্নেল আমার সঙ্গে আলাপ করে নিজেও অনেকটা আপন বোধ করেছিলেন। তিনি আমার বক্তব্যের সারবত্তা মেনে নিলেন এবং আমার মনোভাব আঁচ করতে পেরে মসজিদেই আমাদের থাকার ব্যাপারে মত দিলেন। আমি বললাম, খাওয়া-দাওয়া পাকশাকের ব্যাপারেও আমাদের নিজস্ব একটা নিয়মনীতি আছে বিধায় আমরা নিজ হাতে পাকশাক্ করে খাওয়াই পছন্দ করব। তাই আমাদের প্রয়োজনীয় কম্বল এবং ডাল-চাল ওখানেই পাঠিয়ে দেবেন, আমরা আমাদের মতো করে খাওয়া-দাওয়া কর। কর্নেল আমাদেরকে থানার হাতেই তুলে দিলেন। কারণ মসজিদটা থানার পাশেই এবং থানার ওসি ছিলেন সিলেট থেকে যাওয়া একজন বাঙালি হিন্দু। আমাদেরই সিলেটের গোবিন্দগঞ্জ এলাকার দুলারবাজার থেকে ওরা গিয়েছিলেন দেশ বিভাগের সময়। থানায় এসে যখন দেখলাম, থানার ওসি আমারই বয়সি একজন ভদ্রলোক, তখন আমরা অনেকটা আশ্বস্ত হলাম। হাজার হোক, একজন স্বদেশী লোক। তিনি অনেকটা আপনজনের মতোই করে বললেন, কিছু মনে করবেন না যেন, এখানকার খাসিয়ারা ভীষণ মাদকাসক্ত। মসজিদের বাইরের খোলা জায়গাটায় ওরা মদপান ও হট্টগোল করে অনেক রাত পর্যন্ত। আপনারা ভালো করে দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়বেন এবং কেউ ডাকাডাকি করলেও দরজা খুলবেন না। আমি পুলিশ প্রহরা রাখব, যাতে আপনাদের কোনো অসুবিধে না হয়।

ডাউকীর মসজিদটি বহুকাল ধরে নামাজীশূন্য। সেই সাতচল্লিশের আগে, যখন ভারত-পাকিস্তান এক রাষ্ট্র ছিল, তখন নির্মিত হয়েছিল মসজিদটি। তারপর দেশ ভাগ এবং সাম্প্রদায়িক তিক্ততার পর থেকে ওখানে কোনো মুসলমান আর থাকে না।

সেখানকার বাসিন্দা আলীর মুখ থেকেই শুনলাম, দেশ ভাগের সঙ্গে সঙ্গে বেশ ক'টি হিন্দু পরিবার গিয়ে উদ্বাস্তু হয়ে ওঠে মসজিদটিতে। আল্লাহর কী মর্জি, ওদের মধ্যে ওলাউঠা দেখা দেয়। বেশ ক'জন মারাও যায়। তারপর ওই হিন্দুরা মনে করল, আল্লাহর ঘরের অবমাননার জন্যেই আল্লাহর শাস্তি তাদের ওপর নেমে এসেছে। তারপর তারাই অনেক খোঁজাখুঁজি করে আলীকে কোত্থেকে ধরে নিয়ে আসে এবং তাকেই মসজিদের সেবায় নিয়োজিত করে নিজেরা বিপদমুক্ত থাকতে প্রয়াসী হয়। সেই থেকে আলী ওখানে ওদের সঙ্গে মিলেমিশেই আছে। তার মুখ থেকেই শুনলাম, একবার ওখান থেকে সত্তর মাইল দূরে পাহাড়ি এলাকায় এক মুসলমান মারা যায়। অন্য কোনো মুসলমানই ছিল না সেখানে। তারপর আলীকে লোকে এ খবর দিলে সে নিজ খরচে ওই সত্তর মাইল পথ অতিক্রম করে নিজে গিয়ে সেই মুসলমান লাশটি দাফন করে আসে।

পরের দিন সকালেই ওসির সঙ্গে দেখা করতে গেলাম ডাউকী থানা হেড কোয়ার্টারে। পাহাড়ের গা ঘেঁষে একটা পাকা ঘর। যতদূর মনে পড়ে টালির ছাদ। পাশেই ওসির কোয়ার্টার। ওদিকে রাতে এক কাণ্ড। খাসিয়া নাকি মণিপুরী-উপজাতীয় একজন পুলিশকে দেয়া হয়েছে মসজিদ প্রহরার জন্য। সে ভাঙা ভাঙা বাংলায় আমাকে আমার পরিচয় ও আগমনের উদ্দেশ্য জিজ্ঞেস করল। আমিও অনেকটা ওর মতো করে বললাম, আমাদের দেশে হত্যাযজ্ঞ চলছে, আমরা তাই তাদের দেশে চলে এসেছি, আশ্রয়ের খোঁজে। আমরা যাব শিলং, তারপর কোলকাতা, দিল্লি বা অন্য কোথাও। সে প্রতিবাদ করে ইশারায় বলল, আমাদের মতো যত দাড়িওয়ালা মুসলমান, তারা সর্বদা ভারত থেকে পাকিস্তানে যায়। আর ওর নিজের মুখের দিকে দেখিয়ে বলল, ওর মতো যত ক্লিন শেভড্ হিন্দু, তারা যায় পাকিস্তান থেকে ভারতে। এখন তার উল্টো হতে যাবে কেন? নিশ্চয়ই আমাদের অন্য কোনো মতলব আছে। আমরা তা গোপন করলেও সে তা ধরে ফেলেছে। আমি বললাম, তোমার তাতে কাজ কি বাপু, তুমি যে ডিউটিতে এসেছ, তাই করো, আমাদের ব্যাপার বুঝবেন ওসি সাহেব ও আরও বড় সাহেবরা। সে একটা অশ্রাব্য কথা বলে তাতে চরম বিরক্তি প্রকাশ করল, আমরা যে তাকে উপেক্ষা করছি বা সঠিক কথা বলছি না, তা মনে করে সেও আলাপে ক্ষান্ত দিয়ে নিজে বন্দুক নিয়ে ডিউটিতে দাঁড়িয়ে রইল

সারা দিনের ক্লান্ত আমরা, এশার নামাজ পড়েই খাওয়া-দাওয়া করে ন'টার দিকেই শুয়ে পড়লাম। একনাগাড়ে ফজর পর্যন্ত ঘুমিয়ে যখন ঘুম থেকে উঠলাম তখন গোটা ডাউকী আর খাসিয়া জৈন্তা পাহাড় অঘোরে ঘুমুচ্ছে। আগের দিনই আসরের আজানের সময় লক্ষ করেছিলাম, আজানের অশ্রুতপূর্ব ধ্বনি শুনে আশপাশের অনেক খাসিয়া নারী পুরুষ এসে মসজিদের পাশে জমায়েত হয়েছিল। পরম ঔৎসুক্য ভরে তারা আমাদের দিকে তাকাচ্ছিল। যেন অন্য কোনো গ্রহের জীব এসে পড়েছে তাদের পাহাড়ি এলাকায়।

থানার ওসি বাবু সাদর অভ্যর্থনা জানালেন আমাদেরকে দেখে। অনেকদিন পর দেশী প্রতিবেশীকে কাছে পেয়ে তিনি নিজেও সুখী মনে হলো। চা-বিস্কুটে তিনি আমাদেরকে আপ্যায়িত করলেন। ওসি আমাদের পরবর্তী ইচ্ছে বা গন্তব্যস্থল কি জিজ্ঞেস করলেন। আমরা বললাম, আমরা শিলং-এ গিয়ে উর্ধ্বতন সরকারি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলাপ করতে চাই। তারপর যাব দিল্লিতে। ঢাকার সামরিক হত্যাযজ্ঞ সম্পর্কে আমরা বিশ্ববাসীকে অবহিত করতে চাই। ওসি বললেন, আমি ওপরে জানাচ্ছি। কোনো সরকারি নির্দেশ না আসা পর্যন্ত আপনাদেরকে এখানেই দু'একদিন অপেক্ষা করতে হবে।

মুখ্যমন্ত্রীকে ফোন

দেখতে দেখতে দু'টি দিন চলে যাচ্ছে। কিন্তু ওপরের কোনো নির্দেশ এসে পৌছেছে বলে মনে হলো না। তবে ভারতের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার লোকজন এসে কয়েকবারই আমাদের সাক্ষাৎকার নিলেন।

ততক্ষণে আরেকটা কাণ্ড ঘটে গেছে। বাজারের পথ অতিক্রম করতে গিয়ে সামনেই পড়ল পোস্ট অফিস ও টেলিগ্রাম অফিস। শিলং-এ সরাসরি ডায়ালিং বা কল করার ব্যবস্থাও আছে। আমি সরাসরি মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রীর বাসায় টেলিফোন করলাম। তার উপজাতীয় স্ত্রী কী যে বললেন, বুঝতে পারছিলাম না। পরে আমি যখন ইংরেজিতে আমাদের পরিচয় দিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে চাই বললাম, তখন মহিলাটিও ইংরেজিতে জানালেন, চিফ মিনিস্টার ইজ আউট নাও। সম্ভবত গোয়েন্দা সংস্থার লোক কাছেই ছিল। গোটা ডাউকীতে কথাটি জানাজানি হয়ে গেল যে, দু'তিনজন মৌলভী গোছের আগন্তুক দু'দিন আগে ডাউকীতে এসে উঠেছে। এরা সাংঘাতিক লোক। মুখ্যমন্ত্রীকে পর্যন্ত তারা টেলিফোন করে। ফলে গোয়েন্দা তৎপরতা আরো বৃদ্ধি পেল। ওসি এবং গোয়েন্দা বিভাগের লোকজন জানাল যে চিফ মিনিস্টারকে কল করে তো আমরা ওদের চাকরি খাওয়ার ব্যবস্থা করে বসেছিলাম। আমরা বললাম, আমাদের যে গরজ অনেক বেশি। আপনারা আমাদেরকে ডাউকীতে আটকে রেখে তো আমাদের মিশনই মাটি করে দিচ্ছেন। আমাদের ঘরবাড়ি পুড়ছে, আত্মীয়স্বজন মরছে অথচ আমরা এখানে আরামে ঘুমোব, এটা কী করে সম্ভব? বিশ্ববাসীকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তা অবগত করতে হবে এবং তার একটা বিহিত করতে হবে। তৃতীয় দিনে ওপর থেকে মানে শিলং থেকে অর্ডার এসেছে আমাদেরকে পাঠিয়ে দিতে। কিন্তু আপনি আমাদেরকে পাঠাবেন কি করে? আমিও ওসিকে জিজ্ঞেস করলাম। বললেন, কেন, বাই রুট মানে বাসে করে পাঠিয়ে দেব! আমি বললাম, তা হবে না। ওভাবে আমরা যেতে রাজি নই। আমাদেরকে বিশেষ কারে বা জিপে পাঠাতে পারেন, নতুবা আমরা দেশে ফিরে যাব। বললেন, কেন? তাতে আপনাদের অসুবিধে কি? বললাম, একেতো মর্যাদার প্রশ্ন। সাধারণ যাত্রীদের সঙ্গে কাঁঠাল বোঝাই হয়ে আমরা যাব এটা আমরা মনের দিক থেকে মেনে নিতে পারছি না। বিশেষত যাত্রী বলতেই যখন এখানে কিছু মদ্যপ উপজাতীয়- যাদের ভাষাও আমরা বুঝি না। দ্বিতীয়ত, আমরা যে পোশাক পরিহিত। সুস্পষ্ট যবন,

একটুও নিজেকে আড়াল করার প্রয়াস নেই। যদি কোনো ক্ষিপ্ত হিন্দু যুবক পেটে ছুরি বসিয়ে দেয়? আমাদের নিরাপত্তা কোথায়? বিশেষ করে ভারতে উগ্র সাম্প্রদায়িকতার যে ছড়াছড়ি! কেউ আমাদেরকে পাকিস্তানের গুপ্তচরও তো ভাবতে পারে! অযথাই অনেক অবান্তর প্রশ্নের আমরা সম্মুখীন হতে চাই না। ওসি আমার কথার যৌক্তিকতা স্বীকার করলেন। বললেন, হুবহু আপনার বক্তব্যটাই আমি ওপরে উদ্ধৃত করব।

ডাউকীকে গুডবাই

অবশেষে সত্যি সত্যি শিলং থেকে জিপ এলো। পুলিশ বাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ পাঠিয়েছেন। ডাউকীকে গুডবাই জানিয়ে ওসির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে একটি সরকারি জিপে আমরা দু'ভাই দু'জন পুলিশের প্রহরায় শিলং রওয়ানা হলাম। মামাকে বললাম, এবার আর আমাদের অসুবিধে হবে না ইন্‌শাআল্লাহ্। আপনি আমাদের অসুস্থ বাবাকে গিয়ে খবর দেবেন, আমরা ভালোই আছি। তিনি যেন আমাদের জন্যে দুশ্চিন্তায় না ভোগেন।

খরস্রোতা পাহাড়ি নদীতে খুঁটি যত শক্ত করেই দেয়া হোক না কেন, তার টেকার নিশ্চয়তা নেই। তাই ডাউকীর পুলটি রশিতে ঝুলিয়ে নির্মিত। এ পুলের কথা ছোটবেলা থেকেই খুব শুনে এসেছি। সেই পুলটি পার হয়ে আমরা খাসিয়া জৈন্তা পাহাড়ের কোল ঘেঁষে ঘেঁষে এগোতে লাগলাম। ক্রমেই জিপ ওপরে উঠছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই জিপ এত ওপরে উঠল যে, সিলেট শহর তথা আমাদের বাড়ির এলাকা পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। বর্ষাকালে বৃষ্টির পর যখন আকাশ খুব পরিষ্কার থাকে, তখন সর্বদাই আমরা দূরের এ খাসিয়া পাহাড় দেখে অভিভূত হয়ে এসেছি। আজ পাহাড় থেকে আমাদের এলাকা দেখছি। কোনো কোনো স্থানে পাহাড়ের গা ঘেঁষে গাড়ি অতিক্রম করছিল তখন রাস্তার পাশ এতই কম দেখা যাচ্ছিল যে, যে কোনো সময় গাড়ি একটু পিছলিয়ে হাজার হাজার ফুট নিচে গহ্বরে পড়ে যাওয়ার অজানা আশঙ্কায় বুক দুরু দুরু কেঁপে উঠছিল।

রাত আটটায় আমরা শিলং শহরের মেডিকেল হাসপাতালের সামনে গিয়ে পৌঁছলাম। মেঘালয় পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেল মেহদী সাহেব তাঁর এস.পি.ডি.এস.পি কজনকে নিয়ে আমাদেরকে অভ্যর্থনা জানালেন। একজন মুসলমান উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার অভ্যর্থনায় অনেকটা আশ্বস্ত বোধ করলাম। তিনি আমাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, বিছানাপত্র সঙ্গে নিয়ে এসেছি কি-না। বললাম, কোনোমতে প্রাণটা নিয়ে চষামাটির ওপর দিয়ে প্রায় ত্রিশ মাইল পথ পায়ে হেঁটে এসেছি, বিছানাপত্র আনব কি করে? বললেন, ওহ! এতই মারাত্মক অবস্থা? আচ্ছা, চিন্তা করবেন না। জিপের ড্রাইভারকে বললেন, হোটেল পাইনউডে নিয়ে যাও, সেখানে রিসিপশনের জন্যে আমাদের লোকজন আছে। কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা পৌঁছে গেলাম হোটেল পাইনউডে। পাইনগাছ পরিবেষ্টিত একটি উঁচু টিলার ওপর এ হোটেলটি। আমাদের তখনকার ঢাকার শাহবাগ হোটেলের সমমর্যাদার এই পাইনউড হোটেলের পর্দা, হোটেলের কাপ পিরিচে পর্যন্তও পাইন গাছের ছাপ মারা। সুন্দর নৈসর্গিক পরিবেশ। এ হোটেলেই ইতিপূর্বে বিভিন্ন সময়ে মেহমান ছিলেন মহাত্মা গান্ধী, কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ও জওহর লাল নেহরুর মতো খ্যাতিমান নেতারা। আজ আমাদেরকে এ হোটেলে নিয়ে আসা হয়েছে। আমরা আশ্বস্ত হলাম যে, শেষ পর্যন্ত ওরা আমাদের মূল্যায়ন করতে পেরেছে।

আবারো বন্দি হলাম না তো?

পরের দিন সকালেই শুরু হলো আমাদের জিজ্ঞাসাবাদ। আমাদের দু'ভাইকে দু'টি পৃথক পৃথক কক্ষে নিয়ে গিয়ে জেরা শুরু করা হলো। প্রথমে পরিচিতি পর্বেই অনেক প্রশ্ন। পিতামহ থেকে শুরু করে ভাই-বোন, তাদের সন্তান-সন্ততি, কার বয়স কত? সবই একে একে জিজ্ঞেস করে সঙ্গে সঙ্গে লিখে নেয়া হলো। মেহদী সাহেব পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেল। তার সঙ্গে এসেছে ডিব্রুগড়ের একজন হিন্দু বাঁদরমুখো ডিএসপি। তার কথাবার্তায় বেশ চোটপাট-ঔদ্ধত্য। মেহদী সাহেব বললেন, আস্তে! বস মুসলমান বলেই তার সামনে অমন চোটপাট করে কথা বলতে পারছে হিন্দু ডি.এস.পি। আইজিপির দুর্বলতাটুকু আমরা বেশ বুঝতে পারলাম। হিন্দু আই.জি.পি হলে ওকে ধমক দিয়ে শায়েস্তা করত। বড়কর্তার সামনে ছোট অফিসারের অত চোটপাট কি প্রকারান্তরে বড়কর্তাকে অবজ্ঞা করারই নামান্তর নয়? হিন্দু অধ্যুষিত ভারতে মুসলমান কর্তাদের ওইভাবে মানিয়ে চলতে হয় বেশ বুঝা গেল। ছোট ভাইটি নিখিল পাকিস্তান ইসলামী বিপ্লবী পরিষদের চেয়ারম্যান। সে শেখ মুজিব তথা আওয়ামী লীগের সহযোগী শক্তি। সিল-প্যাড, প্রমাণপত্র কিছু সঙ্গে আছে কি-না ওরা জানতে চাইল। আমরা বললাম, প্রাণ নিয়ে পালাবার সময় কারোও এসব আনুষ্ঠানিক কাগজপত্রের কথা মনে থাকে? আপনাদের কথাবার্তার ধরন দেখে মনে হচ্ছে, আমরা যেন রীতিমত প্রস্তুতি নিয়ে ভারতবর্ষ পরিক্রমায় বেরিয়েছি। মাঝে মাঝে আমি তীব্র শ্লেষাত্মক কথাও ছুঁড়ে মারি জিজ্ঞাসাবাদকারী পুলিশ ও গোয়েন্দা অফিসারদের প্রতি।

পাইনউড হোটেলে আমাদের দায়িত্বে নিযুক্ত ডি.এস.পি ভদ্রলোকটি হিন্দু হলেও বেশ অমায়িক। কথাবার্তায় অত্যন্ত ভদ্র। আমার লেখা দু' একটি গান ও কবিতা তাকে শুনিয়েছিলাম। তিনি তার খুবই সমঝদার শ্রোতা দেখলাম। মাঝে মাঝে বিকেলে আমাকে ডাকিয়ে নিয়ে চা-পানে আপ্যায়িত করতেন। বলতেন, 'you are a great poet indeed.' একদিন আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি আমাদের এ কবিতা ও গানের অর্থ বুঝেই বলছেন, না এমনিতেই আমাকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য প্রশংসা করছেন? বললেন, না, প্রকৃতই আপনি একজন কবি। আমি অন্তর থেকে আপনার প্রশংসা করছি। আর বাংলা তো আমাদের নিকটবর্তী প্রতিবেশী ভাষা। শব্দভাণ্ডার এবং বর্ণমালা প্রায় সমান সমানই। তাই বাংলা গান বা কবিতা বুঝতে আমাদের কষ্ট হয় না। একদিন-দু'দিন করে বেশ কয়েকদিন আমাদের কাটল পাইনউড হোটেলে। কিন্তু আমাদেরকে দিল্লি বা কোলকাতায় নিয়ে যাওয়ার কোনো উদ্যোগই লক্ষ করলাম না। অথচ আমাদের ইচ্ছে ছিল ভারতের রাজধানীতে পৌঁছে বিশ্ব সমাজকে প্রেস-পত্রিকার মাধ্যমে বাংলাদেশের আর্তচিৎকার আমরা শুনাব। এমনি সময় একদিন দিল্লির সম্ভবত ইন্ডিয়ান টাইম্‌স-এ ২৭ মার্চ ও তার পরবর্তী ঢাকার মিলিটারী অপারেশনের বিস্তারিত বিবরণ জনৈক ঢাকাবাসী আইনজীবীর নামে প্রকাশিত হলো। আমরা দেখলাম, আমরা যেসব কথা প্রচার করব বলে মনস্থ করেছিলাম, তার প্রায় সব কথা হুবহু পত্রিকায় বেরিয়ে গেছে। আমি সেদিন সেই বন্ধুভাবাপন্ন আমার কবিতা ও গানের ভক্ত ডি.এস.পিকে বললাম, এই দেখুন, অন্যে দাঁও মেরে দিল। ঠিক এ কথাগুলোই আমরা

নিজেরা প্রচার করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আপনারা অসমীয়রা আমাদের কথার মূল্য দিলেন না।

শিলং-এ তখন তীব্র ঠাণ্ডা পড়েছে। ওখানে অন্যান্য বছর টেপের পানি জমে যায় শুনলাম। কিন্তু এবার শীতের তীব্রতা নাকি অনেকটা কম। টেপের মুখে পানি জমছে না। হোটেলের কক্ষে কয়লার হিটার রয়েছে। তাও এবার জ্বালাবার প্রয়োজন হচ্ছে না। তবে সকালে আটটার আগে নতুন টাট্‌কা পানি না আসা পর্যন্ত ওজু-গোসল খুবই কষ্টকর ছিল। তবুও সময় মতো ওজু করে ফজরের নামাজ পড়ে সঙ্গে নেয়া ছোট সাইজের থানবী (রহঃ)-এর উর্দু তর্জমা ও টীকা সংবলিত কোরআন শরীফ তেলাওয়াতে বসতাম। দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত এমন কি দিনের বেলায়ও এ কোরআন শরীফখানাই ছিল আমাদের প্রধান সঙ্গী। সারাদিন তেলাওয়াতে কাটাই। কখনো আবার ঘুমিয়ে পড়ি।

পাইনউড হোটেলে একদিন কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করছি। হোটেলের খানসামা বৈকালিন চা-নাশ্‌তা নিয়ে রুমে প্রবেশ করল। বয়স পঞ্চাশোর্ধ্ব। অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে এক বিশেষ অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে সে আমার দিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস নিল। বুঝলাম, মনের গহিনে কোনো এক অব্যক্ত বেদনা তাকে পীড়া দিচ্ছে। আমি তেলাওয়াত বন্ধ করে তার দিকে মনোনিবেশ করলাম। জিজ্ঞেস করলাম, এমন করে আমার দিকে তাকানো হচ্ছে কেন? জবাবে সে জানাল, কভি ইস্‌সে হামারা ভি তাআল্লুক থা হুজুর! (এক সময় আমাদেরও এর সঙ্গে সম্পর্ক ছিল হুজুর!) বলে সে কোরআন শরীফের দিকে ইঙ্গিত করল। আমি আর আত্মসংবরণ করতে পারলাম না। তাহলে আপনিও মুসলিম? এই বলে আমি তাঁকে জড়িয়ে ধরলাম। বলল, জ্বী, মেরা নাম লতীফ হ্যাঁয়! ঘর? কানপুর থা (কানপুরে ছিল)। তারপর সে যা বলল, তার নির্গলিত অর্থ হলো : সে এখন প্রায় ক্রীতদাস। তাকে হোটেলের গাড়ি করে বাসা থেকে নিয়ে আসে। আবার দিনান্তে বাসায় ফিরিয়ে দিয়ে আসে। স্বাধীনতা বলে কিছু নেই। তাই নিজের দ্বীন-ধর্ম, আকিদা-বিশ্বাস, ধর্মীয় আচার-আচরণ থেকে বিচ্ছিন্ন একটি জীব-জানোয়ারের জীবনই তাকে কাটাতে হচ্ছে।

দেখতে দেখতে শুক্রবার এলো। জুমার নামাজ শিলং-এর একটা বড় জামে মসজিদে পড়ব এরূপ একটা সাধ ছিল মনে। তাতে এখানকার মুসলমানদের সঙ্গে মেলামেশার একটা সুযোগ পাওয়া যাবে। কিন্তু কর্তৃপক্ষ তাতে সায় দিলেন না। তাতে নাকি টেকনিক্যাল অসুবিধে আছে! নামাজ আমাদেরকে হোটেলেই পড়তে হবে। ঠিক তখনই আমরা বুঝতে পারলাম, আসলে আমরা মেহ্‌মান নই, ভারতীয় কর্তৃপক্ষের হাতে বন্দি। তাই হোটেলের বাইরে কোথাও যাওয়া আমাদের জন্যে মানা। মুসাফির হিসেবেই জুমা আমাদের জন্যে জরুরি নয়। বন্দি হয়ে থাকলে সে প্রশ্ন একেবারেই অবান্তর। তাই আমরা আর উচ্চবাচ্য করলাম না। কিন্তু বেঁকে বসলেন আব্দুল মজীদ সাহেব। এমনিতে তিনি নামাজের কোনো ধার ধারেন বলে মনে হয় না। কিন্তু ওরা নামাজ পড়তে বাধা দেবে কেন, এটা তিনি মেনে নিতে পারছিলেন না।

দেখতে দেখতে পয়লা বৈশাখ এসে গেল। সে দিনটিকে যে আসামবাসীরা এত তাৎপর্যপূর্ণ মনে করে, তা আগে কল্পনাই করতে পারেনি। বিহুর পূজা হয় সেদিন। একেবারে আমাদের ঈদুল ফেতরের মতো। ঘরে ঘরে আনন্দ-উৎসব। রকমারি খাবার ও মিষ্টান্নাদির ছড়াছড়ি। পত্রপত্রিকার বিশেষ ক্রোড়পত্র বা বিশেষ সংখ্যা। রেডিও-টিভিতে বিশেষ অনুষ্ঠান। আমাদের জন্য অবশ্য রেডিও-টিভির ব্যবস্থা ছিল না। মজিদ সাহেবের থ্রি-ইন-ওয়ান আমাদের সংবাদ-পিপাসা মোটামুটি মিটিয়ে যাচ্ছিল।

বিহুর পূজার দিনে আমাদের জন্যে ডবল খানা, মানে গোশতের পরিমাণ দ্বিগুণ এলো। মজিদ সাহেব সেক্যুলার টাইপের মুসলমান। তাই তাঁরও কোনো অসুবিধে দেখা দেওয়ার কারণ ছিল না। কিন্তু আমাদের অনেক বাছবিচার করে চলতে হয়। পূজার কনসেশান গ্রহণে আমরা দ্বিধাগ্রস্ত। তেমনি গোশ্ত হলেই আমরা খেতে পারি না, তলিয়ে দেখতে হয়, এটা হারাম, না হালাল, সঠিক পদ্ধতিতে জবাইকৃত, নাকি যন্ত্রের সাহায্যে মারা বা যেনতেন করে যে কারো হাতে জবাই করা পশুর গোশ্ত কি-না। আল্লাহর নামে কোনো মুসলমান কর্তৃক জবাই করা না হলে আমাদের জন্যে তা খাওয়া সিদ্ধ নয়। তাই খাওয়ার টেবিলে আমরা দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়লাম। হোটেলে সহঅবস্থানকারী শক্তি বাবু দাঁত খিঁচিয়ে যা বলল, তাঁর নির্গলিতার্থ হলো, এ মুসলমানির তেজে সীমান্ত পেরিয়ে এপারে এসেছি, এখানে এসেও দেখছি মুসলমানির উৎপাত থেকে বাঁচতে পারলাম না। আমি বললাম, শক্তি, তোরা হচ্ছিস জীব-জানোয়ারের মতো, দুনিয়ার সবকিছু তোদের জন্য হালাল মনে করিস, একেবারে যাকে বলে সর্বভুক। কিন্তু আমাদের হাত-পা যে বাঁধা! আমরা কেবল হালালটা খেতে পারি, হারামটা ছেড়ে দিতে হয়। নে ভাই, ডবল গোশতের পেয়ালা, আমাকে তোর ডালের পেয়ালাটা দিয়ে দে। আর ভারতে এসেছি বলে যে নিজের দ্বীন-ধর্ম ছেড়ে দিয়ে তোদের মতো জীব হয়ে গেছি, এরূপ ভাববারও কোনো কারণ নেই। শিলং, গয়া-কাশী বৃন্দাবন বা হরিদ্বারে গেলেও, মুসলমান মুসলমানই থাকে। কাফের হয়ে যায় না। বুঝলি ? আমার জবাবটা তার জন্যে প্রীতিকর না হলেও অফারটা রীতিমত সুখদায়ক ছিল। শাঁখারিপট্টির হিন্দু পাহলোয়ান দু'দুটো ডবল পেয়ালা খাসি গোগ্রাসে গিলতে লাগল। অগত্যা আমার অনুজটিকে সম্ভবত অগ্রজের মর্যাদা রক্ষার খাতিরে ডাল নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হলো। অবশ্য, ডালটাও বেশ সুস্বাদুই ছিল। কারণ, এতে বেশ ঘিয়ের আমেজ বর্তমান ছিল।

বন্দিত্বের উপলব্ধি মনকে বিষিয়ে তুলল। তদুপরি অনুজের একাকিত্বও ঘুচে গেছে কালিয়াকৈরের আওয়ামী লীগ নেতা ও পরবর্তীতে বঙ্গবন্ধু মন্ত্রী সভার পাটমন্ত্রী শামসুল হক, জনাব তৌফিক ইমাম (পরবর্তীতে মুজিব নগর সরকারের কেবিনেট সচিব) ও পাকিস্তান আমলে রাঙ্গামাটির এডিসি, পরবর্তীতে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মুখ্য সচিব ড. সামাদের আগমনে আমরা যে অন্তত পাকিস্তানের গুপ্তচর নই, একথা তো নিশ্চয়ই তাঁদেরই মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে গেছে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের কাছে। এছাড়া আমার তখনকার কবিতা ও গানগুলোর সমঝদার শ্রোতা ডি. এস. পি. ভদ্রলোকটিও নিশ্চয়ই যথারীতি আমার মন-মানসিকতা কর্তৃপক্ষের কাছে বিবৃত করে থাকবেন। তাই এখন আমার ভারতে থাকা মানে অযথাই একটা যবনের হিন্দু ভারতের অন্ন ধ্বংস করা।

এদিকে শয্যাশায়ী অশীতিপর বৃদ্ধ পিতা দেশের বাড়িতে কি অবস্থায় রয়েছেন, বাড়িঘর অক্ষত আছে কি-না, এসব দুশ্চিন্তাও আমাকে খুবই পীড়া দিচ্ছিল। তাই অনুজটিকে বলে আমি দেশে ফিরতেই মনস্থ করলাম। কর্তৃপক্ষকে তা জানাতেই তাঁরা দেখলাম একটা আস্ত যবনের হাত থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্যে এক পায়ে খাড়া। তাই কথাটা বলতেই মঞ্জুর হয়ে গেল এবং ২৮ এপ্রিল তারা আমাকে একখানা জিপ দিয়ে ডাউকী সীমান্তে পাঠিয়ে দিলেন। প্রতিবাদকারী আবদুল মজিদ সাহেবের কাছে কিছু বিদেশী মুদ্রা ছিল। তাঁকে নাকি পরে গুরুতর টর্চারিং করা হয়েছিল।

বাড়ি ফেরার পথে

ফিরতির সময় আবার গোয়াইনঘাটের সেই আত্মীয় বাড়িতে এসে পৌঁছলাম। সালুটিকর বিমানঘাঁটি থেকে গোয়াইনঘাটের দূরত্ব ৯/১০ মাইল মাত্র। বিমান ঘাঁটিতে সাময়িক তৎপরতা জোরদার। ঢাকা-সিলেট বিমান উড়ছে ঘন ঘন। যে কোনো সময় গোয়াইনঘাট থানা সদরে সামরিক বাহিনীর হামলা হতে পারে সীমান্ত এলাকা পর্যন্ত নিরাপদ করার স্বার্থে। তাই এলাকাবাসীরা আটাশটি গ্রামের লোকজনকে একত্র করে কোরআন শরীফ খতম ও দোয়ার মজলিসের ব্যবস্থা করেছে। প্রচুর লোক-সমাবেশ হবে সন্দেহ নেই। আমি ভাবলাম, আমার বক্তব্য প্রচারের এটা একটি মোক্ষম সুযোগ। যথাসময়ে মজলিসে হাজির হয়ে দেখি লোকে লোকারণ্য। ২৫/৩০ জন আলেমও আছেন মজলিসে। গণ্যমান্য মুরব্বিগণও উপস্থিত। স্থানীয় থানার অফিসার ইন-চার্জই (অ-সিলেটি) এলাকার সবচেয়ে গণ্যমান্য সরকারি লোক। তিনি আবার মুক্তিবাহিনীর প্রধানও।

কোরআন খতম হয়ে গেল। কারণ, পড়ার লোক বেশি ছিল। মোনাজাত হবে একটার দিকে। এখনো যথেষ্ট সময় বাকি। আমি মসজিদের ইমাম সাহেবকে বললাম, কিছু নসিহত করুন না লোকজনকে! বললেন, নসিহত আমি জুমার সময়ে করি। বললাম, এখন লোকে কী করবে? তার চেয়ে বরং কিছু কথা বলা যাক! কিন্তু মৌলভী সাহেব কিছুতেই কিছু বলবেন না। বললেন, আপনার বড় খায়েশ দেখছি ওয়াজ করার। বললাম, হ্যাঁ, তা-ই। বললেন, তাহলে আপনিই বলুন, আমি কিছু বলব না।

আমি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় ঢাকায় পাকবাহিনীর নৃশংস অত্যাচারের কথা বিবৃত করে তাদের সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। এদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে পূর্ণোদ্যমে ঝাঁপিয়ে পড়াকে সমর্থন জানালাম এবং নিজ অধিকার রক্ষার জন্যে মরলেও শাহাদত নসিব হবে সে কথাটাও বললাম। এ কথাও বললাম, কিন্তু অতি উৎসাহের ফলে যদি একটি মুসলমানও তোমাদের হাতে নৃশংসভাবে অন্যায়ভাবে নিহত হয়, তবে আল্লাহ্‌র গজব তোমাদেরকে গ্রাস করবে। ভালোয় ভালোয় মজলিস শেষ হলো। আমার আত্মীয়-স্বজনরা তথা মেজবান তরীকুল্লাহ্, ইরশাদ আলী ভাইয়েরা আমার সাহসিকতা ও সম্মানের জন্যে অত্যন্ত গর্বিত হলেন।

এমন সময় দেখি লন্ডন ডিউজবারীতে বর্তমানে কর্মরত আমার সিলেট আলিয়া মাদরাসার সহপাঠী বন্ধু মাওলানা আবদুল আজীজ তাবলীগ জামাত নিয়ে সেখানে

উপস্থিত। আমার বাড়ি ফেরার আগেই ওই এলাকার প্রাক্তন সংসদ সদস্য মুক্তিযোদ্ধা নেতা জনাব হাবীবুর রহমানের হাতে আমার একটি পরিচয়পত্র লিখিয়ে নিয়েছিলাম। তবুও একাকী বাড়ি ফেরা ছিল এক অসম্ভব ব্যাপার। যে কোনো স্থানে অপরিচিত অতি উৎসাহী নব্য বন্দুকধারী মুক্তিযোদ্ধার গুলির নিশানা হয়ে যেতে পারি সে আশঙ্কা পুরো মাত্রায়ই বিদ্যমান ছিল। দেশের ভদ্র লোকজন বা আলেম-ওলামারা পরে থাকেন সাধারণত লুঙ্গি-পাঞ্জাবি। অন্যরা শার্ট-লুঙ্গি। আমার গায়ে একেবারে ঢাকায় ব্যবহার্য সেলোয়ার-পাঞ্জাবি। কেউ একজন বলেছিল, দাড়ি কেটে আপাতত একটা শার্ট পরে চলেন না কয়েক দিন? জবাবে বলেছিলাম, বেশ বদল করে এ ভয়াবহ সময়ে আপন পরিচয় গোপন করে মরতে চাই না। যা আছি তাই হয়ে থাকব আমরণ। বিজয় আসলে এভাবেই আসবে। বর্ণচোরার বেশে চলাকে আমি ঈমানের পরিপন্থী মনে করি।

দূরদর্শী ওলামা

মুক্তিযুদ্ধবিরোধী তৎপরতার জন্যে সাধারণভাবে আলেম সমাজকে দোষারোপ করা হয়ে থাকে অথচ অনেকেই ভুলে যান যে, তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানে অনুষ্ঠিতব্য পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগ দিতে কোনো পশ্চিম পাকিস্তানি পরিষদ সদস্য ঢাকায় আসলে তার ঠ্যাং ভেঙে দেয়া হবে বলে ভুট্টোর হুমকি দেয়া সত্ত্বেও মুফতী মাহ্মুদ ও তাঁর দলীয় আলেম সদস্যগণ এবং মাওলানা নূরানী যথারীতি ঢাকায় এসেছিলেন। শুধু তাই নয়, তাঁরা তাঁদের এদেশীয় অনুসারী আলেমদেরকে এ দেশের বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে স্থানীয়ভাবে পলিসি নির্ধারণের পরামর্শ দিয়েছিলেন। এ কারণে, জমিয়তপন্থী আলেমগণ মুক্তিযুদ্ধবিরোধী তৎপরতায় নিজেদের জড়াননি।

হায় আবদুর রাজ্জাক!

আমার সিলেট আলিয়া মাদরাসার সহপাঠী আখালিয়া গ্রাম নিবাসী আবদুর রাজ্জাকের বাড়িতে যখন হানাদার বাহিনীর হামলা হলো, তখন আবদুর রাজ্জাক বাড়ির সবাইকে অস্থির হতে মানা করে নিজে এ বিশ্বাসে হামলাকারীদের সামনে এগিয়ে এলো যে, সে উর্দুতে তাদেরকে বুঝিয়ে দেবে যে, এরা নিরীহ পাবলিক, রাজনীতির লোক নয়। এমনি সময় ঘাতকের গুলি তাঁর বুক ভেদ করে চলে গেল। সে একটি কথা বলারও সুযোগ পায়নি। তার মৃত্যু সংবাদে আমি খুব কেঁদেছিলাম। তার নব বিবাহিতা বধূটি বিয়ের কয়েক মাসের মধ্যেই বিধবা হয়ে যায়। এমনি হাজার হাজার সরল বিশ্বাসী আবদুর রাজ্জাক হানাদার জানোয়ারদের হাতে প্রাণ দিয়েছে। এদের সংখ্যা নিতান্তই কম নয়।

তাবলীগ জামাতের কাফেলায় শামিল হয়ে পড়লাম বন্ধুবর মাওলানা আবদুল আজীজের দাওয়াতে। তাবলীগ জামাতের অন্যতম মুরব্বি হাজী ইয়াকুব সাহেবের শ্বশুরবাড়ি ওই এলাকায়ই। আমার সেই খতরনাক সত্য ভাষণের সময় তিনি উপস্থিত ছিলেন কিনা জানি না। তার খবর কিন্তু রটে গিয়েছিল সর্বত্র। জামাতের সঙ্গে পদব্রজে পূর্বদিকে অগ্রসর হয়ে ১৫/২০ মাইল দূরবর্তী দরবস্ত বাজারে উপস্থিত হয়েছি।

তারপর কানাইঘাটে পৌঁছে সেখানে শায়খুল হাদীস আল্লামা মুশাহিদ (সাবেক এমএনএ) সাহেবের মাজার জিয়ারত করে এক রাত তাঁরই বাড়িতে তাঁর অনুজ মওলানা

মুজাম্মিল সাহেবের আতিথ্য ভোগ করে গাছবাড়ি চুড়খাই হয়ে গোলাপগঞ্জ পর্যন্ত পায়ে হেঁটে হঠাৎ একটা ট্রাক পেয়ে গেলাম ভাগ্যগুণে। ট্রাকওয়ালাকে একটু অতিরিক্ত ভাড়া দিয়ে যখন সিলেট শহরের উপকণ্ঠে কদমতলীতে পৌঁছলাম তখন চীনা রাইফেলধারী সম্পূর্ণ অপরিচিত চেহারার নবাগত WPP প্রতীকধারী পুলিশ পেটে রাইফেলের আগা দিয়ে এক খোঁচা মেরে সিলেট শহরে অভ্যর্থনা জানাল। বুঝলাম, মাস খানেকের মধ্যে অনেক উলট-পালট হয়ে গেছে দেশে। মিলিটারি শাসন বেশ কঠোরভাবে জেঁকে বসেছে। অবিশ্বাস্যভাবে তাদের খবরদারি বেড়ে গেছে।

সিলেট শহরে পা দিতেই বন্ধু হেকীম আবুল হায়াতের সঙ্গে দেখা। বললেন, জামায়াতি ও মুসলিম লীগাররা আমাদের বাড়ি ত্যাগের পর এমনি পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল যে, ওই সময় বাড়িতে থাকলে নির্ঘাৎ গুলি খেয়ে মরতে হতো। আপনার অশীতিপর বৃদ্ধ বাবা আপনাদের দু'জনকে একসঙ্গে হারিয়ে আর এ উত্তেজনাকর পরিস্থিতি দেখে শারীরিক ও মানসিকভাবে একেবারে শয্যাশায়ী। তাঁর অবস্থাও আশঙ্কামুক্ত নয়। আপনি তাড়াতাড়ি বাড়ি যান– তিনি বললেন।

বাড়ি ফেরার পর

কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি পাঁচ মাইল পথ অতিক্রম করে সিলেট শহর থেকে বাড়িতে পৌঁছে গেলাম। বিরহকাতর আব্বা আমাকে পেয়ে অভিভূত হয়ে গেলেন। তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরলেন আর বিগত উত্তেজনাকর দিনগুলোর কথা বিবৃত করলেন। সত্যিই মাত্র ক'টি দিনে তাঁর স্বাস্থ্যের ভীষণ অবনতি হয়েছে। আমি ভারত থেকে ফিরে যে সত্যিই একটা খুব ভালো কাজ করেছি, তখন আমি তা উপলব্ধি করলাম।

আমার বাড়ি ফেরার কথা বিদ্যুৎগতিতে ছড়িয়ে গেল। শান্তি কমিটির নেতা শাহ্পুর গ্রামের কসীরুদ্দীন সরপঞ্চ আমাকে তার বাড়িতে যাওয়ার জন্য সংবাদ দিলেন। আমি তার মৃদু জিজ্ঞাসাবাদের সম্মুখীন হলাম।

গ্রামের বাড়িতে ক'দিন অবস্থান করেই আমার মন অস্থির হয়ে উঠল। বেকার জীবন কাটিয়ে তো আমি আদৌ অভ্যস্ত নই। আবার ভাই যেহেতু মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে ভারত প্রবাসী, তাই শত্রুরা যে কোনো সময় আমার বিরুদ্ধে ফন্দি আঁটতে পারে। ছোট ভাইয়ের নামে প্রচারিত জ্ঞানগর্ভ পুস্তক-পুস্তিকা ও বিবৃতিগুলো আসলে আমারই লেখা– একথাও ছিল একটা ওপেন সিক্রেট। তাই একাধারে বেশি দিন বাড়িতে থাকাও নিরাপদ নয়। আমি আমার অশীতিপর বৃদ্ধ বাবাকে বলে রাজি করে তাবলীগের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম। প্রথম গন্তব্যস্থল ঠিক করলাম শায়খে কাতিয়া হযরত মাওলানা আমীনুদ্দীন সাহেবের বাড়ি– জগন্নাথপুর থানার অন্তর্গত কাতিয়া। শেরপুর হয়ে কাতিয়া যেতে হয়। এদিকে খবর পেলাম, গাভুরটেকীর কর্মবীর ডা. মর্তুজা চৌধুরী সাহেব আমার নামধাম শুনে আমার সাক্ষাৎ চেয়েছেন। তিনি তখন জরাগ্রস্ত। বাইরে কোথাও যাওয়ার শক্তি নেই। খেলাফত আন্দোলন তথা ব্রিটিশবিরোধী তাবৎ আন্দোলনে অগ্রণী ও বিপ্লবী ভূমিকা পালন করে এমনকি সিলেটে বোমা হামলার আসামি হয়ে সেই বিশের দশকেই খেলাফত আন্দোলনকালে তিনি জেল খেটেছেন।

ছিরামিশী গ্রামে আমরা বিরূপ অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিলাম। স্থানীয় কিছু লোক আমাদেরকে, মানে তাবলীগ জামাতকে পাকিস্তানের চর ঠাউরিয়েছিল। এ সময় একদিন কুশিয়ারা নদীর তীরবর্তী রানীগঞ্জ বাজার ও ছিরামিশী গ্রামে আগুনের লেলিহান শিখা দেখা গেল। ৩ দিন পর্যন্ত এ আগুন জ্বলেছিল। একদিনে রানীগঞ্জে ১১৪ জন এবং ছিরামিশীতে ৭০ জন লোককে লাইনে দাঁড় করিয়ে হানাদাররা হত্যা করল। মৃত-অর্ধমৃত লোকগুলোকে পেছন থেকে হাত বাঁধা অবস্থায়ই নদীর স্রোতে ওরা নিক্ষেপ করেছিল। তিন দিন পর নৌকা যোগে রানীগঞ্জে গিয়ে আমরা এ পৈশাচিক হত্যার বধ্য ভূমিটি দেখে এসেছিলাম। একটি শ্মশ্রুধারী লাশ পানিতে পেয়ে আমরা রীতিমত জানাজা আদায় করে দ্রুত সেখান থেকে সরে এসেছিলাম।

তাবলীগ পর্ব শেষ করে আমি দেখলাম, বাড়িতে বেকার অবস্থায় থাকা শত্রুদের সন্দেহকে দৃঢ়তর করবে। তাই উপস্থিত সময়ে একটা মুদির দোকান খুলে আমি বাজারে বসে গেলাম। লোকজনের সঙ্গে শুধু শুধু চায়ে আড্ডা জমিয়ে দিন কাটালে কারো সন্দেহ হতে পারে যে লোকটি বুঝি আন্ডার গ্রাউন্ড কাজ করে যাচ্ছে। একটা কর্মব্যস্ত দোকানদার সম্পর্কে তো তা ভাবা চলবে না। পাশের হায়দরপুর গ্রামের আবদুল হাই নামের একটি অতিভদ্র ছেলে ছিল আমার ব্যবসায়ের পার্টনার। আসলে সে-ই দোকানদারি করত আর আমি ছিলাম লোক দেখানো পার্টনার। এভাবে কিছুদিন কাটানোর পর ছাতক সিমেন্ট ফ্যাক্টরির সিমেন্ট ও ধানের চালান নৌকায় করে ঢাকা পাঠিয়ে ঢাকা থেকে প্রয়োজনীয় এটা-ওটা কিনে সিলেটের আড়তে জমা দেয়ার ব্যবসাও কিছুদিন চলল।

বাবার মৃত্যু সংবাদ পৌঁছবে কী করে?

এ সময় সহোদর মাওলানা জালালাবাদীর চিঠি মুজিবনগর তথা কোলকাতা থেকে বিলাত হয়ে বাড়ি পৌঁছতে প্রায় দেড় মাস সময় লেগে যেত। আমার বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে লোকজন আব্বার সঙ্গে দেখা করলে আব্বা তাঁর ছোট ছেলেটির অনুপস্থিতিজনিত অস্বাভাবিক অবস্থার কথা বলতেন আর আমাকে বলতেন, বাবা! এতদিন যখন গেছে আরো ক'টা দিন অপেক্ষা কর আমার সময় শেষ হয়ে এসেছে। জীবনের এ অন্তিম পর্যায়ে আত্মীয়-স্বজনের কোলাহলটা থেকে দূরে রয়ে একটু আল্লাহ্ আল্লাহ্ করতে চাই। সত্যি সত্যি এর মাত্র মাস দুয়েক পরেই আগস্ট মাসে আব্বা ইন্তেকাল করলেন। তাঁর জীবনের অন্তিম মুহূর্তেও আমার কোলেই তাঁর মাথা ছিল। ছোট ভাইটির অনুপস্থিতি তখন তীব্রভাবে অনুভব করছিলাম। কিন্তু আশ্চর্য, আব্বার চেহারায় কোনো দুশ্চিন্তার আলামতই লক্ষ করলাম না। আমি বললাম, আব্বা, ওর জন্য একটু দোয়া করুন। দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে আব্বা আমাদেরকে বললেন, আমার ছেলে ভালোই আছে। দেশ স্বাধীন হবে। ও ভালোয় ভালোয়ই দেশে ফিরবে। তোমরা ওর জন্য চিন্তা করো না! তার জন্যে আমার মনে কোনোই দুশ্চিন্তা নেই। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আব্বা তাঁর স্বদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্য যেভাবে দোয়া করলেন আর তাঁর স্বাধীনতা সংগ্রামী পুত্রের সম্পর্কে যে নিশ্চিত সুসংবাদ দিলেন, তা আমাদের জন্য শিক্ষণীয় হয়ে রইল।

চিঠি দিয়ে ছোট ভাইকে পিতার মৃত্যু সংবাদ পৌছানো সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। তাই এ সংবাদ প্রচারের জন্যে আমি পত্র-পত্রিকার আশ্রয় নিলাম। তৎকালীন দৈনিক পাকিস্তান (অধুনালুপ্ত দৈনিক বাংলা)সহ কয়েকটি কাগজে এ সংবাদ বেরুল। সত্যি সত্যি আমার সহোদরটি এ মাধ্যম থেকেই পিতার মৃত্যু সংবাদ যথাসময়েই পেয়ে গিয়েছিল।

নভেম্বর মাসে ঢাকায় এসে উস্তাদ প্রবর মওলানা উলিউর রহমান সাহেবের মুখে শুনলাম, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠানে তাঁরা রীতিমত উবায়দুল্লাহর কণ্ঠ শুনে আসছেন। পরে তাঁর মুখেই শুনেছিলাম যে, মুজিবনগরের স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রটির উদ্বোধনই হয়েছিল তার অর্থাৎ আমার সহোদর মাওলানা জালালাবাদীর তেলাওয়াতে কোরআনের মাধ্যমেই। দূরবর্তী সিলেট থেকে আমরা শুরুর দিকের অনুষ্ঠানগুলো শুনতে পেতাম না। অবশ্য, সংবাদ বুলেটিন ও চরমপত্র প্রভৃতি কথিকাদি শুনা যেত অত্যন্ত ক্ষীণ আওয়াজে। স্বাধীনতা-উত্তরকালে বেতার কর্মীদের প্রকাশিত 'শব্দ সৈনিক' নামের সংকলনে কিন্তু জালালাবাদীর নাম অনেকটা চেপে যাওয়া হয়েছে। এটা অনিচ্ছাকৃত নাকি উদ্দেশ্যমূলক, বলা মুশকিল।

বন্দুকের মুখে জীবন

সেপ্টেম্বর কিংবা অক্টোবর মাসের কথা। তখন একদিকে দেশের অন্যান্য স্থানের মতো আমাদের টুকেরবাজার স্কুলে জোরসে চলছে রাজাকার ট্রেনিং-এর মহড়া। জনৈক পাঞ্জাবি আর্মি অফিসার (যতদূর মনে পড়ে সুবাদার বা ক্যাপ্টেন ছিল) এ ট্রেনিং-এর দেখাশোনা করছেন। আমার মনে এক দুষ্টবুদ্ধি চাপল। গ্রামের ও এলাকার শান্তিবাহিনীওয়ালাদের সামনে নিজের ইমেজটাকে তুলে ধরে নিজের নিরাপত্তা নিশ্চিত এবং ওদের কূটনামি ও ঘ্যাচরঘ্যাচর বন্ধ করার জন্যে আমি একটা বন্ধুত্বপূর্ণ সালাম দিয়ে আর্মি অফিসারটির কক্ষে ঢুকলাম। খান সাহেবও আমাকে বেশ উষ্ণ আলিঙ্গনে অভ্যর্থনা জানালেন। আমার মুখের উর্দু বুলি মুহূর্তেই তার মনপ্রাণ কেড়ে নিল। তিনি আমাকে চা-পানে আপ্যায়িত করলেন। এদিকে বাইরে তখন শান্তিকমিটির স্থানীয় সেক্রেটারি (যিনি আমার আবাল্য শুভাকাঙ্ক্ষী ও আপনজন বলে পরিচিত ছিলেন) এ দৃশ্য দেখে জ্বলেপুড়ে মরছিলেন। তিনি ঝড়ের বেগে কক্ষে ঢুকে আর্মি অফিসারকে লক্ষ্য করে বললেন, এ হচ্ছে এলাকার এক নম্বরের মুক্তি, দেশের দুষমন, ওর ভাই এখনও ইন্ডিয়ায় আছে! বলেই তিনি আমার ভাইয়ের সেই কবে শেখ মুজিবকে লেখা একটি পত্রের ফটোস্টেট কপি অফিসারের সামনে তুলে ধরলেন। জামায়াতীদের গোয়েন্দা তৎপরতা যে এত শক্ত তা কোনোদিন কল্পনাও করিনি। এখন আমার যেন সাক্ষাৎ যমদূতের সঙ্গে মোলাকাত হলো! মুহূর্তে কলিজাটি শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল। সত্যি কথা বলতে কী! ওমন একটা সাক্ষাৎ প্রমাণের পর আমার আর কোনো জবাবই ছিল না। বাইরে কৌতূহলী জনতা হায় হায় করে উঠল! কি জানি এ মুহূর্তে অফিসারটি আমাকে গুলি করে দেয় নাকি!

এ স্কুলেই আমার হাতেখড়ি আর এ স্কুল থেকে আমিই সর্বপ্রথম প্রাইমারি বৃত্তি পরীক্ষায় জালালাবাদ রেঞ্জের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে স্কুলের তথা এলাকার মুখ উজ্জ্বল

করেছিলাম। তাই বিগত কুড়ি বছর পর্যন্ত এলাকায় আমার নামে ধন্য ধন্য রব। অথচ এ স্কুল ঘরটিতেই একটু পরে আমার মৃতদেহ দেখা যাবে! আল্লাহ্‌র কী মর্জি, মাত্র কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই আমিও কর্তব্য স্থির করে ফেললাম। আমি বললাম, খান সাহেব! সদর ইয়াহিয়া খান সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে দেশটাকে শান্ত করতে প্রয়াস পাচ্ছেন। তিনি চলে যাওয়া বাঙালিদেরকে ইন্ডিয়া থেকে নিয়ে আসার জন্যে দিন-রাত রেডিও টিভিতে অনুরোধ জানাচ্ছেন, অথচ এরা চায় দীর্ঘকাল ধরে যুদ্ধ চলুক, আর ওরা আপনাদের বন্দুক দেখিয়ে দেশবাসীকে লুটেপুটে খাক। দেশবাসী আপনাদের ভয়ে এদেরকে টাকা-পয়সা দেয়, আর মনে মনে আপনাদের শত্রু হয়। ওই ব্যাটাদেরকে আপনারা শাস্তি দিতে পারেন না? আর দেখলেন তো, আপনার সঙ্গে দু'টি ভালোমন্দ কথা বলছি, কেমন করে লোকটি এসে বে-আদবের মতো ঘরে ঢুকে আমাদের আলাপটা মাটি করে দিল। আমার গুলি মনে হয় লক্ষ্য ভেদ করল। তিনি হুম করে বন্দুকটি ওই 'শান্তি-নেতা'র দিকে তাক করে ধরে বললেন, বের হয়ে যাও, নতুবা এখনি তোমাকে গুলি করব। বে-আদব কাহাকে? আর আমাকে বললেন, মৌলভীজি সয়লাবকে ওয়াক্ত হাম্‌নে পেট কাটকে জও চান্দা দিয়ে থা ইয়ে লোগ পাবলিক কো না দে-কর খোদ খায়া, হারামখোর কাহাঁকা। আমি বললাম, ঠিক ধরেছেন খান সাহেব এরাই সেই লোক। ভালোয় ভালোয় সেদিন রক্ষা পেলাম। জনতা আমাকে বাহ্‌বা আর তাকে ধিক্কার দিল।

মুসলমানদের নেতা হবে হিন্দুদেরই বন্ধু গোপন!

ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহ নাগাদ মুক্তিযুদ্ধের আসন্ন বিজয় আগামীকালের সূর্যোদয়ের মতো অবশ্যম্ভাবী মনে হচ্ছিল। এমন সময় আমার মনে এক অদ্ভুত খেয়াল চাপল। শাহ্‌ ওলী নিয়ামতুল্লাহ কাশ্মীরী (রহঃ)-এর সাড়ে আট শ' বছরের পুরনো ফার্সি কতগুলো কবিতার পঙ্‌ক্তি করাচির বহুল প্রচারিত উর্দু দৈনিক জঙ্গ-এ প্রকাশিত হয়েছিল। তার একটি পঙ্‌ক্তিতে দু'ঈদের মধ্যবর্তী সময়ে একটা মহাঅঘটন ঘটবার এবং তাতে মুসলমানদের ঘরে ঘরে নিহত হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী ছিল। তাতে হত্যাকারী হিন্দু জাতি এবং বিশ্বব্যাপী তার নিন্দার কথা উল্লেখিত হয়েছিল। ভবিষ্যদ্বাণীই যদি সত্য প্রমাণিত হয় তবে একজন ওলীর তথা ইসলামের গৌরব বৃদ্ধি হবে মনে করে আমি ওই পঙ্‌ক্তিগুলোর বাংলা পদ্যানুবাদ সিলেটের শাহ্‌জালাল প্রিন্টিং প্রেস থেকে ছেপে ব্যক্তিগত উদ্যোগে পুস্তিকাকারে প্রকাশ করি।

মুসলমানদের নেতা হবে হিন্দুদেরই বন্ধু গোপন
সে তাহাদের করবে মদদ অবৈধ চুক্তি থাকবে যেমন

ওই পংক্তিগুলোতে এই কথাগুলোও ছিল। ব্যাপারটি যদিও পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারছিলাম না তবুও পুস্তিকাটি ছেপে দিলাম। সিলেট আলিয়া মাদরাসার প্রাক্তন প্রিন্সিপাল দাদা-উস্তাদ বাহরুল উলুম মাওলানা মোহাম্মদ হোসেন আমার এ পদ্যানুবাদকে মূলের চাইতেও বেশি প্রাঞ্জল ও বোধগম্য বলে অভিহিত করেছিলেন। ফেনী থেকে লিখিত আমার পিতৃসম শ্রদ্ধেয় মাওলানা নূর মুহাম্মদ আজমী সাহেবের পত্রেও এর খুবই প্রশংসার কথা ছিল তবে তিনি এটাকে খতরনাক উদ্যোগ বলেই অভিহিত করেছিলেন।

এদিকে সিলেটের পূর্ব সীমান্ত থেকে মুক্তিবাহিনীর স্বদেশের মাটিতে প্রবেশের সংবাদ পাওয়া গেল। আমি অতি আগ্রহে স্বাধীনতা আর সহোদরের আগমন প্রতীক্ষা করছিলাম। বরইকান্দির রইসআলী (সিলেটের বর্তমান আ'লীগ নেতা) নাকি কে যেন একজন বলল, করীমগঞ্জে আমার ভাইটিকে দেখে এসেছে। পরে সহোদরটির মুখেই শুনেছিলাম। ১৪ ডিসেম্বরে মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল ওসমানী একটি ডাকোটা বিমানে করে করীমগঞ্জের কুম্ভিগ্রাম পর্যন্ত তাকে নিয়ে এসেছিলেন। ক্যাপ্টেন খালেক চালিত এ বিমানটির সহচালক ছিলেন ক্যাপ্টেন আকরাম। এ বিমানটিতে করে ভারতীয় ব্রিগেডিয়ার পান্ডে জেনারেল ওসমানীর এডিসি লেঃ শেখ কামাল এবং সুরঞ্জিৎ সেন গুপ্তও সেদিন এসেছিলেন; কিন্তু সীমান্ত নিরাপদ নয় দেখে আমার ভাইটি কোলকাতায় ফিরে গিয়েছিল।

১৫ ডিসেম্বর আমাদের চরুগাও পয়েন্টে সিলেট-সুনামগঞ্জ বাদাঘাট রাস্তার তেমুখীতে পাকিস্তান সমর্থক রাজাকার প্রহরীদের লক্ষ্য করে মর্টার নিক্ষিপ্ত হল। মিত্রবাহিনী তথা ভারতীয় বাহিনী সুরমা নদীর অপর পারে অবস্থান গ্রহণ করেছে। ভারতীয় হেলিকপ্টার ওদেরকে সিলেট শহরের পূর্ব পাশে নামিয়ে দিয়েছে। দুপুরে আগরতলা থেকে তাদের জন্যে সদ্য প্রস্তুত রুটি ভাজি প্রভৃতি সরবরাহ করা হলো দেখলাম। আমি যেহেতু এলাকার মুক্তিযুদ্ধের সমর্থকদের মধ্যে সর্বাধিক পরিচিত ও স্বীকৃত তথা বিগত নয় মাসে বিড়ম্বিত ব্যক্তিত্ব, তাই আমার মনোবল আজ অনেক চাঙ্গা। তাই নিকটাত্মীয়রা সবাই বাড়ি ছেড়ে বনবাদাড়ে পালালেও আমি বুক টান করে ভারতীয় সৈন্যদের খুব কাছ থেকে দেখলাম। রুশ বিমানে করে ভারতীয় পাইলটরা সিলেটের দস্তিদার বাড়িতে অবস্থানরত পাকসেনাদের ওপর উপর্যুপরি বোমা নিক্ষেপ করছে। এতকাল যাদেরকে বিধর্মী শত্রু জেনে এসেছি সেই ভারতীয়দের আঘাতে স্বদেশের মাটি পুড়ে খাক্ হচ্ছে দেখে মনে ভীষণ দুঃখ পাচ্ছিলাম। এদিকে নিকট থেকে ভারতীয় সৈন্যদেরকে দেখে মনে হলো, পাকিস্তানি সৈন্যদের সামনে ওরা যেন বাঘের সামনে ভেজা শিয়াল! স্বধর্মীয় সৈনিকদের অধঃপতনের জন্যে আজ তারা গায়ে-গতরে যশ্ ও খ্যাতিতে ভারতীয়দের চাইতে অনেক গুণে সেরা হওয়া সত্ত্বেও আজ শোচনীয়ভাবে পরাস্ত হচ্ছে!

মৌলভীজি, আমি আর কোনো বাঙালিকে গুলি করব না!

বিজয়ের মাত্র মাসখানেক আগে আমি যখন ঢাকা যাচ্ছিলাম, তখন জনৈক পাকিস্তানি সৈন্য আকবর খানের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল। আমি উর্দুতে বলতে পারি দেখে সে নিজেই অনেকটা আপন বোধ করে কথা বলছিল। সে আমাকে দেশের সঠিক পরিস্থিতি কি জিজ্ঞেস করেছিল। আমি অকপটে বলেছিলাম, গোটা দেশের লোক তাদের শত্রু। যে কোনো সময় দেশ স্বাধীন হয়ে যাবে আর ওরা বেঘোরে মারা পড়বে। আকবর খান বলল, কিন্তু আমরা যেদিকে যাই সেদিকেই তো লোককে পাকিস্তানি পতাকা ওড়াতে দেখি! বললাম, ওই একখান পতাকা উড়িয়ে যদি তোমাদের পশুবৃত্তি থেকে লোক বাঁচতে পারে, তবে তাতে তারা কার্পণ্য করবে কেন? বলল, হ্যাঁ তাই তো। তারপর বলল, আচ্ছা মৌলভীজি, আমরা তো দেশটাকে রক্ষার জন্য প্রাণ দিচ্ছি,

তবে লোকে আমাদেরকে শত্রু ভাবে কেন? বললাম, শত্রু না হলে তোমরা নিরীহ মানুষের বুকে গুলি চালাও কি করে? মা-বোনের ওপর অত্যাচার করো কি করে? বলল, মৌলভীজি, ও রকম সকলে করে না। বললাম, যারাই ওই অপকর্মগুলো করে তাদের খাকি পোশাক, তোমারই গায়ের পোশাকের মতো। তাই ওই পোশাকটি এখন বাঙালিরা মনে প্রাণে ঘৃণা করে। বলল, তাহলে হিন্দুস্থানের কাফের সৈন্যরা কি আপনাদের বেশি আপন নাকি? বললাম, তা হয়তো নয়, কিন্তু ওরা তো আমাদের মানুষকে গুলি করছে না, মা-বোনকে অত্যাচার করছে না! বরং তোমাদের অত্যাচারে ওদের দেশে আশ্রয় নেয়া এক কোটি লোককে তারা খাবার দিচ্ছে, আশ্রয় দিচ্ছে! স্বধর্মের, স্বজাতির খুনি থেকে বিজাতীয় আশ্রয়দাতাকেই কি লোকে আপন ভাববে না? সে বলল, তাই তো! এবার সে বিনীতভাবে তাদের এখন কি করণীয়, আমাকে জিজ্ঞেস করল। কথাগুলো আমি সহজবোধ্য উর্দুতে এমনভাবে বলেছিলাম যে, রেলের কম্পার্টমেন্টে বসা সহযাত্রীদের অনেকেই তা বুঝতে পারছিল। প্রথমে সহযাত্রীরা একজন খানসেনার সঙ্গে আমার আলাপচারিতাকে মোটেই সুনজরে দেখছিল না। কিন্তু যখন দেখল আমি নির্ভয়ে এমন সব কথাই বলে যাচ্ছি যা তাদেরই প্রাণের কথা, তখন সবাই আমার কথাগুলো অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে শুনতে শুরু করল। আমিও রীতিমত উৎসাহিতবোধ করছিলাম। আমি বললাম, আকবর খান, এখন তোমাদের একটিই করণীয়, যেখানে যত বাঙালি পাও, তাদের হাতে-পায়ে চুমু খেয়ে বলবে, না বুঝে আমরা মারাত্মক অপরাধ করে বসেছি, ভাই তোমরা আমাদেরকে মাফ করো! তোমরা যে অন্তত তোমাদের অপরাধটুকু বুঝতে পেরেছ এটকু বুঝতে পারলেও লোকে কিছু সান্ত্বনা পাবে। শায়েস্তাগঞ্জ পেরিয়ে কোনো এক স্টেশনে আকবর খান নেমে গেল। আর যাবারকালে সত্যি সত্যি আমার হাতে চুমু খেয়ে অঙ্গীকার করল, সে আর কোনো বাঙালিকে গুলি করবে না এবং কোনো বাঙালিকে শত্রুও ভাববে না। আমি বললাম, আমার অনুরোধ, তুমি যখন তোমার ক্যাম্পে ফিরে যাবে, তখন আমার এ কথাগুলো তাদেরকেও বলবে এবং তাদের ভুলটুকু বুঝতে দেবে। সে বলল, মৌলভীজি, এটা আমি অবশ্যই তাদেরকে বলব। কারণ, আপনি আমার সব ধারণা একেবারে পাল্টে দিয়েছেন। ওই সময়ে ইয়াহিয়া খান নির্বাচন দিয়ে নির্বাচনের ফলাফল মতো কাজ না করে ভুট্টোর প্ররোচনায় যে কী মারাত্মক অন্যায় করেছেন, তা তাকে ভালোমতে বুঝিয়ে বলি।

স্বাধীন দেশে আমি এরেস্ট!

স্বাধীনতা যুদ্ধের গোটা সময়টি ধরে এরূপ পরস্পরবিরোধী সংগ্রাম করে ১৬ ডিসেম্বর যেদিন স্বাধীনতার সূর্যোদয় হলো, সেদিন আমার ভাই কিন্তু সিলেটের আমাদের বাড়িতে ফিরে এলো না। এক অজানা আশঙ্কায় বুকটা দুরু দুরু কেঁপে উঠল। সীমান্ত অতিক্রম করে আসতে কোনো অঘটন ঘটে যাইনি তো!

গেলাম আওয়ামী লীগ নেতা দেওয়ান ফরীদ গাজীর শেখ ঘাটের বাসায়। জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা তো এলেন, আমার ভাইটিকে কি করে এলেন? তিনি জানালেন, উনি

ভালোই আছেন, শিগগির চলে আসবেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি আমাকে বললেন, আপনি এরেস্ট! ফরিদগাজী তখন সিলেটের প্রশাসকও। সুতরাং বে-আইনের পরিবেশে তাঁর কথাই আইন। বললাম, অপরাধ? বললেন, আপনি কি সব ভবিষ্যদ্বাণী ছেপেছেন আমাদের বিরুদ্ধে? বললাম, এজন্যে? এটা কি আমার নিজের কথা নাকি? আর আপনাদের বিরুদ্ধে হলে আমার বিরুদ্ধেইবা নয় কেন? স্বাধীনতা সংগ্রাম আর মুক্তিযুদ্ধের কৃতিত্বটা কি আপনার একার নাকি? আমরা এর কেউ নই? তাহলে আমাদের এ ভিটেমাটি ছেড়ে পালিয়ে বেড়াবার, ঘরে-বাইরে লড়াই করার দরকারটা কী ছিল? গাজী সাহেব আমার জবাবে অবশ্য শান্ত হলেন। পরে শুনেছিলাম, দরগাহে শাহজালালের মুতাওয়াল্লী সরেহ কওম এ. জেড. আবদুল্লাহই তাঁকে কানকথা বলে উত্তপ্ত করেছিলেন। আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় অফিসে জালালাবাদীর পাশের কামরায় অবস্থানকারী জনাব মোহাম্মদ উল্লাহ্ (পরবর্তীকালের রাষ্ট্রপতি)-কে সহোদরটির ব্যাপারে টেলিগ্রাম করলে তিনি কিন্তু অত্যন্ত সান্ত্বনামূলক জবাবী টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলেন। সেদিন সত্যিই সেটা আমাদের জন্য অত্যন্ত স্বস্তিদায়ক ছিল। এজন্য তাঁকে সবসময় শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি।

গ্রেনেড হাতে ১৬ ডিসেম্বরে

১৬ ডিসেম্বরের সকালে দেশবাসী আমাকে এক ভিন্নরূপে প্রত্যক্ষ করল। আমার হাতে ছিল সেদিন একটা গ্রেনেড। বিজয়ী মুক্তিবাহিনী দলে দলে পশ্চিম দিক থেকে সিলেট শহরে মার্চ করে ঢুকছিল। আমি ব্যান্ডপার্টিসহ নেতৃত্ব দিয়ে তাদেরকে আমার এলাকায় সাদর সম্ভাষণ জানাচ্ছিলাম। সেদিন স্থানীয় আ'লীগ নেতা, সম্পর্কে আমার ভাগিনা পীরপুরের মোহাম্মদ মাহমুদ ছাড়াও এলাকার সর্বাধিক ধনাঢ্য ও প্রধান সমাজসেবী ব্যক্তিত্ব হায়দারপুরের হাজি আবদু সাত্তার ওরফে মুতলিব হাজিও এ মিছিলে আমার সঙ্গে শরিক ছিলেন। আর তারা যেন কোনো দালালের বাড়িতে ঢুকে অনর্থ ঘটিয়ে স্বাধীনতাকে কলংকিত না করে সে জন্যে নিজ হাতে একটা গ্রেনেড রেখে আপন পরিচয়টা তাদের সামনে সুস্পষ্ট রেখেছিলাম। গায়ে লম্বা জামা। মাথায় টুপি। মুখে দাড়ি আর অপর দিকে হাতে একটি গ্রেনেড মুক্তিযুদ্ধের প্রতীক। মুক্ত বাংলায় এ পরস্পরবিরোধী দৃশ্য আর কেউ কোথাও দেখেছে কি না জানি না। কিন্তু এ ছিল আমার সেদিনের পরিচয়। আজও আমার সে পরিচয়ের কোনো ব্যত্যয় ঘটেনি।

আমি মুক্তিযোদ্ধা আমি রাজাকার!

দেশটাকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসি, তাই আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা। আর মুক্তিযুদ্ধ মানেই ধর্মের প্রতি বিদ্রোহ নয় যে, দাড়ি-টুপি বিসর্জন দিয়ে প্রগতিশীল সাজতে হবে। বরং আমার ধর্মীয় মূল্যবোধই আমাকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে, জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্বুদ্ধ করে। আর এ জিহাদের সময়ও আমি ধর্মেরই শিক্ষা অনুযায়ী রোজ কোরআন তেলাওয়াত করে নামাজ পড়ে পড়ে আল্লাহর দরবারে বিজয় কামনা করেছি। যুদ্ধের সময়ও ব্যাংকারে শুয়ে শুয়ে মুক্তিযোদ্ধারা আমারই অনুজের মুখে স্বাধীন বাংলা বেতারের কোরআনের তেলাওয়াত শুনেছে। সুতরাং ধর্মের ছোঁয়া লাগলেই মুক্তিযুদ্ধের

চেতনাই বিনষ্ট হয়ে যায়, এরূপ মতলবি প্রচারণা চালাবার একচেটিয়া অধিকারও আমি কাউকে দিতে রাজি নই। দেশকে ভালোবাসা যদি মুক্তিযোদ্ধার পরিচয় হয়, তবে আমি একজন প্রথম সারির মুক্তিযোদ্ধা। আর টুপি-দাড়ি ধর্মীয় প্রতীক যদি হয় রাজাকার আলবদরের পরিচয়, তবে এই পরিচয়েও আমিই এদেশের শ্রেষ্ঠ রাজাকার। এ দুটি পরিচয় নিয়েই আমি বাঁচতে চাই, মরতে চাই, পরকালে হাশরের ময়দানে উঠতে চাই।

যদি আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা সেদিন পরাস্ত হয়ে বিদেশেই রয়ে যেতেন তবে তাঁরাই চিরদিন বিজয়ী শক্তির লিখিত ইতিহাসে দুষ্কৃতকারী ও ভারতের চররূপে চিহ্নিত হয়ে রইতেন। বিজয় যেহেতু আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের হাতেই (হোক না তা মিত্রশক্তির সহায়তায়ই) এসেছে, তাই রাজাকার আলবদররা হয়ে গেল ঘৃণিত দালাল আর আমরা দেশপ্রেমের একচেটিয়া ইজারাদার। তাই এদের কেউই যে দেশটা বৃহৎ আগ্রাসী ভারতের হিংস্র থাবায় রক্তাক্ত হয়ে অসাড় চেতনাহীন হয়ে শেষ পর্যন্ত স্বাধীনতা হারাবে এ ভয়ে মুক্তিযুদ্ধের ও ভারতীয় সামরিক তৎপরতার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেনি একথা কি কেউ হলফ করে বলতে পারবেন? যদি তাই নয়, তবে দেশপ্রেমের ইজারাদার কেবল আমরাই হব, তারা হবে না কেন?

বিচারের বাণী নিভৃতে কাঁদে

কিন্তু যারা নির্বিচারে এ দেশের মুক্তিযোদ্ধা ও দেশেপ্রেমিক পরিবারসমূহে হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে, বাড়ি-ঘরে অগ্নিসংযোগ করেছে, মা-বোনের ওপর নৃশংস অত্যাচার চালিয়েছে, ভুক্তভোগী সেই বিধবা-স্বামীহারা, পুত্রহারা, পিতৃহারারা যদি সুনির্দিষ্ট অপরাধের সেই অপরাধীদের বিচার দাবি করে এবং আদালতে অভিযোগ উত্থাপন করে তবে তা উপেক্ষিত হবে এটাও কাম্য নয়। কবির ভাষায় : বিচারের বাণী নিভৃতে কাঁদে।

তবে সে অপরাধটা যদি কেবল পাকিস্তানের সপক্ষে মতামতপোষণে সীমাবদ্ধ থাকে তবে তা ব্যক্তি স্বাধীনতার পর্যায়েই পড়ে। এজন্য কারো বিচারের প্রশ্নই ওঠে না। আমাদের দেশের সাধারণ আলেম সমাজ এ পর্যায়ে পড়েন। সকলকেই নির্বিচারে দালাল বা যুদ্ধাপরাধী ঠাওরানো ঠিক হবে না।

কেন বাবা ১৫ আগস্ট ঘটালে?

একে একে কথার ফুলঝুড়ি ছেড়ে যাচ্ছেন মাওলানা জালালাবাদী তাঁর স্মৃতি দিয়ে গাঁথা কথামালা থেকে। এরই এক পর্যায়ে জানতে চাইলাম ১৫ আগস্ট নিয়ে তাঁর অনুভূতি ও ভাবনা কী? এ প্রশ্নের উত্তর দিলেন যথারীতি স্মৃতিচারণ থেকেই। '৭৫-এর হত্যাকাণ্ডের পর আমার সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারী কর্নেল ফারুক, মেজর ডালিম, কর্নেল রাশেদ চৌধুরী, মেজর বজলুল হুদা প্রমুখের কথা হয়েছে। একবার ব্যক্তিগত সাক্ষাতে কর্নেল রাশেদ চৌধুরীকে জিজ্ঞেস করলাম, কেন বাবা তোমরা ১৫ আগস্টের এত বড় একটা কাণ্ড করতে গেলে? জবাবে সে বলেছিল, আমরা সেদিন মরার জন্যই গিয়েছিলাম। আমাদের পিঠ দেয়ালে ঠেকে গিয়েছিল। আমরা জানতাম, কেউ তাদের বিরুদ্ধে যাবে না। আমরা ঝুঁকি নিয়ে আমাদের মুক্ত করতে সেদিন সে কাণ্ড করেছিলাম। তারপর একবার ধানমণ্ডিতে অবস্থিত ফ্রিডম পার্টির সদর দপ্তরে পার্টির দ্বিতীয় বার্ষিকী উপলক্ষে

অনুষ্ঠিত সম্মেলনে অতিথি হিসেবে আমাকে কর্নেল ফারুক আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। ফ্রিডম পার্টির সে অনুষ্ঠানে আমি আমার বক্তৃতায় এ প্রশ্ন উত্থাপন করলাম যে, আপনারা কোন্ যুক্তিতে এত বড় একটা হত্যাকাণ্ড ঘটালেন? না আছে আপনাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে অ্যাসাইনমেন্ট, না আছে জনগণের ম্যান্ডেট। এর পরিণতিতে যদি কোনো দিন বিচার হয় তাহলে আপনাদের পক্ষে কেউ দাঁড়াবে না। অবশ্য বক্তৃতায় একথা বলার আগেই সভাস্থলে প্রবেশের সময় পার্টির সেক্রেটারি জেনারেল মেজর বজলুল হুদা এমপির সঙ্গে এ বিষয়ে আমার কথা হয়। মেজর হুদা আমাকে দেখেই স্মিতহাস্যে অনুযোগের স্বরে বললেন, হুজুর, আপনার ভাই (মাওলানা উবায়দুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী) পত্রিকায় বিবৃতি দিয়ে আমাদের ফাঁসির দাবি করেছেন।

মেজর হুদা ভেবেছিলেন, আমি এজন্য কৈফিয়তের স্বরে কিছু বলব। উল্টো একটু রসিয়েই আমতা আমতা করে বললাম, এটাই তো আসল ফ্রিডম, মেজর সাহেব, মতামতের স্বাধীনতায় যদি বিশ্বাস না করেন তবে এ ফ্রিডম পার্টির মানেটা কি? এর মানে তো— যে যা-ই বিশ্বাস করে তাই তো অকপটে বলবে। যদি মতের স্বাধীনতায় বিশ্বাস না করেন তাহলে ফ্রিডম পার্টি কোন্ ফ্রিডমে বিশ্বাস করে? আমার এ জবাবে মেজর হুদা একেবারেই অপ্রস্তত হয়ে যান।

ঘড়ির কাঁটা ১০টা পেরিয়েছে

ঘড়ির কাঁটা তখন ১০ ছুঁয়ে গেছে। ফিরতে হবে অনেক দূর। তাই বারবার কথার ঝুড়ি বন্ধ করার তাগাদা। বিদায় বেলাও জানালেন আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ সব কথা। স্মরণ করলেন, আরো কয়েকজন আলেম মুক্তিযোদ্ধাকে। মাওলানা অলিউর রহমানকে তিনি শহীদ বুদ্ধিজীবী আখ্যা দিয়ে বলেন, ১৪ ডিসেম্বর অন্যান্য বুদ্ধিজীবীর মতো তাঁকেও ধরে নিয়ে রায়েরবাজার বধ্যভূমিতে হত্যা করা হয়। তিনি তাই নিঃসন্দেহে শহীদ আলেম বুদ্ধিজীবী। চাঁদপুরের মনপুরা সিনিয়র মাদরাসার সুপারিনটেন্ডেন্ট মাওলানা হাবিবুর রহমান কিংবা সিলেটেরই মাওলানা আবুল কালামের মতো আলেম মুক্তিযোদ্ধার কথা বলে তাদের সম্পর্কেও জানার অনুরোধ জানালেন আমাদেরকে।



মামা-ভাগনে (মাওলানা আবদুর রহমান ও আবদুর রব) : মুক্তিযুদ্ধের দুই লড়াকু সৈনিক

সাংবাদিক ইমদাদুল হক তৈয়ব ও যাত্রাবাড়ী মাদরাসা থেকে তাজুল ফাত্তাহকে নিয়ে আমরা যাব আলেম মুক্তিযোদ্ধার খোঁজে পার্শ্ববর্তী এলাকা ছনটেকে। রাত আটটায় মোটরসাইকেলযোগে রওনা হই তিনজন। মোটরসাইকেলে বসেই সাক্ষাৎকারের প্রস্তুতিস্বরূপ টুকিটাকি আলোচনা সেরে নেই। কাজলা পেট্রোল পাম্প পার হয়ে যখন মোটরসাইকেল বাম দিকের গলিপথে মোড় নিচ্ছিল, তখন বুলডোজারের আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাওয়া এক পাথুরে অট্টালিকার দিকে ইঙ্গিত করে তৈয়ব বললেন, সরকারি জায়গায় এই শাহী প্রাসাদ কে বানিয়েছে? তাজুল ফাত্তাহ জানাল, আমাদের সাবেক এমপি সালাহউদ্দিন।



আমাদের মন্ত্রী, এমপিরা সরকারি বিভিন্ন জায়গা-সম্পদ দখল করে বিশাল বিশাল অট্টালিকা বানিয়েছেন। অথচ যে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রাণবাজি রাখা যুদ্ধের কারণে আমরা এখন বুক ফুলিয়ে বলতে পারি— 'আমরা স্বাধীন' তারাই কি-না ভাঙা বাড়িতে দীন-হীন জীবনযাপন করছেন। এ বৈষম্য কিভাবে মেনে নেয়া যায়? যাই হোক সামান্য সময়ের মাঝে আমরা পৌঁছ যাই আমাদের গন্তব্যে। মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে সরাসরি মুক্তিযোদ্ধার মুখ থেকে বাস্তব গল্প শোনার অদম্য স্পৃহা নিয়ে আলোচনা শুরু করি। সে কথার রেশ ধরেই জীবনের বাঁকে বাঁকে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা ও মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন স্মৃতি নিয়ে কথা শুরু করেন মুক্তিযোদ্ধা মাওলানা আবদুর রহমান।

এখন যৌবন যার যুদ্ধে যাবার তার শ্রেষ্ঠ সময়

'মুক্তিযুদ্ধ' শব্দটি শুনলেই মনের মাঝে এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের চিত্র ভেসে ওঠে। দিনরাত সারাক্ষণ শুধু গোলাবারুদের হৃদয় কাঁপানো শব্দ চারদিকে। আজকে এখানে সংঘর্ষে এতজন মারা গেছে। কালকে ওখানে এতজন ধরা পড়েছে। অমুক দিন অমুকের ঘর-বাড়ি, ধন-সম্পদ সব জ্বালিয়ে দিয়েছে। এই ক্ষতি হয়েছে। ওই ক্ষতি। আরও কত কী! দেশ জুড়ে সংঘাতময় পরিস্থিতি ও নির্যাতনের মাত্রা বেড়ে যাওয়ার আগেই আমরা বুঝতে পারি সামনের দিনগুলো খুব একটা ভালো যাবে না। এজন্য যুদ্ধের আগে

থেকেই আমি মানসিকভাবে প্রস্তুত হয়েছিলাম সেই ভয়াবহ পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে। তখন আমি কুমিল্লার রামপুর মাদরাসায় জালালাইন জামাতে পড়তাম। দিন দিন যখন 'পাইদের' (পাকিস্তানিদের) নির্যাতন চরম আকার ধারণ করল তখন একদিন রামপুর মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা আবদুল গফুর সবাইকে ডাকলেন। ডেকে গরম একটা ভাষণ দিলেন। দেশপ্রেমের কথা শোনালেন। বোঝালেন, মজলুমকে সাহায্য করার জন্য। স্পষ্ট করেই বললেন, 'মা-বোনদের ইজ্জত বাঁচাতে তোমরা প্রত্যেকেই মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করো।' কথা শেষ হলে সবাই প্রস্তুত হয়ে গেল ট্রেনিং নেয়ার জন্য। ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে পাড়ি জমাল সীমান্তের ওপারে— ভারতে। তখন আমার পারিবারিক অবস্থা ছিল খুবই জটিল। বড় ভাই ভীষণ অসুস্থ। মা মারা গেছেন। এছাড়াও আছে তীব্র অর্থনৈতিক টানাপোড়েন। এরকম দুঃসময়ের মাঝে আমি কী করব। পরিবারের হাল ধরব নাকি দেশ বাঁচাব। কিছুই বুঝে উঠতে পারছিলাম না। শেষ পর্যন্ত দেশের মায়া-ভালোবাসা ও তার করুণ অবস্থাই আমার কাছে বড় হয়ে দেখা দেয়। আমার এক পরিবারের চেয়ে দেশের লাখও পরিবারের দাম অনেক বেশি। ছুটলাম আমিও। সরাসরি ভারত। পর্যাপ্ত কাপড়-চোপড় ও অর্থকড়িও সঙ্গে নিতে পারিনি। সেখানের পরিবেশ ভীষণ দুঃখ-কষ্টের হলেও আনন্দ পেতাম খুব। তখন আমাদের ট্রেনিং ক্যাম্পে ভারতের পক্ষ থেকে পরিচালক ছিলেন ক্যাপ্টেন জিয়া ধর। আর বাংলাদেশ থেকে ছিলেন ক্যাপ্টেন সুজাত আমান। আমরা একটানা চার মাস ট্রেনিং করি। রীতিমতো ট্রেনিং শেষে ফিরে আসি বাংলাদেশে।

পাছে লোকে কিছু বলে

আমি যে মাদরাসা পড়ুয়া তা কেউ জানত না। একদিন আমাদের ক্যাম্পে একটি জানাজা এলো। জানাজা কে পড়াবে এ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা শুরু হয়ে গেল সবার মাঝে। আমার মুখে হালকা হালকা দাড়ি। নিয়মিত নামাজ পড়তাম সেখানে। আমাদের চৌদ্দশ' সাথীর ভেতর থেকে হঠাৎ আমাকে ডেকে বসলেন দেবীদ্বার কলেজের প্রিন্সিপ্যাল স্যার। বললেন, তুমিই নামাজ পড়াবে। আমি মনে মনে খুশি হয়ে বললাম, স্যার কি গায়ে দিয়ে নামাজ পড়াব? আমার গায়ে যে পোশাক আছে তা খুবই ময়লা। তাছাড়া পাঞ্জাবি ছাড়া নামাজ পড়াব কেমন করে? স্যার বললেন, তোমার কাছে কি অন্য কোনো পোশাক নেই? বললাম, আছে। আবার স্যার বললেন, তাহলে তাই পরে নাও। আমি তখন লুকিয়ে রাখা পাঞ্জাবি-পাজামা পরে ফেললাম। আমার গায়ে এই পোশাক দেখে তো সবাই অবাক। আরে এ তো মাদরাসা পড়ুয়া হুজুরদের পোশাক! বিস্ময় নিয়ে সবাই জানতে চাইল— আপনি কি আলেম? বললাম, হ্যাঁ, আমি রামপুর মাদরাসায় পড়ি। তখনই সবাই জানল আমি মাদরাসা পড়ুয়া। সেখানে আরও কয়েকজন আলেম ছিলেন। তবে তারা সবাই নিজেদের এই পরিচয়টা গোপন করে রাখতেন। কেননা, একথা শুনলে হয়তোবা কেউ কেউ আমাদের পাকিস্তানি বলে সন্দেহ করতে পারে। এই সন্দেহ ও ভয়ের কারণেই আলেমরা তখন নিজেদের খুব লুকিয়ে রাখতেন।

অপারেশন ইন্ডিয়া টু হোমনা নদী

ভারত থেকে রওনা দিয়েছিলাম এশার নামাজের পর। ট্রেনিং শেষে বলা হয়েছিল সবসময় প্রস্তুত থাকতে। যে কোনো মুহূর্তে রণাঙ্গনে পাঠানো হবে। মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকলেও তখন আমাদের শারীরিক প্রস্তুতি ছিল না। এশার নামাজ পড়েছি কেবল। ট্রেনিং শেষ হয়ে যাওয়ায় এখন আর সেই লেফট-রাইটের নির্যাতন নেই। তাই অনেকটা ভয় ও চিন্তামুক্ত। এখন হয়তোবা রাতের আহারের ব্যবস্থা হবে। তারপর গা এলিয়ে ঘুম। হোক না সেটা মাটির বিছানায়। তবও তো ঘুমের সুযোগ পাচ্ছি। সারাদিন হাড়ভাঙা পরিশ্রমের পর ঘুমের কথা ভাবলে যে কারোরই চোখ চকচক করে ওঠে। কিন্তু সেদিন আমাদের অবস্থা হলো তার বিপরীত। ঘোষণা এলো, এখনই বেরুতে হবে। ঘুম নেই। খাবার যে যা পারো মাত্র কয়েক মিনিটে সেরে নাও। হাতে একদম সময় নেই। কুইক! আমি কেমন যেন ঘটনার ডান-বাম বুঝতে পারছিলাম না। ঘুমাব, খাবার খাব, নাকি সবার সঙ্গে দৌড়ে নৌকায় গিয়ে উঠব। চেয়ে দেখি, সবাই ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়ছে। কেউ নিজেদের ছোট গাট্টি গোছাচ্ছে। কেউবা নাক-চোখ বন্ধ করে দ্রুত পেটের সম্বল করে নিচ্ছে। কেউবা ছুটছে নৌকার দিকে। আমি দাঁড়িয়ে দেখছি চারদিক। কিন্তু কখন যে নিজের অজান্তেই আমার ছোট জাম্বিলখানা নিয়ে নৌকায় গিয়ে উঠলাম কিছুই মনে নেই। সব ঘটে গেল মাত্র কয়েক মুহূর্তের মধ্যে। যেন আমি একটা ঘোরের মধ্যে ছিলাম।

আমাদের নৌকা ভারতের হাতিয়া নদীর বুক চিরে মুলতান হয়ে ছুটছে বাংলাদেশের দিকে। বৈঠার ছলাৎ ছলাৎ আওয়াজ যেন রাতের নিস্তব্ধতাকে কাচের টুকরোর মতো ভেঙে খানখান করে দিচ্ছে বারবার। আমাদের অনুসরণ করে আসছে পেছনে আরেকটি নৌকা। আমার সঙ্গে আছে ভাগনে আব্দুর রব। বিশজন করে চল্লিশজন যাত্রী দু' নৌকায়। সবাই চুপচাপ বসে আছি। কেউবা ঝিমুচ্ছে। দু'চারজন ইশারা-ইঙ্গিতে কথাবার্তা বলছে পরস্পর। শব্দ করা মানা। দূরে কোথাও কোনো শব্দ হলে সেখানেই জেঁকে বসছে সজাগ চোখগুলো। আল্লাহর রহমতকেই সঙ্গে নিয়ে ছুটছে আমাদের নৌকা দু'টি। নদীর বুক চিরে। ঘন অন্ধকার, মৃত্যুপথে।

সারারাত একটানা সফর করে পরদিন দুপুরের দিকে আমাদের নৌকা দু'টি এসে ভিড়ে হোমনার উজানচর ঘাটে। নৌকা থেকে উঠে আমরা কেউ আর মাটিতে নামতে পারছিলাম না। হাড্ডিগুলো যেন সব বরফের মতো জমে গেছে। পেটে ক্ষুধা। চোখে ঘুম। শরীর ক্লান্ত। শঙ্কা ও অজানার পথ সামনে। শত্রুরা ওঁৎ পেতে আছে সবখানে। ক্যাপ্টেন ফরিদ ওই ঘাটে পেট্রোল ডিউটি করছিলেন। নৌকা থেকে নামার পর ক্যাপ্টেন ফরিদ আহমেদের সাহায্যে প্রথমে আমরা পেয়ারি নাথের বাড়িতে অবস্থান নেই। তার কিছুক্ষণ পরই রওনা দেই আমাদের মূল ক্যাম্পের দিকে। সেখান থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরত্ব। রাস্তা সামান্য হলেও শরীর তা মানতে চাইছে না। এখন প্রয়োজন বিশ্রাম, ঘুম ও খাওয়ার। অগত্যা, সবাই হেঁটে হেঁটেই এসে হাজির হলাম আমাদের মূল ক্যাম্পে। বাঞ্ছারামপুর থানার রাহুদি গ্রামে অবস্থিত ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের এ ক্যাম্পটি।

সেখানে আমরাই প্রথম না, আমাদের আগেও শ' খানেক মুক্তিযোদ্ধা অবস্থান নিয়েছিলেন। আমরা পৌঁছেই দেখি তারা সবাই হাতিয়ার নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে লড়াই করতে। সঙ্গী মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে অস্ত্র দেখে আমাদের মনও আনন্দে নেচে উঠল এবার সরাসরি ফাইট করার সুযোগ পেয়ে। আমরা গিয়েই বললাম, তোমরা একা নও। আমরাও যাচ্ছি তোমাদের সঙ্গে। দল এবার আগের চেয়ে ভারী। তারা প্রথমে আমাদের নিতে চাইল না। বলল, তোমরা ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত। আজ তোমরা ক্যাম্পে থাকো, পরবর্তী ফাইটে যেও। কিন্তু আমরা নাছোড়বান্দা। গোঁ ধরলাম সবাই। আমরা যাবই তোমাদের সঙ্গে। আরাম করার জন্য এখানে আসিনি। কষ্ট তো হবেই। তবুও আমরা তাতে রাজি। পরে তারা খুশি হয়েই আমাদের সঙ্গে নিল। রওনা করলাম আমরা জীবনের প্রথম সম্মুখ লড়াইয়ে। বাস্তবতার মুখোমুখি হতে। ট্রেনিং নিয়েছি। স্টেনগান, এলএমজিগুলো কিভাবে চালাতে হয় বেশ ভালোভাবেই শিখেছি। ক্রলিং করে গোপনে কিভাবে নির্দিষ্ট গন্তব্যে যেতে হয় তাও জেনেছি। কিন্তু কখনও সরাসরি 'পাইদের' বিরুদ্ধে লড়ার অভিজ্ঞতা অর্জন করিনি। আজ হচ্ছে সেই অভিজ্ঞতা অর্জনের মাহেন্দ্রক্ষণ। একদম হাতে-কলমে। যাদের কারণে দেশ ছেড়েছি, অসুস্থ ভাইয়ের সেবা না করে দূরে সরে আছি। শরীরের সব শক্তি ব্যয় করে ট্রেনিং নিয়েছি তাদের শায়েস্তা করতে এগোচ্ছি, ভাবতেই মনটা আনন্দে ভরে গেল। এগিয়ে চলছি আমরা। সঙ্গী কতজন হবে তা তখনও সঠিকভাবে আমি জানি না। জনা বিশেক হবে। গন্তব্য আমাদের হোমনা নদীর পাড়। আমাদের নেতৃত্বে আছে কমান্ডার ফরিদ আহমেদ। নদীর কাছাকাছি আসার আগেই কিছুটা দূর থেকে আমরা শুয়ে ক্রলিং করে এগোতে লাগলাম। প্রায় সবার হাতেই হালকা অস্ত্র। খালি হাতে ক্রলিং করা বেশ দুষ্কর। বেশি দূর ক্রলিং করলে আবার হাত-কনুইয়ের চামড়া উঠে যায়। এর ওপর আবার অস্ত্র নিয়ে ঝোপঝাড় দিয়ে ক্রলিং তো আরও মারাত্মক ব্যাপার।

আস্তে আস্তে আমরা সবাই এসে হাজির হলাম হোমনা নদীর পাড়ে। কিন্তু ততক্ষণে শিকার হাত থেকে ফসকে গেছে। আমাদের আগমনের সংবাদ পেয়ে 'পাইরা' লেজ গুটিয়ে আগেই পালিয়ে গেছে। আমরা এসে দেখি নদীর বুকে বন্দুকের রেঞ্জের বাইরে সারিবদ্ধ কয়েকটি বাতি। আমাদের থেকে আস্তে আস্তে দূরে সরে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ পর একে একে সব বাতিই আমাদের চোখের আড়ালে চলে গেল। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে ফিরে চললাম আমরা ক্যাম্পের উদ্দেশ্যে। চোখে আমাদের প্রতিশোধের আগুন। মনে শিকার হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার বিষাদ।

'পাইরা' আইলো রে...

দেশের পরিস্থিতি ভালো নয়। প্রতিদিনই সংবাদ পাচ্ছি 'পাইরা' নানাভাবে বাঙালিদের প্রতি জুলুম করছে। বাড়ি-ঘর জ্বালিয়ে দিচ্ছে। শিশুদের নিক্ষেপ করছে সেই আগুনে। মেয়েদের কথা শুনলেই তাদের জিবে পানি এসে যায়। প্রতিযোগিতা লেগে পড়ে কে কাকে আগে ভোগ করবে। বাড়িতে তরুণ কোনো ছেলে পেলেই মুক্তিবাহিনী সন্দেহে ফায়ার স্কোয়াডের সামনে দাঁড় করায়। তাই সারা বাংলায় তখন বিভীষিকাময় এক

ভয়ংকর দানবের নাম হয়ে যায় পাক মিলিটারি। তখন কেউ যদি একবার বলে 'আইল'। ব্যস, সবাই দে দৌড়। যে যেদিকে পারো দৌড়ে পালাও। আর একে মুহূর্তও দেরি নয়। ধেয়ে আসছে দানবের পাল।

ময়মনসিংহের ঘটনা। মুক্তাগাছা থানার জয়দা গ্রাম। একদিন হঠাৎ 'পাইরা' জানতে পারল ওই গ্রামে ছবর আলী নামের এক মুক্তিযোদ্ধা আছে। স্ত্রীসহ এক ছেলে তিন মেয়ে রেখে যুদ্ধে গেছে সে। এলাকার স্থানীয় বাসিন্দা রাজাকার আব্দুল মজিদের মাধ্যমে তারা এ গুরুত্বপূর্ণ সংবাদটি পায়। খবর পাওয়া মাত্রই কয়েক ইউনিট সেনা ছোটে জয়দা গ্রামের উদ্দেশে। যোগাযোগ ব্যবস্থা নিম্নমানের হওয়ায় তারা গাড়ি না নিয়ে হেঁটেই রওনা দেয়। ছবর আলীর চার সন্তানের সবাই ছিল বয়সে ছোট। বড় মেয়ে ফজিলা খাতুনের বয়সই ছিল মাত্র দশ বছর। 'পাইরা' যখন জয়দা গ্রামের কাছাকাছি এসে পৌঁছে তখন এলাকাবাসী জানতে পারল 'পাইরা' আসছে, সবাই তখন এলাকা ছেড়ে দে ছুট। 'পাইরা' আসছিল পশ্চিম দিক থেকে। তাই সবাই দৌড় শুরু করে পূর্ব দিকে মইশতারা গ্রামের উদ্দেশে। মুক্তিযোদ্ধা ছবর আলীর পরিবারে সেদিন ভালো কিছু খাবারের আয়োজন করা হয়েছিল। খই, পায়েশ ও তেলে পিঠা ভাজা হয়েছিল। খাবার যখন প্রায় প্রস্তুতির পথে তখনই এলো এই পশুগুলোর আগমনের দুঃসংবাদ। পালিয়ে যায় এলাকার সবাই।

সবার সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধা ছবর আলীর পরিবারের লোকজনও পালিয়ে যাওয়ার এক সপ্তাহ পর নিজ বাড়িতে ফেরে। কিন্তু তখন বাড়িতে ফিরলে কী হবে। সেখানে ছিল না তাদের মজাদার খাবারে সাজিয়ে রাখা সেই ছোট্ট ঘরটি। বরং যা ছিল তা হলো জ্বলে-পুড়ে শেষ হয়ে যাওয়া একটি গ্রামের ধ্বংসাবশেষ। কয়েকটি ঘরের বিরান ভূমি।

রুহুদিয়া গ্রামের ক্যাম্পটি আমাদের জন্য এক সময় অভয়ারণ্যে পরিণত হয়ে গেল। এখানে থেকে আমরা বিভিন্ন দিকে খুব সহজেই যুদ্ধ পরিচালনা করতে পারতাম। 'পাইরাও' কখনও আমাদের এখানে ধাওয়া করতে আসেনি। আশপাশে কোথাও 'পাইরা' এসেছে খবর পেলে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে যেতাম তাদের প্রতিরোধ করতে।

একদিন সন্ধ্যার পর হঠাৎ এক মেয়ে সংবাদ নিয়ে এলো হোমনা নদীতে 'পাইদের' কয়েকটি পণ্যবাহী বোট দেখা যাচ্ছে। 'পাইদের' আগমনের সংবাদে সাধারণ মানুষজন ঘর-বাড়ি ছেড়ে উল্টো দিকে পালিয়ে যেত। আমাদের অবস্থা ছিল তার পুরোপুরি বিপরীত। সংবাদ ফেলেই আমরা ছুটতাম সেদিকে, তারা আছে যেদিকে। যুদ্ধ-মৃত্যুর নেশায় মন আমাদের পাগল হয়ে যেত। তখন খাবার, বিশ্রাম, কষ্ট কোনো কিছুর কথাই মনে থাকত না আর। মারতে হবে, রক্ত ঝরাতে হবে, প্রতিশোধের আগুন নেভাতে হবে, তাড়াতে হবে তাদের এ দেশ থেকে— পুরো চেতনায় তখন আমাদের এ আগুনই জ্বলে উঠত। তখন এমন একটা মুহূর্ত যে ক্যাম্পে যোদ্ধা নেই বললেই চলে। সবাই এক এলাকায় অ্যাম্বুশ করতে গেছে। তাছাড়া ক্যাপ্টেন ফরিদ আহমেদসহ কয়েকজন আমাদের অসুস্থ সাথী মাহবুবকে দেখতে গেছে দূরে কোথাও। তাই লোক আমরা মাত্র হাতেগোনা কয়েকজন। অস্ত্রও নেই। তবুও সাহস নিয়ে এগিয়ে গেলাম নদীর দিকে।

গিয়েই প্রথম গুনে ফেললাম, শত্রুদের তিনটি বোট। সবগুলোর মাঝে সৈন্য ভরা। তবুও প্রতিজ্ঞা, জানে ছাড়ব না একজনকেও। যদিও লোক আমরা মাত্র জনা পাঁচেক। সঙ্গে আছে আমার ভাগনে আবদুর রব, বর্তমানে সে রাজারবাগের পুলিশ অফিসার। অস্ত্র মাত্র পাঁচটি— একটি এলএমজি, দুটি এসএলআর, একটি স্টেনগান ও একটি কাটা রাইফেল। 'পাইরা' সেখানে কিছুটা বুদ্ধি খাটাতে চেয়েছিল। বোটগুলো নদীর মাঝে এলোপাতাড়ি করে রেখে ইঞ্জিন বন্ধ করে রেখেছিল। যাতে বাতাসে আস্তে আস্তে সেগুলো পাড়ে চলে আসে। চারদিক অন্ধকার থাকায় কেউ আর তাহলে টের পাবে না। এ সুযোগে তারা কেল্লা ফতেহ করতে চেয়েছিল। কিন্তু আমরা খুব সহজেই ওদের কূটকৌশল পণ্ড করে দেই। ধীরে ধীরে যখন বোটগুলো আমাদের রেঞ্জের মধ্যে চলে এলো। অমনি নদীর পাড় থেকে ঝোপের আড়ালে বসে একযোগে ফায়ার করি। এক সঙ্গে গর্জে ওঠে পাঁচটি আগ্নেয়াস্ত্র। হঠাৎ তারা এরকম প্রতিকূল অবস্থা দেখে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। কি করবে, পাল্টা ফায়ার করবে নাকি ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে বোট দূরে সরিয়ে নেবে। আপাতত গুলি করলেইবা কোথায় করবে। সবখানে তো অন্ধকার। কিছুই দেখা যায় না। খালি কয়েকটা মেশিনগানের একঝাঁক গুলি জেঁকে ধরছে বোটে দাঁড়িয়ে ও বসে থাকা যোদ্ধাদের। গুলি থেকে রক্ষা পাওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছে তাদের জন্য। আমাদের গুলি শুরু করার একটু পরই তারাও পাল্টা আক্রমণ শুরু করে। মেশিনগানের গুলির সঙ্গে সঙ্গে মর্টারের শেলও নিক্ষেপ শুরু করে তারা। আমাদের পাঁচ অস্ত্রের গুলি যদি পাঁচটি হয়ে থাকে তাহলে তারা চারদিক ছুড়ছে পাঁচশ' গুলি ও মর্টারের শেল। এরকম পরিস্থিতি তখন সারাদেশেই ছিল। বাঙালিরা একটা করলে তারা গুলি করত একশ'। আমরা তখন গুলি ও মর্টারের শেলের ঝড়ের পাশাপাশি শুনতে পেলাম ভয়ংকর এক 'পাইয়ের' গর্জন— আভি ফায়ার ডালো! এধারছে ফায়ার ডালো! ওধারছে ফায়ার ডালো!' তবুও আমরা দমবার পাত্র নই। যে করেই হোক তাদের আজ সাইজ করবই। আল্লাহর নাম নিয়ে সমান দূরত্ব বজায় রেখে পাঁচজন পাঁচ জায়গা থেকে থেমে থেমে ফায়ার করতে লাগলাম। এভাবে চলতে থাকল কয়েক ঘণ্টা। সবশেষে তারা যখন বুঝল এভাবে এলোপাতাড়ি গোলাগুলি করে লাভ হবে না। তখন তারা ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে আস্তে আস্তে পিছু হটতে লাগল। গোলাগুলি চলার সময় তাদের কয়েকজনকে আমাদের গুলি খেয়ে পানিতে পড়ে যেতে দেখেছি। পরদিন নদীতে আমরা কোনো লাশ দেখতে পাইনি। তবে এর দু'তিন দিন পর শুনেছি, পাশের গ্রামের লোকেরা নাকি নদীতে ফুলে যাওয়া দুটি 'পাইয়ের' লাশ দেখতে পেয়েছে!

বেঈমান, নিমকহারাম...

হঠাৎ আমরা একটি সাপ লালন শুরু করি। দুধ-কলা খাইয়ে কিভাবে যে সাপটি লালন শুরু করলাম পরে বহু চিন্তাফিকির করেও আমরা তা বের করতে পারিনি। চেহারা-সুরত আর বেশ-পোশাকে একশ' ভাগ বাঙালি। বাংলা ও বাংলা মানচিত্রের জন্য আমাদের চেয়ে বেশি ভালোবাসা যেন ছিল তার হৃদয়ে। কিন্তু ভেতরে সে ছিল পুরোপুরি পাকিস্তানি। দালালি করে বেড়াত সে। রাজাকার। কথায় মধু থাকলেও জিহ্বার নিচে

বিষমাখা চাকু লুকিয়ে রাখত। দেশ আরও দ্রুত স্বাধীন হতো শুধু এই নিমকহারামিদের কারণেই আমাদের সংঘাতের দিনগুলো দীর্ঘ হয়েছিল। কারণ, যুদ্ধের ময়দানে বাঙালিদের ছিল ভীষণ বিচক্ষণতা। আর পাকিস্তানিদের ছিল বিচক্ষণতাহীন সাহসিকতা। রণাঙ্গনে 'সাহস' বিজয় আনতে পারলেও বিচক্ষণতার অভাবে বিপর্যয় আসে সবসময়ই। সেই রাজাকারদের তখন জানা দরকার ছিল, দেশ এক সময় অবশ্যই স্বাধীন হবে। তখন পাকিস্তানিদের হয়তোবা অনেকেই মাফ করে দেবে। কিন্তু তাদের কেউ মাফ করবে না।

ওই রাজাকার আমাদের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে মিশত। দরদমাখা কণ্ঠে খুব দামি দামি কথা বলত। সুযোগে আমাদের কাছ থেকেও তথ্য বের করে নিয়ে যেত, আমরা বুঝতামই না। আমাদের প্রতিদিনের খবরাখবর সে নিয়মিত পাকিস্তানিদের ক্যাম্পে সরবরাহ করত। আমরা এসব তখন কিছুই বুঝিনি। শত্রুরা আমাদের যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করে হঠাৎ একদিন আমাদের ওপর চূড়ান্ত আক্রমণ করে বসে। বিভীষিকাময় অবস্থা হয়েছিল সেদিন।

সে এক ভয়াবহ যুদ্ধ

আমাদের ক্যাম্পের দক্ষিণে ছিল নদী। পশ্চিমে জলাধার, ধানের জমি। আর পেছন দিকে অর্ধকিলোমিটার দূরে পূর্ব-পশ্চিম বরাবর ছিল বড় রাস্তা। একদিন হঠাৎ শত্রুরা এই তিন দিক থেকে একযোগে আক্রমণ শুরু করে। আমরা কিছু বুঝে ওঠার আগেই শত্রুদের বন্দুকের নলের মুখে পড়ে যাই সবাই।

আমরা তখন ক্যাম্পে ছিলাম মোট চল্লিশজন। নাইন বেঙ্গলের আব্দুল আজিজ ছাড়া বড় কোনো কমান্ডার ক্যাম্পে ছিলেন না। আমি পেট্রোল ডিউটি শেষে মাত্র ক্যাম্পে ফিরে অস্ত্র রাখছি, ঠিক সেই মুহূর্তেই আমাদের ওপর শুরু হয় বৃষ্টি। সেই বৃষ্টি পানির নয়। বুলেট, মর্টার শেল ও মাইনের বৃষ্টি ছিল ওটা।

প্রথম আক্রমণ হয় নদীর দিকে থেকে। তারা ভেবেছিল এতে আমরা সবাই নদীর দিকে অস্ত্র তাক করব। আর তারা এ সুযোগে পেছন দিক থেকে ঝাঁপিয়ে পড়বে। আব্দুল আজিজ ছিলেন খুবই বিচক্ষণ। তিনি শুরুতেই সব কিছু টের পেয়ে যান। তাই সঙ্গে সঙ্গে বলেন, তোমরা সবাই এ জায়গা ছেড়ে দূরে চলে যাও। শত্রু আমাদের ঘিরে ফেলেছে। তখন আমরা সবাই যে যেদিকে পারলাম লুকাতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু তখনই দেখি আমাদের চারদিক থেকে ঝড়ের মতো বুলেট, বোমা আসছে। আমি কি করব ভেবে পাই না। অস্ত্র হাতে গুলি করতে করতে সামনে এগুতে থাকি। ট্রিগার চেপে ধরে এক জায়গায় পজিশন নিয়ে দাঁড়িয়ে যাই। বুঝতে পারি আমাদের এই পিপীলিকার শক্তি দানবের দাপটের সামনে বেশিক্ষণ টিকবে না। তবুও সাহস নিয়ে প্রতিরোধ করতে থাকি। আল্লাহর কি মেহেরবানী। হঠাৎ আমাদের সামনের কয়েকটি পাকসেনার দৃষ্টি পড়ে গেল পালিয়ে যাওয়া ভীতসন্ত্রস্ত কিছু সুন্দরী মেয়ের ওপর। তাদের কয়েকজন ছুটল সে মেয়েগুলোর পেছনে। ব্যস, এ সুযোগেই আমরা আমাদের কাজ বাগিয়ে নেই। ফায়ার করে সামনের বাকি দু'চারটাকে মেরে রাস্তা সাফ করে ফেলি। ওই রাস্তা দিয়েই

আমরা সবাই সটকে পড়ি। এলাকা ছেড়ে দূরে অবস্থান নেই। রক্ষা পাই সেদিনের মতো।

মনে পড়ে শহীদ ভাইদের

সেদিনের ওই ভয়াবহ মুহূর্তগুলোর কথা মনে হলে এখনও আমার শরীর হিম হয়ে যায়। কাঁটা দিয়ে ওঠে। সেদিন আমাদের চারজন সাহসী যোদ্ধা শহীদ হন। আর এলাকার যত বাড়ি-ঘর ছিল 'পাইরা' সব জ্বালিয়ে ধ্বংস করে ফেলে। পরে আমরা যখন এলাকায় ফিরে যাই তখন কেবল ছাই আর সাধারণ মানুষের লাশের স্তূপই দেখতে পাই। আমাদের শহীদ চার সাথীর চেহারা দেখে আমরা প্রথমে তাদের চিনতে পারিনি। পরে চিনেছিলাম গায়ের পোশাক ও শরীরের নানা চিহ্ন দেখে।

চাচা আপন প্রাণ বাঁচা

আমাদের এলাকায় এক হিন্দু গণক ছিল। সে অনেক কিছুই আকাশের তারা দেখে বলে দিতে পারত। 'পাইরা' যখন আমাদের ওপর চূড়ান্ত আক্রমণ করে এর দু'দিন আগেই জেনে যায় এ বিপদের কথা সেই গণক। আমাদেরও বলে, তোমরা এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যাও। বিপদ আসছে জেনেও সে তা মোকাবিলা করার প্রস্তুতি নেয়নি। বরং আপন জান বাঁচাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। সবাইকে বিপদে রেখে নিজের জান ও গাট্টি নিয়ে এলাকা ছেড়ে দেয় চম্পট। ঠিক দু'দিন পরেই 'পাইরা' আমাদের ওপর এই নির্মম ও ধ্বংসাত্মক হামলা চালায়।

এর কিছুদিন আগেও এরকম এক কাহিনী ঘটেছিল। ছুটি নিয়ে একটি খুবই জরুরি কাজে বাড়ি আসার চেষ্টা করি। রওনা দেয়ার আগে আমাদের সঙ্গী মোস্তফা ভাই একটি চিঠি দিয়েছিলেন তার বাড়িতে পৌঁছে দেয়ার জন্য। সেবার অর্ধেক রাস্তা এসে আবার ফেরত যাই ক্যাম্পে। বাড়িতে আসতে পারিনি। পথে তুমুল যুদ্ধ চলছে। কোনো দিকে চলা-ফেরার পথ নেই। অগত্যা ফিরেই গেলাম। ক্যাম্পে ঢোকার আগেই পথে দেখা জল্লাদ ভাইয়ের সঙ্গে। সবাই ডাকত তাই আমিও জল্লাদ ভাই বলে ডাকতাম। প্রকৃত নাম কি ছিল তার, জানতে চাইনি কখনও। কেনইবা তাকে এ নামে ডাকা হতো তাও খুঁজতে যাইনি। জল্লাদ ভাই সবগুলো দাঁত বের করে দিয়ে বলল, তোমরা যে আজ যেতে পারবে না, আমি জানি। কিভাবে জানলে? অবাক হয়ে জানতে চাই। সে বলল, গণক জানিয়েছে আমাকে।

তোমাকে পাওয়ার জন্যে হে স্বাধীনতা

দেশ যখন স্বাধীন হয় তখন আমি ছুটি নিয়ে বাড়িতে ছিলাম। যখন শুনলাম আমরা স্বাধীন, তখন কি যে আনন্দ পেয়েছিলাম তা বলে বুঝাতে পারব না। আর ওদিকে আমাদের এলাকায় হয়েছিল সবচেয়ে তুমুল যুদ্ধ। এমনকি দীর্ঘ ষোল দিন পরে স্বাধীন হয় আমাদের এলাকা।

কি পেয়েছি কি পাইনি তা হিসাব করার সময় কোথায়

আমরা যুদ্ধ করেছি দেশ স্বাধীন করার জন্য। এদেশের মানুষকে জালিমের হাত থেকে মুক্ত করার জন্য। আমাদের মাদ্রাসায় এই শিক্ষাই দেয়া হয়, 'কোথাও মজলুম দেখলে

সাহায্য করো।' দেশ স্বাধীন করে দেশের সম্পদ ইচ্ছেমতো ভোগ করব, বিলাসী জীবনযাপন করব এ রকম ইচ্ছা তখনও ছিল না, এখনও নেই। এই দেখুন, আমার অবস্থা। এরকম সাদামাটাই আমার জীবন। কোনো বিত্ত-বৈভবের ছোঁয়া নেই এখানে। স্বাধীনতার পর প্রথমে আমি কাপড়ের ব্যবসা করতাম। এর কিছুদিন পর দ্বীনি খেদমতের লক্ষ্যে আশরাফুল উলুম নামের এ মাদরাসাটি প্রতিষ্ঠা করি। এখনও এখানেই আছি।

জাতির জনক আর স্বাধীনতার ঘোষক নিয়ে মিছেমিছি বিতর্ক

যে যাই বলুক না কেন, স্বাধীনতার ঘোষক কিন্তু সত্যিই জিয়াউর রহমান, এতে সন্দেহ নেই। আমি নিজের কানে শুনেছি, জিয়াউর রহমান দেশের স্বাধীনতার ঘোষণা করেছেন তবে শেখ সাহেবের পক্ষে। এখন যে আমরা ঘোষক নিয়ে নানা বিতর্ক শুনি এ সবই হচ্ছে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য।

ব্যক্তিগতভাবে আমার কাছে শেখ মুজিব ও জিয়াউর রহমানের সম্পর্ক অনেকটা বাপ-বেটার মতো। তারা পরস্পর খুবই আন্তরিক ছিলেন। শেখ মুজিব ও জিয়াউর রহমান দু'জনই খুবই সৎ ও নিষ্ঠাবান ছিলেন। জাতির কাণ্ডারি দু'জনই। এখন যে তাদের নামে এত মুণ্ডুপাত করা হয় সবই বিদ্বেষপ্রসূত ও রাজনীতির মারপ্যাঁচ। শেখ সাহেব তখন সত্যিই এক অনুপম ব্যক্তিত্ব ও জাতির পথপ্রদর্শক ছিলেন। সমস্যা ছিল পরিবার ও আশপাশের লোকদের নিয়ে। তারাই শেখ সাহেবের বদনাম করেছে। তার ছেলে শেখ কামাল শয়তানের শেষ ছিল। সব রকমের কুকর্মে ভীষণ পারদর্শী ছিল। একদিন রাস্তায় হাঁটছিলাম। তখন এক পাগলের মুখে একটি কবিতা শুনি। পরবর্তী সময়ে এ পঙক্তিগুলো বেশ প্রসিদ্ধি লাভ করে।

ছিলাম ছিলাম ছিলাম ভালো
পাকিস্তানের আমলে
বাংলাদেশে হাইজ্যাক আনল
শেখের পুতে কামালে।

যদিও এটি একটি পাগলের কথা কিন্তু এতে শতভাগ বাস্তবতা ছিল। তা স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার মতো। কামালের অবস্থা ছিল এখনকার তারেকের মতো। হঠাৎ করে ক্ষমতার স্বাদ পেয়ে সে অন্ধ ও বেপরোয়া হয়ে গিয়েছিল। যার পরিণামে পুরো পরিবারের সবাইকে মরতে হয়েছে।

নির্মম, মর্মন্তুদ!

একদিন শেখ সাহেব দূর সফর থেকে বাসায় ফিরলেন। শরীর ভীষণ ক্লান্ত। মনটা তার চেয়েও বেশি খারাপ। ওপর দিকে পা তুলে শুয়ে ব্যারিস্টার ফরিদকে বললেন, ফরিদ! দেশের মানুষ যে আমাকে বেঈমান বলবে। এখন আমি কী করি বলো তো?। ফরিদ বললেন, স্যার! মাত্র চারটা অঙ্গ কেটে ফেলে দিন (চারজনকে শেষ করে ফেলুন) সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। তখন শেখ সাহেব বললেন, আমি কাকে মেরে ফেলব বলো। যার দিকেই তাকাই সেই আমার ভাই, সেই আমার বন্ধু, না হয় আমার সন্তান। কীভাবে

এদের আমি মেরে ফেলতে বলি! শেখ সাহেব পরে আর কাউকে মারতে পারেন নি। কিন্তু তিনি না পারলেও পেরেছিলেন পুরো পরিবারের সঙ্গে নির্মমভাবে নিহত হতে!!

দ্রব্যমূল্যের পাগলাঘোড়া

শেখের আমলে দ্রব্যমূল্য হুহু করে বেড়ে যেত। দেখা গেছে, ভাষণে শেখ সাহেব বললেন, আজ থেকে দ্রব্যমূল্য কমিয়ে সাধারণ জনগণের নাগালের মধ্যে নামিয়ে আনা হবে। তিনি যে ভাষণে বলতেন অতটুকুই শেষ। এমনকি সে দিনই ভাষণ শেষে দেখা যেত দাম আগের চেয়ে আরও বেড়ে গেছে। এটা আমার কাছে তার একটি ব্যর্থতাই মনে হয়েছে।

সিন্ডিকেট?

এর প্রধান কারণ ছিল আওয়ামী লীগবিরোধী 'ন্যাপ'। তারা হাজার হাজার বস্তা খাবার নদীতে ফেলে দিত। এতেই সংকট খুব তীব্র হয়েছিল। এই 'ন্যাপরা' যুদ্ধের সময় ট্রেনিং করত। মুক্তিযোদ্ধার নাম নিয়েই চলাফেরা করত। কিন্তু যুদ্ধে যেত না। দূরে থাকত।

মুসলিম সমাজের বিষফোঁড়া

মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী ছিল যারা মুসলিম লীগ তাদের অন্যতম। জামায়াতে ইসলামীরাও ছিল একই ভূমিকায়। এই দলটি সত্যিই একটি ধূর্ত ও ভ্রষ্ট দল। তারা কখনোই ইসলাম ও মুসলমানদের পক্ষের শক্তি হতে পারে না। এ পর্যন্ত তারা শুধু ইসলামের ক্ষতিই করে এসেছে। তাদের নাম হলো 'জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ'। নামের শুরুতেই আছে 'জামায়াত' শব্দ। অথচ তারা কিন্তু আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের অনুসারী নয়। বরং তারা মানে-অনুকরণ করে মি. মওদুদীকে। মওদুদীর মতবাদে বিশ্বাসী সবাই। আর মি. মওদুদী যে লাইনচ্যুত এ ব্যাপারে সব আলেম একমত। তাই অতীত থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত কোনও আলেমই কখনোই তাদের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেনি। তাদের নামের দ্বিতীয় শব্দ হলো 'ইসলামী'। তাদের নামে আর ভাবে মনে হয় তারা এখনই সারাবিশ্বে ইসলাম কায়েম করে ফেলবে। অথচ ব্যর্থতার কথা হল, তারা নিজেদের মাত্র সাড়ে তিন হাত বডির মাঝেই ইসলাম কায়েম করতে পারেনি। যদি নিজের শরীরে যেখানে নিজের শতভাগ অধিকার, কর্তৃত্ব আছে সেখানে ইসলাম কায়েম না করতে পারে তাহলে অপরের মাঝে যেখানে নিজেদের ক্ষমতা নেই সেখানে কীভাবে ইসলাম কায়েম করবে? দেখুন, তারা ইসলামী দল করেছে অথচ তাদের সঙ্গে আলেমরা যারা ইসলাম, ঈমান নিয়ে পাণ্ডিত্য অর্জন করেছে, নিজেদের মাঝে তা পুরোপুরি প্রয়োগ করেছে তারা কেউ তাদের সঙ্গে নেই। ইসলামের জ্ঞানভাণ্ডার অর্জন করলেই মানুষ জামায়াতে ইসলামীর বিরোধী হয়ে যায়। এসব দ্বারা কী প্রমাণ হয়? এখন আপনি বলতে পারেন, কই আমি তো তাদের মাঝে আলেমদের দেখতে পাই। অমুক অমুক আলেম তাদের সঙ্গে আছে।

তাহলে আপনাকে আমি সবিনয়ে বলব, একটি বাগানে যদি আটানব্বইটি আম গাছ থাকে আর দুটি থাকে জাম গাছ। তাহলে আপনি কী বলবেন, ওইটা আমের বাগান নাকি জামের? দুনিয়ার সবাই বলবে সেটা আম বাগান। জাম বাগান কেউ বলবে না।

জয় বাংলা

দেশরক্ষা বিভাগ

স্বাধীনতা সংগ্রামের সনদপত্র

আব্দুর রহমান ...., পিতা/মৃত আমজাদ আলী ...,

গ্রাম মালিকান ..., থানা দেবীদ্বার ..., জিলা কুমিল্লা বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর/বীরাঙ্গনা সৈনিক। তিনি 2 নম্বর সেক্টরে স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে তাঁর অবদান চির উজ্জ্বল হয়ে রইবে।

অধিনায়ক (ডাঃ কাজী মোঃ ... হুসাইন) এম. এ. মেডিক্যাল বিভাগ ... হাসপাতাল, ঢাকা।

প্রাপকের স্বাক্ষর

মোহাম্মদ আতাউল গনী ওসমানী

অধিনায়ক,
বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনী



ম-৮৫২৫৯

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

স্মারক নং মু. বি. ম/সা/কুমিল্লা/প্রঃ-০/কো/২০০২/৬১৬২ তারিখ ...

সাময়িক সনদপত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, জনাব/বেগম ......আবদুর রহমান......

পিতা/স্বামী ...মরহুম আমজাদ আলী......গ্রাম/ওয়ার্ড ...মালিকানা......

ডাকঘর ......মালিকানা......উপজেলা/থানা ...দেবীদ্বার......

জেলা ...কুমিল্লা...... একজন মুক্তিযোদ্ধা। সরকার মহান স্বাধীনতাযুদ্ধে তাঁর অবদান কৃতজ্ঞতার সাথে স্বীকার করছে। তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য প্রযোজ্য সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্য হবেন।

সচিব
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

প্রতিমন্ত্রী
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সরকার থেকে পাওয়া মাওলানা আব্দুর রহমানের মুক্তিযুদ্ধের দু'টি সার্টিফিকেট

জামায়াতের মাঝে আলেম-উলামা থাকার প্রসঙ্গটা একই ধরনের। তাছাড়া খোঁজ নিয়ে দেখা যাবে যাদেরকে তারা আলেম বলে দাবি করে, তারা সবাই নামে মস্ত আলেম। কিন্তু ভেতরে ফাঁক— ধর্মীয় জ্ঞানশূন্য। আর কারো ভেতরে কিছু থেকে থাকলেও সে পথভ্রষ্ট। আপনি তাদের কোনো সমাবেশ বা তাফসিরুল কোরআন মাহফিলে বসে থাকলে দেখবেন তারা যতটুকু না এলেম-আমল নিয়ে কথা বলতে পারে তার চেয়েও বেশি পারঙ্গম তারা বাকপটুতায়, কোরআনের অপব্যাখ্যা করে নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিল করার বেলায়। এখন তো দিবালোকের মতোই স্পষ্ট, যষ্ঠিমধু যেমন মধু না তেমনি জামায়াতে ইসলামীও ইসলামী কোনও দল না।

খুঁজে বের করতে হবে, শেকড় উপড়ে ফেলতে হবে

এই দলের নামের সর্বশেষ শব্দ হলো, 'বাংলাদেশ'। এর দ্বারা মনে হয় জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানও আছে। বা অন্যান্য দেশেও এই জামায়াত আছে। আর বাংলদেশে যে জামায়াত আছে সেটা বিদেশী কোনও দলের বাংলাদেশী গ্রুপ। তাই আমাদের খোঁজ নেয়া দরকার এই দলের গোড়া কোথায়। কোথা হতে সব কলকাঠি নাড়ানো হচ্ছে।

এ জন্যই কী দেশটাকে স্বাধীন করেছিলাম?

কে যুদ্ধ করেছে কে করেনি তা নিয়ে আমার এই শেষ বয়সে এসে কোনও মাথাব্যথা নেই। আমি নিজে সক্রিয়ভাবে সশস্ত্র লড়াই করেছি এটাই আমার কাছে বড় কিছু। সবাই যেন যার যার ন্যায্য অধিকারটুকু পান এ জন্যই লড়াই করেছিলাম অথচ এখন দেখা যাচ্ছে কেউ খেতে পারছে না কেউবা আঙুল ফুলে হয়ে গেছে কলা গাছ। এটা আমাকে ভীষণ পীড়া দেয়।

ম্যাচের কাঠি না ঘষে আগুন জ্বালানো যায় না; এ রকম একটা ভাবনা মাথায় রেখে জীবন দিয়ে খেটেছি তখন, আর এখন আমাদের সেই শ্রমের কোনও মূল্যই নেই।

শেকড়ের টানে...

মনে পড়ে, আমাদের ক্যাম্পে চৌদ্দশ লোক ট্রেনিং করেছে। সবার পরনেই তখন হাফপ্যান্ট ছিল। শুধু আমি একাই তখন পা'জামা পড়ে ট্রেনিং করেছিলাম। সেই কঠিন মুহূর্তে যেমন আমি আমার শেকড় ভুলিনি তেমনি এখনও আমি আমার আদর্শের ওপর যথাসাধ্য অবিচল আছি। থাকবও ইনশাআল্লাহ!

ভাগনের গল্প

'৭১-এর সাহসী লড়াকু মাওলানা আবদুর রহমানের সঙ্গে কথা বলার মাঝামাঝিতে এসে উপস্থিত হন তার ভাগনে আবদুর রব। স্বাধীনতা যুদ্ধের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সক্রিয় ছিলেন এই দুই মামা-ভাগনে। লড়েছেন একই সঙ্গে বিভিন্ন রণাঙ্গনে। মৃত্যুর খুব কাছাকাছি থেকে ফিরে এসেছেন তারা দু'জনই। আবদুর রব বর্তমানে রাজারবাগ পুলিশ লাইনে কর্মরত। মুক্তিযোদ্ধা মাওলানা আবদুর রহমানের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা সেরে আমরা মুখোমুখি হই ভাগনে আবদুর রবের। তিনিও বেশ আগ্রহের সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধাদের স্মৃতিগুলো আমাদের সঙ্গে শেয়ার করেন। আমাদের বিভিন্ন কৌতূহলী প্রশ্নের জবাবে বেরিয়ে আসা সেই গেরিলা যোদ্ধার অপ্রকাশিত চমকপ্রদ ঘটনাগুলো ও তার ব্যক্তিগত অভিব্যক্তির চুম্বকাংশ তুলে ধরা হলো।

তখনও আমি সেই ছোট্টটিই রয়ে গেছি

তখন আমি ক্লাস নাইনে পড়তাম। উঠতি বয়সের তরুণ। দেশের সংবাদের প্রতি তেমন আগ্রহ ছিল না। তবে দেশ ও দেশের মানুষের প্রতি প্রচণ্ড ভালোবাসা ছিল। তখন মাঝে মধ্যেই পাকিস্তানিদের বিভিন্ন অত্যাচারের কথা কানে আসত। কিন্তু তাদের তখনও স্বচক্ষে দেখিনি। হঠাৎ একদিন শুনলাম গ্রামে মিলিটারি আসছে। খবর পেয়ে সবাই দেয় ছুট। যে যে জায়গায় পারে পালায়। সবার সঙ্গে আমিও পালালাম। তবে পাকিস্তানিদের নিয়ে নানা দানবীয় গল্পের কারণে আমার মনে তাদের দেখার একটা তীব্র আগ্রহ জন্মেছিল।

প্রতিশোধের আগুন জ্বলে উঠল যেভাবে

তাই আমি দৌড়ে রাস্তার পাশে এক ঝোপঝাড়ে গিয়ে লুকালাম। আমি যেখানে লুকালাম তার অদূরেই ছিল একটি টং দোকান। চা, পান, সিগারেট বিক্রি হতো। দোকানি আমার চেয়ে দু'চার বছরের বড় হবে। মিলিটারি আসার সংবাদ পেয়ে সেও দোকানের পেছনে এক মাটির ডিবির আড়ালে গিয়ে লুকায়। আমাদের সামনে দিয়ে একদল মিলিটারি হেঁটে যায়। গায়ে খাকি পোশাক। মাথায় লোহার টুপি। হাতে আগ্নেয়াস্ত্র। চেহারায় তাদের হিংস্রতা। তারা গ্রামে ঢোকে। আমরা আড়াল থেকে বেরিয়ে আসি। চোখ, কান খোলা রেখে এদিক-ওদিক তাকাই। দূর গ্রামের দিকে চলে গেছে তারা। মানুষের চেহারা এত ভীতিকর হতে পারে ভাবিনি কখনও। আমরা রাস্তায় বসে কথা বলতে থাকি। ঘণ্টাখানেক পর আবারও আওয়াজ পাই আসছে। সঙ্গে সঙ্গে আমি আগের জায়গায় গিয়ে লুকাই। কিন্তু ওই টং দোকানি কিছুটা সাহস করেই দোকানে বসে থাকে। এবার আর লুকায়নি। ভাবে, দোকানদার মনে করে হয়তোবা তারা তাকে ছেড়ে দেবে। কিছুই করবে না। কিন্তু বিধি বাম। মিলিটারিগুলো এসে এবার সবাই ওই দোকানের সামনেই অবস্থান নেয়। জনপ্রতি এক কাপ চায়ের অর্ডার দিয়ে পরস্পর কথাবার্তায় লিপ্ত হয়ে গেল। দোকানি চা বানিয়ে দিচ্ছিল। হঠাৎ এক মিলিটারির দৃষ্টি পড়ে গেল দোকানির হাতের ওপর। কনুই থেকে কবজি পর্যন্ত মাটি লেগে আছে। হাঁটুর

দিকটায় কিছুটা মাটির দাগ দেখা যাচ্ছে। জিজ্ঞেস করল, কিয়া তুমনে মুক্তি হ্যায়। দোকানি বলল, না স্যার। আমি মুক্তিযোদ্ধা নই। মিলিটারি আবার জিজ্ঞেস করল, হাত মে কিস লিয়ে মিট্টি লাগায়া? তরুণ দোকানদার চেয়ে দেখল সত্যিই তো হাতে মাটি লেগে আছে। সে যে মাটির ঢিবির আড়ালে লুকিয়েছিল পরে আর হাতের মাটি ঝেড়ে ফেলে দেয়নি। মিলিটারিগুলো আর কোনো কথা বলল না। নীরবে চা পান করল, চা পান শেষে এক মিলিটারি অস্ত্র তাক করল দোকানির মাথা-বুক বরাবর। আমি আড়াল থেকে শুধু একটা আর্তচিৎকার শুনলাম। একটি মেশিনগান গর্জে উঠে দোকানিকে ঝাঁঝরা করে দিল মুহূর্তে। আমি আড়াল থেকে সব দেখছিলাম। ভয়ে বুকটা দুরুদুরু করছিল। মিলিটারিগুলো মার্চ করতে করতে আমার সামনে দিয়েই চলে গেল। সবকিছুই ঘটে গেল আমার চোখের সামনে, সামান্য সময়ে মধ্যে। আমি বেরিয়ে এলাম। দোকানের মেঝেতে জমাট বাঁধা রক্তের মাঝে পড়ে আছে একটি নিথর দেহ। টিনের বেড়ায় লেগে থাকা ছোপ ছোপ রক্তগুলো শুকিয়ে যাচ্ছে। আমার শরীরে বয়ে গেল যন্ত্রণার এক উষ্ণ স্রোত। মন প্রস্তুত হলো প্রতিশোধের জন্য।

আমি মুক্তিযোদ্ধা হলাম

এর কিছুদিন পর আবারও এলাকায় হানা দিল সেই জানোয়ারগুলো। তারা মেয়েদের লাঞ্ছিত করল। যুবকদের গাছের সঙ্গে বেঁধে গুলি করে মারল। পেট্রোল ঢেলে জ্বালিয়ে দিল গ্রামের বাড়িগুলো। আমি আর স্থির থাকতে পারলাম না। মনে এবার প্রতিঘাতের আগুন দাউদাউ করে জ্বলে উঠল। খোঁজখবর নিতে লাগলাম কীভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করা যায়। কীভাবে এই জালিমদের হাত থেকে বাঁচা যায়। বুঝলাম এভাবে হাত গুটিয়ে বসে থাকলে শুধু মার খেতেই হবে। বাঁচতে হলে আমাদের বাঁক ঘুরে দাঁড়াতে হবে। শুনলাম, মামু আবদুর রহমান যাচ্ছে ট্রেনিং করতে। আমি গিয়ে বললাম, মামু, তোমার সঙ্গে আমিও যেতে চাই। মামু আমার কথা শুনে খুশি হয়ে গেলেন। এর কিছুদিন পর সুযোগ মতো মামু-ভাগনে ছুটলাম ট্রেনিং করতে। বাংলাদেশের সীমানা পার হয়ে ভারতে। আঁকাবাঁকা পথ। পাহাড়ি অঞ্চল। দুর্গম গিরি। ট্রেনিং করলাম টানা চার মাস। ট্রেনিং শেষে একদিন রাতে দেশে ফিরি। তখন দেশের অবস্থা আগের চেয়েও ভয়াবহ। সবখানেই বাঙালিরা নির্যাতিত হচ্ছে। সরাসরি অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ি। তখন রাজাকাররা আমাদের বলত 'চুক্তি বাহিনী'।

মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছি অনেকবার। বেশ কয়েকবার এমন পরিস্থিতি হয়েছে যে নিজের জীবনের আশাই ছেড়ে দিয়েছিলাম। আজকে মনে হয় মরেই যাব। শেষে আল্লাহ বাঁচিয়ে রেখেছেন। প্রায় সবগুলো ফাইটে আমি আর মামু একই সঙ্গে ছিলাম। ছিনিয়ে এনেছিলাম স্বাধীনতা নামের সেই সোনার হরিণটিকে।

একটি কম্বল আর সার্টিফিকেটের জন্যই কি যুদ্ধ করেছিলাম?

যুদ্ধের পরপর ঘোষণা দেয়া হলো মালয়েশিয়ান ক্যাম্পে সবাইকে একত্রিত হতে। কুমিল্লার ক্যান্টনমেন্টের একটি ক্যাম্পের নাম মালয়েশিয়ান ক্যাম্প। কেন যে এই

বিদেশী নাম রাখা হয়েছিল তা আমরা কেউ জানতাম না। এখন অবশ্য এই গরিবী হালতে সেই নাম স্মরণ করে উন্নতির স্বপ্ন দেখতে পারি। আমি মামুর সঙ্গে বিদেশী নামধারী সেই দেশী ও খুব পরিচিত ক্যাম্পে এসে হাজির হই। আমাদের কেন এখানে ডাকা হলো আমরা কেউই তা জানতাম না। কেউ বলছে, যুদ্ধের পর সেই যোদ্ধাদের বাঁচিয়ে রাখতে নেই। তারা শাসনক্ষমতায় হাত দিতে পারে। তাই সবাইকে শেষ করে দিতে হয়। এজন্য হয়তোবা এখন আমাদের এখানে একত্রিত করে হঠাৎ গুলি করে সবাইকে শেষ করে দেয়া হবে। আমি মনে মনে দোয়া-কালাম পড়ছিলাম। আবার কেউ কেউ ধারণা করছে, সরকার আমাদের সামান্য কিছু অনুদান দিয়ে দায়মুক্ত হওয়ার ভান করবে। আরও কত জনের কত রকম ভাবনা। অপেক্ষা ও চিন্তা-ভাবনার পালা এক সময় শেষ হলো। আমাদের সবাইকে একটি করে কম্বল ও সার্টিফিকেট দেয় সরকার। কম্বলটি কয়েক বছর পর ছিঁড়ে যায়। ব্যবহার অযোগ্য হওয়ায় ফেলে দিই। সার্টিফিকেটটি এখনও আছে। সেই সার্টিফিকেট আমাদের কী উপকার করতে পেরেছে জানি না। তবে বহুবার লাঞ্ছনা আর দুর্দশার মাঝে যে ফেলেছে তা স্পষ্ট করেই বলতে পারব। সেই ব্যথার কাহিনী একটু পরেই বলছি। তার আগে বলি মুক্তিযুদ্ধ করে আমরা আলেমরা আর কী পেলাম। কিছু যদি আমরা পেয়ে থাকি তাহলে তা হলো 'মুক্তিযোদ্ধার' বদলে 'রাজাকার, 'আল-বদর' খেতাব। যে শব্দগুলো মানুষের মাঝে ভালোবাসা নয় শুধুই ঘৃণার উদ্রেক ঘটায়।

হায়, আমি রাজাকার!

স্বাধীনতা যুদ্ধের মাস দুয়েক পরের কথা। আমি আর মামু যাচ্ছিলাম গ্রামে। সময়মতো লঞ্চে উঠেছি আমরা। আমাদের পাশাপাশি ঢাকা থেকে আরও কিছু লোক উঠল। লোকগুলো আমাদের কাছাকাছি বসা। তারা পরস্পর বেশ মজা করে কথাবর্তা বলছিল। হঠাৎ আমাদের দু'জনকে দেখতে পেয়ে তারা কথার মোড় ঘুরিয়ে দিল। আমাদের দু'জনের মাথায় টুপি, মুখে চাপদাড়ি আর গায়ে আছে লম্বা জামা। চেহারা-সুরত দেখেই তারা মুখ বাঁকিয়ে ফেলে। ভাবে, এরাই রাজাকার। যেই ভাবা সেই কাজ। একজন আমাদের ব্যঙ্গ স্বরে বলেই ফেললেন, 'ভাই রাজাকার কোথায় যাচ্ছেন?' আমরা কোনো জবাব না দিয়ে চুপ হয়ে বসে রইলাম। আরেকজন আরও আগ বাড়িয়ে গায়ে পড়ে বলতে লাগল, 'দেশ স্বাধীন হওয়ায় রাজাকাররা কি কথা বলা ভুলেই গেছে গা?' তাদের ঔদ্ধত্য যখন সীমা ছাড়িয়ে যায় তখন আমাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। মামু উঠে দাঁড়ান। সামনে এগিয়ে গিয়ে এক বদমাইশকে ধরে ট্রেনিংয়ে শেখা কলাকৌশল থেকে দুই ঘা লাগিয়ে দিলেন। এতেই ফল হলো, তারা বুঝে গেল আমরা রাজাকার নই মুক্তিযোদ্ধা. পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে লড়াকু সৈনিক।

যেমন কুকুর তেমন মুগুর

এরকম ঘটনা মামু-ভাগনে উভয়ের জীবনে একাধিকবার ঘটেছে। বর্তমানে তো আমাদের মতো টুপি-দাড়িওয়ালা দেখলেই বলে, শালা রাজাকার। আর জঙ্গি শব্দটা তো এখন টনিকের চেয়েও বেশি মজাদার ফায়দা দেয়। এমনকি বয়সে যারা নবীন,

জন্মগ্রহণই করেনি তাদেরকেও শুধু টুপি-দাড়ি আর মাদরাসায় পড়ার কারণে রাজাকার বলে গাল দেয়া হচ্ছে। একবার এক মজার ঘটনা ঘটে গেল। ঢাকার এক মাদরাসার ছাত্রকে কিছু প্রগতিশীল লোক রাজাকার বলে গাল দিল। তারা এমন ভান করল যেন তারাই দেশটাকে স্বাধীন করেছে। তাই তাদের দেশের জন্য এত মায়া। রাজাকারদের প্রতি এত ক্ষোভ। ছাত্রটি ছিল খুব মেধাবী ও কবি। সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিয়ে দিল সে,

দাড়ি টুপি দেখে আমার
যারা বলে রাজাকার
বিরাশিতে জন্ম আমার
বলেন হবে সাজা কার?

উত্তর শুনে সেই দেশদরদিরা আর একটা কথাও বলতে পারল না। একদম 'থ' বনে গেল সবাই, একজন সাধারণ মাদরাসা পড়ুয়ার উপস্থিত বুদ্ধি দেখে। শেষে কী আর করা, একদম লেজ গুটিয়ে দে ছুট।

কী হবে এসব কাগুজে সার্টিফিকেট দিয়ে?

আবার সার্টিফিকেট প্রসঙ্গে আসি। আমরা এ পর্যন্ত বেশ কয়েকটা সার্টিফিকেট পেয়েছি। প্রথম সার্টিফিকেট পেতে কোনো পয়সা-কড়ি না লাগলেও পরবর্তী সবগুলোতে টাকা-পয়সা ঢালতে হয়েছে। টাকা দিয়ে তোলা এ সার্টিফিকেটগুলো শুধু সিন্ধুকে রেখে দেয়া ছাড়া আমরা আর কিছুই করতে পারিনি।

গত আওয়ামী লীগ সরকারের (১৯৯৬-২০০১) শাসনামলের কথা। ঘোষণা শুনলাম, মুক্তিযোদ্ধা ও তার পরিবারের সদস্যদের সার্টিফিকেট ও কিছু সাহায্য-সহযোগিতা করবে সরকার। এজন্য মুক্তিযোদ্ধারা যেন সবাই যোগাযোগ করেন। আমার আবার অতিরিক্ত এসব বিষয়ের প্রতি কোনো আগ্রহ ছিল না। কিন্তু ছেলে-মেয়েগুলো খুব করে ধরল, আমিও যেন যোগাযোগ করি। আমি প্রথমে সাফ জানিয়ে দিলাম, ফকিরের মতো আমি তাদের দ্বারে যেতে পারব না। তারা যদি আমাকে কিছু দিতে চায় বাসায় পাঠিয়ে দিক। মন চাইলে তখন তোমরা নিও। কিন্তু আমার কথাগুলো সন্তানদের কানেই গেল না। সবাই গোঁ ধরল। তোমার যেতেই হবে। তুমি মুক্তিযোদ্ধা, দেশের জন্য জান বাজি রেখে লড়াই করেছ, এজন্য সরকার তোমাকে হয়তো কিছু সুযোগ-সুবিধা দিচ্ছে। তা তোমার গ্রহণ করাই উচিত। শেষে বলা যায় একপ্রকার বাধ্য হয়েই রওনা দিই। দেখি কী হয়। আমার ছেলেমেয়ে সবাই পড়ে মাদ্রাসায়। কেউ তখন নাহুমীরে কেউবা দাওরা-মেশকাত। সব মাদ্রাসার সার্টিফিকেটই আরবিতে লেখা হয়। সারাদেশে একই নিয়ম। আমার সন্তানদের আরবি সার্টিফিকেটসহ আমারটা নিয়ে হাজির হই মগবাজার আওয়ামী লীগ অফিসে। গেটের দারোয়ান আমাকে প্রথমে ঢুকতে দিতে চায়নি। জেরা শুরু করে আমাকে। কী দরকার? কাকে চান? কেন? শত উত্তর শেষে জেরায় মনে হয় সফল হলাম। অন্তত পাস নম্বর নিয়ে ভেতরে ঢোকার মতো অবস্থা হবেই। ভেতরে যাওয়ার পর সবাই আমার দিকে সন্দেহের চোখে তাকাতে লাগল। যে কারণে কেউ একবার চেয়ার টেনে বসার কথা বলল না। নিজেই ছোট হয়ে আগ বাড়িয়ে আমার

পরিচয় দিলাম— আমি মুক্তিযোদ্ধা। আমার নাম-ঠিকানা এই— এটা আমার সার্টিফিকেট, পরিচয়পত্র। আমার কথা শুনে তারা কেউ বিশ্বাস করল না। এমন ভাব করল যেন আমার সার্টিফিকেটগুলো জাল। মুক্তিযুদ্ধের সার্টিফিকেট দেখানোর পর যখন আমার সন্তানদের আরবি সার্টিফিকেটগুলো বের করলাম সঙ্গে সঙ্গে যেন গোটা অফিসের এই মাথা থেকে ওই মাথায় আগুন লেগে গেল। আর সেই আগুনের মূল উৎপত্তি ও আংরা যেন আমি ও আমার হাতের আরবি সার্টিফিকেটগুলো। সারা অফিসে একটা রব পরে গেল "রাজাকার এসেছে মুক্তিযোদ্ধা সাজতে"। এই তো রাজাকার। এই যে, এই যে, এই দেখুন আমাদের সামনে ফ্যালফেলিয়ে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আস্ত একটা রাজাকার। অবস্থা বেগতিক দেখে তখন মহাপাপীর মতো মাথাটা নিচু করে কোনোরকম বেরিয়ে এলাম মগবাজার আওয়ামী লীগ অফিস থেকে। অফিস থেকে বেরিয়ে প্রথমে পকেটে হাত দেই। ম্যাচ খুঁজি। জ্বালিয়ে দেব সার্টিফিকেটগুলো। বিড়ি-সিগারেটের অভ্যাস নেই। তাই পকেটে ম্যাচ না পাওয়া যাওয়াই সঙ্গত। ম্যাচ না পেয়ে ভাবলাম, এখানেই ছিঁড়ে ফেলি। মামলা ডিসমিস। তাহলে সামনে আর এরকম ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হবে না। ছিঁড়তে গিয়ে চক্ষুলজ্জার কারণে থেমে গেলাম। লোকে দেখলে হয়তো পাগল ভাববে আমাকে। সিদ্ধান্ত নেই, বাসায় গিয়ে এগুলোকে ছিঁড়ব না হয় পুড়ব, একটা কিছু করবই। বাসায় আসি। বাসায় ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই চেহারা দেখে সবাই বুঝে ফেলে কিছু একটা হয়েছে আমার। সব খুলে বললাম, পরিবারের সদস্যদের কাছে। তারা আমাকে সান্ত্বনা দিল। বুঝাল, কিছু কিছু ব্যাপারে দুঃখ করতে নেই। পরে তারা আমাকে সার্টিফিকেটগুলো আর নষ্ট করতে দিল না। লুকিয়ে ফেলল সবগুলো। এখনও ওসব মনে হলে লজ্জা, ক্ষোভে মরে যেতে মন চায়। কিন্তু পারি না। পরিবারের দিকে চেয়ে এখন অনেক কিছুই সয়ে যেতে হয়। তাছাড়া যুদ্ধের পরের জীবনটা আমার বোনাস জীবন। তখন আল্লাহ চাইলেই আমাদের নিয়ে যেতে পারতেন। কিন্তু নেননি। মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে এনেছেন আমাকে। তাই এই বোনাস জীবনে অনেক কিছু সয়ে যেতে প্রস্তুত থাকতে হচ্ছে এখন।



হাতিয়া দ্বীপের সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা মাওলানা মোস্তাফিজের গল্প

ঘড়ির কাঁটা তখন সকাল ছ'টাও ছুঁতে পারেনি। এরই মধ্যে আমাদের রিকশা পৌঁছে গেছে যথাযথ গন্তব্যে। বাইরে থেকেই শোনা যাচ্ছিল কোরআনের সুমধুর আওয়াজ। প্রভাতী সূর্যের আলোয় আল-কোরআনের শব্দময় দ্যুতি ছড়িয়ে দিচ্ছে মাদরাসার ছাত্ররা। আমরা দু'জনে এখন মাদরাসার অধ্যক্ষ মুক্তিযোদ্ধা মাওলানা মোস্তাফিজুর রহমানের কক্ষে। এসেছি সুদূর ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম বিভাগীয় সদরের হালিশহরের এ মাদরাসাটিতে। কেবলই আলেম মুক্তিযোদ্ধার খোঁজে চট্টগ্রামে আসা। এবারে চট্টগ্রামে আলেম মুক্তিযোদ্ধার খোঁজে আমার সফরসঙ্গী হয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষার্থী মুহাম্মদ ফায়জুল হক।



মোরা একটি ফুলকে বাঁচাব বলে যুদ্ধ করি

পরিচয় পর্ব সেরে চলে এলাম মূল আলোচনায়– মহান মুক্তিযুদ্ধের সেই দিনগুলোতে ফিরে যাবার আহ্বান জানালাম দেশের এ গর্বিত মুক্তিযোদ্ধাকে। প্রথমেই জানতে চাইলাম কিভাবে নিজেকে মুক্তিযুদ্ধে সম্পৃক্ত করলেন? বললেন, আমি তখন হাতিয়া রহমানিয়া আলিয়া মাদরাসার ছাত্র। পারিবারিকভাবে আমরা সবাই তখন আওয়ামী লীগের সমর্থক। মাদরাসায় সহপাঠীরা আওয়ামী লীগ না করলেও আমি সক্রিয়ভাবে ছাত্রলীগ করতাম। এজন্য মাদরাসায় সমালোচিত হতাম ঠিকই, কিন্তু পারিবারিকভাবে প্রভাবশালী ছিলাম বলে কেউ কিছু সামনাসামনি বলত না। ছাত্ররা সমালোচনা করলেও শিক্ষকরা আমার ব্যাপারে নীরব ছিল। এরই মধ্যে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। দল বেঁধে তরুণরা মুক্তিযোদ্ধার খাতায় নাম লেখাতে থাকল। পরিবার থেকে আমার ওপর কড়াকড়ি আরোপ করা হলো। আমি যেন ওসব না করে লেখাপড়ায় মনোযোগ দেই। কিন্তু মনকে মানাতে পারলাম না। স্বাধীনতার স্বপ্নে বিভোর আমার সারা দেহ-মন। পরিবার ছেড়ে একদিন ঠিকই বন্ধু-বান্ধবদের হাত ধরে বেরিয়ে পড়লাম মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে।

আমরা প্রথমে এলাম চট্টগ্রামের নিউমুরিং এলাকায়। সেখানে স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। তারাও মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে। আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য

ত্রিপুরায় গিয়ে প্রশিক্ষণ নেয়া। দল বেঁধে পাহাড়, বন-জঙ্গল পেরিয়ে রামগড় দিয়ে ত্রিপুরায় প্রবেশ করলাম। তখন যুদ্ধের মাঝামাঝি সময়। জুলাই মাস চলছিল। ত্রিপুরার বড়ইতলি নামক স্থানে আমাদের ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করা হলো। এক মাসের ট্রেনিং শেষে আবার চট্টগ্রামে চলে এলাম। এখানে আমাদের গেরিলা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করা হলো। গেরিলা যুদ্ধের জন্য আলাদা প্রশিক্ষণও দেয়া হলো মৌলভী সৈয়দ-এর নেতৃত্বে। চট্টগ্রামে তখন এত ঘর-বাড়ি ছিল না। রাতে লোকালয়ে আসতাম। দিনে বনে-জঙ্গলে থাকতাম। অপারেশনের সময় যার যার দায়িত্বমতো শহরে বিভিন্ন স্থানে অবস্থান গ্রহণ করতে হতো। আমাদের অপারেশনটা মূলত ছিল পাকসেনা, পুলিশ বা স্থাপনার ওপর আচমকা আক্রমণ করা।

চারদিক নীরব হয়ে আসছে। আমি আর ফায়জুল এক পলকে তাকিয়ে আছি '৭১-এর শ্রেষ্ঠ সন্তান এ বীরযোদ্ধার দিকে, শুনে যাচ্ছি একে একে সেইসব দিনগুলোর কথা। আমাদের সঙ্গে আরো যোগ দিয়েছেন মাদরাসারই শিক্ষক ও কয়েকজন ছাত্র। তারাও শুনে যাচ্ছেন তাদের প্রধান শিক্ষকের গৌরবময় দিনগুলোর কথা। আমি ইতিমধ্যে জানতে চাইলাম মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম স্মৃতির কথা। স্মৃতির ভুবনে ফিরে গিয়ে তিনি আবারো বলতে থাকলেন, একটা ঘটনা আমার এ মুহূর্তে মনে পড়ছে। আমরা যখন ভারতে যাচ্ছিলাম, বন-জঙ্গল, পাহাড় পায়ে হেঁটে যেতে হয়েছিল। দিনের পর দিন হাঁটছি তো হাঁটছি, পাহাড়, বন পেরোচ্ছি। সবকিছুই দলবদ্ধভাবে করছিলাম। এভাবে একদিন ফটিকছড়ি পার হয়ে গেছি। তখন কে বা কারা যেন জঙ্গলে আমাদের ওপরে এলোপাতাড়ি গুলি ছুঁড়তে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের এক বন্ধু কামাল মারা গেল। আমরা সবাই বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম। সেদিন খুবই অসহায় মনে হয়েছিল নিজেকে এ পৃথিবীতে। কি করব কিছুই বুঝে উঠতে পারছিলাম না। শেষ পর্যন্ত একদিন পর আমরা একত্র হতে পেরেছিলাম।

তারেক ফালু দুলুর ভিড়ে

স্বাধীনতার ছত্রিশ বছর পর মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে নিজের পরিচয়ে কি গর্ববোধ করেন? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে তীব্র আক্ষেপের সুরে মুক্তিযোদ্ধা মাওলানা মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, পরিস্থিতি এখন এমন দাঁড়িয়েছে যে, নিজেকে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে ভাবতে লজ্জাবোধ হয়। এই দেশের জন্যই কি আমরা মুক্তিযুদ্ধ করেছিলাম?

শিল্পী শাহনাজ রহমতুল্লাহর একটা জনপ্রিয় গানের কলি এরকম–

এক সাগর রক্তের বিনিময়ে বাংলার আকাশে রক্তিম সূর্য আনলে যারা
তোমাদের এই ঋণ কোনো দিন শোধ হবে না,
হয়তোবা ইতিহাসে তোমাদের নাম লেখা রবে না
বড় বড় লোকদের ভিড়ে জ্ঞানী আর গুণীদের আসরে
তোমাদের কথা কেউ কবে না।

এ গানের কলিগুলো আমার মনে প্রায়ই জেগে ওঠে। এ গানের সত্যিকার অর্থ দাঁড়িয়েছে এখন এ রকম–

তারেক, ফালু, দুলু, নিলু, ভুলু, নিজামী আর মুজাহিদদের ভিড়ে
তোমাদের কথা কেউ কবে না

আমরা তখন দেশ স্বাধীন করেছি এজন্য যে, তখন বলা হয়েছিল দেশ স্বাধীন হলে বৈষম্য দূর হবে, গরিবের মুখে হাসি ফুটবে, আমরা শান্তিতে দু'মুঠো ভাত খেতে পারব। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের পরই দেখলাম শুরু হয়ে গেল নৈরাজ্য। মুক্তিযোদ্ধারা পর্যন্ত তাদের বিরোধীদের হত্যা-লুট করতে লাগল। দেশের প্রতি অনীহা আসে যখন দেখি সে সময়ের দেশদ্রোহীরা গাড়িতে জাতীয় পাতাকা নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। নিজের জীবনকে একেবারে অসহায় মনে হয় যখন দেখি মুক্তিযুদ্ধের নাম ভাঙিয়ে আঙুল ফুলে কলাগাছ হয় লোকজন।

বঙ্গবন্ধু, জাতির পিতা

বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলেন, মুক্তিযুদ্ধে বঙ্গবন্ধুকে বাদ দিলে আর কিছুই থাকে না। বঙ্গবন্ধুর বলিষ্ঠ নের্তৃত্ব ছিল আমাদের প্রেরণা। প্রতিটি মুক্তিযোদ্ধা তার নেতৃত্ব মেনে নিয়েই মুক্তিযুদ্ধ করেছে। তিনি বঙ্গবন্ধু, তবে তাকে জাতির পিতা কখনো আমি বলিনি, যদিও ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত আওয়ামী লীগ করেছি। আমি কোরআন-হাদিসে বিশ্বাস করি, আর কোরআন-হাদিসই আমাদের জাতির পিতা ও জাতীয়তা নির্ধারণ করে দিয়েছে। তবে এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, শেখ মুজিব বাংলাদেশের স্থপতি।

হাতিয়ার ছেলে মোস্তাফিজ

নোয়াখালী জেলার এক বিচ্ছিন্ন দ্বীপ হাতিয়া। হাতিয়ার এক অজপাড়াগাঁয়ে জন্ম নেন মোস্তাফিজ। বাবা কোরআনে হাফেজ। হাতিয়া রহমানিয়া আলিয়া মাদরাসা থেকে মুক্তিযুদ্ধের সময় বিশ বছর বয়সে দাখিল পাস করেছেন মাত্র মোস্তাফিজুর রহমান। সেই সময়কার হাতিয়ার অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, হাতিয়ায় পাকসেনারা আসে দেশ স্বাধীন হওয়ার এক মাস আগে। তার আগে রাজাকার বাহিনী বিভিন্ন সময় অত্যাচার করেছে। হিন্দু পরিবারের বাড়ি-ঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে। জোগেশ্বর, বিযেশ্বরদের কথা মনে আছে। তাদের বাড়ি একেবারে জ্বালিয়ে দেয়া হয়। শুধু হিন্দু বাড়ি নয়, আফাজিয়া বাজারের পশ্চিমে মুসলমানদের বাড়িও জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছিল। আওয়ামী লীগ নেতা আমিরুল ইসলাম কালামের বাড়ি জ্বালিয়ে দিলে তিনি পালিয়ে যেতে বাধ্য হন।

স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে

১৯৫১তে জন্ম নেয়া মাওলানা মোস্তাফিজুর রহমান বর্তমানে হালিশহর বি ব্লক বাইতুল করিম মাদরাসা কমপ্লেক্স-এর প্রিন্সিপাল। চট্টগ্রাম ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের বিভাগীয় সমন্বয়কারী এবং হাতিয়া জনকল্যাণ সমিতির সাধারণ সম্পাদক। ১৯৯৬ সালের জাতীয় নির্বাচনে হাতিয়া, নোয়াখালী-৬ আসন থেকে ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের পক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। ইসলামী রাজনীতিতে এতটা সম্পৃক্ততার কথা শুনে জিজ্ঞেস করলাম আওয়ামী লীগ থেকে একেবারে সরাসরি ইসলামী রাজনীতিতে কিভাবে এলেন? উত্তরে তিনি বলেন, আমি এক সময় আওয়ামী লীগের একান্ত সমর্থক

ছিলাম। এরশাদের সময় শেখ হাসিনা একবার লালদীঘি ময়দানে মিটিং করলেন। সেখানে অনেক লোক মারা গেল, আমি গুলিবিদ্ধ হলাম। তখনই নিজের মধ্যে উপলব্ধি এলো, আমিও যদি এখন মারা যেতাম তাহলে পরকালে কি পেতাম? সেই থেকে নিজেকে নতুন করে ভাবতে শিখলাম। অনেক ভেবেচিন্তে '৯০তে এসে ইসলামী শাসনতন্ত্রে যোগ দিলাম।

অন্যান্য ইসলামী দলে না গিয়ে ইশা আন্দোলনে যোগ দেয়ার পেছনে সে এক মহাইতিহাস। মাওলানা মোস্তাফিজ জানালেন, স্বপ্নাদিষ্ট হয়েই তিনি চরমোনাইর মরহুম পীর সাহেব মাওলানা ফজলুল করীমের হাতে বায়াত হন।

শেষ পর্যন্ত চোখটা নষ্টই হয়ে গেল!

কথায় কথায় অনেক কাছে চলে এসেছি মাওলানা মোস্তাফিজুর রহমানের। এরই মধ্যে একটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলাম। আপনার ডান চোখটাতে একটু সমস্যা দেখা যাচ্ছে, এটা কিভাবে? উত্তরে বললেন, মুক্তিযুদ্ধের সময়ই একটা পাথর ছিটকে এসে চোখে লেগেছিল। তারপর ধীরে ধীরে চোখটা ক্ষত হতে হতে নষ্ট হয়ে গেল। আমি বলে উঠলাম, ও আচ্ছা! আপনি তো তাহলে চোখকেও শহীদ করে দিয়েছেন মুক্তিযুদ্ধের জন্য। আলেম মুক্তিযোদ্ধা মোস্তাফিজুর রহমান চট্টগ্রাম দারুল উলুম আলিয়া থেকে কামিল পাস করেন এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে অনার্স করেন।

যেতে হবে বহুদূর

সময় হয়েছে বিদায়ের। এক আবেগঘন পরিবেশ আমাদের বিদায়কে কেন্দ্র করে। মাওলানা মোস্তাফিজ সেই আবেগের তাড়নাকে আরো ঘনীভূত করে দিলেন হাতিয়ায় নিজ জমিতে চাষ করা বাদামের একটি ঝুলি হাতে ধরিয়ে দিয়ে। মুখে বাদাম চিবুতে চিবুতে আবারো রিকশায় চেপে বসলাম অন্য কোনো আলেম মুক্তিযোদ্ধার খোঁজে।



'৫২-এর ভাষা আন্দোলন ও '৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধের অকুতোভয় সৈনিক মুহাদ্দিস আবদুস সোবহান

চট্টগ্রামে আলেম মুক্তিযোদ্ধার খোঁজে হালিশহর থেকে চলে এলাম পটিয়া থানায় অবস্থিত এশিয়ার অন্যতম প্রাচীন ও বিখ্যাত বিদ্যাপীঠ জিরি মাদরাসায়। এখানকার সিনিয়র মুহাদ্দিস মাওলানা লুৎফর রহমানের সঙ্গে আমার পরিচয় আগে থেকেই। মাদরাসার অনেক পুরনো শিক্ষক হিসেবে তিনি স্থানীয় একাধিক আলেম মুক্তিযোদ্ধাকে চেনেন বলে জানিয়েছিলেন। তাঁর কাছ থেকেই পার্শ্ববর্তী ফাজিলখাঁর হাটের স্বনামধন্য মুহাদ্দিস মুক্তিযোদ্ধা মাওলানা আবদুস সোবহানের ঠিকানা পেলাম। ঠিকানামতো চলে এলাম ফাজিলখাঁর হাটের দৌলতপুর গ্রামে।

মসজিদেরই পাশে আমায় কবর দিও ভাই

মাওলানা আবদুস সোবহান মসজিদের পাশে কবর দেয়ার ওসিয়ত করে গেছেন কি-না সে ইতিহাস উদ্ধার করা যায়নি ঠিকই, কিন্তু তার কবর উদ্ধার করা গেছে মসজিদের পাশে। উদ্ধার করা বলছি এই অর্থে যে, কবরটি প্রায় নিশ্চিহ্নই হয়ে গিয়েছিল। ফাজিলখাঁর হাটের পাশেই মসজিদ। দুই পাশে কবরস্থান, মাঝে মসজিদ ও পুকুর। মসজিদের মোয়াজ্জিন জোহরের আজান দিলেন। আজানের পর আসতে থাকল মুসল্লিগণ। এক প্রবীণ মুসল্লির কাছ থেকে জানতে পারলাম মসজিদের পাশেই তাঁর কবর। বয়োজ্যেষ্ঠ এ মুসল্লি অনেক কষ্টে কবরটি দেখাতে সমর্থ হলেন। আগে ইটের চিহ্ন ছিল, এখন সেই ইটগুলোও কে বা কারা নিয়ে গেছে। আমি কবরকে ক্যামেরাবন্দি করতে ব্যস্ত। এ ফাঁকে আমার সহকর্মী ফায়জুল মুসল্লির কাছ থেকে জানতে চাইলেন মাওলানা আবদুস সোবহান সম্পর্কে। আঞ্চলিক ভাষায় মুসল্লি জানালেন, মাওলানা সোবহান এ মসজিদেরই প্রতিষ্ঠাতা ইমাম। দীর্ঘদিন তিনি এ মসজিদের ইমাম ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি আওয়ামী লীগের মিটিং-মিছিলে সবার আগে আগে ছিলেন। মুক্তিযোদ্ধাদের নানাভাবে সহায়তা দিয়েছেন। এর চেয়ে বেশি কিছু আর জানাতে পারলেন না প্রবীণ এই মুসল্লি। কবর উদ্ধারের পর এবার শুরু হলো ইতিহাস উদ্ধারের পালা। ইতিহাস জানতে রওয়ানা হলাম মরহুম মুহাদ্দিসের গ্রামের বাড়িতে।

ইতিহাস এতই দুষ্প্রাপ্য!

ইতিহাস বের করে আনাটা কি এতটাই দুষ্প্রাপ্য! কম বেগ পেতে হয়নি আমাদেরকে মাওলানা আবদুস সোবহানের ইতিহাসের পুনর্জাগরণ ঘটাতে। দৌলতপুর গ্রামের রাজ্জাকপাড়ায় বসবাস করেন তাঁর পরবর্তী প্রজন্ম। ভর দুপুরে সেখানে গিয়ে উঠলাম।

তিন ছেলে দুই মেয়ের সংসার ছিল মুহাদ্দিস আবদুস সোবহানের। এদের মধ্যে দুই ছেলে ও এক মেয়ে ইতিমধ্যেই মারা গেছে। বড় দুই ছেলে মরহুম আবদুল গাফফার ও হাফেজ মোহাম্মদ ইউনুস-এর স্ত্রীদ্বয় তাদের সন্তান নিয়ে এ বাড়িতে থাকেন। মাটির তৈরি পরিপাটি ঘর। সেখানে পাওয়া গেল আলেম মুক্তিযোদ্ধার কয়েকজন নাতিকে। তারা তাদের দাদা, নানা সম্পর্কে কিছুই বলতে পারলেন না। দাদা, নানা সম্পর্কে কোনো গল্প শোনে নি তারা? এ প্রশ্নের উত্তরে নির্বাক নাতি মোহাম্মদ ইকবাল। হ্যাঁ এটা ঠিক, তাদের দাদা '৯২তে যখন মারা যান তখন একেবারেই ছোট ছিল তারা। পর্দার আড়াল থেকে পুত্রবধূদ্বয়ের কাছ থেকে জানতে চাইলাম তাদের শ্বশুর সম্পর্কে। শ্বশুর বড় আলেম ছিলেন। মুহাদ্দিস ছিলেন, ইমাম ছিলেন। এসব কিছু জানা গেল। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধে শ্বশুরের ভূমিকা কি ছিল সে সম্পর্কে তেমন কোনো তথ্যই দিতে পারলেন না। শ্বশুরের স্মৃতিস্বরূপ তাঁর ব্যবহৃত কিছু কিতাব ছিল তা আমাদের এনে দেখানো হলো। আরো কিতাব মাদরাসায় গরিব ছাত্রদের দিয়ে দেয়া হয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধে মাওলানা সোবহান কেমন ছিলেন সে ইতিহাস কি তাহলে অধরাই থেকে যাবে? মাওলানা সোবহানের একমাত্র জীবিত ছেলে মাহমুদুল হাসান। এ মাহমুদুল হাসানের ছেলে মোহাম্মদ ইকবাল জানালেন, তার বাবা চট্টগ্রাম বন্দরে কাজ করেন। সেখান থেকে ফিরলে আপনারা অনেক তথ্য জানতে পারবেন। এ বলে বাবার মোবাইল নাম্বার ধরিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ফোনে কথা হলো। কাজ শেষে বাসায় ফিরছিলেন মাহমুদুল হাসান। চট্টগ্রাম শহরের শেষ প্রান্তে চাকতাই (কর্ণফুলী) ব্রিজের গোড়ায় আমাদের সাক্ষাৎ হতে যাচ্ছে বলে স্থির হলো।

ইতিহাসের ঘুম ভাঙল

শেষ পর্যন্ত ইতিহাসের ঘুম ভাঙল। ঘুমিয়ে থাকা নিঝুম ইতিহাস জেগে উঠল মাওলানা সোবহানের কনিষ্ঠ পুত্র মাহমুদুল হাসানের হাত ধরে। তিনজন গিয়ে উঠলাম স্থানীয় এক ছোট হোটেলে। লাঞ্চ সারার পাশাপাশি চলতে থাকল ইতিহাসকেও জাগিয়ে তোলার চেষ্টা। জানালেন মাহমুদুল হাসান– তার বাবা '৫২-এর ভাষা সৈনিক। সেই থেকে দেশের সকল স্বাধিকার আন্দোলনে দেশের পক্ষে ছিলেন একনিষ্ঠ সমর্থক। দেওবন্দ মাদরাসা থেকে শিক্ষা লাভ করে দেশে ফিরে শিক্ষকতা পেশাকে বেছে নেন মাওলানা সোবহান। এ ব্যাপারে মজার গল্প বললেন ছেলে মাহমুদুল হাসান–

দেওবন্দে বাবার প্রিয় শিক্ষকের নাম মাহমুদুল হাসান। এ শিক্ষক তাকে উপদেশ দিয়েছেন, সারা জীবন শিক্ষকতার সঙ্গে থাকবে। এই প্রিয় শিক্ষকের ওসিয়ত তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন। পাঠদান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন। প্রিয় শিক্ষকের নামেই আমার নাম রেখেছেন 'মাহমুদুল হাসান'। শিক্ষকতা জীবনে মুহাদ্দিস আবদুস সোবহান চট্টগ্রামের কইগ্রাম, বোয়ালিয়া এবং জিরি মাদরাসায় মুহাদ্দিস হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯৯২-এর ৩১ মে চন্দ্রঘোনা ইউনেসিয়া মাদরাসায় বোখারী শরীফ পাঠদান অবস্থায় তিনি মৃতুবরণ করেন।

ছেলে মাহমুদুল হাসান জানালেন, তার বাবা '৫২ সাল থেকেই আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত। তারই ধারাবাহিকতায় ৬ দফাকে সমর্থন করেছেন। ৬ দফার পক্ষে জনমত গড়ে তুলেছেন। রাজপথে নেমেছেন ৬ দফা আদায়ে, '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানে। '৭০, '৭১-এর গণআন্দোলনের সময় আওয়ামী লীগের



জিরির মুক্তিযোদ্ধা মাওলানা আঃ সোবহান এখানেই শুয়ে আছেন

মিটিং-মিছিলে নেতৃত্ব দিয়েছেন, বঙ্গবন্ধু চট্টগ্রামের পলো গ্রাউন্ডে সমাবেশ করতে এলে তৃতীয় বক্তা হিসেবে বক্তৃতা করেন বলে জানালেন ছেলে মাহমুদুল হাসান। তিনি নিজে সেই সমাবেশে থেকে বঙ্গবন্ধুর পাশাপাশি বাবা মাওলানা সোবহানের বক্তৃতা শুনেছেন। এছাড়াও লালদীঘি ময়দানে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতাদের সঙ্গে মঞ্চে একত্রে বক্তৃতা করেছেন মুহাদ্দিস আবদুস সোবহান। মুক্তিযুদ্ধ যখন শুরু হয়ে গেল তখন তুখোড় বক্তা মাওলানা সোবহান তাঁর তুখোড় বক্তৃতাশৈলী দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ব্যাপক জনমত গড়ে তুলেছেন। বাড়ি বাড়ি গিয়েছেন। তরুণদের উদ্বুদ্ধ করেছেন মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে। মুক্তিযোদ্ধাদের খাওয়ানো, থাকতে দেয়া, সাহস জোগানো, পথ দেখানো, তথ্য জানানো ইত্যাদি সবই করেছেন নিজের জীবন বাজি রেখে।

মুক্তিযুদ্ধের পরেও মৃত্যু পর্যন্ত আওয়ামী লীগের সঙ্গে নিজেকে সম্পৃক্ত রেখেছেন মাওলানা আবদুস সোবহান। চট্টগ্রামের আলোচিত আওয়ামী লীগ নেতা ও স্থানীয় এমপি আখতারুজ্জামান বাবু নিয়মিতই গাড়ি নিয়ে বাড়িতে এসে তার সঙ্গে দেখা করে যেতেন। মৃত্যুকালে তার বয়স ঠিক কত ছিল তা সঠিকভাবে না বলতে পারলেও আশি থেকে পঁচাশি বয়স পর্যন্ত জীবিত ছিলেন বলে জানালেন ছেলে মাহমুদুল হাসান। ১৯৯২ সালে মাদরাসায় হাদিস পড়ানো অবস্থায় পরকালে পাড়ি জমান দেশের জন্য উৎসর্গপ্রাণ এ মহান পুরুষ। বাবার সহকর্মী হিসেবে আরো একাধিক আলেম তখন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে কাজ করেছেন বলে জানালেন মাহমুদুল হাসান। এ চট্টগ্রামেই তাদের কেউ এখনো জীবিত আছেন কিংবা মৃতদের পরিবার রয়ে গেছে বলে জানা গেল তার কাছ থেকে। এদের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেবেন এরকম আশ্বাসও দিয়ে দিলেন অতি আগ্রহী মাহমুদুল হাসান। আশ্বস্ত আমরা দু'জনে তার এ আগ্রহে কেবল উদ্দীপ্তই হলাম না, ভাবতেও শিখলাম যে, ৩৬ বছর ধরে ঘুমিয়ে থাকা আলেম মুক্তিযোদ্ধার ইতিহাস সত্যিকার অর্থেই জেগে উঠছে।



পাকিস্তান প্রবাসী মুফতি আবদুস সালাম চাঁটগামী জানালেন, ইয়াহিয়া এবং সরকারের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা সাধারণ সৈন্যদের বলে দিয়েছে– বাঙালি মানেই হিন্দু; সুতরাং তাদের পেলে খতম করো আর নারীদের ভোগ করো, বাড়ি-ঘর জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ধ্বংস করে দাও...!

পাকিস্তানের শীর্সস্থানীয় দৈনিক 'ডন' পত্রিকার সম্পাদক আব্বাস নাসির গতকাল বিবিসি রেডিওকে একটি সাক্ষাৎকার দেন। জনাব নাসিরের বক্তব্যের সারাংশ হিসেবে তিনটি পয়েন্ট বেরিয়ে আসে– ১. পাকিস্তানের সেনাবাহিনী একটি রাজনৈতিক দল; ২. পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকে গত ৬০ বছরের ইতিহাসে ১৯৭০-এর নির্বাচনই হচ্ছে একমাত্র সুষ্ঠু নির্বাচন এবং ৩. কায়েমী স্বার্থবাদীদের কারণে এ ৬০ বছরেও দেশটিতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

আব্বাস নাসির বলেন, অবশ্যই সেনাবাহিনী একটি রাজনৈতিক দল। তারা সব সময় একটি রাজনৈতিক সত্তা ও দল হিসেবেই কাজ করেছে। দেশের বিভিন্ন বিষয়ে ভূমিকা রাখার অধিকার চেয়েছে। অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলোর চেয়ে সেনাবাহিনী একটি সুবিধাজনক অবস্থায় রয়েছে। তাই এটিকে আমরা এমন একটি রাজনৈতিক দল বলতে পারি যার রয়েছে ৫ লাখ সশস্ত্র সদস্য। আর এটা হলো মোটামুটি একটি সুশৃঙ্খল রাজনৈতিক দল।

পাকিস্তানে কেন আজও একটি সুস্থ গণতন্ত্রের ধারা প্রতিষ্ঠত হলো না– এর কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নাসির বলেন, দেশটিতে গণতন্ত্র একটি অলীক স্বপ্ন। কায়েমী স্বার্থবাদীদের মধ্যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা না করার ব্যাপারে একটি ঐকমত্য রয়েছে। কায়েমী স্বার্থবাদী বলতে আমি ১৯৫০-এর দশকের আমলাতন্ত্র আর তারপর '৫০-এর দশকের শেষ দিকে ও '৬০-এর দশকের সামরিক বাহিনী, আমলাতন্ত্র এবং শিল্পপতিসহ ধনিক শ্রেণীকে বোঝাচ্ছি। তারা সবাই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টাকে নস্যাৎ করেছে। তিনি আরও বলেন, আমরা সবাই জানি, পাকিস্তানে একমাত্র সুষ্ঠু নির্বাচন হয়েছিল ১৯৭০ সালে। এর ফলশ্রুতিতে পাকিস্তান ভেঙে দু' টুকরো হয়ে যায়। কারণ সামরিক বাহিনী এবং আমলাতন্ত্র এ নির্বাচনের ফলাফল মেনে নিতে রাজি ছিল না। ওই নির্বাচনে তদানীন্তন পূর্ব-পাকিস্তানের নেতৃত্ব সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছিল। আব্বাস নাসির আরও বলেন,

এরপরও এ দুঃখজনক ধারা চলতে থাকে। কায়েমী স্বার্থবাদীরা তাদের স্বার্থ হাসিলের জন্য গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে দেয়নি।

স্বাধীনতাপ্রেমী এবং একজন সংবাদকর্মী হিসেবে 'ডন' পত্রিকা সম্পাদকের এ সাক্ষাৎকারটি আমাকে প্রভূত প্রলুব্ধ করেছে আমাদের মহান স্বাধীনতা সংগ্রাম নিয়ে নতুন করে ভাবতে। গেল শতাব্দীর অন্যতম গ্রেট ট্রাজেডি '৭১-এর রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ নিয়ে একজন পশ্চিম পাকিস্তানির এরকম নির্মেধ, নির্মোহ এবং নিরপেক্ষ মন্তব্য-বিশ্লেষণ মনে করিয়ে দিল মুফতি আবদুস সালাম চাঁটগামীর কথা। আমাদের চট্টগ্রামেরই সন্তান। ১৯৬৭ সাল থেকে একাধারে ৩৬ বছর পাকিস্তানে ছিলেন। মুসলিম বিশ্বের নামকরা একটি মাদরাসার প্রধান মুফতি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন প্রায় ৩৩ বছর। উর্দুর আগ্রাসনে নিজের মাতৃভাষা প্রায় ভুলে যেতে বসেছিলেন। এভাবে কি নিজের বাঙালি জাতিসত্তাও ভুলে গেছেন– এমনি নানা প্রশ্ন নিয়ে চট্টগ্রাম সফরের প্রথম দিনের শেষ বেলাতে তাঁর বর্তমান কর্মস্থল হাটহাজারী মাদরাসায় গিয়ে হাজির হই। সঙ্গে ফায়জুল হক। সালাম এবং কুশল বিনিময়ের পর তাঁকে আজকের সাক্ষাতের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানালাম। তিনি এক গাল হেসে বললেন, '৭১-এ আমি দেশেই ছিলাম না– মুক্তিযোদ্ধা হবো কি করে? আমি তো তখন পশ্চিম পাকিস্তানে ছিলাম।

– নিশ্চয়ই সে সময়টিতে আপনি ইয়াহিয়া-ভুট্টোদের পক্ষাবলম্বন করেছিলেন?

: আপনি কি ভেবেছেন উর্দুতে কথা বলি বলে আমি বাঙালি থেকে বের হয়ে গেছি?

– তারইবা নিশ্চয়তা কি?

: তাহলে শুনুন, আমার প্রথম পরিচয় হলো আমি একজন মুসলমান। দ্বিতীয় পরিচয় আমি একজন বাঙালি। এই পরিচয়ে পরিচয় দিতে নিজেকে গর্ববোধ করি।

– '৭১-এর রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ পশ্চিম পাকিস্তানের দৃষ্টিতে ছিল বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন আর আমাদের কাছে মহান স্বাধীনতা সংগ্রাম...।

: বেশক, ইয়ে আজাদিকা লড়াই থা।

– আচ্ছা, আপনি তখন পশ্চিম পাকিস্তানে ছিলেন কেন?

: '৬৭-তে আমি তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানে গিয়েছিলাম পড়াশুনা করার জন্য। আমি তো গিয়েছিলাম দু'-তিন বছরের টার্গেটে। কিন্তু '৬৭-'৭০ তখন পুরো গোলমাল চলছিল। হঠাৎ করে হাওয়াই জাহাজ (বিমান)-এর ভাড়া ৫০০ টাকা হয়ে গেল। কিন্তু আমার কাছে তখন কোনো টাকাই ছিল না। ডাকে আব্বা ৬০০ টাকা আমার নামে দেশ থেকে পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু গোলমালের কারণে ৫০০ টাকার টিকিট ১০০০ টাকা হয়ে গেল। এরপরে তো টিকিটই বন্ধ করে দিল।

– সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিল?

: দুই দেশের মধ্যে গোলযোগের কারণে সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিল। মাদরাসায় দু'মাস মেহমান ছিলাম। রুটি দেয়া হতো, তাই খেয়ে থাকতাম। এরপর মাদরাসার পাশেই কারী মুসা আমাকে একটি ইমামতি দিলেন। ইমামতি পেয়ে সেখানে চলে

যাই। ওখানেই খাওয়া-দাওয়া করতাম। হঠাৎ একদিন স্বপ্নে দেখলাম– আমাদের বাড়ির পশ্চিমে একটি মসজিদ আছে। আমার আব্বা এসে আমাকে বলছেন– তুমি ওখানে থেকে যাও। ওখানে যে সুযোগ পাবে অন্য কোথাও তা পাবে না।

– তখন দেরি হয়ে গেল না?

: বিলকুল দেরি হয়ে গেছে।

– কিন্তু আপনার স্বপ্ন তো বাস্তবায়ন হয়েছে?

: হ্যাঁ, তা হয়েছে। ওখানকার সদর মুদাররিস (প্রধান শিক্ষক) মাওলানা ইয়াহহিয়া সাহেব এসে আমাকে বললেন, আবদুস সালাম, তুমি মুফতি সাহেবের কাছে গিয়ে তোমার ব্যাপারটা খুলে বলো।

– তাহলে চাকরিটা হয়েই গেল?

: না, হয়নি। তখন মুফতি ছিলেন অলি হাসান এবং আহমদুর রহমান সাহেব। আমি তাদের সঙ্গে কাজ করতাম।

– '৭০ সাল থেকে আপনি ইফতা বিভাগে কাজ শুরু করেন?

: হ্যাঁ, তাঁরা যতদিন জীবিত ছিলেন সদর (প্রধান) মুফতি ছিলেন। আমি ছিলাম কার্যকরী মুফতি – সব কাজ আমিই করতাম।

– আমরা ইতিমধ্যেই জেনেছি, '৭১-এর ন'মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের সময় আপনি হানাদার পাকিস্তানিদের আবাসভূমিতে ছিলেন। দেশে ফিরতে চাইলেও ফিরতে পারেননি। তখন বাঙালিদের সম্পর্কে পাকিস্তানিদের মনোভাব কেমন ছিল?

: '৭১-এর জুলাই মাসের আগ পর্যন্ত পূর্ব বাংলায় কি ঘটেছে সে সম্পর্কে পশ্চিম পাকিস্তানিরা কোনো কিছুই জানতে পারেনি। ২৫ মার্চ সামরিক কর্তৃপক্ষ সংবাদের ওপর কড়া সেন্সর জারি করেছিল। এককথায় তখন পশ্চিম পাকিস্তানিরা দুনিয়ার বাকি অংশ থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। কড়া সেন্সরশিপের জন্য পরিকল্পনা করে বিরুদ্ধ সংবাদ বহনকারী কোনো বিদেশী সংবাদপত্র ও সাময়িকী দেশের ভেতরে আসতে দেয়া হতো না। এ ধরনের পত্র-পত্রিকায় যদি পূর্ব বাংলার ঘটনাবলির সামান্য উল্লেখও থাকত তাহলে তার প্রচার বন্ধ করে দেয়া হতো, ওইসব পত্র-পত্রিকা পুড়িয়ে ফেলা হতো। এ ব্যাপারে সরকারের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এমন সুশৃঙ্খল ছিল যে, যেসব যাত্রী তারা পাকিস্তানিই হোক কিংবা বিদেশী হোক দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলে শুল্ক বিভাগের কর্তৃপক্ষ তাদের সবাইকে তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করে দেখতেন। এসব যাত্রীর সঙ্গে সেনাবাহিনীর কার্যকলাপ সম্পর্কীয় পূর্ব বাংলার ঘটনার সামান্যতম উল্লেখ কোনো সংবাদপত্রে থাকলে তা বাজেয়াপ্ত করা হতো। তবে জুলাই মাসের শেষের দিকে সংবাদপত্র থেকে সেন্সর তুলে নেয়া হয়। বাংলাদেশের খবর পরিবেশনের ব্যাপারে উর্দু দৈনিক 'জং' কিছুটা নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করেছে।

'৭১-এর যুদ্ধটা মূলত আর্মিদের কারণে হয়েছে। সাধারণ জনগণ এটাকে পছন্দ করেনি। যারা আমাদের ওপর নির্যাতন করেছে, অত্যাচার করেছে জনগণ তাদের

ভালো চোখে দেখেনি। জাতীয় পর্যায়ে যারা ছিল এটা তাদের গোঁয়ার্তুমির কারণে ঘটেছে। সাধারণ পাকিস্তানিরা এসব ঘৃণার চোখে দেখত।

– আচ্ছা, তখনকার বড় বড় আলেমদের এ ব্যাপারে ভূমিকা কি ছিল?

: তারা দুঃখ প্রকাশ করেছে। মুফতি মাহমুদ, আল্লামা আবদুল্লাহ দরখাস্তি, শাহ্ আহমদ নূরানীসহ অনেকেই সরাসরি বাঙালিদের পক্ষাবলম্বন করেছেন। তাঁরা বারবার ইয়াহিয়াকে অনুরোধ করেছেন শেখ মুবিজকে ক্ষমতা দিয়ে দিতে। তবে একটা ঘটনা আমি কখনোই ভুলব না। দেশ ভাগ হয়ে যাওয়ার পর মুফতি শফী সাহেব তাঁর মাদরাসা থেকে বাঙালি ছাত্রদের বের করে দিয়েছিলেন। প্রায় দেড়-দুশ' ছেলে হবে। তখন ইউসুফ বিন্নুরী সাহেব তাঁর মাদরাসায় ওইসব ছাত্রদের এনে জায়গা দিয়েছিলেন।

– এদের অপরাধ?

: অপরাধ তো একটাই, এরা বাঙালি। যখন ইউসুফ বিন্নুরী সাহেবের কাছে এসে মুফতি শফী সাহেব বললেন, আমরা বাঙালি ছাত্রদের বের করে দিয়েছি আপনি দিচ্ছেন না কেন? বিন্নূরী সাহেব উত্তরে বলেছেন, তারা যদি রাজনীতি করে তাহলে এখনই বের করে দেব। আর যদি পড়ার জন্য আসে তাহলে আমি তাদের কোন অন্যায়ে বের করে দেব? হোক না তারা মন-মানসিকতায় বাঙালি, শেখ মুজিবপ্রেমী, আ'লীগপ্রেমী!

– ইয়াহিয়া কারও কথায়ই কর্ণপাত করল না?

: জিন্নার মতো ইয়াহিয়াও শিয়া ছিলেন। আর শিয়াদের নীতি তো আপনাদের ভালো করে জানা থাকার কথা।

– আচ্ছা পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যরা তো আমাদের মতো মুসলমানই ছিল। তারা কি করে আমাদের ওপর বর্বরতা চালাল?

: ইয়াহিয়া এবং সরকারের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা সাধারণ সৈন্যদের বলে দিয়েছে– বাঙালি মানেই হিন্দু; সুতরাং তাদের পেলে খতম করো আর নারীদের ভোগ করো, বাড়ি-ঘর জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ধ্বংস করে দাও...।

– আমার জন্ম যেহেতু স্বাধীনতার এক যুগ পর তাই ইতিহাসই আমাদের জানার একমাত্র সম্বল। ইতিহাস পাঠে আমরা জেনেছি, পশ্চিম পাকিস্তানিরা আমাদের ওপর চরম বৈষম্যমূলক আচরণ করত। আপনার অভিজ্ঞতা কি বলে?

: শুধু একটা উদাহরণ দেই। বাইরের সাহায্য এলে সেটা তিন ভাগ করা হতো। রাজধানী (ইসলামাবাদের) জন্য এক ভাগ, পূর্ব পাকিস্তানের জন্য এক ভাগ আর পশ্চিমের জন্য এক ভাগ। মানে আমরা পেলাম এক ভাগ আর তারা দু' ভাগ। অথচ জনসংখ্যায় কিন্তু বাঙালিরা বেশি।

– প্রায় এক লাখ সৈন্যের আত্মসমর্পণের খবর শুনে সাধারণ জনগণের মনোভাব কি হয়েছিল?

: তারা আফসোস করেছিল।

– বঙ্গবন্ধু যে তখন পাকিস্তানে ছিলেন তা কি কেউ জানত?

: না, সাধারণ জনগণ তা জানতে পারেনি।

– বঙ্গবন্ধু নিহত হওয়ার খবর শুনে সাধারণ পাকিস্তানিদের প্রতিক্রিয়া কি ছিল।

: '৭১-এ শেখ মুজিবকে সাধারণ জনগণ যে দৃষ্টিতে দেখেছিল '৭৫-এ এসে ঠিক তার উল্টোটা ঘটেছে। তার সাড়ে তিন বছরের শাসনামল কেউ ভালো চোখে দেখেনি। তাই তার নিহত হওয়ার খবরে তারা খুশিই হয়েছিল।

– জিয়া হত্যায়?

: জিয়া ক্ষমতায় আসায় খুশি হয়েছিল। কিন্তু জিয়া হত্যায় আফসোস করেছে।

– দীর্ঘ প্রায় তিন যুগের প্রবাস জীবনের পরে দেশে চলে এলেন কেন?

: শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছি। তাই দেশে চলে এলাম। আমার জ্ঞাতি গোষ্ঠীর সবাই তো এখানেই থাকে। চাকরির কারণে এত বছর পাকিস্তানে ছিলাম। এখন থেকে বাকি জীবনটা জন্মভূমিতেই কাটিয়ে দেব। আমার কবরটা যেন এদেশেই হয়।



রাঙ্গুনিয়ার মাওলানা আবু ইসহাক ও মাওলানা আবুল কালাম : বাপ-বেটার লড়াই

আলেম মুক্তিযোদ্ধার খোঁজে চট্টগ্রাম শহর ছেড়ে এখন চলে এসেছি রাঙ্গুনিয়া থানার রানীরহাট ইউনিয়নে। রানীরহাটের পরই পার্বত্য জেলা রাঙ্গামাটি শুরু। রানীরহাটেই পার্বত্য পরিবেশ চোখে পড়ল। মাঝে মধ্যেই দেখা যাচ্ছে ছোট-মাঝারি পাহাড়। পাহাড় কেটে বাঙালি-উপজাতি বসত গড়েছে। পাহাড়ের পাদদেশ দিয়ে বয়ে চলা নদী বয়ে নিয়ে গেছে পাহাড়ি ঢল। যাতায়াতের মাধ্যম জিপ বা স্থানীয় ভাষায় চানের গাড়ি। রানীরহাট বাজার থেকে বেশ কিছুটা পথ পেরিয়ে পৌছলাম ফুলবাগিচা আজিজুল উলুম হেফ্‌জ ও এতিমখানায়। এ মাদরাসারই শিক্ষক ছিলেন এ গ্রামের আলেম মুক্তিযোদ্ধা মরহুম মাওলানা আবু ইসহাক। মাদরাসার বর্তমান মোহতামিম তাঁরই নাতিন জামাই। অফিস থেকে জানাল, তিনি বিদেশ সফরে রয়েছেন। আমাদের পরিচয় পেয়ে মাদরাসার শিক্ষক এবং মাওলানা আবু ইসহাকের চাচাতো ভাই জানালেন, মুক্তিযোদ্ধা মাওলানা ইসহাক তিন বছর আগে মারা গেছেন। তার দুই ছেলে তিন মেয়ে। ছোট ছেলে বিদেশ থাকেন। বড় ছেলে বাড়িতেই আছেন। তার কাছ থেকে কিংবা স্থানীয় চেয়ারম্যানের কাছ থেকে বিস্তারিত জানা যাবে বলে জানালেন এ জ্ঞাতি ভাই। চেয়ারম্যান আবার মাওলানা ইসহাকের ভাতিজা। পাশাপাশি তাদের ঘর। আমি এবং আমার সঙ্গী ফায়জুলকে বাড়ি দেখিয়ে দিতে সঙ্গে দেয়া হলো মাদরাসারই এক ছাত্রকে। চেয়ারম্যান যথারীতি ব্যস্ত তার অফিসে। পাশেই মাওলানা আবু ইসহাকের বড় ছেলে আবুল কালামের ঘর। চেয়ারম্যানের ছোট ছেলে জানাল, আবুল কালাম নেই। আবুল কালামকে না পাওয়া গেলেও তার মোবাইল নাম্বার পাওয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে মোবাইলে রিং পৌছে দিলাম আবুল কালামের কাছে। বাস থেকে তিনি জানালেন, এ মুহূর্তে রাঙ্গামাটির পথে আছেন তিনি। সেখানে তার ভাড়া বাসায় যাচ্ছেন। ফোনেই দ্রুত ঠিকানা নিয়ে নিলাম। রাঙ্গামাটি শহরের বোর্ড বাজারে থাকেন আবুল কালাম। যাত্রা এবার রাঙ্গামাটি শহরে।

রাঙ্গামাটি কত দূর?

রানীরহাট থেকে ১২ কিলোমিটারের পথ রাঙ্গামাটি শহর। সংখ্যায় ১২ কিলোমিটার হলেও ঘড়ির দূরত্বে ১ ঘণ্টার পথ। পাহাড়ি আঁকাবাঁকা পথে ১ ঘণ্টার রোমাঞ্চকর সময় পাড়ি দিয়ে পৌছলাম রাঙ্গামাটি শহরে। শহরের শেষ প্রান্তে বোর্ড বাজারে এক ভাড়া বাসায় পরিবার নিয়ে থাকেন আবুল কালাম। দুপুরে গিয়ে পৌছলাম আবুল কালামের বাসায়।

প্রথমে আবুল কালাম নিজেকে পরিচয় করিয়ে দিলেন আমাদের সঙ্গে। চট্টগ্রাম দারুল উলুম আলিয়া মাদরাসা থেকে কামিল পাস করেছেন আবুল কালাম। পঁচিশ বছর প্রবাস জীবন কাটিয়ে রাঙ্গামাটিতে এখন ব্যবসায়িক জীবনে সাফল্যের আশায় মুখিয়ে আছেন। বাবা, মুক্তিযুদ্ধ ইত্যাদি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেই অত্যন্ত আবেগতাড়িত হয়ে পড়েন আবুল কালাম। মৃদু কণ্ঠে যুদ্ধের ভয়ানক দিনগুলোর কথা একে একে স্মরণ করে বলতে থাকেন– তাঁর বাবা মাওলানা আবু ইসহাক ৬ দফা ঘোষণার আগে নেজামে ইসলাম পার্টির কর্মী ছিলেন। ৬ দফা ঘোষিত হলে তিনি বুঝতে পারেন, ৬ দফা প্রকারান্তরে ইসলামেরই প্রতিধ্বনি। পাকিস্তানিরা যে বৈষম্য করে যাচ্ছে তা থেকে মুক্তির জন্য জালেমের বিরুদ্ধে লড়াই করাই ইসলামের নীতি। সেজন্যই তিনি আওয়ামী লীগে যোগ দেন।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে পাকিস্তান সরকার রাঙ্গুনিয়ার দু'জনকে ধরিয়ে দেয়ার জন্য ৪০ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করে। এ দু'জনের একজন হলেন আমার বাবা মাওলানা আবু ইসহাক, আরেকজন আমার চাচা মাস্টার আবু মুসা। অনন্যোপায় হয়ে বাবা ও চাচা ১ এপ্রিল আত্মগোপনে যান। পাকিস্তান সরকার এ দু'জনের বিরুদ্ধে কেন পুরস্কার ঘোষণা করল? এ প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলাম আবুল কালামকে। উত্তরে তিনি বললেন, কওমি আলেমদের মধ্যে আমার বাবাই ছিলেন অন্যতম। পাকিস্তানের বিপক্ষে যাওয়া সঠিক না বেঠিক আলেম সমাজ এ প্রসঙ্গে যখন দ্বিধা-বিভক্ত তখন আমার বাবাই ঘোষণা দেন, পাকিস্তানের বিপক্ষে যাওয়া কেবল সঠিকই নয়, বরং এটা ঈমানি দায়িত্বও বটে। কেবল ঘোষণা নয়, আমার বাবা আলেমদের নিয়ে এ ব্যাপারে জনশক্তি তৈরিরও চেষ্টা করেন। বিষয়টি পাকিস্তান সরকার বুঝতে পেরে তাকে ধরিয়ে দিতে এ পুরস্কার ঘোষণা করে।

আত্মগোপন করে কোথায় গেলেন, কী করলেন– তা জানতে চাইলেন ফায়জুল হক। আবুল কালাম জানালেন, আত্মগোপন করে পাহাড়ি অঞ্চলে চলে এলেন। তখন এসব অঞ্চল আরো গভীর বনে ঢাকা ছিল। দক্ষিণ রাঙ্গুনিয়ার পদুয়ায় আত্মগোপন করেছিলেন। মাঝে মাঝে বাড়িতে আসতেন। আবার চলে যেতেন গভীর পাহাড়ি বনে। বাবাকে ধরতে আমাদের বাড়িতে ছয়বার রেইড করেছিল হানাদার বাহিনী। ৬ এপ্রিল প্রথম বাড়িতে রেইড করে পাকসেনারা। রেইড করান স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান আমারই খালু কুখ্যাত রাজাকার কায়কোবাদ চৌধুরী। এ কায়কোবাদ চৌধুরী ছিল ফজলুল কাদের চৌধুরীর ডান হাত। রানীর হাট স্কুল মাঠে স্বাধীনতার ৮ দিন পর গণআদালতে কায়কোবাদকে গুলি করে হত্যা করা হয়।

মীর জাফরের দল হুঁশিয়ার!

ও আচ্ছা, ফজলুল কাদের চৌধুরী তো এই রাঙ্গুনিয়াই ছিলেন। সে সময় তারা মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি কি রকম নির্যাতন করেছিলেন। এ ব্যাপারে কি আপনার জানা আছে? আবারো প্রশ্ন করলাম আবুল কালামকে। অতি শোকবিহ্বল সুরে কালাম বললেন, আহা! সবকিছুই আমাদের চোখের সামনে ঘটেছে। কত লোককে যে তারা হত্যা আর নির্যাতন করেছে তা ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়। ফজলুল কাদের চৌধুরীর ডান হাত ছিল কায়কোবাদ, আর বাম হাত ছিল ওয়াকিল আহমেদ।

তোমাদের সঙ্গে আছি, তোমরা লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হও। আরেকদিন রাজাকারের এক গ্রুপ এলো। সরাসরি আমি বলে দিলাম আমরা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের। তোমাদের কোনো সাহায্য করতে পারব না। রাজাকারদের এরপর দৌলতপুরের কোথাও আসতে দেয়া হয়নি। তারা জেনে গিয়েছিল দৌলতপুর মুক্তিযোদ্ধাদের ঘাঁটি।

হিন্দু-মুসলমান ভাই ভাই

যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। ছেলেরা সবাই মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিতে লাগল। তাদের আমি টাকাকড়ি, খাবার সবকিছুর ব্যবস্থা করে দিলাম সাধ্য অনুযায়ী। বাড়িতে অনেকে এসে আশ্রয় নিত। হিন্দু জেলেরা এসে আশ্রয় নিত। বিরেন্দ্র সাধু, প্রফুল্ল দত্ত, প্রকাশ দত্ত–তারা এসে এখানে থাকত। গুড়-পরোটা ইত্যাদির যোগান দিতাম তাদেরকে। এমনকি বিভিন্ন জিনিস আমার কাছে গচ্ছিত রাখত হিন্দুরা। স্বর্ণ-অলঙ্কার, টাকা-পয়সা ইত্যাদি সময়মতো ফিরিয়ে দিয়েছি। আমরা নিজ চোখে দেখেছি চট্টগ্রাম বন্দরে তেলের ডিপোগুলো জ্বালিয়ে দিয়েছে মুক্তিযোদ্ধারা, জাহাজ ডুবিয়ে দিয়েছে মুক্তিযোদ্ধারা। ফলে কোনো জাহাজ এখানে ভিড়তে পারেনি। জেনারেল জিয়ার নেতৃত্বে আমাদের গ্রামের ছেলেরা মুক্তিযুদ্ধ করেছে, বন্দর দখলে রেখেছে। সাধ্যমত তাদের খাইয়েছি, যোগাযোগ রেখেছি প্রতিদিন। লড়াই করার জন্য মানসিক শক্তি যোগানের চেষ্টা করেছি।

'তোমাকে ভালোবেসে অবশেষে আমি কি পেলাম?'

মৌলভী আব্দুল মালিক অকপটে বলে গেলেন, জহির রায়হানের একটা উক্তি আমার প্রায়ই মনে পড়ে, "তোমাকে ভালোবেসে অবশেষে আমি কি পেলাম?" দেশকে ভালোবাসলাম, দেশের জন্য ত্যাগ স্বীকার করে এখন আমরা কি পেলাম? আমাদের পরিবার '৫২ থেকে দেশের পক্ষের আন্দোলনে সম্পৃক্ত। '৫২-এর পর চট্টগ্রামে প্রথম যখন আওয়ামী লীগ গঠিত হয় তখন তার সেক্রেটারি ছিলেন আমাদের পরিবারের এম. এ. আজীজ। যার নামে এখন চট্টগ্রাম এম. এ. আজিজ স্টেডিয়াম। আওয়ামী লীগ গঠনে তখন আলেমদের মধ্যে ছিলেন মাওলানা আবু তাহের, কারী ইউসুফ। আমাদের পরিবার সেই '৫২ থেকে আওয়ামী লীগের ছিল, এখনো আছে। মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে যে স্বপ্ন দেখেছিলাম দেশকে নিয়ে তার কিছুই পেলাম না। কাজী নজরুলের ছন্দই তুলে ধরলেন মৌলভী আবদুল মালিক—ভুলি কেমনে আজো যে মনে বেদনা রহিল...।

দারিদ্র্যমুক্ত, সুখী, অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী একটি দেশ হবে বাংলাদেশ। সে কিনা এখন প্রতি পদে পদে ঠুকছে। মনে খুব বেদনা হয়, দুঃখ হয়। কিন্তু দুঃখ আর বেদনা নিয়ে বেঁচে থাকা ছাড়া আর কিইবা করার আছে এ বয়সে আমার?

মৌলভী আব্দুল মালিক ছাত্রজীবন কাটিয়েছেন চট্টগ্রাম আলিয়া মাদরাসায়। সে সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে আলিম পরীক্ষা দেন। পরে মহসিন কলেজে বাংলা নিয়ে ভর্তি হন। আলেম পড়েও উর্দু না নিয়ে বাংলা বেছে নিলেন? এ প্রশ্নের উত্তরে তখন তার এক শিক্ষককে বলেছিলেন, বাংলা ভাষার এই দেশে উর্দু নিয়ে কি করব? ছোটবেলায় একই গ্রামের মাওলানা আব্দুস সোবহানের ছাত্র ছিলেন তিনি। ছয় ছেলে ৫ মেয়ে নিয়ে নিজ গ্রামেই অবসর জীবন কাটাচ্ছেন ৮৫ বছর বয়সি স্বাধীনতাপ্রেমী মৌলভী আব্দুল মালিক।



নিজেরা না খেয়ে তাদের খাইয়েছি, মাসের পর মাস কষ্ট করলাম আমরা, আর এখন স্বাধীনতার সুফল ভোগ করছে কারা? এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজে ফেরেন মুক্তিযোদ্ধা মৌলভী আব্দুস সোবহান

মাহমুদুল হাসান সামনে এগিয়ে চলছেন চট্টগ্রাম-আনোয়ারা মহাসড়কের পথ ধরে। মাগরিব পেরিয়ে গেছে বেশ আগেই। মৌলভী আব্দুল মালিকের বাসায় মাগরিবের নামাজ আদায় করে মাহমুদুল হাসানের পথ ধরে চলেছি নতুন আলেম মুক্তিযোদ্ধার খোঁজে। সন্ধ্যা নামতেই চারদিকে অন্ধকার, নেই বিদ্যুৎ। দোকানগুলোয় বাতি মিটমিট করে জ্বলছে মাত্র। বেশ খানিকটা পথ হাঁটতে হচ্ছে মহাসড়কের পথ ধরে। আর মনে মনে ভাবছি, সন্ধ্যা নামতেই এমন অন্ধকার পটিয়া, আনোয়ারা। তাহলে কি সেই আব্দুল মালিকের বক্তব্যই সত্য? এই দেশ নিয়ে দুঃখ করাটাই কি আমাদের সম্বল? রানীরহাট থেকে পটিয়া আসার সময় যাত্রাপথে কিছুটা সঙ্গ দিয়েছিলাম এ্যান্থনি ম্যাসকারেনহাসের লেখা বই 'বাংলাদেশ রক্তের ঋণ'-কে। এই বই পড়ে হতাশার জাল যেন আরো পেঁচানো মনে হলো আমার কাছে। না, তা হতে পারে না। দেশ এক সময় ঠিকই ঘুরে দাঁড়াবে। মুক্তিযোদ্ধাদের স্বপ্ন, রক্ত বিফলে যেতে পারে না। এই আশার আলো জ্বালিয়ে সামনের পথটাকে আলোকিত করতে চাচ্ছি কেবল।



এরই মধ্যে চলে এলাম কাঙ্ক্ষিত বরুটান গ্রামে। এখানে বাস করেন মৌলভী আব্দুস সোবহান। যথারীতি বিদ্যুৎ নেই। চার্জ লাইটের আলোও শেষ হয়ে আসছে। মিটিমিটি আলোতে সাদা কাগজে কলম ধরার অনুরোধ জানালাম ফায়জুলকে। ফায়জুল বলল, কলমের কালো দাগ বাইরের কালোর সঙ্গে মিশে না গেলেই হয়। এমন একটা পরিবেশেই এগিয়ে চলল আলোচনা। মৌলভী আব্দুস সোবহান চট্টগ্রাম দারুল উলুম আলিয়া থেকে ফাজিল পাস করেন। তারপর ওয়াজদিয়া আলিয়া মাদরাসা থেকে কামিল সম্পন্ন করেন। পারিবারিকভাবে বেশ খ্যাতি ছিল মৌলভী সোবহান পরিবারের। স্বাধীনতার আগে ১৯৬৩ সালে গ্রামের মেম্বার নির্বাচিত হন তিনি। মোট তিনবার ছিলেন মেম্বার এবং একবার ছিলেন ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান।

মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে জানতে চাইলে বলেন, ৬ দফার পরই আমি উপলব্ধি করতে থাকি পাকিস্তান সরকার কেবল প্রতারণা আর বৈষম্য ছাড়া আমাদের কোনো কিছুই উপহার


রাঙ্গুনিয়ার মুক্তিযোদ্ধা মাওলানা ইসহাক এখানেই শুয়ে আছেন

পাকসেনারা তো মুক্তিযোদ্ধাদের চিনত না। এ রাজাকাররাই তাদের চিনিয়ে দিত। ঠিকানা মতো নিয়ে যেত। আমাদের বাড়িতে বাবার খোঁজে ছয় বার হানা দিয়েছিল কেবল এ রাজাকারদের সহায়তায়ই। আহা! এখনো মনে পড়ে, আমার বাবারই ছাত্র বগুড়ার জামিল মাদরাসায় লেখাপড়া করেছে এ ছেলেটি। সে তারই শিক্ষককে হত্যা করানোর জন্য পাকসেনাদের আমাদের বাড়িতে নিয়ে এসেছিল। অথচ এ ছাত্রকেই বাবা নিজের গাঁটের পয়সা দিয়ে দ্বীনি শিক্ষা দিয়েছেন। স্বাধীনতার পর বাবা শিক্ষকতাই করেননি সেই আক্ষেপে। যে শিক্ষা মানুষকে মানুষ বানাতে পারে না সেই শিক্ষা দিয়ে লাভ কি? শিক্ষকতাই বাদ দিয়ে দিয়েছিলেন বাবা। শেষ পর্যন্ত জিরি মাদরাসার বারবার অনুরোধ এবং মায়ের আদেশে আবার শিক্ষকতা পেশায় ফিরে আসেন।

ফিরে আসি আবার মুক্তিযুদ্ধে।

তোমার আমার ঠিকানা– পদ্মা, মেঘনা, যমুনা

বাড়িতে বারবার রেইড চলছে, চারদিকে রাজাকারদের ভয়াবহ থাবা, এ অবস্থায় আপনারা কি করলেন– জানতে চাইল ফায়জুল। জবাবে বললেন, আমি তখন আলিয়া মাদরাসায় ফাজিল জামাতের ছাত্র। লেখাপড়া সব বন্ধ। সিদ্ধান্ত নিলাম মুক্তিযুদ্ধে যাব। এলাকার যুবকরা একত্রিত হলাম। আমাদের প্রাথমিক পরিকল্পনা ছিল ভারতে গিয়ে প্রশিক্ষণ নিয়ে আসব। পরিকল্পনা মতো এগুচ্ছিলাম। এরই মধ্যে আমাদের এ অঞ্চলের কমান্ডার সাবেক অতিরিক্ত আইজি নূরুল আলম এক চিঠিতে জানালেন, তিনি প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ভারত থেকে আগামী কিছুদিনের মধ্যে রাঙ্গুনিয়ায় আসবেন। সেখানে তাদের ট্রেনিং দেয়াবেন। ভারতে আর যাবার প্রয়োজন হবে না। যেই কথা সেই কাজ। দক্ষিণ রাঙ্গুনিয়ায় খোলা হলো আমাদের জন্য ট্রেনিং ক্যাম্প। প্রশিক্ষণ শেষে নেমে পড়লাম অপারেশনে। আমাদের বড় কয়েকটি অপারেশনের মধ্যে একটি ছিল চট্টগ্রাম শহরের দামপাড়া পুলিশ ক্যাম্প অপারেশন। এখানে রাজাকারদের প্রশিক্ষণ চলছিল। ব্যাপক হতাহত করা হলো এই অপারেশনে। আরেক বড় অপারেশনে

রানীরহাটে আটজন পাঞ্জাবি সেনাকে হাতেনাতে গুলি করে মেরে ফেললাম। এরপর রাঙ্গুনিয়া থেকে ক্যাম্প গুটিয়ে ফেলে পাঞ্জাবিরা। সেপ্টেম্বরেই উত্তর রাঙ্গুনিয়া আজাদ হয়ে যায়।

রাঙ্গুনিয়া আজাদ হয়ে যাওয়ায় আমার বাবা সেপ্টেম্বরে প্রকাশ্যে আসেন। প্রকাশ্যে এসে তিনি নেমে পড়েন মুক্তিযুদ্ধের কাজে। তাঁর অনুসারী আলেমদের সংগঠিত করতে চেষ্টা করেন। মাদরাসায় মাদরাসায় গিয়ে বিশেষ করে কওমি মাদরাসাগুলোর শিক্ষক-ছাত্রদের বোঝানোর চেষ্টা করেন– এখনই সময় দেশের জন্য জেহাদে যাবার। কিন্তু তখন অনেক রকম সমস্যা ছিল মাদরাসাগুলোতে। রাজনীতি করা নিষিদ্ধ ছিল বলে অনেক মাদরাসার ছাত্র ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে পারেনি। আমার বাবার একান্ত প্রচেষ্টার কারণেই তখন চট্টগ্রামের অনেক কওমি মাদরাসার আলেম রাজাকারদের সঙ্গে সম্পৃক্ত হননি। 'পাকিস্তানের পক্ষ নেয়া ইসলামবিরোধী'– এ নামে লিফলেট তৈরি করে মাদরাসায় মাদরাসায় বিলি করেছেন আমার বাবা। যখন যেখানে যেভাবে পেরেছেন সেভাবেই মানুষকে বুঝিয়েছেন মুক্তিযুদ্ধের কথা। দিয়েছেন তাদেরকে এ ব্যাপারে সঠিক ধর্মীয় ব্যাখ্যা। ধর্মীয় ব্যাখ্যা দিয়ে দেয়ালিকা, পোস্টার ছড়িয়ে দিয়েছেন চারদিকে মানুষকে সঠিক তথ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করতে।

মাওলানা আবু ইসহাক দীর্ঘ ৬৩ বছর শিক্ষকতা করেছেন। যেসব মাদরাসায় শিক্ষকতা করেছেন তার মধ্যে কয়েকটি মাদরাসা হলো– বগুড়া জামিল মাদরাসা, জিরি মাদরাসা, পটিয়া মাদরাসা, চট্টগ্রাম মাজহারুল উলুম মাদরাসা ইত্যাদি। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর তাকে নিয়ে একটি শোকাবহ কাসিদা লিখেছিলেন মাওলানা আবু ইসহাক– এ তথ্য জানালেন ছেলে মুক্তিযোদ্ধা আবুল কালাম। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে মাদরাসা শিক্ষা সংস্কার নিয়ে আলোচনার কথা ছিল মাওলানা ইসহাকের। কিন্তু ১৫ আগস্টের ঘটনার জন্য তা আর হয়ে ওঠেনি। ৯৩ বছর পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন মাওলানা ইসহাক। ৯৩ বছর বয়সে ২০০৩/২০০৪ ইন্তেকাল করেন এ মহান পুরুষ।

কাপ্তাইয়ের পথে

বিদায়বেলা আবুল কালাম জানালেন, তার নানা মাওলানা দলিলুর রহমানও মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। তিনি এখন জীবিত নেই। তাঁর ছেলেকে পাওয়া যাবে কাপ্তাইয়ের চন্দ্রঘোনায় গেলে। রাঙ্গামাটি থেকে কিভাবে যাওয়া যাবে কাপ্তাই? আবুল কালাম জানালেন, রাঙ্গামাটি থেকে বড়ইছড়ির আলাদা বাস আছে। সেই বাসে করে দু'ঘণ্টা সময়ে বড়ইছড়ি যাওয়া যাবে। তারপর সেখান থেকে কাপ্তাই মূল সড়ক ধরে চন্দ্রঘোনা।

ঘড়ির কাঁটা চারটা ছুঁই ছুঁই। সন্ধ্যার আগেই পৌঁছতে হবে নানা বাড়িতে। দ্রুত বিদায় নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। চোখে বড়ইছড়ি। বাস ধরার তাড়া, শরীরে দীর্ঘ ভ্রমণের ক্লান্তি। তারপরও মনের ভাবনা থেমে নেই। কত বিচিত্রই না আলেম মুক্তিযোদ্ধার এ ইতিহাস। বাপ-বেটা যুদ্ধের দুই ফ্রন্টে লড়াই করেছেন। বাপ লড়াই করেছেন বুদ্ধিবৃত্তিক মুক্তিযুদ্ধে। নিজ বুদ্ধি, প্রজ্ঞা, মেধা দিয়ে লড়াই করেছেন দেশের হয়ে। আর বেটা লড়াই করেছেন সরাসরি যুদ্ধফ্রন্টে। অপারেশনে গিয়ে পাকসেনা, রাজাকারদের চিরতরে মৃত্যুর স্বাদ পাইয়ে দিয়েছেন। ভাবা যায়, আলিয়া মাদরাসার ফাজিল পড়ুয়া একজন ছাত্র এভাবে অস্ত্র হাতে যুদ্ধে নেমেছেন! আসলে, বাবার মতো তিনিও একজন আলেম মুক্তিযোদ্ধা।



'তোমাকে ভালোবেসে অবশেষে আমি কি পেলাম?' মুক্তিযোদ্ধা মৌলভী আব্দুল মালিকের প্রশ্ন

যোগাযোগ সূত্র যখন মাহমুদুল হাসান!

আবারো সেই মাহমুদুল হাসান। ধামাইরহাটের দুর্বোধ্য সড়কে সুখের মুহূর্ত ছিল সেই একটাই। মাহমুদুল হাসান ফোন করে জানালেন, আরো তিনজন আলেম মুক্তিযোদ্ধার খোঁজ পাওয়া গেছে তাদের দৌলতপুরে। এলে তাদের সঙ্গে যোগাযোগের সময় দেবেন তিনি। খুশিতে মনটা ভরে উঠল। বললাম, বিকেলের মধ্যেই আমরা চলে আসছি আপনার এলাকায়। এদিকে ধামাইরহাট, রানীরহাটে সময়টা বেশি লাগল। রানীরহাট থেকে চট্টগ্রাম শহর, সেখান থেকে পটিয়ার ফাজিলখাঁর হাটে পৌছতে সন্ধ্যা ছয়টা বেজে গেল। যথারীতি যথাসময়ে দৌলতপুর বাজারে এসে হাজির মাহমুদুল হাসান। কেবল হাজিরই নয়, প্রথমেই আমন্ত্রণের পর্বটা সেরে নিলেন। বললেন, এখানে কাজ শেষে আজ রাতটা আমাদের বাসায় থাকার অনুরোধটা রাখতে হবে। এভাবে অনুরোধ করার পর তা ফিরিয়ে দেয়ার সাধ্য আমার ছিল না। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। তাই আর দেরি না করে মাহমুদুল হাসানের যোগাযোগ সূত্র কাজে লাগিয়ে নতুন মুক্তিযোদ্ধার খোঁজে মাঠে নেমে পড়লাম।



পাক বৈষম্যের জ্বলন্ত সাক্ষী

পাকিস্তান সরকার বাঙালির ওপর যে বৈষম্য চাপিয়ে দিয়েছিল তার জ্বলন্ত সাক্ষী হয়ে এখনো বেঁচে আছেন ৮৫ বছর বয়সি আলেম মুক্তিযোদ্ধা মৌলভী আব্দুল মালিক। মাহমুদুল হাসান আমাদের প্রথমেই নিয়ে গেলেন তাঁর বাড়িতে। বয়সের ভারে জনাব মালিক নুয়ে পড়েছেন ঠিকই, কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিগুলোকে এখনো ধারণ করে রেখেছেন সগৌরবে। বিশেষ করে পাক বৈষম্যের কথা ভালোভাবে মনে রেখেছেন জীবনের এ প্রান্তে এসেও। তাই তিনি প্রথমেই বৈষম্যের কথা তুলে ধরে বললেন, পাকিস্তান সরকার যে সত্যিই আমাদের ওপর বৈষম্য চাপিয়ে দিয়েছিল তার প্রমাণ আমি নিজেই। কিভাবে বৈষম্য করা হয়েছিল আপনাদের সঙ্গে? এ প্রশ্নের উত্তরে বলেন, আমি ১৯৫৭ থেকে ৬৫ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানে ছিলাম। সেখানে ন্যাশনাল বুক সেন্টারে চাকরি করতাম। চাকরি করতে গিয়ে দেখেছি প্রতি পদে পদে বৈষম্য। বাঙালিদের চাকরি

পেতে অনেক হয়রানির শিকার হতে হতো। চাকরি হলেও পরে কাজ করতে গিয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীর মতো আচরণ করত আমাদের ওপর। আমি তখন যে ন্যাশনাল বুক সেন্টারে চাকরি করতাম সে সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে উর্দু ও বাংলা ভাষায় 'পাক সার জমিন' নামে পত্রিকা বের করা হতো। আমি সেখানে বাংলায় অনুবাদের কাজ করতাম। বাংলা বিভাগে একজন মাত্র সাব-এডিটর ছিল। অথচ উর্দু বিভাগে বেশ কয়েকজন সাব-এডিটর ছিল। অল্প কয়েকজন বাঙালিকে পুরো বিভাগের চাপ সইতে হতো। এ নিয়ে এডিটর এহসান মালিকের সঙ্গে প্রায়ই আমাদের দ্বন্দ্ব হতো। পশ্চিম পাকিস্তানে যদি পত্রিকার ১০,০০০ কপি ছাপা হতো, ঢাকায় তখন ছাপা হতো ১,০০০ কপি। ঢাকায় পত্রিকা আসতোও না নিয়মিত। অথচ ঢাকায় লোকসংখ্যা বেশি, চাহিদা বেশি। ঢাকার জন্য কাগজের যে কোটা ছিল তাও চাহিদার তুলনায় অপর্যাপ্ত ছিল। অফিসে বাঙালিদের কেন যেন আলাদা চোখে দেখা হতো। বেতন, সুযোগ-সুবিধাও কম ছিল। এসব বিষয় নিয়ে প্রচণ্ড ক্ষোভ জমতে থাকে আমার মনে। প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত বৈষম্য মাথায় নিয়ে কর্মজীবন পার করি সেখানে। ১৯৬৫ সালে পল্টনে ঢাকা অফিসে চলে আসি। ঢাকার কিছু মজার কথা মনে আছে। সিরাজ নামে আমার এক বন্ধু জিপিও-তে কাজ করত। তার হাত হয়ে ঢাকা থেকে চিঠি পশ্চিম পাকিস্তানে যেত। ঢাকায় আন্দোলন তীব্র হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাঞ্জাবি সেনাদের সংখ্যাও বাড়তে থাকল। সেনারা পশ্চিম পাকিস্তানে তাদের পরিবারের কাছে অনেক চিঠি পাঠাত। আমার বন্ধু সিরাজ দুষ্টুমি করে সেসব চিঠি এনে পড়ে শোনাত। অনেক চিঠিতে লেখা থাকত— আজব কোনো এক দেশে এলাম, এখানে শুধু পানি আর পানি। কখন কোথায় যে মরি তার ঠিক নেই। আরো অনেক মজার মজার বিষয় থাকত। কেউ পরিবার থেকে আগেই বিদায় নিয়ে নিত।

২৫ মার্চ রাতে

৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু ভাষণ দিলেন। হাজির হলাম সেদিনের রেসকোর্স ময়দানে। তারপর থেকেই যুদ্ধ যুদ্ধ ভাব শুরু হয়ে গেল। বুঝতে পারলাম মুক্তিযুদ্ধ অত্যাসন্ন। ২৫ মার্চ মুক্তিযুদ্ধের যাত্রাকে আরো সহজ করে দিল। আমরা তখন ফকিরাপুল মসজিদের পাশে এক বাসায় থাকতাম। সেই রাতে চারদিক থেকে গোলাগুলি আর আগুনের দাউ দাউ শব্দ ছাড়া আর কোনো কিছুই শুনতে পাইনি। কে কোথায়, কার কি অবস্থা কোনো কিছুই বুঝে উঠতে পারিনি। মাঝে মাঝে মানুষের কান্না আর চিৎকারের শব্দ শুনতে পেয়েছি। উত্তর-দক্ষিণ যে দিকে তাকাই সে দিকেই আগুনের ধোঁয়া চোখে পড়েছে। অত্যন্ত আতঙ্কের মধ্যে কোনোরকমে রাতটা কাটালাম। পরে কারফিউ শিথিল করা হলে বেরিয়ে পড়লাম গ্রামের বাড়ির উদ্দেশে। পথে লাশ, মানুষের আহাজারি হলো আমাদের সঙ্গী। ঢাকার ডেমরা, তারপর নবীনগর, কোম্পানিগঞ্জ হয়ে ১২ দিন হেঁটে চট্টগ্রামের সাতকানিয়ায় এক বন্ধুর বাড়িতে পৌঁছলাম। আমার সঙ্গে ছিল আরো চারজন। এর মধ্যে ছিলেন ভিক্টোরিয়া জুট মিল্স-এর ম্যানেজার মুমিনুল হক, মিরেশ্বরের আবু মুসা।

আমরা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের

বাড়িতে পৌঁছে দেখলাম, এখানেও যুদ্ধের আবহ তৈরি হয়ে গেছে। লোকজন প্রস্তুতি নিচ্ছে যুদ্ধের। আবার বিপক্ষ শক্তিও দাঁড়িয়ে গেছে। এলাকার ছেলেরা মুক্তিযুদ্ধের জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। আমার বাড়িতে এলো। আমি তাদের সাহস দিলাম। বললাম, আমরা

দিতে পারেনি। পত্রিকা পড়ে যখন পূর্ণ উপলব্ধি এলো তখন মুসলিম লীগ ত্যাগ করলাম। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে আমার বড় ভাই আব্দুল গাফফার খান মুক্তিযোদ্ধা পরিষদ গঠন করেন। তিনি হন এর সভাপতি। এক পর্যায়ে পাকবাহিনী তাকে হন্যে হয়ে খুঁজতে থাকে। শেষ পর্যন্ত আত্মগোপনে যান তিনি কিছু দিনের জন্য। ছোট ভাই হিসেবে আমি বাজার, রান্না করা খাবার ইত্যাদি নিয়ে যেতাম তার কাছে। মুক্তিযোদ্ধা যারা তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাইত তাদের যোগাযোগ করিয়ে দিতাম। একদিন একদল মুক্তিযোদ্ধা বাড়িতে এলো। ঘরে ছিল ৫ কেজি চাল। সব চাল চুলায় বসিয়ে দিলাম। তাদের প্রাণভরে খাওয়ালাম। তারপর চলে গেল তারা অপারেশনে। এ রকম আরো কয়েকদিন যারাই এসেছে মুক্তিযোদ্ধা হয়ে তাদেরই খাবার, থাকার ব্যবস্থা, চিকিৎসা দিয়েছি। ঘরে কেনো কিছু থাকবে কি-না থাকবে, পরিবারের অন্যরা কি খাবে বা না খাবে তার দিকে তাকাইনি। নিজেরা না খেয়ে তাদের খাইয়েছি।

দেশের জন্য এত ত্যাগ স্বীকার করে কি পেলেন তারপর? এ প্রশ্নের উত্তরে তিনিও বললেন, স্বাধীন হয়েছে ঠিকই, কিন্তু তার কোনো সুফল পাইনি। সুবিধাবাদীরা সবকিছু নিয়ে গেল। এই দুঃখ কোথায় রাখি? মাসের পর মাস কষ্ট করলাম আমরা। কিন্তু যেদিন দেশ স্বাধীন হলো তার পরের দিনই এর কৃতিত্ব নিয়ে গেল তারা। অথচ তারা ঘুরেফিরেই ৯ মাস কাটিয়েছে। সেই দুঃখেই আমি মুক্তিযুদ্ধের সার্টিফিকেট নেইনি। সার্টিফিকেট নিয়ে কি হবে বলেন? যার জন্য এত কিছু করলাম তাকেই যদি না পেলাম তবে এই সার্টিফিকেট দিয়ে কি লাভ? সার্টিফিকেটের কোনো মূল্য নেই আমার কাছে। বরং যদি কোনো কাজ করে দেখাতে পারেন তবেই তার প্রতিদান পাবেন আপনি।

৬৬ বছর বয়সি মৌলভী আব্দুস সোবহানের কথা শুনে বোঝাই যাচ্ছে তিনি অত্যন্ত বাস্তববাদী। মুক্তিযুদ্ধে যে বাস্তবতাকে দেখেছেন, মেম্বার, চেয়ারম্যান হয়ে যে বাস্তবতা উপলব্ধি করেছেন তাই হয়তো প্রকাশ করতে চেয়েছেন আলো-অন্ধকারের সুখকর বা নির্মম অভিজ্ঞতার আলোকে।

রাতের কালো ছায়া আরো গভীর হয়ে আসছে। আরো একজন আলেম মুক্তিযোদ্ধা আছেন মাহমুদুল হাসানের সন্ধানে। শেষ পর্যন্ত বিদায়টাকে বরণ করে নিয়ে চলে এলাম বাইরের নতুন অন্ধকারে। আঁধারেই খুঁজে নিতে হবে আলেম মুক্তিযোদ্ধার আরো অনেক হারিয়ে যাওয়া ইতিহাস।



মুক্তিযোদ্ধা মরহুম কাজী আবু ইউসুফের আত্মা বলছে—হতভাগা সন্তানেরা! মনে রেখো, এভাবে পূর্বপুরুষদের ভুলে যেতে নেই

বরুটান গ্রামেই রাত প্রায় ন'টা। এখান থেকে আসতে হবে দৌলতপুরে। সেখানে মরহুম কাজী সৈয়্যদ মাওলানা মোহাম্মদ আবু ইউসুফের সন্তানদের নাগাল পাওয়া যাবে। চার-পাঁচ মাইল দূরত্বের পথ পাড়ি দিতে হবে ওখানটায় পৌঁছতে। আবারো সেই একইভাবে আলো-আঁধারে মহাসড়কের পাশ ধরে হাঁটছি। একটু আলোর ছাপ এসে পড়ল আমাদের কপালে। হাত ওঠাতেই একটা জিপ এসে থামল সামনে। বেশ দ্রুতই পৌঁছে গেলাম দৌলতপুর বাজারে। বাজার থেকেও আরো মাইল খানিকের পথ। পায়ে হেঁটে যাওয়া ছাড়া এখানে অন্য কোনো উপায় নেই। গ্রামের রাস্তাটা নতুন করে তৈরি হচ্ছে। ইটের বড় বড় টুকরাগুলো জুতা ভেদ করে পায়ের তলা স্পর্শ করতে চাইছিল বারবার। হাসান ভাই, পথ কি আর শেষ হবে না... এ রকম আকুতি কয়েকবারই করলাম আমরা দু'জন। মাহমুদুল হাসান সামনে চলছেন তো চলছেনই। কোনো ক্লান্তি নেই, অবসাদও না। আমাদের জন্য এভাবে কষ্ট করে যাচ্ছেন তিনি। এতটা স্বার্থহীন, অর্থহীন ত্যাগ ক'জনেইবা করে এ যুগে? ফায়জুল তো তাকে বলেই ফেললেন, আপনি আমাদের জন্য এত কষ্ট করছেন ! খুব ছোট কিন্তু বড় অর্থময় একটা কথা দাঁড় করিয়ে দিলেন চট্টগ্রাম বন্দরে কায়িক শ্রম বিক্রি করে অর্থ উপার্জনকারী মাহমুদুল হাসান—আপনারা আমার বাবার কাজে এসেছেন। আপনাদের সাহায্য করা আমার বাবাকে খেদমত করার সমান। সত্যিই মুক্তিযোদ্ধা মাওলানা আব্দুস সোবহানের অসাধারণ এক ছেলে তিনি। এখনো বাবার প্রতি এতটা দায়বদ্ধতা আছে তার। এসব কথায় হাঁটার কষ্টটা তো দূর হলোই, বরং আরো শক্তি ফিরে পেলাম মনে। অবশেষে কাজী মোহাম্মদ আবু ইউসুফের ছেলের বাড়ি এসে পৌঁছলাম।

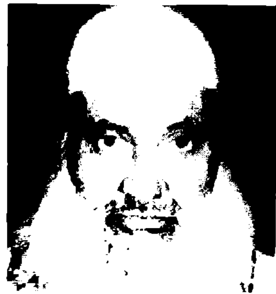
কাজী আবু ইউসুফের ছয় ছেলে। ২য় ছেলে কাজী মোহাম্মদ মাহমুদুল আলমের বাড়ি এটি। বেশ গোছানো, পরিপাটি বাড়ি করেছেন তিনি। কিছুদূরে তাদের পূর্বপুরুষের বাড়ি। নতুন করে বাড়ি করে এখন এখানেই থাকেন তিনি। অন্য ভাইয়েরা অন্যত্র থাকেন। বংশগত পেশা তাদের 'কাজী', তার বাবাও এ পেশায় ছিলেন মৃত্যু পর্যন্ত। মাহমুদুল হাসান পরিচয় করিয়ে দিলেন আমাদেরকে তার সঙ্গে। আসার উদ্দেশ্যটাও বললেন। আমরাও নিজেদের পরিচয় দিয়ে মূল আলোচনায় যেতে চাইলাম। ৪০

পেরিয়েছেন মাত্র মাহমুদুল আলম। বললেন, আমি তো ডায়বেটিক্স-এর রোগী। এত কিছু আমার মনে নেই। পরে আমাদের কাছ থেকে ডকুমেন্ট নিতে পারবেন। আমি বললাম, ছেলে হিসেবে বাবা সম্পর্কে যতটুকু জানেন তা নোট করলেই চলবে আমাদের। জবাব যেটা দিতে চাইলেন, তা হলো বাবা সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না তিনি। মনেও নেই তার। কিন্তু এটাকে আমার কাছে অজুহাত মনে হয়েছে মাত্র। কারণ ৮০, ৯০ বছর বয়সের লোকজন অকপটে আমাদের কাছে বলে গেছেন নিজেদের সম্পর্কে, নিজের পরিবারের মুক্তিযোদ্ধা সম্পর্কে। আর ৫০ না ছুঁতেই সব ভুলে গেলেন তিনি। এতটা অনীহা বাবার ক্ষেত্রে। কৌশলটা ইতিমধ্যে পরিবর্তন করে ফেললাম। আচ্ছা, আপনার বাবা লেখাপড়া করলেন কোথায়, পেশা কি ছিল এগুলো তো জানেন? বললেন, বাবা কোলকাতা আলিয়া মাদরাসা থেকে লেখাপড়া করে এসেছেন। ভালো ইংরেজি, ফার্সি, উর্দু, বাংলা বলতে পারতেন তিনি। মোগল আমল থেকে আমাদের পূর্বপুরুষরা কাজী ছিলেন। আমার বাবা প্রথমে চট্টগ্রাম এবং পরে বাংলাদেশের কাজী সমিতির সভাপতি ছিলেন দীর্ঘদিন। ভালো বক্তা ছিলেন। বঙ্গবন্ধু, জিয়া, এরশাদের সঙ্গে চট্টগ্রামে এক মঞ্চে বক্তৃতা করেছেন। ১৯৮০ সালে কামিল পাস করলে মুক্তিযুদ্ধের সময় নিশ্চয়ই সবকিছু বুঝতেন। তো সে সময়ে বাবাকে কাছ থেকে কি রকম দেখেছেন? বললেন, সে সময়ে তেমন কিছু বুঝি না। মুক্তিযুদ্ধের এক পর্যায়ে বাবার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে। তিন মাস পর তিনি সুস্থ হন। কেন মস্তিষ্ক বিকৃত হলো সে সম্পর্কে কিছু— এটা বিশ্বাস করি না, তারপরও শুনি, তাবিজ করে মস্তিষ্ক বিকৃতি করা হয়েছিল। তার আগে এমন কি করলেন যে এভাবে মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটল। আর যেন এগুতেই পারলেন না মাহমুদুল আলম। আর কিছুই কি জানা নেই তার। এদিকে মাহমুদুল হাসান বলতে থাকলেন, কাজী ইউসুফের কথা স্পষ্ট মনে আছে আমার। তুখোড় বক্তা ছিলেন তিনি। আমার বাবার সঙ্গে সঙ্গে থাকতেন। আমি নিজ চোখে দেখেছি, আমি নিজে শুনেছি কাজী সাহেবের বক্তৃতা। সে সময় আমার বাবা আর তিনি আওয়ামী লীগের মিটিং-এ যেতেন। বক্তৃতা করতেন। আমার বাবা আগে বক্তৃতা দিলে কাজী সাহেব পরে। কাজী সাহেব আগে বক্তৃতা দিলে আমার বাবা পরে বক্তৃতা দিতেন। ছোটবেলা বাবার সঙ্গে আওয়ামী লীগের যেসব মিটিং-এ যেতাম সেখানেই দেখতাম কাজী সাহেবকে। মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রথম দিকে সুস্থ ছিলেন কাজী সাহেব। আমি নিজেই দেখেছি বাবাকে ডেকে আনতেন আমাদের বাড়ি থেকে। একসঙ্গে বের হতেন। কোথাও মুক্তিযোদ্ধাদের খোঁজ পেলে সেখানে গিয়ে তাদের নিয়ে সমাবেশ করতেন, বক্তৃতা দিতেন। যতটুকু সম্ভব ছিল সাহায্য করতেন মুক্তিফৌজকে। এ সব কিছু আমার চোখের সামনে ঘটা। বাবা আর কাজী সাহেব একে-অন্যের বন্ধু ছিলেন। দু'বন্ধু মিলে দেশের হয়ে কাজ করেছেন। মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল এটাও শুনেছি আমি। কিন্তু কেন ঘটেছিল, আর তা ঠিক হলো কিভাবে সেটা আমার জানা নেই।

আপন ছেলে হয়ে জানেন না। অথচ বন্ধুর ছেলে কিভাবে বলে গেলেন কত কিছু। আমরা তো এটাই শোনার জন্য এসেছিলাম মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের মুখ থেকে। কিন্তু এমনটা হলো কেন ? বাবা এত বড় বক্তা ছিলেন, কাজী নেতা ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ শক্তি হয়ে কাজ করেছেন অথচ তার কিছুই বলতে পারল না ছেলে। মানুষ এভাবে শেকড় থেকে বিচ্যুত হয় কিভাবে। রাত অনেক হয়ে গেছে। দেরি না করে বিদায় নিয়ে চলে এলাম। বিদ্যুৎ চলে এসেছে ইতিমধ্যে। ফাঁকে ফাঁকে কিছুটা আলো দেখা যাচ্ছে। কিন্তু আমার মনটা একেবারে অন্ধকার হয়ে এলো। অন্ধকারে হাতড়ে ফিরছি একটাই প্রশ্ন— শেকড় থেকে ছিন্ন হলে মানুষ কি এভাবেই সব কিছু ভুলে যায়? নিজেকে, নিজের পূর্বপুরুষকেও চিনতে পারেনা ! আদর্শচ্যুতি এতটা দূরে ঠেলে দেয় মানুষকে!

চন্দ্রঘোনার মুক্তিযোদ্ধা মাওলানা দলিলুর রহমানকে কি এ প্রজন্ম ভুলেই যাবে!

মাওলানা আবু ইসহাকের শ্বশুর এবং আবুল কালামের নানা মাওলানা দলিলুর রহমান প্রখ্যাত আলেম ও মুক্তিযোদ্ধা। তিনি মারা গেছেন ১৯৯২-তে। তাঁর পরিবার থেকে বিস্তারিত জানার জন্য রাঙ্গামাটি থেকে যেতে হবে চন্দ্রঘোনায়। নাতি আবুল কালামের ঠিকানা অনুযায়ী খুব দ্রুত বাস ধরতে হবে বড়ইছড়ির। রাস্তায় বেরিয়ে সিএনজি ড্রাইভারের কাছ থেকে জানতে পারলাম, বড়ইছড়ির সর্বশেষ বাস হলো চারটায়। চারটা বাজতে আর বাকি পাঁচ মিনিটের সামান্য বেশি। অনুরোধ জানালাম, দ্রুত বাস স্টপিজে পৌঁছে দিতে। বাস স্টপিজে টিকিট কাটার সময়টা কেবল পাওয়া গেল। বাস ছেড়েছে বড়ইছড়ির উদ্দেশ্যে। দূরত্ব ৩৪ কিলোমিটার। কিন্তু সময় লাগবে দু'ঘণ্টা! কারণ একটাই। পুরো পথটা পাহাড়ি পথ। মূল সড়ক নয়। বরং রাঙ্গামাটি থেকে কাপ্তাই পৌঁছার আড়াআড়ি বাইপাস রাস্তা এটি। গভীর পাহাড়ি বন দিয়ে চলে যাওয়া এই সড়কে সন্ধ্যার পর কোনো বাস চলাচলের প্রশ্নই আসে না। দিনেও নির্দিষ্ট সময়ে হাতেগোনা কয়েকটি বাস চলাচল করে। বাসের অধিকাংশ যাত্রী উপজাতি। গোটা পথটাতেই বাঙালি চোখে পড়েনি, কেবল সীমান্ত প্রহরী বিডিআর ছাড়া। খাগড়া সীমান্ত ঘেঁষে গহিন পাহাড়ি উঁচু-নিচু, আঁকা-বাঁকা পথ বেয়ে ধীরগতিতে চলেছে বাস। কিছুটা ভীতি আর কিছুটা রোমাঞ্চ এই দুইয়ে ছেয়ে গেছে আমাদের মন। রোমাঞ্চকে আরেকটু জমিয়ে তুলতে ফায়জুলকে ব্যাগ থেকে কাঁচা বাদাম বের করতে বললাম। সেই হালিশহরে হাতিয়ার আলেম মুক্তিযোদ্ধা মাওলানা মোস্তাফিজুর রহমান এ বাদাম দিয়েছিলেন। বাদাম চিবুতে চিবুতে দেখলাম জুম চাষ, ঝরনা, উপজাতিদের জীবন প্রবাহ, বৈচিত্র্যময় সব ঘর-বাড়ি। বড়ইছড়ি চট্টগ্রাম-কাপ্তাই সড়কে যখন পৌঁছলাম তখন ঘড়ির কাঁটা বিকেল ছয়টা পেরিয়ে গেছে। কাপ্তাই সড়কের পাশের পাহাড় লেক একসঙ্গে মিশে আছে সৌন্দর্যের অপরূপ কীর্তি ধারণ করে। তারই মাঝে ঘনিয়ে আসছে গোধূলি লগ্ন। প্রকৃতি যখন ফিরছে আপন নীড়ে তখন আমরা অজানা অচেনা পথে এগুচ্ছি একই নেশায়—আলেম মুক্তিযোদ্ধার খোঁজে। আবারো বাসে করে কাপ্তাই থেকে চন্দ্রঘোনা গিয়ে সেখান



থেকে কর্ণফুলী নদী পার হয়ে যেতে হবে স্বরূপভাটা ইউনিয়নে। পূর্ব স্বরূপভাটায় শুয়ে আছেন মাওলানা দলিলুর রহমান। সূর্য ততক্ষণে নদীতে মিশে গেছে। নদী পার হয়ে রিকশা করে আমরা চলেছি স্বরূপভাটায়। ইট বিছানো রাস্তা একটু পরেই শেষ হয়ে গেল। কাদা মেশানো সন্ধ্যার কাদামাটির রাস্তা পেরিয়ে রিকশা এলো পূর্ব স্বরূপভাটায়। রিকশার চাকা থেমে গেছে। হেঁটেই বাকিটা পথ যেতে হবে। আলো-অন্ধকারে রিকশাওয়ালার পিছু পিছু হেঁটেই চললাম আলেম মুক্তিযোদ্ধার ছেলে ফরিদ আহমেদ চৌধুরীর বাড়ি।

ফরিদ আহমেদ চৌধুরী বাড়িতে ছিলেন না। পাওয়া গেল মুক্তিযোদ্ধার নাতিকে। এখানেও একই সমস্যা। পরবর্তী প্রজন্ম খুব একটা জানেন না তাদের পূর্বপুরুষ সম্পর্কে। বাড়ির মালিক ফরিদ আহমেদ চৌধুরী ফিরলেন। রাত আটটায় প্রত্যন্ত এক গ্রামে এভাবে বাড়িতে অপরিচিত লোক দেখে কিছুটা বিচলিত হয়েছিলেন বৈকি? বিচলিত ফরিদ আহমেদ চৌধুরীকে দেখে মনে হলো আমাদের মুখ থেকে এই প্রথম শুনলেন তার বাবা মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। বুঝতে আর বাকি রইল না, এ পরিবারেও তাদের পূর্বপুরুষ হারিয়ে যাচ্ছেন ধীরে ধীরে। মাওলানা দলিলুর রহমান দেওবন্দের বড় আলেম ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় আওয়ামী লীগের বড় নেতা ছিলেন। স্বাধীনতার পর তিনিই প্রথম আওয়ামী লীগের হয়ে জনসভা করেছিলেন। এসব প্রাথমিক তথ্য যা নাতি আবুল কালামের কাছ থেকে শুনেছিলাম তা বলতে লাগলাম। তখনই ছেলে ফরিদ আহমেদ চৌধুরী বাবার স্মৃতি ধীরে ধীরে ফিরে পেতে লাগলেন। বললেন, তার বাবা দেওবন্দের মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানীর ছাত্র এবং মুরিদ ছিলেন। সে মাদ্রাসায়ই লেখাপড়া শেষ করেছেন। লেখাপড়া শেষ করার পরও ১৫ বার দেওবন্দ মাদ্রাসায় গেছেন। সেখানে থাকতেই রাজনৈতিক মনমানসিকতা গড়ে ওঠে। কংগ্রেসের সমর্থক ছিলেন তিনি। দেশে প্রথমে নেজামে ইসলাম পার্টি করতেন। তারপর আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, ৬ দফা আন্দোলন বেগবান হলে আওয়ামী রাজনীতিতে যোগ দেন। সভা-সমাবেশ করে ৬ দফার পক্ষে আন্দোলন গড়ে তুলেন। ইসাখালীতে বঙ্গবন্ধু এলে তিনি জায়নামাজ উপহার দেন বঙ্গবন্ধুকে।

'৭১-এর মার্চে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে মাওলানা দলিলুর রহমান আত্মগোপনে যেতে বাধ্য হন। এ সময় আমার খালা গোলাগুলির সামনে পড়ে তা দেখেই হার্টফেল করে মারা যান। অনেক ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তাঁর জানাজায় শরিক হতে পারেননি বাবা। শেষ পর্যন্ত বাবা দীর্ঘদিন আত্মগোপন করে থাকেন। দক্ষিণ রাঙ্গুনিয়ায় আত্মগোপন করতেন বলে জানালেন ছেলে ফরিদ আহমেদ চৌধুরী। সেপ্টেম্বরে রাঙ্গুনিয়া আজাদ হতে থাকলে প্রকাশ্যে আসতে শুরু করেন মাওলানা দলিলুর রহমান। স্বরূপভাটা, চন্দ্রঘোনা হয়েই মুক্তিযোদ্ধারা ভারত গিয়ে প্রশিক্ষণ নিত। প্রশিক্ষণ নিয়ে যারা বাংলাদেশে প্রবেশ করত তাদের অন্যতম আশ্রয় হয়ে উঠেছিল মাওলানা দলিলুর রহমানের বাড়ি। রসদ সরবরাহ থেকে শুরু করে থাকা-খাওয়ার আঞ্জাম দিয়েছেন তিনি। মিটিং-মিছিল করে যুদ্ধ ময়দান, রাজনৈতিক ময়দান সরগরম রাখতেন তুখোড় বক্তা মাওলানা দলিলুর রহমান।

দেশ স্বাধীন হলে রাঙ্গুনিয়া আওয়ামী লীগের সভাপতি হিসেবে তিনি বিজয় মিছিল ও সমাবেশ করে রাঙ্গুনিয়ায় লাল-সবুজের পতাকাকে সমুন্নত করেন।

ছেলে ফরিদ আহমেদ চৌধুরী তার বাবা সম্পর্কে আরো বলেন, তিনি আগে থেকেই রাজনৈতিক সচেতন এবং জ্ঞানপিপাসু ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ, নজরুলের বই থেকে শুরু করে পত্র-পত্রিকা সবই পড়তেন তিনি। এলাকার লোকজন শহরে গেলে তাঁর জন্য পত্রিকা নিয়ে আসতেন। ভারতে দেওবন্দ থাকাকালে জওহরলাল নেহেরু, সুভাষ বসুর সঙ্গে আলাপ করার সৌভাগ্য হয়েছে বাবার।

তৃতীয় প্রজন্ম পূর্বপ্রজন্মকে একেবারে ভুলে গেছে বলা বোধ হয় এ পর্যায়ে এসে অন্যায় হবে। আলোচনার শেষ পর্যায়ে মাওলানা দলিলুর রহমানের নাতি ফ্রেমে বাঁধা একটা ছবি নিয়ে এলেন। বললেন, পাসপোর্টের জন্য তোলা দাদার ছবিটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল, বাঁধাই করে রেখে দিয়েছি। অনুরোধের পর ছবিটা নিয়ে আসারও অনুমোদন পেয়ে গেলাম। রাত ন'টায় অজপাড়া এ গ্রাম ছেড়ে ফিরে এলাম নতুন আরেক ঠিকানায় নতুন করে আলেম মুক্তিযোদ্ধার খোঁজে।



রানীরহাটের মুক্তিযোদ্ধা মাওলানা মতিউর রসূল অর্থের অভাবে চিকিৎসা নিতে পারছেন না। স্ত্রীর করুণ আকুতি— আপনারা তাঁর চিকিৎসার জন্য কিছু টাকা-পয়সা দিয়ে যান!

রাতটা একেবারে মন্দ কাটল না চন্দ্রঘোনায়। সারাদিনের সব ক্লান্তি আর অসারতা ঝেড়ে ফেলে এলাম স্থানীয় হোটেলটাতে। সকালে আবার নতুন এ্যাসাইনমেন্ট। আবুল কালামের দেওয়া তথ্যমতে রানীরহাটে তাঁর গ্রামে আরো একজন আলেম মুক্তিযোদ্ধা রয়েছেন। চন্দ্রঘোনা থেকে রানীরহাট। আবারো বাইপাস পথ ধরে যেতে হবে। জিপে করে ধামইরহাট, সেখান থেকে রিকশায় রানীরহাট। ধামইরহাট সড়কের দিকে তাকানোর পরে মনে হচ্ছিল সে আমাদের বলছে, ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি! যুদ্ধবিধ্বস্ত বা ভুতুড়ে নগরীর রাস্তার নমুনা পাওয়া যাবে এখানটায় এলে। জিপের মানুষগুলো ডান-বাম করে শুধু দুলছিল। কোনো আসামিকে শাস্তি দেয়ার জন্য এই পথে জিপে চড়িয়ে দেয়াই যথেষ্ট। পিচঢালা নষ্ট হয়ে গেছে অনেক আগেই। নিচের ইটগুলো উঁচিয়ে-নিচিয়ে, বাঁকিয়ে-দাঁড়িয়ে আছে কোনোরকমে। শক্ত জিপগুলোও নড়বড় হয়ে গেছে এই পথে চলতে গিয়ে। আশ্চর্য হতে হয় এই দেখে যে, এখানকার মানুষগুলো এভাবে থেঁতিয়ে চলতে চলতেই অভ্যস্ত হয়ে গেছে। অভ্যস্ত হতে বাধ্য হয়েছে, চেহারার জিম্মিভাব দেখে তাই মনে হয়েছে। এক ঘণ্টার মাত্র জার্নি। তাতেও সারাদিনের সঞ্চিত শক্তি প্রায় নিঃশেষ। দেহে নতুন প্রাণ এলো যখন জিপের হেলপারের মুখ থেকে আওয়াজ এলো ধামইরহাট, ধামইরহাট...। ধামইরহাট বাজার থেকেও আরো দেড় মাইল দূরে রানীরহাট। রিকশা নিতে হলো, যদিও স্বাভাবিকের চেয়ে ভাড়া দ্বিগুণ। অবশ্য এটা আমাদের খুব সহজেই স্বীকার করতে হবে যে, পার্বত্য অঞ্চল ও রাঙ্গুনিয়া, কাপ্তাই এসে সব যানবাহনেই বেশি বেশি ভাড়া গুনতে হয়েছে। ভাড়া যাই হোক, ক্লান্ত দেহে গ্রাম্য খোলা বাতাসে স্বস্তির আবহ আসবে এমনটাই আশা ছিল। কিন্তু একটু সামনে যেতেই আবারো বিবর্ণ রাস্তার ভয়ঙ্কর অবস্থা। রিকশাওয়ালা বললেন, আপাতত নামুন, সামনে হয়তো ভালো রাস্তা আছে। রিকশা চলছে সামনে, পিছু পিছু হাঁটছি আমরা। রৌদ্রের তেজ বাড়তে শুরু করেছে। হাতে করে বয়ে নেয়া পানির বোতলটা



বারবার হাত বদলাচ্ছে আমার আর ফায়জুলের। বোতল বদলানোর মাঝেই ফায়জুল বলে উঠলেন, সামনে আরো কঠিন রাস্তা অপেক্ষা করছে, ওই দেখুন তাকিয়ে। সত্যিই, শুকনো কাদায় পুরো রাস্তারই বেহাল দশা। রিকশাটাই যেন এখন বোঝা। রিকশাওয়ালা নিজেও এখন এটাকে টানতে পারছেন না তা তার চোখ-মুখ দেখেই পরিষ্কার। দু'জন দু'পাশ থেকে রিকশার পেছনের হুড ধরলাম। মন থেকে প্রশ্নটা বেরিয়েই গেল—এলাকায় কি কোনো এমপি-টেমপি নেই? রিকশাওয়ালা উত্তর দিলেন, এখানকার এমপি সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরী। তার এলাকার রাস্তার এ অবস্থা কেন? আবারো রিকশাওয়ালার সহজ উত্তর, জোর করে পাস করে আর কোনোদিন এলাকায় আসেন না, ঢাকায় শুধু চাপাবাজি করেন। রাস্তা-ঘাটের করুণ অবস্থা, মানুষের জীবনযাত্রার নিম্নমান রিকশাওয়ালার বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণে যথেষ্ট ছিল।

শেষ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছলাম যথাযথ গন্তব্যে। মাওলানা মতিউর রসূল থাকেন মাটি দিয়ে তৈরি একটা ঘরে। বয়স এখন ৮০ ছাড়িয়ে গেছে। ঠিকমতো স্পষ্ট করে কথা বলার শক্তি হারিয়ে ফেলেছেন ইতিমধ্যে। স্মৃতিশক্তিও কি হারাতে বসেছেন? তা জানা গেল একটু পরেই। প্রথমে বুঝে উঠতে পারেননি, আমরা কারা, কেন এসেছি। আমাদের প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে যেতে বললেন, 'আঁর ডর লাগের, আই জানি নো।' পরে যখন একই গ্রামের মাওলানা আবু ইসহাকের কথা বললাম তখন তিনি অভয় পেলেন। বললেন, মাওলানা ইসহাক ছিলেন আমার উস্তাদ। তার কাছ থেকেই আলিফ-বা থেকে শুরু করে দাওরা হাদিস পর্যন্ত শিখেছি। ফায়জুল জিজ্ঞেস করল, '৭১-এর কথা কি আপনার মনে পড়ে? তখন কোথায় ছিলেন, কি করলেন? এ সব কিছুই আমরা জানতে এসেছি। আচ্ছা—একাত্তর, এখন তো অনেক বয়স হয়েছে। সে সময়ের অনেক কথা মনে নেই। তখন আমার বয়স ছিল পঞ্চাশ। আমি তখন রুকুনুল ইসলাম মাদরাসায় শিক্ষকতা করতাম। মাওলানা ইসহাকের সঙ্গে আমিও আত্মগোপনে গিয়েছিলাম। মাঝে মাঝে আসতাম। আবার যখনই খবর পেতাম মিলিটারি আসছে, তখনই আত্মগোপনে চলে যেতাম। তিন বার আমার বাড়িতে রেইড দিয়েছিল আমাকে ধরার জন্য। আল্লাহর রহমতে তিন বারই বেঁচে গিয়েছি। প্রশ্ন করলাম, আত্মগোপনে যেতে হলো কেন আপনাদের? উত্তরে বললেন, আমরা তখন আওয়ামী লীগ করতাম। আর যারাই আওয়ামী লীগ করত, তাদেরকেই দুষ্কৃতকারী বলেছিল পাকহানাদাররা। আমাদের পেলে সঙ্গে সঙ্গে মেরে ফেলবে। এজন্য আত্মগোপন ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। কোথায় আত্মগোপন করলেন, তারপর কি হলো? এ প্রশ্নের উত্তরে বলেন, পালিয়ে দূরে দূরে চলে যেতাম। গভীর পাহাড়ে চলে যেতাম। বরুয়াপারা পাহাড়ি এলাকায় গিয়েছিলাম। ওখানে বুদ্ধিশ্‌রা আমাদের আশ্রয় দিয়েছিল। বুদ্ধ সাধকরা খাওয়া-দাওয়া, থাকার ব্যবস্থা, ইবাদতের জায়গা সবই দিয়েছিল আমাদের। আমরা ইসলামের আলেম আর তারা বৌদ্ধ ধর্মের আলেম। দু'পক্ষই একে-অন্যের আপন হয়েছিলাম সেই বিপদে।

পরবর্তীতে আর কি কি ঘটল তেমন কিছুই মনে করতে পারলেন না বয়সের ভারে নুয়ে পড়া মাওলানা মতিউর রসূল। তবে যতটা বুঝা গেল তাতে মনে হয়েছে তিনি তাঁরই

গ্রামের মাওলানা আবু ইসহাকের সঙ্গেই ছিলেন গুরু-শিষ্যের মতো। ওস্তাদের কথামত কাজ করেছেন স্বাধীনতার পক্ষ হয়ে। ওস্তাদের সঙ্গে মাদরাসায় মাদরাসায় গিয়ে ছাত্র-শিক্ষকদের বুঝাতে চেষ্টা করেছেন, পাকিস্তানিরা ইসলামের নামে যা করছে তা অন্যায়। মজলুম হয়ে বসে থাকা ইসলামের নীতি নয়।

তিন ছেলে তিন মেয়ে নিয়ে অতি সাধারণ এক সংসার মাওলানা মতিউর রসূলের। চর-চাক্তাই চট্টগ্রাম মুজাহিরুল উলুম মাদরাসা থেকে দাওরা হাদিস সম্পন্ন করেন। তারপর রুকুনুল ইসলাম মাদরাসা এবং ফুলবাগিচা মাদরাসায় দীর্ঘদিন শিক্ষকতা করেছেন। হাতে তসবি নিয়ে বসে থাকা ছাড়া অসুস্থ এ মুক্তিযোদ্ধা অন্য কিছু করার ক্ষমতা হারিয়েছেন। শেষ সময়ে বললাম, আমরা আপনার একটা ছবি তুলে নিব, পাঞ্জাবিটা পরে দাঁড়ান। তখনই তাঁর স্ত্রী তাকে ডেকে বললেন, ছবি তুলবেন কেন? এরা কারা? কেন এসেছে? মাওলানা মতিউর রসূল বোঝাতে চেষ্টা করলেন, এরা ঢাকা থেকে এসেছে, মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে জানতে। স্ত্রী তখন বললেন, ছবি তুললে টাকা দেবে নাকি? স্ত্রী আমাদের শুনিয়ে বললেন, তাদেরকে টাকা দিয়ে যেতে বলেন। মুচকি হেসে মতিউর রসূল বললেন, না, তারা টাকা-পয়সা দেয়া-নেয়ার জন্য আসেনি। ছবি তোলার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন মাওলানা রসূল। তখন তাঁর স্ত্রী আমাদের বললেন, আপনারা উনার চিকিৎসার জন্যই টাকা-পয়সা দিয়ে যান!

আমি ভাষা হারিয়ে ফেলেছি। ক্যামেরায়ও আমার আঙুলের চাপ পড়ছিল না। একটা মুক্তিযোদ্ধা পরিবার কতটা অসহায় হলে এভাবে আকুতি-মিনতি করতে পারে? এই করুণ অসহায়ত্বের সঙ্গে বসবাসের জন্যই কি তারা মুক্তিযুদ্ধ করেছিল?



চট্রলার সাহসী বীর গেরিলা কমান্ডার মৌলভী সৈয়দ

চট্টগ্রাম-বাঁশখালী থানার মৌলভী সৈয়দের তথ্য সংগ্রহ খুব জরুরি হয়ে দেখা দিয়েছিল। চট্টগ্রাম সফরের প্রথম অ্যাসাইনমেন্ট হালিশহরের মুক্তিযোদ্ধা মাওলানা মোস্তাফিজুর রহমান জানিয়েছিলেন তাঁর কথা। মৌলভী সৈয়দ মাওলানা মোস্তাফিজদের গেরিলা ট্রেনিং দিয়েছেন। তার নেতৃত্বে দুঃসাহসিক কিছু অপারেশনের কথাও শুনিয়েছিলেন। তখন থেকেই মনটা পড়ে আছে মৌলভী সৈয়দের কাছে। এ পর্যন্ত বহু আলেম মুক্তিযোদ্ধার সন্ধান পেলেও এ প্রথম একজন কমান্ডারের নাম শুনলাম। তাও আবার গেরিলা কমান্ডার- ডেঞ্জারাস। তবে মাওলানা মোস্তাফিজ তাঁর নাম ছাড়া আর কিছুই বলতে পারলেন না। তাই সেবার একটা শূন্যতা নিয়েই ফিরেছিলাম চট্টগ্রাম থেকে। ঢাকা এসে 'আলেম মুক্তিযোদ্ধার খোঁজে' বিজ্ঞাপন দিলাম দৈনিকগুলোতে। 'আমার দেশ'-এর বিজ্ঞাপন পড়ে বাঁশখালি থেকে ফোন দিলেন মাস্টার আঃ রশিদ। জানালেন, তাঁর এলাকায় একজন আলেম মুক্তিযোদ্ধা আছেন। কে তিনি? পরক্ষণেই তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে এলো সেই কাঙ্ক্ষিত নামটি- মৌলভী সৈয়দ! মারা গেছেন অনেক আগেই। বাঁশখালীতে এক নামে সবাই তাঁকে চেনে।

বান্দরবান ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্রের তরুণ শিক্ষক, এ প্রজন্মের ছড়াকার মাসউদুল কাদিরকে আগেই জানিয়েছিলাম এবারের চট্টগ্রাম সফর করব তাকে নিয়ে। পটিয়া মাদরাসা এবং এর আশেপাশে বেশ ক'জন আলেম মুক্তিযোদ্ধার খোঁজ পাওয়া গেছে। তার পরিচিত এলাকা বলে এ অ্যাসাইনমেন্টগুলো তাকে নিয়েই সারতে চাই। স্বতঃস্ফূর্ত সম্মতি পেতে আর দেরি হয়নি তার কাছ থেকে। তাই ঢাকা থেকে সরাসরি চলে গেলাম বান্দরবান।

বাঁশখালী যাবার পথ দুটি। চট্টগ্রাম শহর থেকে বাঁশখালী গেলে রাস্তা ভালো। তবে বান্দরবান চিম্বুকের ঘ্রাণ পেয়ে ইকো পার্কের সংস্পর্শ পেতে বাঁশখালীর যে রাস্তা তা দিয়ে গেলে নজরুলের ঠিক কাণ্ডারী কবিতার কথা মনে পড়ে।

"দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশিতে যাত্রীরা হুঁশিয়ার।"

মাসউদুল কাদির ও তার বন্ধু মুর্শিদুল কবির সময় স্বল্পতার জন্যে ওই রাস্তাটি বেছে নিলেন। বান্দরবান এর আগে একবার এসেছিলাম। তাই এখানকার পাহাড়ি জিপ গাড়িগুলোর সঙ্গে আগে থেকে পরিচিত হলেও চড়লাম এবারই প্রথম। বাদুড়ের মতো লটকে থাকা মানুষগুলো চেঁচামেচি করছে। ড্রাইভারকে গালাগাল, হৈ হুল্লুড়ে মাথা ধরে আসছিল। একজন বলছিল কালও সূর্য না ডুবতেই ডাকাতি হয়েছে। আজও ড্রাইভার

ডাকাতের হাতে তুলে দেবে আমাদের। আমি অবশ্য একটু ভয়ই পাচ্ছিলাম। আমার বহু পুরনো মোবাইলটা বুঝি এবারই গচ্ছা যাবে। যাক গাড়ি থেকে নেমে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম।

বাঁশখালী পৌঁছতেই রাত হয়ে গেল। রাতেই মৌলভী সৈয়দের পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা খুঁজে বের করলাম। একজন ভদ্রলোকের মুখোমুখি হলাম। মৌলভী সৈয়দের নাম বলতেই লোকটি একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকা শেখেরখিল ইসলামিয়া দাখিল মাদরাসায় অধ্যক্ষ মাওলানা মাহবুবুল আলমকে দেখিয়ে দিলেন। বয়োবৃদ্ধ মাহবুবুল আলম খুব খুশি মনে আমাদের নিয়ে চললেন মৌলভী সৈয়দের বড় ভাই মুক্তিযোদ্ধা ডা. আলী আশরাফের বাড়িতে। যেখানে মুক্তিযোদ্ধা মৌলভী সৈয়দ আহমদ হেসে খেলে বড় হয়েছেন।

এক নজরে মৌলভী সৈয়দ

না : মৌলভী সৈয়দ আহমদ

পিতা : একরাম শিকদার

মাতা : উমদা খাতুন

জন্ম : ১৩ মার্চ ১৯৪২

প্রাথমিক শিক্ষা : নাপোড়া শেখেরখিল প্রাথমিক বিদ্যালয় (২য় শ্রেণী পর্যন্ত)। দাখিল, ফাজিল : পুঁইছড়ি ইসলামিয়া সিনিয়র মাদরাসা। তারপর আবার মৌলভী সৈয়দ স্কুলে ভর্তি হন। পুঁইছড়ি জুনিয়র সেকেন্ডারি হাই স্কুলে ৮ম শ্রেণী পাস করে এসএসসি পাস করেন চট্টগ্রাম মুসলিম হাই স্কুল থেকে। এইচএসসি ও ডিগ্রি : চট্টগ্রাম সিটি কলেজ (১৯৬৮ সালে বন্দি অবস্থায় ডিগ্রি পাস করেন)।

সভাপতি : চট্টগ্রাম ছাত্রলীগ (মহানগর)

ভাই : ডাক্তার আলী আশরাফ (মুক্তিযোদ্ধা)

প্রতিষ্ঠাতা (১৯৭২-এ) : চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী যুব লীগ।



মৌলভী সৈয়দের বড় ভাই মুক্তিযোদ্ধা ডা. আলী আশরাফ নাতিকে নিয়ে তাঁর বাসার সামনে

যুগ্ম সম্পাদক : চট্টগ্রাম জেলা বাকশাল (১৯৭৪)

মৃত্যু : ১১ আগস্ট ১৯৭৭।

মৌলভী সৈয়দের ভাই মুক্তিযোদ্ধা ডা. আলী আশরাফের সঙ্গে কথোপকথন।

– আসসালামু আলাইকুম,

: ওয়ালাইকুমুস সালাম।

– যুদ্ধে আপনি কোথায় ছিলেন আর আপনার ভাই কোথায় ছিল?

: আমরা দু' ভাই একসঙ্গে যুদ্ধ করেছি। মৌলভী সৈয়দ একজন উঁচু মাপের কমান্ডার ছিলেন। তার সঙ্গে বিশ্বস্ত সঙ্গীর খুব প্রয়োজন ছিল। তাই আমাকে ভাইয়ার খুব প্রয়োজন ছিল। আমি মৌলভী সৈয়দকে ছেড়ে এক মুহূর্তও নড়িনি।

– মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে সবাই ইন্ডিয়া গেল, মৌলভী সৈয়দ গেলেন না কেন?

: দেখুন, নারী-পুরুষের আর্তচিৎকার শুনে তার পক্ষে ইন্ডিয়া যাবার সুযোগ ছিল না। বরং এখানেই তিনি প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র সংগ্রহ করে পুরো চট্টগ্রামকে সরব রাখেন। সেরা সেরা অপারেশন চালু রেখে মুক্তিকামীদের চাটগাঁয় ঢোকার সুযোগ করে দেন।

– আপনার বাড়ির এ অবস্থা কেন? এমন দু'জন জাতীয় বীরের বাড়ির অবস্থা এর চেয়ে ভালো হওয়ার কথা ছিল।

: দেখুন আমরা শোষণ শিখিনি। শিখিনি ছিনতাই, ডাকাতি। সত্যিকার মানুষের কাতারে থাকার জন্য সারা জীবন চেষ্টা করেছি। তবে ভাতা ৫০০/= টাকা ছাড়া তেমন কোনো অবদান অবশ্য পাইনি। অবৈধ পথও অবলম্বন করিনি। দোয়া করবেন বাকি জীবনটা যেন এভাবে স্বচ্ছ থেকে কবরে যেতে পারি।

পুঁইছড়ি মাদরাসায়

১৯১১ সালে প্রতিষ্ঠিত মাদরাসাটি এখনো সেকেলে বারান্দাতেই পড়ে আছে। প্রায় শত বছরের পুরনো এ প্রতিষ্ঠানে উলা (উচ্চ মাধ্যমিক) পর্যন্ত পড়েছেন মৌলভী সৈয়দ আহমদ। আমরা ওই মাদরাসাটিও দেখতে গেলাম। কথা বললাম মাদরাসার অধ্যক্ষের সঙ্গে। তিনি মৌলভী সৈয়দ-এর কথা তুলে ধরলেন। এ প্রতিষ্ঠানটি বড় মনীষীদের পদচারণায় পরিচিত স্থান।

পুঁইছড়ি মাদরাসা দেশের বহু বিখ্যাত ব্যক্তি উপহার দিয়েছে। তবে দুঃখ লাগল শত বছর হয়ে গেল প্রতিষ্ঠানটির অথচ এখনো রাস্তাঘাটের দিক থেকে সেই আগের জায়গায়ই রয়ে গেছে। একটি মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ সেতুর ওপর দিয়ে ছেলে-মেয়েদের যাতায়াত করতে হয়। এলাকার কৃতী সন্তানেরা কোথায়?

মৌলভী সৈয়দের কবরের পাশে

মুক্তিযোদ্ধা ডা. আলী আশরাফ এবং তার নাতি সয়ীদুল আমীন জেসী আমাদেরকে নিয়ে গেলেন মৌলভী সৈয়দের কবরের পাশে। আমরা তার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া

করলাম। মসজিদের পাশে এ কবরস্থান দেখার জন্য দেশের বিখ্যাত বিখ্যাত ব্যক্তিরাও গিয়েছেন।

বাড়ির পাশ দিয়ে চলে যাওয়া রাস্তাটি তার নামে নামকরণ করা হয়েছে। লাল জীবনের সড়কও মৌলভী সৈয়দ সড়কে পরিণত হয়েছে। তাছাড়া তৈলার দ্বীপ সেতুর নামও মৌলভী সৈয়দের নামে নামকরণ করা হয়েছে।

মৌলভী সৈয়দ স্মরণে 'রক্ত ঋণ'

প্রতি বছরই মৌলভী সৈয়দকে নিয়ে আলোচনা সভা, মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সামনে তাকে তুলে ধরার জন্য প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে 'শহীদ মৌলভী সৈয়দ স্মৃতি সংসদ'। বর্তমানে এ সংগঠনের সভাপতি জনাব খোরশেদ আলম। সাধারণ সম্পাদক আতাউল করিম আতিক। এ সংগঠন মৌলভী সৈয়দের জীবন আদর্শ তুলে ধরার চেষ্টা করে যাচ্ছে। তারাই 'রক্ত ঋণ' নামে একটি স্মারক প্রকাশ করেছে।

সহপাঠী, সহকর্মী ও জাতীয় নেতাদের চোখে মৌলভী সৈয়দ

আবু সাঈদ সরদার
সহযোগী মুক্তিযোদ্ধা

সময়ের সাহসী সৈনিক বীর মুক্তিযোদ্ধা মৌলভী সৈয়দ আহমদ '৭১-এর স্বাধীনতা যুদ্ধে চট্টগ্রাম শহর রণাঙ্গনে মুক্তিযুদ্ধের এক নির্ভীক দক্ষ সংগঠক ছিলেন। মার্চের শেষে ও এপ্রিলের প্রথম দিকে বর্বর পাক-দখলদার সৈনিকরা যখন নির্বিচারে চট্টগ্রাম শহরের বাঙালি ছাত্র, যুবক, শ্রমিক নিরীহ জনতাকে হত্যাযজ্ঞে মত্ত, তখন এই বিপ্লবী চট্টগ্রামের হাজার হাজার ছাত্র-যুবকের মতো মৌলভী সৈয়দও স্বাধীনতার প্রত্যয়দীপ্ত মন নিয়ে বিদ্রোহ করেছিলেন পশ্চিমা শাসক-শোষকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে।

৭ মার্চের জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণের মধ্যে স্বাধীনতা ঘোষণার ইঙ্গিত নিয়েই এ তরুণ রাজনৈতিক নেতা তখন থেকেই প্রথমে তাঁর পাহাড়তলীস্থ ঢাকা ট্রাঙ্ক রোডের পাশে অবস্থিত 'সাইকেল পার্টস'-এর দোকানটিতে গড়ে তুলেছিলেন স্বাধীনতাকামী কিছু সশস্ত্র যুবকদের নিয়ে একটি গোপন স্কোয়াড।

২৮ মার্চের পর চট্টগ্রাম সেনানিবাস থেকে বেরিয়ে পড়া পাঞ্জাবি সৈনিকদের বেপরোয়া অত্যাচারে চট্টগ্রাম শহরের জনজীবন যখন আতঙ্কিত ও স্তব্ধপ্রায়, নিষ্প্রাণ রাস্তায় রাস্তায় শত শত অসহায় বাঙালির লাশ আর স্থানীয় অবাঙালিদের (বিহারি) উল্লাস, পাঞ্জাবি দখলদার বাহিনীর সৈনিকদের ভাড়ি সাজোয়া বাহিনী আর ট্যাঙ্কের গোলাগুলির ছোটাছুটি এবং হাজার হাজার তরুণ ছাত্র-যুবক-এর চট্টগ্রামের বিভিন্ন বর্ডার দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের ট্রেনিং নিতে ভারতের উদ্দেশ্য গমন, তখন এ তরুণ ছাত্র নেতাটি জীবনের মারাত্মক ঝুঁকি নিয়ে স্থানীয় যুবকদের সংগঠিত করে স্থানীয়ভাবে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করে (তার মধ্যে বেশিরভাগই ছিল নিয়মিত বাহিনীর ফেলে যাওয়া অস্ত্রশস্ত্র) চট্টগ্রাম শহরের আগ্রাবাদ এলাকায় আধা শহর, আধা গ্রামীণ পরিবেশে পানওয়ালাপাড়া গ্রামের সবুজবাসে গড়ে তুলেছিলেন মুক্তিযুদ্ধের এক দুর্ভেদ্য ঘাঁটি।

নিজের কর্মনিষ্ঠা, সুদক্ষ সাংগঠনিক তৎপরতা, বিশ্বস্ততা আর প্রবল মনোবলের কারণে মৌলভী সৈয়দ আহমদ শত্রু পরিবেষ্টিত চট্টগ্রাম শহরেই স্থানীয় শ' শ' মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে গড়ে তুলেছিলেন সুসংগঠিত মুক্তিযোদ্ধাদের এক বিশাল বেইজ।

আমি মৌলভী সৈয়দের মুক্তিযুদ্ধকালীন সার্বক্ষণিক সঙ্গী হিসেবে একথা বিশ্বাস করি, সেদিন মৌলভী সৈয়দ শহরের কেন্দ্রস্থলে স্থানীয় উদ্যোগে মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে যে মুক্তিযুদ্ধের সাংগঠনিক ভিত গড়ে তুলেছিলেন তা গড়তে দেরি হলে ভারত থেকে ট্রেনিং প্রাপ্ত আগত মুক্তিযোদ্ধারা চট্টগ্রাম শহরে প্রবেশের পর অনেকেই প্রাথমিক শেল্টারটুকু (আশ্রয়স্থল) পেতেও যথেষ্ট বেগ পেতেন বা নির্ভরযোগ্য তথ্য ও সমন্বয়-এর অভাবে তাদের গেরিলা কার্যক্রম অনেক পিছিয়ে যেত।

আজ মৌলভী সৈয়দ আহমদ নেই। তার কথা লিখতে গেলে যে কথাটা অবশ্যই লিখতে হয়– ফাঁকি দিয়ে নির্বাচিত নেতা হওয়া কিছুই কঠিন না, বিরাট পলিটিক্যাল নেতা হওয়া আরো সহজ, দু'চারটে স্টান্টে অনেককে অনেক দূরে ঠেলে দিতে পারে। কিন্তু ফাঁকি দিয়ে বীর মুক্তিযোদ্ধা মৌলভী সৈয়দ হওয়া যায় না। মৌলভী সৈয়দ হতে হলে সাহস ও বিশ্বাসের যুক্তি নিয়ে এগুতে হয়। মৌলভী সৈয়দকে হিংসা করা সহজ কিন্তু সে যা করে গেছে তা করা সহজ নয়।

চট্টগ্রাম শহর রণাঙ্গনে মুক্তিযুদ্ধের সুসংগঠিত প্রথম তৎপরতা : ২৮ মার্চ পর্যন্ত, ইপিআর-এর মেজর রফিক পরবর্তীকালে ১ নং সেক্টরের কমান্ডার হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছিলেন ও মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে অবিস্মরণীয় অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বীর উত্তম খেতাব-প্রাপ্ত হন। ৩০-৪০ জন বাঙালি সৈনিক নিয়ে চট্টগ্রাম আদালত ভবনের পাহাড়ে পাকিস্তানি দখলদার সৈনিকদের শহরে প্রবেশের প্রতিরোধ করার লক্ষ্যে এমবুস নেন, কিন্তু ইতিমধ্যে পাকিস্তানি সেনার বিপুল সমাবেশ ও অত্যাধুনিক অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত সাঁজোয়া বাহিনী, স্থানীয় অবাঙালিদের সহায়তায় ও মুসলিম লীগের কতিপয় দালালের প্রত্যক্ষ সমর্থনে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত গোলাগুলি ছুড়তে ছুড়তে অকাতরে সাধারণ নিরস্ত্র মানুষ হত্যাযজ্ঞে নেমে পড়ে। চট্টগ্রামে জনমনে নেমে আসে ভয়ঙ্কর আতঙ্ক। শহরের অর্ধেক তখন জনশূন্য। ভয়ার্ত মানুষ ততক্ষণে গ্রামমুখী। অনেকে সীমান্ত পার হয়ে ভারতের নিরাপদ আশ্রয়ে যাওয়ার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছে।

২৮ মার্চ দুপুরেই পাক দখলদার বাহিনী টাইগার পাস নেভাল বেইজ পজিশন নিয়ে নেয়। ২৯ মার্চ শত্রুসেনা আগ্রাবাদ শেখ মুজিব রোড (তৎকালীন কায়েদে আজম রোড) অতিক্রম করে আগ্রাবাদ রেডিও স্টেশন কার্যালয়সহ পুরো এলাকা দখল নিয়ে নেয়।

৩০ মার্চ হালিশহর ইপিআর ক্যাম্পের ভেতরে ইতোপূর্বে মেজর রফিক ও বাঙালি ইপিআর সৈনিকগণ প্রায় পাঁচশ' পাকিস্তানি দখলদার সৈনিককে একটি বিল্ডিং-এর মধ্যে বন্দি করে রেখেছিলেন। সেদিন দখলদার পাক সৈনিকদের বিমানের বেপরোয়া বোমা বর্ষণে উল্লেখিত বন্দিদের বিল্ডিংটি ধ্বংস হয় এবং সব দখলদার পাক-সৈনিক তাদের নিজেদের দলের নিক্ষিপ্ত বোমায় নিহত হয়। দখলদার পাক-সৈনিকের বোমারু বিমান ভেবেছিল হালিশহরস্থ ইপিআর ক্যাম্পটিই বিদ্রোহী বাঙালি সৈনিকদের হেড কোয়ার্টার,

অতঃপর হালিশহর ইপিআর ক্যাম্পটি শত্রু কর্তৃক দখল হয়। এ সময় শ' শ' ইপিআর বাঙালি সৈনিক উল্লেখিত হালিশহর ইপিআর ক্যাম্পের পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহ রামপুর, সরাইপাড়া, অনেন্দীপুর, ছোটপোল, বড়পোল বেপারীপাড়া, হাজীপাড়া, মুহুরীপাড়া মনছুরাবাদ, মিস্ত্রিপাড়া পানওয়ালাপাড়া, মৌলভীপাড়া, চৌমুহনী, আগ্রাবাদসহ পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং সময় ও সুযোগমতো অনেকেরই অস্ত্রশস্ত্র স্থানীয় উদ্যমী যুবকদের কাছে জমা রেখে সামরিক পোশাক ছেড়ে সাধারণ কাপড়ে কালুরঘাটে অবস্থানরত অন্যান্য বাঙালি সৈনিকদের সঙ্গে মিলিত হয়। কালুরঘাটে তখন বাঙালি সৈনিকদের নিয়ে মেজর জিয়াউর রহমান প্রতিরোধ ঘাঁটি স্থাপন করে অবস্থান নিয়েছিলেন। তখন শহরের প্রধান প্রধান রাস্তায় পাক দখলদার সৈনিকের প্রহরা যেমনি ছিল তেমনি চলছিল অনবরত কার্ফু।

ঠিক এমনি সময় ও সুযোগকে কাজে লাগাতে বীর মুক্তিযোদ্ধা মৌলভী সৈয়দ তৎপর হলেন। তার ঢাকা ট্রাঙ্ক রোডস্থ 'সাইকেল পার্টস'-এর দোকানটি তখন আর নিরাপদ নয়। তাই পানওয়ালাপাড়া নিবাসী আওয়ামী লীগ কর্মী মীর সুলতান আহমদের মাধ্যমে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং আধা-শহর, আধা-গ্রামীণ পরিবেশ এবং বহু অলি-গলি আর খাল-বিল, ঝোপঝাড়-এর মধ্যস্থলে পানওয়ালাপাড়া গ্রামটিকে মুক্তিযুদ্ধের ঘাঁটি হিসেবে গড়ে তোলার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেন। যেই কথা সেই কাজ। আমরা কিছু তরুণ যেন এমনি একটি প্রস্তাবের ও সফল নেতৃত্বের অপেক্ষায় ছিলাম। আনেন্দীপুর নিবাসী মোহাম্মদ হারিস, রামপুর নিবাসী আবদুল মোনাফ, দামপাড়া নিবাসী আবদুর রউফ, নূরুল ইসলাম, মীর সুলতান আহম্মদ, মোঃ সফিউল্লাহ, মোঃ সেকান্দার, মোঃ ইয়াকুবসহ আরো দু'জন (যাদের নাম স্মরণে নেই) এবং আমি আবু সাঈদ সরদার ৯ মে শুক্রবার বাদ জুমা রামপুরাস্থ আবদুল মোনাফের বাংলাঘরে মহান আল্লাহতায়ালার নামে পবিত্র কোরআন শরীফ নিয়ে মৌলভী সৈয়দ আহমদ-এর পরিচালনায় মুক্তিযুদ্ধে সশস্ত্র অংশগ্রহণের শপথ নেই। পর্যায়ক্রমে আমাদের মূল সাংগঠনিক তৎপরতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন হাজীপাড়ার জালালউদ্দিন আহম্মদ, মইনুদ্দিন খান বাদল, শেখ দেলোয়ার হোসেনসহ আরো অনেকে। প্রথমেই আমরা বিদ্রোহী বাঙালি ইপিআর সৈনিকদের পরিত্যক্ত অস্ত্র গোলাবারুদ সংগ্রহের কাজে লেগে যাই, এমনকি বিহারিদের মওজুদ অস্ত্রশস্ত্র দু' চার জায়গা থেকে উদ্ধার ও সংগ্রহ করতে সমর্থ হই। আমাদের এ সাংগঠনিক তৎপরতা স্থানীয় অধিবাসীরা প্রথমে খুব একটা ভালো চোখে দেখলেন না, কারণ তারা ভেবেছিলেন আধুনিক অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত সুসংগঠিত পাক দখলদার বাহিনীর পরিকল্পিত যুদ্ধের সঙ্গে আমাদের মতো বাচ্চা ছেলেরা এমন কি-ই-বা আর প্রতিরোধ করতে পারব।

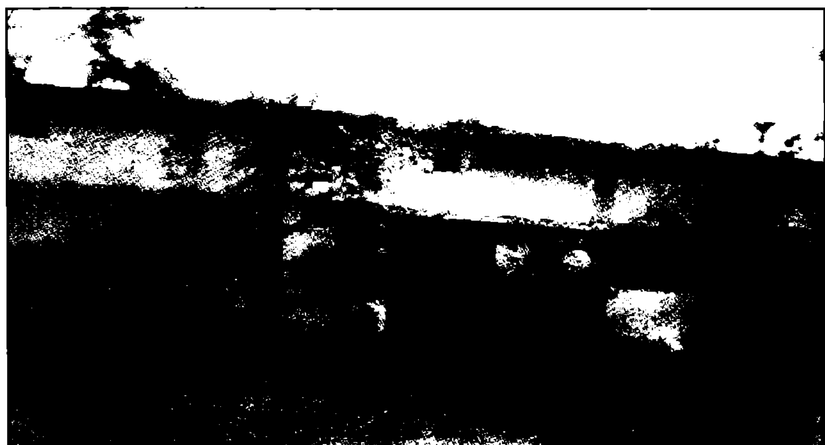
তাই মৌলভী সৈয়দ আহমদের নির্দেশে আমরা আমাদের দলে নতুন নতুন মুক্তিযোদ্ধা ব্যাপকভাবে রিক্রুটের ব্যাপারে কিছুটা শিথিলতা দিয়ে জনমত গঠনের জন্য গোপন লিফলেট-এর মাধ্যমে ব্যাপক প্রচারণা চালাই। এসব লিফলেট যেহেতু কোনো ছাপাখানা থেকে ছাপানো সম্ভব নয় তাই একটি পুরাতন সাইক্রোস্টাইল মেশিন সংগ্রহ করে নিজেরাই তাতে প্রচারপত্র মুদ্রণ করে স্থানীয় রিকশাওয়ালা, ফেরিওয়ালা এবং দোকানদারদের মাধ্যমে তা বিলি ব্যবস্থা করি। অচিরেই আমরা ফলাফল লাভ করি।

ব্যাপক প্রচারণার ফলে অনেক ভীতু আওয়ামী লীগ নেতা ও কর্মীসহ, স্বাধীনতার পক্ষের সবাই আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং উৎসাহ, সাহস ও সহযোগিতা প্রদান করেন। এ পর্যায়ে দলে দলে আশেপাশের গ্রামসহ শহরের বিভিন্ন এলাকা থেকে ছাত্র, যুবক, জনতা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ, কেউ এখানে ট্রেনিং নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে চায় কেউ আমাদের মাধ্যমে ভারতে পাঠিয়ে ট্রেনিং গ্রহণের সুযোগ প্রদানের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানায়।

আমরা তখন আমাদের কার্যক্রম বাড়িয়ে আগ্রাবাদ ছোটপুলস্থ নূর মোহাম্মদ (মিন্টি কাও)-এর বাড়ি ও পার্শ্ববর্তী মাঠটিকে স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিং প্রদানের স্থান নির্বাচন করি। আগ্রাবাদ বঙ্গিপাড়ার পরিত্যক্ত নাপিত বাড়িটিতে স্থাপন করা হয় গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান গোপন দপ্তর। আগ্রাবাদ পানওয়ালাপাড়াস্থ সবুজবাগে স্থাপন করা হয় মৌলভী সৈয়দ বেইজের হেড কোয়ার্টার, যা ছিল খুবই সুরক্ষিত পরিবেশে। সবচেয়ে উল্লেখিত ট্রেনিং ক্যাম্প ও গোয়েন্দা কার্যালয়ের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগের এমন সব অলিগলি ছিল, যা মুক্তিযোদ্ধাদের চলাচলের জন্য অত্যন্ত নিরাপদ।

দ্বিতীয় সপ্তাহেই মৌলভী সৈয়দ আহমদ ভারতের আগরতলায় অবস্থানরত মুক্তিযুদ্ধের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং দেশের ভেতর থেকে ইতিমধ্যে তিনি যেসব কার্যক্রম সম্পাদন করেছেন তার বিস্তারিত উল্লেখপূর্বক প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ পাঠাবার আবেদন জানান। সেখান থেকে নির্দেশ আসে, এখানকার আগ্রহী স্বাধীনতা সংগ্রামী যুবকদের দেশের অভ্যন্তরে সংগঠিত করে প্রয়োজনীয় সংক্ষিপ্ত ট্রেনিং দিয়ে যেন যথেষ্ট সংখ্যক মুক্তিযোদ্ধা সংগ্রহ করে রাখা হয় এবং অস্ত্রশস্ত্রসহ ভারতে ট্রেনিংপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধারাও চট্টগ্রাম শহরে প্রবেশের পর তখন তার সঙ্গেই যোগাযোগ করবে।

এ পর্যায়ে আমরা ভারত থেকে ট্রেনিংপ্রাপ্ত আগত মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য গোপন শেল্টার (আশ্রয়স্থল), তাদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা, কাপড়-চোপড় সংগ্রহসহ তাদের আনা



শেখেরখিল লালজীবন জামে মসজিদ। এই মসজিদে মৌলভী সৈয়দ জুমার নামাজ পড়াতেন

অস্ত্রশস্ত্র ও প্রয়োজনীয় যুদ্ধ সামগ্রী মওজুদ রাখার নিরাপদ গোপন ডাম্প নির্বাচনের কাজে তৎপরতা শুরু করি। পরীক্ষিত ও নিরাপদ ব্যক্তিদের মধ্য থেকে নির্ভরযোগ্য কিছু বাড়ি মুক্তিযোদ্ধাদের শেল্টারের জন্য বিভিন্ন এলাকায় আমরা বেছে নেই। তার মধ্যে বেশিরভাগ গৃহস্বামী ছিলেন গরিব শ্রেণীর। পরবর্তীতে এমন অনেক শেল্টার মাস্টার আমরা নেয়েছি যারা নিজেরা মশারির বাইরে থেকে একমাত্র মশারিটি মুক্তিযোদ্ধাদের সুনিদ্রার জন্য দিয়েছেন। এমন অনেক আশ্রয়দাতা পেয়েছি, যিনি নিজের পালিত মোরগটি জবাই করে দেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধরত মুক্তিযোদ্ধাদের খাইয়েছেন, অনেক আশ্রয়দাতা পেয়েছি যারা রাত জেগে বাড়ির উঠানে পাহারা দিয়ে পরিশ্রান্ত মুক্তিযোদ্ধাকে ঘুমোতে বলেছেন।

ঠিক তার বিপরীতে গ্রামের অনেক পয়সাওয়ালা গৃহস্বামীকে দেখেছি যারা সন্ধ্যার পর ঘরের জানালা, দরজা বন্ধ করে দিতেন এবং সকাল সকাল আলো নিভিয়ে ঘুমিয়ে পড়তেন পাছে যদি মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দিতে হয় এই ভয়ে।

ভারতসহ আগত মুক্তিযোদ্ধাদের ও স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাদের সংগৃহীত অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ ও যুদ্ধসামগ্রী নিরাপদে রাখার জন্য আমরা পানওয়ালাপাড়া, মিস্ত্রিপাড়া, ছোটপোলসহ আশেপাশের কয়েকটি গ্রামের বড় বড় কবরস্থানগুলোকে বেছে নিলাম। সে সব কবরস্থানে বড় বড় ডাম্পে যাবতীয় সামগ্রী রেখে ওপরে কবরের মতো মাটি দিয়ে কবরের আকৃতি বানিয়ে রাখতাম। হরহামেশা মানুষ তো মরছেই। হঠাৎ শত্রুর নজরে এলেও হয়তো মনে করবে, এটাও হয়তো নতুন কোনো কবর।

ভারতে ট্রেনিংপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের চট্টগ্রাম শহরে প্রবেশ ঘটে জুনের প্রথম সপ্তাহে। ভারত থেকে আগত ট্রেনিংপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে সর্বপ্রথম মৌলভী সৈয়দ আহমদ বেইজের সঙ্গে যোগাযোগ করেন মুক্তিযোদ্ধা আবদুর রহমান ১৭ নং গ্রুপের দলনেতা হিসেবে চট্টগ্রাম শহরে প্রবেশ করেন এবং মৌলভী সৈয়দ আহমদ বেইজের সঙ্গে সম্পৃক্ত থেকে চট্টগ্রাম শহর রণাঙ্গনে মুক্তিযুদ্ধে বিশেষ অবদান রাখেন।

এরপর পর্যায়ক্রমে এ শহর বেইজের সঙ্গে যোগাযোগ করেন অনেকগুলো ভারতীয় ট্রেনিংপ্রাপ্ত BLF,FF গ্রুপ। এরা জুলাই, আগস্ট-এর মধ্যে বিপুল পরিমাণে চট্টগ্রাম শহরে প্রবেশ করেন। তার মধ্যে BLF KCLL ডা. মাহফুজুর রহমান (দলনেতা) ও রবিউল হোসেন কচি (উপনেতা) BLF KCI ডা. মাহবুবুল আলম (দলনেতা), ডা. জাফর উল্লাহ (উপনেতা), FF শহীদ জিন্নাহ, FF মোহাম্মদ ইলিয়াস, FF ফকির জামাল, FF মোঃ লোকমান গনি, সুলতান আহমদ, জানে আলম (বন্দর), মোঃ শাহাজাহান (বাংলাদেশ বিমান)। এ ছাড়া মাহাবুব গ্রুপও শহর বেইজের সঙ্গে যোগাযোগ করেন।

আগস্ট মাসে বাংলাদেশ নেভির লে. ক. আবদুল ওয়াহেদ চৌধুরী (এ. ডব্লিউ. চৌধুরী নামে খ্যাত) (দলনেতা) ও ডা. শাহ আলম বীর উত্তম (উপনেতা) হিসেবে প্রায় পঞ্চাশ জনের উর্ধ্বে একটি উচ্চ ট্রেনিংপ্রাপ্ত নৌ কমান্ডো দলও আমাদের শহর বেইজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে চট্টগ্রাম বন্দরে সফলতার সঙ্গে কমান্ডো অপারেশন চালান। যা যুদ্ধকালীন সারাবিশ্বে আলোচিত হয়েছিল।

বিভিন্ন গ্রুপ কমান্ডারগণ যারা শহর বেইজের সঙ্গে আংশিক যোগাযোগ বা সম্পূর্ণ নিজস্ব প্রক্রিয়ায় চট্টগ্রাম এর মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে সফল যুদ্ধ করেছেন তাদের মধ্যে আমার জানা ও স্মরণ মতে যাদের নাম মনে পড়ছে, তারা হলেন FF গ্রুপ-১ সাত্তারের নেতৃত্বে, FF গ্রুপ-২ জাহাঙ্গীর আলমের নেতৃত্বে। শহীদ ওমর ফারুক ও রাইসুল হক বাহারের নেতৃত্বে দু'টি দল এবং মাহবুবুল আলম ও রোজারিওর নেতৃত্বে FF ৮ নং দল। এসব BLF. FF গ্রুপগুলো চট্টগ্রাম শহরে প্রবেশের পর মৌলভী সৈয়দ আহমদ বেইজের সাংগঠনিক ভিত ও অগ্রিম সব আয়োজনে মুগ্ধ হন এবং মৌলভী সৈয়দ গঠিত শহর বেইজের সমন্বয়ে এ শক্তিশালী মুক্তিযোদ্ধা গ্রুপগুলো চট্টগ্রাম শহরে সুপরিকল্পিত উপায়ে বেশ কিছু অপারেশনের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের প্রাণ সঞ্চার করেন।

এসব গ্রুপের উল্লেখযোগ্য অপারেশনগুলো ছিল :

১. সম্মিলিতভাবে পেট্রোল পাম্প অপারেশন (বিস্ফোরণের মাধ্যমে)।

২. সার্কিট হাউজের পেছনে জাতিসংঘ গাড়ি অপারেশন (জিন্নাহ গ্রুপ)।

৩. ফায়ার বিগ্রেড হেড কোয়ার্টার বিল্ডিং/গাড়ি অপারেশন।

৪. পাঁচলাইশস্থ অয়েল এন্ড গ্যাস ডেভেলপমেন্ট করর্পোরেশন হতে 'ওয়ারলেস সেট' উদ্ধার অপারেশন।

৫. আমেরিকান এক্সপ্রেস অপারেশন।

৬. ফজলুল কাদের চৌধুরীর বাড়ি অপারেশন। (মুক্তিযোদ্ধা ওমর ফারুক শহীদ হন)

৭. আইস ফ্যাক্টরি রোড অপারেশন। (মুক্তিযোদ্ধা রফিক আহমদ শহীদ হন)

৮. সম্মিলিত ইলেকট্রিক টাওয়ার, ট্রান্সফরমার অপারেশন।

৯. দালাল মোঃ আলী বাড়ি রাজাকার ক্যাম্প অপারেশন।

১০. দালাল মোঃ আলীর পেট্রোল পাম্প অপারেশন।

১১. হালিশহর শত্রু সেনা ক্যাম্প অপারেশন।

১২. আগ্রাবাদ সিডিএ আবাসিক এলাকায় পাক আর্মি ইনটেলিজেন্স অফিস অপারেশন।

১৩. প্রখ্যাত নৌ কমান্ডো অপারেশন (চট্টগ্রাম বন্দরের জাহাজে)

১৪. কোর্ট বিল্ডিং অপারেশন।

১৫. বিআরটিসি বাস অপারেশন।

১৬. লালদিঘীর পাড়ে ফজলুল কাদের চৌধুরীর সভা অপারেশন।

১৭. দেওয়ানহাটস্থ আলবদর ক্যাম্প অপারেশন (দেওয়ান হোটেল)।

১৮. ডালিম হোটেলস্থ আল্-শামস্ ক্যাম্প অপারেশন।

উল্লেখিত গুরুত্বপূর্ণ অপারেশন ছাড়া আরো অনেক অপারেশন মুক্তিযোদ্ধারা করেছেন, যা আমাদের স্মরণে আজ বিলুপ্ত বা সঠিক তথ্য সংগ্রহের অভাবে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। চট্টগ্রাম শহর রণাঙ্গনে সমগ্র মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে শহীদ হয়েছেন বীর মুক্তিযোদ্ধা রফিক আহমদ (আইস ফ্যাক্টরি রোড অপারেশন), বীর মুক্তিযোদ্ধা ওমর ফারুক (ফজলুল কাদের চৌধুরীর চন্দনপুরাস্থ গুডস্ হিল বাসভবনে), বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ

জিন্নাহ (রহস্যাবৃত কারণে এ শহীদের মরদেহের ঠিকানা আজো আমরা পাইনি)

অক্টোবর মাসের দিকে ভারত থেকে ট্রেনিংপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা ইঞ্জিনিয়ার আফছার উদ্দিন মোহাম্মদ আলী চট্টগ্রাম শহর রণাঙ্গনের সিটি কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব নিয়ে চট্টগ্রাম শহরে গ্রুপ কমান্ডারের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন। এতে করে প্রাথমিক পর্যায়ে মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে কিছুটা দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হলেও পরবর্তীতে ঈদগাঁহস্থ একটি বাড়িতে সব মুক্তিযোদ্ধা গ্রুপ কমান্ডারসহ নেতৃস্থানীয় মুক্তিযোদ্ধা সংগঠকগণের উপস্থিতিতে ও মৌলভী সৈয়দ আহমদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় চট্টগ্রাম শহর কমান্ডকে মৌলভী সৈয়দ আহমদ ও ইঞ্জিনিয়ার আফছার উদ্দিন মোহাম্মদ আলীর যৌথ কমান্ডে দেওয়া হয়। যারা পরবর্তীকালে সুষ্ঠু দায়িত্ব পালনে সক্ষম হন।

মোছলেম উদ্দিন আহমদ

সহকর্মী

অন্যায়ের কাছে মাথা নত না করা এ জাতীয় বীর মৌলভী সৈয়দ নামে বহুল পরিচিত হলেও তাঁর পুরো নাম মৌলভী সৈয়দ আহমদ চৌধুরী। বাঁশখালী থানার নাপোড়া শেখেরখিলে তাঁর জন্ম। তিনি মরহুম জননেতা জহুর আহমদ চৌধুরীর একজন আস্থাভাজন কর্মী ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি ছিলেন চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা আওয়ামী যুবলীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। তিনি সভাপতি থাকাকালে আমি সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলাম। তিনি চট্টগ্রাম মহানগর ছাত্রলীগের সভাপতির দায়িত্বও পালন করেছিলেন। চট্টগ্রামের বর্তমান সিটি মেয়র আলহাজ এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরীকেও তাঁর সঙ্গে সাধারণ সম্পাদক করা হয়। এ সময় বঙ্গবন্ধু কর্তৃক ঘোষিত চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা বাকশালের সম্পাদক হয়েছিলেন বর্তমান চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা আওয়ামী লীগ সহ-সভাপতি, প্রাক্তন এমপি সাতকানিয়ার জনাব এম ছিদ্দিক। যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন জনাব আতাউর রহমান খান কায়সার, আবু সালেহ, মরহুম এ কে এম আবদুল মন্নান, মরহুম নাজিম উদ্দিন ও মরহুম মৌলভী সৈয়দ আহমদ। এক সময়ের তুখোড় ছাত্রনেতা মৌলভী সৈয়দ '৬৯ সালে আইয়ুববিরোধী আন্দোলনে চট্টগ্রামে যে ক'জন ছাত্রনেতা নেতৃত্ব দিয়েছেন তাঁদের শীর্ষে ছিলেন। আইয়ুববিরোধী আন্দোলনের দায়ে অনেকদিন তিনি কারাবন্দি ছিলেন। মাদরাসা শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে তিনি সিটি কলেজে ভর্তি হন। সিটি কলেজ থেকে তিনি স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি মেধাবী ছাত্র ছিলেন।

মৌলভী সৈয়দ-এর সঙ্গে আমরা দীর্ঘদিন রাজনীতি করেছি। মৌলভী সৈয়দ, মেয়র মহিউদ্দিন চৌধুরী এবং আমি আরও কয়েকজন একই পরিবারের সদস্যের মতো ছিলাম, তাই তাকে খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয়েছিল। তিনি একজন বড় মাপের নেতা ও সাহসী পুরুষ ছিলেন। একজন মহৎ মানুষের যাবতীয় গুণাবলি তাঁর মধ্যে ছিল। বাঁশখালীর এক সাধারণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করে, শুধুমাত্র বঙ্গবন্ধুর আদর্শের প্রতি অবিচল থেকে, দৃঢ়তার কারণে চট্টগ্রামের রাজনীতিতে একটি গৌরবজনক আসনে তিনি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। তাঁর দেশপ্রেম ছিল প্রশ্নাতীত। তিনি ছিলেন একজন সত্যিকারের

দেশপ্রেমিক। জীবনে অনেক কষ্ট করেছেন মৌলভী সৈয়দ যার কারণে সাফল্য লাভ করেছেন সব ক্ষেত্রে। তিনি যখন চট্টগ্রাম শহর (মহানগর) ছাত্রলীগের সভাপতির দায়িত্ব পালন করছিলেন তখনও তিনি মিঞানগরে একটি বাড়িতে লজিং থাকতেন, যা আজ কল্পনাও করা যায় না। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি চট্টগ্রামে সক্রিয়ভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। নেতৃত্ব দিয়েছিলেন শহর এলাকায়। যে ক'টি গ্রুপ চট্টগ্রাম শহরে সাহসী অপারেশন করেছে তাদের নেতৃত্ব দেন মৌলভী সৈয়দ। চট্টগ্রাম শহরে কয়েকটি সফল অভিযান তিনি ব্যক্তিগতভাবে পরিচালনা করেন।

মৌলভী সৈয়দ একজন অনলবর্ষী বক্তা ছিলেন। তার রাজনৈতিক জ্ঞান ছিল প্রশ্নাতীত। তিনি রাজনীতি নিয়ে প্রচুর পড়াশুনা করতেন। তার একটি বিশাল ব্যক্তিগত লাইব্রেরি ছিল। ভালো সংগঠক ছিলেন মৌলভী সৈয়দ। তিনি দীর্ঘদিন শ্রমিক রাজনীতি করেছেন। বিদ্যুৎ সেক্টরে শ্রমিকদের মাঝে তিনি যথেষ্ট জনপ্রিয় ছিলেন। জাতীয় নেতা শেখ ফজলুল হক মনি তাঁকে খুব ভালো জানতেন। মৌলভী সৈয়দ মনি ভাইয়ের খুবই প্রিয়ভাজন ছিলেন।

মৌলভী সৈয়দ একজন বাস্তববাদী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর কোনো সংসার ছিল না। তাঁর জন্য বিয়ে ঠিক হয়েছিল দেওয়ানহাট এলাকার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে। তাঁর বিয়ের এনগেজমেন্টও সম্পন্ন হয় কিন্তু তিনি সংসার যাত্রায় পা দেননি। কারণ যখন পঁচাত্তর-পরবর্তী সময়ে প্রতিরোধ সংগ্রামে জড়িয়ে পড়েন, তখন তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, এ যাত্রায় হয়তো সংসার হবে না। তিনি পাত্রী পক্ষকে সাফ জানিয়ে দিয়েছিলেন, তাদের মেয়েকে অন্যত্র বিয়ে দিয়ে দিতে। তাঁর সম্মতিক্রমে ওই মেয়েকে অন্যত্র বিয়ে দিয়ে দেয়া হয়।

ডা. আবু ইউসুফ চৌধুরী

সহকর্মী

মৌলভী সৈয়দ এবং আমি আমাদের দু'জনের মধ্যে বিশেষ একটা সম্পর্ক ছিল। এর কারণ আমাদের দু'জনের বাড়িই বাঁশখালী থানায়। কবে, কখন কোথায় এবং কিভাবে পরিচয় হয়েছিল ঠিক মনে নেই। তবে এটা নিশ্চিত সে পরিচয় অবশ্যই মিটিং-মিছিলে। আন্দোলন-সংগ্রামে। দু'জন দু' গ্রুপে রাজনীতির সঙ্গে জড়িত হলেও বাঁশখালীর টান বোধ হয় আমাদের খুব কাছাকাছি নিয়ে যেতে পেরেছিল। এখানে উল্লেখ করতেই হয়, আমি ১২০ আন্দরকিল্লাভিত্তিক জেলা ছাত্রলীগের সঙ্গে আর মৌলভী সৈয়দ রেস্ট হাউসভিত্তিক শহর ছাত্রলীগের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। দু' গ্রুপের রাজনীতির মধ্যে প্রকাশ্য বিরোধ না থাকলেও প্রচণ্ড প্রতিযোগিতা ছিল। মৌলভী সৈয়দ শহর ছাত্রলীগের প্রাক্তন সভাপতি ছিলেন। তিনি আবার শহর জয়বাংলা বাহিনীরও প্রধান ছিলেন। এত অমায়িক ব্যবহারের রাজনৈতিক কর্মী আমি খুব কম দেখেছি। হালকা গড়নের এ ত্যাগী নেতার কাছে সাহায্য-সহযোগিতা চেয়ে পাননি এমন ঘটনার কথা আমি শুনিনি।

মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে পাকসেনাদের হাতে চট্টগ্রামের পতন ঘটে। ওই সময় শহরের রাজনৈতিক কর্মীদের এক বিরাট অংশ প্রতিরোধ যুদ্ধে অংশ নিতে শহর ছেড়ে প্রথমে গ্রামে এবং শেষে ভারতে চলে যায়। আমিও এ দলে ছিলাম। আর

একটি ক্ষুদ্র অংশ শহরে অবস্থান করতে থাকেন। মৌলভী সৈয়দ এদেরই একজন। শহর ছাত্রলীগের তৎকালীন সভাপতি ও জয়বাংলা বাহিনীর শহর প্রধান হওয়ার সুবাধে তিনি ছিলেন রাজনৈতিক অঙ্গনে সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব। তার সঙ্গে শহরে আত্মগোপন করে থাকা ছাত্রলীগ/আওয়ামী লীগ কর্মীরা যোগাযোগ করতে শুরু করে। মৌলভী সৈয়দ এবং আরো কয়েকজন পরিচিত রাজনৈতিক কর্মীর পরিচিতির কারণে তাদের এ চেষ্টা দ্রুত বিস্তার লাভ করে। শহরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ছাত্রলীগ কর্মীরা ধীরে ধীরে এ উদ্যোগের সঙ্গে জড়িত হতে শুরু করে। বিশেষ করে সরাইপাড়া, রামপুরা, ছোটপুল, বেপারীপাড়া, হাজীপাড়া, মুহরীপাড়া, মনছুরাবাদ, পানওয়ালাপাড়া, মিস্ত্রিপাড়া, চৌমুহনী, আগ্রাবাদ এসব এলাকার কর্মীদের তিনি একত্রিত করে বিভিন্ন দফায় ট্রেনিং দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। এর মধ্যে ভারত থেকে ট্রেনিং নিয়ে আসা FF-এর মুক্তিযোদ্ধা ও BLF-এর KC KCII গ্রুপের মুক্তিযোদ্ধারা মৌলভী সৈয়দের সঙ্গে মিলে অসংখ্য ছাত্র-যুবককে ট্রেনিং দেয়। এসব মুক্তিযোদ্ধারা সবাই বিনা দ্বিধায় মৌলভী সৈয়দ-এর নেতৃত্ব মেনে কাজ শুরু করে। এর কারণ অবশ্যই রাজনৈতিক। কারণ তিনি ছিলেন ছাত্রলীগের একজন নেতা। FF গ্রুপ এবং BLF গ্রুপ উভয় গ্রুপই মৌলভী সৈয়দ-এর সঙ্গে কাজ করে। সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বহু যুবক FF এবং BLF-এর যোদ্ধাদের কাছ থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে গেরিলা যুদ্ধে অসীম সাহসিকতায় পরিচয় দিয়েছে। এ বিশাল বাহিনীর নিয়ন্ত্রক ছিলেন মৌলভী সৈয়দ। আবার সেপ্টেম্বর-এর দিকে কাজের সময়ের জন্য BLF, FF, IFF-এর শহর কমিটি গঠন করা হয় এবং মৌলভী সৈয়দ ডেপুটি কমান্ডার হিসাবে FR ও BIF-এর দায়িত্ব নেন।

দীর্ঘ ন'মাস যুদ্ধে মৌলভী সৈয়দ একবার মাত্র তার পাহাড়তলীস্থ মোটর পার্টস্-এর দোকান হতে গ্রেফতার হন। পরে ট্রাকে তুলে পাকিস্তানিরা আরো লোক খুঁজতে থাকে। ওখানে থেকে মৌলভী সৈয়দ পালিয়ে যান। বহু চেষ্টা করেও পাকবাহিনী মৌলভী সৈয়দকে আর ধরতে পারেনি। মৌলভী সৈয়দ 'আগুন' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশনার মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের গতি ত্বরান্বিত করার প্রচারণা চালাতেন। মুক্তিযুদ্ধের দীর্ঘ ন'মাস মৌলভী সৈয়দ পাক হানাদার বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধরত মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয়স্থল, ট্রেনিং, খাবার-দাবার এবং তাদের যাতায়াতের ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত ছিলেন। পাকবাহিনী বহু চেষ্টা করেও তাকে হত্যা করতে পারেনি।

আমরা স্বাধীন দেশে শুধুমাত্র নিজের গদি রক্ষার জন্য এরকম এক মহান দেশপ্রেমিক মুক্তিযোদ্ধাকে হত্যা করেছি। তার এ নির্মম হত্যাকাণ্ডের সুষ্ঠু কোনো তদন্ত বা বিচারও হয়নি। এ লজ্জা আমরা রাখি কোথায়।

মুহম্মদ ইদ্রিস

সাংগঠনিক সম্পাদক, চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা আওয়ামী লীগ

বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডকে যারা মেনে নিতে পারেনি তার মধ্যে অন্যতম মৌলভী সৈয়দ আহমদ চৌধুরী। বঙ্গবন্ধুকে যে দিন হত্যা করা হয়, আমি এবং বাঁশখালীর শফিকুল ইসলামসহ অনেকে সেদিন তার সঙ্গে ঢাকায় ছিলাম। সেদিন রাতে নাখালপাড়া এমপি

হোস্টেলে তিনি রাত্রি যাপন করেন। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার খবর শুনে এমপি হোস্টেলের দেয়াল টপকে নবাবপুর রোডে সেন্ট্রাল বোর্ডিং-এ চলে আসেন এবং আমাদেরকে তার সঙ্গে দেখা করার জন্য সেখানে যেতে খবর পাঠান। কেন্দ্রীয় নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে তিনি বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ নেয়ার দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন এবং তার জন্য কলাকৌশল গ্রহণ করেন। যাকে চট্টগ্রাম ষড়যন্ত্র মামলা নামে অভিহিত করা হয়। পরবর্তীতে এক সময় তাকে গ্রেফতার করে চরম নির্যাতন চালিয়ে হত্যা করা হয়। তার লাশ কফিনে করে তার গ্রামে বাড়ি বাঁশখালীর শেখেরখিলে পাঠিয়ে দিলে গ্রামের কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।

১৯৬৮ সালে থার্ড ডিভিশন মুভমেন্ট আন্দোলন সংগঠিত করার সময় মুসলিম হাইস্কুলের পাশ থেকে তিনি গ্রেফতার হন। ১৯৬৯ সালে গণআন্দোলনের এক পর্যায়ে তিনি জেল থেকে ছাড়া পান। আমরা তখন চট্টগ্রাম কলেজ থেকে এস এম ইউসুফকে সংবর্ধনা দেয়ার জন্য জেল গেটে উপস্থিত হই। সিটি কলেজ সম্ভবত খবরটি জানত না। তাকে সংবর্ধনা জানাতে কেউই ছিলেন না। এদিকে এসএম ইউসুফকে নিয়ে সবাই আসকার দীঘি পাড়ের সবুজ পার্কের সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠান শেষে চট্টগ্রাম কলেজের তালেব অলী ক্যান্টিনের সংবর্ধনা মঞ্চে চলে গেলেন। আমার মধ্যে ভাবান্তর হলো— দু'জনই সদ্য কারামুক্ত, একজনকে নিয়ে মাতামাতি আরেকজনকে অবহেলা, মেনে নিতে পারলাম না। সৈয়দ ভাইকে নিয়ে গিয়ে চট্টগ্রাম কলেজ সংবর্ধনা মঞ্চে উঠিয়ে দিলাম অনেকটা জেদের বশবর্তী হয়ে। ওখানে বৈরী পরিবেশে তিনি বক্তব্য রাখলেন। তার কণ্ঠ এখনও আমার কানে বাজছে— "আমি কৃষকের ছেলে, আমার কৃষক পিতা যখন তার ফসলের ন্যায্য মূল্য পায় না আমি বিদ্রোহী হয়ে উঠি, আমার শ্রমিক ভাই যখন তার মজুরি পায় না তখন আন্দোলন করতে বাধ্য হই। রাজনীতি আমার পেশা নয়, রাজনীতি আমার নেশা নয়, রাজনীতি আমার অঙ্গীকার।"

'৭১-এর মার্চ, উত্তাল বাংলাদেশ। চট্টগ্রামে জয়বাংলা বাহিনী গঠিত হয়। মৌলভী সৈয়দ আহমদ চৌধুরী প্রধান এবং বর্তমান মেয়র এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরী ডেপুটি প্রধান। লালদীঘি মাঠে জয়বাংলা বাহিনীর মার্চপাস্ট অনুষ্ঠিত হলো। পাকিস্তানি পতাকা পোড়ানো হয়। মৌলভী সৈয়দ উত্তোলন করলেন বাংলাদেশের পতাকা আর মহিউদ্দীন চৌধুরী উত্তোলন করলেন জয়বাংলা বাহিনীর পতাকা। মৌলভী সৈয়দ মাইক্রোফোনে এসে ঘোষণা দিলেন আজ থেকে কোতোয়ালী, ডবলমুরিং ও পাঁচলাইশ থানা স্বাধীন। তিনি সর্বস্তরের জনগণকে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের আহ্বান জানালেন। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে এ ধারাটি সংযোজিত হওয়া উচিত যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম সঠিক ইতিহাস জানতে সমর্থ হয়।

মৌলভী সৈয়দ মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে চট্টগ্রাম নগর গেরিলা অধিনায়ক ছিলেন। তার কমান্ডে নগরের গেরিলা অপারেশন পরিচালিত হয়। বিজয় লাভের পরে দেশ পুনর্গঠনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। শেখ ফজলুল হক মনির নেতৃত্বে যুবলীগ গঠিত হলে তিনি চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা যুবলীগের আহ্বায়ক মনোনীত হন। তার নেতৃত্বে আমরা বিভিন্ন থানায় যুবলীগকে সংগঠিত করি।

আলহাজ আখতারুজ্জামান চৌধুরী (বাবু)

সভাপতি, চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা আওয়ামী লীগ

চট্টগ্রামের গর্ব বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ মৌলভী সৈয়দ গর্বিত। একাত্তরের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ ও মহান নেতা বঙ্গবন্ধুর শাহাদতের পর প্রথম সশস্ত্র প্রতিবাদ করেন। তার সামাজিক, মানব কল্যাণমূলক ও দুঃসাহসিক প্রতিবাদী মনোভাবের প্রতি ভীত হয়ে পরবর্তীতে স্বৈরাচার শক্তি অমানুষিক অত্যাচারের মাধ্যমে এ মহান নেতাকে হত্যা করে। তার এ গৌরবময় স্মৃতি ইতিহাসের পাতায় চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

এমএ মান্নান

সাবেক মন্ত্রী ও সভাপতি, চট্টগ্রাম মহানগর আওয়ামী লীগ

মৌলভী সৈয়দ প্রথিতযশা মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালীন চট্টগ্রাম নগরে মৌলভী সৈয়দের বিভিন্ন কার্যক্রম কিংবদন্তি হিসেবে এখনো জনগণের স্মৃতিতে রয়েছেন। ছাত্র, যুবনেতা এবং স্বাধীনতা আন্দোলনে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে মৌলভী সৈয়দের অনন্য ভূমিকা ছিল। বঙ্গবন্ধু হত্যার পর এ আপোষহীন সংগ্রামী মুক্তিযোদ্ধা বঙ্গবন্ধু হত্যার প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে নতুন করে কার্যক্রম শুরু করেন। তারই ফলশ্রুতিতে ঘাতক বাহিনীর উত্তরাধিকারীরা তাঁকে গ্রেফতার করে অমানসিক নির্যাতন চালিয়ে হত্যা করে।

ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন

সাবেক মন্ত্রী ও সভাপতি, চট্টগ্রাম উত্তর জেলা আওয়ামী লীগ

বঙ্গবন্ধু হত্যার প্রতিবাদ ও জাতির ক্রান্তিলগ্নে তাঁর অপরিসীম ত্যাগের জন্য জাতির ইতিহাসে মৌলভী সৈয়দ স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট-এর পর এ মহান নেতার নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের প্রথম সশস্ত্র প্রতিবাদ করা হয়। পরবর্তীতে জিয়াউর রহমানের সামরিক সরকার অমানুষিক অত্যাচার ও নির্যাতনের মাধ্যমে এ মহান নেতাকে হত্যা করে। তাঁর রাজনৈতিক, সামাজিক ও মানব কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড সবার কাছে অনুস্মরণীয়, অনুকরণীয় হয়ে থাকবে।

এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরী

মেয়র, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ মৌলভী সৈয়দ অমর আত্মত্যাগের জন্য মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। বঙ্গবন্ধুর শাহাদতের পর এ মহান নেতার নেতৃত্বে প্রথম সশস্ত্র প্রতিবাদ করা হয়। পরবর্তীতে স্বৈরাচারী শক্তি অমানুষিক অত্যাচারের মাধ্যমে এ মহান নেতাকে হত্যা করে। তাঁর সামাজিক ও মানব কল্যাণমূলক বিভিন্ন কর্মকাণ্ড সবার কাছে অনুকরণীয় হয়ে থাকবে।

মোঃ আবদুল জলিল

সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

১৯৭৭ সালের ১১ আগস্ট সামরিক স্বৈরশাসক খুনি জিয়ার নির্দেশে চট্টগ্রাম যুবলীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ মৌলভী সৈয়দকে নির্মমভাবে হত্যা করে।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে হত্যার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রাকে থামিয়ে দিয়ে এদেশকে পাকিস্তানি ভাবধারায় ফিরিয়ে নেয়ার অপচেষ্টা শুরু হয়। শুরু হয় মুজিব সৈনিকদের নিশ্চিহ্ন করার প্রক্রিয়া। এ অশুভ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবেই বঙ্গবন্ধু হত্যার প্রতিবাদ করার অপরাধে হত্যা করা হয় শহীদ মৌলভী সৈয়দকে।

ঘাতকচক্র ভেবেছে এভাবে নির্যাতন, নিপীড়ন এবং হত্যা করে বাংলাদেশ থেকে বঙ্গবন্ধুর চিহ্ন মুছে ফেলা যাবে। কিন্তু আজকের বাস্তবতা প্রমাণ করেছে তা কখনো সম্ভব নয়। যতদিন বাংলাদেশ থাকবে ততদিন এদেশে বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকবেন।

শেখ হাসিনা

সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও সভানেত্রী, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

বঙ্গবন্ধুর আদর্শের নির্ভীক সৈনিক, চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী যুবলীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, শহীদ মৌলভী সৈয়দকে সামরিক স্বৈরশাসক খুনি জিয়ার নির্দেশে নির্মম নির্যাতনের মাধ্যমে ১৯৭৭ সালের ১১ আগস্ট হত্যা করা হয়।

শহীদ মৌলভী সৈয়দের একমাত্র অপরাধ— বঙ্গবন্ধুর নির্মম হত্যাকাণ্ডকে মেনে নিতে না পারা এবং তাঁর এ পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে সোচ্চার হওয়া। খুনিরা সেদিন আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের একে একে হত্যা করে নিশ্চিহ্ন করতে চেয়েছিল। কিন্তু তাদের সেই অপপ্রয়াস সফল হয়নি। খুনি ঘাতকের দল জানে না বঙ্গবন্ধুর আদর্শের অবিনাশী চেতনায় যারা বাঁচে তাদের নিপীড়িন করা যায়, নির্যাতন করা যায়, হত্যাও করা যায় কিন্তু কোনোভাবেই নিশ্চিহ্ন করা যায় না। যে আদর্শ বুকে নিয়ে অসংখ্য আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীর মতো শহীদ মৌলভী সৈয়দ মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছেন সেই আদর্শকে যে কোনো মূল্যে সমুন্নত রাখার দৃপ্ত শপথের সময় এখন।



মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি চিহ্ন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে পটিয়া মাদরাসা

'৭১-এর অনেক আগেই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া চট্টগ্রাম। বর্তমানে এ প্রতিষ্ঠানটি এশিয়ার বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। এ প্রতিষ্ঠানটি মুক্তিযুদ্ধের অনেক ঘটনার জীবন্ত সাক্ষী। তাই পটিয়া মাদরাসার সাবেক ছাত্র এবং পটিয়ারই সহযোগী প্রতিষ্ঠান বান্দরবান ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্রের তরুণ শিক্ষক মাসউদুল কাদিরকে সঙ্গে নিয়ে বাঁশখালী থেকে সরাসরি চলে এলাম পটিয়ায়।

চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হয়েছে স্বাধীনতার ঘোষণা। মুক্তির ঘোষণা। বাঙালি জাতিকে রুখে দাঁড়াবার প্রতি আহ্বান জানিয়ে মেজর জিয়াউর রহমানের এ ঘোষণা মানুষের হৃদয় নাড়িয়ে দিয়েছিল। তবে কালুরঘাট বেতারে কর্মরত একজন কর্মকর্তা জানান, মেজর জিয়ার আগেও কয়েকজন মিলে এ ঘোষণাপত্র পাঠ করেন। কিন্তু সত্য হলো, মেজর জিয়ার ঘোষণায়ই সারাদেশে ব্যাপক সাড়া পড়ে যায়। এরপর কালুরঘাট বেতার কেন্দ্রটি পাকিস্তানিদের শ্যেনদৃষ্টিতে পড়ে যায়। যে কোনো মুহূর্তে আক্রমণের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়া যায় না। বেতার কেন্দ্রের অনেক কর্মকর্তাও জীবনের ভয়ে অফিস করা ছেড়ে দিতে লাগলেন। এরই মধ্যে হানাদারদের আক্রমণ শুরু হয়ে গেল। চৌকস মেজর জিয়া কালুরঘাটের বেতার সরঞ্জামাদী নিয়ে পটিয়ার দিকে যাত্রা করেন।

'৭১-এ জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়ার অবস্থান

যুদ্ধ শুরু হয়েছে। সারাদেশের স্কুল, কলেজ, মাদরাসা সবই ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান তো অঘোষিতভাবে ছুটি হয়ে গেছে। জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়াও ছুটি হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু দ্বীনের শক্ত প্রাচীর উলামায়ে কেরাম মাদরাসা ত্যাগ করতে খুবই কষ্ট পাচ্ছিলেন। তাই অনেকে মাদরাসা ছাড়তে পারলেন না। তখনও প্রতিদিন এখানে আজান হতো, নামাজ হতো। কেউ ভাবেনি সুন্দর ইলমে দ্বীনের এ বাতিটাও নিভিয়ে দেবার চক্রান্ত হবে। চক্রান্ত হবে ইলমের এ বাগানটিও ভস্মীভূত করে দেবার। তবে ভীতসন্ত্রস্ত ছিল সবাই। যে কোনো মুহূর্তে আক্রান্ত হতে পারে।

মেজর জিয়াকে পটিয়ায় সাদর আমন্ত্রণ

সময়ের স্রোত যত বয়ে যায় ইতিহাস তত পাকাপোক্ত হয়। নির্মিত হয় ইটের প্রাচীর। মেজর জিয়াউর রহমান কালুরঘাট থেকে এসব যন্ত্রপাতি নিয়ে যাবেন কোথায়! কারা

তার প্রতি সদাচরণ করবে। একটু ভালো ব্যবহার করবে। জানিয়ে দেবে না হানাদারদের। কর্ণফুলী নদীর তটে দাঁড়িয়ে হয়তো তাই ভাবছিলেন মেজর জিয়া। কর্ণফুলী পার হয়ে পটিয়া থানার দিকে যাত্রা করলেন। কোথাও থামছেন। দেখে নিচ্ছেন রাস্তা-ঘাট ক্লিয়ার তো? হ্যাঁ, দুর্বার গতিতে পালিয়ে নিরাপদ এলাকায় অবস্থানের চেষ্টা করলেন। ডান-বাম সারা পটিয়ায় দেখেশুনে শেষ পর্যন্ত কর্তৃপক্ষের সাদর আমন্ত্রণে জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়াতে মেজর জিয়াউর রহমান ছুটে এলেন।

স্বাগতম হে মহান অতিথি!

তখন সময়টা খুব খারাপ ছিল। কেউ মুক্তিযোদ্ধাদের জায়গা দিতে চাইত না। কারণ তাদের জায়গা দিলেই দালালরা গিয়ে পাকিস্তানিদের জানিয়ে দিত। ফলে একটি সুন্দর সংসার জ্বলেপুড়ে ছারখার হয়ে যেত। তারপরও যেসব হৃদয়বান দেশপ্রেমিক আছেন তারা ছিলেন সম্পূর্ণ নির্ভীক। মাতৃভূমির জন্য যে কোনো বিসর্জন তারা সহজে মেনে নিতেন। মেজর জিয়া বিশাল বহর নিয়ে পটিয়া মাদরাসায় ঢুকে পড়েছেন। কোনো বাধা নেই। কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া নেই। তাকে দেখিয়ে দেয়া হচ্ছে। এই যে, এটা মেহমানখানা, এটি গোসলখানা, এদিকে টয়লেট, ওখানে থাকার জায়গা। ওটা শত্রুদের থেকে নিরাপদ আবাস।

মেজর জিয়াউর রহমান পটিয়া মাদরাসার ছাত্র-শিক্ষকদের ভালোবাসায় মুখিয়ে গেলেন। সবাই যত্ন নিত মেজর জিয়ার।

বেতার কেন্দ্র যখন পটিয়া মাদরাসায়

মেজর জিয়াউর রহমান জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়ায় অবস্থান নিয়েই চালু করলেন কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র। আজও সেই অস্থায়ী বেতার কেন্দ্র 'জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়ার মেহমানখানা' ইতিহাসের বিরল সাক্ষী হয়ে পড়ে আছে। আজকেও যদি তৎকালীন



জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়া একাত্তরে বহু মুক্তিযোদ্ধাকে আশ্রয় দিয়েছে

যুগের মুরব্বিদের জিজ্ঞেস করি তাহলে খুঁজে পাই মেজর জিয়ার পটিয়ায় অবস্থানের ইতিহাস। খুঁজে পাই পটিয়া মাদরাসায় বেতার কেন্দ্র স্থাপনের ইতিহাস।

ইসলামী লেখক মুক্তিযোদ্ধা মিয়া ফারুকী

খুঁজতে খুঁজতে উপস্থিত হলাম পটিয়ার অত্যন্ত পরিচিত ইসলামী লেখক, কলামিস্ট, মুক্তিযোদ্ধা জনাব মিয়া ফারুকীর বাড়িতে। দরজা খুলে বয়োবৃদ্ধ লোকটির সহাস্য মুখটি দেখে চমকে উঠলাম। এ বয়সেও লোকটি এমন হাসি হাসতে পারেন। তিনি আমাদের সাদরে গ্রহণ করলেন। চোখ তুলে তাকাতেই দেখলাম দেয়ালে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে মিয়া ফারুকীর ছবি ঝুলছে। বিস্মিত চাহনি দেখেই তিনি উঠে গিয়ে ছবির ফ্রেমটা আমার হাতে তুলে দিলেন। আমি মন ভরে দেখলাম। বঙ্গবন্ধুর চোখে চোখ রেখে হাসছেন মিয়া ফারুকী। আমি কথা শুরু করে দিলাম।

—মুক্তিযুদ্ধের সময় কি আপনি রাজনীতি করতেন?

: হ্যাঁ, আমি রাজনীতির সঙ্গে খুব শক্তভাবেই জড়িত ছিলাম। বর্তমানে অবশ্য ঝিমিয়ে পড়েছি।

—মুক্তিযুদ্ধ আপনাকে কি দিয়েছে?

: আসলে সেটা বড় বিষয় নয়। বরং আমি মুক্তিযুদ্ধকে কি দিয়েছি, কতটুকু ত্যাগ দিয়েছি সেটাই বড় বিষয়।

—তাহলে সেটাই বলুন!

: দীর্ঘ ন'মাস আমি এক রাতও ঘুমুতে পারিনি আমার ঘরে। পাহাড়ে, জঙ্গলে, ইন্ডিয়ায় পালিয়ে ন'মাসের প্রতিটি মুহূর্ত কেটেছে। রাতগুলো দিনে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। কারণ রাতেও তো ঘুমুতে পারিনি। পরিকল্পনা করতে হতো। কোথাও কোথাও আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়তে হতো।

—মুক্তিযুদ্ধে আপনার কোনো ক্ষতির কথা তুলে ধরবেন কি?

: ক্ষতি অনেক। সব ক্ষতিই বিজয় দিবসের আনন্দে আমি ভুলে যাই। শুধু ভুলতে পারি না আমার কঠোর পরিশ্রমের সংগ্রহশালাটির কথা। হানাদাররা আমার বাড়িটি তিন বার পুড়েছে। ফলে আর কিছুই থাকেনি। হাজার হাজার বইপত্র পুড়ে গিয়ে যেন আমার হৃদয়টাও ভস্মীভূত করে দিয়েছে।

—এখনও তো আপনার সংগ্রহশালা দেখছি অনেক সমৃদ্ধ। তা কিভাবে সম্ভব?

: দেখুন আগের তুলনায় এটা কিছু না। সেই বইগুলো থাকলে এ বাড়ি পুরনো বইয়ের জাদুঘরে পরিণত হতো। দেশ-বিদেশের মানুষ দেখতে আসত। আমি অনেক পুরনো বই জমা করেছিলাম। যেগুলো তখনি ছিল বিরল বই। আর এ সময়ে তো এটা আকাশ ছোঁয়ার মতো।

— ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কি?

: দেখুন! আমি মুসলমান। এটাই আমার সবচেয়ে বড় পরিচয়। ইসলাম ও আলেম সমাজের পরামর্শ ছাড়া আমার কাজের স্পিড বাড়ে না। পটিয়ার মুফতি আযিযুল হক আমার কাজের প্রেরণা। আমি তাঁকে নিয়ে লিখেছি। সেই হাজী ইউনুস-এর হাতে প্রকাশিত আত-তাওহীদ পত্রিকাতে আমি নিয়মিত লিখেছি। ইসলামী লেখায় আমি অজানা এক আনন্দের তৃপ্তি খুঁজে পাই। খুঁজে পাই অপূর্ব ভাবাবেগ।

হানাদারদের শ্যেনদৃষ্টি

গোয়েন্দার মাধ্যমে খবর হয়তো পেয়ে গেছেন মেজর জিয়াউর রহমান। তাই আর পটিয়া মাদরাসায় নয় এবার অন্যত্র ছুটে যাবার পালা। পটিয়ার স্কুলসংলগ্ন মাঠে হানাদারদের বোম্বিংয়ে বিরাট আকৃতির তরমুজ একটাও আর রইল না। তারা প্রতিটি তরমুজকে একজন একজন মুক্তিযোদ্ধা মনে করে বোমা ফেলেছে। ফলে বিনষ্ট হয়েছে আল্লাহর দান প্রকৃতির অপূর্ব সবুজ বাগান। মেজর জিয়ার চলে যাওয়া তো মাদরাসা রক্ষার সার্টিফিকেট নয়। দালাল দস্যুরা তো আর এ সংবাদটি দেয়নি যে, এখন আর মুক্তিযোদ্ধারা পটিয়া মাদরাসায় নেই। সুতরাং আর বোমা ফেলার দরকার নেই। কিন্তু এ সংবাদ পৌঁছলে কি আর মানবে তারা। এখানে আবারো ফিরে আসতে পারে জিয়ার বাহিনী। তাই আক্রমণের মূল টার্গেট এখন পটিয়া মাদরাসা।

শুরু হলো বোম্বিং

পটিয়াতে আর মেজর জিয়া নেই। নেই মুক্তিযোদ্ধাদের আনন্দ কোলাহল, সাড়াশব্দ। তারা চলে গেছেন নিরাপদ আশ্রয়ে। ওদিকে জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া এতিমের মতো নিজের জায়গায় ঠাঁয় দাঁড়িয়ে আছে। কোনো টেনশন নেই। মনভরা ভাব নেই। সে তার মতোই আজকের ইতিহাস দেখছে। কারণ শত বছর পরে তাকে সাক্ষী দিতে হবে। তখন তো মিথ্যে প্রলাপ বকলে চলবে না। সুতরাং তখন আর ঘুমানোর সময় নেই। চোখ খুলে রেখে পর্যবেক্ষণ করতে হচ্ছে প্রতিটি মুহূর্ত। শুরু হলো জামিয়ার ওপর জঙ্গি বিমানের আক্রমণ। মুক্তিযোদ্ধা হেফাজতের শাস্তি দিচ্ছে পাকিস্তানিরা। বোম্বিংয়ে সমগ্র জামিয়া থরথর করে কেঁপে উঠল। ভেঙে পড়তে লাগলো বিল্ডিং থেকে ইটের পর ইট। ভেতরে অবস্থানরত ওলামায়ে কেরাম ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে বসে রইল। কারণ এখান থেকে আর পালাবারও সুযোগ নেই। জামিয়ার পুকুর পাড় ঘেঁষে অসাধারণ সুরম্য একটি প্রাসাদ। বিমানের উপর্যুপরি আক্রমণে প্রাসাদটি একদম মাটির সঙ্গে মিশে গেল। ফলে ঘটে গেল কঠিনতম নারকীয় ঘটনা। প্রত্যক্ষদর্শী বান্দরবান নাইক্ষ্যংছড়ির বাসিন্দা মাওলানা ইয়াকুব জানান, "আমি তখন ছাত্র ছিলাম। বোম্বিংয়ের শব্দ শুনে পালাবার পথ খুঁজছি। আসলে বিপদের সময় যে পথ খুঁজে পাওয়া যায় না ওই মুহূর্তটা এর বাস্তব প্রমাণ। আমি কোনো পথ খুঁজে পাচ্ছি না। মুহূর্তের মধ্যেই আমার পাশ ঘেঁষে নাজিল হলো হানাদারি বোমা। বোমার স্প্লিার এসে আমার গায়ে পড়ল। চোখের সামনেই দেখলাম পুকুর পাড়ের বিল্ডিংটা ধসে পড়ছে। ভেসে আসছে মানুষের আর্তনাদ। বাঁচাও! বাঁচাও! কিন্তু তখন কে কাকে বাঁচাবে। কে কার উপকারে এগিয়ে যাবে। যে মাটিতে আঘাত পড়ছে সেখানকার মাটি উলটপালট হয়ে যাচ্ছে। এর ভেতরে আল্লাহর অনেক সাহায্যও দেখলাম। কত বোমা শুধু এমনিতেই পড়ে আছে। ফাটেনি। অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা মনে করেন সবগুলো বোমা ফাটলে মাদরাসাটি আর খুঁজে পাওয়া যেত না।"

আল্লামা দানেশ-এর শাহাদত

জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়ার জনপ্রিয় শিক্ষক আল্লামা দানেশ। তাঁকে জ্ঞানের রাজী বলা হতো। পটিয়ার বিশাল দরস গায় (পাঠ দান কক্ষে) তাঁর জ্ঞানগর্ব আলোচনা শুনতে

প্রতি বছরই দেশ-বিদেশের ছাত্ররা জমা হতো। পটিয়ায় মুফতি আযিুল হক যে অসামান্য মির্মম প্রতিভার চাষ করে গেছেন তা আজও পটিয়ার ত্রাণকর্তারা ধরে রেখেছেন। আল্লামা দানেশ এমন একজন বিদগ্ধ ব্যক্তি ছিলেন যার জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখা-প্রশাখায় ছিল অবাধ বিচরণ। আধুনিক কাব্যচর্চায় তাঁর যে নিরন্তর সাধনা ছিল তা আজও শিষ্যরা অনায়াসে স্বীকার করেন। এখনো পটিয়ার হাজী ইউনুস হলে তাঁর লিখিত পঙ্‌ক্তিমালা খচিত রয়েছে। সেই মূল্যবান মানুষটি মুক্তিযুদ্ধের এ পরম দিনে দস্যু হানাদারদের আঘাতে একজন জ্যান্ত হাদিসব্যাখ্যাতা ও সময়ের প্রাণবন্ত মুহাদ্দিসকে আমরা হারিয়েছি। হারিয়েছি সাজানো ছন্দের জীবন্ত প্রদীপকে। চট্টগ্রামে বর্তমান লোহাগাড়া থানার চরম্বায় তাঁর জন্মস্থান।

কারী জেবুল হাসানের মেহমানের শাহাদত

আল্লাহওয়ালাদের কাছে খোদাভীতুরাই ছুটে আসেন। কারী মাওলানা জেবুল হাসানও থাকতেন পুকুর পাড়ের বিল্ডিং-এ। জেবুল হাসান স্পষ্ট কোরআন পাঠক হিসেবে সুনাম অর্জন করেছিলেন। তাঁর খ্যাতি ছিল সারা চাটগাঁয়। মুক্তিযুদ্ধের এ কঠিন দিনেই কারী জেবুল হাসানের সঙ্গে সাক্ষাত করার জন্য একজন ভক্ত-মুহিব্বীন ছুটে এসেছিলেন। তখনই শুরু হয়েছিল হানাদারদের আক্রমণ। বোমার আঘাতেই কারী জেবুল হাসানের সঙ্গী আল্লাহর এ মেহমান প্রাণ হারান। তিনি পুকুরপাড় বিল্ডিংয়েই শাহাদত লাভ করেন। একটু পানিও তাঁর মুখে তুলে দেয়া যায়নি।

তাছাড়া আহত হয়েছেন আরো কতজন তার শেষ নেই। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ তো অনেক। স্বাধীনতার পরে যে এজন্য কোনো সহযোগিতার হাত প্রসারিত হয়েছে তাও নয়। বরং পরবর্তী সরকার মাদরাসা বন্ধের পাঁয়তারা করেছে।

আহা! পাণ্ডুলিপিগুলো পুড়ে ছাই হয়ে গেল!

মানুষের একটি জীবন থাকে লেখার। শুধু লেখে লেখে জমাবার একটি সময় অতিবাহিত হয়। আল্লামা হারুন ইসলামাবাদী তখন তারুণ্য পেরিয়ে ভরা যৌবনে। মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী প্রতিষ্ঠিত 'এদারাতুল মাআরিফ'-এ সময় কাটাচ্ছিলেন জনাব ইসলামাবাদী। এক সময় প্রখ্যাত আলেম ও রাজনীতিক মাওলানা আতহার আলী প্রতিষ্ঠিত দৈনিক পাঁচবানেরও সহকারী সম্পাদক ছিলেন। ফলে তার লেখালেখির স্বর্ণযুগ অতিবাহিত হচ্ছিল। লেখে লেখে জমা করছিলেন অসংখ্য পাণ্ডুলিপি। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের বিপদসংকুল মুহূর্তে একদল দস্যুর লেলিয়ে দেয়া আগুনে পুড়ে যায় 'এদারাতুল মাআরিফ'। হারিয়ে যায় আল্লামা ইসলামাবাদীর অসংখ্য পাণ্ডুলিপি। জীবনের অমূল্য সম্পদগুলো হারিয়ে তিনি নির্বিকার হয়ে যান। বঞ্চিত হয় পৃথিবীর মানুষ।

অতন্দ্র প্রহরী

জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া ছেড়ে সবাই চলে গেছে। শিক্ষকও নেই, ছাত্রও নেই। এ দুর্দিনে কে মাদরাসার তদারকি করবে? আল্লামা হারুন ইসলামাবাদী ঢাকা থেকে ফিরে এসে মাদরাসা পাহারার দায়িত্ব নিলেন। কোথায় কি ঘটছে, কোথায় কি হচ্ছে কোনো দিকে কর্ণপাত না করে তিনি মাদরাসা রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বেই মশগুল ছিলেন।

মুক্তিযোদ্ধা মাওলানা শরীফ

মাওলানা শরীফও পটিয়া মাদরাসার শিক্ষক। পটিয়ার ঈশ্বরখাইন তাঁর বাড়ি। মুক্তিযুদ্ধকালীন একটি ঘটনা। একদিন এলাকার অনেক লোকজনকে একত্রিত করে হানাদাররা ফায়ার করে মেরে ফেলার জন্য লাইন ধরিয়েছে। মাওলানা শরীফ ভালো উর্দু ও ফার্সি জানেন। তিনি তাদের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করলেন। হানাদাররা বুঝাতে চাইল মুক্তিযোদ্ধারা থাকলে তো দেশের ক্ষতি। কিন্তু মাওলানা শরীফ অত্যন্ত অভয় দিয়ে বলেছেন, আরে তারা তো মুক্তিযোদ্ধা নয়। তাদের আপনি হত্যা করবেন কেন? মাওলানা শরীফের কৌশলী প্রচেষ্টায় সেদিন অনেক মুক্তিযোদ্ধা বেঁচে গিয়েছিলেন। তারা আজও মুক্তিযোদ্ধা মাওলানা শরীফকে খুব শ্রদ্ধা করে।

মাওলানা সিদ্দিকুল্লাহ বললেন...

এককালের পটিয়ার খ্যাতনামা ছাত্র ও পরবর্তী সময়ের বিখ্যাত হাদিস ব্যাখ্যাতা মাওলানা সিদ্দিকুল্লাহ। তাঁর বিতর্কের জ্ঞান দেশ বিখ্যাত। কোরআন ও হাদিস মন্থন করে ঘুরে ফেরা যার প্রধান কাজ। একজন খ্যাতিমান কলম সৈনিক হিসেবেও যার জুড়ি নেই। জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়ার ছাত্রদের মুখে মুখে যার সুনাম।

১৯৭১-এ নোয়াখালীর মাদরাসা, স্কুল-কলেজের ছাত্ররা হাজির হয়েছে। তরুণরা চোখভরা বিস্ময় নিয়ে জানতে চাইল, এটা তো দুই মুসলিম দেশের যুদ্ধ, আমরা মুসলমান, তারাও মুসলমান– এ মুহূর্তে আমাদের করণীয় কি? মাওলানা সিদ্দিকুল্লাহ তরুণদের প্রশ্নের বানে ভেসে না গিয়ে সরাসরি জানিয়ে দিলেন, উভয় পক্ষ মুসলমান হলেও এখন চলছে জালেমের বিরুদ্ধে মজলুমের লড়াই। সুতরাং মজলুমের বাঁচার অধিকার নিশ্চয়ই আছে।

সেদিন মাওলানা সিদ্দিকুল্লাহ তরুণদের সময়োচিত জবাব দিয়ে প্রশংসিত হয়েছেন, হয়েছেন নন্দিত। তাই আজকে আমরাও তাঁকে সম্মানের সঙ্গে স্মরণ করছি। আমরা মাওলানা সিদ্দিকুল্লাহর সঙ্গে সরাসরি কথা বলেছি। তাঁর কথা ও চিন্তা-চেতনার মধ্যে বৈপ্লবিক সাড়া পাওয়া যায়। উচিত কথা বলতে কখনো তিনি পিছপা হন না।

মুফতি মুজাফফর আহমদের সাফ কথা

পটিয়ার বর্তমান সিনিয়র শিক্ষক মুফতি মুজাফফর আহমদের সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কথা হয়। কথা হয় মুক্তিযুদ্ধে পটিয়া মাদরাসায় মেজর জিয়ার আগমন নিয়ে। প্রবীণ শিক্ষক মুফতি মুজাফফর আহমদ জানান, "হ্যাঁ, মেজর জিয়াউর রহমান কালুরঘাটের বেতারযন্ত্রাদী নিয়ে ছুটে এসেছিলেন পটিয়া মাদরাসায়। আসলে তখন কোথায় কি হচ্ছে সব খুঁজে দেখাও কষ্টকর ছিল। তবে একথা সত্য যে, মেজর জিয়া বেতারযন্ত্রাদী ও মুক্তিযোদ্ধাদের মাদরাসায় জায়গা দেয়ার কারণেই পাকিস্তানিরা মাদরাসায় আক্রমণ করতে দ্বিধা করেনি।"

ইতিহাস কথা বলে

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা বেলাল মোহাম্মদ এ বিষয়ে তাঁর 'স্বাধীনতা বাংলা বেতার কেন্দ্র' গ্রন্থে লিখেছেন–

"৩১ মার্চ সকালে আমরা সম্মিলিত হয়েছিলাম ট্রান্সমিটার ভবনে। বৈদ্যুতিক চ্যানেলগুলো সব ছিন্নভিন্ন। বিশেষ করে 'মাস্ট'-এর চারধারে ওয়্যারিং সম্পূর্ণ বিকল। হারুন-অর-রশীদ খানসহ আমি নিকটবর্তী ওয়াপদা সাব-স্টেশনে গিয়েছিলাম। চেষ্টা চালানো হয়েছিল আপ্রাণ। কিন্তু বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা করা যায় নি। মেরামতের কাজ বেশ কালক্ষয়ী। এদিকে হানাদার বাহিনী চট্টগ্রাম শহরে এসে গিয়েছিল। কালুরঘাট এলাকার পতনও অত্যাসন্ন।

১ কিলোওয়াট ট্রান্সমিটার ডিসমেন্টাল করার দায়িত্ব নিয়েছিলেন হারুন-অর-রশীদ খান। ঘরটি তালা দেয়া ছিল। ট্রান্সমিটার বের করার জন্যে দরজার চৌকাঠ এবং সংলগ্ন দেয়াল ভাঙতে হয়েছিল। কাজটি ছিল দারুণ ঝুঁকিপূর্ণ। পর্যাপ্ত কারিগরি জ্ঞান ছাড়া এ ছিল এক দুঃসাহসিক কাজ। বেতারের লেখক ছিলেন মাত্র দু'জন। টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট আমিনুর রহমান ও মিক্যানিক আবদুশ শুকুর। আর ছিলেন মোহরা গ্রামের আবু তাহের চৌধুরী। তাঁরা দ্রুত হাতে তার কেটে নিয়ে ট্রান্সমিটারটি ডিসমেন্টাল করেছিলেন। হাতের কাছে পাওয়া সুতো জড়িয়ে দিয়েছিলেন কর্তিত তারের অগ্রভাগে। পরে ইনস্টল করার সময় যেন সংযোগ-স্থানটি চিনে নেয়া যায়।

ব্যাংকার সৈয়দুর রহমান ট্রাক নিয়ে কাপ্তাই থেকে এসেছিলেন। সেই ট্রাক ভর্তি ছিল ভাত-তরকারি, সৈনিক ও বেতার কর্মীদের জন্যে। ট্রাকে তুলে দেয়া হয়েছিল ১ কিলো ওয়াট ট্রান্সমিটারটি। মোহরা সংগ্রাম পরিষদ অফিসে সেকান্দার হায়াত খানের সঙ্গে অবস্থানরত ছিলাম আমরা।

১ কিলোওয়াট ট্রান্সমিটারটি ট্রাকের ওপর ইনস্টল করে চালু করতে হলে বিদ্যুৎ সরবরাহ দরকার। মোবাইল অবস্থায় তা কি করে সম্ভব? তাহলে আরেকটা ট্রাকের ওপর একটা জেনারেটর বয়ে বেড়ানো সম্ভব কিনা। হ্যাঁ, কক্সবাজার ওয়াপদা অফিস থেকে একটা



পটিয়া মাদরাসার মেহমানখানা। এখানেই একাত্তরে জিয়াউর রহমান স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের যন্ত্রাদি নিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন

জেনারেটর নিয়ে আসা যেতে পারে ট্রাকসহ। অনুরূপভাবে ট্রান্সমিটার চালু করার প্রাথমিক স্থান নির্বাচন করা হয়েছিল পটিয়া। সেই মর্মে ট্রান্সমিটারবাহী ট্রাকটি যাত্রা করেছিল পটিয়ার উদ্দেশে। আমরাও যাত্রা করেছিলাম একটি মাইক্রোবাসে। আমরা ৯ জন– সৈয়দ আবদুশ শাকের, মুস্তফা আনোয়ার, শারফুজ্জামান, আমিনুর রহমান, রাশেদুল হোসেন, আবদুশ শুকুর, আবদুল্লাহ্-আল-ফারুক, কাজী হাবিবউদ্দীন আহমদ ও আমি। আমাদের দু'জন সহকর্মী আবুল কাসেম সন্দ্বীপ ও রেজাউল করিম চৌধুরী বোমাবর্ষণের পর বিচ্ছিন্ন হয়েছিলেন। মাইক্রোবাসটি লিভার ব্রাদার্সের। ড্রাইভার এনামুল হক। পটিয়ায় আমাদের সহযাত্রী হয়েছিলেন সেকান্দর হায়াত খান।

পটিয়া মাদরাসার একটি কক্ষে রাখা হয়েছিল ট্রান্সমিটারটি।

... পটিয়া মাদরাসায় রাখা ১ কিলোওয়াট ট্রান্সমিটারটি দেখতে গিয়ে লক্ষ্য করা গিয়েছিল, তাড়াহুড়োর মধ্যে কিছু খুচরো অংশ আনা হয়নি। কালুরঘাটে পাঠানো হয়েছিলো রাশেদুল হোসেন ও শারফুজ্জামানকে। তাঁরা খুচরো অংশ এবং এনটিনা, ক্রিস্টাল নিয়ে ফিরেছিলেন দিনে দিনে।

... পরে ১৭ এপ্রিল পটিয়া মাদরাসায় অর্থাৎ যেখানে আমরা দু'দিন ১-কিলোওয়াট ট্রান্সমিটার নিয়ে অবস্থান করেছিলাম, সেখানে বোমা ফেলে পাকিস্তানিরা...।"

–পৃষ্ঠা : ৫৪, ৫৫ ও ১০২



মুক্তিযুদ্ধে শহীদ আল্লামা দানেশ

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে আল্লামা দানেশ-এর শাহাদত একটি স্মরণীয় দিন। জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়ায় যখন হানাদারেরা বোমা ফেলে তখন একটি মর্মন্তুদ সময় কাটছিল বাঙালি জাতির জন্য। কেউ আত্মীয়ের বাড়িতে যেতে পারত না। কেউ পরিবারের কোনো খোঁজ নিতে পারত না। কেউ কাউকে বন্ধুও মনে করতে পারতো না। গাড়ি করে দূরে কোথাও ছুটে যাওয়া ছিল কষ্টকর ব্যাপার। এক সময় গাড়ি চলাচল বন্ধই হয়ে যায়। আল্লামা দানেশ-এর মূল বাড়ি চট্টগ্রাম লোহাগাড়া থানা চরম্বায় অবস্থিত। মুক্তিযুদ্ধের ভীষণ কষ্টকর দিনেও কিভাবে তার মরদেহ পটিয়া থেকে লোহাগাড়ায় নিয়ে আসে তা একটি রহস্যই থেকে যায়। এ রহস্য বের করতেই বান্দরবান ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্রের দুই তরুণ শিক্ষক মাসউদুল কাদির ও মাহফুজকে নিয়ে ছুটে যাই লোহাগাড়ায়। আল্লামা দানেশ-এর বড় ছেলে মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম চরম্বা সিদ্দিকিয়া মদীনাতুল উলুম মাদরাসার প্রিন্সিপ্যাল। তার সঙ্গে দেখা করলাম। আমাদের পেয়ে তিনি খুব উদ্দীপনা নিয়ে আলোচনা শুরু করলেন। ধীরে ধীরে আল্লামা দানেশ-এর পুরো জীবনের একটি ফিরিস্তির সন্ধান পেলাম।

আল্লামা দানেশ ১৯০৭ সালের দিকে চট্টগ্রামের তৎকালীন সাতকানিয়া বর্তমান লোহাগাড়া থানার চরম্বায় জন্মলাভ করেন। বাল্যকালে তিনি লোহাগাড়ায় পদুয়ার মাওলানা জান-এ এলাহী সওদাগরের কাছে প্রাথমিক লেখাপড়া সম্পন্ন করেন। তারপর তিনি রাঙ্গুনিয়া খণ্ডলিয়াপাড়া মাদরাসায় ৭ম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা করেন। এরপর ছুটে আসেন আল জামিয়াতুল ইসলামিয়া জিরি। তিনি জিরিতে হেদায়া–দাওরা হাদিস পর্যন্ত পড়াশুনা করেন। তারপর উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য ছুটে যান দারুল উলুম দেওবন্দ। দারুল উলুম দেওবন্দ থেকে ফিরে এসে হাটহাজারির বিশিষ্ট মুহাদ্দিস মাওলানা ইয়াকুব এর পরামর্শে মিয়ানমারের আকিয়াবের পাথর কিল্লা মাদরাসায় কর্মজীবন শুরু করেন। সেখানে তিনি অতি সম্মানের সঙ্গে ৫টি বছর কাটান। সেখান থেকে বাংলাদেশে এসে চাটগাঁর সাতকানিয়া আলিয়া মাদরাসায় ১৬/১৭ বছর পড়ান। তখন জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা মুফতি আযিযুল হক বারবার তাকে পটিয়ায় যোগদানের জন্য উৎসাহ দিচ্ছিলেন। যেহেতু মুফতি সাহেব ছিলেন তার শিক্ষক তাই তার কথা না রাখাটা ছিল কষ্টকর। তারপরও তিনি যাচ্ছিলেন না। পরে একদিন সরাসরি মুফতি আযিযুল হক সাতকানিয়ায় এসে বললেন, তুমি আমার ছাত্র হয়ে আমার মৃত্যুর সময় আমার কাছে থাকবে না। এটা কোনো কথা হলো? পীড়াপীড়ির পর আল্লামা দানেশ একান্ত বাধ্য হয়ে শুধু তার প্রিয়তম শিক্ষক মুফতি আযিযুল হককে সন্তুষ্ট করার জন্য জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়ায় এসে অধ্যাপনায় যোগ দিলেন। ক'বছর চলল তার শিক্ষকতা জীবন। তারপর শুরু হলো মুক্তিযুদ্ধের সরগরম অবস্থা। তখন তো আর

কোনো প্রতিষ্ঠান খোলা ছিল না। জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়াও ছুটি ছিল। জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়ার প্রিন্সিপ্যাল হাজী ইউনুস তখন হজের উদ্দেশ্যে মক্কা গমন করেছেন। একে একে মাদরাসা একেবারে খালি হয়ে গেল। ওদিকে সবার মতো আল্লামা দানেশও তার নিজ বাড়িতে চলে এলেন। এছাড়া আর কোনো গত্যন্তর ছিল না।

স্বপ্নে পটিয়ার প্রতিষ্ঠাতা মুফতি আযিযুল হক-এর সাক্ষাৎ পেলেন। মুফতি আযিযুল হক খুব ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তাকে বললেন, সবাই মাদরাসা ছেড়ে চলে গেল। শেষ পর্যন্ত তুমিও মাদরাসা ছাড়লে। কে রক্ষা করবে আমার প্রতিষ্ঠিত এ হেরার বাগান!

স্বপ্ন দেখে আল্লামা দানেশ তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠে গেলেন। মুক্তিযুদ্ধের এ কঠিন দিনে পটিয়া অভিমুখে পায়ে হেঁটে ছুটে গেলেন। কারণ গাড়ির ব্যবস্থা অসম্ভব ছিল। ১৯৭১-এর এপ্রিলে পটিয়ায় আক্রমণ শুরু হলে তিনি তখন মাদরাসায় অবস্থান করছিলেন। হানাদারদের বোমার আঘাতে মারাত্মকভাবে আহত হন। এরপর শাহাদতের কোলে ঢলে পড়েন। আশ্চর্যের বিষয় হলো, সারাদেশে এমন জটিল সমস্যা চলছে, তারপরও কিন্তু তার কবর লোহাগাড়ার চরম্বাতে। কিভাবে তার ছেলে-মেয়েরা সংবাদ পেল, কিভাবে মরদেহ পটিয়া থেকে লোহাগাড়ায় নিয়ে এলো। এটি আরেক ইতিহাস।

আল্লামা দানেশ-এর বড় ছেলে মাওলানা কাসেম সে ঘটনার বর্ণনা দেন এভাবে–

সেদিন ছিল শুক্রবার সাড়ে ১১টা। লোহাগাড়ার রাজঘাটা মাদরাসার প্রিন্সিপ্যাল মাওলানা আবদুল গণি'র মাধ্যমে পটিয়ার দুর্ঘটনার খবর এবং আমার বাবার শাহাদতের সংবাদ পেলাম। তখন আর আমরা ঠিক থাকতে পারিনি। তখন যে মুক্তিযুদ্ধ চলছে তাও ভুলে গেছি। আমরা দশবারোজন মিলে একটি দল তৈরি হয়ে পায়ে হেঁটে পটিয়ায় রওয়ানা হলাম। সঙ্গে এলাকার চেয়ারম্যান বদিউল আলমও ছিলেন। খাটিয়ায় করে লোহাগাড়ায় নিয়ে আসি বাবার মরদেহ। মুক্তিযুদ্ধের বিপদসংকুল সময়েও তাঁর জানাজা পড়তে হাজার হাজার মানুষ ভিড় জমায়। যা আমাদের মনে শান্তির পরশ বুলিয়ে দেয়। জানাজা হয়ে গেলে চরম্বা মাদরাসার পাশেই আমরা তার দাফনের ব্যবস্থা করি।

কবর দেয়ার পর থেকে তার কবরকে কেন্দ্র করে অনেক অলৌকিক ঘটনার সৃষ্টি হয়েছে। বিজ্ঞ মহল তার কবরের এ ঘটনায় বলেছেন এটি আল্লামা দানেশ যে পবিত্র একজন মানুষ ছিলেন তারই প্রোজ্জ্বল প্রমাণ।

আল্লামা দানেশ-এর আধ্যাত্মিক সম্পর্ক ছিল নানুপুরের মরহুম পীর মাওলানা জমির উদ্দিন-এর সঙ্গে। তারপর সম্পর্ক গড়েন মুফতি আযিযুল হক-এর সঙ্গে। তার ইন্তেকালের পর তিনি হাজী মুহাম্মদ ইউনুস-এর সঙ্গে আধ্যাত্মিক সম্পর্ক গড়তে গেলে তিনি বলেন, "তুমি তো কামেল লোক। আমার কাছে মুরিদ হতে হবে না।" পরবর্তীতে আধ্যাত্মিক সম্পর্ক অটুট হলে মক্কার হেরেমে বসে হাজী ইউনুস তাঁকে খেলাফত প্রদান করেন।

মুক্তিযুদ্ধের সময় হানাদারদের আক্রমণে আল্লামা দানেশ-এর শাহাদতের কথা শুনে শায়েখ হাজী ইউনুস মন্তব্য করলেন, দানেশ-এর ইন্তেকালে মাদরাসার চার ভাগের তিন ভাগই যেন চলে গেছে!



মাওলানা নোমান আক্ষেপ করে বললেন, আমরা যে আশা করে দেশটা স্বাধীন করেছি তা কিন্তু আজও অপূর্ণই রয়ে গেছে

চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া থানার অন্তর্গত আলমদারপাড়ায় পড়ে আছেন মুক্তিযুদ্ধের প্রাণবন্ত সহযোগী মাওলানা নোমান। নাম শোনার পর থেকেই মন অস্থির হয়ে আছে তাঁর দেখা পাওয়ার জন্য। বান্দরবান ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্রের তরুণ শিক্ষক মাসউদুল কাদিরকে নিয়ে ছুটে যাব আলমদারপাড়ায়, মনস্থির করলাম। পটিয়া মাদরাসায় জুমা আদায় করে আর কালবিলম্ব না করে ছুটছি আলমদারপাড়ার দিকে। আমাদের তৃতীয় ও চতুর্থ নম্বর সঙ্গী হলো কবি আবরার সিদ্দিক ও মাহমুদ বিন মুজাফফর। আমরা তার বাড়ি চিনি না। সেখানকার পথঘাটও অচেনা, অদেখা। আকাশ কালো হয়ে ঝরঝর ভাব। রাস্তার অবস্থা দেখে মনে হয় না এখানে কখনো কোনো স্থানীয় প্রতিনিধি ছিল। বুড়ো নয় আমাদের মতো তরুণদেরই কোমরের হাড় ভাঙার জোগাড়। গাড়ি থেকে নেমে দেখি আমাদের আরো এক সদস্য বেড়ে গেল। সেও আলমদারপাড়াতেই যাচ্ছে। তাকে পেয়ে কিছুটা আশান্বিত হলাম। কারণ এ এলাকাতে সে অনেকটা পুরনো। তবে খানিকক্ষণ পরে সে আমাদের আশাহত করে জানাল, মাওলানা নোমানকে সেও চেনে না। খানিকটা হেঁটেই নজরে পড়ল আলমদারপাড়া ছাটারা মসজিদ। পাশেই একটি নোমানিয়া স্কুল। পূর্ব দিকে চোখ ফেরাতে লক্ষ করলাম নোমানিয়া ফোরকানিয়া মাদরাসা। অবাক হলাম। মনে মনে ভাবলাম আমাদের উদ্দিষ্ট নোমানের নামে এসব প্রতিষ্ঠান না তো? ভাবনাটা রয়েই গেল। যে ছেলেটার সঙ্গে দেখা হয়েছিল সে একজন বৃদ্ধ লোককে মাওলানা নোমান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে। পরে জানলাম ছেলেটি তার বাড়িতেই যাচ্ছে। তবে তার নাম জানে না। বৃদ্ধ লোকটি একগাল হেসে বলল, ওহ্হো, আমিই তো মাওলানা নোমান। আমরা সবাই চমকে গেলাম। আলেম মুক্তিযোদ্ধার খোঁজে বেরিয়েছি শুনে তিনি যারপরনাই খুশি হলেন। আবেগাপ্লুত হলেন। শুধু বললেন, বহুদিন পর মনের মতো লোক খুঁজে পেয়েছি।

আসরের নামাজ পরেই আমরা তাঁকে ঘিরে ধরলাম। তিনি বাঙালি জাতির গর্ব মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত। অসংখ্য মুক্তিযোদ্ধাকে তিনি আশ্রয় দিয়েছেন। মুক্তিসেনার পরিবারের খরচ বহন, মুক্তিসেনাদের সহযোগিতা করার জন্য তিনি মানুষের কাছ থেকে চাঁদা পর্যন্ত তুলেছেন।

পৃথিবীর পাঠশালায়

মাওলানা নোমান ১৯৩৭ সালের কোনো এক সময়ে চট্টগ্রামের পটিয়া থানার ভাটিখাইন, আলমদারপাড়ার ছাটারায় জন্মগ্রহণ করেন। পাইকপাড়া প্রাইমারি স্কুলে চতুর্থ শ্রেণী

এবং পটিয়া রাহাত আলী হাইস্কুলে ৫ম-ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা করেন। তারপর ছুটে যান জামিয়া ইসলামিয়া জিরি। সেখানে দীর্ঘ আট বছর পড়াশোনা করেন। তারপর মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী মাদরাসায় কয়েক বছর অধ্যয়ন করেন। এরপর তার মনে বাসনা জেগে বসে উপমহাদেশের বিখ্যাত বিদ্যাপীঠ দারুল উলুম দেওবন্দে যাবেন। বসবেন শাইখুল ইসলাম মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী-এর দরসে। ভাবনানুযায়ী ছুটে যান দারুল উলুম দেওবন্দ। দু' বছর দেওবন্দে পড়ালেখা করে হাদিসে উচ্চতর ডিগ্রি দাওরা পাস করে দেশে ফেরেই চাটগাঁর বাঁশখালীর পুকুরিয়া মুখলিসিয়া এমদাদিয়া মাদরাসায় ৩ বছর শিক্ষকতা করেন। তারপর ছুটে যান ঢাকার আশরাফুল উলুম বড় কাটারা মাদরাসা। ৩ বছর কাটিয়ে তিনি নিজেই মাদরাসা গড়ার নতুন স্বপ্ন দেখেন। ঢাকার খিলগাঁওয়ে জামিয়া মাদানিয়া নামে একটি মিশন শুরু করেন। সেখানেও তিনি স্থায়ী হতে পারলেন না। কারণ তার শিক্ষক সালেহ আহমদ তাকে ডেকে আনেন চট্টগ্রামের মিয়া খাঁ নগর (কালামিয়া বাজার) মোজাহেরুল উলুম মাদরাসায়। তখন পুরো মাদরাসার দায়িত্বই তাকে পালন করতে হয়েছে। এ সময়টি ছিল স্বাধীনতা যুদ্ধের পাঁচ বছর আগে। পাঁচ বছর তিনি ভালোভাবেই কাটালেন। কিন্তু যখন স্বাধীনতা শুরুই হয়ে গেল তখন তিনি বাড়িতে ফিরে মুক্তিসেনাদের সহযোগিতায় ঝাঁপিয়ে পড়েন। স্বাধীনতাবিরোধীদের অনেক চাপে পড়তে হয়েছে তাকে। স্বাধীনতার পর আবার তিনি পুকুরিয়া মাদরাসায় যান। সেখানে ৩ বছর কাটিয়ে তার এলাকা ছাটারায় ফিরতে বাধ্য হন। কারণ তখন তার বড় ভাই মুসলেহ উদ্দীন ইন্তেকাল করেছেন। ২০০০ সালের দিকে বান্দরবান ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্রের পরিচালক হোসাইন মোহাম্মদ ইউনুসের পীড়াপীড়ির কারণে তার কেন্দ্রে দু'বছর শিক্ষকতা করেছেন। পিতা আঃ করীম তাকে খুবই ভালোবাসতেন। তাই তার নামে নোমানিয়া স্কুল, ফোরকানিয়া মাদরাসা গড়েছেন। ২ ভাই ও ১ বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন সবার প্রিয়। বর্তমানে তিনি ৬ ছেলে, মেয়ে, ১৬ নাতি-নাতনি এবং দু' স্ত্রীর মধ্যে জীবিত ১ স্ত্রী নিয়ে বেশ সুখেই দিন কাটাচ্ছেন।

বঙ্গবন্ধুর সান্নিধ্যে

১৯৭০ সালের নির্বাচনের আগে পাকিস্তানের মুফতি মাহমুদ, মাওলানা গোলাম গউস হাজারভী এবং পূর্ব পাকিস্তান থেকে মাওলানা শামছুদ্দীন কাসেমীসহ অনেকের সঙ্গে মাওলানা নোমানও শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান। বঙ্গবন্ধু উলামায়ে কেরামকে কাছে পেয়ে খুব খুশি হন। তিনি বলেন, আপনারাই সত্যিকার আলেম-উলামা। ইসলাম ও মানবজাতির রক্ষাকারী। মুফতি মাহমুদ বঙ্গবন্ধুর উদ্দেশ্যে বলেন, আমরা আপনাকে ইসলামের দাওয়াত দিতে এসেছি। আপনার সঙ্গে মিলেমিশে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে চাই। বঙ্গবন্ধু তখন বললেন, এখন আপাতত হচ্ছে না। তবে আপনারা সংসদে এলে ইসলাম সম্পর্কে যে কোনো বিষয়ে আমি দুর্বল থাকব।

বঙ্গবন্ধুর সমর্থন

মাওলানা নোমানের সঙ্গে আমাদের আলাপচারিতা আরো জমে উঠল। ছয় দফার আন্দোলনের কথা জানালেন। আন্দোলনের মুখে পড়ে আইয়ুব খান একটি গোলটেবিল

বৈঠকের আয়োজন করে। নবাবজাদা নসরুল্লাহ্ খানের সভাপতিত্বে বৈঠক শুরু হয়ে যায়। মুফতি মাহমুদ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ তৎকালীন বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতা-কর্মীরা উপস্থিত হন। নবাবজাদা নসরুল্লাহ সবার কাছে জানতে চান আপনাদের আন্দোলনের কারণ কি? আপনারা কি চান? মুফতি মাহমুদ তার বক্তব্যে বলেন, আমরা এদেশে ইসলামী হুকুমত দেখতে চাই। তখন নবাবজাদা বঙ্গবন্ধুর দিকে চেহারা ফিরিয়ে ইশারা করেন, "আপনিও কি তা মানতে রাজি আছেন? বাঙালি জাতির রাজমুকুট শেখ মুজিবুর রহমান মুফতি মাহমুদের বক্তব্যের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে সমর্থন জানিয়েছিলেন।

সফল ভবিষ্যদ্বাণী

মুফতি মাহমুদ বলতেন, "পাকিস্তান থেকে তোমাদের এ অঞ্চল শিগগিরই পৃথক হয়ে যাচ্ছে।" মাওলানা বলেন, তখন মুফতি সাহেবের এ ধরনের মন্তব্য অবিশ্বাস্য মনে হতো।

বিশ্বাসঘাতক জিন্নাহ

আওলাদে রাসুল মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী'র শিষ্যরা একটি পৃথক সুন্দর বাংলাদেশ কামনা করত। তারা কিছুতেই পাকিস্তানের অধীনে থাকাটা ভালো চোখে দেখেনি। এর অনেকগুলো মৌলিক কারণও ছিলো। মাওলানা শিব্বির আহমদ উসমানী ভারতকে দু'খণ্ড করে দেয়ার পক্ষে আন্দোলনে সময় ব্যয়ের মৌলিক উদ্দেশ্য ছিল সুন্দর একটি পৃথক ইসলামী দেশ পৃথিবীকে উপহার দেয়া। কিন্তু মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর চুতুরতার কাছে শিব্বির আহমদ ও তার দল পরাজিত হয়। শিব্বির আহমদ সে দিন বিস্মিত হয়ে বলেছিলেন, "আমার সঙ্গে আপনার কি ওয়াদা ছিল। আর করছেন কি?" জবাবে জিন্নাহ বললেন, "ইয়েতো মেরে পলিটিক্যাল ওয়াদা হ্যাঁ। অর্থাৎ এটি তো আমার রাজনৈতিক অঙ্গীকার ছিল।" অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণে শিব্বির আহমদ উসমানী জিন্নাহর কর্মকাণ্ড থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। এতে করে তৎকালীন উলামায়ে কেরামও তার ওপর চটে যান। তবে মাহমুদসহ অনেকেই শিব্বির আহমদ উসমানীর ইশারায় পৃথক একটি আন্দোলনের রূপ দান করে। সে আলোকেই মুফতি মাহমুদসহ অসংখ্য আলেম পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে এমনিতেই সোচ্চার ছিলেন।

বাপের বেটা মাহমুদ!

মাওলানা নোমান অনেকটা আবেগাপ্লুত হয়ে উঠলেন। তখন তারা কিন্তু উপমহাদেশের যে কোনো দেশে অনায়াসে ঘুরে আসতে পারতেন। মাওলানা নোমানও মুফতি মাহমুদ পরিচালিত আন্দোলনের অংশীদার ছিলেন। অর্থাৎ সুন্দর বিবাদমুক্ত এক বাংলাদেশ কামনা করতেন। আন্দোলন শুরু হলো। জড়িয়ে পড়লেন পাকিস্তানবিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে। মুফতি মাহমুদের বাড়ি পাকিস্তান হলেও তিনি পাকিস্তান সরকারের তাণ্ডবলীলার বিরুদ্ধে জ্বলন্ত অঙ্গারের মতো প্রজ্বলিত ছিলেন। তিনি সরকারের অনিয়মের বিরুদ্ধে ছিলেন সোচ্চার। তাই তিনি বাঙালি উলামায় কেরামে উদ্দেশ্যে বললেন, "আপনারা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কথা বলুন, দেশের মানুষকে মুক্তিযুদ্ধের জন্য উৎসাহিত করুন।

যে যাই বলুক ভাই

মুফতি মাহমুদের আহ্বানে সারাদেশে জায়গায় জায়গায় উলামায়ে কেরাম মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কথা বলতে শুরু করলেন। কেউ কেউ তাদেরকে ইসলামের দুশমন আখ্যায়িত করতে লাগল। কারণ পাকিস্তান তো মুসলিম দেশ। একটি মুসলিম দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া অন্য একজন মুসলমানের পক্ষে কিভাবে সম্ভব? একথা ভেবে স্বাধীনতার বিষয়ে অনেকেই চুপ ছিল। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের প্রবক্তারা কিন্তু ভড়কে যায়নি। কারো কথায় কানও দেয়নি। কারণ পাকিস্তান সরকার যে হারে নির্যাতন শুরু করেছিল তা মানবতাবাদী কোনো মানুষের পক্ষে বরদাশত করা সম্ভব ছিল না। বিশেষ করে মুফতি মাহমুদের পতাকায় জড়ো হওয়া উলামায়ে কেরাম অন্যের কথার ওপর তোয়াক্কা না করে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ করে যান। মাওলানা নোমানও এলাকায় অনেকটা সমালোচনার পাত্র হন। কারণ প্রথম দিকে মুক্তিযুদ্ধকে সবাই এতটা মেনে নিতে পারেনি। যখন পাকিস্তানি হানাদারদের নির্মম নির্যাতন বেড়েই চলেছে। বেড়ে চলেছে মানুষ নিধনের তাণ্ডবলীলা। তখন মুমিন মুসলমান ক্রমশ রুখে দাঁড়ায়। ফলে হানাদাররা মুখ থুবড়ে পড়ে। সে নিশানার দিকে সমগ্র বাঙালি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ হবার অনুরোধ জানিয়ে মাওলানা শামছুদ্দীন কাসেমী জনসম্মুখে রাজপথ কাঁপিয়ে পাকিস্তানের সমালোচনা করে এক জ্বালাময়ী বক্তব্য দেন। এটি মুফতি মাহমুদেরই পরামর্শ ছিল।

ফেরারী হয়ে

মাওলানা নোমান বলেন, তখন আমি ঢাকাতে। আমাদের অফিস ঢাকার ভিক্টোরিয়া পার্কে। পাশেই পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ছিল। এর মধ্যে শামছুদ্দীন কাসেমীর এ বক্তব্যে তাদের টনক নড়ে। তারা সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসে ভিক্টোরিয়া পার্কে। তখন থেকেই আমাদের পালিয়ে বেড়ানো শুরু। আর অফিসে ঘেঁষতে পারি নি। অবশেষে গ্রেফতার করা হলো শামছুদ্দীন কাসেমীকে। তারা একসঙ্গে তিন, চারটি পত্রিকা খুলে দেখালো মাওলানা কাসেমীর পাকিস্তানবিরোধী বক্তব্যের উপাখ্যান। একজন সেনা কমান্ডার তাকে লক্ষ করে বললেন, আপনি কি জানেন না দেশের (পাকিস্তানের) বিরুদ্ধে কথা বললে চৌদ্দ বছর জেল? মাওলানা কাসেমী বললেন, একটি মুসলিম দেশের কাজ হত্যা, সন্ত্রাস, লুট, ধর্ষণ নয়। অথচ আপনার আজকের এ দেশে হত্যা, সন্ত্রাস, লুট আর ধর্ষণ ছাড়া আর কিছুই করতে দেখছি না। এটি কি মুসলমানদের কাজ? মাওলানার কথায় সেনা কমান্ডার হতভম্ব হয়ে যান। তার কথার সত্যতা পেয়ে সেনা কমান্ডারের দরদ বেড়ে গেল। কাসেমী সাহেবের ধারণানুযায়ী লোকটি ছিল আল্লাহওয়ালা। ফলে তাকে আবার ফেরত দিয়ে যায়।

এ ধরনের আরো কত ঘটনা শুনালেন মাওলানা নোমান। ভালো উর্দু জানার কারণে তিনি অনেকবার পাকিস্তানি সেনাদের সঙ্গে বাকবিতণ্ডায় লিপ্ত হন। ফলে তাঁর এলাকায় তারা মারাত্মক কোনো ক্ষতি করতে পারেনি। তিনি অনেক হিন্দুসহ অসংখ্য

মুক্তিযোদ্ধাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব পালন করেছেন। প্রত্যন্ত এলাকায় ঘুরে ঘুরে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য রসদ জোগাড়ের ব্যবস্থা করেছেন। মুক্তিযোদ্ধা শামসুল আলমও তাঁর অনেক সহযোগিতা নেন। পটিয়ার মুক্তিযোদ্ধারা আপন সহযোগী মনে করত তাঁকে। কত মুক্তিযোদ্ধা তাঁর কাছে ঘুমিয়ে নিরাপদ রাত কাটিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই।

মুক্তিযুদ্ধ, হায়, বৃথা যায়, বৃথা যায়, বৃথা যায়

মাওলানা নোমানের কথা যেন আর শেষ হতে চায় না। কিভাবেইবা হবে। লাখো প্রাণের বিনিময়ে কেনা যে স্বাধীনতা তিনিও যে তার একজন প্রত্যক্ষ অংশীদার।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। আমাদের শহরে ফেরার তাড়া। তাঁকে বললাম, এবার তাহলে উঠি। বিদায়বেলা মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আপনার অনুভূতি শুনতে চাই।

মাওলানা নোমান আক্ষেপ করে বললেন, আমরা যে আশা করে দেশটা স্বাধীন করেছি তা কিন্তু আজও অপূর্ণই রয়ে গেছে।



হানাদারদের নির্যাতনের ক্ষতচিহ্ন এখনও বয়ে বেড়াচ্ছেন '৭১-এর দুঃসাহসিক মুক্তিযোদ্ধা ছাগলনাইয়ার মৌলভী মকছুদ আহমদ ভূঁইয়া

তাজুল ফাত্তাহর ডাকে ঘুম ভেঙে গেল। শিবলি ভাই, এই দীর্ঘ কাঁটাতারের বেড়া কেন? ওপারে পাহাড়, এ পাশে ফসলী জমি। তাকিয়ে দেখি ঝড়ের গতিতে গাড়ি চলছে। জানালার কাচ গলে এক টুকরো রোদ এসে লাফাচ্ছে আমাদের কোলের ওপর। জানালাম, ভারত, ত্রিপুরা রাজ্য ওটা। আবারো প্রশ্ন, ও! এসব এলাকায়ই কি তাহলে নিষ্ঠুর বিএসএফরা গুলি চালায় ক্ষেতের কৃষকদের বুক তাক করে? দেশ ভাগের সময় যারা অমন অকৃত্রিম বন্ধু সেজেছিল এখন তাদের এই দানবীয় রূপ কেন? এটাই কি তাদের আসল চেহারা?

ঢাকা থেকে কয়েক ঘণ্টার লং জার্নির পর গিয়ে নামি ফেনীর ফুলগাজী থানার নতুন মুন্সিরহাট বাজারে। গ্রাম্য বাজার। কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করে, লোকেশন জেনে নিয়ে হাজির হই নোয়াপুর বটতলা বাজারে, মুক্তিযোদ্ধা মৌলভী নূরুল আফসারের এলাকায়। দোকানপাট ও বাজারী লোকজনের সঙ্গে কথা বলে বুঝলাম, মুক্তিযোদ্ধা মৌলভী নূরুল আফসার এলাকায় তার বেশ পয়পরিচিত ও সুখ্যাতি রয়েছে। পরে এক দোকানি আমাদেরকে তাঁর বড় ছেলে নূরুল আমিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়ে দেন। আমরা কথা বলি ও তার অকৃত্রিম আতিথেয়তা গ্রহণ করে বাড়ি যাই। জানতে পারি তার বাবা মুক্তিযোদ্ধা মৌলভী নূরুল আফসার বাড়ি নেই। তাবলীগে বেরিয়েছেন। ঢাকায় আছেন। তবে আজ রাতেই ফেনীর মার্কাজ মসজিদে চলে আসবেন। মার্কাজ মসজিদেই তার সঙ্গে দেখা করার কথা স্থির করে ছুটি নতুন অ্যাসাইনমেন্টে। সময়, চারটা পাঁচ।

'আলেম মুক্তিযোদ্ধার খোঁজে' দেয়া দৈনিক সমকালের বিজ্ঞাপন পড়ে আমাদের ফোন দিয়েছিলেন মুসলেহ উদ্দীন নামের এক ভদ্রলোক। বললেন, তার বাড়ি ফেনীর ছাগলনাইয়া থানার নতুন মুহুরীগঞ্জে। গ্রাম ও পোস্ট দৌলতপুর। তার বাবা মৌলভী মকছুদ আহমদ ভূঁইয়া দেশ স্বাধীন হওয়ার পক্ষে কাজ করেছে। তিনি একজন সাচ্চা মুক্তিযোদ্ধা। আপনারা কি আমার বাবার খোঁজ নেবেন?

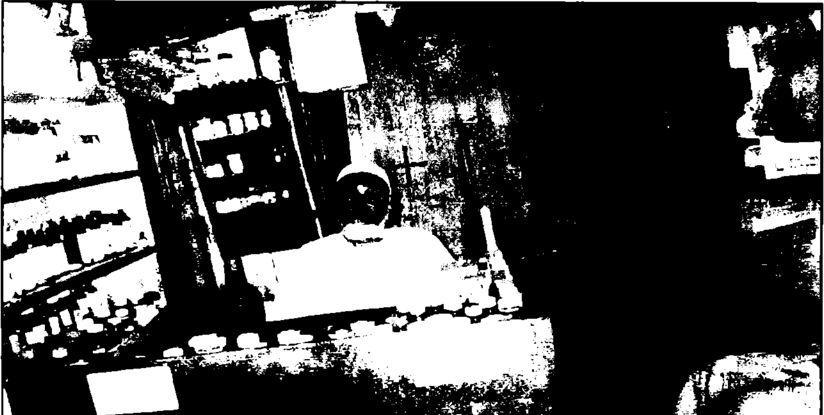
বাস থেকে নেমেই দেখি এক তরুণ দাঁড়ানো। বয়স ১৬/১৭। হাত বাড়িয়ে দিয়ে প্রশ্ন– আপনারা কি ঢাকা থেকে এসেছেন? 'জি' উত্তর দিতেই পথ দেখিয়ে বলল, আমি তার নাতি, চলুন। কিছু দূর হেঁটে এসে উপস্থিত হই এক হাকিমি-ডাক্তারের দোকানে। ওষুধের টেবিল সামনে নিয়ে চেয়ারে এক মুরব্বি বসা। পেছনে আরো একজন বয়স্ক লোক বেঞ্চের ওপর। সালাম জানিয়ে ভেতরে ঢুকতেই উত্তর দিয়ে হাসিমুখে অভ্যর্থনা

জানালেন তারা। সৌজন্যতার খাতিরে পেছনে বসা লোকটি উঠে দাঁড়িয়ে আমাদের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন। আর সামনে বসা মুরব্বি যার কাছে আমরা এসেছি তিনি বসেই হাত মেলালেন। দাঁড়ালেন না। প্রথমে কিছুটা কেমন কেমন যেন লাগল। সংবাদ দিয়ে কোনো মেহমান আসলে তো তাকে স্বয়ং অভ্যর্থনা জানিয়ে রাস্তা থেকে নিয়ে আসা একটা সাধারণ সৌজন্যতা। মনে না চাইলেও সামাজিকতা বা ভদ্রতার খাতিরে মানুষ এতটুকু করে থাকে। এখানে একজন দাঁড়ালেও আরেকজন বসেই রইলেন। অথচ বয়স, স্বাস্থ্য তো বলে তিনি দুর্বল নন। এখনও দাঁড়াতে পারবেন, হাঁটতে পারবেন, প্রয়োজনে ছুটতেও পারবেন ইচ্ছেমত।

কথা শুরুর আগেই তার পরিচয় জেনে নিই আমরা। নতুন যে তথ্যটুকু যোগ হলো তা এরকম– তার বর্তমান পেশা হাকিমি-ডাক্তারি। সেই পঞ্চাশ দশকের গোড়া থেকে এ পেশার সঙ্গে জড়িত তিনি। এখন এ পেশায় তার বেশ নাম-ডাক হয়েছে। দেশ থেকে তো আছেই বিদেশ থেকেও মানুষ তার ওষুধ সেবন করে উপকৃত হচ্ছে। তার মোট চার ছেলে, চার মেয়ে। চট্টগ্রামের হাটহাজারী মাদরাসা থেকে তিনি দাওরা শেষ করেন। চট্টগ্রাম দারুল উলুমে পড়েন আলিম, ফাজিল। '৫০–'৫৯ পর্যন্ত তিনি হেড মৌলভী ছিলেন ফাজিলপুর রেল স্টেশন জিন্না হাইস্কুলের। মুহুরীগঞ্জ হাই স্কুলে ছিলেন পরের তিন বছর '৬২ পর্যন্ত। এর পর দরগাহপুর ইসলামিয়া দাখিল মাদরাসায় তার সাড়ে ৭ বছর শিক্ষক জীবন কাটে।

মুক্তিযোদ্ধা মৌলভী মকছুদ আহমদ ভূঁইয়া অনর্গল কথা বলত পারেন উর্দু, আরবি ফার্সি, ইংরেজি ও মাতৃভাষা বাংলায়। '৭১-এ তার ভূমিকাটি ছিল দুঃসাহসিক। কিন্তু সেই দুঃসাহসই তার জন্য শেষ পর্যন্ত কাল হয়ে দাঁড়ায়।

আমরা প্রথমে তার কাছে '৭১-এ তাঁর ভূমিকা জানতে চেয়ে প্রশ্ন করি। তিনি উত্তর দেন– আমি রাজাকার ছিলাম! আমরা চমকে উঠি। রাজাকার ছিলেন! কোন দল করতেন তখন? মুসলিম লীগ করতাম। আবারো চমকে উঠি। যেন সাপে কামড়েছে



একাত্তরে দেশের জন্য পঙ্গুত্ববরণ করেছেন ছাগলনাইয়ার মৌলভী মকছুদ আহমদ ভূঁইয়া। এখন তাঁর সময় কাটে এই ফার্মেসিতে বসেই

আমাদের। শেষ প্রশ্ন করি। ভাবলাম, অনেকেই তো যুদ্ধের পর দলীয় প্রশ্রয়ে সার্টিফিকেট নিয়ে রাজাকার থেকে মুক্তিযোদ্ধা সেজেছে। তিনিও কি সেরকম নাকি! আপনার কি কোনো '৭১-এর সার্টিফিকেট আছে? সোজা উত্তর দেন তিনি, না, নেই । এবার একদম শেষ। আর কোনো ভরসা পাচ্ছি নে। এ বইয়ে কোনো রাজাকারের সাক্ষাৎকার যাবে তা তো অসম্ভব। তাহলে এত দূর আসা, এত কষ্ট করা সবই বৃথা? তাজুল ফাত্তাহ আস্তে করে বললেন, শিবলি ভাই, চলুন কেটে পড়ি। রাজাকার থেকে বাঁচি। হাতে প্রচুর কাজও বাকি। বললাম, দাঁড়ান, আরেকটু দেখে নিই।

আচ্ছা, আপনার ছেলে মুসলেহ উদ্দীন তো ফোন দিয়েছিল আপনি আলেম মুক্তিযোদ্ধা বলে। এখন দেখা যাচ্ছে উল্টো। ব্যাপারটা কি একটু খুলে বলবেন? তখন তিনি আস্তে আস্তে সব খুলে বললেন, তার উত্তরে অন্ধকার দূর হয়ে গেল।

প্রথমে তিনি মুসলিম লীগের সমর্থক ছিলেন। স্বাধীনতাবিরোধী এমন একটি গোঁড়া দলের সমর্থক হয়েও যখন তিনি তার প্রতিবেশী হিন্দু কিংবা মুসলমানের ওপর জুলুম, অন্যায়, অবিচার দেখলেন আর সহ্য করতে পারলেন না। ঘুরে দাঁড়ালেন। কিন্তু এলাকার আর দশটা তরুণ যেমন সরাসরি অস্ত্র হাতে নেমে পড়লেন তিনি সে পথ না ধরে ভিন্ন একটি কৌশল অবলম্বন করলেন। যারা মুক্তিযোদ্ধা তাদের তো পাক হানাদারের সঙ্গে যোজন যোজন দূরত্ব। সাপে-নেউলে দশা। তাই পাক হানাদারদের কাছ থেকে কোনো গোপন তথ্য আদায় করা কিংবা কোনো বাঙালিকে ধরে নিয়ে গেলে রক্তারক্তিতে না গিয়ে কৌশলে ছুটিয়ে আনা ছিল অসম্ভব। সব ভেবে তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন সরাসরি রাজাকারের খাতায় নাম লেখাবেন। যেই ভাবা সেই কাজ। ছদ্মবেশে পাক্কা রাজাকার সেজে গেলেন। তবে তিনি ব্যতিক্রম রাজাকার। এর জন্য তার সবচেয়ে বেশি সহায়ক ছিল তার ভাষা। উর্দু তিনি অনর্গল বলতে পারেন। এলাকার আর কেউ তা পারত না।

একবার পাকিস্তানিরা পুরো এলাকা ঘিরে ফেলে। বেছে বেছে ১৭০ জন মানুষ দাঁড় করায় মাঠে। সার বেঁধে দাঁড়ানো মানুষগুলো মৃত্যুর জন্য পুরো প্রস্তুতিই নিয়ে ফেলেছিল। ফায়ার করে শেষ করে দেবে তারা সবাইকে। কিন্তু হঠাৎ সেখানে এসে উপস্থিত হন মৌলভী মকছুদ আহমদ ভূঁইয়া। ক্যাম্প কমান্ডারের সঙ্গে দীর্ঘ সময় উর্দু ভাষায় কথা বলেন। পরিচয় দেন নিজেকে একজন পিস কমিটির চেয়্যারম্যান হিসেবে। কমান্ডার তার কথা বিশ্বাস করেন, মানেন। মুক্তি দেন ১৭০ জন সাধারণ গ্রামবাসীকে। যাদের প্রায় অধিকাংশ এখনও জীবিত। তারা সবাই এখন কৃতজ্ঞ মৌলভী মকছুদ আহমদ ভূঁইয়ার কাছে। এছাড়াও মাঝে মধ্যে যখন দু'একজনও ধরা পড়ে যেত পাকিস্তানিদের হাতে তিনি বিভিন্ন ফন্দি এঁটে তাদেরকে বাঁচিয়ে আনতেন।

আমরা যখন কথা বলি মুক্তিযোদ্ধা মৌলভী মকছুদ আহমদ ভূঁইয়ার সঙ্গে তখন বাজারের মানুষজন এসে ভিড় জমায় চারপাশে। তাদের মুখ থেকেও শুনি মৌলভী সাহেবের নানা গুণকীর্তন। মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন স্মৃতির কথা। দোকানের ভেতরে একদম কোনে যে বৃদ্ধ লোকটি বসে ছিলেন তার নাম মোঃ আবদুর রব। তিনি ভারত থেকে ট্রেনিং নিয়ে দেশে

এসে সরাসরি সশস্ত্র যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। তিনিও বললেন যুদ্ধ নিয়ে নানা টুকিটাকি। একটা ঘটনা বললেন, যুদ্ধ চলাকালে আমি একবার এলাকায় আসি। দুর্ভাগ্যবশত ধরাও পড়ে যাই হানাদারদের হাতে। আমাকে যখন ধরে নিয়ে যায়, মৃত্যুর সব আয়োজন সম্পন্নও করা হয়। তখন হঠাৎ দেখি সেখানে এসে উপস্থিত মৌলভী মকছুদ আহমদ ভূঁইয়া। কথা বলছেন কমান্ডারের সঙ্গে। মুখে হাসি, ভাবে আত্মীয়তা। (মুক্তিযোদ্ধা আঃ রব এবং মুক্তিযোদ্ধা মৌলভী মকছুদ আহমদ ভূঁইয়া তারা পরস্পর মামা-ভাগনে) কিছু বুঝে ওঠার আগেই দেখি আমি স্বাধীন, মুক্ত। এখনও ভাবি, ওই দিনের পর থেকে আল্লাহ আমাকে দ্বিতীয় জীবন দিয়েছেন। আমার প্রথম জীবন শেষ।

আরেকটি কাজ করতেন তিনি। যারা রাজাকার, স্বাধীনতাবিরোধী তাদেরকে তার হাকিমি-ফার্মেসিতে ডেকে আনতেন মাঝে মধ্যে। আর পেছনে প্রস্তুত থাকত মুক্তিরা। ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে ধরে উচিত শিক্ষা দিয়ে দেওয়া হতো স্বাধীনতাবিরোধী গাদ্দারদের।

কিন্তু এভাবে আর কত দিন চলা যায়। এত বিশাল এক শক্তিধর বাহিনীর সঙ্গে এক সাধারণ মৌলভী কি ছলচাতুরী করে টিকে থাকতে পারে? অসম্ভব। একদিন সত্যি সত্যি পাকবাহিনী বুঝে গেল। মৌলভী মকছুদ আহমদ ভূঁইয়া রাজাকার বা পিস কমিটির কেউ না বরং সে ভয়ংকর চতুর মুক্তিযোদ্ধা। এত দিন তারা এক বিষধর গোখরাকেই বিশ্বাস করে আসছে। এটা তাদের জন্য এক মস্ত ভুল। তাকে একদল স্পেশাল ফোর্স এসে বন্দি করে নিয়ে যায় ফেনীতে পাকিদের মূল ঘাঁটিতে। শুরু হয় নির্যাতন। তারা পিটিয়ে তার হাঁটু ও কোমরের গিরাগুলো ভেঙে ফেলে। তাকে পঙ্গু করে রাস্তায় ফেলে দেয়। সেই যে নির্যাতনে তার হাড্ডিগুলো দুমড়েমুচড়ে গেছে শত চিকিৎসা করেও পরে আর তা ভালো হয়নি। পঙ্গুত্ববরণ করে নিতে হয়েছে তার আজীবনের জন্য। তিনি নিজের কাছে নিজে এখন পঙ্গু হলেও বাকি সবার কাছে বোঝা। আমরা যখন তার জীবনের এই ভয়াবহ অধ্যায়ের কথা শুনলাম তখন বুঝলাম তিনি কেন সৌজন্যতাস্বরূপ উঠে দাঁড়াননি। কেন নিজে না গিয়ে নাতির মাধ্যমে আমাদেরকে অভ্যর্থনা জানালেন। তখন নিজেদেরই আমরা নিন্দাবাদ জানালাম। ছিঃ!

তার মুক্তিযুদ্ধের সার্টিফিকেট না থাকার কারণ সম্পর্কেও কথা বলি। প্রথমে তিনি সার্টিফিকেটকে অত বেশি দরকারি ভাবেননি। তাই সে দিকে তিনি যাননি। পরবর্তীতে যখন সবাই তাকে বলল সার্টিফিকেট নিয়ে রাখার জন্য, উপকার হবে। তখন তিনি রিলিফ কমিটির চেয়ারম্যান আলী নেওয়াজের কাছে যান এবং সার্টিফিকেটের কথা বলেন। আলী নেওয়াজের সঙ্গে তার ভালো সম্পর্ক না থাকার কারণে তিনি তা অস্বীকার করেন। বলেন, আপনি তো মুক্তিযোদ্ধা না রাজাকার ছিলেন। আচ্ছা তিনি যদি মুক্তিযোদ্ধা না হয়ে রাজাকারই হতেন তাহলে বলবেন কি ১৭০ জন গ্রামবাসীকে কে বাঁচিয়েছেন? মুক্তিযোদ্ধা আঃ রবকে কে ফায়ার স্কোয়াড থেকে উদ্ধার করেছেন? দৌলতপুর গ্রামের ঘরগুলোকে আগুনের হাত থেকে কে বাঁচিয়েছেন? কে ধরিয়ে দিতেন স্বাধীনবিরোধী জঘন্য ওই গাদ্দারদের? কে দেশের জন্য পঙ্গুত্ব বরণ করে নিয়ে আজ অসহায়ত্বে ভুগছে? উত্তরগুলো খুঁজে দেখবেন কি পাঠক?



জীবনের ঝুঁকি নিয়ে '৭১-এর ন'মাস মাতৃভূমির জন্য লড়েছেন মাওলানা আঃ মতিন মজুমদার

দৈনিক সমকালের বিজ্ঞাপন পড়ে যারা ফোন দিয়েছিলেন তাদের মধ্যে আরেকজন হলেন মুক্তিযোদ্ধা মাওলানা আবদুল মতিন মজুমদারের একমাত্র ছেলে ঢাকার বাংলামোটরে চাকরিরত মনোয়ার হোসেন মজুমদার সবুজ। সেদিন তাদের গ্রামের বাড়ির ঠিকানাটা নোট বুকে লিখে রেখেছিলাম। গ্রাম : উত্তর ফাল্গুন করা। পোস্ট ও থানা : চৌদ্দগ্রাম। জেলা : কুমিল্লা। চা পান ও আলোচনার পর নতুন মুহুরীগঞ্জের মুক্তিযোদ্ধা মৌলভী মকছুদ আহমদ ভূঁইয়ার কাছ থেকে হাসিমুখে বিদায় নিয়ে মোবাইলে যোগাযোগ করি বাংলামোটরের সবুজের সঙ্গে। নতুন করে বাড়ির লোকেশন জেনে নিই। তিনি জানালেন, বাড়ি যাবার পথ খুবই সোজা এবং কাছেই। চৌদ্দগ্রাম নেমে চৌধুরী ফিলিং স্টেশন। পাশেই আমাদের বাড়ি। রাত তখন ন'টার কাছাকাছি। ফেনী থেকে কুমিল্লা আসার জন্য আমরা দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকি হাইওয়েতে, শ' শ' গাড়ি যাচ্ছে কিন্তু আমাদের বহন করার মতো কোনো গাড়ি নেই। অনেকক্ষণ, কত মিনিট হবে ঠিক বলতে পারব না। অপেক্ষা করার পর একটি চট্টগ্রাম-নোয়াখালীগামী লম্বা বাস পেয়ে যাই। বিসমিল্লাহ বলে লাফ দিয়ে উঠে পড়ি তাতে। সঙ্গে সঙ্গে বাস দ্রুত চলতে শুরু করে। দরজায় দাঁড়িয়েই ভেতরে তাকিয়ে চমকে উঠি। সর্বনাশ! আমরা ডাকাতের হাতে পড়ে গেছি। হাইওয়ের বিশাল বাস। অনেকগুলো সিট। যাত্রী মাত্র ৫/৬ জন, হাট্টা গাট্টা লোক। যাত্রীরা আমাদের ডাকছে, বারবার বলছে– ভেতরে আসেন। সিটে বসেন। হালত বলছে, একটু পরেই আমাদের চেপে ধরবে। ড্রাইভার যখন বুঝল আমরা তাদের চক্রান্ত ধরে ফেলেছি, এক অন্ধকার জায়গা দেখে আমাদের নামিয়ে দিল। রাস্তায় কোনো মানুষ নেই, ঘন অন্ধকার। আল্লাহর নাম জপতে জপতে সামনে হাঁটতে থাকি। অনেক পথ হাঁটার পর আরেকটি বাস পেয়ে চলে আসি চৌদ্দগ্রামে। রাত সাড়ে দশটায় চৌধুরী ফিলিং স্টেশনে এসে মানুষজনকে জিজ্ঞেস করতে করতে বাড়ি খুঁজতে থাকি। বিশ্বরোড থেকে নেমে গ্রামের পথ ধরে হাঁটতে শুরু করি। অন্ধকার পথ। অচেনা, মধ্যরাত, রাস্তায় লোকজনের



যাতায়াত নেই। কোথাও উঁচু, কোথাও নিচু, ভাঙা। দু'পাশে বাঁশঝাড়, পুকুর কিংবা ডোবা। কোথাওবা কিছুই অনুমান করা যায় না। রাস্তা, বাঁশঝাড়, ডোবা নাকি খেত। নিরুপায় হয়ে কিছুই না পেয়ে মোবাইল জ্বালিয়ে পথ চলতে থাকি। চলছি তো চলছি, শেষ হয় না চলার। মাঝপথে যে দু'একজনকে পেয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম তারাও বলল, বাড়ি সামনেই। মোবাইলেও বলা হয়েছিল তা। কিন্তু এত দূরকে কি কেউ কাছে বলে! নিজের এলাকা তো সবাই চেনে-জানে, তাই বলে কি 'দূরে-কাছে' গুলিয়ে এক করে ফেলতে হয়! তার ওপর আবার যা অন্ধকার, গা ছমছম করে। হাতের মোবাইলকে মনে হচ্ছে জোনাকী পোকা। তাজুল ফাত্তাহকে বললাম, মনে করবেন তো, আবার যখন শহরের বাইরের কোনো অ্যাসাইনমেন্টে যাব ভালো দেখে টর্চ কিনে নিতে হবে।

দরজায় দাঁড়িয়ে সালাম দিতেই মুক্তিযোদ্ধা মাওলানা আবদুল মতিন মজুমদার দরজা খুলে বাইরে আসেন। আমাদের পরিচয় জেনে হাতে ধরে ভেতরে নিয়ে বসতে দেন। আস্তে আস্তে আলাপ জমে ওঠে তার সঙ্গে। আবদুল মতিন মজুমদারের মোট চার সন্তান– এক ছেলে, তিন মেয়ে। ছেলেটি চাকরিজীবী। মেয়েগুলো বিভিন্ন হোস্টেলে আছে; ছাত্রী। বর্তমানে তিনি কোনো দল না করলেও এক সময় কঠিন আওয়ামীলীগার ছিলেন। বক্তৃতা, সভা সেমিনার ছিল তার নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। তার মুখের তেলাওয়াত ছাড়া চৌদ্দগ্রামের কোনো সভা শুরু হতো না। কিন্তু তার মতে— যে আওয়ামী লীগ এক সময় দেশের জন্য লড়েছে আজকে সেটা হয়েছে কিছু অমানুষের বিচরণ ক্ষেত্র। আর আলেম হয়ে ইসলামী রাজনীতি না করার কারণও বললেন, 'আমি ইসলামী রাজনীতিতে বিশ্বাসী। তবে তাদের মাঝে যেহেতু রাজনীতি আছে ইসলাম নেই তাই আমিও তাদের সঙ্গে নেই।' দেশ স্বাধীন হওয়ার পর '৭২-এ তিনি ছিলেন এলাকার রিলিফ কমিটির চেয়ারম্যান। এরপর সেই যে তিনি রাজনীতি ছেড়েছেন আর এর ধারেকাছেও যান নি। একজন প্রবীণ রাজনীতিকের প্রচুর অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতা অর্জনের পর এ ময়দান ছেড়ে ঘরে হাত গুটিয়ে বসে থাকার কথা শুনলে স্বভাবতই এর কারণ জানতে মন উদগ্রীব হয়। উত্তরটি তিনি দিয়েছিলেন ছোট্ট করে। 'সবাই দেখি স্বার্থের জন্য রাজনীতি করে। স্বার্থবাজদের থেকে বাঁচতে চাই।'

আবদুল মতিন মজুমদার তার জীবনের প্রথম দিকে পাকিস্তানবিরোধী ছিলেন না। তাই বলে ভাবছেন পাকিস্তানের জন্য জান-প্রাণ! তাও না। স্বাভাবিক ছিলেন। যতটুকু ভালোবাসার দরকার ছিল ততটুকুই। কিন্তু পাকিস্তান ও পাকিস্তানিদের যখন তিনি খুব কাছ থেকে দেখলেন, ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় তাদের সঙ্গে মিশতে হলো তাকে, তখন তিনি বুঝতে পারলেন তাদের নিষ্ঠুর দানবীয়তা। তাদের শোষণ, জুলুম, অনাচার ও বৈষম্যের শিকার খুব একটা না হলেও অসহায় আক্রান্তদের তার খুব কাছ থেকে দেখার দুর্ভাগ্য হয়েছে। তা থেকেই তিনি সচেতন হয়ে সচেতনদের প্লাটফর্মে নাম লিখান। শরিক হন স্বাধীনতার আপোষহীন লড়াইয়ে। তিনি আলেম। মুক্তিযোদ্ধা। শুধু তাই নয়। আলেম গোয়েন্দা মুক্তিযোদ্ধাও!

সত্তর দশকের শুরুর দিকের কথা। পাকিস্তানি সৈন্যরা সুযোগমতো বিভিন্ন জায়গায় তাদের ক্যাম্প করে নিচ্ছিল। প্রথমে তারা কোথাও এতটুকু মাথা গোঁজার ঠাঁই করতে পারলেই হলো, চারপাশে শুরু করে দিত জ্বালাও-পোড়াও তাণ্ডব। গুলি চালিয়ে ভাবত পাখি মারলাম। কখনো প্রতিযোগিতায় নেমে যেত। কে ক'টা মারতে পারে। এক, দুই, তিন... দশ, বিশ, আরো বেশি। নারকীয় আনন্দে চিৎকার করে উঠত তখন 'মাই নে পহ্লা হোয়া'।

গ্রামবাসীরা পালাত। যে যে দিকে পারত সে দিকেই উর্ধ্বশ্বাসে ছুটত তখন। পেছনে লাশের পাহাড় পড়ে থাকত শকুনের ঠোঁটের অপেক্ষায়। কিংবা পঁচে গলে যেত, দুর্গন্ধ ছড়াত।

এমনই এক দুঃসময়ে মুক্তিযোদ্ধা মৌলবী আব্দুল মতিন মজুমদার গ্রাম ছেড়ে পালালেন। বর্তমানে যিনি চৌদ্দগ্রাম মাধ্যমিক পাইলট বালিকা বিদ্যালয়ের সিনিয়র ধর্মীয় শিক্ষক। সঙ্গে তার মা, বাবা, বড় ভাই, ভাবী, স্ত্রী ও তার ছোট্ট মেয়েটি। পেছনে রাইফেলের বুলেট, সামনে অজানা গন্তব্য। ছুটতে ছুটতে এসে ওঠেন জঙ্গলপুরের এক বাড়িতে। সেখানে গিয়েও দেখেন তারা এখনও দৈত্যের হাত থেকে বাঁচতে পারেননি। পাশে খাল। খালের ওপার থেকে গুলি আসছে বৃষ্টির মতো। আবারো দৌড়। ছুটতে ছুটতে আমজাদের বাজার হয়ে সরাসরি ত্রিপুরায় রাধানগরে ওঠেন সবাই। শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নেন। এদিক-সেদিক থেকে বাঁশ-কাঠ সংগ্রহ করে ছোট্ট ঘর তৈরি করে পরিবারের সবার জন্য মাথা গোঁজার সামান্য ঠাঁই তৈরি করেন বহু কষ্টে। পরে যোগ দেন মুক্তিযুদ্ধে, প্রতিঘাতের লড়াইয়ে।

মুক্তিযোদ্ধা মৌলভী আবদুল মতিন মজুমদারের মূল কাজ ছিল গোয়েন্দাগিরি। সারা দিন এদিক-সেদিক ঘুরে বেড়াতেন, খোঁজ নিতেন পাকিস্তানি আর রাজাকারদের। নির্দিষ্ট সময়ে এসে রিপোর্ট করতেন এলাকার মুক্তিবাহিনীর কমান্ডার আবদুল কাদের চৌধুরী ও হারুন মিয়ার কাছে। সেই রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করেই মুক্তিবাহিনী হামলা চালাত সবখানে। তার দুটি স্মরণীয় ঘটনা শুনি।

বসন্তপুরে একবার এক রক্তক্ষয়ী লড়াই হয়। সে লড়াইয়ের কথা আজো মানুষের মুখে মুখে শুনা যায়। দু'পক্ষেরই প্রচুর লোক হতাহত হয় সে যুদ্ধে। এক পাঞ্জাবির লাশ তখন গুলি লেগে নদীতে পড়ে যায়। নদীর তীর ঘেঁষে ছিল হিন্দুদের ক্যাম্প। সম্ভবত প্রতিমা ক্যাম্প। এক হিন্দু দেখে দূরে নদীতে কী যেন আসছে। সে সংবাদ দেয় আরো দু'চারজনকে। তারাও আসে। পরে আরো কয়েক দল। তখন হঠাৎ একজন চিৎকার করে ওঠে– ওটা পাকিস্তানি সৈন্য। সম্ভবত এদিকেই আসছে। সংবাদ শুনামাত্র সবাই ভয়ে দিশেহারা হয়ে যায়। সবকিছু ফেলে দল বেঁধে দে দৌড়। মুহূর্তে এলাকা ফাঁকা। কোথাও কেউ নেই।

তথ্য সংগ্রহ করতে একবার এক লোকালয়ে গিয়ে আঃ মতিন মজুমদার দেখেন, এক পাকিস্তানি সৈন্যের লাশ পড়ে আছে। গ্রামবাসী হাঁ করে দেখছে সেটাকে। মানুষের উপচেপড়া ভিড়। একজন সাহস করে এসে লাশের গায়ে হাত দিল। খুঁজে দেখল তার সঙ্গে কী কী আছে। কয়েকটা কর্তুজ। একটা হাত রুমাল। চিরুনি। কালো কালির ছোট্ট একটা কলম। নষ্ট হয়ে যাওয়া তিনটা সাদা কাগজের টুকরা। আর একটা চিঠি। চিঠি নিয়ে সবার কৌতূহল বেড়ে গেল। এ হাত ও হাত গড়াতে লাগল মুহূর্তে। অনেকটা কাড়াকাড়ির মতো অবস্থা। কিন্তু যে-ই হাতে নেয় সে-ই হতাশ হয়, দমে যায়– উর্দু ভাষা। অচেনা ভাষা। পড়তে পারে না কেউ। টুপি-দাড়ি দেখে সবাই গিয়ে আঃ মতিন মজুমদারকে ধরে। বলে, আপনি কি মৌলভী? পড়তে পারবেন এ চিঠি! 'হ্যাঁ' বলতেই হাতে তড়িঘড়ি তুলে দিল চিঠিটি। শুনান আমাদের। আনন্দ ও অপেক্ষায় তাদের চোখ চকচক করতে লাগল। "বউ, কুমিল্লা ক্যান্টেনমেন্ট থেকে আমাকে কোথায় যেন নিয়ে যাচ্ছে। বিয়ের পর তো তোমাকে সময় দিতে পারলাম না, চলে এলাম। আল্লাহ বাঁচিয়ে রাখলে আগামী চাঁদের শেষের দিকে আসছি, দীর্ঘ সময় থাকব তখন। ভালো থেকো।"



বারবার মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফিরে এসেছেন ’৭১-এর লড়াকু মুক্তিযোদ্ধা মৌলভী নূরুল আফসার

লোকটার জবাবে বিস্মিতই হতে হলো আমাদের। ‘চৌদ্দগ্রামে কোনো আবাসিক হোটেল নেই।’ তাহলে আমাদের মতো মুসাফিররা এখানে এসে কী করেন! ‘আপনারা যা করবেন তাই করেন তারা।’ খুব স্বাভাবিকভাবেই উত্তর করল হাসপাতালের কর্মচারীটি। ‘ঢাকা ফেরত যাবেন নতুবা মহিপালের কোনো হোটেলে উঠতে হবে।’ বলেন কী! এত্ত রাতে আবারো গাড়ির ঝামেলা! অগত্যা তাই করতে হলো আমাদের। লোকটি বহু কষ্ট করে আমাদের উঠিয়ে দিলেন একটি মালবাহী কার্গোতে। মধ্যরাতে এসে নামি মহিপালে। রাতের শেষ অংশটুকু এক আবাসিক হোটেলে কাটিয়ে ফজরের আগেই এসে হাজির হই মিজান রোড আলিয়া মাদরাসায় তাবলীগের মার্কাজ মসজিদে। ফজর নামাজের পর খুঁজে বের করি মুক্তিযোদ্ধা মৌলভী নূরুল আফসারকে। জানালাম, ঢাকার লালমাটিয়া শাহী মসজিদের মুয়াজ্জিন মুক্তিযোদ্ধা মৌলভী উসমান গনি আপনার সন্ধান দিয়েছেন। আপনি তো মুক্তিযোদ্ধা, আমরা আপনার কাছে মুক্তিযুদ্ধের গল্প শুনতে এসেছি। শুনাবেন কি সেই গল্প?

তখন তিনি মনোরহাট সিনিয়র মাদরাসায় দাখেল পরীক্ষার্থী ছিলেন। এই পরীক্ষার সময়ই দেশে গণ্ডগোল তুঙ্গে উঠে যায়। নির্যাতনের নানা খবর আসতে থাকে চারদিক থেকে। স্বাধীনতার ঘোষণাও হয় একদিন। এদিকে তিনি ছিলেন জামায়াতে ইসলামীর সমর্থক, আবার পরীক্ষার্থী। পরীক্ষা বা দলীয় সমর্থন কোনো কিছুই তার জন্য বাধার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। সব ভুলে তিনি শরিক হন তখন স্বাধীনতার সংগ্রামে। সার্বভৌমত্ব রক্ষার লড়াইয়ে।

৩১ আগস্ট ১৯৭১। ১৭ জনের এক দলের সঙ্গে তিনি বের হয়ে যান যুদ্ধের ট্রেনিং নেয়ার উদ্দেশ্যে। নেতৃত্বে খাজা আসেম। বাড়ির পাশেই বর্ডার। বর্ডার পার হয়ে ঢুকে পড়েন ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের চুক্তাখোলা ক্যাম্পে। সেখান থেকে কাঁঠালিয়া ক্যাম্পে পাঠানো হয় তাদের। ওই ক্যাম্প শত্রুর রেঞ্জের মধ্যে পড়ে যাওয়ায় পরিবর্তন করতে হয় ক্যাম্পটি। আসেন আগরতলার বাগমারা ক্যাম্পে। বাগমারায় পূর্ণ ট্রেনিং শেষ করে চলে আসেন রাজানগর ক্যাম্পে। তখন নেতৃত্বে ছিলেন ব্রিগেডিয়ার মতিউর রহমান। তার পর কর্নেল জাফর ইমামের নেতৃত্বে চলে আসেন বাংলাদেশের সুবার বাজার এলাকায়। যোগ দেন সম্মুখ সমরে। তিনি সাধারণত এলএমজি ব্যবহার করতেন। আর

সব লড়াইয়ে তিনি সব সময় থাকতেন প্রথম কাতারে। মৃত্যুর কথা ভুলে যেতেন তখন। যুদ্ধের প্রথম দিকে তিনি ফেনীতে ছিলেন। বেশিরভাগ যুদ্ধ তিনি ফেনীতেই করেন। ফেনীর বিজয় নিশ্চিত হলে চলে যান পাহাড়ি এলাকা চট্টগ্রামের নাজিরহাট এলাকায়। সেখানেও লড়েন বেশ কৃতিত্বের সঙ্গে।

পরশুরাম থানার অনন্তপুরের ঘটনা। প্রথমে পাকিস্তানিদের বেশ দুর্বল ভেবেছিলেন সহযোগী মুক্তিরা। তাঁরও ধারণা ছিল তাই। কিন্তু লড়াই বেধে যাবার পর দেখেন পরিস্থিতি বেশ ভয়াবহ। পাকিরা সংখ্যায় প্রচুর। গোলাবারুদও যথেষ্ট পরিমাণে রয়েছে তাদের হাতে। মুক্তিযোদ্ধারা ছিলেন সবাই সারিবদ্ধভাবে। কেউ ঝোপঝাড়ের আড়ালে। কেউবা কোনো মাটির ঢিবির আড়ালে। সবাই নিজ নিজ অবস্থান থেকে মোকাবেলা করে যাচ্ছিলেন। তখন মৌলভী নূরুল আফসার ছিলেন সারির একেবারে কোনায়। তিনি আস্তে আস্তে ক্রলিং করে সামনে এগিয়ে যেতে থাকেন। ওদিকে ঝড়ের মতো গুলির মুখে মুক্তিরা পিছু হটতে বাধ্য হয়। মৌলভী নূরুল আফসার তখনও জানতেন না তিনি একা। আর তিনি কত ভয়ংকর মৃত্যু কূপে নেমে গেছেন হামাগুড়ি দিয়ে। হঠাৎ শুনতে পান পাক কমান্ডারের নির্দেশ— 'এ চুতিয়াকা বাচ্চা, হাতিয়ার ডাল দো'। এলএমজি'র ট্রিগারে আগেই হাত রাখা ছিল মৌলভী নূরুল আফসারের। সঙ্গে সঙ্গে চেপে ধরলেন এলএমজি'র ট্রিগার। এক পশলা গুলি ছুটে যায় মুহূর্তে। ছেঁকে ধরে সেগুলো খাকি পোশাকের জানোয়ারগুলোকে। তারাও ট্রিগার চেপেছিল শেষ মুহূর্তে। কিন্তু গুলিবিদ্ধ দেহ তাদের অস্ত্রগুলো ধরে রাখতে পারেনি। লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় গুলি। সবাই হুমড়ি খেয়ে আছড়ে পড়ে মাটিতে। যেন একসঙ্গে অনেকগুলো পাকা ফল গাছ থেকে খসে পড়েছে।

যুদ্ধের এই ভয়াবহ বাস্তব চিত্র শুনতে আমরা যখন ভীষণ শিহরিত হচ্ছিলাম তখন তাকিয়ে দেখি মুক্তিযোদ্ধা নূরুল আফসারের চোখে পানি এসে গেছে। দু'চোখ ভরে গেছে পানিতে। তার মনে হচ্ছিল ওটা একটা দুঃস্বপ্ন ছিল। বাস্তব হলে তো সেখান থেকে বেঁচে আসা অসম্ভব।

তিনি আরেকটি হৃদয়বিদারক ও দুর্বার অভিযানের কথা শোনান।

কোলাপাড়ায় বেঁধে গেল শেরে শেরে যুদ্ধ। এক দল আরেক দলকে মারার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠল। কেউ কারো চেয়ে কম নয়। যুদ্ধের এক পর্যায়ে এসে মুক্তিরা পাকিস্তানিদের ফাঁদে ফেলে দেয়। তিন দিকে ভারত। সীমান্ত পার হয়ে আসছে ভারতীদের গোলা। আরেক দিক দিয়ে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে যায় মুক্তিবাহিনী। মাঝে অবরুদ্ধ পাকিস্তানি সৈনিক দল। তিন পক্ষ থেকে গুলি বিনিময় হতে থাকে সমান তালে। আস্তে আস্তে পাকিস্তানিদের জায়গা ছোট হয়ে আসতে থাকে। কিন্তু তখন হঠাৎ উড়ে আসে কয়েকটা পাকিস্তানি বোমারু বিমান। মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর বোমা ফেলতে থাকে একযোগে। মুক্তিসেনারাও পাল্টা প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন তখন। কয়েকটা বিমানও ভূপাতিত

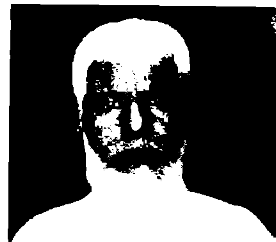
করেছিলেন তারা কিন্তু এ সুযোগে শত্রুরা খাঁচা থেকে পালিয়ে যায়। হাতছাড়া হয়ে যায় একটা বড় সুযোগ। আর তখন কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধাও শহীদ হন। যাদের মধ্যে ছিলেন মৌলভী নূরুল আফসারের দীর্ঘকালের বন্ধু শহীদ সিরাজ। নিজে ফেরত আসতে পারলেও বন্ধুর বিয়োগে এখনও শোকাতুর মুক্তিযোদ্ধা মৌলভী নূরুল আফসার। এখনও স্মরণ করেন তিনি শহীদ সিরাজকে। ভালোবাসা পাঠান তার নামে প্রতিদিন।

মুক্তিযুদ্ধে ১০ ইস্ট বেঙ্গলের সঙ্গে থাকার কারণে যুদ্ধের পর বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে চাকরি পেয়ে যান মুক্তিযোদ্ধা মৌলভী নূরুল আফসার। তার পদ ছিল সার্জেন্ট অফিসার। দীর্ঘ ২১ বছর যথাযথ দায়িত্ব পালনের পর ১৯৯২-এর আগস্টে তিনি চাকরি থেকে অবসর নেন। এরপর থেকে তিনি পারিবারিক কাজ ও তাবলীগে সময় ব্যয় করে আসছেন। স্বাধীনতা যুদ্ধের এই দুঃসাহসী লড়াকুর চার ছেলে, তিন মেয়ে। বর্তমানে তার বয়স ৫৭ বছর। তার কাছে জানতে চেয়েছিলাম, আপনি কি ভোট দেন? বলেছেন, দেই। তবে কোনো দল করি না। কেন? সোজা উত্তর— এ দেশে রাজনীতি নেই। সব পেটনীতি।



মুক্তিযোদ্ধা নানু কারী সবিস্ময়ে বললেন, গিয়ে দেখি মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয়ের আমাদের থানা কমান্ডার বিএনপি নেতা আঃ গাফফার। আমি তো অবাক, এ লোক আবার মুক্তিযোদ্ধা হলো কবে!

খবর পেলাম, প্রায় একশ' কিলোমিটার দূরে এক অজপাড়াগাঁয়ে একজন মুক্তিযোদ্ধা আছেন। আলেম মুক্তিযোদ্ধা। রওনা হলাম। সঙ্গে তাজুল ফাত্তাহ। ভেবেছিলাম, সকালের সূর্য ওঠা দেখব কোনো এক সবুজ গ্রাম থেকে। তাই তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ি বাসা ছেড়ে। কিন্তু শহুরে বাস চালকের স্বেচ্ছাচারিতা ও খেয়ালিপনার কারণে ঢাকায় শুধু সূর্য ওঠা ও রৌদ্রোজ্জ্বল সকালই দেখতে হলো না আমাদের, সূর্যের প্রখরতাও হাড়ে হাড়ে টের পেতে হলো ; বেলা তখন ন'টা পাঁচ।



সবুজ গ্রামের বুক চিরে চলে গেছে পিচঢালা রাস্তা। ঢাকা টু নবাবপুর। সড়কে যন্ত্রদানবের উপস্থিতি খুব একটা নেই। পায়ে হাঁটা মানুষের সংখ্যাও নগণ্য। এক দল দুরন্ত কিশোর কাছের কোনো ক্ষেত থেকে মাছ ধরে ধেই ধেই আনন্দে বাড়ি ফিরছে। প্রথম যে মানুষটাকে আমরা সামনে পেলাম তাকে জিজ্ঞেস করেই বুঝতে পারলাম, মুক্তিযোদ্ধা নানু কারী এলাকার বেশ খ্যাতনামা ব্যক্তি। সবাই এক নামেই তাকে চেনে— কৈলাইন মিঞা বাড়ি। আমরা পায়ে হেঁটে রওনা দিলাম বাস স্টেশন থেকে। কলকল শব্দে বয়ে যাওয়া খালের সাঁকো পার হয়ে একদম গ্রামের ভেতর ঢুকে গেলাম, মাত্র কয়েক মিনিটে।

খুব সহজেই বাড়ি খুঁজে পেলেও তাকে পেতে কিছুটা বেগ পেতে হলো। 'বাড়ি নেই। দাওয়াতে গেছে'— পর্দার আড়াল থেকে জানালেন তার সহধর্মিনী। ছুটলাম দাওয়াতী বাড়ির খোঁজে। পরে ওই বাড়ি খুঁজে না পেয়ে আমরা এক দোকানের সামনে বেঞ্চে বসে অপেক্ষা করতে লাগলাম তার জন্য। বেশি সময় চাতক পাখির মতো চেয়ে থাকতে হলো না আমাদের। মিনিট দশেক পরেই তিনি হাজির হলেন। মাঝারি গড়ন। শ্যামবর্ণ। বুক পর্যন্ত ঝুলে পড়েছে সাদা ধবধবে দাড়ি। গায়ে লম্বা যুব্বা। প্রথমেই পান খাওয়া লাল টকটকে মুখে কিছুটা বিস্ময় প্রকাশ করলেন—আমার কাছে এসেছেন! কী মনে করে? আপনারা কারা? আমরা আমাদের পরিচয় দিয়ে আসার কারণটা বলতেই তিনি স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন এবং খুশি মনে জানালেন, তিনি আমাদের সব ধরনের

তথ্য দিয়ে সর্বাত্মক সহযোগিতা করবেন। আমাদের তিনি বাড়িতে এনে বসতে দিলেন। প্রফুল্ল বোধ করলেন। আপ্যায়ন করালেন। মূল কাজ শুরু করলাম আমরা। প্রথমেই পরিচয় পর্বটা সেরে নিই। পুরো নাম : মৌলভী মেসবাহুল ইসলাম মিঞা (নানু কারী)। জন্ম : ১৯৫০। পিতা : মরহুম মবিনুল ইসলাম মিঞা। কৈলাইন, নবাবপুর, চান্দিনা, কুমিল্লা। শিক্ষা : কারী, জামিয়া ইসলামিয়া ইব্রাহীমিয়া (উজানি মদ্রাসা)। ম্যাট্রিক, মইচাইল হাই স্কুল। ফাজিল, ধামতি আলিয়া। মোট তিন ভাই— নজরুল ইসলাম, মেসবাহুল ইসলাম ও শহিদুল ইসলাম।

আলেম মুক্তিযোদ্ধার বড় ভাই শহিদুল ইসলাম তখন চট্টলায় ইপিআর (বর্তমান বিডিআর)-এ চাকরি করতেন। '৭১-এ তার কর্মক্ষেত্র ছিল আগরতলা হেড কোয়ার্টারে। সেখান থেকে তিনিও স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। কথা বলার সময় এক ফাঁকে তিনিও আমাদের সঙ্গে এসে যোগ দেন। তথ্য দেন। মুক্তিযোদ্ধা নানু কারী কখন, কীভাবে, কেন যুদ্ধ করেছিলেন পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে। বর্তমান প্রতিক্রিয়াইবা তার কী? তিনি কেমন আছেন? শুনুন তারই মুখ থেকে—

দেখুন আমার বয়স হয়েছে। এই বৃদ্ধ বয়সে কি আর সেই তিন যুগ আগের ইতিহাস বলা যায়! স্মৃতি যদি আমাকে প্রতারিত না করে তাহলে হয়তোবা আপনাদের কিছুটা সহযোগিতা করতে পারব। তখন আমি যুবক। বয়স বিশ কি বাইশ। পূর্ণ যৌবন আমার মাঝে টগবগ করছিল। আমি খুব সম্ভব আওয়ামী লীগ করতাম। আমার আব্বাও তাই। তবে জেঠারা ছিলেন কঠিন মুসলিম লীগার।

দেশের পরিস্থিতি দিন দিন খারাপ হতে লাগল। চারদিকে রাজাকারদের উৎপাত বেড়ে গেল। পাকবাহিনী বারবার গ্রামে ঢুকে নির্যাতন-নিপীড়ন চালাতে লাগল অসহায় গ্রামবাসীদের ওপর। ঘরে ঘরে আগুন দিল। মা-বোনদের ধরে নিয়ে গেল, লাঞ্ছিত করল। মানুষকে পাগল করে তুলল তারা। বেদনায় নীল হয়ে উঠল সবাই। চারদিকের এই নির্মম পরিস্থিতি দেখে আমার ভেতরটা নড়ে উঠল। প্রতিশোধের শপথ নিলাম। দেশকে বাঁচানোর জন্য প্রস্তুত হলাম। আমার ভেতর সাহসের কমতি ছিল না। যেমন ভাবা তেমন কাজ। একরাতে বেরিয়েও পড়লাম। খুব বৃষ্টি হচ্ছিল তখন। গিয়ে মিলিত হলাম এক বিশাল দলের সঙ্গে। গ্রুপের মোট সদস্য ছিল ১২০ জন। সবাই রাতের আঁধার ভেদ করে বৃষ্টিতে ভিজে চলতে থাকি। সারারাত হেঁটে বহু কষ্টে গিয়ে উঠি সীমানার ওপারে। ইন্ডিয়ার সোনামোড়া এলাকায়। গিয়ে দেখি সেখানে সকাল। পালাটানা ক্যাম্পে আমরা প্রশিক্ষণ নিই। আমাদের নেতৃত্বে ছিলেন ক্যাপ্টেন সুজাত আলী। গ্রেনেড নিক্ষেপ, রাইফেল চালানো, শত্রু শিবিরে হানা দেওয়াসহ গুরুত্বপূর্ণ বেশ কয়েকটি বিষয়ের ওপর আমরা কঠিন প্রশিক্ষণ নিই। প্রশিক্ষণ শেষে ফিরি সরাসরি রণাঙ্গনে; বাংলাদেশে।

প্রথম ও স্মরণীয় এবং ভয়ানক যুদ্ধ করি মাত্র একবারই। রণাঙ্গনের স্থান ছিল চান্দিনার উদাল্লাপাড়া গ্রাম। বড়িয়া মাদরাসার কাছাকাছি স্থান। তারা এসেছিল মোট ১১শ' জনের এক গ্রুপ। নাওয়া-খাওয়া ফেলে তাদের সঙ্গে তিনদিন লড়েছিলাম আমরা। ওদের মেরে

লাশের পাহাড় বানিয়ে ফেলেছিলাম। দুই দিক থেকে আক্রমণ করে ওদের দিশেহারা অবস্থায় ফেলে দেই। উত্তর দিক থেকে পাকসেনাদের ওপর আক্রমণ করে ইন্ডিয়ান শিখ সৈন্যরা। আর আমরা ছিলাম দক্ষিণ দিক দিয়ে। সেদিন আমার হাতে ছিল এসএলআর। এ অভিযান কোনো দিন ভোলার নয়।

স্বাধীনতার পর জেনারেল ওসমানী আমাদের সার্টিফিকেট ও কম্বল দিয়েছিলেন। ঘরে একবার চুরি হয়। মালপত্রের সঙ্গে সার্টিফিকেটটিও নিয়ে যায় চোর। ভাতা প্রসঙ্গে কী আর বলব। ওটাও তো সার্টিফিকেটের মতোই দুঃখজনক ব্যাপার। বরং এরচেয়েও বেশি মারাত্মক।

হাসিনা সরকার এসে মুক্তিযোদ্ধাদের ভাতা দেয়ার ব্যবস্থা চালু করে। মাসিক ৩০০/- টাকা ভাতা। ৬ মাস পরপর দেওয়া হয় মোট ১,৮০০/- টাকা করে। হাসিনার পর এলো খালেদা সরকার। সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভাতা প্রথাতেও ব্যাপক পরিবর্তন এলো। মানে বন্ধ হয়ে গেল। আমি মোট দু'বারে ৩,৬০০/- টাকা পাই। আর পাইনি। যোগাযোগ করলাম মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে। গিয়ে দেখি মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয়ের আমাদের থানা কমান্ডার বিএনপি নেতা আঃ গাফফার। আমিতো অবাক। এ লোক আবার মুক্তিযোদ্ধা হলো কবে! আমি তাকে ভাতার বিষয়টা জানালাম। সেও আমাকে আশ্বস্ত করল— চালু হয়ে যাবে আবার। তবে সে আমার কাছে দশ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করল। আমি তাকে বললাম, আমার পক্ষে এত টাকা জোগাড় করা কিছুতেই সম্ভব না। দয়া করে তুমি দেখো কিছু করতে পার কি-না। সে সাফ 'না' জানিয়ে দিল। আমি নিয়মিত তার পিছু ঘুরঘুর করলাম অনেক দিন। নাহ্ ! কিছুতেই কিছু হলো না। সে ভাতা আজো বন্ধ। সম্ভবত এ রুদ্ধদ্বারের পরিধি কেয়ামত অব্দি।

একদিন তার অফিসে গিয়ে দেখি সে তার ছোট্ট মেয়েকে সঙ্গে এনেছে। আমি তার হাতে এক হাজার টাকা গুঁজে দিলাম। তার মেয়েটি আমার দিকে ফ্যালফ্যালিয়ে তাকিয়েছিল। তাকেও দিলাম পঞ্চাশ টাকা। খুশি হল মেয়েটি। তখন আঃ গাফফারকে অনুনয় করে বললাম, দেখো খুবই সংকটে আছি আমি। আর পারছি না। টাকাগুলো আমার খুবই দরকার। তুমি যদি একটু দয়া করো...। তবুও টাকা দেয়নি। কারণ, আমি আলেম। আমার ছেলে আওয়ামী লীগ করে। পরে বুঝেছি, সেদিন তাকে এক হাজার টাকা দেওয়াই ভুল ছিল। টাকাগুলো জলে গেল। এরকম ভুল আর করব না।



এটাই কি দেশপ্রেমের প্রতিদান—মুক্তিযোদ্ধা মাওলানা আঃ মতিন কাজীকে দেখে এ প্রশ্ন কে না করবে ?

মুক্তিযোদ্ধা নানু কারীর সঙ্গে কথা শেষ করে বেরুলাম নতুন আলেম মুক্তিযোদ্ধার খোঁজে। আমাদের কাছে তথ্য ছিল একই থানার উত্তর বরকড়ই ইউনিয়নের লগড্ডা গ্রামেও আছে আরেক আলেম মুক্তিযোদ্ধা। ছুটলাম সে দিকে। আমাদের মতো শহুরেদের যান্ত্রিক জীবনে সামান্য সময়ের জন্য গ্রামের সবুজ শ্যামল পরিবেশের ছোঁয়া পাওয়া এক ভয়াবহ গণীমতের ব্যাপার। খোলা আকাশ, খোলা প্রান্তর, সবুজ বনান্তর, মুক্ত বাতাস, বয়ে চলা নদী এ সব থেকেই বঞ্চিত আমরা শহুরে 'ভদ্র'লোকেরা। অথচ গ্রামবাসীদের দেখে মনে হয় তাদের কাছে এগুলোর কোনো কদরই নেই। আসলে যে পোকা মিষ্টি আমের ভেতর জন্মায় সে মিষ্টি রসের ব্যাপারটা ধরতে পারে না। সে মনে করে সে তার জীবনটা রসকষহীন অবস্থায় পার করে দিচ্ছে। লগড্ডা যাবার পথে হাতের বামে পড়ল ভারত উপ-মহাদেশের প্রখ্যাত বুজুর্গ কারী ইবরাহীম (রহঃ)-এর উজানী মাদরাসা। দূর থেকে দেখা যাচ্ছিল মাদরাসার উঁচু দালানগুলো। সুযোগ হারালাম না। কয়েক মিনিটের জন্য ঢু মারলাম মাদরাসায়। বিশাল মাদরাসা। তিন দিক বাঁধানো পুকুর। সুদর্শন মসজিদ। কয়েকটি কবর। মানুষের দান করা শস্যের বস্তার স্তূপ।



ঘুরে ঘুরে সব দেখলাম। কবর জিয়ারত করলাম। পুলকিত হলাম। ছবি নিলাম। একরাশ প্রশান্তি নিয়ে ফিরলাম আমাদের পথে। আবারো পেছন ফিরে দেখলাম বিশাল দালান। বড় পুকুর। কয়েকটি কবর, ময়দান, সুদর্শন মসজিদ। সবকিছুকে ঘিরে আছে এক মায়াময় সবুজের সমারোহ।

রিকশা থেকে নামলাম বরকড়ই পীর মঞ্জিল দাখিল মাদ্রাসার কাছের বাজারে। জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম মুক্তিযোদ্ধা মাওলানা আব্দুল মতিন কাজী এ মাদরাসায়ই শিক্ষকতা করেন। বাড়ি গ্রামের খুবই ভেতরে। ক্লাস চলছে, এখন তিনি মাদরাসায়ও থাকতে পারেন। খোঁজ নিতে এসে হাজির হই মাদরাসার অফিস কক্ষে। সামান্য পরিসরের ছোট্ট মাদরাসা। মাঠের তিন দিকে একতলা বিল্ডিং, দোচালা টিনশেড।

আরেক পাশে পাকা রাস্তা। মাদরাসায় তিনি নেই। বাড়িতে। অফিস কক্ষ থেকে মোবাইল নম্বর সংগ্রহ করে কথা বললাম তার সঙ্গে। তিনি আমাদের বাড়ি যাওয়ার আমন্ত্রণ জানালেন। আবারো রিকশায় চাপলাম। গ্রামের আঁকাবাঁকা মেঠো পথ দিয়ে চলতে লাগল আমাদের রিকশা। দু'পাশে ফসলী জমি, ধান ক্ষেত। কোথাওবা সামান্য পানির ডোবা। ছোট-বড় গাছ। দূরের বাড়িগুলো থেকে ভেসে আসছিল ধান মাড়ানো মেশিনের ঘটঘট শব্দ। কখনোবা রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে কৃষকদের শুকাতে দেওয়া ধানের খড়কুটো। সে খড়ের ওপর দিয়ে রিকশা চলছিল ভালোবাসার ছন্দ তুলে। মনে হচ্ছিল কতই না আপন এ ভূমি আমার। হয়তোবা এ ভালোবাসার টানেই, মাটির ঘ্রাণে পাগল হয়েই সেদিন তারা পাকসেনাদের তাড়াতে মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন।

নাম : মাওলানা মোহাম্মদ আব্দুল মতিন কাজী। পিতা : মরহুম কাজী আব্দুল খালেক। ২ ভাই ৩ বোন। ৩ মেয়ে ৫ ছেলে। শিক্ষা : কামিল হাদিস ও কামিল ফেকাহ, শর্ষিনা আলিয়া। কামিল আদব, ধামতি আলিয়া। কর্মজীবন : শিক্ষক : বরকড়ই পীর মঞ্জিল দাখিল মাদরাসা, কুমিল্লা। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ : বিভাগ, চট্টগ্রাম। জেলা : কুমিল্লা। থানা : চান্দিনা। সরকারি গেজেট নং-০২০৪০৯০০৬৯।

'৭১-এ নির্যাতনের অসহনীয় মাত্রা দেখে অতিষ্ঠ হয়ে মাওলানা আঃ মতিন কাজী সিদ্ধান্ত নেন দেশের জন্য লড়তে হবে। এলাকার ছেলেদের সঙ্গে ভারতে চলে যান ট্রেনিং-এর জন্য। সেখানে তিন মাস একটানা প্রশিক্ষণ নেন। ক্যাম্পের নেতৃত্বে ছিলেন ক্যাপ্টেন সুজাত আলী। চান্দিনা থানার যে গ্রুপটির সঙ্গে তিনি ভারতে যান, ট্রেনিং নেন, বাংলাদেশে রণাঙ্গনে এসে যোগ দেন সে দলটিতে মোট সদস্য ছিল একশ' বিশজন।

রণাঙ্গনে তিনি বেশ কয়েকটি রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে সশস্ত্র অবস্থায় অংশগ্রহণ করেন। যুদ্ধ করেন রাজাকার ও পাকসেনাদের বিরুদ্ধে। একবার চান্দিনায় রাজাকারদের একটি গ্রুপের সঙ্গে তাদের তুমুল লড়াই বেধে গেল। দীর্ঘ সময় স্থায়ী হলো সে যুদ্ধ। সবশেষে রাজাকাররা পিছু হটল। লাশের পাহাড় পিছু ফেলে পালিয়ে বাঁচল ক'জন। আর ১০-১২ জন রাজাকার আত্মসমর্পণ করল। বন্দি হলো। তারা রাজাকারদের ধরে এনে মুক্তিবাহিনীর থানা কমান্ডার আলী আকবর-এর কাছে সোপর্দ করেন। তারপর ফেরেন নিজেদের ক্যাম্পে। আরেকদিন এর চেয়েও মারাত্মক এ্যাকশনে জড়িয়ে পড়েন তিনি। রামমহন বাজারে প্রায় ১৭শ' আর্মি চলে আসে। ব্যস, বেধে গেল আক্রমণ, পাল্টা আক্রমণ। ৩ দিন চলল সে লড়াই। সবশেষে আত্মসমর্পণই করতে হয়েছিল পাকিস্তানিদের।

যুদ্ধের পর অন্যসব মুক্তিযোদ্ধার মতো এ মুক্তিযোদ্ধাও সার্টিফিকেট ও কম্বল পেয়েছিলেন। একটা কম্বল তো আর সারাজীবন থাকে না। নষ্ট হয়ে যায়। এটাই নিয়ম। আর তার সার্টিফিকেটটা যে কখন হারিয়ে গেছে টেরও পাননি।

তিনি মাত্র একবার ১৮শ' টাকা ভাতা পান। তারপর ভাতা গ্রহণের খাতা তার কাছ থেকে জমা নিয়ে নেওয়া হয়। তখন আবার শুরু হয় নতুন করে মুক্তিযোদ্ধাদের নাম তালিকাভুক্ত করার পালা। তার সার্টিফিকেট হারিয়ে যাওয়ায় তিনি বেশ বিপাকে পরে

যান। সরকারের খাতায় নাম আছে কিন্তু নিজের কাছে কোনো প্রমাণ নেই। এক্ষেত্রে নিয়ম হলো, দশজন মুক্তিযোদ্ধার সত্যায়ন হলে তাকে আবারো তালিকাভুক্ত করে ভাতা চালু করার। তিনি দশজন মুক্তিযোদ্ধার সত্যায়নপত্র সংগ্রহ করেন। যারা তাকে আগে থেকেই চিনত। রণাঙ্গনে দেখেছে। একসঙ্গে লড়েছে। কিন্তু কপাল মন্দ। বিএনপি নেতা আব্দুল গাফফারের অদৃশ্য সুতোর টানে তার সব শ্রম পণ্ড হয়ে পড়ে। আকারে-ইঙ্গিতে সে এখানেও মোটা অংকের চাঁদা দাবি করেছিল। কিন্তু সরলমনা গ্রাম্য আলেম তার ভেলকিবাজি ঠাওর করতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত বহু ঘোরাঘুরি করেও বঞ্চিত হয়েছেন নিজের বৈধ অধিকার ও প্রাপ্য সম্পদ থেকে। মন্ত্রণালয় থেকে নিয়মিত মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ভাতা পাঠানো হয়। অথচ সে ভাতা মুক্তিযোদ্ধাদের হাত পর্যন্ত পৌঁছে না। আগেই আব্দুল গাফফাররা নিজেদের পকেটে ঢুকিয়ে ফেলে। বাড়ি-গাড়ি করে। কে এই আব্দুল গাফফার? ক্ষমতার দাপটে যে মুক্তিযুদ্ধ না করেও মুক্তিযোদ্ধা বনে গেছে? তার ক্ষমতার পরিধি কতটুকু বিস্তৃত? আমরা জানতে পারব কি?

মুক্তিযোদ্ধা মাওলানা আঃ মতিন কাজী বগুড়ার কামিল মাদরাসায় একটি বড় পদে মোটা অংকের বেতনে চাকরি করতেন। কিন্তু এলাকার ছোট্ট দাখিল মাদরাসা থেকে যখন তার কাছে আবেদন জানানো হলো, আপনি এলাকার মাদরাসায় না পড়িয়ে দূরে আরেক এলাকায় পড়াচ্ছেন। এতে তো এলাকার ছেলেমেয়েরা গণ্ডমূর্খই থেকে যাচ্ছে। আপনার কি কোনো দায়িত্ব নেই? আপনি আমাদের এখানে আসুন। এ মাদরাসাকে দাখিল পার করে কামিল পর্যন্ত চালু করব। তা কেবল আপনার মতো ক'জন শিক্ষিত শিক্ষক পেলে সম্ভব হবে।

এলাকার সন্তানদের টানে তিনি বগুড়ার মোটা বেতনের চাকরিটা ছেড়ে দিয়ে নিজ গ্রামে চলে আসেন। হাল ধরেন ছোট্ট দাখিল মাদরাসাটির। কিন্তু কয়েক বছর পার হয়ে গেলেও সে মাদরাসাটির উন্নতি করেনি কর্তৃপক্ষ। দাখিল দাখিলই রয়ে গেছে। কামিল হয়নি আজো। সম্ভবত আর হবেও না। তবুও তিনি নিজ এলাকার সন্তানদের প্রতি ভালোবাসার টানে তাদের ছেড়ে যাননি বিত্ত-বৈভবের খোঁজে। সম্মানের খোঁজে, ভালোবাসার টানে রয়ে গেছেন। এখন তিনি বিশাল পরিবার নিয়ে সামান্য টাকার বেতন দিয়ে এক প্রকার দীনহীন জীবনযাপন করছেন। এলাকার সন্তানদের জন্য যিনি লোভনীয় চাকরি ছেড়ে ছোট্ট চাকরি গ্রহণ করেছেন, '৭১-এ দেশের জন্য জীবনবাজি রেখে লড়েছেন তিনিই কি-না আজ অভাব-অনটনে দিশেহারা হয়ে যাচ্ছেন। আর আব্দুল গাফফাররা হচ্ছে আঙুল ফুলে কলা গাছ। এটাই কি দেশপ্রেমের প্রতিদান?



মেজর কামরুলকে পীর কাশিমপুরী বললেন, বাবা তৈরি হয়ে যান, যুদ্ধ করতে হবে, দেশ স্বাধীন করতে হবে

ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজে কামরুল যখন এইচএসসি পরীক্ষার্থী তখনই ডাক এলো মুক্তি সংগ্রামের। যোগ দেন মুক্তিযুদ্ধের ২ নম্বর সেক্টরে এক তরুণ গণযোদ্ধা হিসেবে। মুক্তিযুদ্ধের দুই কিংবদন্তি মেজর খালেদ মোশাররফ ও ক্যাপ্টেন হায়দারের সহযোদ্ধা হিসেবে তাদের পাশে পাশে ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের হিরন্ময় দিনগুলোতে। ১৯৯৬ সালে সেনাবাহিনী থেকে অবসর নেয়া এই মেজর এর পরের সময়টাতে লিখেছেন 'জনযুদ্ধের গণযোদ্ধা' নামের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক একটি অসামান্য গ্রন্থ। মুক্তিযুদ্ধকালীন নয় মাসের অভিজ্ঞতার আলোকে অসাধারণ গদ্যশৈলীতে লেখা আলোচ্য গ্রন্থটি নানা কারণেই শ্রেষ্ঠত্বের দাবি রাখে।

স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রসঙ্গে বলতে বা লিখতে গেলে জনগণের ভূমিকা সম্বন্ধে সচরাচর যা বলা হয় তা হলো- বাংলাদেশের ছাত্র, কৃষক, জনতা, পেশাজীবী শ্রেণীগোত্র নির্বিশেষে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তারপর আলোচনার চরিত্র ক্রমাগত সীমিত হয়ে আসে অল্প কিছু রাজনৈতিক নেতা, কিছু সামরিক ব্যক্তিত্ব, কিছু বুদ্ধিজীবী এবং আরও অল্পকিছু নির্বাচিত ব্যক্তির মধ্যে। সাড়ে সাত কোটি জনগণের জন্য বরাদ্দ রইল ওই একটি লাইন, কখনওবা একটি প্যারাগ্রাফ বড়জোর। মেজর কামরুল তার পুরো গ্রন্থেই এ 'হতভাগা' শ্রেণীদের নিয়ে আলোচনা করেছেন। 'জনযুদ্ধে গণযোদ্ধা'র শ্রেষ্ঠত্ব এখানেই।

মুক্তিযুদ্ধের ন' মাস কামরুল দেশের নানা প্রান্তে ঘুরেছেন। যুদ্ধ করেছেন পাক হানাদারদের বিরুদ্ধে। তিনি তার বইয়ে খুব কাছ থেকে দেখা দেশের নামকরা দু'জন পীরের ভূমিকার কথা উল্লেখ করেছেন সবিস্তারে। দু'জনের ভূমিকা ছিল দু'রকম। একজন ছিলেন দেশের পক্ষের অপরজন শত্রু পক্ষের। প্রথমজন কুমিল্লা মুরাদনগরের পীর কাশিমপুর দ্বিতীয়জন স্বরূপকাঠির শর্ষিনার পীর। শর্ষিনার পীরের প্রসঙ্গ থাক। পীর কাশিমপুর প্রসঙ্গে মেজর কামরুল লিখেছেন, "যে গ্রামে আমাদের ক্যাম্প তার নাম পীর কাশিমপুর। একজন পীর সাহেব থাকেন এ গ্রামে- প্রচুর লোকের শ্রদ্ধা, ভক্তি ও অর্ঘ্য নিয়ে। পীর কাশিমপুর বললে নিশ্চিত হতে পারবেন যে, আপনাকে কেউ অন্য কোনও কাশিমপুরে নিয়ে যাবে না। আমরা কাশিমপুরে পৌঁছেই পীর সাহেবের দোয়া নিয়েছিলাম। পাকিস্তানিরা ৭ নভেম্বর আমাদের প্রতিরক্ষার ওপর আক্রমণ করে। তার দু'দিন আগে সকালবেলা অহেদ কেরানি আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে। সেই তার

সঙ্গে আমার প্রথম দেখা। আশ্চর্য, লোকটি কোনও ভূমিকা ছাড়াই চাপিতলায় আমাদের প্রতিরক্ষা অবস্থানের কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের প্রস্তাব করে আমার জবাবের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। খুব কড়া ভাষায় লোকটিকে অপমান করে তাড়িয়ে দেয়া উচিত ছিল; দিইনি। রাগ সামলে আমি চলে এসেছিলাম। বিকালবেলা এক অভূতপূর্ব কাণ্ড ঘটে গেল। পীর সাহেব আমার টিনের দোচালা ছাপরা ঘরে বলা-কওয়া ছাড়া ঢুকে পড়লেন। যিনি সাধারণত বাইরে যান না তিনি কেন আমার ঘরে এলেন এবং আমিইবা কী করব– ভেবে পাচ্ছিলাম না। পীর সাহেব একটু ব্যস্ত হয়ে বললেন, "বাবা কি কি অস্ত্রশস্ত্র এনেছেন, দেখি?" আমি বিস্ময় কোথায় রাখব! দুই কোঠার ঘরের এক ঘরে আমি থাকি, আরেক ঘরে অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ। নিজেদের সামলিয়ে নিয়ে এইচ এ-৩৬ হ্যান্ড গ্রেনেড থেকে শুরু করে এনারগা-৯৪, রাইফেল, এসএমজি, এসএমসি, এলএমজি, বিস্ফোরক, এন্টি পারসোনাল মাইন, এন্টি ট্যাংক মাইন, গোলাবারুদ, ২ ইঞ্চি মর্টার সব দেখিয়ে ও বুঝিয়ে বললাম। বোঝানোর মাঝে মাঝে পীর সাহেব আবার কোনটা দিয়ে কী হয়, তাও জানতে চাইলেন। প্রশিক্ষণের সময় যেভাবে অস্ত্র সম্বন্ধে সম্যক ধারণা দেয়া হয়, সেভাবেই পীর সাহেবকে সব বলে গেলাম। তিনি কি সবই বুঝলেন? এত ধৈর্য ধরে শুনলেন যে! পীর সাহেব এবার আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন, "বাবা, তৈরি হয়ে যান, যুদ্ধ করতে হবে। দেশ স্বাধীন করতে হবে।" আমি কিছুই মেলাতে পারছিলাম না। অথচ যখন কাশিমপুর এসেছিলাম কত লোক বলেছিল পীর সাহেবের বাড়িতে আর্মি আসে, তারা খুব মান্য করে পীর সাহেবকে। আমি যেন আমার বার্তা পেয়ে গেলাম।"

মেজর কামরুলের এই লেখার সূত্র ধরে তাজুল ফাত্তাহকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ি কুমিল্লার উদ্দেশ্যে। প্রথমে চান্দিনার নবাবপুরে। সেখানটায় আরো দু'জন আলেম মুক্তিযোদ্ধা রয়েছেন। তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে চান্দিনা মূল সড়কে এসে দ্রুত বাস ধরি। নামতে হবে ময়নামতি ক্যান্টেনমেন্টে। চান্দিনা-মুরাদনগর সরাসরি কোনো বাস নেই। ক্যান্টেনমেন্ট থেকে কুমিল্লা-ব্রাহ্মণবাড়িয়া সড়কে ১৮ মাইল কোম্পানিগঞ্জ। ময়নামতি ক্যান্টেনমেন্ট বাসস্ট্যান্ডে বাসের জন্য দাঁড়িয়ে আছি। প্রথমে কোম্পানিগঞ্জের বাস ধরতে হবে। বাস এলো একটু পরে। বাদুড়ঝোলা অবস্থা। তাজুল ফাত্তাহকে বললাম, গুলিস্তান-কমলাপুরের আগের ৬ নম্বর বাসগুলো ঢাকা থেকে বিতাড়িত হয়ে এখানে চলে এলো নাকি? ছাদে, পাদানিতে মানুষ, কেবল মানুষ। এরই মধ্যে জায়গা করে নেই আমরা। বাস ছুটে চলে। বাসের ভেতর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দোল খাই।

কোম্পানিগঞ্জ থেকে পীর কাশিমপুর কিভাবে যেতে হয়– এক বাস যাত্রীকে জিজ্ঞেস করলাম।

– কোম্পানিগঞ্জ নেমে আবার নতুন করে বাস ধরতে হবে। কোম্পানিগঞ্জ থেকে ৫ কিলোমিটার হবে পীর কাশিমপুর।

আপনারা কোত্থেকে এসেছেন– বাসযাত্রী আমাদেরকে প্রশ্ন করলেন।

– বললাম, ঢাকা থেকে।

– পীর সাহেবের বাড়ি যাবেন?

– হ্যাঁ।

– ঢাকার জুরাইনেই তো ওনাদের মূল দরবার। ঢাকা ছেড়ে এখানে এলেন যে? জেয়ারত করতে?

ভদ্রলোকের পাশে দাঁড়ানো এক যাত্রী তার মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে বলতে শুরু করলেন, এদেশের মানুষ এতটা হুজুগে পাগল আগে কখনো ভাবিনি। আমাদের দেশের পীর-দরবার, মাজার-খানকাহগুলোকে এক চোট নিয়ে এ সম্পর্কিত তিনি তার একটি স্মরণীয় ঘটনা শুনালেন।

ভদ্রলোক হয়তো কোনো ছবির পরিচালক-টরিচালক হবেন। কোনো এক প্রত্যন্ত গ্রামে মাজারের শুটিং করতে গিয়ে এ অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হন। বললেন, একটি প্রতীকী কবর বানিয়ে তার ওপরে লালসালু জড়িয়ে মোটামুটি একটা মাজারের রূপ দেয়া হয়েছে। পরের দিন শুটিং হবে। মাঝে শুধু এক রাত। এরই মধ্যে এলাকাবাসী এসে মাজারে সেজদা শুরু করে দিল। টাকা ফেলতে লাগল। এক রাতেই টাকার স্তূপ বনে গেল!

কে জানে, হয়তো সত্য, হয়তো মিথ্যা — মনে মনে বললাম।

পীর কাশিমপুর, পীর কাশিমপুর বলে হেলপার চেঁচাতে লাগল। আমরা বাস থেকে নেমে পড়লাম।

আধা ঘণ্টা আগেই মাগরিবের আজান হয়েছে। পীর কাশিমপুর বাজারে একটি মসজিদে ঢুকে প্রথমে নামাজ সেরে নিলাম। মসজিদের ভেতর এক মুসল্লির সঙ্গে দেখা। তারপর আলাপ।

নাম মোঃ ফিরোজ মিয়া। বাড়ি এখানটায়ই। রিকশা চালান। ঢাকায় বহু বছর রিকশা, ভ্যান চালিয়েছেন। ঘুরে ঘুরে টচপটি বিক্রি করেছেন। বয়স পঞ্চাশ পেরিয়েছে। ভাবলাম, স্থানীয় হিসেবে পীর সাহেব সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণাটা তার কাছ থেকেই জেনে নেয়া যায়।

ফিরোজ মিয়া জানালেন, পীর সাহেব বড় ভালো মানুষ ছিলেন। তাঁর কাছে সবাই আসত– পাকিস্তানি আর্মি, মুক্তিবাহিনী...। তিনি সবাইকে দোয়া দিতেন।

একবারের ঘটনা। দরবারের সামনে রাস্তার পাশে বসে আছেন হুজুর। আর্মিদের এক কমান্ডার এসে বলল, এ গ্রামে কি মুক্তিবাহিনী আছে? পীর সাহেব উত্তর দিলেন, এক সময় ছিল, এখন আছে কি-না বলতে পারব না। এ উত্তর শুনে আর্মিরা চলে যায়। ফিরোজ মিয়া আরও জানালেন, ওনার কারণে আর্মিরা তাদের এ গ্রামের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করতে পারেনি।

ফিরোজ মিয়াকে অনুরোধ জানালাম, দরবারটা দেখিয়ে দিতে। 'বাজারের সোজা দক্ষিণ দিকে, হেঁটে পাঁচ মিনিটের রাস্তা, হাতের ডান পাশে।' ফিরোজ মিয়াকে ধন্যবাদ জানিয়ে তার দেখিয়ে দেয়া রাস্তা ধরে হাঁটা শুরু করলাম।

আজ শবেবরাত। ইবাদত-বন্দেগির রাত। মুমিনমাত্রই কেঁদেকেটে এ রাতটি পার করে দেন। দূর সফরে এ দিনটিতে বের হওয়া কি ঠিক হয়েছে– সহকর্মী তাজুল ফাত্তাহকে

বললাম। আমাদের বরাতে হয়তো এটাই লিখা ছিল– ফাত্তার এ উত্তর শুনে ভেতরকার সব দ্বিধা-জড়তা কেটে গেল।

আমাদের মাথার ওপর দৃষ্টিনন্দন সুবিশাল তোরণ। মাথা উঁচিয়ে দেখলাম, আমরা আমাদের উদ্দিষ্ট জায়গায় চলে এসেছি। 'মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল গফুর চিশতী (রহ)' সিমেন্ট-বালি কেটে কেটে তোরণে লেখা হয়েছে পীর কাশিমপুরীর নাম। ডানে-বামে তাকিয়ে সোজা ঢুকে পড়লাম ভেতরে। তাজুল ফাত্তাহকে বললাম, আরে এটা যে জুরাইন মাজারের ফটোকপি! পীর কাশিমপুরীর মাজারসহ চারপাশের সব ক'টি ইমারতই জুরাইন মাজারের হুবুহু অনুকরণে তৈরি করা হয়েছে। প্রথম দেখায় যে কেউ ধাঁধায় পড়ে যাবেন। ভুল করে জুরাইন মাজারে চলে এলাম না তো।

সামনে পেয়ে এক লোককে জিজ্ঞেস করলাম, মাজারের বর্তমান গদিনসীন কোথায় বসেন। ভদ্রলোক বললেন, এ মাজারে কোনো গদিনসীন নেই, আছেন মোতাওয়াল্লি। তাহলে চলুন না তার সঙ্গেই কথা বলা যাক।

মোতাওয়াল্লি নেই, আছেন তার ছোট ভাই।

– আস্‌সালামু আলাইকুম।

– ওয়ালাইকুমুস্ সালাম।

কী ব্যাপার, আপনারা কোত্থেকে এস্ছেন? – ছোট ভাই জিজ্ঞেস করলেন।

– ঢাকা থেকে। মরহুম পীর কাশেমপুরী সম্পর্কে জানতে।

– কী জানবেন?

– '৭১-এ উনি নাকি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ছিলেন?

– আপনি জানলেন কী করে?

– মেজর কামরুল হাসান ভূঞার একটি বই পড়ে জেনেছি।

– একটা বইয়ে পেলেন অমুক এই... এরপর চলে এলেন, এটা কোনো কথা হলো। আপনারা কী সাংবাদিক হলেন?

– জনাব, এটাইতো সাংবাদিকদের কাজ।

উত্তরটা তার কাছে চপেটাঘাতের মতোই মনে হয়েছে। এরপর দু'জনের মধ্যে রীতিমতো বাকবিতণ্ডা শুরু হয়ে গেল।

বুঝলাম, তার ভিমরতি ঘটেছে। পূর্বপুরুষের নির্মল সত্য ইতিহাসকে বোতলে পুরে ছিপি এঁটে দিতে চাচ্ছেন। কিন্তু তা কি আর হয়।

ইতিমধ্যেই বড় ভাই মোতাওয়াল্লি চলে এসেছেন। নাম তৈয়্যবুর রহমান। পীর কাশিমপুরীর ভাইয়ের ছেলে।

বারান্দা থেকে হাত ধরে নিয়ে আমাদেরকে রুমে বসালেন। চা-বিস্কিট খেতে দিলেন। এরপর বললেন, এবার বলুন, আপনারা কী উদ্দেশ্যে এসেছেন। আগের কথারই পুনরাবৃত্তি করলাম– তার কাছে। মেজর কামরুলের নাম শুনেই বলা শুরু করলেন, আরে ও তো তখন বাচ্চা ছেলে। ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজে ইন্টারমিডিয়েটে পড়ত। বেঁটেখাটো। শ্যামবর্ণের...। '৭১-এ এ দরবারে এসে ও বাবা হুজুরের কাছে পড়ে

থাকত। মেজর কামরুলের সঙ্গে আমি একসঙ্গে কত উঠাবসা করেছি। আমি নিজেও একজন মুক্তিযোদ্ধা। '৭১-এ যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর ট্রেনিং নিতে ভারতেও গিয়েছিলাম।

নড়েচড়ে বসলাম। বললাম, '৭১-এ আপনার বাবা হুজুরের কাছে মুক্তিযোদ্ধাদের পাশাপাশি পাকিস্তানি আর্মিরাও নাকি আসত?

তৈয়্যব বললেন, সবাই আসত। একবার পাকিস্তানি আর্মিদের এক কমান্ডার তার দলবল নিয়ে ট্রলারে করে আমাদের দরবারের সামনে এসে নামল। দরবারের সামনেই বাবা হুজুর একটা চেয়ারে বসা ছিলেন। তারা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন– কিয়া ইস্ মহল্লে ম্যা কুই মুক্তি ফৌজ হ্যাঁয়? —এ গ্রামে কি কোনো মুক্তিবাহিনী আছে?

বাবা উত্তর দিলেন– পহ্লা ম্যা তো থা, আভি হায় ইয়া নেহি মাই নেহি জানতা– আগে তো ছিল। এখন আছে কি-না আমার জানা নেই।

উনি তো একজন মহান আল্লাহর ওলি ছিলেন। সত্য কথাটা বলে দিলে নিজের ভাইদের বিরুদ্ধে যাবে, আবার এত বড় একজন বুজুর্গ সরাসরি মিথ্যাইবা বলেন কী করে– তাই তিনি কৌশলে এ উত্তরটা দিলেন। এতে সব কুলই রক্ষা হয়েছে। সাপও মরল লাঠিও ভাঙল না।

এবার ব্যক্তিগত তথ্য জানার পালা। তৈয়্যব জানালেন, পীর কাশিমপুরী ঢাকা আলিয়া থেকে কামিল পাস করেন। তিনি জুরাইনের পীর সাহেবের খলিফা ছিলেন। জুরাইনের পীর সাহেবের বাড়িও এ গ্রামেই। পীর কাশিমপুর বাজারের পশ্চিম দিকে। গ্রামের এ বাড়িতে জুরাইনের পীর সাহেবের ছোট দু' ভাইয়ের মাজার রয়েছে। তিনি ছিলেন চিরকুমার। পীর কাশিমপুরী বেঁচে ছিলেন একশ' বছর। মারা যান ১৯৭৫-এ। বগুড়া, রাজশাহী এবং ভারতের বর্ধবমান ও কোলকাতায় তাঁর প্রচুর মুরিদ-ভক্ত রয়েছে।

তিনি আমৃত্যু প্রচারবিমুখ ছিলেন এবং মৃত্যুর আগে এর ওপর অটল থাকার জন্য আমাদেরকে অসিয়ত করে গেছেন। কোথাও আমাদের কোনো ছবিও দেখতে পাবেন না। বাবা হুজুরের কোনো জীবনী গ্রন্থও নেই।

– আপনাদের পরবর্তী প্রজন্ম তো সিমেন্ট, বালি, কংক্রিটের এ কবর-দালানগুলো ছাড়া আর কিছুই পাবে না। এখনো কি ইতিহাস সংরক্ষণের প্রয়োজনবোধ করছেন না?

– বাবা হুজুরের এ নিষেধাজ্ঞার মধ্যেও হয়তো কোনো রহস্য আছে– এর মধ্যেই কামিয়াবি।

এরপর আর কিইবা বলার থাকে।

বিদায়বেলা ব্যক্তিগত ঔৎসুক্য থেকে জানতে চাইলাম, পীর কাশিমপুরের নামকরণ কিভাবে হলো? তিনি জানালেন, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী আমাদের এখানে এক মিটিংয়ে এসে বললেন, এ গ্রামে এত এত পীর-বুজুর্গ অথচ এর নাম শুধু কাশিমপুর কেন? সে মিটিংয়েই তিনি কাশিমপুরের আগে 'পীর' যোগ করে এর নাম রেখে দিলেন 'পীর কাশিমপুর'।



মাওলানা মতিউল ইসলামের প্রাণের দাবি দেশ স্বাধীন হোক পাকিস্তান নিপাত যাক

পাক্কা ১০ মিনিট হয়ে গেল, এখনও আসছে না তাজুল ফাত্তাহ। এদিক-ওদিক ক'বার তাকিয়ে ঘড়িতে চোখ রাখি, সোয়া ১টা। দুপুর ১টায় এখানে দাঁড়ানোর কথা, নির্দিষ্ট সময় পার হয়ে ষোল মিনিট গড়িয়েছে। সোয়া ১টা পার হয়ে গেলেও কি ১টা বাজে না তাজুল ফাত্তাহর ঘড়িতে! আবারো মোবাইলের বাটন চাপি। কী ব্যাপার! কোথায় আপনি?

: এই তো আসছি ভাই, যাত্রাবাড়ী চৌরাস্তায়ই আছি। আর মাত্র দু' তিন মিনিট...। দু' তিন মিনিট সময় বললেও ফাত্তাহ হাজির যখন হলো মিনিটের কাঁটা আরো এক ধাপ এগিয়ে তখন দেড়টার ঘরে ঠাঁই নিয়েছে। 'এত্ত দেরি?' প্রশ্ন করতে হলো না আমার। নিজেই এক লম্বা বক্তব্য দিয়ে স্বেচ্ছায় কারণ দর্শালেন— "সাপ্তাহিক গতিবিধির নির্বাহী সম্পাদক ছড়া শিল্পী মহিউদ্দীন আকবর ভাইয়ের কাছে গিয়েছিলাম। এই তো অফিস তাঁর। মহিউদ্দীন আকবর ভাইএর শ্বশুর হলেন মাওলানা মতিউল ইসলাম। আড়াইহাজারে থাকেন। কালিবাড়ি নেমে রিকশায় পাঁচগাঁও মানেহর 'মৌলভীবাড়ি'। তিনি '৭১-এ বাংলাদেশের পক্ষে বেশ জোরালো ভূমিকা রেখেছেন। মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য দোয়া করেছেন, নফল রোজা রেখেছেন, নফল নামাজ পড়েছেন। খাবার-দাবার, অর্থ-কড়ি দিয়েও সাহায্য সহযোগিতা করেছেন। তখন নারায়ণগঞ্জ মিশন পাড়া জামে মসজিদের ইমাম,খতিব ছিলেন তিনি। মুক্তিবাহিনীর জন্য মসজিদের দরজা খোলে দিতেন। মুক্তিযোদ্ধাগণ আসতেন। আশ্রয় গ্রহণ করতেন। থাকতেন। পরামর্শ করতেন তারা পরস্পর। তারপর আবার বেরিয়ে যেতেন শত্রুর সন্ধানে। আমাদের শীলন সাংস্কৃতিক একাডেমীর উপদেষ্টা মহিউদ্দীন আকবর ভাই আরো কয়েকজনের নাম বললেন। তবে সবার পূর্ণ ঠিকানা দিতে পারলেন না। মাওলানা আবদুল হাই, শুক্কুর কারী তার কাছ থেকেই এ নাম দুটি সংগ্রহ করে আনলাম। ধূমায়িত কাপে চুমুক দিতে দিতে এতক্ষণ এই গল্প শুনছিলাম মহিউদ্দীন আকবর ভাই-এর কাছ থেকে। তাই দেরি হয়ে গেল আসতে।"

নতুন নাম যুক্ত হওয়ায় বেশ ভালোই লাগল। তখনই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম কবে, কখন যাওয়া যায় আড়াইহাজারে, মাওলানা মতিউল ইসলামের বাড়িতে। নির্দিষ্ট দিনে

ভোরবেলায় বাসযোগে রওনা দেই আড়াইহাজারের উদ্দেশে। বাস থেকে নেমে রিকশা নিই, পাঁচগাঁও মানেহর 'মৌলভীবাড়ি'। রিকশা চলতে শুরু করে। প্রধান সড়ক ছেড়ে গ্রামের ভেতরে ঢুকে আস্তে আস্তে। দু'একজন দোকানিকে জিজ্ঞেস করে আমরা বেশ দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে চলতে থাকি। এক সময় রিকশা থামে এক ছায়াঘেরা বাড়ির সামনে। মোল্লাবাড়ি। এমন সময় সাইকেল চেপে বাড়ি থেকে কোথায় যেন যাচ্ছিলেন মোল্লাজি। তার কাছে জিজ্ঞেস করতেই তিনি বললেন– এটা মোল্লাবাড়ি, মৌলভীবাড়ি না। আমিই অধম এই এলাকায় 'মোল্লা' ডাকে প্রসিদ্ধ। মৌলভীবাড়ি আপনারা কয়েক মাইল পেছনে ফেলে এসেছেন। ওটা আরেক গ্রাম।

'মোল্লা', 'মৌলভী' আক্ষরিক অর্থে কোনো দূরত্ব নেই। স্থান, কালভেদে সামাজিক অর্থে তা আছে। মানেহরে এই ফারাকটুকু হাড়ে হাড়ে টের পেলাম। স্থানীয়রাও 'মোল্লা', 'মৌলভী'কে মনে হয় আভিধানিক অর্থে অভিন্ন জ্ঞান করেন। আবার সামাজিক অর্থকেও গুলিয়ে এক করে ফেলেন। যার খেসারত আমাদের দিতে হলো মাইলকে মাইল রাস্তা পাড়ি দিয়ে। রিকশা ঘুরিয়ে আমরা পেছনে আসতে থাকি। গ্রামের ভেতর পিচ ঢালা রাস্তা অতিক্রম করে রিকশা থেকে নামি নতুন আরেক বাড়ির সামনে। বাড়ির চারপাশে এত বেশি গাছ মনে হলো জঙ্গলা কোনো স্থানে আমরা দাঁড়িয়ে আছি। দূরে ফসলী জমি। ঘরের পেছনে দাঁড়িয়ে জোরে সালাম দিতেই বেরিয়ে এলেন মাওলানা মতিউল ইসলামের বড় ছেলে মাওলানা আবু নাসের ফাইজুল্লাহ। কথা বলে জানতে পারলাম পেশায় তিনি স্থানীয় কাজী। মাওলানা ফাইজুল্লাহ আমাদের ঘরে নিয়ে বসতে দেন। বললেন, আব্বা গোসলখানায় আছেন। বসুন। আমি সংবাদ দিচ্ছি।

কিছুক্ষণ পর সালাম দিয়ে ঘরে প্রবেশ করলেন মোল্লা (!) না আমাদের উদ্দিষ্ট মৌলভী সাহেব। বয়স মনে হলো ৮০ পার হবে। প্রথমে তার ব্যক্তি জীবন নিয়ে টুকটাক প্রশ্ন করি। তিনি জন্মগ্রহণ করেন ১৯৩২ সালে। তার মোট ৭ সন্তান– ৩ ছেলে, ৪ মেয়ে। '৭১-এ ছিল ১ ছেলে ২ মেয়ে। পড়াশুনা করেছেন ঢাকা আলিয়ায়। '৬২-তে কামিল পাস করেন এখান থেকেই। এখন অবসরে আছেন। কর্ম জীবনে তিনি ৪৪ বছর ইমামতি ও খতিবের দায়িত্ব পালন করেন নারায়ণগঞ্জ মিশন পাড়া জামে মসজিদে। এর পাশাপাশি ২৩ বছর শিক্ষকতাও করেন চাষাড়া ফাজিল মাদরাসায়। তারপর তিনি শুরু করেন '৭১ নিয়ে তাঁর আত্মকথন–

ইংরেজদের ইতিহাস আমরা জানি। তারা দু'শ বছর আমাদের শাসন-শোষণ করেছে। শকুনের মতো খুবলে খেয়েছে তারা আমাদের। তাদের সীমালংঘন ও অমানসিক আচরণের জন্য তাদেরকে এদেশ থেকে তাড়ানোর প্রয়োজন দেখা দেয়। সময়ের সেই প্রয়োজনে এগিয়ে আসেন আলেম সমাজ। আন্দোলনের পুরোভাগে থাকেন আলেম-ওলামা। তাদের তাড়াতে গিয়ে কেউ ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলেছেন, কেউবা নির্বাসিত হয়েছেন, আবার কেউ মার খেয়ে পঙ্গু হয়েছেন। শাইখুল হিন্দ মাহ্‌মূদুল হাসান (রহঃ) ছিলেন ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের এক বীর সিপাহসালার। মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী, মওলানা আবুল কালাম আজাদ, মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী, মাওলানা

শওকত আলী, মাওলানা মোহাম্মদ আলীসহ অসংখ্য আলেমের কঠিন ত্যাগে এ ভূমি ব্রিটিশের হাত থেকে স্বাধীন হয়েছে। ১৯৪০-এর পর দ্বিজাতিতত্ত্বের প্রশ্নে মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী ও মওলানা শাব্বীর আহমদ ওসমানীর মধ্যে তীব্র মতানৈক্য দেখা দেয়। তাঁরা উভয়ে সঙ্গত যুক্তি দেখিয়ে নিজ নিজ মতের ওপর অবিচল থাকেন। মাওলানা শাব্বীর আহমদ ওসমানী অনেক চেষ্টা করেছেন মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী কে বুঝাতে— অতীত থেকে আমাদের অনেক তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে হিন্দুদের জাহেলী মানসিকতা সম্পর্কে। তাই আমাদের পৃথক হয়ে যাওয়া উচিত। তখন হোসাইন আহমদ মাদানীও অনেক মজবুত দলিল পেশ করতেন নিজের মতের পক্ষে। মোদ্দাকথা, কেউ সহমত পোষণ করেননি। উলামায়ে কেরাম তখন দুই প্লাটফর্মে অবস্থান নেন। মওলানা আবুল কালাম আজাদসহ একদল আলেম মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী (রহঃ)-এর সঙ্গে থাকেন। আবার মাওলানা আশরাফ আলী থানবী, মাওলানা জাফর আহমদ উসমানী, মুফতি মোহাম্মদ শফি, আমাদের মাওলানা মোহাম্মদুল্লাহ হাফেজ্জি হুজুর, মাওলানা আত্হার আলী, মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরীসহ আলেমদের বিরাট আরেক দল ছিলেন মাওলানা শাব্বির আহমদ উসমানীর সঙ্গে। এ হলো ভারতবর্ষের কথা। এরপর ইতিহাসের চাকা আরো সামনে বাড়তে থাকে। দল হয়, দল ভাঙে। আন্দোলন, সংগ্রাম, রক্ত ঝরে। এক সময় সামরিক শাসক আইউব খান বন্দুকের নলের মাথায় ক্ষমতা নিয়ে নিলে আবারো ইংরেজদের প্রেতাত্মা আমাদের ঘাড়ে চেপে বসে। এরপর এলো আইউবের বংশধর ইয়াহিয়া খান। শুরু হয় জুলুম-নির্যাতন, বঞ্চনা। বাঙালিরা বাঁক ঘুরে দাঁড়ায়। অনেক আলেমও এ সময় পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অবস্থান নেন। কেউ কেউ সরাসরি অস্ত্র হাতে ঝাঁপিয়ে পড়েন। কেউবা সাধ্যমত স্বাধীনতাকামীদের সাহায্য করেছেন।

আমি তখন চাষাড়ায় ছিলাম। মিশন পাড়া জামে মসজিদের পেশ ইমাম ও খতিব। মনে চাইত, প্রবলভাবে কামনাও করতাম– দেশ স্বাধীন হোক। বর্বরদের এ অন্ধকার যুগের অবসান ঘটুক। আমার ঘরের আঙ্গিনায় পতপত করে উড়ুক বাংলাদেশের লাল সবুজের পতাকা। কিন্তু মসজিদের ইমাম-খতিব হওয়ার কারণে প্রকাশ্যে কোনো পক্ষে অবস্থান নিতে পারতাম না। মসজিদে কথা বলতে হতো আমার উভয় পক্ষকে লক্ষ রেখে মেপে মেপে। তবে গোপনে সাধ্যমত সাহায্য-সহযোগিতা করতাম। সবাইকে নিয়ে দোয়া করতাম। কাঁদতাম। আল্লাহ! দেশের জন্য যারা জান দিয়েছেন তাদের তুমি রক্ষা করো। মুক্তি দাও!



মুক্তিযোদ্ধা মাওলানা মির্জা মোঃ নূরুল হক সহযোগী হিন্দু মুক্তিযোদ্ধাকে বললেন, যুদ্ধের ময়দানে ঘোড়ার গোশত খাওয়াও আমাদের জন্য জায়েজ। হিন্দুর সঙ্গে খেতেও আমাদের কোনো বাধা-নিষেধ নেই

আবারো সেই নাগেশ্বরী-ভুরুঙ্গামারী। মুক্তিযুদ্ধের কঠিন রণক্ষেত্র। সেই ভুরুঙ্গামারীরই আরেক মুক্তিযোদ্ধার সন্ধান দিলেন মাওলানা মতিউল ইসলাম। আড়াইহাজার থেকে নতুন মুক্তিযোদ্ধার ঠিকানা পেয়ে আমরা চলে যাই সরাসরি ঢাকার গা ঘেঁষা বন্দর নগরী নারায়ণগঞ্জে। চাষাড়া মোড়ে নেমে খুঁজে খুঁজে হাজির হই পুরনো আমলের এক লাল ইটের বাড়ির সামনে। এখানে সেখানে আস্তর খসে খসে পড়ে আছে। বাড়ির খসে যাওয়া শরীরে গজিয়ে ওঠা উদ্ভিদও জানান দিচ্ছে ইতিহাসের সাক্ষী আমরাও। গেটে দাঁড়িয়ে আওয়াজ দিতেই ভেতর থেকে এক তরুণ বেরিয়ে আসে। সাংবাদিক পরিচয় পেয়ে সাগ্রহে সে আমাদের ঘরে নিয় যায়। চেয়ার দেখিয়ে বলে, বসুন। বসে বসে সামান্য চা, বিস্কুট খান। বাবাকে সংবাদ দিচ্ছি। দশ মিনিটের মতো আমাদের অপেক্ষা করতে হলো। ঘরে ঢুকলেন ষাটোর্ধ্ব ঘন সফেদ শ্মশ্রুমণ্ডিত এক মুরব্বি টাইপের মানুষ। আমরা সালামের জবাব দিয়ে নিজেদের নাম বললাম। উদ্দেশ্যটুকুও তাকে খুলে বললাম। কী যেন ভাবলেন তিনি। দীর্ঘকায় বলশালী দেহটি কাত করে পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটি ভিজিটিং কার্ড বের করে টেবিলের ওপর তা বাড়িয়ে দেন। চেয়ারে হেলান দিয়ে তিনি আরাম করে ইঙ্গিত করলে কার্ডটি তুলে নেই। ওটা উঠিয়ে নিয়ে চোখ বুলাই সাদা শক্ত-মোটা কাগজের নীল বর্ণমালাগুলোর ওপর।



মির্জা মোঃ নূরুল হক

অধ্যক্ষ, নারায়ণগঞ্জ ইসলামিয়া আলিয়া (কামিল) মাদরাসা কেন্দ্রীয় ঈদগাহ, চাষাড়া, নারায়ণগঞ্জ।

সভাপতি, বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষক সমিতি

সভাপতি, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা ওলামা ফ্রন্ট

ফোন : ...

পরিচয় পর্ব শেষ করে মূল আলোচনায় যাই। বিভিন্ন প্রশ্নের মাধ্যমে আমরা তার জীবনের উল্লেখযোগ্য অংশ শুনি। নোট বুকে টুকে নিই চুম্বকাংশটুকু। মুক্তিযোদ্ধা মাওলানা মির্জা মোঃ নূরুল হক জীবনের শুরু অংশ কাটিয়েছেন ভারতের কুচবিহার জেলার দিনহাটা থানায়। সেখানেই ছিল তার মূল বাড়ি-ঘর, আত্মীয়-স্বজন।

'৪৭-এ দেশ ভাগের সময় ওই এলাকাটি মুসলিম আধিক্যের কারণে পাকিস্তানের ভূখণ্ড হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু দেবাশ্রিত জাতির কূটচালে শেষ পর্যন্ত তাদের হাতেই রয়ে যায় এলাকাটি। এ বিষয়টি যেমন নিখিল পাকিস্তানের মুসলমানগণ ভালো চোখে দেখেনি। তেমনি স্থানীয় মুসলমানগণও মেনে নেননি। তাই সাবেক প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের পিতা মকবুল হোসেন মুক্তার, মির্জা মোঃ নূরুল হকের পিতা মির্জা মোঃ সিরাজ আলীসহ একদল স্থানীয় সাহসী মুসলমান সেখানে একদিন পাকিস্তানের পতাকা ওঠান। সংবাদ পেয়েই ভারতীয় কেন্দ্রীয় সরকার কুচবিহারের হিন্দু মহারাজাকে গ্রেফতার করে। আর যারা পতাকা ওঠায় তাদের ধরে এনে সীমান্ত পার করে সবাইকে পাকিস্তানে পাঠিয়ে দেয়। হিন্দুদের নির্মম শিকার মুসলমানগণ তখন বিভিন্ন জায়গায় নিজেদের আবাসস্থল করে নেন। মির্জা সাহেবের পিতা ঢেরা গাড়েন কুড়িগ্রাম জেলার ভুরুঙ্গামারী থানার শিংঝর গ্রামে। বিডিআর ক্যাম্পের আধা মাইল পশ্চিমে। ৩ ভাই ৪ বোনের মাঝে তিনিই সবার বড়। বাবা ছিলেন পেশায় ব্যবসায়ী। '৬৭-এ তিনি নাগেশ্বরীতে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। বলা যায় ওই মাদরাসা দিয়ে মুক্তিযোদ্ধা মাওলানা মির্জা সাহেবের কর্মজীবন শুরু।

'৭১ নিয়ে তিনি তার অভিজ্ঞতার কথা আমাদের শোনান। একদিন তিনি বাড়িতে ছিলেন। সকাল ১০টার দিকে এক লোক এসে বলে, বেলুচ ক্যাপ্টেন আপনাকে ডাকে। এখনই যেতে হবে। তিনি প্রথমে দ্বিধায় পড়ে যান, দেখা করবেন নাকি পালাবেন। মতলব খারাপ থাকলে তো আর রক্ষা নেই, সরাসরি ফায়ার স্কোয়াডে। সাহস করে সিদ্ধান্ত নেন তিনি দেখা করবেন। বিস্‌মিল্লাহ বলে ঘর থেকে বের হন। বেলুচ ক্যাপ্টেনের কাছে এসে শুনেন, আটিয়ালডাঙ্গা থেকে পাকিস্তানিদের ওপর কে যেন একটি শেল নিক্ষেপ করেছে। তাই ক্যাপ্টেন ভীষণ চটা। পরিস্থিতি থমথমে। তার কাছ থেকে স্থানীয় হিন্দুদের সম্পর্কে কিছু তথ্য নিয়ে ভুরুঙ্গামারী ত্রিমোহনী এনে তাকে নামিয়ে দেয় বেলুচ ক্যাপ্টেন। গাড়ি চলে গেলে তিনি হেঁটে বাড়ির পথে এগুলোই এক পাকসেনা রাইফেল তাক করে তার দিকে। গুলি করবে এমন সময় এক লোক দৌড়ে আসে। চিৎকার করে বলে, বেলুচ ক্যাপ্টেন সাবকা দোস্ত হ্যায়। বেঁচে যান তিনি।

মুক্তিযোদ্ধা মাওলানা মির্জা মোঃ নূরুল হক যে গ্রুপটিতে ছিলেন সেটির পরিচালনায় ছিলেন ক্যাপ্টেন বুরহানুদ্দীন ও কর্নেল নওজেশ। অস্ত্র হাতে লড়ার পাশাপাশি তার দায়িত্ব ছিল পাকসেনাদের অবস্থান সম্পর্কে খোঁজখবর দেওয়া। তাই দিনের বেলা তিনি সুপারি বিক্রি করতেন। এই ব্যবসার আড়ালে নিজ কর্তব্যটুকু পালন করতেন। দুই গ্রুপে মুসলমানের সঙ্গে হিন্দুরাও যুদ্ধ করত পাকসেনাদের বিরুদ্ধে। তেলিয়ানির পাড় ছিল তার শ্বশুরবাড়ি। ওই এলাকার প্রতিটি বাড়িতেই মুক্তিযোদ্ধাদের পালাক্রমে খাওয়ার

ব্যবস্থা করা হতো। সবাই স্বেচ্ছায় এ আয়োজনে শরীক হত। তখন ছিল রমজান মাস। মুক্তিযোদ্ধাদের সবাই রোজা রাখত। সেহরি-ইফতার এক প্লেটে দু'জন দু'জন করে খেতে হতো। একদিন দেখেন তার সঙ্গে যে মুক্তিযোদ্ধা খাবে সে চুপচাপ বসে আছে। খাচ্ছে না। মির্জা সাহেব কিছুটা অবাক হয়ে জানতে চান, খাচ্ছেন না কেন? উত্তর করে লোকটি, আমি হিন্দু। মুক্তিযোদ্ধা মির্জা সাহেব বলেন, যুদ্ধের ময়দানে ঘোড়ার গোশত খাওয়াও আমাদের জন্য জায়েজ। হিন্দুর সঙ্গে খেতেও আমাদের কোনো বাধা-নিষেধ নেই। নিন, দ্রুত হাত চালান। হিন্দু লোকটি খাওয়া শুরু করে।

মুক্তিযোদ্ধা মির্জা সাহেব জানালেন, তাদের অভিযানগুলো সব সময়ই রাতে হতো। এমনকি ১৫ ডিসেম্বর রাতেও এক ভয়াবহ সংঘর্ষ হয় খানসেনাদের সঙ্গে। স্থানটি ছিল সৈয়দপুর। ভারতীয় বাহিনী সম্পর্কে তিনি বলেন, আমরা সব সময় আগে আগে থাকতাম। তারা থাকত পেছনে। কম করে হলেও ৬ মাইল। ওয়ারলেসে যোগাযোগ করে সামনে বাড়ত তারা। তবে লড়ত না।

'৭১ নিয়ে তার সর্বশেষ তথ্য হলো, পাক হানাদার চলে যাওয়ার সময় নাগেশ্বরীর বিভিন্ন স্থানে মাইন পুঁতে যায়। যে মাইন ছিন্নভিন্ন করেছে শুধু গ্রাম্য অসহায় পরিবারের দেহগুলোকে।

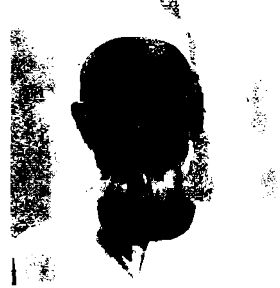
তার নারায়ণগঞ্জ আসার ঘটনাটি এ রকম। '৮৬-এর ২০ অক্টোবরের দিকে তার গ্রামের মাদরাসার এক কাজে ঢাকায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে আসতে হয়। সচিবের সঙ্গে কথা বলার সময় সেখানে গিয়ে হাজির হন নারায়ণগঞ্জের ডিসি আবু তাহের। সচিবকে বলেন, আমাদের মাদরাসায় কোনো প্রিন্সিপ্যাল নেই। একজন দক্ষ লোক চাই। সচিব তখন মির্জা সাহেবকে বলেন, আপনি নারায়ণগঞ্জে চলে যান। মির্জা সাহেব আপত্তি জানান, গ্রামে তার নিজস্ব মাদরাসা আছে। পরিবার নিয়ে বেঁচে থাকার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে জায়গা-সম্পত্তি, ঘর-দোয়ার আছে। দীর্ঘকালের পরিচয়ের একটি সুখময় সেতুবন্ধনও আছে সবার সঙ্গে। ওই এলাকার লোকেরাও তো...।

সচিব কোনো যুক্তিই মানতে নারাজ। এক ধরনের জোর করেই তাকে নারায়ণগঞ্জ মাদরাসার অধ্যক্ষের পদে নিয়োগ দেন। থাকার জন্য ব্যবস্থা করেন এখন সেকেলে হলেও সে সময়ের সরকারি এক বিশাল বাড়ি। যা আজো দাঁড়িয়ে আছে সময়ের সাক্ষী হয়ে। যেভাবে তিনি বেঁচে আছেন ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে।



“ওদেরও তো শারীরিক চাহিদা আছে। তাই পাক আর্মিদের জন্য নারী ভোগ জায়েজ!” গঙ্গাচড়ার মুক্তিযোদ্ধা মাওলানা আলিফুর রহমানের স্মৃতিতে রাজাকার প্রধান জামায়াত নেতা তসলিমের এ উক্তিটি এখনো মনকে ক্ষত-বিক্ষত করে

রাস্তার দু'পাশে যতদূর চোখ যায় কেবল ধান আর ধানের জমিই চোখে পড়ছে। প্রভাতী সোনালি সূর্যের আলোয় সোনালি ধানগুলো সোনার মতো খাঁটি আর চকচকে মনে হচ্ছিল। মাইলের পর মাইল জমি পেরিয়ে যাচ্ছি রংপুরের মঙ্গাপীড়িত গঙ্গাচড়ায়। জীবন-পরিবেশ, পৃথিবী, অর্থ-শোষণ এসব কিছুর সঙ্গে লড়াই করেই বেঁচে থাকেন এ অঞ্চলের মানুষ, ঠিক যেমনটা লড়াই করেছেন '৭১-এ পাক হানাদারদের বিরুদ্ধে। গঙ্গাচড়ার মুক্তিযোদ্ধা মাওলানা আলিফুর রহমানের সাক্ষাৎ লাভই আমাদের প্রাথমিক উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্যের নাগাল পেতে ভ্রমণটা অবশ্য শুরু হয়ে গেছে আগের দিন রাত ৯টায়ই। আমি এবং ফায়জুল যথারীতি গল্পে গল্পে, ঘুমে ঘুমে আর বাসের ঝাঁকুনিতে রাতটা পার করে ঢাকা থেকে রংপুর চলে এলাম ভোর ছ'টায়। দেশের দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চল সফর শেষে উত্তরাঞ্চলে এবার আলেম মুক্তিযোদ্ধার খোঁজে।



গঙ্গাচড়ার পথ ধরে যেতে যেতে

রংপুর শহর থেকে গঙ্গাচড়া প্রায় ১৫ কিলোমিটারের পথ। কার্তিকের সকালে মৃদু শীতল হাওয়ায় রিকশায় চড়ে এগুচ্ছি শহর থেকে গ্রামে চলে যাওয়া পিচঢালা পথ ধরে। পথের দু'পাশে বাড়ি-ঘর ছাড়া আর কিছু থাকলে শুধুই ধানের জমি ছিল একরের পর একর। তারপরও এখানে কেন মঙ্গা হয়? প্রশ্ন ফায়জুলের। এ এলাকায় আগে আসার সুবাদে আমি জবাব দিলাম, এখানে যাদের আছে তাদের অনেক আছে আর যাদের নেই তাদের কিছুই নেই। ধানের সময় ছাড়া অন্য সময় কাজ থাকে না। তাই অভাব লেগেই থাকে। আসলে সম্পদের অসম বন্টন হলে তার পরিণতি কি হয় তাই দেখতে পাওয়া যায় এখানে। অধিক শ্রমে চরম অর্থনৈতিক শোষণের শিকার এ অঞ্চলের মানুষ। এই অর্থনৈতিক শোষণই তো '৭১-এ শক্তি যুগিয়েছিল মুক্তির আলো ছিনিয়ে আনতে।

স্বাধীনতার এত বছর পরও এখানকার মানুষ সেই মুক্তির আলোর সন্ধানে সংগ্রাম করে যাচ্ছে দিনরাত। তা না হলে কাক ডাকা ভোরে কেনইবা এত মানুষ পিচঢালা পথে বেরিয়ে পড়েছেন। কেউ হেঁটে যাচ্ছেন, কেউ সাইকেলের প্যাডেল চেপে যাচ্ছেন শহরে দু'মুঠো জীবিকার আশায়। শহরমুখী বিশাল সাইকেলের বহর। মনে হয় যেন এ সাইকেলই তাদের পুঁজি, জীবনের অবলম্বন। ১০ টাকায় ২৪ ঘন্টার জন্য সাইকেল ভাড়া পাওয়া যায় এ অঞ্চলে। সামর্থ্য হলে সাইকেল কিনে নিতে দ্বিতীয়বার ভাবতে হয় না এ অঞ্চলের মানুষদের। অবশেষে মৌলভীবাজার নামক এক বাজারে গিয়ে থামল আমাদের রিকশা। সেখান থেকে গ্রামীণ মেঠো পথ ধরে পৌঁছে গেলাম মাওলানা আলিফুর রহমানের বাড়ি। সাইকেল যেখানে জীবনের অবলম্বন সেখানে মাওলানা আলিফুর রহমানের সঙ্গী কেন হবে না সাইকেল। বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেই না প্যাডেলিং করবেন সাইকেলে, অমনি আমরা গিয়ে পৌঁছলাম তাঁর সামনে। পরিচয় পর্ব পেরিয়ে প্রবেশ করলাম মূল আলোচনায়।

বাপ-বেটার লড়াই

মাদরাসা পড়ুয়া ছেলে আওয়ামী লীগের হয়ে কাজ করবে এটা যেন কল্পনাই করতে পারেনি আলিফুর রহমানের বাবা। এমনিতেই গঙ্গাচড়া তখন জামায়াতে ইসলামীর ঘাঁটি ছিল। আলিফুর রহমানের বাবা ছিলেন জামায়াতের সমর্থক। '৭১-এ মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে টগবগে তরুণ আলিফুর রহমান গ্রামের যুবক হালিম, সাব্বির প্রমুখের সঙ্গে যোগ দেয় আওয়ামী লীগে। পথে-ঘাটে, হাটে-বাজারে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত তৈরির চেষ্টা করে। দ্রুত নালিশ চলে যায় বাবার কাছে। মাওলানা আলিফুর রহমানের ভাষায়– বাবা একদিন আমাকে ডেকে ধমকে বললেন, তুই কোথায় যাস? আলেম হয়ে হিন্দুদের সঙ্গে তোর ওঠা-বসা কেন? আমি জবাব দিলাম, আলেম হয়েছি বলে কি মুক্তিযুদ্ধ করতে পারব না? কেন বাবা! কোরআনে কি জালেমের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর কথা আছে না? আমার কথায় বাবার মন গলল না। তিনি কিছুতেই আমাকে যুদ্ধে যেতে দিতে নারাজ। আমি যখন স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিলাম আমি মুক্তিযুদ্ধ করবই, তখনই বাবা আরও কঠোর সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি তার সমস্ত সম্পদ আমার বড় ভাই আনিসুর রহমানের নামে উইল করে দিলেন। অনেকটা ত্যাজ্যপুত্র করার মতো। এসব নিয়ে তখন আমার মাথা ঘামাবার সময় নেই। আমাকে এখন ভারত যেতে হবে। প্রশিক্ষণ নিয়ে হানাদারদের প্রতিরোধ করতে হবে। আমরা তরুণরা একত্রিত হলাম ভারত যাব, অন্যদের ভারতে যেতে সহায়তা দেব। হিন্দুরা এসে আমাকে জিজ্ঞেস করল– মাওলানা, আমরা এখন কি করব? আমি তাদের আশ্বস্ত করে বললাম, তিস্তা নদী পার হয়ে ভারতে যাব। আমাদের আদি বাড়ি ছিল মূলত তিস্তা নদীর পারেই। নদী ভাঙনের কারণে এখন এখানে এসে বাড়ি করেছি। তাই নদী ঘাটের ব্যাপারটা আমার বেশ ভালো চেনা। ঘাটিয়ালকে বলে দিলাম এক পরিবারকে পার করে দেয়ার জন্য পাবে ২৫ পয়সা। লোকজন দলবেঁধে পার হতে লাগল। আমরা সিতাই বন্দরে গিয়ে থামলাম। সেখানে ক্যাম্প হলো। গঙ্গাচড়ার তৎকালীন এমপি সিদ্দিক সাহেব মিটিং করলেন, মুক্তিবাহিনী গড়লেন। শামসু মাস্টার আমাকে মুক্তিবাহিনীতে ভর্তি করে দিলেন। শুরু হলো নতুন

জীবন। ট্রাক নিয়ে মিছিল করতে করতে চলে গিয়েছিলাম জলপাইগুড়ি। আমাদের স্লোগান ছিল 'জয়বালা-জয়হিন্দ, মুজিবকে শক্তি দিন'। ক্যাম্পে চিড়া ছিল আমাদের নিয়মিত খাবার। এভাবে ১৫ দিন চলে গেল। বাড়িতে ছেলে-মেয়ে-স্ত্রীর কথা মনে পড়ে গেল। পৈতৃক বাড়ি নয় শ্বশুরবাড়ি যাবার ছুটিও পেয়ে গেলাম। শ্বশুরবাড়িতে স্ত্রী, ছেলে-মেয়েকে নিরাপদে দেখে আশ্বস্ত হলাম। কিন্তু এদিকে গঙ্গাচড়া আমাদের বাড়িতে বারবার হানা দেয়া হচ্ছে বলে জানতে পারলাম। পরিবারের ওপর টর্চার চালাচ্ছে রাজাকাররা আমাকে খুঁজতে গিয়ে। অন্য মুক্তিযোদ্ধাদের খোঁজেও চলছে গ্রামে রাজাকার হানাদারদের হিংস্র থাবা। এ সংবাদ নিয়ে আমি হাজির হলাম ক্যাম্পে। শামসু মাস্টার তখন আমাকে দিলেন নতুন অ্যাসাইনমেন্ট। বললেন, তুমি তোমার গ্রামেই চলে যাও। সেখানে থেকে রাজাকারদের গতিবিধি লক্ষ রাখো। তাদের অবস্থান, কার্যক্রম সম্পর্কে জানা হবে তোমার প্রধান কাজ। ঠিকই আমি মাথায় টুপি দিয়ে চলে এলাম গঙ্গাচড়া। লোকজন জিজ্ঞেস করলে যখন যে পাশে বৃষ্টি আসে সেদিকে ছাতা ধরতে হয়। আর এদিকে লোকের আড়ালে চলত গোয়েন্দা কাজ। বন্ধু সাব্বিরের ছেলে কাশিমকে আমি কৌশলে ভর্তি করালাম রাজাকার বাহিনীতে। যে রাজাকারদের সব খবর পৌঁছে দিত আমার কাছে। আমি তা নিয়ে বুড়িরহাট সীমান্ত পাড়ি দিয়ে যেতাম আমাদের ক্যাম্পে। বুড়িরহাট সীমান্তে আবার পাক আর্মির ব্যাংকার ছিল। সেখানে কখন কতজন সেনা থাকে এসব তথ্য পৌঁছে দেয়াও ছিল আমার কাজ। যুদ্ধের প্রায় শেষ পর্যায়ে এসে একদিন তো আমি প্রায় ধরাই পড়ে গিয়েছিলাম। সাইকেল নিয়ে নদীর তীর ঘেঁষে যাচ্ছি। তখন দু'জন সেনা টহল দিচ্ছিল সেখানে। আমাকে দেখে ফায়ারিং করল। দাঁড়ালাম আমি। জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাচ্ছিস। আমি বললাম, সামনে যাচ্ছি। সেখানে আমাদের বাড়ি। তারা জানতে চাইল সঙ্গে কি আছে। আমি বললাম, 'পাঁচ রুপিয়া হ্যায়।' পাঁচ রুপি দিয়ে সেখান থেকে কেটে পড়লাম আমি। আসলে আমি যাচ্ছিলাম ওপারে তথ্য জানাতে। দু' সেনা এখানে আছেন এ তথ্যটা জেনে যাবার পর মুক্তিবাহিনী আর দেরি করল না। সেদিনই তাদের শেষ করে দিল। এর পরই চলে এলো ১৬ ডিসেম্বর। সেদিন রংপুর চলে এসে আমরা আনন্দ মিছিলে যোগ দিলাম।

মুক্তিযুদ্ধের পর '৭২ সালে বাবা মারা গেল। এদিকে সব সম্পত্তি বড় ভাই ও ছোট ভাই বুঝে নিয়েছে। মাঝখানে আমি দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলাম। একদিন বড় ভাই আমাকে ডেকে বললেন, বাবা সেদিন মন থেকে নয় বরং শুধু শাসন করার জন্যই উইল করেছিল। বাবার সম্পত্তি আমাদের সব ভাইদের মাঝে সমানভাবেই বণ্টিত হবে। পরে ঠিক তাই হলো।

এরই মধ্যে কিন্তু বড় ভাই আনিসুর রহমান আমাদের আলোচনায় হাজির হয়ে গেছেন। অকপটেই ছোট ভাইয়ের কথার সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করলেন।

এভাবে প্রায় ত্যাজ্যপুত্র হয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে এতটা মানসিক শক্তি কোথা থেকে পেলেন এ প্রশ্নের জবাবে মাওলানা আলিফুর রহমান বললেন, '৭১-এ নয় আরও অনেক আগেই আমি বাঙালির মুক্তির মন্ত্র শিখেছি। ১৯৫৫ সালে যখন আমি দাখিল শ্রেণীর

ছাত্র, তখন পীরগাছায় যুক্তফ্রন্টের এক বিশাল জনসমাবেশ হলো। আমরা কয়েকজন মাদরাসা ছাত্র অংশগ্রহণ করলাম। সেখানে জাতীয় নেতাদের বক্তৃতা শুনলাম। সেই থেকে আমার চিন্তা-ভাবনায় বড় পরিবর্তন আসল। পরবর্তীতে ধীরে ধীরে আওয়ামী লীগের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে নিজেকে জড়াতে লাগলাম পরিবারের অগোচরে। এভাবেই মূলত আমি স্বাধীনতা যুদ্ধে সম্পৃক্ত হয়ে যাই।

পাকসেনাদের জন্য ওটা জায়েজ!

মুক্তিযুদ্ধের সময়কার এক লোমহর্ষক ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে মাওলানা আলিফুর রহমান বললেন, একটা ঘটনা এখনো মনে পড়ছে, রাজাকাররা পাকসেনাদের মনোর নের জন্য মেয়েদের ধরে নিয়ে আসত ক্যাম্পে। একবার আমাদের গ্রাম থেকে একটি মেয়েকে ধরে নিয়ে আসার পর বাবা এসে তখনকার জামায়াতে ইসলামী এবং স্থানীয় রাজাকার বাহিনীর প্রধান তসলিম উদ্দিন-এর কাছে নালিশ করল– আমার মেয়েকে ধরে নিয়ে গেছে, তাকে উদ্ধার করার ব্যবস্থা করুন। তার উত্তরটা ছিল এরকম– পাকসেনারা বাইরে থেকে আসছে, পরিবার ছাড়া তিন মাস, ছ' মাস এখানে থাকছে, তাদেরও তো শারীরিক চাহিদা আছে। তাই তারা ওসব করলে ওটা জায়েজ হবে! কেবল তসলিম রাজাকার নয়, আরো অনেক রাজাকার ছিল যারা এভাবেই নারী, বাড়ি-ঘর লুণ্ঠন করেছে।

স্বাধীনতার ৩৬ বছর পর এখন যখন দেখি সেই রাজাকাররা বিচার করছে, ক্ষমতার স্বাদ পাচ্ছে, তখন মনটা দুঃখের সাগরে ভেসে যায়। তখন এদের সাধারণ ক্ষমা করাটা আমাদের জন্য ভুল ছিল। সেদিনের ভুলের সুযোগ নিয়ে তারা এখন আবার আগ্রাসী হয়ে উঠতে চাইছে। তাদের বিচার না হলে তারা আগামীতে আবার শোষণ করতে চাইবে। আমি মনে করি যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হোক। তাদের নির্বাচনে অযোগ্য ঘোষণা করা হোক।

মাওলানা আলিফুর রহমান ১৯৬৩ সালে সিরাজগঞ্জ আলিয়া মাদরাসা থেকে কামিল পাস করেন। তারপর হাজীরহাট দাখিল মাদরাসায় দু' বছর শিক্ষকতা করেন। একই সঙ্গে রংপুর কলেজ থেকে ডিগ্রি লাভ করেন। পরবর্তীতে ১৯৬৫–৭৬ সাল পর্যন্ত গজখণ্ড হাই স্কুলে শিক্ষকতা করেন। এরপর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আওতায় ২০০৪ সাল পর্যন্ত চাকরিতে ছিলেন। পাঁচ ছেলে এক মেয়ে নিয়ে তার সংসার জীবনের এ প্রান্তে এসে স্বাধীনতার স্বাদ সম্পর্কে তার মন্তব্য– সৎ মনোভাবসম্পন্ন যোগ্য ব্যক্তিদের হাতে দেশ পরিচালিত হোক এটাই আমাদের স্বপ্ন।



রংপুরের দুই বন্ধু (কারী আবদুস সালাম সরকার ও মাওলানা মোহাম্মদ আলী)'র একাত্তরের গল্প

গ্রামবাংলার চিরপরিচিত সবুজের বুক চিরে আবার শহরের কৃত্রিম চাকচিক্যময় ভুবনে চলে এলাম। সঙ্গে নিয়ে এলাম মঙ্গাপীড়িত গঙ্গাচড়ার নীরব দরিদ্র কিন্তু সংশপ্তক এক অঞ্চলের প্রতিচ্ছবি। যেখানে প্রতিনিয়ত চলছে মানুষের বেঁচে থাকার সংগ্রাম। রংপুর শহরে সেই প্রতিচ্ছবির ছায়া নেই। আছে পরিপাটি সড়ক, অলি-গলি, ইটের পিঠে গড়া ভবন আর ভবন। কিন্তু তা দিয়ে কি নীরব দরিদ্রতা মুছে ফেলা যায়! রংপুর শহরের বাহারকছনায় বাস করেন মুক্তিযোদ্ধা মাওলানা কারী আবদুস সালাম সরকার। পেশায় তিনি একজন দলিল লেখক। তার পেশাস্থল রংপুর জেলা ভূমি অফিস। গঙ্গাচড়া থেকে সরাসরি রিকশা করে এখানে।



অপেক্ষার পালা শেষে

রংপুর জেলা ভূমি অফিসের সামনে দলিল লেখকদের জন্য বড় টিনশেডের ছাউনি আছে। সেখানে সারিবদ্ধভাবে বসেন তারা। সকাল দশটায় মাওলানা আবদুস সালাম সরকার এখানে আসার কথা থাকলেও এসে পৌছতে দেরি হচ্ছিল। শুরু হলো অপেক্ষার পালা। এ সুযোগে অবশ্য আশেপাশের পরিবেশটাতে বেশ ভালোভাবে চোখ বুলিয়ে নিলাম। শহরের সড়ক ও ড্রেনেজ ব্যবস্থা যথেষ্ট উপযোগী। যানজটের কোনো চিহ্নমাত্র চোখে পড়েনি। পত্রিকার পাতায় চোখের পাতা ফেলতে ফেলতে ঘণ্টা দেড়েক চলে গেল। তারপরও দেখা নেই সালাম সরকারের। জীবনে কখনও দেখা হয়নি, কথা হয়েছে বেশ ক'বার। কেমন হবেন সালাম সরকার, কেন-ই-বা এত দেরি। ঘণ্টা দুয়েক পর শ্মশ্রুমণ্ডিত পঞ্চাশোর্ধ্ব সুঠাম দেহের ব্যক্তিটি নিজেকে আমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন আবদুস সালাম সরকার হিসেবে। বেশ ঘটা করে পরিচয় পর্বটা সেরে ফিরে যেতে চাইলাম '৭১-এ।



'৭১-এ বয়স মাত্র উনিশ। এখন যে পেশায় যেখানে বসা তখন ঠিক সেখানে সে পেশায়ই ছিলেন আলেম মুক্তিযোদ্ধা আদুস সালাম সরকার। মূলত ৬৫ সাল থেকেই

পারিবারিকভাবে গতানুগতিক ধারার বাইরে ছিলেন জনাব সালাম সরকার। তাঁর তিন মায় ঘরে তারা উনিশ ভাই ছিলেন। '৭১-এ এদের একজনও বেঁচে ছিল না। কারিয়ানা বিদ্যা বাবা-মার আদরে থাকাকালীন শেষ করলেও ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে থাকা অবস্থায় বাবা মারা যান। অবশ্য আপন মা বেঁচে ছিলেন ১০৩ বছর বয়স পর্যন্ত। '৭১-এর স্মৃতিকথায় ফিরে যেতে গিয়ে তিনি বললেন, মার্চ কিংবা এপ্রিলে সাহেবগঞ্জে পাকিস্তান আর্মিরা ২১ জন বাঙালি আর্মিকে মেরে ফেললে আমাদের মধ্যে চেতনা আসে, আর বসে থাকার সময় নয়, এখনই ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে হানাদারদের প্রতিরোধে। বৃহত্তর রংপুরের মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার মোস্তাফিজুর রহমানের সহায়তায় আমি ভারতে দেনাটানায় চলে যাই। সেখানে মাসখানেক প্রশিক্ষণ নেই। প্রশিক্ষণ শেষে দেশে অপারেশনের দায়িত্ব পাই।

'অপারেশন পত্রিকা'

ঘটনাটা শুনার পর ফায়জুল-এর নাম দিয়েছেন 'অপারেশন পত্রিকা'। নামকরণের সার্থকতা খুঁজতে ঘটনার চুলচেরা বিশ্লেষণ হতে পারে। কিন্তু তার চেয়ে বড় বিষয় হলো, 'অপারেশন পত্রিকা' পরিচালনায় পুরোপুরি সফল ছিলেন মাওলানা আবদুস সালাম। সাইকেলের সিট কভারে 'বাংলার বাণী' পত্রিকা নিতেন। কোমরে থাকত গ্রেনেড। সুবিধামত স্থানে গ্রেনেড ছুড়তেন, আর পত্রিকা বিতরণ করতেন বাঙালি অফিসারদের মাঝে। এরকমই একদিন কোমরে গ্রেনেড নিয়ে এবং সিটে পত্রিকা সামলিয়ে যাচ্ছিলেন বাঙালি অফিসারের কাছে। এমন সময় পাকসেনাদের সামনে পড়লেন আবদুস সালাম। কোথায় যাস বলে জিজ্ঞেস করলে উত্তরে তিনি বললেন, অফিস মে যাতা হু। হয়তোবা উর্দু বলতে পারেন ওটা বুঝতে পেরে আর জেরা না করে ছেড়ে দিলেন তাকে। সেদিনের সেই গ্রেনেড উর্দুভাষী বিহারি ফল পট্টিতে চার্জ করে শোধের ষোলআনা পূর্ণ করলেন।

আরেকটা অপারেশনের কথা জানালেন মাওলানা আবদুস সালাম। একইভাবে বিহারিদের ওপর অপারেশন চালালেন স্টেনগান দিয়ে। কিন্তু স্টেনগান-এর ম্যাগাজিন খোলা ছিল। তাতে গুলি ছিল। স্পিনে ত্রুটি ছিল। বড় ছেলের পায়ের কাছে সেদিন গুলিটা বেরিয়ে গেল। বিকট শব্দে মানুষজন দৌড়াদৌড়ি শুরু করলেন। আমি খুব ভয় পেয়ে গেলাম। এবার বুঝি আর রক্ষা নেই। তাৎক্ষণিক বুদ্ধি খাঁটিয়ে আমি বুঝাতে চাইলাম সাইকেলের টায়ার ফেটে শব্দ হয়েছে। শহরের টোবাকো সিগারেট কোম্পানির পাকিস্তানি দারোয়ান আমাকে ধরে বললেন, 'শালা তোমার গ্রামে গুলি হলো কেন?' এখানেও আমি টায়ার ফাটার কৌশল পেতে পার পেয়ে গেলাম।

পাটের আগাছা সরিয়ে ফেলেছি...

জামায়াতীদের উপহাসের পাত্র ছিলাম প্রথম আমরা। ২১ জন বাঙালি সেনাকে হত্যা করার পর আমার এক আত্মীয় রাজাকার আমাকে উপহাস করে বলেছিলেন, আমরা যে পাট করি তার আগাছা সরিয়ে ফেলেছে ২১ জনকে মেরে ফেলে। আমরা মুক্তিযোদ্ধারা সেসব উপহাসের যথার্থ জবাব দেয়ার চেষ্টা করেছি। পাকিদের হিংস্রতা দেখেছি ১৬ ডিসেম্বর যখন রংপুর মডার্ন সিনেমার কাছে তাদের ক্যাম্পে আসলাম। সেখানে

মেয়েদের বিচ্ছিন্ন হাত, পা, সোনার বালা, দেয়ালে অশ্রাব্য কথা দেখেছি। পৈশাচিক অহংকারে নারীদের নির্যাতন করে তা অশ্রাব্য ভাষায় দেয়ালে লেখে রেখেছিল। রাজাকার, আলবদর বাহিনী এসব মেয়ে সরবরাহ করত। আমার বিশ্বাস, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সে সময় যদি নিজ চোখে এসব দেখতে পেতেন তাহলে তিনি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করতেন না। যুদ্ধাপরাধীদের এখনও বিচার হওয়ার সুযোগ আছে। ইচ্ছে করলেই তাদের বিচার করা যেতে পারে। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করতে গিয়ে ধর্মীয় রাজনীতি নিষিদ্ধ করা হবে কি-না এ রকম একটা প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে বলেন, যুদ্ধাপরাধীর সঙ্গে ধর্মীয় রাজনীতির কোনো সম্পর্ক নেই। জামায়াতকে কোনো ধর্মীয় দল মনে করি না আমি। ধর্মের নামে ধোঁকা দিয়ে ধর্মীয় রাজনীতি করার দায় ধর্ম কেন বহন করবে? তাই ধর্মীয় রাজনীতি নয় বরং অপরাজনীতি আগে বন্ধ করা হোক।

রাজনীতি নিয়ে যখন আলোচনা জমে উঠল তখন তিনি হাতের মোবাইলটা চেপে তার এক রাজনৈতিক দ্বীনি ভাইকে এখানে আসার জন্য বললেন। সেই দ্বীনি ভাই নিজেও একজন আলেম মুক্তিযোদ্ধা। এর ফাঁকে ব্যক্তি আবদুস সালাম সরকারকে জেনে নেয়ার চেষ্টা চলল। ৮ ছেলে-মেয়ে ও স্ত্রী নিয়ে জনাব আবদুস সালাম সরকারের পারিবারিক জীবন। থাকেন রংপুর সদরের বাহারকাছনায়। সেখানেই তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন বায়তুল উলুম দাখিল মাদরাসা। নিজ এলাকায় মুক্তিযুদ্ধের পর জনপ্রিয়তার তুঙ্গে ছিলেন। ইউনিয়ন কাউন্সিলের মেম্বার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন ১৯৭৩ থেকে একাধারে ১৯৮৩ পর্যন্ত। এরপর আর কোনো মেম্বার নির্বাচন করেননি কেন তার জবাবটাও দিলেন সদীপ্ত কণ্ঠে এভাবে– ১৯৮২ সালে আমি চরমোনাই মাহফিলে যাই। আমার ভেতরে বড় ধরনের পরিবর্তন আসে। ক্রমান্বয়ে চরমোনাই-এর ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হই। ১৯৯১ ও '৯৬-এর সংসদ নির্বাচনে ইসলামী শাসনতন্ত্রের ব্যানারে রংপুর-৩ ও রংপুর-৪ আসন থেকে নির্বাচন করি। মাওলানা কারী আবদুস সালাম সরকার ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা সদস্য, রাজশাহী বিভাগীয় মুজাহিদ কমিটির সাধারণ সম্পাদক এবং কেন্দ্রীয় মজলিসে খাস-এর সদস্য। বর্তমানে তিনি বাহারকাছনা জুম্মাতারা জামে মসজিদের খতিব। খোলা টিনের ছাউনির নিচে সাদামাটা পাটির ওপর বসে বলতে থাকা মাওলানা সালাম সরকার এত দূর পর্যন্ত নিয়ে গেছেন নিজের ক্যারিয়ারকে তা সাদা চোখে দেখে বিশ্বাস করার নয়। এত কিছু করার পরও ধরে রেখেছেন নিজের পূর্বপুরুষের পেশা দলিল লিখন। পারিবারিক ও ধর্মীয় ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ এক ব্যক্তি আলেম মুক্তিযোদ্ধা আবদুস সালাম সরকার। ইতিমধ্যেই পৌঁছে গেছেন তাঁর আরেক দ্বীনি ভাই মাওলানা মোহাম্মদ আলী।

চায়ের চুমুকে ধরলা নদীর পাড়

মাওলানা মোহাম্মদ আলী মাওলানা আবদুস সালাম-এর ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং রংপুর জেলা মুজাহিদ কমিটির ইমাম কাম অডিটর সেই সঙ্গে রাজশাহী বিভাগীয় সহকারী ইমাম কাম অডিটর। ১৯৭৭ থেকে '৯০ পর্যন্ত রংপুর কোর্ট মসজিদের ইমাম হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। মরহুম পীর এসহাক সাহেবের সময় থেকে চরমোনাই-এর সঙ্গে সম্পৃক্ত বলে জানালেন মাওলানা মোহাম্মদ আলী।

মুক্তিযুদ্ধে কিভাবে জড়ালেন তা জানতে চাইলে মাওলানা মোহাম্মদ আলী বললেন, তখন আমার বয়স ১৮ বা ১৯ বছর। স্থানীয় আলিয়া মাদরাসার ছাত্র। যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে বাড়িতে ফিরে এলাম। কুড়িগ্রাম জেলার নাগেশ্বরীতে আমাদের বাড়ি। এখানে আসার পর জানতে পারলাম পাক হানাদাররা ধরলা নদী পার হয়ে আমাদের দিকে ধেয়ে আসছে। আমরা তরুণরা সিদ্ধান্ত নিলাম ধরলা নদী পাহারা দেব। ধরলা নদী পার হয়ে এদিকে আসতে পারলে তারা নাগেশ্বরীসহ আরও দুটি ইউনিয়ন– ফুলবাড়ি ও ভুরুঙ্গামারী জ্বালিয়ে দেবে। হ্যাঁ, ইতিমধ্যে আবদুস সালাম সরকারের ছোট টেবিলটাতে চা-বিস্কুট এসে হাজির হল। চায়ে চুমুক দিয়ে ধরলা নদীর পাড়ে যাবার অনুরোধ করলাম। আবারও বলতে শুরু করলেন আলেম মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ আলী– আমরা সব যুবকরা ধরলা নদীর পাড়ে চলে এলাম। দুই মাসেরও বেশি সময় ধরে একটানা পাহারা দিলাম। কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না। আমাদের কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা প্রাণ দিয়েও তা রক্ষা করতে পারলেন না। পাক হানাদাররা এপারে চলে আসে। আগুনে পুড়ে ছাই করে দেয় বাড়ির পর বাড়ি। আমরা অনন্যোপায় হয়ে ভারতে চলে আসি। ৬ নং সেক্টরের অধীনে কর্নেল নওজেশ-এর তত্ত্বাবধানে ভারতের সাহেবগঞ্জে তিন মাস প্রশিক্ষণ নেই। প্রশিক্ষণ শেষে আমাদের দায়িত্ব বুঝিয়ে দেয়া হয়। সেই ধরলা নদীকে রক্ষার কাজ বুঝে নিলাম আমরা। পাকিদের ক্যাম্প একে একে ধ্বংস করে দিলাম অপারেশন পরিচালনা করে। আমাদের অপারেশনে ভারতীয় ফৌজও অংশ নিয়েছিল। মর্টার শেল নিক্ষেপ করে একেবারে গুঁড়িয়ে দেয়া হয়েছিল পাক হানাদারদের ক্যাম্প। ক্যাম্প থেকে বিন্দুমাত্র কোনো কিছু নিয়ে যাওয়ার সুযোগ দেয়া হয়নি তাদের।

দেশ স্বাধীন হবার পর আবার পড়ালেখায় মনোনিবেশ করেন। ফাজিল, কামিল শেষে ইমাম হিসেবে পেশাগত জীবন শুরু করেন। মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে পরবর্তীতে যথাযথ মূল্যায়িত হয়েছেন কি-না– এ প্রশ্নের উত্তরে মাওলানা মোহাম্মদ আলী বলেন, স্বাধীনতার ৩৬ বছর পার হয়ে গেল। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের মূল্যায়ন কোথায় হলো বলেন? শেখ হাসিনা সরকারের সময় মুক্তিযোদ্ধা সার্টিফিকেট নিয়েছিলাম, কিন্তু এগুলোর গুরুত্ব একেবারেই কম আমার কাছে। সার্টিফিকেটের জন্য তো মুক্তিযুদ্ধ করিনি। মুক্তিযুদ্ধ করেছি মহান আল্লাহর পবিত্র ভূমিকে যারা অপবিত্র করতে চয়েছিল তাদের প্রতিরোধ করতে। দেশের জন্য আমাদের এতটুকু পরিশ্রমে যদি আল্লাহ সন্তুষ্ট হন তাতেই আত্মতুষ্টি।

মুক্তিযোদ্ধা মাওলানা মোহাম্মদ আলীর কাছে জানতে চাইলাম, তাঁর জানা মতে কুড়িগ্রামে আরও আলেম মুক্তিযোদ্ধা আছেন কি-না? তিনি অত্যন্ত বিস্ময় সুরে বললেন, আলেম মুক্তিযোদ্ধা আছে মানে, অবশ্যই একাধিক আলেম মুক্তিযোদ্ধা আছে। কুড়িগ্রাম হলো মুক্তিযুদ্ধের ভয়ঙ্কর রণক্ষেত্র। এখানে সবাই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করেছে। আপনারা নাগেশ্বরীতে এই ঠিকানায় চলে যান। সেখানে বীর আলেম মুক্তিযোদ্ধার সাক্ষাৎ পাবেন। এ তথ্য পাবার পর আমরা দু'জন নড়েচড়ে বসলাম। আজই চলে যেতে হবে নাগেশ্বরীতে মুক্তিযুদ্ধের ভয়ঙ্কর রণক্ষেত্রে আলেম মুক্তিযোদ্ধার খোঁজে।



মাহতাব উদ্দীনরা প্রমোশনহীন থাকার জন্যই কি মুক্তিযুদ্ধ করেছিলেন?

কুড়িগ্রামের পথে যাত্রা

রংপুর শহর থেকে বাসযোগে আড়াই ঘণ্টা পথ কুড়িগ্রাম। ভর দুপুরে উত্তপ্ত সূর্যের আলোকে সঙ্গে নিয়ে যাত্রা করলাম কুড়িগ্রামের পথে, যে জেলার পথ-ঘাট, সীমান্ত '৭১-এ হয়ে উঠেছিল মুক্তিযুদ্ধের ভয়ঙ্কর রণক্ষেত্র। এবারেও দীর্ঘ যাত্রায় সফরসঙ্গী হয়েছেন ফায়জুল হক। গতকাল থেকে একনিষ্ঠভাবে সঙ্গ দিচ্ছেন আমাকে আলেম মুক্তিযোদ্ধার খোঁজে। এতটা স্বতঃস্ফূর্ত, নিঃস্বার্থ, প্রাণান্তকর পরিশ্রম কেনইবা করে যাচ্ছেন তিনি। আমার মতো কি তার হৃদয়েও এক ঝাঁক ক্ষোভ বাসা বেঁধে আছে? আমার মত সেও কি মাদরাসা পড়ুয়া বলে পাত্রে-অপাত্রে, স্থানে-অস্থানে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকের মতো মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা নিয়ে উপহাসের শিকার হন? মাদরাসার গণ্ডি পেরিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পা রাখা ফায়জুলের মাঝে গোঁড়ামির লেশমাত্র নেই, তারপরও কি হজম করে যান মৌলবাদী, প্রতিক্রিয়াশীল ইত্যাদি শব্দ। দেশের তরুণ প্রজন্মের নাগরিক হয়েও কি তিনি আমার মতো স্বাধীনতাবিরোধী, মুক্তিযুদ্ধবিরোধী ইত্যাকার ভাষা গলাধঃকরণ করে যাচ্ছেন।



বাসের জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে গ্রামবাংলার মনোরম পরিবেশ, নদী, শ্যামল ছায়া। বাংলা মায়ের এ অপার প্রকৃতি কি বলে দিতে পারে আমায় এসব কারণেই আমার মতো ফায়জুলের মাঝে ক্ষোভ থেকে শক্তি সঞ্চালিত হয়েছে, বেরিয়ে গেছেন আলেম মুক্তিযোদ্ধার খোঁজে। তিনিও কি প্রমাণ করতে চান– আলেমরা অসার নন, জাতির বোঝা নন। দেশের মুক্তিযুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন তারাও। হোক না সংখ্যায় কম। গ্রামীণ প্রকৃতির মাঝে চোখ দুটি মেলে এরকম কত কিছুই ভাবছি। এদিকে ফায়জুল ব্যস্ত কুড়িগ্রামের ম্যাপ, পরিচিতি ইত্যাদি নিয়ে। ওদিকে বাস পৌঁছে গেল কুড়িগ্রাম শহরে। আমরা যাব শহর থেকেও প্রায় ৩০ কি.মি. দূরের নাগেশ্বরীতে। কুড়িগ্রাম সদর অতিক্রম করতেই দেখা গেল সিংহ প্রতীক সংবলিত শহীদ মুক্তিযোদ্ধা স্মৃতিফলক। জেলা সদর পার হলেই চোখে পড়বে ধরলা সেতু। '৭১-এ এখানে সেতু ছিল না। এ ধরলা নদী রক্ষায়ই নিয়োজিত ছিলেন বলে জানিয়েছিলেন আলেম মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ আলী। সেতুটা পার হতেই দেখা গেল আরেক স্মৃতিফলক। ধরলা

নদী রক্ষা করতে গিয়ে এখানেই শহীদ হয়েছেন এক ট্রাক মুক্তিযোদ্ধা। এসব স্মৃতিচিহ্নগুলোই বলে দিচ্ছিল কুড়িগ্রাম জেলা মুক্তিযুদ্ধের কত গুরুত্বপূর্ণ ফ্রন্ট ছিল। নাগেশ্বরী বাজারে ঠিক তখনই পৌঁছলাম যখন মাগরিবের নামাজের সময় শুরুর আগে আসরের নামাজটা আদায় করে নেয়া যায়। আপাতদৃষ্টিতে সৌভাগ্যই বলতে হবে। আসর নামাজ পড়ে মসজিদেই পেয়ে গেলাম খুঁজতে আসা এক আলেম মুক্তিযোদ্ধা মাহতাব উদ্দীনকে। পরিচয় পর্ব হলো, মাগরিবের নামাজ হলো, চা চক্র চলল। জানালাম উদ্দেশ্য– আমরা এসেছি এ অঞ্চলে মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে যারা আলেম ছিলেন তাদের খোঁজে। তিনি নিজে দু'একজনের নাম বললেন এবং আরও জানালেন, সামনেই আছে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড সংসদ। সেখানে গেলে একাধিক আলেম মুক্তিযোদ্ধার সন্ধান মিলবে। সন্ধ্যায় বেশ জমে উঠেছে মুক্তিযোদ্ধা সংসদ। উপস্থিত আছেন উপজেলা সহকারী কমান্ডার মতিয়ার রহমান নান্টু। আমাদের উদ্দেশ্যের কথা খুলে বলার চেষ্টা করলাম দু'জনে। তিনি আমাদের অফিসে বসতে দিলেন, চায়ের আপ্যায়ন জানালেন। উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদ অফিসটি বেশ পরিপাটিই বলতে হবে। চেয়ার, টেবিল, টেলিভিশন, মুক্তিযোদ্ধাদের পদচারণা সব আছে এ অফিসে। আরো আছে বঙ্গবন্ধু ও জিয়াউর রহমানের পাশাপাশি ছবি। এ অঞ্চলে শহীদ হওয়া মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকাও আছে। সব মিলিয়ে মুক্তিযুদ্ধ আবহ ধরে রেখেছেন তারা।

ডালমে কুচ কালা হ্যায়

মুক্তিযোদ্ধা নান্টু ভাই নিজ মোবাইল থেকেই খোঁজ নিতে থাকলেন আলেম মুক্তিযোদ্ধা আছেন কি-না। হাতে চায়ের কাপ ধরিয়ে দিয়ে তিনি নিজে চায়ে চুমুক দিতে দিতে বললেন, এখানে একাধিক আলেম মুক্তিযোদ্ধা আছে। মুক্তিযুদ্ধে তাদের এমন সব অভিজ্ঞতা আছে যা শুনলে আপনাদের গা শিউরে উঠবে। এরকম একজন চলে আসছেন এখনই। তবে তার আগে আমার দায়িত্ব হলো, আপনাদের পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া। আপনারা যেটা বলছেন হয়তোবা সেটা আপনাদের মূল পরিচয় নাও হতে পারে। এমন কী প্রমাণ আছে যে এটাই আপনাদের মূল পরিচয়। গরম চায়ের সঙ্গে এ জাতীয় গরম কথা শরীরের তাপমাত্রাটা বাড়িয়ে দিল না তো! ঠাণ্ডা মাথায় বুঝাতে চাইলাম– আমরা এভাবে পুরো দেশে ঘুরে ঘুরে আলেম মুক্তিযোদ্ধাদের খুঁজছি! আলেমগণ সম্পর্কে একটা সাধারণ ধারণা আছে যে, তারা মুক্তিযুদ্ধবিরোধী ছিলেন। এ ধারণা আসলেই কতটুকু সঠিক তা জানার আগ্রহ নিয়ে কাজ করছি দীর্ঘদিন ধরে। আপনারা যারা মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন, আপনাদের সাহায্য, তথ্যই আমাদের এ প্রজন্মকে জানাতে পারে আলেম মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ে সঠিক ইতিহাস। জনাব নান্টু বললেন, বিষয়টা আমি ভালোভাবেই বুঝতে পারছি, কিন্তু আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের দিনকাল ভালো যাচ্ছে না, তাই এমনটা বলেছি। আমি সঙ্গে সঙ্গে ব্যাগ থেকে বের করে পত্রিকায় দেয়া বিজ্ঞাপনের কপিগুলো দেখালাম। যেখানে আলেম মুক্তিযোদ্ধার খোঁজ চেয়ে বিজ্ঞাপন দেয়া হয়েছিল জাতীয় দৈনিকগুলোতে। বিজ্ঞাপনটা ভালোভাবে পড়লেন নান্টু, দুলু প্রমুখ মুক্তিযোদ্ধা। দুলু তো নান্টুর কানে কানে বলেই ফেললেন, 'ডালমে কুচ কালা হ্যায়'। বড্ড বিপাকে পড়ে গেলাম। এরই মাঝে চলে এলেন মোবাইলে ডেকে আনা

আরেক আলেম মুক্তিযোদ্ধা। বড় পাঞ্জাবি, মাথায় পাঁচকল্লি টুপি পরা মুক্তিযোদ্ধাকে দেখেই বুঝে গেলাম তিনি আর কেউ নন, তিনি হলেন মাওলানা শামছুল হুদা, যার কথা বলেছিলেন রংপুরের মুক্তিযোদ্ধা এ এলাকারই সন্তান মাওলানা মোহাম্মদ আলী। দু'পাশে দু'জন আলেম মুক্তিযোদ্ধা বসা আছেন। ফায়জুল খাতা-কলম নিয়ে প্রস্তুত। আমি মুখিয়ে আছি প্রশ্ন করার জন্য। কিন্তু সমস্যাটা তৈরি করছে পরস্পর আস্থাহীনতা। চটজলদি মাথায় বুদ্ধি এলো। মাওলানা শামছুল হুদাকে বললাম, আপনি তো ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সৈয়দ বেলায়েত হোসেনকে চেনেন, মোবাইল ধরিয়ে দিচ্ছি, তার কাছ থেকে আমাদের সম্পর্কে জেনে নিতে পারেন। এখানেও বিপদের ছায়া। মোবাইলে রিং হলেও ধরছেন না বেলায়েত। বেশ কিছুক্ষণ পর ফোন রিসিভ হলো। আমি ঠাট্টাচ্ছলে বললাম, আপনাদের কাজে এসে বিপদে পড়লাম, আর আপনি ফোনই রিসিভ করছেন না। তারপর যা হবার তাই হলো। শামছুল হুদা কথা বললেন বেলায়েত হোসেনের সঙ্গে। জিরো থেকে হিরো হয়ে গেলাম আমরা দু'জনে। নান্টু ভাই আশ্বাস দিলেন সব ধরনের সাহায্যের। শামছুল হুদা তো বায়না ধরলেন আজ তার বাসায়ই থাকতে হবে। মুক্তিযোদ্ধা সংসদে গোল করে চেয়ারে বসলেন অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধাগণ। চলল মুক্তিযুদ্ধ রণক্ষেত্রের লোমহর্ষক সব বর্ণনা।

পায়ের নিচে যখন মাইন বোমা

মুক্তিযোদ্ধা মাওলানা মাহতাব উদ্দীন '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে কিভাবে অংশ নিলেন বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, '৭১-এ বঙ্গবন্ধু যখন ঘোষণা করলেন 'তোমাদের যার যা কিছু আছে তা নিয়েই নেমে পর মুক্তিসংগ্রামে' তখনই বুঝে গেলাম মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে আমাদের। আমার বয়স তখন ত্রিশ কি বত্রিশ। আওয়ামী লীগের সঙ্গে পুরোপুরি জড়িত ছিলাম। আমার বন্ধু আওয়ামী লীগ নেতা সোহরাব, বেলায়েতের সঙ্গে আমিও মুক্তিযোদ্ধা তালিকায় নাম লেখাতে চাইলাম। ক'দিন লেফ্‌ট-রাইট করার পর উচ্চতা মাপার জন্য ডাকা হলো। আমি বেশ চিন্তায়ই পড়ে গিয়েছিলাম। কেননা আমার বন্ধুদের তুলনায় কিছুটা খাটো আমি। শেষ পর্যন্ত টিকে গেলাম। ভুরুঙ্গামারী নিয়ে যাওয়া হলো আমাদের। শুরু হলো প্রশিক্ষণ। উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য চলে এলাম দার্জিলিং-এ। সেখানে এক মাস প্রশিক্ষণ দেয়ার পর পাঠানো হলো তেঁতুলিয়া সীমান্তে। রাইফেল, স্টেনগান, এলএমজি এসবের প্রশিক্ষণে ততদিনে পাকা মুক্তিযোদ্ধা। তেঁতুলিয়া দিয়ে পঞ্চগড়ে প্রবেশ করলাম। রাইফেল হাতে ২৫ জনের একটি টিম গঠন করে দেয়া হলো। তৎকালীন পঞ্চগড়, বর্তমান দিনাজপুরের ছোটখাটা ও বড়খাটা এলাকায় পাঠানো হলো অপারেশনে। গভীর রাতে রওনা দিলাম। কারো হাতে রাইফেল, কারো হাতে লাঠি। কিন্তু আমরা জানতাম না এ রাস্তায়ই মাইন পুঁতে রাখা হয়েছে। পায়ের নিচে চাপা পড়ে বিকট শব্দে বিস্ফোরিত হয়ে গেল একে একে কয়েকটি মাইন। একেকজনের হাত, পা, দেহ ছিটকে পড়ে গেল বিভিন্ন স্থানে। আমি ছিলাম ২৫ জনের সবার পেছনে। চোখের সামনে একে একে ছিটকে পড়ল সবাই। আমিসহ তিনজন সে দিকে না গিয়ে উত্তর দিকে যাওয়া শুরু করলাম। নিঝুম রাত, চারদিকে অন্ধকার,

বাড়ি-ঘরও নেই। অনেক দূরে গিয়ে একটি বাড়ি চোখে পড়ল। বাড়িটি কোন পক্ষের– রাজাকারের না মুক্তিযুদ্ধের। অনেক ভয়ে ভয়ে বাড়ির সামনে দাঁড়ালাম। এক বৃদ্ধ ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। মনটা কেন যেন বারবার বলছিল আমরা রাজাকারদের এলাকায় চলে এসেছি। বৃদ্ধ লোকটা এখনই রাজাকারদের খবর দেবে। তাকে পেলে প্রাণে রক্ষা নেই। বৃদ্ধ লোকটা আমাদের দেখে প্রথমেই বললেন, বাবা তোমরা কোন মার বুক খালি করে এসেছ যুদ্ধ করতে। আমাদের বসতে দেয়া হলো। মুরগি রান্না করতে ব্যস্ত হয়ে গেলেন লোকটি। আমাদের মাঝে ভয় কিন্তু মোটেই কাটেনি। পানিতে বিষ থাকতে পারে, বিষাক্ত মুরগি হতে পারে, বিষ মেশানো দুধ খাওয়ানো হতে পারে। এমনকি মুরগি রান্না করার কথা বলে রাজাকার বা পাকসেনাদের আগমনের জন্য দেরি করিয়ে দিতে পারে প্রভৃতি হাজারো শংকার মাঝে কাটল কয়েক ঘণ্টা। পথঘাটও চেনা নেই। বাড়ি থেকে বেরিয়ে পালিয়ে যাওয়ারও রাস্তা নেই। আমাদের মানসিক এ অবস্থা দেখে বৃদ্ধ লোকটি তার ছেলের মাথায় হাত দিয়ে বলতে থাকল– আমি আমার ছেলের মাথা ছুঁয়ে বলছি আমি তোমাদের কোনো ক্ষতি করব না। ছটফট করা মনটা এ কথায় শান্ত হয়ে উঠল। কিছুক্ষণের জন্য নিরাপদে বিশ্রামের সুযোগ পেলাম। সকালে তিনিই আমাদের মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে পৌঁছে দিলেন। আমরা ক্যাম্পে চলে এলেও মুহূর্তের জন্য ভুলতে পারিনি তাকে। এ রকম হয়তো আরো মুক্তিযোদ্ধাকে আশ্রয় দিয়েছেন, খাইয়েছেন, পথ দেখিছেন। তাঁর প্রতি আজীবন কৃতজ্ঞ থাকব আমরা তিনজন।

মাওলানা মাহতাব উদ্দীনের বাড়ি নাগেশ্বরী থানার সাপ খাওয়া গ্রামে। '৫০-এর দশকে কওমি মাদরাসায় দাহম (সপ্তম) শ্রেণী পর্যন্ত পড়া মাহতাব উদ্দীন বর্তমানে নাগেশ্বরী টেলিফোন বোর্ডে চাকরিরত আছেন। সরকারি চাকরি করতে গিয়ে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে কোনো সুবিধা পেয়েছেন কি-না তার জবাব দিতে গিয়ে বললেন, গত বিশ-ত্রিশ বছরে আমার কোনো প্রমোশন হয়নি। অথচ যারা লবিং করেছে, পয়সা দিতে পেরেছে তাদের ঠিকই প্রমোশন হয়েছে। এই হলো মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমাদের মূল্যায়ন। ছ' ছেলে, ছ' মেয়ে নিয়ে মাহতাব উদ্দীন এভাবে প্রমোশনহীন থাকার জন্যই কি মুক্তিযুদ্ধ করেছিলেন?



মুক্তিযুদ্ধের সেকশন কমান্ডার মাওলানা শামছুল হুদা বললেন, জামায়াত নেতা প্রিন্সিপাল কমরুদ্দীন সে দিন মুক্তিযোদ্ধাদের ক্ষমা করেননি আজ আমরা কেন সেই কমরুদ্দীন রাজাকারদের ক্ষমা করব!

জমে ওঠা নাগেশ্বরী বাজার ভেঙে যেতে শুরু করেছে। রাতের আঁধার আরো গভীর হচ্ছে। পথ-ঘাট শূন্য থেকে আরো শূন্যতর হচ্ছে। আর এদিকে মুক্তিযোদ্ধা সংসদ অফিসের ভেতরটা আরো জমতে শুরু করেছে। আঁধার ভেঙে অন্যরকম আলোর ছায়া চলে এসেছে এখানটায়। নান্টু ভাই আগেই বলেছিলেন, শামছুল হুদা এমন স্মৃতিকথা আমাদের জানাবেন যা শুনলে আপনাদের গা শিউরে উঠবেই। শুরু হলো শামছুল হুদার স্মৃতিকথন।

আমায় ধরে রাজাকার পেল ১০ হাজার টাকা!

'৭১-এ ২০-এ পা দিয়েছেন মাওলানা শামছুল হুদা। তার আগে ১৯৬৮ সালে সাত দরগাহ মাদরাসা থেকে আলিম পাস করেছেন। মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিকথন শুরু করলেন এভাবে— এপ্রিল মাসে ট্রেনিং-এর জন্য প্রথম নাম লেখাই আমি। ভুরুঙ্গামারি হাই স্কুল মাঠে প্রথমে আমাদের প্রশিক্ষণ চলতে থাকে। আমি মূলত ছিলাম এমএফ বা মুক্তি ফৌজে (এমএফ নম্বর-৫০৩১০)। এ ফৌজে বোরহান সাহেবের নেতৃত্বে আমাদের ডিফেন্স ট্রেনিং দেয়া হয়। সে মতে বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী ফুলকুমার নদীর তীরে কালমাটিতে ডিফেন্স তৈরি করি। এই ডিফেন্সকে ঘিরে চলল আমাদের প্রাথমিক ধাপে দেশ মুক্ত করার লড়াই। অন্যদিকে শান্তিবাহিনী প্রধান আতাউল্লাহ ঘোষণা করল কেউ কোনো মুক্তিযোদ্ধাকে জীবিত ধরে দিতে পারলে ১০ হাজার টাকা পুরস্কার পাবে। এ সংবাদে রাজাকাররা তো একেবারে হন্নে হয়ে খুঁজতে থাকল আমাদের। একদিন একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল। সেদিন আমি ছেঁড়া গেঞ্জি পরে হাতে গ্রেনেড নিয়ে ফুলকুমার নদী পার হয়ে ডিফেন্সে ফিরে আসছিলাম। আমার সঙ্গে ছিল ১০/১২ বছরের একটি শিশু। তাকে ইচ্ছে করেই সঙ্গে রেখেছিলাম যেন আমার কোনো বিপদ হলে সে সংবাদ মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে পৌছে দিতে পারে। কিছু দূর আসার পর লক্ষ করে দেখলাম টুপি পরা একদল লোক বাড়ির পাশে মিটিং করছে।

কৌশলে তাদের এড়িয়ে যেতে চেয়েছিলাম। কিন্তু চারদিকে খোলা জমি ছিল বলে তারা আমাকে দেখে ফেলে। ডাক দিয়ে কাছে নিয়ে যায়। জিজ্ঞাসা করে কোথায় যাচ্ছি। আমি বললাম, সামনের গ্রামে যাচ্ছি, ওখানে আমার বাড়ি আছে। একথা যখন বলছি তখন তাদের একজন আমাকে চিনে ফেলে। সে বলতে থাকে— এ মুক্তিযোদ্ধা, তাকে আমি ভুরুঙ্গামারীতে ট্রেনিং নিতে দেখেছি। আমাকে চিনে ফেলার পর তারা একেবারে আনন্দে আত্মহারা। একজন উচ্চস্বরে বলতে থাকল- ১০ হাজার পেয়েছি! ১০ হাজার পেয়েছি!! আমার হাত-পা ভালো করে বাঁধা হলো। যেই বাড়িতে বাঁধা হলো, সেই বাড়ির মালিক আমাকে পাহারা দিচ্ছেন, আর অন্যরা চলে গেছেন ১০ হাজার টাকা পাবার নেশায় শান্তিবাহিনীর ক্যাম্পে তাদের কমান্ডার আতাউল্লাহকে খবর দিতে। ওই যে শিশু ছেলেটা আমার সঙ্গে ছিল সে কিন্তু চটজলদি দৌড়ে আমার আটকের সংবাদটা পৌঁছে দিল মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে। মুক্তিযোদ্ধারা এসে বাড়ির মালিক ছাড়া আর কাউকে পেল না। বাড়ির মালিক শেষ নিশ্বাসটা তখনই নিয়ে ফেলেছিল। আর আমি দ্বীর্ঘশ্বাস নিয়ে আল্লাহর রহমতে বীর বেশে ক্যাম্পে চলে এলাম।

সেদিন সেই বাড়ির মালিকের এক কান দিয়ে ১৮টা গুলি করি। রাজাকাররা ১০ হাজার টাকা পাবার বদলে পেল তাদের মৃত প্রাণ!

মা ছেলেকে গুলি করল!

মুক্তিযুদ্ধের ভয়ঙ্কর দিনগুলোর বর্ণনা বেশ জমে উঠেছে। উপস্থিত আমরা সবাই এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে মুক্তিযোদ্ধা মাওলানা শামছুল হুদার দিকে। তিনি তখন সেকশন কমান্ডার। দলবল নিয়ে ডিফেন্স যুদ্ধে চলে এসেছেন লালমনিরহাট। যুদ্ধ তখন পুরোদমে চলছে। দিনটা ছিল কোরবানির ঈদের পরের দিন। সেদিনটার কথাই বললেন মাওলানা শামছুল হুদা এভাবে— সেদিন রাত ৯টা থেকে তিস্তা ব্যারেজে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। স্টেনগান, এল.এম.জি থেকে একের পর এক গুলি চালাতে লাগলাম। রাতভর গুলি বিনিময় চলল। আমরা তিস্তা ব্যারেজের তিন নং গেট দখলের লক্ষ্য নিয়ে এগুতে থাকলাম। পরদিন তারা ধীরে ধীরে পিছপা হতে থাকল। আমরা এগুতে থাকলাম। এক পর্যায়ে তাদের গুলি করা বন্ধ হয়ে গেল। তাতে বুঝে নিলাম, পাকসেনারা ক্যাম্প গুটিয়ে পালিয়েছে। রাজাকাররাও গ্রাম ছেড়েছে। তারপরও কেন যেন মনে হতে থাকল রাজাকাররা থেকেও যেতে পারে। সেজন্য সাবধানে এগুতে থাকলাম। মাত্র ক'দিন আগেই এই গ্রামটি রাজাকারের ঘাঁটি ছিল। এখন এটি স্বাধীন, পুণ্যভূমি। গ্রামেই শান্তিবাহিনীর চেয়ারম্যানের বাড়ি পেলাম। বাড়িতে চেয়ার, টেবিল সবই ছিল। এসবে বসে মিটিং হতো কোন মুক্তিযোদ্ধাকে মারা হবে বা কোন নারীকে পাকসেনাদের পণ্যে পরিণত করা হবে। বাড়িতে অনেক লুটের মালও ছিল। সেগুলো আমরা দখল করলাম। খাবারও জুটে গেল। দু'দিন থাকলাম বাড়িটিতে। দ্বিতীয় দিন এক বুড়ি এসে মুক্তিযোদ্ধা সরদারকে খুঁজতে থাকল। আমি নিজেকে সেকশন কমান্ডার হিসেবে পরিচয় করিয়ে দিয়ে জানতে চাইলাম আমরা তার কি উপকার করতে পারি। বুড়ি বলল- আমার এক গাদ্দার ছেলে ছিল তার নেতৃত্বে লুটপাট, হত্যা এগুলো হয়েছে। আমার অন্য ছেলে ও মেয়েকে ভারত পাঠিয়েছি, তাকে পাঠাতে পারলাম না।

বুড়ির কথার স্বরই বলে দিচ্ছিল তিনি ভালো বাংলা বলতে জানেন এবং শিক্ষিতা। বুড়ি শক্ত গলায় আরো বলতে থাকলেন, আমার ছেলেকে মেরে ফেললে আমার কোনো আফসোস নেই। বুড়ির বাড়িই মূলত এটি। তাঁর ছেলেই চেয়ারম্যান। রাজাকার চেয়ারম্যান গ্রামের আশেপাশে থেকে যেতে পারে বলে ধরে নিলাম। তাকে ধরার জন্য আমরা সব রকম প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছিলাম। হঠাৎ দূর থেকে একটা ফাঁকা গুলির শব্দ এলো। আমার অন্যান্য সঙ্গীদের এর পাল্টা কোনো শব্দ না ছুঁড়ার জন্য বললাম। সম্ভবত বুড়ির সেই চেয়ারম্যান ছেলে বুঝে নিয়েছিল, মুক্তিযোদ্ধারা এই গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে চলে গেছে। সেই ভেবে নিজ বাড়িতে এগিয়ে আসতে থাকল। যেই না বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করল অমনি আমাদের লোক তাকে জাপটে ধরল। সঙ্গে সঙ্গে হাত-পা বেঁধে ফেলা হলো। বারান্দার খুঁটির সঙ্গে শক্ত করে বাঁধলাম। কিছুটা দূরে এলএমজি সেট করলাম। এতে ২৮টা গুলি ছিল। একসঙ্গে সবগুলো গুলি ছুঁড়ে ব্রাশফায়ারে শেষ করে দিতে চাইলাম। তখনই সেই বুড়ি আমার সামনে এসে বলল, বাবা এই গাদ্দার ছেলেকে আমার হাতে দাও। আমি বললাম, আপনার সেই সাহস নেই, আপনি এখান থেকে চলে যান। বুঁড়ি তারপরও হাত জোড় করে বলল, আমার হাতে দাও। আমিই তাকে গুলি করব, তুমি দেখ আমি ঠিকই পারব। আমরা ধরে নিলাম, ছেলে যতই অপরাধ করুক, মার কাছে তো সন্তানই। যতই বলুক বুড়ি, গুলি চালাতে পারবে না। তারপরও বলছে যখন হাতে ধরিয়ে দেই। দেখি ছেলের ওপর কতটা ক্ষোভ, আক্ষেপ জমেছে বুড়িমার। টুল এনে দিলাম। বুকের দিকে তাক করে দিলাম এল.এম. জির নল। এল.এম.জির ওপর একটি পিড়ি খাড়া করে দিলাম যেন বুড়ি সরাসরি ছেলেকে না দেখতে পারে। এল.এম.জি. দু'পা দিয়ে চেপে ধরল বুড়ি। বাঁট ঠিক করা হলো। ট্রিগার চাপলেই বাঁট নড়ে যাবে। তাই আমি শক্ত করে ধরলাম। সবকিছু প্রস্তুত। এখন ট্রিগার চাপলেই বুড়ি মেরে ফেলতে পারেন আপন ছেলেকে। এ দৃশ্য দেখে অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধারা বাকবিহ্বল হয়ে গেল। কারো মুখ থেকে কোনো শব্দ আসছে না। চেয়ারম্যান ছেলের বাকধ্বনি আগেই নিঃশেষ হয়ে গেছে। তার সারাদেহ এখন নিথর। কল্পনার কাছেও যেতে পারছে না যে, তারই জন্মদাত্রী মা ট্রিগার চাপার অপেক্ষায় আছেন। কারো মুখে কোনো শব্দ নেই। অঝোর ধারায় চোখ বেয়ে পানি পড়ছে অনেকের। পশুপাখিও যেন সেদিন বাকরুদ্ধ। এদিকে মুক্তিযোদ্ধা সংসদ অফিস আরো নীরব হয়ে এসেছে। আমরা উপস্থিত শ্রোতাদের কারো কারো চোখে ঢেকে আসছে পানিতে। মাওলানা শামছুল হুদার গলা ভেঙে আসছে। আর তিনি বলতে চাইলেন না। ৩৬ বছর পর আবারও সেই চোখ থেকেই যেন পানি ঝরছে। সেই বুড়ি, সেই হিংস্র ছেলে, সেই গ্রাম, সেই দৃশ্য সবই এখন তার সামনে। বন্দুকের বাঁট চেপে ধরে রেখেছেন। ট্রিগারে আঙুল ছুঁয়েছেন বুড়ি। পৃথিবীতে এমন কোনো মা কি আছে যে তার আপন সন্তানকে এভাবে গুলি করতে পারে। দুনিয়ার এমন কোনো হতভাগা ছেলে কি আছে, যে মার চোখে এত বড় অপরাধী হতে পারে। এভাবে কোনো ছেলে প্রাণ হারিয়েছে মার হাতে! কিন্তু সেদিন ঠিক তাই ঘটল। শরীরের সব শক্তি আঙুলের গোড়ায় এনে ট্রিগার চেপে ধরলেন বুড়ি। মুহূর্তে ২৮টা গুলি গিয়ে আঘাত করল আপন ছেলের গায়ে। ঝাঁঝরা হয়ে গেল সন্তানের বুক। প্রাণ চলে গেল বুড়ি মার হাত হয়ে

অনেক অনেক দূরে। সাবাস মা, ধন্য মা জাতি। দেশের জন্য একজন মায়ের এর চেয়ে আর বড় উৎসর্গ কী হতে পারে!

বীরাঙ্গনা তুমি অমর হও

রাজাকার চেয়ারম্যানের মা কেন নিজ ছেলেকে এভাবে গুলি করে মারলেন তার উত্তর পেতে আমাদের বেশি সময় নিতে হয়নি। সে এলাকায়ই এ রকম এক বাড়ির সন্ধান পাওয়া গেল। যুদ্ধের ভয়াবহতায় সবাই চলে গেলেও সেই বাড়িতে যারা আছেন তারা তখনও যাননি। আমরা মুক্তিযোদ্ধারা একটু একটু করে বাড়ির সামনে এগিয়ে এলাম। তখনই ঘর থেকে অনেকগুলো নারী কণ্ঠ ভেসে এলো– আমাদের কি আপনারা সাহায্য করতে পারেন, আমরা এখানে ১০ জন নারী একেবারে বস্ত্রহীন, অজ্ঞান, অনাহারে আছি। একথা শুনামাত্র বুঝে গেলাম হানাদারদের নৃশংস নির্যাতনের শিকার তারা। এদের মধ্যে তিনজন এখনও অজ্ঞান। আমরা সঙ্গে সঙ্গে আমাদের শার্ট, গামছা এবং পরার লুঙ্গি দু' টুকরা করে এক টুকরা দিলাম। খাবার দেয়া হলো। দশজনের সবাই অসুস্থ। তিনজনের পেট একেবারে ফুলে-ফেঁপে ছিল। পেটে চাপ দিয়ে ভেতর থেকে হাওয়া বের করা হলো। কি যে দুর্গন্ধ। দেহের এমন কোনো অঙ্গ নেই যেখানে শকুনের হিংস্র ছোবল পড়েনি। রাজশাহী, বগুড়া, দিনাজপুর, লালমনিরহাট থেকে এদের ধরে আনা হয়েছিল। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীও ছিল এখানে। তাদেরকে মানসিক শক্তি জোগানোর চেষ্টা করলাম। বুঝালাম তোমাদের এ ত্যাগ কখনও বৃথা যেতে পারে না। অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই পুরো দেশ স্বাধীন হবে। বিদায়বেলা আসমা নামে একজনকে বলে এলাম– এদিক দিয়ে অনেক গাড়ি যাবে, রেডক্রসের গাড়িতে উঠবে। অন্য গাড়িতে নয়। একজন ঠিকানা দিয়ে দিল তার পরিবারে সংবাদ দেয়ার জন্য। ঠিকানা অনুযায়ী সেই মেয়ের বাবাকে সংবাদ দিয়েছিলাম। কিন্তু বাবা এই মেয়েকে আনতে অস্বীকার করেন। পরে আমি কারমাইকেল কলেজে এলাম একদিন। এই কলেজে তখন বীরাঙ্গনাদের আশ্রয় কেন্দ্র খোলা হয়েছিল। এখানে সেই আসমাকে পেলাম, দেখা হলো ফিরিয়ে নিতে অস্বীকার করা বাবার হতভাগা সেই কন্যার সঙ্গেও। যেই পশুরা এভাবে নিষ্পাপ প্রাণগুলোকে জীবন থাকতে মৃত্যুর স্বাদ পাইয়ে দিয়েছে তাদের কোনো ক্ষমা নেই। যেমনটা ক্ষমা করেননি সেই বুড়ি মা। অমর হোক সেই সব বীরাঙ্গনাদের উৎসর্গিত জীবন।

এবার যাব সরাসরি যুদ্ধফ্রন্টে

মাওলানা শামছুল হুদা আগেই আমাদের সঙ্গে বায়না ধরে রেখেছিলেন। আজ রাতটা তাঁর বাসায় কাটাতে হবে। আসর যখন পুরো মাত্রায় জমে বসেছে তখন আবারও স্মরণ করিয়ে দিলেন তিনি আমাদের। ঘড়ির কাঁটা নয়টা পেরিয়ে গেছে। বাইরে কুয়াশা জমতে শুরু করেছে। ভেতরে জমে থাকা আসরটা ভেঙে যাক এখনই, এটা ভাবতেও খারাপ লাগছে। তারপরও ঘড়ির কাঁটাকে তো আর পিছিয়ে দেয়া যায় না। বাসায় ফিরে আরো কিছু জেনে নেয়ার ইচ্ছে চেপে রাখলাম। রিকশায় কিছু দূর যাওয়ার পর রিকশাওয়ালাকে থামতে বললেন মাওলানা হুদা। চারদিক নীরব, ঘরবাড়ি খুব একটা

চোখে পড়ছে না। রিকশা থামিয়ে বললেন, সামনের এই বাড়িটাতে থাকেন নাগেশ্বরীর বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ মাওলানা মিজানুর রহমানের ছেলে। চলুন তার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করি। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সেদিন শহীদ মুক্তিযোদ্ধা মাওলানা মিজানুর রহমানের ছেলেকে পাওয়া গেল না। ছেলে ঢাকায় চলে এসেছেন জীবিকার তাগিদে। ঢাকায় গাড়ি চালান তিনি। একটা ঠিকানাও ধরিয়ে দিলেন শহীদ মুক্তিযোদ্ধার পুত্রবধূ। রিকশা আবার এগিয়ে চলল সামনে। কুয়াশা একটু একটু করে জেঁকে বসেছে গোটা এলাকায়। জনাব শামছুল হুদা জানালেন, ভুরুঙ্গামারী এখান থেকে ৮/১০ মাইল দূরের পথ। ভুরুঙ্গামারীর বাঘভাণ্ডার সীমান্ত। এই সীমান্তের ফুলকুমার নদীর পাশেই গড়ে তুলেছিলাম আমাদের ডিফেন্স। যদি যেতে চান তবে আগামীকাল নিয়ে যেতে পারি আপনাদের। ফায়জুল বললেন, এবার তাহলে সরাসরি রণক্ষেত্রে! কেন নয়, অবশ্যই যাব। কিছুটা পায়ে হেঁটে ঝিমানো গাঁয়ের কাঁচা পথ দিয়ে পৌঁছে গেলাম মাওলানা হুদার বাড়ি। সারাদিন পরিশ্রম শেষে রাত যখন হয় এগার তখন কি আর চোখকে সামলানো যায়। তারপরও কত রকম আপ্যায়নের আয়োজনই না করলেন তিনি। একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া হলো। জানা হলো ব্যক্তি শামছুল হুদাকে। ঢাকায় কার্তিকের রাতে এতটা কুয়াশা কল্পনাও করা যায় না। টিপ টিপ কুয়াশা পড়ছে চালে, চোখের পাতায় জেঁকে বসেছে ঘুম।

সকালে আগে থেকে রিকশা ঠিক করেই রেখেছেন মাওলানা শামছুল হুদা। এই রিকশা করে আমরা চলে যাব আরেক মুক্তিযোদ্ধা মাওলানা মোহাম্মদ আমজাদ হোসেনের বাড়ি। তারপর সেখান থেকে বাঘভাণ্ডার সীমান্তে যাব। দুপুর নাগাদ পৌঁছে গেলাম বাঘভাণ্ডার সীমান্তে। সামনেই কাঁটাতারের বেড়া। হুদা এখানে দাঁড়িয়ে বললেন, সীমান্তের এই পথ দিয়েই ভারত থেকে যুদ্ধাস্ত্র, খাবার ইত্যাদি সবকিছু আনতাম। আরেকটু সামনে আসার পর ব্রিজের গোড়ায় রিকশাকে থামতে বললেন। ফুলকুমার নদী এখন ছোট খালে রূপ নিয়েছে। ব্রিজের গোড়ায় আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললেন, এখানে মাটি চাপা দিয়ে এক রাজাকারকে হত্যা করেছি। রিকশা আবার সামনে এগিয়ে চলল। হঠাৎ থামিয়ে রিকশাওয়ালাকে বললেন, ডান দিকের রাস্তায় যাও। ডান দিকে কেন যাবে তা জানতে চাইলে বললেন, আগে যাক না তারপরই বলব। কিছু দূর যাবার পর রিকশা থামিয়ে দিলেন। এখানেও দু'পাশে ধানের জমি। দূরে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে বললেন, জমির ওইপাশের বাড়িটাতেই আমাকে বন্দি করেছিল রাজাকাররা। পরে মুক্তিযোদ্ধারা এসে বাঁধনমুক্ত করলে এ বাড়ির মালিককে ১৮ গুলিতে নিঃশেষ করে দিই। রাজাকারদের বিরুদ্ধে এভাবে সংগ্রাম করে আসা মাওলানা শামছুল হুদা স্বাধীনতা লাভের এ প্রান্তে এসে ৩৬ বছর পর সেই রাজাকার তথা যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হওয়া উচিত কি-না এ প্রসঙ্গে বললেন, মরহুম শেখ মুজিবুর রহমান যদি তখন বুঝতে পারতেন রাজাকাররা কত ভয়ঙ্কর তাহলে তাদের তিনি ক্ষমা করতেন না। এই ভুরুঙ্গামারী বাজারেই জামায়াত নেতা প্রিন্সিপাল কমরুদ্দিন রাজাকারের নির্দেশে এক ফায়ারিং-এ ৩৯ জন স্থানীয় যুবককে মেরে ফেলে। সেদিন পাকসেনারা প্রিন্সিপাল

কমরুদ্দিনকে জিজ্ঞেস করেছিল এ ৪০ জন যুবককে আপনি চেনেন কি-না। কমরুদ্দিন সদম্ভে নিজের এলাকার যুবকদের চিনতে ভুল করেছেন। পরে ৪০ জনকে সোজা করে লাইনে দাঁড় করানো হলো। সামনের যুবকের পেটে ধরে গুলি চালানো হলো। সেই গুলি ৩৯ জন যুবকের প্রাণ কেড়ে নিল। ৪০তম যুবক এ দৃশ্য দেখে তার পর্যন্ত গুলি আসার আগেই মাটিতে পড়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। একদিন এক রাত মৃতের ভান করে ফিরে এসে আমাদের এ তথ্য জানান। কমরুদ্দিন তো তার এলাকার যুবকদের ক্ষমা করলেন না। আমরা এখন কেন তাদের ক্ষমা করব?

মাওলানা শামছুল হুদার বয়স ৫০ পেরিয়ে গেছে ঠিকই। কিন্তু যুবক সময়ের সেই প্রাণশক্তি এখনও বিলীন হয়নি। তাই প্রায় সারাদিন আমাদের সময় দিলেন, ঘুরালেন, কথার ফুলঝুড়ি ছাড়লেন, তারপরও কিছুমাত্র ক্লান্ত হলেন না। এখনও পরিশ্রম করে যান জীবন সংগ্রামে জয়ী হতে। ভুরুঙ্গামারী থেকে সিরাজগঞ্জে যাবার উদ্দেশ্যে বাসে উঠলাম। কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে বিদায়ের সুর বেজে উঠল। জানি না দেখা হবে কি-না আর।

দেখা হোক বা না হোক অন্তত যেন এই মহান মুক্তিযোদ্ধার অবদানকে আজীবন স্মরণে রাখতে পারি এটাই মহান আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ।



কুড়িগ্রাম জেলার ভুরুঙ্গামারী থানার বাঘভাণ্ডার সীমান্তে সীমান্তখুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে আছেন নাগেশ্বরীর মুক্তিযোদ্ধা মৌলভী শামসুল হুদা। একাত্তরে এই স্থানটিতে যুদ্ধের অনেক স্মৃতি রয়েছে তাঁর



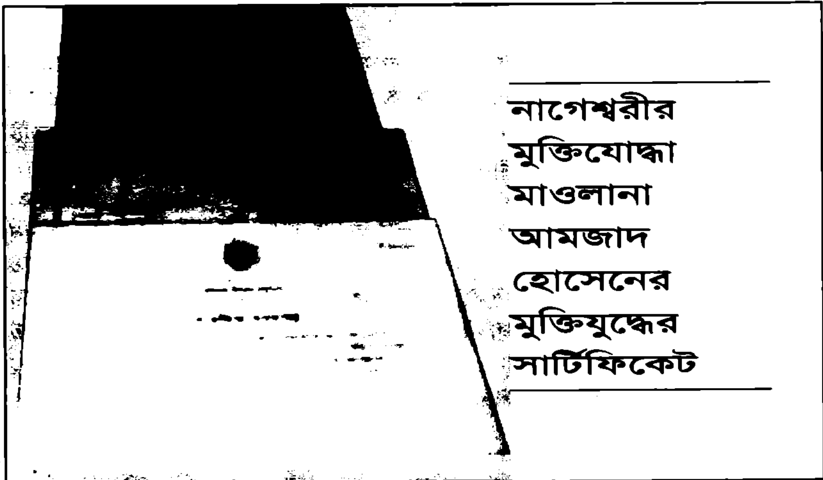
নারী ধর্ষক হানাদারদের প্রতিরোধ না করলে যে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে এ তাড়না থেকেই মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন নাগেশ্বরীর মাওলানা আমজাদ হোসেন

রিকশা চলছে গ্রামের কাঁচা পথ বেয়ে। এক রিকশায় আমরা তিনজন– মাওলানা শামছুল হুদা, ফায়জুল এবং আমি। রিকশার উপরের অংশে আমি বসায় সব ঝড়ঝাপটা দেহের এ অংশটার মধ্য দিয়েই গেল। ছোট রাস্তার দু' পাশে যেদিকে তাকানো যায় কেবল ধান ক্ষেতই চোখে পড়ে। আমনের আধা পাকা সোনালি রঙের ধান ক্ষেত প্রভাতী সোনালি সূর্যের আলোয় আরো বেশি জ্বলজ্বল করছে। এই ধানই চাল হয়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে গৃহিণীর হাতে পৌছে যায়। রবি ফসল খুব কমই চোখে পড়ল। মাওলানা হুদা জানালেন, ধানের জন্য এ অঞ্চল সেরা। কোনো কোনো পরিবার দুই হাজার মণ পর্যন্ত ধান পেয়ে থাকে। আমন ধান কাটার পর কিছু রবি শস্য রোপণ করা হবে বলে জানালেন তিনি। কুড়িগ্রাম তথা উত্তরাঞ্চলের মানুষের জীবন, জীবিকা, ভাষা সম্পর্কে অনেক কিছু জেনে গেলাম তাঁর কল্যাণে। এক ঘণ্টারও বেশি পথ পাড়ি দেয়ার পর মাওলানা আমজাদ হোসেনের বাড়ি পৌছলাম।



অতি সাধারণ বাড়ি মাওলানা আমজাদ হোসেনের। ঘরের মেঝে ধান রাখার গোলা। গোলার পাশে খাটে বসলাম আমরা। জনাব আমজাদ হোসেন ১৯৭৫ সালে জথরাইল ওয়াজিদিয়া মাদরাসা থেকে কামিল পাস করেন। পরবর্তীতে চট্টগ্রামের আরেকটি মাদরাসা থেকে ডিগ্রি বিষয়ে কামিল সম্পন্ন করেন। '৭১-এ আলিম পরীক্ষার্থী থাকলেও সে বছর তিনি পরীক্ষা না দিয়ে নিজ বাড়িতে চলে আসেন। সে বছর আলিম পরীক্ষা হলেও পরে তা বাতিল হয়ে যায়। আলিম পরীক্ষা না দিয়ে বাড়ি ফিরে এসে দেখেন সবকিছু বদলে গেছে। এ পর্যায়ে কেন মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিলেন তার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বললেন, বাড়িতে এসে যখন জানতে পারলাম পাকসেনারা নারীদের ধরে নিয়ে যাচ্ছে, নির্যাতন করছে, বাড়ি-ঘর জ্বালিয়ে দিচ্ছে তখন আমরা যুবকরা আর বসে থাকতে পারলাম না। নারী ধর্ষক, হানাদারদের প্রতিরোধ না করলে যে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। এ তাড়নায় যুবকরা মিলে সিদ্ধান্ত নিলাম আমরা আমাদের মা-বোনদের ইজ্জত রক্ষার্থে যুদ্ধে অংশ নিব। নাগেশ্বরী মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে নাম লেখালাম।

ভুরুঙ্গামারীতে কিছুদিন প্রশিক্ষণ নিয়ে চলে এলাম ভারতের দার্জিলিং-এ। এদিকে আমাদের বাড়ির আশেপাশ সবকিছু জ্বালিয়ে দেয়ায় ৭ ভাইসহ পরিবারের সদস্যরাও ভারতে চলে আসে। এক মাস ৯ দিন দার্জিলিং-এ ট্রেনিং নিলাম। হাতবোমা, এলএমজি, এসআর, থ্রি নট থ্রি ইত্যাদি অস্ত্র বিষয়ে প্রশিক্ষণ নেই। তারপর দলবদ্ধভাবে প্রথমে মুঘলহাট হয়ে ফুলবাড়িতে এলাম। সেখান থেকে আমাদের পাঠানো হলো তিস্তা ব্রিজে অপারেশনে। আমাদের কাছে সংবাদ এলো, তিস্তা ব্রিজ দিয়ে এ পারের ট্রেন বিহারি ও পাকসেনাদের নিয়ে ওপারে চলে যাবে। তাদের প্রতিহত করতে হবে আমাদের। তিস্তা ব্রিজের দখল নিয়ে এক পর্যায়ে শুরু হয়ে গেল যুদ্ধ। কখনও গোলাবারুদ এনে দিচ্ছি, কখনও বন্ধুকের নল তাক করছি, গুলি ছুড়ছি। জীবনের অভয়কে পুঁজি করে দিনগুলো কাটিয়েছি অস্ত্র আর গোলাগুলির মাঝে। এভাবে ১৩ দিন যুদ্ধের পর তিস্তা ব্রিজ আমাদের দখলে আসে। পাঁচ জন খানসেনাকে চোখের সামনে মেরে ফেলি। একজনকে জীবিত ধরে কুচবিহারে মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেই। এর কিছুদিন পরই চলে এলো ১৬ ডিসেম্বর। ফিরে এলাম আপন স্বাধীন মাতৃভূমিতে। জ্বলেপুড়ে সব কিছু ছাই হয়েছিল। এসবকে ধীরে ধীরে গড়ে তুললাম। '৭২ সালে সেই আলিম পরীক্ষা আবার অনুষ্ঠিত হলো। '৭৫-এ এসে কামিল পাস করলাম। অতি সরল কিন্তু কর্মঠ এ আলেম মুক্তিযোদ্ধা এখনও জীবন সংগ্রামে ব্যস্ত। তাই তো আমাদের সঙ্গে বেরিয়ে গেলেন সাইকেল নিয়ে নিজ কর্মক্ষেত্রে। মাদরাসা শিক্ষার মহত্ত্বকে ধরে রেখেছেন কর্মজীবনের মধ্য দিয়ে। সাইকেলে করে পার্শ্ববর্তী গ্রামের দাখিল মাদরাসায় যাচ্ছেন। তিনি যে সে মাদরাসার প্রধান শিক্ষক তথা সুপারিনটেন্ডেন্ট। আমরা তিনজন আগের মতোই আবার রিকশায় চেপে বসলাম। আমাদের পাশ দিয়ে এরকম আরো অনেক সাইকেল চলছে। সাইকেলে করেই চলছে তাদের জীবনের গতি। আর আমাদের দেহ-মনের গতি এখন ভুরুঙ্গামারীর দিকে। সেখানে আমরা চলে যাব স্বাধীনতার স্বপ্নদ্রষ্টা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর আদি বাড়িতে। যেটি অবস্থিত ভুরুঙ্গামারী থেকে অনেক ভেতরে। একেবারে সীমান্ত এলাকায়। হাত বাড়ালেই ওপাশে আসাম।

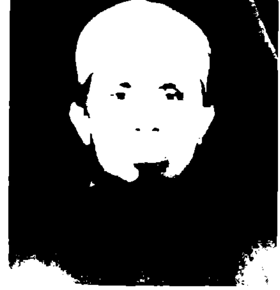


নাগেশ্বরীর মুক্তিযোদ্ধা মাওলানা আমজাদ হোসেনের মুক্তিযুদ্ধের সার্টিফিকেট



নরসিংদীর মুক্তিযোদ্ধা মাওলানা কামারুজ্জামান সগর্বে বললেন, আমাদের গোলা বৃষ্টির তীব্র বাণে অনেক পাকিস্তানি সৈন্য মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে

আতিকুল্লাহ শহীদ জানালেন নরসিংদীতে আছেন তিন আলেম মুক্তিযোদ্ধা, যাদের তিনি চেনেন। প্রয়োজনে যোগাযোগও করিয়ে দেবেন তাদের সঙ্গে। আগেই কথা ছিল সকাল ন'টার মধ্যে সায়েদাবাদ বাস টার্মিনাল থেকে বাস ধরব দু'জনে। সে মোতাবেক শহীদকে নিয়ে বাসে চেপে ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যেই পৌঁছে গেলাম নরসিংদী শহরে। এরপর রিকশা করে জেলা সদরের রাস্তা বেয়ে দত্তপাড়া মাদরাসায় গিয়ে পৌঁছলাম। রমজানের ছুটি শুরু হয়ে যাওয়ায় মাদরাসার শায়খুল হাদিস মাওলানা বশির উদ্দীনের সাক্ষাৎ পাওয়া গেল না। হতাশা নিয়েই তাঁর মোবাইলে ফোন দিলাম। অপর প্রান্ত থেকে তিনি জানালেন, জেলা সদর থেকে অনেক দূরে রায়পুরায় তাঁর গ্রামের বাড়িতে ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন তিনি। অগত্যা ছুটলাম আরেক আলেম মুক্তিযোদ্ধার খোঁজে। আবার রিকাশায় চেপে জেলা সদরের ভেতর দিয়ে পৌঁছলাম ভেলানগরে। সেখান থেকে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে বাসে চড়ে বিশ মিনিটের মধ্যেই নির্দিষ্ট স্টেশনে পৌঁছে গেলাম। সেখান থেকে পায়ে হেঁটে পাঁচ মিনিটের পথ জামেয়া ইসলামিয়া ইসলামপুর মাদরাসা। মাদরাসায় পৌঁছতেই জোহরের নামাজের সময় হয়ে গেল। নামাজ শেষে আমরা মুক্তিযোদ্ধা মাওলানা কামারুজ্জামানের সঙ্গে কথা বলি।



কী কথা তাহার সাথে

প্রথমেই কীভাবে মুক্তিযুদ্ধে জড়িত হলেন জানতে চাইলাম। কামারুজ্জামান বললেন, আমার বয়স তখন বিশ কি বাইশ বছর। ইন্টারমিডিয়েটে পড়াশোনা করতাম। দেশে তখন চরম নৈরাজ্য ও বিশৃংখলা বিরাজ করছে। চারদিকে শোষণ, নিপীড়ন ও জুলুম, অত্যাচারের খড়্গ কৃপাণ। এদিকে সত্তরের নির্বাচনে শেখ মুজিব সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয় লাভ করা সত্ত্বেও তার হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করছে না স্বৈরাচারী ইয়াহিয়া সরকার। বরং এ দেশের আম জনতা পাক হানাদার বাহিনীর বন্দুকের নলের টার্গেটে

পরিণত হয়। বিশেষ করে ওই নরপিশাচরা মা-বোনদের ইজ্জত ও সম্ভ্রম লুণ্ঠনে বেপরোয়া, উন্মাদ হয়ে ওঠে। এ দৃশ্য দেখে মনের মধ্যে বড় হোঁচট খেলাম।

একদিন আমাদের গ্রামের অদূরে কুঠির বাজারে মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্প দেখতে যাই। কিন্তু তারা আমাদেরকে কাছেও ঘেঁষতে দিল না। তখনই মনের মধ্যে জেদ চাঁপল, আমাকে মুক্তিযোদ্ধা হতে হবে। যেমন ভাবা তেমন কাজ। মুক্তিযুদ্ধের ট্রেনিং নিতে আমি, ছোট ভাই শামসুজ্জামান ও মামা বাচ্চু মিয়াসহ মোট বিশ-ত্রিশ জনের একটি দল প্রস্তুত হই। তারপর নদীপথে নৌকাযোগে রওয়ানা দেই ভারতের উদ্দেশে। নৌকা কুমিল্লায় পৌঁছলে আমরা বাধার সম্মুখীন হই। কিন্তু কয়েকজন রাজাকার আমাদের লক্ষ্য জানতে পেরে আমাদেরকে নিরাপদে বেরিয়ে পড়ার সুযোগ করে দেয়। তাদের এ সহযোগিতায়ই আমরা তখনকার মতো বিপদমুক্ত হয়ে সামনে অগ্রসর হই। তা না হলে মৃত্যুর আলিঙ্গনই ছিল আমাদের নিয়তি। সে সময়টাতে অনেককেই তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোরপূর্বক রাজাকারে শামিল হতে বাধ্য করা হয়। এ রাজাকার গ্রুপটি হয়তো সে শ্রেণীরই হবে।

'জয় বাংলায়' মুক্তি মেলে!

আগরতলা সীমান্তে পৌঁছার পর কর্তব্যরত পুলিশ আমাদেরকে হ্যান্ডস্‌আপ করার নির্দেশ দেয়। এরপর পরিচয় জিজ্ঞেস করে। আমরা তখন 'জয় বাংলা' স্লোগান দিলে ছেড়ে দেয়। সময়টা তখন একাত্তরের সেপ্টেম্বর। আগরতলা পৌঁছে থাকা-খাওয়ার অসুবিধার কারণে আমাদেরকে হাপানি ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে এক মাস রাইফেল, স্টেনগান, এসএলআর ইত্যাদির প্রশিক্ষণ শেষে নভেম্বরে দেশে ফিরে এসে যুদ্ধে অবতীর্ণ হই।

আমি রণবীর!

দেশে ফিরে কোথায় কীভাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন? মাওলানা কামারুজ্জামান জানালেন, আমাদের গ্রুপে আমরা ছিলাম সত্তরজন সদস্য। গ্রুপ কমান্ডার ছিলেন ধানুয়ার মিজানুর রহমান। আবার দশজন করে সাত সেকশনে গ্রুপ ভাগ করা হয়। এক সেকশনের নেতৃত্ব ছিল আমার ওপর। আমরা প্রধানত বিভিন্ন পয়েন্টে চেকে থাকতাম। প্রথমে আমাদেরকে শিবপুর থেকে পুটিয়াতে ফাইটের জন্য নেওয়া হয়। আমরা দু'টি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে যুদ্ধ করতাম। একটি ছিল ফায়ারিং গ্রুপ। আরেকটি হচ্ছে সাপোর্টিং গ্রুপ। নিয়ম ছিল, সাপোর্টিং গ্রুপ প্রথমে ফায়ার করে আমাদেরকে জানান দেবে। তারপর তারা সাপোর্ট দেবে আর আমরা ফায়ার করব। কিন্তু সাপোর্টিং গ্রুপের সাদেকসহ দু'জন নিহত হওয়ায় তারা পিছু হটে। তাই তাদের পক্ষ থেকে কোনো সংকেত না পাওয়ায় আমরা ফায়ার শুরু করে দেই। রাতের অন্ধকারে শত্রু পক্ষের সঙ্গে গোলাগুলি শেষে আমরা খড়িয়াতে আত্মগোপনে চলে যাই।

আরেকটি অপারেশন হয়েছিল বাঙালি নগর। তখন নভেম্বরের প্রায় শেষ মুহূর্ত। মুক্তিবাহিনী এবং বেঙ্গল রেজিমেন্ট সমন্বয়ে পাকিস্তানি সৈন্যদের বিরুদ্ধে শুরু হয় তুমুল

যুদ্ধ। আমাদের গোলাবৃষ্টির তীব্রবাণে অনেক পাকিস্তানি সৈন্য মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে এবং জীবিত আরো অনেককে ধরে এনে মেরে নদীতে ফেলে দেওয়া হয়।

ডিসেম্বর মাস। পাকিস্তানি বাহিনী তাদের নৃশংস জুলুম, হত্যা ও মা-বোনদের ইজ্জত, সম্ভ্রম লুণ্ঠনের পরিণতিতে আত্মসমর্পণ করে। তারপর আমরা নারায়ণগঞ্জের মিলিশিয়া ক্যাম্পে অস্ত্র জমা দেই। ফেরার পথে কচুক্ষেত ক্যান্টনমেন্ট থেকে প্রত্যেককে ৮০ টাকা করে দেয়া হয়।

শান্তি ও সফলতার পথ

যুদ্ধের ময়দান থেকে আবার পাঠশালায় ফিরে এলেন। এরপর... শুনুন তার জবানী থেকেই—

স্বাধীনতার পর ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিয়ে ঢাকা জগন্নাথ কলেজে ভর্তি হই। পাশাপাশি তখনকার ইসলামিক একাডেমিতেও ভর্তি হই। সেখানে আরবি শিখতাম। এক ফাঁকে তাবলিগে তিনদিন সময় লাগাই। তাবলীগে সময় লাগানোর পর আমার উপলব্ধি জাগে, আল্লাহর হুকুম ও নবীর তরিকাতেই শান্তি ও সফলতা। অতএব, আমাকে দ্বীন, ধর্ম সম্পর্কে বিশদ জ্ঞানার্জন করতে হবে। তাই কলেজ ছেড়ে কুমরাদি আলিয়া মাদরাসায় ভর্তি হই। কিন্তু মাদরাসার অভ্যন্তরীণ পরিবেশ ও ছাত্রদের চলাফেরা আমার ভালো লাগেনি। তাই আমার শিক্ষক মাওলানা কারী আঃ সাত্তারের পরামর্শে সন্দ্বীপ মাদরাসায় চলে যাই। সেখানে গিয়ে আমার কাঙ্ক্ষিত পরিবেশ পাই। সেখানে ছ' বছর, তারপর ভারতে গিয়ে ৪ বছর পড়াশোনা করি। ১৯৮৪ সালে ইসলামপুর মাদরাসায় শিক্ষকতার মধ্য দিয়ে কর্মজীবন শুরু করি।

আগেই দুপুরের 'ডাল-ভাতের দাওয়াত' দিয়ে রেখেছিলেন মাওলানা কামারুজ্জামান। ফিরিয়ে দিতে পারিনি। সাক্ষাৎকার শেষে যথারীতি পরিবেশন করলেন বিশেষ পদ্ধতিতে রান্না করা সেই 'অমৃত' খাবার। পেট পুরে খেলাম। এরপর ছুটলাম পরের গন্তব্যে।



তাবলীগের সাথী মুক্তিযোদ্ধা মাওলানা বশির উদ্দিন স্মৃতি হাতড়ে জানালেন, পাঞ্জাবিরা আমাদের দেখে বলত, আপনারা সতর্ক হয়ে চলাফেরা করবেন। আর মুক্তিযোদ্ধারা বলত, আপনারা আমাদের জন্য দোয়া করবেন

মাওলানা বশির উদ্দিন আতিকুল্লাহ শহীদের প্রিয় শিক্ষক। সে-ই প্রথমে আমাকে জানায়, তিনি আমাদের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের একজন সক্রিয় বীর মুক্তিযোদ্ধা। প্রথমে তার সঙ্গে মোবাইল ফোনে আলাপ হয়। কিন্তু উদ্দেশ্যের কথা জানাতেই তিনি ফোনের অপর প্রান্ত থেকে বলে উঠলেন, 'এসব থেকে তওবা করেছি, এ বিষয়ে কোনো কথা বলতে চাই না।' মুক্তিযোদ্ধা মাওলানা কামারুজ্জামানের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আবার পথচলা শুরু হলো। শহীদকে বললাম, যতদূরই হোক, বশির উদ্দিন সাহেবের সঙ্গে দেখা না করে যাচ্ছি না। শহীদ কাচুমাচু করে বলল, উনি তো এ বিষয়ে কথা বলতে চাচ্ছেন না। শুধু শুধু এত দূর গিয়ে...। তাকে বললাম, আপনি শুধু পথ দেখিয়ে নিয়ে যান, বাকিটা আমার দায়িত্ব।

সৃষ্টিগড় বাজার থেকে দুশ' পঞ্চাশ টাকায় একটি বেবিট্যাক্সি রিজার্ভ নিলাম। আহা, বায়ু দূষণের অপরাধে রাজধানী থেকে বিতাড়িত হওয়া এ বেবিগুলোর কতদিন পর যে দর্শন পেলাম। কত কালের পরিচিত বাহন, মনে হলো সে তার পূর্বপুরুষের ভিটেবাড়ি থেকে বিতাড়িত হয়ে মাহারা সন্তানের মতো কোনোরকমে বেঁচে আছে। আসলে আমাদের চারদিকের সব কিছু তো এভাবেই বেঁচে আছে।

ক্লান্ত দুপুর নেতিয়ে পড়েছে। রাস্তার দু' ধারে ঝোপঝাড়। মনে হয় কোনো এক গহিন অরণ্যের ভেতরে পিচঢালা পথ বেয়ে ভোঁ ভোঁ শব্দে এগিয়ে চলছে বেবি। আট কি দশ কিলোমিটার দূরত্বের পথ। কিন্তু সে পথ যেন আর ফুরোয় না। অচেনা পথ হলে এমনটাই হয়? আধঘণ্টা পর বেবি দু' থানার মাঝে পার্টিসান হয়ে থাকা আড়িয়াল খাঁ নদীর ব্রিজে উঠল। কলকল শব্দে বয়ে চলা নদী যেন সর্পিল ভঙ্গিতে গিয়ে মিলিত হয়েছে কোনো এক মোহনায়। আড়িয়াল খাঁর কোল ঘেঁষে আমরা ছুটছি, সামনের দিকে। একটু এগিয়ে যেতেই বেবি ঢুকে গেল একটি প্রাচীন বড় বাজারে। নদীর তীর ঘেঁষে দাঁড়ানো বাজার তার প্রাচীনত্বের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বেবি থেকে নেমে বাজার থেকে কিছু মৌসুমি ফল নিয়ে নিলাম। এবার মনে হলো পুরোপুরি মেহমান সেজে গেছি। এছাড়া আর কিইবা উপায় আছে। শহীদ ব্যাপারটা বুঝতে পেরে মুচকি

মুচকি হাসলেন। আবার বেবিতে উঠে বসলাম দু'জনে। পিচঢালা পথ শেষে গ্রামের কাঁচা মেঠোপথে বেবি যখন নামল, আমরা তখন রীতিমতো বিচলিত। এত দীর্ঘ পথ পেরিয়েও আমাদের গন্তব্যে পৌঁছতে আরো সামনে এগুতে হবে! কিছু দূর এগিয়ে বেবি তার যাত্রাবিরতি করল।

ড্রাইভারকে অপেক্ষায় রেখে পায়ে হেঁটে চললাম। বিস্তীর্ণ ধান ক্ষেতের ফসলি মাঠের মধ্য দিয়ে চলে গেছে সরু মেঠো পথ। বর্ষার এ ভরা মৌসুমে চারদিকে যখন পানিতে থৈ থৈ অবস্থা তখন কর্দমাক্ত রাস্তার কী দশা তা বলাই বাহুল্য। ধান কাটা শেষে মাঠ এখন শূন্য পড়ে আছে। দু'একজন কৃষককে মাঠে কাজ করতে দেখা গেল। কাদামাখা পথ ধরেই আধা ঘণ্টা হেঁটে আমরা পৌঁছে গেলাম আমাদের কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে।

গ্রামের বাড়িতেই তিনি একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেছেন। আমরা তার সঙ্গে মাদরাসার এক কক্ষে বসলাম। শহীদ তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। পারস্পরিক শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর তিনি আমাদের কী খেদমত করতে পারেন, জানতে চাইলেন। আমি প্রথমে তাঁর সঙ্গে আমাদের সাক্ষাতের মিশন প্রসঙ্গে কথা বলি। তারপর তার সরল গদ্যে বেরিয়ে আসে টানটান উত্তেজনাপূর্ণ তার মুক্তিযুদ্ধের আখ্যান।

স্কুলে ক্লাস নাইনে পড়া অবস্থায়ই আন্দোলন শুরু করি। আমি আমাদের গোটা এলাকায় ছাত্রলীগের নেতৃত্ব দিতাম। আমরা 'আইয়ুব মোনায়েম ভাই ভাই, এক দড়িতে ফাঁসি চাই' স্লোগান নিয়েও আন্দোলন, মিছিল করেছি। ১৯৭০ সালে আমি আদিয়াবাদ হাই স্কুল থেকে ছ'টি লেটার ও স্টার মার্কসহ ম্যাট্রিক পাস করি। তারপর ঢাকা গভর্নমেন্ট কলেজে ইন্টারমিডিয়েটে ভর্তি হই। ফার্স্ট ইয়ারে সাউথ হোস্টেলে থাকতাম। আঃ কুদ্দুস মাখন নিউমার্কেটে আসলেই আমার কাছে আসতেন। আমার সিটে রাতে থাকতেন। আমি ছিলাম কলেজের ছাত্রলীগের নির্বাহী কমিটির সদস্য। তখন দেশে চলছে অসহযোগ আন্দোলন। কারফিউতে সারাদেশ অচল। আমরা নিউমার্কেটে কারফিউ ভেঙে মিছিলে, আন্দোলনে যোগ দিতাম। স্বাধীনতার পতাকা উড়াবার সময় ওই মিটিংয়ে আমি ছিলাম। আ স ম আ. রব রোদের তাপে জ্ঞান হারিয়ে ফেললে বরফ দিয়ে তাকে সুস্থ করা হয়। অসহযোগ আন্দোলনের কারণে কলেজ বন্ধ ঘোষণা করা হয়। আমি বাড়িতে ফিরে আসি। সত্তরের নির্বাচনের সময় আমি বাড়িতে। নির্বাচনের ফলাফল অনুযায়ী আওয়ামী লীগের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর না করায় চারদিকে ক্ষোভ ধূমায়িত হয়ে উঠছে। আমাদের গ্রামের তথা এ অঞ্চলের মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সংগঠক ছিলেন গয়েস আলী মাস্টার। তার সহযোগী ও সমন্বয়কারী ছিল পাঁচজন— আমি, ফজলুল হক, আবুল বাশার মীর কফিল উদ্দীন ও রুহুল আমীন। তখনো রায়পুরায় পাঞ্জাবিরা ঢুকেনি। পরামর্শ হলো, তাদের অনুপ্রবেশের আগেই কৌশলগত প্রস্তুতি ও প্রশিক্ষণের প্রয়োজন। তাই আমি স্যারের কাছে প্রশিক্ষণের জন্য ভারতে যাওয়ার অনুমতি চাইলাম। কিন্তু স্যার আমাকে অনুমতি দিলেন না। বললেন, তোমরা যদি যুদ্ধে গিয়ে মারা যাও তাহলে দেশ চালাবে কে? কিন্তু স্যারকে না জানিয়ে আমিও আমার আগের ব্যাচের জয়নাল আবেদীন (বর্তমান শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব) ও সেই পাঁচজনের একজন ফজলুল হকসহ মোট এগারজন ভারতের উদ্দেশে রওয়ানা করি।

নির্জন রাতের নিস্তব্ধ প্রহরে তিনটার সময় রওয়ানা দেই। চানপুর, লালপুর, মেড্যা দিয়ে পার হয়ে মাগরিবের পরপর ওপারে পৌঁছি। সেখানে এক মসজিদে মাগরিবের নামাজ পড়ে নেই। ওই এলাকায় পাঞ্জাবিরা ডিউটি দিত। এক যুবককে বসে থাকতে দেখে কোথাও আশ্রয়ের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করি। সে বলল, আমাদের গ্রামে তল্লাশি করা হয়। এখানে মোটেও নিরাপদ নয়। তবে আপনারা এ এলাকার লাল মিয়ার কাছে যেতে পারেন। আমরা তার কাছে গেলে তিনি আমাদের পরিচয় জিজ্ঞেস করেন। আমার বাড়ির পরিচয় দিতেই এক প্রতিবেশী চাচার আত্মীয়তার সূত্রে ভাতিজা হিসেবে তিনি আমাকে খুব আপ্যায়ন করেন। তারপর নরসিঙ্গর দিয়ে বর্ডার পার হই। সেখানে গিয়ে এক হিন্দুবাড়িতে উঠি।

এমএনএ শামছুদ্দীন ভূঁইয়া আমাদেরকে আগরতলা এক বিল্ডিংয়ে জায়গা দেন। সেখান থেকে চারিপাড়া হাই স্কুলে ট্রেনিংয়ের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে আমি গ্রেনেডের প্রশিক্ষণ নেই। তারপর এলাকার আফতাব উদ্দীন ভূঁইয়ার মাধ্যমে স্যার একটি চিঠি পাঠিয়ে দিলেন এমএনএ শামছুদ্দীন ভূঁইয়ার কাছে। শামছুদ্দীন ভূঁইয়া আমাদেরকে এ বলে দেশে পাঠিয়ে দিলেন যে, ট্রেনিং বড় কথা নয়, দেশের পক্ষে কাজ করা বড় কথা। দেশে ফিরে এলে স্যার সাংগঠনিক বিভিন্ন কাজে আমাদেরকে ব্যবহার করেন।

আমাদের কাজ ছিল রাজাকারদের ধরিয়ে দেওয়া এবং যুদ্ধের পেছনে থেকে পরিকল্পনা ও নির্দেশনা দেওয়া। একবার ১৫/১৬ জন পাঞ্জাবি ধরে মেরে ফেলা হয়। এক পাঞ্জাবিকে ধরা হলো, সে ইয়া আলী, ইয়া আলী, বলে চিৎকার করতে থাকল। তারপর তাকে জল্লাদের হাতে সোপর্দ করলে তার হাতেই তার মৃত্যু হয়।

যুদ্ধের সময় আমার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরওয়ানা জারি ছিল। তাই বাড়িতে থাকতাম না। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজও যথারীতি পড়তাম। আর সারারাত জেগে থাকার উদ্দেশ্যে তাস খেলতাম। তখন বর্ষাকাল। চারদিকে পানি আর পানি। কোথাও এতটুকু শুকনো জায়গা নেই। সারারাত তাস খেলে জেগে ছিলাম। ভোরে ফজরের আজান শুনেই মসজিদে গেলাম। মসজিদে মেঘনাবাদ এলাকার একটি তাবলীগ জামাত এসেছে। নামাজ শেষে তাদের নির্দিষ্ট বয়ানের মজলিসে বসি। উদ্দেশ্য ছিল, তারা স্বাধীনতার বিরুদ্ধে কোনো কথাবার্তা বলে কি-না তা লক্ষ করা। মাওলানা সাইদুর রহমান বয়ান করলেন। জাদুর মতো প্রভাব সৃষ্টিকারী তার সে বয়ান শুনে আমার অবস্থা যে কী হয়েছিল আমার নিজেরই উপলব্ধি ছিল না। তার বয়ান আমার মধ্যে এতটাই প্রভাব ফেলল যে, তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি তাবলীগে যাবেন? আমি জবাবে বললাম, হ্যাঁ, যাব। কতদিনের জন্য যেতে প্রস্তুত? বললাম, আপনি যতদিন থাকবেন ততদিন আমিও আপনার সঙ্গে থাকব। বাবার কাছে অনুমতি চাইলে তিনি অনুমতি দিয়ে দিলেন। তারপর গয়েস স্যারের কাছে অনুমতি নিয়ে তাবলীগ জামাতের সফরসঙ্গী হয়ে গেলাম।

মুক্তিযুদ্ধের প্রায় শেষ সময়। টাঙ্গাইলের মধুপুর গড়ে ১ চিল্লা কাটাচ্ছিলাম। তবে আমাদের এ দাওয়াতি সফরে কোনোরকম সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়নি। পাঞ্জাবিরা

আমাদের দেখে বলত, আপনারা সতর্ক হয়ে চলাফেরা করবেন। আর মুক্তিযোদ্ধারা বলত, আপনারা আমাদের জন্য দোয়া করবেন।

তাবলীগ জামাতে থেকেই স্যারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। আমার স্কুল জীবনের এক রাজাকার সহপাঠী আমার বাড়িতে আগুন দেয় ও লুটপাট করে। সে এখনও জীবিত। জামায়াতে ইসলামী করে।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর কলেজে চলে যাই। কিন্তু ইচ্ছে করেই ঐচ্ছিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেনি। চিল্লা দেওয়ার কারণে তখন থেকেই মনের মধ্যে মাদরাসায় পড়াশুনা করার আগ্রহ দানা বেঁধে ওঠে। এক পর্যায়ে সন্দ্বীপের হযরতের মাদরাসায় গিয়ে ভর্তি হই। সেখানে ছ' বছর পড়াশোনা করি। তারপর দেশের আরো দু'এক জায়গায় পড়াশুনা শেষে ভারতের দারুল উলুম দেওবন্দে চলে যাই।

মুক্তিযুদ্ধের অব্যবহিত পরে গয়েস আলী স্যার আমাকে ডেকে নিয়ে মুক্তিযুদ্ধের সার্টিফিকেট এবং এক লাখ ষাট হাজার টাকার একটি চেক দিতে চাইলেন। আমি তাঁকে জানাই, সার্টিফিকেট দিয়ে কী হবে? তিনি বললেন, এ সার্টিফিকেট দিয়ে তুমি অনুদান ও সহযোগিতা পাবে। আগামীতে পড়াশোনার খরচ চালিয়ে যেতে পারবে। আমি বললাম, স্যার! মুক্তিযুদ্ধ যদি সওয়াবের কাজ হয় তবে আমি তার বিনিময়ে কোনো বৈষয়িক প্রতিদান পেতে চাই না। পক্ষান্তরে তা যদি গুনাহের কারণ হয় তবে আমি তা নিয়ে অপরাধের বোঝা বয়ে বেড়াতে চাই না। আর আপনি যে চেক দিতে চাচ্ছেন তা কাদের অর্থ? তিনি বললেন, এটা হচ্ছে তাঁতিদের সুতোর টাকা। আমি বললাম, এ টাকা আমি কিছুতেই নিতে পারি না। তখন স্যার বললেন, আমি আগে থেকেই জানতাম তুমি এ টাকা গ্রহণ করবে না। তবুও তোমাকে পরীক্ষা করে দেখলাম। তাই আমার পক্ষে সার্টিফিকেট এবং চেক কোনোটাই নেয়া হয়নি।

বঙ্গবন্ধু একজন ভালো মানুষ ছিলেন। তিনি বাঙালির কল্যাণ চেয়েছেন। আর কায়েদে আজম যদি পাকিস্তানের জাতির জনক হতে পারেন তবে বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতির জনক হতে আপত্তি কোথায়?

একজন মানুষ যত জুলুমই করুক না কেন, তাকে হত্যা করা যায় না। ইসলাম তা সমর্থন করে না, তাই '৭৫-এর হত্যাকাণ্ড কিছুতেই ইসলাম সমর্থিত হতে পারে না।

অবশেষে একটি অপ্রিয় প্রসঙ্গ উত্থাপন করলাম। '৭১-এ রাজাকার নিধনই ছিল আপনার প্রধান কাজ। স্বাধীনতার ৩৬ বছর পর এ ব্যাপারে আপনার অভিব্যক্তি কী? বললেন, এখন বাংলাদেশের সবাই স্বাধীনতার পক্ষে। কেউই স্বাধীনতার বিরুদ্ধে কোনো কাজে অংশগ্রহণ করছে না। তাই এ ইস্যুতে বিভক্তি ও বিভাজন সৃষ্টি করা অনুচিত। বঙ্গবন্ধুও তো তখন তাদের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে দিয়েছেন।

– যারা তাদের অতীত কৃতকর্মের জন্য নিন্দিত ও ঘৃণিত তাদের কী নিজেদের সে ভূমিকার জন্য জাতির কাছে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাওয়া উচিত নয়?

– যদি তারা দলীয়ভাবে এমন কাজ করে থাকে তবে তাদের চিন্তাধারার ভুল ছিল এবং সে কারণে তাদের অবশ্যই ক্ষমা চাওয়া উচিত।



স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ সত্ত্বেও সার্টিফিকেটের আবেদন নিয়ে ঘুষের নির্মম কষাঘাতে ফিরে যেতে হয় মাওলানা বজলুর রহমানদের

বেবিট্যাক্সি ড্রাইভারকে আগেই বলা ছিল ফেরার পথে আরেক জায়গায় যাত্রাবিরতি করতে হবে। অথচ রায়পুরাতেই অতিরিক্ত দু' ঘণ্টা ব্যয় করে ফেলেছি আমরা। অগত্যা চালককে আশ্বস্ত করতে হলো– 'চিন্তা করবেন না, আপনার ব্যাপারটা আমরা দেখব।' সূর্য পশ্চিম দিগন্তে হেলে পড়েছে অনেক আগেই। এখন শুধু টুক করে ডুব মারার অপেক্ষা। ভোঁ ভোঁ শব্দে বেবি ছুটছে তার সর্বশক্তি নিয়ে। আমরা এখন যাব জানখারটেক গ্রামে মুক্তিযোদ্ধা মাওলানা বজলুর রহমানের খোঁজে। ইতিমধ্যেই আঁধার ঘনিয়ে এসেছে। গা ছমছম অবস্থা। অথচ রায়পুরা যাবার পথে শহীদকে কত আনন্দ করেই না বলেছিলাম, আহা, কি অপরূপ দৃশ্য! ফুলে-ফলে সমৃদ্ধ। এমন এলাকা আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। শহীদের জন্ম এ এলাকাতেই। তাই গর্বে তার বুকটা ভরে মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছিল–

'ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা
তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা
ও সে স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে দেশ স্মৃতি দিয়ে ঘেরা।
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি
সকল দেশের রানী সে যে আমার জন্মভূমি।'

রাতের আঁধারে চেনা বাড়িটা শহীদের কাছে অচেনা হয়ে গেল। তাই ড্রাইভারকে এক টঙ দোকানের সামনে বেবি থামাতে বললাম। দোকানিকে জিজ্ঞেস করলাম, মাওলানা বজলুর রহমানের বাড়িটা কোথায় যেন? দোকানি দেখিয়ে দিলেন– এই যে, এ বাড়িটাই তো। উনি এখন মসজিদে আছেন।

মসজিদ থেকে খুঁজে বের করলাম '৭১-এর হারিয়ে যাওয়া এ বীর সেনানীকে। এরপর হাত ধরে তিনি দু'জনকে নিয়ে চললেন তার বাড়িতে এবং পরম মমতামাখা কণ্ঠে বললেন, 'এত রাতে কোথায় যাবেন, এ গরিবের বাড়িতেই থেকে যান না। নিজেকে

ধন্য মনে করব!' আহা, কি পিতৃসুলভ কথা। এ যুগে ক'জনেইবা বলতে পারেন এমন করে!

যত রাতই হোক আমাদের ঢাকা ফিরতে হবে। আপনার আন্তরিকতা দেখে খুশি হলাম। ধন্যবাদ, মাওলানা সাহেব। আপনার মুখ থেকে '৭১-এর গল্প শুনব। সত্য গল্প, সাহসের গল্প। তাহলে শুরু করুন।

'৭১ সালে আমার বয়স চৌদ্দ কি পনেরো হবে। পড়াশুনা করতাম কুমরাদী আলিয়া মাদরাসায়। দেশের অস্থিতিশীল অবস্থায় মাদরাসা থেকে বাড়িতে ছুটিতে এলাম। একদিন হঠাৎ করে কিছু লোক আমাকে জোরপূর্বক ধরে নিয়ে যায় আমাদের এলাকার সবচেয়ে বড় সাপ্তাহিক হাট জোহর বাজারে এবং আরো অনেকের সঙ্গে মিলে আমাদরেকে নিয়ে যাওয়া হয় ভারতে।

আমরা ভারতে পালাটানা ক্যাম্পে দু'মাস প্রশিক্ষণ নেই। ট্রেনিংয়ে এসএলআর, রাইফেল, এলএমজি, স্টেনগান, গ্রেনেড, মর্টারশেল ইত্যাদীর প্রশিক্ষণ নেই। প্রশিক্ষণ শেষে আমরা দেশে ফিরে হেজামারা এসে রাইফেল পাই। ফেরার পথে আমাদের চল্লিশ জনের একটি গ্রুপ ছিল। কমান্ডার ছিলেন মুক্তার। আর আমাদের সেকশন কমান্ডার ছিলেন মোহাম্মদ আলী।

প্রথমে আমরা হাঁটুভাঙ্গাতে ২০ জনের একটি গ্রুপ অপারেশনে অংশ নেই। পাঞ্জাবিদের বিরুদ্ধে শুরু হয় প্রচণ্ড লড়াই। ফলে তাদের ক'জন প্রাণ হারায়। তবে আমাদের পক্ষের কেউ হতাহত হয়নি। পরবর্তীতে দত্তপাড়া এলাকায় আমি প্রশিক্ষণ নেই।" এ পর্যন্ত বলে থেমে গেলেন মাওলান বজলুর রহমান।

তার অনুরোধ, বাকিটুকু শুনতে হবে আমাদের জবানি থেকেই। পাছে কেউ যদি কোনো ক্ষতি করে বসে।

দেশের উন্নতি ও সুখ-সমৃদ্ধির আশায় যারা নিজেদের জীবন বাজি রেখে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জনে লড়াই করেছেন তাদের দিকে দেশের কর্ণধারদের এতটুকু দেখার ফুরসত নেই। আজ তারা অবহেলায়, নীরবে নিভৃতে ধুঁকে ধুঁকে জীবনযুদ্ধে পরাজিত। তাই স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ সত্ত্বেও আজ তাদের সার্টিফিকেটের আবেদন নিয়ে ঘুষের নির্মম কষাঘাতে ফিরে যেতে হয়। জীবনের চাকা ঘুরাতেই যার প্রাণান্তকর দশা তার পক্ষে ঘুষের টাকা জোগানের দুঃস্বপ্ন দেখাও অসম্ভব। তাই আজ এ মুক্তিযোদ্ধার দিন কাটে জীর্ণ কুটিরে মানবেতরভাবে। বাকি জীবনটাও কি এভাবেই কেটে যাবে?



জয়দা গ্রামে তাবলীগের আমীর মরহুম মাওলানা মাহমুদুল হাসানের পরিবারের খোঁজে : তাঁর স্ত্রী বললেন, আমার শাশুড়ি বলতেন, হিন্দু হোক তারাও তো মানুষ, আগে তাদের জীবন বাঁচানোর চেষ্টা করো বউমা

চিঠির সূত্র ধরে...

ঢাকায় মালিবাগ জামেয়ার প্রিন্সিপাল মাওলানা কাজী মু'তাসিম বিল্লাহর মুক্তিযুদ্ধের ওপর নেয়া একটি সাক্ষাৎকার গেল মার্চে দৈনিক যুগান্তরে ছাপা হওয়ার পরপরই দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে '৭১-এর মহান স্বাধীনতা সংগ্রামে আলেমদের ভূমিকা সমৃদ্ধ বহু ঘটনা ও তথ্য দিয়ে লেখা বেশ কিছু চিঠি পাই। মাওলানা আঃ হক শামীম, এনআইসিভিডিএম, ঢাকা-১২০৭ (পূর্ণ ঠিকানা এবং ফোন নম্বরবিহীন)-ই লিখেন প্রথম চিঠিটি। তিনি চিঠিতে জানান, ময়মনসিংহ জেলার মুক্তাগাছা থানার জয়দা গ্রামের তাদের সেই 'মাওলানা বাড়ি'র পুরো পরিবারের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করার ইতিহাস। যে মোল্লা-মৌলভীদের স্বাধীনতাবিরোধী বলে দাঁড় করানো হচ্ছে অহর্নিশি— এক-দু'জন নয় একটি গোটা মাওলানা পরিবারই মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিল— ঘটনাটা কি বিশ্বাসযোগ্য? তথ্য সন্ত্রাসের মতো কিছু ঘটেনি তো? নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করছিলাম।

নেশা পেয়ে বসে। সিদ্ধান্ত নেই, সরেজমিন ঘুরে আসব জয়দার সেই মাওলানা বাড়ি থেকে। সুনির্দিষ্ট ঠিকানা না পেয়ে শরণাপন্ন হলাম মুক্তাগাছার ছেলে, আমাদের বন্ধু, মুফতি এনায়েতুল্লাহর। এনায়েত জানালেন, জয়দা গ্রাম তিনি চেনেন। চিঠির সূত্র ধরে বাড়িও খুঁজে নেয়া যাবে। পরিকল্পনা করলাম, দিনের বাকি অংশ এবং রাতটা এনায়েতদের বাড়িতে কাটিয়ে পরদিন সকাল সকালই বেরিয়ে পড়ব জয়দার উদ্দেশে। এনায়েতদের বাড়ি মুক্তাগাছা থেকে ১১ কিলোমিটার পশ্চিমে চেঁচুয়া নরকোনাতে। বাস লাইনে ঢাকা-জামালপুর সড়কের পাশে। আর জয়দা গ্রাম মুক্তাগাছা থেকে ৬ কিলোমিটার পশ্চিমে পদুরবাড়ি-লেংড়ার বাজারে। ঢাকা-টাঙ্গাইল সড়কের পাশে। মহাখালী থেকে জামালপুরের 'ডাইরেক্ট' গাড়িতে চড়লে নির্ঝঞ্ঝাটে সাড়ে তিন ঘণ্টায় গিয়ে পৌঁছা যাবে চেঁচুয়া বাজারে– কথা ছিল এমনটাই। কিন্তু গাড়ি চালকের স্বেচ্ছাচারিতায় তা গিয়ে গড়াল সাড়ে পাঁচ ঘণ্টায়। উফ! কি যন্ত্রণা। চেঁচুয়া বাজারে নেমে এনায়েতকে বললাম, আচ্ছা, ট্রান্সপোর্ট লাইনটাই কি এমন? 'ডাইরেক্ট' বাসে

আসছি বলে সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা লেগেছে, লোকাল হলে সাড়ে দশ ঘণ্টায়ও পৌঁছা যেত কি-না সন্দেহ ছিল'– এনায়েত এই বলে প্রবোধ দিল।

জাহান আলী মাস্টারের এলাকায়

চেঁচুয়া বাজারে নেমেই বুঝতে পারলাম, এনায়েতের মরহুম বাবা জাহান আলী মাস্টার এলাকায় বেশ নামকরা। প্রচুর লোকের ভক্তি-শ্রদ্ধা নিয়ে বেঁচে ছিলেন। মৃত্যুর পরে এখনও তা অটুট আছে। চল্লিশের দশকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে অনার্স করা এই ভদ্রলোক সারাটা জীবন নিজের এলাকায় শিক্ষকতা করে কাটিয়ে দিয়েছেন। মুক্তাগাছার মন্ত্রী-এমপি হতে অধিকাংশ গণ্যমান্য শিক্ষিত ব্যক্তিই তার ছাত্র। মারা গেছেন বছর খানেক হলো। রাতে তার বৃদ্ধা মায়ের হাতের রান্না খেলাম পরম তৃপ্তি নিয়ে। আহা, এই বয়সেও এত মজা করে রাঁধতে পারেন এই মা! সঙ্গে তাদের নিজস্ব বাগানের আম, কাঁঠাল, পেঁপে, পেয়ারা। এনায়েত রসিকতা করে বললেন, ন্যাচারাল, মন ভরে খান। ঢাকা শহরে এমন ভেজালহীন ফল পাবেন না। সত্যিই তো।

মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। এবারের বর্ষা মৌসুমে এই প্রথম এমন ভারী বৃষ্টিপাত। বৃষ্টি মাথায় নিয়েই যাত্রা শুরু করলাম জয়দার উদ্দেশে। ভ্যান আগে থেকেই ঠিক করা ছিল। এ এলাকায় রিকশার চল নেই। মানুষ চলাচল করে মাল টানার ভ্যানে করে। এনায়েত জানতে চাইল, 'রিকশার যাত্রী' ভ্যানে চড়তে সমস্যা হবে কি-না? তাকে বললাম, ১/১১-এর আগে ঢাকাতেই রিকশার বদলে ভ্যানে চড়েছি অনেক বার সুতরাং এতে কোনো সমস্যা নেই। ভ্যান যাবে লেংড়ার বাজার পর্যন্ত। সেখানে গিয়ে মাওলানা বাড়ির লোকেশন জেনে আবার নতুন ভ্যান নিতে হবে।

'মাওলানা বাড়ি'র পথে পথে

মাওলানা মাহমুদুল হাসানের বাড়ি এলাকার লোকজনের কাছে– 'মাওলানা বাড়ি' হিসেবেই পরিচিত। লেংড়ার বাজারে গিয়ে দু'তিনজন বয়স্ক লোকের কাছে মাওলানা বাড়ি যাওয়ার রাস্তার কথা জিজ্ঞেস করতেই তারা রাস্তা দেখানোসহ ভ্যানও ঠিক করে দিল এবং সঙ্গে একজন চলল। অত্যধিক বৃষ্টিপাতের ফলে মাওলানা বাড়ি যাওয়ার সহজ রাস্তা চলাচলের অযোগ্য, তাই একটু ঘুরে যেতে হলো মাওলানা বাড়িতে। পথে যেতে যেতে সেই উপকারী গাইড সত্তরোর্ধ্ব মোঃ শামসুদ্দীন জানালেন, মাওলানা বাড়ির মুক্তিযুদ্ধকালীন কথা। তিনি বলেন, যুদ্ধের সময় এ বাড়ির মাওলানা সাহেবের ছোট ভাই মোঃ হাবিবুর রহমান চানু ছিলেন ভারতে ট্রেনিংপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা। আর অন্যরা প্রত্যক্ষ যুদ্ধে অংশ নেননি। তবে হ্যাঁ, যুদ্ধকালীন সময়ে তাদের বাড়িতে এ এলাকার বহু হিন্দু আশ্রয় নিয়েছিল। তারা তাদের সানন্দে আশ্রয় দিয়েছিল।

মোঃ শামসুদ্দীন একজন কৃষক। তার এ বক্তব্য আমাদের ভ্যানচালক জয়দা পশ্চিম পাড়ার মোঃ মোরশেদ মিয়া সমর্থন করে বলল, আমরা তখন ছোট। আমাদের সমবয়সিরা দলবেঁধে যুদ্ধের সময় মাওলানা বাড়িতে যেয়ে আশ্রয় নেয়া হিন্দু ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে খেলাধুলা করতাম।

ভাবতে বড় অবাক লাগে, একজন মাওলানার বাড়িতে যুদ্ধের সময় হিন্দুরা জীবন বাঁচাতে আশ্রয় নিয়েছিল! অত্যধিক বর্ষণের ফলে ভ্যান সরাসরি মাওলানা বাড়িতে গেল



৬

যুদ্ধ শুরু হলেই আমি ট্রেনিং নিতে ইন্ডিয়া চলে যাই। ট্রেনিং শেষে দেশে যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে আমার বড় ভাই মাওলানা মাহমুদুল হাসান আমার কাছে চিঠি পাঠান এই বলে যে, যুদ্ধের সময় কোনো বিপদের সম্মুখীন হলে তোমরা নিকটস্থ মসজিদে আশ্রয় নেবে

৭

তাবলীগের আমির মরহুম মাওলানা মাহমুদুল হাসান। '৭৫-এ পাসপোর্টে ব্যবহৃত ছবি

না। কর্দমাক্ত পিচ্ছিল মেঠোপথ। এ পথে মানুষ চলাই দুষ্কর, ভ্যান চলবে কি করে! অগত্যা ভ্যান রেখে গেলাম মাওলানা মাহমুদুল হাসানের প্রতিষ্ঠিত জয়দা আইনুল উলুম হাফিজিয়া মাদরাসার মাঠে। এই মাদরাসার পাশেই চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন মাওলানা মাহমুদুল হাসান।

'মাওলানা বাড়ি'র মাওলানাদের কথা

মাওলানা বাড়ির প্রতিষ্ঠাতা মৌলভী সৈয়দ আলী মুন্সী। মুন্সি সাহেবের ৫ ছেলে— মরহুম মাওলানা মাহমুদুল হাসান, মরহুম কারী আঃ সালাম, মাওলানা আঃ হাই, মোঃ হাবিবুর রহমান (চানু) ও হাফেজ আঃ লতিফ। মাওলানা মাহমুদুল হাসান মুক্তিযুদ্ধের ন'মাস তাবলীগের সফরে ছিলেন। হাবিবুর রহমান (চানু) ছিলেন সরাসরি যুদ্ধের ময়দানে। বাকি ৩ জন বাড়িতে। মুক্তাগাছা শহর ছিল হিন্দু অধ্যুষিত। মাওলানা বাড়ি তুলনামূলকভাবে মূল সড়ক থেকে ভেতরে হওয়ায় হিন্দুরা এখানে এসে আশ্রয় নেয়। দু'একটি পরিবার প্রথমে আশ্রয় নেয়ার পর আশ্রিতদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার ও আচরণের কথা প্রকাশ হতে থাকলে আশ্রয় গ্রহণকারীদের সংখ্যা দিন দিন বাড়তে থাকে। মাওলানা মাহমুদুল হাসান ছিলেন তাবলীগের সাথী। কাকরাইল মার্কাজের মুরব্বি। মূলত তিনি ও তার অন্য আলেম দু' ভাইয়ের জন্যই এ বাড়ি মাওলানা বাড়ি নামে পরিচিতি পায়।

মাওলানা বাড়ির প্রতিষ্ঠাতা মৌলভী সৈয়দ আলী মুন্সিসহ তার বড় দুই ছেলে ইতিমধ্যেই মারা গেছেন। বেঁচে আছেন তিন ছেলে। স্ত্রী-সন্তান নিয়ে দুই ছেলে থাকেন মুক্তাগাছা শহরে। ছোটজন গাজীপুরের টঙ্গীতে। তাই মাওলানা বাড়িতে গিয়ে কোনো বয়স্ক পুরুষের সাক্ষাৎ পেলাম না। বাড়িতে আছেন কেবল মৃত দুই ভাইয়ের স্ত্রীদ্বয়। তাদের ছেলে-মেয়েরা থাকেন দূরে দূরে। শ্বশুরবাড়ি কিংবা নিজ নিজ কর্মস্থলে। ভেতর বাড়িতে কঠোর পর্দা– বাংলা ঘরের সামনে পা রেখেই আঁচ করতে পারলাম। এই না হলে মাওলানা বাড়ি?

পর্দার আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো অজানা ইতিহাস

অপূর্ণাঙ্গ ঠিকানা নিয়ে ঢাকা থেকে যাত্রা শুরু, এরপর ভ্যানে চড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে কর্দমাক্ত পিচ্ছিল পথে হেঁটে কত কষ্টেই না 'মাওলানা বাড়ি' পৌছলাম। তাহলে শূন্য হাতেই কি ফিরে যাব ঢাকাতে– একরাশ বেদনা নিয়ে বললাম এনায়েতকে। দরজায় নক করে দেখা যেতে পারে ভেতর থেকে কোনো সাড়া মেলে কি-না– এনায়েত বুদ্ধি দিল এবং তাই করা হলো। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই ভেতর থেকে একটি নারী কণ্ঠ ভেসে এলো– জানতে চাইলেন, কে আমরা, কোত্থেকে এসেছি, কেন এসেছি। আমরা আমাদের পরিচয় দিলাম, উদ্দেশ্যের কথা জানালাম। পাল্টা জানতে চাইলাম, আপনি কার কি হন। তিনি জানালেন, কাকরাইল মার্কাজের তাবলিগের আমির মাওলানা মাহমুদুল হাসানের স্ত্রী– মাহমুদা খাতুন (৬৭)। একাত্তরে এ বাড়িতেই ছিলেন অন্য সবার সঙ্গে। তাকে অনুরোধ করলাম, এ বিষয়ে আমরা আপনার কাছ থেকে বিস্তারিত জানতে চাই, পর্দার আড়াল থেকে কথা বললে চলবে। তিনি সম্মতি দিলেন। আমাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে বললেন—

আমার বয়স তখন ৩০/৩২ হবে। আমার তখন ৫ বছরের ১ ছেলে ও ১ বছরের ১টি মেয়ে সন্তান ছিল। আমাদের বাড়িতে অনেক হিন্দু মহিলা ও মেয়েরা এসেছিল। পুরুষরা বাড়িতে আসত না।

তারা বাড়ির বাইরে থাকত, আশ্রিতরা নিজেরাই রান্নাবান্না করে খেত। তবে রান্নার জন্য তাদেরকে পাতিল ও লাকড়ি আমরা দিতাম। আর যারা একদম খালি হাতে আশ্রয় নিয়েছিল তাদেরকে চিড়া-মুড়ি ও আটা দিয়ে সাহায্য করেছি। আটা তখন খুব সস্তা ছিল। গাছের কাঁঠালও দিয়েছি। তরি-তরকারিও দিয়েছি। এ ব্যাপারে আমার শাশুড়ি আয়েশা খাতুন খুব দৃষ্টি রাখতেন। যেন আশ্রিতদের কোনোরকম কষ্ট না হয়। আমার শাশুড়ি বলতেন– 'হিন্দু হোক, তারাও তো মানুষ, আগে তাদের জীবন বাঁচানোর চেষ্টা করো বউ মা।' যুদ্ধকালীন সময়ে হিন্দুদের একটি পূজা ছিল। তারা আমাদের বাড়িতেই নির্বিঘ্নে সেই পূজা অনুষ্ঠান পালন করেছিল। সত্যি কথা কি, আমরা সেদিন লুকিয়ে তাদের পূজা-পালনের দৃশ্যও উপভোগ করি।

শুধুমাত্র মানবতার টানে, ধর্মীয় ভেদাভেদ ভুলে হিন্দু-মুসলমানদের এমন সহাবস্থানকে ইতিহাসের কোন অধ্যায়ে লিখব তা নির্ণয় করতে পারলাম না। চোখ ছলছল করে উঠল অজপাড়াগাঁয়ের এক মাওলানা বাড়ির কাহিনী শুনে। এরপরও কি ঢালাওভাবে এসব মাওলানাদের স্বাধীনতাবিরোধী বলে আখ্যায়িত করা হবে?

দুই ভাইয়ের সাহসী উচ্চারণ

মাওলানা বাড়ির সন্তান মোঃ হাবিবুর রহমান (চানু) যিনি সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন, তার মুক্তি নং–১০০৯ (বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত সংখ্যা, শনিবার, মে ১৪, ২০০৫, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়)। বর্তমানে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ মুক্তাগাছা থানা শাখার কমিটিতে আছেন। থাকেন মুক্তাগাছা শহরের আটআনি বাজার মোড়ে। আমরা তাঁর সঙ্গেও কথা বলি। চানু জানান–

"যুদ্ধ শুরু হলেই আমি ট্রেনিং নিতে ইন্ডিয়া চলে যাই। ট্রেনিং শেষে দেশে যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে আমার বড় ভাই মাওলানা মাহমুদুল হাসান আমার কাছে চিঠি পাঠান এই বলে যে, যুদ্ধের সময় কোনো বিপদের সম্মুখীন হলে তোমরা নিকটস্থ মসজিদে আশ্রয় নেবে। ইনশাআল্লাহ বিপদে পড়বে না। আল্লাহর রহমতে কোনো বিপদ আমাদের হয়নি। হিন্দুরা এত বাড়ি থাকতে আপনাদের বাড়িতে কেন আশ্রয় নিল? এটা কি সত্যি ঘটনা? চানু রেগে গিয়ে বললেন, এ ঘটনা এ অঞ্চলের কে না জানে। মূলত আমাদের ভাই-বেরাদারদের ব্যবহার ও বিশ্বস্ততাই এর অন্যতম কারণ। আমার ভাইয়েরা সবাই মাদরাসায় শিক্ষিত। এমনকি আমিও কওমি মাদরাসায় (জামেয়া ইসলামিয়া চরপাড়া ময়মনসিংহ) শরহে বেকায়া পর্যন্ত পড়েছি। ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা, সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি আমরা বজায় রেখেছিলাম বলেই তারা আমাদের বাড়িকে নিরাপদ বলে মনে করেছিল।"

মাওলানা বাড়ির আরেক মাওলানা-মাওলানা কাজী মোঃ আবদুল হাই। তিনি ঢাকা জামেয়া কোরআনিয়া আরাবিয়া লালবাগ মাদরাসা থেকে দাওরা হাদিস পাস করেছেন। বর্তমানে মুক্তাগাছা পৌরসভার ২ নং ওয়ার্ডের কাজীর কাজ করছেন। এছাড়া তিনি জাতীয় ইমাম সমিতি মুক্তাগাছা থানা শাখার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, লক্ষ্মীখোলা পৌর গোরস্থান মাদরাসার শিক্ষক এবং নবারুণ বিদ্যানিকেতন হাই স্কুলের ধর্মীয় শিক্ষক। যুদ্ধের সময় তিনি জামালপুর জেলার শৈলারকান্দা আলিয়া মাদরাসার সুপারিনটেন্ডেন্ট ছিলেন। আমরা তার সঙ্গে কথা বলি বৃষ্টি ও তার ব্যস্ততাকে উপেক্ষা করে লক্ষ্মীখোলায় তার বিবাহ-তালাক রেজিস্ট্রি (কাজী অফিস) অফিসে বসে।

কেন আপনাদের বাড়িতে যুদ্ধের সময় হিন্দুরা আশ্রয় নিল? আঃ হাই জানালেন, শুধুমাত্র বিশ্বাসী বলেই তারা আমাদের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল। আপনারা জানেন, কিছু কিছু দুষ্ট লোক তখন হিন্দুদের সহায়-সম্পদ আত্মসাৎ বা দখলের চেষ্টা করেছিল। কিন্তু আমরা এর থেকে বিরত ছিলাম বলেই তারা আমাদের বাড়িকে নিরাপদ মনে করত। তাছাড়া আরেকটা কথা, আমাদের বাড়িটা আলেমদের হওয়ায় অনেকেই ধারণা করত পাকসেনারা তো আর এখানে আসবে না। তাই তারা এখানে আশ্রয় নিতো। তবে যুদ্ধের মাঝামাঝি সময়ে আমার ছোট ভাই হাবিবুর রহমান মুক্তিযুদ্ধে গেলে পাকবাহিনীর রোষানলে আমাদেরও পড়তে হয়। পাকবাহিনী আমাদের ঘরে আগুন দেয়। কিন্তু আল্লাহর অসীম রহমতে সেই আগুন আপনা-আপনিই নিভে যায়। অবশ্য তখন কোনো পুরুষ এমনকি আমরা কোনো ভাই ও আমার বাবা-চাচারা কেউ বাড়িতে ছিলেন না। আমি মনে করি, এটা আল্লাহর একটা বিশেষ রহমত ছিল।

এত হিন্দু কোথা থেকে এলো? তিনি বলেন, আমাদের আশেপাশে প্রচুর হিন্দু বাড়ি ছিল। তাদের সঙ্গে আমাদের আগেই উঠাবসা ছিল; পাশাপাশি ক্ষেত-ক্ষামার ছিল, বিভিন্ন সময় গচ্ছিত মাল রেখে পূর্বাবস্থায় ফেরত পেত। আর এজন্যই তারা আমাদের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল। বৃহৎ শক্তির বিপক্ষে কেন অবস্থান নিলেন? তিনি বলেন, পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বিভিন্ন বিষয়ে আমাদের ওপর জুলুম করত। তাই ইনসাফের খাতিরেই

আমরা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে অবস্থান নেই। এখানে আওয়ামী লীগ বা বিএনপি বড় কথা নয়। আর স্বাধীনতা কে না চায়?

মুক্তিযুদ্ধে সহায়তাকারী এ মাওলানা অস্ত্র হাতে সরাসারি রণাঙ্গনে না গেলেও তাঁর বদান্যতায়, তাঁর সুপারিশে অনেকের জীবন রক্ষা পেয়েছিল। তিনি বলেন– যুদ্ধের ৬ মাস হতে চলল। আমি শৈলারকান্দা মাদরাসা থেকে পায়ে হেঁটে বাহেঙ্গা দিয়ে মুক্তাগাছা আসছিলাম। পথেই (বাহেঙ্গা) জোহর নামাজ আদায় করে সবে হাঁটা ধরব তখন শুনি অনেক মানুষের কান্নার আওয়াজ। প্রথমে ভয় পেলেও বুকে সাহস সঞ্চার করে ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখি ১ জনকে পাকসেনারা গুলি করেছে, আরো ৭/৮ জনকে গুলি করতে চাচ্ছে, পাকবাহিনী তাদের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সাহায্যকারী বলে গালাগাল দিচ্ছে। পরে আমি তাদেরকে নিরীহ-আওয়াম বলে তাদের ছেড়ে দিতে বলি। আমার হুজুরি লেবাস দেখে পাকবাহিনীর জওয়ানরা আমার কথা বিশ্বাস করে এবং তাদের ছেড়ে দেয়।

আশ্রয়প্রার্থী রেণু বালার পরিবারের কথা

যুদ্ধের সময় মাওলানা বাড়িতে আশ্রয় নেয়া হিন্দু পরিবারগুলোর সঙ্গে আমরা কথা বলতে চেষ্টা করছি। কিন্তু তাদের অনেকেই আমাদের সঙ্গে বলতে রাজি হননি। মুক্তাগাছা শহরের বিশিষ্ট এক হিন্দু ব্যবসায়ী মাওলানা বাড়িতে আশ্রয় নেয়ার কথা স্বীকার করলেও আনুষ্ঠানিকভাবে তা তিনি বলতে নারাজ। তার ভাষায় 'ডান বাম যাই বলুন না কেন আমাদের দিয়ে কথা বলিয়ে আপনারা উপকৃত হন; আর আমরা পড়ি বিপদে।' তবে আমাদের সঙ্গে সানন্দে কথা বলেছেন, ছবির জন্য সপরিবারে পোজ দিয়েছেন রেণু বালার পরিবার।

রেণু বালা দে। অশীতিপর বৃদ্ধা। একাত্তরে তিনি ছেলে-মেয়েদের নিয়ে মাওলানা বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন।



একাত্তরে মাওলানা বাড়িতে এরকম অসংখ্য হিন্দু পরিবার আশ্রয় নিয়েছিল

কথা হয় তাঁর বড় ছেলে শ্রী শংকর চন্দ্র দের সঙ্গে। শংকর চন্দ্র পেশায় ড্রাইভার। বাস চালক। ময়মনসিংহ-টাঙ্গাইল রোডে গাড়ি চালান। বর্তমানে থাকেন মুক্তাগাছা পৌরসভার মুজাটি নয়া পাড়াতে। মূল বাড়ি জয়দা উত্তর পাড়ায়। স্কুল ঘরের পাশে ঠিক ময়মনসিংহ-টাঙ্গাইল রোডের ওপরে। শংকর বাবু জানালেন—

আমাদের বাড়িটা রাস্তার সাথে হওয়ায় যুদ্ধ শুরুর কয়েকদিন পরই আমাদের ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দেয় পাকবাহিনী। আগুন লাগানোর আগে সামান্য যা ছিল তা লুটে নেয় তাদের দোসর রাজাকাররা। আমরা তো ঘর ছাড়া তার ওপর আবার হিন্দু। সুতরাং কোথাও আশ্রয় মিলল না। আমার বাবা স্বর্গীয় শশাংক মহন দে। তিনি স্বাধীনতার ৬/৭ বছর পর স্বর্গবাসী হন। তিনি লোকমুখে শুনলেন যে, মাওলানা বাড়িতে আমাদের গ্রামের ফণিন্দ্রের পরিবারসহ আরও অনেক অনেক হিন্দু পরিবার আশ্রয় নিয়েছে। আমার বাবা ও কাকা সুভাষ চন্দ্র দে, দু'জনে মিলে আমাদের নিয়ে রেখে এলেন মাওলানা বাড়িতে। আমার বয়স তখন আট কি নয়। আমার স্পষ্ট মনে আছে, শুধুমাত্র হিন্দুদের আশ্রয় দেয়ার কারণে মাওলানা বাড়িতে আগুন লাগায় রাজাকাররা। আমাদের পরিবারের সবাই আমরা সেখানে বেশ স্বাচ্ছন্দ্যেই ছিলাম। তাঁরা আমাদের চালসহ বিভিন্ন খাবার পর্যন্ত দিয়ে সহযোগিতা করেছে। দিনে তো বড়রা বাড়িতে থাকত না রাতে আসত। তবে আমরা ছোটরা ও মহিলারা নিজের বাড়ির মতো করেই থেকেছি।

আমার দাদা (বড় ভাই) কার্তিক চন্দ্র দে, বোন শ্রীমতী মুঞ্জু চন্দ্র দে ও শ্রীমতী পুতুল চন্দ্র দেসহ আমরা মাওলানা বাড়ির সমবয়সিদের সঙ্গেই থাকতাম।

শংকর চন্দ্র দে দুই সন্তানের জনক। ছেলে চুটন চন্দ্র দে পড়ছে ২য় শ্রেণীতে, আর মেয়ে যেতু চন্দ্র দে পড়ছে ৩য় শ্রেণীতে, তার স্ত্রী অর্চনা রানী দে গৃহিণী।

মাওলানা বাড়ির জামাই বীর মুক্তিযোদ্ধা হাফেজ মহিউদ্দীন

মাওলানা বাড়ির জামাই হাফেজ মোঃ মহিউদ্দীন আহমেদ ভারতীয় ট্রিনিংপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা। তাঁর এফএফ নং ৯১১৯। বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা নং ৯৫২। তিনি ২১ ডিসেম্বর ১৯৯৯ সালে ইন্তেকাল করেন। তাঁর বাড়ি ছিল মাওলানা বাড়ির পাশের গ্রাম মণ্ডলসেনে। তিনি যুদ্ধ করেছেন ময়মনসিংহ জেলা কমান্ডার নাজমুল তারা'র অধীনে। যুদ্ধের প্রথম দিকে নেত্রকোনা, বারহাট্টা এলাকায় যুদ্ধ করেন। পরে মুক্তাগাছার অবসরপ্রাপ্ত হাবিলদার মোঃ রফিজদ্দীন রেফাত-এর অধীনে যুদ্ধ করেন মুক্তাগাছায়।*

ঢাকা ফেরার তাড়া। এক ফাঁকে এনায়েত মনে করিয়ে দিলেন, 'আমাদের এলাকায় এসেছেন, মুক্তাগাছার বিখ্যাত মণ্ডা না খেয়ে যাবেন?' তা কি আর হয়। এনায়েত সোজা নিয়ে গেলেন মণ্ডার আদি জন্ম যেখানে– গোপাল পণ্ডিতের দোকানে। জিভে মণ্ডার স্বাদ নিয়ে ঢাকার গাড়ি ধরলাম।

---

* মুক্তিযোদ্ধা হাফেজ মহিউদ্দীন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা থাকবে এ গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে।



শৈলারকান্দার পীর মাওলানা সাইফুল মালেকের মহানুভবতা— সেদিন লাঠি হাতে বলেছিলাম, দেশ এখন স্বাধীন, খবরদার কারও রক্তে যেন তোমাদের হাত রঞ্জিত না হয়। ওরা ভুল পথে ছিল, তাই ওদের পরাজয় হয়েছে

জয়দা গ্রামে আলেম মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের খোঁজে গিয়ে জানতে পারি শৈলারকান্দার পীর মাওলানা সাইফুল মালেক সম্পর্কে। তাঁর সম্পর্কে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের জন্য আবারো ডাক পড়ল– মুফতি এনায়েতের। পীর সাহেব সম্পর্কে এনায়েতকে বলতেই এনায়েত বলল, তিনি পীর সাহেবকে চেনেন, তার দরবারেও গিয়েছেন, পীর সাহেবের সঙ্গে তার দূর-আত্মীয়ের সম্পর্কও আছে।

আলহাজ শাহ্ সুফি মাওলানা সাইফুল মালেক। পীর সাহেব কেবলা সালাম আবাদ শরীফ। ঢাকা-জামালপুর মহাসড়ক থেকে তিন কিলোমিটার উত্তরে তার খানকা অবস্থিত। জামালপুর জেলার সবচেয়ে প্রভাবশালী পীর তিনি। বয়স নব্বই ছুঁই ছুঁই। এখনো হাঁটেন বেশ। চোখে চশমার প্রয়োজন পড়ে না!

পীর সাইফুল মালেক সম্পর্কে মুফতি এনায়েতের ভগ্নীপতি ডা. মনজিন (পীর সাহেবের ভাগ্নে) বেশ কিছু তথ্য দিলেন। সঙ্গে পীর সাহেবের ছেলে আবু আহমদ-এর সঙ্গে যোগাযোগের সেল নাম্বারও। এলাকার পরিচিত বাহন ভ্যানে চড়ে সালাম আবাদ দরবার শরীফে পৌঁছলাম। দিনটি ছিল শুক্রবার। গিয়ে শুনি সারারাত মাহফিল করে পীর সাহেব এখন বিশ্রামে আছেন। অগত্যা পীরের ছেলে আবু আহমদ-এর সঙ্গে কথা বলতে শুরু করলাম। সালাম আবাদ দরবারের সুবিশাল প্রবেশদ্বার 'বাবে রহমত'। শান বাঁধানো বড় একটি দীঘি। বিশাল মাঠ। এ দরবারের নিয়ন্ত্রণে চলে বেশ কিছু প্রতিষ্ঠানও। আল-আমিন এতিমখানা, সালাম আবাদ শরীফ আহমদিয়া ফাজিল মাদরাসা, সিদ্দীকিয়া হাফেজিয়া মাদ্রাসা ও গাউছিয়া কারিগরী বিদ্যালয়। আল-আমিন এতিমখানায় প্রায় ৩০০ এতিম ছাত্র রয়েছে। জাতীয় ও জেলা পর্যায়ে স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত এতিমখানা এটি।

আবু আহমদ জানালেন, পীর সাহেবের বহু মুরিদ ও এতিম মুক্তিযোদ্ধা ছিল। মুক্তিযুদ্ধের সময় তাঁকে পাক-হানাদার বাহিনী রাজাকারদের অভিযোগের প্রেক্ষিতে আটক করেছিল। আটক করে প্রথমে জামালপুরে ও পরে ময়মনসিংহ সার্কিট হাউজ সেনা ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে স্থানীয় রাজাকারদের অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায়

তাকে মুক্তি দেয় পাক বাহিনী। আবু আহমদ আরো জানান, লোকমুখে শুনেছি, আব্বাকে যেদিন আটক করে পাক বাহিনী, সেদিন আকাশবাণী থেকে "বাংলাদেশের জয় বাংলার পীর সাইফুল মালেককে পাক বাহিনী আটক করে পরে ছেড়ে দেয়।" এ মর্মে সংবাদ প্রচার করেছিল। এরপর থেকেই স্থানীয় অনেকের কাছে তিনি 'জয় বাংলার পীর' নামে খ্যাত।

কথার ফাঁকে একজন এসে জানালেন, পীর সাহেব বাইরে বেরিয়ে এসেছেন। তাই আর কালক্ষেপণ না করে আমরা সরাসরি তাঁর কাছে পৌঁছে গেলাম। পরিচয় পর্বে এনায়েত হয়ে গেল পীর সাহেবের আত্মীয়। সুতরাং সম্বোধন সরাসরি আপনি, তুমি হয়ে তুই-এ গিয়ে পৌঁছল। আমরা জানতে চাইলাম, লোকে আপনাকে 'জয় বাংলার পীর' বলে কেন? পীর সাহেব প্রথমে এ নিয়ে কথা বলতে আপত্তি জানালেও এনায়েতের পীড়াপীড়িতে শেষ পর্যন্ত রাজি হলেন। তিনি বলেন–

কুমিল্লা চৌদ্দগ্রামের কাজী পরিবার আমার ভক্ত-মুরিদ পরিবার। এ পরিবারের সন্তান কাজী গিয়াসউদ্দীন আহমেদ (কে জি আহমেদ) ছিল আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামি। আর জহিরুল কাইয়ুম ওরফে বাচ্চু মিয়া ছিল আওয়ামীলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান, সেও আমার ভক্ত। ১৯৬৯-এর আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাটি হচ্ছিল ক্যামেরা কোর্টে। মামলার শেষ পর্যায়ে কে জি আহমেদকে দেখতে আমি ট্রাইব্যুনাল হলে যাই। সেখানে সর্বসাধারণের প্রবেশাধিকার সংরক্ষিত ছিল। সেখানকার ডিউটি অফিসার ছিল এক পাকিস্তানি। নাম শরীফ হাসান, সে আমার পূর্ব পরিচিত। সে আমাকে ট্রাইব্যুনাল হলে প্রবেশের ব্যবস্থা করে দেয়। সে হলেই কে জি আহমেদই আমাকে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। এরপরও শেখ সাহেবের সঙ্গে আমার অনেকবার সাক্ষাৎ হয়েছে।



শৈলারকান্দার পীরের দরবার 'বাবে-রহমত'

এরপর যুদ্ধ শুরু হলো। যুদ্ধ অবস্থায়ও আমার এখানে মাসিক মাহফিল হয়েছে। মাহফিল ও নামাজের সময় এখানে বহু মুক্তিযোদ্ধা যাতায়াত করত। আমি যুদ্ধের সময় শান্তির জন্য দোয়া করেছি। আমি আমার মাতৃভূমিকে ভালোবাসি। মাতৃভূমিকে ভালোবাসা ঈমানের দাবি; নবী (সাঃ) মাতৃভূমিকে ভালোবাসতেন বলেই হিজরতের প্রাক্কালে তাঁর (সাঃ) দু'চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরেছিল। আমার কাছে মুক্তিযোদ্ধাদের কেউ কোনো সাহায্যের জন্য আসলে তাকে যথাসাধ্য সাহায্য করতাম। এ খবর পাকিস্তানি সেনাদের কাছে পৌঁছল। সম্ভবত শবে বরাতের (রাত) হবে। সেদিন মাহফিল ছিল। মাহফিলের পর পাকসেনারা আমাকে উঠিয়ে নিয়ে গেল জামালপুর সেনা ক্যাম্পে। পথে ছিল পাক বাহিনীর কড়া পাহারা। জামালপুর ক্যাম্প ইনচার্জ ও অন্যান্যরা আমাকে জামালপুরে রাখা নিরাপদ নয় মনে করে ময়মনসিংহে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়। সিদ্ধান্ত হয় আমাকে সামরিক যানে না পাঠিয়ে ট্রেনে পাঠানোর। আমাকে নেয়ার পথে নুরুন্দী ও নান্দিনাসহ প্রতিটা স্টেশনে ছিল লোকে লোকারণ্য। জামালপুরে রাতে রেখে আমাকে ময়মনসিংহ পাঠানো হলো। সেখানকার সেনা ক্যাম্প ছিল বর্তমান সার্কিট হাউজে। আগে থেকেই সেখানে পিস কমিটির বড় বড় নেতারা ছিল। তারা আমাকে দেশবিরোধী, আওয়ামী লীগার ইত্যাদি বলে সেখানকার দায়িত্বরত অফিসারের সামনে কটূক্তি করে। আমি সেখানে উপস্থিত এক মাওলানা রাজাকার নেতাকে বলি, মাওলানা আপনার সিগনেচারে কেউ বাঁচে, কেউ মরে, আমারও হয়তো কিছু একটা হবে। তবে লুট-পাট, ইজ্জতহানি ও অগ্নি সংযোগ কোন ইসলাম সমর্থন করে তা বলবেন কি? একথা শুনে অন ডিউটি অফিসার ব্রিগেডিয়ার সেই মাওলানাকে লক্ষ্য করে বলেছিল– কিয়া মাওলানা, হামারে লোগ ইয়ে কাম কারতাহে যু মাওলানানে কাহা? আগার ইয়ে মাওলানাকা বাত সাচহো তো তুম লোগ ঝুটা হো। আওর তোমহারে বাতভি ঝুটা হ্যায়। একথা বলে সেই অফিসার আমাকে তার রুমে নিয়ে যায়। অনেক কথার মাঝে ব্রিগেডিয়ার আমাকে নাম নিয়ে পাকিস্তানের জন্য দোয়া করতে বলে। আমি তা অস্বীকার করি। আমি নাম না নিয়ে মঙ্গলের দোয়া করি আমার দেশের জন্য। স্থানীয় গোয়েন্দা রিপোর্ট আমার পক্ষে এবং ব্রিগেডিয়ারের কাছে আমার নামে করা অভিযোগ ভিত্তিহীন প্রমাণিত হলে তারা আমাকে ছেড়ে দেয়। পরে অবশ্য তারা আমাকে তাদের গাড়ি দিয়ে শৈলারকান্দা পৌঁছে দিতে চাইলে আমি সবিনয়ে তা প্রত্যাখ্যান করি।

এত বড় একটা শক্তির বিরুদ্ধে কেন অবস্থান নিলেন? পীর যুক্তি দিয়ে বোঝালেন, প্রথমত আমি মুসলমান, একজন ঈমানদার হিসেবে আমি অন্যায়, অবিচার, হত্যাযজ্ঞকে সমর্থন করতে পারি না তাই আমি এ পথে যাই। আমি সহ্য করতে পারিনি কোনো হিন্দুর ঘর জ্বালানো, মেয়েদের লাঞ্ছিত করা। অকারণে কোনো মায়ের বুক খালি করা। একমাত্র ঈমানের দাবিতেই আমি যতটুকু সম্ভব মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে অবস্থান নেই। তাই সালাম আবাদ দরবারে মুক্তিযুদ্ধের সময় বহু হিন্দু নর-নারীকে আশ্রয় দিয়েছি। আমাকে আটক করার দিন নাকি 'আকাশবাণী' থেকে প্রচার করেছিল 'জয় বাংলার পীর আটক'।

আমি নিজে তা শুনিনি, তথ্যটি কতটুকু সঠিক আমি জানি না! তবে এ দরবার সম্পূর্ণ রাজনীতিমুক্ত।

মুক্তিসেনারা ময়মনসিংহে যখন বিজয়ীর বেশে প্রবেশ করছিল তখন আপনি কোথায় ছিলেন? এনায়েতের এ প্রশ্নে তিনি বেশ কৌতুক করে বলেন, তুই তো জাহান মাস্টারের পোলা, খুঁচায়া কতা কইবার বেশ উস্তাদ। ঘটনা বেশি কিছু না। বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলের মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার এম এ হাশেম ছিল আমার মুরিদ। যেসব মাওলানা-রাজাকারদের জন্য আমাকে আটক করা হয়েছিল তার প্ল্যান ছিল তাদের ওপর প্রতিশোধ নেয়ার। তার একথা জানতে পেরে ময়মনসিংহের সম্ভুগঞ্জ ঘাটে (বর্তমানে সম্ভুগঞ্জ ব্রিজ) আমি যাই। ওইদিক দিয়ে মুক্তিসেনারা বিজয়ীর বেশে ময়মনসিংহ শহরে প্রবেশ করছিল। আমি সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম লাঠি হাতে। তাদের বলেছিলাম- দেশ এখন স্বাধীন! খবরদার কারো রক্তে যেন তোমাদের হাত রঞ্জিত না হয়। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠন যেমন প্রয়োজন তেমনি তোমাদের হাতে সব নাগরিকের নিরাপত্তাও জরুরি। ওরা ভুল পথে ছিল। তাই ওদের পরাজয় হয়েছে; সুতরাং কোনো খুনোখুনি চলবে না। আরেকটি কথা, যেসব রাজাকার মাওলানাদের অভিযোগে আমাকে আটক করেছিল স্বাধীনতার পর আমি মুক্তিযোদ্ধাদের বলে বলে তাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করি।



মুক্তিযুদ্ধের ন'মাস দেশপ্রেমিক মুক্তিযোদ্ধারা চরমোনাই মাদরাসার যে রুমটিতে অস্ত্র বোঝাই করে রেখেছিলেন সেই স্মৃতি নিয়ে মাওলানা ইউসুফ আলী খান আজও বসবাস করছেন

রাত আটটা বেজে তের। কীর্তন খোলা-১ এর বারান্দায় পা রাখলাম। সঙ্গে মাসউদুল কাদির ও তাজুল ফাত্তাহ। আলো ঝলকানিতে লঞ্চগুলো হেসে উঠছিল বারবার। যেন উল্লাসে মেতে উঠছে আমাদের নৌভ্রমণের শুভকামনায়। মানুষের ভিড়; ব্যস্ততা, প্রচণ্ড কোলাহল, জলে ভাসা টার্মিনালে ধুপধাপ শব্দ মাতিয়ে রাখছে চারদিক। কিছুক্ষণ পরই দূর পাল্লার লঞ্চগুলো ছুটবে উর্ধ্বশ্বাসে, রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়বে তাদের ক্ষীপ্রতা। অন্ধকার নামার পরপরই অনেক লঞ্চ পাড়ি জমিয়েছে দূর এলাকাগুলোয়। রাতের আয়ু ছোট হয়ে আসছে। এখনও আমাদের কেবিন বুকিং দেয়া হয়নি। সারাদিনের নানামুখী ব্যস্ততায় আমাদের সে সুযোগটুকু কোথায়। যে করেই হোক আমাদের একটি ভালো কেবিন চাই। নতুবা ভ্রমণ দুষ্কর হয়ে যাবে। আগামীকালের এসাইনমেন্টে বেশ কষ্ট হবে। আশা ও ভয় নিয়ে দ্রুত পা চালাতে লাগলাম। ভাগ্য আমাদের সঙ্গে পরিহাস করেনি। কেবিনের ব্যবস্থা হয়ে গেল। একেবারে ভিআইপি কেবিন! ভাবা যায়, লঞ্চ ছাড়ার আর মাত্র ৭ মিনিট বাকি, সাধারণ একটা সিট পাওয়াই যেখানে দুষ্কর, সেখানে ভিআইপি কেবিন! টাকা দিয়ে সবকিছু হয়— ঢাকা-রবিশাল রুটে একথাটা মিথ্যা। তাই এটাকে আমাদের ওপর ওপরওয়ালার পক্ষ থেকে বিশেষ রহমতই মনে হলো। কৃতজ্ঞতাস্বরূপ মুখ থেকে বেরিয়ে এলো— আলহামদুলিল্লাহ! সামান্য পরেই টিংটিং বাজাল, হুইসেল শুনা গেল। আস্তে আস্তে দূরে সরতে লাগল আমাদের লঞ্চ। কিছুক্ষণ পর মাথা বাঁকিয়ে পিছু তাকালাম। এখন আর আলোকোজ্জ্বল, ভিড়-ব্যস্ততা ও প্রচণ্ড কোলাহলের সেই সারিসারি লঞ্চের সদরঘাটটি নেই। আছে কেবল কয়েকটি আলোর বিন্দু। শুভ বিদায়!



এশার নামাজ পড়ে ভালো করে পেট চার্জ দিয়ে কেবিনে এসে দরজা বন্ধ করে বসি। মৃদু কম্পনে চলতে থাকা লঞ্চের কেবিনে বসে আড্ডার স্বাদ উপভোগ করতে লাগলাম। কিছুক্ষণ বই নিয়ে পরামর্শ করলাম আমরা। কথা বললাম, গল্প করলাম। রাত গড়াতে

লাগল সামনের দিকে। মধ্যরাতে বাইরে বেরুই তিনজন। বারান্দায় পাতানো চেয়ারে আরাম করে বসি। আকাশে চাঁদ উঠেছে। জ্যোৎস্না রাত, নির্মল-স্বচ্ছ বাতাস যেন আমাদের গা ধুয়ে দিচ্ছিল বারবার। আনন্দে মনটা নাচছিল। আমার চেয়ে বেশি উপভোগ করছে সঙ্গে থাকা দুই ছড়া শিল্পী— মাসউদুল কাদির ও তাজুল ফাত্তাহ। কারণ, এটাই তাদের জীবনের প্রথম নৌভ্রমণ। এ প্রথম এমন নৈসর্গিক দৃশ্যের সঙ্গে পরিচয়। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ওপর ক্লান্তিরা এসে ভর করতে লাগল। শেষ রাতের দিকে জ্যোৎস্না ধোয়া আরাম কেদারা ছেড়ে আমরা কেবিনের বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম। ঘুমুতে চেষ্টা করলাম। ঘুম তো নয় আশা আর প্রতীক্ষার নির্যাতন। তবুও চোখ বুজে রইলাম কিছুক্ষণ। ধীরে ধীরে রাতের অন্ধকার কালো বিড়ালের মতো হামাগুড়ি দিয়ে নেমে যেতে লাগল। প্রায় তিনশ' কিলোমিটার নদী পথ পাড়ি দিয়ে সকালে লঞ্চ ছেড়ে বরিশাল শহরে পা রাখি।

শহরের কোল ঘেঁষে বয়ে যাওয়া নদীটির নাম কীর্তন খোলা। আমাদের রাজধানীর সলিল প্রতিবেশী বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা বা তুরাগের চেয়ে কয়েকগুণ বেশি প্রশস্ত। পানি দুর্গন্ধ বা তামাটে কিংবা পীত বর্ণেরও নয়। স্বচ্ছ, নির্মল ও ঝকঝকে। দু'পাশে তার অফুরন্ত সবুজের সমারোহ। চোখ ধাঁধানো রূপ। কীর্তন খোলা নদীর এপার থেকে ট্রলার নিয়ে ওপারে চলে গেলাম। এরপর দুটো মোটরসাইকেলে চেপে পনের-বিশ মিনিটেই পৌঁছে যাই দেশের বৃহৎ ও সেরা মাদরাসাটিতে। যে মাদরাসর সুখ্যাতির পরিধি আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডল পর্যন্ত স্পর্শ করেছে। জামিয়া রশিদিয়া আলিয়া ও কওমি মাদরাসা চরমোনাই। সবুজ ঘাসের এক বিশাল প্রান্তকে ঘিরে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে কওমি ও আলিয়া মাদরাসা দু'টি। হযরত এসহাক (রহঃ)-এর হাতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আলিয়া মাদরাসাটি। আর তার পাশের কওমি মাদরাসাটির গোড়াপত্তন ও আজকের এই বিশাল অবস্থানে নিয়ে আসেন মরহুম মাওলানা ফজলুল করীম। আজ থেকে কয়েক যুগ আগে তিনি দু' ধারায় বিভক্ত মাদরাসা শিক্ষাকে সমন্বয় করতে এ কালজয়ী উদ্যোগটি গ্রহণ করেছিলেন।

জামিয়া রশিদিয়া আলিয়ার ভাইস প্রিন্সিপ্যাল মাওলানা ইউসুফ আলী খান। তিনি আলেমও মুক্তিযোদ্ধাও। তিনি ম্যাট্রিক পাস করেন বরিশাল বিএম কলেজ আর টাইটেল শর্ষিনা আলিয়া থেকে। ৭৫ বছর বয়স্ক এ বয়োবৃদ্ধের ২ ছেলে ও ৩ মেয়ে রয়েছে। তিনি হযরত এসহাক (রহঃ)-এর দুই মেয়েকে পালাক্রমে বিয়ে করেন। আলিয়া মাদরাসার দোতলায় তার অফিস রুমে এসে হাজির হই আমরা। নিজেদের পরিচয় দেই। অনুমতি পেয়ে চেয়ার টেনে বসে পড়ি তার মুখোমুখি। তার সঙ্গে কথা বলি, গল্প করি, আড্ডা জমিয়ে ফেলি। যে তথ্যগুলো তখন আমরা উদ্ধার করতে পারি, সেগুলো ছিল এরকম :

মাওলানা ইউসুফ আলী খান সশস্ত্র লড়াইয়ে অবতীর্ণ না হলেও মুক্তিযুদ্ধে তার প্রত্যক্ষ ভূমিকা ছিল অনেক বেশি। মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দেওয়া, দেখা-শোনা করা, পরামর্শ দেওয়া, বিভিন্ন প্রয়োজনে সঙ্গে থাকাসহ মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি তার

❝

৯ নং সেক্টর কমান্ডার মেজর এমএ জলিল ও ক্যাপ্টেন আবদুল লতিফ-এর রীতিমত যাতায়াত ছিল চরমোনাইর পীর সাহেব মাওলানা এছহাক (রহঃ)-এর কামরায়। সেক্টর কমান্ডার ছাড়াও অসংখ্য মুক্তিযোদ্ধা তাঁর কাছে আসত। কথা বলত। পরামর্শ করত। গল্প করত। স্বাধীনতার গল্প

❞



চরমোনাইর দরবারের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা এছহাক (রহঃ)

অবদানের কথা অনস্বীকার্য। এছাড়াও তিনি ছিলেন মুক্তিযোদ্ধাদের কাজী-বিচারক। কেউ কোনো অপরাধ করলে তার কাছে মোকদ্দমা দায়ের করা হতো। তিনি সময় দিলে সবাই বিচারে হাজির হতো। তার বিচার স্বতঃস্ফূর্তভাবে সবাই মেনে নিত। দ্বিমত পোষণ করত না কেউ। মাওলানা ইউসুফ আলী খানের মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠ হওয়ার পেছনে মরহুম পীর হযরত এসহাক (রহ.)-এর নসিহত-পরামর্শ ও হুকুম কাজ করেছে। জানা গেছে, ন' নম্বর সেক্টর কমান্ডার মেজর এমএ জলিল ও ক্যাপ্টেন আবদুল লতীফ এর রীতিমত যাতায়াত ছিল মরহুম পীর সাহেব মাওলানা এসহাক (রহঃ)-এর কামরায়। সেক্টর কমান্ডার ছাড়াও অসংখ্য মুক্তিযোদ্ধা তাঁর কাছে আসত। কথা বলত। পরামর্শ করত। গল্প করত। স্বাধীনতার গল্প। সাহসের গল্প।

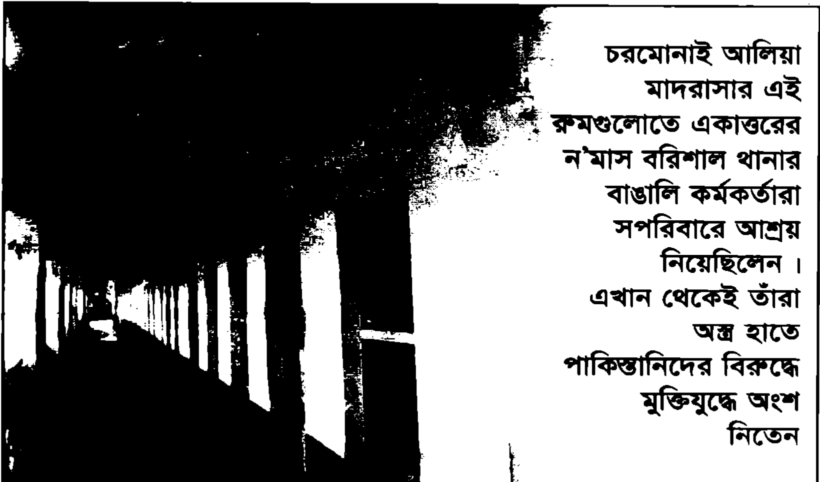
তার প্রতিষ্ঠিত মাদরাসা জামিয়া রশিদিয়াতেই ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের শক্ত ঘাঁটি। এ মাদরাসায় তারা থাকত। খেত। পরামর্শ করত। আড্ডা দিত। এখান থেকেই অস্ত্র হাতে বেরিয়ে যেত মুক্তিসেনারা শত্রুর খোঁজে। আবার যুদ্ধে যারা বেঁচে যেত, জয়ী হতো তারা ফিরে আসত মাদরাসার রুমে। থাকত। খেত। ঘুমাত। মাদরাসার পক্ষ থেকে ২/৩টি বড় বড় রুম ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল কেবল মুক্তিযোদ্ধাদের আপ্যায়নে। আতিথেয়তায়।

মাদরাসা থেকে দূরে বুখাইনগর এলাকায় একবার মুক্তিযুদ্ধের স্থানীয় শীর্ষ কর্তাদের নিয়ে মিটিং হয়। সেখানে মাওলানা ইউসুফ আলী খানের ডাক পড়ে। দাওয়াত আসে। তিনি হাজির হন। তখন একজন তাঁকে না চিনতে পেরে চিৎকার করে ওঠে— এ আবার কে? কোনো টিকটিকি নয় তো? সঙ্গে সঙ্গে কমান্ডার আবদুল হামিদ দাঁড়িয়ে গেলেন। বললেন– আরে আপনি এই মাওলানাকে চিনলেন না। মাওলানা ইউসুফ আলী খান; আমাদের একান্ত নিজস্ব লোক। কোনো ভয় নেই। ওই বৈঠকেই তাকে সর্বসম্মতিক্রমে মুক্তিযোদ্ধাদের কাজী-বিচারক নির্বাচন করা হয়।

চরমোনাই মাদরাসায় বরিশাল থানার অনেক কর্মকর্তা সপরিবারে আশ্রয় গ্রহণ করে থাকতেন। তাদের মাঝে অনেকে অফিসার, কেউবা দারগাও ছিলেন। তাদের হাতে বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র ছিল। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তারা থানা থেকে অস্ত্রগুলো নিয়ে পালিয়ে আসে। আশ্রয়গ্রহণ করে। আর ফেরত যায় নি। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। দেশ স্বাধীন হয়ে গেলে সবাই নিজ নিজ পরিবার নিয়ে বাড়ি চলে যায়। হাতের অস্ত্রগুলো কী করবে এ নিয়ে ভেবে অস্থির। শেষ পর্যন্ত তারা অস্ত্রগুলো 'বিশ্বস্ত মাওলানা' ইউসুফ আলী খানের হাতে আমানত রেখে যায় এবং অনুরোধ করে যায়, অস্ত্রগুলো যেন সুযোগমতো থানায় জমা দিয়ে দেয়। দেশ স্বাধীন হওয়ার কিছুদিন পর মাওলানা ইউসুফ আলী খান ওই এলাকার দারোগা আবদুল মান্নান-এর সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন। পরে তার হাতে গচ্ছিত আমানত বন্দুক, রিভলবার দারোগা আবদুল মান্নান-এর হাতে সোপর্দ করে দায়মুক্ত হন তিনি। পরিচয় দেন বিশ্বস্ততার, আমানতদারির ও দেশপ্রেমের।

স্বাধীনতার পর সরকারের পক্ষ থেকে চরমোনাই মাদরাসা বা পীর সাহেব হুজুর কিংবা মাওলানা ইউসুফ আলী খান কোনো প্রকার চাপ বা কঠোরতার মুখোমুখি হননি। আর কোনো অনুদান বা সাহায্য-সহযোগিতাও পাননি। দেশ স্বাধীন হয়ে গেলে শর্ষিনা, ফয়রার পীর এবং বরিশাল জামে মসজিদের ইমাম ও খতিব মাওলানা বশীরুল্লাহ কারীদের সরকার গ্রেফতার করে। জেল হাজতে পাঠায়। কিন্তু চরমোনাই পীর বা মাওলানা ইউসুফ আলী খানের দিকে সরকার অভিযোগের আঙুল তুলেনি। কারণ, তারা ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি। মাওলানা ইউসুফ আলী খানের একটি অভিব্যক্তি হলো, আমরা এক সময় ব্রিটিশের নাগরিক ছিলাম। পরে হলাম পাকিস্তানের। তারপর বাংলাদেশের। আর এখন চাই ইসলামী হুকুমতের নাগরিক হতে।

তিনি যখন বললেন, পীর সাহেব হযরত এসহাক (রহঃ)-এর প্রথম মেয়ে মারা যাওয়ার পর ২য় মেয়েকেও তিনিই বিয়ে করেন। মাসউদুল কাদির তখন একটু কৌতুক করে


চরমোনাই আলিয়া মাদরাসার এই রুমগুলোতে একাত্তরের ন'মাস বরিশাল থানার বাঙালি কর্মকর্তারা সপরিবারে আশ্রয় নিয়েছিলেন। এখান থেকেই তাঁরা অস্ত্র হাতে পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতেন

বলল, আপনি তো তাহলে দেখা যাচ্ছে 'যিন্নুরাইন'। সঙ্গে সঙ্গে হাসির রোল পড়ে গেল সবার মাঝে। ইউসুফ সাহেবও হাসলেন অনেক সময় ধরে। আমি বললাম, হুজুর এখানের চাকরিটা পেলেন কীভাবে? মাসউদুল কাদির আরো হাসির খোরাক নিয়ে এলো। বলল, কেন! যৌতুক হিসেবে। আবারো হাসি। আরো বেশি আনন্দ। হাসতে হাসতে একদম নিচু হয়ে গেলেন ইউসুফ আলী খান।

আরেকটি তথ্য পাই তার কাছে। চরমোনাই-এর চারদিকে নদী। লোকে বলে, মোনাই নামক নাকি এক পীর-দরবেশ থাকত এ চরে। তার প্রস্থানের পর তাঁর অনুসারীরা তাঁর নামেই এ এলাকার নাম রাখে 'চরমোনাই'।

এক ফাঁকে সাক্ষাৎ করে এলাম চরমোনাইর বর্তমান পীর ও স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান মুফতি রেজাউল করীমের সঙ্গে। পরিচয় দিলাম। আমাদের আগমনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানালাম। শুনে খুশি হলেন। বললেন, একটা মহান কাজে নেমেছেন আপনারা। 'আপনাদের মতো পুণ্যবানদের দোয়া ছাড়া এ কাজে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়'— এ বলে সালাম করে বিদায় নিলাম তাঁর কাছ থেকে। চরমোনাই ইউনিয়নের তিন বারের চেয়ারম্যান, আমৃত্যু আ'লীগের সভাপতি এবং মুক্তিযুদ্ধকালীন স্থানীয় কমান্ডার ছিলেন পার্শ্ববর্তী বুখাইনগরের মৌলভী মির্জা আঃ হামিদ। এ তথ্য দিলেন ইউসুফ আলী খান। তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা ছুটলাম এই আলেম মুক্তিযোদ্ধার খোঁজে। বিদায় চরমোনাই মাদরাসা।



বুখাইনগরের মুক্তিযোদ্ধা মৌলভী মির্জা আঃ হামিদের সন্তানের আক্ষেপ— আমার মা দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ। তার তিন ছেলে মুক্তিযোদ্ধা। স্বামী মুক্তিযোদ্ধা। সরকার কি তার প্রাপ্য সম্মানটুকু দিচ্ছে?

খবরটা পেলাম চরমোনাই আলিয়া মাদরাসার ভাইস প্রিন্সিপ্যাল মুক্তিযোদ্ধা মাওলানা ইউসুফ আলী খানের কাছ থেকে। নয়া তথ্য, বুখাইনগরেও আলেম মুক্তিযোদ্ধা আছে। কথার ফাঁকে যখন তার কাছ থেকে তথ্যটা পাই টুকে ফেলি সযতনে। চরমোনাই মাদরাসা থেকে বের হয়ে ছুটি সেই আলেম মুক্তিযোদ্ধার সন্ধানে। সঙ্গে দুই সহযোগী— মাসউদুল কাদির, তাজুল ফাত্তাহ। মাদরাসার গেট পেরুবার আগে পেলাম আরেক আলেম মুক্তিযোদ্ধার সন্ধান। ঢাকার লালমাটিয়া থেকে মোবাইলে এলো ম্যাসেজটা। তাদের জানিয়ে দিলাম, আমরা ঢাকার বাইরে আছি। ঢাকায় ফিরে দেখা করব। তখন দুপুর বারোটা। মাদরাসা গেটের বাইরে আমরা তিনজন। বুখাইনগর যাওয়ার লোকেশন. জেনে নিলাম পাশের এক দোকানির কাছ থেকে। ইউনিয়ন একই হলেও এলাকা ভিন্ন। পুরোপুরি গ্রাম সেটা। শহরের ছোঁয়াও নেই সেখানে।

আজব যান 'নসিমন'

গাড়ির জন্য খুব বেশি সময় চেয়ে থাকতে হলো না। মিনিট পাঁচেক পরেই ঠকঠক শব্দের মিছিল নিয়ে হাজির হলো 'বোরাক' নসিমন। বাধ্য হয়েই আমাদের উঠে বসতে হলো শব্দের পাখায় (!) ভর করে চলা আজব যান নসিমনে।

পরিচয়টা কী করে দেব। ধরুন একটা তিন চাকার ঠেলা গাড়ি বা ভ্যান গাড়ি। সামনে একটা মস্ত ইঞ্জিন। তার চেয়েও বিকট তার শব্দ। আর মাথার উপরে আছে পাতলা প্লাস্টিকের লম্বা ছাউনি। সামনে গ্রাম্য কারুকাজ। সর্বোচ্চ তার গতি হবে একটা ছাগল ছানার দৌড়ের সমান। আমরা যখন গাড়িতে তখন দূর থেকে একটা ছেলে দৌড়ে এসে সামনে দিয়ে মিলিয়ে গেল। কবি সম্ভবত এরকম বাহনকেই বলেছিলেন 'কলের গাড়ি'। ইউনিয়ন একই শুনে ভেবেছিলাম যাক বাঁচা গেল বেশি দূর হবে না। তাড়াতাড়ি কাজ সারা যাবে। কিন্তু কলের গাড়ি নসিমনে উঠে বুঝতে পারলাম– ভাবনাটা ভুল। রাস্তা ফুরাবার নয়। ভাঙা রাস্তা দিয়ে যখন শব্দের তাণ্ডব তুলে চারপাশে জানান দিয়ে চলছিল নসিমন আমরা তখন ঝাঁকি সইতে না পেরে গাড়িতে এপাশ-ওপাশ ছিটকে পড়ছিলাম।

শক্ত হাতে মাথার ওপরের শেষ সম্বল রডটুকু ধরেও স্থির থাকতে পারছিলাম না। বহু কষ্ট ভোগ করে এক সময় মুক্তি পেলাম নসিমনের নির্যাতনের হাত থেকে। এসে নামলাম বুখাইনগরের দ্বার প্রান্তে। এখন আর কোনো বাহন নেই। হেঁটেই এগুতে হবে বাকি পথটুকু। নসিমনের ভাড়া মিটিয়ে তিনজন একসঙ্গে হাঁটা ধরলাম সামনের দিকে। গ্রামে ঢুকতেই গ্রামবাসীর সরল জিজ্ঞাসা। অসম্ভব কৌতূহল— আপনারা কারা ? কাকে চান? কী প্রয়োজন?

যত কম কথায় পারা যায় উত্তরগুলো চুকিয়ে আমরা খুঁজতে লাগলাম মরহুম মুক্তিযোদ্ধা মৌলভী মির্জা আবদুল হামিদ-এর বাড়িটি।

সবুজ ভালো লাগে

সবুজ ভালো লাগে। ভালো লাগে সবুজের সমারোহ। এই সবুজের কারণেই আমাদের জাতীয় পতাকা আমার এত প্রিয়। এই পতাকায় যে লাল গোলকটি আছে তা আমাকে টেনে নেয় সবুজের আরো কাছে। ভালোবাসতে বাধ্য করে রক্তে কেনা এই বাংলাদেশকে। বুখাইনগর গ্রামটি আমার ভালো লেগে গেল। এই ভালো লাগার যে কারণটি আমার কাছে মনে হলো, সেটাও এই সবুজ। শুধুই কি সবুজ! ঘন সবুজ আঁকাবাঁকা মেঠো পথ নয় যেন আমরা হাঁটছিলাম সবুজ অরণ্যের সজীবতায় সিক্ত হয়ে। সবুজে যে স্বর্গীয় শান্তি আছে সেটা বুঝা যাবে এই বুখাইনগরের সবুজ দেখলে।

পিছু নিল গুপ্তচর

মাঝগ্রামে এসে হঠাৎ আমরা কয়েকজন ব্যক্তির সন্দেহের দৃষ্টিতে পড়ে গেলাম। মরহুম মুক্তিযোদ্ধা আবদুল হামিদ-এর বাড়ির খোঁজ দিলেও তারা আমাদের খুব সহজে গ্রহণ করলেন না। সন্দেহভাজন ভেবে তিনজন ব্যক্তি ফিসফিস করতে লাগলেন। একজন দ্রুত সাইকেল চেপে কোথায় চলে গেলেন। আমরা এগুতে লাগলাম সামনের দিকে। মেঠো পথ। সরু ও লম্বা। দু' পাশে গাছের অরণ্য পেরিয়ে ফসলি জমি চকচক করছে। কয়েকটি ছেলে-মেয়ে বই-খাতা হাতে নিয়ে আমাদের দিকে চেয়ে আছে ফ্যালফ্যাল করে। তাদের পরস্পর অর্থহীন 'জরুরি' কথাগুলো বন্ধ হয়ে গেল হঠাৎ। আমরা বাড়তে লাগলাম আরো সামনের দিকে। অনুসন্ধানী মনে শংকা, আশা ও দ্বিধা-দ্বন্দ্বের ঝড়।

বাড়ি পেলাম খুব সহজেই । প্রসিদ্ধ বাড়ি। তবে কথা বলার মতো, তথ্য সংগ্রহের মতো কেউ নেই। যার সঙ্গে দেখা হলে আমাদের প্রয়োজন মিটতে পারে তিনি এ বাড়ির ছোট ছেলে মীর্জা আনোয়ার হোসেন ফনু। পেশায় ব্যবসায়ী। বাজারে তার দোকান আছে। চরমোনাই ইউনিয়নের আ'লীগের বর্তমান সভাপতি। কিন্তু তিনি এখন সম্ভবত বাজারে। মোবাইল নম্বর সংগ্রহ করে ফোন দিলাম। জানালাম আমাদের পরিচয় ও উদ্দেশ্য। তার সঙ্গে কথা বলে মনে হলো আমাদের আগমন সম্পর্কে তিনি আগেই জানেন। কীভাবে জানলেন? তখনও বুঝতে পারলাম না আমরা।

বাড়ি থেকে বের হয়ে বাজারে যাওয়ার পথে মরহুম মুক্তিযোদ্ধা মাওলানা আবদুল হামিদের কবরের কাছে গেলাম আমরা। বাড়ির পাশে খালি ঘাসময় জমি। কবরের কোনো চিহ্ন নেই। কেবল ছোট্ট একটা আম গাছ। আবদুল হামিদের এক নাতনি

দেখিয়ে দিল তার কবরটা। যেখানে তিনি শুয়ে আছেন। দূর ও কাছ থেকে কয়েকটা ছবি নিলাম। তারপর বেরিয়ে পড়লাম বাজারের পথে। বাড়ি থেকে কিছু দূর আসতেই সামনে থেকে একটা লোক এলো। লম্বা দেহ। মাঝারি স্বাস্থ্য। কথায় কিছুটা পটু। খুব কৌশলে লোকটা আমাদের সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রশ্ন করতে লাগল। কথা বলছে আর আড় চোখে আমাদের বেশ ভালোভাবে পরখ করছে। কথার তালে লোকটা আমাদের পিছু নিল। বহু কষ্টে আমরা লোকটা থেকে দূরে সরে গেলাম। একটু পরেই বুঝতে পারলাম ওই লোকটা একজনের গুপ্তচর। বাজারে এসে রিং দিলাম মীর্জা আবদুল হামিদের ছেলে মীর্জা আনোয়ার হোসেনকে। তিনি কল রিসিভ করে কেটে দিলেন। আবারো কল দিলাম। তিনি কথা বলতে চাচ্ছেন না। রিসিভ করলেন কিন্তু নিজের অবস্থানের ঠিকানা দিলেন না। ভয় পাচ্ছেন। আমরা কোনো শত্রুপক্ষের লোক কি-না, কে জানে। আমরা পেরেশান। অস্থির। তাহলে কি এখানে আসাটাই বৃথা। লোকজনকে জিজ্ঞেস করে, বাজারের এক মাথা থেকে আরেক মাথায় বারবার চক্কর দিয়ে, মোবাইলে কলের ওপর কল করে কিছুতেই কোনো লাভ হচ্ছিল না। অনেকটা নিরাশ হয়েই এক দোকানের সামনে টুলের ওপর বসে পড়লাম। ভাবছিলাম কী করব। আমার সঙ্গী দু'জন তো আমার মতোই নার্ভাস।

সন্দেহের অবসান

হঠাৎ মোবাইল বেজে উঠল। মীর্জা আনোয়ার হোসেনের কল। 'মুকুন্দ বাবুর ফার্মেসিতে আমি বসে আছি, চলে আসুন'।

কথাটা যেন বিশ্বাসই করতে পারছিলাম না। যিনি আমাদের এতক্ষণ ধরে ঘুরাচ্ছেন। দেখা দেবেন না। কথা বলবেন না। মনে মনে ভয় পাচ্ছেন। তিনিই ফোন দিয়ে বলছেন– 'চলে আসুন'!

সঙ্গে সঙ্গে উর্ধ্বশ্বাসে এসে হাজির হলাম মুকুন্দ বাবুর ফার্মেসিতে। বুঝলাম, গোয়েন্দার 'ভালো' রিপোর্টেই আমাদের কপাল খুলেছে। তিনি আমাদের সঙ্গে কথা বলতে সম্মত হয়েছেন। ফার্মেসির লম্বা টুলে আমরা সার বেঁধে বসে পড়লাম। মাসউদুল কাদির প্রশ্নকর্তা হিসেবে আমার সঙ্গী হলো। আর তাজুল ফাত্তাহ মনযোগী হলো নোট নিতে। হাতে কাগজ-কলম। মীর্জা আনোয়ার হোসেন ফনু। বয়স চল্লিশের আশেপাশে। আলেম মুক্তিযোদ্ধা মীর্জা আবদুল হামিদের ছোট ছেলে। চরমোনাই ইউনিয়নের আঃ লীগের বর্তমান সভাপতি। অতীত ও বর্তমান, বাবা-মা ও পরিবারের অন্যান্য সদস্য, নিজ এলাকা ও তার আশপাশ, ধর্ম-সমাজ ও রাজনীতি, শত্রু-মিত্রসহ সব কিছু নিয়ে রাখঢাকহীন সরাসরি আলোচনা-সমালোচনা ও তথ্য-উপাত্ত দিয়ে আমাদের সহযোগিতা করেন তিনি। সঙ্গে আছে তার আবেগময়ী একান্ত আত্মকথন। চলুন শুনি তারই মুখ থেকে সেসব কথা–

স্বাগত জানাই...

আপনারা ভালো আছেন তো! প্রথমে কী ভাই আমি আপনাদের ঠাওর করতে পারিনি। তাই একটু ঝামেলা হয়ে গেল। দয়া করে কিছু মনে করবেন না। এখন আমার ভালো

লাগছে। আপনাদের বুঝতে পেরেছি। স্বস্তি পাচ্ছি। আচ্ছা, এভাবে পথে পথে মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরে ইতিহাস সংগ্রহ করা তো বেশ জটিল ও দুরূহ কাজ। নিজের খেয়ে, নিজের গাঁট থেকে অর্থ ঢেলে দিনের পর দিন লোকালয় থেকে লোকালয়ে ছুটে বেড়ানোর দায়িত্ব কেন কাঁধে চাপাতে গেলেন! আপনারা আবার কেমন মানুষ? যাই হোক খুবই অসাধারণ ও বিশাল এক কাজে আপনারা হাত দিয়েছেন। স্মৃতি নিয়ে বসে থাকলে বা 'সত্য' নানা দিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকলে তো আর ইতিহাস হয় না। কাউকে না কাউকে মন থেকে স্মৃতি লিখতে হয় বা বিক্ষিপ্ত 'সত্য'কে এক সুতোয় গাঁথতে হয়। আপনারা তো তরুণ, যুবক। সাংবাদিক। কলম ধরলেই ঘটনার ছায়াছবি চলচ্চিত্রের মতো রিল খুলে দেয়। ইচ্ছে করলেই সব 'সত্য'কে মুষ্ঠিবদ্ধ করতে পারেন। এটা আপনাদের প্রতি আল্লাহর এক বিশেষ দান। আর স্মৃতি বুকে নিয়ে বসে থাকলে, 'সত্য' ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকলে বয়স ও সময় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিস্মৃতির ঘুণ পোকা কুড়ে কুড়ে খায়। আপনাদের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানাই।

আপনাদের মূল প্রসঙ্গে আসি। আমার বাবা মীর্জা আবদুল হামিদ। মা লুৎফুন্নেসা। আমরা পাঁচ ভাই, চার বোন। বাবা ছিলেন আলেম, ধর্মভীরু ও একজন নিখাদ মানুষ। '৭১-এর স্বাধীনতা যুদ্ধে তিনি ছিলে সক্রিয় যোদ্ধা। সশস্ত্র লড়াকুদের কমান্ডার। যত দূর জানি, এ দেশে যদি যোদ্ধা ও বীর প্রসবিনী মাতা এবং লড়াকু পত্নী থেকে থাকেন তাহলে আমার মা একজন। কারণ, আমরা মোট পাঁচ ভাই ছিলাম। ছোট্ট দু'জন বাদে মোটামুটি উপযুক্ত বাকি তিনো ভাইকে তিনি সশস্ত্র যুদ্ধে পাঠিয়ে দেন। আমার বাবা ছোটকাল থেকেই ছিলেন স্বাধীনচেতা। পরাধীনতা মানতে পারতেন না কখনো। আর অন্যায়, অপরাধ, জুলুমের বিরুদ্ধে ছিলেন সব সময়ই সোচ্চার। ভয়-ভীতি ত্যাগ করে সব সময়ই তাকে দেখেছি এসবের বিরুদ্ধে জোরালো প্রতিরোধ গড়ে তুলতে। প্রতিবাদ-প্রতিরোধের সামনের সারির ছিলেন তিনি। ছিলেন সাহসী, সৎ ও অনুপম চরিত্রের অধিকারী।

চরমোনাই পীরের বন্ধু ছিলেন

বরিশাল শাগরদি নূরিয়া আলিয়া মাদরাসা থেকে বাবা মৌলভী (কামিল) পাস করেন। বর্তমানে ওটা নূরিয়া স্কুল। চরমোনাই রশিদিয়া মাদরাসার সাবেক প্রিন্সিপাল এবং পীর মরহুম মাওলানা এসহাক (রহঃ) ছিলেন আমার বাবার ক্লাসমেট। বয়স ছিল দু'জনেরই কাছাকাছি। চলা-ফেরা, ঘোরাঘুরি সব কিছু একসঙ্গে হতো তাদের। পরস্পর অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন তারা। সেখান থেকে পড়াশুনা শেষ করে তিনি স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করেন। পরবর্তীতে বুখাইনগর মাধ্যমিক উচ্চ বিদ্যালয়ে সরকারি তফশিলদার ছিলেন। তারপর এলাকার শুভাকাঙ্ক্ষী ও ভক্তবৃন্দের চাপাচাপিতে এক প্রকার বাধ্য হয়েই তিনি চেয়ারম্যান হন। মোট তিন বার চেয়ারম্যান ছিলেন। স্বাধীনতার আগে একবার আর বাকি দু'বার ছিলেন স্বাধীনতার পর— '৭৬-৮৪ পর্যন্ত। তার দলীয় অবস্থান হলো, তিনি একজন আওয়ামী লীগার ছিলেন। এটা ছিল তার ব্যক্তিগত মত বা দৃষ্টিভঙ্গি তবে যে কারো যে কোনো ভালো কাজকে তিনি সব সময়ই স্বাগত জানাতেন।

দোষারোপ বা বিদ্বেষে না ছড়িয়ে তিনি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতেন খোলা মনে। তাই মানুষও তাকে সীমাহীন শ্রদ্ধা করত। ভালোবাসত। বিশ্বাস করত। '৭১-এ তিনি চরমোনাই ইউনিয়নের সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি ছিলেন। তখন তার পদটি ছোট থাকলেও প্রভাব ও জনপ্রিয়তা ছিল তার পুরো ভোলা, বরিশাল জুড়ে। সব সময়ই তার পেছনে মানুষের ভিড় লেগে থাকত। ভিড়ে মানুষের সংখ্যা কখনো হাজার ছাড়িয়ে যেত।

আদর্শবান সমাজসেবক

বাবার মৃত্যু হয়েছিল '৮৭ সালের ২১ জুলাই। উচ্চ রক্তচাপে বরিশাল শেরেবাংলা মেডিকেল মারা যান তিনি। মৃত্যুর সময় তার দেহটা বেশ ভেঙে পড়েছিল। প্রচণ্ড মানসিক চাপই ছিল তার কারণ। সব দলই তাকে বশ মানিয়ে রাখতে চাইত। চাইত নিজের দল ছাড়া অন্য কোনো দলে সে না যাক। এরশাদ তো তাকে এজন্য কোনো অপরাধ ছাড়াই জেলে পুরে রেখেছিল। মোটা অংকের জরিমানাও গুনতে হয়েছিল বাবাকে। আবার সাবেক প্রেসিডেন্ট আবদুর রহমান বিশ্বাসও বেশ শক্ত করে বলেছিলেন রাষ্ট্রপতি জিয়া'র গলায় মালা পরাতে। আঃ রহমান বিশ্বাস তখন পাটমন্ত্রী ছিলেন। কিন্তু বাবা ছিলেন অনড়। কারো হুমকি-ধমকি, চাপ বা জেল-জরিমানায় এক বিন্দুও টলতেন না। নিজ সিদ্ধান্তে ও আদর্শের ওপর ছিলেন অটুট। মালাও পরাননি, অন্য কোনো দলেও ভিড়েননি। তিনি ছিলেন নিজ গতিতে। নিজ পথে।

আমাদের দেশের চেয়ারম্যানদের তো দেখি। চেয়ারম্যান হয়েছে মানে একদম জমিদার হয়ে গেছে। সব কিছু নিজের মনে করে গপুসগপুস করে গিলতে থাকে। সরকারি রিলিফের মালেও কাউকে ভাগ দিতে চায় না। যা পায় সব দিয়ে উদরপূর্তি করে। আমার বাবা ছিলেন এর সম্পূর্ণ বিপরীত। কোনো দিন তো জনগণের সম্পদে হাত দিতেনই না। এমন কি নিজ সম্পত্তি থেকেও বিলিয়ে দিয়ে মানুষের সেবা করতেন। তাই দেখা গেছে তিনি চেয়ারম্যান থাকা অবস্থায় কখনো জায়গা-সম্পত্তি তো বাড়েইনি; বরং উল্টো কমেছে। এ সবই সম্ভব হয়েছে তার আদর্শের ওপর অবিচল থাকার কারণে।

অভিশপ্ত ত্রিশ গোডাউন

মনে পড়ে বরিশাল ত্রিশ গোডাউনের কথা। ওটা ছিল পাকিস্তানিদের সবচেয়ে শক্তিশালী ঘাঁটি। জনবল, গোলাবারুদ, পজিশনের স্থানসহ সব কিছুরই ছিল সেখানে অফুরন্ত সমাবেশ। ভারী ভারী অস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত থাকত ওরা সব সময়ই। এদিকটায় যত অত্যাচার, জ্বালাও-পোড়াও চলত সবই পরিচালিত হতো সেখান থেকে। মুক্তিযোদ্ধারাও সেখানে অভিযান চালাতে নানান অংক কষতেন। কিন্তু আমার বাবা ও কয়েকজন দুঃসাহসী মুক্তিযোদ্ধার দুর্বার আক্রমণে তাদের সে ঘাঁটি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। পেছনে লাশের পাহাড় ফেলে পালিয়ে বাঁচে কয়েকজন। তারপর থেকে ওরা আর বরিশালে কোমর সোজা করে দাঁড়াতে পারেনি। সোজা বাড়ির পথ ধরতে হয়েছিল। নতুবা কবর।

ত্রিশ গোডাউনে ঘটেছিল আরেক কাহিনী। একদল ডাকাত ডেরা গেড়েছিল সেখানে। কী এক কাজে বাবাকে সেখানে যেতে হয়েছিল। একা ছিলেন তিনি। একাকিত্বের

সুযোগ পেয়ে ডাকাতরা বাবাকে বন্দি করে ফেলে। বাবা বন্দি থাকলেও ঘটনা ফাঁস হয়ে যায়। মুহূর্তে খবরটা বরিশালের এক মাথা থেকে আরেক মাথায় ছড়িয়ে পড়ে। সংবাদ পাওয়া মাত্র লোকজন ছুটে চলে সেখানে। আসে একদল মুক্তিযোদ্ধা। নেতৃত্বে কমান্ডার আবদুল মান্নান। ঝাঁপিয়ে পড়েন সবাই একযোগে। ডাকাতরা ঘটনা আচমকা ভয়াবহতার দিকে মোড় নেয়ায় ঘাবড়ে যায়। অস্ত্র চালাতে গিয়ে হাত কেঁপে ওঠে ওদের। কিছুক্ষণ লড়ে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয় সবাই। মারাও পড়েছিল সেখানে ক'জন। জীবিতরা তাকিয়ে ভাবে, আমরা কোনো পথচারীকে ধরিনি। আমরা ধরেছিলাম বিশাল বরিশালের প্রাণকে।

বাবার জীবনে এরকম আরেকটি দুঃসময় এসেছিল। সেখানেও তিনি মৃত্যুর কাছাকাছি থেকে ফিরেছিলেন। তবে ঘটনাটি স্বাধীনতার পরের। আমরা মোট পাঁচ ভাই ছিলাম। বড় তিন ভাই-ই মুক্তিযোদ্ধা- মীর্জা নজরুল ইসলাম, মীর্জা হেমায়েতুদ্দীন, মীর্জা আবুয়াল হোসেন। সবার বড় ভাই মীর্জা নজরুল ইসলামকে '৭৫-এ একদল স্বাধীনতাবিরোধী, দুষ্কৃতি নিমর্মভাবে হত্যা করে। সে হত্যার বিচার এখনও আমরা পাইনি। জানি না কোনো দিন পাব কি-না। সেই ভাইয়ের শোকে আমার বৃদ্ধা মা এখনও কাঁদেন। ভালো কিছু রান্না হলে তিনি মুখে নেন না আজো। এমনকি ঈদের দিনেও মা তার কথা ভাবেন। কাঁদেন। বিলাপ করেন সারাক্ষণ। যুদ্ধের পর জীবিতরা সবাই যার যার বাড়ি-ঘরে ফেরত গেলেও আমার ভাইদের কোনো খবর নেই। বেশ কয়েকদিন চলে গেলেও আমার ভাইয়েরা আসেন না। চিন্তিত হয়ে পড়েন সবাই। শংকা দানা বাঁধতে থাকে সবার মনে। তাহলে কি তিন ভাই একই সঙ্গে...! না আর ভাবতে পারছিল না কেউ। বাবা ব্যস্ত হয়ে বাড়ি থেকে বের হয়ে গেলেন ওদের খুঁজে বের করতে। অনেক খোঁজাখুঁজি করে এসে হাজির হন ত্রিশ গোডাউন এলাকায়। ত্রিশ গোডাউন প্রথমে ছিল পাকিস্তানিদের ক্যাম্প। পরে হয় মুক্তিযোদ্ধাদের ঘাঁটি। বাস্তবতা হলো, ত্রিশ গোডাউন দখলের সময় আমার বাবার অনন্য ভূমিকা ছিল। যদি বলি সবচেয়ে বেশি ভূমিকাই ছিল আমার বাবার তাহলে মনে হয় ভুল হবে না। দুঃখের কথা হলো, সে দিন বাবা ত্রিশ গোডাউনে যাওয়া মাত্র দৌড়ে এসে কয়েকজন মিলে বাবাকে ধরে ফেলে। বেঁধেও ফেলে শক্ত রশি দিয়ে। বলে, শালা রাজাকার। এইবার তোরে পাইছি। তুই শেষ আজকে। কালেমা পড়...! বাবার কোনো কথা বলার সুযোগ নেই। আরেকজন কোত্থেকে কয়েকটা মাইন নিয়ে এলো। বেঁধে দিল গলার সঙ্গে। বাবা কী করবেন, কী বলবেন ঘটনার ডান-বাম কিছুই বুঝতে পারছিলেন না। শুধু হতবিহ্বলের মত তাকিয়ে ছিলেন। আর মনে মনে ডাকছিলেন আল্লাহকে। হট্টগোলের এক পর্যায়ে হঠাৎ সেখানে আমার ভাই এসে উপস্থিত হয়। দেখেন, বাবা বাঁধা। গলায় মাইন। মারার জন্য প্রস্তুত সবাই। চিৎকার করে ওঠেন ভাইয়া- আরে, আরে তোমরা করছ কী! কী হয়েছে? কাছ থেকে একজন বলে, কেন, দেখ না শালা রাজাকার। মাথায় টুপি, মুখে দাড়ি, এখনই শেষ করে দিতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদী হন ভাইয়া। হুংকার দেন গলা ফাটিয়ে- কে বলেছে রাজাকার? ইনি তো আমার বাবা। একজন দুর্ধর্ষ মুক্তিযোদ্ধা। ছেড়ে দাও! বাবাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। সেদিন টুপি, দাড়িই বাবার জন্য কাল হয়ে

দাঁড়িয়েছিল। ভাইয়া আর কিছুক্ষণ পরে এলে তো বাবার লাশও খুঁজে পাওয়া যেত না। ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে ছড়িয়ে যেত চারদিক। যারা বাবাকে মারতে চেয়েছিল তারা কেউ মুক্তিযোদ্ধা ছিল না। ছিল ডাকাত। সারা বছর লুটপাট করে বেড়াত। ওরা জন্মেছিল মানুষের গর্ভে। বড়ও হয়েছিল মানুষের অঞ্চলে। কিন্তু কখন যে কিভাবে ওরা মানুষের আদলে দানব হয়ে গেছে বুঝা মুশকিল! যুদ্ধের পর ওরা মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পে এসেছিল মুক্তিযোদ্ধা সাজতে। মানুষকে দেখাতে আমরাও মুক্তিযোদ্ধা। আর আমার বাবাকে মারতে চেয়েছিল স্বাধীনতার সনদে লৌকিক স্বাক্ষরদানের জন্য।

কাছ থেকে দেখা

আগে দেখতাম দল বেঁধে মুক্তিসেনারা আমাদের বাড়ি আসত, থাকত, খেত, ঘুমাত, আড্ডা দিত হল্লা করে। বাবার সঙ্গে শলাপরামর্শ করত চুপি চুপি। তারপর বেরিয়ে যেত অস্ত্র হাতে। শত্রুর সন্ধানে। তাদের কেউ কেউ আবার ফেরত আসত। কেউবা আসত লাশ হয়ে। রক্তাক্ত শরীর নিয়ে ছিন্নভিন্ন অবস্থায়। তারা আমাদের বাড়িতে যে অস্ত্রগুলো নিয়ে আসত, এখানে সেখানে লুকিয়ে রাখত বা ফেলে রাখত সেখান থেকে যদি মাঝে মধ্যে দু'একটা অস্ত্র গুঁজিয়েও ফেলতাম তাহলে আজকে আমাদের একটা গোলাবারুদের গোডাউন থাকত। ছোট না বিশাল হতো সেই অস্ত্র ভাণ্ডার। যুদ্ধের পরেও দেখেছি আমীর হোসেন আমু, তোফায়েল আহমেদ ও আবুল হাসানাতের মতো অনেক নেতা বাবার কাছে খুব আসতেন। একই সঙ্গে এদিকে-সেদিক যেতেন। এখন সময়ে সময়ে সরকার পাল্টায়। সবাই ক্ষমতার মসনদ দখল নিয়ে ব্যস্ত। কেউ আর মুক্তিযোদ্ধা বা তার পরিবারের দিকে তাকায় না। সুযোগ কোথায় তাকানোর?

এ কেমন মুক্তিযুদ্ধের ভাতা?

আমার মা অসুস্থ। দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ তিনি। তার তিন ছেলে মুক্তিযোদ্ধা। স্বামী মুক্তিযোদ্ধা। সরকার কি তার প্রাপ্য সম্মানটুকু দিচ্ছে? তার অধিকারের যে ভাতাটুক

> **অনেকেই আছে যারা মুক্তিযুদ্ধ করেনি, ডাকাতি করেছে, এখন ভাতা পাচ্ছে। স্বাধীনতার পরে জন্ম ভাতা পাচ্ছে। শাহী হালতে চলছে তারা। আর আমাদের অবস্থা হলো কয়েকবার নামমাত্র তালিকা করে নেওয়া হয়েছে। ছবি তোলা হয়েছে। সার্টিফিকেটও দেখানো হয়েছে কিন্তু ফলাফল জিরো। কোনো সম্মানী নেই। ইদানীং আবার বলা হচ্ছে দুই কপি ছবি, প্রত্যয়নপত্র আরো কী কী যেন অফিসে জমা দিতে। এটা হয়তোবা নতুন কোনো প্রতারণার কৌশল**

মুক্তিযোদ্ধা মরহুম মৌলভী মির্জা আঃ হামিদের মুক্তিযুদ্ধের সার্টিফিকেট হাতে

আছে তাও তো তিনি পাচ্ছেন না। তার মানে কি তিনি আমৃত্যু বঞ্চিতই থাকবেন? কেন? কেন? কেন?

অনেকেই আছে যারা মুক্তিযুদ্ধ করেনি, ডাকাতি করেছে, এখন ভাতা পাচ্ছে। স্বাধীনতার পরে জন্মভাতা পাচ্ছে। শাহী হালতে চলছে তারা। আর আমাদের অবস্থা হলো কয়েকবার নামমাত্র তালিকা করে নেওয়া হয়েছে। ছবি তোলা হয়েছে। সার্টিফিকেটও দেখানো হয়েছে কিন্তু ফলাফল জিরো। কোনো সম্মানী নেই। ইদানীং আবার বলা হচ্ছে দুই কপি ছবি, প্রত্যয়নপত্র আরো কী কী যেন অফিসে জমা দিতে। এটা হয়তোবা নতুন কোনো প্রতারণার কৌশল। আমরা ওদিকে আর যাচ্ছিনে। এখন মুক্তিযোদ্ধার সন্তান বলতেও লজ্জা লাগে, ঘেন্না করে। এই দাবি করে কি কোনো লাভ আছে? এই যে মাঝে মধ্যে তালিকা হয়, এসবই রাজনীতির খেলা। এর বাইরে আসলেও কি কিছু করার ইচ্ছা সরকারের আছে ? থাকলে সেটা আলাদীনের জাদু প্রদীপের চেয়েও বেশি কার্যকর হতো।

আফসোস হয়!

এখন বলতে মন চায়— আমার বাবা কেন পাকিস্তানের পক্ষে ছিলেন না। তিনি যেমন জাঁদরেল আলেম ছিলেন, গুণী ও প্রতিভাধর ছিলেন, তিনি তো জামায়াতের বড় লিডার হতে পারতেন। গড়তে পারতেন বিশাল বিশাল দালানকোঠা। ব্যাংক ব্যালেন্স। রাজপথে হাঁকাতে পারতেন দামি দামি গাড়ি। যে গাড়ির সামনে ঢেউ তুলে পত্‌পত্‌ করে উড়ত লাল সবুজের পতাকা— আমাদের জাতীয় প্রতীক!

আহা, বুখাইনগর!

মীর্জা আনোয়ার হোসেন ফনুর সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা সেরে আমরা ফেরার পথ ধরলাম। দুই মোটরসাইকেলে তিনজন চেপে বসলাম। গন্তব্য সোজা কীর্তনখোলার ঘাট। বুখাইনগর বাজার ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার কান থেকে মুছে গেল মানবীয় কোলাহল। ফটফট করে বাজতে লাগল যান্ত্রিক যন্ত্রণা। সঙ্গী হলো বায়বীয় শাঁ শাঁ গুঞ্জন। আর ছুটে চলল রাস্তায় ফাঁক ফাঁক করে বিছানো লাল ইটের ফরফর মিছিল; সঙ্গে নয় যেন আগে আগে। সবুজ ফসলি জমি আর ঘন অরণ্য পেরিয়ে এসে পৌঁছি কীর্তনখোলার তীরে। সেখান থেকে আবারো ট্রলার। শামিয়ানার নিচে বসে নদী পেরুনো।

আল্লাহ তোমাদের মঙ্গল করুন

এসব আওয়াজটাওয়াজ কোনো ফ্যাক্টরই না, সামনে যে এর চেয়েও বড় বিপত্তি অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য আমরা তা জানতামই না। নদী পার হয়ে রিকশায় চড়ে লঞ্চ ঘাটে এসে দেখি ঘাটে লোকজনের আনাগোনা খুব একটা নেই। ঘড়ির কাঁটা তিন ছুঁই ছুঁই। এই ভর দুপুরে দেখি ঘাটে প্রচুর লঞ্চ। ভেতরে বিক্ষিপ্তভাবে কিছু যাত্রী লম্বা বিছানা করে শুয়ে-বসে আছে। বাইরে দালালরা ঢাকা ৬০, ঢাকা ৬০ বলে যাত্রী হাঁকাচ্ছে। কেউ কেউ ৪০-এও তুলে নিচ্ছে কিছু লোক। আমরা কথা বলি— ঢাকা যাব। একটি ভালো কেবিন চাই। মাঝে নয়, দু'পাশের এক পাশে হতে হবে। যেন সরাসরি নদীর স্বচ্ছ

বাতাসটুকু পাই। ন্যায্য মূল্য দেব। কিন্তু প্রথম লঞ্চের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা লোক দুটি জানিয়ে দিল, কোনো কেবিন নেই। সব বুকিং হয়ে গেছে! দ্বিতীয় লঞ্চে যাই। সেখানেও একই উত্তর। তারপর! একই অবস্থা সেখানেও। গোমরা মুখ নিয়ে তিনজন খোঁজ নিই সবগুলো লঞ্চের দ্বারে দ্বারে। কিন্তু কোথাও কেবিন পাই না। এদিকে আমাদের অবস্থা বেশ করুণ। গত রাতে একটুও ঘুমাইনি, চুটিয়ে আড্ডা দিয়েছি। চোখে ঘুম। সারাদিন কোনো বিশ্রাম নেই। এক জায়গা থেকে আরেক জায়গা ছোটাছুটি করতে হয়েছে–কখনো হেঁটে, কখনো ট্রলারে, কখনোবা কোনো নসীমন টাইপের গাড়িতে। ঘুম-ক্লান্তির প্রচণ্ড ভারে শরীর যখন ন্যুব্জ তখন আমরা খাঁ খাঁ রোদে বিশ্রামের জায়গার খোঁজে ছুটছি এক লঞ্চ থেকে আরেক লঞ্চ। কী যে ভয়ানক অস্বস্তি! শেষে ব্যর্থ হয়ে এক লঞ্চের ডেকে গিয়ে হাতে থাকা নিউজ পেপার বিছিয়ে বসে পড়ি। আশপাশে কেউ নেই। ধীরে ধীরে অনিচ্ছায় চোখগুলো বুজে আসে। শুয়ে পড়ি। হঠাৎ। মোবাইল বেজে ওঠে স্ক্রিনে মেরাজ রহমান। মেরাজ বরিশালের ছেলে। ছোট ভাই। সুহৃদও। তাই তার কাছে আকুতি জানালাম, ভাই, বড্ড বিপদে আছি। ডেকেই শুয়ে রয়েছি। কেবিন পাচ্ছিনে। সে জানাল, শিবলি ভাই, আসছি, একটু অপেক্ষা করুন। কিছুক্ষণ পরে হাজির হলো মেরাজ রহমান। সঙ্গে বন্ধু আবদুল্লাহ আল-মামুন আর সবুজ।

তিনজন কীভাবে যেন এসেই মুহূর্তের মধ্যে কেবিনের ব্যবস্থা করে ফেলল। সুন্দর রুম। কেবিনে ঢুকে স্বস্তির নিশ্বাস বেরুল তিনজনের মুখ থেকেই— আল হামদুলিল্লাহ্! আল্লাহ তোমাদের মঙ্গল করুন।



চান্দিনার সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা মাওলানা মুখলিছের দুঃসাহসিক উক্তি : উস্তাদকে সাফ জানিয়ে দিলাম—আমি উভয় পক্ষের শত্রু হতে রাজি নই

মিরপুর আরজাবাদ মাদরাসার শিক্ষা সচিব মাওলানা আবদুল কুদ্দুস তথ্যটা দিলেন- মুক্তিযোদ্ধা মাওলানা মুখলিছুর রহমান, তার চেনা, পাশাপাশি বাড়ি। কুমিল্লার চান্দিনার দোল্লাই নবাবপুর ইউনিয়নের বরকরই গ্রামে তাদের বাড়ি। থাকেন ঢাকাতেই। ক্যান্টনমেন্ট-মানিকদি জামে মসজিদের খতিব। আবদুল্লাহপুরে আরেক মুক্তিযোদ্ধা মাওলানা রুহুল আমিন খান উজানবীর কাছে মুখলিছুর রহমানের ছোট ভাইয়ের সঙ্গে পরিচয়। তার কাছ থেকেই নম্বর নেয়া। এরপর যোগাযোগ। যথারীতি আমন্ত্রণ জানালেন সদালাপী মাওলানা মুখলিছ। আতিকুল্লাহ শহীদকে নিয়ে এক সন্ধ্যায় হাজির হলাম তার আস্তানায়।



দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার

'৭১-এ যুদ্ধের কান্তার মরু পাড়ি দিয়ে কারার লৌহ কপাট ভেঙে ফেললেন কীভাবে? বললেন, আমার বয়স তখন ২০/২১ বছর। কচুয়া মাদরাসায় জালালাইন পর্যন্ত পড়ে আলিয়া মাদরাসায় ভর্তি হই। বদরপুর নেসারিয়া সিনিয়র মাদরাসায় আলেম পরীক্ষার্থী।

স্বাধীনতা সংগ্রামের আগে '৭০ সালে একটি নির্বাচন হয়। আমার শিক্ষক মাওলানা আঃ হক ছিলেন আইডিএল (ইসলামিক ডেমোক্রেটিক লীগ)-এর সদস্য। শর্ষিনার পীর ছিলেন আইডিএল-এর প্রতিষ্ঠাতা। সেই সময়ের নির্বাচনে মাওলানা আঃ হক আইডিএল-এর টিকিটে প্রার্থী হন। তাই শিক্ষকের নির্দেশে এই প্রথম রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করি। আমরা পুরোদমে নির্বাচনী কাজে নেমে পড়ি। রাত জেগে, নিদ্রা ও ক্লান্তির কথা বেমালুম ভুলে নির্বাচনী প্রচারাভিযান পোস্টার লাগানোর নেশায় আমরা উন্মাতাল। আমাদের হুজুর যে দলের প্রার্থী ছিলেন তা ছিল পাকিস্তানপন্থি। একদিন আওয়ামী লীগের পাণ্ডা গোছের কিছু ছেলে নির্বাচনী প্রচারের পোস্টার-কাগজ ও আমাদের মাথার টুপি ছিনিয়ে নিয়ে আমাদেরকে লাঞ্ছিত-অপদস্থ করে। এ ঘটনায় সাধারণ মানুষ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং তারা আমাদের কাছে ক্ষমা চায়। শেষ পর্যন্ত এলাকার চেয়ারম্যানের মধ্যস্থতায় এ ঘটনার সুরাহা হয়।

দেশ ও জনগণের অতন্দ্র প্রহরী

বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ

কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল

নং

৩১৩ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা

সনদ ক্রমিক : ২০২০৬

১১ NOV [illegible]

যাহার জন্য প্রযোজ্য

মাওলানা মুখলেছুর রহমান পিতা ক্বারী ইদ্রিস আলী মিয়া

গ্রাম/মহল্লা বর কড়ই ডাকঘর দোল্লাই নবাবপুর

থানা চান্দিনা জেলা কুমিল্লা

একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা। তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করিয়াছেন। বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে তাঁহার অবদান চির উজ্জ্বল হইয়া থাকিবে।

তাঁহার সর্বাঙ্গীন উন্নতি ও মঙ্গল কামনা করিতেছি।

প্রতি স্বাক্ষর

শেখ হাসিনা
প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
এবং
প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও প্রধান উপ
বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ

আবুল আহাদ চৌধুরী
চেয়ারম্যান
কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল
বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ।

বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ

মাওলানা মুখলেছুর রহমান

মৃত ক্বারী ইদ্রিস আলী মিয়া

২০.১০.১৯৯৯

নম্বর - ২

বহি নম্বর ৭৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা পরিশোধ বহি

(মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা গ্রহণকারীর জন্য)

নাম: মোখলেছুর রহমান
পিঃ মৃত ইদ্রিস মিয়া
গ্রাম: বরকাইট
ডাক: দোল্লাই নবাবপুর

[illegible]	[illegible]				[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]				
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]				
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]				
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				

মাওলানা মুখলিছের মুক্তিযুদ্ধের সার্টিফিকেট, পরিচয়পত্র এবং ভাতা বই

আপনি পাকিস্তানপন্থি দলের রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েও কীভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন? – একরাশ বিস্ময় নিয়ে তাঁকে এ প্রশ্ন করলাম।

তার উত্তর— এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পূর্ণ বিজয় লাভ করে। নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেও তাদেরকে ক্ষমতায় অংশগ্রহণ করতে না দিয়ে উল্টো আমজনতার ওপর জুলুম-নির্যাতন চালায় নাৎসি ইয়াহিয়া সরকার।

এটা আমার কাছে অনৈতিক মনে হয়েছে। যারা নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন পেয়ে বিজয় লাভ করেছে, তাদের হাতেই ক্ষমতা হস্তান্তর করা উচিত। কিন্তু তারা তা না করে বরং সাধারণ মানুষের ওপর জুলুম ও নির্যাতন বাড়িয়ে দেয়। পাকিস্তানের এই অন্যায় বাড়াবাড়ি আমার কাছে সহ্য হয়নি।

আমরা ক'জন নবীন মাঝি

মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর আমাদের গ্রামের আমরা ছ'জন— মুজিবুর রহমান, হাবীবুর রহমান, নুরুল ইসলাম, শহীদুল ইসলাম ও আমি একসঙ্গে ট্রেনিংয়ে অংশগ্রহণ করি। আমরা নবাবপুর থেকে হেঁটে কলমছড়া থানার ফকিরহাট বর্ডার দিয়ে ভারতে ঢুকে পড়ি। তারপর উদয়পুরের অদূরে পাটনা ক্যাম্পে ক্যাপ্টেন শুজাত আলীর নেতৃত্বে ট্রেনিং নেই। প্রথম ব্যাচে আমরা ৯০০ জন একসঙ্গে প্রশিক্ষণ নেই। এতে চান্দিনারই ছিল ১২০ জন।

আমরা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এসএলআর, এলএমজি, স্টেনগান, গ্রেনেড, রাইফেল, এন্টি পার্সোনাল মাইন, এন্টি টেংক মাইন ও ডেমোলেশন ইত্যাদির কৌশল ও ব্যবহার শিখি।

মোরা ঝঞ্ঝার মতো উদ্দাম

তখন সেপ্টেম্বর মাস। প্রশিক্ষণ শেষে আমরা মিয়ার বাজার সীমান্ত দিয়ে চৌদ্দগ্রাম হয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করি। আমরা দশজন করে সেকশন ও ৩০ জন করে একটি ট্রুপসে বিভক্ত হই। আমাদের অধিনায়ক ছিলেন মেজর হায়দার। আমাদের টার্গেট ছিল, মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে যারা পরিকল্পনা করত তাদের হত্যা করা। বিএলএফ (বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্স) নামে একটি সংগঠন মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষে জনমত তৈরির কাজে নিয়োজিত ছিল। তারা আমাদের গাইড দিতেন।

বিরাগভাজন অতঃপর আত্মগোপন

আত্মীয়স্বজন যারা ছিলেন তারা পাকিস্তানের পক্ষেই ছিলেন। এদিকে মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষণ নেওয়ার কথা জানাজানি হওয়ায় আমি তাদের হ্যান্ডলিস্টভুক্ত হয়ে যাই। আমার পরিবারও টার্গেটের শিকার হয়। তাই দু'দিন বাড়িতে অবস্থান করেই আমি আত্মগোপনে চলে যাই।

অপারেশন সাকসেসফুল

আমরা উড্ডা গ্রামের জলম বাজারে সর্বপ্রথম এ্যাটাক করি। চারদিকে জ্বালাও-পোড়াওয়ের সংবাদ শুনে এই আক্রমণের প্রস্তুতি নেই। সাধারণ জনগণ মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষে ছিলেন। তারাই মুক্তিযোদ্ধাদেরকে সংবাদ সরবরাহ করে বেশি

সহযোগিতা করেছে। এদিকে উভয় পক্ষে প্রচণ্ড গোলাগুলি হয়। গুলির বৃষ্টি বর্ষণের ভেতরে পড়ে মাথায় লোহার হেলমেট থাকায় অল্পতে প্রাণে বেঁচে যাই।

দ্বিতীয় বার, চান্দিনা থাকা অবস্থায় ৬ ডিসেম্বর নির্দেশ এলো সবাইকে চান্দিনা থানায় যেতে হবে। আমরা থানার চারদিক ঘেরাও করে রাখি। ভারতের সৈন্যরা আমাদেরকে পেছনে থেকে কভারিং ফাইট দিতেন। এভাবে আমরা পাকিস্তানি সৈন্যদেরকে পর্যুদস্ত করে ফেলি। তারা ৭ তারিখে আত্মসমর্পণ করে এবং পাকিস্তানি ১,৩৯৫ জন সৈন্যকে ভারতীয় আর্মিরা তাদের হেফাজতে নিয়ে যায়। আর আমাদের দু'জন মুক্তিযোদ্ধা শাহাদতবরণ করেন। আমাদের এ দু'টিই ছিল সম্মুখযুদ্ধ। বাকিগুলো গেরিলা যুদ্ধ।

আমি বিদ্রোহী

আমার অত্যন্ত প্রিয় শিক্ষক কচুয়া রহিমানগরের মুফতি শামছুদ্দীন সাহেব। তিনি ছিলেন চরম পাকিস্তানপন্থি। আমি প্রশিক্ষণ শেষে দেশে এলে তিনি লোক পাঠিয়ে আমাকে খবর দেন এবং তাদের পক্ষে কাজ করার আহ্বান জানান। তাদের সাফ জানিয়ে দিলাম, আমি উভয় পক্ষের শত্রু হতে রাজি নই। কারণ, আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, দেশ স্বাধীন হবেই। ১৬ ডিসেম্বরের আগেই তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে ধরা পড়েন। তাঁকে বলা হলো, আপনি শুধু 'জয় বাংলা' বলুন, আপনাকে মুক্তি দেয়া হবে। তিনি বললেন, না, আমি তা কখনো বলতে পারি না। মুক্তিযুদ্ধবিরোধী সক্রিয় ভূমিকার কারণে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর একদল মুক্তিযোদ্ধা তাকে মাটিতে জ্যান্ত পুঁতে ফেলে!

একটি মানবিক আবেদন

মাওলানা মুখলিছ নিজ এলাকা চান্দিনায় মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে বেশ পরিচিত মুখ, তাই সরকারি গেজেটে তার নামও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সেই সূত্রে গত সরকারের আমল থেকে মাসে ৫০০ টাকা করে মুক্তিযোদ্ধা ভাতা পাচ্ছেন।

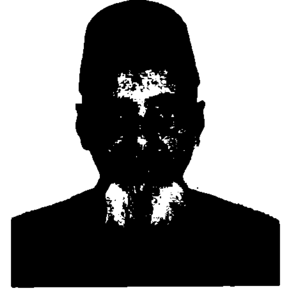
কিছুদিন আগে হঠাৎ করে তার অসুখ করেছে। ছেলেমেয়েরা ধরাধরি করে নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করান। পরীক্ষা-নীরিক্ষা করে ডাক্তার জানালেন, তার হার্টে সমস্যা। এক্ষুনি অপারেশন করাতে হবে। নইলে রোগী বাঁচানো যাবে না। শুনে আত্মীয়-স্বজনরা ঘাবড়ে যান। কারণ হার্টের অপারেশন তো অত্যন্ত ব্যয়বহুল। অগত্যা ধার-দেনা করে তারা অপারেশন চালিয়ে যান। সুস্থ হয়ে বাসায় ফেরেন '৭১-এর সূর্য সন্তান মাওলানা মুখলিছ। চিকিৎসা বাবদ খরচ হয়েছে প্রায় চার লাখ টাকা। শুনে তার মাথায় হাত। এত টাকা পরিশোধ করবেন কী করে! চারদিকে অন্ধকার দেখেন। যেমনটি দেখেছিলেন '৭১-এ। ৩৬ বছর আগে সেই অন্ধকার থেকে যে লাল টুকটুকে সূর্যটাকে ছিনিয়ে এনেছিলেন মুখলিছরা সেটা আজও উদিত হয়, হবে অনন্তকাল ধরে কিন্তু জীবনযুদ্ধের আঁধারে কি হারিয়ে যাবে মুখলিছরা?

অপারেশনের চিকিৎসার সহযোগিতার জন্য একটি আবেদন করে রেখেছেন। এখনও সাড়া দেয়নি মন্ত্রণালয়– মুখলিছ আক্ষেপের সুরেই জানালেন। তবে এখনও মন্ত্রণালয়ের ঘুম ভাঙার অপেক্ষায় আছেন '৭১-এর এ বীর মুক্তি সেনানী।



ভাষা সৈনিক ও মুক্তিযোদ্ধা মাওলানা আমীমী এ প্রজন্মের কাছে এক জীবন্ত কিংবদন্তি

আমি নিশ্চিত যে, পাঠক আপনারও গা শিউরে উঠবে। তৎকালীন অবাঙালি অধ্যুষিত মোহাম্মদপুরে বাঙালিদের ওপর যে পৈশাচিক হত্যাযজ্ঞ, রক্তখেলা চলেছে তার বর্ণনা শুনে গা শিরশির না করে পারেই না। গা শিরশির করা এ রকমই নারকীয় হত্যাকাণ্ডের সাক্ষী হয়ে এখনো বেঁচে আছেন ভাষা সৈনিক ইমাম মাওলানা লোকমান আহমেদ আমীমী। সেই দিন হঠাৎই ফায়জুলকে সঙ্গে নিয়ে মোহাম্মদপুর জামে মসজিদটাতে মাগরিবের নামাজ আদায় করলাম। এ মসজিদেই সেই ১৯৬৩ সাল থেকে ইমামের দায়িত্ব পালন করছেন মাওলানা আমীমী। নামাজ শেষে তাঁর নিজ কক্ষে আলোচনা জমে উঠল একাত্তর, ভাষা আন্দোলন নিয়ে। ভাষা সৈনিক মাওলানা আমীমী একে একে বলে গেলেন ভয়ংকর সব ঘটনাবলির কথা। যা কিনা বারবার আমাদের দু'জনকেই রোমাঞ্চিত করে তুলছিল।



রক্তে রঙিন সলিমুল্লাহ!

অত্যন্ত মর্মস্পর্শী কণ্ঠে ২৫ মার্চ-এর পরবর্তী দিনগুলোর কথা বলে গেলেন মাওলানা আমীমী এভাবে–

সেই ভয়ংকর দিনগুলোতে আমি মোহাম্মদপুর মসজিদের পেশ ইমাম। বৃহস্পতিবার, ১৯৭১ সনের ২৫ মার্চ। স্বাধিকার আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী নেতাদের নির্দেশ অনুযায়ী ঘরে ঘরে স্বাধীন বাংলার পতাকা ও কালো পতাকা উড়ছে। মোহাম্মদপুরের প্রায় সব অবাঙালি এর সহযোগিতা করল না, তারা বরং বিরোধিতা করল। ২৫ মার্চ সন্ধ্যায় চারজন ছাত্রনেতার মধ্যে আ স ম আ. রব ও শাজাহান সিরাজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সফিউল্লাহ (শানু)দের ১২/১০, তাজমহল সড়কের বাসায় আসেন। তাঁরা এখানে জরুরি বৈঠকে মিলিত হন। বৈঠকে স্থানীয় অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। তাতে রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়। মোহাম্মদপুরের অবাঙালিরা আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা না করলে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য, পানি, বিদ্যুৎ ইত্যাদি বন্ধ করে দেয়ারও সিদ্ধান্ত বৈঠকে নেয়া হয়।

২৫ মার্চ রাতে পাক হানাদার বাহিনী বাঙালি নিধনযজ্ঞে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কার্ফ্যু জারি করা হয়। কালো পতাকা ও স্বাধীন বাংলার পতাকা নামিয়ে ফেলার জন্য রাতেই কড়া

নির্দেশ জারি করা হয়। কিন্তু মোহাম্মদপুরের যে দুটি বাসায় ২৫ মার্চ সকাল পর্যন্ত স্বাধীন বাংলার পতাকা উড়ছিল তার একটি হলো শহীদ সলিমুল্লাহ সাহেবের ১২/১০, তাজমহল সড়কের বাসা। অপরটি হলো আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামি মেজর সুবেদার মরহুম আলহাজ হারুনুর রশীদ খানের (মৃত্যু ২৬/১১/৮৯) ১৫/১, তাজমহল সড়কের বাসা।

২৬ মার্চ শুক্রবার সকালে দেখলাম মোহাম্মদপুর ঈদগাহের পূর্ব-উত্তর কোণের ৩১/৯, শেরশাহ্ রোডের বাড়ির (বর্তমানে বরুড়া ভিলা) তৎকালীন মালিক জনাব লারীর জামাতা সামরিক অফিসার সামরিক গাড়িতে এসে লারী সাহেবের বাসায় কিছুক্ষণ অবস্থান করেন। পরক্ষণে তিনি সলিমুল্লাহ সাহেবের ও হারুনুর রশীদ খানের বাড়িতে স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলিত দেখে যান। সম্ভবত ব্যারাকে ফিরে গিয়ে তিনি যথাস্থানে এ সংবাদ দেন। তাদের চলে যাওয়ার কিছুক্ষণ পর একটি হেলিকপ্টার উল্লিখিত বাড়ির ওপর দিয়ে চক্কর দেয়। তখনো সে দুটো বাড়িতে পতাকা উড়ছিল।

এদিকে বর্তমানে মোহাম্মদপুর থানা ভবনের মালিক রিয়াসাত হাসানের বাড়িটি ছিল তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান আনজুমানে মুহাজিরীনের প্রধান কার্যালয়। আনজুমানের সভাপতি ছিলেন মাওলানা রাগেব আহসান। রিয়াসাত হাসান ছিলেন মাওলানা রাগেব আহসানের বেয়াই। আনজুমানের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন সাবের আলী। যে কোনো মূল্যে পাকিস্তানের অখণ্ডতা বজায় রাখতে হবে এবং বাঙালি নিধনে সহযোগিতা করতে হবে– এ ছিল আনজুমানের মিটিং-এর সিদ্ধান্ত।

সংগঠিত হতে থাকল আনজুমানের তরুণ কর্মীরা। তদুপরি মোহাম্মদপুরের একশ্রেণীর তরুণ কসাইও আনজুমানের সঙ্গে সহযোগিতা করে এবং দলে ভিড়ে যায়। মোহাম্মদপুরের পরিবেশ তখন অত্যন্ত থমথমে ছিল।

বিশিষ্ট সমাজসেবী, মোহাম্মদপুরে বাঙালির অধিকার প্রতিষ্ঠার অগ্রদূত, সাহসী বীর পুরুষ শহীদ সলিমুল্লাহর অবদান ছিল অপরিসীম। মোহাম্মদপুর কলেজ (বর্তমানে কেন্দ্রীয় কলেজ), মোহাম্মদপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, মোহাম্মদপুর বাংলা মাধ্যম উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় তাঁর ভূমিকা ছিল অসামান্য। এসব কারণে উর্দু ভাষীরা তাঁর প্রতি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ছিল।

২৬ মার্চ শুক্রবার কার্ফ্যুর মধ্যে জুমার নামাজ জামাতে আদায় করলাম। ফরজ নামাজ শেষে সবেমাত্র সুন্নত নামাজ শেষ করেছি, হঠাৎ কানে ভেসে এলো গুলির আওয়াজ। সঙ্গে সঙ্গে অধিকাংশ অবাঙালি মুসল্লি বলে উঠল, সলিমুল্লাহ্ সাহেব মুসল্লিদেরকে গুলি করেছেন। জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা স্বচক্ষে দেখেছেন? উত্তরে তাঁরা বললেন, স্বচক্ষে দেখিনি তবে তিনি ছাড়া এ কাজটা কেউ করেনি। জামে মসজিদের মুসল্লিদের গুলি করার প্রশ্নই ওঠে না। কারণ সলিমুল্লাহ সাহেব সেই দিন তাঁর বাসার অদূরে উত্তর দিকে বর্তমান বাইতুল আমান মসজিদে জুমার নামাজ আদায় করে ঘরে ফিরে খাবার টেবিলে বসবেন এমন মুহূর্তে গোলযোগের সূত্রপাত ঘটে।

প্রকৃতপক্ষে সলিমুল্লাহ সাহেবের পার্শ্ববর্তী জনৈক অবাঙালির বাড়ির ছাদ থেকে গুলি করে সলিমুল্লাহ সাহেব গুলি করেছেন অপবাদ দিয়ে তাঁকে সপরিবারে হত্যার ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল। এ ষড়যন্ত্র ছিল পূর্ব পরিকল্পিত।

প্রকৃত অবস্থা জানার জন্য আমি মসজিদ থেকে বের হলাম। দেখলাম জামে মসজিদের কবরস্থানের উত্তর পাশে অবস্থিত সলিমুল্লাহ সাহেবের বাড়ি আক্রান্ত। গত রাতের ছাত্র নেতাদের বৈঠকের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষাপটে শানুর প্রতি অবাঙালিরা ক্ষুব্ধ ছিল।

মসজিদের সামনে ও আশেপাশে গণ্যমান্য ব্যক্তিদেরকে বিশেষ করে মাস্টার আবদুল মতিন (তিনি মতিঝিল সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের ইংরেজির শিক্ষক ও মোহাম্মদপুর ফাতেমা জিন্নাহ স্কুল বর্তমানে কিশলয় উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা), মসজিদ কমিটির উপস্থিত অন্যান্য সদস্য ও সুধীমণ্ডলীকে গোলযোগ থামাবার অনুরোধ করলাম। কিন্তু তাদের অনিচ্ছা আমাকে শংকিত করে তুলল। শেষ পর্যন্ত কায়েদে আযম রোডের (বর্তমানে শহীদ সলিমুল্লাহ সড়ক) ৯/১, নম্বর বাড়ির তৎকালীন মালিক জনাব আবদুল হামীদ, যিনি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মচারী ছিলেন, তিনিসহ আরও কয়েকজন মিলে সলিমুল্লাহ সাহেবের আক্রান্ত বাড়ির সামনে পৌঁছলাম। দেখলাম, নিচতলায় আগুন দেয়া হয়েছে, শানুর মোটরসাইকেলটি পুড়ছে। গলদেশে গুলির আঘাতে রক্তাক্ত সলিমুল্লাহ সাহেবের দ্বিতীয় ছেলে শামীমকে রেসিডেনসিয়াল মডেল স্কুলের তৎকালীন উর্দুভাষী ডাক্তার আবদুর রহীম সাহেব অনেক কষ্টে টেনেহেঁচড়ে মডেল স্কুলের ভেতরে নিয়ে আশ্রয় দেন এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন।

দেখলাম, সলিমুল্লাহ সাহেব লুঙ্গী ও ধোলাই করা সাদা পাঞ্জাবি পরা। তিনি তাঁর ছোট দুই মেয়েকে কোলে নিয়ে চারতলার ছাদ থেকে চিৎকার করে বলছেন, আল্লাহর কসম, আমি গুলি করিনি। ইতিপূর্বে শানুও তাই বলছিল। পরক্ষণে কোরআন শরীফ হাতে নিয়ে সলিমুল্লাহ সাহেব বলছেন, আমি গুলি করিনি। আক্রমণকারীরা তাঁর লাইসেন্স করা দোলনা বন্দুকটি নিচে ফেলে দিতে বলল। তিনি তাদের কথামত বন্দুকটি নিচে ফেলে দিলেন।

ততক্ষণে কপালে সাদা পট্টি বাঁধা একদল যুবক বাড়িতে ঢুকে পড়েছে। এদের সবার হাতে চকচকে ধারালো ছোরা। সবাই আমাদের প্রবল বাধা ও বারবার নিষেধের পর এরা বের হয়ে আসে। আমরা ফিরে আসার পরক্ষণেই অবাঙালি একটি শ্রেণীর উস্কানিতে আবার তারা বাড়িতে প্রবেশ করে। তারা সলিমুল্লাহ সাহেবকে চারতলার ছাদ থেকে নিচে ফেলে দেয়ার চেষ্টা করে। ব্যর্থ হয়ে তাঁকে নিচের তলায় নামিয়ে উপর্যুপরি ছোরার আঘাতে ক্ষতবিক্ষত করে। রক্তে ঘরের মেঝে রঙিন হয়ে যায়। এক পর্যায়ে তাঁকে গুরুতর আহত অবস্থায় বাসার পশ্চিম দিকের রাস্তায় ফেলে রাখা হয়। কাতরাতে কাতরাতে গভীর রাতে তিনি শহীদ হন (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

এর আগেই তাঁর নির্দেশে অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁর স্ত্রী ও ছেলে-মেয়েরা পার্শ্ববর্তী ভূপাল হাউসে আশ্রয় নেন। তাঁর স্ত্রী পায়ে গুরুতর আঘাত পান। পরে বিভিন্ন স্থানে আশ্রয় নিয়ে কোনোরকমে প্রাণে বেঁচে যান। সলিমুল্লাহ সাহেবের চাচা শ্বশুর মরহুম মাওলানা

সিরাজুল হক গুলিবিদ্ধ হয়ে অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করেন।

এতক্ষণে কপালে সাদা পট্টি বাঁধা ছেলেরা সলিমুল্লাহ সাহেবের বাড়ির আসবাবপত্র, কাপড়-চোপড় সবকিছু রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলতে থাকে এবং লুটপাট করতে থাকে। বাড়ির প্রায় সব তলায় আগুন ছড়িয়ে পড়েছে। দু'দিন পর্যন্ত আগুন জ্বলতে থাকে। এতে বাড়িটি ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

পার্শ্ববর্তী জনাব হারুনুর রশীদ খানের বাড়িটির জিনিসপত্র লুণ্ঠন করে অগ্নিসংযোগ করা হয়। হারুন সাহেবের ছেলে-মেয়েরা বেঁচে গেলেও হারুন সাহেবকে বদলি করার নামে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হয়। স্বাধীনতা যুদ্ধের কয়েক মাস যাবৎ তাঁকে অমানুষিক নির্যাতন করা হয়।

এ ঘটনার পর চেষ্টা করেও ঘর থেকে বের হতে পারিনি। বের হতে চাইলে আশেপাশের লোকেরা বললেন, কপালে সাদা পট্টি বাঁধা বাইরের ছেলেরা এসে গেছে। তারা আপনাকে চিনবে না। আপনার কোনো প্রকার ক্ষতি হোক তা আমরা চাই না। কাজেই মসজিদে জামাতে শরিক হওয়া ছাড়া আপনি ঘর থেকে বের হবেন না। এদের সঙ্গে উর্দু ভাষায়ই সমস্ত কথাবার্তা হতো। প্রকৃতপক্ষে আমি তখন গৃহবন্দি হয়ে পড়লাম।

জয়বাংলা স্লোগানদানকারীরা ইসলাম থেকে খারিজ তাদের জানাজা হতে পারে না!

২৭ মার্চ শনিবার ফজরের নামাজের জামাত শেষে ঘরে ফিরে এসে ওজিফা কালাম পড়া শেষ করেছি। দেখলাম, বেলা সাতটার সময় জনাব আবদুল হামীদসহ কয়েক ব্যক্তি খাটিয়ায় করে কয়েকজনের লাশ দাফন করার জন্য কবরস্থানে নিয়ে এসেছে। এঁদের মধ্যে শহীদ সলিমুল্লাহর লাশও ছিল। আমি তাঁদের জানাজার নামাজ পড়ার কথা বললে জনাব আবদুল হামীদ ছাড়া অন্যরা বললেন, জয় বাংলা শ্লোগানদানকারীরা ইসলাম থেকে খারিজ, তাদের জানাজা হতে পারে না। আপনি মাথা ঘামাবেন না। ভাবলাম, এসব উর্দুভাষীরা কত নিচে নেমে গেছে যে, জয় বাংলা বলায় মুসলমানের জানাজা পড়তে দেবে না। একান্ত আপনজন, সমাজসেবক শহীদ সলিমুল্লাহর লাশ জানাজার নামাজ ছাড়াই সমাহিত করা হলো। ছোট্ট একটি বাচ্চা, সুরুজ, সিদ্দিক, আনওয়ার প্রমুখের লাশ একই গর্তে পুঁতে ফেলা হলো। পরে ওদের অজান্তে বাংলার স্বাধীনতার অমর বীর শহীদদের জন্য ফাতিহা পাঠ করে মাগফেরাত কামনা করি।

ছোরা মেরে শেষ করে দেয়ার হুমকি

২৬ মার্চের আগে পর্যন্ত আমাকে জুমার দিনের বক্তৃতা উর্দু ও বাংলা ভাষায় করতে হতো, কারণ উভয় ভাষাভাষী লোকই এখানে বাস করত। ২৬ মার্চের পরে শুধু উর্দুভাষাতেই বক্তব্য রাখতে হতো। মানসিক বিপর্যয়ের চরম অবস্থায় এপ্রিল মাসের এক জুমার ভাষণে বললাম, মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামে যেই কলোনি আর শাহ আলী বাগদাদী (রহঃ)-এর মিরপুর কলোনিও বেদাগ রইল না। বাঙালির রক্তে রঞ্জিত হল। এ কথা শোনার পর উপস্থিত মুসল্লিদের মধ্যে একটি চাপা

গুঞ্জরণ শোনা গেল। কিন্তু কেউ এ সত্য কথার প্রতিবাদ করার সাহস পেল না। অবশ্য পরে কেউ কেউ ব্যক্তিগতভাবে আমার কাছে অভিযোগ করলেন যে, জুমার দিনে আপনি বাঙালি হত্যার প্রতিবাদ করলেন। কিন্তু দেশের বিভিন্ন এলাকায় উর্দুভাষীদেরকে হত্যা করা হচ্ছে, আপনি এর কোনো প্রতিবাদ করলেন না। বললাম, দেখুন, আমি সঠিক যা জানি তার প্রতিবাদ করেছি, যা আমার জানা নেই তার প্রতিবাদ আমি কি করে করি! বুঝলাম, আমার উত্তরে তারা সন্তুষ্ট হলো না।

২৬ মার্চের আগের এক জুমার ভাষণে সূরা আররুমের ২২ নং আয়াতের উদ্ধৃতি দিলাম। আল্লাহতায়ালা বলেছেন, "আর তাঁরই নিদর্শনসমূহের একটি এ আকাশ ও জমিন সৃষ্টি করা এবং তোমাদের ভাষা এবং বর্ণ পৃথক পৃথক হওয়া, এতে জ্ঞানীদের জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে।"

কাজেই সমস্ত ভাষার স্রষ্টা আল্লাহতায়ালা। কোনো ভাষা শিক্ষা করা নিন্দনীয় নয়। আপনারা এদের জলবায়ু, তরিতরকারি, খাদ্য-দ্রব্য সব কিছুই ভোগ করছেন। কিন্তু বাংলা ভাষা শিখতে আপত্তি। এক পর্যায়ে আনজুমানে মুহাজিরিনের সভাপতি মাওলানা রাগেব আহসানকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা মোহাম্মদপুর, মিরপুর, ক্যান্টনমেন্ট ও অন্যান্য এলাকা নিয়ে 'মুহাজিরিন স্থান' প্রতিষ্ঠা করতে চান ? এটা কতটুকু যুক্তিসঙ্গত? তিনি বললেন, কায়েদে আযমের রিলিফ ফান্ডের সহায়তায় এ কলোনিগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাই এ এলাকাগুলো মুহাজিরিনদের প্রাপ্য। বললাম, কায়েদে আযম রিলিফ ফান্ডের যোগানে বাঙালিদেরও অবদান আছে। তদুপরি মদিনার মুহাজিরিন ও আনসার একসঙ্গে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে কি বসবাস করেনি ? এমনকি ঐতিহাসিক 'মদিনা সনদের' মাধ্যমে অমুসলিমদের স্বার্থ কি অক্ষুণ্ন রাখা হয়নি?

এসব ঘটনাবলির প্রেক্ষাপটে এক পর্যায়ে ছোরা মেরে আমাকে শেষ করে দেয়ার হুমকি দেয়া হয়। এদিকে দেশের বাড়ি থেকে সংবাদ এল বয়স্ক বাবাকে পাকসেনারা অমানবিক নির্যাতন করেছে। রাইফেল দিয়ে পিটিয়ে হাড় ভেঙে ফেলেছে।

যেহেতু মসজিদ বেহেশতের টুকরাসম, সে জন্য মসজিদের সঙ্গে আমার প্রাণের নিবিড় বন্ধন। তাই জীবনের ও পরিবার-পরিজনের মায়ায় মসজিদ ছেড়ে যাওয়া বড় অপরাধ বলে মনে হচ্ছিল। যদি আল্লাহতায়ালা পরকালে জিজ্ঞেস করেন প্রাণের মায়ায় মসজিদ ছেড়ে চলে গেলে কেন? তখন এর কোনো সদুত্তর দিতে পারব না। এজন্য মনে বেশ সাহসও ছিল। রয়ে গেলাম মোহাম্মদপুরে। প্রত্যেক দিন বাদ এশা মুসল্লিগণ মসজিদে দোয়া ইউনুস পড়তেন। দোয়া করার দায়িত্ব ছিল আমার ওপর। আমি নীরবে দোয়া করতাম। তাই ওদের মনে সন্দেহ দেখা দিল আমি কি পাকিস্তানের জন্য দোয়া করি নাকি বাংলাদেশের জন্য? শেষ পর্যন্ত জনৈক অবাঙালি আলেমের দ্বারা দোয়া করানো হতো।

সেই সময় মোহাম্মদপুরে পশ্চিমবঙ্গের ২/১টি বাঙালি পরিবার ছাড়া কোনো বাঙালি ছিল না। এমনকি আমার জানামাতে মোহাম্মদপুরের মসজিদগুলোতে তখন কোনো বাঙালি ইমাম বা মুয়াজজিন ছিলেন না।

এরই মধ্যে মসজিদ কমিটির তরফ থেকে মসজিদের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতির চরমপত্র পেলাম।

চরমপত্র নিয়ে এলেন সামসাদ নামক এক মুসল্লি। যে কিনা কেবল আমার পেছনে এশার জামাত পড়ার জন্য পলাশী ব্যারেক থেকে মোটরসাইকেলে করে আসত। বললাম, মসজিদের ইমাম হিসেবে সব দলের লোক আমার পেছনে নামাজ আদায় করে থাকেন। আমি সক্রিয়ভাবে কোনো রাজনৈতিক দলের পক্ষে ভূমিকা পালন করিনি, করা উচিতও নয়। এ পত্রে ইমামতির দায়িত্ব থেকে অব্যাহতিদানের কোনো কারণও দর্শানো হয়নি। পত্রবাহক বললেন, সত্তরজন অবাঙালির স্বাক্ষর সংবলিত একটি দরখাস্ত মসজিদ কমিটির সেক্রেটারির কাছে পেশ করা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে 'বাঙালি ইমামের পেছনে নামাজ পড়তে তারা নারাজ'।

ভাবলাম, এদের নামাজ নষ্ট করার অধিকার আমার নেই। এখন আল্লাহতায়ালাও আমার কাছে মসজিদ ছেড়ে যাওয়ার কৈফিয়তও চাইবেন না।

শেষ পর্যন্ত তিন মাসের মাইনে নিয়ে পরিবারসহ পাড়ি জমালাম অজানার উদ্দেশ্যে। নিউ ইস্কাটনের এক মসজিদের পরিচিত হাফেজকে আমার বিপদের কথা জানালাম। তিনি ইসমত আলীর এক বাসায় আমাদের তুলে দিলেন। এ বাসায় থাকা অবস্থায় আমার শিক্ষক হিসেবে চাকরি হয়ে গেল ৩০ আগস্ট ১৯৭১-এ ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজে। ধর্মীয় শিক্ষক হিসেবে সেখানে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত চাকরিরত ছিলাম। মুক্তিযুদ্ধ শেষ হলে বাঙালিরা আবার আমার কাছে ফিরে আসে। তাদের অনুরোধে আবার সেই মোহাম্মদপুর মসজিদের ইমামের দায়িত্ব গ্রহণ করি।

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ যার মুসল্লি

মাওলানা লোকমান আহমদ আমীমী ১৯৫৭ সালে ঢাকা আলিয়া থেকে কামিল সম্পন্ন করেন। কিন্তু তার অনেক আগে থেকেই বর্তমান শহীদুল্লাহ হলের পাশে ঐতিহ্যবাহী মুসা খাঁ মসজিদের ইমাম ছিলেন। ১৯৪৬ থেকে ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত এ মসজিদের অবৈতনিক ইমাম ছিলেন তিনি। এ সময়ে তাঁর মুসল্লি হিসেবে নামাজ পড়েছে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ড. কাজী দীন মুহাম্মদ প্রমুখ। মোনায়েম সরকারের মন্ত্রিসভার যারা নামাজী ছিলেন, তারাও এ মসজিদের নামাজ পড়তেন। এসব মুসল্লিদের ইমাম হিসেবে নিজেকে নিয়ে গর্ববোধই করেন ইমাম মাওলানা লোকমান আহমদ আমীমী।

ভাষা সৈনিক আমীমী

ভাষা সৈনিক হিসেবে আপনার পরিচিতি আছে। ভাষা আন্দোলনে কিভাবে সম্পৃক্ত হলেন তার কোনো স্মৃতিকথা যদি আমাদের জানান। আমাদের অনুরোধে তিনি বলতে শুরু করলেন–

যে কোনো কারণেই হোক, একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, ভাষা আন্দোলনের সময় মাদরাসা শিক্ষিতরা উর্দুর প্রতি সমর্থন জানিয়েছিলেন। তবে ব্যতিক্রম যে ছিল না, তা নয়। রাজনীতিবিদদের মধ্যে মাওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ ও মওলানা আকরম খাঁ বাংলার পক্ষে বলিষ্ঠ ভূমিকা নিয়েছিলেন। এমনকি তৎকালীন ঢাকা আলিয়া

মাদরাসার অধ্যাপক মাওলানা মোস্তাফিজুর রহমানের ভূমিকাও ছিল অত্যন্ত প্রশংসনীয়। তাঁর উৎসাহ-উদ্দীপনায় সে সময় ঢাকা আলিয়া মাদরাসার উল্লেখযোগ্যসংখ্যক ছাত্র ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে। এসব ছাত্রের নেতৃত্বে ছিলেন মাদরাসার অধ্যক্ষ জিয়াউল হক সাহেবের ছেলে এবং পরবর্তীকালে মাওলা ব্রাদার্সের মালিক আতিকুল মাওলা। আমিও আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের একজন ছিলাম।

ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার সৌভাগ্য হওয়ার পেছনে আমার আর একটা কারণ ছিল। আমি তখন ঢাকা আলিয়া মাদরাসায় আলেম শ্রেণীতে পড়তাম। থাকতাম ঢাকা হলের (বর্তমান শহীদুল্লাহ হল) পাশে ঐতিহ্যবাহী মুসা খাঁর মসজিদে। ১৯৪৬ সাল থেকে ৬৩ সাল পর্যন্ত আমি এ মসজিদের অবৈতনিক ইমাম ছিলাম। এ সুবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমসাময়িক অনেক ছাত্র-শিক্ষকের সঙ্গে আমার মেলামেশা হতো। হলের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমি যোগদান করার সুযোগ পেতাম। এ পরিবেশও আমাকে ভাষা আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট করে।

১৯৪৮ সালের ২১ মার্চ রমনার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ রাষ্ট্র ভাষা প্রসঙ্গে ঘোষণা করেন, উর্দু এন্ড উর্দু শ্যাল বি দি স্টেট ল্যাংগুয়েজ অব পাকিস্তান– উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা।

উপস্থিত শ্রোতাদের অযুত কণ্ঠে ধ্বনিত হলো— নো, নো! আমিও সে জনসভায় উপস্থিত ছিলাম।

কার্জন হলের ছাত্র মিটিং-এও কায়েদে আজমের একমাত্র উর্দুই রাষ্ট্রভাষার ঘোষণার প্রতিবাদ জানায় ছাত্র সমাজ। সেখানেও আমি উপস্থিত ছিলাম।

ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহ্বানে ২১ ফেব্রুয়ারি বিক্ষোভ মিছিলের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সেদিন আমাদের মাদরাসা খোলা ছিল। ১৪৪ ধারা জারির কারণে মিছিলে অংশগ্রহণ করা বা না করা সম্পর্কে শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে দ্বিমত দেখা দেয়। আমরা বেশিরভাগ ছাত্র ক্লাস বর্জন করি। মাদরাসার কিছুসংখ্যক শিক্ষক, বিশেষ করে বাংলা ভাষার অকৃত্রিম দরদি মরহুম মাওলানা মোস্তাফিজুর রহমান মিছিলের পক্ষে আমাদেরকে উৎসাহিত করেছিলেন। মাদরাসার অধ্যক্ষ মরহুম জিয়াউল হকের কনিষ্ঠ পুত্র মরহুম আতিকুল মাওলার নেতৃত্বে মাদরাসা হতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরনো কলা ভবনের গেইটে এসে আমরা উপস্থিত হই।

২০ ফেব্রুয়ারি বিকেল ৬টা থেকে ঢাকা শহরে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছিল। ১৪৪ ধারা ঘোষণার কারণে সারা শহরে উত্তেজনায় থমথমে ভাব বিরাজ করছিল।

২১ ফেব্রুয়ারি কলাভবনের সামনে বেলা ১১টায় ছাত্ররা সমবেত হতে থাকে। সামনের বেলতলায় বেলা ১২টার দিকে ছাত্রনেতা জনাব গাজীউল হকের সভাপতিত্বে সভার কাজ আরম্ভ হয়। আমার মনে গড়ে, জনাব গাজীউল হক খদ্দরের পাঞ্জাবি এবং পাজামা পরিহিত ছিলেন। মরহুম জনাব শামসুল হক বক্তব্য রাখলেন। ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে শোভাযাত্রা বের করা সম্পর্কে মতবিরোধ দেখা দিল। শেষ পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীরা দশজন দশজন করে বের হয়ে ১৪৪ ধারা উপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিল।

কলা ভবনের মেইন গেইটে কড়া পুলিশি পাহারা। দশজন দশজন করে ছাত্রছাত্রী বের হতে লাগল। পুলিশ তাদেরকে গ্রেফতার করে গাড়ি করে টঙ্গী, ভাওয়াল ও

জয়দেবপুরের প্রত্যন্ত অঞ্চলে নিয়ে ছেড়ে দিতে লাগল। এমন পরিস্থিতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে তিনকোণ পুকুরের পাড়ে এবং বিশ্ববিদ্যালয় জিমনেশিয়াম মাঠে সমবেত ছাত্রদের প্রতি কাঁদুনে গ্যাস ছোঁড়া হয়। তাতে উত্তেজনা আরও বৃদ্ধি পায়। কিছুক্ষণের মধ্যে নিরস্ত্র ছাত্র আর সশস্ত্র পুলিশের মধ্যে খণ্ড যুদ্ধ শুরু হয়। মেডিকেল কলেজ গেইট, মেডিকেল হোস্টেল ও তার চারদিকে সংঘর্ষ শুরু হয়। পুলিশের বেপরোয়া লাঠিচার্জে বহু ছাত্র আহত হয়।

২১ ফেব্রুয়ারি বিকেল ৩টা থেকে জগন্নাথ হলে প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশন চলছিল। বাইরের সদস্যদের কাছে ছাত্ররা পুলিশি জুলুমের প্রতিবাদ জানায়। বিকেল ৩টার দিকে পূর্তমন্ত্রী মরহুম হাসান আলীর গাড়ি মেডিকেল কলেজের সামনের চৌরাস্তায় আটক করা হয়। অধিবেশনে আমাদের দাবি সমর্থনের আশ্বাস দেয়ায় তাঁর গাড়ি ছেড়ে দেয়া হয়।

পরক্ষণেই তৎকালীন ঢাকার অবাঙালি ম্যাজিস্ট্রেট জনাব কোরাইশী মোটরসাইকেলে হাসপাতালের সামনে উপস্থিত হন। ছাত্রদের অনবরত ইট-পাটকেলের আঘাতে তাঁর মাথার 'হ্যাট' পড়ে যাবার উপক্রম হয়। তাঁর শরীরেও ইট-পাটকেল পড়তে থাকে। মোটরসাইকেল মাঝ রাস্তায় থামিয়ে সিটে বসা অবস্থায় তিনি উত্তেজিত কণ্ঠে পুলিশদেরকে ছাত্রদের প্রতি গুলি করার নির্দেশ দেন।

মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সামনের চৌরাস্তার দিকে মেইন গেটের আশেপাশে কিছু দোকানঘর বন্ধ অবস্থায় ছিল। পুলিশ বাহিনী রাইফেল হাতে এসব দোকানের সামনে অবস্থান নেয়। কোরাইশী গুলি করার নির্দেশ দিয়েই পশ্চিম দিকে কেটে পড়ে।

মেডিকেল হাসপাতালের সামনের চৌরাস্তার পূর্বদিকে ছিল তারের বেড়া। তারের বেড়া ডিঙ্গিয়ে জিমনেশিয়াম মাঠের পূর্বদিক দিয়ে ঢাকা হলের দিকে যাবার একটি পথ ছিল। প্রয়োজনে ছাত্ররা এ পথে যাতায়াত করত। মাঠে তখনও কোনো গ্যালারি তৈরি হয়নি। মাঠের মাঝ-দক্ষিণ দিকে অর্ধভগ্ন কয়েকটি পাকা কবর ছিল। মেডিকেল হাসপাতালের সামনের চৌরাস্তার পূর্ব পাশে একটি পয়ঃপ্রণালি নিষ্কাশনের পাম্প মেশিন ছিল (বর্তমানেও তা যথাস্থানে বিদ্যমান)। তারই পাশে আমি ও অগণিত বিক্ষুব্ধ ছাত্র বিক্ষোভরত ছিলাম। আমরা পশ্চিমমুখী দাঁড়িয়ে ছিলাম। আমার ডান পাশে এক সহপাঠী আবদুল হাকিম (বর্তমানে ম্যারিজ রেজিস্ট্রার) দাঁড়িয়েছিলেন। বাম পাশে যারা দাঁড়িয়ে ছিলেন, তারা আমার অপরিচিত ছিলেন।

তখন বেলা সাড়ে তিনটা থেকে চারটা। কোরাইশীর নির্দেশে পুলিশ তিনবার গুলি ছোঁড়ে। তারা বেশিরভাগ গুলি আমাদের মাথার ওপর দিয়ে ছোঁড়ে। আর কিছু গুলি নিচের দিকেও করা হয়। হঠাৎ দেখি আমার বাম পাশে একজনের পর দাঁড়ানো এক যুবকের পেটে গুলি লাগে। পেট চেপে ধরলেও দরদর করে রক্ত ঝরছিল। কয়েকজন ধরাধরি করে তাঁকে মাঠের পূর্বদিকের গেট দিয়ে পুকুরের দক্ষিণ দিক দিয়ে মেডিকেল হাসপাতালে নিয়ে যায়। কিন্তু অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের দরুন সন্ধ্যার দিকে হাসপাতালে সে শাহাদৎ বরণ করে। যুবকের বয়স ২০/২২ বছর হবে। দোহারা চেহারা, শরীরের রঙ শ্যামলা। পরনে সাদা শার্ট ও পাজামা ছিল। এ যুবক আর কেউ নয়, ভাষা শহীদ সালাম।

প্রথম গুলির শব্দ হওয়া মাত্র ছাত্রদের মধ্যে কে যেন চিৎকার করে বলছিল, 'তোমরা শুয়ে পড়ো।' অধিকাংশ বিক্ষোভকারীরাই তখন শুয়ে পড়ি। অবশ্য এরপর আর কোনো গুলির শব্দ না শুনে উঠে দাঁড়াই। গুলিবর্ষণকারীরা যদি অবাঙালি হতো তাহলে শহীদের সংখ্যা আরও অনেক হতো বলে আমার ধারণা।

আজ যেখানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদ সেখানে একটি বাংলো ছিল। এ বাংলোতে বাস করতেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবাঙালি অধ্যাপক জনাব জিলানী। গুলিবর্ষণের পর তারা স্বামী-স্ত্রী দোতালা থেকে ছাত্রদের উদ্দেশে উর্দু ভাষায় ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক উক্তি করে। তাতে বিক্ষুব্ধ হয়ে ছাত্ররা বাংলো আক্রমণ করতে যায়। ছাত্রনেতাদের হস্তক্ষেপে অবস্থা আর বেশি দূর গড়ায়নি।

সন্ধ্যার আগে মেডিকেল হাসপাতালের দোতলার বারান্দায় অপর এক শহীদের লাশ দেখেছি। গুলির আঘাতে তাঁর মাথার খুলি উড়ে গিয়ে মগজ ছিটকে পড়েছিল। তাঁর পরনে পাজামা, শার্ট ও পায়ে ইংরেজি জুতা পরা ছিল। বরকত বর্তমান শহীদ মিনারের স্থানে তৎকালীন ব্যারাকের পাশে দাঁড়ানো অবস্থায় গুলিবিদ্ধ হন। বরকত, রফিক, সালাম, জব্বার প্রমুখ শাহাদৎ বরণ করেন। এছাড়া অনেকে আহত হন। আহতদের পরিচয় মনে পড়ছে না।

পরিষদ ভবনে এ দুঃসংবাদ পৌছার সঙ্গে সঙ্গে মাওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ ও জনাব আবুল কালাম শামসুদ্দিন মুসলিম লীগ থেকে পদত্যাগ করে বের হয়ে আসেন। মিসেস আনোয়ারা খাতুন আন্দোলনে যোগ দেন। জনাব আবুল কালাম শামসুদ্দিন পরদিন পরিষদ সদস্যপদেও ইস্তফা দেন।

বিক্ষুব্ধ ঢাকা নগরী শোকে ভেঙে পড়ে। শোকাভিভূত জনতা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানায়। রাতের অন্ধকারে পুলিশি তত্ত্বাবধানে আজিমপুর গোরস্থানে শহীদদের লাশ দাফন করা হয়। তাঁদের কে জানাজা পড়েছিল, আদৌ জানাজা হয়েছিল কি-না সঠিক জানা যায়নি।

২২ ফেব্রুয়ারি সকালে শহীদদের রক্তাক্ত জামা-কাপড়ের পতাকাবাহী বিরাট মিছিল বের হয়। ছাত্র-জনতার সঙ্গে সচিবালয়ের ১০ হাজার কর্মচারীও এ মিছিলে যোগ দেয়। তখন এটাই ছিল স্মরণকালের সবচেয়ে বড় মিছিল।

পুলিশ নিরাপত্তা আইনে জনাব আবুল হাশেম, খয়রাত হোসেন, মাওলানা তর্কবাগীশ, মওলানা ভাষানী, অধ্যাপক মুজাফফর আহমদ প্রমুখকে গ্রেফতার করে।

আলোচনার ফাঁক গলিয়ে এশার নামাজের সময় ঘনিয়ে আসল। নামাজ পড়াতে মাওলানা আমিনী যথারীতি চলে গেছেন মসজিদে, ঠিক যেভাবে গিয়ে আসছেন সেই ১৯৬৩ সাল থেকে। যাওয়া-আসার মাঝে এরকম কত ঝড়, স্রোতই না বয়ে গেছে দীর্ঘ সময়টাতে। সেসব কিছু মনে করেই কি তিনি প্রতি ওয়াক্ত নামাজ শেষে পার্শ্ববর্তী কবরস্থান জিয়ারতে চলে যান! মাগরিব ও এশা নামাজের পর যেমনটা আমরা দু'জনে দেখেছি।



যশোর রেল স্টেশন মাদরাসা প্রাঙ্গণে রয়েছে একাত্তরের ২১ শহীদের গণকবর

নোয়াপাড়া* থেকে সোজা চলে এলাম যশোর রেল স্টেশন মাদরাসায়। ইতিমধ্যেই জেনেছি, এ মাদরাসা প্রাঙ্গণেই একাত্তরের ২১ শহীদের কবর রয়েছে এবং মরহুম যশোরী হুজুর আমাদের মহান স্বাধীনতা সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। খবরটা প্রথমে দিয়ে ছিলেন মিরপুর জামেয়া হোসাইনিয়া ইসলামিয়া আরজাবাদ মাদরাসাার প্রিন্সিপাল মুক্তিযোদ্ধা মাওলানা মোস্তফা আজাদ। এরপর জনৈক পাঠক নিজের নাম পরিচয় উল্লেখ না করে মোবাইলে এরকম একটি ম্যাসেজ পাঠান— "যশোরের সুবিখ্যাত রেল স্টেশন মাদরাসাার তৎকালীন মুহতামিম ও প্রখ্যাত আলেমে দীন আবুল হাসান যশোরী, কাতিয়ার হুজুরসহ অনেকেরই একাত্তরে ভূমিকা ব্যাপক। সে সময় পাক বাহিনী গণহত্যা চালায় বিহারী, রাজাকারদের ইন্ধনে। এখনো মাদরাসাা প্রাঙ্গণে সেই গণকবর রয়েছে। সেখানে আলেম, মাদরাসাা ছাত্র, স্থানীয় স্কুল টিচার— সবাই আছেন।"

যশোর রেল স্টেশন মাদরাসার বর্তমান প্রিন্সিপাল এবং মরহুম মাওলানা আবুল হাসান আলী যশোরীর একমাত্র ছেলে মাওলানা আনোয়ারুল করীমের সঙ্গে মোবাইলে যোগাযোগ হওয়ায় তিনি মাদরাসাার অফিস কক্ষে আমার আসার অপেক্ষায় ছিলেন।

মাদরাসাায় ঢুকে প্রথমে গণকবরটি দেখে নিলাম। গণকবরটির এক পাশে শুয়ে আছেন মাওলানা যশোরী। ১৯৯৩ সালের ১৮ জুলাই এই বুজুর্গ আলেম ইন্তেকাল করেন। উন্নিশ একাত্তরের ভাগ্যচক্রে বেঁচে যান মাওলানা যশোরী। না হয় ২১-এর জায়গায় ২২ শহীদের গণকবর থাকত এখন। এই ২১ শহীদের গল্পে শুনতেই আজ এখানে চলে এসেছি। মাওলানা আনোয়ারুল করীম বলছেন সে গল্প—

পুরো মার্চই যশোর ছিল উত্তাল। ২৫ মার্চে ঢাকা আক্রমণের পর যশোর আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এক দিকে পাক আর্মি, বিহারি অপরদিকে ইপিআর, আ'লীগের নেতাকর্মী এবং সাধারণ বাঙালি। খুলনা এবং পূর্বাঞ্চল থেকে পাক আর্মি যশোর ক্যান্টনমেন্টে আসার পথে চাচড়া রাজবাড়িয়ায় ইপিআরের প্রচণ্ড বাধার সম্মুখীন হয়। তিনদিন চলে এ লড়াই। এখানে প্রচুর পাক আর্মি, ইপিআর এবং সাধারণ বাঙালি মারা যায়। কিন্তু

---

* নোয়াপাড়ার পীর খাজা রফিকউজ্জামান একাত্তরে মুজিব বাহিনীর দুর্ধর্ষ কমান্ডার ছিলেন। একাত্তরে তাঁর ভূমিকা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে নোয়াপাড়া গিয়ে তাঁকে পাওয়া যায়নি। হজব্রত পালনে তখন তিনি সৌদি আরবে অবস্থান করছিলেন। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা থাকবে এ গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে।

এপ্রিলের ৩ তারিখে দিবাগত রাতে বিহারিদের সহযোগিতায় পাক আর্মি চাচড়া, রায়পাড়া, নিউ টাউন, ঝুমঝুমপুর বিহারি কলোনিতে পৌঁছে যায় এবং একসঙ্গে চারদিক থেকে এটাক করে। এলাকাবাসী দিগ্বিদিক হারিয়ে মাদরাসাায় এসে আশ্রয় নেয়। এদের মধ্যে অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিও ছিলেন। মহেশপুরের তৎকালীন আ'লীগের এমপিএ মঈনউদ্দীন মিয়াজির অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী, ছেলে-মেয়েকে আব্বা বাসা থেকে মাদরাসাায় নিয়ে আসেন। ইতিমধ্যেই পাক বাহিনীর কাছে রিপোর্ট পৌঁছে যায়— এ মাদরাসাার যশোরী হজুরসহ যারা আছে সবাই স্বাধীনতার পক্ষে। এরা ইপিআরকে সাহায্য করেছে...। আব্বা ছিলেন পূর্ব পাকিস্তান জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের সিনিয়র সহ-সভাপতি। আর জমিয়ত ছিল আমাদের স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি। দেখা গেছে যশোর সদরের আ'লীগের এমপিএ রওশন আলীসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি এমনকি ইপিআররা পর্যন্ত আব্বার কাছে দোয়া নিতে আসতেন।

৪ এপ্রিল পাক বাহিনী মাদরাসাায় ঢুকে পড়ে। ঢুকেই গণহারে ধরপাকড় শুরু করেছিল। মাদরাসাা আগেই বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল। তাই অধিকাংশ ছাত্র-শিক্ষকই ইতিমধ্যে মাদরাসাা ত্যাগ করে বাড়িতে চলে যায়। কেবল অল্প কয়েকজন ছাত্র-শিক্ষক তখন মাদরাসাায় ছিল। মোটকথা মাদ্রসায় যারা ছিল সবাইকে লাইনে দাঁড় করানো হলো। প্রথম লাইনের প্রথম ব্যক্তি ছিলেন আব্বা। মাত্র চার-পাঁচ হাত সামনে থেকে গুলি করা হয়। সেটা মাথার ওপর দিয়ে চলে যায়। মানুষ ছত্রভঙ্গ হয়ে যে যেদিকে পারে পালাতে থাকে। মাওলানা হাবিবুর রহমান আব্বার অত্যন্ত প্রিয় ছাত্র ছিলেন। পরে শিক্ষক এবং খলিফা হন। তিনি আব্বাজিকে ধরে বারান্দায় এনে দাঁড় করিয়ে দেন। এরপর রাস্তার ওপর যদি দাঁড়িয়ে পাক আর্মি আব্বাকে লক্ষ্য করে দুটি গুলি ছুড়ে। গুলি দুটি দু'ঘাড়ের ওপর দিয়ে গিয়ে দেয়ালে পড়ে। আব্বা সেখান থেকে সরে যেতে চেষ্টা করলে আবার গুলি হয়। এটাও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে সিঁড়িতে গিয়ে পড়ে। তারপর আব্বা দৌড়ে গিয়ে বাথরুমে আশ্রয় নেন। সেখানেও গুলি করে। এই বরাবর ওপরের রুমটা (আমরা যে রুমে বসে কথা বলছিলাম) শেল মেরে গুঁড়িয়ে দেয়া হয়। পাশের রুমটাতেই আব্বা থাকতেন।

সেদিন আব্বাসহ মোট ২৩ জনকে গুলি করে। এর মধ্যে ২১ জন শহীদ হন। ২ জন বেঁচে যান। শহীদদের মধ্যে আব্বার অত্যন্ত প্রিয় খলিফা এবং এখানকার শিক্ষক মাওলানা হাবিবুর রহমানসহ ৫ জন ছাত্র ছিলেন। নোয়াব আলী নামের একজন ছাত্রের নাম মনে পড়ছে। সাধারণ জনগণের মধ্যে দৈনিক 'রানা'-এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক আব্দুল মাজেদ সাহেবের আব্বা মাস্টার আব্দুর রউফ এবং আলহাজ কাজী আঃ গনী প্রমুখ।

মুক্তিযুদ্ধের বাকি সময়টা স্থানীয় বিহারি আব্বার পেছনে লেগে ছিল। মাদরাসাার দক্ষিণ দিকে পুকুর পাড়ে আমাদের বাসা ছিল সেটা জ্বালিয়ে দেয়া হয়। আব্বার বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ— তিনি মুক্তিবাহিনীর সহযোগী, তাঁর ছেলে মানে আমি মুক্তিযোদ্ধা ...। আমি তখন বাগেরহাট জেলার মোল্লারহাট থানার উদয়পুর মাদরাসাায় হেফজ শেষ করে শুনাচ্ছি। জামায়াতিরা পাক আর্মিদের কাছে আমার বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ জমা



যশোর রেল স্টেশন মাদরাসায় একাত্তরের একুশ বীর শহীদের গণকবর। এই শহীদদের পাশেই শুয়ে আছেন স্বাধীনতাপ্রেমী মাওলানা আবুল হাসান যশোরী



মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষাবলম্বনের অপরাধে পাকিস্তানি সৈন্যরা গুলি চালায় মাওলানা যশোরীকে লক্ষ করে। লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে সেই গুলি গিয়ে লাগে দেয়ালে। আঙুল দিয়ে তাই দেখাচ্ছেন মাওলানা যশোরীর ছেলে মাওলানা আনোয়ারুল করীম যশোরী



পাকিস্তানিদের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার্থে এই টয়লেটে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন মাওলানা যশোরী

দিল। মেজর আমিন তখন মার্শাল ল'র দায়িত্বে ছিলেন। তিনি আব্বাকে ডেকে বললেন, আপনার ছেলেকে যত শিগগিরই পারেন এখানে হাজির করুন। আমাকে হাজির করা হলো। আমার বয়স তখন ১৫-১৬ হবে। ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদ করা হলো। প্রথম কিছুদিন রাজাকারী ট্রেনিং নেই। তবে আমাকে কোনো অপারেশনে নেয়া হয়নি। আল্লাহ বাঁচিয়েছেন। মেজর আমিন নামাজি ছিলেন। আমার দায়িত্ব ছিল ইমামতি করা— ফজর ছাড়া বাকি চার ওয়াক্ত নামাজের ইমামতি করতাম। অবশ্য এক পাক কর্নেল পশ্চিম পাকিস্তান জমিয়তের সভাপতি আল্লামা আব্দুল্লাহ দরখাস্তির মুরিদ হওয়ায় শেষ পর্যন্ত আব্বার বিরুদ্ধে বড় ধরনের কোনো এ্যাকশানে যাননি।

এ পর্যন্ত বলে মাওলানা আনোয়ারুল করীম থেমে যান। এরপর আমার হাত ধরে বারান্দায় নিয়ে এলেন। বর্বর পাক বাহিনী কর্তৃক বিল্ডিংয়ের দেয়াল, সিঁড়ি এবং মাওলানা যশোরীর আশ্রয় নেয়া বাথরুমের গুলিবিদ্ধ স্থানগুলি আঙুল দিয়ে দেখালেন।

'৩৬ বছর আগের এই চিহ্নগুলি এখনো অক্ষত আছে কি করে? দিন বদলের সঙ্গে সঙ্গে সব কিছুই তো বদলে যাচ্ছে— মুক্তিযোদ্ধা রাজাকার ভাই ভাই, একসঙ্গে ক্ষমতায় যাই...' আনোয়ারুল করীমের কূটনৈতিক উত্তর— এ চিহ্নগুলি মুছে ফেললে যে ইতিহাসকেই মুছে ফেলা হবে। ইতিহাস বিকৃতিকারীদের কাতারে আমরা দাঁড়াতে চাই না।



কালিয়ার হুজুর স্মৃতি হাতড়ে জানালেন, মেজর জলিল মোটরসাইকেলে এসে তাদের বিভিন্ন দিকনির্দেশনা দিতেন

'আমাদের এখানকার একজন শিক্ষক সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। মাওলানা ফিরোজ আহমদ (কালিয়ার হুজুর)। তাঁকে কি আপনার বইয়ে নেয়া যাবে?'– মাওলানা আনোয়ারুল করীমের এ প্রশ্নের উত্তরে বললাম, কেন নয়, লাল-সবুজের পতাকায় তাঁর অংশ আছে, এ মাটিতে তাঁর রক্ত-ঘাম আছে। স্বাধীনতাবিরোধীরা নানান ছলচাতুরী করে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে ঢুকে পড়তে পারলে একজন প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে স্থান পাবেন না কেন? মাওলানা ফিরোজ আহমদ তখন পাশেই এক মসজিদে ইমামতির দায়িত্বে ছিলেন। মোবাইলে তাঁকে খবর দেয়া হলো। ইমামতি শেষে তিনি এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। প্রথমে তাঁর স্থায়ী ঠিকানাটা জেনে নিলাম।



মাওলানা ফিরোজ আহমদ
জন্ম : ১৯৫০
গ্রাম : পার বিষ্ণুপুর
পোস্ট : পেরুলিয়া স্থান
থানা : কালিয়া
জেলা : নড়াইল

জামায়াতের মুখোস উন্মোচন

মাওলানা ফিরোজ আহমদ একাত্তরে হাজী নঈম উদ্দীন গাজীরহাট হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থী ছিলেন। '৭০-এর নির্বাচনে আ'লীগের সমর্থক থাকলেও ভোট দিয়েছেন দাঁড়িপাল্লায়। একাই জামায়াতকে ২১টি ভোট দেন। শুধু দ্বীনি মিল থাকার কারণে। যদিও কয়েক মাস পরেই বুঝেছেন এটা ভুল করেছেন তিনি। মুখে ইসলাম ইসলাম করলেই ইসলাম হয় না, কাজে তার প্রমাণ দিতে হয়। এ দলটি কখনোই তার প্রমাণ দিতে পারেনি। বরং ইসলামকে কেবল কলুষিত-করেছে। এখনও করছে। নিজের

মা-বোনকে কি কেউ স্বেচ্ছায় ভোগের জন্য কারও হাতে তুলে দিতে পারে? একাত্তরে এ পশুগুলো তাই করেছে। এদের কারণেই সমস্ত আলেম সমাজ আজ কলুষিত হচ্ছে। ৩৭ বছর আগের সে ভুলের জন্য এখনো তিনি অনুশোচনা করেন। যদিও তার একটি ভোট জামায়াত প্রার্থীকে বিজয়ী করতে পারেনি।

নকশালের উৎপাত...

মাওলানা ফিরোজ আহমদের বাড়ি ছিল নবগঙ্গা নদীর তীরে। মে মাসের দিকে পাকিস্তানি নেভি আর্মিরা লঞ্চে করে এসে তাদের এদিক দিয়েই গ্রামের ভেতর ঢুকে পড়ে। মুক্তিযোদ্ধাদের খুঁজতে থাকে। মুক্তিযোদ্ধা খোঁজার বাহানায় গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে ছাই করে দেয়। এদিকে অত্যাধুনিক চায়না অস্ত্র নিয়ে নকশাল বাহিনী উৎপাত শুরু করে দেয়। ইন্ডিয়া থেকে ট্রেনিং নিয়ে প্রায় পাঁচশ'র মতো নকশাল এসে তাদের ঘিরে ফেলে। দু'জন মুক্তিবাহিনী ধরেও নিয়ে যায়। তবে সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো ফিরোজ আহমদ নিজেদের এলাকায় রাজাকারদের কোনো আস্তানা গাড়তে দেননি এমনকি কাউকে রাজাকারও হতে দেননি। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর প্রথম চার মাস পাক বাহিনীর ওপর তারা গুপ্ত হামলা করতেন।

ট্রেনিং নিতে ভারতের পথে

এরপর ট্রেনিং নেয়ার জন্য একসঙ্গে ৪২ জন ভারতে চলে যান। যশোরের চৌগাছা দিয়ে ইন্ডিয়া ঢুকে পড়েন। ৫ নং টালিখোলা হয়ে পলতা ক্যাম্পে চলে যান। সেখানে এক মাসের ট্রেনিং নেন। রান, পজিশান, গ্রেনেড নিক্ষেপ, অস্ত্র চালান– এসবের ট্রেনিং দেয়া হয়। এরপর দেশে ফিরে এসে খুলনা-দৌলতপুর রেল গেইটে ক্যাম্প স্থাপন করেন। তাদের ক্যাপ্টেন ছিলেন সুফিয়া কামাল।

উচিত শিক্ষা

এসব এলাকায় রাজাকারদের উৎপাত খুব প্রকট আকারে দেখা দেয়। তাই দিঘলিয়া নদীর পাড়ে রাজাকারদের ধরে এনে মেরে ফেলা হতো ফিরোজ আহমদের নেতৃত্বে। মারা হতো কেবল সেসব রাজাকারই যাদের বিরুদ্ধে মানুষ হত্যার সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ছিল। অন্যান্যদের অস্ত্র রেখে ছেড়ে দেয়া হতো। দেশ স্বাধীন হয়ে গেলে বাড়িতে এসে মাত্র একদিন থেকে ক্যাপ্টেনের নির্দেশে আবার ক্যাম্পে চলে যান ফিরোজ আহমদ ও তার সহযোদ্ধারা।

মোটরসাইকেলে চড়ে...

ফিরোজ আহমদদের সেক্টর কমান্ডার ছিলেন মেজর এমএ জলিল। তিনি মোটরসাইকেলে করে এসে নিয়মিত তাদের সঙ্গে দেখা করতেন, বিভিন্ন দিকনির্দেশনা দিতেন। ৩০ ডিসেম্বর মেজর জলিলকে ইন্ডিয়ান আর্মিরা এরেস্ট করে জেলে ঢুকিয়ে দেয়। কারণ জলিল মেইলে ঢুকে দু'-তিনজনকে ব্রাশ ফায়ার করে মেরে ফেলে। তারা মেশিনের দামি দামি পার্স খুলে নিয়ে যাচ্ছিল।

মেজর জলিলের গ্রেফতারের ঘটনাটা তাঁকে এখনো খুব পীড়া দেয়।

সদর সাহেবের বই পড়ে...

স্বাধীনতার পর স্কুলে ফিরে এসে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেন। এরপর দেন ইন্টারমিডিয়েট খুলনা সুন্দরবন কলেজ থেকে।

স্কুলে পড়াশুনা করলেও ফিরোজ আহমদ ছিলেন ধার্মিক ফ্যামিলির সন্তান। বড় ভাই তখন গওহারডাঙ্গা মাদরাসায় পড়তেন।

সে সুবাদে ঘরে সদর সাহেব (মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী)-এর বই ছিল। মাঝে মাঝে সেগুলো পড়তেন। মূলত সদর সাহেবের বই পড়েই তার মনটা ঘুরে গেল। সিদ্ধান্ত নিলেন– মাদরাসায় পড়ার। এখন যে মাদরাসায় শিক্ষকতা করছেন এখান থেকেই '৮২-তে 'দাওরা' পাস করেন মাওলানা ফিরোজ আহমদ। এরপর এখানে শিক্ষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। স্বাধীনতাপ্রেমী মাওলানা যশোরীর হাত ধরে যে পেশায় লেগেছিলেন আড়াই যুগ আগে এখনো তা নিবিষ্ট চিত্তে পালন করে যাচ্ছেন মাওলানা ফিরোজ আহমদ।



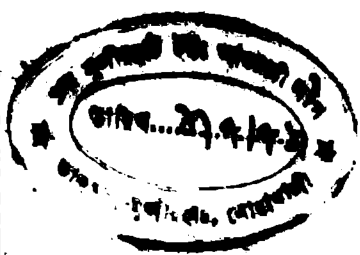
ফুলগাজির মাওলানা উসমান গনী '৭১-এ পাক সেনা ও রাজাকারদের অবস্থান জেনে গিয়ে ক্যাম্পে রিপোর্ট করতেন

প্রায় ক্ষয় হতে চলা কাগজটাকে লেমিনেটিং-এ মুড়িয়ে পরম যতনে রেখে দিয়েছিলেন মাওলানা মুহাম্মদ উসমান গনী। পড়ন্ত বিকেলে আমরা যখন মোহাম্মদপুরে তার বাসাটাতে পৌঁছলাম তখন এ কাগজ হাতেই আমাদের সঙ্গে সাক্ষাতে এলেন। লেমিনেটিং করা কাগজটাই তাঁর স্মৃতি, আবেগ, ভালোবাসা আর চেতনার প্রাণবিন্দু। এ কাগজই একাত্তরের বিন্দু বিন্দু ঘটনার সাক্ষী হয়ে আছে। যা জমাট বেঁধে সিন্ধুতে রূপ নিয়েছে। জমাট বাঁধা সেই সিন্ধুটাকে খোলার অনুরোধ জানালাম কাগজ হাতে বসে থাকা মুক্তিযোদ্ধা মাওলানা উসমান গনীকে।



এটা একটা ছাড়পত্র মাত্র। অনুমোদন করেছেন সে সময়ের নির্বাচিত নোয়াখালীর স্থানীয় আওয়ামী লীগ দলীয় এমপি খাজা আহমেদ যেটা কিনা মাওলানা উসমানীকে ভারত-বাংলাদেশে অবাধে চলার সুযোগ করে দিয়েছিল। এ সুযোগকে কাজে লাগিয়ে নিজের মেধা, শ্রমকে উৎসর্গ করেছেন নতুন স্বাধীন বাংলাদেশ গড়ার নেশায়। ঠিক কিভাবে মুক্তিযুদ্ধের শুরুটা করেছিলেন?

আমি তখন ফুলগাজি থানার মুন্সিরহাট ইসলামিয়া সিনিয়র মাদরাসায় শসম বা দাখিল শ্রেণীতে পড়ি। আমাদের গ্রামের বাড়ি কমুয়া চানপুর থেকে এক কিলোমিটার দূরে ভারতের ত্রিপুরা সীমান্তে। সীমান্তবর্তী বলে যুদ্ধের ধাক্কা প্রথম থেকেই সামলাতে হয়েছে আমাদের। আমাদের বাড়িতে মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্প প্রতিষ্ঠা করা হলো। বাড়িতেই ছিল মক্তব। এ মক্তবে ডাক্তাররা থাকত। আহত হলে তাদের সেবা ও চিকিৎসা হত এ মক্তবে। যুদ্ধফ্রন্টে যখনই কেউ আহত হতো তখনই তাদের ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব ছিল আমাদের ওপর। আহতদের আমাদের বাড়িতে নিয়ে আসতাম ধরাধরি করে। অস্ত্র, গুলি, আর্টিলারি ইত্যাদি মজুদ করে রাখা হতো। কাঁধে করে অস্ত্র, গুলি প্রভৃতি নিয়ে গেছি যুদ্ধ ময়দানে। পাকিদের বিরুদ্ধে ঠিকমতোই লড়ে যাচ্ছিলাম। কিন্তু মে মাসে এসে হানাদাররা পেছন থেকে হেলিকপ্টার দিয়ে আমাদের ওপর আক্রমণ করতে থাকল।



ফুলগাজীর মাওলানা ওসমান গনী একাত্তরে তৎকালীন আ'লীগের স্থানীয় নেতা মোঃ সফি উদ্দীন ভূঁইয়ার লিখিত এই কাগজটি দিয়ে ভারতে অবাধে যাতায়াত করতেন। মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে পৌঁছে দিতেন পাকিস্তানি সৈন্যদের গোপন তথ্য

ফলে আমাদেরকে বাংলাদেশ ভূখণ্ড ছেড়ে ভারতীয় ভূখণ্ডে চলে যেতে হলো। আমি আমার মা ভাই-বোন নিয়ে ত্রিপুরার চোকতাখোলা ক্যাম্পে গেলাম। চোকতাখোলাসহ আরো কয়েকটি স্থানে শরণার্থী শিবির খোলা হলো। শরণার্থী শিবিরগুলো পরিচালনার দায়িত্ব নিলেন এমপি খাজা আহমেদ। গড়ে উঠল মুক্তিযুদ্ধ ক্যাম্প। যোগ দিলাম ক্যাম্পে। একেকজনকে একেক দায়িত্ব ভাগ করে দেয়া হতো। অন্যদের মতো আমিও সকালে ক্যাম্পে চলে যেতাম। দায়িত্ব বুঝে নিতাম। প্রথম ক'দিন দায়িত্ব পেলাম বাংলাদেশ থেকে আগত শরণার্থীদের ক্ষয়-ক্ষতির হিসেব-নিকেশ করার। আমাদেরকে তখন আশ্বস্ত করা হয়েছিল যে, জাতিসংঘ থেকে আমরা সাহায্য পাব। কিন্তু তা আর হয়ে ওঠেনি। তারপর কিছুদিন গোয়েন্দা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছি। দেশে চলে আসতাম। পাকসেনা, রাজাকারদের খোঁজখবর, তাদের অবস্থান ইত্যাদি জেনে গিয়ে ক্যাম্পে রিপোর্ট করতাম। আগস্ট মাসে তখন পাকিস্তানি ব্রিগেডিয়ার আসলাম খান ফেনীর নিজাম উদ্দিন ময়দানে ভাষণ দেয়। সেই ভাষণ শুনে ক্যাম্পে গিয়ে বিস্তারিত জানাই।

কোনো বিশেষ ঘটনা কি মনে আছে সেই সময়কার? প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে হাসি হাসি কণ্ঠে বলে গেলেন—

একবার সীমান্ত পাড়ি দিয়ে বাংলাদেশে আসলাম। দুর্ভাগ্যক্রমে সামনেই মিলিটারি পরে গেল। আমাকে ডেকে জিজ্ঞেস করল– তুম কিদার জারাহে— তুমি কোথায় যাচ্ছ? আমি বললাম, আমার গ্রামে যাচ্ছি। আমি উর্দু জানি এটা বুঝতে পেরে বলল, দেখ তো এ লোকটা কে? সে কি বলছে কিছুই বুঝা যাচ্ছে না। আমি কাছে গেলাম, কথা বললাম। সে আমাকে জানাল সে ড্যাডা বা হিন্দু। আমি আঁৎকে উঠলাম। এখনই তো তার প্রাণ নিয়ে নিবে হানাদাররা। মনে মনে কৌশল আঁটলাম। সেনাদের বললাম, ইয়ে পাগল হ্যায়, মজনু হ্যায়, তাই সে কলমা জানে না। সে ড্যাডা ড্যাডা কেন করছে তা জানতে চাইল এক সেনা। আমি জবাব দিলাম– ড্যাডা হামারে এক মুসলিম কওম হ্যায়। তারা কৃষিকাজ করে, গরিব। এ লোকটাকে ছেড়ে দেন, সে গরিব। কৃষক। শেষ পর্যন্ত ছাড়া পেয়ে গেল লোকটা এবং আমার সঙ্গে ক্যাম্পে চলে আসল। এরই মধ্যে ক্যাম্পে তো আমি একেবারে নায়ক বনে গেলাম। আমাকে মাথায় নিয়ে নাচতে লাগল এই হিন্দু লোকটা। আর বলতে লাগল– সে আমার দেবতা, সে আমাকে বাঁচিয়েছে, আমি তাকে পূজা করব।

মাওলানা উসমানী সেই কাগজটি হাতে নিয়ে আবারো স্মৃতির জগতে ফিরে গেলেন। বলতে লাগলেন, মুক্তিযুদ্ধের শেষ দিনগুলোতে সীমান্ত এলাকা এক সেকেন্ডের জন্য গোলাগুলি ছাড়া ছিল না। গুলি, আর্টিলারি মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে পৌঁছে দিতাম এ সময়। ভারতের বৈরাগীর বাজার থেকে ৩০ কি.মি. পথ টেলিফোন লাইন টেনে মুক্তিযোদ্ধাদের ব্যাংকারে সংযোগ দিয়েছিলাম। এ ছাড়াও খাবার, ওষুধ, টাকা-কড়ি ইত্যাদি সরবরাহ করার যখন যে দায়িত্ব কাঁধে এসেছে তখন তা নির্বিঘ্নে পালন করেছি। অবশ্য আমাদের কাজের জন্য সামান্য কিছু ভাতাও পেয়েছি। তরুণ বয়সে এত কিছু করলেন পরিবার থেকে কোনো বাধা আসেনি? এর উত্তরটাও ছিল এরকম— মা কোনো

বাধা দিত না। তারাও বুঝত জালেমদের রুখে দাঁড়ানো তরুণদেরই কাজ। সীমান্তের কাছে আমাদের বাড়ি হওয়ায় বাড়িতে মাঝে মাঝেই আসতে পারতাম। গবাদি গরু নিয়ে গিয়েছিলাম ক্যাম্পে। নিজেদের জমির ধান কাটিয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম। তাই খাওয়া-দাওয়ারও তেমন কোনো সমস্যা হয়নি। নিজেরা খেয়েছি এবং ক্যাম্পের লোকদেরও খাইয়েছি।

মুক্তিযোদ্ধা মাওলানা উসমান গনী আরো জানালেন, তাদের সেক্টর কমান্ডার ছিলেন মেজর হায়দার, সাব সেক্টর কমান্ডর ছিলেন লে. কর্নেল জাফর ইমাম। ১৯৫৪ সালে জন্ম নেয়া জনাব গনী খুব অল্প বয়স থেকেই রাজনীতিসচেতন ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরুর আগেই ফেনীর রাজপথে কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে স্লোগান তুলেন–

ভুট্টোর মাথায় লাথি মার
বাংলাদেশ স্বাধীন কর।
ইয়াহিয়া, ভুট্টো ভাই ভাই
এক রশিতে ফাঁসি চাই।

শেখ মুজিবকে নিয়ে তিনি নিজে অনেক ছন্দ তৈরি করেছেন। তার কয়েকটা আমাদের শুনালেন তিনি—

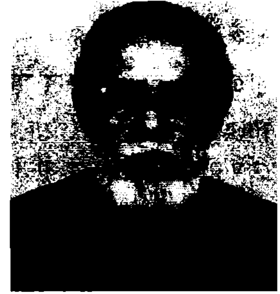
মজিব ভাইয়া যাওরে
নির্যাতিত দেশের মাঝে
জনগণের নাওরে।
বঙ্গবন্ধুরে প্রাণে মজিব ভাই
স্বাধীন বাংলা আসমানে উড়াই।
ছলে বলে ২৪ বছর রক্ত খাইছে চুসি
জাতিকে বাঁচাইতে গিয়ে মুজিব হইলা দুষি।

আলেম মুক্তিযোদ্ধা মুহাম্মদ উসমান গনী ১৯৮০ সালে কামিল পাস করেন। এরপর ঢাকায় এসে নূরানী ট্রেনিং নেন। একই বছর লালমাটিয়া শাহী মসজিদে মোয়াজ্জিনের চাকরি পান। ২০০৫ সাল পর্যন্ত এ মসজিদেই মোয়াজ্জিন ছিলেন। এখন ব্যবসাপাতি নিয়ে ব্যস্ত। বর্তমানে লালমাটিয়া শাহী মসজিদের পাশেই দুই ছেলে ও ৫ মেয়ের পরিবার নিয়ে নিজ বাড়িতে বসবাস করছেন। মুক্তিযোদ্ধা মাওলানা উসমান গনী যে স্বপ্ন নিয়ে '৭১-এ মুক্তি সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন তা আজও পূরণ হয়নি– এ দুঃখবোধ তাকে কুরে কুরে খাচ্ছে প্রতিনিয়ত। আহা, তার এ দুঃখবোধ কি মোচন হবার নয়!



'৭১-এ অস্থায়ী সরকারের কাছে দেশ থেকে নানা তথ্য সরবরাহ করতেন সাংবাদিক মওলানা আবদুল আওয়াল

এই নিয়ে দ্বিতীয় বারের মতো একই উদ্দেশ্যে বাড়িটিতে আসলাম। মরহুম মওলানা আবদুল আওয়ালের খুবই সাধারণ মানের বাড়ি মোহাম্মদপুরের এখানটায়। মওলানা আওয়ালবিহীন অনেকটা নীরব-নিথর বাড়িতে প্রথম এসেছিলাম সপ্তাহ খানেক আগে। তখন পরিচয় হলো তাঁর একমাত্র ছেলে রিফাক আহমেদের সঙ্গে। পরিষ্কার করতে চাইলাম উদ্দেশ্য– '৭১-এ মওলানা আবদুল আওয়ালের ভূমিকা সম্পর্কে জানতে এসেছি। বিষয়টাতে অতি আগ্রহী হলেন বটে এ প্রজন্মের ছেলে রিফাক, কিন্তু এ বিষয়টাতে অতটা জানেন না বলে জানালেন তিনি। তথ্য জানার একমাত্র উৎস তার বয়স্কা মা। যে কিনা কখনো কোনো পরপুরুষের সামনে দাঁড়ানো না কথা বলতে। তারপরও অনুরোধ করলাম ছেলের কাছে– মা যদি বাবা সম্পর্কে কিছু বলতে সম্মত হন। কিন্তু মা তার আদর্শ, বিশ্বাসে অত্যন্ত দৃঢ় প্রত্যয়ী। পর্দার আড়াল থেকেও কথা বলতে রাজি হলেন না আমাদের সঙ্গে। একটা উপায় ইতিমধ্যে আবিষ্কার করা গেল। ছেলে বাবার গল্প শুনে এসে জানাবে আমাকে। তবে এজন্য সময় চাইলেন রিফাক।



মহীয়সী নারী

দ্বিতীয় বার আগমনের আগে অনেক কিছুই জেনে গেছেন বাবা সম্পর্কে মার কাছ থেকে ছেলে রিফাক। মুক্তিযুদ্ধে কোথায় ছিল তাদের পরিবার। বাবা আবদুল আওয়াল '৭১-এ সেই টালমাটাল দিনগুলো কিভাবেইবা সামলালেন। এসব এখন বেশ সাবলীলভাবে বলতে শুরু করে দিলেন রিফাক–

আমার বাবা তখন দৈনিক বাংলা, যা সে সময়ে দৈনিক পাকিস্তান নামে প্রকাশ হতো তার সাব-এডিটর ছিলেন। দৈনিক বাংলার অফিসে একদিন ঠিকই হামলা করে বসল হানাদাররা। বাবা অফিসের পেছন গেট দিয়ে বেরিয়ে আসলেন। এ যাত্রায় প্রাণে রক্ষা

পেলেন তিনি। আমাদের পরিবার তখন ভাড়া করা বাসায় থাকত গোপীবাগে। গোপীবাগের বাসায়ও তল্লাসি চালানো হলো। সেখানে তাকে না পেয়ে বাড়িওয়ালার এক আত্মীয়কে গুলি করে মেরে ফেলেছে হিংস্র পশুরা। এমতাবস্থায় ভেঙে পড়েননি রিফাক-এর মা। ঘরে ছোট ছোট দুই মেয়ে। তাদের কোলে নিয়ে স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে চড়ে বসলেন রিকশায়। মওলানা আবদুল আওয়ালের পর্দানিশীন স্ত্রী তাঁর পর্দা কৌশল দিয়ে সেদিন প্রাণ বাঁচালেন স্বামী-সন্তানের। নিজে পর্দা করতে গিয়ে শাড়ি দিয়ে ঢেকে রাখলেন রিকশার পুরো সামনের ভাগ। ফলে কেউ বুঝেই উঠতে পারল না যে, পর্দার অন্তরালে আরো ক'টি প্রাণ জিইয়ে আছে খুবই নিরাপদে। সত্যিই মহীয়সী ধার্মিক নারী মওলানা আওয়ালের স্ত্রী। ঢাকা থেকে নরসিংদী রিফাকের নানা বাড়ি চলে এলেন আবদুল আওয়াল। পরিবারকে নিরাপদে রেখে মওলানা আওয়াল ঢাকা চলে আসতে চাইলেন। স্ত্রী তাতে কোনো বাদ সাধলেন না। পাঠিয়ে দিলেন ঢাকার রণক্ষেত্রে মুক্তি-সংগ্রামের নায়ক হতে।

মুক্তিযুদ্ধকালীন অভিনব সাংবাদিকতা

সাংবাদিকতাই যার পেশা আর নেশা তাকে কি কোনো যুদ্ধ-ঝড় উড়িয়ে নিতে পারে? যেমনটা পারেনি মওলানা আওয়ালকে। অন্যরকম যুদ্ধে নামলেন তিনি সে সময় ঢাকায়। ঢাকার বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে তা সম্পাদনা করে পাঠাতেন কলকাতায়। যুদ্ধের অস্বাভাবিক পরিবেশে তথ্য সংগ্রহের ধরন ছিল ভিন্নতর। বাদাম বিক্রেতা, ফকির, ভিক্ষুক, হকার ইত্যাদি সেজে বেরিয়ে পড়ত শহরের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে মওলানা আওয়ালের সহকর্মীরা। তাদের দেয়া তথ্যকে সাজিয়ে-গুছিয়ে লিখে পাঠিয়ে দিতেন কলকাতা অস্থায়ী সরকারের দফতরে। ঢাকার সার্বিক অবস্থা, মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃতি, পাকসেনাদের তৎপরতা এবং রাজাকারদের কুটিলতা– এসবই সংবাদ হয়ে চলে যেত অস্থায়ী সরকার বরাবর মুক্তিযোদ্ধা আওয়াল-এর হাত ঘুরে। জীবনবাজি রেখে এ কাজগুলো করতে হতো তখন। বুদ্ধিজীবী হত্যা তালিকায় তের নম্বরে ছিলেন এ মওলানা মুক্তিযোদ্ধা। তাকে হন্যে হয়ে খুঁজছে পাকসেনাদের তাদের এদেশীয় দোসররা। তারপরও তারা তাঁর মৃত্যুর নাগাল পাননি।

তারা আমাকে মেরে ফেলবে!

বুদ্ধিজীবী হত্যা তালিকায় থেকেও '৭১-এ বেঁচে গেলেন মওলানা আব্দুল আওয়াল। তাই মৃত্যুকে অতটা ভয় না-ই পেতে পারেন তিনি। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর বছর ২০০৩ সালে যখন তিনি স্ট্রোক করে খুবই অসুস্থ, তখন তার পরিবার তাকে পাশের ইবনে সীনা হাসপাতালে নিয়ে যেতে চাইলে তিনি বলে উঠলেন, জামায়াতীরা ওখানে আমাকে মেরে ফেলবে। ওই হাসপাতালে আমি যাব না। এতটা জামায়াতে ইসলামীবিরোধী কেন ছিলেন মওলানা আওয়াল? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে চাইলেন ছেলে এভাবে— আমার বাবা সব সময় মৌলবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে গেছেন। ইসলামের নামে ধর্ম ব্যবসাকে

কখনো তিনি মেনে নিতে পারতেন না। ১৯৬২ সালেই 'মওদুদী চিন্তাধারা' নামে বই লিখে ব্যাপক আলোচিত হন। মুক্তিযুদ্ধের সময় রাজাকার জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে জোরালোভাবে সরব ছিলেন। জামায়াতীদের মুখোশ উন্মোচন করে দিতে তিনি বই লিখেছেন, আন্দোলন, সভা-সেমিনার করেছেন আজীবন। এসব কারণে তাদের টার্গেটে পরিণত হন আমার বাবা। বারবার হত্যার হুমকি পেয়েছেন, আক্রমণের মুখে পড়েছেন। পুলিশ দিয়ে বাড়ির নিরাপত্তা রক্ষা করতে হয়েছে। তারপরও ঘাবড়ে যাননি বাবা। অতি স্বাভাবিকভাবেই নিজের জীবনটাকে চালিয়ে নিয়েছেন। একবার পুলিশ গার্ড দিয়ে রেখেছে আমাদের বাড়ি। বাবা তাদের না বলে, না কয়ে মহল্লার দোকানে চলে গেলেন, পুলিশ পিছু পিছু ছুটল। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ডিজি যখন ছিলেন তখনও অতি সাদাসিধে জীবন ছিল বাবার। রিকশায় চড়ে বাড়ি থেকে বের হতেন। মারা যাবার এক বছর আগে আমার টাকায় তাঁর জন্য একটি প্রাইভেট কার-এর ব্যবস্থা করা হয়।

পরিবারের চেয়েও দেশ বড়!

নিজ পরিবারের চেয়ে দেশকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন বাবা। মহান মুক্তিযুদ্ধের পর বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেশ উদ্ধারে নামলেন তিনি। তখন আমার এক ভাই কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। আমার মা এখনও বলে থাকেন, তখন যদি বাবা পরিবারকে সময় দিয়ে ছেলের চিকিৎসায় মনোযোগী হতেন তবে সেই ভাইকে বাঁচানো যেত! রিফাক এভাবেই বলে যাচ্ছিলেন নিজ বাবা সম্পর্কে। অত্যন্ত আবেগতাড়িত কণ্ঠে তিনি আরো জানালেন, তাঁর বাবা মারা যাবার পর তাকে মোহাম্মদপুর কবরস্থানের ভিআইপি অংশে কবরস্থ করা যায়নি। কারণ সেখানে কবর দিতে চল্লিশ হাজার টাকা প্রয়োজন। সে মুহূর্তে সে টাকাটাও ছিল না তাদের ঘরে। দেশের জন্যই নিজেকে উজাড় করেছেন বলে দাবি করলেন ছেলে রিফাক। আরো জানা গেল, ১৯৬২ সাল থেকেই বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে ওঠে মওলানা আওয়ালের। সে সময়কার জাতীয় উর্দু ও ফার্সি পত্রিকার বাংলা ভাষান্তর করে তা পেশ করতেন বঙ্গবন্ধুর কাছে। এসব উর্দু, ফার্সি পত্রিকায় কোনো বিষয়ে কোনো কোনো তথ্য যতটুকু গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে তা নিয়ে আলোচনা করতেন বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে। তখন থেকেই আওয়ামী লীগের নিবেদিতপ্রাণ একজন হয়ে ওঠেন মওলানা আবদুল আওয়াল। শেখ হাসিনার অনেক বক্তৃতার স্ক্রিপ্ট নিজে তৈরি করে দিতেন বলে জানালেন ছেলে রিফাক। পরিবারের চেয়ে মওলানা আওয়াল দেশ, রাজনীতি, আদর্শকে মূল্য দিতেন বেশি বলে দাবি করলেন তাঁর একমাত্র ছেলে।

মওলানা আবদুল আওয়ালের জন্ম ১৯৪২ সালে কচুয়ার উজানিতে। সেখানে নিজ হাতে তৈরি একটি মসজিদ আছে। ঢাকা আলিয়া থেকে তিনি কামিল সম্পন্ন করেন। একনাগাড়ে বাংলা, উদু, ফার্সি এবং ইংরেজি ভাষায় বলতে ও লিখতে পারতেন। কর্মজীবনে জাতীয় উলামা পরিষদ, সাংবাদিক ইউনিয়ন প্রভৃতির সদস্য ও সভাপতি

ছিলেন। বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক হিসেবে কাজ করেছেন দীর্ঘদিন। ইসলামী গবেষণা প্রশিক্ষণ ইত্যাদিতে সক্রিয় ছিলেন। ইসলামের মৌলিক বিষয়, ইসলামী অর্থনীতি, মৌলবাদ ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর একাধিক বই ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। পারিবারিক জীবনে দুই মেয়ে, এক ছেলে ও স্ত্রী রেখে ২০০৩ সালে মারা যান তিনি। ছেলে রিফাক তার বাবার পাওয়া মুক্তিযোদ্ধা সাংবাদিক পদক আমাদের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন, বাবা মুক্তিযুদ্ধ কিংবা তার পরে কখনো আপস করেননি মৌলবাদ, জামায়াত কিংবা অন্য কোনো অপশক্তির কাছে। আজীবন নির্ভীকভাবে লড়াই করেছেন নিজের সততা ও প্রজ্ঞা দিয়ে। আমিও কোনো অপশক্তির কাছে আপস করতে চাই না। লড়ে যেতে চাই বাবার মতো করে অমর হতে। সত্যিই কি এ প্রজন্মের রিফাক লড়তে পারবেন নিজেকে নিয়ে আরো ঝঞ্ঝাময়, জটিলতর এ পৃথিবীতে! আর যাই হোক, গত এক সপ্তাহে মার কাছ থেকে বাবা সম্পর্কে গল্প শুনে অনুভূতি ও ভাবনার এরকম অভিঃপ্রকাশ ক'জনের-ইবা হয়!



সাবেক এমপি মাওলানা আতাউর রহমান খান ভারাক্রান্ত মন নিয়ে বললেন,'৭১-এর ন'মাসের পাপের প্রায়শ্চিত্যই এখন তারা করছে, আরো করবে...

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)র টিকিটে নির্বাচিত সাবেক এমপি মাওলানা আতাউর রহমান খান সম্পর্কে আগে থেকেই জানা ছিল, দেশের আলোচিত আলেমদের মধ্যে '৭১-এ তাঁর ভূমিকা ছিল স্বাধীনতার পক্ষে। আমার নেয়া একটি সাক্ষাৎকারে এ ব্যাপারে তিনি বিস্তারিত জানিয়েছিলেন। স্বাধীনতার বিপক্ষে অবস্থানকারী তৎকালীন আলোচিত ইসলামী রাজনৈতিক দল 'নেজামে ইসলাম পার্টি'র সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করে দল থেকে পদত্যাগ করাসহ তার রাজনৈতিক গুরু এবং পার্টি প্রধান মাওলানা আতহার আলীকেও একটি 'আলটিমেটাম পত্র' প্রদান করেছিলেন – আমাকে একথাও জানিয়েছিলেন মাওলানা খান। এরপর থেকেই সুযোগ খুঁজছিলাম, তার সঙ্গে আরেকদিন বসব– শুধু মুক্তিযুদ্ধের গল্প শোনার জন্যে। এক সন্ধ্যায় তার বড় ছেলে, দৈনিক ইনকিলাবের সহকারী সম্পাদক মাওলানা উবায়দুর রহমান খান নাদভীর সঙ্গে দেখা, ঢাকার রাজপথে। তিনি জানালেন, তার বাবা– মাওলানা খান কিশোরগঞ্জে তাদের 'নূর মঞ্জিল-এর বাসাতেই আছেন। সেখানটায় গেলেই তার সঙ্গে দেখা হবে, কথা হবে। দুর্ভাগ্য, কিশোরগঞ্জে গিয়ে বিফল মনোরথে ফিরে আসতে হয়েছে। 'হুজুর একটু আগে ঢাকায় গেছেন'– নূর মঞ্জিলের ভেতর থেকে জানালো গৃহপরিচারিকা। ঢাকায় ফিরে স্বামীবাগের বাসায় পাওয়া গেল মাওলানা খানের সাক্ষাৎ।



কি আছে সেই 'আলটিমেটাম পত্রে?

আমার সবটুকু ঔৎসুক্যই সেই চিঠিটি নিয়ে। জাঁদরেল আলেম ও আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব এবং তৎকালীন শীর্ষ ইসলামী রাজনীতিক মাওলানা আত্হার আলীর বহুল আলোচিত নেজামে ইসলাম পার্টির কিশোরগঞ্জ মহকুমা (বর্তমানে জেলা)'র শীর্ষ নেতা এবং তাঁর দক্ষিণ হস্ত হিসেবে পরিচিত মাওলানা খান তাঁর গুরুকে কি লিখেছিলেন সেই পত্রে? কোনোভাবেই আর তর সই ছিল না যেন আমার। তাই প্রথমেই বললাম, তখন আপনি কোথায় ছিলেন এবং কি লিখেছিলেন সেই চিঠিতে?

মাওলানা খান বললেন, তখন যুদ্ধের মাঝামাঝি সময়– আগস্ট হবে। ২৫ মার্চের দু'-তিন দিন পরেই বাবা-মা, স্ত্রী-ছেলে-মেয়েদের নিয়ে কিশোরগঞ্জ শহরের বাসা থেকে আমাদের গ্রামের বাড়ি ইটনা থানার বড় হাত কবিলা গ্রামে চলে যাই। যদিও এক মাস পরেই আবার সবাইকে নিয়ে শহরে ফিরে আসি। কিন্তু সে সময়টাতে আমি গ্রামের বাড়িতেই ছিলাম। চারদিকে পাকিস্তানিদের সীমাহীন জলুম-নির্যাতন দেখে আর ঠিক থাকতে পারলাম না। তাই আমার মুরব্বি এবং রাজনৈতিক গুরু মাওলানা আত্হার আলী (রহ.)-কে ছয়টা শর্ত দিয়ে এ মর্মে একটা চিঠি লিখলাম, এ ছ' শর্তের সন্তোষজনক উত্তর পেলেই কেবল আমি পাকিস্তানের পক্ষে থাকব এবং জীবনবাজি রেখে পাকিস্তান রক্ষার জন্য কাজ করে যাব। উদুর্তে লেখা চিঠিটির হুবহু অনুবাদ–

একটি পরামর্শ

তারিখ : ১৬ আগস্ট ৭১

আমরা নানা কারণে বর্তমান টানাপোড়েনের সময় পাকিস্তানকে সমর্থন করছি এবং পাকিস্তানের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্যে বৈধ সকল কাজ করতে প্রস্তুত আছি এবং করছি।

কিন্তু বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা উপস্থাপন করতে চাই, যেহেতু আমরা আল্লাহর ফজলে আলেম, কাজেই ইল্‌মের আলোকে সবকিছু যাচাই না করে অন্ধের মতো কিছু করতে আমরা প্রস্তুত নই। ব্যক্তিগতভাবে আমরা সবাই নিজ নিজ কর্ম সম্পর্কে দায়ী; তদুপরি আলেম সমাজকে কলুষিত হতে না দেয়াও আমাদের দায়িত্ব।

পাক বাহিনী দেশে যা করছে, ইসলামের দৃষ্টিতে এর পর্যবেক্ষণ করে আমি ছ'টি বিষয়কে নাজায়েজ ও অগ্রহণযোগ্য চিহ্নিত করেছি। এ ছ'টি বিষয়ে সংশোধন ব্যতীত তাদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে কাজ করা কোনোভাবেই জায়েজ হবে না। যেভাবেই হোক এ ছ'টি বিষয়ের সংশোধন করা হোক। অন্যথায় আমি সবকিছু থেকে আলাদা থাকব। আমাকে কোনো কাজে যেন বাধ্য করা না হয়।

ছয়টি বিষয় নিম্নরূপ

১. একটি ভূখণ্ডের নামই 'পাকিস্তান' নয় বরং একটি আদর্শিক রাষ্ট্রের নাম পাকিস্তান। আদর্শিক রাষ্ট্রের হেফাজত ওই আদর্শের যথাযথ হেফাজতের মাধ্যমেই হতে পারে। অতএব দেশটির আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গির হেফাজতের লক্ষ্যে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নেয়া হোক। এটাকে কেবল ভবিষ্যতের ওয়াদার ওপর ছেড়ে রাখলে চলবে না।

২. পাকিস্তানবিরোধীদের দমন করার ক্ষেত্রে শরিয়তের বিধানের পুরোপুরি অনুসরণ করতে হবে। নির্ভুল, সঠিক, নিশ্চিত তথ্য না নিয়ে কাউকেও রাষ্ট্রের শত্রু সাব্যস্ত করা যাবে না। কেউ শত্রু বলে চিহ্নিত হলে তার সঙ্গে ওই আচরণই করতে হবে, যার সে যোগ্য। একজনের দোষে আরেকজনকে শাস্তি দেয়া যাবে না। যথা পিতার অপরাধে ভাইকে...।

৩. এ ভূখণ্ডের সকল সম্পদ আমাদের জাতীয় সম্পদ। এসবের ব্যাপক ধ্বংসসাধন আমাদের জাতীয় সম্পদ ধ্বংস করার নামান্তর। অতএব দেশ রক্ষার নামে জাতীয় সম্পদ ধ্বংস করা যাবে না।

৪. ব্যক্তির অপরাধে তার সহায়-সম্পদ, বাড়িঘর, সামানপত্র, দোকানপাট, ফল ফসল ধ্বংস করা যাবে না। কারণ এগুলো তার উত্তরাধিকারীদের সম্পদ। উত্তরাধিকারীদেরকে সহায়-সম্বলহীন করে দেয়া কোনোভাবেই সমর্থনযোগ্য নয়, একজনের বাড়িতে আগুন দিতে গিয়ে সারা গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়া হচ্ছে; এটা কোন ধরনের জুলুম?

৫. লুটপাট বন্ধ করতে হবে। লুট করা ও লুটের সুযোগ করে দেয়া শরীয়তের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ অবৈধ ও হারাম।

৬. নারীদের ওপর জুলুম বন্ধ করা হোক। শিশু, নারী ও বৃদ্ধদেরকে পূর্ণ নিরাপত্তা দিয়ে হেফাজত করতে হবে। তাদের ওপর হাত ওঠানো বন্ধ করতে হবে, নারীদেরকে মা ও বোন গণ্য করতে হবে।

আশাকরি উল্লেখিত ছ'টি বিষয়ের ওপর কঠোরভাবে আমল করা হবে।

হে আল্লাহ আমার মনের অবস্থার খবর তুমিই রাখো। সকল খারাবি হতে আমাকে বাঁচাও। আমি কী করতে পারি, কে শুনবে আমার কথা?

اللهم احفظنا فانك خير الحافظين ونجنا من القوم الظالمين۔

"হে আল্লাহ, আমাদেরকে হেফাজত করো। তুমিই শ্রেষ্ঠ হেফাজতকারী। আমাদেরকে জালেমদের হাত থেকে মুক্তি দাও।"

– আতাউর রহমান খান

১৬/৮/১৯৭১

গ্রাম থেকে চিঠিটি হাতে হাতেই পাঠাই। মাওলানা আত্হার আলী (রহঃ)-এর উত্তরে লিখেন,

তুমি ভালো কথাই লিখেছ। আচ্ছা, আমি তাদের কাছে চিঠি লিখব।

শেখ মুজিব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হবেন

'৭১-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিপুল ভোটে নির্বাচিত হলো। আমার সমর্থন এবং বিশ্বাস ছিল চিরাচরিত নিয়মানুযায়ী মেজরিটি পাওয়া দলকেই ক্ষমতা দেয়া হবে। আমি মনে-প্রাণে চাইতাম, শেখ মুজিব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হবেন এবং দেশ শাসন করবেন। অথচ এটা না করে ভুট্টোর চক্রান্ত এবং ষড়যন্ত্রের কারণে শেখ মুজিবকে ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করা হলো। তখন থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর প্রতি আমার প্রচণ্ড ঘৃণা সৃষ্টি হয়। ইয়াহিয়া-ভুট্টো শেখ মুজিবের সঙ্গে যে কালক্ষেপণের বৈঠক করল আমার তখনই মনে হয়েছে একটা কিছু ঘটবে। যার পরিণতি ভালো হবে না এবং শেষ পর্যন্ত তাই হলো।

মাওলানা আতহার আলীর কাছে লেখা মাওলানা আতাউর রহমান খানের ঐতিহাসিক চিঠি

ডেটলাইন : ১৬ আগস্ট, ১৯৭১

এসব করা হলো এদেশের সবাইকে হিন্দু মনে করে!

পাকিস্তানের তৎকালীন ইয়াহিয়া সরকার বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যে ভূমিকা পালন করেছে– আর্মি দিয়ে যে জুলুম, নির্যাতন এবং ব্যাপক গণহত্যা চালাল, বাড়ি-ঘর পুড়িয়ে ছারখার করে দিল এবং এসব করা হলো এদেশের সবাইকে হিন্দু মনে করে! তারা অস্ত্রের মাধ্যমে আমাদের দমিয়ে রাখতে চেয়েছিল। অথচ এ দমননীতি পৃথিবীর কোনো দেশের জন্য কখনোই মঙ্গলজনক নয় এটা যেমন পশ্চিম পাকিস্তানিরা বোঝেনি সেই সঙ্গে এদেশের আলেম সমাজও বুঝতে ব্যর্থ হয়েছে। পাকিস্তান ঐক্যবদ্ধভাবে থাকাটাই ভালো ছিল কিন্তু এভাবে তো ঐক্যবদ্ধ থাকাটা সম্ভব হবে না। আমি এ দৃষ্টিকোণ থেকে পাকিস্তানের বিরোধিতা করেছি।

খালি আগুন আর আগুন

২৫ মার্চ আমরা আমাদের কিশোরগঞ্জের বাসাতেই ছিলাম। ২৭ মার্চ কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে মেজর জিয়ার কণ্ঠে স্বাধীনতার ঘোষণা শুনি। এ দিনেই আজিমউদ্দিন হাই স্কুলের মাঠ থেকে বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈন্যরা প্রতিরোধমূলকভাবে পাকিস্তানি বিমান লক্ষ্য করে গুলি করে। এরপর সবাই আঁচ করতে পারল, শহরে ব্যাপকভাবে পাকিস্তানি আর্মিরা চলে আসবে। এই আতঙ্কে শহর প্রায় শূন্যই হয়ে গেল। আমিও মা-বাবা, স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে এক আত্মীয়ের বাড়িতে চলে গেলাম। সেখানে কয়েক দিন থেকে আমাদের গ্রামের বাড়িতে চলে আসি। গ্রামে থেকেই খবর পাই– কিশোরগঞ্জ শহর পুরোটাই পাকিস্তানি আর্মিরা দখল করে নিয়েছে। চারদিকেই হত্যাকাণ্ড, খালি আগুন আর আগুন। জ্বালাও, পোড়াও।

আবার শহরে ফিরে এলাম

গ্রামে মন বসছিল না তাই এক মাস পর আবার সবাইকে নিয়ে শহরের বাসায় ফিরে এলাম। বিবিসি এবং স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের খবর শুনতাম নিয়মিত। এম আর আখতার মুকুলের চরমপত্র শুনতাম মনোযোগ দিয়ে। আমার কাছে এ অনুষ্ঠানটা খুব ভালো লাগত।

আমার আত্মীয়-স্বজন এবং একান্ত কাছের লোকেরা মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছিল। তারা আমার কাছে শহরের খবরাখবর নেয়ার জন্য আসত। আমি তাদের দিকনির্দেশনা দিতাম, তাদের প্রবোধ দিতাম, উৎসাহ দিতাম যে, এদিন থাকবে না, আমাদের সুদিন ফিরে আসবেই।

আমাকেও তারা সন্দেহের চোখে দেখত

আমার বাবা মাওলানা আহমদ আলী খানের পীর সাহেব এবং প্রিন্সিপাল হিসেবে নাম-ডাক ছিল কিন্তু রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা তার খুব একটা ছিল না, যদিও তিনি কিশোরগঞ্জ মহকুমার নেজামে ইসলাম পার্টির সভাপতি ছিলেন। মাওলানা আতহার আলী (রহঃ) তাঁকে মুরব্বি হিসেবে সভাপতি বানিয়েছিলেন। আমি ছিলাম সেক্রেটারি। কাজ করতাম আমিই। তিনি মাদরাসা এবং পীর-মুরিদি নিয়ে থাকতেন। হিন্দুরা পর্যন্ত তাঁর ভক্ত ছিল।

যুদ্ধের পুরো সময়টাতেই তিনি সম্পূর্ণ নীরব ছিলেন।

আমি অস্ত্র হাতে সরাসরি যুদ্ধে যেতে পারিনি– পরিবেশ, পরিস্থিতির কারণে। মুক্তিযুদ্ধের ন'মাস কিশোরগঞ্জ পাকিস্তানি আর্মি এবং রাজাকারদের দখলে ছিল। তাই ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় তখন সবাই পাকিস্তানের পক্ষেই ছিল।

আমাদের রেল স্টেশন মাস্টারের বাসাটাই আল-বদর বাহিনীর ক্যাম্প ছিল। এর প্রধান ছিলেন প্রফেসর মাহতাব উদ্দীন, আর ডাকবাংলোয় ছিল আর্মিদের ক্যাম্প।

কাউকে পাকিস্তানবিরোধী সন্দেহ হলে বা তাদের কাছে রিপোর্ট আসলে তাকে তারা ধরে নিয়ে আসত, মেরে ফেলত। একবার আমার বাসা থেকে একটা লোক ধরে নিয়ে যায়। গ্রামের লোক। ছোট ব্যবসায়ী ছিল। শহরে মালপত্র কিনতে এসেছিল। আমার বাংলা ঘরে লোকটা শুয়েছিল। হয়তো কেউ রিপোর্ট দিয়েছিল...। তাদের ক্যাম্পে গিয়ে বোঝালাম, নিরীহ, গরিব মানুষ, ফেরিওয়ালা গ্রাম থেকে এসেছে, ওকে ছেড়ে দিন। পরের দিন ছেড়ে দেয়।

একবার শুনলাম, ডাকবাংলোর সামনে যেখানে পাকিস্তানি আর্মিদের ক্যাম্প ছিল প্রায় ৪০-৪২ জন লোককে পিঠমোড়া করে হাত বেঁধে প্রখর রোদের মধ্যে চিৎ করে শুইয়ে রেখেছে। রাতেই তাদের মেরে ফেলবে! আমি গিয়ে মেজর ইফতেখারকে বললাম, ওরা কি অপরাধ করেছে, ওদের শাস্তি দেয়ার মানেটা কি?

উনি বললেন, 'ইয়ে হিন্দু হ্যায়, মুক্তি হ্যায়! —একথা শুনে আমি 'থ' খেয়ে গেলাম। এত দিন লোক মুখে শুনতাম এখন তা নিজের কানেই শুনছি। বাঙালি মানেই এদের কাছে হিন্দু!

পরে আমি মেজরকে আচ্ছা করে বোঝালাম আমি তাদেরকে চিনি, এরা হিন্দু না...। পরে অবশ্য এদেরকে মুক্তি দেয়।

আসলে ওরা আমাদের নিশ্চিহ্ন করে দিতে চেয়েছিল। পূর্ব পাকিস্তান সম্পর্কে ইয়াহিয়া বলেছিল, আমি মানুষ চাই না, ভূমি চাই।

এক জুমাবারের ঘটনা। কিশোরগঞ্জ শহরের পাশে বড়ইতলায় জুমা পড়ে বের হওয়ার পর পাকিস্তানি আর্মিরা নির্বিচারে গুলি করে মেরে ফেলে নিরীহ মুসল্লিদের। এসব নারকীয় হত্যাকাণ্ডের কারণে দিনের পর দিন আমি চরম মানসিক যন্ত্রণায় ভুগেছি। নির্যাতন, নিপীড়নমূলক কোনো কর্মকাণ্ডে আমার অংশগ্রহণ না দেখে আমাকেও তারা সন্দেহের চোখে দেখত। এসব কারণে সব সময় তটস্থ থাকতাম। আমাকে কয়েকবার টার্গেটও করেছিল। এ কারণে যুদ্ধের ন'মাস বোম্বিংয়ের ভয়ে বাসার সামনে ব্যাংকার তৈরি করে সবাইকে নিয়ে আশ্রয় নিতাম।

কত হিন্দু ফ্যামিলিকে পাকিস্তান আর্মি এবং রাজাকারদের হাত থেকে রক্ষা করেছি। তাদের আশ্রয় দিয়েছি। খেতে দিয়েছি। বিভিন্নভাবে সাহায্য করেছি। এডভোকেট গৌরাঙ্গ কিছুদিন আগেও কোর্টে বললেন, আমার বাবা প্রায়ই বলেন, আপনি না থাকলে ওই সময় আমরা মারা পড়তাম।

পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী তার কথায় কর্ণপাত করেনি

নেজামে ইসলাম পার্টির সভাপতি মাওলানা আত্হার আলী (রহঃ)-কে আমি জানিয়েছি যে, হুজুর যা চলছে এতে পাকিস্তান টিকবে না। আর আমরা পাকিস্তানের পক্ষে তো আছি বটেই কিন্তু ফলাফল এই হবে, হয় এটা ইন্ডিয়া হয়ে যাবে আর না হয় স্বাধীন একটা রাষ্ট্র হবে। যদি স্বাধীন রাষ্ট্র হয় তাহলে চিরদিনের জন্য আমরা এদেশের জনগণের বিরোধী অবস্থানে আছি একথাটা চিহ্নিত হয়ে যাবে এবং আমাদের ভবিষ্যৎ খুব খারাপ হবে। তখন আত্হার আলী (রহঃ) নিয়াজি, টিক্কা খান, রাও ফরমান আলীসহ তৎকালীন ক্ষমতাসীন অনেকের কাছেই চিঠি লিখেছিলেন– এভাবে নির্যাতন আর জ্বালাও-পোড়াও করে পাকিস্তানকে রক্ষা করা যাবে না। এই চিঠিগুলো আমি নিজে ড্রাফ্ট করতাম। কিন্তু পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী তখন তার কথায় কর্ণপাতও করেনি। উনি চাইতেন পাকিস্তান থাকুক, কিন্তু পাকিস্তান রক্ষার পদ্ধতিটাকে উনি পছন্দ করতেন না। একজন মানুষ বিদ্রোহী হয়ে গেলে তাকেই কন্ট্রোল করা যায় না। সেখানে একটা দেশকে কি করে রাখবে। আমাদের দেশের ন্যায্য দাবি-দাওয়া পূরণ না করে পাকিস্তানিরা আমাদেরকে বন্দুকের গুলির দ্বারা দমিয়ে রাখতে চেয়েছে– এটা দুনিয়াতে হয় না। এমন একটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ মাত্র ন'মাসে শেষ হলো কি করে। এ নিয়ে পুরো বিশ্ব অবাক। আসলে পাকিস্তানের নিপীড়নমূলক পদ্ধতির কারণেই এত দ্রুত বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে।

পিডিপি, মুসলিম লীগ, জামায়াত, নেজামে ইসলাম...

পিডিপি, মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলামী এবং নেজামে ইসলাম পার্টি এ দলগুলোর ভূমিকা সমান নয়। পূর্ব পাকিস্তান রক্ষায় পাকিস্তান সরকার গঠন করেছিল রাজাকার বাহিনী। মুসলিম লীগ, পিডিপি মিলে 'আল-শাম্স'। আর জামায়াতে ইসলামীর তৎকালীন ছাত্র সংগঠন 'ইসলামী ছাত্র সংঘ' করেছিল আল-বদর বাহিনী। এগুলোর কার্যক্রম ছিল পুরো দেশব্যাপী। আর মাওলানা আত্হার আলী (রহঃ) নেজামে ইসলাম পার্টির পক্ষ থেকে শুধু কিশোরগঞ্জের স্থানীয় লোকজনদের নিয়ে গঠন করেছিলেন 'মুজাহেদিনে ইসলাম' সংগঠন। এর উদ্দেশ্য ছিল কোনো মানুষ যেন অন্যায়ভাবে নিপীড়নের শিকার না হয়। আমার জানামতে ওনার কমিটি কাউকে মারেওনি এবং মারায়ওনি। এছাড়া অন্যান্য সংগঠনের শান্তি কমিটি নামে শান্তি বোঝা গেলেও তারা শান্তির সপক্ষে কোনো কাজই করেনি বরং পাকিস্তান রক্ষার জন্য যা যা করা দরকার ছিল সবই করেছে। আমি এসব সংগঠনের কোনোটিতে জড়িত ছিলাম না। অবশ্য মাওলানার সংগঠনের সঙ্গে জড়িত না হওয়াতে আমার কিছু সমস্যাও হয়েছিল।

হায়রে আলেম সমাজ!

পূর্ব পাকিস্তানের ওপর পশ্চিম পাকিস্তানিদের সীমাহীন শোষণ-বঞ্চনার পরেও তৎকালীন এদেশীয় আলেম-ওলামা ঢালাওভাবে পশ্চিম পাকিস্তানের পক্ষ নেয়ার কারণ কি এটি একটি বিরাট প্রশ্ন।

আলেম সমাজ ভেবেছিল, পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তান বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে এটা ভারতের অধীনে চলে যাবে। তারা মনে করেছে, জুলুম-শোষণের অধীনে থাকা ভালো পরাধীন হওয়া থেকে। এমনকি আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দও ভাবেনি, স্বাধীন হওয়ার পর ভারতীয় সৈন্যরা এদেশ ছেড়ে যাবে। স্বয়ং শেখ মুজিবও হয়তো কল্পনাও করেননি।

মাওলানা খানের সঙ্গে কথা বলার পুরো সময়টাতেই পাশে ছিলেন তার ছোট ছেলে কবি, গীতিকার মুহব্বির রহমান খান। মুহিব এ প্রজন্মের ছেলে হলেও ইতিহাসের অন্দরগলিতে তার ভালোই বিচরণ রয়েছে, বুঝা গেল। মাঝে মাঝে বাবার মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে উত্তর দিচ্ছিলেন বেশ পাণ্ডিত্য ভরেই। এক ফাঁকে মাওলানা খানকে বললাম, আহা! মুহিব এবং আমরা তো এ প্রজন্মেরই কিন্তু আমাদেরও যে রাজাকার গালি শুনতে হয়! মাওলানা খান স্বগতোক্তি করে বললেন, আমি তো আগেই বলেছি, তৎকালীন আলেম সমাজের বিতর্কিত ভূমিকার কারণে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে স্বাধীনতাবিরোধী বা রাজাকার গালি শুনতে হবে। এটা আমি আঁচ করতে পেরে বিভিন্ন ফোরামে প্রকাশ করতাম, আমরা পাক বাহিনীর জুলুমের পক্ষে থাকব না, আমরা জনগণের কাতারে থাকব। এতে যদি পাকিস্তান থাকে থাকবে আর না হয় অন্য কিছু হবে। আমাদের রাজাকার হওয়া, স্বাধীনতাবিরোধী আখ্যায়িত হওয়া এটা তো তখনকার ভুল চিন্তারই প্রতিফলন।

হেলিম মাওলানা বলতেন...

তারাকান্দির মাওলানা আবদুল হালিম হোসাইনী তিনি হেলিম মাওলানা হিসেবে পরিচিত। মজযুব ধরনের মানুষ ছিলেন, কুতুবের মতো ছিলেন। পীর হিসেবে এলাকায় তার ব্যাপক জনপ্রিয়তা ছিল। ভারতের মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানীর বিশেষ স্নেহধন্য মুরিদ ছিলেন। তাই নামের শেষে হোসাইনী ব্যবহার করতেন। যুদ্ধের সময় তার সঙ্গে আমার যোগাযোগ ছিল। তিনি প্রায়ই আমাদের বাসায় আসতেন এবং বলতেন, কি আরম্ভ হয়েছে, এগুলো কোনো কাজ হলো নাকি, কি করবা মাওলানা আতাউর রহমান...?

একবার আমাদের বাসা থেকে বের হয়ে শহিদী মসজিদে গিয়ে আসর নামাজ পড়ে সমবেত মুসল্লিদের উদ্দেশ্যে গরম একটা বক্তৃতা দিলেন। বললেন, আমরা কি অপরাধ করলাম, আমাদের পাকবাহিনী মারে, এদিকে মুক্তিবাহিনীও মারে...?

পাকুন্দিয়ায় তাঁর লঙ্গরখানায় যুদ্ধের ন'মাস মুক্তিবাহিনীরা থাকত, খেত।*

পাপের প্রায়শ্চিত্ত

মাওলানা খানের কথার ফুলঝুড়ি যেন আর শেষ হতে চায় না। দেশ থেকে দেশান্তরে কত প্রসঙ্গেরই না অবতারণা করলেন তিনি। সব কিছুই তার নখদর্পণে। পাকিস্তানের সাম্প্রতিক কিছু ঘটনার উল্লেখ করে বললেন, পাকিস্তানিদের সবই আছে, নেই শুধু একটা জিনিস– শান্তি। '৭১-এর ন'মাসের পাপের প্রায়শ্চিত্তই এখন তারা ভোগ করছে। আরো করবে...!

---

* তারাকান্দির পীর মাওলানা আবদুল হালিম হোসাইনী (হেলিম মাওলানা)-এর মুক্তিযুদ্ধকালীন ভূমিকা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা থাকবে এ গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে।



হুমায়ূন আহমেদ, পূর্বপুরুষদের এভাবে ভুলে যেতে নেই

বর্তমান প্রজেক্টটি হাতে নেয়ার পরেই আমার 'গোড়া' প্রকাশক বললেন, আনিসুল হকের 'মা' এবং হুমায়ূন আহমেদের 'জোছনা ও জননীর গল্প'-এ বিখ্যাত উপন্যাস দু'টি যেন পড়ে নেই। বললাম, এসবের খবর আপনিও রাখেন? এগুলো পড়েছেন বুঝি? তিনি বললেন, পড়িনি তবে আমার সামনেই এগুলোর হাজার হাজার কপি বিক্রি হতে দেখি। কি আছে এর ভেতর– মানুষ এত কিনে কেন?

'জোছনা ও জননীর গল্প' জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস। বিভিন্ন সাক্ষাৎকার, স্মৃতিকথায় ইতিমধ্যেই হুমায়ূন স্বীকার করেছেন এ গ্রন্থটিই তার জীবনের এ পর্যন্ত সেরা কাজ। শুধু এ কারণেই 'অবাঞ্ছিত' হুমায়ূনকে আমার এই বহু সাধনার কর্মে 'বাঞ্ছিত' কলমে উপস্থাপন করতে চেষ্টা করব। এর যুক্তি কার্যকরণ, ব্যাখ্যাও সঙ্গে সঙ্গে থাকবে। কারণ, মিসির আলির জন্মদাতার কাছে 'যুক্তি' জিনিসটা বড়ই মূল্যবান।

আমি জানি, আমার গিন্নির কালেকশান থেকে এ বই খুঁজে পাওয়া যাবে। ও সাংঘাতিক হুমায়ূন (-এর লেখার)-ভক্ত। হুমায়ূনের বই বেরুতে দেরি আর ওর সেটা পড়তে দেরি হয় না। একেবারে গোগ্রাসে গিলে ফেলে। এ নিয়ে মাঝেমধ্যে ওর সঙ্গে তর্ক বাধিয়ে ফেলি। বলি, এসব 'অগভীর সাহিত্য' পড়ে সময় নষ্ট করার কোনো মানে হয়?

ও বলে, কেমন?

: হুমায়ূন আর হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের মধ্যে অনেক দিক থেকেই মিল আছে। একজন ক্ষমতা ও অপরজন জনপ্রিয়তার শীর্ষে অবস্থান করেও নারী আসক্তিতে কেউ কারও চেয়ে পিছিয়ে নেই। পরকীয়া প্রেম তাও আবার নিজের মেয়ের বয়সীদের সঙ্গে। একজন বন্ধুর মেয়েকে অপরজন নিজের মেয়ের বান্ধবীকে বিয়ে করেছেন! ছিঃ, একেই বলে বয়সের ভিমরতি!

উভয়েই ধর্ম (ইসলাম)-কে পুঁজি করে 'ব্যবসা' করেন। অথচ ধর্ম কখনোই ব্যবসায়ী পণ্য হতে পারে না। তারপরও হরহামেশা আমাদের চারদিকে তাই হচ্ছে। এদিকটায় হুমায়ূনের চে' এরশাদই তুলনামূলক 'বেটার'। শুধু এই অর্থে যে, এরশাদ ধর্মানুরাগী সেজে জনগণকে আকৃষ্ট করতে চান। আর হুমায়ূন ধর্ম (নির্দিষ্ট করে শুধু ইসলাম)-কে কটাক্ষ করে পাঠককে মোহমুগ্ধ করেন।

– যেমন?

: তার এমন একটা রচনা দেখাতে পারবে যেখানে তিনি ইসলাম, মাওলানা-মৌলভীদের আক্রমণ করতে ছাড়েননি। তাহলে শুনো–

১. জুম্মা ঘরের ইমাম সাহেবের বিষয়ে একটা খুবই খারাপ কথা শুনেছি। সকালবেলা তিনি দুধ খান। হাসানের ছেলে রোজ সকালে তারে এক পোয়া দুধ দিয়া আসে। ছেলেটার বয়স আট-নয়। গত সোমবারে সে দুধ নিয়া গেছে। ইমাম সাহেব তখন ছেলের হাত ধইরা দরজা লাগায়ে দিল... ঘটনাটা কি ঘটল বুঝতে পারছ ডাক্তার?

– তেঁতুল বনে জোছনা : হুমায়ূন আহমেদ, পৃষ্ঠা : ২৩, তৃতীয় প্রকাশ, একুশে বইমেলা ২০০১, অন্য প্রকাশ।

২. গুজব শোনা যাচ্ছে– আজ জুম্মাঘরের ইমাম সাহেবকে নেংটা করে স্কুলের মাঠে চক্কর দেওয়ানো হবে। গুজবটা কেউ ঠিক বিশ্বাসও করতে পারছে না, আবার অবিশ্বাসও করতে পারছে না। চেয়ারম্যান সাহেব বিচিত্র সব কাণ্ড করেন। তার পক্ষে এ ধরনের শাস্তি দেয়া অসম্ভব না। আবার জুম্মাঘরের ইমাম সাহেবের মতো মানুষকে নেংটা করে কানে ধরে চক্কর দেওয়ানো হবে এটাও বিশ্বাসযোগ্য না। – ঐ : পৃষ্ঠা : ৪৫

৩. মৌলভী লোকটি তখনো চেয়ারে ঠিক আগের মতো বসে আছে। দোয়া-টোয়া পড়ছে হয়তো, তাঁর ঠোঁট কাঁপছে দ্রুত ভঙ্গিতে। বাবু ভাই কড়া গলায় বললো, কে আপনি?... আমি বললাম, 'উনি একজন কোরানে হাফেজ'। 'কোরানে হাফেজ? গোটা কোরান শরীফটা মুখস্থ করেছেন?' 'জি জনাব'। 'কি উদ্দেশ্যে করেছেন?' 'বিশেষ কোনো উদ্দেশ্যে করি নাই'।

বাবু ভাই বিরক্ত স্বরে বললেন, এক সময় এটার দরকার ছিল, মুখস্থ করে মনে রাখতে হত কিন্তু এখন আর দরকার নাই। কোরআন শরীফ পাওয়া যায়। বুঝলে?

– একা একা : হুমায়ূন আহমেদ, পৃষ্ঠা : ৪২, প্রথম প্রকাশ : ১৯৮৪, বিউটি বুক হাউস।

৪. একদিন খবরের কাগজে একটা বেশ রগরগে খবর ছাপা হলো। তের বৎসরের বালিকা পরিচারিকা ধর্ষণের দায়ে গৃহস্বামী গ্রেফতার। প্রথম পৃষ্ঠায় পুরো দুই কলাম জুড়ে খবর। অর্ধেক পড়বার পর আঁৎকে উঠতে হলো– গৃহস্বামী আমাদের ছোট ফুপা।

... ফুপার কিছুই হলো না। হবার কথাও না। ফুপাদের এতো টাকা পয়সা যে ওইসব ছোটখাট জিনিস তাদের স্পর্শ করতে পারে না, ফুপার সঙ্গে দেখা হলে দারুণ একটা অস্বস্তিকর ব্যাপার হবে এই ভেবে আমি এবং বাবু ভাই ধানমণ্ডি এলাকা দিয়ে যাওয়া আসাই বন্ধ করে দিলাম। এর পরপরই খবর পেলাম ছোট ফুপা নাকি মগবাজারের কোনো এক পীরের কাছে যাওয়া-আসা করছেন। – ঐ : পৃষ্ঠা : ৪৪-৪৫।

কি আরও শুনতে চাও?

: না বাবা, থাক।

হুমায়ূন কথা রাখেননি

২০০৪-এর শুরু থেকে হুমায়ূন পত্রিকার শিরোনাম হতে শুরু করেছেন নিয়মিতই। বিশেষ করে মাসিক, পাক্ষিক ও সাপ্তাহিকগুলো তাকে নিয়ে কভার স্টোরি ছাপতে

থাকে। কারণ একটাই– দীর্ঘদিনের লিভটুগেদার শেষে নিজের মেয়ের বান্ধবী অষ্টাদশী শাওনকে বউ করে ঘরে আনতে চান! এদিকে শাওনের পক্ষ থেকে শর্তারোপ করা হয়েছে তাদের কবুল বলার আগেই গুলতেকিনকে তালাক দিতে হবে। সবাইকে অবাক করে দিয়ে তাই করলেন হুমায়ূন। দীর্ঘ ২৮ বছরের সংসার জীবনের ইতি টানতে তালাকের নোটিশ পাঠিয়ে দিলেন। ৫ জুন স্ত্রীর কাছে পাঠানো তালাকের নোটিশে হুমায়ূন আহমেদ লিখেছেন, 'বিয়ের পর থেকেই তার সঙ্গে আমার বনিবনা হচ্ছিলো না। ভবিষ্যতেও কোনো দিন বনিবনা হওয়ার সম্ভাবনা না থাকায় অপারগ হয়ে আমি... দিলাম'।

এ নোটিশ গুলতেকিনের হাতে পৌঁছার পর আইনজীবীদের সঙ্গে হুমায়ূনের আচরণ সম্পর্কে বলতে গিয়ে বারবার তিনি চোখের পানি মুছতে থাকেন। ঘনিষ্ঠজনদের সঙ্গে আলাপকালে গুলতেকিন বলেছেন, ষোড়শী অবিবাহিত তরুণীদের ওপর বরাবরই হুমায়ূন আহমেদের প্রচণ্ড আসক্তি ছিল। এ বয়সি বেশ ক'জন মেয়ের সঙ্গে সম্পর্কের ব্যাপারে কোনো প্রতিবাদ করলেই হুমায়ূন আহমেদ তাকে নির্যাতন করতেন।

হুমায়ূন আহমেদ ও গুলতেকিনের বিয়ে হয় ১৯৭৬ সালে। হুমায়ূন তখন সবেমাত্র লেখক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছেন। তার একটা লেখা পড়ে স্কুলপড়ুয়া গুলতেকিন চিঠি লেখেন লেখক হুমায়ূন আহমেদের কাছে। এই চিঠি পড়ে লেখক পুলকিত বোধ করেন। পাল্টা জবাব দেন ভক্তের চিঠির প্রশংসা করে। এভাবে এক পর্যায়ে তাদের প্রেম জমে ওঠে। বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ শিক্ষক হুমায়ূন আহমেদ তখন গুলতেকিনকে বিয়ে করার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। এর ফাঁকে হুমায়ূন আহমেদ গুলতেকিনকে নিয়ে একটা বই প্রকাশ করে ফেলেন। তাতে আরও জমে ওঠে দু'জনের প্রেম। এক পর্যায়ে তাদের বিয়ে হয়ে যায় ধুমধাম করে। সেই থেকে গুলতেকিন উঠে আসে হুমায়ূন আহমেদের বইয়ের পাতায় পাতায়। হুমায়ূনভক্তদের কাছে সমভাবে জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন গুলতেকিন। তিন মেয়ে এক ছেলের আলো ভরা তাদের সংসার। সেই সংসারে ঝড় ওঠে অসমবয়সি মেয়েদের প্রতি হুমায়ূন আহমেদের আকর্ষণের কারণে। অবশ্য প্রথম দিকে সবাই গুলতেকিনকে বুঝাতেন, কবি-সাহিত্যিকদের এমন বাতিক থাকতেই পারে। এটা তেমন কিছু নয়, কিন্তু গুলতেকিনের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে দিয়ে হুমায়ূন আহমেদ সত্যি সত্যিই বেপরোয়া হয়ে ওঠেন। সুখের সংসারে আগুনের তাপ লাগতে শুরু করে বিয়ের দেড় যুগ পরেই।

হুমায়ূন কি তার শেকড়ে ফিরে আসছেন?

গুলতেকিনের কাছে তালাক নোটিশ পাঠিয়ে হুমায়ূন আহমেদ দৈনিকগুলোতে 'একটি মানবিক আবেদন' শিরোনামে একটি লেখা পাঠান। লেখাটি যত্নসহকারেই ছাপা হয় সব ক'টি দৈনিকে। সেই লেখাটির অংশবিশেষ—

"সম্প্রতি আমার জীবনে একটি দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটেছে। আমার এবং গুলতেকিনের দীর্ঘ বিবাহিত জীবনের ইতি চেয়ে আমি একটি আবেদনপত্র পাঠিয়েছি। যার সঙ্গে অতি আনন্দময় জীবনের শুরু করেছিলাম তার কাছে এমন একটি চিঠি পাঠানো যে কতো

বেদনাদায়ক তা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। সেই বেদনা সমগ্র পরিবারের বেদনা। সেই কষ্ট আমার, গুলতেকিনের এবং আমাদের পরিবারের সবার কষ্ট। আমার প্রিয়জনদেরও কষ্ট।

... আমাদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কোরআন শরীফে তালাক সম্পর্কে বলা হয়েছে, এটি আল্লাহ পাকের খুবই অপছন্দের একটি কাজ, কিন্তু বৈধ। আল্লাহ পাকের অপছন্দের কাজটি বৈধ করার কারণ হলো মাঝে মধ্যে এর প্রয়োজন হতে পারে। আমার এবং গুলতেকিনের অতি সুন্দর শুরু করা জীবনে এক সময় তিক্ততা এসে যায়। সম্পর্কের তিক্ততা এমন একটি জিনিস যা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কমে না। বাড়তেই থাকে, তিক্ততা এড়ানোর জন্য আমরা দু'জন আলাদা বাস করতে থাকি। দীর্ঘ চার বছর আমরা আলাদা বাস করেছি। আমি যতদূর জানি, দীর্ঘ সেপারেশনে বৈবাহিক সম্পর্ক ধর্মীয় মতে আপনাতেই শেষ হয়ে যায়।"

কেউ ভাববে এগুলো হুমায়ূনের বক্তব্য? যে হুমায়ূন তার সারাটা জীবন কাটিয়ে দিলেন ইসলামকে খোঁচা মেরে মেরে সেই তিনিই কিনা ইসলামের এত সুন্দর ব্যাখ্যা দিলেন। দুর্মুখেরা বলে— বিপদে পড়লে নাস্তিকও আল্লাহর নাম নিতে থাকে, এটাই স্বাভাবিক। হুমায়ূনও তাই করেছেন। বইয়ের পাতায় পাতায় যে মোল্লা-মৌলভীদের উলঙ্গ করে ছেড়েছেন শেষ পর্যন্ত তাদের কাছে গিয়েই তো তালাক কার্যকর করতে হলো। জীবনের শেষ কৃত্যটাও কি তাদের দিয়ে করাতে হবে না? তাহলে এদের পেছনে লেগে কী লাভ হুমায়ূন!

জীবনের ক'টা বছর আমেরিকা কাটিয়ে হুমায়ূন বাংলাদেশকেও আমেরিকা ভেবে বসেছেন— তার মূল ভুলটা এখানেই।

হুমায়ূনের 'জোছনা ও জননীর গল্প' পড়ে তো আমি অবাক। বহুবার তিনি স্বীকার করেছেন তার জীবনের সেরা কাজ এটি অথচ এ উপন্যাসের মূল নায়কই কিনা একজন সত্যিকার মাওলানা! উপন্যাস হলেও সত্য ঘটনা অবলম্বনেই লেখা— ভূমিকা ছাড়াও একথা ভিন্ন করে ফুটনোটে বলে দিয়েছেন হুমায়ূন। তাহলে হুমায়ূন কি তার শেকড়ে ফিরে আসছেন— উত্তর হয়ত হ্যাঁ, হয়তো না।

মুক্তিযোদ্ধা মাওলানা ইরতাজ উদ্দিন কাশেমপুরীর খোঁজে

'জোছনা ও জননীর গল্পে'র মূল নায়ক মাওলানা ইরতাজ উদ্দিন কাশেমপুরীর '৭১-এর ঘটনা উল্লেখ করতে গিয়ে হুমায়ূন লিখেন, "নেত্রকোনা অঞ্চলের এ সত্য ঘটনাটির সাক্ষী যে দর্জি সে গুলি খাওয়ার পরও প্রাণে বেঁচে যায়। আমি তার কাছ থেকেই গল্পটি শুনি।"

ভাবলাম, তাহলে অকুস্থল থেকেই ঘুরে আসা যায়। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের এই মহান বীরের স্মৃতিবিজড়িত নীলগঞ্জ বাজার, সোহাগী নদী, এক মিনারী মসজিদ, তার কবর, বাড়ি ক্যামেরাবন্দি করে আনতে হয়।

এই প্রথম একাই রওয়ানা হলাম ঢাকার বাইরে কোনো অ্যাসাইনমেন্টে। ফায়জুল. তাজুল ফাত্তাহদের ক্লাস থাকায় ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও তাদের কেউ আমার সঙ্গী হতে

পারলেন না। ঢাকা ছাড়ার আগে দৈনিক আমার দেশের বিভাগীয় সম্পাদক মুহাম্মদ শহীদুল্লাহকে ফোন দিলাম ডিটেলস্ ঠিকানাটা জেনে নিতে। 'নেত্রকোনায় নীলগঞ্জ নামে কোনো থানা আছে বলে আমার জানা নেই'— নেত্রকোনার ছেলে শহীদুল্লাহ যখন এই উত্তর করল তখন ভাবলাম, হুমায়ূন এখানেও তাহলে হেঁয়ালীর আশ্রয় নিয়েছেন! হায়রে হুমায়ূন!

নীলগঞ্জের পথে পথে

অগত্যা ফোন দিলাম কিশোরগঞ্জের সন্তান, দৈনিক ইনকিলাবের সহকারী সম্পাদক উবায়দুর রহমান খান নাদভীকে। নাদভী জানালেন, নীলগঞ্জ নেত্রকোনায় নয় বরং কিশোরগঞ্জেরই একটি এলাকা। তাদের কিশোরগঞ্জ শহরের বাসার পেছন থেকেই নীলগঞ্জের টেম্পো ছাড়ে।

সায়েদাবাদ থেকে 'ঈশা খাঁ'য় চড়ে সোজা চলে গেলাম কিশোরগঞ্জে। সেখান থেকে টেম্পোতে নীলগঞ্জ। নীলগঞ্জ বাজারে নেমে একে-ওকে জিজ্ঞেস করি। কেউ কিছু বলতে পারে না। নীলগঞ্জ বাজারের দক্ষিণে নরসুন্দা আর পুবে ধলেশ্বরী নদী আছে কিন্তু সোহাগী নদী নেই। একাধিক মসজিদ আছে, নেই এক মিনারী মসজিদ। দর্জির দোকান আছে কিন্তু এরকম কোনো দর্জি নেই। 'নীলগঞ্জ হাইস্কুল আছে তো?' একজন হোটেল ম্যানেজারকে জিজ্ঞেস করি। ম্যানেজার বলে তা আছে কিন্তু আপনি তো সেটা অনেক পেছনে ফেলে এসেছেন। এখান থেকে ৬-৭ টাকা রিকশা ভাড়া হবে। রিকশা নিয়ে সোজা চলে গেলাম নীলগঞ্জ হাইস্কুল। হাইস্কুলে এসে চার-পাঁচজন শিক্ষকের সঙ্গে কথা বললাম। অসীত কুমার পাল, ভারপ্রাপ্ত হেড মাস্টার, সন্তোষ পাল, মোকছেদ উদ্দিন, সিনিয়র শিক্ষক— তাদের কাছে জানতে চাইলাম ঘটনাটা সম্পর্কে। তারা প্রত্যেকেই অজ্ঞতা প্রকাশ করলেন। বললেন, '৭১-এ মনসুর কিংবা মাওলানা ইরতাজ উদ্দিন কাশেমপুরী নামের কেউ এ স্কুলের হেড মাস্টার কিংবা ধর্ম শিক্ষক ছিলেন না। তখন হেড মাস্টার ছিলেন বিনয় ভূষণ পাল— এখন রিটায়ার্ড। নীলগঞ্জ বাজারে তার লাইব্রেরি আছে, পেছনেই বাসা। আর ধর্ম শিক্ষক ছিলেন মাওলানা আবদুল অহেদ— ওই তো পাশের গ্রামে তার বাড়ি। মারা গেছেন কয়েক বছর হলো।

শেষ ভরসা '৭১-এর হেড মাস্টার বিনয় ভূষণ পাল। তাই নীলগঞ্জ বাজারে ফিরে এসে বিনয় বাবুকে খুঁজে বের করলাম। বাবুর কাছে জানতে চাইলাম আপনিই কি '৭১-এ নীলগঞ্জ হাই স্কুলের হেড মাস্টার ছিলেন? বললেন, হ্যাঁ, কিন্তু কেন বলুন তো?

: হুমায়ূন আহমেদকে চেনেন?

: ঔপন্যাসিক হুমায়ূন?

: হ্যাঁ।

: তার 'জোছনা ও জননীর গল্প' উপন্যাসটা পড়েছেন?

: না, পড়িনি তো।

: সেখানে তিনি ... এরকম একটা ঘটনা উল্লেখ করেছেন।

: হুমায়ূন বলেছেন নেত্রকোনার ঘটনা, কিন্তু নীলগঞ্জ তো এটাই. এটা তো কিশোরগঞ্জ. এখানে কাশিমপুর গ্রাম কিংবা সোহাগী নদীও নেই।

: তাহলে?

: আমার জানামতে সোহাগী নেত্রকোনার আঠারবাড়িতে আছে। সেখানে গিয়ে দেখতে পারেন।

কিশোরগঞ্জ শহরে ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা নেমে এসেছে। এখান থেকে আঠারবাড়ি সরাসরি কোনো বাস নেই। নান্দাইল চৌরাস্তা পর্যন্ত বাসে যাওয়া যাবে। এর পর ট্যাক্সি করে।

তাই করলাম।

আঠারবাড়ি পৌঁছতেই রাত দশটা বেজে গেল। ভাবলাম, বাকি রাতটা এখানে কাটিয়ে সকালেই বের হবো সোহাগী নদী আর মাওলানা কাশেমপুরীর খোঁজে। আঠারবাড়ি কোনো থানা না হলেও এর বিশালত্ব থানা শহরের চেয়ে কোনো অংশেই কম না। প্রাচীন বাজার। ব্রিটিশ আমলে হিন্দু রাজাদের জমিদারি ছিল এখানে। এখনও আশেপাশে জমিদার বাড়ি আছে কিন্তু জমিদার নেই। রক্তচোষা জমিদারদের জমিদারির অবসান ঘটেছে অনেককাল আগেই।

যখন শুনলাম আঠারবাড়িতে কোনো আবাসিক হোটেল নেই আমার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। খাবার প্লেটে হাতটা আটকে গেল রাত কাটানোর দুশ্চিন্তায়। বারোটার মধ্যেই হয়তো বাজার ভেঙে যাবে তারপর কি হবে আমার! হোটেল মালিক বললেন, আপনি কিছু না মনে করলে আমার চকিতেই রাতটা কাটিয়ে দিতে পারবেন। আপনি তো আমার ছেলের মতোই। আমার দু'ছেলে ঢাকার বড় কাটারা মাদরাসায় পড়ে। 'শাহী হোটেল'-এর মালিক তোতা মিয়া বাবুর্চিকে আল্লাহ সত্যি একটি শাহী মন দিয়েছেন। না হয় আমার মতো মুসাফিরদের আশ্রয় দিতেন কে?

থাকার ব্যবস্থা নিশ্চিত হওয়ায় ভাবলাম, ঢাকায় একটা ফোন লাগাই, হুমায়ূনের সঙ্গে যদি যোগাযোগ করা যায়। মাধ্যম মাহবুব ভাই। দীর্ঘদিন 'যুগান্তর'-এর টঙ্গী প্রতিনিধি ছিলেন। এখন 'আমার দেশে'-এ। হাউস বদল হলেও সম্পর্ক আছে আগের মতোই। হুমায়ূনের সঙ্গে মাহবুব ভাইয়ের সম্পর্ক খুব কাছের। ইতিমধ্যেই তার অনেক নাটকে তিনি অভিনয়ও করেছেন। মাহবুব ভাইয়ের সঙ্গে যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম টিএন্ডটি ফোন। তিনি কখনোই মোবাইল ব্যবহার করেন না। ফোনের দোকানে গিয়ে যোগাযোগ করলাম মাহবুব ভাইয়ের সঙ্গে। তিনি জানালেন, হুমায়ূনের সঙ্গে আপাতত তার সম্পর্ক ভালো যাচ্ছে না। তাই হুমায়ূনের একটা মোবাইল নম্বর দিয়ে বললেন, আমারই যোগাযোগ করতে হবে। সঙ্গে এও বললেন, ভাগ্য ভালো থাকলে পেতে পারি আবার নাও পেতে পারি। কয়েক দিন পরপরই তিনি 'সিম' চেঞ্জ করেন। শেষ পর্যন্ত মাহবুব ভাইয়ের আশঙ্কাই সত্য প্রমাণিত হলো। হুমায়ূনের মোবাইলে যতবারই রিং দিয়েছি ততবার উত্তর পেয়েছি 'এই মুহূর্তে মোবাইল সংযোগ দেয়া সম্ভব হচ্ছে না...।

টেলিফোন দোকানি আমার অস্থিরতা দেখে যেচে পড়ে আমার পরিচয় জিজ্ঞেস করলেন এবং নিজের পরিচয় দিলেন—

তাপস কুমার পাল, আঞ্চলিক প্রতিনিধি (আঠারবাড়ি) দৈনিক জাহান, ময়মনসিংহ।

প্রথমেই হুমায়ূনকে একচোট নিলেন। বললেন, শুনি, বয়স হলে মানুষের স্বভাব চেঞ্জ হয়, ওর স্বভাব আর চেঞ্জ হলো না। হেঁয়ালীপনা ওর অস্থিমজ্জায় মিশে গেছে। তার এক উপন্যাসে 'আঠারবাড়ি'কে খুব খারাপভাবে উপস্থাপন করায় 'চন্দ্রকথা' নাটকের শুটিং করতে এসে চরমভাবে লাঞ্ছিত হয়।

তাপস বাবু জানালেন, সোহাগী কোনো নদী নয় এটা একটা জায়গার নাম। আঠারবাড়ি থেকে অনেক দূর। জিপ গাড়িতে জনপ্রতি দশ টাকা করে ভাড়া হবে। সেখানে গিয়ে দেখতে পারেন।

ঢাকা ছাড়ার সময় শহীদুল্লাহ নেত্রকোনা প্রেসক্লাবের সেক্রেটারি সেলিম ভাই এবং ইত্তেফাক প্রতিনিধি শ্যামল দার নম্বর দিয়েছিলেন— প্রয়োজনে যেন তাদের সঙ্গেও যোগাযোগ করি। এই বিপদে মনে পড়ল নেত্রকোনার এই দুই সাংবাদিকের কথা। স্থানীয় সাংবাদিক হিসেবে সবকিছুই তো তাদের নখদর্পণে থাকার কথা।

হুমায়ূনের নাম শুনেই দুই সাংবাদিক যেন তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন। অশ্রাব্য ভাষায় তাকে গালাগাল করলেন। বললেন, আপনার মতো এমন অনেককেই সে বিভ্রান্তিতে ফেলেছে। মানুষকে এভাবে কষ্ট দেয়ার কোনো মানে হয়?

জিপ থেকে সোহাগী বাজারে নেমেই নজরে পড়ল একটি এক মিনারী মসজিদ। মনটা খুশিতে নেচে উঠল। তাহলে কি পেয়ে গেছি কাঙ্ক্ষিত সেই কাশেমপুরীকে। এক বুক আশা নিয়ে ঢুকে পড়লাম এক মিনারী মসজিদে। ইমাম সাহেবকে জিজ্ঞেস করলাম '৭১-এ এ মসজিদের ইমাম কে ছিলেন? তিনি আমাকে হতাশ করে বললেন, মসজিদই তো প্রতিষ্ঠা হয়েছে পাঁচ-সাত বছর হলো। কুয়েতের অর্থায়নে নির্মিত মসজিদগুলো সাধারণত এক মিনারীই হয়ে থাকে। এটার নাম সোহাগী জামে মসজিদ।

কথা হয় সোহাগী ইউনিয়ন উচ্চ বিদ্যালয়ের বাংলার শিক্ষক জহির উদ্দিনের সঙ্গে। জহির উদ্দিন আমাকে হাত ধরে চায়ের দোকানে নিয়ে এলেন। চা-বিস্কুট আপ্যায়ন করার ফাঁকে ফাঁকে বললেন, হুমায়ূন তার অনেক উপন্যাসেই সোহাগীকে এনেছেন, আমিও যেন আমার গ্রন্থে তাদের এ 'বিখ্যাত' জায়গাটাকে উপস্থাপন করতে না ভুলি।

শিক্ষক মহোদয়কে জিজ্ঞেস করলাম, এখানে কি সোহাগী নদী আছে?

: সোহাগী তো জায়গার নাম, নদী আছে— কাঁচামাটিয়া নদী।

— আচ্ছা, আপনি কি হুমায়ূনের বাড়ি চেনেন?

: হুমায়ূনের বাড়ি কেন্দুয়া। এখান থেকে জিপে করে ষাটপুর (সাহিতপুর) যান। সেখান থেকে রিকশায় বঙ্গবাজার নেমে যে কাউকে জিজ্ঞেস করলেই তার বাড়ি দেখিয়ে দেবে।

মৌলভী বাড়ি না হুমায়ূনের বাড়ি?

সোহাগী থেকে জিপে করে ষাটপুর আসতেই প্রায় ঘণ্টা দুয়েক লেগে গেল। ষাটপুর থেকে চল্লিশ টাকায় রিকশা নিলাম বঙ্গবাজার। রিকশা ভাড়া চল্লিশ টাকা শুনে ভাবলাম,


হুমায়ূন আহমেদের দাদা মৌলভী আজিম উদ্দিন আহমেদের কবর

অপরিচিত যাত্রী হওয়াতেই কি এত টাকা হাঁকালো রিকশা ড্রাইভাররা। তাই ওদের উদ্দেশ্যে করে বললাম, তোমাদের এলাকায় মেহমান হিসেবে আসাতেই কি এ প্রতিদান? ওদের সম্মিলিত উত্তর— এক টাকাও বেশি বলিনি, জনাব। গেলেই বুঝবেন।

অগত্যা উঠে বসলাম রিকশায়, বড় রাস্তা বেয়ে ইটের খোয়া বিছানো পথ দিয়ে মাইল তিনেক এগুতেই শুরু হলো মেঠো পথ। রাস্তার দু'পাশে মানুষের ঘর-বাড়ি। অনেক বাড়ির উঠানের মাঝ দিয়ে রাস্তা চলে গেছে সামনের দিকে। খানা-খন্দে ভরা রাস্তা। কোথাওবা সদ্য ধান নেয়া খড়কুটো বিছানো। এভাবে এক সময় গিয়ে বঙ্গবাজারে পৌঁছলাম। হাতেগোনা কয়েকটি দোকান নিয়ে এ বাজার। কেন্দুয়া থেকে একটা পিচ ঢালা রাস্তা বঙ্গবাজারে এসে মিলেছে। আরেকটা চলে গেছে উত্তর দিকে। এ পথ দিয়েই হুমায়ূনদের বাড়ি যায়। এ রাস্তার মাথায় 'মাইলস্টোনে' লেখা 'শহীদ ফয়জুর রহমান সড়ক'। দু'একজনকে জিজ্ঞেস করলাম, হুমায়ূন আহমেদের বাড়িটা কোথায়? তারা বলে উঠলেন, মৌলভী বাড়ি? সোজা এ রাস্তার মাথায় চলে যান।

: মৌলভী বাড়ি নয় হুমায়ূন আহমেদের বাড়ি?

: ওই একই কথা, হুমায়ূন ক'দিনের লোক? তার দাদার আমল থেকে এটা মৌলভী বাড়ি হিসেবে পরিচিত।

মৌলভী আজিম উদ্দিন আহমেদের কবরের পাশে

শহীদ ফয়জুর রহমান সড়কের মাথায় গিয়ে মৌলভী বাড়ির কথা জিজ্ঞেস করতেই এক লোক পথ দেখিয়ে নিয়ে চললেন আমাকে। পথের ডান পাশে একটা জোড়া কবর দেখিয়ে বললেন, এটাই মৌলভী বাড়ির মৌলভী সাহেবের কবর। পাশেরটা তাঁর স্ত্রীর।

এপিটাফে লেখা–

মৌলভী আজিম উদ্দিন আহমেদ
জন্ম : ১৮৬৬ ইংরেজি
মৃত্যু : ৪ মে ১৯৭১

ফাতেমা আক্তার খাতুন
জন্ম : ১৮৯৭ ইংরেজি
মৃত্যু : ১৯ মার্চ ১৯৮৭
চার 'কুল' পড়ে মৃতের জন্য দোয়া করলাম। এরপর সামনে এগিয়ে চললাম।

মৌলভী বাড়িতে এক দুপুর

হাতের বাম পাশে পুকুর। ডান পাশে বাড়ি। বাড়িতে গিয়ে উঠলাম। একটু পরেই ভেতর বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন হুমায়ূনের চাচা আলতাফুর রহমান আহমেদ। লুঙ্গি, পাঞ্জাবি ও টুপি পরা। দাড়ি বুক পর্যন্ত ঝুলে আছে। চুল, দাড়ি, ভ্রূ পেকে ধবধবে সাদা হয়ে আছে। তাঁর পুরো অবয়বেই শুভ্রতার পবিত্র ছাপ। তার সঙ্গে পরিচিত হলাম। ঢাকা থেকে এসেছি শুনে ঘরের ভেতরে নিয়ে বসালেন। পানি আনালেন। চা-বিস্কুট দিলেন। খেলাম। গল্প করলাম প্রাণভরে।

ইতিহাসের ইতিহাস

আমার উদ্দেশ্যের কথা জানালাম। একরাশ বিস্ময় নিয়েই আলতাফুর রহমান বললেন, শুধু এ কারণে আপনি ঢাকা থেকে এতটা পথ পাড়ি দিয়ে এ পর্যন্ত এসেছেন, এটা কোনো কাজ করেছেন?

কিন্তু মাওলানা কাশেমপুরীর স্মৃতি বিজড়িত এলাকাটার সন্ধান পাওয়া যে আমার জন্য খুবই জরুরি হয়ে পড়েছে। বলতে পারবেন কি তাঁর এলাকাটা কোথায়?

: (বিরক্তি ভাব প্রকাশ করে) ঠিকানাটা খুব বিদঘুটে মনে হচ্ছে। কোথায় নীলগঞ্জ, কোথায় সোহাগী। কাশেমপুর গ্রামটাইবা কোথায়? ও যে আসলে কি কাজ করে।

— আচ্ছা, আপনাদের ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ডটা একটু বলবেন কি? আপনার বাবা, মানে হুমায়ূন, জাফর ইকবালদের দাদা একজন নামকরা মৌলভী ছিলেন এটা তো খুবই চমকপ্রদ তথ্য, '৭১-এ তো হুমায়ূনের বাবা, পুলিশ ইন্সপেক্টর ফয়জুর রহমান আহমেদ বর্বর পাকিস্তানিদের হাতে শহীদ হন কিন্তু সে সময়টাতে আপনার বাবার ভূমিকা কি ছিল— যেহেতু উনি একজন মৌলভী ছিলেন ...।

: আমার বাবার নাম মৌলভী আজিম উদ্দিন আহমেদ। চার ভাইয়ের মধ্যে তিনি সবার বড় ছিলেন। ঢাকার নবাববাড়ি বড় কাটারা (সার্টিফিকেটে লেখা কোলকাতা আলিয়া মাদরাসা— এটাই সত্য) থেকে মাওলানা হন। টাঙ্গাইলের ভূঞাপুর হাইস্কুলের ধর্ম শিক্ষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। প্রিন্সিপাল ইব্রাহিম খাঁ ও আলিম খাঁ তাঁর ছাত্র ছিলেন। এরপর দীর্ঘদিন কেন্দুয়া সান্দিকোনা হাইস্কুলে হেড মাওলানা হিসেবে ছিলেন। কেন্দুয়া রোয়াইল বাড়ি এবং নান্দাইল নিভিয়া ঘাটা সিনিয়র মাদরাসার সুপারিন্টেনডেন্ট

১

EAST BEN AL AND ASSAM DRASAH MINATION OL COURSE.

No. 64

Calcutta:

The 3rd November 1913.

Azimuddin

has passed the Madrasah Standard in Arabic and Per n Literature and Muhammadan Law in the Course at the Annual Examination held in April 1913 and that he has been placed in the Division.

Registrar, Central Bd of Examiners, Bengal Madrasahs.

Director of Public Instruction.

২

৩

السياسة

৪

কুতুবপুর জুনিয়ার [redacted]

বহির নম্বর—
ক্রমিক নম্বর—
চাঁদাদাতার নাম শ্রীযুক্ত সাহেব
সাং পোঃ
অদ্য আপনার নিকট হইতে ১৩২ সনের মাসের
বাবদে টাকা সাহায্য
বাবদ বুঝিয়া পাইয়া অত্র রশিদ দিলাম। ইতি সন ১৩২ তারিখ
আদায়কারী মেম্বরের দস্তখত—

কুতুবপুর জুনিয়ার মাদ্রাসা।

বহির নম্বর—
ক্রমিক নম্বর—
চাঁদাদাতার নাম শ্রীযুক্ত সাহেব
সাং পোঃ
অদ্য আপনার নিকট হইতে ১৩২ সনের মাসের
বাবদে টাকা সাহায্য
বাবদ বুঝিয়া পাইয়া অত্র রশিদ দিলাম। ইতি সন ১৩২ তারিখ
আদায়কারী মেম্বরের দস্তখত—

১. হুমায়ূন আহমেদের দাদার মৌলভী পাসের সার্টিফিকেট। ২. দাদার কাছে লেখা হুমায়ূন আহমেদের বাবার চিঠি। ৩. হুমায়ূন আহমেদের দাদার পঠিত কিতাব। ৪. হুমায়ূন আহমেদের দাদার প্রতিষ্ঠিত মাদরাসার চাঁদা আদায়ের রশিদ

ছিলেন। সেখান থেকে চলে এসে বাড়ির কাছে কলমহাট প্রাইমারি স্কুলে ২০ টাকা বেতনে সাধারণ শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। শেষ জীবনে বাড়িতে চলে আসেন এবং বাড়ির পাশে কুতুবপুর জুনিয়র মাদরাসাা এবং একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন। এখন শুধু মসজিদটা আছে। মাদরাসাটা ধ্বংস হয়ে গেছে।

আব্বা 'ফারায়েজ— জমিজমার হিসেব' খুব ভালো বুঝতেন। তাই দেখা গেছে শেরেবাংলা একে ফজলুল হক যখন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হন তখন দেশজুড়ে যে ঋণ সালিশী বোর্ড গঠন করেন আমাদের রোওয়াইল বাড়ি-আমতলা ইউনিয়নের ঋণ সালিশী বোর্ডের চেয়ারম্যান বানান তাঁকে।

হিন্দুরা মুসলমানদের ঋণ দিয়ে তার বিনিময়ে জায়গা লিখে নিতেন— এ নিয়ে উভয় পক্ষে মারামারি লেগে যেত। এর প্রতিকারার্থেই এ বোর্ড গঠন করা হয়েছিল। তিনি একাধিক ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। আরবি, ফার্সি, উর্দু, ইংরেজি ও বাংলায় অর্নগল কথা বলতে পারতেন। আমাদের নেত্রকোনা অঞ্চলে তিনি খুব নামকরা আলেম ছিলেন। আমার বাবার ঘরে আমরা মোট ৫ ভাই ছিলাম।

১. ফয়জুর রহমান আহমেদ
২. হাবিবুর রহমান আহমেদ
৩. আজিজুর রহমান আহমেদ
৪. আলতাফুর রহমান আহমেদ ও
৫. এরশাদুজ্জামান আহমেদ।

বাচ্চুর (হুমায়ূনের ডাক নাম) বাবাসহ ইতিমধ্যে আমাদের দু'ভাই মারা গেছেন।

'৭১-এ আমার বাবা ছিলেন মজলুমের পক্ষে। যদিও তিনি মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার দেড় মাসের মাথায়ই মারা গেছেন— ৪ মে তিনি ইন্তেকাল করেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পরপরই তার বড় ছেলে হুমায়ূনের বাবা নিরুদ্দেশ হয়ে যান। এ চিন্তায় তিনি আরও ভেঙে পড়েন। তিনি বেঁচে থাকতেই অনেক দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ আমাদের বাড়িতে এসে আশ্রয় নিয়েছিল। সেই নান্দাইল চৌরাস্তা থেকে মানুষ ফ্যামিলি, গরু-বাছুর নিয়ে আশ্রয় নিয়েছে আমাদের বাড়িতে। আব্বা তাদের জায়গা দিয়েছেন, খেতে দিয়েছেন, ঘুমুতে দিয়েছেন। পাঞ্জাবিরা অনেক দূরের রেললাইন দিয়ে চলাচল করেছে। গ্রামের এত ভেতরে আসেনি। মানুষ এ আশায়ই আমাদের বাড়িতে আশ্রয় নিত যে, মৌলভী সাহেব উর্দু-ইংরেজিতে তাদের সঙ্গে কথা বলতে পারবেন।

যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে হুমায়ূনরা তাঁর বাবার সঙ্গে বরিশালে ছিলেন। হুমায়ূনের বাবা নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়ার পর বরিশাল থেকে আমাদের বাড়িতে একটা চিঠি আসে আব্বার কাছে। বরিশাল হাসপাতালের প্যাডে কাঁচা হাতের লেখা—

"আপনার ছেলে কোথায় আছে আমরা জানি না। তার জন্য এবং আমাদের জন্য দোয়া করবেন।

ইতি

আপনার বউ মা"

এ চিঠি পেয়ে আব্বা আমার মেজ ভাই হাবিবুর রহমানকে দিয়ে হুমায়ূনের নানার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। পাকিস্তানিরা পুল-কালভার্ট ভেঙে ফেলায় প্রায় ১০০ কিলোমিটার পথ পায়ে হেঁটে মোহনগঞ্জে হুমায়ূনের নানা বাড়িতে গিয়ে পৌছেন। সেখানে গিয়ে জানতে পারেন তার নানার কাছেও একই চিঠি পাঠিয়েছেন। নিচে শুধু লেখা 'ইতি আপনার মেয়ে'।

হুমায়ূনের নানা আবুল হোসেন শেখ মুসলিম লীগ করতেন। তিনি আজীবন স্থানীয় চেয়ারম্যান, মোহনগঞ্জ হাইস্কুল ও কলেজের সভাপতি ছিলেন। এলাকায় তার বিশাল প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল। '৭১-এ তার ভূমিকা ছিল পাকিস্তানের পক্ষে। তাই হুমায়ূনের মায়ের চিঠি পেয়ে তিনি স্থানীয় বিহারিদের নিয়ে বরিশাল থেকে তাদের সবাইকে মোহনগঞ্জ নিয়ে আসেন। দেশ স্বাধীন হওয়া পর্যন্ত তারা তাদের নানা বাড়িতেই ছিলেন।

তার নানা সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর টিক্কা খানের কাছে দরখাস্ত লিখলেন, তার জামাই ফয়জুর রহমান আহমেদ কোথায় আছেন জানানোর জন্য। মে মাসে আব্বা মারা যাওয়ার পর হুমায়ূন আর জাফর ইকবাল তার দাদার জানাজায় এসেছিল। তখন এখানে তারা দু'তিনদিন ছিল।

৮ ডিসেম্বর মুক্তিবাহিনীর হাতে মোহনগঞ্জ মুক্ত দিবসে নিহত হয় হুমায়ূনের নানা। স্থানীয় শত্রুতার কারণে তাকে এবং তার দ্বিতীয় ছেলে নজরুল ইসলাম শেখকে মুক্তিযোদ্ধারা তাদের বাড়ির পাশের নদীর পাড়ে নিয়ে গুলি করে মেরে ফেলে। মূলত তিনি ভিলেজ পলিটিক্সের শিকার হয়ে স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে নিহত হন।

তার নানাকে মারার জন্য যখন মুক্তিযোদ্ধারা ধরে নিয়ে যায় তখন হুমায়ূনের মাকে (ভাই-বোনের মধ্যে তিনি সবার বড় ছিলেন) বললেন, আমার যত বিষয়সম্পত্তি আছে সব তোমার ছেলে-মেয়েদের দিয়ে গেলাম। আর এ চিঠিটি রাখো, এক মাস পর খুলবে, তখন সব জানতে পারবে।

এক মাস পর খুলে দেখেন তাতে লেখা— 'শুট ডেড ফ্রম টিক্কা খান'।

আমাদের কথার ফাঁকে আলতাফুর রহমান সাহেবের ছোট ছেলে হুমায়ূন, জাফর ইকবালের চাচাতো ভাই তাকবির আহমেদ অপু কাঁধে বইয়ের ব্যাগ নিয়ে সালাম দিয়ে ঘরে ঢুকল। পাজমা, পাঞ্জাবি ও টুপি পরা অপু বাড়ির পাশের মাদরাসায় দাখিল নবম শ্রেণীতে পড়ে। তার পড়ার টেবিলে হুমায়ূন-জাফর ইকবালদের বই সাজানো। তাকে ছোট্ট একটি প্রশ্ন করলাম, বড় হয়ে তুমি কি চাচাতো ভাইদের মতো বিখ্যাত লেখক হতে চাও? পনের-ষোল বছরের এই কিশোরের সরল উত্তর — না, আমি আলেম হতে চাই!

চেপে রাখা ইতিহাস

হুমায়ূনের চাচা আলতাফুর রহমান আহমেদের কাছ থেকে বিদায় নেয়ার আগ মুহূর্তে তার কাছে জানতে চাইলাম– আপনার বাবার কোনো স্মৃতিচিহ্ন আছে কি যা আমার

কাজে আসতে পারে? বললেন, হ্যাঁ, অনেক কিছুই আছে— বাবার মাওলানা হওয়ার সার্টিফিকেট, উর্দু-আরবি-ফার্সি কিতাব, হাতের লেখা চিঠি, দলিল-দস্তাবেজ। তবে কোথায় আছে খুঁজে দেখতে হবে। বললাম, ঠিক আছে আপনি সেগুলো খুঁজে বের করুন। আমি অপেক্ষা করছি। ২০-২৫ মিনিট পরে আলতাফুর রহমান সাহেব রশি দিয়ে বাঁধা একটি মোটা প্যাকেট নিয়ে এলেন। প্যাকেটের ওপর বালির পুরো আস্তরন। খুব সতর্কভাবে প্যাকেটটি খুললেন। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জন্য খুলে গেল অনেক চেপে রাখা ইতিহাসও। সত্যি, কি নেই এই প্যাকেটে! কয়েকটি দুর্লভ উর্দু-আরবি কিতাব, উর্দু, ফার্সি, আরবি, বাংলা ও ইংরেজিতে লেখা প্রচুর চিঠিপত্র, মাওলানা পাসের সার্টিফিকেট, নিজের প্রতিষ্ঠিত কুতুবপুর জুনিয়র মাদরাসাার চাঁদা আদায়ের রশিদ বই ...! আহা! ইতিহাসের এ অমূল্য সম্পদগুলো উইপোকায় কেটে অনেক কিছুই গায়েব করে ফেলেছে। থিসিসের বিষয় নিজের ঘরে রেখে হুমায়ূন ও জাফর ইকবালরা সুদূর আমেরিকা থেকে যে 'ডক্টরেট ডিগ্রি' এনেছেন তা কি এর চেয়েও মহামূল্যবান? বিশ্বাস হয় না।

চিঠি দিও পত্র দিও

দাদার কাছে লেখা হুমায়ূনের বাবা-মায়ের দুটি চিঠি—

কান্দিরপাড়
কুমিল্লা টাউন
২৪/৩

বাবাজান

সালাম ও কদমবুছি গ্রহণ করুন। গতকাল আলতুর টেলিগ্রাম পেয়ে নিজে রওয়ানা হতে পারিনি। বাচ্চুর মাকে বাচ্চুসহ পাঠিয়েছি। আজ ইসহাক সাবের টেলিগ্রাম পেয়ে জানতে পেরেছি— একটু ভালো। অসুস্থতার কারণ এবং বর্তমান অবস্থা কেমন লিখতে বলবেন। চাকুরির খাতিরে আসতে পারিনি। কত দুশ্চিন্তায় দিন কাটাচ্ছি খোদাই জানেন। তিনিই জানেন কি হবে। ... (উইপোকায় কেটে ফেলায় উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি) খবরটা যদি পেতাম।... (ঐ) এতো দূর থেকে চোখের পানিতে বুক ভাসানো ছাড়া উপায় কি?

খোদার কাছে আপনার আশু রোগ মুক্তি কামনা করছি। ভোরে ছদকাও আদায় করেছি— জানি না ললাটের কি লিখন।

আপনারই
ফয়েজ
কুমিল্লা
১৯/৩

পাক জনাবেষু

আব্বা আমার হাজার সালাম কদমবুছি জানিবেন। অনেক দিন আপনার খেদমতে চিঠি দিতে পারি নাই। সেজন্য ক্ষমা করিবেন। এখানে আমার সংবাদ আলতুর কাছে পাইয়া

থাকিবেন। ঈদে কোনো রকমে একটা খাসি কোরবানি করবেন। টাকা পয়সার খুব ঝামেলা আছে। এখনও মালপত্র আসে নাই। তাই খুব অসুবিধার ভিতর দিয়ে দিন যাইতেছে। জায়গাটা ভালোই মনে হইতেছে। শিখু-শাহীন এখনও ভর্তি হয় নাই। তার আব্বার শুধু মফঃসলেই থাকতে হইতেছে। আপনি কি কোরবানি করেছিলেন? অন্য সবাই আসিয়াছিল কিনা জানাবেন। হোছনা ও ছোট খোকা কেমন আছে জানাবেন। ঈদে আপনাদের কথাই বারবার মনে পড়েছে। ছেলে-মেয়েরা খুবই মনমরা হয়ে রয়েছে। ঈদের দিন তাদের পরিচিত কেউ নাই। শেফু-ইকবাল পড়াশুনা করিতেছে। বদলিটায় ওদের পড়ার খুব ক্ষতি হয়েছে। ওদের জন্য দোয়া করবেন। আপনার দোয়াই ওদের সম্বল। আল্লাহ চাহে তো ৩০/৩ তারিখ এখান থেকে বগুড়া রওয়ানা হবো। শিখু ও শাহিনকে আনুর বাসায় রেখে যাব। আপাততঃ তাই মত হয়েছে। ওদের উৎসাহ দিয়ে আপনি চিঠি দিবেন। এপ্রিলের ৪/৪ তারিখ ওদের পরীক্ষা আরম্ভ হবে। বাসায় এখনও কোনো চাকর পাই না। খুব ঝামেলায় আছি। বাচ্চুর পরীক্ষা মে মাসে। সে আপনার কথা শুনে। তাকে বুঝায়ে পত্র দেন। যাতে মনোযোগ দিয়ে পড়াশুনা করে পরীক্ষা দেয়। আর যাতে নামাজ পড়ে সে জন্য উপদেশ দেন। আপনার ও আম্মার বর্তমান অবস্থা জানাবেন। আম্মার খেদমতে সালাম দিবেন। ফরহাদরা কেমন আছে তাহাদিগকে আমার স্নেহ দিবেন। পত্রের ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করিবেন। এখানে সবাই ভালো আছে। আপনাদের কুশল চাই।

আরজ ইতি
আপনার স্নেহের
আয়েশা

মাদরাসাটি হারিয়ে গেল!

এরই মধ্যে আমাদের কাছে এসে উপস্থিত হয়েছেন হুমায়ূনের কেয়ারটেকার মজিবর রহমান। বেঁটে-খাটো, শ্যামবর্ণ, মুখে হালকা দাড়ি। লুঙ্গি-পাঞ্জাবি পরা, মধ্য বয়সি। একগাল হেসে বললেন, আরে চার-পাঁচ ঘণ্টা হয়ে গেল আপনি আমাদের এলাকায় এসেছেন এখনও যে আপনার সঙ্গে দেখাই হলো না। চলেন হুমায়ূন স্যারের এলাকাটা আপনাকে ঘুরিয়ে দেখাই। বিদায় বেলা হুমায়ূনদের বাড়ির কিছু ছবি নিলাম। আলতাফুর রহমান সাহেবের সঙ্গে আমার কয়েকটি ছবি উঠালাম। তার মোবাইল নম্বর নিলাম। পরম আতিথেয়তায় বিদায় নিলাম তাঁর কাছ থেকে।

মুজিবর রহমান একে একে ঘুরে দেখালেন হুমায়ূনের 'কীর্তি'গুলো। প্রায় এক কোটি টাকা খরচ করে হুমায়ূন তার এলাকায় 'শহীদ স্মৃতি বিদ্যাপীঠ' নামে একটি স্কুল করেছেন। এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন অভিনেতা আসাদুজ্জামান নূর। কয়েক একর জায়গা নিয়ে এটি করেছেন। স্কুল মাঠের এক কোনায় '৭১-এর চার শহীদ (হুমায়ূনের বাবাসহ স্থানীয় তিনজন)-এর নামে 'শহীদ স্মৃতি ফলক' গড়েছেন। স্মৃতি ফলক উন্মোচন করেন প্রয়াত কবি শামসুর রাহমান। স্কুলটির নির্মাণ কাজ অনেক আগেই শেষ হয়েছে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এর সিলেবাস প্রণীত হবে। কিন্তু সরকার এখনও অনুমোদন দিচ্ছে

না — জানালেন কেয়ারটেকার মজিবুর রহমান। স্কুলটির পাশেই একটা ডাকঘর করেছেন। ডাকঘরের পরিচালক কেয়ারটেকার মজিবুর রহমান নিজেই।

হুমায়ূনের দাদার প্রতিষ্ঠিত কুতুবপুর জামে মসজিদটি দেখালেন। পাঁচ-সাত বছর আগে এর সংস্কার করা হয়েছে। হুমায়ূন নিজের টাকায় মসজিদটির ফ্লোর মোজাইক করে দিয়েছেন। কিন্তু দাদার প্রতিষ্ঠিত কুতুবপুর জুনিয়র মাদরাসাটি কোথায় গেল? আমতা আমতা করে মুজিবুর রহমান বললেন, ওটা ইতিহাসের গহ্বরে হারিয়ে গেছে অনেক আগেই!

হুমায়ূনের সাংবাদিকভীতি

কেয়ারটেকার-এর কাছ থেকে হুমায়ূনের 'লেটেস্ট' মোবাইল নম্বরটি সংগ্রহ করে সরাসরি ফোন দিলাম তার মোবাইলে। অপর প্রান্ত থেকে একটি নারী কণ্ঠ ভেসে এলো। পরিচয় জানতে চাইলে বললেন, তিনি শাওন। 'হুমায়ূন স্যারকে একটু দেয়া যাবে?'— 'তিনি সিঙ্গাপুর গেছেন, তার মাকে নিয়ে চিকিৎসার জন্য, তিনদিন পরে ফিরবেন' এই বলে মোবাইল কেটে দিলেন।

ঢাকায় ফিরে এক সপ্তাহ পর আবার রিং দিলাম হুমায়ূনের নম্বরে। এবার মনে হয় হুমায়ূনই ধরলেন কিন্তু পরিচয় দিতেই বললেন, এটা রং নম্বর।

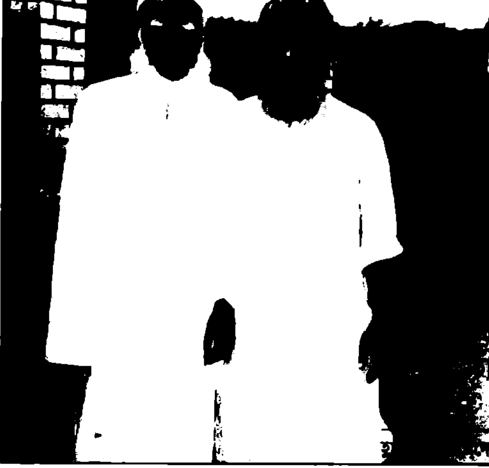
হুমায়ূনের সাংবাদিকভীতি সম্পর্কে আমার আগে থেকেই জানাছিল। তিনি সব সময়ই সাংবাদিকদের এড়িয়ে চলেন। সাধারণত অপরাধীরাই এমন করে। হুমায়ূন, আপনিও কি অপরাধী। বুকে হাত দিয়ে নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করুন।

জোছনা ও জননীর গল্প

আমি বিশ্বাস করি হুমায়ূন তার এ গ্রন্থে সত্য ঘটনাই লিখেছেন। সত্য না হলে মৌলভী বাড়ির হুমায়ূন তার অপছন্দের 'মোল্লা-মৌলভী'দের এখানে টেনে আনতেন না। তবে এখানেও হুমায়ূন তার চিরাচরিত স্বভাব অনুযায়ী হেঁয়ালীর আশ্রয় নিয়েছেন। জায়গার নামগুলো ঘুরিয়েফিরিয়ে উল্লেখ করেছেন। 'জোছনা ও জননীর গল্পে'র চুম্বকাংশ—

হাজি মতলুব মিয়ার নির্মাণ নীলগঞ্জ জামে মসজিদ এ এলাকার সবচে' সুদৃশ্য পাকা দালান। হাজি মতলুব মিয়া জীবনের শেষপ্রান্তে এসে ধর্মকর্মে মন দেন। তিনি ঘোষণা করেন, আসল ইবাদত হলো হক্কুল ইবাদত। জনতার জন্যে কিছু করা। তিনি তখন হক্কুল ইবাদতের অংশ হিসাবে মসজিদ বানানো শুরু করেন। এ সময় তাঁর বয়স সত্তরের কাছাকাছি। নানান ব্যাধিতে আক্রান্ত। মসজিদ তৈরি যেদিন শুরু করেন, সেদিন তিনি একটা স্বপ্ন দেখেন। স্বপ্নে অলি ধরনের এক মানুষ, যার পরনে সাদা লম্বা কুর্তা, মাথায় পাগড়ি, হাতে বাঁকা লাঠি, তাঁকে দেখা দেন। সেই সুফি মানুষ হাতের বাঁকা লাঠি দিয়ে তাকে বুকে খোঁচা দিয়ে বলেন– 'মতলুব মিয়া, তোমার আয়ু শেষ হয়ে গিয়েছিল। তুমি একটি সৎকর্মে হাত দিয়েছ, এ সৎকর্ম শেষ না হওয়া পর্যন্ত তোমার মৃত্যু হবে না। সৎকর্ম সুন্দরভাবে সমাধা করো।' এই বলেই সুফি পুরুষ অদৃশ্য হয়ে যান। ঘুম ভেঙে মতলুব মিয়া দেখেন এ সুফি পুরুষ তার বুকের যে জায়গায় বাঁকা লাঠি দিয়ে খোঁচা দিয়েছেন সেই জায়গা কালো হয়ে আছে।

তিনি বিপুল উৎসাহে মসজিদ বানানো শুরু করেন। কাজ দ্রুত সমাধা করার প্রয়োজন নেই। ধীরে-সুস্থে হবে। ভালোমতো হবে। যেভাবেই হোক কাজটা লম্বা করতে হবে।



“ ...কাত্তরে আমার বাবা ছিলেন ...লুমের পক্ষে। যদিও তিনি ...দ্ধ শুরু হওয়ার দেড় মাসের ...ই মারা গেছেন– ৪ মে তিনি ... করেন। তিনি বেঁচে থাকতে ...নেক দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ ...মাদের বাড়িতে এসে আশ্রয় নিয়েছিল। মানুষ এ আশায়ই ...দের বাড়িতে আশ্রয় নিত যে, ...লভী সাহেব উর্দু-ইংরেজিতে ...দের সঙ্গে কথা বলতে পারবেন ”

...দের চাচা আলতাফুর রহমান আহমেদের সঙ্গে লেখক

মেঝেতে প্রথমে সিমেন্ট করা হলো। সেই সিমেন্ট উঠিয়ে মোজাইক করা হলো। তিনি চার মিনারের সিদ্ধান্ত নিলেন। এতে সময় বেশি লাগবে। যত ইচ্ছা সময় লাগুক। মসজিদ নির্মাণ পুরোপুরি শেষ করা যাবে না। একটা দরজা কিংবা একটা জানালা বাকি থাকবে। এ ছিল তার পরিকল্পনা। পরিকল্পনা কার্যকর হলো না। এক মিনার তৈরি হবার পরপরই তার মৃত্যু হলো। মসজিদের উদ্বোধন হলো তার জানাজা পাঠের মাধ্যমে।

হাজি মতলুব মিয়ার মসজিদের বর্তমান নাম 'এক মিনারি মসজিদ'। ঈদের দিন দূর-দূরান্ত থেকে এ মসজিদে লোকজন নামাজ পড়তে আসে। জুম্মাবারেও মুসল্লিদের ভালো সমাগম হয়।

নীলগঞ্জে মিলিটারি আস্তানা গাড়ার পর জুম্মাবারে লোক সমাগম আরো বেড়েছে। মসজিদের বাইরেও চাটাই বিছাতে হয়। জুম্মাবারে মিলিটারি ক্যাপ্টেন মুহাম্মদ বাসেত দু'একজনকে সঙ্গে নিয়ে মসজিদে নামাজ পড়তে আসেন। নামাজের শেষে তার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করার জন্যে এক ধরনের ব্যস্ততা সমাগত মুসল্লিদের মধ্যে দেখা যায়। ঘটনাটা বিস্ময়কর হলেও সত্যি। দু'একজন কোলাকুলিও করেন।

জুম্মার নামাজ মাওলানা ইরতাজউদ্দিন পড়ান। সেদিন তাঁর পরনে থাকে ইস্ত্রি করা আচকান, ধবধবে সাদা পাগড়ি। জুম্মাবারে তিনি চোখে সুরমা দেন। কানের লতিতে আতর। নবি-এ-করিমের সুগন্ধী পছন্দ ছিল। সুগন্ধ ব্যবহার করা সেই কারণেই প্রতিটি মুসলমানের জন্যে সুন্নত।

নামাজ একটার সময় শুরু হয়, তবে মাঝে মাঝে একটা বাজার পরেও অপেক্ষা করা হয়। ক্যাপ্টেন সাহেবের জন্যে অপেক্ষা। মসজিদের মুয়াজ্জিন মুনশি ফজলুল হক ক্যাপ্টেন সাহেবের অপেক্ষায় বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকেন। এখান থেকে থানা কম্পাউন্ড পর্যন্ত পরিষ্কার দেখা যায়। ক্যাপ্টেন সাহেব থানা কম্পাউন্ড থেকে ঢোলা কুর্তা পরে যখন বের হন, তখন মুনশি ফজলুল হকের ভেতর অন্যরকম উত্তেজনা দেখা যায়।

ইরতাজদ্দিন জুম্মাবারে মসজিদে বারোটার মধ্যে এসে পড়েন। তখন মুয়াজ্জিনও আসে না। মসজিদ থাকে খালি। এক একজন করে মুসল্লি আসে, তাদের আসা দেখতে তাঁর ভালো লাগে। কাউকে দেখে মনে হয় তার অসম্ভব তাড়া। বসে থাকতে পারছে না, সারাক্ষণ ছটফট করছে। আঙুল ফোটাচ্ছে। ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছে। কেউ কেউ আসে নিতান্তই অনাগ্রহে। তাদের চোখে-মুখে থাকে 'কী বিপদে পড়লাম?' দূর-দূরান্ত থেকে কিছু আগ্রহী লোকজনও আসে। এরা হাদিস-কোরান শুনতে চায়। এরা অনেক আগে চলে আসে। তাদের সঙ্গে হাদিস-কোরান নিয়ে কথা বলতে ইরতাজউদ্দিন পছন্দ করেন। ধর্মের কত জটিল বিষয় আছে। কত সূক্ষ্ম খুঁটিনাটি আছে। এসব নিয়ে আলাপ করতেও ভালো লাগে।

এখন সময় অন্যরকম। এ সময়ের নাম সংগ্রামের সময়। এ সময়ে মানুষজন কোনো বাঁধাধরা নিয়মে চলে না। জুম্মাবারে মুসল্লিরা প্রবল আতঙ্ক নিয়ে মসজিদে প্রবেশ করেন এবং কেউ কিছু শুনতে চান না।

ইরতাজউদ্দিন মাথা নিচু করে ইমামের জায়নামাজে বসে আছেন। তাঁর হাতে তসবি। তসবির নিরানব্বইটা দানা তিনি এক এক করে টানছেন এবং একেক দানায় আল্লাহ পাকের একেকটি নাম স্মরণ করছেন।

ইয়া রাহমানু : হে দয়াময়।

ইয়া সাদেকু : হে সত্যবাদী।

ইয়া কুদ্দুসু : হে পবিত্র।

ইয়া মুমীতু : হে মৃত্যুদাতা।

ইরতাজউদ্দিন 'ইয়া মুমীতু' বলে থেমে গেলেন। আল্লাহপাকের পরের নামগুলো এখন আর তাঁর মনে পড়ছে না। ঘুরেফিরে মাথায় আসছে 'ইয়া মুমীতু', 'ইয়া মুমীতু'।

মসজিদের বাইরে উঠানের দক্ষিণ পাশে কদমগাছের ছায়ায় চারজন হিন্দু বসে আছে। তাদের একজন মিষ্টির দোকানের মালিক পরেশ, ধুতি পরে আছে। চরম দুঃসময়ে সে ধুতি পরার সাহস দেখিয়েছে। কারণ আজ জুম্মা নামাজের পর তারা মুসলমান হবে। মুসলমান হবার পর লুঙ্গি-পাঞ্জাবি পরবে। কাজেই শেষবারের মতো ধুতি পরা যায়। চারজন হিন্দুর মধ্যে দু'জন নমশূদ্র। নমশূদ্ররা সাহসী হয়– এমন কথা চালু থাকলেও এরা ভয়ে কুঁকড়ে আছে।

হিন্দু মুসলমান হচ্ছে– এ দৃশ্য দেখার জন্যে ক্যাপ্টেন সাহেব আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। এ চার হিন্দুর জন্যে মুসলমান নাম তিনিই ঠিক করে দিয়েছেন।

আবদুর রহমান।

আবদুল কাদের ।

আবদুল হক।

আবু সালেহ।

ক্যাপ্টেন সাহেবের ইচ্ছা ছিল চারজনকেই একটা করে কোরান শরীফ দেবেন। নীলগঞ্জের একমাত্র লাইব্রেরিতে কোনো কোরান শরীফ পাওয়া যায়নি। ক্যাপ্টেন সাহেব এতে বিরক্ত হয়েছেন।

যে চারজনকে আজ মুসলমান করা হবে তাদের যেন নিয়মমাফিক খৎনা করানো হয়– সেই বিষয়েও ক্যাপ্টেন সাহেব নির্দেশ দিয়েছেন। হাজামকে খবর দেয়া হয়েছে। সে ধারালো বাঁশের চল্টা দিয়ে খৎনা করাবে। ক্যাপ্টেন সাহেবের ধারণা এ দৃশ্যও উপভোগ্য হবে। তার নিজের ক্যামেরা ছিল না। এই মজার দৃশ্য ক্যামেরায় তুলে রাখার জন্যে তিনি ক্যামেরার ব্যবস্থাও করেছেন।

পৌনে একটায় জুম্মার নামাজের আজান দেয়া হলো। আজানের পরপরই ইরতাজউদ্দিন মসজিদ থেকে বের হয়ে কদমগাছের কাছে গেলেন। গাছের নিচের চারজনই নড়েচড়ে বসল। এদের একজন শুধু তার চোখে চোখ রাখল। অন্যরা মাটির দিকেই তাকিয়ে রইল।

ইরতাজউদ্দিন বললেন, আপনারা ভালো আছেন?

তিনজন হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল। একজন অন্যদিকে তাকিয়ে রইল।

ইরতাজউদ্দিন বললেন, আপনারাই শুধু মুসলমান হবেন? আপনাদের পরিবারের কেউ হবে না?

পরেশ বলল, সবেই হবে। প্রথমে আমরা, তারপর পরিবার।

ইরতাজউদ্দিন বললেন, আপনাদের ধর্ম কী বলে আমি জানি না। আমাদের ধর্ম বলে জীবন বাঁচানো ফরজ। মুসলমান হলে যদি জীবন রক্ষা হয়, তাহলে মুসলমান হন। জীবন রক্ষা করেন।

মুকুল সাহা ধুতির এক প্রান্ত দিয়ে চোখ ঢেকে ফুঁপিয়ে উঠল। ইরতাজউদ্দিন তার দিকে তাকিয়ে বললেন, পবিত্র কোরান মজিদে একটা বিখ্যাত আয়াত আছে– 'লাকুম দিনুকুম ওয়ালিয়া দ্বিন।' যার যার ধর্ম তার তার কাছে। ইসলাম অন্য ধর্মের উপর জবরদস্তি করে না।

ইরতাজউদ্দিনের আরো কিছু বলার ইচ্ছা ছিল, এর মধ্যেই মুয়াজ্জিন মুনশি ফজলুল হক তাঁর কাছে ছুটে এসে বলল, ক্যাপ্টেন সাহেব থানা কম্পাউন্ড থেকে বের হয়েছেন। আজ তাঁর সঙ্গে ছয়জন আছেন। ক্যাপ্টেন সাহেবকে নিয়ে সাতজন।

ইরতাজউদ্দিন বললেন, জুম্মার নামাজ আমি পড়াব না। এখন থেকে আপনি পড়াবেন।

এইটা কী বলেন!

ইরতাজউদ্দিন বললেন, কেন জুম্মার নামাজ পড়াব না সেই ব্যাখ্যা আজ নামাজ শুরুর আগে দিতে চেয়েছিলাম, কিন্তু দিব না। আমি এখন চলে যাব।

জুম্মার নামাজও পড়বেন না?

না।

এইসব কী বলতেছেন!

যা বলতেছি চিন্তাভাবনা করে বলতেছি। এখন থেকে আমি জুম্মার নামাজ পড়াব না। পরাধীন দেশে জুম্মার নামাজ হয় না। নবি-এ-করিম যতদিন মক্কায় ছিলেন জুম্মার নামাজ পড়েন নাই। তিনি মদীনায় হিজরত করার পর একটা সূরা নাজেল হয়। সূরার নাম 'জুমুয়া'। সেই সূরায় জুম্মার নামাজের নির্দেশ দেয়া হয়। তখন তিনি জুম্মার নামাজ শুরু করেন।

মাথা খারাপের মতো কথা বলবেন না। ক্যাপ্টেন সাহেব চলে এসেছেন।

আসুক। আমি চলে যাচ্ছি। মাওলানা ইরতাজউদ্দিন বাড়িতে ফিরে জোহরের নামাজ আদায় করলেন। নামাজের শেষে মোনাজাতের সময় তিনি বললেন, হে গাফুরুর রহিম। আমি যদি ভুল করে থাকি আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাই। আমার বুদ্ধি এবং জ্ঞান দুই-ই অল্প। আমি যে সিদ্ধান্ত নিয়েছি তা আমার অল্প বুদ্ধি এবং অল্প জ্ঞানের ফসল। এতে যদি ত্রুটি হয়ে থাকে, তুমি আমাকে ক্ষমা করো। আমি তোমার ক্ষমার সাগরে হাত পাতলাম।

ক্ষমা চাইবার সময় তাঁর চোখে পানি চল এলো। তিনি অনেকক্ষণ কাঁদলেন। নামাজের সময় তাঁর চোখে পানি আসে না। অনেকদিন পর চোখে পানি এলো। তিনি মোনাজাত শেষ করে জায়নামাজে বসে রইলেন। গায়ের পোশাক বদলালেন না। কারণ তিনি জানেন ক্যাপ্টেন সাহেব তাঁকে ডেকে পাঠাবেন। জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। তিনি ক্যাপ্টেন সাহেবকে যা যা বলবেন তা মোটামুটি ঠিক করা আছে। এইসব কথা ক্যাপ্টেন সাহেবের পছন্দ হবে না। যদি পছন্দ না হয় তাহলে নদীর পাড়ে তাকেও যেতে হতে পারে।

মৃত্যু নিয়ে তিনি ভীত না। কে কখন কীভাবে মারা যাবে তা আল্লাহপাক নির্ধারিত করে রেখেছেন। লাওহে মাহফুজে এসব দলিল রাখা আছে। যে মৃত্যু আল্লাহপাক কর্তৃক নির্ধারিত– সেই মৃত্যুকে ভয় পাবার কিছুই নেই।

ওসি সাহেবের স্ত্রী কমলা এসে কয়েকবার ঘুরে গেছে। ইরতাজউদ্দিন জায়নামাজে চোখ বন্ধ করে বসেছিলেন বলে কিছু বলতে সাহস পায়নি। এবার সে সাহস করে বলল, চাচাজি, কী হয়েছে?

তিনি বললেন, মনটা সামান্য অস্থির হয়ে আছে। আর কিছু না।

ভাত খাবেন না চাচাজি?

না, এখন খাব না। মা, আমি এখন কী বলব মন দিয়ে শোন। যদি আমার ভালোমন্দ কিছু হয় তুমি হেডমাস্টার সাহেবের কাছে চলে যাবে। উনি অতি শুদ্ধ মানুষ। উনি যা করার অবশ্যই করবেন। কমলা ভীত গলায় বলল, এসব কথা কেন বলতেছেন?

ইরতাজউদ্দিন বললেন, আমার মন অস্থির হয়ে আছে বলেই বলতেছি। অস্থির মানুষ অনেক কথা বলে।

চাচাজি, এক কাপ চা কি বানায়ে দেব?

না গো মা, কিছুই খাব না। তবে এক গ্লাস পানি খাব। এ পৃথিবীর যাবতীয় খাদ্যের মধ্যে পানি হলো শ্রেষ্ঠ খাদ্য এবং আল্লাহপাকের দেয়া অতি পবিত্র নেয়ামত। যতবার পানির গ্লাসে চুমুক দিবে ততবারই মনে মনে আল্লাহ পাকের শুকুর গুজার করবা, তোমার প্রতি এ আমার একমাত্র উপদেশ। আছর ওয়াক্তের আগে আগে ক্যাপ্টেন মুহাম্মদ বাসেত ইরতাজউদ্দিনকে ডেকে পাঠালেন। তাকে থানা কম্পাউন্ডে নিয়ে যাবার জন্যে থানার ভারপ্রাপ্ত ওসি দু'জন কনস্টেবল নিয়ে এসেছেন। ওসি সাহেব একবারও ইরতাজউদ্দিনের দিকে চোখ তুলে তাকাচ্ছেন না। মনে হচ্ছে যে কোনো কারণেই হোক এই মানুষটির দিকে চোখ তুলে তাকানোর মতো অবস্থা তাঁর না।

ইরতাজউদ্দিন থানার দিকে রওনা হবার আগে অজু করলেন। কমলার ছেলেটিকে কোলে নিয়ে আদর করলেন। নবি-এ-করিম শিশুদের পছন্দ করতেন। তাদের বলতেন, বেহেশতের ফুল। শিশুদের প্রতি স্নেহ ও মমতা দেখানো সুন্নত। সেই মমতা ইরতাজউদ্দিন কেন জানি দেখাতে পারেন না। শাহেদের মেয়ে রুনি ছাড়া কোনো শিশুই তাকে আকর্ষণ করে না। এটা অবশ্যই তাঁর চরিত্রের বড় একটা দুর্বলতা। তবে কমলার এ ছেলেটার প্রতি তাঁর মায়া পড়ে গেছে। এ ছেলেকে কোলে নিলেই সে খপ করে তাঁর দাড়ি ধরে ফেলে। তার হাত ছুটানো তখন সমস্যা হয়ে যায়। হাত ছাড়িয়ে নিতে গেলে কাঁদতে শুরু করে।

ক্যাপ্টেন বাসেতের সামনে কফির কাপ। চিনি-দুধবিহীন কালো কফি। তিনি একেবার কফির কাপে চুমুক দিচ্ছেন, কড়া কফির তিক্ত স্বাদে মুখ বিকৃত করছেন। ইরতাজউদ্দিন তাঁর সামনে চেয়ারে বসে আছেন। তাঁকেও কফি দেয়া হয়েছে। তিনি কফিতে চুমুক দেননি।

ক্যাপ্টেন বাসেত সিগারেট ধরালেন। লম্বা করে ধোঁয়া ছেড়ে হাত ইশারা করলেন। ঘরে দু'জন সিপাই এবং একজন হাবিলদার মেজর ছিল, তারা ঘর ছেড়ে বারান্দায় দাঁড়াল। তাদের দৃষ্টি ঘরের ভেতর। ক্যাপ্টেন বাসেত খানিকটা ঝুঁকে এসে বললেন, আমি খবর পেয়েছি আপনি জুম্মার নামাজ পড়াবেন না, কারণ আমি জুম্মার নামাজ পড়তে যাই। আমার মতো খারাপ মানুষকে পেছনে নিয়ে নামাজ হয় না– এ জাতীয় বক্তৃতাও না-কি দিয়েছেন।

ইরতাজউদ্দিন শান্ত গলায় ব্যাখ্যা করলেন কেন তিনি জুম্মার নামাজ পড়াচ্ছেন না। ব্যাখ্যা শুনে ক্যাপ্টেন বাসেতের মুখ কঠিন হয়ে গেল।

আপনি বলতে চাচ্ছেন পরাধীন দেশে জুম্মার নামাজের প্রয়োজন নেই। অর্থাৎ আপনি বলতে চাচ্ছেন পূর্ব পাকিস্তান পরাধীন?

জি জনাব।

আপনি কি বুঝতে পারছেন আপনি কী বলছেন?

বুঝতে পারছি।

আপনার এ কথার জন্যে আপনাকে কী শাস্তি দেয়া হবে তা কি জানেন?

জি-না জনাব।

দেশের যে শত্রু তার শাস্তি একটাই। আপনি মুক্তিদের একজন। আপনি মুক্তির হয়ে কাজ করছেন।

আমি যা করেছি নিজের বিচার ও বিবেকে কাজ করেছি।

আপনি চান না পাকিস্তান থাকুক? আপনি হিন্দুস্তানের পা-চাটা কুকুর হতে চান?

জনাব, আমি নিজেকে খাঁটি মুসলমান মনে করি। একজন খাঁটি মুসলমানের দায়িত্ব জালিম শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা।

ক্যাপ্টেন বাসেত হাতের সিগারেট ফেলে দিয়ে নতুন সিগারেট ধরালেন। কঠিন গলায় বললেন, মাওলানা সাহেব, আপনার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

ইরতাজউদ্দিন চুপ করে রইলেন। ক্যাপ্টেন বাসেত ঠাণ্ডা কফির কাপে চুমুক দিয়ে মুখ বিকৃত করে বললেন, খারাপ মাথা ঠিক করার কৌশল আমি জানি। এমনভাবে মাথা ঠিক করব যে বাকি জীবন আপনি তসবি টানবেন আর বলবেন, পাকিস্তান পাকিস্তান।

ইরতাজউদ্দিন ছোট্ট করে নিঃশ্বাস ফেললেন।

মাওলানা, চুপ করে থাকবেন না, কথা বলেন।

ইরতাজউদ্দিন বললেন, জনাব, আমার যা বলার ছিল আমি বলে ফেলেছি।

আর কিছু বলার নাই।

জি-না।

আমি আপনাকে কী শাস্তি দেব জানেন? আপনাকে উলঙ্গ করে সারা গ্রামে ঘুরানো হবে। আমি রসিকতা করছি না। আমি বিশ্বাসঘাতককে কঠিন শাস্তি দেই।

ইরতাজউদ্দিন বললেন, আল্লাহপাক যদি এ লজ্জা আমার কপালে লিখে থাকেন তাহলে এ লজ্জা আমাকে পেতে হবে। পবিত্র কোরান শরীফের সূরা বনি ইসরাঈলে আল্লাহ পাক বলেছেন– 'আমি সবার ভাগ্য সবার গলায় হারের মতো ঝুলিয়ে দিয়েছি।' আমার ভাগ্য আমার কপালে লেখা, একইভাবে আপনার ভাগ্যও আপনার কপালে লেখা।

আমাকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করছ?

জনাব, ভয় দেখানোর মালিক আল্লাহ পাক। আমি না।

ক্যাপ্টেন বাসেত চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। টেবিলে টোকা দিতেই সিপাই এবং সুবাদার মেজর ঘরে ঢুকল। ক্যাপ্টেন বাসেত বললেন, ওসিকে বলো এ গাদ্দারকে নেংটা করে সারা গ্রামে ঘুরাতে। তোমরাও সঙ্গে থাকবে।

নীলগঞ্জের অতি শ্রদ্ধেয় অতি সম্মানিত মানুষ মাওলানা ইরতাজউদ্দিনকে সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় প্রদক্ষিণ করা হলো। তাঁকে প্রথম নিয়ে যাওয়া হলো নীলগঞ্জ স্কুলে। সেখান থেকে নীলগঞ্জ বাজারে। বাজারে ছোট্ট একটা ঘটনা ঘটল। দরজির দোকানের এক দরজি একটা চাদর নিয়ে ছুটে এসে ইরতাজউদ্দিনকে ঢেকে দিয়ে জড়িয়ে ধরে থাকল। ঘটনা এতই দ্রুত ঘটল যে সঙ্গের মিলিটারিরা বাধা দেবার সময় পেল না।

ইরতাজউদ্দিন এবং দরজিকে মাগরেবের নামাজের পর সোহাগী নদীর পাড়ে নিয়ে গুলি করা হলো। মৃত্যুর আগে আগে ইরতাজউদ্দিন পরম নির্ভরতার সঙ্গে আল্লাহ পাকের কাছে উঁচু গলায় শেষ প্রার্থনা করলেন, হে আল্লাহ পাক, যে মানুষটা জীবনের মায়া তুচ্ছ করে আমাকে লজ্জার হাত থেকে বাঁচাতে চেয়েছিল তুমি তার প্রতি দয়া করো। তুমি তার প্রতি তোমার রহমতের দরজা খুলে দাও।*

নীলগঞ্জ হাই স্কুলে হেডমাস্টার মনসুর সাহেব মাথা নিচু করে তাঁর শোবার ঘরের খাটে বসে আছেন। তাঁর সামনেই ঘোমটা দিয়ে বসে আছেন তাঁর স্ত্রী আসিয়া। বিস্ময়কর ঘটনা ঘটেছে আসিয়া এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। তাঁর মাথায় কোনো সমস্যা নেই।

মধ্যদুপুর। প্রবল বৃষ্টি হচ্ছে। বৃষ্টি শুরু হয়েছে কাল রাত থেকে। এত প্রবল বর্ষণ নীলগঞ্জে এর আগে কখনো হয়েছে বলে মনসুর সাহেব মনে করতে পারছেন না। তিনি ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, আসিয়া, তুমি যদি অনুমতি দাও তাহলে আমি একটা কাজ করতে চাই।

আসিয়া ক্ষীণ গলায় বললেন, কী কাজ?

মনসুর সাহেব বললেন, ঘোমটা সরাও কথাগুলি আমি তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলতে চাই।

আসিয়া ঘোমটা সরালেন। মনসুর সাহেব বললেন, আমার অতি প্রিয়জন ইরতাজউদ্দিন কাশেমপুরী সবসময় বলতেন, যে স্বামী স্ত্রীর মনে কষ্ট দিয়ে কোনো কাজ করবে আল্লাহ পাক তাকে কখনো ক্ষমা করবেন না। যে কাজটা আমি করতে যাচ্ছি, তার জন্যে তোমার অনুমতি চাই।

আসিয়া আবারো বললেন, কী কাজ?

মনসুর সাহেব বললেন, ইরতাজউদ্দিন কাশেমপুরীকে মিলিটারিরা গতকাল সন্ধ্যায় নদীর পাড়ে গুলি করে মেরেছে। তারা এ অঞ্চলে কারফিউ দিয়ে রেখেছে। মৃতদেহ পড়ে আছে নদীর পাড়ে। ভয়ে কেউ সেখানে যাচ্ছে না। আমি উনার ডেডবডি নিয়ে আসতে চাই। নিয়মমতো কবর দিতে চাই।

আসিয়া বললেন, আপনি একা এ কাজ পারবেন?

কেন পারব না? পারতে হবে।

আপনি যদি বলেন, তাহলে আমি যাব আপনার সঙ্গে।

মনসুর সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন, তুমি যেতে চাও?

---

* নেত্রকোনা অঞ্চলের এই সত্য ঘটনাটির সাক্ষী যে দরজি সে গুলি খাওয়ার পরও প্রাণে বেঁচে যায়। আমি তার কাছ থেকেই গল্পটি শুনি।– লেখক

জি যেতে চাই। মিলিটারি যদি আপনাকে গুলি করে মারে, তাহলে আপনার সঙ্গে আমিও মরতে চাই। আমি একা বেঁচে থেকে কী করব?

নীলগঞ্জের মানুষ বিস্ময়ের সঙ্গে দেখল, হেডমাস্টার সাহেবের সঙ্গে ঘোমটা পরা একজন মহিলা প্রবল বর্ষণের মধ্যে মাওলানা ইরতাজউদ্দিনের বিশাল শরীর টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। তাদের খুবই কষ্ট হচ্ছে। অনেকেই দৃশ্যটা দেখছে, কেউ এগিয়ে আসছে না।

হঠাৎ একজনকে ভিজতে ভিজতে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। সে আসিয়া বেগমের কাছে এসে উর্দুতে বলল, মাতাজি আপনি সরুন, আমি ধরছি।

মনসুর সাহেব বললেন, আপনার নাম?

আগন্তুক বলল, আমি বেলুচ রেজিমেন্টের একজন সিপাই, আমার নাম আসলাম খাঁ।*

---

* ইরতাজউদ্দিন কাশেমপুরীর নামাজে জানাজা হয় দেশ স্বাধীন হবার পর। ওইদিন তার কবর হলেও জানাজা হয়নি। জানাজার জন্যে মাওলানা খুঁজে পাওয়া যায় নি।



মা তোমাকে অভিবাদন

নারী তুমি অপার প্রেরণা, তুমি মহান

শহীদ জননী সাফিয়া বেগম। '৭১-এ যিনি তাঁর ছেলেকে হাসিমুখে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছিলেন, দেশের জন্যে, আমাদের সবার ভালো থাকার জন্যে।

প্রিয় পাঠক, সে মায়েরই গল্প শোনাব আজ আপনাদের।

মা,

কেমন আছ? আমি ভালোভাবেই পৌঁছেছি এবং এখন ভালোই আছি। হরতাল বন্ধ হয়ে গেছে। রীতিমতো ক্লাস হচ্ছে। পরীক্ষা শীঘ্রই শুরু হবে। দোয়া করো। তোমার দোয়া ছাড়া কোনো উপায় নাই। আমি নিজে কী ধরনের মানুষ আমি নিজেই বুঝতে পারি না। আচ্ছা তুমি বলো তো সব দিক দিয়ে আমি কী ধরনের মানুষ। আমি তোমাকে আঘাত না দেওয়ার অনেক চেষ্টা করি। তুমি আমার মা দেখে বলছি না; তোমার মতো মা পাওয়া দুর্লভ। এই বিংশ শতাব্দীতে তোমার মতো মা যে আছে কেউ বিশ্বাস করবে না। আমি এগুলি নিজ হৃদয় থেকে বলছি, তোমার কাছে ভালো ছেলে সাজবার জন্য নয়। যদি আমি পৃথিবীতে তোমার দোয়ায় বড় বা নামকরা হতে পারি, তবে পৃথিবীর সবাইকে জানাব তোমার জীবনী, তোমার কথা।

আমি ভালো পড়াশুনা করার চেষ্টা করছি এবং দোয়া দিয়ে চিঠির উত্তর দিও।

ইতি

তোমার অবাধ্য ছেলে

আজাদ

করাচি ইউনিভার্সিটি থেকে মায়ের কাছে লেখা আজাদের চিঠি। আজাদ লিখেছিল, সে যদি নামকরা হয় কোনোদিন, সে লিখবে তাঁর মায়ের জীবনী। পৃথিবীকে জানাবে তার মায়ের কথা।

'৭১-এ বর্বর পাকিস্তানিদের হাতে আজাদ শহীদ হয়। মা মারা যান ১৪ বছর পরে ১৯৮৫ সালের ৩০ আগস্ট। এ ১৪ বছরের জীবনে তিনি এমন এক ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন এরপর তিনি আর শুধু আজাদের মা থাকেননি। তিনি হয়ে যান বঙ্গজননী। আজাদ বেঁচে নেই। আমরা, আজাদের মায়ের বাকি সন্তানেরা তো বেঁচে আছি। আমরা লিখব এ মায়ের কীর্তিগাথাগুলি। অসম সাহসী মায়ের এক অবিশ্বাস্য, অবিস্মরণীয় উপাখ্যান। যতদিন বাংলাদেশ থাকবে, যতদিন স্বাধীনতা থাকবে, এই অমর মাকে ততদিন শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে হবে আমাদের।

সাফিয়া বেগমের বাবা ছিলেন জাহাজের কাপ্তান। বাড়ি ছিল ভারতের মাওয়ায়। ছিলেন ব্রিটিশ ভারতের শীর্ষ ধনীদের একজন। বাবা তার আদুরে কন্যাকে তুলে দিতে চান এমন এক পাত্রের হাতে যে শিক্ষা-দীক্ষা, চেহেরা-সুরত আর বিত্ত-বৈভবে হবে অনেকের চেয়ে আলাদা।

আজাদের বাবা ইউনুস আহমেদ চৌধুরী বিক্রমপুরের মেদিনী মণ্ডল গ্রামে জন্ম নেন। পেশায় ইঞ্জিনিয়ার। টাটা কোম্পানিতে চাকরি করতেন। চাকরি সূত্রে থাকতেন বোম্বে, কানপুর, কোলকাতায়। ইউনুস চৌধুরী দেখতে লম্বা, উজ্জ্বল বর্ণ, গাঢ় ভুরু, উন্নত কপাল, উন্নত নাক, উজ্জ্বল চোখ, ভরা কণ্ঠস্বর— সব মিলিয়ে এক রাজপুত্র। কাপ্তান বাবা তার মেয়েকে ধুমধাম করে বিয়ে দিয়ে দেন ইউনুস চৌধুরীর কাছে। বিয়েতে মেয়েকে দু'শ' ভরি স্বর্ণ দেন!

বিয়ের এক বছরের মাথায় ইউনুস চৌধুরী আর সাফিয়া বেগমের কোল জুড়ে আসে একটি ফুটফুটে কন্যা সন্তান, তার নাম ছিল বিন্দু। কিন্তু সে বেশি দিন বাঁচেনি। গুটি বসন্ত কেড়ে নিয়েছিল তার জীবন। এরপর জন্ম নেয় আজাদ। তার জন্ম হয় ১১ জুলাই ১৯৪৬। ভারত-পাকিস্তান দু'দেশ হয়ে যাওয়ার পর ইউনুস চৌধুরী চলে আসেন পাকিস্তানে। টাটা কোম্পানির চাকরি ছেড়ে দিয়ে ঢাকায় এসে ইউনুস চৌধুরী ব্যবসা শুরু করেন। নানা ধরনের ব্যবসা। যেমন সাপ্লাই আর কন্ট্রাকটরি। প্রভূত উন্নতি করেন তিনি। বিষয়-সম্পত্তি বাড়তে থাকে অভাবনীয় হারে। লোকে বলে, ইউনুস চৌধুরীও বলে বেড়ান, এসবের মূলে ছিল একজনের সৌভাগ্য— আজাদের মা, বউয়ের ভাগ্যেই সৌভাগ্যের সিংহ দুয়ার খুলে যায় চৌধুরীর। ঢাকায় আসার পর তিনি যে ব্যবসাপাতি শুরু করেন, এর প্রাথমিক মূলধন যুগিয়েছিলেন সাফিয়া বেগমই, বাবার কাছ থেকে বিয়ের সময় পাওয়া গয়নার কিয়দংশ বিক্রি করে। পাকিস্তান চলে আসার পর আস্তে আস্তে আজাদের বাবা হয়ে ওঠেন ইউনিয়ন ব্যাংকের চেয়ারম্যান, চিত্তরজন কটন মিলের চেয়ারম্যান, একুয়াটি শিপিংয়ের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান। একটা কাস্টম ফোর্ড গাড়ি ছিল তার। গাড়ির নম্বর ছিল ইপিডি ৪৩৪৯। জনশ্রুতি আছে, ইরানের শাহ পাহলভি যখন পূর্ব পাকিস্তানে আসেন, তখন তাঁর গাড়ি হিসেবে ব্যবহারের জন্য ইউনুস চৌধুরীর গাড়ি সরকার ধার নিয়েছিল। এরকমও শোনা যায়, প্রিন্স ফিলিপ শিকারে এসে আজাদদের বাসায় উঠেছিলেন। ভিন্নমতও শোনা যায়, না ঠিক বাসায় ওঠেননি, চৌধুরীর গাড়িটা প্রিন্সের জন্য ধার নিয়েছিল সরকার, আর আজাদের বাবা তাদের সফরসঙ্গী হয়েছিলেন। মোটকথা আজাদের বাবা ছিলেন এই শহরের খুবই গুরুত্বপূর্ণ এক ব্যক্তি। আর আজাদদের স্কাটনের বাড়িটা ছিল শহরের সবচেয়ে দর্শনীয় বাড়ি। বহু লোক শুধু বাড়ি দেখতেই এ ঠিকানায় আসত। ২০৮ নিউ স্কাটনে আজাদের এ বাসাটা ছিল দুই বিঘা জমির ওপর। বাসাটায় হরিণ ছিল, ঝরনা ছিল, ঝরনার টলটলে পানিতে রাজহাঁস সাঁতার কাটত, বিরাট লন ছিল, ছিল মসলার বাগান। আজাদদের আরেকটা বাড়ি ছিল ফরাশগঞ্জে। গেণ্ডারিয়ায় ছিল কয়েকশ' বিঘা জমি। এগুলো সব ছিল আজাদের মায়ের নামে।

এরেই মধ্যে ইউনুস চৌধুরী তার এক নিকটাত্মীয়ের বউকে বিয়ে করে নিয়ে আসেন। এরকম কিছু ঘটবে এটা আঁচ করতে পেরে মা আগেই ইউনুস চৌধুরীকে হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন, 'আপনাকে একটা কথা বলে রাখি, আপনি যদি কোনো উল্টাপাল্টা কিছু করেন, আমি কিন্তু সোজা এই বাড়ি ছেড়ে আজাদকে নিয়ে চলে যাব। আর আমার মরা মুখটাও আমি আপনাকে দেখতে দেব না।' অভিমানী সাফিয়া বেগম কিছুতেই এই অনৈতিক বিয়ে মেনে নিতে পারেননি। তাই বালক আজাদকে নিয়ে সাফিয়া বেগম স্বামীর গৃহ-অর্থ-বিত্ত ত্যাগ করে আলাদা হয়ে যান।

জাহানারা ইমাম লেখেন, "বিকেলে রুমী বলল, 'আম্মা, চল তোমাকে এক বাসায় নিয়ে যাই। তোমার মন একদম ভালো হয়ে যাবে'।

'কোথায়?'

'আগে থেকে বলব না। সারপ্রাইজ।'

মগবাজার চৌমাথা থেকে তেজগাঁও ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়ার দিকে একটু এগিয়েই রেললাইন পার হয়ে গাড়ি খানিক সামনে গিয়ে ডাইনে একটা গলিতে ঢুকল। আরো একটুখানি গিয়ে আবার থামল একটা একতলা বাড়ির সামনে— ২৮ বড় মগবাজার। দু'ধাপ সিঁড়ি উঠেই ছোট্ট একটা বারান্দা-রেলিংঘেরা। বারান্দায় চেয়ারে বসা স্বাস্থ্যবান একটি যুবক। উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে আদাব দিল। রুমী বলল, 'মা, এ হল আজাদ। একে তুমি ছোটবেলায় দেখেছ। অনেক বছর আগে এদের বাসায় আমরা অনেক দাওয়াত খেয়েছি।'

মনে করতে পারলাম না কিন্তু ঘরে ঢুকে তার মাকে দেখেই জড়িয়ে ধরলাম। অনেক বছর আগে— তা দশ-বারো বছর তো হবেই এদের বাড়িতে কতো গিয়েছি, কতো খেয়েছি। আজাদের বাবা মি. ইউনুস আহমদ চৌধুরী ব্যবসায়ী ছিলেন, তাঁর সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়েছিল আমাদের এক ভাগনে মেছের-এর মাধ্যমে। আজাদের মা খুব ভালো রাঁধতেন। আমরা প্রায় প্রায়ই ছুটির দিনে ওদের বাড়িতে দাওয়াতে যেতাম আর আজাদের মার হাতের অপূর্ব রান্না খেয়ে খুব উপভোগ করতাম। ওরা প্রথম দিকে পুরনো ঢাকায় থাকতেন। তারপর মি. চৌধুরী নিউ ইস্কাটন রোডে বাড়ি বানালেন। বিরাট বাড়ি-আগাপাস্তলা মোজেইক, ঝকঝকে দামি সব ফিটিংস, আজাদের মায়ের ড্রেসিংরুমটাই একটা বেডরুমের সমান বড়। সামনে অনেকখানি খোলা জমি— বাগানের জন্য। এক পাশে হরিণের ঘর, সেখানে চমৎকার এক হরিণ। আজাদ তখন দশ-বারো বছরের ছেলে।

তারপর মাঝখানে বেশ কয়েক বছর কেমন করে জানি যোগাযোগটা বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। লোকমুখে শুনেছিলাম মি. চৌধুরী আরেকটা বিয়ে করেছিলেন।

এখন আজাদের মা নিজেই পুরো ব্যাপারটা বললেন, 'স্বামী আবার বিয়ে করাতে উনি একমাত্র সন্তান আজাদকে নিয়ে স্বামীর সংসার ছেড়ে চলে আসেন বেশ ক'বছর আগে। আজাদ গত বছর এমএ পাস করেছে। অনেক দুঃখ ধান্দা করে ছেলেকে মানুষ করেছেন। এখন আজাদ চাকরী করবে, এখন আর কোনো দুঃখ-কষ্ট থাকবে না।

আজাদের মার দিকে চেয়ে রইলাম। বরাবরই দেখেছি বাইরে নম্র, মৃদুভাষিণী এবং ভেতরে ভেতরে খুব দৃঢ়চেতা কিন্তু এতটা একরোখা তা জানতাম না। এখন অনেক শুকিয়ে গেছেন, পরনে সরু পাড়ের সাদাসিধে শাড়ি, গায়ে কোনো গহনা নেই। আগে দেখেছি—ভরাস্বাস্থ্যে গায়ের রং ফেটে পড়ছে, হাতে-কানে-গলায় সোনার গহনা ঝকমক করছে, চওড়া পাড়ের দামি শাড়ির আঁচলে চাবি বাঁধা, পানের রসে ঠোঁট টুকটুকে, মুখে সবসময় মৃদু হাসি, সনাতন বাঙালি গৃহলক্ষ্মীর প্রতিমূর্তি। সেই মিসেস চৌধুরী স্বামীর দ্বিতীয় বিবাহের প্রতিবাদে তীব্র আত্মসম্মান বোধে এককথায় প্রাচুর্য ও নিরাপত্তার ঘর ছেড়ে চলে এসেছেন।

একটা নিশ্বাস চাপলাম। ইস্কাটনের বাড়িটা আজাদের মায়ের নামে। সেই বাড়ি তিনি ফেলে এসেছেন ছেলের হাত ধরে। থাকছেন ভাড়া বাড়িতে।

ছেলেটিকে দেখে প্রাণ জুড়িয়ে গেল। স্বাস্থ্যবান সুদর্শন যুবক মায়ের মতই সবসময় হাসিমুখ।"

মা বড় কষ্ট করে ছেলেকে লেখাপড়া করান। আজাদ এমএ পাস করে, ব্যবসায় ঢোকার প্রস্তুতি নিচ্ছে। মা মেয়ে খুঁজছেন আজাদকে বিয়ে দেবার। এই সময় দেশে শুরু হয়ে যায় মুক্তিযুদ্ধ। রুমী, কাজী কামাল, শহীদুল্লাহ্ খান বাদল, তৌহিদ সামাদ, ফতেহ্, সৈয়দ আশরাফুল, বাকি, হ্যারিস, হিউবার্ট রোজারিও— আজাদের বন্ধুরা যোগ দেয় ঢাকার আরবান গেরিলা যুদ্ধে। আজাদ মাকে বলে, আমিও যুদ্ধে যাব।

আনিসুল হক লেখেন, "সেই রাতেই ভাত খেতে খেতে আজাদ মাকে বলে, 'মা, এরা এরপর যেই অপারেশনে যাবে, আমি সেটাতে যেতে চাই, এত বড় জোয়ান ছেলে, ঘরে বসে থাকে, আর দেশের মানুষ মার খায়। এটা হতে পারেন না।'

মা কথার জবাব দেন না।'

'এই দ্যাখ মার অ্যাপ্রুভাল আছে। মা আপত্তি করল না'। আজাদ কায়দা করে।

মা বলেন, 'আমি কালকে তোকে ফাইনাল কথাটা বলব। আজকের রাতটা সবুর কর।'

'ঠিক আছে। কিন্তু দ্যাখো মা, না কোরো না।'

মা সারারাত বিছানায় ছটফট করেন। কী বলবেন তিনি ছেলেকে। যুদ্ধে যাও! পরে যদি ছেলের কিছু হয়। এই ছেলে তাঁর বহু সাধনার ধন। তাঁর প্রথম সন্তানটা একটা মেয়ে। কানপুরেই জন্ম হয়েছিল মেয়েটার। চৌধুরী সাহেব মেয়ের নাম রেখেছিলো বিন্দু। সেই মেয়ে এক বছর বয়সে মারা যায়। প্রথম সন্তান বিয়োগের যে কী কষ্ট! বহু রাত সাফিয়া বেগম কেঁদেছেন। মেয়েটা তাঁর কথা শিখেছিল। 'মা, মা, দাদা, দাদা' বলতে পারত। সুন্দর করে হাসত। চৌধুরী সাহেব বলতেন, ফেরেশতারা হাসাচ্ছে। বিন্দু তাঁর সমস্ত অস্তিত্ব জুড়ে ছিল।' সেই মেয়ে বসন্ত হয়ে মারা গেল। সাফিয়া বেগমের মনে হলো সমস্ত জগৎই শূন্য। জীবনের কোনো মানে নেই। বেঁচে থাকা আর মরে যাওয়া সমান কথা। বিন্দু মারা যাওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর পেটে সন্তান এসে গেল। নতুন করে তিনি মাতৃত্বের স্বপ্ন বুনতে লাগলেন। জন্ম নিল আজাদ। তখন আজাদির স্বপ্নে পুরো

ভারতই উত্তাল। তাই ছেলের নাম চৌধুরী রাখলেন আজাদ। আজাদকে তিনি যত্ন করেছেন অনেকটা আদেখলার মতো করে। সারাক্ষণ কপালে টিপ পরিয়ে রেখেছেন, যেন কারো নজর না লাগে। মাজারে গিয়ে মানত করেছেন তার সুস্থতার জন্য। আজাদের কোনো অসুখ-বিসুখ হলে তিনি পাগলের মতো করতেন। তাঁরা পাকিস্তানে চলে আসার পরে তাঁর শাশুড়ি এসবকে বাড়াবাড়ি বলে সমালোচনা করতেন। কিন্তু তাঁর কীইবা করার ছিল। ছেলের অমঙ্গল-আশঙ্কায় সর্বদা তাঁর মন কাতর হয়ে থাকত। আজাদের পরেও তাঁর কোলে একটি বাচ্চা এসেছিল। সেও তো বাঁচেনি। আজাদ তাঁর সর্বস্ব। তাকে বুকের মধ্যে আগলে না রেখে তিনি পারেন?

সেই ছেলে আজ কেমন ডাগরটি হয়েছে। মাশাল্লা স্বাস্থ্য-টাস্থ্য সুন্দর। ছেলের জন্য তিনি মেয়ে দেখে রেখেছেন। ছেলের বিয়ে দিতে পারলে তাঁর দায়িত্ব পালন সম্পূর্ণ হয়। পুত্র পালনের দায়িত্ব তিনি স্বেচ্ছায় একা কাঁধে তুলে নিয়েছেন। এই দায়িত্ব কঠিন। আজকে একটা কঠিন সিদ্ধান্ত তাঁকে নিতে হবে। এই সিদ্ধান্ত তিনি কী করে একা নেবেন? ছেলের বাবার সঙ্গে পরামর্শ করতে পারলে ভালো হতো। তা তিনি জীবন থাকতেও করবেন না। যে বাবা ছেলের মুখের দিকে তাকিয়েও স্থূল বাসনা থেকে নিজেকে বিরত রাখতে পারে না, সে আবার বাবা কিসের? সাফিয়া বেগম আজ সত্যি অগ্নি-পরীক্ষার মুখোমুখি।

কিন্তু দেশ যখন তাঁর ছেলেকে চাইছে, তখন মা হয়ে কি তিনি ছেলেকে আটকে রাখতে পারেন? বলতে পারেন, আমার একটা মাত্র ছেলে, আর কেউ নাই ত্রিজগতে। আমার ছেলেকে ছাড় দাও। এই কথা বলার জন্যে কি তিনি ইস্কাটনের বাসা ছেড়ে ছিলেন? এই সুবিধা নেওয়ার জন্যে? না। ওটা ছিল তাঁর নিজস্ব সংগ্রাম। আজকে দেশ অন্যায় শাসনে জর্জরিত। সাফিয়া বেগম যতটুকু বোঝেন। রেডিও শুনে, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র শুনেন। ছেলেদের আলোচনা শুনে, বাসায় আগত লোকদের কথাবার্তা যতটুকু তার কানে আসে তা বিচার-বিশ্লেষণ করে, আর পুলিশ সুবেদার খলিলের বয়ান শুনে। তাতে পাঞ্জাবিদের এই জুলুম মেনে নেওয়া যায় না। মেনে নেওয়া উচিত না। তিনি ছেলেকে মানুষ করেছেন কি নিজে ছেলের আয়-রোজগার আরাম করে ভোগ করবেন বলে! কক্ষণো নয়। এটা তিনি ছেলেকে চিঠিতেও লিখে জানিয়েছেন, ছেলেকে তিনি মানুষ করেছেন মানুষের যা কিছু কর্তব্য তাই করবে বলে। দেশ আর দশের কাজে লাগবে বলে।

অমঙ্গল-আশঙ্কায় আবার তাঁর বুক কেঁপে ওঠে, সমস্ত অন্তরাত্মা শুকিয়ে এতটুকু হয়ে যায়। যদি ছেলের কিছু হয়! তিনি কল্পনা করার চেষ্টা করেন, কেউ এসে তাঁকে খবর দিচ্ছে যে তার ছেলের গায়ে গুলি লেগেছে, না। তিনি কল্পনা করতে পারেন না, অশ্রুর প্লাবন এসে তার দু' চোখ আর সমস্ত ভাবনা ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

একজন কারো সঙ্গে পরামর্শ করতে পারলে ভালো হতো। কিন্তু কার সঙ্গে! হঠাৎই মায়ের মনে পড়ে যায় জুরাইনের পীর সাহেবের কথা। বড় হুজুর আর তাঁর স্ত্রী দু'জনই বড় ভালো মানুষ। তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করলেই তো চলে।

মা সকালবেলা রওনা দেন জুরাইন মাজার শরিফ অভিমুখে। পীর সাহেবের সঙ্গে দেখা করেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন– ছেলে যুদ্ধে যেতে চায়। তিনি কি অনুমতি দেবেন?

পীর সাহেব বলেন, 'ছেলেকে যেতে দাও। পাকিস্তানিরা বড় অন্যায় করতেছে। জুলুম করতেছে। আর তাছাড়া, ছেলে বড় হলে তাকে আটকায়া রাখার চেষ্টা করে ফল নাই। তুমি না করলেও সে যুদ্ধে যাবেই।'

মায়ের মন থেকে সব দ্বিধা দূর হয়ে যায়, ফিরে এসে তিনি আজাদকে ডাকেন, বলেন, 'ঠিক আছে, তুই যুদ্ধে যেতে পারিস। আমার দোয়া থাকল।'

ছেলে মায়ের মুখের দিকে ভাবলেশহীন চোখে তাকিয়ে থাকে। বোঝার চেষ্টা করে। মা কি অনুমতিটা রেগে দিচ্ছেন, নাকি আসলেই দিচ্ছেন।

'মা, তুমি কি অন্তর থেকে পারমিশান দিচ্ছ, নাকি রাগের মাথায়?'

'আরে রাগ করব ক্যান। দেশ স্বাধীন করতে হবে না?'

'থ্যাংক ইউ মা। আমি জানি তোমার মতো মা আর হয় না।"

... অজাদ যুদ্ধে যাওয়ার পর, তার মাকে একাধিকবার বলেছিল, এটা তার খালাতো ভাইবোনদের মনে আছে এখনও যে আজাদ বলছে, 'মা আমি কিন্তু রাজনীতি করি না, পলিটিক্স করতে আমি যুদ্ধে যাই নাই, আমি যুদ্ধে গেছি বাঙালির ওপরে পাকিস্তানিদের অত্যাচার মানতে পারছি না বলে, রাজারবাগের পুলিশ ব্যারাকে ওরা যা করছে ...'

আজাদের খালাতো ভাই জায়েদের মনে পড়ে, আজাদদের মগবাজারের বাসাটা ছিল একটা ছোটখাটো ক্যান্টনমেন্ট। প্রচুর অস্ত্র-গোলাবারুদ আসত এ বাসায়। আবার এখান থেকে বিভিন্ন বাসায় সেসব চালান হয়েও যেত। সে নিজেও বস্তায় ভরে অস্ত্র নিয়ে গেছে আশপাশের বাসায়। দিলু রোডের হাবিবুল আলমের বাসায় যেমন।

সিদ্ধিরগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন অপারেশনই ছিল আজাদের প্রথম বড় অপারেশন। বিদায় বেলা মা বলেছিলেন, 'সাবধানে থেকো। সাবধানো চলো। বিসমিল্লাহ বলে বের হয়ো, বিপদে লা-ইলাহা-ইল্লা আন্তা সোবহানাকা পোড়ো, মাথা ঠাণ্ডা রেখো।'

কাজী কামালের নেতৃত্বে জনা-দশেক মুক্তিযোদ্ধা যাচ্ছে সিদ্ধিরগঞ্জে পাওয়ার স্টেশন কীভাবে উড়িয়ে দেওয়া যায়, সেটা সার্ভে করতে। মেজর খালেদ মোশাররফ কাজী কামালকে মেলাঘর থেকে অস্ত্রশস্ত্র আর লোকজন দিয়ে পাঠিয়েছেনই সিদ্ধিরগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন উড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে। এটা করতে পারলে ঢাকা শহরের বেশিরভাগটা অন্ধকার হয়ে পড়বে। এর আগে দু'বার যোদ্ধারা চেষ্টা করেছিল এটা উড়িয়ে দিতে, পারেনি। এবার কাজী কামালের দল বেশ ভারী। ১০ জনের গ্রুপ নিয়ে সে ঢুকেছে ঢাকায়। একটা সাড়ে তিন ইঞ্চি রকেট লাঞ্চারও আনা হয়েছে। ৮টা রকেট শেল। ভীষণ ভারী। রকেট লাঞ্চার চালানোর জন্যে আর্টিলারির গানার দেওয়া হয়েছে। তার নাম ল্যান্স নায়েক নুরুল ইসলাম। আর আছে কানা ইব্রাহিম। এক চোখ কানা তার। কোনোভাবে যদি পাওয়ার স্টেশনের ভেতরে ঢোকা না যায়, বাজার থেকে শেল মারলে কী হয়! এই হলো মেলাঘরের পরামর্শ! অস্ত্রের মধ্যে আরো আছে দুটো

এসএলআর, সঙ্গে আন্যার্গা লাঞ্চার। প্রত্যেকের জন্যে একটা করে স্টেনগান, চারটা ম্যাগাজিন, দুটো গ্রেনেড আর অসংখ্য বুলেট।

ভাদ্র মাস। আকাশে মেঘ। তাই একটা গুমোট ভাব। সন্ধ্যার পর বাড্ডার ওপারের পিরুলিয়া গ্রামের হাইড আউট থেকে দুটো নৌকাযোগে গেরিলারা রওনা হয় সিদ্ধিরগঞ্জের দিকে। তারা দুটো নৌকায় ওঠে। একটা নৌকায় বদি, কাজী, জুয়েল, আরো দুজন। আরেকটা নৌকায় আজাদ, জিয়া, ইব্রাহিম, রুমী। নৌকা চলতে শুরু করলে বাতাস এসে গায়ে স্পর্শ রাখে, একটুখানি শীতল হয় শরীর। এখনও অন্ধকার তেমন ঘন হয়ে নামেনি। আজাদ উত্তেজিত। তার হাতে একটা স্টেনগান। বলা যায় না, হয়তো আজই তার শত্রুর দিকে গুলি ছোড়ার উদ্বোধন হতে পারে।

সামনে কাজী কামালদের নৌকা। সবাই যার যার স্টেনগান নৌকার পাটাতনে নামিয়ে রেখেছে। কারণ কেউ অস্ত্র দেখে ফেললে তাদের আসার উদ্দেশ্যই মাটি হয়ে যাবে। কিন্তু বদি কিছুতেই তার স্টেনগান নামিয়ে রাখবে না। সে রেখেছে তার কোলের ওপরে।

কাজী কামাল এই অপারেশনের কমান্ডার। সে বলে, 'বদি, স্টেনটা নামায়া রাখো।'

বদি গম্ভীর গলায় বলে, 'আপনেরা নামায়া রাখছেন রাখেন। আমারে কন ক্যান। আর্মি আসলে কি বুড়া আঙুল টাইনা ইনডেক্স দিয়া গুলি করব? নেভার। আই অ্যাম আ ফাইটার অ্যান্ড আই অ্যাম অলওয়েজ রেডি টু শুট...'

আজাদ বদির কথা শুনে অবাক। কাজী না এই অপারেশনের কমান্ডার। তার আদেশ কি বদির মেনে নেওয়া উচিত ছিল না।

দুই নৌকা ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে পাওয়ার স্টেশনের কাছাকাছি। সব নিস্তব্ধ। কেবল নৌকার ছলাৎ ছলাৎ শব্দ ছাড়া আর কিছু শোনা যাচ্ছে না। অন্ধকার ধীরে ধীরে বাড়ছে। আকাশে মেঘ থাকায় তারা পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না। তবে এখানে-ওখানে বিলের মধ্যে ঝোপের ওপরে জোনাকি দেখা যাচ্ছে। আর একটা কিটিকিটি শব্দও যেন আছে। ঝোপেঝাড়ে কি ঝিঁঝিও ডাকছে নাকি? এর মধ্যে আবার শেয়ালের ডাকও কানে আসে লাইটারের আলোয় হঠাৎ চমকে ওঠে আজাদ। কাজীর মুখে লাইটারের আলো পড়ায় ওর মুখটা কিছুক্ষণের জন্যে ভেসে ওঠে আজাদের চোখে। বন্ধুর মুখ দেখে সে খানিকটা স্বস্তি বোধ করে।

তাদের নৌকা দুটো এগিয়েই চলেছে। সবাই একদম চুপ কারণ তারা প্রায় সিদ্ধিরগঞ্জের কাছাকাছি এসে পড়েছে। দূরে পাওয়ার স্টেশনের আলো দেখা যাচ্ছে। ওখানে আছে পাকিস্তানি সৈন্যদের সতর্ক প্রহরা। তাদের জন্যে এটা খুবই স্পর্শকাতর ও সংরক্ষিত এলাকা, সন্দেহ নেই।

ছলাৎ ছলাৎ শব্দ। এতক্ষণে অন্ধকারের সঙ্গে চোখ খাপ খাইয়ে নিতে পেরেছে। অন্ধকারের মধ্যেও নিজেদের কে কোথায় বসে আছে, দেখা যাচ্ছে।

আজাদ একটা শ্বাস নেয় জোরে। সেই শ্বাস নেওয়ার শব্দটাও তার কানে প্রবলভাবে বাজে। সে কি ভয় পাচ্ছে?

হঠাৎ সামনে একটা নৌকার মতো নড়তে দেখা যায়। কী নৌকা, কাদের নৌকা, অন্ধকারে কিছু বোঝা যায় না। তবে তাদের মাঝি বাঙালি। সে হাঁক ছাড়ে, 'কে যায়!' রাত্রির নিস্তব্ধতা ভেদ করে সেই হাঁক প্রলম্বিত হয়ে বিলের ঢেউয়ে ঢেউয়ে যেন আছড়ে পড়ে।

আজাদ ভাবে, হয়তো কোনো সাধারণ নৌকা। বাঙালি কেউ যাচ্ছে। কাজী জবাব দেয়, 'সামনে যাই।'

কাজীর গলার স্বরটাকে যেন খানিকটা, মাঝির স্বরের তুলনায়ও এই পরিবেশে, আগন্তুকের মতো শোনায়।

ওই নৌকাটা কাছে আসতেই দেখা যায় : সর্বনাশ! ওই নৌকায় পাকিস্তানি মিলিটারি। একটা মুহূর্ত সময় শুধু। আজাদ এখন কী করবে? তার সামনে কাজীদের নৌকা। সে ফায়ার ওপেন করলে তো কাজীরা মারা পড়বে। তার নিজেকে দিশেহারা লাগে। বদি কারো নির্দেশের অপেক্ষা না করে স্টেন তুলে ব্রাশফায়ার করে। পুরো ম্যাগাজিন খালি করে দেয়। এই শান্ত নিরিবিলি অন্ধকারে অসাড় হয়ে শুয়ে থাকা বিলটার ওপরে আর মেঘভারে নিথর আকাশটার নিচের সমস্ত স্তব্ধতা তখন ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। প্রতিপক্ষ নৌকা থেকেও গুলি বর্ষিত হয়। অন্ধকারে ফুটে ওঠে আগুনের ফুলকি। বারুদের গন্ধ বাতাসের ভেজা গন্ধে এসে মেশে।

আজাদ ঠকঠক করে কাঁপে। সামনে শোনা যায় নৌকার ডুবে যাওয়ার শব্দ আর মানুষের আর্তনাদ। মানুষ সাঁতার কাটার চেষ্টা করছে, তাই জলে উঠছে আলোড়ন।

আজাদ এরই মধ্যে নৌকার পাটাতনে রাখা অস্ত্র তুলে নিয়েছে। ফায়ার করার জন্যে সে প্রস্তুত। কিন্তু কমান্ডারের অর্ডার ছাড়া ফায়ার করাটা উচিত হবে না। সে চিৎকার করে অর্ডার চায়, 'কাজী, কাজী...'

কাজী তাড়াতাড়ি বলে, 'ডোন্ট ফায়ার, ডোন্ট ফায়ার।'

আজাদ বলে, 'ওকে। ওকে।'

কাজী বলে, 'এই, ওই নৌকা এদিকে আনো। এইটা ফুটা হইয়া গেছে। পানি উঠতেছে। কাম শার্প।'

আজাদদের নৌকা তাড়াতাড়ি সামনে যায়। এদিকে অন্ধকারে বদির গলা, 'হেল্প মি, আই অ্যাম গোয়িং টু বি ড্রাউনড।' টর্চের আলোয় দেখা যায় বদি পানিতে ভাসছে। ও বোধহয় পড়ে গিয়েছিল। ভাসমান বদিকে নৌকায় তোলা হয়। কাজীরাও নৌকা বদল করে উঠে পড়ে আজাদদেরটায়। ওরা এসে আজাদদের নৌকায় উঠতে না উঠতেই প্রথম নৌকাটা ডুবে যায়।

কাজী বলে, 'দেয়ার বোট হ্যাজ বিন টোটালি ডেস্ট্রয়েড। লেট্‌স রিট্রিট। স্পিডবোট নিয়ে আবার অ্যাটাক করতে আইতে পারে।'

পাকিস্তানি সৈন্যদের নৌকাটা ডুবে গেছে। সৈন্যরা হয় গুলিবিদ্ধ অথবা নিমজ্জিত।

চারদিক অন্ধকার।

একমাত্র নৌকাটি দ্রুত বাইতে বাইতে তারা ফিরে আসছে। দুই নৌকার মাঝি একই নৌকায়। তারা জোরে জোরে দাঁড় বাইছে।

জুয়েল বলে, 'আমার আঙুলে কী যেন হইছে রে।'

পেন্সিল টর্চ জ্বালিয়ে ভালো করে তাকিয়ে দেখা যায়, ডান হাতের তিনটা আঙুল গুলিতে জখম। রক্তে জায়গাটা একাকার। মনে হয় গুলি আঙুল ভেদ করে বেরিয়ে গেছে।

আজাদের শরীর কাঁপছে। উত্তেজনায়। জুয়েলের হাতে রক্ত দেখে সে বুঝতে পারে, তারা মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফিরছে।

দুই মাঝি নৌকা বাইছে। মনে হচ্ছে, তবুও নৌকার গতি বড় শ্লথ। আজাদ আর জিয়া পানি সেচা থালা হাতে নিয়ে বৈঠা বাওয়ার কাজ করছে।

কাজী কামাল হ্যা-হ্যা করে হাসে। 'আজাদ, আওয়ার এলভিসি প্রিসলি, ইজ রোয়িং দ্য বোট। দিস ইজ ফানি।'

আজাদ বলে, 'আরে আমি বিক্রমপুরের পোলা না? গ্রামে গিয়ে কত নৌকা বেয়েছি।' এবার নৌকা সত্যি দ্রুত এগোচ্ছে। অবশেষে বিলের শেষে ডাঙা দেখা যায়। আকাশে মেঘের ফাঁকে একটা চাঁদ দেখা যাচ্ছে। সাদা পেয়ালায় পানি নিয়ে রংমাখা তুলি ছেড়ে দিলে যেমন রঙগুলো ছড়াতে থাকে, চাঁদের ওপরে মেঘগুলোকে দেখা যাচ্ছে তেমনি। শেয়ালের ডাক কানে আসছে, কুকুরদের সম্মিলিত প্রতিবাদ ধ্বনিও। জোনাকি এখন অনেক।

ডাঙা এসে গেছে। নৌকা ঘাটে ভিড়লে সবাই নৌকা থেকে নেমে পড়ে।

রাতটা পিরুলিয়া গ্রামের হাইড আউটেই কাটায় তারা। এটাও আজাদের জন্যে এক নতুন অভিজ্ঞতা।

১৯৭১ সালের ১০ আগস্ট এক রাতে ঢাকার অনেক ক'টা মুক্তিযোদ্ধা নিবাসে হামলা চালায় পাকিস্তানি সৈন্যরা, আরো অনেকের সঙ্গে ধরা পড়ে রুমী, বদি, আলতাফ মাহমুদ, জুয়েল এবং আজাদ।

জাহানারা ইমাম লেখেন, "৬ সেপ্টেম্বর সোমবার ১৯৭১। আজাদের মায়ের কাছে যাবার জন্য মনটা ছটফট করছে। এ কয়দিন তাল করে উঠতে পারি নি। আজ বেলা এগারোটার দিকে গেলাম। আজাদের মা আমাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদলেন, বললেন 'বইন গো, কি সর্বনাশ হয়া গেল আমাদের। আপনের রুমীরেও তো লয়া গেছে শুনছি।'

'হ্যাঁ আপা, বাড়িসুদ্ধ সবাইকেই নিয়ে গেছিল। দু'দিন দু'রাত পর রুমী ছাড়া বাকিরা ফিরে এসেছে।'

বাড়িটার ওপর দিয়ে যেন ঝড় বয়ে গেছে। খাট ভেঙ্গে পড়ে আছে, লোহার আলমারীর পাল্লা ছ্যাঁদা হয়ে গেছে বুলেটে, দেয়ালে জায়গায় জায়গায় রক্তের ছিটে শুকিয়ে খয়েরী হয়ে গেছে।

জিজ্ঞেস করে করে পুরো ঘটনাটা শুনলাম আজাদের মার মুখ থেকে।

২৯ আগস্টের রাতে তাঁর বাসাতে অনেক লোক ছিল। বোনের ছেলে জায়েদ, চঞ্চল এরা তো থাকতোই, তাছাড়াও অন্য জায়গা থেকে বেড়াতে এসেছিল আরেক বোনের ছেলে টগর, বোন-ঝি জামাই মনোয়ার। জুয়েল, কাজী, বাশার এরা তিনজন ছিল। আর কপাল মন্দ সেকেন্দার হায়াত খানের—জয়েন্ট সেক্রেটারি এ আর খানের ছেলে—আজাদদের বন্ধু, সে রাতে এ বাসাতেই ছিল।

রাত দুপুরে ঘুম ভেঙে সবাই দেখে আর্মি সারা বাড়ি ঘিরে ফেলেছে। এঘর-ওঘরের জানালা দিয়ে উঁকি মেরে বোঝা যায় সামনে, দুই পাশে, ছাদে সর্বত্র মিলিটারি। ভেবেছিল পেছন দিকে মেথরের রাস্তাটায় নিশ্চয় কেউ নেই, ওইদিক দিয়ে পালানোর চেষ্টা করা যেতে পারে। জায়েদ হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে কোনোমতে মেথর আসার চিকন দরজাটার কাছে গিয়ে নিঃশব্দে খুলতেই গলি থেকে কয়েকজন আর্মি উঠে এসে ঢোকে বাড়িতে। তারা ঘরে ঢুকে সামনের দরজা খুলে দেয়—সেদিক দিয়ে আরো মিলিটারি পুলিশ সব ঘরে ঢুকে পজিসান নিয়ে দাঁড়ায়। জুয়েলের দুটো আঙুলে তখনো একটুখানি ব্যান্ডেজ বাঁধা ছিল। ক্যাপ্টেন সেই আঙুল দুটো ধরে দুমড়ে ভেঙে দেয়। জুয়েল 'মা-গো' বলে একটা প্রাণঘাতী চিৎকার দিয়ে ওঠে। আর তখনি ঘটে যায় সেই কাণ্ডটা। কাজী হঠাৎ ক্যাপ্টেনটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ক্যাপ্টেন টাল সামলাতে না পেরে খাটের ওপর পড়ে যায়। কাজী পড়ে তার ওপর। দুজনের আছড়ে পড়ার ভারে খাট ভেঙে যায়। কাজী ক্যাপ্টেনের স্টেন ধরে টানাটানি করতে থাকে। সেপাইরা ভাবতেও পারেনি এইরকম কিছু ঘটতে পারে। তারা ভয় পেয়ে এলোপাতাড়ি গুলি করতে থাকে। গুলিতে ভীষণরকম জখম হয় জায়েদ আর টগর। এর মধ্যে ধস্তাধস্তি করতে করতে কাজী পালিয়ে যায়— টানাটানির চোটে তার লুঙ্গি খুলে যায়। সেই অবস্থাতেই সে দৌড়ে বেরিয়ে যায়।

কাজীকে ধরতে না পেরে খানসেনাদের সব রাগ গিয়ে পড়ে বাড়ির বাকি লোকদের ওপর। মারের চোটে আজাদের নাক-মুখ দিয়ে রক্ত বেরিয়ে আসে, বাশারের বাঁহাত কবজি আর কনুইয়ের মাঝে দু'টুকরো হয়ে ভেঙে যায়, জুয়েলের আঙুল তো আগেই ভেঙেছিল, এখন নাক-মুখ দিয়ে রক্ত বেরোতে থাকে, মনোয়ার, সেকেন্দারও প্রচুর মার খায়।

তারপর গুলিবিদ্ধ, অচেতন জায়েদ আর টগরকে রক্তের স্রোতের মধ্যে ফেলে বাকিদেরকে ধাক্কাতে ধাক্কাতে নিয়ে খানসেনারা চলে যায়। চোখের সামনে এরকম পৈশাচিক কাণ্ডকারখানা দেখে আজাদের মায়ের হুঁশ ছিল না বহুক্ষণ। চেতনা ফিরলে দেখেন ভোর হয়ে আসছে। দেখেন রক্তে থৈ-থৈ মেঝেতে দুটি প্রাণী তখনো অজ্ঞান। তিনি পাশের বাসায় গিয়ে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ফোন করেন এম্বুলেন্স পাঠাবার জন্য। কিন্তু এম্বুলেন্স আসে না। তিনি হলি ফ্যামিলি হাসপাতালে ফোন করেন, কিন্তু এম্বুলেন্স আসে না। এই করতে করতে সকাল আটটা-ন'টা হয়ে যায়। তখন তিনি নিরুপায় হয়ে রিকশা করে ইন্টারকনের সামনের ট্যাক্সি-স্ট্যান্ডে গিয়ে একটা ট্যাক্সি নিয়ে আসেন। জায়েদ, টগরকে অনেক কষ্টে ধরাধরি করে ট্যাক্সিতে তোলা হয়। তিনি

ড্রাইভারকে মেডিক্যাল কলেজে যেতে বলেন। ড্রাইভার তাঁকে পরামর্শ দেয় মেডিক্যালে না নিতে। কারণ মেডিক্যালে মিলিটারি ভর্তি। তারা গুলিবিদ্ধ পেশেন্ট দেখলে গুম করে ফেলবে। তখন আজাদের মা হলি ফ্যামিলি হাসপাতালে যান।

হলি ফ্যামিলিতে জায়েদ, টগর এখনো সংকটজনক অবস্থায় রয়েছে। জায়েদ ছয়দিন অজ্ঞান ছিল। আজাদের মা স্টিল আলমারির পাল্লা দুটো খুলে দেখালেন স্টেনের গুলি পাল্লা ফুটো করে পেছনের লোহার পাত ফুটো করে ঘরের দেয়ালে গিয়ে বিঁধেছে। ভাঙা খাট যেভাবে ছিল, সেভাবেই পড়ে আছে। মেঝের চাপ চাপ রক্ত শুকিয়ে কালচে হয়ে আছে, সেগুলো ধুয়ে পরিষ্কার করা হয়নি। কে করবে? তিনি তো একদিকে নিজের ছেলের শোকে কাতর, অন্যদিকে আহত বোনের ছেলে দুটোর জন্য হাসপাতালে দৌড়াদৌড়ি করছেন। এই আটদিনে ওর চেহারাও শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে, চুলে তেল নেই, পরনের কাপড় ময়লা। ঘরের দিকে, নিজের দিকে তাকাবার এক মুহূর্ত ফুরসৎ নেই ওর।

আজাদের মা জিজ্ঞেস করলেন, 'রুমীর কোনো খবর করতে পারলেন বইন?'

'না আপা, এখনো কোনো দিকে কোনো সুরাহাই করতে পারছি না। পাগলা পীর বাবা ভরসা দিয়েছেন উনি রুমীকে বের করে এনে দেবেন। আপা, আপনি যাবেন ওর কাছে? খুব ক্ষমতাবান পীর উনি। ক্যান্টনমেন্ট থেকে বড় বড় জেনারেলরা পর্যন্ত ওর কাছে আসে।'

'নাবইন, আমার পীর সাহেব আছেন জুরাইনে, আমি গেছি তেনার কাছে। আল্লায় দিলে আজাদ আমার ছাড়া পায়া যাইব। আমি রমনা থানায় আজাদের লগে দেখা করছি।'

আমার হৃৎপিণ্ড লাফিয়ে গলার কাছে চলে এল। 'আজাদের সঙ্গে দেখা করতে দিয়েছে?'

'না বইন। অরা দেখা করতে দেয় নাই। রাইতে রমনা থানায় আইনা রাখে, আমাদের চিনা এক লোক সিপাইরে ঘুষ-মুষ দিয়া কেমন কইরা জানি বন্দোবস্ত করছিল, রাইতে লুকাইয়া জানালার বাইরে দাঁড়ায়া কথা বলছি।'

'কি কথা বল্লেন? কেমন আছে আজাদ?'

'বইনরে। বড্ড মারছে আমার আজাদরে। আমি কইলাম বাবা কারো নাম বল নাই তো? সে কইল, 'না মা, কই নাই। কিন্তু মা যদি আরো মারে? ভয় লাগে যদি কইয়া ফেলি?' আমি কইলাম, 'বাবা, যখন মারবো, তুমি শক্ত হইয়া সহ্য কইরো।"

আজাদের ওপরে পাকিস্তানিরা প্রচণ্ড অত্যাচার চালিয়েও কথা বের করতে পারে না। আনিসুল হক লেখেন, "আজাদদের ধরে নিয়ে যাওয়া হয় তেজগাঁও বিমানবন্দরের উল্টোদিকে ড্রাম ফ্যাক্টরির কাছে এমপি হোস্টেলে। রুমী, জামী, তাদের বাবা শরীফ ইমাম, বন্ধু হাফিজ প্রমুখকে ধরে বাইরে রাস্তায় জিপের সামনে এনে হেডলাইট জ্বালানো হয়, তখন কেউ একজন রুমীকে শনাক্ত করে। হতে পারে সেই কেউ একজনটা বদি, হতে পারে সামাদ ভাই, হতে পারে অন্য কোনো ইনফরমার। রুমীকে শনাক্ত করার পর তাকে আলাদা করে জিপে তোলা হয়। চুল্লুকে চোখ বেঁধে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু স্বপনের বাড়ির সামনে গিয়ে আর্মিরা যে 'স্বপন ভাগ গিয়া' বলেছিল,

যাওয়া হয়। কিন্তু স্বপনের বাড়ির সামনে গিয়ে আর্মিরা যে 'স্বপন ভাগ গিয়া' বলেছিল, এটা চুল্লু শুনতে পায়।

এখন রাত কত হবে, আজাদ জানে না। সময়ের হিসাব এখন তাদের কাছে গৌণ হয়ে গেছে। তাকে একটা ঘরে আলাদা করে নেওয়া হয়েছে। ধরা পড়ার পর থেকেই তার ওপরে মারটা বেশি পড়ছে। তাদের বাড়িতে পাকিস্তান আর্মির যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, তারই রেশ ধরে তার ওপর দিয়েই ঝড়টা যাচ্ছে বেশি। পিটিয়ে তার মুখ ক্ষতবিক্ষত করে ফেলা হয়েছে। সমস্ত শরীরে ব্যথা। ওই ঘরে যখন সবাই মিলে এক জায়গায় ছিল, তখন থেকেই শুরু হয়েছে মারধর। বুকে-পেটে-মুখে লাথি। ঘুসি। বেত, চাবুক, লাঠি দিয়ে বেধড়ক পিটুনি। বিশেষ করে গিঁটে গিঁটে, কনুইয়ে, হাঁটুতে, কব্জিতে মার। চারদিকে বাঙালির আর্তনাদ, চিৎকার। গোঙানি।

এরপর আজাদকে একটা ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়। এঘরে একজন বসে আছে। অফিসার। নেমপ্লেটে লেখা নাম : ক্যাপ্টেন হেজাজি।

'তুম আজাদ হ্যায়?'

আজাদ বলে, 'নেহি, হাম মাগফার হ্যায়।'

সঙ্গে সঙ্গে হান্টারের বাড়ি এসে পড়ে গায়ে, পিঠে, ঘাড়ে, মাথায়। 'ফের ঝুট বলতা হ্যায়!'

এরপর একজনকে আনা হয়। তার মুখ কাপড়ে ঢাকা। তাকে জিজ্ঞেস করা হয়, ' এ আজাদ?'

মুখ-ঢাকা মাথা নেড়ে বোঝায়, হ্যাঁ। এ-ই আজাদ।

আবার শুরু হয় জেরা।

'তুমি ইন্ডিয়া কবে গেছ?'

'যাই নাই।'

'কোন জায়গায় ট্রেনিং নিয়েছ?'

'নেই নাই।'

আবার মার। মারতে মারতে মেঝেতে ফেলে দেওয়া হয় আজাদকে। তারপর জেরাকারী বুটসহ উঠে পড়ে তার গায়ে পায়ে মাথায়! প্রথম প্রথম এই মার অসহ্য লাগে। তারপর একটা সময় আর কোনো বোধশক্তি থাকে না। ব্যথাও লাগে না। আজাদ পড়েই থাকে মেঝেতে। খানিকক্ষণ বিরতি দেয় জওয়ানটা।

আজাদের চোখ বন্ধ। সে প্রায় সংজ্ঞাহীন। পানি এনে ছিটানো হয় তার চোখে-মুখে। আবার চোখ মেলতেই আজাদকে বসানো হয় মেঝেতে।

'কোন কোন অপারেশনে গিয়েছিলে?'

'যাই নাই।'

'আর কে কে মুক্তিযোদ্ধা আছে তোমার সাথে?'

'জানি না।'

আবার মার। প্রচণ্ড। কিন্তু আশ্চর্য, কিছুই টের পাচ্ছে না আজাদ।

'শোনো। সব স্বীকার করো। বন্ধুদের নাম বলে দাও। অস্ত্র কোথায় লুকিয়ে রেখেছ. বলে দাও। তাহলে কথা দিচ্ছি, তোমাকে ছেড়ে দেব।'

'আমি কিছু জানি না। আমি নির্দোষ।'

'জানো না? তোমার বন্ধুরাই তোমার কথা বলেছে। তোমার বাসা দেখিয়ে দিয়েছে। তোমাকে চিনিয়ে দিয়েছে। সে সব স্বীকার করেছে, তাকে আমরা ছেড়ে দেব। তাহলে তুমি কেন বোকার মতো মরবে। স্বীকার করো।'

'আমি কিছু জানি না। তোমরা ভুল করছ!'

আবার প্রচণ্ড জোরে মার। দড়ির মতো করে পাকানো তার দিয়ে। হাত চলে যায় অজান্তেই, পিঠে। হাতের আঙুলে গিয়ে পড়ে চাবুক। আঙুল থেঁতলে যায়। নখগুলো মনে হয় খুলে খুলে পড়বে।

প্রথম রাতের নির্যাতনে আজাদের মুখ থেকে কোনো কথাই আদায় করা যায় না।

সময় কীভাবে, কোথা দিয়ে বয়ে যাচ্ছে, আজাদ টের পায় না। এক সময় দেখতে পায়— বদি, রুমী, চুল্লু ভাই, সামাদ ভাই, আলতাফ মাহমুদ, আবুল বারক আলভী, বাশার, জুয়েল, সেকেন্দার, মনোয়ার দুলাভাই, আলতাফ মাহমুদের শ্যালকেরা, রুমীর বাবা, ভাই, আরো অনেকের সঙ্গে সেও একই ঘরে। তার কী রকম একটা অভয় অভয় লাগে। একই সঙ্গে এতগুলো পরিচিত, অভিন্ন-লক্ষ্য মানুষ, সতীর্থ মানুষ।

আজাদকে ধরা হয়েছে গতকাল রাত ১২টার পরে। এখন সন্ধ্যা। প্রায় ১৮ ঘণ্টা হয়ে গেছে তাদেরকে কিছুই খেতে দেওয়া হয়নি।

জাহানারা ইমাম সারাদিন চেষ্টা করেছেন ফোনে, আর্মি এক্সচেঞ্জে। তিনি ক্যাপ্টেন কাইয়ুমকে চাইছেন। কিন্তু ক্যাপ্টেন কাইয়ুমকে কিছুতেই পাওয়া যাচ্ছে না। এই ক্যাপ্টেন গত রাতে তাদের বাসায় রেইডের নেতৃত্বে ছিলেন। আর এ বাসায় এসেছিল সুবেদার সফিন গুল। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে জাহানারা ইমাম সুবেদার সফিন গুলকে পেয়ে যান। এই সুবেদার বলে গিয়েছিল, 'এক ঘণ্টা পরে ইন্টারোগেশন শেষে সবাইকে ছেড়ে দেওয়া হবে।'

জাহানারা ইমাম বলেন, 'কী এত ইন্টারোগেশন। ওদের ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে না কেন? ওরা কেমন আছে? আমি কি ওদের কারো সাথে কথা বলতে পারি।'

সফিন গুল জামীকে ডেকে দেন।

জামী সংক্ষেপে সারে। 'হ্যালো, ভালো আছি। আমাদের ছেড়ে দেবে।'

'তোরা খেয়েছিস কিছু?'

'না।'

'দে তো, সুবেদার সাহেবকে ফোনটা দে'।

জাহানারা ইমাম মিনতি করে আল্লার দোহাই পেড়ে সুবেদারকে অনুরোধ করেন ওদের কিছু খেতে দিতে।

পাকিস্তানি সৈন্যরা এসে পড়ে। বন্দিদের আবার তোলা হয় একটা জানালাবদ্ধ বাসে। তাদের নিয়ে আসা হয় আবার এমপি হোস্টেলে। একটা কক্ষে সবাইকে কিছুক্ষণ রাখার পর তাদের নিয়ে যাওয়া হয় পেছনের আরেকটা বিল্ডিংয়ে। আজাদ শুনতে পায়, এখানে সবার স্টেটমেন্ট নেওয়া হবে। স্টেটমেন্ট মানে একজন আর্মি অফিসার বন্দিদের একে একে প্রশ্ন করবে। জবাব শুনে সেগুলো কাগজে লিখে নেবে। এই স্টেটমেন্ট নেওয়ার সময় যে টর্চার করা হয়, তা আগের দু'দিনের অত্যাচারের চেয়েও ভয়াবহ।

আজাদের পালা আসে। একজন অফিসার নাম ধরে ডাকে। 'আজাদ'। আজাদ ওঠে না। 'আজাদ আলিয়াস মাগফার।' আজাদ ওঠে।

আজাদকে একটা কক্ষে নিয়ে যাওয়া হয়। এখানে তিনজন অফিসার একসঙ্গে ঘিরে ধরে আজাদকে।

'আজাদ।'

আজাদ কোনো কথা বলে না।

'তোমাকে তোমার বন্ধুরা দেখিয়ে দিয়েছে তুমি আজাদ, তুমি সেটাই স্বীকার করছ না। এটা ঠিক না। আমাদের কাছে সবকিছুর রেকর্ড আছে। তুমি সিদ্ধিরগঞ্জ অপারেশনে গিয়েছিলে। ২৫ তারিখে তুমি রাজারবাগ অপারেশনে ছিলে। প্রথমটার কমান্ডার ছিল কাজী কামাল। পরেরটার আহমেদ জিয়া।'

'এসব ঠিক নয়। আমার নাম মাগফার। ওরা আমার বাসায় এসেছিল তাস খেলতে। ওরা তাসটা ভালো খেলে। এছাড়া আমি ওরা কোথায় কী করে না করে কিচ্ছু জানি না।'

'হারামজাদা।' সিপাইদের ডেকে তার হাওলায় সমর্পণ করা হয় আজাদকে, 'আচ্ছা করকে বানাও।' দুজন সিপাই এসে আজাদের পায়ে দড়ি বাঁধে। তারপর তাকে ঝোলায় সিলিং ফ্যানের সঙ্গে উল্টো করে। ফ্যান ছেড়ে দেয়। আজাদ উল্টো হয়ে ঝুলছে, ঘুরতে থাকে ফ্যানের সঙ্গে সঙ্গে। আর চলতে থাকে চড়-কিল-ঘুসি। আজাদ 'মা মা' বলতে বলতে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে।

তাকে নামিয়ে তার চোখো-মুখে পানি দেওয়া হয়। জ্ঞান ফিরে পেলে সে প্রথম যা বলে, তা হলো, 'মা।' যেন সে মায়ের কোলে শুয়ে আছে।

অফিসাররা আজাদের ফাইলটা আবার দেখে। মায়ের সঙ্গে বাবার সম্পর্ক নেই। মায়ের একমাত্র ছেলে। মায়ের সঙ্গে একা থাকে।

অফিসার বলেন, 'তুমি মাকে দেখতে চাও?'

'হুঁ।'

'মায়ের কাছে যেতে চাও?'

'হুঁ।'

'তাহলে তুমি বলো, অস্ত্র কোথায় রেখেছ?'

আজাদ বলে, 'জানি না।'

আবার একপ্রস্থ প্রহার চলে।

আজাদ আবার তার মায়ের মুখ মনে করে নির্যাতন ভোলার চেষ্টা করে।

'ওকে। তোমার মা বললে তুমি সব বলবে?'

'বলব।'

'ঠিক আছে। তোমার মাকে আনা হবে।'

অফিসার ইনটেলিজেন্সের এক লোককে ডেকে বলে, 'এর মাকে আনো।'

মা আসে। আজাদ বলে, 'মা, 'কী করব? এরা তো খুব মারে। স্বীকার করতে বলে। সবার নাম বলতে বলে।'

'বাবা, তুমি কারো নাম বলোনি তো!'

'না মা, বলি নাই। কিন্তু ভয় লাগে, যদি আরো মারে, যদি বলে ফেলি।'

'বাবা রে, যখন মারবে, তুমি শক্ত হয়ে থেকো। সহ্য কোরো। কারো নাম যেন বলে দিও না।'

'আচ্ছা। মা, ভাত খেতে ইচ্ছা করে। দুই দিন ভাত খাই না। কালকে ভাত দিয়েছিল, আমি ভাগ পাই নাই।'

'আচ্ছা, কালকে যখন আসব, তোমার জন্যে ভাত নিয়ে আসব।'

সেন্ট্রি এসে যায়। বলে, 'সময় শেষ। যানাগা।'

মা হাঁটতে হাঁটতে কান্না চেপে ঘরে ফিরে আসেন। পাশেই হলি ফ্যামিলি, জায়েদ আর টগর সেখানে চিকিৎসাধীন আছে, কিন্তু সেখানে যেতে তাঁর ইচ্ছা করছে না।

সকালবেলা, যথারীতি গাড়ি এসে বন্দিদের নিয়ে যায় এমপি হোস্টেলের ইন্টারোগেশন সেন্টারে।

আজাদকে আবার নিয়ে যাওয়া হয় কর্নেলের সামনে। কর্নেল কাগজ দেখে। আজাদকে তার মায়ের সঙ্গে দেখা করানো হয়ে গেছে। ইন্টেলিজেন্সের রিপোর্ট। এখন নিশ্চয় সে স্বীকার করবে সবকিছু। জানিয়ে দেবে অস্ত্রের ঠিকুজি।

'আজাদ, বলো, সিদ্ধিরগঞ্জ অপারেশনে আর কে কে ছিল?'

'আজাদ বলে, 'জানি না।'

'বলো, সিদ্ধিরগঞ্জ অপারেশনের পরে রকেট লাঞ্চারটা কোথায় রাখা হয়েছে?'

'জানি না।'

কর্নেল ইঙ্গিত দেয়। আজরাইলের মতো দেখতে একজন সৈনিক এগিয়ে আসে। আজাদের ঘাড়ে এমনভাবে হাত লাগায় যে মনে হয় ঘাড় মটকে যাবে। তাকে ধরে একটা চেয়ারে বসানো হয়। তাকে বাঁধা হয় চেয়ারের সঙ্গে। বিদ্যুতের তার খোলামেলাভাবে আজাদের চোখের সামনে খুলে বাঁধা হচ্ছে চেয়ারের সঙ্গে, তার পায়ের

সঙ্গে। তাকে এখন শক দেওয়া হবে। আজাদের একবার মনে হয় ফারুক ইকবালের কথা, ৩ মার্চ রামপুরা থেকে পুরানা পল্টনের ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের মিটিংয়ে আসার জন্যে মিছিলে নেতৃত্ব দিচ্ছিল সে, টেলিভিশন ভবনের সামনে আর্মি গুলি চালায়, গুলিবিদ্ধ হয়ে রাজপথে লুটিয়ে পড়ে ফারুক ইকবালের শরীর, তখন সারাটা শহরে জনরব ছড়িয়ে পড়ে যে ফারুক ইকবাল নিজের বুকের রক্ত দিয়ে রাস্তায় মৃত্যুর আগে লিখেছিল 'জয় বাংলা', তখন খবরটা বিশ্বাস হয়নি আজাদের, এখন ঠিক অবিশ্বাস হচ্ছে না। তার মনে পড়ে লে. কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনের মৃত্যুর বর্ণনা, যা সারাটা শহরে ছড়িয়ে পড়েছে কিংবদন্তির মতো, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার দু'নম্বর আসামি লে. কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনের বাসায় ২৫ মার্চ রাত ১১টার দিকে আর্মি ঢুকে পড়ে, তাঁকে জিজ্ঞেস করে, 'তুমহারা নাম কিয়া।' তিনি বলেন, 'কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন, তারা বলে, 'বলো পাকিস্তান জিন্দাবাদ।' তিনি বলেন, 'এক দফা জিন্দাবাদ।' পুরোটা মার্চে যখন নানা রকমের আলোচনা চলছিল, তখন মোয়াজ্জেম হোসেন এই এক দফার সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইছিলেন, 'এক দাবি এক দফা বাংলার স্বাধীনতা...' সৈন্যরা গুলি করল, লুটিয়ে পড়ল তাঁর দেহ...

প্রচণ্ড অত্যাচার চলছে আজাদের ওপর দিয়ে, কিন্তু আজাদ নির্বিকার, সে শুধু মনে করে আছে তার মায়ের মুখ, মা বলেছেন, 'বাবা, শক্ত হয়ে থেকো... কারো নাম বোলো না...'

এক সময় কর্নেল তাঁর হাতের কাগজ রাগে ছুড়ে ফেলে, তারপর নির্দেশ দেয় চূড়ান্ত শাস্তির... আজাদের ঠোঁট তখন নড়ে ওঠে, কারণ সে জানে চূড়ান্ত শাস্তি মানে এই শারীরিক যন্ত্রণার চির উপশম, আজাদের মন এই টর্চারের হাত থেকে বাঁচার সম্ভাবনায় আশ্বস্ত হয়ে ওঠে।

পরদিন, কখন রাত হবে, কখন তিনি ভাত নিয়ে যাবেন রমনা থানায়, সারাদিন অস্থির থাকেন মা। দুপুরে তিনি আর ভাত মুখে দিতে পারেন না। তার ছেলে ভাত খেতে পায় না। তিনি বাসায় বসে আরাম করে ভাত খাবেন! তা কি হয়!

সন্ধ্যা হতে না হতেই তিনি চাল ধুতে লেগে পড়েন। দিনের বেলায়ই ঠিক করে জোগাড়যন্ত্র করে রেখেছেন কী রাঁধবেন! মুরগির মাংস, ভাত, আলুভর্তা, বেগুনভাজি। একটা টিফিন-ক্যারিয়ারে নেবেন। নাকি দুটোয়! তার কেমন যেন লাগে।

রাত নেমে আসে। সারাটা শহর নিস্তব্দ্ধ হয়ে পড়ে। কারফিউ দেওয়ার আগেই ভাত নিয়ে তিনি হলি ফ্যামিলিতে আশ্রয় নেন। রাত আরেকটু বেড়ে গেলে দুটো টিফিন-ক্যারিয়ারে ভাত নিয়ে তিনি যান রমনা থানায়।

দাঁড়িয়ে থাকেন, কখন আসবে গাড়ি। কখন এমপি হোস্টেল থেকে নিয়ে আসা হবে আজাদদের। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর গাড়ি আসে। একজন একজন করে নামে বন্দিরা। কই, এর মধ্যে তো তার আজাদ নাই। আর্মিরা চলে গেলে তিনি পুলিশের কাছে যান। 'আমার আজাদ কই?'

পুলিশকর্তা নামের তালিকা দেখেন। বলেন, 'না, আজাদ তো আজকে আসে নাই।'

'মাগফার চৌধুরী?'

'না। এ নামেও কেউ নাই।'

'আর কি আসতে পারে?'

'আজ রাতে? নাহ্।'

'কালকে?'

'বলতে পারি না'।

টিফিন-ক্যারিয়ারে ভাত নিয়ে আজাদের মা কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে থাকেন। সারা রাত। থানার চত্বরে। বাইরে বাঙ্কারে পাকিস্তানি সেনাদের চোখ এলএমজির পেছনে ঢুলুঢুলু হয়ে আসে, ভেতরে পুলিশের প্রহরী মশা মারে গায়ে চাপড় দিতে দিতে, বিচারপতির বাসভবনের উল্টোদিকের গির্জায় ঘণ্টা বাজে, মা দাঁড়িয়ে থাকেন টিফিন-ক্যারিয়ার হাতে, তাঁর কেবলই মনে হতে থাকে সেই দিনগুলোর কথা, বিন্দু মারা যাওয়ার পরে যখন তাঁর পেটে আবার সন্তান এল, প্রতিটা মুহূর্ত তিনি কী রকম যত্ন আর উৎকণ্ঠা নিয়ে ভেতরের জীবনটাকে বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন, আর সন্তানের জন্ম দেওয়ার পরে কানপুরের ক্লিনিকেই চৌধুরী সাহেব আজান দিয়েছিলেন, আর ভারতবর্ষের আজাদির স্বপ্নে ছেলের নাম রেখেছিলেন আজাদ, তাঁর পেটের ভেতরটা গুড়গুড় করছে, যেন তিনি আজাদকে আবার এই পৃথিবীর সমস্ত বিপদ-আপদ-শঙ্কার প্রকোপ থেকে বাঁচাতে তাঁর মাতৃগর্ভে নিয়ে নেবেন, যদি তিনি পাখি হতেন, এখনই তাঁর পাখা দুটো প্রসারিত করে আজাদকে তার বুকের নিচে টেনে নিতেন। আস্সালাতু খায়রুম মিনান্নাউম, ভোরের আজান দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি দৌড় ধরেন তেজগাঁও থানার দিকে। ওখানে যদি তাঁর আজাদ থাকে! ঝিরঝির করে বৃষ্টি ঝরে, ছোট ছোট ছাঁদে, তিনি কিছুই টের পান না, তেজগাঁও থানার চত্বরে হাজির হন। তখনও তাঁর হাতে দুটো টিফিন-ক্যারিয়ার।

পুলিশকে দুটো টাকা চা খাওয়ার জন্যে উপহার দিয়ে তিনি আজকের হাজতিদের পুরো তালিকা দেখেন। গরাদের এ পাশে দাঁড়িয়ে হাজতিদের প্রত্যেকের মুখ আলাদা আলাদা করে নিরীক্ষণ করেন। না, আজাদ নেই।

এখান থেকে এমপি হোস্টেল বেশি দূরে নয়। তিনি এমপি হোস্টেলের দিকে দৌড় ধরেন। একজন সুবেদারের সঙ্গে দেখা হয় তাঁর। সুবেদারকে বলেন, 'আজাদ কোথায়? আমি আজাদের মা।'

সুবেদার বলে, 'মাইজি, উনি তো এখানে নাই। ক্যান্টনমেন্টে আছেন। আপনি বাড়ি চলে যান।'

মা কী করবেন, বুঝে উঠতে পারেন না। তাঁর হাতের ভাত ততক্ষণে পচে উঠে গন্ধ ছড়াচ্ছে। তাঁর নিজের পরিপাকতন্ত্রের ভেতরে থাকা পরশুদিনের ভাতও যেন পচে উঠছে...

'মাইজি, আপনি বাড়ি চলে যান।'

মা এক সময় বাসায় চলে আসেন। তাঁকে পাথরের মতো দেখায়। তিনি মহুয়াকে, কচিকে সংসারের স্বাভাবিক কাজকর্ম দেখিয়ে দেন, কিন্তু তবু মনে হয় সমস্তটা পৃথিবী গুমোট হয়ে আছে, কী অসহ্য ভাপসা গরম, বৃষ্টি হলে কি জগৎটা একটু স্বাভাবিক হতো! তিনি হাসপাতালে যান, দেখতে পান, জায়েদের জ্ঞান ফিরে এসেছে, টগরের অবস্থাও উন্নতির দিকে, তিনি জুরাইনের বড় হুজুরের কাছে, বেগম সাহেবার কাছে যান, তাঁরা তাঁকে আশ্বাস দেন যে, আজাদ বেঁচে আছে, আজাদ ফিরে আসবে। 'ঘাবড়াও মাত। ও আপাস আয়ে গা।'

মহুয়া বলে, 'আম্মা কিছু খান, না খেয়ে খেয়ে কি আপনি মারা যাবেন, আজাদ দাদা ফিরে আসবে তো!'

মা কিছুই খান না। একদিন, দু'দিন।

মহুয়া বলে, 'আম্মা, আপনি কি আত্মহত্যা করতে চান? আত্মহত্যা মহাপাপ। আপনি মারা গেলে আমরা কার কাছে থাকব আম্মা?'

মায়ের হুঁশ হয়। তিনি তাঁর চোখের সামনে দেখতে থাকেন তাঁর ভাগ্নে-ভাগ্নী চঞ্চল, কচি, টিসুর অপ্রাপ্তবয়স্ক মুখ, জায়েদ, টগরের শয্যাশায়ী শরীর, তিনি মরে গেলে এরা কোথায় যাবে, কার কাছে থাকবে?

মহুয়া একটা থালায় ভাত বেড়ে টেবিলে রাখে। তাঁকে ধরে জোর করে এনে খাবার টেবিলে বসায়। মা খাবেন বলেই আসেন। দু'দিন খান না। পেটে খিদেও আছে। তাঁর সামনে থালায় ভাত। মহুয়া আনতে গেছে তরকারি। ভাত। ভাতের দিকে তাকিয়ে মায়ের পুরো হৃৎপিণ্ডখানি যেন গলা দিয়ে দুঃখ হয়ে, শোক হয়ে, শোচনা হয়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে। তিনি ভাতগুলো নাড়েন-চাড়েন। তাঁর মনে পড়ে যায়, রমনা থানার গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে আজাদ কেমন করে বলেছিল, 'মা, ভাত খেতে ইচ্ছা করে।' দুই দিন ছেলে আমার ভাত খায় না। তারপরেও তো কেটে যাচ্ছে দিনের পর দিন। তাঁর চোখ দিয়ে জল গড়াতে থাকে। এই প্রথম, আজাদ নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার পরে, তিনি কাঁদেন।

তাঁকে কাঁদতে দেখে বাড়ির ছেলেমেয়েরাও বিনবিনিয়ে কাঁদতে থাকে। আজাদের মায়ের আর ভাত খাওয়া হয়ে ওঠে না। তখন সারাটা দুনিয়ায় যেন আর কোনো শব্দ নেই। কেবল কয়েকজন বিভিন্ন বয়সী নারী-পুরুষের কান্নার শব্দ শোনা যায়। তারা আপ্রাণ চেষ্টা করছে চোখের জল সামলাতে, বুকের ভেতর থেকে উঠে আসা রোদনধ্বনি দমন করতে তারা পারে না।

রাত্রিবেলা সবাই ভাত খাচ্ছে। মহুয়া মায়ের কাছে যায়। 'আম্মা, দুইটা রুটি সেঁকে দেই। খাবেন?'

মা মাথা নাড়েন। খাবেন।

তাঁকে রুটি গড়িয়ে দেওয়া হয়। একটুখানি নিরামিষ তরকারি দিয়ে তিনি রুটি গলায় চালান করেন।

খাওয়ার পরে, শোয়ার সময় তিনি আর খাটে শোন না; মহুয়া, কচি, টিসু অবাক হয়ে দেখছে গত দু'রাত ধরে আম্মা মেঝেতে পাটি বিছিয়ে শুইছেন। তারা বিস্মিত হয়, বলে,

'আম্মা, এইটা কী করেন, আপনে মাটিতে শুইলে আমরা বিছানায় শুই কেমনে?' কিন্তু আম্মা কোনো জবাব না দিয়ে মেঝেতেই শুয়ে পড়েন। মাথায় বালিশের বদলে দেন একটা পিঁড়ি।

তখন কচি, ১১ বছর বয়স, মহুয়াকে বোঝায়, 'আম্মা যে দেখছে রমনা থানায় দাদা মেঝেতে শুইয়া আছে, এই কারণে উনি আর বিছানায় শোয় না, না বুঝি!'

এর পরে আজাদের মা বেঁচে থাকেন আরো ১৪ বছর, ১৯৮৫ সালের ৩০ আগস্ট পর্যন্ত, এই ১৪ বছর তিনি কোনো দিন মুখে ভাত দেননি। একবেলা রুটি খেয়েছেন, কখনও কখনও পাউরুটি খেয়েছেন পানি দিয়ে ভিজিয়ে। মাঝে মধ্যে আটার মধ্যে পেঁয়াজ-মরিচ মিশিয়ে বিশেষ ধরনের রুটি বানিয়েও হয়তো খেয়েছেন। কিন্তু ভাত নয়। এই ১৪ বছর তিনি কোনো দিন বিছানায় শোননি।

তিনি আবার যান জুরাইনের মাজার শরিফের হুজুরের কাছে, হুজুরাইনের কাছে। হুজুর তাঁকে অভয় দিয়ে বলেন, 'ইনশাল্লাহ, আজাদ ফিরে আসবে। শিগগিরই আসবে।"

ম্যাক্সিম গোর্কির মা ও আজাদের মা

বিশ্ব সাহিত্যের একটি কালজয়ী উপন্যাস 'মা'। এর রচয়িতা রুশ ঔপন্যাসিক ম্যাক্সিম গোর্কি। রচনাকাল ১৯০৭। ১৯০৫ সালের রাশিয়ার বিপ্লবের পরে, যে বিপ্লবে গোর্কি নিজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। লেখেন এ অসামান্য উপন্যাসটি। গোর্কি জানিয়েছেন, একটি বাস্তব ঘটনা থেকে 'মা' উপন্যাসের সৃষ্টি। ১৯০২ সালে তিনি খবর পান, নিঝ্নি নভগোরোদের শহরতলি সরমভোতে মে-দিবসে একটি মিছিল বেরিয়েছিল। সেই মিছিলের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন একজন রাজনৈতিক কর্মী পিত্তর আন্দ্রেভিচ জালোমোভ (১৮৭৭-১৯৫৫)। তিনি মিছিলের পুরোভাগে থেকে একটি ব্যানার বহন করছিলেন। মিছিলে আক্রমণ হলো, কিন্তু জালোমোভ ব্যানার নামিয়ে ফেলতে রাজি হলেন না।

অন্যান্যের সঙ্গে তাকে গ্রেফতার করা হলো, শুরু হলো জালোমোভের বিচার। অনেকে মনে করেন, এই বিচারের সময় তিনি আদালতে যে জবানবন্দি দিয়েছিলেন, গোর্কিই তা লিখে দেন। বিচারে জালোমোভের নির্বাসন হলে গোর্কি তাকে নিয়মিত অর্থ দিয়ে সাহায্য করতেন এবং তার মুক্তির জন্য তিনশ' রুবল দিয়েছিলেন। জালোমোভ আদালতে যে জবানবন্দি দিয়েছিলেন, তা শ্রমিক শ্রেণীকে গণঅভ্যুত্থানে অংশগ্রহণ করতে সাহায্য করবে বলে লেনিন তার 'স্ফুলিঙ্গ' পত্রিকায় উল্লেখ করেছেন। গোর্কি আসলে জালোমোভ ও তার মায়ের সান্নিধ্যে এসেই 'মা' উপন্যাসটি লিখতে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন।

আনিসুল হক গোর্কির ঠিক ৯৬ বছর পরে (২০০৩ সালে) আরেক মায়ের সংগ্রামের এক আশ্চর্য সত্য কাহিনী নিয়ে লেখেন বাংলা ভাষার 'মা'। দুই মায়েরই লক্ষ্য এক ও অভিন্ন। গোর্কির মায়ের লক্ষ্য পুঁজিবাদ উৎখাত করে সমাজতন্ত্র কায়েম করা আর আজাদের মায়ের লক্ষ্য পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মাতৃভূমিকে উদ্ধার করা। দুই মাই

ছেলেকে অনুমতি দেন বিপ্লবে যেতে, যুদ্ধে যেতে। সত্যি নারী তুমি অপার প্রেরণা, তুমি মহান। মা তোমাদের অভিবাদন।

'মা'কে নিয়ে দুটি প্রশ্ন

মাকে নিয়ে লেখা আনিসুল হকের 'মা' উপন্যাস সত্যিই অনন্য। তবে দুটি প্রশ্নের উত্তর জানা পাঠকের জন্য খুবই জরুরি। ১. সাফিয়া বেগমের দুর্যোগ মুহূর্তে পিতৃকুল তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়ে ছিল কি-না এ ব্যাপারে লেখক সম্পূর্ণ নীরবতা অবলম্বন করেছেন। অথচ সাফিয়া বেগমের বাবা ছিলেন ব্রিটিশ ভারতের একজন নামকরা ধনী লোক। মেয়ের এমন সঙ্গীন মুহূর্তে কোনো বাবাই কি মেয়ের পাশে এসে না দাঁড়িয়ে পারেন? সুতরাং বোদ্ধা পাঠকের মনে এ প্রশ্ন জাগতেই পারে।

২. জাহানারা ইমাম, আজাদের খালাতো ভাই জায়েদসহ অনেকের উদ্ধৃতিতে আনিসুল হক লিখেছেন, সাফিয়া বেগম আজাদকে যুদ্ধে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন জুরাইনের পীর সাহেবের নির্দেশে। এমনকি মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি নিয়মিত যোগাযোগও রেখেছিলেন এ পীর সাহেবের সঙ্গে। আনিসুল হক তার বইয়ের ভূমিকা এবং পরিশিষ্টে উল্লেখ করেছেন, আজাদের মায়ের ঘটনা জানতে তিনি অনেকের সঙ্গেই সাক্ষাৎ করেছেন এবং তাদের নামের একটি তালিকাও দিয়েছেন। কিন্তু লেখক জুরাইনের পীর সাহেবের সঙ্গে কেন সাক্ষাৎ করলেন না— এ ঔৎসুক্য অনেকের ভেতরেই থেকে যাবে। একজন পীর হয়ে বাঙালিদের পক্ষাবলম্বন করা তৎকালীন প্রেক্ষাপটে কোনো সহজ কথা নয়। এমন একজন মহান স্বাধীনতাপ্রেমীর সাক্ষাৎকার না নেয়াটা কি ইচ্ছাকৃত ভুল, না কোনো দুরভিসন্ধি! আনিসুল হক, 'মা'র পরের সংস্করণে এর একটা বিহিত চাই।

শহীদ আজাদের মায়ের খোঁজে জুরাইন গোরস্থানে

১৯৮৫ সাল। ৩০ আগস্ট। আজাদের ধরা পড়ার ১৪ বছর পূর্ণ হওয়ার দিন। '৭১-এর পর মা আর কোনো দিন ভাত খান নি, দুটো পাতলা রুটি, একটু সবজি হলেই তাঁর দিন চলে যায়, কী শীত, কী গ্রীষ্ম, তাঁর বিছানা মেঝেতে পাটি বিছিয়ে, খুব শীতের রাতে গায়ের ওপরে দুটো শাড়ি ভাঁজ করে ঢেকে দেওয়া থাকে।

সেই রাতটা কাছে আসছে। এদিকে শাহজাহানপুরের এক দীনহীন বাসায় থাকা আজাদের মার শরীরটা খুবই খারাপ হচ্ছে। হাঁপানির টান যখন ওঠে, তখন তিনি এত কষ্ট পান যে মনে হয় এর চেয়ে মৃত্যুই শ্রেয়। এর মধ্যে একটা দিনের জন্যেও, সেই ১৯৬১ সাল থেকে, তিনি স্বামীর মুখ দেখেননি। নিজের মুখও তাকে দেখতে দেননি। আজাদের মা জায়েদকে ডেকে বলেন, 'আমার আর সময় নাই।'

জায়েদ বলে, 'আম্মা, ডাক্তার ডাকি।'

মা বলেন, 'ডাকো। এত দিন ধরে আমাদের দেখছেন, বিদায় নিই।'

তাঁকে যে ডাক্তার দেখতেন, টাঙ্গাইলের লোক, ডাক্তার এস. খান, তাঁকে ডাকা হয়। ডাক্তার এসে দেখেন, আজাদের মা শুয়ে আছেন স্যাঁতসেঁতে মেঝের ওপরে বিছানো একটা পাটিতে। তিনি বিস্মিত হন না। কারণ তিনি জানেন, কেন এই ভদ্রমহিলা

মেঝেতে শোন। তবে ঘরের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ তাঁকে চিন্তিত করে। গলিটা ময়লা, একধারে নর্দমা উপচে উঠেছে, দুর্গন্ধ ঘরের ভেতরে পর্যন্ত এসে ঢুকছে। ঘরটাতেও আলো তেমন নেই।

তবে সাফিয়া বেগমের মুখখানা তিনি প্রশান্তই দেখতে পান। তিনি তাঁর নাড়ি পরীক্ষা করেন, স্টেথোস্কোপ কানে দিয়ে তাঁর বুকের ভেতরের হাপরের শব্দের মর্ম অনুধাবন করেন। রোগীর অবস্থা বেশি ভালো নয়। এখনই ক্লিনিকে নিয়ে গিয়ে একটা শেষ চেষ্টা করা যায়।

ডাক্তার বলেন, 'বোন, কী করবা!'

মা বলেন, 'আপনাকে দেখলাম। দেখতে ইচ্ছা করছিল। তাই ডেকেছি। আপনার আর কী করার আছে! আমার সময় হয়ে এসেছে। আমাকে বিদায় দিন। ভুল-ত্রুটি যা করেছি, মাফ করে দেবেন।'

'হসপিটালে যাওয়া দরকার।'

'না। দরকার নাই।'

'আল্লাহ!' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ডাক্তার কিছু ওষুধ দিয়ে বিদায় হন।

মা বলেন, 'উকিল ডাকো। গেণ্ডারিয়ার জমিগুলো আমি লেখাপড়া করে দেব।'

উকিল ডাকা হয়।

তিনি গেণ্ডারিয়ার জমি তাঁর ভাগ্নে-ভাগ্নীদের নামে আর জুরাইনের মাজারের নামে দলিল করে দেন।

২৯ আগস্ট পেরিয়ে যায়। আসে ৩০ আগস্ট। আজাদ ধরা পড়ার ১৪ বছর পূর্ণ হওয়ার দিন। তিনি ভাগ্নে-ভাগ্নীদের ডাকেন। জায়েদকে বলেন, 'শোনো, আমার মৃত্যুর পরে কবরে আর কোনো পরিচয় লিখবে না, শুধু লিখবে— শহীদ আজাদের মা। বুঝলে!'

'জি।' জায়েদরা কাঁদতে শুরু করে।



জুরাইন গোরস্থানে শুয়ে আছেন সাফিয়া বেগম। একাত্তরে এই মা তাঁর একমাত্র ছেলেকে মুক্তিযুদ্ধে পাঠিয়েছিলেন জুরাইনের পীর সাহেবের নির্দেশে!

তিনি বলেন, 'শোনো, আসলে আজাদ যুদ্ধের সময়ই শহীদ হয়েছে। ওর বউয়ের জন্যে আমি কিছু গয়না রেখেছিলাম। এগুলো রেখে আর কোনো লাভ নাই। আজাদ তো আসলে যুদ্ধের সময়ই শহীদ হয়েছে। এগুলো তোমাদের দিয়ে গেলাম। তোমরা বড় হুজুরের সাথে আলাপ করে সৎকাজে এগুলো ব্যয় কোরো। আমার যাওয়ার সময় হয়েছে, আমি যাই বাবারা, মায়েরা...'

জায়েদ, টিসু, টগর, তাদের বউ-বাচ্চা, যারা তাঁর পাশে ছিল, তারা কাঁদতে থাকে।

তিনি ইশারা করে বলেন, 'কেঁদো না।' তিনি একটা ট্রাঙ্কের চাবি জায়েদের হাতে তুলে দেন। পরে, জায়েদ সেই ট্রাঙ্ক খুলে প্রায় একশ' ভরি সোনার গয়না দেখতে পায়! আশ্চর্য তো মহিলা, এতটা কষ্ট করলেন, কিন্তু ছেলের বউয়ের জন্য রাখা গয়নায় এই ১৪টা বছর হাত দিলেন না!

১৩ জিলহজ, ৩০ আগস্ট ১৯৮৫ বিকাল পৌনে ৫টায় আজাদের মা শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

মায়ের কবর দেখতে জুরাইন গোরস্থানে যাই শাহজাহান ভূঁইয়াকে নিয়ে। কন্ট্রাকটরি করার সুবাদে এ এলাকার সব অলিগলি তার চেনাজানা। গোরস্থানে গিয়ে মুহুরিকে জিজ্ঞেস করি, এই নামের কবরটা কোথায়? মুহুরি বলে, পিতা বা স্বামীর নাম ছাড়া কোনো লাশের নাম এন্ট্রি করা হয় না। বলি, এ মায়ের প্রতিজ্ঞা— মৃত্যুর পর তাঁর এপিটাফে লেখা থাকবে শুধু 'মোসাম্মৎ সাফিয়া বেগম, শহীদ আজাদের মা'। মুহুরি বিরক্ত হয়। বলে, তাহলে আপনারা গোরস্থানে ঢুকে খুঁজে দেখতে পারেন।

নতুন-পুরাতন দু'অংশে ভাগ করা জুরাইন গোরস্থান, বিশাল তার সীমানা প্রাচীর। নতুনটায় তো থাকার কথা নয় তাই পুরানটায় খুঁজতে শুরু করি মায়ের কবর। ঘণ্টার পর ঘণ্টা পার হচ্ছে, মায়ের কবরের আর খোঁজ পাওয়া যায় না। আবার গিয়ে ধরি মুহুরিকে। বলি, আচ্ছা তার স্বামীর নাম এই, দেখুন তো এবারে পাওয়া যায় কি-না। মুহুরি বলে, সাল আর মাসের নাম বলুন। তবেই খুঁজে দেখা যেতে পারে। '১৯৮৫ সালের আগস্ট মাস', মুহুরি এন্ট্রি খাতা উল্টায়। এক পাতা, দু'পাতা... বেরিয়ে আসে মায়ের নাম। সাফিয়া বেগম। পাশে ইউনুস আহমেদ চৌধুরী! তাহলে মায়ের প্রতিজ্ঞা কি রক্ষা করা হয়নি?

এবার মাত্র দশ মিনিটের মধ্যেই খুঁজে পেলাম মায়ের কবর! এপিটাফে লেখা— "মোসাম্মৎ সাফিয়া বেগম। শহীদ আজাদের মা, মৃত্যু : ৩০ আগস্ট ১৯৮৫, তত্ত্বাবধানে : জুরাইন দরবার শরীফ।"

মায়ের জন্যে মন খুলে দোয়া করলাম, কবরের ছবি নিলাম বিভিন্ন এঙ্গেল থেকে। এক বুক দীর্ঘশ্বাস নিয়ে সোজা চলে এলাম জুরাইন দরবার শরীফে।

পীর সাহেবের সাক্ষাৎ পেতে চাই— জানালাম দরবার শরীফের এক খাদেমকে। খাদেম জানায়, পীর সাহেব কুমিল্লার মুরাদনগরে তাঁর গ্রামের বাড়িতে আছেন। সপ্তাহ খানেক পরে ঢাকা ফিরবেন। আমার ঔৎসুক্য আর ধরে রাখতে পারি না। কারণ '১৯৭১-এর

দিনগুলিতে' জাহানারা ইমাম এ পীর সাহেবের কথা লিখেছেন। আনিসুল হক লিখেছেন তার 'মা' উপন্যাসে। তাছাড়া এই মাত্র দেখে এলাম সাফিয়া বেগমের এপিটাফে লেখা জুরাইন দরবার শরীফের কথা। খাদেমকে জিজ্ঞেস করলাম, জুরাইনের পীর সাহেব কি ১৯৭১-এ আমাদের মহান স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে কাজ করেছেন? খাদেম অজ্ঞতা প্রকাশ করল। সে দিনের মতো ফিরে এলাম জুরাইন দরবার শরীফ থেকে।

জুরাইনের পীর সাহেবের সান্নিধ্যে

একে একে তিন সপ্তাহ গেলাম পীর সাহেবের সাক্ষাৎ পেতে— সাক্ষাৎ আর মেলে না। খাদেমদের একই উত্তর— হুজুর গ্রামের বাড়ি আছেন। শেষবারে বললাম, দয়া করে হুজুরের মোবাইল নম্বরটা দেবেন? অনেক ভেবেচিন্তে একজন ভেতর বাড়ি গিয়ে নম্বর এনে দিলেন। এগার অংকের গাণিতিক সংখ্যাটা মুহূর্তের মধ্যেই আমাকে যোগাযোগ করিয়ে দিল পীর সাহেবের সঙ্গে। পীর সাহেব কথা দিলেন দু'দিন পরে ঢাকা ফিরলে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটবে— ইনশাআল্লাহ।

জুরাইন দরবার শরীফে আছে সুবিশাল মসজিদ, মাজার আর একাধিক লঙ্গরখানা। মূল মাজারটি অনেকটা তাজ মহলের আদলে গড়া। পুরো দরবার শরীফ জুড়েই সৌম্য-শান্ত পরিবেশ বিরাজ করছে। জুরাইন-পোস্তগোলার মতো ধুলো-মলিন সড়কের কোলঘেঁষে শত বছরের পুরনো এমন একটি দরবার এভাবে নীরবে-নিভৃতে পড়ে আছে চোখে না দেখলে তা অনেকেরই বিশ্বাস হবে না।

দু'দিন পর ফোন দিয়ে চলে এলাম জুরাইন দরবার শরীফে। দরবার প্রাঙ্গণেই পীর সাহেবের বাসা। জুরাইনের পীর সাহেব 'বড় হুজুর' হিসেবে সবার কাছে পরিচিত। খাদেম আমাকে বড় হুজুরের বাসার ভেতর পর্যন্ত পৌঁছে দিল। মাথার ওপরে ফ্যান ঘুরছে, সামনে-পেছনে বাতি জ্বলছে। বিদ্যুৎ না থাকার তো কোনো কারণ দেখছি না, তাহলে জেনারেটর চলার এমন বিকট শব্দ কেন— খাদেমকে জিজ্ঞেস করলাম। খাদেম বলল, "এটা সালাহউদ্দিনের পেট্রোল পাম্পের জেনারেটরের আওয়াজ। দেখেন না, হুজুরের বাড়ির ওপরে তার বাউন্ডারি। দরবার শরীফের জায়গা দখল করে সে এটা বানিয়েছে। আমাদের সঙ্গে এ নিয়ে অনেক ঝগড়া-ফ্যাসাদ হয়েছে কিন্তু তার ক্ষমতার কাছে শেষ পর্যন্ত আমরা হার মেনেছি।"

ক্ষমতা শেষ তো 'দৌড়' সালাহ উদ্দিন ঠিকই দৌড়ের ওপর আছে অথচ পীর সাহেব আছেন বহাল তবিয়তে। সব সালাহ উদ্দিনের পরিণতি এমনই হয়, বুঝলেন খাদেম সাহেব — তাকে সান্ত্বনা বাণী শুনালাম।

একটু পরেই ভেতর থেকে বড় হুজুর বেরিয়ে এলেন। বড় হুজুর বয়সেও বেশ বড়। দাড়ি-চুলে পাক ধরেছে অনেক আগেই। কিন্তু তাকে দেখে বোঝার উপায় নেই আশি ছুঁই ছুঁই পক্ককেশী বৃদ্ধ। যেন কোনো তাগড়া যুবক। কথা বলার ভঙ্গিই আলাদা।

বড় হুজুরকে বললাম, আপনি কি সাফিয়া বেগমকে নিয়ে লেখা 'মা' উপন্যাসটা দেখেছেন এবং লেখক আনিসুল হকের সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎ হয়েছে? 'মা' উপন্যাসে জুরাইন দরবার এবং আপনাকে বেশ সুন্দরভাবেই উপস্থাপন করা হয়েছে। বড় হুজুর না

সূচক উত্তর করলেন। তাঁকে বললাম, আচ্ছা, সাফিয়া বেগম এবং '৭১-এ আমাদের মহান স্বাধীনতা সংগ্রামে আপনার ভূমিকা সম্পর্কে জানতে চাই, সঙ্গে আপনাদের দরবারের ইতিহাসটুকু যদি বলতেন?

"আমার নাম আলহাজ মাওলানা মোহাম্মদ কামরুজ্জামান চিশতী। ১৯৬৩ সাল থেকে আমি বর্তমান দায়িত্বে আছি। আমার আব্বারা ছিলেন তিন ভাই।

১. হযরত খাজা আবুন নাসের মৌলানা মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন চিশতী (রহঃ)

২. হযরত খাজা শাহ আখতারুজ্জামান চিশতী (রহঃ) এবং

৩. হযরত খাজা শাহ মোহাম্মদ শামসুজ্জামান চিশতী (রহঃ)।

বড় ভাই মৌলানা নাজিম উদ্দিন চিশতী (রহঃ) এ দরবারের মূল প্রতিষ্ঠাতা, তিনি ভারতের হায়দারাবাদের গুলবাদ শরীফের পীর হজরত খাজা শামছুদ্দীন আলম হোসাইনী চিশতী (রহঃ)-এর খলিফা ছিলেন।

একদিন স্বপ্নে নবীজি (সাঃ) গুলবাদের পীর সাহেবকে নির্দেশ দেন, তুমি বাংলা মুল্লুকে গিয়ে কামরুজ্জামানকে মুরিদ করো। অনেক উপকার হবে। এ স্বপ্ন দেখে গুলবাদের পীর সাহেব বাংলাদেশে চলে আসেন এবং আমাদের মুরাদনগরের পীর কাশিমপুরে এসে বড় চাচাকে মুরিদ করেন এবং খেলাফত দেন। তিনিই জুরাইনের এ দরবার গড়ে তুলেন। তাঁর মৃত্যু হয় ১৯৪০ সালে। এরপর গদীনসীন হন আমার আব্বা খাজা শাহ শামসুজ্জামান চিশতী। আমার দু' নম্বর চাচা কম বয়সেই মারা যান। মাত্র ৪০-৪৫ বছর বয়স পেয়েছিলেন। তিনি বড় চাচারও দশ বছর আগে ইন্তেকাল করেন। আমার আব্বা ইন্তেকাল করেন ১৯৬৩ সালে। এরপর আমি গদীনসীন হই।

তারা মিয়া (সাফিয়া বেগমের স্বামী ইউনুস আহমেদ চৌধুরীর ডাকনাম) আমার আব্বার ভক্ত ছিলেন। তাঁর কাছে মুরিদও হন। আব্বা মারা যাওয়ার পর আমার সঙ্গেও নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন। তিনি দেখতে খুব সুন্দর এবং স্মার্ট ছিলেন। সব সময় শাহী হালতে চলতেন। প্রচুর অর্থ-সম্পত্তির মালিক ছিলেন। পেশায় কন্ট্রাক্টর ছিলেন। তাঁর কনসটাকশন ফার্ম ছিল। দেশ-বিদেশ ঘুরে ঘুরে ডিজাইন কালেকশান করতেন। বাওয়ানি এবং আদমজি জুট মেইল তাঁর নকশাতেই করা। আমাদের এ দরবারের নকশাও তাঁরই। তিনি ভারত থেকে তাজমহলের নকশা এনে এটার কাজ শুরু করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত টাকার অভাবে পুরোপুরিভাবে মূল নকশাটা অনুকরণ করতে পারেননি। চৌধুরী সাহেব সেই পঞ্চাশের দশকেই মার্সিডিজ গাড়িতে চড়তেন। স্কাটন এবং ফরাশগঞ্জে তার আলিশান বাড়ি ছিল। গেণ্ডারিয়াতে ছিল কয়েকশ' বিঘা জমি। স্কাটনের বাড়ি, ফরাশগঞ্জের বাড়ি, গেণ্ডারিয়ার জায়গা সব তাঁর স্ত্রী সাফিয়া বেগমের নামে দিয়ে দেন। সাফিয়া বেগমও ছিলেন অনেক বড়লোকের মেয়ে। তাঁর বাবা মেয়ের বিয়েতে ২০০ ভরি স্বর্ণ দেন! সাফিয়া বেগমের একমাত্র ছেলের নাম ছিল আজাদ। চৌধুরী সাহেবের সঙ্গে সাফিয়া বেগমও নিয়মিত এ দরবারে আসতেন।

মানুষের টাকা হলে যা হয়। চৌধুরী সাহেব নিয়মিত 'বারে' যেতেন। ঢাকা ক্লাবে যেতেন। প্রথম প্রথম সঙ্গে করে তাঁর স্ত্রীকে নিতেন। সাফিয়া বেগম এসব পছন্দ

করতেন না। অনেকবারই আমাকে বলেছেন। বারে কোনো ভালো মানুষ যায়? রাত ২টায়-৩টায় বাসায় ফেরে, কী কী করে...।

আমার আব্বা অনেক চেষ্টা-তদবির করেছেন চৌধুরী সাহেবকে এসব থেকে ফেরাতে। আমিও করেছি। কোনো ফল হয়নি।

আজাদের মা বড়লোকের মেয়ে হলেও খুব ধর্মভীরু ছিলেন। নিয়মিত নামাজ পড়তেন, বোরকা পরে চলতেন। হঠাৎ একদিন আজাদের বাবা দ্বিতীয় বিয়ে করে বউ নিয়ে ঘরে উঠেন। সাফিয়া বেগম এটা মেনে নিতে পারেননি। তিনি খুব অভিমানী মহিলা ছিলেন। এ বিয়ের কারণে আজাদের মা আজাদকে নিয়ে এক কাপড়ে মধ্যরাতের পর বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসেন। সঙ্গে করে বাবার দেয়া স্বর্ণ নিয়ে এসেছিলেন। এটা ১৯৬১ সালের ঘটনা হবে। এরপর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি কোনোদিন স্বামীর চেহেরা দেখেননি। তার চেহেরাও চৌধুরী সাহেবকে দেখতে দেননি। এরপরের ইতিহাস খুবই মর্মান্তিক। এত বড়লোকের মেয়ে এবং স্ত্রী অথচ এরপরে তিনি জুরাইন, শাহজাহানপুর এবং মগবাজারের বস্তিতে ছিলেন। ২০০ ভরি স্বর্ণ ছিল তার কাছে। এগুলোতে হাত দেননি। এটা আজাদের হবু স্ত্রীর জন্য রেখে দিয়েছিলেন। কারও কাছ থেকে কখনও কোনো সাহায্য গ্রহণ করেন নি।

'৭১-এর আগস্ট-সেপ্টেম্বরের দিকে সাফিয়া বেগম হঠাৎ একদিন আমার কাছে এসে আজাদের যুদ্ধে যাওয়ার জন্য অনুমতি চায়। আমি অনুমতি দিয়ে দেই। এক রাতে আজাদকে পাকিস্তানি আর্মিরা ধরে নিয়ে যায়। সে আর ফিরে আসেনি। সাফিয়া বেগম অনেকবারই আমার কাছে জানতে চেয়েছে— আজাদ বেঁচে আছে কি-না, আজাদ ফিরে আসবে তো? সাফিয়া বেগমের সে কথা আমার কানে এখনো ভাসে, 'ভাইসাব, আপনি না বলেছেন আসবে— আমার আজাদ তো আর আসলো না'... আমি বলেছি বেঁচে আছে, একদিন না একদিন ফিরে আসবেই। কারণ শহীদরা তো মরে না। (কোরআনের আয়াত উদ্ধৃতি করে) সে হিসেবে আমার বলা ঠিক আছে। এক সময় গিয়ে তিনিও বুঝেছিলেন আজাদ বেঁচে নেই। একজন শোকাতুর মাকে কি সরাসরি বলা যায় যে, তার ছেলেকে পাকিস্তানিরা মেরে ফেলেছে! এ মানবিক কারণেও আমি সত্যকথাটা বলতে পারিনি।

স্বাধীনতার পর পুত্রশোকে সাফিয়া বেগম একেবারে ভেঙে পড়েন। ভাত খাওয়া ছেড়ে দেন। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এক বেলার জন্যও ভাত খাননি। শুধু রুটি-সবজি খেয়ে বেঁচে ছিলেন। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত কোনোদিন খাটে শোননি। ইট, পিঁড়ি মাথায় দিয়ে ঘুমুতেন। শুকিয়ে একেবারে কাঠ হয়ে গিয়েছিলেন। হাতের হাড়গুলো গোনা যেত। হাড্ডির সঙ্গে চামড়া লেগে যায়। সব সময় সাদা শাড়ি, সাদা ব্লাউজ পরতেন। বোরকা পরে চলতেন। ছাই রঙের বোরকা। বোরকাটা ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছিল। সব সময় রোজা রাখতেন, নামাজ পড়তেন, প্রতি বছর স্বর্ণ বিক্রি করে তাঁর সে স্বর্ণের জাকাত আদায় করতেন। তাঁর মতো এমন আবেদা মহিলা আমার জীবনে আমি খুব কমই দেখেছি। তার নামে চৌধুরী সাহেবের একাধিক বিলাসবহুল বাড়ি এবং ৫২ বিঘা জমি ছিল—

এগুলো কোনোটাই নিজে ছুঁয়ে দেখেননি। মৃত্যুর আগে নিজের টাকায় জুরাইন কবরস্থানে কবরের জায়গা কিনে রাখেন। ১০ হাজার ১ টাকা দিয়ে জায়গাটা কিনেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর সে জায়গাতেই তাঁকে দাফন করা হয়েছে।

তাঁর অসিয়ত ছিল মৃত্যুর পরেও যেন চৌধুরী সাহেবকে তার চেহেরা দেখতে দেওয়া না হয়। মৃত্যুর পর জুরাইন দরবারেই তাঁর জানাজা হয়। সংবাদ পেয়ে চৌধুরী সাহেবও এসেছিলেন। চৌধুরী সাহেবের অনেক অনুরোধের পর খাদেমরা তাকে দেখতে দেন। চৌধুরী সাহেব কাঁদতে কাঁদতে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন। মৃত্যুর আগে সব স্বর্ণ তাঁর বোনের ছেলে-মেয়েদের দিয়ে যান। আমাকে একটা সিলভারের বক্স দিয়েছিলেন। তার ভেতরে ২ ভাবীর মতো স্বর্ণ ছিল। আর একটা বালাও দিয়েছিলেন। দিয়ে বলেছিলেন এটা ভাবীর জন্য। গেণ্ডারিয়ার জমি তাঁর ভাগ্নে-ভাগ্নী এবং জুরাইন দরবারের নামে দলিল করে দেন। গেণ্ডারিয়া পুকুর, ডিস্ট্রিলারি রোড, ডিআইটি প্লট এগুলো সব তারই জায়গা। পরে ডাকাত শহীদ (কমিশনার শহীদ) সব কিছু জোর করে দখল করে নেয়। সাফিয়া বেগমের মৃত্যুবার্ষিকীতে তার ভাগ্নে-ভাগ্নী জাহিদ, মহুয়ারা মাঝে মাঝে আসে।

'৭১-এ বাঙালিদের ওপর পাকিস্তানিদের অত্যাচার ছিল পৃথিবীর মানবেতিহাসের জঘন্যতম ঘটনা। আমরা ছিলাম মজলুম। ইসলাম কখনো জালেমের পক্ষে যেতে বলেনি। তাই আমরা আমাদের বাঙালি ভাইদের পক্ষেই ছিলাম। যতভাবে সম্ভব হয়েছে মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতা করেছি।

আমার ছোট ভাই শাহ আলম সরাসরি মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের সার্টিফিকেটও আছে তাঁর নামে। আমাদের কাশিমপুর বাড়িতে মুক্তিযোদ্ধাদের খাইয়েছি, থাকতে দিয়েছি, ঘুমুতে দিয়েছি, তারা আমাদের কাছে প্রচুর অস্ত্রও জমা রাখত। আমাদের বাড়িতে হিন্দু-মুসলমান সবাই আসত। হিন্দুদের আত্মরক্ষার জন্যে মুসলমান নাম রেখে দিতাম। পাঞ্জাবি-পাজামা এবং টুপি পরাতাম। আর বলে দিতাম, পাঞ্জাবিরা জিজ্ঞেস করলে বলবে, তোমরা মুসলমান। হিন্দুরা তাদের আলমারি, ট্রাঙ্কে ছোট ছোট মূর্তি রাখত, সেগুলো পুকুরে ফেলে দিয়েছি। আমাদের বাড়িতে রাতে যারা ঘুমুতেন আম্মা তাদের কাছে গিয়ে টর্চ জ্বালিয়ে খোঁজখবর নিতেন।

যুদ্ধের ন'মাস আমি ঢাকা-বাড়ি যাওয়া-আসা করতাম। আমার সব ভক্ত-মুরিদকেই আমি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছি। আঃ মতিন নামে আমার এক ভক্ত যাত্রাবাড়ীর কমান্ডার ছিল। সে খুব ডেয়ারিং ছিল। সে একাই এ এলাকার পাঞ্জাবিদের আস্তানা তছনছ করে দিয়েছে। পাঞ্জাবিরা তাকে ধরিয়ে দিতে ১০ হাজার টাকা ঘোষণা করেছিল।

** এ লেখাটির সিংহভাগ মেটার আনিসুল হকের 'মা' থেকে নেয়া।*



জামায়াতীদের ষড়যন্ত্রের কারণে '৭১-এর ছ'মাস বায়তুল মোকাররমে মুয়াজ্জিন হিসেবে চাকরি করতে পারেননি আমীরে শরিয়ত আহমাদুল্লাহ আশরাফ

জৌলুসহীন খুব সাদামাটাই বলতে হবে বাংলাদেশ ইসলামী খেলাফত আন্দোলনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়টা। হাফেজ্জি হুজুরের পরশে যে কার্যালয়টি এক সময় ছিল প্রাণ চাঞ্চল্যমুখর উদ্বেলিত এখন তা প্রায় প্রাণহীন ও গতিহীন। চাকচিক্যহীন ব্লাকবোর্ড, পাটির বিছানা ইত্যাদি দেখতে দেখতে মনে পড়ে গেল- এখানেই তো দেশের ইসলামী রাজনীতির পথিকৃৎ হাফেজ্জি হুজুরের রাজনৈতিক সাহসী সব কর্মকাণ্ড চলেছে। আলেমদের তিনি দেখিয়েছেন- কেন এবং কিভাবে রাজনীতি করতে হয়। তাঁরই বড় ছেলে মাওলানা শাহ আহমাদুল্লাহ আশরাফ এর সাক্ষাৎ লাভেই আজ এখানে আসা। হাফেজ্জি হুজুরের ছেলে, খেলাফতে আন্দোলনের বর্তমান আমীরে শরীয়ত- এসবের বাইরেও অন্য একটা পরিচয়ে পরিচিত হতেই আমাদের আজকের কথোপকথন। মাহে রমজানের দুপুরে জোহরের নামাজ শেষে বসে পরলাম কথায় কথায় দুপুরের ঝকঝকে আলোয় অন্ধকারে হাতড়ে ফেরা আলেম মুক্তিযোদ্ধার ইতিহাসকে আলোকিত করে তুলতে।



যেদিন আর্মি আক্রমণ করবে সেদিন বাংলাদেশ হবে

মাওলানা শাহ আহামাদুল্লাহ আশরাফ ১৯৭১ সালে জাতীয় মসজিদ বায়তুল মুকাররমের মুয়াজ্জিন হিসেবে দায়িত্বরত ছিলেন। অত্যন্ত কাছ থেকে তিনি মুক্তিযুদ্ধকে অবলোকন করেছেন, শিকার হয়েছেন পাকসেনাদের অত্যাচার, নির্যাতনের। প্রতিবাদ লড়াই করেছেন বর্বরতার, মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তায় হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন দেশের স্বাধীনতা কামনায়। বয়সের এ প্রান্তে এসে সে সবের যা কিছু স্মরণে এসেছে তাই জানানোর চেষ্টা করেছেন তিনি। ১৯৬৩ সাল থেকে ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত বায়তুল মোকাররম মসজিদের মুয়াজ্জিন ছিলেন মাওলানা আশরাফ। সে সময়ের বায়তুল মোকাররমের কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন, তখন বায়তুল মোকাররম ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে শুরু করেছে। মসজিদের কাজ শুরু করে বাওয়ানী গ্রুপ। একটা আশাঙ্কা কাজ করত আমাদের মাঝে। এত বড় মসজিদ বানাতে গিয়ে বাওয়ানি গ্রুপ দেওলিয়া হয়ে যায় কি-না? কিন্তু এসব কোনো কিছুই ঘটেনি। বরং মসজিদের আয়তন বেড়েছে বেশ

দ্রুত। আমরা নানা পরামর্শ দিতাম মসজিদের উন্নয়নে। '৭১-এ ধীরে ধীরে আন্দোলন দানা বাঁধতে থাকে। কোনো সন্দেহ নেই বাঙালি মুসল্লিদের মধ্যে তার প্রভাব ছিল সুস্পষ্ট। অন্যান্যদের মতো আমরাও খুব উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লাম। কি করব কোনো কিছুই বুঝে উঠতে পারছিলাম না। এরই মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ঢাকায় এলেন জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম-এর সাধারণ সম্পাদক মুফতি মাহমুদ। তাঁর কাছে জানতে চাইলাম, কী হতে যাচ্ছে ভবিষ্যতে। তিনি আমাদের বললেন, যে দিন দেখবা আর্মি আক্রমণ করছে সেদিনই বাংলাদেশ হবে। এর কিছু পর ঠিকই আসল কালো রাত। ঢাকায় শুধু আগুনের কুণ্ডলী। আমি বুঝে গেলাম বাংলাশেই আমাদের আসল ঠিকানা।

দোয়া করে মওতের প্রস্তুতি নিলাম

বায়তুল মোকাররম মসজিদের মুয়াজ্জিন শাহ আহমাদুল্লাহ আশরাফ মসজিদের পাশেই টুপি, জায়নামাজের ছোট দোকান নিয়ে বসেছিলেন সে সময়। একদিন কি ভয়ানক কাণ্ডটা-ইনা ঘটাল হিংস্র হানাদাররা। মাওলানা আশরাফ-এর ভাষায়– অন্যান্য দিনের মতো একদিন আমি আমার দোকানে বসে ছিলাম। একদল পাকিস্তানি সৈন্য আসল আমার সামনে। তাদের একজন একটা জায়নামাজ ধরে তার দাম জানতে চাইল। নির্দিষ্ট দাম বলে দিলাম। সে এর চেয়ে অনেক কম দামে নিতে চাইল। আমি পরিষ্কার জানিয়ে দিলাম, এ দামে কিনাও হয়নি এ জায়নামাজ। তারপরও সে এক রকম জোর করে কিনতে চাইলে আমি তাকে ধমকের সুরে বললাম, রাখ জায়নামাজ! এ জায়নামাজে তোমাদের নামাজ হবে না জোর করে নিলে। আমার এ ধমকে একেবারে চটে গেল সেই আর্মি। বলল, সে আমাকে ধমক দিয়েছে, সে মুক্তিযোদ্ধা, আমি তাকে গুলি করব। অন্যরা গুলি না করার কথা বললে সে আমাকে তৎক্ষণাৎ গুলি না করে এরেস্ট করে আর্মির গাড়িতে তুলে নেয়। এরেস্ট যখন করেই ফেলল, তখন আমি মনে মনে ভাবতে থাকলাম, এরা তো কাউকে ধরে নিলে আর বাঁচিয়ে রাখে না, মেরে ফেলে। আমাকে তো মেরেই ফেলবে, তবে মরার আগে মাইরাই মরব। গাড়িতে একটা লোহা পড়ে আছে। তা দেখে মাথায় বুদ্ধি এলো– লোহা দিয়ে ড্রাইভারকে দিব এক বাড়ি। তারপর গাড়ি থেমে গেলে একটা কিছু হবে। কিন্তু এ কাজটি করার জন্য আমি যখন নড়েচড়ে বসতে চাইলাম তখনই কড়া নজরদারি শুরু হয়ে গেল আমার ওপর। বন্দুক বুকে ধরে রাখা হলো। ফলে মেরে মরার চেষ্টাটাও ব্যর্থ হলো। আমাকে গাড়িতে করে যাত্রাবাড়ি আর্মি ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হলো। জায়নামাজ ক্রেতা সেই আর্মি আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনল– সে মুক্তিযোদ্ধা, তাকে এখনই হত্যা করে ফেলতে হবে। অন্য এক পাঞ্জাবি আর্মির কথা মনে আছে। সে তখন বলেছিল– এ ছেলের কোনো দোষ নেই। আমিও তখন জানতে চাইলাম, কোন অপরাধে আমাকে মারা হবে? এ কথা বলা মাত্রই ইচ্ছামত আমাকে মারল। আর্মি অফিসার নির্দেশ দিয়ে দিল– তাকে অমুক ডোবায় নিয়ে যাও। তার অর্থ– ডোবায় নিয়ে অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে আমাকে মেরে ফেলা হবে। সেই পাঞ্জাবি আর্মিসহ অন্যরা আমাকে বিদায় জানাল। আমিও দোয়া করে মওতের প্রস্তুতি নিলাম। গাড়িতে উঠে মৃত্যুর পথযাত্রী হলাম এবার। যখনই গাড়ি ছাড়বে ঠিক তখনই পেছন থেকে এক আর্মি আমাকে ডাকছিল। বলল, গাড়ি থেকে নেমে আসো। নামার পর আমাকে ধমক দিয়ে বলল– এক দৌড় দাও। আমি তখন ভাবলাম, ডোবায় নয়, বরং দৌড় দিতে গিয়ে পেছন থেকে গুলি করে আমাকে মারা

হবে। শেষ পর্যন্ত আল্লাহর নাম নিয়ে দৌড়ের প্রস্তুতি নিলাম। দ্রুত না ধীরে ধীরে দৌড়াতে থাকলাম। যে কোনো সময় গুলি এসে জীবনটা কেড়ে নিতে পারে। এমন একটা কঠিন সময়ে দৌড়ে দূরে যাচ্ছি বটে, কিন্তু গুলি এসে গায়ে লাগছে না। এক পর্যায়ে বুঝতে পারলাম, তারা গুলি করছে না এবং পালিয়ে যাওয়ার সময় দিচ্ছে। আল্লাহর রহমতে সেদিন বেঁচে গেলাম একেবারে মৃত্যুর কাছাকাছি গিয়েও।

আরেকদিন এ রকম আরেকটি ঘটনা ঘটল। লালবাগে তখন কার্ফিও চলছিল। আমি রাস্তায় বের হলে আমাকে ধরে ফেলল আর্মিরা। ফায়ারিং স্কোয়াডে নিয়ে যাচ্ছিল মারার জন্য। পথিমধ্যে মুসলিম লীগের এক নেতা আমাকে দেখে চিনে ফেলে। আর্মিদের সঙ্গে আমাকে বায়তুল মোকাররমের মুয়াজ্জিন হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেয়। এ যাত্রায় রক্ষা পাই। বায়তুল মোকাররমে মুয়াজ্জিন থাকাকালে সামনে থেকে দেখেছি পাক হানাদারদের নানা রকম বর্বরতা। আমার সামনে দিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের ধরে নিয়ে গেছে ফায়ারিং স্কোয়াডে। যাদেরকে সম্ভব হয়েছে মসজিদে আশ্রয় দিয়েছি, পথ দেখিয়েছি কোথায় কিভাবে, কোন দিকে যেতে হবে।

মওদুদীর চায়ের টেবিলে কাঁপন

১৯৭০-এর কোনো এক সময় জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা মওলানা মওদুদী ঢাকায় এলেন। জামায়াতবিরোধী হিসেবে আমার একটা পরিচিতি তখন থেকেই ছিল। আজিমপুরে মওদুদীর সঙ্গে নাস্তার টেবিলে বসার আমন্ত্রণ পেলাম। আমাকে সেখানে জমিয়তে উলামা-এর নেতা হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেয়া হলো। মওদুদীকে আমি বললাম– আপনারা তো আমাদের জমিয়তে উলামাকে কমিউনিস্ট পার্টি মনে করেন। কোনো ইসলামী পার্টি মনে করেন না। তো আপনারা এক হোন না কেন? আমার সামনে ছিল নেজামে ইসলাম পার্টির নেতা এডভোকেট ফরিদ আহমেদ। তিনি বললেন, আমরা তো এক, একসঙ্গে আন্দোলন করছি। আমি বললাম, আপনারা যতই এক বলেন আমি দেখি দুই। আপনারা উপরে উপরে এক, ভেতরে ভেতরে দুই। আমার এ কথায় একেবারে রেগে উঠলেন ফরিদ আহমেদ। আমি তাকে মাথা গরম না করে ঠাণ্ডা হবার জন্য বললাম। মওদুদী ও ফরিদ আহমেদ দু'জনকেই লক্ষ্য করে বললাম, আপনারা এ রকম মুনাফেকী রাজনীতি কতদিন করবেন? আমাদের সোসালিস্ট বলছেন, ইসলামে তো সোসাল প্রোগ্রাম আছে। কিন্তু আপনারা আসলে পুঁজিবাদীদের বাঁচানোর জন্য ইসলামী গণতন্ত্র, ইসলামী গণতন্ত্র ধোয়া তুলছেন। অত্যন্ত চালাক মওদুদী এ বিষয়ে আর কথা বলতে চাইলেন না। এ বিষয়ে এড়িয়ে অন্য প্রসঙ্গে চলে গেলেন। এ ঘটনার পর জামায়াতীরা আমার উপর আরো ভাল করে ক্ষেপেছিল এবং এরই ফলশ্রুতিতে '৭১-এ ছয় মাস আমি বায়তুল মোকাররমে মুয়াজ্জিন হিসেবে চাকরি করতে পারিনি। মসজিদের পাশে দোকান দেয়ার অজুহাত দিয়ে আমাকে চাকরিচ্যুত করে দেয়া হয়। কিন্তু তাদের এ ষড়যন্ত্র আর টিকে থাকেনি। নতুন স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হয়। বঙ্গবন্ধু বাসা থেকে ধরে নিয়ে আমাকে আবার চাকরিটা ফিরিয়ে দেন।

আমাদের কামরাঙ্গীরচর মাদরাসায় এ রাজাকার গোষ্ঠী একবার অস্ত্র রাখতে চেয়েছিল। আমি তাদেরকে মুখের ওপর না করে দিয়েছিলাম এই বলে– মুক্তিযোদ্ধারা আমার ভাই, তাদের কেন মারব?



মাওলানা আহমাদুল্লাহ আশরাফ বললেন, মুক্তিযুদ্ধের সময় আমি অনেক মুক্তিযোদ্ধাকে ব্যক্তিগতভাবে সাহায্য করেছি, মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য আলাদা ক্যাপ বানিয়েছি। বাড়িতে তা বানিয়ে দোকানে বিক্রি করেছি। কামরাঙ্গীরচর মাদরাসায় রাজাকারদের প্রতিহত করেছি–বাবার সামনে এসব কিছু করার পরও তিনি কোনোদিন বড় ছেলে হিসেবে আমাকে বলেননি এগুলো করো না, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে যেও না

মোহাম্মদুল্লাহ হাফেজ্জি হুজুর

হাফেজ্জি হুজুর কোন পক্ষে ছিলেন?

হাফেজ্জি হুজুর মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে না বিপক্ষে ছিলেন? এ প্রশ্নের উত্তর ছুঁড়ে দিলাম তাঁরই ছেলে মাওলানা আশরাফ-এর দিকে। এর উত্তরে তিনি বললেন, মুক্তিযুদ্ধের সময় আমি অনেক মুক্তিযোদ্ধাকে ব্যক্তিগতভাবে সাহায্য করেছি, মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য আলাদা ক্যাপ বানিয়েছি, ইন্ডিয়ান আর্মির ক্যাপের মতো ছিল এটি। বাড়িতে তা বানিয়ে দোকানে বিক্রি করেছি। কামরাঙ্গীরচর মাদরাসায় রাজাকারদের প্রতিহত করেছি– বাবার সামনে এসব কিছু করার পরও তিনি কোন দিন বড় ছেলে হিসেবে আমাকে বলেননি এগুলো করো না, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে যেও না। বরং আমার মনে হয়েছে, আমার এসব কাজের প্রতি তাঁর এক রকম মৌন সম্মতি ছিল। বাবা স্বাভাবিকভাবে খুব বেশি একটা কথা বলতেন না, চুপচাপ থাকতেন, যিকিরফিকিরে মগ্ন থাকতেন। সেজন্য হয়তো তখন প্রকাশ্যে কোনো বিবৃতি দেননি। তবে আলেমদের মধ্যে যারা তার কাছে আসতেন তিনি স্পষ্টভাবে তাদের একথা বলতেন,

ইসলামের বিপক্ষে নয় বরং জালেমের বিপক্ষে মজলুমের সংগ্রাম এটি। এছাড়া মুক্তিযুদ্ধের সময় অনেক মুক্তিযোদ্ধাকে দেখেছি বাবার কাছে দোয়া নিতে এসেছেন। কোনো পাকিস্তানি আর্মিকে কখনো দেখিনি বাবার কাছে দোয়ার জন্য আসতে।

হাফেজ্জি হুজুরের চার ছেলে ও ৬ মেয়ে ছিল। তাদের মধ্যে বড় ছেলে মাওলানা শাহ আহমাদুল্লাহ আশরাফ বর্তমানে বাবার পথ অনুসরণ করে খেলাফত আন্দোলনের আমীরে শরীয়ত বা দলীয় প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। পাশাপাশি কামরাঙ্গীরচর মাদরাসাসহ একাধিক মাদরাসা তত্ত্বাবধান করছেন। কারী হিসেবে সুখ্যাতি আছে মাওলানা আশরাফের। উপমহাদেশের নামকরা কারী ফতেহ মোহাম্মদ এবং বাংলাদেশের কারী খলিলুর রহমান থেকে কারিয়ানা শিখেছেন। বয়সের ভারে অনেকটা নুয়ে পড়েছেন, স্মৃতির খাতা থেকে অনেক কিছু মুছেও গেছে। তারপরও বলিষ্ঠ ও সাহসী কণ্ঠস্বরের মাওলানা আশরাফ বাবার গৌরবময় ঐতিহ্য ধরে রাখার ব্যাপারে বেশ আশাবাদী। বাবার মতো আলেম রাজনীতিক পরিচয়ে অমর না হতে পারলেও আলেম মুক্তিযোদ্ধা পরিচয়ে অমর হওয়া কি কম গর্বের!



'রাজাকারের কেচ্ছা'

সেই কিশোরটি। যে একদিন মাদ্রাসা থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল রাজাকার হবে বলে। কর্মকর্তারা বন্দুক দাঁড় করিয়ে মাপলেন তার উচ্চতা। বন্দুক থেকে কয়েক ইঞ্চি ছোট হলো সে। শেষ পরীক্ষা নেওয়ার জন্য এক হাতে বন্দুক ওঠাতে বললেন। অনেক কষ্টে ওঠাল সে। পরীক্ষায় ফেল। তাই তাড়িয়ে দেয়া হলো কিশোরটিকে।

কিছুদিন পর আশ্চর্য এক পাগলের সঙ্গে পরিচয় হলো কিশোরের। পাগলের পকেট ভর্তি দিয়াশলাই। যখন তখন যেখানে সেখানে আগুন জেলে বেড়ানোই তার পাগলামির ধরন।

অই ছেমরা তোর নাম কি?

এক সন্ধ্যায় শহরের রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল কিশোর। আশেপাশে ফেলল তার সন্ধানী দৃষ্টি। খুঁজে পেল না প্রশ্নকর্তা কে? ব্যস্তসমস্ত মানুষ হেঁটে চলছে আপন মনে। বিরামহীন যানবাহন ছুটছে দ্রুত গতিতে। রাস্তার মোড়েই এক ডাস্টবিন। অসংখ্য মাছি ভনভন করছে সেখানে। একটি কুকুর নোংরা ঘাঁটছে। তার পাশেই এক পাগল দিয়াশলাইয়ের কাঠিতে আগুন জ্বালছে ফরফর শব্দে।

নতুন ধরনের পাগল দেখে আশ্চর্য হলো কিশোর। কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল অবাক চোখে। কিন্তু প্রশ্নকর্তা কে? কিশোর খুঁজবে তাকে না এগিয়ে যাবে আপন পথে? দ্বিধা-দ্বন্দ্বে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। তখন আবার সেই কণ্ঠ শোনা গেল।

আমিই জানতে চাইছি তোর নাম।

কিশোর ইতিউতি তাকিয়ে আবিষ্কার করল সামনের পাগলটিই সেই প্রশ্নকর্তা। একটি দিয়াশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে কিশোরের দিকে চেয়ে সে তখন মৃদু মৃদু হাসছে। সন্ধ্যার আধোআঁধারে সেই হাসি কেমন রহস্যময় মনে হলো কিশোরের চোখে।

আমার নামে তোমার কাজ?

পাল্টা প্রশ্ন রেখে কৌতূহলী হয়ে পাগলের দিকে এগুলো সে। শহরে তখন পুরোপুরি সন্ধে নেমেছে। রাস্তায় জ্বলে উঠেছে দু'একটি ক্ষীণ আলোর বাল্ব। কিছুক্ষণ আগেও যত মানুষ ছিল, তা এখন ভোজবাজির মতো মিলিয়ে গেছে। মাঝে মধ্যে দু'একটা যানবাহন শহরের রোডঘাটের জেগে থাকা জানান দিচ্ছে। সন্ধ্যার এই মৌন নৈঃশব্দের মাঝে শব্দ যেন ভূতুড়ে রাজ্যের সৃষ্টি করেছে। সন্ধ্যার শহর কোনো নিশীথ রাতের নগরী যেন।

কিশোর জানে, এ শহরে ওর কোনো ভয় নেই। মাথার ঢেউখেলানো কিস্তি টুপি, গায়ে আদ্দির ফিনফিনে পাঞ্জাবি, ওর ভয় না পাওয়ার সাইন বোর্ড। যাদের ভয় পায় মানুষ। সেই তাদেরই দলে রয়েছে কিশোরের অনেক বন্ধু-বান্ধব। তাই এ কিশোর নির্ভয়। সময়ের জ্ঞান না রাখলেও চলে তার রাস্তাঘাটে।

আয়, অই গেরেজটায় গিয়া বই।

আচমকা কিশোরের হাত ধরে টান দিল পাগল। হতভম্ব হলো কিশোর। কি এক আকর্ষণে এগিয়ে গেল পাগলের সঙ্গে।

গলির একটু ভেতরেই পরিত্যক্ত এক গাড়ি বারান্দায় বসল ওরা। পাশেই মস্ত তেতলা বাড়ি। দু'একটি জানালায় ক্ষীণ চোরা আলো ছাড়া সমস্ত বাড়িতে প্রাণের কোনো সাড়া নেই।

তোরে আমি ছিনি।

বলেই পাগল বিড়ি বের করল ছোট্টা ঝোলা ঘেঁটে। কথা শুনে পাগলের চোখে চোখ রাখল কিশোর। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল আপাদমস্তক। পাগলের পরনে ময়লা রংজলা শততাপ্পীমারা আদ্দিকালের প্যান্ট। হাঁটু পর্যন্ত গোটানো এক পা। অন্য পা পাতা ছড়িয়ে লটপটাচ্ছে ধুলোয়। গায়ে কোন সেকালের এক ছেঁড়া ফতুয়া। দাবার ঘরের মতো বিভিন্ন রঙের ঘর কাটা। মাথায় ঘনকালো লম্বা চুলে পাখির বিষ্ঠা। ডাস্টবিনের নোংরা। রীতিমত দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। এক মুখ দাড়ি-গোঁফের একই অবস্থা। পাগলের দাঁতগুলো শুধু আশ্চর্য রকম ঝকমকে সাদা। কিশোরও পাগলটিকে চেনে। মাদ্রাসা গেটে দেখেছে অনেক দিন। স্পষ্ট মনে পড়ল এখন।

তোমাকেও চিনি।

বলল কিশোর। ওর সদ্য ভাঙা-স্বর কণ্ঠে কেমন এক উত্তেজনা।

আগুইনা পাগলেরে না ছিননের আছে কি?

এই জাতীয় জীবনে আগুনের এহন বড় দরকার।

তাই আমি রাস্তায় রাস্তায় আগুন জ্বালাইয়া ঘুরি।

কেউর যদি দরকার অয়।

সামনের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে কেমন নির্লিপ্ত কণ্ঠে কথাগুলো বলল পাগল। ও পাশে খুট করে শব্দ হতেই দু'জনে ভয়ে জড়োসড়ো হলো। আগুনে পাগল টপ করে ভাঙা টিনের দরজার ওপাশে দৌড়ে গেল। কিশোর ভয়ে মূর্তি হয়ে রইল। ডান পাশে পাঁচিলের ধারে বাঘের চোখের মতো দুটো চোখ জ্বলছে। অন্ধকারে আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। কিশোর যখন ভয়ে চোখ বন্ধ করতে যাচ্ছে তখনই 'মিউ' শব্দ হলো। দরজার আড়াল থেকে ঝটিকায় বেরিয়ে এলো পাগল। শালার বিলাই। পাকবাহিনীর মতো ভয় পাওয়াইয়া দিছিল।

ধর হালার পুতেরে। বলেই লাথি মারতে গেল। বেড়ালের দিকে পাগলকে তেড়ে যেতে দেখে খিঁক খিঁক করে হেসে উঠল কিশোর।

চুপ, হাসনের কি অইল। এটাও একটা পাকবাহিনীর চেলা। শালার তাজা খাসি মার্কা শরীলটায় লাথিটা লাগাইবার পারলাম না।

তিন তলার জানালা গলিয়ে যে ক্ষীণ চোরা আলোটুকু আসছিল। তাও নিভে গেছে কিছুক্ষণ আগে। মাঝে মধ্যে শুধু এদোগলির কুকুরদের ঘেউ ঘেউ শব্দে এ শহর প্রাণহীন নয় প্রমাণিত হচ্ছে।

কিরে বিড়ি খাবি। নে খা। ভয় কইমা যাইব।

আমি ভয় পেয়েছি তোমাকে কে বলল?

পাগলের কথায় খেপে উঠল কিশোর। বিড়ি টানতে টানতে মিটিমিটি হাসল পাগল। সে তো তাই চায়। সাহসী, খেপা, বুদ্ধিমান, মাদ্রাসার একটি কিশোর। বিড়িতে শেষ টান দিয়ে পাগল বলল।

তোর নামটা তো এহনো কইলি না।

আমার নাম জেনে তোমার কি হবে?

তারচে' বল আমাকে কেন ডেকে এনেছ।

মাদ্রাসার ঘটনাটা মনে পড়তেই কিশোরের সমস্ত শরীরে কে যেন আগুন ধরিয়ে দিল। কেমন ছটফট করতে লাগল ও। মাদ্রাসা জীবনে এ রকম ঘটনা এই প্রথম। যে সমস্ত ছেলেরা গত দু'তিন বছর ধরে ওর কিল-ঘুষি খেয়ে অনায়াসে চেলাগিরি করে যাচ্ছিল, তারাই কিনা শাসাল কিশোরকে। মুখের ওপর তর্জনি নাড়িয়ে বলে গেল ওর দু'হাত মুচড়ে দেবে। ওরা এখন মাদ্রাসায় নেই। দেড়-দু'মাস ধরে রাজাকারের ট্রেনিং নিচ্ছে। বাছাই করা কিছু ছেলে গিয়েছে। যাদের ওজন এবং উচ্চতা মেপে নেয়া হয়েছে। কিশোর অবশ্য ওজনে কম ছিল না। উচ্চতায় একটু কম হয়ে গেছে।

কিশোর বুঝতে পারছিল। ট্রেনিংয়ে যাওয়ার পর থেকেই কেমন পাল্টে যাচ্ছিল ওরা। দিন দিন পাকিস্তানি হয়ে উঠল। অথচ ওরা ট্রেনিংয়ে গিয়েছিল নিজেদের বেঁচে থাকার জন্য যুদ্ধকৌশল শিখতে। ট্রেনিংয়ের ফাঁকে ফাঁকে আর্মি জিপে করে ওরা মাদ্রাসায় আসতে লাগল। চোখে-মুখে হামবড়া ভাব। প্রথম প্রথম ওরা কিশোরের দিকে ট্যারা চোখে তাকাত। হাসত দাঁত কেলিয়ে। তারপর আজ সকালে সেই ঘটনাটি ঘটে যাওয়ার পরপরই কিশোর ছুটে গিয়েছিল সেই হুজুরের কাছে। যিনি ট্রেনিংয়ের উজিরে আজম।

খেপা ষাঁড়ের মতো জিদগুলো কিশোরকে গুঁতিয়ে বেড়াচ্ছে দিনভর। একটা কিছু করতেই হবে ওদের বিরুদ্ধে। ওদের রুখা প্রয়োজন।

আমি জানি তুই একটা কিছু করবার চাস এবং তাই নিয়া এতক্ষণ ভাবতাছস। আমার লগে কাজ করবি?

কথা ক'টা বলে পাগল আবারও বিড়ি ধরাল।

ড্রেনের পাশ দিয়ে একটা চিকা ছুটে গেল চিকিরমিকির করে। চৌরাস্তার বটগাছ থেকে ভেসে আসছে প্যাঁচার ডাক। কেমন একটা ভুতুড়ে থমথমে ভাব সমস্ত শহরে। কিশোর

তার মাথার টুপিটা নিয়ে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করল। তারপর গম্ভীর এবং উত্তেজিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল কি কাজ করতে হবে বলো। আমি যে কোনোরকম কাজ করতে প্রস্তুত।

শাবাশ।

আমি জানি তোরে দিয়া অইবো। কিশোরের কাঁধে আলতো হাত রাখল পাগল। উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে কিশোর আবার জিজ্ঞেস করল বললে না তা কি কাজ।

পাগল আচমকা দিয়াশলাইয়ের একটি কাঠি জ্বালিয়ে কিশোরের মুখের সামনে তুলে ধরল। লাল লাল চোখে তাকিয়ে থেকে বলল আগুন জ্বালাবি। পারবি?

ওদের রুইখা দাঁড়াবি। পারবি না?

বুকে জমে থাকা সমস্ত দিনের জ্বালাগুলো কিশোরের ডান হাতে এসে জড়ো হলো। অন্ধকারে অদৃশ্য ঘুষি মেরে ফাটিয়ে ফেলতে চাইল রাজাকারদের চোখ-মুখ।

পারব না কেন? একশ' বার পারব।

পারতেই হবে।

'যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা'

মুক্তিবাহানী বিচ্ছুকা বেটা কাঁহা হ্যায়? বাপকা বেটা হোতো মোকাবেলা কারো।

স্টেনগান তাক করে চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে ধীর পায়ে সামনে এগুতে থাকে অন্তু। কোথাও কোনো মুক্তিবাহিনীর সাড়াশব্দ না পেয়ে বিরক্ত হয়ে পেছনে রাজাকারদের দিকে আগুন চোখে তাকায়। রাজাকাররা প্রায় ভুল খবর দিয়ে নিজেদের ফায়দা লোটার জন্য মিলিটারিদের ডেকে নিয়ে আসে গ্রামে। এটাও এ রকম একটি ঘটনা কি-না সন্দেহ করে অন্তু জোর ধমক লাগায়।

কাঁহারে তোমার মুক্তিবাহিনী কাঁহা আছে? দেখাদো কৌন মুক্তি আছে? উসকা বাপকা নাম হাম ভোলা দেউংগা।

অন্তুর পেছনে হাঁটতে থাকা দু'জন কম বয়সি টুপি মাথায় আর লম্বা পাঞ্জাবি পরা রাজাকার হাত কচলায়। মাথানত করে কান চুলকে উত্তর দেয় হুজুর কিছুক্ষণ পূর্বেই আমরা ভি খবর পেয়েছি। এই ইখানেই ভি বেটারা ছিল ভি।

এর্কি মাত করো জরুর লে আও। মুক্তিবাহানী কাঁহা আছে।

মিলিটারি অফিসার অন্তু রাজাকারদের উদ্দেশ্যে চোখ রাঙিয়ে ধমক লাগায়। ইখানে ছিল তো আভি কাঁহা গায়া? কেয়া হাওয়া অর পাবান বান গিয়া? যাও তোম দুনো আচ্ছা কারকে দেখ কোন ফোকারমে বাইটা হ্যায় মুক্তি। অন্তুর ধমকে রাজাকার দু'জন গ্রামের দিকে ছুটে যায় মুক্তিবাহিনীর খোঁজে।

ছোট্ট সুন্দর পাখি ডাকা, নদী বয়ে চলা গ্রাম বকুলতলি। ভোরের পাখির ডাকে এ গ্রামের মানুষ জেগে ওঠে। মাঠেঘাটে কাজ করে সারাদিন। বউঝিরা পুকুর ঘাটে জল আনতে যায়। মাছরাঙ্গা ছোট মাছের লোভে ছোবল মারে, পুকুরের টলটলে জলে।

আজ যে হঠাৎ কি হলো? ডাকতে ভুলে গেল ভোরের পাখি। লাঙ্গল ছেড়ে ঝোপঝাড়ে পালাল সরল চাষী। পুকুর ঘাটে কলসি ফেলেই দৌড় দিল ঘোমটা টানা বউ! বকুলতলির চারদিকে পালাও পালাও চিৎকার। বুকফাটা কান্নার শব্দ। যে যেদিকে পারল ছুটে পালাল। ছুটল মা-বোন। ছুটল বাবা, চাচা, বুড়ো আর বুড়ি। পোষা কুকুর, সেও ছুটল লেজ গুটিয়ে। চারদিকে এলোপাতাড়ি গুলির আওয়াজ।

বকুলতলি গ্রামবাসীদের বকুল ফুলের মালাটা ছিঁড়েই গেল বুঝি। নিরীহ গ্রামবাসী কলিমুদ্দির বুড়ো বাপ আর বুড়ি মাকে ধরে নিয়ে এলো দুই রাজাকার।

ওদের মুখে-চোখে উপচেপড়া হাসি। দুই বুড়ো-বুড়িকে অন্তুর পায়ের সামনে জোরে ধাক্কা মেরে ফেলে দিলে হাউমাউ করে কেঁদে উঠল বুড়ো-বুড়ি।

অযথা কান্না শুনে ক্ষেপে উঠল অন্তু। ওদের মুখের দিকে বুট পা তুলে জিজ্ঞেস করল।

বাতা, মুক্তিবাহিনী কাঁহা আছে? তোম দুনোকো ইনাম মিলেগা। মুক্তিবাহিনীকা পাতা দো।

প্রশ্ন শুনে স্টেনগান তাক করা মিলিটারি অফিসারের দিকে করুণ চোখে তাকাল কলিমুদ্দির বাপ। চোখের জল মুছতে মুছতে ইনিয়ে বিনিয়ে বলল।

মিলিটিং বাবারে, হামি বুইড়া মরা মানুষ আছি, কুছ জানি নারে। হামি মুক্তিবাহিনী নারে, আমারে ছাইড়া দে রে বাবা।

একজন রাজাকারকে ইশারা করে অন্তু ধমক লাগাল,

ইস বুড্ডাকো এ্যারেস্ট কারকে ক্যাম্পমে লে যাও।

কলিমুদ্দির বাপকে বেঁধে নিয়ে যেতে চাইলে কলিমুদ্দির মা পাগলের মতো ছুটে এলো। অন্তুর পায়ে কেঁদে লুটিয়ে পড়ল বুড়ি।

বাবা মিলিটিংরে বাবা মিলিটিং, অই মানুষটি বড় ভালারে বাবা, মানুষটারে ছাইড়া দে রে। মানুষটার বদলি আমারে বাইন্দা নেও বাবা। কলিমুদ্দির মার কথা শুনে হো হো করে হাসল মিলিটারি অফিসার। বুড়ির চুল টেনে সামনে থেকে সরিয়ে দিয়ে বলল, এই বুড্ডিকো ভি লে যা। হামার রান্দাউন্দা কারবে। বাঙ্গাল মুলক মে আচ্ছা কোই নোকর নেহি মিলতা হ্যায়।

রাজাকার দু'জন কলিমুদ্দির বাপ এবং মাকে নিয়ে জিপগাড়ি স্টার্ট দিল।

এক ধরনের বীরত্ব বীরত্ব ভাব নিয়ে মুক্তিবাহিনীর উদ্দেশ্যে গালাগাল দিতে দিতে হেঁটেই ক্যাম্পের দিকে এগুতে লাগল অন্তু। দু'চার কদম হাঁটলেই যাওয়া যায় বকুলতলি বাজারে তাদের অস্থায়ী ক্যাম্প। একটু এগুতেই টুকটুকে লালশাড়ি পরা একটি ছোট্ট মেয়ে এসে কেঁদে লুটিয়ে পড়ল অন্তুর পায়ের ওপর।

আমারে আপনে বাঁচান। ও আর্মি স্যার আমার মুরগিটারে আপনে বাঁচান।

ছোট্ট এ রকম একটি সুন্দর মেয়ের কাকুতি শুনে এককথায় গলে গেল অন্তু। সাত-পাঁচ না ভেবেই ও বলে ওঠে,

কিয়া হুয়া। আচ্ছাকারকে বোলো। মেয়েটির ডাগর চোখে চোখ পড়তেই একটু মায়া হলো তার। তাই এবার নরম স্বরে জিজ্ঞেস করল।

তোমহারা কেয়া নাম আছে বেটি?

হাতের উল্টোপিঠে চোখের জল মুছতে মুছতে মেয়েটি হেঁচকি তুলতে তুলতে বলল,

আমার নাম টুনি। আদরের মুরগিটারে আমার শেয়ালে লইয়া গেছে। মুরগির কথা শুনেই অন্তুর মুখে কলবল করে ঢেউ বইল জলের। আহ! বাঙ্গাল মুলকমে-ই-এক আচ্ছা চিজ হ্যায়!

পরমুহূর্তেই কি মনে করে হো হো করে হেসে ওঠে অন্তু।

শালা! ইনসানকা খানা জানোয়ার নে লেগিয়া! মুরগি পাকারকে শিয়াল হারামি কাঁহা গিয়া মুঝে বাতাও। আজ মাই উসকা মৌত বানা দেউংগা।

এই যে এই দিকে বলেই পুকুর পাড়ের দিকে দৌড়ে যায় টুনি। পেছনে অন্তু। আজ বুঝি শেয়ালের রক্ষে নেই।

হ্যান্ডসআপ। অস্ত্র দূরে ফেলে দাও। হাত উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকো। এক পা নড়েছ কি গুলি করে মাথার খুলি উড়িয়ে দেব একদম।

ব্যাপারটা এত দ্রুত ঘটে গেল যে, অন্তুর মতো এত বড় মিলিটারি অফিসারও বুঝে উঠতে পারল না কিছুই। অস্ত্র ফেলে দাঁড়িয়ে রইল কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে। এক সময় মাথায় রাইফেলের গুঁতো অনুভব করল। ওর অকেজো ব্রেনে তখন ঘুরপাক খাচ্ছে, হুক্কা হুয়া হুক্কা হুয়া!

এক কলসি জল ঢালার পর জ্ঞান ফিরল অন্তুর। চোখ খুলেই ও চেঁচিয়ে উঠল,

আমি আর মিলিটারি হবো না। আমাকে মুক্তিবাহিনী বানাতে হবে। অন্তুকে ঘিরে থাকা মিলিটারি মুক্তিবাহিনী খেলার সাথীবন্ধুরা হেসে উঠল খিলখিল করে।

মফস্বল স্কুলে তখন ক্লাস বসার ঘণ্টা বেজেছে। ঘণ্টা শুনেই হন্তদন্ত হয়ে স্কুলের দিকে ছুট লাগাল ওরা।

'এখন যুদ্ধে যাওয়ার সময়'

ভালোবাসি আমার দেশকে আমি। ভালোবাসি এই মাটিকে আমি। আমার দেশ আমার মা। এই মাটি আমার মায়ের শরীর।

ভালোবাসি আমার মাকে আমি। ভালোবাসি আমার মায়ের শরীরকেও আমি।

একদিন।

শেষবিকেলের সূর্য যখন লাল হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছিল, ঠিক তখন। চম্পানগরের পশ্চিম দিকে প্রচণ্ড হইচই শোনা গেল। অনেকটা মরে-বেঁচে থাকা গ্রামের সব মানুষ দৌড়ে পালাল। সমবেত কণ্ঠে শোনা গেল।

আগুন!

আগুন!

চিৎকার।

বুকের গভীরে ব্যথার আগুন নিয়ে পালাতে পারল না শুধু ওরা। ওদের মনে প্রতিশোধের ঢেউ উঠল। বেদনার নদীতে বয়ে গেল টালমাতাল ঝড়। খেপা ষাঁড়ের মতো ক্রুদ্ধ হলো ওরা। যুদ্ধে যাওয়ার ঘোড়ার মতো অবাধ্য হলো ওদের মন।

ওরা

একজন শহীদ।

একজন গফুর।

অন্যজন ক্ষিতীশ।

আর কতদিন সহ্য করব এসব? চেঁচাল শহীদ।

আমি কালই যুদ্ধের ট্রেনিং নিতে যাব।

দীর্ঘদিনের জমিয়ে রাখা ক্ষোভ প্রকাশ করল গফুর।

শালার পুতগো আমি একটা একটা কইরা মারুম।

রাগে ফেটে পড়ল ক্ষিতীশ।

তিনজন রাগী যুবকের প্রতিজ্ঞা শুনল বিকেলের হু হু বাতাস। চারদিকের সবুজ গাছপালা। নীরব ফসলের মাঠ হয়তো খুশিতে নেচে উঠলো।

পারবে তোমরা আমাদের রক্ষা করতে?

তিনজন যুবক গোল হয়ে দাঁড়িয়ে কাছাকাছি এলো। শুধু দৈহিকভাবেই নয়। ওদের হৃদয়ও বোধ হয় এ মুহূর্তে ধেনোফড়িংয়ের মতো লাফিয়ে এলো হৃদয় নদীর আরো কাছে।

তিনজন যুবকের মুষ্টিবদ্ধ ছ'টি হাত গর্জে উঠল শূন্যে। তিনটি মুখে একটি স্লোগান ফেটে বেরুল।

আমার দেশ তোমার দেশ।

তিনটি যুবকের বুকের পাঁজর কাঁপিয়ে প্রতিউত্তর এলো।

বাংলাদেশ। বাংলাদেশ।

এ সময় গুলির শব্দে ওদের উত্তেজনা অনেকটা কমে গেল। গুলির শব্দের রেশ ধরে গ্রামের পশ্চিম দিকে তাকিয়ে ওরা শিহরিত হলো।

শেষবিকেলের সূর্যের লাল আভার সঙ্গে মিশে আগুনের লেলিহান জিব যেন চম্পানগর গ্রামটাতে সৃষ্টি করেছে একটি হাবিয়া দোজখের। মেয়েদের বাঁচাও বাঁচাও চিৎকার।

শিশুদের নারকীয় কান্নার সুরে ধৈর্যহারা হলো ওরা। শহীদ বলল চল এগিয়ে যাই।

গফুর উত্তর দিল।

মরতে যাবি নাকি খালি হাতে?

দাঁত কিড়মিড়িয়ে ক্ষিতীশ বলল–

শালা আমার একটা অস্ত্র চাই।

শমুন্দির পুতগো আমি একটা একটা কইরা শেষ করুম।

তারপর।

তিনজন যুবক ওপারে ট্রেনিংয়ে যাওয়ার জন্যে কেউ বাকসো ভাংলো। কেউ কাট্‌ল বাঁশের খুঁটির ব্যাংক। ওপারে নেয়ার জন্যে আদম চালান ব্যবসায়ীরা ওদের থেকে টাকা নিল। তারিখ পাল্টালো ঘন ঘন।

এক সময়।

তিনটি যুবক মুষড়ে পড়ল। ভাবল টাকা ফিরিয়ে নিয়ে অন্য পার্টিকে দেবে। সময় আর সুযোগের অপেক্ষায় ওৎ পেতে থাকে ওরা।

কানাকানি হতে হতে একদিন ব্যাপারটি জানাজানি হলো সমস্ত গ্রামে। ঘটনা শুনে আলম মাতব্বর ছুটে এলেন। শহীদ গফুরকে ডাকিয়ে দাড়ি চুলকোতে চুলকোতে কিছু ধর্মের কথা শোনালেন। ভুল ব্যাখ্যা দিলেন হাদিসের। ট্রেনিংয়ে যাওয়া-টাওয়া থেকে বিরত থাকতে বললেন বারবার।

কিছুক্ষণ নীরব থেকে প্রচণ্ড রেগে ওঠে শহীদ।

মাতব্বর চাচা, তুমি কি দেশের জন্যে কিছু করতে নিষেধ করছ আমাদের। মা-বোনদের ওপর নির্যাতন করল ওরা। গ্রামে গ্রামে আগুন দিল। তারপরও আমরা কিছু করব না বলো?

কথা শুনে তিন বার আস্তাগফার পড়লেন আলম মাতব্বর। সুন্নতি চুল ঢাকা মাথা দুলিয়ে বললেন,

ভাতিজা কস কি? কস কি তোরা এই সব? মা-বোইন কইলি তুই কাগোরে? লেখাপড়া শিখা তোরা কি অইলি? অই মালাউনের বাচ্চাগুলিরে কইলি মা আর বোইন? হিন্দুরা যদি তোর মা আর বোইন অয়, তবে আসল মা-বোইনরা তোর কি লাগে?

পকেট থেকে দামি সিগারেট বের করে তাতে আগুন ধরায় আলম মাতব্বর, খুব আয়েশের ভঙ্গিতে টান দিতে দিতে এবার বলল,

কাইল তো আগুন দিয়া গেল খালি হিন্দু পাড়ায়! তো ভাতিজা, তোগো কথা অগো কানে গেলে মুসলমান পাড়ায়ও আগুন দিতে ছাড়ব না কইলাম। এহনো সময় আছে ভাতিজা, বালা অইয়া যা কইতাছি।

দামি সিগারেটের ধুঁয়া আকাশে ছড়াতে ছড়াতে দ্রুত চলে যান আলম মাতাব্বর।

স্রেফ প্রাইমেরি পাস গফুর, শহীদ ভেবে পেল না আলম মাতাব্বরের কথার অর্থ। হিন্দু, মুসলমান, ধর্ম শব্দগুলো ওদের মাথায় কিলবিল করতে লাগল। শহীদ ভাবল।

হিন্দু আর মুসলমান কি? আমরা যে সবাই এক গ্রামের মানুষ। কতকাল একসঙ্গে থাকছি। কত বছর ধরে এক লাঙ্গলে, এক মাঠে হাল ধরে আসছি। মানুষে-মানুষে এই মেলামেশা কি ধর্মের দেয়াল দু'ভাগ করে দেবে?

মানুষে-মানুষে বিচ্ছিন্নতা আনে যে ধর্ম, সে কি রকম ধর্ম? এ ধর্ম কাদের জন্য? মানুষের জন্যে? মানুষের জন্যে হলে মানুষে-মানুষে আবার এত খুনাখুনি কেন?

এরা কোন মানুষ, যারা আমাদের গ্রামে আগুন দিচ্ছে? এরা কোন মানুষ, যারা আমাদের কানে হিন্দু মুসলমানের বিষ ঢালছে? ওরা, ওরা এবং আমরা সবাই মানুষ। এক স্রষ্টার সৃষ্ট জীব।

দূরে ক্ষিতীশকে দৌড়ে আসতে দেখে শহীদের ভাবনার সুতোটা ছিঁড়ে গেল।

দৌড়ে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে ক্ষিতীশ বলল।

এই শহীদ পার্টি খবর পাঠিয়েছে। আজই নৌকা যাইব ওপারে। আমাগো তৈরি হইয়া এক্ষুনি যাইতে কইছে।

খবর শুনে তিন যুবক আনন্দে-উত্তেজনায় কাঁপতে থাকে।

আমি চুপি চুপি মাকে একবার বলে আসি।

বলল শহীদ।

এই ফাঁকে আমিও আমার ব্যাগটা নিয়ে আসি।

বলল গফুর।

ক্ষিতীশের হাতে এক টুকরো পোড়ামাটি। গতকাল ওদের পাড়ায় আগুন দিয়েছে। ওর মাকে ধরে নিয়ে গেছে। ওর বাবাকে গুলি করে হত্যা করেছে।

ক্ষিতিশের কেউ নেই। না মা, না বাবা। না বাড়িঘর। ওদের পোড়াভিটের মাটির টুকরোটিকে গালে চেপে ধরল ও।

ও যেন ওর মা মাটি থেকে চুপি চুপি মঙ্গল চেয়ে নিল।

আশীর্বাদ করো, যুদ্ধে যাচ্ছি মা।

সেই কিশোরের খোঁজে

বইয়ের নাম 'খেলায় খেলায় মুক্তিযুদ্ধ'। লেখক আহমাদ উল্লাহ, হাসি প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বই সংগ্রহ করতে গিয়ে হাতে এলো এ বইটি। ভেতরটা উল্টেপাল্টে দেখলাম। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গল্প তিনটি– 'রাজাকারে কেচ্ছা, যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা ও এখন যুদ্ধে যাওয়ার সময়'। বাকিগুলো অন্য বিষয়ে। গল্প তিনটি এক নিশ্বাসে পড়ে ফেললাম। মনে হলো গল্পের নায়ক লেখক নিজেই। তার প্রতিচ্ছবিই ফুটে উঠেছে প্রতিটি গল্পে পরিষ্কারভাবে। পরিচিত গদ্য। তাহলে ইনি কি আমাদের সেই আহমাদ উল্লাহ ভাই, যার সঙ্গে একসঙ্গে



'যুগান্তর'-এ কাজ করেছি? যার পড়ালেখা জীবনের শুরুটা ছিল মাদরাসায়। দেশের একটি সেরা মাদরাসা থেকে হাফেজ হয়ে বেরিয়েছিলেন। তাই কারও কারও কাছে

'হাফেজ আহমাদ' নামেও পরিচিত তিনি এবং ষাটের দশকের শেষ অংশটা মাদরাসাতেই কাটিয়েছেন– এ ব্যাকগ্রাউন্ডটুকু আগেই জানা ছিল আমার। তাহলে আর দেরি নয়। তাঁকে খুঁজে বের করতেই হবে। কারণ তিনিও যে এ বইয়ের অন্যতম নায়ক।

খোঁজ পেলাম, এখন তিনি আরামবাগে হাসানের প্রেসে বসেন। আমাদের পরিচিত ঠিকানা। সোজা চলে গেলাম সেখানটায়। ভূমিকাহীন সরাসরি প্রশ্ন– 'রাজাকারের কেচ্ছা'র সেই কিশোরটি নিশ্চয় আপনি, 'এখন যুদ্ধে যাওয়ার সময়'–এ তিন কিশোর– শহীদ, গফুর, ক্ষিতীশ– এর মধ্যে নিশ্চয় আপনি একজন?– তুই ঠিকই ধরছত শিবলা। এত বছর পর হঠাৎ তুই এগুলো কইত্থিকা আবিষ্কার করলি– এসব লেখা তো '৭০-এর দশকের শেষ দিকের।

'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি'

'৭১-র নিয়ে সরাসরি আপনার মুখ থেকে শুনতে এসেছি, বলবেন কি সেই অগ্নিঝরা দিনগুলোর কথা, কিভাবে আপনি সেই ঐতিহাসিক সময়টার সাক্ষী হলেন...।

প্রিয় পাঠক, চলুন না ঘুরে আসি ১৪ বছরের এক কিশোরের স্বপ্নরাজ্য থেকে–

"আমার জন্ম ১৯৫৬-এর নভেম্বরে। জন্মের কয়েক বছরের মাথায় মাকে হারাই। বাবা কবির আহমাদ সচিবালয়ের নামিদামি অফিসার ছিলেন। এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্টের সেকশন অফিসার। '৬১তে হাফেজ্জি হুজুরের হাতে বায়াত হন। লম্বা লম্বা দাড়ি, সব সময় পাজামা, পাঞ্জাবি, টুপি পরেন। সৎ এবং ধর্মভীরু হিসেবে সচিবালয় জুড়ে তাঁর অন্যরকম নাম-ডাক ছিল। আমরা থাকতাম আজিমপুর সরকারি কলোনিতে। পলাশীর মাঠে খেলাধুলা করতাম। আমাদের কলোনির পাশেই ইউনিভার্সিটির হলগুলো। তাই রাজনৈতিক মিটিং-মিছিলের কারণে সব সময়ই এলাকাটা সরগরম হয়ে থাকত। ৮-১০ জনের খণ্ড খণ্ড মিছিল। মাঝে-মধ্যে মিছিলের সামনে বঙ্গবন্ধুকে দেখা যেত। খাজে দেওয়ান এবং লালবাগের চৌরাস্তায়ও বঙ্গবন্ধু মিটিং করতেন। অনেকবারই তাঁকে খুব কাছ থেকে দেখেছি। ঋজু, সুঠাম দেহের অধিকারী। তাঁর এ ভাবটা আমাকে খুব আকর্ষণ করত। আমি তখন লালবাগ মাদরাসায় হেফজ শেষ করে 'এবতেদায়ী ছানী'তে পড়ি।

খাজা খয়ের উদ্দিনের ঘাঁটি ছিল এ এলাকাতে। তিনি এ এলাকা থেকে মুসলিম লীগের প্রতীক হারিকেন মার্কায় দাঁড়াতেন। আলেম-ওলামাদের দলে ভেড়াতে চেষ্টা করতেন। আমার সহপাঠী যারা হারিকেন মার্কা করত তারা ফরিদপুরের শেখ... এরকম ছন্দ এঁকে ঠাট্টা করত। মাদরাসা থেকে বের হলেই সিঁড়ির সামনে গান বাজতে থাকত– জয় বাংলা, বাংলার জয়...। হুজুরদের বিরোধিতা করার জন্য মাদরাসার দিকে মাইক তাক করে দিত আ'লীগ কর্মীরা। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার পর মিছিলে স্লোগান উঠত– জেলের তালা ভেঙেছি, শেখ মুজিবকে এনেছি...। গান বাজতো 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি...। স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করানোর জন্য স্লোগান দেয়া হতো– মায়েদের বুকে দুধ নেই, শিশুরাই কাঁদছে...। এ লাইনগুলো

আমাকে নাড়া দিত। আমি ভাবতাম, মায়েদের বুকে দুধ নেই এ কেমন কথা। আমি ছিলাম মাহারা। তাই ভাবতাম, তাহলে স্বাধীনতা দরকার ।

এদিকে দেশের অস্থিতিশীল পরিস্থিতির কারণে আজিমপুর কলোনি থেকে প্রায় প্রতিদিনই অনেক ফ্যামিলি গ্রামের বাড়িতে চলে যেতে লাগল। আমাদের কোয়ার্টারে আব্বা আর আমি থাকতাম। আব্বা আমাকে নিয়ে সব সময় খুব আতঙ্কে থাকতেন। অনেকের কাছেই বলতেন- ছেলেটা চঞ্চল, নানান লোকের সঙ্গে মেশে। এখন তো আমাকে নিয়ে আরও দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলেন। তাই আমাকে চেক দিয়ে রাখতেন। যাতে কোনো জায়গায় না যাই। আমি আব্বার কথা খুব একটা শুনতাম না। দিন দিন রাজনৈতিক পরিস্থিতি জটিল হতে লাগল। এক পর্যায়ে দেখলাম, শহরের লোকেরা উৎকণ্ঠিত, ৭ মার্চের ভাষণে কী বলেন শেখ। আমার ভেতরেও একটা উন্মাদনা তৈরি হয়ে গেল ৭ মার্চের সমাবেশকে কেন্দ্র করে। এরপর তো দেখলাম মানুষ সংগঠিত হতে লাগল। এদিকে মাদরাসা থেকে বলে দেয়া হলো কেউ যেন ৭ মার্চের সমাবেশে না যায়। খাজা খয়ের উদ্দীনপন্থি ছাত্ররা বলত- যাইস্ না আহমাদ, মাদরাসা থেকে বের করে দেবে। কে কার কথা শুনে। ঠিকই ৭ মার্চের সমাবেশে সকাল ১০টায় মাদরাসা থেকে নাই হয়ে গেলাম- নোয়াখালীর এক সহপাঠী বন্ধুকে নিয়ে। ওর বাসা ছিল ধানমণ্ডিতে। টুপিটা পকেটে ঢুকিয়ে গলাগলি করে পৌঁছে গেলাম রমনার ময়দানে। সমাবেশে নাচলাম, স্লোগান দিলাম, ধুলায় ধূসরিত হয়ে গেল পাঞ্জাবি-পাজামা। সমাবেশ শেষ হলে এক ফাঁকায় এসে পাঞ্জাবি খুলে ঝেড়ে নিলাম।

হুজুরদের পিটুনির ভয়ে ওইদিন আর মাদরাসায় যাইনি। বাসায়ও যাইনি। বন্ধুটির ধানমণ্ডির বাসায় চলে গেলাম। সন্ধ্যার পর তারা পথ দেখিয়ে দিল এদিক দিয়ে আজিমপুর যেতে হবে...। বুক ধড়ফড় করছিল আব্বা বুঝে ফেলেন কি-না। তাই পলাশী মসজিদে গিয়ে অজু করে ফ্রেশ হয়ে বাসায় গেলাম। সন্ধ্যার পর যে সময়টা মাদরাসা ছুটি হয় ওই সময়েই বাসায় গেলাম। আব্বার কাছে আর ধরা খেলাম না।

৭ মার্চের ভাষণের পর থেকে ভেতরে একটা স্বপ্ন তৈরি হয়ে গেল এ দেশকে স্বাধীন করতেই হবে।

পরদিন থেকে মাদরাসায় যেতে লাগলাম। কুতুবখানায় ছাত্রদের জমিয়ে ট্রেনিং দেয়া হতো। বলা হতো দেশের ওপর শত্রুর আক্রমণ হলে প্রতিরোধ করতে হবে। আঘাত করতে হবে। আত্মরক্ষা করতে হবে- ইসলাম টিকিয়ে রাখার জন্য। আমরা ছোট বলে আমাদের লাঠি দেয়া হতো না। কেবল ওপরের ছাত্রদের দেয়া হতো। ছাদের ওপর গিয়ে বড় ছাত্ররা প্র্যাকটিস করত। মসজিদের কোনায় কোনায় খয়েরপন্থিদের মিটিং হতো- পাকিস্তানকে টিকিয়ে রাখার জন্য। আমার এগুলো ভালো লাগেনি। আমি এড়িয়ে গেছি। এদিকে দিন দিন রাজনৈতিক পরিস্থিতি জটিল হতে লাগল। পলাশী-আজিমপুরে গাছ কাটা শুরু হয়ে গেল রাস্তায় ব্যারিকেড দেয়ার জন্য। এ এলাকাগুলো ছিল স্বাধীনতার ঘাঁটি। আশেপাশে ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের হল। ১৬/১৭ মার্চের মধ্যে কলোনি পুরো ফাঁকা হয়ে গেল। খেলতে গিয়ে ভয় লাগত। এক সময়

মাদরাসা ছুটি দিয়ে সবাইকে নিয়ে হুজুররা মিটিং করতেন। এ ফাঁকে পোস্তারচরে গিয়ে ফুটবল খেলতাম। বারো আনা/এক টাকা দিয়ে প্লাস্টিকের ফুটবল কিনতাম।

আমার দুরন্তপনা দেখে আব্বা আরও বেশি আতঙ্কিত হয়ে পড়লেন। তাই ২০ মার্চে আমাকে গ্রামের বাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন। বাবা এরকম বলতেন– কত দিন তোমার দাদিকে দেখো না, ফুপুকে দেখো না, এদেরকে দেখে আসো। আমি জানতাম না দীর্ঘদিনের জন্য আমাকে গ্রামের বাড়ি পাঠিয়ে দেয়া হচ্ছে। মাথায় হাত বুলিয়ে বলতেন, মেঘনার চরের মানুষগুলো দেখবে, রাখাল দেখবে...।

আব্বা থেকে গেলেন ঢাকাতেই।

২৬ মার্চ রাত আড়াই কি তিনটার দিকে ফুপু হঠাৎ ঘুম থেকে ডেকে বললেন, ঢাকায় কেয়ামত হচ্ছে। এখনো ব্যাপারটা আমার কাছে বিস্ময় মনে হচ্ছে সেই নরসিংদী থেকে কিভাবে তিনি ঢাকার আওয়াজ শুনলেন! দাদি বিলাপ করে করে বলতেন, আমার কবীরের কী হবে, তুই তোর আব্বাকে সঙ্গে করে আনলি না কেন? দাদি কাঁদে, ফুপুরা কাঁদে আর বলে, তোর বাপ বেঁচে নেই।

পরের দিন দেখি শয়ে শয়ে মানুষ পায়ে হেঁটে আমাদের এদিকে আসছে। তাই ছোট বড় সবাইকে নিয়ে আমার নেতৃত্বে ঘাটে ঘাটে ক্যাম্প বসালাম। ঢাকা, তারাবো থেকে দলে দলে মানুষ পায়ে হেঁটে নরসিংদীর গুদারাঘাট দিয়ে নদী পার হয়ে গ্রামের ভেতরে যাবে। বাড়ি বাড়ি থেকে মুড়ি, চিড়া, গুড়, পানি নিয়ে ঘাটে বসে থাকতাম। মানুষকে খাওয়াতাম, মহিলাদের পা ফুলে মোটা হয়ে গেছে। মানুষের এ অব্যাহত ঢল দু'দিন পর্যন্ত ছিল। কাউকে কাউকে বাড়িতে নিয়ে আশ্রয় দিলাম। অনেককে কালামপুর, চম্পক নগর গ্রাম দুটিতে পাঠিয়ে দিতাম। যারা চলে যেতে চাইত তাদের পথ দেখিয়ে দিতাম– এদিক দিয়ে গেলে কুমিল্লা যাওয়া যাবে...।

ঢাকা ফেরত মানুষের কাছে জানতে পারলাম, ঢাকায় সত্যিই কেয়ামত হয়ে গেছে। গ্রামের নানান মানুষ বলত, পুতটারে থুইয়া মায়েও মরছে, কবীরেও মরল! আজিমপুর কলোনির আশেপাশের সব ক'টি হলে আক্রমণ হয়েছে– তিনি বাঁচার কথা নয়। আব্বার ব্যাপারে কেন যেন আমার ভেতরে কোনো দুশ্চিন্তা আসেনি। ঠিকই দেখা পেল ৫/৬ দিন পর আব্বা বাড়িতে এলেন। অনেক দূর থেকে আব্বাকে মানুষজন দেখতে আসতে লাগল। সত্যিই আব্বাকে আল্লাহপাক বাঁচিয়েছেন। অনেক লাশ ডিঙ্গিয়ে দেশের বাড়িতে এসেছেন। আব্বা ঢাকা থেকে এ দৃশ্য দেখে গিয়ে সম্পূর্ণ শয্যাশায়ী হয়ে গেলেন। কঠিন রোগে পড়ে গেলেন।

এদিকে রেডিওতে ঘোষণা দেয়া হচ্ছে, অফিস-আদালত খুলেছে, চাকরিতে জয়েন্ট করার জন্য। প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীরা ফিরে না এলে ধরে আনা হবে– এ জাতীয় ভয়-ভীতি দেখানো হতো। তাই মে মাসেই আব্বা আমাকে ঢাকা নিয়ে এলেন। এ কয়েক দিনের কর্মকাণ্ড দেখে আব্বা আমাকে গ্রামে রেখে যেতে সাহস পেলেন না। ঢাকা এসে শুনলাম, ২৫ মার্চ রাতে অমুক অমুক বন্ধু মসজিদেই মারা পড়েছে পাক

বাহিনীর হাতে। বন্ধুদের মেরে ফেলায় আমার ভেতরে জেদ চেপে বসল– কীভাবে প্রতিশোধ নেয়া যায় এদের বিরুদ্ধে।

আবার মাদরাসা যেতে শুরু করলাম। হাফেজি কোরআন গলায় ঝুলিয়ে মাদরাসায় যেতাম। আব্বা বলে দিয়েছিলেন এভাবে যেতে। কারণ রাস্তাঘাটে মানুষজন ধরে ধরে মেরে ফেলত। পাক আর্মিদের কত গাড়ির মুখোমুখি হয়েছি মাদরাসায় যেতে। 'নরম' আর্মি ডেকে জিজ্ঞেস করত– লাড়কা তোমহারা কিয়া নাম? আমার কণ্ঠে তেলাওয়াত শুনত। আর 'খাট্টা' আর্মিরা থাপ্পড় দিতে আসত– কার্ফ্যু থাকার কারণে।

আবার বাড়ি গেলাম। ডেমরা দিয়ে যেতেই যত সমস্যা। বাস থেকে নামিয়ে সরাসরি গুলি করে মেরে নদীতে ফেলে দিত। সামনের অনেককে এরকম করতে দেখলাম। যখন আমাদের গাড়িতে আসল মানুষের 'হাগা-মুতা' শুরু হয়ে গেল। সবাই আল্লাহর নাম নিতে লাগল। আমার গলায় ঝুলানো ছিল সেই হাফেজি কোরআন। আমি চোস্ত উর্দু বলতে পারতাম। তাদের সঙ্গে উর্দুতে কথা বললাম। শেষ পর্যন্ত রক্ষা পেলাম।

এভাবে কয়েক বার ঢাকা-বাড়ি যেতাম। একবার ঢাকা এসে দেখলাম সালাহ্ উদ্দিন সাহেবের নেতৃত্বে সিনিয়র বন্ধুরা রাজাকারী ট্রেনিং নিতে চলে গেছে। এদেরকে নেয়া হয়েছে ধোঁকা দিয়ে। বলা হতো পাকিস্তান প্রতিরক্ষা বাহিনীতে চাকরি হয়ে গেছে। এসে দেখি দু'তিন মাসের ট্রেনিং হয়ে গেছে। বন্ধুরা আমাকে অস্ত্র দেখাল। বলল, দু'তিন তলা থেকে ফেলে দিলে মরবে না। আবার অনেক ছাত্র পালিয়ে যেতে লাগল। হাফেজ ফুরকান মারা গেল। কেউ কেউ আমাকে পটাতে লাগল ট্রেনিং নিতে– খাওয়ানোর টোপ দেখাল। তাদের পীড়াপীড়িতে বললাম, ঠিক আছে, তাহলে আমাকে নিয়ে চলো। বন্ধুদের মধ্যে আমি ছিলাম সর্বকনিষ্ঠ। একদিন নিয়ে গেল। মিরপুরের একটি ট্রেনিং ক্যাম্প ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাল। কিভাবে দৌড়ায়, ফায়ার করে। সারাদিন থেকে বিকেলবেলা নিয়ে আসে। ট্রেনিং ক্যাম্পে মেজর আমাকে দেখে পছন্দ করে ফেলে। তার পাশের চেয়ারে বসাল। আমার তেলাওয়াত শুনল, তেলাওয়াত শুনে পকেট থেকে কালো মানি ব্যাগ বের করে দিল। ভেতরে পুরোটা স্বর্ণ– এক ব্যাগ স্বর্ণ! স্বর্ণ দেখে আমার তো চোখ ছানাবড়া। মাদরাসায় এসে আমাদের এক 'নোয়াখাইল্লা' লিডারের কাছে জমা দিলাম। আমরা চারজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলাম। লালবাগ মোড়ে স্বর্ণের দোকানে চার বন্ধু বন্ধুত্বের নিদর্শনস্বরূপ চারটা আংটি বানাই।

লালবাগের এ কাণ্ড দেখে ঢাকা থেকে চলে গেলাম গ্রামের বাড়িতে। উদ্দেশ্য, মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে কাজ করব। এসব রাজাকারের প্রতিশোধ নেব। আগস্ট-সেপ্টেম্বরের দিকে পাকবাহিনী আমাদের গ্রামে আগুন দেয়। এদিকে আমি ইন্ডিয়া যাওয়ার সুযোগ খুঁজছিলাম। পরিচিত এক লোক কথাও দিয়েছিল নৌকায় করে আমাদেরকে বর্ডারের ওপারে নিয়ে যাবে। শেষ পর্যন্ত আর যাওয়া হয়নি।

ইতিমধ্যেই ইন্ডিয়ান আর্মিরা চলে এলো আমাদের এলাকায়। তারা ট্যাংক, কামান নিয়ে এসেছে। আমি তাদের পেছন পেছন থাকতাম, পথ দেখিয়ে দিতাম। আমরা ঢাকার স্লোগানগুলো জোর গলায় দিতে লাগলাম– জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু...।

ঢাকার আগেই নরসিংদী স্বাধীন হয়ে গেল। সন্ধ্যার পর সবাই অস্ত্র নিয়ে ফাঁকা গুলি করে বিজয় উল্লাস করতে লাগল। দেশ স্বাধীন হওয়ার খবর শুনে আমার মনে হলো, আমি কবুতর হয়ে আকাশে উড়ি। দু'-চার দিন পর ঢাকা এলাম। একই দৃশ্য দেখলাম। এবার রেসকোর্সের পাশ দিয়ে মুক্ত মন নিয়ে পুরো মাঠ হাঁটলাম– মনে মনে স্বাধীনতা ভোগ করলাম। আমিও স্বাধীন। এখন আব্বার ভয়, হুজুরদের ভয় কোনো কিছুই নেই।

গ্রামের বাড়িতে দাদি, ফুপুরা বঙ্গবন্ধুর ফিরে আসার জন্য রোজা রাখলেন। জুলহাস চাচার রেডিও ছিল। গ্রামের সবাই এসে রেডিওর খবর শুনত। ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু ফিরে এসেছেন শুনে সবাই ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।"

এক নজরে হাফেজ আহমাদ

* জন্ম : ১ নভেম্বর ১৯৫৬

* পিতা : কবির আহমাদ

* হাফেজ : লালবাগ মাদরাসা। 'মিজান' (নিম্ন মাধ্যমিক) পর্যন্ত মাদরাসা লাইনে পড়াশুনা।

* বাংলা অনার্স (দু' বছর) : জগন্নাথ কলেজ (বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়)।

* '৭০-এর দশকের সেরা ছড়াকার ও ছোটগল্প লেখক। তার গ্রন্থ সংখ্যা তেরোটি। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : * বঙ্গবন্ধু হত্যার দলিল * পঞ্চম জাতীয় সংসদ সদস্য প্রামাণ্য গ্রন্থ * মুক্তিযুদ্ধের গল্প * হারিয়ে যেতে নেই মানা * পাঁচকুড়ি ছড়া।

* কর্ম জীবন : সহকারী সম্পাদক : মাসিক কিশোর জগৎ; বিভাগীয় সম্পাদক : সাপ্তাহিক চিত্রালী ও বর্ণনা; সহযোগী সম্পাদক : মাসিক সুরেশ্বর; সিনিয়র সহ-সম্পাদক : দৈনিক যুগান্তর; ব্যবস্থাপনা সম্পাদক : দৈনিক দেশ জনতা।

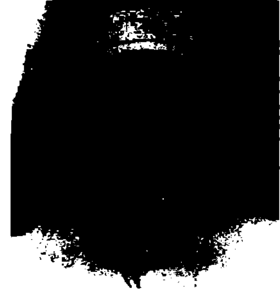
* বর্তমান অবস্থান : উপদেষ্টা সম্পাদক : মাসিক কাবার পথে।



নিজের এলাকায় স্বাধীন বাংলার প্রথম পতাকা ওঠান মাওলানা ফজলুল হক নূরনগরী

"তুম্ ইয়ে কিয়া মাংতে হো, ইহা পরদানেশীন আওরাত হ্যাঁয়। আন্দর মত্ আও– কি চাও তোমরা এখানে। এখানে পর্দানশীন মহিলা আছে। সাবধান, ভেতরে ঢুকবে না কিন্তু!"

মাওলানা ফজলুল হক নূরনগরীর উর্দু জানা আলেমা স্ত্রী '৭১-এর ভয়ঙ্কর দিনগুলোতে এভাবেই নিজের এবং তার মা-বোনদের সম্ভ্রম রক্ষা করেছিলেন নারীলোভী খানসেনাদের হাত থেকে মুক্তিযুদ্ধের ন'মাস নিজের বেশভূষা এবং ইয়াহিয়া–ভুট্টোদের মুখের ভাষা দিয়ে যেভাবে বহু মুক্তিযোদ্ধা এবং সাধারণ বাঙালিকে বাঁচিয়ে ছিলেন মাওলানা নূরনগরী। '৭১-এ মাওলানা নূরনগরী ঢাকার তারা মসজিদ দারুল কোরআন মাদরাসার 'হেড উস্তাদজি' হিসেবে রক্তচোষা পাকিস্তানি হায়েনাদের নৃশংসতা দেখেছেন খুব কাছ থেকে। নূরনগরী ২৫ মার্চের সেই কালো রাতের বর্ণনা দেন এভাবে–



"সারা দিনের উৎকণ্ঠা শেষে নগরবাসী সবেমাত্র ঘুমুতে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। অমনি পাকিস্তানি আর্মির উপর্যুপরি বোমার আঘাতে পুরো শহর কেঁপে ওঠে। বোমার আগুন কুণ্ডলী পাকিয়ে এমনভাবে উপরের দিকে উঠতে থাকে যে, মনে হয়েছে যেন কেয়ামত শুরু হয়ে গেছে। আমি ও আমার ছোট ভাই হাফেজ আবদুল হক ভয়ে–আতঙ্কে তারা মসজিদের সামনে আরও অনেকের সঙ্গে বাংকারে আশ্রয় নেই এবং সেখানে রাত কাটিয়ে সকালবেলা ব্রাহ্মণবাড়িয়া গ্রামের বাড়ির উদ্দেশ্যে পায়ে হেঁটে রওয়ানা করি। ডেমরা দিয়ে নরসিংদী হয়ে প্রথমে আমার শ্বশুরবাড়ি কৃষ্ণনগরের আশ্রাফপুরের বাড়িতে এসে আশ্রয় নেই। এরপর আমাদের গ্রামের বাড়ি বাঘাউড়াতে চলে যাই।"

'৭১-এর মহান স্বাধীনতা সংগ্রামে পক্ষাবলম্বনকারী একমাত্র ইসলামী সংগঠন জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের অফিস সেক্রেটারি ছিলেন মাওলানা নূরনগরী। দলীয় সূত্রে পাওয়া নিজের পরিচয় পত্রটি সেই অগ্নিঝরা দিনগুলোতে কম কাজে আসেনি তার। মাথা মোটা

পাকসেনাদের বহুবার ধোঁকা দিয়েছেন এই কার্ডটি দেখিয়ে। এমনি দু'টি ঘটনা। শুনুন তার জবানী থেকেই—

"তারা মসজিদ দারুল কোরআন মাদরাসার 'হেড উস্তাদজি' (প্রধান শিক্ষক) হওয়ায় '৭১-এর সিংহভাগ সময়টাই ঢাকাতে কাটিয়েছি আমি। তবে বাবা-মা, ভাই-বোন এবং স্ত্রী-সন্তান গ্রামে থাকায় মাঝে-মধ্যে গ্রামেও আসতে হতো। পথে নানা বিপদ মাথায় নিয়ে চলতে হতো। একদিকে পাকবাহিনীর বেপরোয়া আক্রমণ অন্যদিকে মুক্তিবাহিনীর চাপ। তারপরও আল্লাহর ওপর ভরসা করে যাতায়াত করতে থাকি। একবার ঢাকা থেকে বাড়ি ফেরার পথে নরসিংদীর কাছে রাস্তায় অনেক লোককে একত্র করে পাকবাহিনী তাদেরকে মুক্তিবাহিনীর সদস্য সন্দেহ করে ব্রাশফায়ার করার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। তখন আমি আমার কাছে সংরক্ষিত পরিচয় পত্র যাতে আমার ছবিসহ লেখা ছিল 'মাওলানা ফজলুল হক, অফিস সেক্রেটারি, পূর্ব পাকিস্তান জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম'– এই কার্ডটি দেখানোর পর পাকবাহিনীর এই সাধারণ সৈনিকরা ভাবে এদেশের অন্যান্য ইসলামী সংগঠনগুলোর মতো এই সংগঠনের নেতা-কর্মীরাও বোধ হয় তাদের পক্ষাবলম্বন করেছে। এদিকে আবার আমি মাওলানা, এই সরল বিশ্বাসে শেষ পর্যন্ত তারা তাদেরকে ছেড়ে দেয়। আমি তাদেরকে উর্দুতে বুঝালাম যে, এই লোকগুলো কৃষক, ধোপা, জেলে, কামার– এরা মুক্তিবাহিনীর কেউ নন। অথচ সে দলে ১৫ জনের মতো মুক্তিবাহিনীর সদস্য ছিল। যারা কয়েকদিন আগে মাত্র আগরতলা থেকে ট্রেনিং নিয়ে এসেছে। পাকিস্তানি সৈন্যরা চলে যাওয়ার পর লোকগুলো আমার জন্য খুব দোয়া করল। দেশ স্বাধীনের পর একদিন বায়তুল মোকাররম মসজিদের সামনে তাদের একজনের সঙ্গে দেখা হলো। তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে থাকেন আর বলেন, মাওলানা সাহেব, সেদিন আপনি না থাকলে আমরা কেউ বেঁচে আসতে পারতাম না। এরপর পাশের কনফেকশনারিতে নিয়ে পেট ভরে খাওয়ালেন।"

খাতুনে জান্নাতের অফিস কক্ষটি এ মুহূর্তে আরো প্রাণচাঞ্চল্য হয়ে উঠল। এ পর্যায়ে আমার সঙ্গে আরও যোগ দিয়েছেন মাওলানা নূরনগরীর বড় ছেলে সাংবাদিক ইমদাদুল হক তৈয়ব ও তার ২য় মেয়ের জামাই মাওলানা সৈয়দ এহসানুল ইসলাম। পেশাগত সূত্রে তৈয়বের সঙ্গে বন্ধুত্ব এবং সে সুবাদে এ বইয়ের অন্যতম সহযোগীও সে। এবারে ব্রাহ্মণবাড়িয়া আসা কেবল তার আমন্ত্রণেই। অনেক দিন ধরেই তৈয়ব তাড়া দিয়ে আসছিলেন একাত্তর নিয়ে তার বাবার চমকে ওঠার মতো অনেক ঘটনা আছে– তাদের এখানটায় এসে বাবার মুখ থেকে যেন তা শুনে যাই। তৈয়ব হয়তো ইচ্ছে করেই এত সময় আমাদের পাশে অনুপস্থিত ছিলেন। তাই সুযোগটা কাজে লাগালেন এভাবে– শিবলি ভাই, আমার কথার সত্যতা পাওয়া গেছে তো? বললাম, আহা, তৈয়ব, ডিস্টার্ব করবেন না তো। আমি এখন অন্য জগতে আছি। এদিকে মাওলানা নূরনগরী বলেই চলছেন। আরেক দিনের ঘটনা–

"২৭ রমজান। কদরের রাত। আমাদের বাঘাউড়া গ্রামের অনেক লোকজনকে পাকবাহিনী নৃশংসভাবে হত্যা করে। ঈদের পর আরেকদিন তারা নবীনগর থেকে

কনিকাড়া, বগডহর গ্রাম হয়ে আমাদের বাঘাউড়া, জুলাইপাড়া, ওয়ারুক, শিবপুর, সাহারপাড়, দনাশী পূর্ব অঞ্চলে অপারেশনের জন্য চলে আসে। কৃষ্ণমুড়ির মাঠের পশ্চিমে এলে আমার বাবা সুন্দর আলী মোল্লা প্রাণ বাঁচানোর জন্য পাকিস্তানের পতাকা নিয়ে নারে তাকবির আল্লাহু আকবার, পাকিস্তান জিন্দাবাদ বলতে বলতে দৌড়ে মাঠে যান। সঙ্গে গ্রামের সাধারণ লোকজন ও মুক্তিবাহিনীর অনেক সদস্যও ছিল। মাঠে যাওয়ার পর সবাইকে লাইনে দাঁড় করিয়ে একে একে জিজ্ঞেস করা শুরু করে পাকবাহিনী। আমার আব্বাকে জিজ্ঞেস করে– তোম্‌হারা কেত্‌না লাড়কা হ্যায়– তোমার ক'ছেলে?

আব্বা বললেন, আট হ্যায়– আটজন। কিয়া উন্‌মেছে কুই মুক্তি হ্যায়– তাদের মধ্যে কেউ কি মুক্তিযোদ্ধা আছে? আব্বা উত্তরে বললেন– নেহি।

মারার নেশায় বুঁদ হয়ে থাকা খানসেনাদের কি আর এ কথায় চিড়া ভেজে। জানে মেরে ফেলতে হবে। তাই আব্বাসহ সবাইকেই লাইনে দাঁড় করানো হলো।

এদিকে ঢাকা থেকে সবেমাত্র বাড়িতে গিয়ে পৌঁছলাম আমি। সবাই এসে আমাকে বলল, গ্রামের পশ্চিম মাঠে পাকবাহিনী সবাইকে আটকে রেখেছে। যে কোনো সময় মেরে ফেলবে!

আমি আর এক মুহূর্ত দেরি না করে অজু করে সেই পরিচয়পত্রটি বুকে ঝুলিয়ে সাহস করে দৌড়ে মাঠে ছুটে যাই। হাত উঁচু করে পাকবাহিনীকে থামতে ইশারা করি। আমাকে দৌড়ে যেতে দেখে তারা ফায়ার বন্ধ রাখে। আমি সামনে যাওয়ার পর আব্বা বললেন, এই আমার মাওলানা ছেলে। তারা আমার পরিচয় পত্র দেখে আমাকে সালাম করল, আমার সঙ্গে হাত মেলাল এবং কোলাকুলিও করল। পাক কমান্ডার অন্যান্য সৈন্যদের বলতে লাগলেন, আব হামারে ছামনে বহুত উঁচাতব্‌কা কা এক আদমি আয়া। তুম ছব ছামনে চলো। কমান্ডার আমাকে বললেন, ইয়ে কুই মুক্তি তো নেহি, সুফি ছাব? আমি বললাম, এক ভি নেহি। এরপর সবাইকে ছেড়ে দিলেন।"

'৫২-এর ভাষা আন্দোলনের সেই উত্তাল দিনগুলোতেও মাওলানা নূরনগরী ছিলেন লড়াকু সৈনিক। তখন তার বয়স কতইবা হবে– দশ কি বারো। পড়তেন জামেয়া এমদাদিয়া কিশোরগঞ্জে। ঢাকাসহ সারাদেশই মায়ের ভাষার অধিকার আদায়ের জন্য অগ্নিগর্ভ হয়ে আছে। উর্দুপ্রেমিক সহপাঠী ও শিক্ষকগণ মাদরাসার চার দেয়ালের ভেতর বন্দি রাখতে পারেনি তাকে। শিক্ষকদের চোখ ফাঁকি দিয়ে মাওলানা মহিউদ্দীন আজমী, মাওলানা ছফিউল্লাহসহ বেশ ক'জন বন্ধুকে নিয়ে কিশোরগঞ্জ শহরে ছাত্র আন্দোলনে যোগ দেন।

'৫৪-এর যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন উপলক্ষে ঢাকার পল্টন ময়দানে নেজামে ইসলাম পার্টির পক্ষ থেকে আয়োজন করা হয়েছিল এক মহাসমাবেশ। রাজনীতি আর আন্দোলনে জানপ্রাণ কিশোর নূরনগরী কিশোরগঞ্জ থেকে পায়ে হেঁটে গফরগাঁওয়ে চলে আসেন।

বাকি পথ ট্রেনে করে এসে ঢাকা পৌঁছে যোগ দেন সে মহাসমাবেশে। এভাবেই মাওলানা আত্হার আলীসহ তৎকালীন শীর্ষ নেতাদের নজর কাড়েন।

আরেকবারের ঘটনা। তখন তিনি ঢাকার লালবাগ জামেয়ায় পড়েন। পূর্ব পাকিস্তানে স্বৈরাচার আইয়ুব-মোনায়েমবিরোধী আন্দোলন বেশ জমে উঠেছে। ইতিহাসের অংশ হতে এখানেও নিজেকে জড়িয়ে নিলেন। নিজ হাতে পোস্টার, ব্যানার লিখে, মাইকিং করে ঢাকা শহর কাঁপিয়ে তুললেন।

বঙ্গবন্ধু বললেন, আগামী ২৬ মার্চ আপনারা সচিবালয়ে আসেন

বয়সের এ প্রান্তে এসে স্মৃতি হাতড়ে স্মরণ করলেন আরেকটি ঘটনা। '৭০-এর নির্বাচনে বিজয়ী সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তখন পাকিস্তানের হবু প্রধানমন্ত্রী। নিয়মমতো ক'দিনের মধ্যে তিনিসহ অন্যান্য নির্বাচিত সদস্যরা শপথ নেবেন। এই সুযোগে 'বাংলাদেশ ফোরকানিয়া হাফেজিয়া মাদরাসা শিক্ষক সমিতি'র পক্ষ থেকে অবহেলিত শিক্ষকদের সরকারি মর্যাদাদান, নাদিয়া ও নূরানী শিক্ষা বোর্ডকে সরকারিকরণসহ নানান দাবি-দাওয়া নিয়ে মাওলানা নূরনগরীর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল দেখা করতে যান বাংলার অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে। সঙ্গে করে এক কপি পবিত্র কোরআন, জায়নামাজ, তসবিহ নেন বঙ্গবন্ধুকে উপহার দেয়ার জন্য। ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে গিয়ে দেখেন তাদের মতো এমন অনেক সাক্ষাৎপ্রার্থী এসে লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে আছে। অগত্যা তারাও দাঁড়িয়ে গেলেন লাইনে। তাদের ডাক পড়বে ৩১ নম্বরে। শেখ সাহেব চেম্বারে এসে লম্বা লাইনের একেবারে শেষ মাথায় তাদের দেখে প্রথমেই ডাকিয়ে নিলেন। সঙ্গে নেয়া 'হাদিয়া'গুলো খুশি মনে গ্রহণ করলেন এবং বললেন, আমরা মুসলমান, আমাদের ইসলাম ধর্মের যাবতীয় কাজ-কর্ম সঠিকভাবে পালন করা নিতান্ত প্রয়োজন। আরও বললেন, নূরানী ও নাদিয়ার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক যারা দাখিল, আলিম পাস করবেন কিংবা হাফেজ হবেন তাদেরকে প্রতিটি প্রাইমারি ও হাই স্কুলে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হবে এবং তাদের বেতন সাধারণ শিক্ষকদের সমপরিমাণের করা হবে। আপনারা আগামী ২৬ মার্চ দরখাস্ত নিয়ে সচিবালয়ে আসেন, আমি তা মঞ্জুর করে দেব।

কে জানত ২৬ মার্চের একদিন আগেই পাকিস্তানি হায়েনারা ঝাঁপিয়ে পড়বে নিরীহ নিরস্ত্র বাঙালিদের ওপর। আর এরকম হাজারো সুখের স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে।

'৭১ নিয়ে মাওলানা নূরনগরীর আছে মিশ্র অভিজ্ঞতা। যেমন যুদ্ধের ন' মাসের তাঁর বিরোচিত ভূমিকার স্বীকৃতিস্বরূপ নিজ এলাকাবাসী তার হাত দিয়েই স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন করায়। আবার যুদ্ধ শেষে নিজ কর্মস্থল তারা মসজিদ দারুল কোরআন মাদরাসায় ফিরে এলে রাজাকার সন্দেহে মুক্তিবাহিনীর লোকেরা এসে তাকে ঘিরে ফেলে, যাদের মধ্যে তার অনেক ছাত্রও ছিল! সে পরিস্থিতি থেকে তাকে মুক্তি দিয়েছিল ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে সঙ্গে করে নিয়ে আসা স্থানীয় আ'লীগ নেতা মুক্তিযোদ্ধা এ্যাডভোকেট আহমদ আলীর লেখা এই সার্টিফিকেটটি—

Ahmed Ali
Advocate
Judges Court
&
Vice President
District Awami League
COMILLA

BAGICHAGAON
(West of Reserve Tank)
COMILLA

Date 197

— Ahmed Ali
MCA
3/12/72

মাওলানা নূরনগরী একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ করেছেন– কুমিল্লার তৎকালীন আ'লীগ নেতা একথাই বলেছেন এই চিঠিতে

This is to certify that Mr. Fazlul Haque Molla C/o Mr. Sundar Ali Molla of Baghaura P.s. Nabinagar of Comilla is Personally known to me. He comes of a sespectable family of my locality. He did not take any part to any activity subvessive to the lifeatin war... he helped it is various ways.

I wish his success in life.

—এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, জনাব ফজলুল হক মোল্লা, পিতা জনাব সুন্দর আলী মোল্লা, গ্রাম বাঘাউড়া, থানা নবীনগর, জেলা কুমিল্লা ব্যক্তিগতভাবে আমার পরিচিত। আমার এলাকার সম্ভ্রান্ত পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি স্বাধীনতাবিরোধী কোনো কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করেননি; বরং এই ব্যাপারে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছিলেন।

আমি তার জীবনের সফলতা কামনা করি।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের কাজীপাড়ায় অবস্থিত খাতুনে জান্নাত মহিলা মাদরাসার দো'তলার অফিস কক্ষে বসে '৫২-এর ভাষা আন্দোলন, '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান এবং '৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধসহ বিগত অর্ধশতাব্দীকালে এ ভূখণ্ডে সংঘটিত জাতীয় ও সামাজিক এমন বহু উত্থান-পতন, হাসি-কান্নার কাহিনী শোনালেন মাওলানা নূরনগরী। বিগত শতাব্দীর

ষাটের দশক থেকে ঢাকায় থাকা এ মানুষটি গেল বছরের এ সময়টাতে অনেকটা রাগে-অভিমানে রাজধানী ছেড়ে নিজের বাপ-দাদার জন্মস্থান ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে স্থায়ী হয়েছেন। চারদিকের চেনা মানুষজনের মিরজাফরী আর বিশ্বাসঘাতকতায় নিজের মেধা, শ্রম আর ঘামে তিলে তিলে গড়ে ওঠা দীর্ঘ চল্লিশ বছরের প্রিয় তারা মসজিদ দারুল কোরআন মাদরাসাটি ছেড়ে চলে আসতে হয়েছে তাকে। নিজেকে তিনি উজাড় করে দিলেও গাদ্দারি আর বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়া আর কিছুই পাননি। অবশ্য এখন আর অতীত নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামাতে চান না তিনি। যদিও এই 'বিষমাখা' অতীতই তাকে কুরে কুরে নিঃশেষ করে দিচ্ছে।

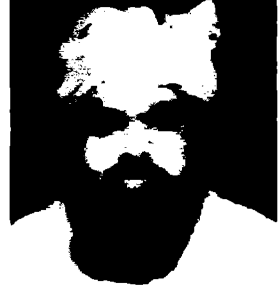
ঐতিহ্যবাহী আলেম পরিবারে জন্ম নেয়া নূরনগরী নিজের আলেমা স্ত্রী, মেয়ে, নাতিন এবং পুত্রবধূকে নিয়ে কাজীপাড়ার এ মহিলা মাদরাসটি চালু করেছেন বছর খানেক আগে। এখান থেকেই আবার নতুন করে ঘুরে দাঁড়াতে চান তিনি। পারবেন কি এ সংগ্রামী আলেম জীবনযুদ্ধে টিকে থাকতে?



স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের কর্মী ও মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক মাওলানা খায়রুল ইসলাম যশোরী

"... আমাদের দুর্বলতা, ভীরুতা, কলুষ আর
লজ্জা সমস্ত দিয়েছে ঢেকে একখণ্ড বস্ত্র মানবিক,
আসাদের শার্ট আজ আমাদের প্রাণের পতাকা"

কবি শামসুর রাহমানের 'আসাদের শার্ট'এর শব্দপুঞ্জের ঝলকানি শুনছিলাম আর ভাবছিলাম তাজুল ফাত্তাহ ও মাসউদুল কাদিরের কথা। এই দুই ছড়াশিল্পী একসঙ্গে হলেই একটা আসর জমিয়ে ফেলেন। চটকদার ছড়া, কবিতা শুনিয়ে আমার মতো এক সাধারণ গদ্য লেখকের কাঁধে কবিত্বের জোয়াল চড়িয়ে দিতে ওরা বেশ জোরালো কসরত চালায়। রিকশাহীন এই পায়ে হাঁটা রাস্তায় কবিতা শুনিয়ে তাজুল ফাত্তাহ আমাকে কী ম্যাসেজ দিতে চাচ্ছে? আবারো সেই ষড়যন্ত্র (!) শুরু হলো নাকি! প্রতিবাদ করতে গিয়ে যেই তাজুল ফাত্তাহর দিকে তাকালাম অমনি চোখ অটকে গেল তার পেছনের ইট সিমেন্টে নির্মিত বিশাল ফটকের প্রতি। পাশে খুব গাঢ় করে লেখা 'আসাদ গেট'।



কলাবাগান থেকে মোহাম্মদপুর। খুব বেশি দূর না হলেও পায়ে হাঁটার রাস্তা তো অবশ্যই নয়। জাতীয় নেতা মাওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশের ছেলের বাসা থেকে বের হয়ে প্রথমেই রিকশা খুঁজি। নেই, আশপাশে কোথাও রিকশা নেই। ভিআইপি রোডে রিকশা নিষিদ্ধ। মার্সিডিজ, লেক্সাস আর পাজেরোর পথে নিজেদের বড্ড দীনহীন মনে হলো। গরিবের বন্ধুর (১২ নং বা ৮ নং টাইপের লোকাল বাসগুলোর) দিকে তাকিয়ে দেখি যা অবস্থা ওঠার কোনো জো নেই। অগত্যা, সিডরের ঝড়-বৃষ্টিকে উপেক্ষা করেই আমরা হাঁটা ধরলাম বাবর রোডের (মোহাম্মদপুর) বিহারি কলোনি বরাবর। ঘণ্টাখানিক পরে আমরা যখন নিজেদের বিহারি কলোনিতে আবিষ্কার করলাম তখন দু'জনই কাক ভেজা দশা, গা থেকে টুপ টুপ করে পানি ঝরছে। উঠতি বয়সের দু'একজন পথচারীকে জিজ্ঞেস করলাম– মাওলানা খায়রুল ইসলাম যশোরীর বাসাটা কোন দালানে? জবাব দিতে পারল না। বলল– এই এলাকায় এই নামে কেউ নেই। অথচ যশোরীর বন্ধু এবং স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সহকর্মী মাওলানা উবায়দুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী

জালালাবাদী বলেছিলেন, এখানটায় এসে মাওলানা যশোরীর নাম বললে যে কেউ চিনিয়ে দেবে তাঁর বাসাটা। '৮১ এবং '৮৬তে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করার পর থেকে এ এলাকায় তিনি বেশ পরিচিত মুখ। পরে জিজ্ঞেস করলাম এক স্কুল শিক্ষকের কাছে। সঙ্গে সঙ্গে দেখিয়ে দিলেন। মাওলানা যশোরীর বাসা? এই তো এদিকটায়...।

চলে এলাম ২৭ নং বিল্ডিং-এর তৃতীয় তলায় ২৪ নং ফ্ল্যাটের সামনে। কলিং বেল চাপতেই এক মহিলার মৃদু কণ্ঠস্বর ভেসে এলো ভেতর থেকে।

ঘরে মরহুম মাওলানা খায়রুল ইসলাম যশোরীর স্ত্রী একাই ছিলেন তখন। মেয়েরা জামাই বাড়িতে। বড় ছেলে কাতারে। সে হাফেজ, আলেম। মেজ জন হিজবুল ইসলাম। ব্যবসায়িক কাজে এলাকার আশপাশেই আছেন। আর ছোট ছেলে হাটহাজারী মাদরাসায় দাওরা হাদিস শেষ করে ইফতা বিভাগে অধ্যয়নরত। দরজার বাইরে দাঁড়িয়েই কথা বলার অনুমতি চাইলাম। মাওলানা যশোরীর স্ত্রীর কাছ থেকে ইতিবাচক সাড়া পেয়ে কথা শুরু করলাম। এক ফাঁকে নম্বর সংগ্রহ করে মোবাইলে কল দেই হিজবুল ইসলামের কাছে। জানাই– আমরা সাংবাদিক। আপনাদের দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে আছি। বাসায় এলে কথা বলব। দয়া করে কি বাসায় আসবেন?

মাওলানা যশোরীর স্ত্রী জানালেন, মাওলানা খায়রুল ইসলাম যশোরীর জন্ম ১৯৪২ সালে মাওলানাবাদ (কালা লক্ষ্মীপুর) ঝিনাইদহের এক সম্ভ্রান্ত পীর কাজী পরিবারে। জন্মের পরই বাবা মারা যান। এরপর মা একেবারে চলে আসেন নানা বাড়িতে। এখানে বেড়ে ওঠেন তিনি। পাকিস্তানের করাচি থেকে এমএ অনার্স করেন উর্দুতে। বিয়ে করেন ১৯৬৬ সনে। '৭১-এর সেই উত্তাল দিনগুলোর শুরুতে তিনি ছিলেন রংপুর কেরামতিয়া মসজিদের ইমাম আর রংপুর দারুল উলুম মাদরাসার প্রিন্সিপাল। তখন তিনি ছিলেন আওয়ামী উলামা পার্টির প্রেসিডেন্ট মাওলানা ওলিউর রহমানের সহযোগী এবং শীর্ষ নেতা। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গেও ছিল তার গভীর হৃদ্যতা। পরস্পর তারা ছিলেন অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতো। মানুষের প্রয়োজনে, তাদের বিপদ-আপদে একসঙ্গে পাশে দাঁড়াতেন দু'জনে। তারা বিভিন্ন এলাকায় দুর্গতিদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করেছেন অসংখ্যবার। রাজনৈতিক মঞ্চে একসঙ্গে বক্তৃতা করেছেন। বঙ্গবন্ধুর মতো তিনিও ছিলেন স্বাধীনতার স্বপ্নদ্রষ্টা। পাক আর্মিদের সব সময়ই তার কাছে অসহ্য মনে হতো। তাদের কুকর্মের বিরুদ্ধে ছিলেন তীব্র প্রতিবাদী। তাই ২৫ মার্চের বিভীষিকার পর তাঁকে পাক হানাদাররা হন্যে হয়ে খুঁজতে থাকে। তার খুনের নেশায় উন্মাদ হয়ে যায় খানসেনারা। প্রথমে আত্মগোপনে চলে যান রংপুরের এক প্রত্যন্ত গ্রামে। সঙ্গে প্রিয়তমা স্ত্রী। কিন্তু সেখানেও টিকটিকির ভয়। নিজেকে নিরাপদ ভাবলেন না। সবাই পরামর্শ দিল বর্ডার পার হয়ে ভারতে চলে যেতে। এ দিকে মাওলানা যশোরীর স্ত্রী আসন্ন সন্তান প্রসবা। ঘরে আরেকটি ছোট্ট সন্তান। সন্তানের মায়া, স্ত্রীর ভালোবাসা, আসন্ন নবজাতকের জন্য ব্যাকুলতা, ও প্রসব বেদনার যন্ত্রণাক্লিষ্ট মুহূর্তের স্মৃতি নিয়ে তিনি এক কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি হন। দেশের এ দুঃসময়ে দেশের পাশে দাঁড়াবেন নাকি পরিবার সামলাবেন! দেশ নাকি পরিবার? বিরাট এক চ্যালেঞ্জ। মায়া, মহব্বত, ভালোবাসা ও দুর্ভাবনা সব কিছু ঝেড়ে ফেলে তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন– দেশকেই বাঁচাতে হবে। আমার এক পরিবারের চেয়ে দেশের দাম হাজার কোটি গুণ বেশি। দেশ বাঁচলে সব পরিবার বাঁচবে। আমার পরিবারও। স্ত্রী, সন্তানের কাছ থেকে তিনি বিদায় নিলেন।

'তোমার বাবা আছে, তিনিই তোমাকে দেখবেন। দেশের জন্য কিছু করতে হবে। আমি আসি। দোয়া করো। বেঁচে থাকলে আবার দেখা হবে।' এই বলে বেরিয়ে গেলেন ঘর ছেড়ে। সেই যে তিনি বেরিয়ে গিয়েছিলেন, যুদ্ধের ন' মাস আর একবারের জন্যও ঘরে ফেরেননি, দেখা দেননি পরিবারের কারো সঙ্গে। তার বিদায়ের পর ৬ এপ্রিল ঘরে আসে তার প্রিয় কলিজার টুকরা। ২য় সন্তান। সন্তান ঘরে, বাবা যুদ্ধে। যুদ্ধের মাঝামাঝি সময় একদিন পাড়া-প্রতিবেশীরা এসে বলল– আমরা তো প্রতিদিনই স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে মাওলানা যশোরীর তেলাওয়াত শুনি। সংবাদটা শুনে প্রথমে তার স্ত্রীর বিশ্বাসই হয়নি। ভাবলেন, এই নামের অন্য কেউ হতে পারে বা এই নামের কেউ আদৌ কোনো দিন কোরআন পাঠ করেনি, তারা বানিয়ে বানিয়ে বলছে এসব। কিন্তু নাছোড়বান্দা প্রতিবেশীর খুব জোরাজুরির পর একদিন এক প্রকার বাধ্য হয়েই রেডিও শুনতে বসেন তিনি। তিনি তখনও ভাবতেও পারেননি তার অবিশ্বাসকে সেদিন রেডিও বিশ্বাসে রূপান্তর করে দেবে। তাকে অবাক করে দিয়ে রেডিও থেকে আওয়াজ বেরুতে লাগল... "তেলাওয়াত করছেন মাওলানা খায়রুল ইসলাম যশোরী। আউযু বিল্লাহি...।"

এদিকে ফোন পেয়ে দ্রুত ঘরে চলে আসেন হিজবুল ইসলাম। তিনি আমাদের হাত ধরে ভেতরে নিয়ে যান। বসতে দেন। আপ্যায়ন করেন। বের করে করে দেখান তার বাবার গর্বের স্মৃতিগুলো। বেশ কয়েকটা ক্রেস্ট। উপহার। সম্মাননা। '৭১ ও তার পরবর্তী সময়ের অসংখ্য পেপার কাটিং। কোনোটিতে মাওলানা যশোরীর বিবৃতি। কোনো অন্যায়ের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ। যেমন মাদরাসা শিক্ষকদের টাকায় ইনকিলাব প্রতিষ্ঠাকারী রাজাকার মান্নানের ভণ্ডামির স্বরূপ উন্মোচন করে বিশাল বিশাল প্রতিবাদ মিছিলের সচিত্র প্রতিবেদন। আবার কোনোটিতে তার সত্যের পথে আহ্বানের রিপোর্ট, বা জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডের দীর্ঘ ফিরিস্তি। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে অন্তরঙ্গ মুহূর্তের ছবি। আরেকটি আছে রেসকোর্স ময়দানের সেই দুর্লভ ছবি। বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শেষে স্টেজে তার পাশে দাঁড়িয়ে বিশাল জনসমুদ্র নিয়ে আল্লাহতালার দরবারে স্বাধীনতার জন্যে দোয়া করছেন মাওলানা যশোরী।

পেপার কাটিংগুলো পড়ে মাওলানা যশোরীর আরও নতুন কিছু তথ্য যোগ হলো। যেমন ভারতে তিনি দেশের জন্য কী কী করেছেন বিস্তারিত এসেছে সে সময়ের বড় বড় কাগজগুলোতে। তিনি যে ক'দিন ভারতে ছিলেন সব সময়ই চেষ্টা করেছেন ভারতের জনমতকে বাংলাদেশের পক্ষে আনার জন্য। কুচবিহারে সিভাই নামক স্থানে প্রথম তিনি জনসমাবেশ করেন। এরপর কলকাতায় ভারতীয় মুসলিম লীগের সদস্য এবং মন্ত্রীদের সঙ্গে সব বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তখন তারা দেশের প্রতি তাঁর আকর্ষণ ও প্রগাঢ় ভালোবাসায় মুগ্ধ হয়ে দিল্লি পাঠান তাকে। দিল্লিতে তখন অনেক মুসলমান ছিলেন পাকিস্তানের পক্ষে। দিল্লি আসলে তারা মাওলানা যশোরীকে বাধা দেয়। বাংলাদেশের পক্ষে কোনো সভা-সমিতি করলে তাকে প্রাণে মারারও ভয় দেখায় তারা। কিন্তু দেশপ্রেমিক মাওলানা যশোরী দমবার বা ভয় পাওয়ার পাত্র নন। তিনি ঠিকই দিল্লির জামে মসজিদের সামনে এক বিশাল জনসভার আয়োজন করে ফেলেন। সম্পূর্ণ ভিন দেশে, সরাসরি তাদের বিরুদ্ধে একাই যে দুঃসাহসের পরিচয় তিনি সেদিন দেখিয়েছিলেন তা দেখে-শুনে সবাই অবাক। অনুষ্ঠানের শুরুতে কিছু লোক গোলমালের চেষ্টা করে। সফল হয়নি তারা। মাওলানা যশোরী মন্ত্রের মতো বক্তৃতা দিয়ে তাদেরকে

বশ মানিয়ে ফেলেন। বক্তৃতা শুনে তারা তাদের নীতি পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়। তখন এক শ্রোতা মন্তব্য করেছিলেন– সত্যিই বাঘের বাচ্চা।

গান্ধী পিস ফাউন্ডেশনে ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেটিভ কাউন্সিলে প্রায় ৩০টি দেশের প্রতিনিধিদের সামনে বেশ প্রাঞ্জল ভাষায় বাংলার দুঃসহ অবস্থাকে বর্ণনা করেছিলেন মাওলানা যশোরী। সৌদি আরবের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গেও ইসলামিক আদর্শভিত্তিক পবিত্র কোরআন এবং হাদিসের ব্যাখ্যা দিয়ে বাংলাদেশে পাকবাহিনীর অন্যায় কার্যকলাপ সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনা করেন। সীমান্তের ওপারে থাকা অবস্থায় ভারতের সাবেক পার্লামেন্ট মেম্বার মাওলানা আসআদ মাদানী তাকে বিভিন্নভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করেছিলেন। বলা যায় তার সাহায্যেই মাওলানা যশোরী ভারতীয় পার্লামেন্টের মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দকে বাংলাদেশ প্রশ্নে একমত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। দিল্লিতে এক মসজিদে তিনি একদিন বাংলাদেশের করুণ চিত্রের ব্যাখ্যা করছিলেন। তখন দর্শকদের মধ্যে থেকে একজন বলে উঠল– 'বাঙালিকা তাজ, রাজ কোই নেহি, ভিখ মাংগকার আজাদি নেহি মিলেগা।" প্রশ্নকর্তাকে মাওলানা যশোরীর তখন দেখা হয়নি কিন্তু এর আশাতীত সন্তোষজনক জবাব তিনি তার জীবনে পেয়েছিলেন। যে কারণে ঘরে ফিরে তিনি রাতভর কেঁদেছিলেন জায়নামাজে বসে।

ভারতে মাওলানা যশোরী স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে কাজ করেন। উত্তাল দিনগুলোর সব সময়ই তিনি এই বেতার কেন্দ্রে থাকতেন। কোরআন তেলাওয়াত ও দেশাত্মবোধক বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্রচার করতেন। যুদ্ধের পরেও তিনি বাংলাদেশ বেতারে ছিলেন। নিয়মিত কোরআন ব্যাখার দায়িত্বটি তিনিই আঞ্জাম দিতেন। ভক্তদের অনুরোধে অনেক সময় তাকে দেশের বিভিন্ন প্রান্তরে ঘুরতে হতো ওয়াজ-নসিহত করে। '৮১ এবং '৮৬ তে তিনি প্রেসিডেন্ট নির্বাচনও করেছিলেন।

বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিলের পক্ষ থেকে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শব্দ সৈনিক সংবর্ধনা ও ক্রেস্ট পান ১৯৯০ সালে। আমাদের অনুরোধে ছেলে হিজবুল ইসলাম বাবার সেই ক্রেস্ট হাতে ছবিও তোলেন। শেষ বিদায়ের আগে তিনি বেশ কয়েকটি মসজিদ-মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছিলেন। ১৯৯৫-এর ২৪ আগস্ট হার্ট এ্যাটাক করে পরপারে পাড়ি জমান সময়ের এই সাহসী আলেম মুক্তিযোদ্ধা। সেই আগস্টের শোক এখনও কাঁদিয়ে বেড়ায় তার অসংখ্য শুভাকাঙ্ক্ষী, আত্মীয়-স্বজন ও ভক্তবৃন্দকে। বিদায়বেলা ছেলে হিজবুল ইসলামের কাছে জানতে চাইলাম বাবার কোনো উক্তি কি মনে পড়ে যা তিনি প্রায়ই বলতেন? হিজবুল দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, বাবা আফসোস করতেন– যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছি তাদেরই যখন পার্লামেন্টে দেখি তখন ভীষণ আফসোস হয়। মান্নান রাজাকাররা মন্ত্রীও হয় এটা কী মানা যায়? একবার দেশ জুড়ে পোস্টার করা হলো– চার নরপিশাচকে ধরিয়ে দিন। সেই নরপিশাচরা তো এখন প্রকাশ্যেই ঘুরে বেড়ায়। সরকার কি তাদের দেখে না?

আর আমাদের আফসোস কি জানেন, আমার বাবা যে আ'লীগের জন্য নিজের জীবন-যৌবন শেষ করে দিলেন তাঁর মৃত্যুর পর সে দলেরই সভানেত্রী একটি শোকবাণী পাঠানোর প্রয়োজন মনে করেননি! বঙ্গবন্ধু জীবিত থাকলে এমনটি কখনোই হতো না।

মাওলানা যশোরী বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিলের পক্ষ থেকে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শব্দ সৈনিক সংবর্ধনা ও ক্রেস্ট পান ১৯৯০ সালে



দেশ ও জনগণের অতন্দ্র প্রহরী

বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ

কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল

৩১৩ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা

নং ....

সনদ ক্রমিক : ৩৫৫৯৪

16 NOV 2000

যাহার জন্য প্রযোজ্য

মরহুম মাওলানা খাইরুল ইসলাম যশোরী পিতা মরহুম আবদুল ওহাব

গ্রাম/মহল্লা মাওলানাবাদ ডাকঘর লক্ষ্মীপুর

থানা ঝিনাইদহ জেলা ঝিনাইদহ

একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা। তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করিয়াছেন। বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে তাঁহার অবদান চির উজ্জ্বল হইয়া থাকিবে।

তাঁহার সর্বাঙ্গীন উন্নতি ও মঙ্গল কামনা করিতেছি।

প্রতি স্বাক্ষর

শেখ হাসিনা
প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
এবং
প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও প্রধান উপদেষ্টা
বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ।

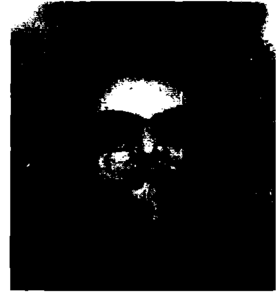
আব্দুল আহাদ চৌধুরী
চেয়ারম্যান
কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল
বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ।

মুক্তিযোদ্ধা মন্ত্রণালয় থেকে পাওয়া মাওলানা যশোরীর মুক্তিযুদ্ধের সার্টিফিকেট



মাসিক মদীনা সম্পাদক মাওলানা মুহিউদ্দীন খান বললেন, মুফতি মাহমুদ যাওয়ার সময় আমাদের বলে গেলেন, আমেরিকা যার বন্ধু তার আর শত্রুর প্রয়োজন হয় না। আমেরিকা পাকিস্তানের বন্ধু হয়ে গেছে। এ দেশ আর একসঙ্গে থাকবে না।

মাওলানা মহিউদ্দীন শামী মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। সক্রিয় আ'লীগার ছিলেন। বঙ্গবন্ধুর খুব আস্থাভাজনও ছিলেন তিনি। তার বাসায় থাকতেন, খেতেন, ঘুমুতেন। শামী সম্পর্কে খুব ভালো তথ্য দিতে পারবেন মাওলানা মুহিউদ্দীন খান। শামী সম্পাদিত মাসিক 'তাহজীব'-এ লিখতেনও তিনি। দৈনিক ইনকিলাবের সহকারী সম্পাদক সুহৃদ মাওলানা উবায়দুর রহমান খান নাদভীর কাছ থেকে তথ্যগুলো পেয়েই সিদ্ধান্ত নিলাম মাওলানা মুহিউদ্দীন খানের কাছেও যাব। চলে এলাম এক সন্ধ্যায় পল্টনে নোয়াখালী টাওয়ারের ২য় তলায় তাঁর অফিসে। জানালাম, হুজুর এ কাজে হাত দিয়েছি- আপনার সহযোগিতা চাই। মাওলানা খান উত্তর করলেন, এটা পাগলামি ছাড়া আর কিছুই নয়- কেন এগুলো করতে যাও, এতে কী লাভ? আমাদের যারা রাজাকার বলে তাদের দৃষ্টিতে আমরা মুক্তিযোদ্ধা হয়ে যাব? এরপর তিনি তাঁর জীবনের কিছু তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা শোনালেন। স্মৃতির ডানায় ভর করে যখন তিনি '৭১-এর গল্প শুনাচ্ছিলেন বিস্মিত হলাম ভীষণ। এমন দরদিপ্রাণ আলেমকে রাজাকার বলা হবে কেন?



মুক্তিযোদ্ধা ও সাধারণ অসহায় মানুষকে তিনি তখন নিঃস্বার্থ সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন। নগদ টাকা দিতেন। চাল, ডাল ও তরি-তরকারি কিনে দিতেন। '৭১-এর ন' মাস শুধু চালের দোকানেই ৪২ হাজার টাকা বাকি করে ফেলেন। পাশ থেকে একজন বললেন, হুজুর, তখন ৪২ হাজার হলে তো এখনকার ৪২ লাখ টাকা। দুঃখের কথা হলো সেই মুক্তিযোদ্ধাদেরই কেউ কেউ এখন মাওলানা খানকে রাজাকার বলে সুখ পেতে চায়!

'৭১ নিয়ে আবারো প্রশ্ন করতেই তিনি বলেন, সাংবাদিকতা জগতের লোক হিসেবে তোমার তো জানার কথা জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ছাড়া স্বাধীনতার পর সব ক'টি ইসলামী দলই নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছিল। কারণ জমিয়ত ছিল স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি, স্বাধীনতা চেয়েছিল তারা। আর আমি ছিলাম তখন সেই জমিয়তেরই পূর্ব পাকিস্তানের সহ-সভাপতি। আমি রাজাকার হই কীভাবে? '৭২-এ যখন দেশের সব ইসলামী ম্যাগাজিন সরকার বন্ধ করে দেয় তখন আমার মাসিক মদীনার ডিক্লিয়ারেশনও বাতিল হয়ে যায়। তখন আমি সরাসরি চলে যাই শেখ সাহেবের কাছে। তার সঙ্গে আমার খুব কাছের সম্পর্ক ছিল। একদম 'তুই-তোকারি' ভাষাতেই তিনি আমার সঙ্গে কথা বলতেন সব সময়। তিনি আমার হাত ধরে পাশে বসিয়ে বললেন, কি রে, তোর নাম তো রাজাকারদের তালিকায় নেই। আমি বললাম, না, তা নেই। তাহলে তোর তো কোনো সমস্যাও নেই। এরপর আমার পত্রিকা আবারো চালু হয়ে যায়।

তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তান জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের সাধারণ সম্পাদক মুফতি মাহমুদ '৭১-এ পূর্ব পাকিস্তানে এসে হোটেল পূর্বাণীতে শেখ মুজিবের সঙ্গে মিটিং করে এখান থেকে বিদায় নেয়ার সময় আমাদের এখানকার জমিয়তের নেতৃবৃন্দদের বলে গিয়েছিলেন, আমেরিকা যার বন্ধু হয়ে যায় তার আর শত্রুর প্রয়োজন হয় না। আমেরিকা পাকিস্তানের বন্ধু হয়ে গেছে। তাই এদেশ আর একসঙ্গে থাকবে না। সুতরাং তোমরা তোমাদের দেশের পক্ষেই কাজ করবে।

কথা বলার ফাঁকে ফাঁকে নোট নিচ্ছিলাম। এদিকে দৃষ্টি পড়তেই মাওলানা খানের হুঁশিয়ারি না, না। খবরদার, আমাকে নিয়ে কোনো লেখাজোখা করবে না। আমি রাজাকারও হতে চাই না, মুক্তিযোদ্ধাও সাজতে চাই না। আমাকে আমার মতো থাকতে দাও।

মাওলানা শামী সম্পর্কে তিনি তথ্য দিলেন– তার বাড়ি মুন্সিগঞ্জে। জানালেন, শামীর এক আত্মীয় তাঁর প্রতিবেশী। গেণ্ডারিয়াতেই থাকেন। দু'দিন পর এলে শামীর ঠিকানা এনে দেবেন।*

দু'দিন পর তাজুল ফাত্তাহকে সঙ্গে নিয়ে আবারো বসি মাওলানা খানের মুখোমুখি। সেদিন যেখানে গিয়ে শেষ হয়েছিল আলাপ তারপর থেকে শুরু করতে বলি। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে এভাবে শুরু করলেন–

আমাদের দেশের কথা তোমাদের আর কী বলব। দেশটা শেষ হয়ে গেছে। '৭১-এ পাকিস্তানিরা দেশকে জ্বালিয়েপুড়িয়ে, লুট করে নিঃশেষ করে দিয়েছে। আবার ভারতীয় সেনারা ফিরে যাবার সময় যা পেয়েছে তাই নিয়ে গেছে। এসেছিল খালি হাতে ফিরেছে ভরা হাতে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর এক শ্রেণীর মুক্তিযোদ্ধাও লুটপাট করে লুটে-পুটে খেয়েছে। আর কত থাকবে একটা দেশের ভেতর?

---

* সময়াভাবে মাওলানা মুহিউদ্দীন শামী সম্পর্কে বিস্তারিত খোঁজখবর নেয়া সম্ভব হয়নি। এ গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে তাঁর সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা থাকবে– ইনশাআল্লাহ।

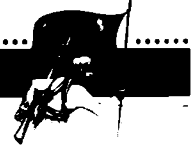
মুক্তিযুদ্ধের সময় আমার বাড়িতে মুক্তিযোদ্ধারা খেয়েছে, ঘুমিয়েছে নিশ্চিন্তে অথচ এখন তারা ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য আমাকে চেনে না। বলে, আমি নাকি রাজাকার। সিরাজ সিকদার টানা ৪ দিন ছিলেন আমার গেণ্ডারিয়ার বাসায়। আমার বাসার পাশেই ছিল তার বোনের বাসা। মাত্র একটা রুম নিয়ে থাকতেন তারা। হঠাৎ একদিন সিরাজ সিকদার বোনের বাসায় এসে হাজির হলে রাতের বেলা তার ভগ্নীপতি তাকে আমার বাসায় থাকার জন্য নিয়ে আসে। শুধু তিনিই নন সঙ্গে আরো দু'-তিনজনও ছিল। তাদের অবশ্য আমি চিনি না। একদল যেত আরেক দল আসত। থাকত মাসের পর মাস। এসব তো প্রমাণিত বাস্তবতা।

রমজানের ঘটনা। গফরগাঁওয়ে ন' ব্যাগ গ্রেনেডসহ পাকিস্তানি সেনাদের হাতে গ্রেপ্তার হয় আমার এক বন্ধুর একমাত্র ছেলে ও একমাত্র মেয়ের জামাই। সেখান থেকে তাদের ময়মনসিংহ শহরে নিয়ে আসা হয়। খবর পেয়ে আমি দ্রুত ছুটে যাই তাদের উদ্ধার করতে। দেখি সেখানের সেনা কামান্ডার হলো পাঞ্জাব প্রদেশের জমিয়তের সাধারণ সম্পাদকের ভাতিজা। আমার পরিচয় দেই তার কাছে। তারপর অনুরোধ করে আমি জামিন হয়ে তাদের দু'জনকে মুক্ত করে নিয়ে আসি। যাদের মুক্ত করেছি পাকিস্তানিদের হাত থেকে সেই তারাই বলে আমি নাকি রাজাকার! তারা বলে অথচ নিজেদের পক্ষে কোনো দলিল পেশ করতে পারে না। এটা কি মতলববাজি নয়?

এক সময়ের তুখোড় আওয়ামী লীগ নেতা ও বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার অন্যতম আসামী তাহেরউদ্দিন ঠাকুর যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র তখন পার্ট টাইম আমার সাপ্তাহিক 'আজ' অফিসে কাজ করত। আমার সঙ্গে বেশ ভালো সম্পর্ক ছিল তার। '৭১-এর ন' মাস ঠাকুর আমার খোঁজখবর রাখতেন। যুদ্ধের পরেও আ'লীগের নেতা-কর্মীদের বলে রাখতেন আমাকে যেন কেউ কোনো ক্ষতি করতে না পারে। তার এই আন্তরিকতায় আমি মুগ্ধ।

'৫২-এর ভাষা আন্দোলনের কথা আমার মনে আছে। তখন আমি ঢাকা আলিয়ার ছাত্র। আমাদের সবার প্রাণের দাবি রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই। ছাত্রদের বিশাল মিছিল নিয়ে ঢাকা আলিয়ার হল থেকে ভিক্টোরিয়া পার্কে আসি। উত্তাল সেই মিছিলে এক সময় শুরু হয়ে যায় প্রশাসনের তাণ্ডব। আমার শরীরেও কয়েক ঘা পড়ে। গ্রেপ্তার হয়ে জেলে যাই। ভাষার জন্য কারাবরণ করি টানা দেড় মাস।

বাঙালিদের একটা নিমকহারামির কথা আমার মনে বেশ দাগ কেটেছে। অনেক কোটিপতি বিহারি ছিল আমাদের এখানে। সেই বিহারিদের সাহায্য খায়নি এমন কোনো দল ছিল না এ দেশে। হাজী বশির উদ্দীন বিহারি ছিলেন। তার ছিল অঢেল অর্থ-সম্পদ। দু'হাতে বিলাতেন তিনি টাকা-পয়সা। এমনকি তার টাকার অনুদানেই শেখ মুজিবের পরিবার চলত সারা বছর। '৭১-এর পর সেই শেখেরই সুযোগ্য (!) ভাগ্নে শেখ মনি গুণ্ডাপাণ্ডা নিয়ে হাজী বশিরের বাড়ি, গাড়ি, অফিস, প্রেস সব লুট করে নিজ দখলে নিয়ে যায়। এটাই কি পরোপকারের প্রতিদান? তার মানে কি, হাজী বশির দুধ-কলা খাইয়ে গোখরা পুশতেন? আদমজী, বাওয়ানী জুট মিলের মালিকদেরও ভাগ্যে জুটেছিল সেই একই দুর্দশা। হায়রে কপাল!



জমিয়ত নেতা কারী আবদুল খালিক বললেন, মাওলানা মান্নান বহুবার আমার পেছনে তার বাহিনী লেলিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহর ফজলে এবং মহল্লাবাসীর আশ্রয়ে বেঁচে যাই

দ্বিতীয়বারের মতো জানতে চাইলে আবারো সেই একই উত্তর– '৭২-এ জমিয়তে উলামায়ে ইসলামকে নিষিদ্ধ করেনি সরকার। নতুন এ তথ্যে অনেকটা অবাক হই। ইসলামী সব দল নিষিদ্ধ করলেও আপনাদের প্রতি এই উদারতা কেন, বৈধতা নিয়েই বেঁচে রইলেন? একই বিষয়ে কয়েকবার প্রশ্ন করে জবাবের অপেক্ষায় রইলাম। দেখি কারী আবদুল খালিক কী জবাব দেন। কারী আবদুল খালিক মিরপুরের শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ সংলগ্ন জামেয়া হোসাইনিয়া ইসলামিয়া আরজাবাদ মাদরাসার দপ্তরে বসা। একটি ডেক্সের পাশে ঠেক দিয়ে দরজার দিকে তাকানো। বাইরে সিডরের তুলকালাম তাণ্ডব। বললেন, '৭১-এ জমিয়তের বেশ জোরালো ভূমিকা ছিল। বিপক্ষে নয়, অবশ্যই স্বাধীনতার পক্ষে। শেখ সাহেবও আমাদের সঙ্গে মতবিনিময় করতেন। বৈঠক হতো। সিদ্ধান্ত নিতাম দেশের কল্যাণে কী কী করতে পারি আমরা। বাস্তবেও ফলিয়েছি আমাদের সেই সিদ্ধান্তগুলো। তাহলে কেন আমাদের নিষিদ্ধ করা হবে? প্রশ্নের মাধ্যমে জবাব শেষ করে নতুন প্রসঙ্গে কথা বলা শুরু করেন কারী আবদুল খালিক। চোখে-মুখে তৃপ্তির ছাপ।

কারী আবদুল খালিক ১৯৩৯ সালে বাগেরহাট জেলার মোরেলগঞ্জ থানার চিংড়াখালী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি লাহোরের তাজবিদুল কোরআন মাদরাসায় 'কারী' হন। হেফজ শেষ করেন ঢাকার ফরিদাবাদ মাদরাসা থেকে। কয়েক বছর গওহারডাঙায়ও অধ্যয়ন করেন।

আপনি তো হাফেজও, তাহলে শুধু কারী হিসেবে সবার কাছে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন কিভাবে? এ প্রশ্নের জবাবে তিনি অনেক পেছন থেকে কথা শুরু করেন। "ঢাকায় এসেই আমি পল্টন মসজিদে নিয়োগ পেয়ে যাই। তারাবিহ পড়াই সেই যুদ্ধেরও এক যুগ আগে থেকে। পল্টন মসজিদের অধীনে একটি মক্তব ও হেফজখানা ছিল। ব্যস্ত মানুষজন এবং

মহল্লার ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা সুযোগ মতো এখানে এসে কোরআন শিখে নিত। আমি ছিলাম সেই মাদরাসার কারী; মানুষকে শুদ্ধ করে কোরআন শেখাতাম। সেই থেকে নাম উঠে যায় 'কারী সাহেব হুজুর'। এছাড়া জাতীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠিত অধিকাংশ কেরাত প্রতিযোগিতায়ই বিচারক হিসেবে আমাকে রাখা হয়।"

জামেয়া হোসাইনিয়া ইসলামিয়া আরজাবাদ মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা তো আপনিই। কীভাবে এর গোড়াপত্তন হলো, যেখান থেকে আজকের এই মহীরুহ। বললেন, সে তো এক দীর্ঘ উপাখ্যান, কষ্টের ইতিহাস। ষাটের দশক থেকেই মাথায় খেলে আসছিল– একটি নিরেট দীনি মাদরাসা বানাব। যেখানে দিন-রাত ধর্মচর্চা ও গবেষণা হবে। দ্বীনের জন্য এক দল নিবেদিতপ্রাণ লেগে থাকবে। কিন্তু কোনো পথ পাচ্ছিলাম না। একদিন এক ছাত্র গার্জিয়ানকে বললাম– দেখুন তো আপনাদের ওদিকে কোনো জায়গা পাওয়া যায় কি-না। মাদরাসা করব। তিনি প্রথমে আমাকে নিরাশার উত্তর দিয়েও পরবর্তীতে তার মাধ্যমেই মিরপুরের এখানটায় ছোট্ট একটু জায়গার ব্যবস্থা হয়। আগে থেকেই জীর্ণপ্রায় একটি মসজিদ ছিল। আমি এসে মরহুম মোহাম্মদ খান, মরহুম আলহাজ মোবারক আলী (টালী কোম্পানি) এবং স্থানীয় মেম্বার আবদুল মান্নান খানের সহযোগিতায় মক্তব, হেফজখানা ও কিতাব বিভাগের দুই জামাত পর্যন্ত চালু করি। হাফেজ হেমায়েত উদ্দিন এবং মসজিদের ইমাম মাওলানা আমিন উল্লাহ শিক্ষক হিসেবে আমার সঙ্গে ছিলেন। প্রথম ছাত্র ছিল জনাব সায়েম আলী সাহেবের ছেলে হাফেজ ছেরাজুল ইসলাম। দু'দিন আগে আমাদের এই প্রিয় ছাত্রটি ইন্তিকাল করে। সৌভাগ্য, এই মাঠেই তার জানাজা নামাজ অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠার বছরখানিক পরই মাদরাসায় এসে খামচে ধরে পাকিস্তানিদের উন্মত্ত ধ্বংসের সর্বগ্রাসী থাবা। ২৭ মার্চ সকালে বিহারিরা হামলে পড়ে মাদরাসার ওপর। গুলি চালায়। লুট করে। আগুন ধরিয়ে দেয়। ছাই বানিয়ে ফেলে মাদরাসার কোরআন-কিতাবসহ পুরো প্রতিষ্ঠানটি। আমি, স্থানীয় মেম্বার আবদুল মান্নান খান, মসজিদ সেক্রেটারি মুজিবর রহমান ও স্থানীয় বেশ কিছু লোকজন মিলে প্রতিরোধের চেষ্টা করেছিলাম। পারিনি। শেষ পর্যন্ত চলে যেতে বাধ্য হই। তারপর পরিবার নিয়ে তিন দিনে মিনিবাস, নৌকা এবং পায়ে হেঁটে বাগেরহাটের গ্রামের বাড়ি চলে যাই। তার এক মাস পর গ্রামে ফ্যামিলি রেখে ফিরে আসি ঢাকায়। পুরানা পল্টন জামে মসজিদে।

১৭, পুরানা পল্টন ছিল কারী আবদুল খালিকের মসজিদ। এ মসজিদকে ব্যানার হিসেবে ব্যবহার করে তিনি স্বাধীনতার পক্ষে অবস্থান নেন। মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা, মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দেওয়া ও সাহায্য-সহযোগিতা সবই করেছেন এ মসজিদ থেকে। মুক্তিযোদ্ধারা অভিযানে যাওয়ার আগে তার কাছে দোয়া নিতে আসতেন। উস্তাদজি, আজকে অমুক জায়গায়! দোয়া চাই। বেঁচে থাকলে আবার দেখা হবে। জুমার বয়ানে তিনি দেশ স্বাধীন হওয়ার পক্ষে জোরালো বক্তব্য রাখতেন। তার সত্য উচ্চারণে মসজিদ কর্তৃপক্ষ বেশ ঘাবড়ে যায়। একদিন মসজিদের সেক্রেটারি এসে তাকে নিষেধ করে। পাকিস্তানবিরোধী বক্তব্য দিবেন না কারী সাহেব। মসজিদ ভেঙে ফেলবে। জানে মেরে ফেলবে তারা আমাদের সব ক'টাকে। কোনো ছাড় দেবে না।

আরেকদিন মুক্তিযোদ্ধারা ভুল বুঝে তাকে। মসজিদের এক মুসল্লির বাসায় মিলাদে গিয়েছিলেন স্বাধীনতাপ্রেমী কারী আবদুল খালিক। দোয়ায় হাত তুলেই কেঁদে কেঁদে



৫

একবার মাওলানা শামছুদ্দীন কাসেমী পাকবিরোধী জ্বালাময়ী বক্তব্য রাখলেন ভিক্টোরিয়া পার্কে, যেখানে জমিয়তের অফিস ছিল। মিলিটারিরা রেগে যায় ভীষণ তাঁর বক্তব্যে। সঙ্গে সঙ্গে গ্রেফতার করে নিয়ে যায় সেনা ক্যাম্পে। কড়া জিজ্ঞাসাবাদ– আলেম হয়ে কেন আপনি পাকিস্তানবিরোধী কথা বলেন?...

৭

স্বাধীনতাপ্রেমী মাওলানা শামছুদ্দীন কাসেমী (রহঃ)

বারবার বললেন– সত্য সংগ্রামের জন্য যারা লড়ছেন আল্লাহ তুমি তাদের জয়ী করো। দোয়া শেষ হতেই কয়েকজন যুবক ধরে বসল, মুক্তিদের জন্য দোয়া করলেন না কেন কারী সাহেব? তার সঙ্গে স্থানীয় একজন দারোগা ছিলেন। তিনি যুবকদের উদ্দেশ্যে বললেন, তোমরা কি সত্য সংগ্রামের জন্য লড়ছ না? তাঁরা উত্তর করল– নিশ্চয়ই। তাহলে হুজুর তো এই দোয়াই করেছেন। যুবকরা চুপ হয়ে গেল। কারী সাহেব তাদের আরো আপন হয়ে গেলেন। তারা বলল, আপনি আমাদেরই লোক। উস্তাদজি, আমরা বেঁচে থাকতে স্বাধীনতাবিরোধীরা আপনার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। ওদের একেবারে জানে মেরে ফেলব।

আরেকদিন তর্ক বাধিয়ে বসেন ভয়ংকর রাজাকার মাওলানা আবদুল মান্নানের সঙ্গে। 'ইনকিলাব'-এর সেই মান্নানের হাতে তখন ছিল বিপুল অস্ত্র, গোলাবারুদ আর দুর্দান্ত রাজাকার বাহিনী। লেলিয়ে দেয় সে তার বাহিনীকে স্বাধীনতাকামী কারী আবদুল খালিকের পিছু। তারা তাকে বারবার হত্যার চেষ্টা করলেও এলাকাবাসীর সমর্থন, সাহায্য ও অকৃত্রিম ভালোবাসার কারণে বারবারই বেঁচে গেছেন ভয়ংকর রাজাকারদের হাত থেকে। আরেকবারও তিনি বড় বাঁচা বেঁচেছেন বিহারিদের বিপক্ষে কথা বলে। তারা বায়তুল মোকাররমের উত্তর গেটে মিছিল নিয়ে শ্লোগান দিচ্ছিল– "শেখ মুজিব কো ফাঁসি দো!"

'৭১-এ তিনি জমিয়তে উলামার ঢাকা মহানগরীর প্রচার সম্পাদক ছিলেন। বর্তমানে কেন্দ্রীয় কোষাধ্যক্ষ। তখন নিখিল পাকিস্তান জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের সভাপতি ছিলেন হাফেজুল হাদীস আল্লামা আবদুল্লাহ দরখাস্তি। আর সাধারণ সম্পাদক ছিলেন মুফতি মাহমুদ। '৭১-এ জমিয়তের ভূমিকা জানতে চাওয়া হলে কারী সাহেব বেশ জোরালোভাবেই বললেন, "ভুট্টো যখন বললেন, পশ্চিম পাকিস্তান থেকে কোনো পার্লামেন্ট সদস্য যদি পূর্ব পাকিস্তানে যায় তাহলে তার ঠ্যাং ভেঙে দেয়া হবে– এর

প্রতিবাদে জাতীয় পরিষদের বিজয়ী প্রার্থীগণের একটি প্রতিনিধি দল এখানে আসে এবং মুফতী মাহমুদের নেতৃত্বে হোটেল পূর্বানিতে শেখ মুজিব-এর সঙে জমিয়তের মিটিং করে। সেখানে মুফতি মাহমুদ, মাওলানা শামছুদ্দীন কাসেমী, মাওলানা আবদুল জব্বারসহ ১২ জন সিনিয়র লিডার ছিলেন। আমি তখন মহানগরীর প্রচার সম্পাদক। নিচ তলায় রিসিপশনে বসা ছিলাম। মিটিং শেষে যখন সবাই বেরিয়ে এলেন তখন মুফতি মাহমুদ আমাদের বললেন– নদীতে যখন ভাঙন আসে সেই ভাঙন কিছু দূর না যাওয়া পর্যন্ত থামে না। এই দেশের ভাঙনও আপনারা ঠেকাতে পারবেন না। সুতরাং যেহেতু আপনারা এই এলাকায় থাকবেন তাই এখানকার ভালো-মন্দ দেখেশুনে থাকবেন। দেশের জন্য কল্যাণকর সিদ্ধান্ত নেবেন সব সময়। তার এই জবাব শুনার পর আগের তথ্যের ওপর ভিত্তি করে পাল্টা প্রশ্ন করি। আপনি বলছেন জমিয়তের নেতাকর্মীরা স্বাধীনতার পক্ষে কাজ করেছে অথচ প্রমাণিত সত্য হলো, গোলাম আযম, নিজামী, ইনকিলাবের মান্নান বা মুজাহিদের মতো যে ৮/১০ জন প্রথম সারির রাজাকার ছিল '৭১-এ তাদের একজন তো অবশ্যই আপনাদের সভাপতি পীর মুহসেনউদ্দীন দুদু মিঞা। যে নিয়মিত টিক্কা খান, ইয়াহিয়া খানদের সঙ্গে মিটিং করত, শলাপরামর্শে বসত। আপনাদের সভাপতিই যদি এত বড় শয়তানের গুরু হতে পারে তাহলে আপনারা ভালো হলেন কীভাবে? বাস্তবতা কি অস্বীকার করা যায়? প্রশ্ন শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদে কেঁপে ওঠে কয়েকটি মুখ। মাদরাসার প্রিন্সিপাল মাওলানা মোস্তফা আজাদ, শামছুদ্দীন কাসেমীর ছেলে বাহাউদ্দীন যাকারিয়া ও কারী সাহেবসহ দপ্তরে বসে থাকা সবাই এক বাক্যে তুবড়ি মেরে উড়িয়ে দিলেন। "অসম্ভব! এটা প্রকৃত বাস্তবতা হতেই পারে না। ভুল তথ্য এসব। বরং '৭১-এ জমিয়তের সভাপতি ছিলেন শেখ আবদুল করিম শায়খে কৌড়িয়া। '৭০-এর নির্বাচনে নোয়াখালীর একটা আসন নিয়ে পীর মুহসেনউদ্দীন দুদু মিঞা মজলিসে শূরার সিদ্ধান্তের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করলে দল তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়। এক পর্যায়ে তিনি নিজেই পদত্যাগ করেন। দল থেকে পদত্যাগ করলেও তিনি নিজের এবং তৎকালীন মিডিয়াও তাকে জমিয়তের সভাপতি হিসেবে প্রচার করে। তাজুল ফাত্তাহ বলল, কাহিনীটা তো তাহলে দেখা যাচ্ছে বর্তমান বিএনপি বা জাপার মতো। বহিষ্কৃত কেউটেরাও ভাবে আমিই আসল বিএনপি বা জাপার সভাপতি!

আচ্ছা আপনাদের তখনকার সময়ের পূর্ব বাংলার সাধারণ সম্পাদক মাওলানা শামছুদ্দীন কাসেমীকে নিয়েও তো আমাদের কাছে তথ্য আছে। অভিযোগ, তিনি নাকি পুরনো ঢাকার এক হিন্দুর বাড়ি দখল করেছিলেন। তার সেই হিন্দু বাড়িতে থাকার প্রমাণও আছে আমাদের কাছে। এছাড়া তিনি '৭১-এ অখণ্ড পাকিস্তানের পক্ষে বিবৃতিও দিয়েছেন পত্রিকাগুলোতে। এটাও প্রমাণিত বাস্তবতা। তাহলে তো তিনি অবশ্যই পীর মুহসেনউদ্দীন দুদু মিঞার মতো হানাদারদের মিত্র ছিলেন। এই বিষয়টি ...? আমাদের প্রশ্ন শেষ হবার আগেই আরেকবার আঁৎকে উঠলেন দপ্তরের সবাই। সচকিত হলো এক সঙ্গে সবগুলো মুখ। একটা রব পড়ে গেল দপ্তরময়। তখন সবার কাছ থেকে যে

তথ্যগুলো পাওয়া গেল তা শুনে আমরাও কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে গেলাম। এত মিথ্যে কীভাবে বলা যায় একজন স্বাধীনতাকামীকে নিয়ে? এও কি সম্ভব?

মাওলানা শামছুদ্দীন কাসেমী এক অভিজাত বংশে জন্মগ্রহণ করা সন্তান। তার আপন বড় ভাই ছিলেন খুবই উচ্চ শিক্ষিত ও সরকারি উর্ধ্বতন কর্মকর্তা। পাকিস্তান সরকারের মালিকানাধীন ভাসমান হসপিটাল 'নিরাময়' জাহাজের ক্যাপ্টেন ছিলেন। সরকার তাকে জার্মানি থেকে ট্রেনিং দিয়ে এনেছিলেন। যুদ্ধ শুরু হলে জাহাজটি যুদ্ধের কাজে ব্যবহারের জন্য সরকার নিয়ে নেয় এবং বাঙালি ক্যাপ্টেন হওয়ায় তার প্রতি সন্দেহপ্রবণ হয়ে তাকে সে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দিয়ে পুরনো ঢাকার এক পরিত্যক্ত হিন্দু বাড়িতে সেনা পাহারায় রেখে দেয় সরকার। তিনি সেখানেই থাকতেন। দেশজুড়ে যুদ্ধ যখন দাবানলের রূপ নেয় তখন পাকিস্তানি আর্মিরা হানা দিয়ে স্বাধীনতাপ্রেমী শামছুদ্দীন কাসেমীর ঢাকার বাড়ি-ঘর তছনছ করে ফেলে। অসহায় হয়ে যায় তার পরিবার। তখন সঙ্গত কারণেই তার বড় ভাই তাদের ডেকে নিয়ে নিজের কাছে আশ্রয় দেন। তিনি তার অসহায় পরিবার নিয়ে অস্থায়ীভাবে ঠাঁই নেন তার বড় ভাইয়ের বাসায় সেই পরিত্যক্ত হিন্দু বাড়িটিতে। এর সামান্য কিছু দিন পরই সুযোগমতো তার পরিবারকে গ্রামে পাঠিয়ে দেন তিনি। এই হলো প্রকৃত ইতিহাস।

আর বিবৃতির কথা এ রকম— একবার মাওলানা শামছুদ্দীন কাসেমী পাকবিরোধী জ্বালাময়ী বক্তব্য রাখলেন ভিক্টোরিয়া পার্কে, যেখানে জমিয়তের অফিস ছিল। মিলিটারিরা রেগে যায় ভীষণ তার বক্তব্যে। সঙ্গে সঙ্গে গ্রেফতার করে নিয়ে যায় সেনা ক্যাম্পে। কড়া জিজ্ঞাসাবাদ– আলেম হয়ে কেন আপনি পাকিস্তানবিরোধী কথা বলেন? এর শাস্তি কত ভয়াবহ আপনি জানেন? মরতে দেখেছেন, মরে দেখননি, তাই মৃত্যুর স্বরূপটাও বুঝেন না। শামছুদ্দীন কাসেমী জবাব দেন– আমি ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বলিনি। এক বিন্দু মিথ্যাও বলিনি। যা সত্য তাই বলেছি। আমি মজলুমের পক্ষে। অন্যায়ভাবে বাঙালিদের আঘাত করা যেমন অন্যায়, চুপ থাকাও অন্যায়। কাপুরুষতা। তার মুখে এ সত্য উচ্চারণ শুনে পাক কমান্ডার একেবারে লা-জবাব হয়ে যান। কিছু সময় বন্দি রেখে তারপর ছেড়ে দেন। তবে এ সুযোগে তার হাতের কয়েকটা স্বাক্ষর রেখে দেন। সেই স্বাক্ষর দিয়েই পাকিস্তানি সৈন্যরা পত্রিকা অফিসে তাঁর নামে বিবৃতি পাঠায়। রটে যায়, তিনি পাকিস্তানিদের পক্ষে পত্রিকায় বিবৃতি দিয়েছেন। সত্যিই কি তাই! সত্যের জয়, হয় নিশ্চয়।



মুক্তিযুদ্ধের সার্টিফিকেট নিয়ে মাওলানা জহিরুল হক ভূইঁয়া আক্ষেপ করে বললেন, এই কাগুজে বাঘ বয়ে বেড়ানোর কোনো মানে হয়?

রাত সাড়ে চারটা। অচেনা পথে এক দল কুকুরের তাড়া খেয়ে পেছনে ফিরতে বাধ্য হই। বেড়িবাঁধের ওপর দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে থাকি এদিকে যদি কেউ আসে। বেড়িবাঁধের মেঠোপথ ভিজে পিচ্ছিল। মধ্যরাতের ২৪৩ বেগের হ্যারিক্যান 'সিডর' তার নিষ্ঠুরতার প্রমাণ রেখে গেছে এখানে-সেখানে। চারদিকের দুমড়ে-চুমড়ে যাওয়া বাড়ি-ঘর, মসজিদ তার জানান দিচ্ছে নিঃশব্দে। কিছুক্ষণ পর অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এলো এক তরুণ। বয়স বিশ পেরুবে হয়তোবা। গায়ে শীতের চাদর। জিজ্ঞেস করতেই পথ দেখিয়ে দিল– এদিকে যান। সামনেই জাহানাবাদ মসজিদ। আগাম শীতের অন্ধকার রাতে কয়েকটা সরু গলি পেরিয়ে এসে হাজির হই মিরপুর বেড়িবাঁধ সংলগ্ন তুরাগের তীরে ঠাঁয় দাঁড়িয়ে থাকা এ মসজিদটাতে। সঙ্গী তাজুল ফাত্তাহ। রাতের প্রথম ভাগে কথা হয়েছিল এখানটায় এসে ফজর পড়ার। নামাজ শেষে কথা বলব মাওলানা জহিরুল হক ভূঁইয়ার সঙ্গে। মাওলানা জরিুল হক ভূঁইয়ার পিতার নাম মরহুম ডালিম ভূঁইয়া। তার গ্রামের বাড়ি শিকারপুর, কসবা, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়। তিনি দাওরা (মাওলানা) পাস করেন জামেয়া ইউনূসিয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়া বড় মাদরাসা থেকে ১৯৬৬ সালে। তার কর্ম জীবনের প্রথম বছরটি কাটে আখাউড়া মাদরাসায়। এর পর টঙ্গী দারুল উলুম-এ। '৭১-এ তিনি ছিলেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের সাংগঠনিক সম্পাদক আর বর্তমানে এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি এবং সাভার ভাগ্নীবাড়ি মাদরাসার প্রিন্সিপাল।



'৪৫-এর ফেব্রুয়ারিতে জন্মগ্রহণকারী এই সংগঠক আলেম মুক্তিযোদ্ধার ১ ছেলে ও ৩ মেয়ে। তিনি এখন নিজস্ব ভূমিতে বসবাস করেছেন। তুরাগ তীরের মিরপুরে।

মাওলানা জহিরুল হক ভূঁইয়া '৭১-এ নবীনগর থানার কুড়িঘর মসজিদের ইমাম ও শিবপুর স্কুলের ধর্ম শিক্ষক ছিলেন। তখন পাকিস্তানিদের অত্যাচার ও জামায়াতীদের ভণ্ডামি তার ভেতর নাড়া দেয়। জন্ম দেয় শত প্রশ্নের। তাই তিনি সিদ্ধান্ত নেন বাঙালিদের নয় বরং পাকিস্তানিদের কোমর ভেঙে দিতে হবে। তাড়াতে হবে তাদের এ দেশ থেকে।

যুদ্ধ চলাকালে তিনি জামায়াতীদের মুখে শুনতেন, পাকিস্তান না থাকলে ইসলাম থাকবে না। তাই পাকিস্তানিদের সাহায্য করা ঈমানী দায়িত্ব। তখন ভাবতেন, অন্য আর কোনো দেশে তো পাকিস্তানিদের দাপট-প্রভাব নেই। সেসব দেশে কী ইসলাম নেই? আমাদের ঈমান কি এতই ঠুনকো?

তাঁর কাছে জানতে পারলাম তাদের এলাকায় যারা রাজাকার বা স্বাধীনতাবিরোধী ছিল তারা সবাই জামায়াতে ইসলামীর কর্মী-সমর্থক। সেই জামায়াতীরাই সুন্দরীদের ধরে নিয়ে পাকসেনাদের হাতে তুলে দিত। তখন নিজেরাও ভোগ করত সুযোগে। আর বলত– নেকাহে মুতা! এসব হালাল!

কসবার মসজিদে নামাজ পড়ত এক পাকিস্তানি সেনা অফিসার। তখন মাঝে মধ্যেই মাওলানা জহিরুল হক ভূঁইয়ার সঙ্গে তার কথা হতো। সেনা অফিসার তাকে চিনত না। ভাবত নিজেদের লোক। মুখ চেনা থেকে যখন পরিচয়টা আরেকটু বেড়ে যায় তখন একদিন বলল, যারা শান্তি কমিটিতে ডেরা গেড়ে শান্তি খোঁজে তাদের চেয়ে আহাম্মক আর নেই। দেশে যেহেতু স্বাধীনতার গর্জন উঠেছে একজন বাঙালি থাকলেও দেশ স্বাধীন হবে। আমি নিশ্চিত, বাঙালিদের স্বাধীনতা কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। তখন হয়তোবা তারা আমাদের ক্ষমা করবে। কিন্তু তাদেরকে কেউ ক্ষমা করবে না। গাদ্দারির অভিশাপ নিয়েই তাদের বাঁচতে হবে আজীবন!

মাওলানা জহিরুল হক ভূঁইয়ার '৭১-এ মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য সহযোগিতা করাই ছিল প্রধান কাজ। নিয়মিত তার বাড়িতে অসংখ্য মুক্তিযোদ্ধা আশ্রয় নিতেন, থাকতেন, খেতেন, ঘুমুতেন। আর যারা সীমানা ডিঙিয়ে ভারত যেতেন তাদের প্রথম প্লাটফর্ম ছিল তার বাড়ি। শরণার্থীদের ভিড় সব সময়ই লেগে থাকত তাঁর বাড়িতে। তিনি এ সবই করতেন মুক্তিযোদ্ধাদের পরামর্শে, তাদের প্রয়োজনে। দেশকে ভালোবেসে।

হাসিনা সরকারের আমলে তাকে মুক্তিযোদ্ধাদের সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছিল। এর আগে তিনি ইচ্ছে করেই তা সংগ্রহ করেননি। কারণ হিসেবে জানতে পারি একটি তিক্ত ঘটনা। যে ঘটনার পর থেকে তিনি অনেক মুক্তিযোদ্ধার ওপর আস্থাহীন হয়ে পড়েন।

ডিসেম্বরের মাঝামাঝি সময় ছিল তখন। বিজয়ের পতাকা উড্ডীন হচ্ছিল বাংলার কোনায় কোনায়। ব্রাহ্মণবাড়িয়াও মুক্তির দ্বারপ্রান্তে। পাকিস্তানিদের এক গান বোটের সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধাদের সংঘর্ষ বেধে যায়। মুক্তিরা ঘিরে ফেলে বোটটিকে। পাকিরা বোট থেকেই নদীর দু' কূলে থাকা মুক্তিদের লক্ষ্য করে অবিরাম বুলেট ছুড়তে থাকে। মুক্তিরা কৌশলে প্রথমে কিছুটা দমে থাকে। আস্তে আস্তে যখন পাকিদের গোলাবারুদ কমতে থাকে, মুক্তিরা শুরু করে পাল্টা তুমুল আক্রমণ। তাদের আক্রমণে পাকিরা দিশেহারা হয়ে যায়। কারণ ততোক্ষণে তাদের সব কার্তুজ শেষ। বোট চালিয়ে সামান্য দূর পালাতেই বুলেটের ক্ষিপ্র আঘাতে পানির ফোয়ারা ছুটে বোটের জাগায় জাগায়। কোনো উপায় না দেখে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে ১৫/২০ জন পাকিস্তানি জোয়ান। নদীতে ডুবে মারা পড়ে কয়েকজন। ধরাও পড়ে কয়েকজন। বাকিরা সবাই পালিয়ে যায়। কম বয়সি

একটি তরুণ ধরা পড়েছিল তখন। বয়স বেশি হলে দশই হবে। তবে সে সৈন্য না। সাধারণ কেউ। জোরপূর্বক তাকে ধরে আনা হয়েছিল। তখন মাওলানা জহিরুল হক ভূঁইয়া সঙ্গীদের ডেকে বলেছিলেন, দেখো এই ছেলেটি যেহেতু আমাদের কোনো ক্ষতি করেনি, চায়ও না ক্ষতি করতে। সে পরিস্থিতির শিকার। শুধু শুধু ওকে জানে মারা ঠিক হবে না। কিন্তু তখন কেউ শুনেনি তার আহ্বান। সবাই বেধড়ক পেটাতে থকে ছেলেটিকে। নৃশংসভাবে হত্যা করা হয় তাকে। ঘটনাটি মাওলানা জহিরুল হক ভূঁইয়ার মনে দাগ কেটে যায়। সেদিন তিনি খুবই ব্যথিত হন অসহায়-অবোধ ছেলেটির জন্য।

একবার কেন্দ্রীয় মুক্তিযোদ্ধা সংসদের সভাপতি তার কার্যালয়ে তাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আপনি সার্টিফিকেটের প্রতি এত অনীহাভাব পোষণ করেন কেন? সবাই নিয়েছে, আপনারও তো উচিত ছিল তা সংগ্রহ করার। মাওলানা জহিরুল হক ভূঁইয়া সোজা উত্তর দেন মুখে, বুকে তার এক আকাশ হতাশা। সার্টিফিকেট দিয়ে কী হবে? দেশের জন্য সব করেছি, সয়েছি। তবুও এখনও তো আমাদের রাজাকারই ভাবেন। টুপি, দাড়ি নবিজীর সুন্নত। আপনারা মনে করেন রাজাকারের পোশাক। বিশ্বাস না হয় পাশের লোকগুলোকে জিজ্ঞেস করুন তারা আমাকে কী ভাবছে। এই কাগুজে বাঘ বয়ে বেড়ানোর কোনো মানে হয়?



মাওলানা ইস্‌হাক ওবায়দী বললেন, আমার ঈদ কার্ড বিক্রির ছবি পত্রিকায় ছাপিয়ে পাক সরকার দেখাতে চেয়েছিল ঢাকার অবস্থা স্বাভাবিক

ঢাকার বায়তুল মোকাররম মসজিদের সামনে ছোট একটি বইয়ের দোকান দিয়ে বসে আছেন, দেশ তখন যুদ্ধে টালমাটাল। মুক্তিযুদ্ধের পোশাক হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছিলো খদ্দরের পোশাক। সে পোশাক পরেই সবার সামনে ব্যবসা জমিয়েছেন মা-ওলানা ইস্‌হাক ওবায়দী। একদিন ঠিকই পাক হানাদার বাহিনী ধরে বসলেন তাঁকে এবং বললেন, আপভি জয়বাংলা কা কাপ্‌ড়া পাহেন্তে হ্যায়? অতি কৌশলী উত্তর ছিল মাওল-ানা ওবায়দীর। 'ইয়ে তো হামারা ওয়াতান্ কা কাপড়া হ্যায়। হব্বুল ওয়াতানে মিনাল ঈমান, ইয়ে বহুত্ মশ্‌হুর মকুলা হ্যায় না?' কুমিল্লার তৈরি খদ্দর কাপড় তো তার আপন মাতৃভূমি বাংলারই কাপড়। এ রকম আরো কিছু ঘটনার সাক্ষী হয়ে আছেন মাওলানা ইস্‌হাক ওবায়দী। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চলে এলাম পল্টনস্থ সালসাবীল ডিজাইন ফার্মে।

মাওলানা ইস্‌হাক ওবায়দীর বাড়ি নোয়াখালীতে। জীবনের শেষ দিনগুলো সেখানে তাঁরই প্রতিষ্ঠিত বশীরিয়া ইসলামিয়া মাদরাসায় কাটাচ্ছেন। ঢাকায় আসার পর যোগাযোগ হয় তাঁর সঙ্গে। সেই সূত্রে সালসাবীলে আমরা মিলিত হলাম। আমার সঙ্গে আছে ফায়জুল হক। কিছুক্ষণ পরে এসে যোগ দিল মাসউদুল কাদির ও আতিকুল্লাহ শহীদ। নতুন প্রজন্মের আমরা চারজন মাওলানা ওবায়দীর মুখোমুখি হলাম একাত্তরের সময়কার ঢাকা সম্পর্কে জানার জন্য।

সেই সময় তিনি ঢাকাতেই অবস্থান করছিলেন। ৩ মার্চ গাজীপুরের কোনাবাড়ীতে এক মসজিদে মাওলানা ইস্‌হাক ওবাইদীর চাকরি হয়। ২৫ মার্চের কালো থাবা অন্য অনেকের মতো তাঁর চাকরিটাও কেড়ে নেয়। দেশের বাড়িতে পায়ে হেঁটে ফিরে যান। দু' মাস পর লঞ্চযোগে আবার ঢাকা ফিরে আসেন। সে সময়কার ঢাকার কথা বলছিলেন মাওলানা ওবায়দী এভাবে—

ঢাকায় লোকজন একেবারেই কমে গিয়েছিল। সবার মধ্যে ভীতি-উৎকণ্ঠা সবই ছিল। এরই মাঝে বেঁচে থাকার তাগিদে বায়তুল মোকাররমের দক্ষিণ গেইটে একটি ছোট বই ও টুপি-জায়নামাজের দোকান দিয়ে বসলাম। বই হয়তো বিক্রি হচ্ছে বা হচ্ছে না, কিন্তু চোখ দেখে যাচ্ছে। টিক্কা খানের মালেক গভর্নমেন্টের রাজপ্রাসাদ বঙ্গভবনের ওপর বোমা নিক্ষেপসহ কত কিছুই তো হয়ে গেল। আমার সামনেই আহত হচ্ছে অনেক

বাঙালি। কাউকে হাসপাতালে নেয়ার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি, কাউকে আবার নিজেরাই প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে ছেড়ে দিচ্ছি। এর মধ্যে মুক্তিযোদ্ধাদের গেরিলা হামলাও অহরহ চলছিল। একদিন দেখলাম, বায়তুল মোকাররম মার্কেটের পশ্চিম-দক্ষিণ পাশে অবস্থিত লাইট কনফেক্শনারির পাশে উর্দুভাষী এক লোকের ফ্যান্সি স্টোর নামে বিরাট দোকান ছিল। ওখানে কেনাকাটা করার জন্য মনে হয় কোনো আর্মি পাঠান জিপ নিয়ে ভেতরে গেছে, অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই গাড়িতে রাখা মুক্তিযোদ্ধাদের টাইম বোমার হামলায় জিপটা তুলার মতো টুকরো-টুকরো হয়ে অনেক ওপরে উঠে ছিটকে পড়ল। বোমা হামলায় একজন সেল্‌সম্যান ক্ষতবিক্ষত হয়ে দৌড়ে এসে আমার ঈদ কার্ড দিয়ে সাজানো চকিতে বসে পড়ল। পেট থেকে ভুঁড়িটা বেরিয়ে আসছে প্রায়। আমরা সবাই মিলে সঙ্গে সঙ্গে পাঠিয়ে দিলাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। মুক্তিযোদ্ধা যারাই এসেছে যতটা পারা গেছে সহায়তা করেছি। আমি তখন তরুণ বলে অনেক ইচ্ছা ছিল কোনো মুক্তিযোদ্ধার হাত ধরে চলে যাব রণাঙ্গনে। অবিশ্বাস, বিশ্বাসঘাতকতার ভয়ঙ্কর ঢাকায় সে সময়টাতে সে রকম ভালো কোনো সঙ্গী পাইনি। যার ফলে সরাসরি রণাঙ্গনে যাওয়া আর হয়ে ওঠেনি। কিন্তু মনের সবকুটু স্থান জুড়ে ছিল নতুন একটা দেশের স্বপ্ন। একাত্তরের আগে যখন দাওরা হাদিস পাস করলাম, তখন ইচ্ছা ছিল ভারতের দেওবন্দ মাদরাসায় গিয়ে উচ্চ শিক্ষা নেব। তা করতে পারলাম না তৎকালীন পাক সরকারের কারণে। তখন ভারতের নাম নেয়াই ছিল দেশদ্রোহিতার সামিল। যুদ্ধ যখন শুরু হলো, তখন ভাবতে লাগলাম, নতুন দেশ হলে ভারত-বাংলাদেশে আর দ্বন্দ্ব থাকবে না। আমরা অবাধে সেখানে যেতে পারব শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে।

ব্যবসা ছিল বায়তুল মোকাররমে, আর এ দিকে লজিং থাকতাম কলতাবাজারে। আমার লজিং মাস্টার বায়তুল মোকারমের আক্তার এন্ড সন্সের মালিক জনাব আনোয়ার সাহেব ছিলেন আওয়ামী নেতা মরহুম তাজুদ্দীন সাহেবের বাল্যবন্ধু। তিনিও মুক্তিযোদ্ধাদের অনেক সহায়তা করতেন। স্বাধীনতার স্বাদ ও পুলক আমরা সবাই একসঙ্গে অনুভব করতাম। রমজান মাস চলছে, আর ক'টি দিন পরেই রোজার ঈদ। দোকানে ঈদ কার্ড তুললাম, দু'একজন কাস্টমার এসে বলল, আপনার ঈদ কার্ড বিক্রির রমরমা ছবিটা গতকাল 'মর্নিং নিউজ' আর 'অবজার্ভার' পত্রিকায় খুব ফলাও করে ছাপা হয়েছে। আমি সব পত্রিকা ঘাঁটাঘাঁটি করলাম, কোনো বাংলা পত্রিকায় এ ছবি আসেনি। শুধু ইংরেজি পত্রিকায়ই এসেছে। আমার অজান্তে বেচা-কেনার কোন ফাঁকে ছবি তোলা হয়েছে তা আমিও জানি না। শুধু ইংরেজি পত্রিকায় প্রকাশ করাতে বুঝতে পারলাম যে, আমার ঈদ কার্ড বিক্রির ছবি ছাপিয়ে পাক সরকার কূটনৈতিক মহল ও বহির্বিশ্বকে বোঝাতে চাচ্ছে যে, দেশের অবস্থা খুবই স্বাভাবিক। যুদ্ধের কোনো শংকা সাধারণ মানুষের মধ্যে নেই। অথচ ঈদ কার্ডের অধিকাংশ খদ্দেরই থাকত পাকসেনারা। তখন আমার আরো বুঝে আসল যে, একটি জালেম সরকার গণমাধ্যমকে কীভাবে নিজ স্বার্থে ব্যবহার করে থাকে। আমরা কিন্তু বিবিসির নিয়মিত শ্রোতা হিসেবে সঠিক সংবাদটা ঠিকই পেয়ে যেতাম।

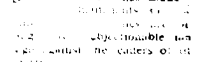
১৬ ডিসেম্বর। বিজয় উল্লাসে ভাসছে ঢাকা। রাজপথে নেমে এলাম আমিও। কলতাবাজার থেকে নবাবপুর রোড হয়ে পল্টনের দিকে আসতে চাইলেও পরে তা আর

PRINCETON (New Jersey) ... (AFP) — A majority of Democratic party supporters ... Senator Edmund Muskie ... candidate, the ... The poll ... survey of Democratic voters taken at the ... Sen. Kennedy nor Sen. Humphrey would get more than 25 per cent of Democratic votes ... primary

BOMB EXPLOSIONS

... Nobody was ... bomb explosion at ... was made ...

... during long ... of the dictatorial regime Ayub Khan. As a result ... was faced with ... crisis, he observed ... to the PPP ... comments Prof. Gh... Azam ... a ... regret that Mr. Bh... himself ... type of madness ... power ... this ... theory ... parties in ... longer for ... has made ... objectionable ... against the leaders of ... parties



IMPRESSION

The East Pakistan ... chief said that the six-party alliance in East Pakistan ... the possibility of an all Pakistan alliance amongst the ... parties seems to ... the hope ... Prime Minister which he ... had been cherishing ... during the last ... months. There is general ... in East Pakistan ... Mr. Bhutto was afraid of ... of power with Sheikh Mujibur Rahman and this ... conditions ... Sheikh Mujib from ...

... Azam ... President Yahya Khan ... Mr. Bhutto to head ... next ... Government ... the (President) does so it ... create doubt in the mind of the people of East Pakistan ... President Yahya Khan and ... Bhutto conspired against Sheikh Mujib in order to transfer power to Mr. Bhutto.

APPEAL TO BHUTTO

Prof. Azam appealed to Mr. Bhutto to realise it clearly ... his past political role ... Ayub regime and his ... political attitude has ... rendered him only a ... two provinces. He could ... develop himself as a national leader. "There is no reason why the people of East Pakistan should accept him as their leader. Rather his role after general election has created very strong sentiment against him in East Pakistan. Any leader of West Pakistan may be acceptable to the people of East Pakistan except Mr. Bhutto," he observed.

"I think Mr. Bhutto certainly feels guilty in this respect ... that is why he could not ... East Pakistan during the ... crisis faced by the people of this wing for last seven months. I fail to understand as to how does he dare to become a national leader with this ...

With EED only four days away people are buying greeting cards to wish their dear and near EED mubarak who are away from them.
M. N. photo

মাওলানা ওবায়দী ঈদ কার্ড বিক্রি করছেন। ১৬ নভেম্বর ১৯৭১-এ মর্নিং নিউজ-এ প্রকাশিত হয় এ ছবি

পারিনি। কারণ, নবাবপুর রোড ও ঠাটারীবাজারে বিহারিদের সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধাদের তখনো যুদ্ধ চলছিল। বিজয় উল্লাসে মুক্তিযোদ্ধারা খোলা জিপে করে স্টেনগান ইত্যাদি তাক করে সমস্ত রাজপথ ঘুরে বেড়াচ্ছিল। আমরা পথচারীরা হাত নেড়ে তাদের অভিবাদন জানাচ্ছিলাম। পথঘাট মুক্ত নয় বলে সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানে অনুষ্ঠিত জেনারেল নিয়াজী ও জেনারেল অরোরার চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান উপভোগ করা আর হলো না।

১৭ ডিসেম্বর দৈনিক পয়গাম অফিসের পাশ দিয়ে ওয়ারী হয়ে পল্টন ময়দানে উপস্থিত হই। সেখানে স্বাধীন বাংলাদেশে এ প্রথম একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। যার মধ্যমণি ছিল কমান্ডার আব্দুল কাদের সিদ্দিকী। আর্মি পোশাকেই তিনি বক্তৃতা করলেন, হাতে ছিল একটা এক হাত লম্বা লাটি বা বেত। প্যান্টের পকেটে পিস্তলের খাপে তার পিস্তলটা দেখা যাচ্ছিল। তার তেজোদীপ্ত ভাষণে তিনি বললেন, "বাংলাদেশ এমন এক দেশ হবে এখন, যেখানে আর কোনো চুরি থাকবে না, রাহ্‌জানি থাকবে না, ছিনতাই হবে না, হত্যা হবে না, ইত্যাদি।"

সভা শেষে চারজন লোককে উল্টা হাত বেঁধে সভা মঞ্চের কাছে নিয়ে আসা হলো, বাঁধা অবস্থায়ই বেয়নেট চার্জ করা হলো অনেকক্ষণ পর্যন্ত।

চেক খদ্দরের জুব্বা-টুপি ও সেলাইবিহীন লুঙ্গি পরা অবস্থায় আমি ছিলাম একদম মঞ্চের পাশেই। কিন্তু এ চারজনের অপরাধ সম্পর্কে কোনো ঘোষণাও শুনতে পাইনি বলে মনে মনে ধারণা করছিলাম, হয়তোবা চুরির দায়ে এ শাস্তি দেয়া হচ্ছে। কেননা, মঞ্চ থেকে একবার সিদ্দিকী সাহেব ঘোষণা দিয়ে একজনের হারানো কয়েক হাজার টাকা তাকে ফেরৎ দেয়া হয়েছিল। স্বাধীন দেশের ন্যায়বিচার কেমন হবে তার দৃষ্টান্ত দেখানো হচ্ছে বলে আমার এ ধারণা হয়েছিল। অন্যদিকে দেশীয় পত্রিকাকে ছবি তুলতে সুযোগ না দিয়ে শুধু বিদেশী মিডিয়াকে ছবি তোলার ব্যাপারে বেশি সুযোগ করে দেয়া হচ্ছিল। বেয়নেট চার্জ করতে করতে ওই চারজন ব্যক্তি যখন আধমরা প্রায়, তখন কাদের সিদ্দিকী পিস্তলের একটি করে গুলি দিয়ে তাদের ইহলীলা সাঙ্গ করলেন। পরে অবশ্য জানতে পেরেছি যে, তারা রাজাকার ছিল।

১০ জানুয়ারি শেখ সাহেব পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে ঢাকায় ফিরলেন। আনন্দে ভাসল গোটা দেশ। অশ্রুসিক্ত আনন্দের আমিও অংশীদার হলাম। চোখ থেকে পানি ঝরল, প্রাপ্তির পানি, উচ্ছ্বাসের পানি। তেজগাঁও বিমানবন্দর থেকে সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানে আনার পথে শেখ সাহেবের খোলা জিপের পাশে পাশে লাখো জনতার আনন্দ মিছিলে আমিও যোগ দিলাম। এ সামান্য পথ অতিক্রম করতে সময় লেগেছিল প্রায় দু'-তিন ঘণ্টার মতো।

মাওলানা ওবায়দী ছাত্র জীবনে 'শের-শায়েরি' করতেন, সে সুবাদে ভালো বাংলা গানও লিখতে পারেন, কবিতার ছন্দ আঁকতে পারেন। গান প্রচারের নেশায় বাংলাদেশ বেতারে একটি চাকরি নিলেন। সংবাদ প্রবাহ অনুষ্ঠানে রিপোর্টিং-এর দায়িত্ব।

পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট বাংলাদেশ বেতারে ডালিম-রশিদদের খোন্দকার মুশতাককে নিয়ে আসার প্রত্যক্ষ সাক্ষী তিনি। বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশনের অনেক

গানের গীতিকার তিনি। তাঁর লেখা সুর সম্রাট শিল্পী বশীর আহমদের সুর ও গায়কীতে গাওয়া আলোচিত একটি দেশাত্মবোধক গানের প্রথম কলি শোনালেন আমাদের—

আল্লাহ এই দেশ তোমারই দান
কৃতজ্ঞ আমরা তোমার কাছে
রেখো আমাদের মান।

বিদায় নিয়ে যেই চেয়ার থেকে উঠে যাচ্ছি, অমনি মাওলানা ওবায়দী আমার ডান হাতটা টেনে ধরে বসিয়ে বললেন, মাওলানা! আরেকটি কথা মনে পড়েছে, কোনোভাবেই যেন তা লিখতে ভুলে না যান। এরপর মাওলানা ওবায়দী স্মৃতি হাতড়ে বললেন, আমি তখন রাজনৈতিকভাবে পাকিস্তান জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম পার্টি করি। হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের ডাকা গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দিতে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আমার নেতা জমিয়তের সেক্রেটারি জেনারেল মুফতি মাহমুদ সাহেব ঢাকায় এসেছিলেন। তিনি পশ্চিম পাকিস্তান ফিরে যাওয়ার প্রাক্কালে পূর্ব পাকিস্তান জমিয়তের সভাপতি পীর মুহসেন উদ্দিন দুদুমিয়ার সিদ্ধেশ্বরীর বাসায় উদ্ভূত পরিস্থিতি সম্পর্কে আমাদের এখানকার নেতৃবৃন্দের সঙ্গে মতবিনিময় করতে গিয়ে বলেন, আমি জুলফিকার আলী ভুট্টো ও শেখ মুজিবুর রহমান সাহেবদেরকে বলেছি, দেশ যদি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তাহলে আপনাদের দু'জনের কারণেই হবে। ইতিহাস কিন্তু আপনাদের ক্ষমা করবে না। আর আমাদের নেতৃবৃন্দকে বললেন, আপনারা আপনাদের দেশের পক্ষেই কাজ করে যাবেন। কী আশ্চর্য ব্যাপার। পরবর্তী ইতিহাস কিন্তু ভুট্টো ও মুজিবকে ক্ষমা করেনি।

আমি আক্ষরিক অর্থে মুক্তিযোদ্ধা নই। তবে আমার দলের আদর্শের কারণে আমার রাজনৈতিক দর্শন মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে ছিল। কেননা এ যুদ্ধ ছিল জালেম-মজলুমের যুদ্ধ। আর মজলুমের পক্ষ অবলম্বন করাই একজন মুসলমানের কাজ। এ যুদ্ধে ন্যায়ের পক্ষে ন্যায়সঙ্গতভাবে যত মুসলমান শহীদ হয়েছেন, তাঁদের সকলকে মহান আল্লাহপাক ক্ষমা করে দিন এবং তাঁদের মর্তবা শহীদের মর্তবায় উন্নীত করুক। আমিন।



মুফতি নূরুল্লাহ বললেন, '৭১-এ জুমার খুতবায় বাংলাদেশের পক্ষে কিছু বলি কি-না এজন্য আমার পেছনে গোয়েন্দা লাগানো ছিল

দেশের ডাকসাইটে আলেমদের মধ্যে মুফতি মুহাম্মদ নূরুল্লাহ অন্যতম। জামিয়া ইউনুসিয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়ার প্রিন্সিপাল, শায়খুল হাদিস ও প্রধান মুফতি এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া বড় মসজিদের খতিব হিসেবে তিনি দেশ-বিদেশে ব্যাপকভাবে আলোচিত-সমাদৃত। সাধারণ আলেম সমাজের কাছে আওয়ামীপন্থি আলেম হিসেবে পরিচিত হলেও সক্রিয় রাজনীতি থেকে নিজেকে তিনি বরাবরই আড়ালে রাখেন। এছাড়া মাঝে মাঝে বিভিন্ন ইস্যুতে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমদের সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করে বিতর্কের ঝড় তোলেন। এরই মধ্যে জানতে পারলাম তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের পক্ষাবলম্বনকারী সেই দুর্লভ আলেমদের একজন। মনে মনে ভাবলাম, এজন্যই কি তিনি আওয়ামীপন্থি হিসেবে পরিচিত! দুইয়ে দুইয়ে চার মেলাতে তাঁর পড়শি, সাংবাদিক ইমদাদুল হক তৈয়বকে নিয়ে ঢাকা থেকে ছুটে যাই ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উদ্দেশে। পূর্ব পরিচয়ের সুবাধে তাঁর পুত্র মুফতি হাদিয়াতুল্লাহ পরিচয় পর্বটা সংক্ষেপ করে আনলেন।

নাম বলা নিষেধ

জুমাবার। ব্রাহ্মণবাড়িয়া বড় মসজিদে নামাজ শেষে আমাদের সঙ্গে কথা শুরু করলেন তিনি। অল্পক্ষণ কথা বলেই ভীষণ ক্লান্তবোধ করায় বিনীত অনুরোধের সুরে বললেন, এখন উঠি, বাকি কথা আসরের পর হবে।

আসর পড়ে একাকী কথা বলতে মসজিদ থেকে বেরিয়ে রুমে গিয়ে বসলেন। শুরু করলেন তাঁর মুক্তিযোদ্ধা হয়ে ওঠার গল্প। আমরাও তা শুনছিলাম তন্ময় হয়ে। আসর গড়িয়ে মাগরিব হলো। গল্প যেন আর শেষ হতে চায় না। তিনি একের পর এক অজানা এবং চমকপ্রদ সব কাহিনী আমাদের শুনিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু সচেতনভাবেই গল্পের নায়কদের নামগুলো এড়িয়ে যাচ্ছিলেন। নাছোড় হয়ে তাঁকে ধরলাম, ইতিহাসের সত্য তুলে ধরাও কিন্তু ঈমানী দায়িত্ব! তিনি বললেন, কি লাভ, থুথু ওপরে ফেললে নিজের ওপরই যে এসে পড়বে!

লালবাগের সালাহউদ্দীন সাহেবের গল্প

অনেক পীড়াপীড়ির পরেও তিনি যখন নাম বলতে চাচ্ছিলেন না মুফতি হাদিয়াতুল্লাহ ব্যাপারটা বুঝতে পেরে কৌশলে বাবাকে 'মামার ঘটনা'টা স্মরণ করিয়ে দিলেন এভাবে– আব্বাজি, মামার ঘটনাটা কিতা না ... ? এত সময়ে মনে হয় কাজ হয়েছে।

মুফতি সাহেব গড়গড়িয়ে বলতে শুরু করলেন, এইলার মামা হোসাইন আহমদ তখন ঢাকার লালবাগ মাদরাসায় পড়ত। যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে লালবাগ মাদরাসার সিনিয়র মুহাদ্দিস মাওলানা সালাহউদ্দীন সাহেবের নেতৃত্বে রাজাকারদের এডভান্স বাহিনীতে সে ভর্তি হয়ে ট্রেনিং নিতে শুরু করে। এ খবর পেয়ে এক চিল্লার নামে আমি তাবলিগ জামাতে বের হয়ে পড়ি। চিল্লার উদ্দেশ্য ছিল মূলত তার মামাকে খুঁজে বের করা। ঢাকায় এসে খোঁজ নিয়ে জানতে পারি, হোসাইন আহমদ মাওলানা সালাহউদ্দীন সাহেবের নেতৃত্বে মিরপুর ১১ নম্বরের কোনো এক জঙ্গলে ট্রেনিং নিচ্ছে। আমি সালাহউদ্দীন সাহেবকে বললাম, আব্বাজি (শ্বশুর) হোসাইন আহমদের সঙ্গে কথা বলার জন্য আমাকে পাঠিয়েছেন। তিনি বললেন, ও তো অনেক দূরে আছে ...। এরপর এ নিয়ে তাঁর সঙ্গে অনেক তর্ক-বির্তক হলো।

আমার অবস্থান সব সময়ই জালেমের বিপক্ষে

বাঙালিদের ওপর পাকিস্তানিদের জুলুম ছিল সীমাহীন। চোখে না দেখলে তা কাউকে বুঝানো সম্ভব নয়। পাকিস্তানি এবং তাদের এ দেশীয় দোসররা মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাদের ধন-সম্পদ লুট করে নিয়ে আসত। কেউ টুঁ শব্দটিও করতে পারত না। তখন প্রতি জুমায় আমি এসব জুলুমের বিপক্ষে বলতাম। অমি বলতাম, কেউ যদি জয়বাংলা বলে মানুষের ওপর জুলুম করে এর জন্য যদি আল্লাহতাআলা এক লাথি দেন তাহলে তোমরা (পাকিস্তানি এবং এদেশীয় দোসররা) আল্লাহু আকবার বলে জুলুম করলে তোমাকে দশ লাথি দেবেন।

তখন অনেক আলেম পা-কি-স্তা-ন বলে লম্বা টান দিত। আমরা জুমার খুতবা তখনো যা পড়েছি এখনও তাই পড়ি। '৭১-এ জুমার খুতবায় বাংলাদেশের পক্ষে কিছু বলি কি-না এজন্য আমার পেছনে গোয়েন্দা লাগানো ছিল। তবে আমার চিরাচরিত স্বভাব হলো, আমি সবসময়ই জালেমের বিপক্ষে থাকি।

আমরা তোমাদের ভুলব না

মুক্তিযোদ্ধা মুফতি নূরুল্লাহ শুরু থেকেই '৭১-এর ঘটনাপঞ্জিকে এমনভাবে বলে যাচ্ছিলেন যে, কেউ তার পূর্বাপর না শুনে থাকলে যে কেউ তাঁকে খাঁটি মুক্তিযোদ্ধা না হয় নিরেট রাজাকার ভেবে বসতে পারতেন। যেমন যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরপরই কুমিল্লা শাসনগাছা নূর মসজিদ মাদরাসার হেফজ বিভাগের ছাত্র তাঁর বড় ছেলে কেফায়েতুল্লাহকে আনতে গিয়ে শুধু দাড়ি-টুপি থাকায় স্বজাতির হাতে পদে পদে রাজাকার হিসেবে বাধাগ্রস্ত হওয়া এবং মৃত্যুমুখ থেকে ফিরে আসা। মুক্তিযুদ্ধের অব্যবাহিত পরে পাঞ্জাবের দালাল সন্দেহে মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে আটক হওয়ার পর ঢাকা সিটি কলেজের প্রফেসর হাজী নূর হোসেন কর্তৃক সে যাত্রায় রক্ষা পাওয়া। নিজের এসব ঘটনা নিয়ে এখন অবশ্য তাঁর খুব একটা দুঃখবোধ নেই।

তবে তিনি কিছুতেই মন থেকে মুছে ফেলতে পারছেন না কচুয়ার বিখ্যাত আলেম মুফতি শামছুদ্দীনের মুক্তিযোদ্ধাদেরই হাতে নির্মম শাহাদত লাভের ঘটনাটি। মুক্তিযুদ্ধের

ন'মাস দেশমাতৃকার টানে সে ছিল উৎসর্গিতপ্রাণ। সেই তাঁকেই কি-না শহীদ হতে হলো স্বগোত্রীয়দের হাতে! তাঁর দু' ছেলে ছিল। দু'জনই মুক্তিযুদ্ধের কমান্ডার ছিল। তাঁকে মুক্তিবাহিনী হত্যা করে। তিনি ছিলেন মূলত ইনসাফের পক্ষে। তাই দেখা গেছে, তিনি যেমন বহু মুক্তিযোদ্ধাকে পাকিস্তানিদের হাত থেকে বাঁচিয়েছেন তেমনি অসংখ্য পাকিস্তানি আর্মিকে মুক্তিবাহিনীর হাত থেকে রক্ষা করেন। আমাদের অতি উৎসাহী মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে তাঁর এ ভূমিকা ভালো লাগেনি।

তাঁর গ্রামের বাড়ি কচুয়ার অদূরে এক মাঠে নিয়ে মুক্তিবাহিনী তাঁকে জিজ্ঞেস করে, আমরা আপনাকে কি দিয়ে মারব? তিনি বললেন, আমি দু'রাকাত নামাজ পড়ে নেই। পরে কচুয়ার রহিমানগরে তাঁর মাজার হয়।

শুধু অবাঙালি হওয়ায় স্বাধীনতার পরপরই এক পরিবারের ১৭ জন হাফেজকে মুক্তিবাহিনী মেরে ফেলে। এসব বাড়াবাড়ি, কিছুতেই এগুলো সমর্থন করা যায় না। মুক্তিযোদ্ধা মুফতি নূরুল্লাহ ব্যথাতুর হৃদয়েই আমাদের এসব বলে যাচ্ছিলেন। শেষ পর্যন্ত একরাশ দুঃখ ও বেদনা নিয়ে আমরা তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিলাম।



স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রাক্কালে মাদরাসা পড়ুয়া সন্তানের কাছে অবসরপ্রাপ্ত এক সুবেদার মেজরের জিজ্ঞাসা- কী মিয়া, কি করবা এখন? তোমার হুজুরদের জিজ্ঞেস করো- এখন কী করব আমরা

প্রেসক্লাবের সামনে অবস্থান করছিল মিরাজ রহমান। মিরাজকে সঙ্গে করে রওনা হলাম মিরপুর আরজাবাদ মাদরাসার উদ্দেশ্যে। টিকিট কেটে গাড়ির জন্য অপেক্ষা করছি আর বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মিরাজের সঙ্গে আলোচনা করছি। ওকে পেলে আমার যেন অনেক কিছু বলতে ইচ্ছে করে। অনেক কথা বলি ওর সঙ্গে। শাসনও করি মাঝে মাঝে।



গাড়ি যখন সায়েন্স ল্যাবরেটরি অতিক্রম করে শুক্রাবাদের কাছাকাছি- হঠাৎ আকাশের গোমরামুখো অবস্থা চোখে পড়ল। বর্ষার দিনে এই হচ্ছে সমস্যা। কখন যে কি হয় বলা মুশকিল। আকাশের মন বোঝা দায়। প্রখর রোদে চলতে পারছি না, হঠাৎ অঝোরে বাদল নামবে। ঝেরে কাঁদবে আকাশ। কান্নার জলে ধুয়ে যাবে গোটা পৃথিবী । সব পাপ-পঙ্কিলতা।

বৃষ্টি বাড়তে লাগল। বৃষ্টির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়তে লাগল আমার উৎকণ্ঠা। গাড়ির কাচ ভেদ করে বৃষ্টির দু'একটি ফোঁটা এসে গায়ে পড়ছিল। বেশ ভালোই লাগছিল।

মিরপুর ১ নম্বরে এসে যখন পৌছেছি বৃষ্টির গতি কিছুটা হ্রাস পেল। ছাতা মেলে বাস থেকে নামতেই একরাশ পানির ছিটা এসে গা ভিজিয়ে দিতে লাগল। মানুষ দু'জন। একটি মাত্র ছাতা। তাও আবার ছোট। ছাতার ছাদ ততটা প্রশস্ত না হওয়ায়- দু'জনাতে কুলোচ্ছে না। ফ্যাশন আর আধুনিকতার ছোঁয়ায় দিন দিন ছাতাগুলোও কেমন যেন ছোট হয়ে আসছে। মিরাজ আনন্দ করে করে ভিজছে। ওদের বয়সে যেমনটা হয়। ওর ভেজা দেখে আমারও ভেজার সখ জাগল। কিন্তু ক'দিন আগে জ্বর হয়েছে, স্ত্রীর কড়া নির্দেশ ডিঙিয়ে ভেজার সাহস আর হলো না।

রিকশা খুঁজছি আর সামনে হাঁটছি। থেমে থেমে হাঁটা। অনেকক্ষণ পরে রিকশা পেলাম। বৃষ্টির জন্য ভাড়াও বেড়ে গেছে। দু'জন যখন মাদরাসার অফিস কক্ষের সামনে এসে নামলাম- কাকভেজা না ভিজলেও মোটামুটি কম ভিজিনি। মাওলানা আজাদ অফিস

কক্ষেই বসেছিলেন। হয়তোবা আমার অপেক্ষা করছিলেন। আমি আজ আসব এটা তাঁকে আগেই জানিয়েছি। কিন্তু রিকশা থেকে নেমেই আমার হার্টবিট বেড়ে গেল। কারণ, ইতিমধ্যে মুঠোফোনে তিন তিনবার তাঁর সঙ্গে আলাপ করেছি, আমার আসার উদ্দেশ্য নিয়ে কিন্তু প্রতিবারই এ বিষয়ে কথা বলতে তিনি অনিচ্ছা প্রকাশ করেছেন। শেষ পর্যন্ত তাঁকে বললাম, আচ্ছা, আপনার সঙ্গে চা-পানেও তো শরিক হতে পারি?

এক পর্যায়ে স্নেহবাৎসল্যে বলে ফেললেন, "বেটা শোনো, যে দেশে রাজাকারদের রাষ্ট্রীয়ভাবে মুক্তিযোদ্ধা পদক দেয়া হয়, যেখানে আসল মুক্তিযোদ্ধারা, প্রকৃত দেশপ্রেমিকরা ভাতে মরে; আর রাজাকার, দেশদ্রোহীরা বুক ফুলিয়ে মাথা উঁচিয়ে চলাফেরা করে, বড় বড় বুলি আওড়ায় এবং যারা জেনেশুনে নিজেদের স্বার্থে এসব রাজাকারদের ব্যবহার করে, সম্মাননা দেয়, জনগণ তাদের কথায় পুতুল নাচে সে দেশে আমার মতো দু'একজন মুক্তিযোদ্ধার কথা মানুষ না জানলে, আমাদের কথা, আমাদের ব্যথা দেশের জনগণের কাছে না পৌঁছলেও কিছু আসে-যায় না, কিছু থেমেও থাকে না!"

তাঁর কাছ থেকে বের করতে পাড়ব কি তাঁর মুক্তিযোদ্ধা হয়ে ওঠার চমকপ্রদ কথাগুলো– দুরু দুরু পায়ে ঢুকে পড়লাম মিরপুরের জামেয়া হোসাইনিয়া ইসলামিয়া আরজাবাদ মাদরাসার অফিস কক্ষে। আমরা এখন মুখোমুখি হবো এখানকার প্রিন্সিপ্যাল বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী মুক্তিযুদ্ধের লড়াকু সৈনিক মাওলানা মোস্তফা আজাদের। তাঁর কড়া নিষেধাজ্ঞার কথা পথেই জানিয়ে রেখেছি মিরাজকে। পাশাপাশি তার প্রতি নির্দেশ ছিল রেকর্ডিংযন্ত্র– এমপি থ্রি অফিস কক্ষে ঢোকার আগেই অন করে পকেটে লুকিয়ে রাখার। চতুর্থ বারের মতো 'লেখা যাবে না' একথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে 'শুধু তোমাদের জেনে রাখার জন্য বলছি' বলেই মাওলানা আজাদ বলে চললেন,

রাগে-ক্ষোভে সার্টিফিকেটটি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেললাম

আমি একজন প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা। '৭১-এর ন' মাস পাকসেনাদের বিরুদ্ধে সম্মুখযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছি বহুবার। এটা আমার গর্ব। আমার অহংকার।

কর্নেল ওসমানীর সার্টিফিকেট ছিল আমার কাছে। সেই প্রমাণপত্র আমি ছিঁড়ে ফেলেছি এ অফিস কক্ষে বসে। টুকরো টুকরো করে ছিঁড়েছি আমি। কখন ছিঁড়েছি? যখন দেখেছি দেশের হাল-চাল পাল্টে গেছে। অযোগ্যরা ক্ষমতার মসনদে বসতে শুরু করেছে, রাজাকাররা রাষ্ট্রীয়ভাবে মুক্তিযোদ্ধা পদক নিচ্ছে। সম্মাননা নিচ্ছে। সমাজের সামনে বুক ফুলিয়ে, গলা উঁচিয়ে মুক্তিযুদ্ধের গল্প শোনাচ্ছে। এ দেশদ্রোহীরা যখন সমাজের হর্তাকর্তা বনে যেতে লাগল আর প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধারা লাঞ্ছিত হতে লাগল। অপমানে-অসহায়তায় কুরে কুরে মরতে লাগল শত শত মুক্তিযোদ্ধা। একজন প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে এ বিষয়গুলো আমাকে চরমভাবে আঘাত করল। রাজাকারদের এ স্বার্থবাজির খেলায় মুক্তিযোদ্ধা সেজে নিজের স্বার্থ হাসিল করার চেয়ে অমুক্তিযোদ্ধা সেজে না খেয়ে মরা ভালো।

মুক্তিযুদ্ধের গল্প শোনো

আমি ভাইবোনদের মধ্যে সবার বড়। মুক্তিযুদ্ধের সময় আমরা সবাই বাড়িতেই ছিলাম। আমার বাবা একজন অবসরপ্রাপ্ত সুবেদার মেজর ছিলেন। নাম বাদশাহ মিয়া। '৭১-এর মাত্র কয়েক মাস আগে তিনি অবসরে এসেছেন। একজন অবসরপ্রাপ্ত সুবেদার মেজর হিসেবে গ্রামের সবাই তাকে মানত-সম্মান করত। ঢাকায় তখন আন্দোলন শুরু হয়ে গেছে। বিক্ষিপ্তভাবে খবরাখবরও আমরা পাচ্ছিলাম। ২৫ মার্চের ঘটনার পর আমাদের সবার অবস্থা খারাপ হয়ে পড়ল। সবাই নিশ্চিত হলাম যুদ্ধ করেই বাঁচতে হবে। যদিও তখনো আমাদের গ্রামে কিছু হয়নি। এপ্রিলের শুরুর দিকে বাবা পেনশন তুলতে অফিসে গেলেন। বাবাকে জানানো হলো পেনশন তুলতে পিস কমিটির অনুমোদন লাগবে। বাবা বললেন- দু'দিনের পিস কমিটির সুপারিশ না নিয়ে পেনশন তোলা না গেলে পেনশন না হয় নাই নিলাম।

বাড়িতে এসে বাবা বললেন, কী মিয়া, কি করবা এখন? তোমার হুজুরদের জিজ্ঞেস করো, এখন কি করব আমরা।

বাবার প্রশ্নের উদ্দেশটা খুলে বলছি-

গাঁয়ের সম্ভ্রান্ত পরিবার হিসেবে আমরা কোনো দলবলে ছিলাম না। আমাদের অবস্থা ছিল 'না এধারকা না ওধারকা'।

বাবা সব বিষয় নিয়ে আমাদের সঙ্গে আলোচনা করতেন। দেশের পরিস্থিতি দিন দিন খারাপ হতে লাগল। ইতিমধ্যে আমাদের গ্রামের আশেপাশে আর্মিরা এসে গেছে বলে সংবাদ পেলাম। বাবা আমাদের নিয়ে একদিন আলোচনায় বসে বললেন- মিয়া এখন একটা কিছু করতেই হয়। আর বসে থাকা যায় না।

বাবা আমাদের গ্রামের সবাইকে জড়ো করলেন। সবাইকে দেশের পক্ষে লড়াই করার জন্য উদ্বুদ্ধ করলেন। সবাই মিলে বাবার সঙ্গে কাজ করার ইচ্ছা প্রকাশ করল। বাবা আগে সুবেদার মেজর ছিলেন বলে সামরিক প্রশিক্ষণ তার জানা ছিল। আমাদের পাশের গ্রামের একটি নদীর ঘাটে পাকিস্তানি সৈন্যরা লঞ্চ নিয়ে আসত। বাবা আমাদের গ্রামের কিছু লোক সংগ্রহ করে লঞ্চে করে আসা সেই সৈন্যদের ওপর হামলা করার প্রস্তুতি নিলেন। আমার স্পষ্ট মনে আছে- তিনটি থ্রি নট থ্রি আর দুটি রাইফেল ছিলো আমাদের একমাত্র সম্বল। বাবা গ্রামের লোকজন নিয়ে প্লান করলেন- দুটি দলে ভাগ করে একটি দলকে বলা হলো তারা এর পাশে বসে হট্টগোল পাকাবে এবং তাদের এই হট্টগোল দেখে আর্মিরা যখন তাদের দিকে ধাবিত হবে তখন অন্যদল পেছন থেকে হামলা করবে। এই প্লান নিয়ে আমরা নদীর পাড়ে অবস্থান নিলাম। আজ আমার চোখে আর্মিদের সেই শব্দহীন লঞ্চে যাতায়াতের দৃশ্য পরিষ্কারভাবে ভেসে উঠছে। আর্মিরা আসছে ধীরে ধীরে, আমাদের বিপদসীমা অতিক্রম করে যাচ্ছে কিন্তু আমাদের শোরগোল পার্টির কোনো খবর নেই। আর্মিদের ভীতিকর পোশাকআশাক দেখেই তারা পালিয়েছে- অবশেষে আমরাও সেদিন সেখান থেকে পিছপা হলাম। আর্মিদের ওপর হামলার চিন্তা ত্যাগ করে বাড়িমুখে যাত্রা শুরু করলাম।

বাবা গ্রামের লোকজনদের নিয়ে চিন্তায় পড়ে গেলেন। বাবাকে একজন বুদ্ধি দিলেন– গ্রামের মানুষজন সাদাসিধে, সাহস কম, তার ওপর সামরিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত আর্মিদের মোকাবিলা করার মতো কোনো শক্তি বা প্রশিক্ষণই তাদের নেই। আপনি এক কাজ করেন, গ্রামের লোকদের মাঝে যারা মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে ইচ্ছুক তাদের নিয়ে ভারতে চলে যান। সেখানে প্রশিক্ষণ হচ্ছে, তাদের নিয়ে সেখানে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করুন। প্রশিক্ষণ পেলে এদের কাজে লাগানো যাবে। কথাটা পছন্দ হলো বাবার এবং আমাদের বললেন, তিনি তাই করবেন। লোকজন নিয়ে ট্রেনিংয়ে যাবেন এবং ট্রেনিং সেরে এদের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়বেন। বাবা গ্রামের লোকজনদের প্রস্তুত করতে লাগলেন। অনেকে আগ্রহী থাকলেও সবাইকে নেয়া হলো না। বাছাই করে করে যুবক শ্রেণীদের বেশি নেয়া হলো। অনেক দূর পথ, অনেক কষ্টের ব্যাপার আছে।

বাবা লোকজন সংগ্রহ করতে করতে আর্মিরা আমাদের গ্রামেও চলে আসতে শুরু করে। তাড়াতাড়ি করে লোকজন নিয়ে এক রাতে তিনি যাত্রা শুরু করলেন। বাবা ছিলেন অত্যন্ত ধর্মভীরু। সবসময় লম্বা পাঞ্জাবি-টুপি পরতেন। লম্বা লম্বা দাড়িও ছিল। মোটকথা দেখতেশুনতে একজন পাক্কা মৌলভি সাহেব। তিনি ছিলেন চরমোনাইর মরহুম পীর এছহাক সাহেবের মুরিদ। যার কারণে আমাদের গ্রামের হিন্দু-মুসলমান সবাই তাঁকে শ্রদ্ধা করত। সবাই চিনত-জানত। বাবা যখন ভারতে যাবার জন্য বাংলাদেশ বর্ডারের কাছাকাছি গেলেন তখন একটা ঘটনা ঘটল— সেখানকার কিছু মুক্তিযোদ্ধা বা সীমান্ত এলাকার কিছু লোকজন বাবা এবং তার দলকে আটকালো। তাদের একমাত্র সন্দেহ বাবার লেবাস-পোশাক। তারা বলল, কি মৌলভি সাহেব, কোথায় যাচ্ছেন? বাবা বারবার তাদের উদ্দেশ্যের কথা জানালেন– আমরা মুক্তিযুদ্ধের জন্য ট্রেনিং নিতে যাচ্ছি। আমরা কর্নেল ওসমানীর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি। বাবার এসব কথা তারা বিশ্বাস করছিল না। এমন সময় আমাদের গ্রামের দু'জন হিন্দু লোক সেখান দিয়ে যাচ্ছিল। বাবাকে দেখে তারা বুঝতে পারল তিনি কোনো সমস্যায় পড়েছেন। হিন্দু লোকদের পরিচয় দেয়াতে পথে বাধাদানকারীরা বাবা এবং তার দলকে ছেড়ে দিল।

এরপর বাবা তার দলবল নিয়ে কর্নেল ওসমানীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন এবং লোকজনকে ট্রেনিং দিলেন। বাবা সুবেদার মেজর হওয়াতে তার দলের ট্রেনিংয়ের দায়িত্ব তাকেই দেয়া হয়েছিল। বাবা যখন ট্রেনিং সেরে গ্রামে আসছিলেন তখনও পথে কিছুটা সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন। বাবা গ্রামে ফিরে এসে পাকিস্তানি সৈন্যদের বিপক্ষে যুদ্ধ করার প্রস্তুতি নিতে থাকেন। তিনি ৯ নং সেক্টর কমান্ডার মেজর জলিলের অধীনে ছিলেন। আমিও প্রশিক্ষণ শেষে বাবার সঙ্গে যুদ্ধে যোগ দেই। সরাসরি সম্মুখযুদ্ধে অংশ নেই আমাদের কাশিয়ানী থানার ভাটিয়াপাড়ায় পাকিস্তানি সৈন্যদের বিরুদ্ধে। ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীনতা লাভের দু'দিন পরে ভাটিয়াপাড়া অঞ্চল পাকিস্তানি সৈন্যমুক্ত হয়।

একবারের একটা ঘটনা– আমরা সবাই মিলে একটি অপারেশনের জন্য প্রস্তুত। আমাদের সঙ্গে বাবুল নামে একজন ক্যাপ্টেন ছিলেন। তিনি আমাকে দেখে কিছুটা

সন্দেহপ্রবণ হলেন। কারণ আমি ছিলাম পাঞ্জাবি, টুপি পরা এবং শ্মশ্রুমণ্ডিত এক যুবক। যুদ্ধ শেষ হলো। আমরা বিজয়ী হলাম। আমরা যেদিন বিজয়ী হলাম সেদিন ছিল শুক্রবার। রাতুইল গ্রামে অবস্থিত মসজিদে জুমার নামাজে আমি ইমামতি করি। খুতবাতে স্বাধীন মানুষের কথা বললাম। নামাজ শেষ করে যখন খেতে বসেছি তখন একজন এসে আমাকে বলল– ক্যাপ্টেন সাহেব আপনাকে ডাকছে। আমি তার কাছে গেলাম। আমার মনে আছে, ভাত রেখেই গিয়েছিলাম। তখন তিনি আমাকে চিনতেন না যে আমি একজন সুবেদার মেজরের ছেলে। আমার পিতা অমুক। আমি তার সামনে যেতে না যেতেই তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন– মৌলভি সাহেব, আপনি দেশের জন্য দোয়া করলেন না কেন?

আমি বললাম– করেছি, স্বাধীন মানুষের জন্য দোয়া করা মানেই তো দেশের জন্য দোয়া করা। আরও কিছু বলতে চাইলে আমি তাকে বললাম, আপনার কাছে জবাবদিহি করার জন্য আমি প্রস্তুত নই। এ ব্যাপারে আরও কিছু শুনতে হলে আমার কাছে এসে আপনার শুনতে হবে। তিনি আমাকে আর কিছু বললেন না। আমি চলে এলাম।

পরে একদিন কথা প্রসঙ্গে তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন– আপনি কেন যুদ্ধে এলেন। আপনার এ যুদ্ধে অংশ নেয়াটা পারিবারিক কারণে না আদর্শগত? আমি বললাম, এটা ইসলাম এবং কুফুরের যুদ্ধ নয়। বরং জালেম-মজলুমের যুদ্ধ। মজলুমের পক্ষে থাকা ইসলামের শিক্ষা। এরপরও কথা হলো আমি একজন বাঙালি। দেশের টানে আমি যুদ্ধ করেছি।

রাজাকারী ট্রেনিং নেয়ায় তাদের বহিষ্কার করা হলো!

মাওলানা হতে তখনো আমার দু' বছর বাকি। যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে লালবাগ মাদরাসা থেকে গ্রামের বাড়ি চলে যাই। যুদ্ধ শেষ হলে খবর পাই লালবাগ মাদরাসা বন্ধ হয়ে গেছে। অবশ্য তখনকার প্রতিকূল পরিস্থিতির কারণে দেশের অধিকাংশ মাদরাসাই বন্ধ ছিল। মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ)-এর প্রতিষ্ঠিত দারুল উলুম খাদেমুল ইসলাম গওহারডাঙ্গা মাদরাসাটি আমাদের পাশের থানা টুঙ্গিপাড়ায় অবস্থিত। দেশ স্বাধীন হওয়ার কিছু দিন পরেই মাদরাসাগুলোর ভর্তি মৌসুম শুরু হয়ে যায়। ইতিমধ্যেই জানতে পারলাম গওহারডাঙ্গা মাদরাসাটি খোলা এবং নতুন বছরের ছাত্র ভর্তি শুরু করে দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। কৌতূহলী হয়ে এর সত্যাসত্য জানতে রওয়ানা করলাম গওহারডাঙ্গার উদ্দেশ্যে। গিয়ে দেখি ব্যাপারটা সত্যিই । আর এক মুহূর্ত দেরি না করে ফরম নিয়ে ভর্তি হয়ে গেলাম মেশকাত জামাতে। তখন মাদরাসাটির প্রিন্সিপাল ছিলেন মাওলানা আব্দুল আজিজ (ছোটইমহল হুজুর)। সূচনালগ্ন থেকেই এ দায়িত্বে আছেন তিনি। হঠাৎ একদিন শুনতে পেলাম স্বাধীনতা যুদ্ধে রাজাকারী ভূমিকার কারণে দু'জন ছাত্রকে বহিষ্কার করেছে মাদরাসা কর্তৃপক্ষ। গোপালগঞ্জে গিয়ে রাজাকারী ট্রেনিং নিয়ে হানাদারদের সহযোগী হয়েছিল তারা। উস্তাদদের পরিষ্কার বক্তব্য– মাদরাসায় পড়ে তোমরা জালেমের সঙ্গে হাত মিলালে কিভাবে? ইসলামপন্থিদের সেই চরম দুর্দিনেও মাদরাসাটি কি করে খোলা রাখা সম্ভব হলো এরই মধ্যে আমার ভেতর থেকে এ প্রশ্ন উবে গেল।

যে দুঃখ শেষ হবার নয়

'৭১-এর রণাঙ্গনের বীর সেনানী মাওলানা আজাদের কণ্ঠ এ পর্যায়ে এসে বাকরুদ্ধ হয়ে এলো। ৩৬ বছর আগে যে হাত অস্ত্র নিয়েছিল সদা তৎপর সে হাত দিয়ে এখন মুছতে হয় বেদনার অশ্রু। দেশপ্রেম আর চোখের জল মিলে একাকার হয়ে যায় মাওলানা আজাদের ভাষা–

"প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে আজ দীর্ঘ ৩৬ বছর হয়ে গেল। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস রচনার মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আজও সম্পন্ন হলো না। হলো না প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের সামাজিক মর্যাদাদানের প্রয়াস। জীবনবাজি রেখে যারা স্বাধিনতার জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করে মুক্তিযুদ্ধ করেছিল; আমাদের মাঝে তাদের অনেকেই আজ মানবেতর জীবন যাপন করছে।

আমাদের দেশে যখন যে দল ক্ষমতায় এসেছে তারাই মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে দলীয়করণের মতো ঘৃণ্য অপপ্রয়াস চালিয়েছে। যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা নারী-পুরুষ এরা সবাই জাতির গৌরব, শ্রদ্ধার পাত্র অথচ এদের নিয়ে দলীয় রাজনীতি করা হয়েছে।

স্বাধীনতাবিরোধী জামায়াত-শিবিরচক্র নিজেদের অপকর্ম আড়াল করার জন্য অনেকেই মুক্তিযুদ্ধের সার্টিফিকেট জাল করে মুক্তিযোদ্ধা বনার চেষ্টা করে এবং এদের অনেকেই এ চেষ্টায় সফল হয়।

ইসলাম নামের আবরণে জামায়াত শিবিরচক্র সব সময়ই সামরিক শক্তির সহায়তায় ক্ষমতা দখলের পাঁয়তারা করে আসছে। উপমহাদেশীয় রাজনীতির অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলে এটা সহজেই উপলব্ধি করা যাবে।

সূর্যমুখী ফুল যেমন সূর্যের বলয়ে ঘুরতে থাকে আবুল আলা মওদুদীর ইসলাম কায়েমের স্লোগানও ক্ষমতার মসনদকে লক্ষ্য করে ঘুরতে থাকে। স্বাধীনতাবিরোধী এই জামায়াত শিবিরের অপকর্মের কারণেই রাজাকার (স্বেচ্ছাসেবী) আলবদর (ঐতিহাসিক বদর যুদ্ধের ঘটনা)-এর মতো পবিত্র শব্দগুলিকে বিকৃত অর্থে ব্যবহার করা হয়। টুপি, দাড়ি, ইসলামী পোশাক এবং ইসলামী মূল্যবোধকে স্বাধীনতাবিরোধীর প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করার সুযোগ করে দেয়। ইসলামবিরোধী চক্র সচেতনভাবে এবং সাধারণ মানুষেরা না বুঝে আলেম-ওলামা এবং মাদরাসা ছাত্রদেরকে এদের দলে শামিল করে নেয়। অথচ ইয়াহিয়া, টিক্কা খান, জুলফিকার আলী ভুট্টো গংদের কারো মুখে দাড়ি, মাথায় টুপি বা ইসলামী লেবাস ছিল না। ছিল না এদের দালাল মুনায়েম খাঁদের মুখে, শরীরে। অথচ স্বাধিকার আন্দোলন, পরবর্তীতে স্বাধীনতার এ আন্দোলনের প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড় করাতে চেয়েছে ইসলাম ও ইসলামী আদর্শকে।

পাকিস্তান থেকে ক্রিকেট টিম, গায়ক দল খেলাধুলা এবং নাচ-গান করতে আসলে কোনো অসুবিধা হয় না অথচ আলেম-ওলামা এসে কোরআন-হাদিসের বক্তব্য রাখলে একটি শ্রেণী ও তাদের পত্রিকা তারস্বরে চিৎকার করে– স্বাধীনতা গেল, স্বাধীনতা গেল বলে।

যশোরী হুজুর আর নোয়াপাড়া পীরের খোঁজে

"তুমি কি যশোরী হুজুরের কাহিনীটা জানো? মাওলানা আবুল হাসান যশোরীর প্রতিষ্ঠিত যশোর রেলস্টেশন মাদরাসায় মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দেয়ার কারণে হানাদাররা ২১ জনকে এক লাইনে দাঁড় করিয়ে একসঙ্গে গুলি করে মেরে ফেলে! এরা বেশিরভাগ মাদরাসার ছাত্র-শিক্ষক কিংবা অন্যান্য স্টাফ ছিল। সেই লাইনে যশোরী হুজুরও ছিলেন। ঘটনাচক্রে তিনি বেঁচে যান। এরপর মাদরাসায় ব্রাশফায়ার করা হয়েছিল। সে ২১ শহীদের কবর মাদরাসার প্রাঙ্গণেই রয়েছে।" এক নিশ্বাসে কথাগুলো বলে ফেললেন মাওলানা আজাদ। নয়া তথ্য এবং বিস্ময় জাগানিয়া। বললাম, আমি ঘুরে আসব সেখান থেকে। কোনো কন্ট্রাক্ট নম্বর থাকলে দিতে পারেন– উপকারে আসবে। দপ্তরি আমিনকে বললেন, আমিন, মাওলানা আনোয়ারুল করীম সাহেবকে (যশোরী হুজুরের ছেলে এবং রেলস্টেশন মাদরাসার বর্তমান প্রিন্সিপাল) ফোন লাগাও, মুহূর্তের মধ্যেই অপর প্রান্ত থেকে আস্‌সালামু ... কণ্ঠ ভেসে এলো। ফোন ধরলেন মাওলানা আজাদ। আমাদের মিশন সম্পর্কে বিস্তারিত জানালেন। শেষে আমার হাতে রিসিভারটি ধরিয়ে দিলেন। মাওলানা আনোয়ারুল করিমকে আমার আগ্রহের কথা জানালাম। তিনি বললেন, আমি অপেক্ষায় থাকব। আসার আগে শুধু একবার মোবাইলে খবরটা দেবেন।

মাওলানা আজাদ আরও জানালেন, যশোরের নোয়াপাড়ার পীর সাহেব শুধু সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধাই নন তাদের কমান্ডারও ছিলেন। তাঁর আপন বড় ভাই আ'লীগের টিকিটে এ পর্যন্ত পাঁচ বার এমপি নির্বাচিত হয়েছেন। গ্রেট মিস, এগুলো বাদ পড়ে কিভাবে! জলদি খোঁজ নাও!



মাওলানা রুহুল আমিন খান উজানভী বললেন, একজন সাধারণ ঈমানদারের পক্ষেও মুক্তিযুদ্ধে সমর্থন না দেওয়া সম্ভব নয়

শ্রাবণের বর্ষণমুখর সন্ধ্যায় ঢাকার উপকণ্ঠ আব্দুল্লাহপুরে অবস্থিত জামিআতুস্ সাহাবা মাদরাসায় পৌঁছলাম। সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্যভিত্তিক একটি ইসলামী এনজিওতে কর্মরত, উদীয়মান লেখক আতিকুল্লাহ শহীদ। উদ্দেশ্য, মাদরাসার প্রিন্সিপাল মাওলানা রুহুল আমিন খান উজানভীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা। তিনি তখন মাদরাসার প্রয়োজনে বাইরে ছিলেন। আমরা অফিস কক্ষে বসে তার জন্য অপেক্ষা করছি। রাত আটটার সময় তার সঙ্গে সাক্ষাতে সালাম ও কুশল বিনিময় হলো।



বালাকোটের মুজাহিদিনের উত্তরাধিকার

পাক-ভারত উপমহাদেশে ইসলামের পতাকা উড্ডীন করার লক্ষ্যে সংঘটিত বালাকোটের যুদ্ধের মহান শহীদদের উত্তরসূরি তিনি। সেই শহীদী কাফেলার অধঃস্তন পুরুষ হিসেবে নিজের পরিচয় পেশ করতে তাঁকে গর্বিত, তেজোদীপ্ত মনে হলো। পাশাপাশি গোটা ভারতবর্ষে দ্বীনের কাণ্ডারি মহান আলেমদের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক সংগঠন 'জমিয়তে উলামায়ে ইসলামে'র সক্রিয় সদস্য হিসেবেও কাজ করছেন। মাদরাসার ছাত্রাবস্থায় তারুণ্যের সেই উচ্ছল বয়সেই গভীর ধীসম্পন্ন মাওলানার রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতা অর্জিত হয়। ফলে ছাত্রথাকালীন সময়ে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনের নানা ঘটনা প্রবাহের প্রতি তার অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। সেই সূত্রে '৭১-এর মহান স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে তাঁর তখনকার ভাবনা, পরিকল্পনা, অংশগ্রহণ ও মূল্যায়ন নিয়ে তাঁর সঙ্গে কথোপকথন।

—মুক্তিযুদ্ধে আপনার ভূমিকা কী ছিল?

: '৭১-এ আমার বয়স ২০/২১ বছর হবে। মাদরাসার শহরে বেকায়া (উচ্চ মাধ্যমিক) শ্রেণীতে অধ্যয়নরত। আমাদের চাঁদপুর জেলার কচুয়া থানাধীন উজানী মাদরাসায় পড়াশুনা করি। যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে আমি ফ্রিডম ফাইটের আঞ্চলিক ট্রেনিংয়ে অংশগ্রহণ করি।

—আপনি মুক্তিযুদ্ধে কখন, কীভাবে উদ্বুদ্ধ হন?

: আগে থেকেই জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের সংস্পর্শে আসার কারণে মুক্তিযুদ্ধের দীক্ষায় অনুপ্রাণিত হই। যুদ্ধের কারণে উজানী মাদরাসা বন্ধ হয়ে যায়। আমার ওপর মুক্তিযোদ্ধাদের আস্থা ছিল সন্দেহাতীত। তাই তারা আমাকে ঢাকায় চলে আসার পরামর্শ দেন। ঢাকায় অবস্থান করে যাতে কারও সন্দেহের পাত্র না হয়ে মুক্তিযুদ্ধের কাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি। সেই মোতাবেক '৭১-এর মে বা জুন মাসে ঢাকার বড় কাটারা মাদরাসায় ভর্তি হই এবং এখানে অবস্থান করেই পড়াশুনার পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধের জন্য আদর্শিক জনমত গঠনের প্রয়াস পাই। এভাবে ১৩ আগস্ট পর্যন্ত বড়কাটারা মাদরাসা চালু থাকে।

হুজুগে পাগল!

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে এদেশের আলেম সমাজ ও ধর্মপ্রাণ মুসলমান এক অনভিপ্রেত ও বিয়োগান্তক শাহাদতের খবরে মুষড়ে পড়েন। সে সময়ে বাংলাদেশের সর্বস্তরের আলেম সমাজের শিরোমণি, পৃষ্ঠপোষকতুল্য ব্যক্তিত্ব ও জননন্দিত বাগ্মী আল্লামা মোস্তফা আল-মাদানীকে নির্মমভাবে শহীদ করা হয়। ফলে সব শ্রেণীর ধর্মপ্রাণ মুসলমান বিশেষত আলেম সমাজ শোকাহত, অভিভাবকশূন্য হয়ে পড়েন। তারা ইসলাম ও মুসলমানদের অস্তিত্বের প্রতি হুমকির আশংকাবোধ করেন। তাই মুক্তিযুদ্ধের বিরূপ প্রতিক্রিয়া তাদের মনে রেখাপাত করে এবং কতিপয় আলেম মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েন।

তাঁর শাহাদতের দিন তিনি দেশব্যাপী ওয়াজের ধারাবাহিকতায় মুন্সিগঞ্জের আব্দুল্লাহপুরে বক্তৃতারত ছিলেন। কোরআনের একটি আয়াত পাঠরত অবস্থায় আততায়ীরা তাকে নির্মমভাবে শহীদ করে। তিনি ছিলেন ফখরে বাঙাল মাওলানা তাজুল ইসলাম, চরমোনাইয়ের মরহুম পীর মাওলানা এছহাক প্রমুখ বড় বড় আলেম ও পীর-মাশায়েখের মুরুব্বি ও সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব। মুহাজেরে মাদানি, হোসাইনি বংশের অধঃস্তন পুরুষ। তবে আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, এ শাহাদতবরণও ছিল বংশ পরম্পরায় পাওয়া তার উত্তরাধিকারিত্ব। তিনি বলতেন, আল্লাহ আমার পূর্বপুরুষদেরকে শাহাদতের জন্য কবুল করেছেন। আমাকেও শাহাদতের জন্য কবুল করুন।

তিনি নিজের জন্য আজীবন এ শাহাদতের আকাঙ্ক্ষাই পোষণ করতেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, ১৯৬৯ সালের আগস্ট মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বজনমান্য ছাত্রনেতা আঃ মালেক শাহাদতবরণ করেন এবং তার জানাজার নামাজে মোস্তফা আল-মাদানী ইমামতি করেন। তখন তিনি বলেছিলেন, "হে আল্লাহ! শহীদ আঃ মালেকের মতো তুমি আমাকেও শহীদ বানাও।"

তাঁর শাহাদতবরণের ঘটনাকে অনেকে মুক্তিযুদ্ধে আলেমদের বিরোধিতার বড় কারণ বলে মনে করেন। প্রকৃতপক্ষে আল্লামা মোস্তফা আল-মাদানী মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ বা বিপক্ষে ছিলেন না। এমনিভাবে আমাদের হাফেজ্জি হুজুরও মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপারে নীরব, নিরপেক্ষ ছিলেন।

অনেকের ধারণা, তাঁকে পাকিস্তানিরা শহীদ করেছে। কারণ তখনকার পূর্ব পাকিস্তানের ইসলামপন্থি তথা আলেম সমাজের তিনি ছিলেন রাহবার-পুরোধা। অন্যদিকে মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপারে তিনি ছিলেন নীরব দর্শকমাত্র। কিন্তু পাকিস্তানিরা আশা করেছিল তিনি পাকিস্তানের পক্ষেই সক্রিয় ভূমিকা পালন করবেন। নিরাশ হয়ে অবশেষে তারা তাদের চিরাচরিত কূটিলতার আশ্রয় নিল। সে মোতাবেক তাঁকে শহীদ করে দেয়ার পরিকল্পনা আঁটল। উদ্দেশ্য, তাঁর মতো সর্বজনমান্য একজন আলেমকে শহীদ করে দিয়ে সেটা যদি বাঙালিদের নামে চালিয়ে দেয়া যায় তাতে সাপও মরবে লাঠিও ভাঙবে না। পূর্ব পাকিস্তানের আলেম-ওলামা এ হত্যায় প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে বাংলাদেশের বিপক্ষেই অবস্থান নেবে। শেষ পর্যন্ত তাই হলো। এদেশীয় আলেম-ওলামা ঢালাওভাবে রাজাকারের খাতায় নাম লেখাতে শুরু করল।*

একলা চলো রীতি

—তবে আপনি কেন মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন?

: আল্লামা মোস্তফা আল-মাদানীর শাহাদতের পর অনেকেই রাজাকারে অংশগ্রহণ করে। আমি ও আরো দু'একজন অন্যদের সঙ্গে রাজাকারে যাই নি। বরং আমরা পীরজি হুজুরের কাছে যাই। তিনিও আমাদেরকে রাজাকারে যোগ দিতে বলেননি। বলেছেন, তোমরা যা ভালো মনে করো তাই করো। পরিস্থিতি দিন দিন অবনতি হওয়ায় বড়কাটারা, লালবাগ মাদরাসা বন্ধ হয়ে যায়। তারপর গ্রামের বাড়িতে চলে যাই। তবে ওপারে যাইনি। বরং দেশে থেকে মুক্তিযুদ্ধকে ইসলামের পক্ষে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা, পরামর্শ ও সহযোগিতা দেই। উপরন্তু মুক্তিযুদ্ধে সর্বাত্মক সফলতার লক্ষ্যে কাজ করি।

দ্বিজাতিতত্ত্বের গ্যাঁড়াকলে

আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার বাস্তবতা ও প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করতে হলে টু নেশন থিউরি বা দ্বিজাতিতত্ত্বের ব্যাপারটা ভালো করে বুঝতে হবে। আরেকটা পানের খিলি মুখে পুড়ে 'বুঝলেন শিবলি সাহেব' বলে মাওলানা উজানভী তাঁর কথার ফুলঝুরি বিরামহীনভাবে চালিয়ে যেতে লাগলেন। তাঁকে আটকানোর কৌশল হিসেবে এক ফাঁকে জানালাম– এ বিষয়ে আমার 'প্রচুর' স্টাডি আছে। মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানীর রচনাবলি, হাকিমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভীর 'রাজনৈতিক চিন্তাধারা', মওলানা আবুল কালাম আজাদের বিখ্যাত গ্রন্থ 'ইন্ডিয়ান উইন্স ফ্রিডম' (ভারত যখন স্বাধীন হলো) এবং মাওলানা মওদুদী ও আল্লামা ইকবালের এ বিষয়ের রচনাবলি মেমোরিতে এখনো সতেজ অবস্থায়ই আছে।

---

* আল্লামা সাইয়েদ মাহমুদ মোস্তফা আল-মাদানী মদিনা শরীফে জন্মগ্রহণ করেন। বরিশালে বিয়ে করে এদেশের স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যান। তিনি নেজামে ইসলাম পার্টির সহ-সভাপতি ছিলেন। একাত্তরে মুক্তিযোদ্ধারা মুন্সিগঞ্জের গ্রামাঞ্চলে ওয়াজরত অবস্থায় মঞ্চেই তাঁকে গুলি করে হত্যা করে। লালবাগ শাহী মসজিদ প্রাঙ্গণে তাঁর কবর রয়েছে। একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে তাঁর প্রচুর বক্তব্য-বিবৃতি তৎকালীন সংবাদপত্রগুলোতে পাওয়া গেছে।

থামবেন পরের কথা উল্টো তিনি আবেগ তাড়িত হয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, এত দিন পরে একজন মনের মতো মানুষ পেলাম, শিবলি সা'ব, আপনাকে আজকে আর ছাড়ছি না, দেখেন, বিবি সা'বের কাছ থেকে বিদায় নিতে পারেন কি-না।

তাকে অবাক করে দিয়ে বললাম, রাখেন বিবি সা'ব, আপনি চালিয়ে যান। আমিও আপনাকে ছেড়ে যাচ্ছি না।

মাওলানা উজানভী নড়েচড়ে বসে দ্বিজাতিতত্ত্বের অন্দরমহলে ঢুকে পড়লেন। "বৃহত্তর ভারতবর্ষ থেকে স্বতন্ত্র মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের আবাসভূমি হিসেবে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মূলমন্ত্রই ছিল দ্বিজাতিতত্ত্ব। তখনকার ভারতের শাসকগোষ্ঠী–ব্রিটিশের নীতি ছিল, ডিভাইড এন্ড রোল তথা ভাগ করো এবং শাসন করো এবং এ দ্বিজাতিতত্ত্বের নীতি ছিল ব্রিটিশের রক্ষাকবচ। পক্ষান্তরে মহাত্মা গান্ধী ছিলেন তাদের এ রক্ষাকবচের মরণকল।

আর এ ডিভাইড এন্ড রোলের ফলেই পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয় এবং ব্রিটিশের এ ডিভাইড এন্ড রোলের বাস্তবায়নের জন্যই মুসলিম লীগের জন্ম হয়। আর সে উদ্দেশ্যেই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়। ইসলামের জন্য পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এ বিষয়টি আরো সুস্পষ্ট এ কারণেও যে, আলোচিত মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন স্বয়ং শিয়া ইসমাইলিয়া গ্রুপের প্রধান আগা খান।

শিয়াদের পোষ্য শিষ্যরাই মুসলিম জনতাকে বিভ্রান্ত করে কংগ্রেসের দাবি ও আদর্শ থেকে বের করে নিয়ে আসে। ফলে মুসলিমবিদ্বেষী শিয়াগোষ্ঠীই তাদের ষড়যন্ত্রে সফলতা লাভ করে।"

মরীচিকা

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার চিন্তানায়ক আল্লামা ইকবালের ভাষ্য ছিল, জাতি হবে একক ও স্বতন্ত্র সত্তা। অর্থাৎ মুসলমান এবং মুসলমান মিলে এক জাতি সত্তা গঠিত হবে। মুসলমান এবং হিন্দু বা অন্য ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে মিলে যৌথভাবে কোনো জাতির অস্তিত্ব লাভ করতে পারে না।

পক্ষান্তরে কংগ্রেস ও জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ এবং এর মুখপাত্র শাইখুল ইসলাম মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানীর ভাষ্য ছিল, জাতি গঠিত হবে ভূখণ্ড ও ভৌগোলিক সীমারেখার ভিত্তিতে। স্বতন্ত্র কোনো একক ধর্ম ও জাতির পরিচয়ে নয়। জাতীয়তার দ্বিতীয় ব্যাখ্যার সমর্থনে কোরআনের প্রমাণও বিদ্যমান।

"তিনি তাদের ভাই আদের নিকট হুদকে পাঠালেন।"

"হে আল্লাহ! আপনি আমার জাতিকে হেদায়াত করুন, তারা সুপথপ্রাপ্ত হচ্ছে না।"

আয়াত দুটিতে ভিন্ন ধর্মের লোককে ভাই ও জাতির পরিচয়ে সাব্যস্ত করা হয়েছে। তাতে এ কথাই প্রমাণিত হয়, ভিন্ন ধর্ম ও গোষ্ঠীর হওয়া সত্ত্বেও এক ও অভিন্ন জাতি গঠিত হতে পারে। ফলে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আদর্শিক ভিত্তিই ছিল ভিত্তিহীন, দুর্বল ও অপ্রমাণিত বিষয়।

বর্তমান বিশ্বায়নের চরম উৎকর্ষের এ যুগে 'দ্বিজাতিতত্ত্বের' ধারণা অবান্তর ও কল্পনাপ্রসূত এবং পাকিস্তান যে ইসলাম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জন্মলাভ করেনি তার রাষ্ট্রনায়ক ও কর্ণধারগণই এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ। তাই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর মাওলানা শাব্বির আহমদ উসমানী কায়েদে আযমকে যখন বললেন, ইসলাম প্রতিষ্ঠার স্লোগান নিয়ে পাকিস্তানের জন্ম হয়েছে; তাই চলুন, আমরা ১৪শ' বছরের আগের অনুশাসন রচনার কৌশল নির্ধারণ করি। জবাবে কায়েদে আযম বললেন, ওটা তো ছিল নিছক রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি।

প্রকৃতপক্ষে এ কায়েদে আযমও ছিলেন চরম মুসলিমবিদ্বেষী শিয়াদের একজন। তিনি আমৃত্যু ইসলামের প্রতি দ্রোহিতা ও বিদ্বেষ পোষণের মধ্য দিয়েই মৃত্যুবরণ করেন। পক্ষান্তরে মহাত্মা গান্ধী 'ইসলামের পক্ষে নিবেদিতপ্রাণ' নিয়ে আত্মাহুতি দেন। তার ঘাতক ছিল তারই স্বজাতি নথুরাম।

দুষ্ট ক্ষত!

মুসলমানদেরকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি ও প্রলোভন দিয়ে যেসব নেতা তাদের সঙ্গে চরম মুনাফেকি ও গাদ্দারি করেছে তাদের অধিকাংশই ছিল শিয়া সম্প্রদায়ের সদস্য। তারা মুসলানদেরকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি ও মুনাফা ভোগ করেছেন। তারা মুসলমানদের প্রকৃত কোনো কল্যাণ চাননি। কায়েদে আযম নিজেকে মুসলিম পরিচয়ে গর্ববোধ করেননি বরং তিনি ঘোষণা দিয়েছিলেন, আজ থেকে আমাদের পরিচয় মুসলমান, হিন্দুতে নয়, বরং আমরা পাকিস্তানি।

মন্দের ভালো

ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্লোগান দিয়ে পাকিস্তানের জন্ম হলেও প্রকৃতপক্ষে তার সংবিধান ছিল ধর্মের বিরুদ্ধে। আইয়ুব খানের প্রেসিডেন্সিয়াল অধ্যাদেশসহ তাদের চাপিয়ে দেয়া বিভিন্ন আইন তার জ্বলন্ত স্বাক্ষর বহন করে। মূলত তারা ইসলামকে নেগেটিভ কন্ডিশনে ব্যবহার করেছে। ইসলাম রাষ্ট্রীয় আইন-কানুনে অবাঞ্ছিত ও নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে। পক্ষান্তরে শেখ মুজিবের ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধান ছিল ইসলামের ক্ষেত্রে নো পজিটিভ ও নো নেগেটিভ পর্যায়ভুক্ত। অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় আইন-কানুনে ইসলামের প্রবেশাধিকার নেই এবং এর বিরুদ্ধে কোনো হুলিয়াও নেই। এ দুই অবস্থানের মধ্যে কোনটি ইসলামের অধিক ক্ষতির কারণ ছিল তা সহজেই বোধগম্য।

আবার ফিরে এলাম প্রশ্ন-উত্তর পর্বে

—একজন আলেম হিসেবে মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপারে আপনার অনুভূতি, উপলব্ধি কী ছিল?

: মুক্তিযুদ্ধ এমন এক মহান সংগ্রাম, যার বিন্দু পরিমাণ ঈমান আছে তার পক্ষে মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন না দেওয়া সম্ভব নয়।

—আলেম সমাজ হচ্ছেন স্বীকৃত বড় ঈমানদার। তাহলে তারা কীভাবে মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে অবস্থান নেন?

: "মূর্খের বিবেক সর্বযুগে পরাজিত, তার মন হয় বিজয়ী।" দুঃখজনক হলেও বাস্তব সত্য হচ্ছে, প্রচলিত রাজনীতির ওপর আলেমদের জানাশোনা নেই।

— 'স্বাধীনতার ঘোষক' প্রশ্নে আপনার অভিমত বা মূল্যায়ন কী?

: স্বাধীনতার ডাকে শেখ মুজিবের আহ্বানে আমরা সাড়া দেই। কিন্তু জিয়াউর রহমানকে স্বাধীনতার ব্যাপারে অবহেলা করা যায় না। স্বাধীনতার 'ইমাম' ছিলেন মুজিব। কিন্তু তার 'তাকবির' জাতি শুনতে পায়নি। বরং 'মুকাব্বির' জিয়াউর রহমানের উচ্চকণ্ঠের তাকবির ধ্বনি তথা স্বাধীনতার আহ্বান জাতি শুনে উজ্জীবিত হয়ে দেশ রক্ষায় ঝাঁপিয়ে পড়ে।

ঘড়ির কাঁটা টিক টিক করে ঘুরছে। চারদিকে নীরব-নিস্তব্ধ। নগরী গভীর ঘুমে নিমগ্ন। আমাদের সাক্ষাৎকার পর্ব আস্তে আস্তে তর্কসভায় রূপ নিল। তাঁর সঙ্গে বিভিন্ন পয়েন্টে দ্বিমত পোষণ করে তর্কে জড়িয়ে পড়লাম। তিন তার্কিকের চেঁচামেচিতে কখন যে রাত পোহাল টেরই পেলাম না। বিদায়বেলা তাঁকে আশ্বাস দিলাম, তর্ক পর্বটা 'অব দ্য রেকর্ড' হিসেবেই থাকবে। মাওলানা তাঁর লাল টকটকে দাঁতগুলো বের করে দিয়ে স্মিত হেসে বললেন, As you wish.



শরীয়তপুরের মুক্তিযোদ্ধা মাওলানা শওকত আলী বললেন, কোনো সুবিধা আদায়ের জন্য মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করিনি

সৈয়দ বেলায়েত হোসেন, ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের সাংগঠনিক সম্পাদক। পেশাগত সূত্রে তার সঙ্গে আমার পরিচয় অর্ধযুগের। কথায় কথায় তিনি জানালেন, তার সংগঠনের এক পরিচিত মুখ তার চেনা, যে দেশের গর্বিত আলেম মুক্তিযোদ্ধাদের একজন। সঙ্গে সঙ্গে হাতে ধরিয়ে দিলেন ১১ অংকের গাণিতিক সূত্রটাও, যেটা কিনা আমাকে যোগাযোগ করিয়ে দিল সেই সুদূর শরীয়তপুরের ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের জেলা উপদেষ্টা এবং শরীয়তপুর জেলা মুক্তিযোদ্ধা পরিষদের আহ্বায়ক হুফফাজুল কোরআন মাওলানা শওকত আলীর সঙ্গে। মোবাইল ফোনেই তিনি ঢাকায় আসার আগ্রহের কথা জানালেন। আমার সঙ্গে চায়ের টেবিলে একত্র হতে। কথামতো ঢাকায় পল্টনস্থ ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের অফিসে সাক্ষাৎ মিলল, একে একে বলে গেলেন '৭১-এর সেই দিনগুলোর কথা, জানালেন '৭১-কে নিয়ে তার ভাবনা, চাওয়ার কথা।



শওকত আলীর বয়স তখন মাত্র ষোল। ভুট্টো বা ইয়াহিয়ার অত রাজনৈতিক মারপ্যাঁচও বুঝেন না। কিংবা ট্যাংক, কামান, জ্বালাও-পোড়াও ইত্যাদি বীভৎসতার সঙ্গেও পরিচিত নন। কিন্তু কিশোর বয়সেই এসব কিছুর অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হলো, যখন তার চোখের সামনেই পাকসেনারা একে একে জ্বালিয়ে দিতে থাকল বাড়ি-ঘর, দোকান-পাট। আবেগতাড়িত কণ্ঠে সেই সব দিনগুলোকে স্মরণ করে বলেন, সে সময় আমি ক্লাস সেভেন বা এইটে পড়ি। যুদ্ধের ডামাডোলে লেখাপড়া গোল্লায় গেছে। রাস্তার পাশেই আমাদের বাড়ি। আমাদের বাড়িতে বেশ কয়েকজন হাফেজ ছিল বলে এ নাম। বাড়ির পাশের রাস্তা দিয়ে মিলিটারির গাড়ির বহর চলে যেত আমাদের আঁৎকে দিয়ে। একদিন তো আমাদের নড়িয়া থানার বাজারেই আক্রমণ করে বসল, ভেঙে চুরমার করে দিল আমার বাবার দোকানও। পারিবারিকভাবে আমরা সক্রিয়ভাবে কোনো রাজনীতিতে জড়িত ছিলাম না। আমার বাবা নেজামে ইসলাম পার্টির সাধারণ একজন সমর্থক ছিলেন মাত্র। আমার এক চাচাতো দাদা শুধু আওয়ামী লীগের সঙ্গে সম্পৃক্তই ছিলেন না, সে সময়ের জাতীয় পরিষদের সদস্যও ছিলেন। তিনিই শরীয়তপুর থেকে নির্বাচিত প্রথম

কোনো জাতীয় পরিষদ সদস্য। তার বাড়িটিও জ্বালিয়ে দেয়া হলো। এমতাবস্থায় আমার বাবা অনন্যোপায় হয়ে শরীয়তপুর ছেড়ে ভোলায় চলে গেলেন। সেখানেও তার দোকান ছিল। আর আমরা চার ভাই সিদ্ধান্ত নিলাম মুক্তিযুদ্ধে যাব। শেষ পর্যন্ত আগরতলায় পৌঁছলাম সেপ্টেম্বর মাসে। সেখানে বক্সনগর নামে এক গ্রামে চলছিল মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিং। সেইদিনগুলোর কথা এখনো স্পষ্ট মনে আছে। আমরা সবাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রশিক্ষণে অংশ নেই। আমি ছিলাম বয়সে তরুণ, লম্বা পাঞ্জাবি পরা, হাফেজ। রমজান মাসে ক্যাম্পে তারাবির নামাজ পড়িয়েছি। নামাজ পড়ে দেশের মুক্তি চেয়ে আল্লাহর কাছে হাত তুলেছি। ক্যাম্পে আমাদের সঙ্গে আরো ছিলেন মাস্টার আবদুর রহমান, মাস্টার শামসুদ্দিন, খন্দকার গোলাম মোস্তফা প্রমুখ। যুদ্ধে জয়ের নেশা নিয়ে পূর্ণাঙ্গ প্রশিক্ষণ শেষে আমরা কুমিল্লা সীমান্তবর্তী অঞ্চলে চলে আসি। সীমানা পেরিয়ে কুমিল্লায় যখন প্রবেশ করলাম তখন আমরা সংবাদ পেলাম পাক হানাদাররা রেসকোর্স ময়দানে আত্মসমর্পণ করতে যাচ্ছে। এ সংবাদে আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠি। উৎসবে মেতে যাই।

মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিকে কিভাবে এখন মূল্যায়ন করছেন এ প্রশ্নের উত্তরে মাওলানা শওকত আলী বলেন, সার্টিফিকেটসর্বস্ব মুক্তিযুদ্ধের কথা কখনো ভাবিনি। সার্টিফিকেট ব্যক্তিগতভাবে খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়নি আমার কাছে। আমার সার্টিফিকেটটা যে কোথায় রেখেছি তাও মনে নেই। অনেককেই দেখি সার্টিফিকেট দেখিয়ে নানা সুযোগ-সুবিধা আদায় করে নিতে। আমাদের মুক্তিযোদ্ধা পরিষদের সদস্যরা আমাকে বহুবার অনুরোধ করেছে মুক্তিযুদ্ধের তালিকায় নাম ওঠাতে। কিন্তু আমি নাম থাকা না থাকার মধ্যে কোনো কৃতিত্ব খুঁজে পাই না। কোনো সুবিধা আদায়ের জন্যও মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করিনি। দেশ স্বাধীন হবার পর একবার একটা কম্বল পেয়েছিলাম। তা বিক্রি করে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিস্বরূপ একটা শার্ট বানিয়েছিলাম। যদিও শার্ট পরার অভ্যাস আমার নেই। কিন্তু সে শার্টটি যে কোথায় হারিয়ে গেল তা এখন খুঁজে পাচ্ছি না। স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবসের সময় আমাদের পরিষদ থেকে মিলাদ, দোয়ার আয়োজন করা হয়।

মাওলানা শওকত আলীর গ্রামের বাড়ি নড়িয়া থানার রোকনপুরে। হেফ্জ শেষ করেন গোপালগঞ্জের এক মাদরাসা থেকে। দাওরা হাদিস (মাওলানা) পাস করেন মাদারীপুর টেকেরহাট মাদরাসা হতে। ছয় মেয়ে ও এক ছেলে নিয়ে তাঁর পারিবারিক জীবন। আবদুল কাদের দারুল উলুম রোকনপুর কওমী মাদরাসার প্রিন্সিপাল এবং ভোজেশ্বর বাজার কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের খতিব। সুলেল কণ্ঠের বক্তা হিসেবে তিনি এলাকায় পরিচিত। বিভিন্ন স্থানে ওয়াজ করে খ্যাতি অর্জন করেছেন। আলেম মুক্তিযোদ্ধা এবং ওয়ায়েজ হিসেবে সবশ্রেণীর মানুষের সম্মান পেয়ে থাকেন বলে তিনি জানান। হাফেজ্জি হুজুরের হাত ধরে সক্রিয় রাজনীতিতে আসেন। '৯৬ সালের সংসদ নির্বাচনে ইসলামী শাসনতন্ত্রের পক্ষ হতে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। ২০০৭-এর নির্বাচনেও দলের পক্ষ থেকে তাকে প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করা হয়। রাজনীতি করেন বলেই কি তিনি যখন মোটরসাইকেলে করে নির্বাচনী প্রচারণায় যান তখন তাকে শুনতে হয়– রাজাকার যায়! রাজাকার যায়!



কাজী মু'তাসিম বিল্লাহর অভিমত— '৭১-এ যারা প্রাণ দিয়েছে তারা শহীদ, বিরাঙ্গনারা মজলুমা

তথ্যটা দিলেন এক লেখক বন্ধু। বললেন, তার কাছে কয়েকজন আলেম মুক্তিযোদ্ধার সন্ধান আছে। অবাক করার মতোই তথ্য। আলেম মুক্তিযোদ্ধা! কে তারা? একে একে চার-পাঁচজনের নাম বলে গেলেন। আরও বলতে চাইলেন। তাকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, যারা জীবিত আছেন তাদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে চাই।

সোজা রওয়ানা হলাম মালিবাগের উদ্দেশে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সময়ের খণ্ডকালীন শিক্ষক, বিশিষ্ট লেখক, সাহিত্যিক ও বর্ষীয়ান আলেম এবং জামিয়া শারইয়্যাহ মালিবাগের বর্তমান প্রিন্সিপাল মাওলানা কাজী মু'তাসিম বিল্লাহর সঙ্গে পড়ন্ত বিকেলে চায়ের চুমুকে চুমুকে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আলাপ জুড়ে দিলাম।

—শুনেছি আপনি আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। কিভাবে স্বাধীনতা যুদ্ধে জড়িত হলেন আমাদের একটু বলবেন কী?

: মুক্তিযুদ্ধের প্রারম্ভে– মার্চ মাসে আমি ঢাকার যাত্রাবাড়ী মাদ্রাসাতে ছিলাম। পঁচিশে মার্চ রাত বারোটার দিকে পাক বাহিনীর তাণ্ডবে আমার ঘুম ভেঙে যায়। আরও দু-একজনসহ আমরা বারান্দায় এসে দেখি চেঁচামেচি। এসব দেখে পাকিস্তানিদের প্রতি এমন একটা ঘৃণা জন্মাল যে, তখন থেকেই আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম এদের উৎখাত করার জন্য যত রকমের চেষ্টা আছে আমি সব করব। ২৮ মার্চ মাদরাসা ছুটি দিয়ে তালা লাগিয়ে পায়ে হেঁটে মুন্সীগঞ্জ দিয়ে মতলব থানা হয়ে চাঁদপুর গেলাম। চাঁদপুর থেকে লঞ্চে ফরিদপুর, ফরিদপুর থেকে হেঁটে আমাদের বাড়ি যশোরে পৌছাই। আমার দায়িত্ব ছিল রাতে মুক্তিযোদ্ধাদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা এবং যুবকদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে উৎসাহিত করা। আমাদের তিন থানায় শান্তি কমিটির তিনটি অফিস ছিল। সেখানে আমার নামও ছিল। তারা আমাকে ধরার জন্য বহু চেষ্টা করেছে। আমি আত্মগোপনে ছিলাম।

—শান্তি কমিটিতে কারা ছিল?

: মুসলিম লীগার এবং জামায়াতিরা। হক্কানি আলেম সমাজ শান্তি কমিটিতে ছিলেন না। জামায়াতিদের প্ররোচনায় বিভ্রান্ত হয়ে কেউ কেউ হয়তো স্বাধীনতার বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছিলেন। প্রকৃত সত্য হলো, ওলামায়ে কেরাম মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে ছিলেন কিন্তু সক্রিয়ভাবে তারা খুব একটা সামনে আসেননি।

—হাফেজ্জি হুজুর বলেছিলেন, 'এ যুদ্ধ ইসলাম আর কুফরের যুদ্ধ নয়, এটা জালেম আর মজলুমের যুদ্ধ। পাকিস্তানিরা জালেম'– এ ব্যাপারে মন্তব্য করুন।

: ঠিক কথাই বলেছেন। পাকিস্তানিদের জুলুম ছিল সীমাহীন। এরকম নৃশংসতা এবং বর্বরতা দুনিয়ার আর কোথাও হয়েছে কি-না আমার জানা নেই। নিজের চোখে দেখা।

—স্বাধীনতার বিপক্ষে যারা অবস্থান নিয়েছিল বিশেষ করে জামায়াতিরা বলে যে, তারা বাংলাদেশের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়নি বরং ভারতের আগ্রাসনকে প্রতিরোধ করার জন্য পাকিস্তানের পক্ষ নিয়েছিল...

: ভারত কোনো আগ্রাসনই করেনি। বাংলাদেশের প্রায় এক কোটি উদ্বাস্তু যখন ভারতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে তখন তারা নিজেদের আত্মরক্ষার জন্য এবং বিদেশের সাহায্য পাওয়ার জন্য এ যুদ্ধে জড়িয়েছে। এছাড়া যতক্ষণ পর্যন্ত বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার আবেদন না করেছে ততক্ষণ পর্যন্ত ভারত আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেনি।

—এ যুদ্ধে যারা প্রাণ দিয়েছে ইসলাম তাদের সম্পর্কে কী বলে?

: অবশ্যই শহীদ। কারণ হাদিসে আছে, 'মান কুতিলা দুনা মালিহি ওয়া ইলমিহি ফাহুয়া শাহীদুন'— তবে মুসলমান হতে হবে।

—বিরাঙ্গনারা?

: তারা মজলুমা। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই দেখতে হবে তাদেরকে। তবে যেসব নারী সম্মুখযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে নিহত হয়েছে তাদেরকে নিহতই বলা হবে। কারণ ইসলাম নারীদের এভাবে যুদ্ধে যেতে বলেনি।

—বর্তমান সমাজে হুজুর বা আলেম মানেই রাজাকার, '৭১-এ আসলেই রাজাকার কারা ছিল আশা করি এ ব্যাপারে অসঙ্কোচ প্রকাশে দুরন্ত সাহস দেখাবেন।

: আলবদর, আলশামস্ ছিল জামায়াতিদের আর রাজাকারদের মধ্যে মুসলিম লীগের প্রভাবান্বিত কিছু লোক। সেখানে হয়তো ব্যক্তিগত পর্যায়ে কোনো কোনো আলেম ছিলেন কিন্তু সে সংখ্যা খুব কম। এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরাম কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিলেন। আসলে স্বাধীনতা যুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকা না থাকার কারণে ওলামায়ে কেরাম এখন নিরপরাধভাবে মার খাচ্ছে, গালি খাচ্ছে। এছাড়া স্বাধীনতা-পরবর্তী কিছু কিছু আলেমের মধ্যে এ ব্যাপারে একটি উন্নাসিকতা ভাব লক্ষ করা যায়— এটাও একটা কারণ। আমি একজন সক্রিয় মুক্তিযোদ্ধা ছিলাম। অথচ দেশের তৎকালীন পরিস্থিতির কারণে আমাদের যশোর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি এবং তৎকালীন এমপি রওশান আলী তার প্যাডে লিখে আমাকে সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন যে, পথে যদি কেউ ধরে তাহলে এটা দেখাবেন। সেখানে তিনি লিখে দিয়েছিলেন, ইনি মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে কিছু করেননি বরং সপক্ষে যথেষ্ট কাজ করেছেন।

—আমরা একটি স্বাধীন দেশের গর্বিত নাগরিক এবং জাতি হিসেবেও স্বতন্ত্র। তো আমাদের জাতীয় দিবসগুলো ইসলামী ভাবধারায় পালন করতে সমস্যা কোথায়?

: ইসলামী ভাবধারায় হলে সমস্যা নেই। কিন্তু বর্তমানে যেভাবে হয় যেমন শহীদ দিবস। শহীদ দিবসে উচিত ছিল খতম পড়ে তাদের জন্য ইসালে সওয়াব দেয়া। আমরা যা করি এটা হলো একটা উল্লাস প্রকাশ। এর দ্বারা শহীদদের কোনো উপকার হয় না। এটা করাও কোনো দোষণীয় নয়। কিন্তু যেটা আসল করা দরকার ছিল সেটা থেকে আমরা দূরে রয়েছি।

—জাতীয় পতাকা, জাতীয় সঙ্গীত, শহীদ মিনার, স্মৃতিসৌধ, শিখা চিরন্তন, শিখা অনির্বাণ, এক মিনিট দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন, কামানে গোলা ছুড়ে শ্রদ্ধা বা সম্মান জানানো, প্রভাতফেরি, পহেলা বৈশাখ যে কোনোভাবেই হোক সাধারণ জনগণ এগুলোর সঙ্গে মিলে একাকার হয়ে গেছে– এ সম্পর্কে কিছু বলুন।

: এখানে কয়েকটি বিষয় আছে যেগুলো সম্পূর্ণ ইসলামী শরিয়ত পরিপন্থী। যেমন শিখা চিরন্তন, শিখা অনির্বাণ, স্মৃতিসৌধ। সেখানে গিয়ে ফুল দেয়া, নীরবে দাঁড়িয়ে থাকা, এগুলো পূজার মতো দেখায়। জাতীয় দিবসগুলোতে আমাদের মাদ্রাসা বন্ধ থাকে, জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়।



মাওলানা এমদাদুল হক আড়াইহাজারী জানালেন, একাত্তরে হাফেজ্জি হুজুর বলেছেন, জুলুম আর ইসলাম কখনও এক হতে পারে না। বাঙালিরা মজলুম সুতরাং বাঙালিদের পক্ষে কাজ করো

রোববার। ১৩ মে। আসরের নামাজ পড়েছি জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমে। প্রায় প্রতিদিন দু-এক ওয়াক্ত নামাজ এখানে পড়া হয় আমার। নামাজ পড়ে মসজিদের পশ্চিম পাশের রাস্তা দিয়ে হাঁটছি। গন্তব্য 'সবজান্তা' সৈয়দ মোশার্‌রফের বইয়ের দোকান। দুর্লভ বইয়ের বিশাল কালেকশান। তার এ দুর্লভ আয়োজনের প্রতি আমি খুবই দুর্বল। সময় পেলেই এসে হাজির হই তার দোকানে। ঘেঁটেঘুঁটে দেখি তার কালেকশান। সময় কাটাই বই পড়ে।



পড়ন্ত বিকেলে হাঁটছি আর ভাবছি আলেম মুক্তিযোদ্ধার কথা। আলেম মুক্তিযোদ্ধার খোঁজে— '৭১-এ আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী আলেমদের নিয়ে আমার এবারের আয়োজন। আজও অ্যাপয়েনমেন্ট আছে একজন আলেম মুক্তিযোদ্ধার সঙ্গে— মাওলানা এমদাদুল হক আড়াইহাজারী। বাংলাদেশ এবং আন্তর্জাতিক মহলে নামকরা ক'জন আলেমের মধ্যে অন্যতম তিনি।

তরুণ লেখক মিরাজ রহমানকে নিয়ে পূর্বনির্ধারিত এসাইনমেন্ট সারতে সোজা রওয়ানা হলাম মাওলানা আড়াইহাজারীর মতিঝিলের অফিসে। মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকার একটি পাঁচতলা ভবনের ২য় তলায় "হাজারী টুর এন্ড ট্রাভেলস"।

রিকশা থেকে নেমে মিনিট পাঁচেক হাঁটতেই এসে পৌঁছে গেলাম মাওলানা আড়াইহাজারীর অফিসে। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত অফিস। আধুনিক ডেকোরেশন, চমৎকারভাবে সাজানো-গোছানো ছোট্ট একটি অফিস। অফিসে ঢুকে রিসিপশনে বসা ভদ্রলোককে সালাম দিয়ে মাওলানা আড়াইহাজারীকে খবর দেয়ার অনুরোধ জানালাম। অনুমতি সাপেক্ষে খুব অল্প সময়ের ব্যবধানে সাক্ষাৎ হলো কাঙ্ক্ষিত আলেম মুক্তিযোদ্ধা, এ বইয়ের অন্যতম নায়ক মাওলানা এমদাদুল হক আড়াইহাজারীর সঙ্গে।

— হুজুর কেমন আছেন?

: আলহামদুলিল্লাহ্! আল্লাহর রহমতে ভালো আছি। আপনি ভালো আছেন?

আপনাদের দোয়ায় ভালো আছি।

— হুজুর, আমি অনেক দিন থেকেই চাচ্ছিলাম আমার কোনো কাজের সঙ্গে আপনাকে জড়িয়ে নেব। কিন্তু সময়-সুযোগের অভাবে পারছিলাম না। আলেমদের মধ্যে যারা '৭১-এ বাংলাদেশের পক্ষে যুদ্ধ করেছেন। তাদের নিয়ে একটি বই করার ইচ্ছা করেছি।

: মাশাআল্লাহ, বিষয়টা আমার খুব পছন্দ হয়েছে। খুব ভালো এবং অতি প্রয়োজনীয় একটি বিষয়ে আপনি হাত দিয়েছেন, যা অনেক আগেই হওয়া উচিত ছিল। আমি আপনার এ আয়োজনকে সাধুবাদ জানাই।

— আরো অনেক আলেমের মাঝে আপনিও আমার তালিকার একজন। কারণ, আমার জানা মতে আপনি '৭১-এ আমাদের স্বাধীনতার সপক্ষে কাজ করেছেন।

: হ্যাঁ, এটাকে আমার জন্য গর্বের বিষয় বলেই মনে করি যে, দেশমাতৃকার টানে আমি নিজেকে কাজে লাগাতে পেরেছি এবং অত্যাচারী, দখলদারদের তাড়াতে গড়ে ওঠা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে পেরেছি।

— আপনার জানা ও দেখা ক'জন আলেম মুক্তিযোদ্ধার নাম বলুন।

: আসলে তখন আমাদের মতো অনেক আলেম প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিল। কাজী মু'তাসিম বিল্লাহ, মাওলানা ফরীদ উদ্দিন মাসউদসহ অনেকের নামই শুনেছি। তবে এখন বিশেষ করে তারাকান্দির পীর মাওলানা আবদুল হালিম হোসাইনী সাহেবের কথা খুব মনে পড়ছে। তিনি মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী (রহঃ)-এর খলিফা ছিলেন। স্বাধীনতা যুদ্ধে তার অভাবনীয় অংশগ্রহণের কাহিনী আমাকে আজও নাড়া দেয়।

—'৭১-এ আপনি কোথায় এবং কোন ক্লাসে পড়ছিলেন?

: স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করার পর আমার মাদরাসা জীবনের সূচনা হয়।

বর্তমান হাটহাজারী মাদরাসার প্রিন্সিপাল মাওলানা আহমদ শফী সাহেবের ক্লাসমেট, সোনারগাঁওয়ের মুফতি হাতেম আলী সাহেবের কাছে আমার শিক্ষা জীবনের হাতেখড়ি এবং তার কাছেই বেশিরভাগ পড়াশুনা। সোনারগাঁও থেকে যখন ঢাকায় পড়তে আসি তখন প্রায় যুদ্ধ আরম্ভ হয় হয় অবস্থা। ঢাকায় এসে শায়খুল হাদিস আল্লামা আজিজুল হক সাহেবের কাছে উঠেছিলাম। লালবাগে তাঁর কাছে পড়াকালীন যুদ্ধ শুরু হয় এবং মাদরাসা বন্ধ হয়ে যায়। যুদ্ধের পরে শায়খুল হাদিস সাহেবের কাছে ব্যক্তিগতভাবে ক্লাস করে মাওলানা পাস করি।

একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি

—যুদ্ধে জড়ালেন কিভাবে?

: আমি হাফেজ্জি হুজুরের খুব ভক্ত ছিলাম। যুদ্ধ চলাকালীন অনেক ছাত্র ট্রেনিং নিচ্ছিল। আমি হাফেজ্জি হুজুরের কাছে পরামর্শ চাইলাম। আমিও ট্রেনিংয়ে যাব কি-না? বা এখন আমি কি করব?

তিনি আমাকে বললেন,

"পাকিস্তানিরা বাঙালিদের ওপর অত্যাচার করছে। সুতরাং তারা জালেম। জুলুম আর ইসলাম কখনও এক হতে পারে না। তুমি যদি খাঁটি মুসলমান হও, ইসলাম মানো তবে পাকিস্তানিদের পক্ষে যাও কিভাবে?

এটা তো ইসলামের সঙ্গে কুফুরের যুদ্ধ নয় বরং এটা হলো জালেমের বিরুদ্ধে মজলুমের প্রতিবাদ-প্রতিরোধ। বাঙালিরা মজলুম সুতরাং বাঙালিদের পক্ষে কাজ করো।" আমার মুক্তিযোদ্ধা হয়ে ওঠার পেছনে এটাই হলো মূল উৎসাহ-প্রেরণা।

দ্বিতীয়ত, আমার বাবা ছিলেন জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের কর্মী। তখন জমিয়তের ভূমিকা ছিল বাংলাদেশের পক্ষে। বাবা ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে একজন সক্রিয় যোদ্ধা। আমার বাবা এবং জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের পক্ষপাতিত্ব আমাকে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে অনুপ্রাণিত করেছে।

তৃতীয়ত, আমার বড় ভাই শামসুল হক মুক্তিযুদ্ধের সময় আড়াইহাজার থানার কমান্ডার ছিলেন। পাকসেনাদের বিপক্ষে অস্ত্র হাতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন তিনি।

বাবা, বড় ভাইয়ের অংশগ্রহণ এবং আধ্যাত্মিক নেতার অনুপ্রেরণায় ধীরে ধীরে আমিও নিজেকে মুক্তিযোদ্ধার বেশে দেখতে আরম্ভ করি। দেশমাতৃকার টানে, দেশ রক্ষার আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ি।

—যুদ্ধে আপনার কাজ কি ছিল?

: আমি যুদ্ধ চলাকালীন আড়াইহাজার এবং এর পার্শ্ববর্তী কয়েকটি থানায় কাজ করেছি। আমি অস্ত্র হাতে সরাসরি রণক্ষেত্রের সৈনিক ছিলাম না। তবে মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে অন্যভাবে জড়িত ছিলাম। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন দেশের সার্বিক খবরাখবর নিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের জানানো এবং নানাভাবে তাদের সাহায্য-সহযোগিতা করাই ছিল আমার কাজ।

—মুক্তিযুদ্ধের কিছু স্মৃতি আমাদের বলবেন কি?

: তখন অনেক মানুষ আসত আমাদের বাড়িতে। বিচিত্র প্রকৃতির মানুষ নানান যন্ত্রণার সঙ্গী হয়ে। আ স ম আ. রব যুদ্ধকালীন একদিন আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন এবং এক রাত থেকেও ছিলেন। আমি তখন আমাদের বাড়িতে ছিলাম।

অভাগা আলেম সমাজ

—স্বাধীনতা আন্দোলনে আলেম সমাজের ভূমিকা সম্পর্কে কিছু বলুন।

: পাকিস্তানিদের জুলুম অত্যাচারের বিরুদ্ধে সমগ্র বাঙালি জাতিকে শেখ মুজিবুর রহমান নেতৃত্ব দিয়েছেন। ব্যক্তি মুজিবের সঙ্গে আমি একমত না হলেও যুদ্ধকালীন তার অবদান এবং তার পক্ষ থেকে 'সোনার বাংলা শ্মশান কেন?' আন্দোলনের পক্ষে গৃহীত কর্মসূচি আমার খুব ভালো লেগেছে। এ সময়টার নেতৃত্ব নিয়ে আমার সবচে' আফসোস হলো— তখন কোনো একজন ইসলামি নেতা মজলুম বাঙালির পক্ষে আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেননি। আমাদের আলেম সমাজের

মাঝে যারা মুক্তিযুদ্ধ করেছেন তারা নিজস্ব ভালোলাগার বশে কিংবা দেশ, মাটি ও মানুষের টানেই যুদ্ধ করেছেন।

—ইসলামি নেতাদের তখন এমন নেতৃত্ব বিমুখতার কারণ কি হতে পারে বলে আপনার ধারণা?

— '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে ইসলামি নেতা-কর্মীদের নেতৃত্ব বিমুখতার মূল কারণ হিসেবে আমার যেটা মনে হয় সেটা হলো– ইসলামি আন্দোলন নিয়ে বিচরণকারী তখনকার দিনের সব দলের গোড়া বা শেকড় ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। বহু আলেম এবং ইসলামি নেতাদের শিক্ষা ও আধ্যাত্মিক গুরুরা ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানি। শিক্ষাগুরু, আধ্যাত্মিক গুরু এবং ইসলামি আন্দোলনের কথা ভেবে অনেক আলেম তখন মুখ বুজে বসে ছিলেন। নিজেদের বিরত রেখেছিলেন নিজের দেশ, মাটি ও মানুষের জাতীয়তা রক্ষার আন্দোলন থেকে।

—তাদের এ ভূমিকাকে আপনি কোন চোখে দেখেন।

: '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ ছিল বাঙালি জাতিসত্তা রক্ষার্থে অত্যাচারী, স্বৈরাচারী পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে আন্দোলন। সেখানে ইসলামি বিশ্বাস ও আধ্যাত্মিকতার কোনো দখল ছিল না। সুতরাং এখানে ইসলামি কোনো বিষয় টেনে ওজর খাটানো নিতান্তই কাপুরুষত্বের পরিচয়। যাকে আমি বরাবরই নিন্দা জানিয়েছি। যার কারণে আমি একজন ইসলামি শিক্ষায় শিক্ষিত আলেম হয়েও তখন আমার স্বগোত্রীয়দের কাতারে দাঁড়াতে পারিনি। বরং স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণের পথকেই আমি বেছে নিয়েছিলাম। আলেম সমাজ এবং ইসলামি নেতাদের এ ব্যাপারটাকে আমি তখনও সমর্থন করিনি এবং এখনও করি না।

সত্যের জয় হবেই

—স্বাধীনতার ঘোষক সম্পর্কে আপনার অভিজ্ঞতা থেকে কিছু বলুন।

: স্বাধীনতার ঘোষক ছিলেন মেজর জিয়া। তার ঘোষক হবার ব্যাপারে আমার কোনো সন্দেহ নেই। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে খবর আদান-প্রদানের জন্য আমি নিয়মিত রেডিও শুনতাম। আমি নিজের কানে শুনেছি, জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছেন।

অবিসংবাদিত নেতা

—বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে শেখ মুজিবুর রহমানের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করুন।

: বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে, বাঙালি জাতির অধিকার আদায়ে শেখ মুজিবের ভূমিকা ছিল অতুলনীয়। আমি একটি কথা আগেই বলেছি, ব্যক্তি মুজিবের সঙ্গে আমি একমত না হলেও মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীনতা আন্দোলনে তিনিই ছিলেন বাঙালি জাতির একমাত্র ভরসা। তখন অবিসংবাদিত নেতা বলতে তিনিই ছিলেন।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা এবং বাংলার ইতিহাস-ঐতিহ্যকে মানলে, বাঙালি জাতির সার্বভৌমত্বকে মানলে, শেখ মুজিব ছাড়া এসব কল্পনাও করা যায় না।

জন্মদাতা পিতাকে কেউ কি ভুলে যায়?

—শেখ মুজিবুর রহমানকে জাতির পিতা বলা নিয়ে আপনার মতামত কি?

: জাতির পিতা হওয়া না হওয়াটা আলাদা একটা ব্যাপার। স্বাধীনতা আন্দোলন এবং মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন মুজিবের অবদান তাঁকে নিরঙ্কুশভাবে জাতির পিতা ও বঙ্গবন্ধুর আসনে বসিয়েছিল। কিন্তু যুদ্ধ-পরবর্তী তার কর্মকাণ্ড ও ভূমিকার কারণে তিনি এব্যাপারে কিছুটা বিতর্কিত হয়ে ওঠেন।

—ব্যাপারটা একটু খুলে বলবেন কি?

: জাতির পিতা নির্ণয় বা নির্বাচনের আগে যে বিষয়টা জানা দরকার তা হলো কোন্ জাতির পিতা? জাতি হিসেবে আমরা যদি নিজেদেরকে মুসলমান জাতি ধরি তাহলে কেবল আমাদের বাঙালি মুসলমানদের নয় গোটা বিশ্বের মুসলমানদের জাতির পিতা হযরত ইব্রাহীম (আঃ)।

আর জাতি হিসেবে যদি মুসলমান-অমুসলমান ভাগ না করে বলি আমরা বাঙালি জাতি– তাহলে আমি বলব বাঙালি জাতির পিতা হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমানের বিকল্প নেই।

—শেখ মুজিবুর রহমানের যুদ্ধকালীন এবং যুদ্ধ-পরবর্তী অবদানের মাঝে পার্থক্যটা আরেকটু খুলে বলবেন কি?

: আসলে ব্যাপারটা হলো তিনি ছিলেন সরলমনা। আত্মীয়-স্বজনদের ব্যাপারে ছিলেন একটু বেশি উদারমনা এবং দুর্বল প্রকৃতির। বর্তমানে তারেক জিয়ার কথাই ধরেন। সে তার মা এবং নিকটাত্মীয়দের মদদ পেয়ে আজকের অবস্থানে এসেছে। যুদ্ধকালীন শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন বাংলার আপামর জনসাধারণের জন্য উৎসর্গপ্রাণ কিন্তু যুদ্ধ-পরবর্তীকালে এ ধারাটা কিছুটা শিথিল এবং সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। তার অনাকাঙ্ক্ষিত স্বজনপ্রীতির ফলে শেখ কামালও অনেক সুযোগ লুফে নিয়েছিল। এটাকে আমি তার সরলমনা জীবনযাপনের অশুভ প্রভাব বলেই সংজ্ঞায়িত করি।

—অল্প কয়েক বছরের ব্যবধানে তার এ পাল্টে যাওয়ার পেছনে অন্য আর কি কারণ থাকতে পারে বলে আপনি মনে করেন?

: শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কে আমি যতটুকু জানি তা হলো– তিনি ব্যক্তিগতভাবে মুসলিম লীগকে আদর্শ মানতেন। যার কারণে তার চিন্তা-ভাবনা ছিল অনেক মার্জিত। যুদ্ধপরবর্তী সময় তার আশেপাশে বিচরণকারী কিছু বামপন্থির ষড়যন্ত্রে তিনি এমনটা হয়ে উঠেছিলেন। আজকের দিনে যাদের কারণে শেখ হাসিনার পতন ঘটেছে, এমন কিছু বামপন্থি ও উদ্ভট লোকদের খপ্পরে পড়ে সরলমনা শেখ মুজিব বির্তকিত হয়ে উঠেছিলেন। তার জাতির পিতা হিসেবে বিতর্কিত হয়ে ওঠার এটাই প্রধান কারণ।

হতভাগার দল!

—আমরা এ প্রজন্মের যুবকরা একটা কথা শুনি তা হলো– যুদ্ধ চলাকালীন ইসলামী দলভুক্ত (দাড়ি-টুপিওয়ালা এবং ইসলামপন্থিরাই) রাজাকার ছিল?

: আসলে রাজাকার বলতে বুঝি স্বাধীনতা যুদ্ধে পাকিস্তানিদের মদদদাতা কিছু সংখ্যক স্বার্থপর লোক। এ দলে যে কেবল মোল্লা, মৌলভিরাই ছিল এমনটা নয়। আমার জানা মতে রাজাকারদের শতকরা নব্বই ভাগই ছিল সমাজের সাধারণ মানুষ। তবে এখানে একটা কথা হলো– যুদ্ধের সময় ইসলামি নেতা এবং আলেমদের অনেকেই পাকিস্তানের পক্ষে ছিলেন কারণে-অকারণে, অনেকে ভুল বুঝেও। তবে আমাদের মতো অনেক আলেম মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণও করেছেন। অনেকে আবার শহীদও হয়েছেন। তখনকার দিনে (যুদ্ধের সময়) রাজাকারদের পোশাক অনেকটা ইসলামপন্থিদের মতো ছিল বলে প্রত্যেক ইসলামি লেবাস-পোশাকধারীই রাজাকার এমনটা কখনোই নয়। আমি বলব, দাড়ি, টুপি এবং ইসলামের সঙ্গে রাজাকারের কোনো সম্পর্ক নেই।

—আপনি একজন মুক্তিযোদ্ধা হয়ে কি মানসিকতা নিয়ে ইসলামি দল (যাকে অনেকেই রাজাকারদের পার্টি বলে) করেন?

: আমি ইসলামি আন্দোলনে বিশ্বাসী। কারণ ইসলামি আন্দোলনের মাধ্যমে আল্লাহর জমিনে তাঁর বিধান কায়েম করা যায়। আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলন ছিল জালেমের বিরুদ্ধে মজলুমের লড়াই। সেখানে ইসলামিক-অনৈসলামিক ব্যাপার নিয়ে টানাটানি ঠিক নয়।

আর ইসলামি দল বলতেই যে রাজাকারদের দল এ কথাটা একেবারেই ঠিক নয়। যারা এসব কথা বলে তারা স্বার্থপর এবং ইংরেজ বেনিয়াদের এ দেশীয় দালাল। যখন দেশ স্বাধীন হলো তখন মজলুম জনতা অসহায় হয়ে পড়ল। তাদের অসহায়ত্বকে পুঁজি করে অনেকে অনেক সুযোগ লুফে নিল। বামপন্থিরা মরিয়া হয়ে উঠেছিল বাম পাড়ার লোক বাড়াতে। তখন আমরা ইসলামি আন্দোলনে বিশ্বাসীরা মজলুম জনতাকে ইসলামি চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে ইসলামি দল গড়ে তুলি। এখনও সেই মানসিকতা নিয়েই বেঁচে আছি।

—জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের '৭১-এর ভূমিকা এবং বর্তমান অবস্থান সম্পর্কে আলোচনা করুন।

: মসজিদ নির্মাণ নিয়ে জনসাধারণের মাঝে মতানৈক্য থাকাবস্থায় যদি মসজিদ তৈরি হয়েই যায় তখন সেখানে নামাজ পড়া নিয়ে মতানৈক্য সৃষ্টি করা উচিত নয়। মুক্তিযুদ্ধে তাদের অবস্থান যাই থাক না কেন স্বাধীনতার পর দেশে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা হয়েছে।

আসলে জালেম পাকিস্তানি এবং বাংলাদেশি উভয় দেশের মানুষই ছিল।

আমি বলব— অতীতের আলোচনা নিয়ে পড়ে না থেকে দেশ, মাটি ও মানুষের স্বার্থে সব ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে একসঙ্গে কাজ করা দরকার। তবে জামায়াতে

ইসলামীর ব্যাপারে আমার মন্তব্য হলো— আকিদাগত ব্যাপারে আমরা তাদের একসুতা পরিমাণ ছাড় দিতে রাজি নই কিন্তু দেশ গড়ার স্বার্থে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব টিকিয়ে রাখতে সব ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে তাদের নিয়ে একসঙ্গে কাজ করা যেতে পারে।

—আপনাকে ধন্যবাদ। আমাকে আপনার মূল্যবান সময় দিয়ে সহযোগিতা করার জন্য।

: আপনাকেও ধন্যবাদ। আমি দোয়া করি আপনার কাজ সফল হোক। আপনার এ প্রশংসনীয় খেদমত আল্লাহপাক কবুল করুন।

এক নজরে মাওলানা আড়াইহাজারী

নাম : মাওলানা এমদাদুল হক আড়াইহাজারী

পিতা : হাজী মোহাম্মদ আলী

জন্ম : ৫/১২/৫০(সার্টিফিকেট তারিখ ৫/১২/৫২)

গ্রাম : ডোমারচর

পোস্ট : সাতুপাড়া

থানা : আড়াইহাজার

জেলা : নারায়ণগঞ্জ

পড়াশুনা

স্কুল জীবন কেটেছে সোনারগাঁও সদাসদি হাইস্কুল। ম্যাট্রিক পরীক্ষার পর মাদরাসা জীবনের সূচনা।

প্রথম মাদরাসা– সোনারগাঁও পর্মেশর্দি কওমি মাদরাসায়। পরে ঢাকায় এসে লালবাগে শায়খুল হাদিস আল্লামা আজিজুল হকের কাছে দাওয়ায়ে হাদিস শেষ করেন। পরবর্তীতে তাঁর কাছেই তাফসিরের ওপর পড়াশুনা করেন মাওলানা আড়াইহাজারী।

মাদরাসা জীবনে প্রথম এবং প্রধান শিক্ষক ছিলেন মাওলানা আব্দুল গাফফার।

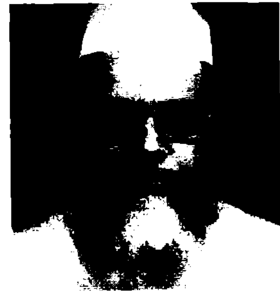
কর্মজীবন

কাপড়ের ব্যবসা দিয়ে কর্মজীবন শুরু। প্রথম দিকে নারায়ণগঞ্জে কাপড়ের গদি ছিল। পরবর্তীতে হজ লাইসেন্স নিয়ে ট্রাভেলস্ ব্যবসা শুরু করেন। এখনও তাই করছেন। মূলত তিনি একজন বক্তা এবং ইসলামি রাজনীতিবিদ। বক্তৃতা এবং ইসলামি রাজনীতিতে ইতিমধ্যেই ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেছেন।

বক্তৃতা এবং ইসলামি আন্দোলনের মিশন নিয়ে তিনি এ পর্যন্ত পৃথিবীর বেশ ক'টি দেশ সফর করেছেন। উল্লেখযোগ্য দেশগুলো হলো— ভারত, আরব আমিরাত, সৌদি আরব, দক্ষিণ কোরিয়া, থাইল্যান্ড ইত্যাদি।



মাওলানা ফরীদ মাসঊদ বললেন, যুদ্ধাপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক বিচার হওয়া উচিত। একটা বিশেষ ক্রাইটেরিয়াতে তাদের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা হয়েছিল। জাতির সঙ্গে যারা অপরাধ করেছে তাদের ক্ষমা করা যায় না। জাতির পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধুকে এ অধিকারও কেউ দেয়নি



বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের উদ্দেশ্যে করা নতুন আইনের ফলে মনে হয় ঢাকা শহর অনেকটা অসময়েই ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘড়ির কাঁটা আটটার ঘর ছুঁয়েছে মাত্র। নিত্য যানজটে নাভিশ্বাস ওঠা মালিবাগ-চৌধুরীপাড়ার রাজপথও অনেকটা যানবাহন শূন্য। তৈয়বকে নিয়ে সোজা ঢুকে পড়লাম চৌধুরীপাড়া পেট্রলপাম্পের পাশের গলিতে। গন্তব্য চৌধুরীপাড়া ঝিল মসজিদ। মুক্তিযোদ্ধা মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসঊদের খোঁজে। সবেমাত্র এশার জামাত শেষ হয়েছে। একটু পর মসজিদ থেকে বের হয়ে এসে তিনি আমাদের নিয়ে তার অফিস কক্ষে বসলেন। কুশল বিনিময়ের পর এক ফাঁকে তাকে বললাম, হুজুর, আপনার তো অনেক পরিচয়, আলেম মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে শুধু মুক্তিযুদ্ধ নিয়েই আজকে আপনার সঙ্গে কথা বলব। আচ্ছা, তাহলে শুরু করেন। অনুমতি পেয়ে ফিরে গেলাম ৩৬ বছর আগের '৭১-এর সেই অগ্নিঝরা রণাঙ্গনে।

—মুক্তিযুদ্ধে জড়িত হলেন কিভাবে, আমরা তো জানি আপনার বাড়ি কিশোরগঞ্জে।

: আমি মৌলিকভাবে কখনোই আমার পড়াশোনাকে পাঠ্য পুস্তকের মধ্যে আবদ্ধ রাখিনি। বাংলাদেশের ইতিহাস, মুসলমানদের ইতিহাস পড়ার প্রতি আগ্রহ ছিল ছাত্রজীবন থেকেই। আমি যখন পড়াশোনা করি তখন দেখি পাকিস্তানের মৌলিক সৃষ্টিটাই একটা প্রতারণার ওপর। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহুর স্লোগানে পাকিস্তান কায়েম হলো এবং সেটা হলো দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতেই। পাকিস্তানের স্রষ্টা মরহুম মোহম্মাদ আলী জিন্নাহ। তিনি পরের দিনই বললেন, আজ থেকে আমরা কেউ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান নই, আমরা সবাই পাকিস্তানি। মূলত পাকিস্তান তিনি ওইদিনেই ভেঙে ফেলেন। কারণ যে দর্শনের ওপর একটা রাষ্টের সৃষ্টি হয় সে দর্শন যদি ভেঙে ফেলা হয়, তাহলে একটা রাষ্ট্রের অস্তিত্ব আর থাকে না। আমি বলব, পাকিস্তানের স্রষ্টা যেমন মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ তেমনি পাকিস্তান ভাঙারও মূল নায়ক তিনিই।

একথা চিন্তা করে আমি আগেই ভাবতাম, এটা টেকার নয় এবং পাকিস্তান হওয়াতে ইসলাম ও মুসলমানদের যে ক্ষতি হয়েছে তা ইসলামের ইতিহাসে এমনটা আর কখনোই হয়নি। যখন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বাঙালি ঐক্যবদ্ধ হলো তখন আমি মনে করলাম, একটা প্রতারণার সৃষ্টিকে ভাঙার মোক্ষম উদ্যোগ এটি। এ চেতনাবোধ থেকেই আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করি।

—এটা তো নেপথ্যের কারণ বললেন? যুদ্ধের কোন অংশটায় আপনি জড়িত হলেন?

: আমি মূলত কোনো সশস্ত্র যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিনি। আমি জনমত গঠন, মুক্তিযোদ্ধাদের সার্বিক সহায়তা দান এবং সাংগঠনিক কাজেই ছিলাম। তখন আমি আমার জন্মস্থান কিশোরগঞ্জের তাড়াইলে ছিলাম।

—আচ্ছা আপনি কি তখন ছাত্র ছিলেন না শিক্ষক, নাকি সবেমাত্র পড়াশোনা শেষ করেছিলেন?

: তখন সবেমাত্র ফারেগ হয়ে (মাওলানা পাস করে) জামেয়া এমদাদিয়ায় শিক্ষক হিসেবে ঢুকেছি।

—আপনি মাওলানা পাস করলেন কোত্থেকে?

: কিশোরগঞ্জের জামেয়া এমদাদিয়া থেকে।

—তখন তো জাঁদরেল আলেম ও রাজনীতিক মাওলানা আতহার আলী (রহঃ) জীবিত ছিলেন, সে সময়ে তাঁর ভূমিকা কী ছিল?

: প্রথম দিকে তিনি চুপ ছিলেন, কোনো পক্ষই তিনি অবলম্বন করেননি। বরং অনেক ক্ষেত্রে আমি দেখেছি, পাকিস্তান সৈন্যদের জুলুমের বিরুদ্ধে তিনি দুই-তিনটি জায়গায় চিঠিপত্র লিখেছেন, যেখানে তার বিশেষ প্রভাব ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে— শেষের দিকে এসে তিনি, মুফতি শফি তার সঙ্গী ছিলেন, তার পরামর্শে আমার যতটুকু মনে পড়ে পাকিস্তানের পক্ষে— আদর্শিক ঐকমত্যের জন্য, ইসলামের জন্য তিনি মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছিলেন।

—আলেমদের মধ্য থেকে আপনার দেখা আর কারা কারা মুক্তিযুদ্ধে জড়িত ছিলেন?

: আমাদের কিশোরগঞ্জে আমি তো তেমন কোনো সঙ্গী পাইনি। কিশোরগঞ্জে কেউ কেউ তো সরাসরি রাজাকারই হয়ে গিয়েছিলেন, আর কেউ কেউ চুপও ছিলেন, কিন্তু সরাসরি কেউ মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ছিলেন না।

—আমরা জানি, সাবেক এমপি মাওলানা আতাউর রহমান খান মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ছিলেন।

: আমার জানা নেই।

—আমি মূলত প্রশ্নটা করেছিলাম পুরো বাংলাদেশ নিয়ে। তৎকালীন প্রসিদ্ধ আলেমদের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন কারা কারা?

: আমি যদ্দূর জানি, মাওলানা কাজী মু'তাসিম বিল্লাহ, মাওলানা রুহুল আমিন খান উজানবী, মাওলানা উবায়দুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী, মাওলানা আবদুল্লাহ বিন

সাঈদ জালালাবাদী এদের কথা শুনেছি। যশোরের মাওলানা খায়রুল ইসলাম যশোরী সাহেবের নামও মনে পড়ে।

—এখন তো ব্যাপকভাবে সমাজে এটা ছড়িয়ে আছে, রাজাকার মানেই আলেম-ওলামা। আপনি তো পাঁচ-সাতজনের নাম বললেন। বিশ হাজার আলেমের মধ্যে একশ' আলেম মুক্তিযোদ্ধা থাকলে আট কোটি মানুষের মধ্যে এটা কোনো ধর্তব্যের মধ্যেই পড়ে না। আমি জানতে চাচ্ছি, মূলত তখনকার আলেম সমাজ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়ার কারণ কী?

: মৌলিকভাবে আলেম সমাজ মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করেননি। তারা তখন চুপ ছিলেন, তবে আলেমদের মধ্যে একটা ক্ষুদ্র অংশ মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছিল, যেমন ক্ষুদ্র একটা অংশ যুদ্ধের পক্ষেও সরাসরি অংশ নিয়েছিল।

—তাদের চুপ থাকার কারণ কি?

: আমার মনে হয় তারা একে তো পাকিস্তানিদের জুলুম-অত্যাচার সমর্থন করতে পারছিলেন না— সেটা ধর্মীয় বা মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকেই হোক, দ্বিতীয়ত, সরাসরি যুক্তিযুদ্ধেও অংশ্রগ্রহণ করতে পারছিলেন না। এ কারণটা আমার জানা নেই, আমি শুধু অনুমান থেকে বলছি, এটা হতে পারে যে, বাংলাদেশ সৃষ্টির পরে তার রূপরেখা কি হবে সে বিষয়ে তাদের স্পষ্ট ধারণা ছিল না।

—তাহলে রাজাকার কারা ছিল? জামায়াতে ইসলামী?

: আলেমদের বৃহৎ অংশ রাজাকার হিসেবে ছিলেন না। যারা পশ্চিম পাকিস্তান থেকে কিছু পাওয়ার জন্য বা তাদের সেনাবাহিনীর কাছ থেকে সুবিধা ভোগ করার জন্য আশান্বিত ছিল তারাই মূলত রাজাকার ছিল। রাজাকার আদর্শগতভাবে জামায়াতে ইসলামীরাই ছিল। আরেকটি অংশকে দেখেছি যারা ক্ষুধার জ্বালায় এ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। তবে আদর্শগতভাবে কেবল জামায়াতে ইসলামীরাই রাজাকার ছিল।

—জামায়াতে ইসলামীরা কেন আদর্শগতভাবে মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে অবস্থান নিল?

: জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানের সৃষ্টি এবং পাকিস্তানের অস্তিত্বটাকে ইসলামের অস্তিত্বের সঙ্গে মিলিয়ে ফেলেছিল। তারা ভেবেছিল, পাকিস্তান যদি না থাকে তাহলে ইসলাম থাকবে না।

—বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে আপনি কোন দৃষ্টিতে দেখেন?

: আমি অবশ্যই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তিযুদ্ধের একজন নেতৃত্বমূলক ব্যক্তিত্ব বলে মনে করি। কারণ, তার তখনকার নায়কোচিত ভূমিকার কারণেই এমন একটি অসম যুদ্ধ শুরু করা সম্ভব হয়েছিল। আমার বলতে দ্বিধা নেই, বঙ্গবন্ধু না থাকলে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হওয়া সম্ভব ছিল না।

—তিনি তো তখন পাকিস্তানে ছিলেন।

: কেউ শারীরিকভাবে অংশগ্রহণ না করলে কোনো যুদ্ধ সংঘটিত হতে পারে না একথা আমার জানা নেই। বাঙালি জাতিকে তিনি যেভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন, এটা তো একটা প্রতিষ্ঠিত স্বীকৃত বিষয়।

—ব্যক্তিগতভাবে আপনার ওপর তার কোনো প্রভাব পড়েছিল? এই যে আপনি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন? ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে তো আপনি বললেনই যে. ছাত্রজীবনে বই পড়ার মাধ্যমে জেনেছেন পাকিস্তানের সৃষ্টিটাই একটি অপসৃষ্টি। নেতা হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে পেয়েছেন—এটার প্রভাব আপনার ওপর পড়েছে কি?

: বঙ্গবুন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বাঙালিদের উদ্বুদ্ধ করার যে প্রয়াস ছিল, সে প্রয়াসে নিশ্চয় আমিও প্রভাবান্বিত হয়েছি। তবে মৌলিক চেতনা এটা আমার ছিল না।

—এবার ঘোষক নিয়ে কিছু বলুন?

: স্বাধীনতার ঘোষণা নিজের কানে শুনেছি, মেজর জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেছেন এবং তার ঘোষণা শুনেই আমরা উজ্জীবিত হয়েছি, তা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। সামরিক ব্যক্তিদের পক্ষে তাঁর ঘোষণাই ছিল প্রথম। তবে তাঁর আগে জনাব আব্দুল হান্নান এবং আরো দু'তিনজন সে ঘোষণা পাঠ করেছিলেন।

—ব্যক্তি জিয়া সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন কি?

: তিনি সহজ-সরল জীবনযাপন করতেন। সৎ এবং পরিশ্রমী হিসেবে পরিচিত ছিলেন এবং তিনি বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পর আবার বাংলাদেশকে সংগঠিত করতে চেষ্টা করেছিলেন। যদিও তিনি এ বিষয়টায় মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ বিরোধীদের সঙ্গে আপস করেছেন। এ আপসকামিতাটা ব্যক্তিগতভাবে আমি পছন্দ করিনি। কিন্তু তার সততা ছিল প্রশ্নাতীত এবং বাঙালি জাতির প্রতি, বাংলাদেশের প্রতি তার কমিটমেন্ট ছিল।

—স্বাধীনতার ঘোষক নিয়ে বিতর্ক চলে আসছে বহুদিন ধরেই। তবে নতুন করে এ প্রসঙ্গটা আবার চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। বর্তমান সেনাপ্রধান প্রসঙ্গটা সামনে টেনে এনেছেন। পাশাপাশি তিনি বলেছেন, শেখ মুজিবুর রহমানকে জাতির পিতার স্বীকৃতি দেয়ার কথা। এ বিষয়ে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে আপনার বক্তব্য জানতে চাচ্ছি।

: এটা কোনো ধর্মীয় দৃষ্টিকোণের বিষয়ই নয়।

—তাহলে আলেম-ওলামা যে বলে জাতির পিতা হচ্ছেন ইব্রাহীম (আঃ)।

: এটা কোথাও নেই। জাতির পিতা হওয়া না হওয়া এটা কোনো শরঈ বিষয়ই না, শরিয়তে এর কোনো আলোচনাই নেই। মিল্লাতা আবিকুম ইব্রাহীম—'আবিকুম' দ্বারা শুধু রাসূল (সাঃ)কে বুঝাননি, সেটা তো কোরাইশসহ সবাইকে বলেছেন—কাফির-মুশরিকদেরও বলেছেন। এখানে 'কুম' মানে তো শুধু মুসলমানরা নয় এবং মিল্লাত আর ক্বওম এক বিষয়ও না। সুতরাং জাতির পিতা হওয়া না হওয়ার প্রশ্নটা নিতান্তই বর্তমানের বিষয় এবং পাকিস্তানের সময় মোহাম্মদ আলী জিন্নাহকে জাতির পিতা স্বীকার করে নিয়েছিল সকলে। যদি ইসলামের দৃষ্টিতে এর কোনো সংজ্ঞা থাকত তাহলে তৎকালীন বড় বড় আলেমরা প্রশ্ন ছুড়তেন— জাতির পিতা হযরত ইব্রাহিম (আঃ), মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ জাতির পিতা হয় কি করে?

—আপনি তাহলে বলছেন এটা কোনো ধর্মীয় ব্যাপারই নয়?

: এটা একটা জাগতিক বিষয়। কোনো এলাকার জনগণ যদি কাউকে স্বীকৃতি দেয় জাতির পিতা হিসেবে তাহলে কোনো সমস্যা নেই। এটা প্রত্যেক জাতিগোষ্ঠীর একান্ত নিজস্ব বিষয়। সুতরাং এ বিষয়টা শরিয়তের মধ্যে এনে টানাটানি করা ঠিক মনে করি না।

—আচ্ছা আপনি তো একজন আলেম মুক্তিযোদ্ধা, এটা অবশ্যই গর্ব করার বিষয়। কিন্তু ঢালাওভাবে আলেমদের যে রাজাকার বলা হয় কখনও কী আপনি এমন পরিস্থিতির স্বিকার হয়েছেন যে আপনাকে কেউ রাজাকার বলে গালি দিয়েছে বা আপনি কি একজন আলেম মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে কখনও কমপ্লেক্সে ভোগেন; দাড়ি আছে, পাঞ্জাবি, টুপি পড়েন বলে?

: আমি কখনও কোনোরকম বিব্রতবোধ করিনি। বরং আমার পরিচয়টা সব জায়গায় আমাকে সম্মানিত করেছে। আমি যখন জেলে ছিলাম রিমান্ডের সময় যখন শুনেছে আমি মুক্তিযোদ্ধা তখন সবাই আমাকে সম্মান করেছে।

—তখন তো আপনার বক্তব্য বিতর্কিত হয়েছিল। পত্রপত্রিকায় সেগুলো প্রকাশিতও হয়েছে, আপনি নাকি অখণ্ড ভারত চান?

: এটা একটা ঐতিহাসিক বিষয় যে, ভারত, বাংলাদেশ এবং পাকিস্তান তিনটি পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র। এখন এ রাষ্ট্রগুলো আবার এক হলে, বিরূপ পরিস্থিতির সৃষ্টি করবে। আমি বলেছি, তৎকালীন সময়ে অখণ্ড ভারত যদি থাকত তাহলে মুসলমানদের জন্য সেটা আরও বেশি কল্যাণকর হতো। বাংলাদেশ একটা স্বাধীন রাষ্ট্র। এটা বাদ দিয়ে আবার ভারতের সঙ্গে যুক্ত হবে এটা কখনোই আমি চাই না এবং পছন্দও করি না।

—কেমন বাংলাদেশের আপনি স্বপ্ন দেখেন?

: একজন নাগরিক হিসেবে আমি চাই দেশের প্রতি, এদেশের মানুষের প্রতি দায়িত্ববোধ আছে, কল্যাণকামিতা, পরিশ্রমী, সৎ এবং যারা দেশের আদর্শকে, দেশের মূল্যবোধকে, জনগণের মূল্যবোধকে শ্রদ্ধা করে এবং বাস্তবায়নের চেষ্টা করে সেসব মানুষের কাছেই যেন শাসন ক্ষমতা আসে।

—যারা রাজাকার ছিল তাদের মধ্যে যদি এসব গুণ চলে আসে এবং তারা যদি ক্ষমতায় আসে তাহলে কী আপনি তাদের মেনে নেবেন?

যারা দেশের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছে এবং যারা বাংলাদেশকে মনেপ্রাণে মেনে নিতে পারেনি, প্রকাশ্যে যারা এ জাতির কাছে ক্ষমা চায়নি তাদের আমি কখনোই দেশপ্রেমী হিসেবে মেনে নেব না।

—যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করা নিয়ে নতুন করে আলোচনা হচ্ছে—এ বিষয়ে আপনার মতামত কী?

: আমি সমর্থন করি, কারণ যুদ্ধাপরাধী যে সেসব সময়ই অপরাধী, তাই যুদ্ধাপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক বিচার হওয়া উচিত এবং সেটা ইনসাফভিত্তিক হওয়া উচিত।

—কেমন?

: ইনসাফভিত্তিক মানে প্রকৃত অপরাধী যারা তাদের যেন খুঁজে বের করা হয় এবং যেন পুরোপুরি ইনসাফ পায়।

—বঙ্গবন্ধু তো সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেছেন, ক্ষমা ঘোষণার পর আবার বিচার করা কী ঠিক হবে?

: একটা বিশেষ ক্রাইটেরিয়াতে কিন্তু সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা হয়েছিল। ঢালাওভাবে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা হয়নি। দ্বিতীয়ত, জাতির সঙ্গে যারা অপরাধ করেছে তাদের ক্ষমা করা যায় না। আর জাতির পক্ষ থেকেও তাকে সে অধিকার বা ক্ষমতা দেয়া হয়নি যে, তিনি ক্ষমা ঘোষণা করবেন।

এক নজরে মাওলানা ফরীদ মাসউদ

জন্ম : ১৯৫০, নানা বাড়িতে, কিশোরগঞ্জ জেলার পাকুন্দিয়া থানার হিজলিয়া গ্রামে।

পড়াশুনার হাতেখড়ি : জামেয়া এমদাদিয়া কিশোরগঞ্জ।

সর্বোচ্চ পড়াশুনা : দাওরা/মাওলানা, জামেয়া এমদাদিয়া কিশোরগঞ্জ। দারুল উলুম দেওবন্দ, ভারত থেকে দাওরা ও ইফতা।

কর্মজীবন : জামেয়া এমদাদিয়া কিশোরগঞ্জে শিক্ষকতা দিয়ে শুরু। এরপর জামেয়া মাদানিয়া যাত্রাবাড়ী, জামেয়া এমদাদুল উলুম ফরিদাবাদ, জামেয়া শারইয়্যা মালিবাগ ও শামছুল উলুম চৌধুরীপাড়া মাদরাসা। ১৯৭৭ সাল থেকে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশে সম্পাদক হিসেবে যোগদান। এরপর পর্যায়ক্রমে ভারপ্রাপ্ত পরিচালক, অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ; পরিচালক, ইসলামি বিশ্বকোষ; পরিচালক, প্রকাশনা; পরিচালক, গবেষণা; পরিচালক, বিশেষ ইমাম প্রশিক্ষণ। তাফসীরুল কোরআনুল কারীম, ইসলামী বিশ্বকোষ ও তাজরিদুস সিহাহর সম্পাদনা পরিষদের সদস্য। সম্পাদক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা।

এ পর্যন্ত প্রকাশিত গ্রন্থ : শতাধিক।

ভাষা জ্ঞান : বাংলা, ইংরেজি, উর্দু ও আরবি।

বিশ্বের চারটি ভাষায় তাঁর গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে– ইংরেজিতে ২টি : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ও বার্মিংহাম, ইংল্যান্ডের একটি প্রকাশনা সংস্থা। মিসরের কায়রো থেকে আরবিতে একটি। পাকিস্তানের করাচি থকে উর্দুতে ৩টি। বাকিগুলো মাতৃভাষা বাংলায়।

বর্তমান অবস্থান : শায়খুল হাদিস, বনশ্রী মাদরাসা রামপুরা, ঢাকা; খতিব, ঝিলপাড় জামে মসজিদ, চৌধুরীপাড়া, ঢাকা; সম্পাদক, মাসিক পাথেয়; পরিচালক, আধুনিক ও মাদরাসা শিক্ষার সমন্বয়ে পরিচালিত 'ইকরা বাংলাদেশ'; সভাপতি, সমাজসেবামূলক সংগঠন 'ইসলাহুল মুসলিমীন পরিষদ বাংলাদেশ'; প্রতিষ্ঠাতা, ১৫টি মাদরাসা; মহাসচিব জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ; খলিফা, শায়খুল ইসলাম মাওলানা সাইয়েদ হোসাইন আহমদ মাদানী (রহঃ)-এর জানেশীন ফিদায়ে মিল্লাত হযরত সাইয়্যেদ আসআদ মাদানী (রহঃ)

পারিবারিক জীবন : স্ত্রী, ৩ ছেলে ও ১ মেয়ে।

প রি শি ষ্ট

পরিশিষ্ট–ক

ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব

[২৩ মার্চ, ১৯৪০ লাহোরে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত মুসলিম লীগের প্রস্তাব যা পরবর্তীকালে 'পাকিস্তান প্রস্তাব' হিসেবে পরিচিত। শেরে বাংলা একে ফজলুল হক ইংরেজি ভাষায় প্রস্তাবটি পেশ করেন। তারই বাংলা তর্জমা]

১. "শাসনতন্ত্র সম্পর্কে ১৯৩৯ সালের ২৭ আগস্ট, ১৭ এবং ১৮ সেপ্টেম্বর এবং ২২ অক্টোবর ও ১৯৪০ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি তারিখগুলিতে গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক নিখিল ভারত মুসলিম লীগ কার্যনির্বাহক কমিটি যেসব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, তার প্রতি অনুমোদন ও সমর্থন জ্ঞাপন করে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের এই অধিবেশন জোরালোভাবে পুনরাবৃত্তি করছে যে, যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কিত যে পরিকল্পনাটি ১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইনের অন্তর্ভুক্ত তা এদেশের স্বাতন্ত্র্যসূচক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে সম্পূর্ণ অনুপযোগী এবং অপ্রযোজ্য এবং মুসলিম-ভারতের পক্ষে সর্বতোভাবে বর্জনীয়।

২. অধিকন্তু এই অধিবেশন আরো জোরালো মন্তব্য লিপিবদ্ধ করছে যে, ১৯৩৯ সালের ১৮ অক্টোবর তারিখে বড়লাট মহামান্য ইংলন্ডেশ্বরের সরকারের পক্ষে যে বিবৃতি দিয়েছেন— বিশেষ করে ভারতের ভবিষ্যৎ গঠনতন্ত্র প্রণয়নের ব্যাপারে— যে ভিত্তির ওপর ১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইন প্রণীত— তা পুনর্বিচার করা হবে বলে যে আশ্বাস দিয়েছেন, তাতে এ সম্মেলন বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করছে এবং ঘোষণা করছে যে, ভারতীয় মুসলিম সম্প্রদায়ের নিকট এমন কোনো গঠনতন্ত্র গ্রহণযোগ্য হবে না, যা নতুন চিন্তাধারার ওপর প্রণীত হবে না অথবা মুসলমানদের নিকট গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে না।

৩. সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের এই সাধারণ সভা সর্বদিক বিবেচনা করে এ প্রস্তাব উত্থাপন করছে যে, যে গঠনতন্ত্রে ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব অঞ্চলসমূহে যেখানে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, সেসব ভৌগোলিক এলাকায় প্রদেশগুলির মধ্যে কিছুটা রদবদল করে সার্বভৌম এবং স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলে বিভক্ত করে এবং সেসব আঞ্চলিক দেশসমূহের প্রদেশগুলিও হবে স্বায়ত্তশাসিত— এ মূল ভিত্তি মেনে না নেয়া হবে, তা কিছুতেই কার্যকরী হবে না বা মুসলমানদের নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না।

এবং ওই সব অঞ্চলের সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়সমূহের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রভৃতি প্রশাসনিক অধিকার ও স্বার্থসমূহের সেসব সম্প্রদায়ের সঙ্গে পরামর্শক্রমে উপযুক্ত কার্যকরী রক্ষাকবচ থাকবে না বা ভারতে বা যেসব অঞ্চলে মুসলমানরা সংখ্যালঘিষ্ঠ সেখানেও উপরোক্ত ব্যবস্থা তাদের জন্যে থাকবে না, তা গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে না।

অধিকন্তু অধিবেশন কার্যকরী কমিটিকে এ ক্ষমতা প্রদান করছে যে, এটিযেন উপরোক্ত মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে এমন একটি গঠনতন্ত্রের খসড়া প্রণয়ন করে যাতে ব্যবস্থা থাকবে পরিশেষে স্ব-স্ব অঞ্চল কর্তৃক সমস্ত ক্ষমতা গ্রহণ করার যেমন— প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক নীতি, যোগাযোগ, শুল্ক এবং অন্যান্য বিষয়।"

পরিশিষ্ট—খ

আওয়ামী লীগের ৬ দফা

* পাকিস্তান হইবে একটি 'ফেডারেশন' বা যুক্তরাষ্ট্র। এই ব্যবস্থার যৌক্তিকতা বা অপরিহার্যতা সম্বন্ধে আলোচনার অবকাশ নাই,— ইহা সর্বজন স্বীকৃত সত্য। পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান এই উভয় অঞ্চলকে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশসমূহকে পূর্ণ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন দিতে হইবে। সরকার হইবে 'পার্লামেন্টারি' ধরনের, যাহাতে প্রাপ্ত-বয়স্ক নাগরিকদের ভোটে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত আইনসভা হইবে সার্বভৌম। যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার আসন সংখ্যা জনসংখ্যার ভিত্তিতে নির্ধারিত হইবে।

* যুক্তরাষ্ট্রীয় (ফেডারেল) সরকারের ক্ষমতা দুইটি বিষয়ে সীমাবদ্ধ থাকিবে— যথা, দেশরক্ষা ও বৈদেশিক নীতি। অবশিষ্ট সকল বিষয়ে অঙ্গ রাষ্ট্রগুলির ক্ষমতা থাকিবে নিরঙ্কুশ।

* সমগ্র দেশের জন্য দুইটি পৃথক অথচ অবাধে বিনিময়যোগ্য মুদ্রা চালু থাকিবে।

অথবা

বিশেষ ব্যবস্থার শর্তাধীনে মুদ্রা ও অর্থনীতি যুক্তরাষ্ট্রীয় বিষয়রূপে গৃহীত হইতে পারে। এই ব্যবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের কর্তৃত্বাধীন 'স্টেট ব্যাঙ্কের' পরিচালনার অধীনে দুই অঞ্চলে দুইটি 'রিজার্ভ ব্যাঙ্ক' থাকিবে। এই আঞ্চলিক রিজার্ভ ব্যাঙ্কগুলি আঞ্চলিক সরকারের অর্থনৈতিক ব্যাপারে পরামর্শ দান করিবে এবং যাহাতে এক অঞ্চল হইতে অন্য অঞ্চলে অবাধে অর্থ ও মূলধন পাচার হইতে না পারে তাহার কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে।

* শাসনসম্বন্ধীয় কার্য নির্বাহের সুবিধার জন্য এবং নানা প্রকার জটিলতা এড়াইবার জন্য কর ও শুল্ক ধার্যের দায়িত্ব অঙ্গ রাষ্ট্রগুলির উপরই ন্যস্ত থাকা বাঞ্ছনীয়। এ ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারকে কোনো ক্ষমতা অর্পণের প্রয়োজন নাই। তবে প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য অঙ্গ রাষ্ট্রগুলির রাজস্বের একটি স্বীকৃত অংশ শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থানুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের অবশ্য প্রাপ্য হইবে। অঙ্গ রাষ্ট্রগুলির আয়ের একটি নির্দিষ্ট অংশ স্বয়ংক্রিয় নিয়মে যুক্তরাষ্ট্রের নিজস্ব তহবিলে জমা হইবে।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিটি অঙ্গ রাষ্ট্রের বহির্বাণিজ্যের পৃথক হিসাব রক্ষা করিতে হইবে এবং বহির্বাণিজ্যের মাধ্যমে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা অঙ্গ রাষ্ট্রগুলির এখ্তিয়ারাধীন থাকিবে।

* যুক্তরাষ্ট্রের জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা সমান হারে বা সর্বসম্মত কোনো হারে অঙ্গ রাষ্ট্রগুলিই মিটাইবে; যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের বৈদেশিক নীতির সহিত সঙ্গতি রাখিয়া অঙ্গ রাষ্ট্রগুলিকে বিদেশে নিজ নিজ বাণিজ্য প্রতিনিধি প্রেরণ এবং স্বীয় স্বার্থে বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পাদনের ক্ষমতা দান করিতে হইবে।

* আঞ্চলিক সংহতি ও শাসনতন্ত্র রক্ষার জন্য শাসনতন্ত্রে অঙ্গ রাষ্ট্রগুলিকে স্বীয় কর্তৃত্বাধীনে আধা সামরিক বা আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠন ও রাখার ক্ষমতা দিতে হইবে।

পরিশিষ্ট–গ

আমাদের বাঁচার দাবি
৬ দফা কর্মসূচি

আমার প্রিয় দেশবাসী ভাই-বোনেরা,

আমি পূর্ব পাকিস্তানবাসীর বাঁচার দাবিরূপে ৬ দফা কর্মসূচি দেশবাসী ও ক্ষমতাসীন দলের বিবেচনার জন্য পেশ করিয়াছি। শান্তভাবে উহার সমালোচনা করিবার পরিবর্তে কায়েমী স্বার্থীদের দালালরা আমার বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা শুরু করিয়াছেন। জনগণের দুশমনদের এই চেহারা ও গালাগালির সহিত দেশবাসী সুপরিচিত। অতীতে পূর্ব পাকিস্তানবাসীর নিতান্ত সহজ ও ন্যায্য দাবি যখনই উঠিয়াছে, তখনই এই দালালরা এমনিভাবে হৈ-হৈ করিয়া উঠিয়াছেন। আমাদের মাতৃভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করিবার দাবি, পূর্ব-পাক জনগণের মুক্তি-সনদ একুশ দফা দাবি, যুক্ত-নির্বাচন-প্রথার দাবি, ছাত্র-তরুণদের সহজ ও স্বল্প-ব্যয় শিক্ষা-লাভের দাবি, বাংলাকে শিক্ষার মাধ্যম করিবার দাবি ইত্যাদি সকল প্রকার দাবির মধ্যেই এই শোষকের দল ও তাহাদের দালালরা ইসলাম ও পাকিস্তান ধ্বংসের ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন।

আমার প্রস্তাবিত ৬ দফা দাবিতেও এঁরা তেমনিভাবে পাকিস্তান দুই টুকরা করিবার দুরভিসন্ধি আরোপ করিতেছেন। আমার প্রস্তাবিত ৬ দফা দাবিতে যে পূর্ব পাকিস্তানের সাড়ে পাঁচ কোটি শোষিত বঞ্চিত আদম সন্তানের অন্তরের কথাই প্রতিধ্বনিত হইয়াছে, তাতে আমার কোনো সন্দেহ নাই। খবরের কাগজের লেখায়, সংবাদে ও সভা-সমিতির বিবরণে, সকল শ্রেণীর সুধীজনের বিবৃতিতে আমি গোটা দেশবাসীর উৎসাহ-উদ্দীপনার সাড়া দেখিতেছি— তাতে আমার প্রাণে সাহস ও বুকে বল আসিয়াছে। সর্বোপরি, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের জাতীয় প্রতিষ্ঠান আওয়ামী লীগ আমার ৬ দফা দাবি অনুমোদন করিয়াছেন। ফলে ৬ দফা দাবি আজ পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের জাতীয় দাবিতে পরিণত হইয়াছে। এ অবস্থায় কায়েমী স্বার্থী শোষকদের প্রচারণায় জনগণ বিভ্রান্ত হইবেন না, সে বিশ্বাস আমার আছে।

কিন্তু এও আমি জানি, জনগণের দুশমনদের ক্ষমতা অসীম, তাঁহাদের বিত্ত প্রচুর, হাতিয়ার ইঁহাদের অফুরন্ত, মুখ ইঁহাদের দশটা, গলার সুর ইঁহাদের শতাধিক। ইঁহারা বহুরূপী। ঈমান, ঐক্য ও সংহতির নামে ইঁহারা আছেন সরকারি দলে। আবার ইসলাম ও গণতন্ত্রের দোহাই দিয়া ইঁহারা আছেন অপজিশন দলে। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের দুশমনির বেলায় ইঁহারা সকলে একজোট। ইঁহারা নানা ছলা-কলায় জনগণকে বিভ্রান্ত করিবার চেষ্টা করিবেন। সে চেষ্টা শুরুও হইয়া গিয়াছে। পূর্ব পাকিস্তানবাসীর নিষ্কাম সেবার জন্য ইঁহারা ইতিমধ্যেই বাহির হইয়া পড়িয়াছেন। ইঁহাদের হাজার

চেষ্টাতেও আমার অধিকার সচেতন দেশবাসী বিভ্রান্ত হইবেন না তাতেও আমার কোনো সন্দেহ নাই। তথাপি ৬ দফা দাবির তাৎপর্য ও উহার অপরিহার্যতা জনগণের মধ্যে প্রচার করা সমস্ত গণতন্ত্রী, বিশেষতঃ আওয়ামী লীগ কর্মীদের অবশ্যকর্তব্য। আশা করি, তাঁহারা সকলে অবিলম্বে ৬ দফার ব্যাখ্যায় দেশময় ছড়াইয়া পড়িবেন। কর্মী ভাইদের সুবিধার জন্য ও দেশবাসী জনসাধারণের কাছে সহজবোধ্য করিবার উদ্দেশ্যে আমি ৬ দফার প্রতিটি দফার দফাওয়ারী সহজ, সরল ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ও যুক্তিসহ এই পুস্তিকা প্রচার করিলাম। আওয়ামী লীগের তরফ হইতেও এ বিষয়ে আরও পুস্তিকা ও প্রচার-পত্র প্রকাশ করা হইবে। আশা করি, সাধারণভাবে সকল গণতন্ত্রী, বিশেষভাবে আওয়ামী লীগের কর্মীগণ ছাড়াও শিক্ষিত পূর্ব পাকিস্তানি মাত্রেই এইসব পুস্তিকার সদ্ব্যবহার করিবেন।

১ নং দফা

এই দফায় বলা হইয়াছে যে, ঐতিহাসিক লাহোর-প্রস্তাবের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনা করতঃ পাকিস্তানকে একটি সত্যিকার ফেডারেশনরূপে গড়িতে হইবে। তাহাতে পার্লামেন্টারি পদ্ধতির সরকার থাকিবে। সকল নির্বাচন সার্বজনীন প্রাপ্ত-বয়স্কের সরাসরি ভোটে অনুষ্ঠিত হইবে। আইনসভাসমূহের সার্বভৌমত্ব থাকিবে।

ইহাতে আপত্তির কি আছে? লাহোর-প্রস্তাব পাকিস্তানের জনগণের নিকট কায়দে-আজমসহ সকল নেতার দেওয়া নির্বাচনী ওয়াদা। ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচন এই প্রস্তাবের ভিত্তিতেই হইয়াছিল। মুসলিম বাংলার জনগণ এক বাক্যে পাকিস্তানের বাক্সে ভোটও দিয়াছিলেন এই প্রস্তাবের দরুনই। ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে পূর্ব বাংলার মুসলিম আসনের শতকরা সাড়ে ৯৭টি যে একুশ দফার পক্ষে আসিয়াছিল, লাহোর-প্রস্তাবের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনার দাবি ছিল তাহার অন্যতম প্রধান দাবি। মুসলিম লীগ তখন কেন্দ্রের ও প্রদেশের সরকারি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। সরকারি সমস্ত শক্তি ও ক্ষমতা লইয়া তাঁহারা এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধতা করিয়াছিলেন। এই প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিলে ইসলাম বিপন্ন ও পাকিস্তান ধ্বংস হইবে, এসব যুক্তি তখনও দেওয়া হইয়াছিল। তথাপি পূর্ব বাংলার ভোটাররা এই প্রস্তাবসহ একুশ দফার পক্ষে ভোট দিয়াছিল। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের পক্ষের কথা বলিতে গেলে এই প্রশ্ন চূড়ান্তভাবে গণতান্ত্রিক উপায়ে মীমাংসিত হইয়াই গিয়াছে। কাজেই আজ লাহোর-প্রস্তাবভিত্তিক শাসনতন্ত্র রচনার দাবি করিয়া আমি কোনও নতুন দাবি তুলি নাই; পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের পুরানো দাবিরই পুনরুল্লেখ করিয়াছি মাত্র। তথাপি লাহোর-প্রস্তাবের নাম শুনিলেই যাঁহারা আঁতকাইয়া উঠেন, তাঁহারা হয় পাকিস্তান-সংগ্রামে শরিক ছিলেন না, অথবা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের দাবি-দাওয়ার বিরোধিতা ও কায়েমী স্বার্থীদের দালালি করিয়া পাকিস্তানের অনিষ্ট সাধন করিতে চান।

এই দফায় পার্লামেন্টারি পদ্ধতি সরকার, সার্বজনীন ভোটে সরাসরি নির্বাচন ও আইনসভার সার্বভৌমত্বের যে দাবি করা হইয়াছে তাহাতে আপত্তির কারণ কি? আমার প্রস্তাবই ভালো, না প্রেসিডেনশিয়াল পদ্ধতির সরকার ও পরোক্ষ নির্বাচন এবং

ক্ষমতাহীন আইনসভাই ভালো, এ বিচার-ভার জনগণের ওপর ছাড়িয়া দেওয়াই কি উচিত নয়? তবে পাকিস্তানের ঐক্য-সংহতির এই তরফদারেরা এই সব প্রশ্নে রেফারেন্ডামের মাধ্যমে জনমত যাচাই-এর প্রস্তাব না দিয়া আমার বিরুদ্ধে গালাগালি বর্ষণ করিতেছেন কেন? তাঁহারা যদি নিজেদের মতে এতই আস্থাবান, তবে আসুন এ প্রশ্নের ওপরই গণ-ভোট হইয়া যাক।

২ নং দফা

এই দফায় আমি প্রস্তাব করিয়াছি যে, ফেডারেশন সরকারের এখতিয়ারে কেবলমাত্র দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্রীয় ব্যাপার এই দুইটি বিষয় থাকিবে। অবশিষ্ট সমস্ত বিষয় স্টেটসমূহের (বর্তমান ব্যবস্থায় যাকে প্রদেশ বলা হয়) হাতে থাকিবে।

এই প্রস্তাবের দরুনই কায়েমী স্বার্থের দালালরা আমার উপর সর্বাপেক্ষা বেশি চটিয়াছেন। আমি নাকি পাকিস্তানকে দুই টুকরা করিয়া ধ্বংস করিবার প্রস্তাব দিয়াছি। সংকীর্ণ স্বার্থবুদ্ধি ইঁহাদের এতই অন্ধ করিয়া ফেলিয়াছে যে, ইঁহারা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মূল সূত্রগুলি পর্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছেন। ইঁহারা ভুলিয়া যাইতেছেন যে, ব্রিটিশ সরকারের ক্যাবিনেট মিশন ১৯৪৬ সালে যে 'প্ল্যান' দিয়াছিলেন এবং যে 'প্ল্যান' কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয়েই গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাতে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র ও যোগাযোগ ব্যবস্থা এই তিনটি মাত্র বিষয় ছিল এবং বাকি সব বিষয়ই প্রদেশের হাতে দেওয়া হইয়াছিল। ইহা হইতে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে যে, ব্রিটিশ সরকার, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ সকলের মত এই যে, এই তিনটি মাত্র বিষয় কেন্দ্রের হাতে থাকিলেই কেন্দ্রীয় সরকার চলিতে পারে। অন্য কারণে কংগ্রেস চুক্তি-ভঙ্গ করায় ক্যাবিনেট প্ল্যান পরিত্যক্ত হয়। তা না হইলে এই তিন বিষয় লইয়াই আজও ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার চলিতে থাকিত। আমি আমার প্রস্তাবে ক্যাবিনেট প্ল্যানেরই অনুসরণ করিয়াছি। যোগাযোগ ব্যবস্থা আমি বাদ দিয়াছি সত্য, কিন্তু তার যুক্তিসঙ্গত কারণও আছে। অখণ্ড ভারতের বেলায় যোগাযোগ ব্যবস্থারও অখণ্ডতা ছিল। ফেডারেশন গঠনের রাষ্ট্র-বৈজ্ঞানিক মূলনীতি এই যে, যে-যে বিষয়ে ফেডারেটিং স্টেটসমূহের স্বার্থ এক ও অবিভাজ্য, কেবল সেই সেই বিষয়ই ফেডারেশনের এখতিয়ারে দেওয়া হয়। এই মূলনীতি অনুসারে অখণ্ড ভারতে যোগাযোগ ব্যবস্থা এক ও অবিভাজ্য ছিল। পেশওয়ার হইতে চাটগাঁ পর্যন্ত একই রেল চলিতে পারিত। কিন্তু পাকিস্তানে তা নয়। দুই অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা এক ও অবিভাজ্য তো নয়ই, বরঞ্চ সম্পূর্ণ পৃথক। রেলওয়েকে প্রাদেশিক সরকারের হাতে ট্রান্সফার করিয়া বর্তমান সরকারও তা স্বীকার করিয়াছেন। টেলিফোন-টেলিগ্রাফ পোস্টাফিসের ব্যাপারেও এ সত্য স্বীকার করিতেই হইবে।

তবে বলা যাইতে পারে যে, একুশ দফায় যখন কেন্দ্রকে তিনটি বিষয় দিবার সুপারিশ ছিল, তখন আমি আবার বর্তমান প্রস্তাবে মাত্র দুই বিষয় দিলাম কেন? এ প্রশ্নের জবাব আমি ৩ নং দফার ব্যাখ্যায় দিয়াছি। এখানে আর পুনরুক্তি করিলাম না।

আরেকটা ব্যাপারে ভুল ধারণা সৃষ্টি হইতে পারে। আমার প্রস্তাবে ফেডারেটিং ইউনিটকে 'প্রদেশ' না বলিয়া স্টেট' বলিয়াছি। ইহাতে কায়েমী স্বার্থী শোষকেরা জনগণকে এই

বলিয়া ধোঁকা দিতে পারে এবং দিতেও শুরু করিয়াছে যে, 'স্টেট' অর্থে আমি 'ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্টেট' বা স্বাধীন রাষ্ট্র বুঝাইয়াছি। কিন্তু তা সত্য নয়। ফেডারেটিং ইউনিটকে দুনিয়ার সর্বত্র সব বড় বড় ফেডারেশনেই 'প্রদেশ' বা 'প্রভিন্স' না বলিয়া 'স্টেটস' বলা হইয়া থাকে। কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকে ফেডারেশন অথবা ইউনিয়ন বলা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ফেডারেল জার্মানি, এমন কি আমাদের প্রতিবেশী ভারত রাষ্ট্র সকলেই তাহাদের প্রদেশসমূহকে 'স্টেট' ও কেন্দ্রকে ইউনিয়ন বা ফেডারেশন বলিয়া থাকে। আমাদের পার্শ্ববর্তী আসাম ও পশ্চিম বাংলা 'প্রদেশ' নয় 'স্টেট'। এরা যদি ভারত ইউনিয়নের প্রদেশ হইয়া 'স্টেট' হওয়ার সম্মান পাইতে পারে, তবে পূর্ব পাকিস্তানকে এইটুকু নামের মর্যাদা দিতেইবা কর্তারা এত এলার্জিক কেন?

৩ নং দফা

এই দফায় আমি মুদ্রা সম্পর্কে দুইটি বিকল্প বা অল্টারনেটিভ প্রস্তাব দিয়াছি। এই দুইটি প্রস্তাবের যে কোনও একটি গ্রহণ করিলেই চলিবে :

ক. পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক অথচ সহজে বিনিময়যোগ্য মুদ্রার প্রচলন করিতে হইবে। এই ব্যবস্থা অনুসারে কারেন্সী কেন্দ্রের হাতে থাকিবে না, আঞ্চলিক সরকারের হাতে থাকিবে। দুই অঞ্চলের জন্য দুইটি স্বতন্ত্র 'স্টেট' ব্যাঙ্ক থাকিবে।

খ. দুই অঞ্চলের জন্য একই কারেন্সী থাকিবে। এ ব্যবস্থায় মুদ্রা কেন্দ্রের হাতে থাকিবে। কিন্তু এ অবস্থায় শাসনতন্ত্রে এমন সুনির্দিষ্ট বিধান থাকিতে হইবে যাহাতে পূর্ব পাকিস্তানের মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হইতে না পারে। এই বিধানে পাকিস্তানের একটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থাকিবে; দুই অঞ্চলে দুইটি পৃথক রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থাকিবে।

এই দুইটি বিকল্প প্রস্তাব হইতে দেখা যাইবে যে, মুদ্রাকে সরাসরি কেন্দ্রের হাত হইতে প্রদেশের হাতে আনিবার প্রস্তাব আমি করি নাই। যদি আমার দ্বিতীয় অল্টারনেটিভ গৃহীত হয়, তবে মুদ্রা কেন্দ্রের হাতেই থাকিয়া যাইবে। ওই অবস্থায় আমি একুশ দফা প্রস্তাবের খেলাফে কোনও সুপারিশ করিয়াছি, একথা বলা চলে না।

যদি পশ্চিম পাকিস্তানি ভাইরা আমার এই প্রস্তাবে রাজি না হন, তবেই শুধু প্রথম বিকল্প অর্থাৎ কেন্দ্রের হাত হইতে মুদ্রাকে প্রদেশের হাতে আনিতে হইবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ভুল বুঝাবুঝির অবসান হইলে আমাদের এবং উভয় অঞ্চলের সুবিধার খাতিরে পশ্চিম পাকিস্তানি ভাইরা এই প্রস্তাবে রাজি হইবেন। আমরা তাঁহাদের খাতিরে সংখ্যাগরিষ্ঠতা ত্যাগ করিয়া সংখ্যা-সাম্য মানিয়া লইয়াছি, তাঁহারা কি আমাদের খাতিরে এইটুকু করিবেন না?

আর যদি অবস্থাগতিকে মুদ্রাকে প্রদেশের এলাকায় আনিতেও হয়, তবু তাতে কেন্দ্র দুর্বল হইবে না; পাকিস্তানের কোনও অনিষ্ট হইবে না। ক্যাবিনেট প্ল্যানে নিখিল ভারতীয় কেন্দ্রের যে প্রস্তাব ছিল, তাতে মুদ্রা কেন্দ্রীয় বিষয় ছিল না। ওই প্রস্তাব পেশ করিয়া ব্রিটিশ সরকার এবং ওই প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ সকলেই স্বীকার করিয়াছেন যে, মুদ্রাকে কেন্দ্রীয় বিষয় না করিয়াও কেন্দ্র চলিতে পারে। কথাটা

সত্য। রাষ্ট্রীয় অর্থ-বিজ্ঞানে এই অবস্থার স্বীকৃতি আছে। কেন্দ্রের বদলে প্রদেশের হাতে অর্থনীতি রাখা এবং একই দেশে পৃথক পৃথক রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থাকিবার নজির দুনিয়ার বড় বড় শক্তিশালী রাষ্ট্রেও আছে। খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি চলে ফেডারেল রিজার্ভ সিস্টেমের মাধ্যমে পৃথক পৃথক স্টেট ব্যাঙ্কের দ্বারা। এতে যুক্তরাষ্ট্র ধ্বংস হয় নাই; তাদের আর্থিক বুনিয়াদও ভাঙ্গিয়া পড়ে নাই। অত যে শক্তিশালী দোর্দণ্ডপ্রতাপ সোভিয়েত ইউনিয়ন, তাদেরও কেন্দ্রীয় সরকারের কোনও অর্থমন্ত্রী বা অর্থ দফতর নাই। শুধু প্রাদেশিক সরকারের অর্থাৎ স্টেট রিপাবলিকসমূহেরেই অর্থমন্ত্রী ও অর্থ দফতর আছে। কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক প্রয়োজন ওইসব প্রাদেশিক মন্ত্রী ও মন্ত্রী দফতর দিয়াই মিটিয়া থাকে। দক্ষিণ আফ্রিকার মতো দেশেও আঞ্চলিক সুবিধার খাতিরে দুইটি পৃথক ও স্বতন্ত্র রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বহুদিন আগে হইতেই চালু আছে।

আমার প্রস্তাবের মর্ম এই যে, উপরোক্ত দুই বিকল্পের দ্বিতীয়টি গৃহীত হইলে মুদ্রা কেন্দ্রের তত্ত্বাবধানে থাকিবে। সেই অবস্থায় উভয় অঞ্চলের একই নকশার মুদ্রা বর্তমানে যেমন আছে তেমনি থাকিবে। পার্থক্য শুধু এই হইবে যে, পূর্ব পাকিস্তানের প্রয়োজনীয় মুদ্রা পূর্ব পাকিস্তানের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে ইস্যু হইবে এবং তাতে 'পূর্ব পাকিস্তান' বা সংক্ষেপে 'ঢাকা' লেখা থাকিবে। পশ্চিম পাকিস্তানের প্রয়োজনীয় মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে ইস্যু হইবে এবং তাতে 'পশ্চিম পাকিস্তান' বা সংক্ষেপে 'লাহোর' লেখা থাকিবে। পক্ষান্তরে, আমার প্রস্তাবের দ্বিতীয় বিকল্প না হইয়া যদি প্রথম বিকল্পও গৃহীত হয়, সে অবস্থাতেও উভয় অঞ্চলের মুদ্রা সহজে বিনিময়যোগ্য থাকিবে এবং পাকিস্তানের ঐক্যের প্রতীক ও নিদর্শনস্বরূপ উভয় আঞ্চলিক সরকারের সহযোগিতায় একই নকশার মুদ্রা প্রচলন করা হইবে।

একটু তলাইয়া চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে যে, এই দুই ব্যবস্থার একটি গ্রহণ করা ছাড়া পূর্ব পাকিস্তানকে নিশ্চিত অর্থনৈতিক মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিবার অন্য কোনও উপায় নাই। সারা পাকিস্তানের জন্য একই মুদ্রা হওয়ায় ও দুই অঞ্চলের মুদ্রার মধ্যে কোনও পৃথক চিহ্ন না থাকায় আঞ্চলিক কারেন্সী সার্কুলেশনে কোনও বিধি-নিষেধ ও নির্ভুল হিসাব নাই। মুদ্রা ও অর্থনীতি কেন্দ্রীয় সরকারের এখতিয়ারে থাকায় অতি সহজেই পূর্ব পাকিস্তানের আয় পশ্চিম পাকিস্তানে চলিয়া যাইতেছে। সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, শিল্প-বাণিজ্য, ব্যাঙ্কিং, ইনসিওরেন্স ও বৈদেশিক মিশনসমূহের হেড অফিস পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত থাকায় প্রতি মিনিটে এই পাচারের কাজ অবিরাম গতিতে চলিতেছে। সকলেই জানেন সরকারি স্টেট ব্যাঙ্ক ও ন্যাশনাল ব্যাঙ্কসহ সমস্ত ব্যাঙ্কের হেড অফিস পশ্চিম পাকিস্তানে। এই সেই দিন মাত্র প্রতিষ্ঠিত ছোট দু-একখানি ব্যাঙ্ক ইহার সাম্প্রতিক ব্যতিক্রম মাত্র। এই সব ব্যাঙ্কের ডিপোজিটের টাকা, শেয়ার মানি, সিকিওরটি মানি, শিল্প-বাণিজ্যের আয়, মুনাফা ও শেয়ার মানি, এক কথায় পূর্ব পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত সমস্ত আর্থিক লেনদেনের টাকা বালুচরে ঢালা পানির মতো একটানে তলদেশে হেড অফিসে অর্থাৎ পশ্চিম পাকিস্তানে চলিয়া যাইতেছে, পূর্ব পাকিস্তান শুকনা বালুচর হইয়া থাকিতেছে। বালুচরে পানির দরকার

হইলে টিউবওয়েল খুঁদিয়া তলদেশ হইতে পানি তুলিতে হয়। অবশিষ্ট পানি তলদেশে জমা থাকে। পূর্ব পাকিস্তানের প্রয়োজনীয় অর্থও তেমনি চেকের টিউবওয়েলের মাধ্যমে পশ্চিম পাকিস্তান হইতে আনিতে হয়। উদ্বৃত্ত আর্থিক সেভিং তলদেশেই অর্থাৎ পশ্চিম পাকিস্তানেই জমা থাকে। এই কারণেই পূর্ব পাকিস্তানে ক্যাপিটেল ফর্মেশন হইতে পারে নাই। সব ক্যাপিটেল ফর্মেশন পশ্চিমে হইয়াছে। বর্তমান ব্যবস্থা চলিতে থাকিলে কোনও দিন পূর্ব পাকিস্তানে মূলধন গঠন হইবেও না। কারণ সেভিং মানেই ক্যাপিটেল ফর্মেশন।

শুধু ফ্লাইট-অব-ক্যাপিটেল বা মুদ্রা পাচারই নয়, মদ্রাস্ফীতিহেতু পূর্ব পাকিস্তানে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দুর্মূল্য, জনগণের বিশেষত পাটচাষীদের দুর্দশা সমস্তের জন্য দায়ী এই মুদ্রা ব্যবস্থা ও অর্থনীতি। আমি ৫ নং দফার ব্যাখ্যায় এ ব্যাপারে আরও বিস্তারিতভাবে এ বিষয়ে আলোচনা করিয়াছি। এখানে শুধু এইটুকু বলিয়া রাখিতেছি যে, এই ফ্লাইট-অব-ক্যাপিটেল বন্ধ করিতে না পারিলে পূর্ব পাকিস্তানিরা নিজেরা শিল্প-বাণিজ্যে এক পা-ও অগ্রসর হইতে পারিবে না। কারণ এ অবস্থায় মূলধন গড়িয়া উঠিতে পারে না।

৪ নং দফা

এই দফায় আমি প্রস্তাব করিয়াছি যে, সকল প্রকার ট্যাক্স-খাজনা-কর ধার্য ও আদায়ের ক্ষমতা থাকিবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে। ফেডারেল সরকারের সে ক্ষমতা থাকিবে না। আঞ্চলিক সরকারের আদায়ী রেভিনিউ-এর নির্ধারিত অংশ আদায়ের সঙ্গে সঙ্গে ফেডারেল তহবিলে অটোমেটিক্যালি জমা হইয়া যাইবে। এই মর্মে রিজার্ভ ব্যাঙ্কসমূহের ওপর বাধ্যতামূলক বিধান শাসনতন্ত্রেই থাকিবে। এইভাবে জমাকৃত টাকাই ফেডারেল সরকারের তহবিল হইবে।

আমার এই প্রস্তাবেই কায়েমী স্বার্থের কালোবাজারি ও মুনাফাখোর শোষকরা সবচেয়ে বেশি চমকিয়া উঠিয়াছে। তারা বলিতেছে, ট্যাক্স ধার্যের ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের না থাকিলে সে সরকার চলিবে কিরূপে? কেন্দ্রীয় সরকার তাতে যে একেবারে খয়রাতি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইবে। খয়রাতের ওপর নির্ভর করিয়া কেন্দ্রীয় সরকার দেশরক্ষা করিবেন কেমনে? পররাষ্ট্রনীতিইবা চালাইবেন কি দিয়া? প্রয়োজনের সময় চাঁদা না দিলে কেন্দ্রীয় সরকার তো অনাহারে মারা যাইবেন। অতএব এটা নিশ্চয়ই পাকিস্তান ধ্বংসেরই ষড়যন্ত্র।

কায়েমী স্বার্থীরা এই ধরনের কত কথাই না বলিতেছেন। অথচ এর একটা আশঙ্কাও সত্য নয়। সত্য যে নয় সেটা বুঝিবার মতো বিদ্যা-বুদ্ধি তাঁহাদের নিশ্চয়ই আছে। তবু যে তাঁহারা এসব কথা বলিতেছেন, তাহার একমাত্র কারণ তাঁদের ব্যক্তিগত ও শ্রেণীগত স্বার্থ। সে স্বার্থ পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে অবাধে শোষণ ও লণ্ঠন করিবার অধিকার। তাঁহারা জানেন যে, আমার এই প্রস্তাবে কেন্দ্রকে ট্যাক্স ধার্যের দায়িত্ব দেওয়া না হইলেও কেন্দ্রীয় সরকার নির্বিঘ্নে চলার মতো যথেষ্ট অর্থের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সে ব্যবস্থা নিঁখুত করিবার শাসনতান্ত্রিক বিধান রচনার সুপারিশ করা হইয়াছে। ইহাই সরকারি

তহবিলের সবচেয়ে অমোঘ, অব্যর্থ ও সর্বাপেক্ষা নিরাপদ উপায়। তাঁহারা ইহাও জানেন যে, কেন্দ্রকে ট্যাক্স ধার্যের ক্ষমতা না দিয়াও ফেডারেশন চলার বিধান রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্বীকৃত। তাঁরা এ খবরও রাখেন যে, ক্যাবিনেট মিশনের যে প্ল্যান ব্রিটিশ সরকার রচনা করিয়াছিলেন এবং কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয়েই গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাতেও সমস্ত ট্যাক্স ধার্যের ক্ষমতা প্রদেশের হাতে দেওয়া হইয়াছিল; কেন্দ্রকে সে ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই। ৩ নং দফার ব্যাখ্যায় আমি দেখাইয়াছি যে, অর্থমন্ত্রী ও অর্থ দফতর ছাড়াও দুনিয়ার অনেক ফেডারেশন চলিতেছে। তার মধ্যে দুনিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তিশালী ফেডারেশন সোভিয়েত ইউনিয়নের কথাও আমি বলিয়াছি। তথায় কেন্দ্রে অর্থমন্ত্রী বা অর্থদফতর বলিয়া কোনও বস্তুর অস্তিত্বই নাই। তাতে কি অর্থাভাবে সোভিয়েত ইউনিয়ন ধ্বংস হইয়া গিয়াছে? তার দেশরক্ষা বাহিনী ও পররাষ্ট্র দফতর কি সেজন্য দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে? পড়ে নাই। আমার প্রস্তাব কার্যকরী হইলেও তেমনি পাকিস্তানের দেশরক্ষা ব্যবস্থা দুর্বল হইবে না। কারণ আমার প্রস্তাবে কেন্দ্রীয় তহবিলের নিরাপত্তার জন্য শাসনতান্ত্রিক বিধানের সুপারিশ করা হইয়াছে। সে অবস্থায় শাসনতন্ত্রে এমন বিধান থাকিবে যে, আঞ্চলিক সরকার যেখানে যখন যে খাতেই যে টাকা ট্যাক্স ধার্য ও আদায় করুন না কেন, শাসনতন্ত্রে নির্ধারিত সে টাকার হারের অংশ রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় তহবিলে জমা হইয়া যাইবে। সে টাকায় আঞ্চলিক সরকারের কোনও হাত থাকিবে না। এই ব্যবস্থায় অনেক সুবিধা হইবে। প্রথমত, কেন্দ্রীয় সরকারকে ট্যাক্স আদায়ের ঝামেলা পোহাইতে হইবে না। দ্বিতীয়ত, ট্যাক্স ধার্য ও আদায়ের জন্য কোনও দফতর বা অফিসার বাহিনী রাখিতে হইবে না। তৃতীয়ত, অঞ্চলে ও কেন্দ্রের জন্য ট্যাক্স ধার্য ও আদায়ের মধ্যে ডুপ্লিকেশন হইবে না। তাতে আদায়ী খরচায় অপব্যয় ও অপচয় বন্ধ হইবে। ওইভাবে সঞ্চিত টাকার দ্বারা গঠন ও উন্নয়নমূলক অনেক কাজ করা যাইবে। অফিসার বাহিনীকেও উন্নততর সৎকাজে নিয়োজিত করা যাইবে। চতুর্থত, ট্যাক্স ধার্য ও আদায়ের একীকরণ সহজতর হইবে। সকলেই জানেন, অর্থ-বিজ্ঞানীরা এখন ক্রমেই সিংগল ট্যাক্সেশনের দিকে আকৃষ্ট হইতেছেন। সিংগল ট্যাক্সেশনের নীতিকে সকলেই অধিকতর বৈজ্ঞানিক ও ফলপ্রসূ বলিয়া অভিহিত করিতেছেন। ট্যাক্সেশনকে ফেডারেশনের এলাকা হইতে অঞ্চলের এখতিয়ারভুক্ত করা এই সর্বোত্তম ও সর্বশেষ আর্থিক নীতি গ্রহণের প্রথম পদক্ষেপ বলা যাইতে পারে।

৫ নং দফা

এই দফায় আমি বৈদেশিক বাণিজ্য ব্যাপারে নিম্নরূপ শাসনতান্ত্রিক বিধানের সুপারিশ করিয়াছি :

১. দুই অঞ্চলের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পৃথক পৃথক হিসাব রাখিতে হইবে।

২. পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পূর্ব পাকিস্তানের এখতিয়ারে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানের এখতিয়ারে থাকিবে।

৩. ফেডারেশনের প্রয়োজনীয় বিদেশী মুদ্রা দুই অঞ্চল হইতে সমানভাবে অথবা শাসনতন্ত্রে নির্ধারিত হারাহারি মতে আদায় হইবে।

৪. দেশজাত দ্রব্যাদি বিনা শুল্কে উভয় অঞ্চলের মধ্যে আমদানি-রফতানি চলিবে।

৫. ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে বিদেশের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদনের, বিদেশে ট্রেড মিশন স্থাপনের এবং আমদানি-রফতানি করিবার অধিকার আঞ্চলিক সরকারের হাতে ন্যস্ত করিয়া শাসনতান্ত্রিক বিধান করিতে হইবে।

পূর্ব পাকিস্তানকে অর্থনৈতিক নিশ্চিত মৃত্যু হইতে রক্ষা করিবার জন্য এই ব্যবস্থা ৩ নং দফার মতোই অত্যাবশ্যক। পাকিস্তানের আঠার বছরের আর্থিক ইতিহাসের দিকে একটু নজর দিলে দেখা যাইবে যে :

ক. পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বিদেশী মুদ্রা দিয়া পাকিস্তানের শিল্প গড়িয়া তোলা হইয়াছে এবং হইতেছে। সেই সকল শিল্পজাত দ্রব্যের অর্জিত বিদেশী মুদ্রাকে পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় করা হইতেছে। এইভাবে পূর্ব পাকিস্তান শিল্পায়িত হইতে পারিতেছে না।

খ. পূর্ব পাকিস্তান যে পরিমাণে আয় করে সেই পরিমাণ ব্যয় করিতে পারে না। সকলেই জানেন, পূর্ব পাকিস্তান যে পরিমাণ রফতানি করে আমদানি করে সাধারণত তার অর্ধেকেরও কম। ফলে অর্থনীতির অমোঘ নিয়ম অনুসারেই পূর্ব পাকিস্তানে ইনফ্লেশন বা মুদ্রাস্ফীতি ম্যালেরিয়া জ্বরের মতো লাগিয়াই আছে। তার ফলে আমাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দাম এত বেশি। বিদেশ হইতে আমদানি করা একই জিনিসের পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানি দামের তুলনা করিলেই এটা বুঝা যাইবে। বিদেশী মুদ্রা বণ্টনের দায়িত্ব এবং অর্থনৈতিক অন্যান্য সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের এখতিয়ার থাকার ফলেই আমাদের এই দুর্দশা।

গ. পাকিস্তানের বিদেশী মুদ্রার তিন ভাগের দুই ভাগই অর্জিত হয় পাট হইতে। অথচ পাটচাষীকে পাটের ন্যায্য মূল্য তো দূরের কথা আবাদী খরচটাও দেওয়া হয় না। ফলে পাটচাষীদের ভাগ্য আজ শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের খেলার জিনিসে পরিণত হইয়াছে। পূর্ব পাকিস্তান সরকার পাটের চাষ নিয়ন্ত্রণ করেন কিন্তু চাষীকে পাটের ন্যায্য দাম দিতে পারেন না। এমন অদ্ভুত অর্থনীতি দুনিয়ার আর কোনও দেশে নাই। যত দিন পাট থাকে চাষীর ঘরে, তত দিন পাটের দাম থাকে পনের-বিশ টাকা। ব্যবসায়ীর গুদামে চলিয়া যাওয়ার সাথে সাথে তার দাম হয় পঞ্চাশ। এ খেলা গরিব পাট চাষী চিরকাল দেখিয়া আসিতেছে। পাট-ব্যবসায় জাতীয়করণ করিয়া পাট রফতানিকে সরকারি আয়ত্তে আনা ছাড়া এর কোনও প্রতিকার নাই, একথা আমরা বহুবার বলিয়াছি। এ উদ্দেশ্যে আমরা আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভার আমলে জুট মার্কেটিং কর্পোরেশন গঠন করিয়াছিলাম। পরে কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যে পুঁজিপতিরা আমাদের সে আরব্ধ কাজ ব্যর্থ করিয়া দিয়াছেন।

ঘ. পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বিদেশী মুদ্রাই যে শুধু পশ্চিম পাকিস্তানে খরচ হইতেছে তাহা নয়, আমাদের অর্জিত বিদেশী মুদ্রার জোরে যে বিপুল পরিমাণ বিদেশী লোন ও এইড আসিতেছে, তাও পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় হইতেছে। কিন্তু সে লোনের সুদ বহন করিতে হইতেছে পূর্ব পাকিস্তানকেই। ওই অবস্থার প্রতিকার করিয়া পাটচাষীকে পাটের ন্যায্য মূল্য দিতে হইলে, আমদানি-রফতানি সমান করিয়া জনসাধারণকে সস্তা দামে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ করিয়া তাদের জীবন সুখময় করিতে হইলে এবং সর্বোপরি আমাদের অর্জিত বিদেশী মুদ্রা দিয়া পূর্ব পাকিস্তানির হাতে পূর্ব পাকিস্তানকে শিল্পায়িত করিতে হইলে আমার প্রস্তাবিত এই ব্যবস্থা ছাড়া উপায়ন্তর নাই।

৬ নং দফা

এই দফায় আমি পূর্ব পাকিস্তানে মিলিশিয়া বা প্যারামিলিটারি রক্ষাবাহিনী গঠনের সুপারিশ করিয়াছি। এ দাবি অন্যায়ও নয়, নতুনও নয়। একুশ দফার দাবিতে আমরা আনসার বাহিনীকে ইউনিফর্মধারী সশস্ত্র বাহিনীতে রূপান্তরিত করিবার দাবি করিয়াছিলাম। তা তো করা হয়ই নাই, বরঞ্চ পূর্ব পাকিস্তান সরকারের অধীনস্থ ইপিআর বাহিনীকে এখন কেন্দ্রের অধীনে নেওয়া হইয়াছে। পূর্ব পাকিস্তানে অস্ত্র-কারখানা ও নৌ-বাহিনীর হেডকোয়ার্টার স্থাপন করিয়া এ অঞ্চলকে আত্মরক্ষায় আত্মনির্ভর করার দাবি একুশ দফার দাবি। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার বারো বছরেও আমাদের একটি দাবিও পূরণ করেন নাই। পূর্ব পাকিস্তান অধিকাংশ পাকিস্তানির বাসস্থান। এটাকে রক্ষা করা কেন্দ্রীয় সরকারেরই নৈতিক ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব। সে দায়িত্ব পালনে আমাদের দাবি করিতে হইবে কেন? সরকার নিজে হইতে সে দায়িত্ব পালন করেন না কেন? পশ্চিম পাকিস্তান আগে বাঁচাইয়া সময় ও সুযোগ থাকিলে পরে পূর্ব পাকিস্তান বাঁচানো হইবে, ইহাই কি কেন্দ্রীয় সরকারের অভিমত? পূর্ব পাকিস্তানের রক্ষাব্যবস্থা পশ্চিম পাকিস্তানেই রহিয়াছে এমন সাংঘাতিক কথা শাসনকর্তারা বলেন কোন মুখে? মাত্র সতের দিনের পাক-ভারত যুদ্ধই কি প্রমাণ করে নাই আমরা কত নিরুপায়? শত্রুর দয়া ও মর্জির ওপর তো আমরা বাঁচিয়া থাকিতে পারি না। কেন্দ্রীয় সরকারের দেশরক্ষা নীতি কার্যত আমাদেরকে তাই করিয়া রাখিয়াছে।

তবু আমরা পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতির খাতিরে দেশরক্ষা ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে রাখিতে চাই। সঙ্গে সঙ্গে এও চাই যে, কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব পাকিস্তানকে এ ব্যাপারে আত্মনির্ভর করিবার জন্য এখানে উপযুক্ত পরিমাণ দেশরক্ষা বাহিনী গঠন করুন। নৌ-বাহিনী অস্ত্র কারখানা স্থাপন করুন। সেনাবাহিনীর দফতর এখানে নিয়া আসুন। এসব কাজ সরকার কবে করিবেন জানি না। কিন্তু ইতিমধ্যে অল্প খরচে ছোটখাটো অস্ত্রশস্ত্র দিয়া আধা-সামরিক বাহিনী গঠন করিতেও পশ্চিমা ভাইদের এত আপত্তি কেন? পূর্ব পাকিস্তান রক্ষার উদ্দেশ্যে স্বতন্ত্র যুদ্ধ-তহবিলে চাঁদা উঠিলে তাও কেন্দ্রীয় রক্ষা তহবিলে নিয়া যাওয়া হয় কেন? ওই সব প্রশ্নের উত্তর নাই। তবু কেন্দ্রীয় ব্যাপারে অঞ্চলের হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার আমরাও চাই না। এ অবস্থায় পূর্ব পাকিস্তান যেমন করিয়া পারে গরিবি হালেই আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করিবে, এমন দাবি কি অন্যায়? এই দাবি করিলেই সেইটা হইবে দেশদ্রোহিতা?

এ প্রসঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানি ভাই-বোনদের খেদমতে আমার কয়েকটি আরজ আছে :

এক. তাঁহারা মনে করিবেন না আমি শুধু পূর্ব পাকিস্তানিদের অধিকার দাবি করিতেছি। আমার ৬ দফা কর্মসূচিতে পশ্চিম পাকিস্তানিদের দাবিও সমভাবেই রহিয়াছে। এ দাবি স্বীকৃত হইলে পশ্চিম পাকিস্তানিরাও সমভাবে উপকৃত হইবেন।

দুই. আমি যখন বলি, পূর্ব পাকিস্তানের সম্পদ পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার ও স্তূপীকৃত হইতেছে তখন আমি আঞ্চলিক বৈষম্যের কথাই বলি, ব্যক্তিগত বৈষম্যের কথা বলি না। আমি জানি, এ বৈষম্য সৃষ্টির জন্য পশ্চিম পাকিস্তানিরা দায়ী নয়। আমি এও জানি যে,

আমাদের মতো দরিদ্র পশ্চিম পাকিস্তানেও অনেক আছেন। যতদিন ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার অবসান না হইবে, ততদিন ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে এই অসাম্য দূর হইবে না? কিন্তু তার আগে আঞ্চলিক শোষণও বন্ধ করিতে হইবে। এই আঞ্চলিক শোষণের জন্য দায়ী আমাদের ভৌগোলিক অবস্থান এবং সেই অবস্থানকে অগ্রাহ্য করিয়া যে অস্বাভাবিক ব্যবস্থা চালাইবার চেষ্টা চলিতেছে সেই ব্যবস্থা। ধরুন, যদি পাকিস্তানের রাজধানী পশ্চিম পাকিস্তানে না হইয়া পূর্ব পাকিস্তানে হইত, পাকিস্তানের দেশরক্ষা বাহিনীর তিনটি দফতরই যদি পূর্ব পাকিস্তানে হইত, তবে কার কি অসুবিধা-সুবিধা হইত একটু বিচার করুন। পাকিস্তানের মোট রাজস্বের শতকরা বাষট্টি টাকা খরচ হয় দেশরক্ষা বাহিনীতে এবং শতকরা বত্রিশ টাকা খরচ হয় কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালনায়। এই একুন শতকরা চুরানব্বই টাকা পশ্চিম পাকিস্তানে না হইয়া তখন খরচ হইত পূর্ব পাকিস্তানে। আপনারা জানেন অর্থ-বিজ্ঞানের কথা : সরকারি আয় জনগণের ব্যয় এবং সরকারি ব্যয় জনগণের আয়। এই নিয়মে বর্তমান ব্যবস্থায় সরকারের গোটা আয়ের অর্ধেক পূর্ব পাকিস্তানের ১ব্যয় ঠিকই, কিন্তু সরকারি ব্যয়ের সবটুকুই পশ্চিম পাকিস্তানের আয়। রাজধানী পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত থাকায় সরকারি, আধা-সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং বিদেশী মিশনসমূহ তাদের সমস্ত ব্যয় পশ্চিম পাকিস্তানেই করিতে বাধ্য হইতেছেন। এই ব্যয়ের সাকুল্যই পশ্চিম পাকিস্তানের আয়। ফলে, প্রতি বছর পশ্চিম পাকিস্তানের আয় ওই অনুপাতে বাড়িতেছে এবং পূর্ব পাকিস্তান তার মোকাবিলায় ওই পরিমাণ গরিব হইতেছে। যদি পশ্চিম পাকিস্তানের বদলে পূর্ব পাকিস্তানে আমাদের রাজধানী হইত তবে এই সব খরচ পূর্ব পাকিস্তানে হইত। আমরা পূর্ব পাকিস্তানিরা এই পরিমাণে ধনী হইতাম। আপনারা পশ্চিম পাকিস্তানিরা ওই পরিমাণে গরিব হইতেন। তখন আপনারা কি করিতেন? যেসব দাবি করার জন্য আমাকে প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতার তহমত দিতেছেন সেইসব দাবি আপনারা নিজেরাই করিতেন। আমাদের চেয়ে জোরেই করিতেন। অনেক আগেই করিতেন। আমাদের মতো আঠার বছর বসিয়া থাকিতেন না। সেটা করা আপনাদের অন্যায়ও হইত না।

তিন. আপনারা ওইসব দাবি করিলে আমরা পূর্ব পাকিস্তানিরা কি করিতাম, জানেন? আপনাদের সব দাবি মানিয়া লইতাম। আপনাদিগকে প্রাদেশিকতাবাদী বলিয়া গাল দিতাম না। কারণ, আমরা জানি এবং বিশ্বাস করি, ও-সব আপনাদের হক পাওনা। নিজের হক পাওনা দাবি করা অন্যায় নয়, কর্তব্য। এ বিশ্বাস আমাদের এতই আন্তরিক যে, সে অবস্থা হইলে আপনাদের দাবি করিতে হইত না। আপনাদের দাবি করিবার আগেই আপনাদের হক আপনাদিগকে বুঝাইয়া দিতাম। আমরা নিজেদের হক দাবি করিতেছি বলিয়া আমাদের স্বার্থপর বলিতেছেন। কিন্তু আপনারা যে নিজেদের হকের সাথে সাথে আমাদের হকটাও খাইয়া ফেলিতেছেন, আপনাদের লোকে কি বলিবে? আমরা শুধু নিজেদের হকটাই চাই। আপনাদের হকটা আত্মসাৎ করিতে চাই না। আমাদের দিবার আওকাৎ থাকিলে বরঞ্চ পরকে কিছু দিয়াও দেই। দৃষ্টান্ত চান? শুনুন তবে :

১. প্রথম গণপরিষদে আমাদের মেম্বর সংখ্যা ছিল ৪৪; আর আপনাদের ছিল ২৮। আমরা ইচ্ছা করিলে গণতান্ত্রিক শক্তিতে ভোটের জোরে রাজধানী ও দেশরক্ষার সদর দফতর পূর্ব পাকিস্তানে আনিতে পারিতাম। তা করি নাই।

২. পশ্চিম পাকিস্তানিদের সংখ্যাল্পতা দেখিয়া ভাই-এর দরদ লইয়া আমাদের ৪৪টা আসনের মধ্যে ৬টাতে পূর্ব পাকিস্তানির ভোটে পশ্চিম পাকিস্তানি মেম্বর নির্বাচন করিয়াছিলাম।

৩. ইচ্ছা করিলে ভোটের জোরে শুধু বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করিতে পারিতাম। তা না করিয়া বাংলার সাথে উর্দুকেও রাষ্ট্রভাষার দাবি করিয়াছিলাম।

৪. ইচ্ছা করিলে ভোটের জোরে পূর্ব পাকিস্তানের সুবিধাজনক শাসনতন্ত্র রচনা করিতে পারিতাম।

৫. আপনাদের মন হইতে মেজরিটি ভয় দূর করিয়া সে স্থলে ভ্রাতৃত্ব ও সমতাবোধ সৃষ্টির জন্য উভয় অঞ্চলে সকল বিষয়ে সমতা বিধানের আশ্বাসে আমরা সংখ্যাগুরুত্ব ত্যাগ করিয়া সংখ্যা-সাম্য গ্রহণ করিয়াছিলাম।

চার. সুতরাং পশ্চিম পাকিস্তানি ভাই সাহেবান, আপনারা দেখিতেছেন, যেখানে-যেখানে আমাদের দান করিবার আওকাৎ ছিল, আমরা দান করিয়াছি। আর কিছুই নাই দান করিবার। থাকিলে নিশ্চয় দিতাম। যদি পূর্ব পাকিস্তানে রাজধানী হইত তবে আপনাদের দাবি করিবার আগেই আমরা পশ্চিম পাকিস্তানে সত্যসত্যই দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপন করিতাম। দ্বিতীয় রাজধানীর নামে ধোঁকা দিতাম না। সে অবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের সকল প্রকার ব্যয় যাতে উভয় অঞ্চলে সমান হয়, তার নিখুঁত ব্যবস্থা করিতাম। সকল ব্যাপারে পশ্চিম পাকিস্তানকে সামগ্রিকভাবে এবং প্রদেশসমূহকে পৃথক পৃথকভাবে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দিতাম। আমরা দেখাইতাম, পূর্ব পাকিস্তানিরা মেজরিটি বলিয়াই পাকিস্তান শুধু পূর্ব পাকিস্তানিদের নয়, ছোট-বড় নির্বিশেষে তা সকল পাকিস্তানির। পূর্ব পাকিস্তানে রাজধানী হইলে তার সুযোগ লইয়া আমরা পূর্ব পাকিস্তানিরা সব অধিকার ও চাকুরি গ্রাস করিতাম না। পশ্চিম পাকিস্তানের শাসনভার পশ্চিম পাকিস্তানিদের হাতেই দিতাম। আপনাদের কটন বোর্ডে আমরা চেয়ারম্যান হইতে যাইতাম না। আপনাদের প্রদেশের আমরা গভর্নর হইতেও চাহিতাম না। আপনাদের পিআইডিসি, আপনাদের ওয়াপদা, আপনাদের ডিআইটি, আপনাদের পোর্ট ট্রাস্ট, আপনাদের রেলওয়ে ইত্যাদির চেয়ারম্যানি আমরা দখল করিতাম না। আপনাদেরই করিতে দিতাম। সমস্ত অল পাকিস্তানি প্রতিষ্ঠানকে পূর্ব পাকিস্তানে কেন্দ্রীভূত করিতাম না। ফলতঃ পূর্ব পাকিস্তানকে অর্থনীতিতে মোটা ও পশ্চিম পাকিস্তানকে সরু করিতাম না। দুই অঞ্চলের মধ্যে এই মারাত্মক ডিসপ্যারিটি সৃষ্টি হইতে দিতাম না।

এমনি উদারতা, এমন নিরপেক্ষতা, পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের মধ্যে এমন ইনসাফ-বোধই পাকিস্তানি দেশপ্রেমের বুনিয়াদ। এটা যার মধ্যে আছে কেবল তিনিই দেশপ্রেমিক। যে নেতার মধ্যে এই প্রেম আছে, কেবল তিনিই পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলের ওপর নেতৃত্বের যোগ্য। যে নেতা বিশ্বাস করেন, দুইটি অঞ্চল আসলে পাকিস্তান রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় দেহের দুই চোখ, দুই কান, দুই নাসিকা, দুই পাটি দাঁত, দুই হাত, দুই পা; যে নেতা বিশ্বাস করেন পাকিস্তানকে শক্তিশালী করিতে হইলে এই সব জোড়ার দুইটিকেই সমান সুস্থ ও শক্তিশালী করিতে হইবে; যে নেতা বিশ্বাস করেন পাকিস্তানের এক অঙ্গ দুর্বল হইলে গোটা পাকিস্তানই দুর্বল হইয়া পড়ে; যে নেতা বিশ্বাস করেন ইচ্ছা করিয়া বা জানিয়া-শুনিয়া যারা পাকিস্তানের এক অঙ্গকে দুর্বল করিতে চায়

তারা পাকিস্তানের দুশমন; যে নেতা দৃঢ় ও সবল হস্তে সেই দুশমনদের শায়েস্তা করিতে প্রস্তুত আছেন, কেবল তিনিই পাকিস্তানের জাতীয় নেতা হইবার অধিকারী। কেবল তাঁরই নেতৃত্বে পাকিস্তানের ঐক্য অটুট ও শক্তি অপরাজেয় হইবে। পাকিস্তানের মত বিশাল ও অসাধারণ রাষ্ট্রের নায়ক হইতে হইলে নায়কের অন্তরও হইতে হইবে বিশাল ও অসাধারণ। আশা করি, আমার পশ্চিম পাকিস্তানি ভাইরা এই মাপকাঠিতে আমার ৬ দফা কর্মসূচির বিচার করিবেন। তা যদি তাঁরা করেন তবে দেখিতে পাইবেন, আমার এই ৬ দফা শুধু পূর্ব পাকিস্তানের বাঁচার দাবি নয়, গোটা পাকিস্তানেরই বাঁচার দাবি।

আমার প্রিয় ভাই-বোনেরা, আপনারা দেখিতেছেন যে, আমার ৬ দফা দাবিতে একটিও অন্যায়, অসঙ্গত, পশ্চিম পাকিস্তান-বিরোধী বা পাকিস্তান ধ্বংসকারী প্রস্তাব করি নাই। বরঞ্চ আমি যুক্তিতর্কসহকারে দেখাইলাম, আমার সুপারিশ গ্রহণ করিলে পাকিস্তান আরো অনেক বেশি শক্তিশালী হইবে। তথাপি কায়েমী স্বার্থের মুখপাত্ররা আমার বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার এলজাম লাগাইতেছেন। এটা নূতনও নয়, বিস্ময়ের কথাও নয়। পূর্ব পাকিস্তানের মজলুম জনগণের পক্ষে কথা বলিতে গিয়া আমার বাপ-দাদার মতো মুরুব্বিরাই এদের কাছে গাল খাইয়াছেন, এদের হাতে লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছেন, আর আমি কোন ছার? দেশবাসীর মনে আছে, আমাদের নয়নমণি শেরেবাংলা ফজলুল হককে এরা দেশদ্রোহী বলিয়াছিলেন। দেশবাসী এও দেখিয়াছেন যে, পাকিস্তানের অন্যতম স্রষ্টা, পাকিস্তানের সর্বজনমান্য জাতীয় নেতা শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীকেও দেশদ্রোহিতার অভিযোগে কারাবরণ করিতে হইয়াছিল এদেরই হাতে। অতএব দেখা গেল পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায্য দাবির কথা বলিতে গেলে দেশদ্রোহিতার বদনাম ও জেল-জুলুমের ঝুঁকি লইয়াই সে কাজ করিতে হইবে। অতীতে এমন অনেক জেল-জুলুম ভুগিবার তকদির আমার হইয়াছে। মুরুব্বিদের দোয়ায়, সহকর্মীদের সহৃদয়তায় এবং দেশবাসীর সমর্থনে সেসব সহ্য করিবার মতো মনের বল আল্লাহ আমাকে দান করিয়াছেন। সাড়ে পাঁচ কোটি পূর্ব পাকিস্তানির ভালোবাসাকে সম্বল করিয়া আমি এ কাজে যে কোনও ত্যাগের জন্য প্রস্তুত আছি। আমার দেশবাসীর কল্যাণের কাছে আমার মতো নগণ্য ব্যক্তির জীবনের মূল্যইবা কতটুকু? মজলুম দেশবাসীর বাঁচার দাবির জন্য সংগ্রাম করিবার চেয়ে মহৎ কাজ আর কিছুই আছে বলিয়া আমি মনে করি না। মরহুম জনাব শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর ন্যায় যোগ্য নেতার কাছেই আমি এ জ্ঞান লাভ করিয়াছি। তাঁর পায়ের তলে বসিয়াই এতকাল দেশবাসীর খেদমত করিবার চেষ্টা করিয়াছি। তিনিও আজ বাঁচিয়া নাই, আমিও আজ যৌবনের কোটা বহু পিছনে ফেলিয়া প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছিয়াছি। আমার দেশের প্রিয় ভাই-বোনেরা আল্লাহর দরগায় শুধু এই দোয়া করিবেন, বাকি জীবনটুকু আমি যেন তাঁদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি-সাধনায় নিয়োজিত করিতে পারি।

৪ঠা চৈত্র, ১৩৭২

আপনাদের স্নেহধন্য খাদেম
শেখ মুজিবুর রহমান

পরিশিষ্ট–ঘ

সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ১১ দফা

স্বৈরাচারী সরকারের দীর্ঘদিনের অনুসৃত জনস্বার্থবিরোধী নীতির ফলেই ছাত্র সমাজ ও দেশবাসীর জীবনে সংকট ক্রমশ বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। শাসনে-শোষণে অতিষ্ঠ হইয়া ছাত্র-জনতা ছাত্র-গণআন্দোলনের পথে আগাইয়া আসিয়াছেন।

আমরা ছাত্র সমাজ ও দেশবাসীর স্বার্থে নিম্নোক্ত ১১ দফার দাবিতে ব্যাপক ছাত্র-গণআন্দোলনের আহ্বান জানাইতেছি :

১.

ক. সচ্ছল কলেজসমূহকে প্রাদেশিকীকরণের নীতি পরিত্যাগ করিতে হইবে এবং জগন্নাথ কলেজসহ প্রাদেশিকীকরণকৃত কলেজসমূহকে পূর্বাবস্থায় ফিরাইয়া দিতে হইবে।

খ. শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের জন্য প্রদেশের সর্বত্র বিশেষ করিয়া গ্রামাঞ্চলে স্কুল-কলেজ স্থাপন করিতে হইবে এবং বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত স্কুল-কলেজসমূহকে সত্বর অনুমোদন দিতে হইবে। কারিগরি শিক্ষা প্রসারের জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, পলিটেকনিক, টেকনিক্যাল ও কমার্শিয়াল ইনস্টিটিউট স্থাপন করিতে হইবে।

গ. প্রদেশের কলেজসমূহে দ্বিতীয় শিফটে নৈশ আইএ, আইএসসি, আইকম ও বিএ, বিএসসি, বিকম এবং প্রতিষ্ঠিত কলেজসমূহে নৈশ্য এমএ ও এমকম ক্লাস চালু করিতে হইবে।

ঘ. ছাত্র বেতন শতকরা ৫০ ভাগ হ্রাস করিতে হইবে। স্কলারশিপ ও স্টাইপেন্ডের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হইবে এবং ছাত্র আন্দোলনে অংশগ্রহণ করিবার অপরাধে স্কলারশিপ ও স্টাইপেন্ড কাড়িয়া লওয়া চলিবে না।

ঙ. হল, হোস্টেলের ডাইনিং হল, ও ক্যান্টিন খরচার শতকরা ৫০ ভাগ সরকার কর্তৃক 'সাবসিডি' হিসাবে প্রদান করিতে হইবে।

চ. হল ও হোস্টেল সমস্যার সমাধান করিতে হইবে।

ছ. মাতৃভাষার মাধ্যমে সর্বস্তরে শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। অফিস-আদালতে বাংলা ভাষা চালু করিতে হইবে। সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পর্যাপ্ত সংখ্যক অভিজ্ঞ শিক্ষকের ব্যবস্থা করিতে হইবে। শিক্ষকের বেতন বৃদ্ধি করিতে হইবে এবং স্বাধীন মতামত প্রকাশের অধিকার দিতে হইবে।

জ. অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করিতে হইবে। নারী শিক্ষার ব্যাপক প্রসার করিতে হইবে।

ঝ. মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে এবং অটোমেশন প্রথা বিলোপ, নমিনেশনে ভর্তি প্রথা বন্ধ, মেডিকেল কাউন্সিল অর্ডিনেন্স বাতিল, ডেন্টাল কলেজকে পূর্ণাঙ্গ কলেজে পরিণত করা প্রভৃতি মেডিকেল ছাত্রদের দাবি মানিয়া লইতে হইবে। নার্স ছাত্রীদের সকল দাবি মানিয়া লইতে হইবে।

ঞ. প্রকৌশল শিক্ষার অটোমেশন প্রথা বিলোপ, ১০% ও ৭৫% রুল বাতিল, সেন্ট্রাল লাইব্রেরির সুব্যবস্থা, প্রকৌশল ছাত্রদের শেষবর্ষেও ক্লাস দেওয়ার ব্যবস্থাসহ সকল দাবি মানিয়া লইতে হইবে।

ট. পলিটেকনিক ছাত্রদের 'কনডেন্স কোসের' সুযোগ দিতে হইবে এবং বোর্ড ফাইনালে পরীক্ষা বাতিল করিয়া একমাত্র সেমিস্টার পরীক্ষার ভিত্তিতেই ডিপ্লোমা দিতে হইবে।

ঠ. টেক্সটাইল, সিরামিক, লেদার টেকনোলজি এবং আর্ট কলেজ ছাত্রদের সকল দাবি অবিলম্বে মানিয়া লইতে হইবে। আইইআর ছাত্রদের দশ-দফা, সমাজকল্যাণ কলেজ ছাত্রদের, এমবিএ, ছাত্রদের ও আইনের ছাত্রদের সমস্ত দাবি মানিয়া লইতে হইবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে বাণিজ্য বিভাগকে আলাদা 'ফ্যাকাল্টি' করিতে হইবে।

ড. কৃষি বিদ্যালয় ও কলেজ ছাত্রদের ন্যায্য দাবি মানিয়া লইতে হইবে। কৃষি ডিপ্লোমা ছাত্রদের 'কনডেন্স কোর্সের' দাবিসহ কৃষি ছাত্রদের সকল দাবি মানিয়া লইতে হইবে।

ঢ. ট্রেনে, স্টিমারে ও লঞ্চে ছাত্রদের 'আইডেন্টিটি কার্ড' দেখাইয়া শতকরা পঞ্চাশ ভাগ 'কন্সেশনে' টিকিট দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে হইবে। মাসিক টিকিটেও এই 'কন্সেশনে' দিতে হইবে। পশ্চিম পাকিস্তানের মতো বাসে ১০ পয়সা ভাড়ায় শহরের যে কোনো স্থানে যাতায়াতের ব্যবস্থা করিতে হইবে। দূরবর্তী অঞ্চলে বাস যাতায়াতেও শতকরা ৫০ ভাগ 'কন্সেশন' দিতে হইবে। ছাত্রীদের স্কুল-কলেজে যাতায়াতের জন্য পর্যাপ্ত বাসের ব্যবস্থা করিতে হইবে। সরকারি ও আধা-সরকারি উদ্যোগে আয়োজিত খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ছাত্রদের শতকরা ৫০ ভাগ 'কন্সেশন' দিতে হইবে।

ণ. চাকুরির নিশ্চয়তা বিধান করিতে হইবে।

ত. কুখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স সম্পূর্ণ বাতিল করিতে হইবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দিতে হইবে।

থ. শাসকগোষ্ঠীর শিক্ষা সংকোচন নীতির প্রামাণ্য দলিল জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট ও হামুদুর রহমান কমিশন রিপোর্ট সম্পূর্ণ বাতিল করিতে এবং ছাত্র-সমাজ ও দেশবাসীর স্বার্থে গণমুখী ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ব্যবস্থা কায়েম করিতে হইবে।

২. প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। বাক-স্বাধীনতা, ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দিতে হইবে। দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করিতে হইবে।

৩. নিম্নলিখিত দাবিসমূহ মানিয়া লইবার ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দিতে হইবে :

ক. দেশের শাসনতান্ত্রিক কাঠামো হইবে ফেডারেশন শাসনতান্ত্রিক রাষ্ট্র সংঘ এবং আইন পরিষদের ক্ষমতা হইবে সার্বভৌম।

খ. ফেডারেল সরকারের ক্ষমতা দেশরক্ষা, বৈদেশিক নীতি ও মুদ্রা— এই কয়টি বিষয়ে সীমাবদ্ধ থাকিবে। অপরাপর সকল বিষয়ে অঙ্গ রাষ্ট্রগুলির ক্ষমতা হইবে নিরঙ্কুশ।

গ. দুই অঞ্চলের জন্য একই মুদ্রা থাকিবে। এই ব্যবস্থায় মুদ্রা কেন্দ্রের হাতে থাকিবে। কিন্তু এই অবস্থায় শাসনতন্ত্রে এমন সুনির্দিষ্ট বিধান থাকিতে হইব যে, যাহাতে পূর্ব পাকিস্তানের মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হইতে না পারে। এই বিধানে পাকিস্তানে একটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থাকিবে। দুই অঞ্চলে দুইটি পৃথক রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থাকিবে এবং পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পৃথক অর্থনীতি প্রবর্তন করিতে হইবে।

ঘ. সকল প্রকার ট্যাক্স, খাজনা, কর ধার্য ও আদায়ের সকল ক্ষমতা থাকিবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে। ফেডারেল সরকারের কোনো কর ধার্য করিবার ক্ষমতা থাকিবে না। আঞ্চলিক সরকারের আদায়ী রেভিনিউর নির্ধারিত অংশ আদায়ের সঙ্গে সঙ্গে ফেডারেল তহবিলে জমা হইবে। এ মর্মে রিজার্ভ ব্যাঙ্কসমূহের ওপর বাধ্যতামূলক বিধান শাসনতন্ত্রে থাকিবে।

ঙ. ফেডারেশনের প্রতিটি রাষ্ট্র বহিঃবাণিজ্যের পৃথক হিসাব রক্ষা করিবে এবং বহিঃবাণিজ্যের মাধ্যমে অর্জিত মুদ্রা অঙ্গ রাষ্ট্রগুলির এক্তিয়ারাধীন থাকিবে। ফেডারেল সরকারের প্রয়োজনীয় বিদেশী মুদ্রা অঙ্গ রাষ্ট্রগুলি সমানভাবে অথবা শাসনতন্ত্রের নির্ধারিত ধারা অনুযায়ী প্রদান করিবে। দেশজাত দ্রব্যাদি বিনা শুল্কে অঙ্গ রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে আমদানি-রপ্তানি চলিবে এবং ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে বিদেশী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে চুক্তি সম্পাদনের, বিদেশে ট্রেড মিশন স্থাপনের এবং আমদানি-রপ্তানি করিবার অধিকার অঙ্গ রাষ্ট্রগুলির হাতে ন্যস্ত করিয়া শাসনতন্ত্রে বিধান করিতে হইবে।

চ. পূর্ব পাকিস্তানকে মিলিশিয়া বা প্যারা মিলিটারি রক্ষী বাহিনী গঠনের ক্ষমতা দিতে হইবে। পূর্ব পাকিস্তানে অস্ত্র কারখানা নির্মাণ ও নৌ-বাহিনীর সদর দফতর স্থাপন করিতে হইবে।

৪. পশ্চিম পাকিস্তানের বেলুচিস্তান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধুসহ সকল প্রদেশের স্বায়ত্তশাসন প্রদান করতঃ সাব-ফেডারেশন গঠন।

৫. ব্যাঙ্ক-বীমা, পাট ব্যবসা ও বৃহৎ শিল্প জাতীয়করণ করিতে হইবে।

৬. কৃষকের উপর হইতে খাজনা ও ট্যাক্সের হার হ্রাস করিতে হইবে এবং বকেয়া খাজনা ও ঋণ মওকুফ করিতে হইবে। সার্টিফিকেট প্রথা বাতিল ও তহ্‌শিলদারদের অত্যাচার বন্ধ করিতে হইবে। পাটের সর্বনিম্ন মূল্য মণপ্রতি ৪০ টাকা নির্ধারণ এবং আখের ন্যায্য মূল্য দিতে হইবে।

৭. শ্রমিকের ন্যায্য মজুরি বোনাস দিতে হইবে এবং শিক্ষা, বাসস্থান, চিকিৎসা ইত্যাদির ব্যবস্থা করিতে হইবে। শ্রমিক স্বার্থবিরোধী কালাকানুন প্রত্যাহার করিতে হইবে এবং ধর্মঘটের অধিকার ও ট্রেড ইউনিয়ন করিবার অধিকার প্রদান করিতে হইবে।

৮. পূর্ব পাকিস্তানের বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও জল সম্পদের সার্বিক ব্যবহারের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৯. জরুরি আইন প্রত্যাহার, নিরাপত্তা আইন ও অন্যান্য নিবর্তনমূলক আইন প্রত্যাহার করিতে হইবে।

১০. সিয়াটো, সেন্টো, পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি বাতিল করিয়া জোট বহির্ভূত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি কায়েম করিতে হইবে।

১১. দেশের বিভিন্ন কারাগারে আটক সকল ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, রাজনৈতিক কর্মী ও নেতৃবৃন্দের অবিলম্বে মুক্তি, গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ও হুলিয়া প্রত্যাহার এবং আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাসহ সকল রাজনৈতিক কারণে জারিকৃত মামলা প্রত্যাহার করিতে হইবে।

সূত্র : বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ, বঙ্গবন্ধুর নির্বাচিত বক্তৃতা ও বিবৃতি : রামেন্দু মজুমদার সম্পাদিত

পরিশিষ্ট–৬

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় আত্মপক্ষ সমর্থনে শেখ মুজিবের জবানবন্দি

স্বাধীনতা-পূর্ব ভারতীয় ও বঙ্গীয় মুসলিম লীগের একজন সক্রিয় সদস্য হিসাবে আমার বিদ্যালয় জীবনের সূচনা হইতেই আমি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য নিরলসভাবে সংগ্রাম করিয়াছি। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার এ সংগ্রামে আমাকে আমার লেখাপড়া পর্যন্ত বিসর্জন দিতে হইয়াছে।

স্বাধীনতালাভের পর মুসলিম লীগ পাকিস্তানের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে, এর ফলে ১৯৪৯ সালে আমরা মরহুম জনাব হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ গঠন করি। আওয়ামী লীগ পূর্বেও ছিল এবং এখনও সেইরূপ একটি নিয়মতান্ত্রিকতার পথানুসারী গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিদ্যমান।

১৯৫৪ সালে আমি প্রথমে প্রাদেশিক পরিষদে এবং পরে জাতীয় বিধান সভায় সদস্য নির্বাচিত হই। আমি দুইবার পূর্ব পাকিস্তান সরকারের মন্ত্রিত্ব লাভ করি। অধিকন্তু আমি গণচীনে প্রেরিত বিধান পরিষদের এক প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব করি। জনসাধারণের কল্যাণার্থে একটি নিয়মতান্ত্রিক বিরোধী দল গঠন করিবার জন্য আমাকে ইতিমধ্যে কয়েক বৎসর কারা নির্যাতন ভোগ করিতে হইয়াছিল।

সামরিক শাসন প্রবর্তনের পর হইতেই বর্তমান সরকার আমার ওপর নির্যাতন চালাইতে থাকে। ১৯৫৮ সালে ১২ অক্টোবর তাহারা পূর্ব পাকিস্তান জননিরাপত্তা অর্ডিন্যান্সে আমাকে গ্রেফতার করে এবং প্রায় দেড় বৎসরকাল বিনা বিচারে আটক রাখে। আমাকে এইভাবে আটক রাখাকালে তাহারা আমার বিরুদ্ধে ছয়টি ফৌজদারি মামলা দায়ের করে, কিন্তু আমি ওই সকল অভিযোগ হইতে সসম্মানে অব্যাহতি লাভ করি। ১৯৫৯-এর ডিসেম্বর কিংবা ১৯৬০-এর জানুয়ারিতে আমার উক্ত আটকাবস্থা হইতে মুক্তি দেওয়া হয়।

মুক্তিলাভকালে আমার উপর কিছু কিছু বিধি-নিষেধ জারি করা হয়—যেমন : ঢাকা ত্যাগ করিলে আমাকে গন্তব্যস্থল সম্বন্ধে লিখিতভাবে স্পেশাল ব্রাঞ্চকে জানাইতে হইবে এবং প্রত্যাবর্তনের পরেও একইভাবে সে বিষয় তাহাদিগকে অবগত করাইতে হইবে। গোয়েন্দা বিভাগের লোকেরা এই সময় সর্বদা ছায়ার মতো আমার পিছু লাগিয়া থাকিত।

অতঃপর ১৯৬২ সালে বর্তমান শাসনতন্ত্র জারির প্রাক্কালে যখন আমার নেতা মরহুম শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীকে গ্রেফতার করা হয় তখন আমাকেও জননিরাপত্তা অর্ডিন্যান্স বলে কারান্তরালে নিক্ষেপ করা হয় এবং প্রায় ছয় মাস বিনা বিচারে আটক রাখা হয়। জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীর মৃত্যুর পর ১৯৬৪ সালে দেশের উভয় অংশে আওয়ামী লীগকে একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে পুনর্জীবিত করা হয় এবং আমরা সম্মিলিত বিরোধী দলের অঙ্গদল হিসাবে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। সম্মিলিত বিরোধী দল এই সময় প্রেসিডেন্ট পদে জনাব আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য মোহ্‌তারেমা ফাতেমা জিন্নাহ্‌কে মনোয়ন দান করে। আমরা নির্বাচনী অভিযান শুরু করি। সরকারি কর্তৃপক্ষও পুনরায় আমার বক্তৃতা সম্পর্কে কয়েকটি মামলা দায়ের করিয়া আমাকে মিথ্যা বিরক্ত ও লাঞ্ছিত করিতে থাকে।

১৯৬৫ সালে ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ চলাকালে যে সকল রাজনীতিবিদ ভারতীয় আক্রমণের তীব্র নিন্দা করেন আমি তাহাদের অন্যতম। সরকারের যুদ্ধ প্রচেষ্টাকে পূর্ণভাবে সমর্থন করিবার জন্য আমি আমার দল ও জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানাই।

যুদ্ধ প্রচেষ্টার সম্ভাব্য সকল প্রকার সাহায্য প্রদান করিবার জন্যও আমার দল পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ইহার সকল অঙ্গের নিকট নির্দেশ প্রেরণ করে।

যুদ্ধ চলাকালে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নরের বাসভবনে অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় সম্মেলনে আমি প্রদেশের অন্যান্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে এক যুক্ত বিবৃতিতে ভারতীয় আক্রমণের প্রতি নিন্দা জ্ঞাপন করি এবং দেশের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রাম ও সাহায্য করিবার জন্য জনসাধারণের প্রতি আবেদন জানাই। যুদ্ধাবসানে প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের প্রদেশ ভ্রমণকালে আমি ও অন্যান্য রাজনীতিবিদগণ আমন্ত্রিত হইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করি। সেই সময় আমি পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান ও যুদ্ধকালে আমাদের অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রদেশকে সামরিক প্রতিরক্ষার ব্যাপারে স্বয়ংসম্পূর্ণ করিয়া তুলিবার জন্য প্রেসিডেন্টের নিকট আবেদন জানাই। কারণ যুদ্ধকালে পূর্ব পাকিস্তান দেশের অন্য অংশসহ বিশ্ব হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল।

আমি তাসখন্দ ঘোষণাকেও সমর্থন করিয়াছিলাম। কারণ আমি এবং আমার প্রতিষ্ঠান অগ্রগতির জন্য বিশ্ব শান্তিতে আস্থাবান— আমরা বিশ্বাস করি যে, সকল আন্তর্জাতিক বিরোধ শান্তিপূর্ণ উপায়ে মীমাংসা হওয়া উচিত।

১৯৬৬ সালের গোড়ার দিকে লাহোরে অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় জাতীয় সম্মিলনীর বিষয় নির্বাচনী কমিটির নিকট আমি পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সমস্যাবলির নিয়মতান্ত্রিক সমাধান— ছয় দফা কর্মসূচি উপস্থাপন করি। ছয় দফা কর্মসূচিতে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান— উভয় অংশের জন্যই পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি করা হইয়াছে।

অতঃপর আমার প্রতিষ্ঠান পূর্ব পাকিস্তান, আওয়ামী লীগ ছয় দফা কর্মসূচি গ্রহণ করে এবং দেশের উভয় অংশের মধ্যকার অর্থনৈতিক ও অন্যান্য বৈষম্য দূরীকরণের অনুকূলে জনমত যাচাই ও গঠনের জন্য ছয় দফার পক্ষে জনসভা অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়।

ইহাতে প্রেসিডেন্টসহ অন্যান্য সরকারি নেতৃবৃন্দ ও সরকারি প্রশাসন যন্ত্র আমাকে 'অস্ত্রের ভাষায়' 'গৃহ যুদ্ধ' ইত্যাদি হুমকি প্রদান করে এবং একযোগে এক ডজনেরও অধিক মামলা দায়ের করিয়া আমাকে হয়রানি করিতে শুরু করে। ১৯৬৬ সালের এপ্রিলে আমি যখন খুলনায় একটি জনসভা করিয়া যশোর হইয়া ঢাকা ফিরিতেছিলাম তখন তাহারা যশোরে আমার পথরোধ করে এবং আপত্তিকর বক্তৃতা প্রদানের অভিযোগে ঢাকা হইতে প্রেরিত এক গ্রেফতারী পরোয়ানা বলে এইবারের মতো প্রথম গ্রেফতার করে।

আমাকে যশোরের মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত করা হইলে তিনি আমাকে অন্তর্বর্তীকালীন জামিন প্রদান করেন। আমি ঢাকার সদর দক্ষিণ মহকুমা প্রশাসকের সম্মুখে উপস্থিত হইলে তিনি আমার জামিনে অসম্মত হন কিন্তু মাননীয় দায়রা জজ প্রদত্ত জামিন বলে আমি সেই দিনই মুক্তি পাই এবং সন্ধ্যা সাতটায় নিজগৃহে গমন করি। সেই সন্ধ্যায়ই, আটটায়, পুলিশ পুনরায় আপত্তিকর বলিয়া কথিত এক বক্তৃতার উপর সিলেট হইতে প্রেরিত এক গ্রেফতারি পরোয়ানা বলে আমার বাসগৃহ হইতে আমাকে গ্রেফতার করে। পুলিশ সেই রাত্রেই আমাকে সিলেট লইয়া যায়। পরদিন প্রাতে আমাকে আদালতে উপস্থিত করা হইলে সিলেটের মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট আমার জামিনের আবেদন বাতিল করিয়া আমাকে কারাগারে প্রেরণ করেন। পরদিবস সিলেটের মাননীয় দায়রা জজ আমার জামিন প্রদান করেন কিন্তু মুক্ত হইবার পূর্বেই পুলিশ পুনরায় আপত্তিকর বলিয়া কথিত এক বক্তৃতা প্রদানের অভিযোগে আমাকে কারা দরজায়ই গ্রেফতার করে। এবারের গ্রেফতারি পরোয়ানা মোমেনশাহী হইতে প্রেরিত হইয়াছিল। সেইরাত্রে আমাকে পুলিশ পাহারাধীন মোমেনশাহী লইয়া যাওয়া হয় এবং একইভাবে মোমেনশাহীর মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট আমার জামিন প্রদানে অস্বীকৃত হন এবং পরে মাননীয় দায়রা জজ প্রদত্ত জামিনে মুক্তিলাভ করিয়া ঢাকা প্রত্যাবর্তন করি। উপরিউক্ত সকল ধারাবাহিক গ্রেফতারি প্রহসন ও হয়রানি ১৯৬৬ সালের এপ্রিলে সংঘটিত হয়।

১৯৬৬ সালের মে মাসের প্রথম সপ্তাহে— সম্ভবত ৮ মে, আমি নারায়ণগঞ্জে এক জনসভায় বক্তৃতা প্রদান করি এবং রাত্রে ঢাকায় নিজগৃহে প্রত্যাবর্তন করি। রাত একটার সময় পুলিশ 'ডিফেন্স অব পাকিস্তান রুল'-এর ৩২ ধারায় আমাকে গ্রেফতার করে। একই সঙ্গে আমার প্রতিষ্ঠানের বহুসংখ্যক নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করা হয়। ইহাদের মধ্যে ছিলেন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজউদ্দীন আহমেদ, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি খোন্দকার মুশতাক আহমেদ, প্রাক্তন সহ-সভাপতি জনাব মুজিবর রহমান, চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগ সম্পাদক জনাব আজিজ, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের প্রাক্তন কোষাধ্যক্ষ জনাব নূরুল ইসলাম চৌধুরী, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের শ্রম সম্পাদক জনাব জহুর আহাম্মদ চৌধুরীসহ অন্যান্য। ইহার অল্প কয়েকদিন পরে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী এমএনএ, প্রচার সম্পাদক জনাব মোমেন এডভোকেট, সমাজকল্যাণ সম্পাদক জনাব ওবায়দুর রহমান, ঢাকা জেলা আওয়ামী

লীগ সভাপতি জনাব শামসুল হক, ঢাকা শহর আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব হাফিজ মোহাম্মদ মূসা, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য মোল্লা জালালউদ্দিন আহম্মদ এডভোকেট, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সহ-সভাপতি ও প্রাক্তন মন্ত্রী ক্যাপটেন মনসুর আলী, প্রাক্তন এমএনএ জনাব আমজাদ হোসেন, এডভোকেট জনাব আমিনুদ্দিন আহম্মদ, পাবনার এডভোকেট জনাব আমজাদ হোসেন, নারায়ণগঞ্জ আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব মোস্তফা সারওয়ার, নারায়ণগঞ্জ আওয়ামী লীগ সম্পাদক জনাব মহীউদ্দিন আহম্মদ, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ কার্যালয় সম্পাদক জনাব মোহাম্মদুল্লাহ এডভোকেট ও সংগ্রামী নেতা শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন, ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগ সহ-সভাপতি জনাব হারুনুর রশীদ, তেজগাঁও ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব শাহাবুদ্দীন চৌধুরী, ঢাকা সদর উত্তর আওয়ামী লীগ সম্পাদক জনাব আবদুল হাকিম, ধানমন্ডি আওয়ামী লীগ সহ-সভাপতি জনাব রশীদ মোশারফ, শহর আওয়ামী লীগ কার্যালয় সম্পাদক জনাব সুলতান আহাম্মদ, অন্যতম আওয়ামী লীগ কর্মী জনাব নুরুল ইসলাম, চট্টগ্রাম শহর আওয়ামী লীগ অস্থায়ী সম্পাদক জনাব আবদুল মান্নান, পাবনার এডভোকেট জনাব হাসনাইন, মোমেনশাহীর অন্যতম আওয়ামী লীগ কর্মী জনাব আব্দুর রহমান সিদ্দিকীসহ অন্যান্য বহু আওয়ামী লীগ কর্মী, ছাত্রনেতা ও শ্রমিক নেতাকে পাকিস্তান রক্ষার বিধি ৩২ ধারা (নিষ্ঠুর অত্যাচার) বলে কারান্তরালে নিক্ষেপ করা হয়। আমার দুই ভ্রাতুষ্পুত্র—পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক শেখ ফজলুল হক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শেখ শহীদুল ইসলামকেও কারারুদ্ধ করা হয়। অধিকন্তু পূর্ব পাকিস্তানের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় বাংলা দৈনিক ইত্তেফাককেও বর্তমান শাসকগোষ্ঠী নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ইহার একমাত্র কারণ হইল যে, ইত্তেফাক মাঝে মাঝে আমার প্রতিষ্ঠানের নীতিসমূহ সমর্থন করিত। সরকার ইহার ছাপাখানা বাজেয়াফত করে এবং ইহার আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সম্পাদক জনাব তোফাজ্জল হোসেন ওরফে মানিক মিয়াকে দীর্ঘকালের জন্য কারারুদ্ধ রাখিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি ফৌজদারি মামলা দায়ের করে। যুগপৎ চট্টগ্রাম মুসলিম চেম্বার্স অব কমার্সের প্রাক্তন সভাপতি চট্টগ্রাম পোর্ট ট্রাস্টের প্রাক্তন সহ-সভাপতি ও অন্যতম আওয়ামী লীগ নেতা জনাব ইদ্রিসকেও পাকিস্তান রক্ষা বিধি বলে অন্ধ কারাকক্ষে নিক্ষেপ করা হয়। আমাদের গ্রেফতারের প্রতিবাদে আমার প্রতিষ্ঠান ১৯৬৬ সালের ৭ জুন সাধারণ ধর্মঘট আহ্বান করে। প্রদেশব্যাপী এই হরতালের দিন পুলিশের গুলিতে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে ১১ ব্যক্তি নিহত হয়। পুলিশ প্রায় ৮০০ লোক গ্রেফতার করে এবং অসংখ্য লোকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর জনাব মোনেম খান প্রায়শই তাঁহার লোকজন এবং সরকারি কর্মচারীর সম্মুক্ষে উন্মুক্তভাবে বলিয়া থাকেন যে, যতদিন তিনি গদিতে আসীন থাকিবেন ততদিন শেখ মুজিবকে শৃঙ্খলিত থাকিতে হইবে। ইহা অনেকেই অবগত আছেন। আটকাবস্থায় কারাকক্ষেই আমাকে বেশ কয়েকবার বিচারালয়ের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। প্রায় ২১ মাস আটক রাখিবার পর ১৯৬৮ সালের ১৭/১৮ তারিখ রাত একটার সময় আমাকে তথাকথিত মুক্তি দেওয়া হয় এবং কেন্দ্রীয় কারাগারের ফটক হইতে কতিপয় সামরিক ব্যক্তি দৈহিক বল প্রয়োগ

করিয়া আমাকে ঢাকা সেনানিবাসে লইয়া আসে এবং একটি রুদ্ধ কক্ষে আটক রাখে। আমাকে বহির্জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া নির্জনে রাখা হয় এবং কাহারও সহিত সাক্ষাৎ নিষিদ্ধ করা হয়। আমাকে খবরের কাগজ পর্যন্ত পড়িতে দেওয়া হইত না, বিশ্ব হইতে সকল যোগাযোগবিহীন অবস্থায় এইভাবে আমাকে দীর্ঘ পাঁচ মাসকাল আটক থাকিতে হয়। এই সময় আমাকে অমানুষিক নির্যাতন সহ্য করিতে হয় এবং আমাকে সকল প্রকার দৈহিক সুযোগ-সুবিধা হইতে বঞ্চিত রাখা হয়। এই মানসিক অত্যাচার সম্বন্ধে যত অল্প প্রকাশ করিতে হয় ততই উত্তম।

এই বিচারকার্য শুরু হইবার মাত্র একদিন পূর্বে, ১৯৬৮ সালের ১৮ জুন, আমি প্রথম এডভোকেট জনাব আবদুস সালাম খানের সহিত সাক্ষাৎ করি এবং তাঁহাকে আমার অন্যতম কৌসুলি নিয়োগ করি।

কেবলমাত্র আমার উপর নির্যাতন চালাইবার জন্য এবং আমার দলকে লাঞ্ছিত, অপমানিত ও আমাদিগকে কুখ্যাত করিবার জঘন্য মনোবৃত্তি লইয়া আমাকে এই তথাকথিত ষড়যন্ত্র মামলায় মিথ্যা জড়িত করা হইয়াছে। ছয় দফার ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবিসহ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, চাকুরির সংখ্যা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সমতার ন্যায়সঙ্গত দাবি আদায়ের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করা ও নিষ্পেষণ করাই ইহার মূল উদ্দেশ্য।

এই আদালতে আসিবার পূর্বে আমি লে. ক. মোয়াজ্জেম হোসেন, লে. মোজাম্মেল হোসেন, এক্স-কর্পোরাল আমির হোসন, এলএস সুলতান উদ্দিন আহাম্মদ, কামালউদ্দিন আহাম্মদ, স্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান, ফ্লাইট সার্জেন্ট মাহফুজ উল্লাহ ও এই মামলায় জড়িত অন্যান্য স্থল, নৌ ও বিমানবাহিনী কর্মচারীদের কখনও দেখি নাই। জনাব আহমদ ফজলুর রহমান, জনাব রুহুল কুদ্দুস ও জনাব খান মোহাম্মদ শামসুর রহমান—এই তিনজন সিএসপি অফিসারদের আমি জানি। আমি মন্ত্রী হিসাবে সরকারি কার্য সম্পাদনকালে তাঁহাদিগকে জানিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম এবং তাঁহারাও তখন পূর্ব পাকিস্তান সরকারের বিভিন্ন দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু আমি তাঁহাদের সঙ্গে কখনো রাজনীতি বিষয়ক আলোচনা করি নাই কিংবা কোনো ষড়যন্ত্রেও ব্যাপৃত হয় নাই। আমি কোনো দিন লে. ক. মোয়াজ্জেম হোসেনের বাসগৃহে অথবা করাচিতে জনাব কামালউদ্দিনের বাসগৃহে গমন করি নাই কিংবা আমার অথবা লে. ক. মোয়াজ্জেম হোসেনের অথবা করাচিতে জনাব কামালউদ্দীনের বাসগৃহে কোনো সভাও অনুষ্ঠিত হয় নাই কিংবা এই তথাকথিত ষড়যন্ত্র সম্পর্কে কোনো ব্যক্তির সহিত কোনো আলোচনা আমার অথবা জনাব তাজউদ্দীনের বাসায় সংঘটিত হয় নাই। ওই সকল ব্যক্তি কোনো দিন আমার গৃহে গমন করে নাই এবং আমিও এই তথাকথিত ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জড়িত কাহাকেও টাকা দিই নাই। আমি কখনও ডা. সাঈদুর রহমান কিংবা মানিক চৌধুরীকে এই তথাকথিত ষড়যন্ত্রে সাহায্য করিতে বলি নাই। তাঁহারা চট্টগ্রামে আমার প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য শত শত সাধারণ কর্মীদের ন্যায় মাত্র। আমার প্রতিষ্ঠানে তিনজন সহ-সভাপতি, ৪৪ জন নির্দেশনা পরিষদ সদস্য, একজন সাধারণ সম্পাদক এবং

আটজন সম্পাদক রহিয়াছেন। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কর্মকর্তাদের অনেকেই প্রাক্তন মন্ত্রী; এমএনএ ও এমপিএ। বর্তমান কেন্দ্রীয় পরিষদের পাঁচজন ও প্রাদেশিক পরিষদের দশজন সদস্য আমার প্রতিষ্ঠানভুক্ত। চট্টগ্রামেও আমার প্রতিষ্ঠানের জেলা ও শহর সভাপতি ও সম্পাদকগণ; প্রাক্তন এমএনএ, এমপিএ ও অনেক বিত্তশালী ও প্রভাবশালী ব্যক্তিগণ বিদ্যমান। আমি তাঁহাদের কাহারও নিকট কোনে প্রকার সাহায্যের কথা উল্লেখ করি নাই। ইহা অসম্ভব যে, আমি একজন সাধারণ ব্যবসায়ী মানিক চৌধুরী ও একজন সাধারণ এলএমএফ ডাক্তার সাঈদুর রহমানকে কোনো সাহায্যের জন্য অনুরোধ করিতে পারি। ১৯৬৫ সালের জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ প্রার্থী জনাব জহুর আহাম্মদ চৌধুরীর বিরোধিতা করিবার জন্য ডা. সাঈদুর রহমানকে বরং আওয়ামী লীগ হইতে বহিষ্কার করা হইয়াছিল। আমি ডা. সাঈদুর রহমানের গৃহে কদাপি গমন করি নাই।

আমি পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি। ইহা একটি নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল—দেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে যাহার একটি সুনির্দিষ্ট, সুসংগঠিত নীতি ও কর্মসূচি রহিয়াছে! আমি অনিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিতে কদাপি আস্থাশীল নই। আমি দেশের উভয় অংশের জন্য ন্যায়বিচার চাহিয়াছিলাম—ছয় দফা কর্মসূচিতে ইহাই বিধৃত হইয়াছে। দেশের জন্য আমি যাহাই মঙ্গলকর ভাবিয়াছি আমি সর্বদাই তাহা নিয়মতান্ত্রিক গণ্ডির ভিতরে জনসমক্ষে প্রকাশ করিয়াছি এবং এই নিমিত্ত আমাকে সর্বদাই শাসকগোষ্ঠী এবং স্বার্থবাদীদের হাতে নিগৃহীত হইতে হইয়াছে। তাহারা আমাকে ও আমার প্রতিষ্ঠানকে দমন করিয়া পাকিস্তানের জনগণের, বিশেষত পূর্ব পাকিস্তানিদের ওপর শোষণ ও নিষ্পেষণ অব্যাহত রাখিতে চায়।

আমার উক্তির সমর্থনে আমি মহামান্য আদালতে আরো নিবেদন করিতে চাই যে, আমাকে প্রতিহিংসাবশত মিথ্যা এই মামলায় জড়িত করা হইয়াছে। পাকিস্তান সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগ কর্তৃক ১৯৬৮ সালের ৬ জানুয়ারি প্রকাশিত এক প্রচারপত্রে অভিযুক্ত বলিয়া কথিত ২৮ ব্যক্তির নাম লিপিবদ্ধ ছিল এবং উহার মধ্যে আমার নাম ছিল না। উক্ত প্রচারপত্রে ইহাও উল্লেখ করা হইয়াছিল যে, সকল অভিযুক্তই অভিযোগ স্বীকার করিয়াছে— তদন্ত প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে— এবং শীঘ্রই বিষয়টি বিচারার্থে আদালতে প্রেরণ করা হইবে।

একজন প্রাক্তন মন্ত্রী হিসাবে অর্জিত অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে আমি স্বরাষ্ট্র বিভাগের উক্ত প্রচারপত্র সম্বন্ধে একথা জানাইতে চাই যে, সংশ্লিষ্ট বিভাগের সেক্রেটারি কর্তৃক ব্যক্তিগতভাবে দলিলপত্র পরীক্ষিত ও অনুমোদিত হওয়া ব্যতিরেকে কোনো বিভাগ হইতে কোনো প্রকার প্রচারপত্র প্রকাশ করা যায় না এবং এবম্বিধ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ক্ষেত্রে কোনো প্রচারপত্র প্রকাশ করিতে হইলে প্রধানমন্ত্রী অথবা প্রেসিডেন্টের অনুমোদন লাভ আবশ্যক।

বর্তমান মামলা উল্লিখিত নিষ্পেষণ ও নির্যাতন নীতির পরিণতি ছাড়া আর কিছুই নহে। অধিকন্তু স্বার্থবাদী মহল কর্তৃক শোষণ অব্যাহত রাখিবার যে ষড়যন্ত্র জাল বর্তমান শাসকগোষ্ঠী বিস্তার করিয়াছে এই মামলা তাহারই বিষময় প্রতিক্রিয়া। আমি কখনও পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিম পাকিস্তান হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য কোনো কিছু করি নাই কিংবা কোনো দিনও এই উদ্দেশ্যে কোনো স্থল, নৌ বা বিমানবাহিনীর কোনো কর্মচারীর সংস্পর্শে কোনো ষড়যন্ত্রমূলক কার্যে আত্মনিয়োগ করি নাই।

আমি নির্দোষ এবং এ ব্যাপারে পরিপূর্ণরূপে অজ্ঞ। তথাকথিত ষড়যন্ত্র সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না।

সূত্র : বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ, বঙ্গবন্ধুর নির্বাচিত বক্তৃতা ও বিবৃতি : রামেন্দু মজুমদার সম্পাদিত

পরিশিষ্ট–চ

শেখ মুজিবুর রহমানের নির্বাচনী আবেদন

আমার প্রিয় দেশবাসী ভাই বোনেরা,

আস্‌সালামু আলাইকুম।

আমার সংগ্রামী অভিনন্দন গ্রহণ করুন।

আগামী ৭ ডিসেম্বর দেশব্যাপী জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে প্রথম সাধারণ নির্বাচনের তারিখ ধার্য করা হয়েছে। জনগণের ত্যাগ ও নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের ফল হচ্ছে এই নির্বাচন। সারাদেশ ও দেশের মানুষকে তীব্র সংকট ও দুর্গতি থেকে চিরদিনের মতো মুক্ত করার সুযোগ এই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে গ্রহণ করা যেতে পারে।

দীর্ঘ তেইশ বছরের অবিরাম আন্দোলনের পথ বেয়ে শত শত দেশপ্রেমিকের আত্মদান, শহীদের তাজা রক্ত আর হাজার হাজার ছাত্র-শ্রমিক ও রাজনৈতিক কর্মীর অশেষ নির্যাতন ভোগ ও ত্যাগের বিনিময়ে বাংলাদেশের জনগণের সামনে আজ এক মহাসুযোগ উপস্থিত। এই নির্বাচনের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, নির্বাচিত হবার পর পরই পরিষদ সদস্যরা বা রাজনৈতিক দলগুলো ক্ষমতার গদিতে বসে পড়তে পারবে না। তাদেরকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দেশের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের কাজ সমাধা করতে হবে। বস্তুত স্বাধীনতার তেইশ বছরের মধ্যে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের মূল দায়িত্ব এবং অধিকার সর্বপ্রথম এবারই জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা লাভ করেছে। তাই এই নির্বাচনের গুরুত্ব অপরিসীম।

আমার দেশবাসী,

আমাদের দীর্ঘদিনের সংগ্রাম, ত্যাগ ও তিতিক্ষার পরও যদি কৃষক-শ্রমিক-মেহনতি মানুষের প্রতিনিধিগণ দেশের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র প্রণয়নের দায়িত্ব থেকে বঞ্চিত হয় তাহলে পাকিস্তান বিশেষ করে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ চিরতরে দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হবে। কেননা সম্পদ লুণ্ঠনকারী ও একনায়কত্ববাদের প্রতিভূরা দেশের কৃষক-শ্রমিক-মেহনতি মানুষের ইচ্ছানুযায়ী শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করার কাজে পদে পদে বাধা দেবে। ভোটাধিকারের নির্ভুল প্রয়োগের মাধ্যমে সেই মহাসুযোগ ও দায়িত্ব যদি আমরা কুচক্রীদের কাছ থেকে ছিনিয়ে আনতে পারি, তাহলে কৃষক-শ্রমিক-সর্বহারা মানুষের দুঃখমোচন এবং বাংলার মুক্তি সনদ ৬ দফা ও ১১ দফা বাস্তবায়িত করা যাবে। একমাত্র এই কারণেই আওয়ামী লীগ আসন্ন নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে যাচ্ছে এবং বাংলাদেশের প্রতিটি আসনে প্রার্থী দাঁড় করিয়েছে।

প্রিয় দেশবাসী,

কারাগার থেকে বেরিয়ে আমরা জনসংখ্যাভিত্তিক প্রতিনিধিত্ব অর্থাৎ এক ব্যক্তি এক ভোটের দাবি তুলেছিলাম; আজ সেটা আদায় হয়েছে। তাই ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র প্রণয়নের ক্ষেত্রে আমরা বিশেষ যোগ্যতা ও সুযোগের অধিকারী। এখন বাংলাদেশ থেকে নির্বাচিত পরিষদ সদস্যরা যদি একই দলের কর্মসূচি ও আদর্শের সমর্থক হন, অর্থাৎ সকল প্রশ্নে তাঁরা ঐকমত্যে থাকতে পারেন তবে আমরা অতীতে চাপিয়ে দেওয়া সকল অবিচার, বৈষম্যমূলক আচরণ, আইন-কানুন এবং বে-ইনসাফী শোষণের পরিসমাপ্তি ঘটাতে পারব। আমাদের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা ও সম্মিলিত দাবির মুখে দেশের অপর অংশের পরিষদ সদস্যগণ বাংলাদেশের মানুষের মুক্তিসনদ ৬ দফা ও ১১ দফা মেনে নিতে বাধ্য থাকবেন। এর কারণ, পরিষদে আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকব। আর যদি আমরা বিভক্ত হয়ে যাই এবং স্বার্থের দ্বন্দ্ব ও মতাদর্শের অনৈক্যের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে আত্মঘাতী সংঘাতে মেতে উঠি তাহলে যাঁরা এদেশের মানুষের ভালো চান না ও এখানকার সম্পদের ওপর ভাগ বসাতে চান তাঁদেরই সুবিধা হবে এবং বাংলাদেশের নির্যাতিত, নিপীড়িত, ভাগ্যহত ও দুঃখী মানুষের মুক্তির দিনটি পিছিয়ে যাবে।

আমার ভাই-বোনেরা

শেরেবাংলা আজ পরলোক। হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী আমাদের মাঝে নাই। যাঁরা প্রবীণতার দাবি করছেন তাঁদের অধিকাংশই হয় ইতিমধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানের এক শ্রেণীর বাঙালি-বিদ্বেষীদের নিকট নিজেদের বিকিয়ে দিয়ে তল্পিবাহকের ভূমিকা গ্রহণ করেছেন, নয়তো নিষ্কর্মা, নির্জীব হয়ে পড়েছেন এবং অন্যের সলাপরামর্শে বশীভূত হয়ে কথায় ও কাজে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছেন। আমি নিশ্চিত বুঝতে পারছি, ভাগ্য-বিপর্যস্ত মানুষের হয়ে আমাদেরকেই কথা বলতে হবে। তাদের চাওয়া ও পাওয়ার সার্থক রূপদানের দায়িত্ব আওয়ামী লীগকেই গ্রহণ করতে হবে এবং সে কঠিন দায়িত্ব গ্রহণে আমরা সম্পূর্ণ প্রস্তুত। তার উপযোগী করেই আমাদের প্রিয় প্রতিষ্ঠান আওয়ামী লীগকে গড়ে তোলা হয়েছে। নিজেদের প্রাণ দিয়েও যদি এদেশের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জীবনকে কণ্টকমুক্ত করতে পারি, আগামী দিনগুলোকে সকলের জন্য সুখী, সুন্দর ও সমৃদ্ধশালী করে তুলতে পারি এবং দেশবাসীর জন্য যে কল্পনার নকশা এতদিন ধরে মনের পটে এঁকেছিলাম— সে স্বপ্নের বাস্তব রূপায়ণের পথ প্রশস্ত করে দুঃখের বোঝা যদি কিছুটাও লাঘব করে যেতে পারি— তাহলে আমাদের সংগ্রাম সার্থক হবে।

আমার প্রিয় দেশবাসী,

আমি ক্ষমতার প্রত্যাশী নই। কারণ, ক্ষমতার চেয়ে জনতার দাবি আদায়ের সংগ্রাম অনেক বড়। এখন নির্বাচনের মাধ্যমে বক্তব্য পেশ ও দাবি আদায়ের দায়িত্ব যদি আমাদের ওপর ন্যস্ত করতে চান তাহলে আমাদেরকে শক্তি সঞ্চয় করতে হবে। সে শক্তি হলো পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ। কারণ, এই সংখ্যাগরিষ্ঠতা হচ্ছে অধিকার আদায়ের চাবিকাঠি। তাই আমার জীবনের সুদীর্ঘ সংগ্রামের এই ঐতিহাসিক

যুগসন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আপনাদের কাছে আমার একটি মাত্র আবেদন—বাংলাদেশের সকল আসনে আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থীদেরকে 'নৌকা' মার্কায় ভোট দিন।

সংগ্রামী দেশবাসী,

সর্বশেষে, আমি ব্যক্তিগত পর্যায়ে আপনাদের কাছে কয়েকটি কথা পেশ করতে চাই। আপনারা জানেন ১৯৬৫ সালের ১৭ দিনের যুদ্ধের সময় আমরা বাঙালিরা কিরূপ বিচ্ছিন্ন, অসহায় ও নিরুপায় হয়ে পড়েছিলাম। বিশ্বের সঙ্গে এবং দেশের কেন্দ্রের সঙ্গে প্রায় আমাদের সকল যোগাযোগের সম্পর্ক ভেঙে পড়েছিল। অবরুদ্ধ দ্বীপের ন্যায় বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ কেবলমাত্র আল্লাহ্র উপর ভরসা রেখে এক সীমাহীন অনিশ্চয়তার মুখে দিন কাটাচ্ছিল। তথাকথিত শক্তিশালী কেন্দ্রে প্রশাসনযন্ত্র বিশেষ ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে সেদিনের সেই জরুরি প্রয়োজনের দিনেও আমাদের নাগালের বাইরে ছিল। তাই আমার নিজের জন্য নয়, বাংলার মানুষের দুঃখের অবসানের জন্য ১৯৬৬ সালে আমি ৬ দফা প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলাম। এই দাবি হচ্ছে আমাদের স্বাধিকার, স্বায়ত্তশাসন ও আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ের দাবি; অঞ্চলে অঞ্চলে যে বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে তার অবসানের দাবি। এই দাবি তুলতে গিয়ে আমি নির্যাতিত হয়েছি। একটার পর একটা মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে আমাকে হয়রানি করা হয়েছে। আমার ছেলেমেয়ে, বৃদ্ধ পিতা-মাতা ও আপনাদের কাছ থেকে আমাকে ছিনিয়ে নিয়ে কারাগারে আটক করে রাখা হয়েছিল। আমার সহকর্মীদেরকেও একই অন্যায়-অত্যাচারের শিকার হতে হয়েছে। সেই দুর্দিনে পরম করুণাময় আল্লাহ্র আশীর্বাদস্বরূপ আপনারাই কেবল আমার সঙ্গে ছিলেন। কোনো নেতা নয়, কোনো দলপতি নয়, আপনারা— বাংলার বিপ্লবী ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক ও সর্বহারা মানুষ রাতের অন্ধকারে কারফিউ ভেঙে মনু মিয়া, আসাদ, মতিয়ুর, রুস্তম, জহুর, জোহা, আনোয়ারার মতো বাংলাদেশের দামাল ছেলেমেয়েরা প্রাণ দিয়ে আন্দোলন গড়ে তুলে আমাকে তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার কবল থেকে মুক্ত করে এনেছিলেন। সেদিনের কথা আমি ভুলে যাই নাই, জীবনে কোনো দিন ভুলব না, ভুলতে পারব না। জীবনে আমি যদি একলাও হয়ে যাই, মিথ্যা আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার মতো আবার যদি মৃত্যুর পরোয়ানা আমার সামনে এসে দাঁড়ায়, তাহলেও আমি শহীদের পবিত্র রক্তের সঙ্গে বেঈমানী করব না। আপনারা যে ভালোবাসা আমার প্রতি আজও অক্ষুণ্ন রেখেছেন, জীবনে যদি কোনোদিন প্রয়োজন হয় তবে আমার রক্ত দিয়ে হলেও আপনাদের এ ভালোবাসার ঋণ পরিশোধ করব।

প্রিয় ভাই-বোনেরা,

বাংলার যে জননী শিশুকে দুধ দিতে দিতে গুলিবিদ্ধ হয়ে তেজগাঁর নাখালপাড়ায় মারা গেল, বাংলার যে শিক্ষক অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গিয়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে ঢলে পড়ল, বাংলার যে শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তুলতে গিয়ে জীবন দিল, বাংলার যে ছাত্র স্বাধিকার অর্জনের সংগ্রামে রাজপথে রাইফেলের সামনে বুক পেতে দিল,

বাংলার যে সৈনিক কুর্মিটোলার বন্দি শিবিরে অসহায় অবস্থায় গুলিবিদ্ধ হয়ে শহীদ হলো, বাংলার যে কৃষক ধানক্ষেতের আলের পাশে প্রাণ হারাল— তাদের বিদেহী অমর আত্মা বাংলাদেশের পথে-প্রান্তরে ঘরে-ঘরে ঘুরে ফিরছে এবং অন্যায়-অত্যাচারের প্রতিকার দাবি করছে। রক্ত দিয়ে, প্রাণ দিয়ে যে আন্দোলন তাঁরা গড়ে তুলেছিলেন, সে আন্দোলন ৬ দফা ও ১১ দফার। আমি তাঁদেরই ভাই। আমি জানি, ৬ দফা ও ১১ দফা বাস্তবায়নের পরই তাঁদের বিদেহী আত্মা শান্তি পাবে। কাজেই আপনারা আওয়ামী লীগের প্রতিটি প্রার্থীকে 'নৌকা' মার্কায় ভোট দিয়ে বাংলাদেশের প্রতিটি আসনে জয়যুক্ত করে আনুন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যে জালেমদের ক্ষুরধার নখদন্ত জননী বঙ্গভূমির বক্ষ বিদীর্ণ করে তার হাজারো সন্তানকে কেড়ে নিয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আমরা জয়যুক্ত হবো।

শহীদের রক্ত বৃথা যেতে পারে না। ন্যায় ও সত্যের সংগ্রামে নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের সহায় হবেন।

জয় বাংলা। পাকিস্তান জিন্দাবাদ।

নিবেদক—

আপনাদেরই

শেখ মুজিবুর রহমান

১ ডিসেম্বর, ১৯৭০

সূত্র : বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ, বঙ্গবন্ধুর নির্বাচিত বক্তৃতা ও বিবৃতি : রামেন্দু মজুমদার সম্পাদিত

পরিশিষ্ট–ছ

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে উন্নয়ন ব্যয়

সময়	উন্নয়ন পরিকল্পনা ব্যয়				পরিকল্পনা বহির্ভূত ব্যয়	মোট উন্নয়ন পরিকল্পনা ব্যয় (১+৪+৫)	মোট ব্যয়	(দশ লাখ টাকার হিসাবে) গোটা পাকিস্তানের এলাকাভিত্তিক উন্নয়ন ব্যয়
	মোট (১)	সরকারি (২)	বেসরকারি (৩)	(৪)	পূর্ত কর্মসূচি (৫)	(৬)	(৭)	(৮)
পূর্ব পাকিস্তান								
১৯৫০-৫১ ১৯৫৪-৫৫	১,০০০	৭০০	৩০০	–	–	১,০০০	২,৭১০	২০%
১৯৫৫-৫৬ ১৯৫৯-৬০	২,৭০০	১,৯৭০	৭৩০	–	–	২,৭০০	৫,২৪০	২৬%
১৯৬০-৬১ ১৯৬৪-৬৫	৯,২৫০	৬,২৫০	৩,০০০	–	৪৫০	৯,৭০০	১৪,০৪০	৩২%
১৯৬৫-৬৬ ১৯৬৯-৭০	১৬,৫৬০	১১,০৬০	৫,৫০০	–	–	১৬,৫৬০	২১,৪১০	৩৬%

সিন্ধু অববাহিকা পূর্ত কর্মসূচি

পশ্চিম পাকিস্তান								
১৯৫০-৫১ ১৯৫৪-৫৫	৪,০০০	২,০০০	২,০০০	–	–	৪,০০০	১১,২৯০	৮০%
১৯৫৫-৫৬ ১৯৫৯-৬০	৭,৫৭০	৪,৬৪০	২,৯৩০	–	–	৭,৫৭০	১৬,৫৫০	৭৪%
১৯৬০-৬১ ১৯৬৪-৬৫	১৮,৪০০	৭,৭০০	১০,৭০০	২,১১০	২০০	২০,৭১০	৩৩,৫৫০	৬৮%
১৯৬৫-৬৬ ১৯৬৯-৭০	২৬,১০০	১০,১০০	১৬,০০০	৩,৬০০	–	২৯,৭০০	৫১,৯৫০	৬৪%

সূত্র : রিপোর্ট অব এডভাইজারি প্যানেলস্ ফর দ্য ফোর্থ ফাইভ ইয়ার প্ল্যান, ভল্যুম-১, প্ল্যানিং কমিশন, গভর্নমেন্ট অব পাকিস্তান, জুলাই ১৯৭১

পরিশিষ্ট–জ

আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের হিস্যা

(দশ লাখ টাকার হিসাবে)

বৈদেশিক আমদানি				বৈদেশিক রপ্তানি		
বছর	পূর্ব পাকিস্তান	পাকিস্তান	পূর্ব পাকিস্তানের হিস্যার শতকরা হার (১-২)	পূর্ব পাকিস্তান	পাকিস্তান	পূর্ব পাকিস্তানের হিস্যার শতকরা হার (৪-৫)
	(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
১৯৪৮-৪৯	২৮২	১,৪৫৯	১৯.৩%	৪২৯	৯৫৮	৪৪.৮%
১৯৪৯-৫০	৩৮৫	১,২৯৭	২৯.৭%	৬২৯	১,১৯৪	৫২.৭.৪%
১৯৫০-৫১	৪৫৩	১.৬২০	২৮.০%	১,২১১	২.৫৫৪	৪৭.৪%
১৯৫১-৫২	৭৬৩	২,২৩৭	৩৪.১%	১,০৮৭	২,০০৯	৫৪.১%
১৯৫২-৫৩	৩৬৬	১,৩৮৪	২৬.৪%	৬৪২	১,৫১০	৪২.৫%
১৯৫৩-৫৪	২৯৪	১,১১৮	২৬.৩%	৬৪৫	১,২৮৪	৫৮.৪%
১৯৫৪-৫৫	৩২০	১,১০৩	২৯.০%	৭৩২	১,২২৩	৫৯.৮%
১৯৫৫-৫৬	৩৬১	১,৩২৫	২৭.২%	১,০৪১	১,৭৮৪	৫৮.৪%
১৯৫৬-৫৭	৮১৯	২,৩৩৫	৩৫.১%	৯০৯	১,৬০৮	৫৬.৫%
১৯৫৭-৫৮	৭৩৬	২,০৫০	৩৫.৯%	৯৮৮	১,৪২২	৬৯.৫%
১৯৫৮-৫৯	৫৫৪	১,৫৭৮	৩৫.১%	৮৮১	১,৩২৫	৬৬.৫%
১৯৫৯-৬০	৬৫৫	২,৪৬১	২৬.৬%	১,০৮০	১,৮৪৩	৫৮.৬%
১৯৬০-৬১	১,০১৪	৩,১৮৮	৩১.৮%	১,২৫৯	১,৭৯৯	৭০.০%
১৯৬১-৬২	৮৭৩	২,১০৯	২৮.১%	১,৩০১	১,৮৪৩	৭০.৬%
১৯৬২-৬৩	১,০১৯	৩,৮১৯	২৬.৭%	১,২৪৯	২,২৪৭	৫৫.৬%
১৯৬৩-৬৪	১,৪৮৯	৪,৪৩০	৩৩.৬%	১,২২৪	২,২৯৯	৫৩.২%
১৯৬৪-৬৫	১,৭০২	৫,৩৪৭	৩১.৭%	১,২৬৮	২,৪০৮	৫২.৭%
১৯৬৫-৬৬	১,৩২৮	৪,২০৮	৩১.৬%	১,৫১৪	২,৭১৮	৫৫.৭%
১৯৬৬-৬৭	১,৫৬৭	৫,১৯২	৩০.২%	১,৫৭৫	২,৯১৩	৫৪.১%
১৯৬৭-৬৮	১,৩২৭	৪,৬৫৫	২৮.৫%	১,৪৮৪	৩,৩৪৮	৪৪.৩%
১৯৬৮-৬৯	১,৮৫০	৪,৮৯৭	৩৭.৮%	১,৫৪৩	৩,৩০৫	৪৬.৭%
১৯৬৯-৭০	১,৮১৩	৫,০৯৮	৩৫.৬%	১,৬৭০	৩,৩৩৭	৫০.০%

সূত্র : মাসিক স্ট্যাটিস্টিক্যাল বুলেটিন. কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান কার্যালয়. পাকিস্তান সরকার — বিভিন্ন সংখ্যা

পরিশিষ্ট–ঝ

পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদ

দলের নাম	সাধারণ আসন	অপ্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত মহিলা আসন	মোট
আওয়ামী লীগ	২৮৮	১০	২৯৮
পাকিস্তান ডেমোক্র্যাটিক পার্টি	২	—	২
ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ওয়ালী গ্রুপ)	১	—	১
জামায়াতে ইসলামী	১	—	১
নেজামে ইসলাম পার্টি	১	—	১
পাকিস্তান পিপলস্ পার্টি	—	—	—
মুসলিম লীগ (কাউন্সিল)	—	—	—
মুসলিম লীগ (কনভেনশন)	—	—	—
মুসলিম লীগ (কাইয়ুম গ্রুপ)	—	—	—
কৃষক শ্রমিক পার্টি	—	—	—
স্বতন্ত্র	৭	—	৭
মোট আসন সংখ্যা	৩০০	১০	৩১০

পরিশিষ্ট—এঃ

নির্বাচনী ফলাফল

পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ

দলের নাম	প্রতিদ্বন্দ্বিতা-কারী আসন সংখ্যা	পূর্ব পাকিস্তান	পাঞ্জাব	সিন্ধু	উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত	বেলুচিস্তান	উপজাতীয় এলাকা	অপ্রত্যক্ষ-ভাবে নির্বাচিত মহিলা আসন	মোট
আওয়ামী লীগ	১৬৬	১৬০	—	—	—	—	—	৭	১৬৭
পাকিস্তান পিপলস্ পার্টি	১২২	—	৬৪	১৮	১	—	—	৫	৮৮
নিখিল পাকিস্তান মুসলিম লীগ (কাইয়ুম গ্রুপ)	১৩২	—	১	১	৭	—	—	—	৯
মুসলিম লীগ (কাউন্সিল)	১১৯	—	৭	—	—	—	—	—	৭
মুসলিম লীগ (কনভেনশন)	১২৪	—	২	—	—	—	—	—	২
ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ওয়ালী গ্রুপ)	৬১	—	—	—	৩	৩	—	১	৭
পাকিস্তান ডেমোক্র্যাটিক পার্টি	১০৮	১	—	—	—	—	—	—	১
জামায়াতে ইসলামী	২০০	—	১	২	১	—	—	—	৪
জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম (হাজারভী গ্রুপ)	৯৩	—	—	—	৬	১	—	—	৭
মারকাজী জমিয়তে ইসলাম (থানভী গ্রুপ)	অজ্ঞাত	—	৪	৩	—	—	—	—	৭
স্বতন্ত্র	৩০০	১	৩	৩	—	—	৭	—	১৪
		১৬২	৮২	২৭	১৮	৪	৭	১৩	৩১৩

পরিশিষ্ট–ট

স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র

মুজিবনগর, বাংলাদেশ
১৭ এপ্রিল, ১৯৭১

যেহেতু ১৯৭০ সনের ৭ ডিসেম্বর থেকে ১৯৭১ সনের ১৭ জানুয়ারি পর্যন্ত একটি শাসনতন্ত্র রচনার অভিপ্রায়ে প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্যে বাংলাদেশে অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

এবং

যেহেতু এই নির্বাচনে বাংলাদেশের জনগণ তাঁদের ১৬৯ জন প্রতিনিধির মধ্যে ১৬৭ জনই আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচিত করেছিলেন।

এবং

যেহেতু জেনারেল ইয়াহিয়া খান একটি শাসনতন্ত্র রচনার জন্যে ১৯৭১ সনের ৩ মার্চ জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অধিবেশন আহ্বান করেন।

এবং

যেহেতু আহূত এ পরিষদ স্বেচ্ছাচার ও বেআইনিভাবে অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করা হয়।

এবং

যেহেতু পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী তাদের প্রতিশ্রুতি পালনের পরিবর্তে বাংলাদেশের গণপ্রতিনিধিদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চলাকালে একটি অন্যায় ও বিশ্বাসঘাতকতামূলক যুদ্ধ ঘোষণা করে।

এবং

যেহেতু উল্লিখিত বিশ্বাসঘাতকতামূলক কাজের জন্য উদ্ভূত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার অর্জনের আইনানুগ অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯৭১

সনের ২৬ মার্চ ঢাকায় যথাযথভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং বাংলাদেশের অখণ্ডতা ও মর্যাদা রক্ষার জন্যে বাংলাদেশের জনগণের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান।

এবং

যেহেতু পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী একটি বর্বর ও নৃশংস যুদ্ধ পরিচালনাকালে বাংলাদেশের অসামরিক ও নিরস্ত্র জনসাধারণের বিরুদ্ধে অগুনতি গণহত্যা ও নজীরবিহীন নির্যাতন চালিয়েছে এবং এখনো চালাচ্ছে।

এবং

যেহেতু পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী অন্যায় যুদ্ধ, গণহত্যা ও নানাবিধ নৃশংস অত্যাচার চালিয়ে বাংলাদেশের জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের একত্র হয়ে একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করতে ও নিজেদের সরকার গঠন করতে সুযোগ করে দিয়েছে

এবং

যেহেতু বাংলাদেশের জনগণ তাঁদের বীরত্ব, সাহসিকতা ও বিপ্লবী কার্যক্রমের দ্বারা বাংলাদেশের ভূ-খণ্ডের ওপর তাঁদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছেন।

সেহেতু

সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বাংলাদেশের জনগণ নির্বাচিত প্রতিনিধিদের পক্ষে যে রায় দিয়েছেন, সে মোতাবেক আমরা, নির্বাচিত প্রতিনিধিরা, আমাদের সমবায়ে গণপরিষদ গঠন করে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণের জন্যে সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা আমাদের পবিত্র কর্তব্য বিবেচনা করে আমরা বাংলাদেশকে সার্বভৌম গণপ্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছি এবং এতদ্বারা পূর্বাহ্নে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণা অনুমোদন করছি।

এবং

এতদ্বারা আমরা আরও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছি যে, শাসনতন্ত্র প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপ্রধান ও সৈয়দ নজরুল ইসলাম উপ-রাষ্ট্রপ্রধান পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন এবং

রাষ্ট্রপ্রধান প্রজাতন্ত্রের সশস্ত্র বাহিনীসমূহের সর্বাধিনায়ক হবেন,

রাষ্ট্রপ্রধানই ক্ষমা প্রদর্শনসহ সর্বপ্রকার প্রশাসনিক ও আইন প্রণয়নের ক্ষমতার অধিকারী হবেন।

তিনি একজন প্রধানমন্ত্রী ও প্রয়োজনবোধে মন্ত্রিসভার অন্যান্য সদস্য নিয়োগ করতে পারবেন।

রাষ্ট্রপ্রধানের কর ধার্য ও অর্থব্যয়ের এবং গণপরিষদের অধিবেশন আহ্বান ও মুলতবীর ক্ষমতা থাকবে এবং বাংলাদেশের জনগণের জন্যে আইনানুগ ও নিয়মতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার জন্যে অন্যান্য সকল ক্ষমতারও তিনি অধিকারী হবেন।

বাংলাদেশের জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে আমরা আরও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছি, যে কোনো কারণে যদি রাষ্ট্রপ্রধান না থাকেন অথবা কাজে যোগদান করতে না পারেন অথবা তাঁর দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে যদি অক্ষম হন, তবে রাষ্ট্রপ্রধানকে প্রদত্ত সকল ক্ষমতা ও দায়িত্ব উপ-রাষ্ট্রপ্রধান পালন করবেন।

আমরা আরও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছি যে, বিশ্বের একটি জাতি হিসেবে এবং জাতিসংঘের সনদ মোতাবেক আমাদের ওপর যে দায়িত্ব ও কর্তব্য আরোপিত হয়েছে তা আমরা যথাযথভাবে পালন করব।

আমরা আরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছি যে, আমাদের স্বাধীনতার এ ঘোষণা ১৯৭১ সনের ২৬ মার্চ থেকে কার্যকর বলে গণ্য হবে।

আমরা আরও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছি যে, আমাদের এই সিদ্ধান্ত কার্যকরি করার জন্যে আমরা অধ্যাপক ইউসুফ আলীকে ক্ষমতা দিলাম।

এবং রাষ্ট্রপ্রধান ও উপ-রাষ্ট্রপ্রধানের শপথ-গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করলাম।

সূত্র : বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ, বঙ্গবন্ধুর নির্বাচিত বক্তৃতা ও বিবৃতি : রামেন্দু মজুমদার সম্পাদিত

পরিশিষ্ট–ঠ

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ
"এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম"

[৫ মার্চ, ১৯৭১ বঙ্গবন্ধু জানালেন, একমাত্র ঢাকা ও তার আশেপাশেই সেনাবাহিনীর গুলিতে অন্তত ৩০০ জন প্রাণ হারিয়েছেন এবং ২০০০ জন আহত হয়েছেন। অনেক জায়গায় ক্রুদ্ধ জনতা পাকিস্তানি পতাকা ও কায়দে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর ছবি পুড়িয়ে ফেলে। এক সমাবেশে সবুজ জমিনের ওপর লাল সূর্যের ভেতরে হলুদ রঙে বাংলাদেশের মানচিত্র সংবলিত একটি নতুন পতাকা ওড়ানো হয়। ৫ মার্চ সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে সেনা কর্তৃপক্ষ জানান, শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক শান্তি বজায় রাখার আহ্বানের ফলে পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। ৬ মার্চ, ১৯৭১ প্রেসিডেন্ট এক বেতার ভাষণে ঘোষণা করেন, জাতীয় পরিষদ এখন ২৫ মার্চ, ১৯৭১ তারিখে অধিবেশনে মিলিত হবে। কিন্তু একই সঙ্গে তিনি বলেন, সশস্ত্র বাহিনী যে কোনো মূল্যে পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষা করবে। ভুট্টো কালবিলম্ব না করে ঘোষণা করেন, তাঁর দল এ অধিবেশনে যোগ দেবে। একই দিন বেলুচিস্তানের কসাই নামে কুখ্যাত লে. জেনারেল টিক্কা খানকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর হিসেবে নিয়োগের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়। আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটি ৬ মার্চ এক অধিবেশনে মিলিত হয় এবং অধিবেশন সারা রাত ধরে চলে।

৭ মার্চ, ১৯৭১ ঢাকার রেসকোর্সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা হয়। কমপক্ষে ১০ লাখ লোক তাদের নেতার কাছ থেকে নির্দেশ গ্রহণ করার জন্যে এক জনসভায় সমবেত হয়। বেশিরভাগ লোকই বঙ্গবন্ধুর কাছ থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা শুনতে চাইছিলেন। বঙ্গবন্ধু দেরিতে সভাস্থলে আসেন। তাঁর ১৮ মিনিটের বক্তৃতায় বাঙালির মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন অব্যাহত রাখার দৃঢ় সঙ্কল্প ব্যক্ত করেন। কিন্তু জনগণ আরো তাড়াতাড়ি ও সরাসরি কোনো কর্মসূচি প্রত্যাশা করছিল। ফলে জনমনে কিছুটা হতাশা পরিলক্ষিত হয়।

বঙ্গবন্ধুর জীবনের সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভাষণটি এখানে উদ্ধৃত হলো।

[উল্লেখ্য, ঢাকা বেতার ভাষণটি সভায় ধারণ করে পরদিন প্রচার করে।]

আজ দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা সবই জানেন এবং বোঝেন। আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুরে আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে। আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তার

অধিকার চায়। কি অন্যায় করেছিলাম? নির্বাচনের পরে বাংলাদেশের মানুষ সম্পূর্ণভাবে আমাকে ও আওয়ামী লীগকে ভোট দেন। আমাদের ন্যাশনাল এসেমব্লি বসবে, আমরা সেখানে শাসনতন্ত্র তৈরি করবো এবং এ দেশকে আমরা গড়ে তুলবো। এদেশের মানুষ অর্থনীতি, রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক মুক্তি পাবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় ২৩ বৎসরের করুণ ইতিহাস বাংলার অত্যাচারের, বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস। ২৩ বৎসরের ইতিহাস মুমূর্ষু নর-নারীর আর্তনাদের ইতিহাস। বাংলার ইতিহাস এদেশের মানুষের রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস।

১৯৫২ সালে রক্ত দিয়েছি। ১৯৫৪ সালে নির্বাচনে জয়লাভ করেও আমরা গদিতে বসতে পারিনি। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান মার্শালল' জারি করে ১০ বছর পর্যন্ত আমাদের গোলাম করে রেখেছে। ১৯৬৬ সালে ৬ দফা আন্দোলনে ৭ জুনে আমার ছেলেদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। ১৯৬৯ সালের আন্দোলনে আইয়ুব খানের পতন হওয়ার পরে যখন ইয়াহিয়া খান সাহেব সরকার নিলেন তিনি বললেন, দেশে শাসনতন্ত্র দেবেন— গণতন্ত্র দেবেন, আমরা মেনে নিলাম। তারপর অনেক ইতিহাস হয়ে গেল, নির্বাচন হলো। আমি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সাহেবের সঙ্গে দেখা করেছি। আমি, শুধু বাংলার নয়, পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টির নেতা হিসাবে তাঁকে অনুরোধ করলাম, ১৫ ফেব্রুয়ারি তারিখে আপনি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন দেন। তিনি আমার কথা রাখলেন না, তিনি রাখলেন ভুট্টো সাহেবের কথা। তিনি বললেন, প্রথম সপ্তাহে মার্চ মাসে হবে। আমি বললাম ঠিক আছে, আমরা এসেমব্লিতে বসবো। আমি বললাম, এসেমব্লির মধ্যে আলোচনা করবো— এমনকি আমি এ পর্যন্তও বললাম, যদি কেউ ন্যায্য কথা বলে, আমরা সংখ্যায় বেশি হলেও একজন যদিও সে হয় তার ন্যায্য কথা আমরা মেনে নেব।

ভুট্টো সাহেব এখানে এসেছিলেন, আলোচনা করলেন। বলে গেলেন যে, আলোচনার দরজা বন্ধ নয়, আরো আলোচনা হবে। তারপর অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে আমরা আলোচনা করলাম— আপনারা আসুন, বসুন ,আমরা আলাপ করে, শাসনতন্ত্র তৈরি করবো। তিনি বললেন, পশ্চিম পাকিস্তানের মেম্বররা যদি এখানে আসে তাহলে কসাইখানা হবে এসেমব্লি। তিনি বললেন, যে যাবে তাকে মেরে ফেলে দেওয়া হবে, যদি কেউ এসেমব্লিতে আসে তাহলে পেশোয়ার থেকে করাচি পর্যন্ত দোকান জোর করে বন্ধ করা হবে। আমি বললাম, এসেমব্লি চলবে। তারপরে হঠাৎ ১ তারিখে এসেমব্লি বন্ধ করে দেওয়া হলো।

ইয়াহিয়া খান প্রেসিডেন্ট হিসাবে এসেমব্লি ডেকেছিলেন। আমি বললাম, আমি যাবো। ভুট্টো বললেন, তিনি যাবেন না। ৩৫ জন সদস্য পশ্চিম পাকিস্তান থেকে এখানে আসলেন। তারপর হঠাৎ বন্ধ করে দেওয়া হলো, দোষ দেওয়া হলো বাংলার মানুষকে, দোষ দেওয়া হলো আমাকে। বন্ধ করার পর এদেশের মানুষ প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠল।

আমি বললাম, শান্তিপূর্ণভাবে আপনারা হরতাল পালন করুন। আমি বললাম, আপনারা কল-কারখানা সবকিছু বন্ধ করে দেন। জনগণ সাড়া দিল। আপন ইচ্ছায় জনগণ রাস্তায়

বেরিয়ে পড়লো, তারা শান্তিপূর্ণভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাবার জন্য স্থির প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো। কি পেলাম আমরা? জামার পয়সা দিয়ে অস্ত্র কিনেছি বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করবার জন্য, আজ সেই অস্ত্র ব্যবহার হচ্ছে আমার দেশের গরীব-দুঃখী নিরস্ত্র মানুষের বিরুদ্ধে— তার বুকের ওপর হচ্ছে গুলি। আমরা পাকিস্তানে সংখ্যাগুরু— আমরা বাঙালিরা যখনই ক্ষমতায় যাবার চেষ্টা করেছি তখনই তারা আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছেন।

টেলিফোনে আমার সঙ্গে তাঁর কথা হয়। তাঁকে আমি বলেছিলাম, জেনারেল ইয়াহিয়া খান সাহেব, আপনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট, দেখে যান কিভাবে আমার গরীবের ওপর, আমার বাংলার মানুষের বুকের ওপর গুলি করা হয়েছে। কি করে আমার মায়ের কোল খালি করা হয়েছে, কি করে মানুষকে হত্যা করা হয়েছে, আপনি আসুন, দেখুন, বিচার করুন। তিনি বললেন, আমি নাকি স্বীকার করেছি ১০ তারিখে রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স হবে।

আমি তো অনেক আগেই বলে দিয়েছি কিসের রাউন্ড টেবিল, কার সঙ্গে বসবো? যারা আমার মানুষের বুকের রক্ত নিয়েছে, তাদের সঙ্গে বসবো? হঠাৎ আমার সঙ্গে পরামর্শ না করে পাঁচ ঘণ্টার গোপন বৈঠক করে যে বক্তৃতা তিনি করেছেন তাতে সমস্ত দোষ তিনি আমার ওপর দিয়েছেন, বাংলার মানুষের ওপর দিয়েছেন।

ভায়েরা আমার, ২৫ তারিখে এসেমব্লি কল করেছে। রক্তের দাগ শুকায় নাই। আমি ১০ তারিখে সিদ্ধান্ত নিয়েছি ওই শহীদের রক্তের ওপর পাড়া দিয়ে আরটিসি-তে মুজিবুর রহমান যোগদান করতে পারে না। এসেমব্লি কল করেছেন, আমার দাবি মানতে হবে। প্রথম সামরিক আইন মার্শালল' Withdraw করতে হবে। সমস্ত সামরিক বাহিনীর লোকদের ব্যারাকে ফেরত যেতে হবে। যেভাবে হত্যা করা হয়েছে তার তদন্ত করতে হবে। আর জনগণের প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। তারপর বিবেচনা করে দেখবো, আমরা এসেমব্লিতে বসতে পারবো কি পারবো না। এর পূর্বে এসেমব্লিতে বসতে আমরা পারি না।

আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না। আমরা এদেশের মানুষের অধিকার চাই। আমি পরিষ্কার অক্ষরে বলে দিবার চাই যে, আজ থেকে এই বাংলাদেশে কোর্ট-কাচারি, আদালত-ফৌজদারী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে। গরীবের যাতে কষ্ট না হয়, যাতে আমার মানুষ কষ্ট না করে সেজন্য সমস্ত অন্যান্য যে জিনিসগুলি আছে, সেগুলির হরতাল কাল থেকে চলবে না। রিকশা, গরুর গাড়ি, রেল চলবে, লঞ্চ চলবে —শুধু সেক্রেটারিয়েট, সুপ্রীমকোর্ট, হাইকোর্ট, জজকোর্ট, সেমি-গভর্নমেন্ট দপ্তর, ওয়াপদা কোনো কিছু চলবে না। ২৮ তারিখে কর্মচারীরা গিয়ে বেতন নিয়ে আসবেন। এরপর যদি বেতন দেওয়া না হয়, আর যদি একটি গুলি চলে, আর যদি আমার লোককে হত্যা করা হয়— তোমাদের কাছে অনুরোধ রইল, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সবকিছু— আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি,

তোমরা বন্ধ করে দেবে। আমরা ভাতে মারবো, আমরা পানিতে মারবো। তোমরা আমার ভাই, তোমরা ব্যারাকে থাকো, কেউ তোমাদের কিছু বলবে না। কিন্তু আর আমার বুকের ওপর গুলি চালাবার চেষ্টা করো না। সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না। আমরা যখন মরতে শিখেছি তখন কেউ আমাদের দাবাতে পারবে না।

আর যে সমস্ত লোক শহীদ হয়েছে, আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে, আমরা আওয়ামী লীগের থেকে যদ্দূর পারি তাদের সাহায্য করতে চেষ্টা করবো। যারা পারেন আমার রিলিফ কমিটিকে সামান্য টাকা-পয়সা পৌঁছে দেবেন। আর এই ৭ দিন হরতালে যে সমস্ত শ্রমিক ভাইয়েরা যোগদান করেছে, প্রত্যেক শিল্পের মালিক তাদের বেতন পৌঁছে দেবেন। সরকারি কর্মচারীদের বলি, আমি যা বলি তা মানতে হবে। যে পর্যন্ত আমার এই দেশের মুক্তি না হচ্ছে, ততদিন খাজনা-ট্যাক্স বন্ধ করে দেওয়া হলো— কেউ দেবে না। শুনুন, মনে রাখবেন, শত্রু বাহিনী ঢুকেছে, নিজেদের মধ্যে আত্মকলহ সৃষ্টি করবে, লুটতরাজ করবে। এই বাংলায়— হিন্দু-মুসলমান, বাঙালি, অবাঙালি যারা আছে তারা আমাদের ভাই। তাদের রক্ষার দায়িত্ব আপনাদের ওপর, আমাদের যেন বদনাম না হয়। মনে রাখবেন, রেডিও-টেলিভিশনের কর্মচারীরা যদি রেডিওতে আমাদের কথা না শোনে তাহলে কোনো বাঙালি রেডিও স্টেশনে যাবেন না। যদি টেলিভিশন আমাদের নিউজ না দেয়, কোনো বাঙালি টেলিভিশনে যাবেন না। ২ ঘণ্টা ব্যাঙ্ক খোলা থাকবে, যাতে মানুষ তাদের মাইনে-পত্র নিতে পারে। পূর্ব বাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে এক পয়সাও চালান হতে পারবে না। টেলিফোন, টেলিগ্রাম আমাদের এই পূর্ব বাংলায় চলবে এবং বিদেশের সঙ্গে নিউজ দেয়া-নেয়া চালাবেন।

কিন্তু যদি এই দেশের মানুষকে খতম করার চেষ্টা করা হয়, বাঙালিরা বুঝেসুঝে কাজ করবেন। প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোল এবং তোমাদের যা কিছু আছে, তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো। মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেবো। এই দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো— ইনশাআল্লাহ্। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।

[সূত্র : ভাষণের টেপ রেকর্ডিং)

সূত্র : বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ, বঙ্গবন্ধুর নির্বাচিত বক্তৃতা ও বিবৃতি : রামেন্দু মজুমদার সম্পাদিত

পরিশিষ্ট–ড

“শেখ মুজিব একজন বজ্রকণ্ঠী বক্তা। সেদিন রেসকোর্স ময়দানের বক্তৃতায় তিনি সব কিছুই ব্যবহার করেছেন— যথার্থ শব্দের মূর্ছনা, তীব্র শ্লেষ, মন্ত্রপূত আহ্বান কিন্তু তিনি যা বলেছেন তার সঙ্গে সে সময়ের জনগণের প্রত্যাশার মিল ছিল না”

৫ মার্চের বিকেলে ইয়াহিয়া খানের মনে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা স্পষ্ট হয়ে উঠল। কর্মপন্থার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কৌশল হবে প্রয়োজনীয় সামরিক শক্তি যোগানো, প্রস্তুতির জন্য সময় নেয়া এবং উপযুক্ত মরণ ছোবল দেয়া। সে অনুযায়ী তিনি আকাশ পথে রণসম্ভার পাঠানোর নির্দেশ দিলেন। আনুষঙ্গিক যুদ্ধ আইন আদেশ জারি করা হলো। পরদিন তিনি বেতারে ঘোষণা করলেন, যেহেতু পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণার কারণে ভুল বুঝাবুঝি ও হাঙ্গামা সৃষ্টিকারীদের চিৎকারে পরিণত হয়েছে, সেহেতু তিনি দেশের প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে এই দুর্ভাগ্যজনক অচলাবস্থার মীমাংসাকল্পে সিদ্ধান্ত দিচ্ছেন যে, ২৫ মার্চ পরিষদের অধিবেশনের নতুন তারিখ নির্ধারণ করা হলো।

আমার মনে হয় না যে, তিন বা চার কোটি পাকিস্তানি যারা সেদিন প্রেসিডেন্টের ভাষণ শুনেছেন তাঁরা সেদিনকার সেই অভিজ্ঞতার কথা ভুলে যাবেন। বাস্তবক্ষেত্রে ইয়াহিয়া খান জনদাবির প্রত্যুত্তরে এটা জানাতে পারতেন, কিন্তু বক্তব্যে তিনি যে ধাঁচের ইঙ্গিত দিয়েছেন, যে সুরে বলেছেন, তাতে তাঁর মনোভাবে দুরভিসন্ধি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এখানে একজন নিরপেক্ষ রাষ্ট্রপ্রধানের এ ধরনের রাজনীতিবিদের সৃষ্ট জটিলতা থেকে মুক্ত করার কথা হয়তো ভাবা যেত, কিন্তু প্রেসিডেন্টের মন্তব্যে আসল চাপটা সেদিকে ছিল না। তিনি বিক্ষুব্ধ বাঙালিদের অনুভূতির জন্য একটি কথাও বলেননি বা সামান্যতম সান্ত্বনা বা লাঘবের উদ্যোগও নেননি। তাঁর পরিবর্তে তিনি শেখ মুজিবুর রহমান ও আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দাপূর্ণ ভাষা ব্যবহার করেছেন। তিনি এক হাতে যা দিতে চেয়েছেন অন্য হাতে তা কেড়ে নিয়েছেন। আমার এক শ্রদ্ধাস্পদ সহকর্মীর উক্তি “তিনি (ইয়াহিয়া) মোটেও আন্তরিক নন এবং তিনি পাকিস্তানকে জাহান্নামে পাঠাচ্ছেন।” —এটা করাচিতে আমার সহকর্মী ও আমার অনুভূতিরই প্রতিধ্বনি।

এ থেকে স্পষ্টত বুঝা গিয়েছিল রেসকোর্স ময়দানে শেখ মুজিবের অস্ত্রকে ভোঁতা করে

দেওয়ার একটা প্রচেষ্টা। কেননা তিনি ভেবেছিলেন ওই দিন শেখ মুজিব স্বাধীনতার ঘোষণা দিতে পারেন। এটা ছিল তাঁর একটা উদ্দেশ্যমূলক জুয়াখেলা। অন্তত এবারে ইয়াহিয়া খান ভুল হিসাব করেননি।

শেখ মুজিবুর রহমান, আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটি এবং তাঁর দলের নির্বাচিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যবৃন্দ এই ফাঁদে আটকা পড়লেন। রেসকোর্স ময়দানের জনসভায় শেখ মুজিব স্বাধিকার অর্জনের জন্য আইন অমান্য আন্দোলন চালিয়ে যেতে বললেন এবং 'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' বলে ঘোষণা দিলেন। জনগণের প্রত্যাশিত ঘোষণা সরাসরি পেল না সেজন্য অনেকে হতাশ হলো। এই আন্দোলন ইয়াহিয়া খানের চক্রের কাছে যতই ধ্বংসাত্মক ও অপ্রিয় হোক না কেন, এটা সামরিক প্রস্তুতির জন্য তখনো আকাঙ্ক্ষিত সময় দিয়েছিল।

বিপ্লবী নেতা হিসেবে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিব যে সুনাম অর্জন করেছিলেন, তা দিয়ে তিনি চার মাইল দূরে পূর্বাঞ্চল সেনানিবাসের প্রধান দপ্তরে লাখ লাখ দৃঢ়চেতা বজ্রমুষ্টি বাঙালিদের নেতৃত্ব দিয়ে টিক্কা খানকে আত্মসমর্পণ করাতে পারতেন। বাঙালিরা তা করতে প্রস্তুত ছিল, সামরিক বাহিনীকে উৎখাত করার জন্য কয়েক শ' আত্মাহুতিও দিতে প্রস্তুত ছিল। তাহলে বাংলাদেশ সামান্য ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত হতে পারতো। পরবর্তীকালে লাখ লাখ প্রাণের মৃত্যু, অজস্র লোকেরা বাস্তুহারা ও সামরিক নৃশংসতার শিকার হয়ে দেশত্যাগ করতে হতো না।

শেখ মুজিবুর রহমান এবং আওয়ামী লীগ বাস্তব পরিস্থিতি বিশ্লেষণের অজ্ঞতার পরিচয় এবারই শুধু একবার দেয়নি। তাঁদের চোখ ও কানের সামনে অসংখ্য বেদনাদায়ক সাক্ষ্য-প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও তাঁরা ইয়াহিয়া খানের চালে বোকা বনে 'ম্যাড হাট্টার' নাচের 'সাংবিধানিক সূত্রের আলোচনায়' অংশ নিলেন এবং পরিণতিতে জনগণকে মেষের মতো কসাই পাকসেনার হাতে জবাই হতে হলো।

২৫ মার্চে চরম আদেশ প্রদানের পর ইয়াহিয়া খান যখন করাচিতে ফিরে যাচ্ছিলেন এবং পশ্চিম পাকিস্তানে সেনাদল ঢাকা ও চট্টগ্রামে গণহত্যার প্রস্তুতি নিচ্ছিল, তখন একজন আওয়ামী লীগের পত্রবাহক শেখ মুজিবের স্বাক্ষরিত প্রেস রিলিজ দেশী ও বিদেশী সাংবাদিকদের মধ্যে বিলি করছিলেন। এই প্রেস রিলিজের বক্তব্য ছিল, প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আলোচনা সমাপ্ত হয়েছে। ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পর্কে আমরা মতৈক্যে পৌঁছেছি এবং আশা করি প্রেসিডেন্ট তাঁর ঘোষণা দেবেন! (এখানে আশ্চর্যবোধক চিহ্ন আমি ব্যবহার করেছি। কেননা এ ধরনের নির্বুদ্ধিতা সম্বন্ধে আমার কোনো মন্তব্য নেই)।

৩ থেকে ২৫ মার্চের বাঙালি সেনারা তিনবার পৃথকভাবে শেখ মুজিবের সঙ্গে দেখা করে নির্দেশ চেয়েছেন, কেননা যা ঘটবে সে সম্পর্কে তাদের কোনো সংশয় ছিল না। প্রতিবারই শেখ মুজিব বাঙালি সেনাদের সঙ্গে সময়োপযোগী ব্যবহার করেছেন বা মামুলি ধরনের কথাবার্তা বলেছেন। আমার মনে হয় না ওই সব সাহসী আত্মত্যাগী ব্যক্তিগণ যাঁরা এখন স্বাধীনতা সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন তাঁরা ওই অভিজ্ঞতার কথা ভুলে যাবেন। যা হোক রাজনীতিবিদরা যতই তাদের পেছনে চাপার চেষ্টা করুন না কেন এই

লোকগুলো এবং তাদের মতো সাহসী ছাত্রবৃন্দ যাঁরা এখন তাদের সঙ্গে থেকে লড়ছেন তাঁরাই বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রকৃত বীরযোদ্ধা হিসেবে পরিচিত থাকবেন এবং ঘটনাক্রমে এঁরাই নতুন প্রজাতন্ত্রের রক্ষক হবেন। ৭ মার্চের ক্ষমতা দখলের সুযোগের ব্যর্থতা ছিল শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাভাবিক নিয়মের বিপরীতধর্মী কাজ। আমি তাঁকে বহু বছর ধরে কাছে থেকে জানি। ১৯৫৮ সালের গ্রীষ্মের দিনে ফ্লাগস্টাফ আরিজোনা, লস এঞ্জেলস এবং সান ফ্রান্সিসকো হোটেলের কামরাগুলোতে একসঙ্গে থেকেছি। আমি তাঁকে হুবহু স্মরণ করতে পারছি, তিনি ১৯৫০ সালে একজন সাহসী ছাত্রনেতা এবং ১৯৫৮ সালে ৭ অক্টোবর বালুচ রেজিমেন্ট মেসে যেদিন আইয়ুব খান সামরিক বাহিনী নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে পাকিস্তানের শাসনভার দখল করলেন ওইদিনে তাঁর সঙ্গে আলোচনার কথা আমার বেশ মনে আছে।

পাঞ্জাবি রাজনীতিবিদদের শঠতায় অতিষ্ঠ হয়ে আওয়ামী লীগ ফিরোজ খান নুনের পক্ষ থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে ভিন্ন পথে চলার সিদ্ধান্ত নেয়। শেখ মুজিব সেদিন অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে বলে ফেলেন, "আমাদের স্বাধীনতা পেতে হবে।" তিনি আরও বলেন, "আমাদের নিজেদের সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী থাকতে হবে। আমি অবশ্যই এসব দেখব।" ক'ঘণ্টা পর যখন তিনি ঢাকার উদ্দেশে আকাশপথে যাচ্ছিলেন আইয়ুব তখন দেশের ক্ষমতা দখল করেছেন এবং শেখ মুজিব শিগগিরই আবার কারাগারের প্রকোষ্ঠে নিজেকে দেখতে পেলেন।

১৯৭১ সালের মধ্যে এই তীক্ষ্ণধী বাঙালি নেতা, অনন্য সাধারণ ব্যক্তিত্বে বিশিষ্ট হয়ে উঠেছেন, কিন্তু তিনি রাজনীতির চালে যে শক্তির বিরুদ্ধে লড়ছিলেন সেই পাক সামরিকচক্রের ভূমিকা সংযত করার পরিবর্তে আলগা করেছিলেন। আমি মোহাম্মদ আইয়ুবের মন্তব্য উল্লেখ করছি :

"মুজিবের ব্যর্থতার কারণ তিনি যে নেতৃত্ব দিয়েছেন, তার মধ্যে নিহিত নয়, তা নিহিত রয়েছে বাস্তব পরিস্থিতির সম্পর্কে তার জ্ঞানের মধ্যে, যার বিরুদ্ধে তিনি সংগ্রাম করেছেন— এটা ছিল রাজনীতির সঙ্গে তার নির্বিষ্ট-চিত্ততা, যা তাকে তৎপ্রবর্তিত আন্দোলনের ব্যাপকতর সামাজিক সংশ্লেষের বিচার থেকে তাকে নিবৃত্ত করেছিলো।"
—(বাংলাদেশ : এ স্ট্রাগল ফর নেশনহুড : ৬২)

এবার ৭ মার্চের কথায় ফিরে আসছি। সেদিনকার রেসকোর্স ময়দানের জনসভা— বাঙালিদের সংগ্রামের একটি নাটকীয় মোড় হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। কিন্তু জনগণ যা আশা করেছিল তা হয়নি। শেখ মুজিবুর রহমান স্বায়ত্তশাসন অর্জনের জন্য একটি কর্মসূচি দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু সভায় উপস্থিত দশ লক্ষাধিক লোক জানতে এসেছিলেন অন্য কিছু— স্বাধীনতার ঘোষণা। বিগত কয়েক সপ্তাহ ধরে সমগ্র পূর্ব বাংলা আক্রোশে ফেটে পড়েছিল। ঢাকায় এবং প্রদেশের অন্যান্য স্থানের সভাগুলোতে এটাই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে, বাঙালিরা পরিস্থিতির এমন এক পর্যায়ে পৌছেছে, যেখান থেকে আর ফিরে আসার পথ নেই। ছাত্রনেতাগণ বাস্তব পরিস্থিতির প্রতি ছিলেন স্পন্দনশীল, তারা প্রকাশ্যভাবে স্বাধীনতার পক্ষে প্রচারের কাজে বেরিয়ে পড়লেন। তারা প্রকৃতপক্ষে আওয়ামী লীগকে স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত এবং অবশিষ্ট সবার সঙ্গে

সামিল হওয়ার জন্য চরমপত্র দিলেন। এমন পরিস্থিতিতে শেখ মুজিবের বক্তৃতা শোনার জন্য জনসাধারণ রেসকোর্স ময়দানে সমবেত হয় এবং তাদের দৃঢ় সংকল্পের কথা জানাতে তারা সঙ্গে শর্টগান, তরবারি, ঘরের তৈরি বল্লম, বাঁশের লাঠি প্রভৃতি বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আসে। সেদিন একটি পুলিশ কিংবা সেনাবাহিনীর কোনো লোকও দেখা যায়নি।

সেনাদলের উপস্থিতির নিদর্শন একটি মাত্র সবুজ পিঙ্গল বর্ণের হেলিকপ্টার, যা গাছের ওপর দিয়ে অবিরামভাবে উড়ছিল। সেনাবাহিনীর এমন উপস্থিতিতে কিছু লোককে বিচলিত করতে পারে এ আশায় হেলিকপ্টারটি উড়লেও জনগণকে মোটেই বিচলিত হতে দেখা যায়নি। সম্ভবত সেদিনের জন্য হেলিকপ্টারের আরোহীরা আরো ভীত হয়ে পড়েছিল। নিরাপদ দূর থেকে সেদিন জনসমুদ্রে যে দৃঢ় প্রতিবাদ তারা স্বচক্ষে দেখেছিল, তা তাদের মারাত্মক দুশ্চিন্তার কারণ হয়েছিল। যদি এই জনসমুদ্র সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযান করত, তাহলে ট্যাঙ্ক কিংবা কামান-বন্দুক নিয়ে তাদের নিস্তব্ধ করা সম্ভব হতো না। এই বিপদের কথা টিক্কা খান ভালোভাবেই অবগত ছিলেন। হেলিকপ্টারটির চক্কর মারার কারণও ছিল তাই।

ময়দানে সমবেত জনসমুদ্রের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল সভামঞ্চের ওপর, যেখানে যে কোনো মুহূর্তে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের উপস্থিতি আশা করা হচ্ছিল। ('বঙ্গবন্ধু' বাঙালিরা সবাই শ্রদ্ধা ও আদরের সঙ্গে এ নামে শেখ মুজিবকে ডেকে থাকে), সভায় উপস্থিত হতে বঙ্গবন্ধু বিলম্ব করছিলেন।

শেখ মুজিবুর রহমান তখন দলের ওয়ার্কিং কমিটির জরুরি সভায় রত ছিলেন। জাতীয় পরিষদের অধিবেশনের জন্য প্রেসিডেন্ট যে নতুন তারিখ ঘোষণা করেছেন, তা বিবেচনার জন্য তাঁর বাসভবনে আগের দিন সন্ধ্যায় এই সভা আহ্বান করা হয়েছিল। জনগণ উচ্চৈস্বরে দাবি করে আসছে স্বাধীনতা ঘোষণার জন্য সে বিষয়েও আওয়ামী লীগের সদস্যদের সিদ্ধান্ত গ্রহণেরও কথা ছিল। এর জন্য প্রবল চাপ দেওয়া হয়েছিল। একদিকে ছিল শক্তিশালী ছাত্র সংগঠনের হুমকি আর চাপ দেয়া হচ্ছিল যে আওয়ামী লীগের উচিত পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের কথা ঘোষণা করা। এদের সঙ্গে ছিল রাজপথে জনগণের দাবির চাপ। এ দাবির বিরুদ্ধে যুক্তি ছিল, স্বাধীনতা ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে কসাই টিক্কা খান পরিচালিত পশ্চিম পাকিস্তানি সেনাবাহিনী পূর্ব বাংলায় বর্বরোচিত প্রতিশোধ গ্রহণের সুস্পষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। যার ফলে নিরীহ লোকদের জীবনহানি ঘটবে। ঢাকা ও চট্টগ্রামের বিস্তীর্ণ এলাকা বিধ্বস্ত হয়ে যাবে। শেখ মুজিব রক্তপাতের বিরোধী ছিলেন। তারপর তাদেরকে বিপদের ঝুঁকি না নেওয়ার জন্য উৎসাহিত করা; কেননা জেনারেল ইয়াহিয়া খানের পরিষদের অধিবেশনের জন্য তারিখ নির্ধারণ স্পষ্ট আত্মসমর্পণ। এটা তাদের কাছে মনে হয়েছিল যে, দু'বছর আগে ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খানের যে পরিণতি ঘটেছিল ইয়াহিয়া খানও অনুরূপ পরিণতির শিকার হবেন। প্রেসিডেন্ট সঠিকভাবে আগেই অনুমান করতে পারছিলেন যে, যুদ্ধ মাত্রই অন্যায় মনোভাবের লোকদের কাছে প্রবল আবেদন জাগবে। কেননা তারা ব্যালট বাক্সের মাধ্যমে বিজয়ের রসাস্বাদনের আশা করছেন।

সারারাত এবং দিনের একটি বিরাট অংশ ধরে আলাপ-আলোচনা চলল। তথাপি আওয়ামী লীগ কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারল না। স্পষ্টত তারা দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণের বিরুদ্ধে; কেননা তা ভয়াবহ পরিণাম ডেকে আনতে পারে। অবশেষে মুজিব প্রকাশ্যভাবে বলার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি বললেন যে, তিনি প্রেসিডেন্টের কাছে চার দফা দাবি পেশ করবেন এবং প্রদেশব্যাপী অহিংস আন্দোলনের নেতৃত্ব দান করবেন, যা নিশ্চিতভাবে বাঙালিদের দৃঢ় সংকল্পের কথা প্রকাশ করবে।

এই চার দফা হলো :

১. অবিলম্বে সামরিক আইন প্রত্যাহার করতে হবে;

২. সামরিক বাহিনীর লোকদের অবিলম্বে ছাউনিতে ফিরে যেতে হবে;

৩. নিহতদের জন্য তদন্ত করতে হবে এবং

৪. অবিলম্বে অর্থাৎ ২৫ মার্চ পরিষদের অধিবেশন বসার আগেই জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে।

দাবিগুলো ছিল সমঝোতা জাতীয়। এগুলোর লক্ষ্য অপরিবর্তনীয় থাকবে—যেমন, জনগণের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর ও সেনাবাহিনী প্রত্যাহার কিন্তু এর পদ্ধতি হবে অহিংস।

অসহযোগ আন্দোলনের সাফল্য সম্পর্কে শেখ মুজিবুর রহমানের বিশ্বাসের কারণ সম্পর্কে তিনি পূর্ণ সচেতন ছিলেন যে, তার হাতে জনগণের ক্ষমতারূপ শক্তিশালী অস্ত্র রয়েছে। প্রেসিডেন্টের অভিপ্রায়কে সঠিকভাবে বুঝতে তিনি হিসেবে ভুল করেছেন এবং সেজন্যই তিনি তাঁর চরম অস্ত্রের বাস্তব ব্যবহার করতে ব্যর্থ হলেন।

আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটি শেখ মুজিবের পরিকল্পনাকে অনুমোদন করতে দ্বিধা করেনি। স্পষ্টত এই ব্যবস্থা আরেকটি মধ্যপন্থা খুঁজে পেতে সাহায্য করেছিল। কিন্তু বাইরে অপেক্ষমাণ ছাত্রনেতাগণ সে সিদ্ধান্তের কথা শুনে স্পষ্টত নিরুৎসাহ হয়ে পড়লেন। রেসকোর্স ময়দানে যাওয়ার আগে শেখ মুজিব তাদের শান্ত করতে চেষ্টা করেন, কিন্তু দৃশ্যত তেমন ফল হয়নি।

শেখ মুজিব একজন বজ্রকণ্ঠী বক্তা। সেদিন রেসকোর্স ময়দানের বক্তৃতায় তিনি সব কিছুই ব্যবহার করেছেন— যথার্থ শব্দের মূর্ছনা, তীব্র শ্লেষ, বজ্রকণ্ঠের মন্ত্রপূত আহ্বান কিন্তু তিনি যা বলেছেন, তার সঙ্গে সে সময়ের জনগণের প্রত্যাশার মিল ছিল না। বক্তৃতার সময় জনতা উত্তেজনায় মাঝে মাঝে করতালি দিচ্ছিল এবং যথার্থ স্থানে প্রশংসাধ্বনি উচ্চারণ করছিল, তথাপি জনগণের যে প্রতিক্রিয়া দেখা গেল তা নিশ্চয়ই ঘটনার উপযোগী হয়নি। বক্তৃতা শেষ করার পর তিনি কিছুক্ষণের জন্য নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন এবং বিরাট জনসমুদ্রের দিকে তাকিয়ে জনতার নৈরাশ্যভাব উপলব্ধি করলেন। এবার তিনি আবার বঙ্গবন্ধু হয়ে গেলেন। তিনি তাঁর দৃষ্টি উত্তোলন করে বজ্রকণ্ঠে উদাত্ত আহ্বান জানালেন, 'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা'।

তথ্যসূত্র : দ্যা রেইপ অব বাংলাদেশ : এ্যান্থনি মাসকারেনহাস

পরিশিষ্ট–ঢ

বাংলাদেশ সরকার সংকলিত বাঙালিদের সংগ্রামের কালানুক্রমিক ঘটনাপঞ্জি

১৯৪৭ জুন, ২০ : বাংলা ব্যবস্থাপক সভার সদস্যগণ ৫৬-২১ ভোটে প্রদেশটিকে বিভক্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

আগস্ট, ২৫ : বন্যার জন্য পূর্ব পাকিস্তানে মারাত্মক খাদ্য পরিস্থিতির উদ্ভব হয়।

১৯৪৮ মার্চ, ১১ : রাষ্ট্রভাষার দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল পরিচালনার দায়ে শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করা হয়।

১৯৫০ অক্টোবর, ৬ : আজিজুল হক খসড়া শাসনতন্ত্র প্রণয়ন কমিটির রিপোর্টের নিন্দা করেন এবং বলেন যে, প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান প্রস্তাবিত যৌথরাষ্ট্রের আড়ালে তাঁর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার ষড়যন্ত্র করছেন।

নভেম্বর, ২৪ : মুসলিম লীগ পরিষদীয় দলের ১৩ জন সদস্য একটি যুক্ত বিবৃতি প্রচার করেন এবং তাতে পূর্ব বাংলার জন্য স্বায়ত্তশাসন দাবি করেন।

১৯৫২ ফেব্রুয়ারি, ২১ : মূলনীতি কমিটির রিপোর্টে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদা না দেয়ায় এর বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। পুলিশের গুলিতে ১৯ জন ছাত্র এবং আরো অনেক নিহত হয়।

মার্চ, ১৫ : প্রাদেশিক আইন পরিষদের অবসান ঘটিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে ৯২-ক ধারা জারি করা হয়।

মার্চ, ১৯ : আওয়ামী লীগের এইচএস সোহরাওয়ার্দী এবং কৃষক-শ্রমিক দলের এ কে ফজলুল হকের নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতাসহ প্রাদেশিক নির্বাচনে জয়লাভ করে এবং সরকার গঠন করে।

মে, ১৭ : প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী পূর্ব পাকিস্তানের গোলমালকে 'বিদেশী ষড়যন্ত্র' বলে অভিহিত করেন।

মে, ১৯ : যুক্তফ্রন্ট সরকারকে বরখাস্ত করা হয়। গভর্নরের শাসন জারি করা হয় এবং ইস্কান্দার মির্জাকে পূর্ব বাংলার গভর্নর হিসেবে ঢাকায় পাঠানো হয়।

আগস্ট, ৪ : পূর্ব পাকিস্তানে অভূতপূর্ব বন্যার প্রাদুর্ভাবের খবর পাওয়া যায়। তাতে লাখ লাখ লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

১৯৫৮ জুন, ২৪ : পূর্ব পাকিস্তানে প্রেসিডেন্টের শাসন বলবৎ করা হয়।

সেপ্টেম্বর, ২০ : প্রাদেশিক পরিষদের স্পিকারকে মানসিক দিক দিয়ে অসুস্থ বলে ঘোষণা করা হয়। ডেপুটি স্পিকার শাহেদ আলীকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়।

অক্টোবর, ৭ : পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি করা হয়। রাজনৈতিক দলগুলিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়।

অক্টোবর, ১২ : শেখ মুজিবুর রহমান, মওলানা ভাসানী এবং খান আবদুল গফফার খানকে গ্রেফতার করা হয়।

১৯৫৯ মে, ৮ : পূর্ব পাকিস্তানের প্রাক্তন বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী মনসুর আলীকে দুর্নীতির দায়ে গ্রেফতার করা হয়।

১৯৬০ সেপ্টেম্বর, ১২ : ঢাকায় শেখ মুজিবুর রহমানকে ফৌজদারি অসদাচরণের দায়ে অপরাধী সাব্যস্ত করা হয় এবং দু'বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেয়া হয়।

অক্টোবর, ১০ : পূর্ব বাংলার উপকূলবর্তী এলাকায় চব্বিশ ঘণ্টাব্যাপী ঘূর্ণিঝড়ের আঘাতের ফলে তিন হাজারেরও অধিক লোক নিহত হয়।

অক্টোবর, ৩১ : আরেকটি ঘূর্ণিঝড়ের ফলে বিশ হাজারেরও অধিক লোক নিহত হয়।

১৯৬১ মে, ৯ : পূর্ব পাকিস্তান পুনরায় ঘূর্ণিঝড়ের কবলে পড়ে; যার ফলে দু'হাজারেরও অধিক লোকের প্রাণ বিনষ্ট হয়।

সেপ্টেম্বর, ২১ : ঢাকায় আইয়ুববিরোধী শ্লোগানরত বিক্ষোভকারী ছাত্রদের ওপর গুলিবর্ষণ করা হয়। শত শত ছাত্রকে গ্রেফতার করা হয়।

সেপ্টেম্বর, ২৪ : সোহরাওয়ার্দি গণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবি করেন।

১৯৬২ এপ্রিল : পূর্ব পাকিস্তানে আইয়ুববিরোধী আন্দোলন চলে। বহু নিরস্ত্র লোক নিহত হয়। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার চারজন বাঙালি সদস্য পদত্যাগ করেন।

জুন, ৯ : সামরিক আইন তুলে নেয়া হয়। মৌলিক গণতন্ত্রের ভিত্তিতে নতুন শাসনতন্ত্র দেয়া হয়। পূর্ব পাকিস্তানের লোকেরা এর বিরোধিতা করে।

১৯৬৬ ফেব্রুয়ারি : শেখ মুজিবুর রহমান আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের জন্য তাঁর ছয় দফা কর্মসূচির কথা ঘোষণা করেন।

১৯৬৬ মার্চ, ২০ : শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর দলীয় কর্মীদের গ্রেফতার করা হয়।

মার্চ, ২৭ : মুজাফফরগড়ে চারজন বিরোধী মুসলিম লীগ নেতাকে গ্রেফতার করা হয়।

জুন, ৭ : পূর্ব বাংলার সর্বত্র আইয়ুববিরোধী বিক্ষোভ দেখা দেয়। পুলিশের গুলিতে হাজার হাজার নিরস্ত্র লোক নিহত হয়। স্বায়ত্তশাসনের দাবির সমর্থনে ৭ জুনের আহূত সাধারণ ধর্মঘট ঢাকা, চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ, ও তেজগাঁওয়ে দাঙ্গাহাঙ্গামায় পরিণত হয়।

জুন, ১৭ : আওয়ামী লীগ, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, কৃষকশ্রমিক দল এবং ঢাকা, চট্টগ্রাম, ও বরিশালের খ্যাতনামা নাগরিকগণ পূর্ব বাংলায় একটি 'ছায়া সরকার' গঠনের জন্য একটি ছয় দফা কর্মসূচি প্রণয়ন করেন।

১৯৬৭ ফেব্রুয়ারি, ২ : পূর্ব পাকিস্তানের বিরোধী দলীয় নেতৃবৃন্দ পূর্ব পাস্তিানের জন্য আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন লাভের উদ্দেশ্যে একটি যুক্তফ্রন্ট গঠন করেন।

এপ্রিল, ২৭ : 'অনিষ্টকর বক্তৃতা' দানের জন্য শেখ মুজিবুর রহমানকে ১৫ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেয়া হয়।

ডিসেম্বর, ৩ : আইয়ুবের একনায়কত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য 'পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট' (পিডিএম) গঠন করা হয়।

ডিসেম্বর, ১৭ : আঞ্চলিক বৈষম্য সম্পর্কে শাহাবুদ্দিনের রিপোর্ট জাতীয় পরিষদে পেশ করা হয়।

১৯৬৮ জানুয়ারি ৫ : পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার বৈষম্যকে সর্বসমক্ষে তুলে ধরার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করে।

জানুয়ারি, ৬ : পূর্ব বাংলাকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টার অপরাধে সেনাবাহিনীর কয়েকজন জুনিয়র অফিসারসহ ২৮ জন লোককে গ্রেফতার করা হয়।

জানুয়ারি, ১৮ : শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করা হয় এবং তাঁকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় জড়ানো হয়। ভারতের সাহায্যে পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার চেষ্টার অপরাধে তাঁকে অভিযুক্ত করা হয়।

জুলাই, ১৮ : পূর্ব পাকিস্তানের ১৭টি জেলা ঘূর্ণিঝড়ের কবলে পতিত হয়। হাজার হাজার লোক নিহত হয়।

ডিসেম্বর, ৭ : ঢাকা, চট্টগ্রাম, যশোর এবং পূর্ব পাকিস্তানের অন্যান্য শহরে আইয়ুব বিরোধী বিক্ষোভ দেখা দেয়। পুলিশের গুলিতে বহু লোক নিহত হয় এবং ৫০০ লোককে গ্রেফতার করা হয়।

ডিসেম্বর, ১৪ : চট্টগ্রামে পুলিশের গুলিবর্ষণে বহু লোক নিহত হয়। আইয়ুববিরোধী আন্দোলন খুবই জোরদার হয়ে ওঠে এবং তাঁর পতনকে আসন্ন করে তোলে।

১৯৬৯ মার্চ, ২৫ : প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সামরিক শাসন জারি করেন এবং জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদগুলি ভেঙে দেন।

মার্চ, ২৬ : ইয়াহিয়া খান ওয়াদা করেন যে, তিনি দেশে 'সুস্থ পরিবেশ' এনে দেয়ার পর জনগণের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন।

মার্চ, ২৮ : শেখ মুজিব একটি যৌথ রাষ্ট্রীয় সংগঠনের জন্য তাঁর পরিকল্পনা ঘোষণা করেন।

মার্চ, ২৯ : ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির নেতা মওলানা ভাসানীকে কাগমারীস্থ তাঁর গ্রামের বাড়িতে অন্তরীণ করা হয়।

মার্চ, ৩০ : মওলানা ভাসানী একটি জাতীয় সরকার গঠনের দাবি জানান।

এপ্রিল, ১০ : ইয়াহিয়া খান প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচন অনুষ্ঠানের অঙ্গীকার করেন।

নভেম্বর ২৮ : ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের নির্বাচনের তারিখ ১৯৭০ সালের ৫ অক্টোবর ধার্য করেন।

১৯৭০ জানুয়ারি, ১ : রাজনৈতিক দলগুলির কর্মতৎপরতার ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়া হয়।

এপ্রিল, ১ : ইয়াহিয়া খান পশ্চিম পাকিস্তানের এক ইউনিট ভেঙে দেয়ার আদেশ দেন।

সেপ্টেম্বর, ২ : পূর্ব পাকিস্তানের ঘূর্ণিঝড়ের জন্য ৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত নির্বাচন স্থগিত রাখা হয়।

ডিসেম্বর, ৭ : জাতীয় পরিষদের নির্বাচন সম্পন্ন হয়। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান যথাক্রমে আওয়ামী লীগ এবং জেড এ ভুট্টোর পিপল্স পার্টি প্রধান দল হিসেবে প্রতীয়মান হয়।

ডিসেম্বর, ৯ : শেখ মুজিব দাবি করেন যে, নতুন শাসনতন্ত্র তার ছয় দফার ভিত্তিতে প্রণীত হবে, যাতে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন অর্জিত হয়।

ডিসেম্বর, ১০ : মওলানা ভাসানী স্বাধীন ও সার্বভৌম পূর্ব পাকিস্তানের দাবি উত্থাপন করেন।

ডিসেম্বর, ১২ : পূর্ব পাকিস্তানের আরো তিনটি দল এই স্বাধীনতার দাবি সমর্থন করে।

১৯৭১ জানুয়ারি, ১৪ : ইয়াহিয়া খান শেখ মুজিবুর রহমানকে পাকিস্তানের ভাবী প্রধানমন্ত্রী বলে অভিহিত করেন।

জানুয়ারি, ২৯ : ঢাকায় শেখ মুজিবুর রহমান ও জেড এ ভুট্টোর মধ্যে যে শাসনতান্ত্রিক আলোচনা চলে, স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে তা পণ্ড হয়ে যায়।

ফেব্রুয়ারি, ১৩ : ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের উদ্বোধনের তারিখ ৩ মার্চ ধার্য করেন।

ফেব্রুয়ারি, ১৫ : ভুট্টো এই মর্মে হুমকি দেন যে, শেখ মুজিবুর রহমান যদি শাসনতন্ত্র প্রণয়নে তাঁর মতামত গ্রহণ না করেন, তাহলে তিনি পরিষদের অধিবেশন বর্জন করবেন।

ফেব্রুয়ারি, ১৬ : শেখ মুজিবুর রহমান আওয়ামী লীগ পরিষদের দলের নেতা নির্বাচিত হন।

ফেব্রুয়ারি, ১৮ : শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করেন যে, বাংলা সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার জন্য ইসলামকে ব্যবহার করা হবে না।

ফেব্রুয়ারি, ২১ : ইয়াহিয়া খান তাঁর মন্ত্রিসভা ভেঙে দেন।

ফেব্রুয়ারি, ২৮ : ভুট্টো জাতীয় পরিষদের উদ্বোধনী অধিবেশন মুলতবি রাখার দাবি জানান।

মার্চ, ১ : ইয়াহিয়া খান পরিষদের অধিবেশন মুলতবি ঘোষণা করেন এবং পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ভাইস-অ্যাডমিরাল এসএম আহসানকে বরখাস্ত করেন। পরিষদের অধিবেশন মুলতবি ঘোষণার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার জন্য শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকায় সাধারণ ধর্মঘট আহ্বান করেন।

মার্চ, ২ : ঢাকায় এবং অন্যান্য স্থানে আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণের মতো প্রচণ্ড গণবিক্ষোভ দেখা দেয়। সেনাবাহিনীর লোকেরা তাদের কাজে নেমে পড়ে এবং সান্ধ্য আইন জারি করা হয়।

মার্চ, ৩ : আওয়ামী লীগ অহিংস অসহযোগ আন্দোলন শুরু করে। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে নিয়ে ইয়াহিয়া খানের বৈঠকের প্রস্তাব শেখ মুজিবুর রহমান প্রত্যাখ্যান করেন।

মার্চ, ৫ : আওয়ামী লীগের স্বেচ্ছাসেবক ও সমর্থকদের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীর কর্মব্যবস্থা গ্রহণের ফলে ৩০০ লোক নিহত হয়।

মার্চ, ৬ : ইয়াহিয়া খান ঘোষণা করেন, ২৫ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসবে।

মার্চ, ৭ : শেখ মুজিবুর রহমান জনগণকে কর পরিশোধ করতে নিষেধ করেন এবং তাঁর কাছ থেকে আদেশ নেয়ার জন্য সরকারি কর্মচারীদেরকে নির্দেশ দেন। তিনি পরিষদের অধিবেশনে যোগদানের জন্য চারটি শর্ত আরোপ করেন। ইস্ট বেঙ্গল রাইফেলস বাহিনীর লোকেরা বাঙালি বিক্ষোভকারীদের ওপর গুলিবর্ষণ করতে অস্বীকার করে।

মার্চ, ৮ : আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হয়।

মার্চ, ৯ : পূর্ব পাকিস্তানের বিচারপতিগণ লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খানকে গভর্নর হিসেবে শপথ করাতে অস্বীকার করেন।

মার্চ, ১৪ : কেন্দ্রীয় সরকার ১৫ মার্চের মধ্যে সরকারি কর্মচারীদেরকে কাজে যোগদানের জন্য চরম আদেশ জারি করে।

মার্চ, ১৫ : শেখ মুজিবুর রহমান একপক্ষীয় স্বায়ত্তশাসন ঘোষণার কথা এবং পূর্ব বাংলার লোকদের প্রতি ৩৫টি নির্দেশ প্রচার করেন। ইয়াহিয়া খান ঢাকায় আগমন করেন।

মার্চ, ১৯ : ইয়াহিয়া ও মুজিবের মধ্যে শাসনতান্ত্রিক আলাপ-আলোচনা শুরু হয়।

মার্চ, ২১ : ভুট্টো ঢাকা আগমন করেন, পশ্চিম পাকিস্তানের দলগুলির নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে সলাপরামর্শ করেন। শেখ মুজিব ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে একটি অনির্ধারিত বৈঠকে মিলিত হন।

মার্চ, ২২ : ইয়াহিয়া খান পুনরায় জাতীয় পরিষদের উদ্বোধনী অধিবেশন মুলতবি ঘোষণা করেন।

মার্চ, ২৫ : আওয়ামী লীগ ইঙ্গিত দেয় যে, সেনাবাহিনীর হাতে আরো লোকের নিহত হওয়ার সংবাদ পাওয়া গেছে বলে শাসনতান্ত্রিক আলোচনায় অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আরো সেনাদলের আগমন ঘটে। ইয়াহিয়া, ভুট্টো এবং অন্যান্য নেতা রাওয়ালপিন্ডির উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করেন। গণহত্যা শুরু হয়।

পরিশিষ্ট–ণ

মুক্তিযুদ্ধের সেক্টরসমূহ

একাত্তরের জুনের শেষে ও জুলাইয়ের প্রথম দিকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ অত্যন্ত জোরদার হয়ে উঠল। সব সেক্টর থেকেই যুদ্ধজয়ের সুখবর আসতে লাগল। বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক কর্নেল (পরে জেনারেল) মোহাম্মদ আতাউল গনি ওসমানী অনেক আগেই বাংলাদেশের সমগ্র রণাঙ্গনকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করেছিলেন। ওই সব সেক্টরে বিভিন্ন সময়ে কমান্ডার বা অধিনায়ক যাঁরা ছিলেন তাঁরা হলেন—

সেক্টর-১ : চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং ফেনী নদী পর্যন্ত।

অধিনায়ক-মেজর জিয়াউর রহমান, এপ্রিল থেকে মে '৭১ পর্যন্ত এবং ক্যাপ্টেন (পরে মেজর) রফিকুল ইসলাম, জুন থেকে ডিসেম্বর '৭১ পর্যন্ত অধিনায়ক ছিলেন।

সেক্টর-২ : নোয়াখালী জেলা, আখাউড়া-ভৈরব রেললাইন পর্যন্ত কুমিল্লা জেলা, ঢাকা জেলা এবং ফরিদপুর জেলার কিছু অংশ।

অধিনায়ক-মেজর খালেদ মোশাররফ, এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর '৭১ পর্যন্ত এবং মেজর এটিএম হায়দার, সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর '৭১ পর্যন্ত অধিনায়ক ছিলেন।

সেক্টর-৩ : আখাউড়া-ভৈরব রেললাইন থেকে পূর্বে কুমিল্লা জেলা, সিলেট জেলার হবিগ মহকুমা এবং ঢাকা জেলার কিছু অংশ ও কিশোরগঞ্জ।

অধিনায়ক-মেজর কেএম শফিউল্লাহ, এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর '৭১ পর্যন্ত এবং ক্যাপ্টেন (পরে মেজর) এএনএম নূরুজ্জামান, সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর '৭১ পর্যন্ত অধিনায়ক ছিলেন।

সেক্টর-৪ : সিলেট জেলার পূর্বাঞ্চল, খোয়াই, শায়েস্তাগঞ্জ রেললাইন বাদে পূর্ব ও উত্তর দিকে সিলেট-ডাউকি সড়ক পর্যন্ত।

অধিনায়ক-মেজর সি আর দত্ত।

সেক্টর-৫ : সিলেট জেলার পশ্চিমাঞ্চল সিলেট-ডাউকি সড়ক থেকে সুনামগঞ্জ - ময়মনসিংহ জেলার সীমান্ত পর্যন্ত।

অধিনায়ক-মেজর মীর শওকত আলী।

সেক্টর-৬ : রংপুর জেলা এবং দিনাজপুরের ঠাকুরগাঁও মহকুমা (পরবর্তী সময়ে যুদ্ধ পরিচালনার সুবিধার জন্য রংপুর জেলার ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরবর্তী অঞ্চলসমূহ সেক্টর নং ১১-এর অধীনে দেওয়া হয়েছিল)।

অধিনায়ক-উইং কমান্ডার এম বাশার।

সেক্টর-৭ : দিনাজপুর জেলার দক্ষিণ অঞ্চল, রাজশাহী, পাবনা, বগুড়া জেলা (পরবর্তী সময়ে যুদ্ধ পরিচালনার সুবিধার জন্য রংপুর জেলার ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরের অঞ্চলসমূহ সেক্টর নং ১১-এর অধীনে দেওয়া হয়েছিল)।

অধিনায়ক-মেজর কাজী নূরুজ্জামান।

সেক্টর-৮ : কুষ্টিয়া, যশোর, ফরিদপুরের অধিকাংশ অঞ্চল এবং দৌলতপুর-সাতক্ষীরা সড়ক বাদে খুলনা জেলা পর্যন্ত।

অধিনায়ক-মেজর আবু ওসমান চৌধুরী, এপ্রিল থেকে আগস্ট '৭১ পর্যন্ত এবং মেজর এমএ মঞ্জুর, আগস্ট থেকে ডিসেম্বর '৭১ পর্যন্ত। যুদ্ধের শেষের দিকে সেক্টর-৯ তাঁর অধিনায়কত্বে দেওয়া হয়।

সেক্টর-৯ : দৌলতপুর-সাতক্ষীরা সড়ক থেকে দক্ষিণে খুলনা জেলা, বরিশাল জেলা ও পটুয়াখালী জেলা।

অধিনায়ক-মেজর এম এ জলিল, ডিসেম্বর '৭১ মাসের প্রথম দিক পর্যন্ত এবং মেজর জয়নাল আবেদীন, ডিসেম্বর '৭১ মাসের শেষ কয়েক দিন অধিনায়ক ছিলেন।

সেক্টর-১০ : নৌ-কমান্ডো সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চল ও অভ্যন্তরীণ নৌ-পথ। নৌ-কমান্ডোরা বিভিন্ন সেক্টরে নির্দিষ্ট মিশনে যখন নিয়োজিত থাকতেন তখন সংশ্লিষ্ট সেক্টর অধিনায়কের অধীনে কাজ করতেন।

সেক্টর-১১ : কিশোরগঞ্জ বাদে ময়মনসিংহ জেলা ও টাঙ্গাইল জেলা।

অধিনায়ক-মেজর আবু তাহের, আগস্ট থেকে নভেম্বর '৭১ পর্যন্ত। নভেম্বর '৭১-এ মেজর আবু তাহের গুরুতর অসুস্থ হওয়ার পর ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট এম হামিদুল্লাহ, নভেম্বর থেকে ডিসেম্বর '৭১ পর্যন্ত অধিনায়ক ছিলেন।

১ নং সেক্টরের প্রথম অধিনায়ক ছিলেন মেজর জিয়াউর রহমান। তার কাছ থেকে জুন মাসে ক্যাপ্টেন (পরে মেজর) রফিকুল ইসলাম (সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী) ১ নং সেক্টরের দায়িত্ব বুঝে নেওয়ার (পরে মেজর) জিয়াউর রহমানকে নতুন সেক্টর- ১১-এর দায়িত্ব দেওয়া হয়। ১১ নং সেক্টরের সেক্টর কমান্ডার হিসাবে মেজর জিয়াউর রহমান ওই নতুন সেক্টর অর্গানাইজ করেছিলেন। পাকিস্তান থেকে পালিয়ে আসার পর মেজর আবু তাহের ওই ১১ নং সেক্টরের দায়িত্ব মেজর জিয়াউর রহমানের কাছ থেকে বুঝে নেন।

১১টি সেক্টর ছাড়াও সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান সেনাপতি জেনারেল ওসমানী তিনটি ব্রিগেড আকারে ফোর্স গঠন করেছিলেন, সেগুলো হলো—

'জেড' ফোর্স : অধিনায়ক-মেজর (পরে লে. কর্নেল) জিয়াউর রহমান, জুলাই থেকে ডিসেম্বর ' ৭১ পর্যন্ত।

'কে' ফোর্স' : অধিনায়ক-মেজর (পরে লে. কর্নেল) খালেদ মোশাররফ, সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর '৭১ পর্যন্ত। তিনি আহত হলে মেজর আবু সালেক চৌধুরী অস্থায়ী অধিনায়ক হয়েছিলেন।

'এস' ফোর্স : অধিনায়ক-মেজর (পরে লে. কর্নেল) কে এম শফিউল্লাহ, সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর '৭১ পর্যন্ত।

স্বাধীনতা যুদ্ধের শেষের দিকে বাংলাদেশ বিমানবাহিনী যুদ্ধে যোগদান করে। অধিনায়ক ছিলেন এয়ার কমোডোর এ কে খন্দকার।

টাঙ্গাইল, ঢাকা, ময়মনসিংহ ও পাবনার কিছু অংশে কাদের সিদ্দিকী তাঁর বিরাট বাহিনী নিয়ে স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগদান করেন এবং অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে যুদ্ধ পরিচালনা করেন। তাঁর ওই বাহিনী 'কাদের বাহিনী' নামে বিশেষভাবে পরিচিত ছিল। স্বাধীনতা যুদ্ধে কাদের সিদ্দিকীর সফলতার জন্যে সবাই তাঁকে সম্মান দেখিয়ে 'বাঘা সিদ্দিকী' বলে ডাকেন।

নৌ-কমান্ডোরা বিভিন্ন সেক্টরে অধিনায়কদের অধীনে যুদ্ধ করেছিলেন।

মেজর আবু তাহের ১১ নং সেক্টরের দায়িত্ব জিয়াউর রহমানের কাছ থেকে বুঝে নেওয়ার আগে পর্যন্ত জিয়াউর রহমান যৌথভাবে ১১ নং সেক্টর এবং 'জেড ফোর্স' উভয়ের অধিনায়ক ছিলেন। 'জেড ফোর্স' গঠিত হয় জুলাই মাসে আর 'কে ফোর্স' ও 'এস ফোর্স' গঠিত হয় অনেক পরে— সেপ্টেম্বর মাসে। কর্নেল সাফাআত জামিল (অব.) তখন ব্যাটেলিয়ান কমান্ডারের দায়িত্বে ছিলেন। তিনি তৃতীয় বেঙ্গল রেজিমেন্টের অধিনায়ক ছিলেন।

সর্বজনাব সিরাজুল আলম খান, আব্দুর রাজ্জাক, শেখ ফজলুল হক মনি এবং তোফায়েল আহামদ— এই চারজনের যৌথ নেতৃত্বে বিখ্যাত 'মুজিব বাহিনী' গঠিত হয়েছিল। ভারতীয় সেনাবাহিনীর জেনারেল ওবানের অধীনে ছাত্রলীগের ছেলেরা 'মুজিব বাহিনী' নামে দেরাদুন সামরিক একাডেমি ও আসামের জাফলং-এ বিশেষ ধরনের সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। সাধারণ মুক্তিযোদ্ধাদের থেকে মুজিব বাহিনীর ছেলেরা অনেক উন্নত মানের প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র পেয়েছিল। পরবর্তী সময়ে তাঁরা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া অনেক অস্ত্র ব্যবহার করে। স্বাধীনতা যুদ্ধে তাঁরা সবাই বিশেষ অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছিল।

'মুক্তিবাহিনী' গঠনে আরও যেসব প্রখ্যাত ছাত্রনেতা পূর্ণ সহযোগিতা ও অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন, তাঁরা হচ্ছেন— সর্বজনাব আ স ম আব্দুর রব (সাবেক মন্ত্রী), নূরে আলম সিদ্দিকী, শাহজাহান সিরাজ (সাবেক মন্ত্রী), আব্দুল কুদ্দুস মাখন (মরহুম), নূরে আলম জিকু ও সরদার আমজাদ হোসেন।

পরিশিষ্ট–ত

স্বাধীনতার ঘোষক

[স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং ঐতিহাসিক স্বাধীনতা ঘোষণার মহান রূপকার বেলাল মোহাম্মদ-এর 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র' গ্রন্থের চুম্বকাংশ]

২৬ মার্চ সকালবেলা আমি ছিলাম এনায়েত বাজারে। ডাক্তার মোহাম্মদ শফীর বাসভবন মুশতারী লজে। রেডিওতে ঢাকা কেন্দ্রের অনুষ্ঠান চলছিল। শোনা গিয়েছিল সামরিক আইনের নির্দেশ ঘোষণা। হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল বেতারের অনুষ্ঠান।

আমার বাসা আগ্রাবাদে। সরকারি কলোনিতে। কয়েক দিন আগে স্ত্রী-পুত্র গ্রামের বাড়িতে গিয়েছিলেন। শূন্য ঘরে তালা দিয়ে আমি উঠে গিয়েছিলাম মুশতারী লজে। বেগম মুশতারী শফী মহিলা মাসিক 'বান্ধবী'র সম্পাদিকা। আমি সেই পত্রিকার পরিচালক। ২৫ মার্চ রাতে আমরা টেলিফোন পেয়েছিলাম ঢাকা থেকে। ঢাকায় গোলাগুলি শুরু হবার খবর। একজন পরিচিতা টেলিফোন করেছিলেন। টেলিফোন মাঝপথে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। সারারাত আমরা উদ্বিগ্ন ছিলাম। পরের দিন পরিস্থিতি যাচাই করছিলাম বাসায় বসে। অফিসে যেতে দেরি করছিলাম। তাই চট্টগ্রাম বেতার স্তব্ধ হয়েছিল।

সকাল ৮টার দিকে এসেছিলেন আবদুল্লাহ-আল ফারুক। বেতারের অনুষ্ঠান প্রযোজক। মাত্র মাস দুয়েক আগে চাকরিতে যোগ দিয়েছিলেন। অফিসে রওনা হয়েছিলেন। পথে লোকজনের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখে যাত্রাভঙ্গ দিয়ে এখানে চলে এসেছিলেন।

আবুল কাসেম সন্দ্বীপ ফটিকছড়ি কলেজের সহ-অধ্যক্ষ। নতুন চাকরিতে নিয়োজিত হয়েছিলেন। ছাত্রজীবনের শেষের দু'বছর আমার বাসায় ছিলেন। চাকরিতে যোগদানের পর থেকে প্রতি সপ্তাহশেষে বেড়াতে আসতেন। ২৫ তারিখে এসে বাসায় তালা দেখে চলে এসেছিলেন মুশতারী লজে। ডাক্তার শফী চাল-ডাল কিনে রেখেছিলেন। ঘরে ফ্লোরিং-এর জন্যে অনেক পরিসর।

কিন্তু বেতার কেন্দ্র বন্ধ থাকবে কেন? কথাটা মনে আসতেই একান্তে বেগম মুশতারী শফীকে বলেছিলাম, আচ্ছা, এখন তো রেডিওটা আমরা কাজে লাগাতে পারি।

তিনি উৎসাহী হয়েছিলেন। চালু করা হলে নিজেও যোগদানের আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। বলেছিলাম, এখন কথাটা কারো কাছে প্রকাশ করবে না।

বেলা ১১টার দিকে বাসা থেকে বেরিয়েছিলাম। শহরের পরিস্থিতি দেখার ছলে। আবুল কাসেম সন্দ্বীপ ও আবদুল্লাহ-আল ফারুক সঙ্গী হয়েছিলেন। গন্তব্য আওয়ামী লীগ

অফিস। স্টেশন রোডের রেস্ট হাউসে জহুর আহমদ চৌধুরীর দপ্তর। পরিচিতি দীর্ঘদিনের। এম আর সিদ্দিকী, জহুর আহমদ চৌধুরী, অধ্যাপক মোহাম্মদ খালেদ ও অধ্যাপক নূরুল ইসলাম চৌধুরী—এই কয়েকজনকেই শুধু চিনতাম। আমাকেও ওঁরা চিনতেন। এঁদের আনুকূল্য পেলেই বেতার চালু করা সম্ভব।

রেস্ট হাউসের গেটে কড়া প্রহরা। ভেতরে চত্বরে বারান্দায় লোকারণ্য। সব অচেনা মুখ। গেটের লাঠিয়াল রক্ষী কিছুতেই ভেতরে যেতে দেবেন না। বলেছিলাম, দেখুন, আমি রেডিওর বেলাল মোহাম্মদ। নেতাদের সঙ্গে জরুরি কথা আছে।

: কিন্তু ওঁরা তো কেউ নেই।

: তবু দয়া করে আমাকে অফিসে যেতে দিন। টেলিফোনে নেতাদের সঙ্গে কথা বলবো।

শুধু আমাকে যেতে দেয়া হয়েছিল। সঙ্গী দু'জনকে রাস্তায় অপেক্ষা করতে বলেছিলাম।

ভেতরে কর্মীরা সবাই করিৎকর্মা। সবাই ব্যতিব্যস্ত। কে কার কথা শোনে? তরুণ অ্যাডভোকেট রফিক টেলিফোন নিয়ে ব্যস্ত। ভিড় ঠেলে তাঁর কাছে গিয়েছিলাম। জানিয়েছিলাম নিজের পরিচয়। তিনি চিনেছিলেন। উদ্দেশ্যটা বলেছিলাম। আগ্রাবাদ বেতার ভবন এবং কালুরঘাট ট্রান্সমিটারে কয়েকজন শক্তসমর্থ কর্মী নিয়োগ করা দরকার। ভবন দুটো দখল করে আমরা নিজেদের কথা প্রচার করতে পারি। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ-গণসঙ্গীত-ঘোষণা।

অ্যাডভোকেট রফিক মনোযোগই দিতে পারছিলেন না। আমার কথার মাঝখানে টেলিফোন বেজে উঠেছিল। আবার বলতে হচ্ছিল নতুন করে কথাটা। বারবার বলবার পর তিনি বুঝেছিলেন। একে-তাকে ডেকে বলতে চেষ্টা করছিলেন আমাকে সহায়তা করার জন্যে। কিন্তু কে কার কথা শোনে?

হতাশ হয়েই কক্ষের বাইরে বারান্দায় বেরিয়ে এসেছিলাম। সেখানেই দেখা অধ্যাপক মমতাজ উদ্‌দীন আহমদের সঙ্গে। চোখ দুটি রক্তজবা। চোখে-মুখে ক্লান্তির ছাপ। সারারাত ঘুমাননি নিশ্চয়। বঙ্গবন্ধুর অসহযোগ আন্দোলনের বুদ্ধিজীবী সৈনিক। মাত্র দিন দশেক আগে লালদীঘির ময়দানে অনুষ্ঠিত হয়েছিল বুদ্ধিজীবীদের আহূত জনসভা। সেই সভাস্থলে মুক্তমঞ্চে অভিনীত হয়েছিল মমতাজ উদ্‌দীন আহমদের লেখা নাটক–'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'।

মমতাজ উদ্‌দীন আহমদ আমার পরিকল্পনাটি শুনেই লুফে নিয়েছিলেন। নিজের প্রভাব খাটিয়ে জোগাড় করেছিলেন একটি জীপ। সেই জীপে চেপে রেস্ট হাউস থেকে যাত্রা কোথায় যাওয়া যায়? প্রয়োজন শুধু বেতার কেন্দ্রে প্রহরা মোতায়েন করা। মমতাজ উদ্‌দীন আহমদই পরামর্শ দিয়েছিলেন ইপিআর-এর কমান্ডার রফিকের সঙ্গে যোগাযোগের। কমান্ডার তাঁর পরিচিত। রেলওয়ে বিল্ডিং-এর পাহাড়ে পাওয়া গিয়েছিল কমান্ডার রফিককে। তিনি প্রস্তাবটি শুনে গুরুত্ব দিয়েছিলেন বলেই মনে হয়েছিল আমার। বলেছিলেন, এক ঘণ্টার মধ্যে ২০ জন জোয়ান আগ্রাবাদে এবং ১৫ জন কালুরঘাটে পৌঁছে যাবে। আপনারা যান।

আমাদের তখন অনেক কাজ। বেতার চালু করা তো মুখের কথা নয়। প্রকৌশলিক দায়িত্বটিই প্রধান। বেতারের নিজস্ব কারিগরি কর্মীদের সহযোগিতা চাই। নিজে আমি ৭ বছর থেকে বেতার কর্মী। চুক্তিভিত্তিক নিজস্ব লেখক-শিল্পী। অনুষ্ঠান বিভাগের কর্মচারীদের সঙ্গে উঠাবসা। প্রকৌশলিক কর্মীদের কারো সঙ্গে তেমন বন্ধুত্ব গড়ে ওঠনি। একই অফিসের সবাইকেই হয়তো চিনতাম। আমাকেও চিনতেন সবাই। কিন্তু কে কোথায় থাকেন, জানা ছিল না। তখন তো বাড়ি বাড়ি গিয়ে যোগাযোগ করতে হবে। একজন ছিলেন মাহবুব হাসান। আমার মতোই চুক্তিভিত্তিক বেতারকর্মী। নাটকের রেকর্ডিং এবং ডাবিং-এর কাজে স্টুডিওতে নিত্য আনাগোনা। দেখে দেখে বেতারের বুথ-এ অপারেটিং-এর কাজও শিখে নিয়েছিলেন। জীপে রাবেয়া খাতুন লেনে মাহবুব হাসানের বাসায় গিয়েছিলাম আমি ও মমতাজ উদ্‌দীন আহমদ। ইতোমধ্যে দুপুর গড়িয়ে গিয়েছিল। মাহবুব হাসান ভাত খাচ্ছিলেন। হাতে হাতে প্লেট নিয়ে আমরাও কিছু খেয়ে নিয়েছিলাম।

দু'জন বেতার প্রকৌশলী মোসলেম খান ও দেলওয়ার হোসেন। চকবাজার এলাকায় তাঁদের বাসা। সহযোগিতায় তাঁদের আপত্তি নেই। তবে একটা শর্ত ছিল। আঞ্চলিক পরিচালক এবং আঞ্চলিক প্রকৌশলীর সুস্পষ্ট অনুমতি থাকতে হবে। বেশ তো, সেই অনুমতি নেয়া হবে। তাঁদের দু'জনকে জীপে তুলে নিয়ে কালুরঘাট ট্রান্সমিটার ভবনে নামিয়ে দেয়া হয়েছিল। ট্রান্সমিটার চালু করার ব্যবস্থা হয়েছিল।

এখন অন্যান্য প্রস্তুতি। কালুরঘাট থেকে সেই জীপে আমরা তিনজন আগ্রাবাদের দিকে ছুটেছিলাম। পথে চট্টগ্রাম কলেজ গেটে এসে নেমে গিয়েছিলেন মমতাজ উদ্‌দীন আহমদ। উদ্দেশ্য, একটু বাসায় যাওয়া। সেই ভোরবেলায় বেরিয়েছিলেন। সবাই নিশ্চয় চিন্তাভাবনা করছেন। এ ছাড়া আরো কাজ ছিল। বেতার চালু করলেই তো হবে না! চালু করে কি প্রচার করা হবে! সে সব লিখতে হবে এবং ভালো ভালো কণ্ঠে প্রচার করতে হবে। কাজেই তিনি এ অবকাশে কয়েকজন ব্রডকাস্টারের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। তাঁদেরকে নিয়ে আগ্রাবাদে পৌঁছে যাবেন। কিন্তু সেই যে তিনি বিদায় নিয়েছিলেন, সে দিন আর আমার সঙ্গে যোগ দিতে পারেননি।

জীপে এখন আমি ও মাহবুব হাসান। আগ্রাবাদ রোডে বাদামতলিতে প্রথম ব্যারিকেড। দু'দিন আগে চট্টগ্রাম বন্দরে নোঙর করেছিল অস্ত্রবাহী জাহাজ বাবর ও সোয়াত। সারাদেশে বঙ্গবন্ধু আহূত অসহযোগ আন্দোলন। এ সময়ে অস্ত্রবাহী যুদ্ধজাহাজ এসে বন্দরে ভিড়েছিল। রটে যাওয়ামাত্রই আক্রোশে ফেটে পড়েছিল মানুষ। বন্দর থেকে স্ট্যান্ড রোড-আগ্রাবাদ রোড হয়ে সেনানিবাসের পথ। অস্ত্র আর গোলাবারুদ যেন সেনানিবাসে নিয়ে যেতে না পারে, পথে পথে তৈরি হয়েছিল ব্যারিকেড। স্বতঃস্ফূর্তভাবে। দেখতে না দেখতেই বড়ো বড়ো কাঠপাথর স্তূপাকার করা হয়েছিল এখানে-ওখানে। পিচের ড্রাম রাস্তার ওপর টেনে এনে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়েছিল।

বাদামতলিতে জীপ থেকে নেমে পড়তে হয়েছিল। হেঁটে দু'মিনিটের পথ। বেতার ভবনের গেটে কোনো প্রহরা ছিল না। সম্পূর্ণ এলাকা জনশূন্য। আমি ও মাহবুব হাসান

সোজা গিয়ে প্রধান নিয়ন্ত্রণ কক্ষে ঢুকেছিলাম। অন্ধকার ঘর, বৈদ্যুতিক সুইচ টিপে আলো জ্বালানো হয়েছিল। আর তখনই বেজে উঠেছিল টেলিফোন। ট্রান্সমিটার ভবন থেকে দুই প্রকৌশলী– তাঁরা কেটে পড়তে চেয়েছিলেন। কেননা টেলিফোনে তাঁদের কথা হয়েছিল আঞ্চলিক প্রকৌশলীর সঙ্গে। তিনি সম্মতি দেননি। মহাসমস্যা। বলেছিলাম, দয়া করে একটু অপেক্ষা করুন আপনারা। আমরা লিখিত অনুমতি নিয়ে আসছি।

টেলিফোন করেছিলাম আঞ্চলিক প্রকৌশলীর বাসায়। মীর্জা নাসির উদ্দীন সকাতরে বলেছিলেন, দেখুন, দুপুরবেলা আওয়ামী লীগের হান্নান সাহেব আমাদেরকে জোর করে ধরে নিয়ে গেলেন। ট্রান্সমিটার চালু করালেন। শেখ সাহেবের স্বাধীনতা ঘোষণা প্রচার করলেন। তারপর সরে পড়লেন। তাঁরা তো আমাদেরকে দিয়ে কাজ করাবেন। পরে আমাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব কে নেবে?

স্বভাবত বিষয়টি আমার জানা ছিল না। চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ হান্নান। তাঁকে আমি চিনতাম না। ২৬ মার্চ দুপুরে তিনি আঞ্চলিক প্রকৌশলী মীর্জা নাসিরউদ্দীন এবং বেতার প্রকৌশলী আবদুস সোবহান, দেলওয়ার হোসেন ও মোসলেম খানের প্রকৌশলিক সহযোগিতা আদায় করেছিলেন। পাঁচ মিনিট স্থায়ী একটি বিক্ষিপ্ত অধিবেশন। ওতে তিনি নিজের নাম-পরিচয়সহ বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচার করেছিলেন।

মীর্জা নাসিরউদ্দীনকে বলেছিলাম, এখন আর ভয়ের কারণ নেই। কমান্ডার রফিকের সঙ্গে আমাদের কথা হয়েছে। তিনি জোয়ান মোতায়েন করবেন। জোয়ানরা এখনই এসে পড়বে।

: বেশ তো, বাধ্যবাধকতার পরিবেশ তৈরি হলে তো ভালোই। কিন্তু এ কাজে আমার অনুমতির প্রয়োজন কি?— তিনি অনুনয় করে বলেছিলেন, দেখুন, বেলাল সাহেব, এসবের পরিণতি কি হবে, বলা যায় না। আমাদের পরিবার-পরিজন রয়েছে।

আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছিল। বলেছিলাম, কথা বাড়িয়ে লাভ নেই, স্যার! আপনি ট্রান্সমিটারে টেলিফোন করে ওঁদেরকে অনুমতি দিয়ে দিন।

: আচ্ছা, একটা কথা কেন বুঝতে চাইছেন না! আমি অনুমতি দেবার কে? আমি তো এখানে দু'নম্বর। আপনি আর-ডি সাহেবের অনুমতি নিচ্ছেন না কেন?

আঞ্চলিক পরিচালক নাজমুল আলমের বাসায় টেলিফোন ছিল না। কয়েকদিন আগেই বাসা বদল করেছিলেন। তখনো টেলিফোন লাগেনি। মীর্জা নাসিরউদ্দিন জানিয়েছিলেন, আর-ডি সাহেব এখন এ-আর-ডি ওয়ানের বাসায়। একটু আগেই আমার সঙ্গে কথা হয়েছে। ওখানে টেলিফোন করুন।

সেই মুহূর্তে নিয়ন্ত্রণ-কক্ষে প্রবেশ করেছিলেন আবুল কাসেম সন্দ্বীপ ও আবদুল্লাহ আল ফারুক। চোখ-মুখ শুষ্ক। চুল উষ্কখুষ্ক। স্টেশন রোডের রেস্ট হাউসের সামনে আমার জন্যে অপেক্ষা করেছিলেন কিছুক্ষণ। পরে শহরের এদিক-সেদিক ঘোরাঘুরি করে ফিরে

গিয়েছিলেন মুশতারী লজে। ডাক্তার শফী উদ্বিগ্ন ছিলেন আমার জন্যে। ওঁরা আমার খবর বলতে পারেননি। অনুযুক্ত হয়েছিলেন আমাকে ছেড়ে ঘরে ফেরার জন্যে। অতিথি হিসেবে আমিই মুখ্য। আমার সুবাদেই এ-বাড়িতে ওঁরা অতিথি হয়েছিলেন। দু'জনেই অপ্রস্তুত হয়েছিলেন। সেই মুহূর্তে আমার খোঁজে বেরিয়ে পড়েছিলেন। বেগম মুশতারী শফী পথনির্দেশ করেছিলেন, বেতার কেন্দ্রে আমাকে পাওয়া যাবে।

সহকারি আঞ্চলিক পরিচালক সৈয়দ আবদুল কাহহারের নাম্বারে ডায়াল করে কি মনে করে রিসিভারটি ধরিয়ে দিয়েছিলেন, আবুল কাসেম সন্দ্বীপের হাতে। সৈয়দ আবদুল কাহহার জানতে চেয়েছিলেন, ওখানে আমাদের কে আছে?

: বেলাল ভাই আছেন।

: টেলিফোন ওঁকে দিন।

রিসিভার হাতে নিয়ে অস্পষ্ট আলাপ শুনেছিলাম। নাজমুল আলম ও সৈয়দ আবদুল কাহহারের কণ্ঠ। কথা আবদুল কাহহারই বলেছিলেন।

: বেলাল সাহেব, আপনারা বেতার চালু করতে চান, করুন। তবে আগ্রাবাদে থাকবেন না। আপনারা কালুরঘাটে চলে যান। ওখানে একটা ক্ষুদে স্টুডিও আছে। ও থেকেই সব প্রচার করতে পারবেন। আপনাদেরও সুবিধা হবে। আগ্রাবাদ চট্টগ্রাম বন্দর থেকে খুব কাছে। এলাকাটার যে কোনো সময়ে পতন ঘটতে পারে। তখন গোলাগুলি হলে আপনারও মরবেন, বেতারের যন্ত্রপাতিও নষ্ট হবে।

শব্দ প্রক্ষেপণের জন্যে ট্রান্সমিটার ভবন স্বয়ংসম্পূর্ণ। পরামর্শটি মাহবুব হাসানও এক কথায় মেনে নিয়েছিলেন। দ্রুত বেরিয়ে এসেছিলাম আমরা নিয়ন্ত্রণ কক্ষ থেকে।

বেতার ভবনের গাড়ি বারান্দায় হোসনে আরাকে দেখতে পেয়েছিলাম। আমাদের একজন অনুষ্ঠান ঘোষিকা। সঙ্গে একজন অপরিচিত ভদ্রলোক। নিজের চাচা হিসেবে ডাক্তার আনোয়ার আলীকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন হোসনে আরা। আওয়ামী লীগের একজন কর্মী। বলেছিলেন, আপনারা তো বেতার চালু করবেন— কিন্তু কি প্রচার করবেন, ঠিক করেছেন কি?

বলেছিলাম, সে তো ঠিক করাই আছে। বঙ্গবন্ধু আর স্বাধীনতা। এর বেশি আর এ মুহূর্তে প্রচার করার কিছুই নেই।

আনোয়ার আলী আমার হাতে একটি সাইক্লোস্টাইল করা ক্ষুদে হ্যান্ডবিল এগিয়ে দিয়েছিলেন। শিরোনাম 'জরুরি ঘোষণা'। নিচে 'স্বাক্ষর শেখ মুজিবুর রহমান'। বক্তব্য বিষয় : অদ্য রাত ১২টায় বর্বর পাক-বাহিনী ঢাকার পিলখানা এবং রাজারবাগ পুলিশ লাইনে অতর্কিতে হামলা চালায়। লক্ষ লক্ষ বাঙালি শহীদ হয়েছেন। যুদ্ধ চলছে। আমি এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করছি এবং সমস্ত বিশ্বের স্বাধীনতাকামী দেশসমূহের কাছ থেকে সাহায্য প্রার্থনা করছি। 'জয় বাংলা'।

এটি পাঠ করেই আমি তো উচ্ছ্বসিত। বলেছিলাম, বাহ্, এটা দিয়েই অনুষ্ঠান প্রচার শুরু করবো। কাগজটি হাতে নিয়েই ছুটেছিলাম রাস্তার দিকে। সদ্য পরিচিত ডাক্তার আনোয়ার আলীকে ধন্যবাদ জানানো ছাড়াই।

মাহবুব হাসান বলেছিলেন, কাছেই তো আর-ই সাহেবের বাসা। চলুন, একটা কাগজে অনুমতি লিখিয়ে নিয়ে যাই। নইলে—

বলেছিলাম, ভালোই হয়।

: আর না-হয় বলবো, ট্রান্সমিটারে টেলিফোন করে বলে দিতে। তারপর টেলিফোন লাইনটা কেটে দিয়ে যাবো।

মীর্জা নাসিরউদ্দিন তখন আর দ্বিমত করেননি। শুধু বলেছিলেন, এমন একটা পরিবেশ তৈরি করবেন, যেন কর্মীরা বাধ্য হয়ে কাজ করেছেন, প্রমাণ থাকে। বোঝেন তো, পরিণতি কি হবে, আমরা কেউ বলতে পারি না।

আগ্রাবাদ রোডে আমাদের জীপটি ছিল না। এদিকে বিকেল গড়িয়ে গিয়েছিল। এখন কালুরঘাটে যাওয়ার উপায়? এগিয়ে এসেছিলেন ডাক্তার আনোয়ার আলী। তাঁর গাড়ি ছিল। তিনি আমাদের পৌঁছিয়ে দিতে পারেন। গাড়িতে ছিলেন হোসেনে আরা এবং স্টিয়ারিং ধরে অন্য একজন।

পথে জনতার মধ্য থেকে ব্যাকুলভাবে ছুটে এসে গাড়িতে উঠেছিলেন প্রবীণ কবি আবদুস সালাম। হাতে খোলা কলম। খোলা খাতার পাতায় বেতার ভাষণের খসড়া।

: নাতি, এই আমার লেখা। আমি প্রচার করতে চাই। পড়ে দেখে ঠিক করে দাও।

চলন্ত গাড়িতেই সংশোধন ও শব্দান্তর করে নিয়েছিলাম। ভাষণটিতে কোরানের বাণী ছিল। চমৎকার বক্তব্যটি ছিল : 'দেশবাসী ভাই-বোনেরা।... সমস্ত প্রকার অস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত থাকুন। যারা নিরস্ত্র তারা অন্তত সোডার বোতল বাজী প্রস্তুত করে মরিচের গুঁড়োর ঠোঙ্গা বানিয়ে ওদের [অবাঙালি সৈনিক] প্রতি নিক্ষেপ করলে টিয়ার গ্যাসের কাজ করবে। বিজলী বাতির বাল্বে এসিড ভরে তা-ও নিক্ষেপ করুন। ইত্যাদি।

রেয়াজুদ্দীন বাজারের কাছাকাছি গাড়ি থামানো হয়েছিল। মাহবুব হাসান বলেছিলেন, এক কাজ করলে হয়। আর-ই সাহেব তো বলেছেন বাধ্যবাধকতার পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। কিন্তু ক্যাপ্টেন রফিক কি জোয়ানদের পাঠিয়েছেন? মনে তো হয় না। পাঠালে তারা আগ্রাবাদে পৌঁছে যেতো। কালুরঘাটে গিয়েও দেখা যাবে কেউ যায়নি।

: সত্যি তাই। এখন কি করা যায়?

: আমি বরং এখানে নেমে পড়ি। দেখি, আওয়ামী লীগ অফিস থেকে লাঠিয়াল গোছের কয়েকজন কর্মীকে নিয়ে যেতে পারি কি-না। মাহবুব হাসান নেমে পড়েছিলেন। সেদিন বা আর কোনোদিন তিনি আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারেননি।

গাড়িতে ড্রাইভিং সীটের পাশে বসেছিলাম। ট্রান্সমিটার ভবনের সামনে বাঁক ফেরার জন্যে গাড়ির গতি কমানো হয়েছিল। তখনই লাফিয়ে নেমে পড়েছিলাম আমি। পথরোধ করে দাঁড়িয়েছিলাম একটি রিকশার। রিকশাটির আরোহী মোসলেম খান ও দেলওয়ার হোসেন।

: কি ব্যাপার, আপনারা কোথায় যাচ্ছেন? চলে যাচ্ছেন কেন?

তাঁরা অনুনয় করে জানিয়েছিলেন, একটু আগেই আর-ই সাহেব টেলিফোনে তাঁদেরকে সাবধান করে দিয়েছেন। যদি বেতার চালু করা হয়, সেটা তাঁদের নিজ দায়িত্বে করা হবে। কাজেই এতো বড় ঝুঁকি তাঁরা নিতে পারেন না।

আমিও অনুনয় সহকারেই বলেছিলাম, দয়া করে আপনারা চলে যাবেন না। আপনাদের কোনো ভয়ের কারণ নেই। আপনারা যেন বাধ্য হয়েই সহযোগিতা করছেন, এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি করা হবে।

কথাটা বলেছিলাম। তাঁদেরকে ট্রান্সমিটার ভবনে ফিরিয়েও নিয়ে এসেছিলাম। কিন্তু সেই মুহূর্তে সমস্যাটির প্রতিকার কি? এগিয়ে এসেছিলেন ডাক্তার আনোয়ার আলী। দ্রুত বেরিয়ে গিয়েছিলেন গাড়ি নিয়ে। ফিরেও এসেছিলেন অল্প সময়ের মধ্যে। সঙ্গে কয়েকজন জোয়ান। সবাই রাইফেলধারী। এবারে পরিস্থিতি অনুকূল হয়েছিল।

এখন তৈরি করতে হবে ঘোষণা-লিপি। ট্রান্সমিটার ভবনের অফিস কক্ষের টেবিলটা পূর্ণ দখলে। এক খণ্ড কাগজে লিখেছিলাম 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র'।

আবুল কাসেম সন্দ্বীপ বলেছিলেন, বেলাল ভাই, 'বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র' বললে ভালো হতো না?

: বেশ তো। 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র'। লেখার মাঝখানে তীর-চিহ্ন দিয়ে 'বিপ্লবী' শব্দটি লিখেছিলাম। অবশ্য দু'দিন পরেই ২৮ মার্চ কেন্দ্রের নাম থেকে 'বিপ্লবী' শব্দটি বাদ দেয়া হয়েছিল। মেজর জিয়াউর রহমানের বরাত দিয়ে লে. শমশেরের প্রস্তাবক্রমে।

লেখালেখির সময় সেখানে এসেছিলেন সুলতানুল আলম—চট্টগ্রাম বেতারের একজন নৈমিত্তিক ঘোষক। আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন ঘোষণা প্রচার করার। আমি সম্মতি দিয়েছিলাম। হোসনে আরাকে অনুষ্ঠান ঘোষণা করার সুযোগ দেয়া হয়নি। বলেছিলাম, আপনার উপস্থিতিতে আমরা উৎসাহিত। কিন্তু আমাদের এটি একটি গুপ্ত বেতার কেন্দ্র। আমরা শুধু কেন্দ্রের নাম প্রচার করবো। স্থানের উল্লেখ করবো না। এখানে মহিলা কর্মীর সমাবেশ শোভন দেখাবে না। বিশেষ করে রক্ষণশীল শ্রোতাদের কাছে।

যুক্তিটি হোসনে আরার মনঃপূত হয়েছিল কিনা, জানি না। পরে আর তিনি আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেননি।

ঘোষণা-লিপি চূড়ান্ত হবার পর আবুল কাসেম সন্দ্বীপ আমার কানে কানে বলেছিলেন, কেন্দ্রের নাম-ঘোষণাটি সুলতানুল আলমকে দিয়ে করাবেন না। কারণ সে 'বিপ্লবী' শব্দটি বলতে চাইবে না।

: তার মানে? আমি যা লিখে দিচ্ছি, সেটাই তো প্রচার করা হবে।

: না, আপনি জানেন না। এটা মানসিকতার ব্যাপার।

বলেছিলাম : আমি অতশত বুঝি না। সমাধান কি, তাই বলো।

তিনি বলেছিলেন : প্রথম নাম-ঘোষণাটি আপনি অথবা আমি করবো।

: বেশ তুমিই করো।

কাগজপত্র গুছিয়ে নিয়ে স্টুডিওতে যাবার জন্যে দাঁড়িয়েছিলাম। তখনই টেলিফোন বেজে উঠেছিল। অন্য প্রান্ত থেকে দ্রুত এবং চাপা কণ্ঠ ভেসে এসেছিল।

: বেলাল সাহেব, আপনারা দেরি করছেন কেন? যা পারেন, প্রচার শুরু করে দিন। এখন সাড়ে সাতটা। লোকেরা রেডিওর কাঁটা ঘোরাচ্ছে। পৌনে ৮টা বাজলেই 'আকাশ-বাণী' ধরবে। আপনাদেরটা কেউ শুনবে না।

বলেছিলেন বার্তা সম্পাদক সুলতান আলী। তিনি দু-একটা সংবাদ-তথ্যও বলে দিয়েছিলেন।

ঠিক সন্ধে ৭-৪০ মিনিটে আবুল কাসেম সন্দ্বীপের কণ্ঠে প্রচারিত হয়েছিল : 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র থেকে বলছি'।

একই নাম-ঘোষণা পরে আব্দুল্লাহ্-আল ফারুক এবং সুলতানুল আলমের কণ্ঠেও প্রচারিত হয়েছিল সেই অধিবেশনে। ডাক্তার আনোয়ার আলীর কাছ থেকে পাওয়া হ্যান্ডবিলটিও বারবার প্রচারিত হয়েছিল বিভিন্ন কণ্ঠে। বঙ্গবন্ধুর নামাঙ্কিত 'জরুরি ঘোষণা'। এবং কবি আবদুস সালামের ভাষণ।

অধিবেশন চলাকালে আমি স্টুডিওতেই অবস্থানরত ছিলাম। ক্ষুদে স্টুডিও। জরুরি অবস্থায় কাজ চালাবার উপযোগী। কেউ একজন আমাকে হাত ইশারায় বাইরে ডেকে নিয়েছিলেন। স্টুডিওর বাইরে দাঁড়িয়েছিলেন দু'জন আগন্তুক। একজন আমার পূর্ব পরিচিত ডাক্তার আবু জাফর। অন্যজন এম এ হান্নান। বলেছিলেন, আপনারা মাইকে আমার নাম ঘোষণা করুন। আমি বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র প্রচার করবো।

: জি আচ্ছা। তবে একটা কথা। আপনার নামটা প্রচার করা হবে না। আপনি নিজের কণ্ঠে শুধু এটি পাঠ করবেন।

কেন, দুপুরবেলা আমি তো আমার নামসহ এটি প্রচার করেছিলাম। এখন অবশ্য বক্তব্যটি একটু বড়ো করে লেখা হয়েছে।

বলেছিলাম, দুপুরবেলা আপনি চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে ঘোষণাপত্রটি প্রচার করেছিলেন। এখন তা নয়। এখন থেকে এ হচ্ছে একটি গুপ্ত বেতার কেন্দ্র। এখান থেকে নিয়মিত অনুষ্ঠান প্রচার করা হবে। তাই কোথায় এর অবস্থান, তা আমরা শত্রুদেরকে জানাতে চাই না। জানলেই তো বিপদ। সহজেই ওরা আক্রমণ করতে পারবে। এমনিতেও তারা যন্ত্রের (ম্যাগনেটিক ওয়েভ) সাহায্যে আমাদের অবস্থান জানতে পারবে। তবে তার জন্যে তাদের কিছুটা সময় লাগবে।

আরো বলেছিলাম, চট্টগ্রামের শ্রোতারা কিন্তু আপনার কণ্ঠস্বর ঠিকই চিনতে পারবেন।

এম এ হান্নান মেনে নিয়েছিলেন এবং নাম ঘোষণা ছাড়াই বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র প্রচার করেছিলেন। বেতারে নিজের কণ্ঠে দ্বিতীয়বার।

প্রায় আধঘণ্টা স্থায়ী হয়েছিল এই সূচনা অধিবেশন। প্রক্ষেপণের কাজে নিজের ইচ্ছায় এসে যোগ দিয়েছিলেন মেক্যানিক আবদুশ শুকুর। কালুরঘাট পর্যায়ে তিনি শেষ দিনটি পর্যন্ত প্রকৌশলিক সহযোগিতায় নিয়োজিত ছিলেন।

অধিবেশনের সমাপ্তিতে আমরা পরদিন সকাল ৭টার পর আবার অনুষ্ঠান প্রচার করা হবে, এই ঘোষণা দিয়েছিলাম।

ভাবাবেগে আপ্লুত হয়েছিলেন আবুল কাসেম সন্দ্বীপ। বলেছিলেন, বেলাল ভাই, বঙ্গবন্ধু সারাজীবন রাজনীতি করে পাকিস্তানের কাছে দেশদ্রোহী হয়েছেন। আর আমরা আজ একটিমাত্র ঘোষণা প্রচার করেই দেশদ্রোহী হলাম।

বলেছিলাম, দেশদ্রোহী বা দেশপ্রেমিক যা-ই হই, এখন আর পিছু হটবার পথ নেই। এগিয়েই যেতে হবে।

কাগজপত্র গুছিয়ে বাইরে এসে দেখেছিলাম সব ফাঁকা। ভবনের প্রাঙ্গণ জনশূন্য। ডাক্তার আনোয়ার আলী বা তাঁর পিক-আপটিও নেই। রাইফেলধারী জোয়ানরাও নেই। কেবল গেটের কাছে একটি জীপ স্টার্ট নিচ্ছে। এম এ হান্নানের জীপ। ছুটে গিয়ে তাঁকে বলেছিলাম, আমরা তিনজন শহরে যাবো।

: গাড়িতে জায়গা হবে না— বলেই ড্রাইভারকে ইঙ্গিত করেছিলেন গাড়ি ছেড়ে দিতে। আমরা তিনজন— আমি, আবুল কাসেম সন্দ্বীপ ও আবদুল্লাহ-আল ফারুক। সেই বিজন এলাকায়, সেই উদ্বেগের রাতে আমরা জীপটির ছুটে চলে যাওয়া দেখেছিলাম হতবাক দাঁড়িয়ে থেকে। আমিই মুখ খুলেছিলাম, এরাই নেতৃত্ব দেবে! গাড়িতে জায়গা নেই, কিন্তু তিনি তো একটু জানতে চাইবেন সমস্যাটা! একটু তো ভাববেন! পিতৃত্ব ছাড়া নেতৃত্ব হয় না।

সারা পথে রিকশা ছিল না। আলো ছিল না। ৩/৪ মাইল পথ পায়ে হেঁটে আমরা মুশতারী লজে পৌঁছেছিলাম। তখন রাত সাড়ে ১০টা।

ডাক্তার মোহাম্মদ শফী প্রাণবন্ত অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন। জড়িয়ে ধরে আমার কপালে চুমো খেয়েছিলেন। আনন্দে আর গর্বে ছিলেন অশ্রুসজল।

'এই দিনটি' শিরোনামে ১৯৭৩-এর ২৬ মার্চ চট্টগ্রামের দৈনিক 'স্বাধীনতা'য় পত্রস্থ হয়েছিল আমার কবিতা :

এই দিনটি আমার দিন
হান্নানের দিন
সালামের দিন
কাসেমের দিন, ফারুকের দিন—
এই দিনটিতে কালুরঘাট ট্রান্সমিটারে
একটি ছিন্নপত্রে আমি
লিখেছিলাম একটি নাম :
'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র'—
মাইকের সামনে কাসেমকে
সেটা পড়তে দিয়েছিলাম।

হান্নান ঘোষণা করেছিলেন।
সালাম ভাষণ দিয়েছিলেন।

১৯৭১-এর এই দিনটির পর পটিয়া থেকে
আমি ডেকে এনেছিলাম ট্রান্সমিটারে
মেজর জিয়াকে— তারপর এসেছিল
একে একে আমাদের হাবিবুদ্দীন,
আমিন, রাশেদ, শারফুজ্জামান,
শাকের, মুস্তফা, রেজাউল।

কিন্তু আল্লাহর কসম, সেদিন
আমি জানতাম না, এ দিনটি
হবে একটা দেশের স্বাধীনতা দিবস ॥ (১৮.৩.৭৩)

কবিতাটি আমার 'সামনে আছে মুক্তিযুদ্ধ : সবার আগে খাদ্য' কাব্যগ্রন্থে সংকলিত। একই কবিতার স্বকৃত অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল 'People's View' পত্রিকায় ১৯৭৬ সালে :

O'let me commemorate a day of mine
And this is a day of mine
The day of late Hannan
The day op poet Salam
The day of Kasem and Faruq—
On this day at Kalurghat Transmitter
I wrote on a loose sheet
A golden name
'Swadhin Bangla Betar Kendra'
(The Free Bangla Radio).
And I allowed Kasem to b'cast it
And Hannan made an announcement.
Salam read out a script.
O'let me commemorate a day—

This day of 1971.
And a day after this day
I contacted the them Major Zia,
Hurried he from Patia to the Transmitter,
Wherefrom his voice ethered the historic message.
Then assembled there
A team of ten word-warriors
Including Habibuddin, Rashed,
Amin, Shaker, Mustafa,
Sharfuzzaman and Rezaul.

And O'let me commemorate a day—
This day of 1971.

While, I swear, I was unaware,
This day would be the day
For an Independent country.

সেই রাতে অনেক ভাবনা-চিন্তা। অনেক কাজ। গভীর রাত পর্যন্ত বৈদেশিক বেতার কেন্দ্রগুলো শোনা দরকার ছিল। সে দায়িত্ব নিয়েছিলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র খন্দকার এহসানুল হক আনসারী। আব্দুল কাসেম সন্দ্বীপ তৈরি করেছিলেন সংবাদ বুলেটিন।

আমার ভাবনা পরের দিনের জন্যে। কালুরঘাট ট্রান্সমিটার ভবন অরক্ষিত। ওখানে পূর্ণ দখল প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা যায়নি। রাজনৈতিক দলের কাছ থেকে সে বিষয়ে সহযোগিতা পাওয়া যাবে না। এখানে-ওখানে টেলিফোন করেছিলাম। ব্যক্তিগত বন্ধুদের পরামর্শের জন্যে।

মূল্যবান তথ্য এবং উপদেশ দিয়েছিলেন চন্দনপুরার তাহের সোবহান। বলেছিলেন, পাহারার জন্যে দরকার রাইফেলধারী জোয়ান। আমার জানামতে পটিয়ায় একদল বাঙালি সৈনিক আছে। একজন মেজরও আছেন সেই দলে। ক্যান্টনমেন্টের বাইরে যারা আছে, তারা সবাই বঙ্গবন্ধুর সাপোর্টার। তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন পটিয়ায় গিয়ে।

পটিয়ার দূরত্ব ১৫/১৬ মাইল। যেতে হলে গাড়ি দরকার। সেই মুহূর্তে মনে পড়েছিল মাহমুদ হোসেনের কথা। আগ্রাবাদ হোটেলের বোর্ডার। দেড়-দু'মাস আগে এসেছিলেন

চট্টগ্রামে। ছ'ফুট দীর্ঘদেহী। মাথায় ঝাঁকড়া চুল। চট্টগ্রাম বেতার ভবনে গিয়ে যেচে আমার সঙ্গে পরিচয় করেছিলেন কিছুদিন আগে। আগেই পরিচিত হয়েছিলেন আমাদের বাদ্যযন্ত্রী ও কণ্ঠশিল্পীদের সঙ্গে। কয়েকজনের কণ্ঠে কিছু গান বাণীবদ্ধ করে নিয়েছিলেন টেপে। স্টুডিও হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন আগ্রাবাদ হোটেলের কনফারেন্স রুমটি। এসব গান পরে ডিস্ক রেকর্ড করা হবে বলেছিলেন। নিজের পরিচয় বলেছিলেন, ফ্রান্সে তাঁর 'হরে কৃষ্ণ হরে রাম' কনসার্ট এক লাখ কপি বিক্রি হয়েছে। তিনি এখন দেশে একটি কারখানা খুলবেন। মালামাল শিপমেন্ট হয়েছে। অচিরেই চট্টগ্রাম বন্দরে পৌঁছবে। সে-সব ছাড় করার জন্যেই চট্টগ্রামে আসা। চট্টগ্রামে আসার সময় তাঁর সঙ্গে কিছু ডিস্ক রেকর্ড ছিল। ভাস্কর-প্রভা ব্রান্ড এবং ফ্লাওয়ার্স রেকর্ড সেলস ডিভিশন নামাঙ্কিত। একটি গান শিল্পী তৃপ্তি দাশের গাওয়া 'ঝির ঝির ঝির ঝির বর্ষাতে মন আজ উতলা'। প্রযোজনা মাহমুদ হোসেন। সঙ্গীত পরিচালনা রোডনী মেনডোজা। গত কয়েকদিন হোটেলের কক্ষে গানটি তিনি বারবার বাজিয়ে বাজিয়ে শুনছিলেন। গানটিতে ঝাঁঝর, বঙ্গ ও বেহালা বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হয়েছিল। তাল কাহারবা। ডিস্কের অপর পিঠে দীপঙ্কর সেনের কথা 'মন চায়' গানটিও ছিল তৃপ্তি দাশের গাওয়া।

মাহমুদ হোসেন আমার সঙ্গে আপন মনে বন্ধুত্ব গড়েছিলেন। বেতার ভবনে আমার কক্ষে বসে আনোয়ারের ক্যান্টিনের ঝোলভাত খেয়েছিলেন দু'-তিন দিন। ১৫ মার্চ লালদীঘির পাড়ে বুদ্ধিজীবীদের আহূত জনসভায় আমার পাশে ঘাসের ওপরে বসেছিলেন সারাক্ষণ। বঙ্গবন্ধুর অসহযোগ আন্দোলনের ব্যাপারে মাহমুদ হোসেনের উৎসাহ ছিল আকাশচুম্বী। আমাকে দিয়ে 'জয় বাংলা' শীর্ষক গীতিনক্সা লিখিয়ে নিয়েছিলেন। ওতে ডি এল রায় ও অতুলপ্রসাদের চিরায়ত গীতকথাসহ আমার একটি গান সংযোজিত ছিল। পরিকল্পনা ছিল লং প্লে করার। সেই মর্মে হোটেলের কনফারেন্স রুমে কণ্ঠশিল্পীদের মহড়া হয়েছিল দু'দিন। ২৩ মার্চ বন্দরে বাবর ও সোয়াত নোঙর করার পর সে কাজে ছেদ পড়েছিল। পরে 'জয় বাংলা' গীতিনক্সার পাণ্ডুলিপিটি কোথায় হারিয়ে গিয়েছিল।

রাত ১২টার পর মাহমুদ হোসেনকে পেয়েছিলাম টেলিফোনে। বলেছিলাম, আপনার পক্ষে কি সম্ভব হবে আগামীকাল ভোরে একটি গাড়ি যোগাড় করা? আমি একটু পটিয়া যেতে চাই।

: অবশ্যই তা সম্ভব হবে। তার আগে বলুন, আমার অনুষ্ঠানটি কেমন হয়েছে?

: আপনার অনুষ্ঠান?

: কেন, শুনতে পাননি? রাত ১০টায় কোথায় ছিলেন?

: পথে ছিলাম—কালুরঘাট থেকে শহরে ফেরার পথে। হাঁটা পথ।

মাহমুদ হোসেন বলেছিলেন, আমি ইংরেজি একটা ঘোষণা প্রচার করেছি মাত্র। বলতে পারেন এস-ও-এস। সম্বোধন করেছি, 'হ্যালো ম্যানকাইন্ড' বলে। এই মিনিট দশেক।

আমি অবশ্য আপনার অনুসরণে 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র' থেকেই ঘোষণাটি প্রচার করেছি। হোটেলে বসে আপনাদের অনুষ্ঠান শুনবার পরই বেরিয়ে পড়েছিলাম।

মাহমুদ হোসেনের সঙ্গে ছিলেন আগ্রাবাদ হোটেলের সহকারী কর্মাধ্যক্ষ ফারুক চৌধুরী, বেতারের নিজস্ব শিল্পী রঙ্গলাল দেব চৌধুরী ও ঘোষক কবীর। দু'জন প্রকৌশলীকে মাহমুদ হোসেন পিস্তলের মুখে নিয়ে গিয়েছিলেন। নাম বলতে পারেননি আমাকে।

বলেছিলেন, আপনার সঙ্গে পটিয়ায় আমিও যাবো। আমার একটা মিশন আছে। সে ব্যাপারে সামরিক সহযোগিতা দরকার হবে। কথা দিন, সেই মিশনে আপনি আমার সঙ্গে থাকবেন।

তখন কথা বাড়াতে চাইনি। প্রয়োজনটা ছিল পটিয়া যাবার গাড়ি। কিছুই না জেনে-শুনে বলেছিলাম : হ্যাঁ, আমি থাকবো আপনার সঙ্গে।

: কিন্তু আমার মিশনটা কি, শুনবেন না?

: সকালবেলা যখন গাড়ি নিয়ে আসবেন, তখনই শুনবো। এখন আপনার-আমার লক্ষ্য অভিন্ন। কাজেই আপনার মিশন নিশ্চয় আমারও মনঃপূত হবে।

: ঠিক আছে। সকাল ৭টায় তৈরি থাকবেন।

২৭ মার্চ সকালবেলা কাজী হাবিবউদ্দিন আহমদ এসেছিলেন মুশতারী লজে। নতুন যোগ দিয়েছিলেন পৈত্রিক ব্যবসায়ে। কয়েক মাস যাবৎ চট্টগ্রামে বসবাসরত। আবদুল্লাহ-আল ফারুকের সঙ্গে বন্ধুত্ব। সেই সূত্রে আমাদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল আগেই। একা বাসায় গত রাতটা খুব ভয়ে ভয়ে কেটেছিল। তাই এখানে চলে এসেছিলেন। ডাক্তার মোহাম্মদ শফী বলেছিলেন, ভয়ের কি আছে? এখানেই থাকো।

যথাসময়েই এসেছিলেন মাহমুদ হোসেন। একটি ট্যাক্সি নিয়ে। সঙ্গে আরো লোক ছিলেন। একজন আমার পূর্ব পরিচিত। ফারুক চৌধুরী। আরেকজন ওসমান গণি। আগ্রাবাদ হোটেলের কোষাধ্যক্ষ! গাড়ি রাস্তায় রেখে ওঁরা তিনজন ঘরে এসেছিলেন। মাহমুদ হোসেন ছেলেদের কাছে মানচিত্র বইটি চেয়েছিলেন। টেবিলের ওপর পূর্ববঙ্গের ম্যাপটা খুলে বের করতে চেয়েছিলেন সীমান্তের ফাঁক-ফোকর।

: কি ব্যাপার?

: ব্যাপারটা পথে পথেই বলা হবে। এখন চলুন।

এ বাসা থেকে সেদিন আমরা পাঁচজন— কাজী হাবিব উদ্দীন আহমদ এবং এয়ার মাহমুদ যোগ দিয়েছিলেন। সবাই বেরিয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু গাড়িতে এতোজনের জায়গা হবে না। গাড়িতে ড্রাইভার ছাড়া আরো দু'জন ছিলেন। সিভিল পোশাকে ওঁরা ছিলেন সৈনিক। হাতে রাইফেল। মাহমুদ হোসেনের মিশনের সদস্য এঁরাও। পেছনের সীটে ঠাসাঠাসি করে চারজনকে বসতে হয়েছিল। মাঝখানে ফারুক চৌধুরী ও ওসমান গণি। দু'পাশে রাইফেলের নল বের করে সৈনিক দু'জন। আর সামনে ড্রাইভারের

পাশের সীটে আমি ও মাহমুদ হোসেন। আমরা তো দূরের যাত্রী। গন্তব্যস্থল পটিয়া। কালুরঘাটগামীরা হেঁটে বা অন্য কোনো উপায়ে যেতে পারেন। আজ তাড়া ছিল না। পটিয়া থেকে কালুরঘাটে ফিরে আসতে আমার বেশ সময় লাগবে। তারপরই অনুষ্ঠান প্রচার করা হবে। এঁরা কালুরঘাটে ধীরেসুস্থে গেলেই চলবে।

মাহমুদ হোসেন তৈরি হয়েই যাত্রা করেছিলেন। তাঁর মিশনটা ছিল সীমান্ত পার হয়ে ভারতে প্রবেশ করা। বলেছিলেন, আপনাকে আগেই বলেছিলাম, ভাস্করপ্রভা আমার স্ত্রী। তিনি মোরারজী দেশাই-এর ভাইজি। লন্ডনে আমাদের পরিচয় এবং বিয়ে হয়। আমাদের দুই সন্তান। যা-ই হোক, এখন যদি ভারতে যাওয়া যায়, শ্বশুরকুলের প্রভাব খাটিয়ে সামরিক সাহায্য নিতে পারবো। গোলাবারুদ না পেলে আমরা পাকিস্তানি সৈন্যদের ঠেকাবো কি দিয়ে? এটাই আমার মিশন। আপনি কথা দিয়েছেন, আমার সঙ্গে থাকবেন।

পথে এক স্থানে মানুষের জটলা। মাহমুদ হোসেন গাড়ি থেকে নেমেছিলেন। একটু পরেই ফিরে এসেছিলেন একটা রাইফেল হাতে। তাঁর পেছনে পেছনে এসেছিল মারমুখো জনতা। কোনো ছলে মাহমুদ হোসেন রাইফেলটি ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। শেষমেশ ওটা ফেরৎ দিয়েই আমাদের কেটে পড়তে হয়েছিল।

: কি দরকার ছিল ঝামেলা করার? সামনে আমাদের অনেক কাজ।

উত্তরে মাহমুদ হোসেন বলেছিলেন, বুঝলেন না, আমাদের হাতে হাতে অস্ত্র দরকার। কখন কি বিপদ আসে!

: দু'জন রাইফেলধারী আছেন তো সঙ্গে।

: জানেন না তো, ওদের হাতের রাইফেল দুটি অকেজো। স্রেফ শো।

আর এক স্থানে গাড়ি থামিয়ে আমরা 'খিরা' কিনে খেয়েছিলাম।

পটিয়া থানায় মানুষের ভিড়। সবাই ইউনিফর্মধারী মিলিটারি এবং পুলিশের লোক। একটি চেনামুখ মানিক মিয়া। চট্টগ্রামে আলাপ-পরিচয় হয়েছিল বেশ আগে। বেগম মুশতারী শফীর সম্পর্কিত মামা।

: এই যে, মানিক মামা, আপনি এখন এখানে?

: আমি তো এই থানার ও-সি।

: ভালোই হলো। আচ্ছা, এখানে যে মিলিটারিরা আছেন, ওঁদের সিনিয়র অফিসার কে আছেন?

: মেজর জিয়াউর রহমান।

: ওঁর সঙ্গে একটু দেখা করা যাবে?

মানিক মিয়া বলেছিলেন, একটু অপেক্ষা করুন, আমি দেখছি। কিন্তু কি জন্যে দেখা করতে চান? তিনি জানতে চাইলে কি বলবো?

: রেডিও থেকে এসেছি বলবেন।

অনুমতি পেয়ে আমি ও মাহমুদ হোসেন ভেতরে গিয়েছিলাম। মেজর জিয়াউর রহমান আমাদের অনুষ্ঠান শুনেছিলেন। সন্ধে ৭টা ৪০ মিনিটে এবং রাত ১০টায়। আমাদের পরিচয় পেয়ে উল্লসিত হয়েছিলেন। বলেছিলাম, আপনার কাছে এসেছি একটা সাহায্য চাইতে। কালুরঘাট ট্রান্সমিটার ভবনটিতে যদি প্রহরার ব্যবস্থা করতে পারেন।

মাহমুদ হোসেন বলেছিলেন, আমার অন্য একটি ব্যাপার আছে।

: বলুন।

খুব নিম্নস্বরে মাহমুদ হোসেন তাঁর মিশনের কথা বলেছিলেন। কক্ষটি ছিল বেশ বড়ো। বিছানাপত্র ছড়ানো ছিটানো। চেয়ার ছিল বিক্ষিপ্তভাবে। এক কোনায় একটা বড়ো টেবিলে খাবারের স্তূপ। পাউরুটি, নানরুটি, পোলাও, ভাজা মাছ, মুরগির রোস্ট, সবজি, ঘন ডাল। এসব খাবার বিভিন্ন বাড়ি থেকে সরবরাহকৃত। কক্ষে অনবরত সৈনিকদের আনাগোনা ছিল।

মেজর জিয়াউর রহমান বলেছিলেন, 'আর্মস এম্যুনিশন খুবই দরকার আমাদের। আপনার মিশন সফল হোক কামনা করি। কিন্তু এতে আমি কি সহযোগিতা করতে পারি?'

: বর্ডার ক্রস করতে হবে তো! আপনি শুধু একটা স্লিপ লিখে দেবেন, আমরা আপনার লোক। ওতেই হবে।

: বেশ, তা-ই হবে। কিন্তু অফিসিয়াল কোনো সীলমোহর বা রাইটিং প্যাড নেই সঙ্গে। শুধু স্বাক্ষর।

: ওতেই হবে।

দুপুর গড়িয়ে গিয়েছিল। মেজর জিয়াউর রহমান আমাদেরকে কিছু খেয়ে নিতে বলেছিলেন। সেই টেবিল থেকে হাতে হাতে খাবার তুলে সবাই খেয়েছিলাম।

তিনটি লরিতে জোয়ানরা সজ্জিত হয়েছিলেন। একটু আগে-পরে যাত্রা করা হয়েছিল। একটি লরি অদৃশ্য হবার পর অন্যটি স্টার্ট নিয়েছিল। দু'টি লরি ছেড়ে যাবার পর আমরা যাত্রা করেছিলাম। সামনে মেজর জিয়াউর রহমানের জীপ। তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গসহ। পেছনে আমাদের ট্যাক্সি।

সারা পথে মাথায় হাতে মালামালসহ লোকজন। সবাই চট্টগ্রাম শহর বা শহরতলীর কর্মস্থল ছেড়ে পলায়নরত। আমরা বিপরীতমুখো পটিয়া থেকে কালুরঘাট। অর্থাৎ শহরের দিকে। গাড়ি থামিয়ে খণ্ড জনতাকে মেজর জিয়াউর রহমান বলেছিলেন, আপনারা কেউ শহর ছেড়ে যাবেন না। কার ভয়ে পালিয়ে যাবেন? দুশমনদেরকে আমরা দু'দিনের মধ্যেই ধ্বংস করে দেবো। আর এক পা ওদিকে নয়। চলুন— ফিরে চলুন শহরের দিকে। একটা ব্যাপারে আপনাদের বলে দিচ্ছি। উর্দু ভাষায় যারা কথা বলে, ওদেরকে বিশ্বাস করবেন না। ওরাই পাকিস্তানি সৈন্যদের আশ্রয় দেবে। বাঙালিদের বিরুদ্ধে দুশমনকে সহযোগিতা করবে। সামনে পেলেই শেষ করে দেবেন ওদেরকে।

এই একই বক্তব্য রেখেছিলেন তিনি পথে দশ জায়গায় গাড়ি থামিয়ে।

ট্রান্সমিটারে পৌঁছতে বিকেল ৫টা বেজে গিয়েছিল। দেখতে-না-দেখতেই জোয়ানরা এলাকাটির বেষ্টনীতে পরিখা খনন করে পজিশন নিয়েছিলেন।

অফিস-কক্ষে শুধু আমরা দু'জন। আমি ও মেজর জিয়াউর রহমান। বলেছিলাম : আচ্ছা, মেজর সাহেব, আমরা তো সব 'মাইনর', আপনি 'মেজর' হিসেবে স্বকণ্ঠে কিছু প্রচার করলে কেমন হয়।

কথাটা ছিল নিতান্ত রসিকতা। তিনি নিয়েছিলেন গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব হিসেবে। সঙ্গে সঙ্গে বলেছিলেন, হ্যাঁ। কিন্তু কি বলা যায়, বলুন তো!

আমি এক পাতা কাগজ এগিয়ে দিয়েছিলাম। তিনি নিজের পকেট থেকে কলম হাতে নিয়েছিলেন। প্রথমে তিনি লিখেছিলেন— I, Major Zia do hereby declare independence of Bangladesh.

আমি তখন বলেছিলাম, দেখুন, 'বঙ্গবন্ধুর পক্ষ থেকে' বলবেন কি?

তিনি বলেছিলেন, হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন। —নিজের নামের শেষে তীর-চিহ্ন দিয়ে লিখেছিলেন— on behalf of our great national leader Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, ...

মেজর জিয়াউর রহমান তাঁর ঘোষণাপত্রে কিছু অস্ত্রের নাম লিখেছিলেন—পাঞ্জাবি সৈন্যদের হাতে তখন যেসব অস্ত্র ছিল। অস্ত্রের নামগুলো সম্পর্কে নিশ্চিত হবার জন্যে তিনি উচ্চকণ্ঠে ক্যাপ্টেন অলি আহমদকে ডেকেছিলেন। ক্যাপ্টেন অলি আহমদ বাইরে থেকে এসে আমার পাশে বসেছিলেন। তিনজনের আলাপ-আলোচনায় খসড়াটি চূড়ান্ত হয়েছিল।

ক্যাপ্টেন অলি আহমদ ছিলেন আমার পূর্ব পরিচিত। আমরা একে-অন্যকে 'তুই-তুমি' বলতাম। একান্তে বলেছিলাম, ঘোষণাটির বাংলা তর্জমা হওয়া দরকার।

: তুমিই স্যারকে বলো।

বলতেই মেজর জিয়াউর রহমান সম্মতি দিয়েছিলেন। তাৎক্ষণিকভাবে ঘোষণাটির অনুবাদ করতে গিয়ে শব্দ খুঁজে পাচ্ছিলাম না। সময়ও ছিল কম। তাড়াতাড়ি অনুষ্ঠান শুরু করা দরকার। বাইরে অধ্যাপক মমতাজ উদ্‌দীন আহমদকে দেখতে পেয়েছিলাম।

: মেজর সাহেব, একজন বাংলার অধ্যাপক আছেন বাইরে। তাঁকে ডেকে নিলে অনুবাদটা সুন্দর হবে।

সেই সান্ধ্য অধিবেশনে মেজর জিয়াউর রহমানের স্বকণ্ঠ ঘোষণার পর অনুবাদটিও অন্যদের কণ্ঠে বারবার প্রচারিত হয়েছিল। ঘোষণাটি প্রধানত আমার সঙ্গে আলোচনা করে রচিত এবং ক্যাপ্টেন অলি আহমদের উপস্থিতিতে। আর বাংলায় অনুবাদের সময় আমাকে সহায়তা করেছিলেন অধ্যাপক মমতাজ উদ্‌দীন আহমদ। ঘোষণার মর্মবাণী ছিল, মেজর জিয়া মহান জাতীয় নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করছেন। বাংলাদেশের সর্বত্র দখলদার সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা হয়েছে। তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে দমন করতে আমাদের একদিন বা দু'দিনের বেশি সময় লাগবে না। এখন দেশ-বিদেশের কাছ থেকে অস্ত্রশস্ত্র সাহায্য পাওয়া আমাদের বিশেষ প্রয়োজন ইত্যাদি।

আজকের অধিবেশনে আবুল কাসেম সন্দ্বীপ সংবাদ বুলেটিন রচনা করে আমাকে দেখিয়ে নিয়ে স্বকণ্ঠে প্রচার করেছিলেন। সংবাদ বুলেটিনে মেজর জিয়াউর রহমানের ঘোষণাকে 'বিবৃতি' বলে কভারেজ দেয়া হয়েছিল। প্রক্ষেপণের দায়িত্বে ছিলেন আমিনুর রহমান ও আবদুশ শুকুর। মোহরা গ্রামের সেকান্দর হায়াত খান ও হারুন-অর-রশীদ খান দুই ভাই আমাদের সহযোগিতায় নিয়োজিত হয়েছিলেন।

অধিবেশন শেষে মাহমুদ হোসেন কাছে এগিয়ে এসেছিলেন। বলেছিলেন, মেজর সাহেবের কাছ থেকে পরিচিতি-পত্র নিয়েছি। আপনি তৈরি আছেন আশা করি। আজ এখান থেকেই আমরা যাত্রা করবো। রাতেই যেন বর্ডার ক্রস করতে পারি। শুভস্য শীঘ্রম।

আবুল কাশেম সন্দ্বীপ ও এয়ার মাহমুদ আমার পাশেই ছিলেন। মাহমুদ হোসেনের পরিকল্পনাটি তাঁদের মনঃপূত ছিল না। বিশেষ করে তাঁর সঙ্গে আমার যুক্ত হওয়া অবাঞ্ছিত। আমাকে করিডোরের এক ধারে নিয়ে গিয়ে আবুল কাসেম সন্দ্বীপ বলেছিলেন, ইনি বিদেশে থাকেন, বিদেশে চলে যাবেন— কিন্তু আপনি কেন যাবেন?

এয়ার মাহমুদ বলেছিলেন, তোমাকে সঙ্গে নিতে চাইছেন নিজের স্বার্থেই।

কিসের স্বার্থে? বর্ডার ক্রস করার ব্যাপারে আমি তো তাঁর কোনো সাহায্যে আসবো না। আমাকে যেতেই হবে। কারণ আমি তাঁকে কথা দিয়েছি।

ইতোমধ্যে অধ্যাপক মমতাজ উদ্‌দীন সেখানে এসে পড়েছিলেন। সব শুনে তিনিও আমার যাওয়া নাকচ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু আমাকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দেখে আবুল কাসেম সন্দ্বীপ চলে গিয়েছিলেন মেজর জিয়াউর রহমানের কাছে।

ট্রান্সমিটারের অফিস-কক্ষে মাহমুদ হোসেনও ছিলেন। মেজর জিয়াউর রহমান আমাকে বলেছিলেন, আপনাকে তো এখানে বেতার পরিচালনার জন্যে থাকতে হবে। মাহমুদ সাহেবের সঙ্গে আপনার যাওয়া চলবে না। ঠিক আছে?

সে মুহূর্তে অদূরে মাহমুদ হোসেনের চোখে আমি দেখেছিলাম অসহায় দৃষ্টি। তিনি যেন আমাকে করুণা করেছিলেন।

মেজর জিয়াউর রহমানের ঘোষণার ইংরেজি পাণ্ডুলিপিটি আমার পকেটে ছিল। বাসায় ফেরার পর ডাক্তার মোহাম্মদ শফীকে দেখতে দিয়েছিলাম। তিনি বলেছিলেন : এসব কাগজ রাখতে নেই। প্রচার করা হয়ে গেছে। প্রয়োজন মিটে গেছে।

বলেই তিনি খণ্ড কাগজটি চুলার আগুনে ফেলে দিয়েছিলেন।

১৯৭৫ সালের বিজয় দিবসের দু'-একদিন আগের কথা। ক্ষমতাসীন মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান সরাসরি আমার সঙ্গে টেলিফোনে আলাপ করেছিলেন। ঢাকা থেকে চট্টগ্রামে।

: আপনি বেলাল বলছেন?

: জি।

: চট্টগ্রামের বেলাল তো?

: জি। আমাকে কি আপনার মনে আছে?

: মনে না থাকলে কথা বলছি কেন? আপনার কি মনে আছে, আমি কি কলম দিয়ে ২৭ মার্চের ঘোষণাটি লিখেছিলাম?

: কলমটা আপনার নিজের পকেট থেকেই নিয়েছিলেন। সেটা কি কলম ছিল, মনে নেই।

একই দিনে আন্তঃসার্ভিস জনসংযোগের পরিচালক টেলিফোনে আমাকে মেজর জিয়াউর রহমানের ঘোষণার খসড়াটির ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছিলেন। অনুযোগ দিয়েছিলেন, সেটা কেন নষ্ট করা হলো! জবাবে আমি কড়া কথা শুনিয়ে দিয়েছিলাম। পরে তিনি অনুরোধ করেছিলেন, স্মৃতি থেকে উদ্ধার করে যেন তাঁকে জানাই। স্বয়ং জেনারেল এ বিষয়ে আগ্রহী। এক ঘণ্টার ব্যবধানে টেলিফোনে জানিয়ে দিয়েছিলাম। সেই প্রসঙ্গে দাবি করেছিলাম, আমার স্মৃতিচারণায় ভাষা ও শব্দগত বিভ্রম ঘটলেও, বক্তব্য অবিকৃতই রয়েছে।

একই বিষয়ে ১৯৭৮ সালে কর্নেল অলি আহমদ আমার সঙ্গে টেলিফোনে আলাপ করেছিলেন। ঢাকা থেকে সিলেট। কর্নেল অলি আহমদ আমাদের দশজন প্রাথমিক কর্মীর নাম-তালিকা এবং কে কোথায় অবস্থানরত, তা-ও জেনে নিয়েছিলেন আমার কাছ থেকে।

২৮ মার্চ সকালবেলা যানবাহন সমস্যার সমাধান হয়েছিল আকস্মিকভাবে। হাবিবুর রহমান জালাল একটি গাড়ি নিয়ে এনায়েত বাজারে এসেছিলেন। সেই গাড়িতেই আমরা কালুরঘাট পৌঁছেছিলাম।

প্রতিদিন সকাল ৯টার পর প্রথম অধিবেশন। দুপুর ১টার পর দ্বিতীয় অধিবেশন এবং সন্ধে ৭টার পর তৃতীয় অধিবেশন। এটাই শ্রোতাদের উদ্দেশে আমাদের আগাম ঘোষণা। কাঁটায় কাঁটায় অনুষ্ঠান প্রচার সম্ভব ছিল না বলেই এভাবে জানিয়ে রাখা হতো।

আজ আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন প্রকৌশল বিভাগের রাশেদুল হোসেন ও শারফুজ্জামান। বলেছিলেন, আর আমরা এখান থেকে যাচ্ছি না। এখানেই থেকে যাবো দিনরাত।

আমি বলেছিলাম, সবাইকে তা-ই করতে হবে। আমিও ঠিক করেছি, আজ রাতে একটু ফিরবো শহরে। আগামীকাল সকালে এসে আর যাবো না। এখানে তো অসুবিধা নেই। সুন্দর সামরিক পাহারা রয়েছে।

শারফুজ্জামান বলেছিলেন, অসুবিধা কিছুই নেই, বরং পিছুটান থাকলেই অসুবিধা। কাজ পেয়েছি, কাজে নেমেছি। আর কোনোদিকে তাকাবো না। আমি এ-ই বুঝি।

ট্রান্সমিটার ভবনে খাবারের সমস্যা ছিল না। আশেপাশের গ্রাম থেকে হাঁড়ি হাঁড়ি খাবার আসতো। কেউ কেউ টেলিফোনে অনুরোধ করতেন, বিরিয়ানি রান্না করে রাখা হয়েছে। দয়া করে গাড়ি পাঠালে ভালো হয়। জোয়ানদের জন্যেই এতোটা করা হতো। ও থেকে আমরাও খেয়ে নিতে পারতাম।

বলেছিলাম, আচ্ছা, বলা তো যায় না কিছুই। খারাপটা চিন্তা করে রাখাই ভালো। ধরো, এই এলাকাটির যদি পতন ঘটে, তাহলে আমরা অনুষ্ঠান কি করে চালু রাখবো? এমন কোনো বিকল্প ব্যবস্থা আছে কি?

রাশেদুল হোসেন বলেছিলেন, ব্যবস্থা আছে, আবার নেই-ও।

: মানে?

: ওই পেছনের ঘরটায় একটা ১ কিলোওয়াট ট্রান্সমিটার আছে। এক ট্রাকে বোঝাই হবে। সাহস করে ওটাকে তুলে নিয়ে যদি যাওয়া যায়—

শারফুজ্জামান বলেছিলেন, কাজটা খুব সহজ নয়। তুলে নিয়ে গিয়ে কাজে লাগানো যাবে কি-না, কিছুই তো বলা যায় না। নিরাপদ জায়গাও তো চাই।

কাজী হাবিবউদ্দীন আহমদ বলেছিলেন, না হয় আমরা ওটাকে মোবাইল করে নেবো। ট্রাকের ওপরেই বসানো থাকবে।

এই আলোচনার সময় হারুন-অর-রশীদ খান উপস্থিত ছিলেন। তাঁর চোখে-মুখে ছিল ঔৎসুক্য। এঁরা দুই ভাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে এসেছিলেন। পিতা প্রয়াত সালেহ আহমদ খান ছিলেন রাজনীতিক। পাঁচলাইশ থানা আওয়ামী লীগের প্রাক্তন সভাপতি। সেকান্দর হায়াত খান আওয়ামী লীগের কর্মী। আমার পূর্ব পরিচিত ছিলেন হারুন-অর-রশীদ খান। তিনি তমদ্দুন মজলিসের বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের সূচনালগ্নেই বিদ্রোহী বাঙালি সৈন্যদের সঙ্গে এঁদের যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল। স্থানের আনুকূল্য ছিল। এঁদের বসতবাড়ির কাছাকাছি এলাকাতেই সৈন্যদের প্রাথমিক ছাউনিগুলো গড়ে উঠেছিল। ছাউনিগুলোর তত্ত্বাবধান, যানবাহনের জন্যে পেট্রোল সংগ্রহ সব কাজেই এঁরা সহযোগিতা দিয়েছিলেন।

হারুন-অর-রশীদ খান জানতে চেয়েছিলেন, ১ কিলোওয়াট ট্রান্সমিটারটির সঙ্গে ১০ কিলোওয়াটের কোনো যোগসূত্র আছে কি-না।

: না, নেই।

সামরিক প্রহরার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন লে. শমশের মোবিন। বলেছিলেন, কেন্দ্রের নাম থেকে 'বিপ্লবী' শব্দটি বাদ দিতে হবে। 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র'—এ নামটিই থাকবে। মেজর জিয়ার নির্দেশে আপনাকে জানালাম।

-সেদিন দুপুরের অধিবেশন থেকে নির্দেশটি কার্যকর করা হয়েছিল। মূলত ২৬ মার্চ-এ এ-নামটিই আমি প্রথম লিখেছিলাম। আবুল কাসেম সন্দ্বীপের প্রস্তাবে 'বিপ্লবী' শব্দটি যুক্ত করা হয়েছিল।

কয়েকজন ক্যাপ্টেনের আনাগোনা ছিল। ক্যাপ্টেন অলি আহমদ ছায়ার মতো মেজর জিয়াউর রহমানের সঙ্গে ছিলেন। একজন ছিলেন ক্যাপ্টেন ভূঁইয়া। বেতারের অনুষ্ঠানে শুধুমাত্র মেজর জিয়াউর রহমানের নাম প্রচারিত হচ্ছিল। ক্যাপ্টেনরা নিজেদের নাম প্রচারে আগ্রহী হয়েছিলেন।

একটা বিজ্ঞপ্তি রচনা করেছিলেন ক্যাপ্টেন ভূঁইয়া। বক্তব্য ছিল, জনগণ যেন তাদের হাতের অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে লালদীঘির ময়দানে জমায়েত হন। সেখানে তাঁদেরকে পরবর্তী নির্দেশ দেবেন ক্যাপ্টেন অমুক অমুক ... ইত্যাদি।

আমি বলেছিলাম : এটা প্রচার করা কি ঠিক হবে? এতে আমরা যে চট্টগ্রামে আছি, শত্রুরা সহজেই তা জেনে যাবে।

: সেটা আমরা বুঝবো। আপনাকে যা বলা হচ্ছে, তা-ই করুন। এটা প্রচার করে দিন।

: বেশ তো, আপনাদের কারো কণ্ঠেই এটা প্রচার করতে পারেন। সেটাই সমীচীন হবে।

দ্বিতীয় অর্থাৎ দুপুরের অধিবেশনে ওঁরা সেটি প্রচার করেছিলেন। পর মুহূর্তে তাঁদের মধ্যেই কেউ হয়তোবা আমার মন্তব্যের যৌক্তিকতা বুঝতে পেরেছিলেন। এ ছাড়া অন্য একটি আশঙ্কার কথাও কারো মনে পড়েছিল। লালদীঘির ময়দানের জমায়েতের ওপর যদি বিমান থেকে হামলা আসে! বিজ্ঞপ্তিটিকে তাঁরা পরে শুধরে নিয়েছিলেন। বলা হয়েছিল, 'আপনারা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে নিজ নিজ মহল্লায় তৈরি হয়ে থাকুন। পরবর্তী নির্দেশ দেবেন ক্যাপ্টেন অমুক অমুক ... ... ইত্যাদি।

এই বিজ্ঞপ্তি প্রচারের ফলে আমাদের অবস্থান নগ্নভাবে প্রকাশ পেয়েছিল। এর প্রতিকার করতে গিয়ে আবুল কাসেম সন্দ্বীপ সংবাদ বুলেটিনে লিখেছিলেন, 'আমাদের চট্টগ্রাম প্রতিনিধি জানিয়েছেন, কয়েকজন বাঙালি ক্যাপ্টেন এই মর্মে জনগণকে নির্দেশ দিয়েছেন, তাঁরা যেন ... ... ইত্যাদি।

আগের রাতে ডা. শফীর কিশোর পুত্র মেরাজ হঠাৎ বলেছিল, কাকু, তোমরা জানো, টিক্কা খান মরে গেছে?

: এ্যাঁ? কে বলেছে? কার কাছে শুনেছ?

: সত্যি বলছি। পাড়ার ছেলেরা বললে।

আবুল কাসেম সন্দ্বীপ লুফে নিয়েছিলেন তথ্যটি। আজকের সংবাদ বুলেটিনে কভার করেছিলেন। টিক্কা খানের মৃত্যুর (?) খবরটি পরে বিবিসি থেকেও প্রচারিত হয়েছিল।

আজ অধ্যাপক মোহাম্মদ খালেদ টেলিফোনে একটি চাঞ্চল্যকর খবর পাঠিয়েছিলেন। হানাদার বাহিনীর মধ্যে অন্তর্বিরোধ। বালুচ রেজিমেন্টের জোয়ানরা বাংলাদেশে

গণহত্যার বিরুদ্ধে। তাদেরও রয়েছে স্বায়ত্তশাসনের দাবি... ইত্যাদি।

টেলিফোনে আলাপ করেছিলেন ফকির আহমদ ও বদরুল হুদা চৌধুরী। আমাদের সঙ্গে যোগদানের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। পরে কিন্তু আসতে পারেননি।

'এগ' ও 'গলফ' সাংকেতিক নামে কেউ দু'টি ইংরেজি ঘোষণা-পত্র আমাদের কাছে পাঠিয়েছিলেন। সে দুটির বক্তব্য সময়োপযোগী ছিল। আমরা প্রচার করেছিলাম। পরে জেনেছি, প্রেরক ছিলেন সৈয়দ আশরাফ আলী ও আবদুল মালেক খান। চট্টগ্রাম বেতারের দু'জন উচ্চপদস্থ অফিসার।

একজন ভদ্রমহিলা এসেছিলেন। অধ্যাপিকা তমজিদা বেগম। অত্যন্ত আগ্রহ স্বকণ্ঠে কিছু প্রচার করার। কিন্তু নিজে থেকে কিছু লিখতে অপারগ। অনুরোধ করেছিলেন কিছু একটা লিখে দিতে। ভদ্রমহিলার ব্যাকুলতায় অভিভূত হয়েছিলাম। তাৎক্ষণিক কিছু বক্তব্য লিখে দিয়েছিলাম। তিনি পাঠ করেছিলেন।

আজ মেজর জিয়াউর রহমান নতুন একটি ঘোষণা-লিপি নিয়ে এসেছিলেন। ওতে নিজেকে তিনি Provisional Head of Bangladesh এবং স্বাধীন বাংলা লিবারেশন আর্মির প্রধান বলে উল্লেখ করেছিলেন। খসড়াটি নিয়ে তাঁর সঙ্গী ক্যাপ্টেনদের সঙ্গে আলোচনার সময় আমিও উপস্থিত ছিলাম। মেজর জিয়াউর রহমান দ্বিধাগ্রস্ত, এ ঘোষণা প্রচার করা সঙ্গত হবে কি-না। একজন বলেছিলেন, এই প্রাধান্য দাবি আপনাকে করতেই হবে, নইলে দেশ-বিদেশের কাছে আপনার আবেদনের গুরুত্ব কি করে হবে?

তিনি বলেছিলেন, কিন্তু অন্য এলাকায় আমার চেয়ে সিনিয়র বাঙালি অফিসার থাকতে পারেন। তিনিও হয়তো আমাদের মতোই বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন এবং প্রতিরোধ শুরু করেছেন।

: তা হোক।

মেজর জিয়াউর রহমান আমার সম্মতি চেয়েছিলেন। বলেছিলাম, ক্যান্টনমেন্টের বাইরে আপনার মতো আর কেউ আছেন কি-না—মানে, কোনো বাঙালি সিনিয়র অফিসার, তা জানাবার উপায় নেই। বিদেশের কাছে গুরুত্ব উৎপাদনের জন্য আপনি নিজেকে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে সামরিক বাহিনীর প্রধান অবশ্যই বলতে পারেন।

ঘোষণাটি প্রচারের সময় 'বঙ্গবন্ধুর পক্ষ থেকে' উল্লেখ করা হয়নি। ঘোষণাটি লে. শমসের মোবিনের কণ্ঠে কয়েকবার প্রচারিত হয়েছিল। সচেতন শ্রোতাদের কাছে মেজর জিয়াউর রহমানের দ্বিতীয় ঘোষণাটি ছিল আপত্তিকর। প্রবীণ রাজনীতিক এ কে খান এর প্রতিকারের জন্যে সক্রিয় হয়েছিলেন। তাঁর বিবেচনায় স্বাধীনতা ঘোষণার জন্যে পটভূমি চাই, যা ওই সময়ে শেখ মুজিব ছাড়া আর কারো ছিল না।

১৯৭২ সালে জনাব এ কে খানের সঙ্গে আমি ও বেগম মুশতারী শফী দেখা করতে গিয়েছিলাম। সেদিন এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, বেতারে একটি ঘোষণা প্রচার করেই কেউ রাতারাতি বিরাট কিছু হয়ে যেতে পারে না। আমি তো ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম

ঘোষণাটি শুনে। তরুণ সৈনিক তিনি। ঘোষণাটি শোধরাবার জন্যে উপদেশ দিয়ে পাঠিয়েছিলাম।

সেই মর্মে মেজর জিয়ার তৃতীয় ঘোষণায় বারবার মহান নেতা বঙ্গবন্ধুর নাম উল্লেখিত হয়েছিল। দাবি করা হয়েছিল, বঙ্গবন্ধু বিপ্লবী পরিকল্পনা কেন্দ্র থেকে নির্দেশনা দিচ্ছেন। ঘোষণাটি কালুরঘাট এলাকার বাসিন্দা ওসমান গণি তাঁর টেপ রেকর্ডারে বাণীবদ্ধ করেছিলেন। স্বাধীনতার পর আমাদের সহকর্মী আমিনুর রহমানের মাধ্যমে সেটির ডাবিং সংগৃহীত হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ বেতারের চট্টগ্রাম ও ঢাকা কেন্দ্র থেকে সেটির নির্বাচিত অংশ প্রচারিত হয়েছিল।

উক্তি-পুনরুক্তি : বেতারে স্বাধীনতা ঘোষণা

একাত্তরের একজন শব্দসৈনিক আবদুল্লাহ্-আল ফারুক জার্মানির 'ডয়সে ভেলে'-তে কর্মরত। ছুটিতে দেশে এসেছেন। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের দশজন প্রতিষ্ঠাতা কর্মীর অন্যতম তিনি। তাঁকে নিয়ে আমরা গেট টুগেদার-এর উদ্যোগ নিয়েছিলাম। চট্টগ্রাম থেকে দু'জন (আমিনুর রহমান ও কাজী হাবিবউদ্দিন আহমদ মনি) আসতে পারেননি। অপর আটজন যথারীতি সম্মিলিত হয়েছিলাম ঢাকায়। এ এম শারফুজ্জামানের কর্ম-কক্ষে আটজনের (সৈয়দ আবদুশ শাকের, আবুল কাসেম সন্দ্বীপ, মুস্তফা আনোয়ার, রাশেদুল হোসেন, রেজাউল করিম চৌধুরী, এ এম শারফুজ্জামান, আবদুল্লাহ্ আল ফারুক ও আমি) বৈকালিক জটলা। পরে সৈয়দ আবদুশ শাকেরের বাসায় নৈশভোজ। ভোজপর্বে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের তৃতীয় বা মুজিবনগর পর্যায়ের চারজন শব্দসৈনিকও (কামাল লোহানী, শামসুল হুদা চৌধুরী, আশফাকুর রহমান খান ও মোহাম্মদ শাহজাহান ফারুক) যোগ দিয়েছিলেন।

একান্তভাবে ঘরোয়া এই সম্মিলনটি ছিল আমাদের জন্যে স্মৃতি রোমন্থনের এবং অহরহ আবেগাপ্লুত হবার দুর্লভ পরিবেশ। সেই অবকাশে আমি সবাইকে অনুরোধ জানালাম, লেখার অভ্যাস না থাকলেও প্রত্যেকে যেন নিজ নিজ খণ্ড স্মৃতিটুকু লিখে রাখেন। আবদুল্লাহ আল ফারুককে অনুরোধ করলাম, বৃহত্তর বিভাষী পাঠকদের জন্যে যেন তাঁর স্মৃতিচারণ ইংরেজি ভাষায় করেন। কল্পকাহিনী নয়, সাহিত্যসৃষ্টির প্রয়াসও নয়—শুধু নিজের কৃতকর্মটুকু যথাযথ লিখে যাওয়া। আমরা কেউই নই ইতিহাসবিদ। তবে অবশ্যই আমাদের একাত্তরের কার্যক্রম একটি স্বাধীন দেশের ইতিহাসের বস্তুনিষ্ঠ উপকরণ। তা থেকে আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে বিভ্রান্তিতে বা অন্ধকারে রাখা অকর্তব্য।

পরবর্তী প্রজন্মের গবেষকরা তো আমাদের খণ্ড খণ্ড স্মৃতিকথার ভেতর থেকেই পাবেন সত্যের হদিস। তাঁদের বিচারে আমাদের সততার প্রমাণ হিসেবে গ্রাহ্য হবে, আমরা কোথাকার কে এবং কি লিখে রেখেছি! স্মৃতিচারণ প্রসঙ্গে অনধিকার চর্চা করেছি কি-না। অর্থাৎ প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ লেখার ছলে হাজারটা অপ্রত্যক্ষ তথ্য পরিবেশনের অসাধুতা রক্ষা করেছি কি-না! ধান ভানতে শিবের গীত গেয়ে নতুন প্রজন্মের গবেষকদের

হাইকোর্ট দেখানোর অবকাশ নেই। তাঁরা ঠিকই প্রবক্তার ব্যক্তিজীবন ও ব্যক্ত বিবরণের সামঞ্জস্য-অসামঞ্জস্যটুকু কষ্টিপাথরে যাচাই করে নেবেন।

প্রকৃতপক্ষে একই রণাঙ্গনে পাশাপাশি অবস্থানরত দুই সহযোদ্ধার বক্তব্য অভিন্ন না-ও হতে পারে। যার যার ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যায়নের স্বকীয়তার কারণে একই দৃশ্যপট দুই চোখে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতিভাত হতেই পারে। তবে বলতে বা লিখতে গিয়ে যদি অধিকারের সীমা ছাড়িয়ে যাওয়া না হয়, তবে একই ঘটনার দ্বিবিধ বর্ণনার মধ্যেও বিরোধ দেখতে পাওয়া যাবে না। ন্যূনতম কোনো কোনো তথ্যের ঘাটতি দেখতে পাওয়া যেতে পারে শুধু।

আলাপচারিতার এই পর্যায়ে আবুল কাসেম সন্দ্বীপ আমাকে অনুযুক্ত করলেন, আমার গ্রন্থে ও বিভিন্ন নিবন্ধে এবং সাক্ষাৎকারে আমি যে বরাবর মেজর জিয়ার ২৭ মার্চের ঘোষণাকে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে বেতারে অনুরূপ তৃতীয় ঘোষণা বলে থাকি। আগের দিন অর্থাৎ ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধুর কর্তৃক স্বাধীনতা ঘোষণার প্রসঙ্গে দু'বার স্বকণ্ঠে এম এ হান্নানই শুধু প্রচার করেননি, বরং বঙ্গবন্ধুর তারবার্তাটির মূল ও অনুবাদ আবুল কাসেম সন্দ্বীপ এবং আবদুল্লাহ-আল ফারুক পাঠ/প্রচার করেছিলেন। সেই সূত্রে দ্বিতীয় দিনে অর্থাৎ ২৭ মার্চ আমাদের সঙ্গে যোগদান করে মেজর জিয়া যে ঘোষণা প্রচার করেছিলেন, তাকে অবশ্যই অনুরূপ পঞ্চম ঘোষণা বলা সঙ্গত। আবুল কাসেম সন্দ্বীপ জানালেন, মেজর জিয়াকে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার পঞ্চম ঘোষক চিহ্নিত করে তাঁর দেয়া একটি সাক্ষাৎকার কয়েক বছর আগেই একটি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। লক্ষণীয়, স্বাধীনতার ঘোষক বিতর্কিকায় মেজর জিয়ার দুই বেসামরিক সহযোগীর (সন্দ্বীপ ও আমি) মতদ্বৈধতা আদৌ কিছু বিভ্রান্তিকর কিংবা সত্যের অপলাপ নয়। এখানে শুধুমাত্র কণ্ঠ গণনা ও মূল্যায়নগত বৈষম্য বা মতান্তর। মেজর জিয়াকে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে বেতারে তৃতীয় বা পঞ্চম ঘোষক চিহ্নিত করে আবুল কাসেম সন্দ্বীপ ও আমি ইতিহাস বিকৃতির দায়ভাগী হতেই পারি না।

এদিকে জনৈক এম এ হালিমের একটি স্মৃতিচারণ নিবন্ধ দুই শিরোনামে চট্টগ্রামের দৈনিক আজাদীতে এবারের স্বাধীনতা দিবসে (১৯৯২) এবং ঢাকার দৈনিক সংবাদে গত ৮ এপ্রিল '৯২ তারিখে পত্রস্থ হয়েছে। তিনি ২৬ মার্চ দ্বিপ্রহরে চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্রের বিক্ষিপ্ত অধিবেশনে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা প্রসঙ্গে এম এ হান্নানের প্রথম ভাষণ প্রচারে নিজের সহযোগিতার কথা লিখেছেন। আর সেটুকু লিখতে গিয়ে বিস্তর বাহুল্য এবং উদ্ভট ব্যক্তিগত মতামতের অবতারণা করেছেন। বিগত ২০ বছর ধরে বহুল আলোচিত এবং প্রতিষ্ঠিত সত্যটি হচ্ছে, ২৬ মার্চ প্রভাতী অধিবেশনে জাতীয় অনুষ্ঠানে ঢাকা থেকে সামরিক আইনের ধারাসমূহের প্রচার শুরু হওয়া মাত্রই চট্টগ্রাম বেতারের কর্তব্যরত কর্মীগণ অসহযোগ আন্দোলনের প্রেরণায় তাৎক্ষণিকভাবে কর্মবিরত হন এবং আগ্রাবাদ বেতার ভবন ও কালুরঘাট প্রচার ভবন ত্যাগ করেন। এ অবস্থায় দ্বিপ্রহরে এম এ হান্নান চট্টগ্রাম বেতারের কয়েকজন প্রকৌশলিক কর্মকর্তাকে নিজের প্রভাব খাটিয়ে

কালুরঘাট প্রচার ভবনে নিয়ে যান এবং প্রচারযন্ত্র চালু করিয়ে নিজের এবং চট্টগ্রাম কেন্দ্রের নাম ঘোষণাসহ তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণটি প্রচার করেন। অন্যদিকে সেই সকালবেলা সহসা স্তব্ধ হয়ে-যাওয়া বেতার কেন্দ্রকে অসহযোগ আন্দোলনের প্রেরণায় কাজে লাগানো যায় কি-না, এই লক্ষ্যে আমি নিজের সে মুহূর্তের অবস্থানস্থল এনায়েত বাজারের ড. এম শফীর বাসভবন থেকে আবুল কাসেম সন্দ্বীপ ও আবদুল্লাহ আল-ফারুকসহ বেরিয়ে পড়ি। নিজের উদ্দেশ্যটুকু জনান্তিকে বেগম মুশতারী শফীকে জানিয়ে যাই। প্রথম গন্তব্যস্থল স্টেশন রোডের আওয়ামী লীগ অফিস। সেখানে দেখা হয় অধ্যাপক মমতাজ উদ্‌দীন আহমদের সঙ্গে। আমার পরিকল্পনাটি শুনে তিনি উৎসাহিত হন। আওয়ামী লীগ অফিসের গেট থেকে পূর্বতন সঙ্গী দু'জন সাময়িকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়েছিলেন।

অধ্যাপক মমতাজ উদ্‌দীন আহমদের পরামর্শে তাঁর সঙ্গে প্রথমে যাওয়া হলো ইপিআর-এর ক্যাপ্টেন রফিকুল ইসলামের রেলওয়ে বিল্ডিং পাহাড়ের অস্থায়ী ছাউনিতে। তাঁকে অনুরোধ জানানো হলো অরক্ষিত বেতার ভবন ও প্রচার ভবনে নিরাপত্তা প্রহরার ব্যবস্থা করার জন্যে। তাঁর কাছ থেকে ভবন দু'টিতে সিপাহী মোতায়েনের আশ্বাস পেয়ে (যদিও পরে তা তিনি পূরণ করতে পারেননি) রাবেয়া খাতুন লেন-এ মাহবুব হাসানের শরণাপন্ন হলাম আমরা। তখন দুপুরের খাবারের সময়। মাহবুব হাসান ভাত খাচ্ছিলেন। হাতে হাতে প্লেট নিয়ে কিছু খেয়ে মাহবুব হাসানসহ প্রথমে কালুরঘাট, পরে আগ্রাবাদ, দু'জন প্রকৌশলিক কর্মীকে অনুরোধ করে কালুরঘাটে নিয়ে যাওয়া, আঞ্চলিক প্রকৌশলী মীর্জা নাসির উদ্দীনের বিরূপ আচরণ, আগ্রাবাদে আবুল কাসেম সন্দ্বীপ ও আবদুল্লাহ্ আল ফারুকের উপস্থিতি এবং চূড়ান্ত প্রস্তুতি নিয়ে কালুরঘাটে পৌঁছে যাওয়া। আর এই অবকাশে সেদিনের মতো সঙ্গচ্যুত হলেন অধ্যাপক মমতাজ উদ্দীন আহমদ এবং একেবারেই দলছুট হলেন মাহবুব হাসান। সন্ধে ৭ : ৪০ মিনিটে আমরা যখন ধারাবাহিক অনুষ্ঠান প্রচারের পরিকল্পনা ও কেন্দ্রের নামকরণ সহযোগে শব্দযাত্রা শুরু করলাম, তখন অস্থায়ী অনেকেই ছিলেন। পরবর্তী ন' মাসের স্থায়ী কর্মী শুধু আমরা ৩ জন— আবদুল্লাহ আল ফারুক, আবুল কাসেম সন্দ্বীপ ও আমি।

স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্রের সেই উদ্বোধনী অধিবেশনে এম এ হান্নানের উপস্থিত এবং ভাষণ প্রচারের বিবরণীটি এখন আমার 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র' গ্রন্থ থেকে (পৃষ্ঠা ৪৮) হুবহু উদ্ধৃত করা যাক—

"ঠিক সন্ধে ৭ : ৪০ মিনিটে আবুল কাসেম সন্দ্বীপের কণ্ঠে প্রচারিত হয়েছিল, স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র থেকে বলছি।

একই নাম ঘোষণা পরে আবদুল্লাহ-আল ফারুক এবং সুলতানুল আলমের কণ্ঠেও প্রচারিত হয়েছিল। সেই অধিবেশনে ডাক্তার আনোয়ার আলীর কাছ থেকে পাওয়া হ্যান্ডবিলটিও বারবার প্রচারিত হয়েছিল বিভিন্ন কণ্ঠে। বঙ্গবন্ধুর নামাঙ্কিত 'জরুরি ঘোষণা' এবং কবি আবদুস সালামের ভাষণ।

অধিবেশন চলাকালে আমি স্টুডিওতেও অবস্থানরত ছিলাম। ক্ষুদে স্টুডিও। জরুরি অবস্থায় কাজ চালাবার উপযোগী। কেউ একজন আমাকে হাত ইশারায় বাইরে ডেকে নিয়েছিলেন। স্টুডিওর বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলেন দু'জন আগন্তুক। একজন আমার পূর্ব পরিচিত ডাক্তার আবু জাফর। অন্যজন এম এ হান্নান। বলেছিলেন, আপনারা মাইকে আমার নাম ঘোষণা করুন। আমি বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র প্রচার করবো।

: জি আচ্ছা। তবে একটা কথা। আপনার নামটা প্রচার করা হবে না। আপনি নিজের কণ্ঠে শুধু এটি পাঠ করবেন।

: কেন, দুপুরবেলা আমি তো আমার নামসহ এটি প্রচার করেছিলাম। এখন অবশ্য বক্তব্যটি একটু বড়ো করে লেখা হয়েছে।

বলেছিলাম, দুপুরবেলা আপনি চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে ঘোষণাপত্রটি প্রচার করেছিলেন। এখন তা নয়। এখন থেকে এ হচ্ছে একটি গুপ্ত বেতার কেন্দ্র। এখান থেকে নিয়মিত অনুষ্ঠান প্রচার করা হবে। তাই কোথায় এর অবস্থান, তা আমরা শত্রুদেরকে জানাতে চাই না। জানলেই তো বিপদ। সহজেই ওরা আক্রমণ করতে পারবে। এমনিতেও তারা রাডারের (ম্যাগনেটিক ওয়েভ?) সাহায্যে আমাদের অবস্থান জানতে পারবে। তবে তার জন্যে তাদের কিছুটা সময় লাগবে।

এম এ হান্নান মেনে নিয়েছিলেন এবং নাম ঘোষণা ছাড়াই বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র প্রচার করেছিলেন। বেতারে নিজের কণ্ঠে দ্বিতীয় বার।"

কেন্দ্রের নামকরণ প্রসঙ্গে আমি আমার গ্রন্থে এভাবে বর্ণনা করেছি—

'এখন তৈরি করতে হবে ঘোষণালিপি। ট্রান্সমিটার ভবনের অফিস-কক্ষের টেবিলটি পূর্ণ দখলে। একখণ্ড কাগজে লিখেছিলাম 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র'।

আবুল কাসেম সন্দ্বীপ বলেছিলেন, বেলাল ভাই, 'বিপ্লবী' বেতার কেন্দ্র বললে ভালো হতো না?

: বেশ তো। 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র'—লেখার মাঝখানে তীর চিহ্ন দিয়ে 'বিপ্লবী' শব্দটি লিখেছিলাম। অবশ্য দু'দিন পরেই ২৮ মার্চ কেন্দ্রের নাম থেকে 'বিপ্লবী' শব্দটি বাদ দেয়া হয়েছিল। মেজর জিয়াউর রহমানের বরাত দিয়ে লে. শমশেরের প্রস্তাবক্রমে। (স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র : পৃষ্ঠা ৪৬-৪৭)

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা পর্যায়ের দশজন কর্মীর নাম-তালিকাটি বহুল আলোচিত এবং স্বীকৃত। ১৯৭৫-এর মার্চ এই দশজনকে বঙ্গবন্ধু স্বর্ণপদকে ভূষিত করার কথা ঘোষণা করা হয়েছিল (তথ্য বিবরণী নং ১০০৮৫)। বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ড ও রাজনৈতিক পট-পরিবর্তনের ফলে পদক প্রদান কার্যকর না হলেও, ঘোষণার পর চট্টগ্রামের দৈনিক আজাদীর বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ এবং অধ্যাপক মোহাম্মদ খালেদ ও এম এ মালেকের অন্তরঙ্গ উদ্যোগে প্রাক্তন মন্ত্রী এম আর সিদ্দিকী ও প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক নূরুল ইসলাম চৌধুরীর উপস্থিতিতে এই দশজনের সংবর্ধনার কথা স্মর্তব্য।

হ্যাঁ, মহান মুক্তিযুদ্ধের সূচনাকাল থেকে হিসাব করলে ২২ বছর ধরে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা-কর্মী হিসেবে বিতর্কের উর্ধ্বে থাকা এই দশজনের প্রতি বিরূপ

উক্তি করেছেন এম এ হালিম। জানি না, তিনি কে এবং এম এ হান্নানের প্রথম অর্থাৎ দ্বিপ্রহরের বেতার ঘোষণা প্রচারের সময় কি বা কতোটা অবদান রেখেছিলেন। তবে আমরা অন্তত তাঁকে কালুরঘাটে দেখতে পাইনি। সেদিন থেকে আজ অবধি চট্টগ্রামের কোনো সভা-সেমিনারে—কোথাও না। আজকের দিনে স্বাধীনতার ঘোষক বিতর্কিকার উদ্ভব ঘটিয়ে যেমন অনেকেই অনধিকারচর্চা করে যাচ্ছেন, ইনিও হয়তো-বা ভিন্নতর প্রেক্ষিতে সে পর্যায়েরই কেউ হবেন। যেমন, কালুরঘাটে ২৭ মার্চ মেজর জিয়ার পদার্পণ সম্পর্কে তিনি সেদিনের প্রত্যক্ষদর্শী না হয়েও ভ্রমাত্মক তথ্য দিয়েছেন। প্রকৃত তথ্য হচ্ছে, আমার বন্ধু মাহমুদ হোসেনকে নিয়ে তাঁর সংগৃহীত গাড়িতে আমি ওই দিন পটিয়ায় গিয়ে মেজর জিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম। আমার আহ্বানেই তিনি তাঁর ছাউনি কালুরঘাটে স্থানান্তরিত করেন। সেই সন্ধ্যায় প্রচার ভবনের নির্জন কক্ষে আমার প্রস্তাবক্রমেই মেজর জিয়া বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচারের তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নেন। তাঁর ইংরেজি ঘোষণা বা বিবৃতির মুসাবিদা এবং বাংলা অনুবাদের সময় পর্যায়ক্রমে ক্যাপ্টেন অলি আহমদ ও অধ্যাপক মমতাজ উদ্‌দীন আহমদ আমাদের সঙ্গে যুক্ত হন। মেজর জিয়া ও আমি এবং ওই দু'জন ছাড়া ওই সময়টুকুতে অন্য কেউ বা কোনো রাজনৈতিক মহলের প্রতিনিধি তখন সেখানে আদৌ উপস্থিত ছিলেন না।... ...

—(প্রকাশ : দৈনিক পূর্বকোণ, ২৪ এপ্রিল এবং দৈনিক সংবাদ, ৯ মে, ১৯৯২)

জিয়ার ঘোষণা : তারিখ বিভ্রম

এই শিরোনামে কিছু বক্তব্য রাখার তাগিদ বোধ করছিলাম গত বছর চট্টগ্রামের বিজয় মেলায় যোগদানের পর থেকেই। ১১ ডিসেম্বর (১৯৯১) আমি বিজয় মেলায় স্মৃতিচারণ করেছিলাম। মঞ্চে আমার পাশে উপবিষ্ট ছিলেন আতাউর রহমান কায়সার। আমার বক্তব্য শুনে তিনি নিম্নস্বরে আমাকে বলেছিলেন, আপনার সঙ্গে কিন্তু আমার একটা ব্যাপারে অমিল হচ্ছে। প্রথম ঘোষণায় কি জিয়াউর রহমান 'বঙ্গবন্ধুর পক্ষে' বলেছিলেন? আমরাই তো তাঁকে দিয়ে পরে কথাটা বলিয়ে নিয়েছিলাম। আগের ঘোষণাকে শুধরে এ কে খান সাহেব ফোনে ডিকটেশন দিলেন। ইত্যাদি।

একাত্তরের একজন এমএনএ মুক্তিযোদ্ধা এবং বিদগ্ধ রাজনীতিক আতাউর রহমান কায়সার সেই জনসভায় পরে বক্তব্য রাখতে গিয়ে অবশ্য আমার সঙ্গে বাক-বিরোধ করেননি। বরং জিয়ার ঘোষণার প্রসঙ্গই সতর্কতার সঙ্গে এড়িয়ে গিয়েছিলেন। তবে তদানীন্তন সামরিক বাহিনীর মেজর জিয়াউর রহমানের সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তা ও ব্যক্তিগত সখ্যের কথা এবং চট্টগ্রামে প্রাথমিক প্রতিরোধ ব্যবস্থায় জিয়ার বিশেষ ভূমিকার কথা বর্ণনা করেছিলেন।

মুক্তিযুদ্ধের সূচনালগ্নে চট্টগ্রামের কালুরঘাট প্রচার ভবনে আমাদের ২৬ মার্চ থেকে ৩১ মার্চ অবধি আনাগোনা/অবস্থানকালে আতাউর রহমান কায়সারকে আমরা সেখানে (কালুরঘাট) দেখতে পাইনি।

প্রস্তুতিপর্বে আমি এবং অধ্যাপক মমতাজ উদ্‌দীন আহমদ ২৬ মার্চ সকালবেলা যে সময়টুকু স্টেশন রোডের আওয়ামী লীগ অফিসে ছিলাম, তখন সেখানে এমএনএ বা নেতৃস্থানীয় কোনো রাজনীতিক ছিলেন না। সঙ্গত কারণেই তাঁরা সবাই তখন আত্মগোপন করে পরিস্থিতি অবলোকনরত ছিলেন। তখন অধ্যাপক মমতাজ উদ্‌দীন আহমদের একজন প্রাক্তন ছাত্র তরুণ আইনজীবী আওয়ামী লীগার আমাদেরকে একটি জীপ দিয়ে সহযোগিতা করেছিলেন। সেই জীপ-এ করে আমরা দু'জন প্রথমে সিআরবি পাহাড়ে ক্যাপ্টেন রফিকুল ইসলামের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম। তারপর রাবেয়া খাতুন লেন-এর বাসা থেকে মাহবুব হাসানকে নিয়ে কালুরঘাট প্রচার ভবন হয়ে আগ্রাবাদ বেতার ভবন এবং সবশেষে পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে কালুরঘাটে গমনাগমনকালে কোনো পর্যায়েই আতাউর রহমান কায়সারের সঙ্গে আমাদের দেখা হয়নি।

২৬ মার্চ দ্বিপ্রহরে কালুরঘাট প্রচার ভবন থেকে এম এ হান্নান কর্তৃক বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা প্রচারের ঐতিহাসিক উদ্যোগটি আমার অজ্ঞাতসারে হয়েছিল। ধারাবাহিকভাবে অনুষ্ঠান প্রচারের লক্ষ্যে সাংগঠনিক দায়িত্বে আত্মনিয়োজিত থাকায় আমরা সেই বিক্ষিপ্ত অধিবেশটি শুনতেও পাইনি। সে দিন সন্ধ্যায় আবুল কাসেম সন্দ্বীপ, আবদুল্লাহ আল-ফারুক, কবি আবদুস সালাম ও অন্যান্য সহযোগীদের নিয়ে যখন স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্রের উদ্বোধনী অধিবেশন চালু করা হয়েছিল, তখনই সেখানে উপনীত হয়েছিলেন দু'জন রাজনীতিক—এম এ হান্নান ও ডাক্তার আবু জাফর। শেষোক্তজন আমার পূর্বপরিচিতি ছিলেন। তখনই সদ্য পরিচিত এম এ হান্নানের দ্বিপ্রহরের প্রথম ঘোষণা প্রচারের কথা জানতে পেরেছিলাম।

সেই অধিবেশন শেষে কালুরঘাট থেকে আমরা তিনজন কর্মী চট্টগ্রাম শহরে প্রত্যাবর্তনের জন্যে এম এ হান্নানের স্টার্ট দেয়া জীপ-এর দিকে ছুটে গিয়েছিলাম। কিন্তু জীপ-এ আসন সঙ্কুলান করা যায়নি। সেই ব্ল্যাক আউট সদৃশ উদ্বেগের রাতে আবুল কাসেম সন্দ্বীপ, আবদুল্লাহ-আল ফারুক ও আমাকে পায়ে হেঁটে এনায়েতবাজারে ডা. এম শফীর বাসায় ফিরতে হয়েছিল। তখনই ধারণা হয়েছিল ক্রম-সংগঠিত বেতার-কর্মীদের দলটিকে নিয়মিত অনুষ্ঠান প্রচারের স্বার্থে কালুরঘাটেই অবস্থানরত থাকতে হবে। আর তাই কালুরঘাট প্রচার ভবনে নিরাপত্তা প্রহরার ব্যবস্থা করা সুকর্তব্য। টেলিফোনে চন্দনপুরার তাহের সোবহান একজন মেজরের হদিস দিয়েছিলেন, যিনি বন্দরে নোঙর-করা পাকিস্তানি যুদ্ধজাহাজ বাবর ও সোয়াত থেকে অস্ত্র খালাসের দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন এবং ঢাকায় পাকিস্তানি হামলার খবর শুনে সে কাজে বিরত ও সেই রাতে (২৬ মার্চ দিবাগত) সঙ্গী জোয়ানদের নিয়ে পটিয়ায় অবস্থানরত ছিলেন। সেই মুহূর্তে অজ্ঞাতনামা ওই মেজর সম্পর্কে তাহের সোবহানের মন্তব্যটি ছিল, বন্দরের দায়িত্ব থেকে হাত গুটিয়ে নেয়া বাঙালি মেজর সাহেব নিশ্চয় বঙ্গবন্ধুর অসহযোগের আহ্বানে উদ্বুদ্ধ। কালুরঘাট ভবনের নিরাপত্তার জন্যে সশস্ত্র প্রহরার ব্যবস্থা নিশ্চয় তিনি করবেন, যা আওয়ামী লীগ কিংবা বেসামরিক কোনো মহলের পক্ষে এ মুহূর্তে সম্ভব নয়।

সেই গভীর রাতেই পরের দিন অর্থাৎ ২৭ মার্চ প্রত্যুষের জন্যে যানবাহনের সংস্থান করা অপরিহার্য হয়েছিল। একজন বিদেশাগত ব্যবসায়ী মাহমুদ হোসেন ছিলেন হোটেল আগ্রাবাদের বোর্ডার। ফ্রান্সে তাঁর ডিস্ক রেকর্ড উৎপাদনের কারখানা আছে, জানিয়েছিলেন। চট্টগ্রামের কণ্ঠশিল্পীদের সঙ্গে পরিচয় করার লক্ষ্যে আমার শরণাপন্ন হয়েছিলেন চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্রে। সেই সূত্রে সদ্য গজানো বন্ধুত্ব। অধ্যাপক মমতাজ উদ্‌দীন আহমদ রচিত প্রযোজিত অসহযোগ আন্দোলনকালীন লালদীঘির ময়দানের গণ-নাটকের অভিনয় আমি ও মাহমুদ হোসেন একযোগে ঘাসের ওপরে বসে উপভোগ করেছিলাম। মাহমুদ হোসেনের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করতেই তিনি জানিয়েছিলেন, সেই রাত ১০টায় তিনি কালুরঘাট থেকে একটি ইংরেজি ঘোষণা প্রচার করেছেন স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্রের সান্ধ্য বা উদ্বোধনী অধিবেশনের ধারাবাহিকতায়। সঙ্গীতশিল্পী রঙ্গলাল দেব চৌধুরীর সহযোগিতায় বেতারের দু'জন প্রকৌশলিক কর্মীকে নকল পিস্তলের মুখে প্রচার ভবনে নিয়ে গিয়েছিলেন। আমার উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার সুরাহা হয়ে গিয়েছিল। বলেছিলাম, আমরা উভয়েই একই পথের পথিক। চলুন, আগামীকাল থেকে কালুরঘাটে একযোগে কাজ করা যাবে। তার আগে একটু পটিয়া যেতে চাই, যদি আপনি একটা গাড়ির ব্যবস্থা করতে পারেন।

মাহমুদ হোসেন ও আমি যখন পটিয়ায় পৌঁছেছিলাম, তখন দ্বিপ্রহর। ঘটনাচক্রে পটিয়া থানার ও-সি হিসেবে আমার পূর্বপরিচিত মানিক মিয়াকে পেয়েছিলাম। তাঁর মুখেই মেজর জিয়াউর রহমানের নাম জানতে পেরেছিলাম। জিয়া আগের দিন অর্থাৎ ২৬ মার্চ সন্ধ্যা ৭ : ৪০ মি.-এ এবং রাত ১০টায় প্রচারিত বেতারের দুটো অধিবেশনই শুনেছিলেন। আমার প্রস্তাবমাত্রই তাঁর ভাসমান ছাউনি পটিয়া থেকে কালুরঘাট প্রচার ভবনে স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। না, ওই সময়ে পটিয়া থানায় কিংবা পটিয়া থেকে কালুরঘাট পর্যন্ত পথটুকুতে এবং প্রচার ভবনে আতাউর রহমান কায়সার বা কোনো নেতৃস্থানীয় চেনামুখ রাজনীতিককে আমরা দেখতে পাইনি।

২৭ মার্চ সান্ধ্য অধিবেশনে মেজর জিয়ার প্রথম ঘোষণাটি অবশ্যই 'বঙ্গবন্ধুর পক্ষে' (ইংরেজিতে : 'অন বিহাফ অব আওয়ার গ্রেট ন্যাশনাল লিডার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান') শব্দাবলী সহযোগেই প্রচারিত হয়েছিল। শেষতম উচ্চারণ ছিল : 'খোদা হাফেজ, জয় বাংলা'। প্রচার ভবনের অফিসকক্ষে অন্তরঙ্গ পরিবেশে আমার সরস প্রস্তাবের (এখানে আমরা সবাই 'মাইনর', আপনিই একমাত্র 'মেজর' ইত্যাদি) প্রেক্ষিতেই ঘোষণা প্রচারের তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন মেজর জিয়া। আর ঘোষণার মূল ইংরেজি লিপি রচনা ও বাংলা অনুবাদলিপি তৈরিতে সহযোগিতা করেছিলাম আমরা তিনজন—ক্যাপ্টেন অলি আহমদ, অধ্যাপক মমতাজ উদ্‌দীন আহমদ এবং আমি। সেই সান্ধ্য অধিবেশনে (২৭ মার্চ) জিয়ার স্বকণ্ঠে ইংরেজি ঘোষণাটি প্রচারের পর বাংলা অনুবাদ আবদুল্লাহ-আল ফারুকের কণ্ঠে প্রচারিত হয়েছিল। পরবর্তী সংবাদ বুলেটিনে আবুল কাসেম সন্দ্বীপ ঘোষণাটিকে চট্টগ্রাম প্রতিনিধির বরাত দিয়ে মেজর জিয়ার বিবৃতি হিসেবে কভারেজ দিয়েছিলেন।

২৮ মার্চ মেজর জিয়া নতুন মুসাবিদাকৃত একটি ঘোষণাপত্র নিয়ে এসেছিলেন। ওতে নিজেকে 'প্রভিশনাল হেড অব বাংলাদেশ' দাবি বিধৃত। তাঁর সঙ্গীয় ক্যাপ্টেনদের একজন (সম্ভবত ক্যাপ্টেন ভূঁইয়া) বলেছিলেন, আপনাকে, স্যার, এই প্রাধান্য দাবি করতেই হবে। নইলে দেশ-বিদেশের কাছে অস্ত্র সাহায্যের আবেদন গুরুত্ব পাবে না।

মেজর জিয়া দ্বিধাগ্রস্ত—কেননা অন্য কোনো সেক্টরে তাঁর সিনিয়র কোনো বাঙালি সামরিক অফিসার তাঁর মতোই প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেন হয়তো। সেই মুহূর্তে জিয়া আমাকেই জিজ্ঞেস করেছিলেন, এ ব্যাপারে আপনি কি বলেন?

উত্তরে আমি বলেছিলাম, ওঁরা যা বলছেন, তা ঠিকই। দেশ-বিদেশের কাছে আপনার সাহায্যের আবেদনকে গুরুত্ববহ করার জন্যে এবং এ মুহূর্তে বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে আপনি তাঁর পক্ষে নিজেকে 'ভারপ্রাপ্ত প্রধান' বলে ঘোষণা করতে পারেন।

কিন্তু আমার পরামর্শ গৃহীত হয়নি। আর সেই ২৮ মার্চের ঘোষণা শুনেই জনাব এ কে খান মেজর জিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে বক্তব্য শুধরে নেবার পরামর্শ দিয়েছিলেন। কারণ একাত্তরের সেই পরম লগ্নে শেখ মুজিব ছাড়া অপর কোনো জননায়কেরই রাষ্ট্র বা দেশপ্রধান হবার পটভূমি ছিল না। একজন অজ্ঞাতনামা সামরিক অফিসার তো নয়ই, বাংলাদেশের অপর কোনো রাজনীতিক নেতার ক্ষেত্রেও অনুরূপ দাবি তখন প্রযোজ্য ছিল না। বস্তুত পাকিস্তানের সামরিক সরকার গণরায়ের অনুকূলে ক্ষমতা হস্তান্তর করলে তো শেখ মুজিবের কাছেই করতেন।

জিয়ার তৃতীয় ঘোষণাটিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের নাম এবং একমাত্র বৈধ নেতৃত্বের কথা বারবার উচ্চারণ করা হয়েছিল। জনাব এ কে খানের সঙ্গে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে পরবর্তী সময়ে জেনেছিলাম, তিনি টেলিফোনে মেজর জিয়ার সেই (অর্থাৎ তৃতীয়) ঘোষণালিপিটির ডিকটেশন দিয়েছিলেন।

জিয়ার চতুর্থ ঘোষণাটি ৩০ মার্চে প্রচারের সুযোগ পাওয়া যায়নি। ওই দিনই দ্বিপ্রহরে কালুরঘাট প্রচার ভবনের ওপর পাকিস্তানি বিমান থেকে বোমা বর্ষিত হয়েছিল। বাংলাদেশে হানাদারদের প্রথম বিমান হামলা। সেই শেষতম বা চতুর্থ ঘোষণালিপিতে মেজর জিয়া তাঁর স্বাক্ষরের নিচে ভুলক্রমে ৩০-এর বদলে ৩১ মার্চ লিখেছিলেন।

কালুরঘাট প্রচার ভবনে একদিন মাত্র এম এ হান্নান ও ডা. আবু জাফর ছাড়া ৩০ মার্চ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে অপর কোনো পরিচিত বা এমএনএ পর্যায়ে রাজনীতিকের আনাগোনা আদৌ দেখতে পাওয়া যায়নি। তবে প্রচার ভবনসংলগ্ন মোহরা গ্রামের বাসিন্দা দুই সহোদর সেকান্দর হায়াত খান ও হারুনর রশীদ খান বেতারকর্মীদের সার্বক্ষণিক সহায়তা দান করেছিলেন। উভয়েই তরুণ এবং যথাক্রমে আওয়ামী লীগ ও তমদ্দুন মজলিসের কর্মী ছিলেন।... ...

আতাউর রহমান কায়সার আমার পূর্বপরিচিত ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের প্রাক্কালে তাঁর সঙ্গে আমাদের সেই ৩ এপ্রিলেই হয়েছিল প্রথম যোগাযোগ। এর আগে চট্টগ্রাম শহর, কালুরঘাট এবং পটিয়ায় কোথাও আমরা তাঁর দেখা পাইনি। জনাব এ কে খানের সঙ্গে

মেজর জিয়ার টেলিফোনে যোগাযোগের নেপথ্য সহযোগিতায় যদি তিনি থেকে থাকেন, তা আমাদের জানা থাকার কথা নয়। তবে তারিখবিভ্রমের কারণেই তিনি জিয়ার প্রথম ঘোষণায় 'বঙ্গবন্ধুর পক্ষে' উল্লেখিত হওয়া সম্পর্কে দ্বিধাগ্রস্ত হতে পারেন। তিনি নিশ্চয় ২৮ মার্চের ঘোষণাটিই নিজের অবস্থানস্থলে বসে শুনেছিলেন এবং সেটাকেই প্রথম ঘোষণা ও ২৭ মার্চ বলে তাঁর স্মৃতিবিভ্রম ঘটেছিল।... ...

— (প্রকাশ : দৈনিক আজাদী, ১০ মে ও আজকের কাগজ ২৫ জুলাই এবং কানাডা থেকে প্রকাশিত 'দেশে বিদেশে', ২৫ জুলাই, ১৯৯২)

হান্নানের কণ্ঠ, জিয়ার কণ্ঠ

বেশ কয়েক মাস আগে পাওয়া একটি 'টেলিফোন কল'। নিজের পরিচয় দেয়ার বদলে 'কলার' আমার নাম পরিচয় জেনে নিলেন। নিজের কথা খুব বিনয়ের সঙ্গেই বললেন, আমাকে আপনি চিনবেন না। তবে শুনুন—

বলেই ক্যাসেট চালিয়ে দিলেন। তিনি ও-প্রান্তে। আমি আর বিরক্ত প্রকাশ করবো কি, শব্দে শব্দে শিহরিত হতে লাগলাম। আমার সব চেনা কণ্ঠস্বর— আবুল কাসেম সন্দ্বীপের কণ্ঠ, আবদুল্লাহ-আল ফারুকের কণ্ঠ, কবি আবদুস সালামের কণ্ঠ, এম এ হান্নানের কণ্ঠ? সুলতানুল আলমের অনুষ্ঠান ঘোষণা? ১৯৭১-এর ২৬ মার্চ 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র' থেকে আমাদের তাৎক্ষণিক পরিকল্পিত অনুষ্ঠানমালা! তার মধ্যে এম এ হান্নানের কণ্ঠে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার বাণী?

ক্যাসেট এখানেই থামেনি। আমার অহরহ চমকিত হবার ধারাবাহিকতায় শুনতে পেলাম ২৭ মার্চ-এর পরবর্তী দিনগুলোর অনুষ্ঠানমালাও। তার মধ্যে মেজর জিয়ার কণ্ঠস্বর? মেজর জিয়ার ইংরেজি ভাষার প্রথম ঘোষণাটির পরিকল্পনা, মুসাবিদা ও প্রচারের সঙ্গে আমি সংশ্লিষ্ট ছিলাম। সেটা ছিল বঙ্গবন্ধুর পক্ষে বেতারে অনুরূপ তৃতীয় ঘোষণা।

: শুনলেন তো। এসব আমি রেকর্ড করেছিলাম। এখন কোনটা কার কণ্ঠ, জানা দরকার।

: বেশ তো, আপনি আসুন কোনো সময়।

পরে আর যোগাযোগ করেননি তিনি। তবে কিছুদিন পরই দুটি দৈনিক পত্রিকায় 'প্রসঙ্গ : স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র' শীর্ষক দুটি চিঠি প্রকাশিত হলো। প্রায় একই বক্তব্যবাহী চিঠি দুটির লেখক 'এম এ হোসেন' ও 'মোহাম্মদ এম হোসেন'। উভয় চিঠিতেই দক্ষিণ গোড়ানের একটি ঠিকানা।

গত ১১ ডিসেম্বর ১৯৯১ আমি চট্টগ্রামের বিজয় মেলায় গিয়েছিলাম। সেই সভা-মঞ্চে আমার পরিচিত সরদার সিরাজুল ইসলাম আমাকে একজন লোকের হদিস দিলেন, যার কাছে স্বাধীন বাংলা (বিপ্লবী) বেতার কেন্দ্রের বাণীবদ্ধকৃত অনুষ্ঠানমালা সংরক্ষিত আছে। তিনি যথাযোগ্যভাবে সেগুলো প্রকাশ করতে আগ্রহী। আমি বললাম, এ মুহূর্তে

মুক্তি— ৩৮

স্বাধীনতার ঘোষণা নিয়ে যে অবাঞ্ছিত বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছে, তার দ্রুত নিরসনের জন্যে তিনি এগিয়ে এলে আমরা সবাই খুব খুশি হবো। তিনি ইচ্ছে করলে, আমরা যারা ঐ সময়ে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের পরিচালনায় ছিলাম, তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করে রেকর্ডকৃত কণ্ঠস্বর ও প্রচারের দিনক্ষণ নিরূপণে আমাদের সহযোগিতা গ্রহণ করতে পারেন। এ মুহূর্তে ওইসব বিরল তথ্য প্রকাশ করলে আজকের স্মৃতি-বিস্মৃতির সংকট আর বানোয়াট দাবির হিড়িকের মধ্যে প্রামাণ্য দিক-নির্দেশনার জন্যে তিনি ধন্যবাদার্হ হবেন। বস্তুত তাঁর কাছে সংরক্ষিত তথ্যাদি নিয়ে রক্ষণশীলতার কোনো অবকাশ নেই।

অত্যন্ত আশান্বিত হলাম, গত ২৯ ডিসেম্বরের 'দৈনিক রূপালী'তে এম এম হোসেনের 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র ও কিছু তথ্য' শীর্ষক একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। আমি ধারণা করছি, এই নিবন্ধকার ও পূর্বাহ্নে পত্রান্তরে প্রকাশিত দু'টি পত্রের লেখক এবং সর্দার সিরাজুন ইসলাম কথিত সংগ্রাহক একই ব্যক্তি হবেন। আমার সঙ্গে টেলিফোনে সংযোগকারীও হয়তোবা অভিন্ন ব্যক্তি। এবারের নিবন্ধে তিনি মেজর জিয়ার কণ্ঠস্বরের দুটি আংশিক উদ্ধৃতি (ইংরেজি) সংযোজিত করেছেন। এসব প্রামাণ্য নিদর্শনের আলোকে এম এম হোসেন মন্তব্য করেছেন, মেজর জিয়ার দুটি ঘোষণায় কোথাও 'আমি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করছি' এক কথাটি পাওয়া যায় না। স্বাধীনতার পরে তিনি যখন ক্ষমতায় ছিলেন, তখন তাঁর সমর্থকরা মেজর জিয়ার ২৭ মার্চের ঘোষণাটিকে অত্যন্ত সুন্দর ও সুপরিকল্পিতভাবে তৈরি করে নিয়েছেন, যা পড়লে মনে হয় তিনিই স্বাধীনতার ঘোষক ইত্যাদি।

প্রকৃতপক্ষে ২৭ মার্চের ঘোষণাটি মেজর জিয়া আমার প্রস্তাবে আমার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে লিখেছিলেন। প্রচার শেষে তাঁর হস্তাক্ষরে পাণ্ডুলিপিটি আমার কাছেই ছিল। সে রাতে কালুরঘাট থেকে শহরে ফেরার পর আমাদের আশ্রয়দাতা গৃহকর্তা ডা. মোহাম্মদ শফী নিরাপত্তার কথা ভেবে টুকরো কাগজটি আমার হাত থেকে নিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছিলেন। এই তথ্য আমি ১৯৭২-এর পর থেকে বহুবার বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় সাক্ষাৎকারে, নিবন্ধে এবং আমার 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র' গ্রন্থে উল্লেখ করেছি। ... ...

মেজর জিয়ার দ্বিতীয় ঘোষণাটিতে পরের দিন (২৮ মার্চ) তিনি নিজেকে Provisional Head of Bangladesh উল্লেখ করেন। এটি প্রচারের পূর্বাহ্নে তিনি দ্বিধান্বিত ছিলেন। কারণ অন্য এলাকায় তাঁর চেয়ে সিনিয়র সামরিক কর্মকর্তা (বাঙালি) থাকতে পারেন। তাঁর সঙ্গীয় ক্যাপ্টেনরা [বিশেষ করে ক্যাপ্টেন ভূঁইয়া] এই বলে যুক্তি প্রদর্শন করেছিলেন, দেশ-বিদেশের কাছে গুরুত্ব উৎপাদনের জন্যেই মেজর জিয়ার অনুরূপ প্রাধান্য দাবি করা দরকার। এ বিষয়ে মেজর জিয়া আমার মতামত জানতে চেয়েছিলেন। আমি তখন বলেছিলাম, বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে তাঁর পক্ষে তিনি নিজেকে সামরিক বাহিনীর প্রধান দাবি করতে পারেন। আমার পরামর্শটি রক্ষিত হয়নি। তবে এই ঘোষণাটি শুনে বর্ষীয়ান রাজনীতিক এ কে খান মেজর জিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করে

সমকালীন দেশ-পরিস্থিতি তাঁকে বুঝিয়ে দেন। ওই সময়ে শেখ মুজিবুর রহমানই একমাত্র প্রশাসনিক প্রাধান্য বা জাতীয় নেতৃত্বে গৃহীত হবেন। অন্য কেউ নয়। মেজর জিয়া বিষয়টি উপলব্ধি করেছিলেন এবং পরবর্তী বা তৃতীয় ঘোষণায় বারবার বঙ্গবন্ধুর একচ্ছত্র নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য উচ্চারণ করেছিলেন। এম এম হোসেন তাঁর নিবন্ধে যে উদ্ধৃতিটুকুকে মেজর জিয়ার দ্বিতীয় ঘোষণা বলেছেন, সেটাই এ কে খানের নির্দেশিত ঘোষণা। অর্থাৎ তৃতীয় ঘোষণা।

যা-ই হোক, এম এম হোসেনকে এই পত্রিকার মাধ্যমে অবহিত করতে চাই, তিনি তাঁর কাছে সংরক্ষিত টেপটির বাণী লিপিবদ্ধ করে পত্রিকায় প্রকাশ ছাড়াও কোনটি কার কণ্ঠ, তা নিরূপণের জন্যেও যেন উদ্যোগী হন। আমাদের ১০ জনের মধ্যে একজন মাত্র আবদুল্লাহ– আল ফারুক দেশের বাইরে আছেন। বাদবাকি সবাই ঢাকা ও চট্টগ্রামে অবস্থানরত। ৩০ মার্চ কালুরঘাটে বিমান হামলার পরক্ষণে পরম নৈরাজ্যের মধ্যে আমাদের এক স্থান থেকে অন্যস্থানে, সীমান্তের ওপারে গমনাগমন এবং এভাবে মুক্তিযুদ্ধের শেষ দিনটি পর্যন্ত শব্দসৈনিক হিসেবে নিরবচ্ছিন্ন কর্মব্রতী থাকার ফলে স্মৃতি-বিস্মৃতির অবকাশ যতোই থাকুক, ধারণকৃত টেপ শুনে আমরা হয়তো কণ্ঠস্বর সঠিক চিনতে পারবো, প্রচার-সময়ও আঁচ করতে পারবো।

এম এম হোসেনের কাছে দেশের ইতিহাস গবেষকরা কৃতজ্ঞ থাকবেন, তিনি যদি তাঁর কাছে সংরক্ষিত প্রামাণ্য সম্ভার বর্তমান অবাঞ্ছিত বিতর্কের 'সময়-কাল'কে উপহার দেন। (২.১.৯২)। (সংক্ষেপিত)

[নিবন্ধটি ১৪ জানুয়ারি ১৯৯২ তারিখের দৈনিক রূপালীতে প্রকাশিত। একই পত্রিকার 'অভিমত' কলামে ১৯ জানুয়ারিতে এম এম হোসেনের 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র ও আরও কিছু তথ্য' শীর্ষক এই লেখাটি পত্রস্থ হয় :

'১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ চট্টগ্রামের কালুরঘাটে স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতারকেন্দ্র থেকে সন্ধ্যার অনুষ্ঠানে প্রচারিত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও হৃদয়স্পর্শী ভাষণটির যেখান থেকে ক্যাসেটে ধারণ করা সম্ভব হয়েছিল সেখান থেকেই সবার অবগতির জন্য নিম্নে হুবহু তুলে দেওয়া হলো—

'ভাইয়েরা আমার, গতরাত্রি (২৫ মার্চ) সারা বাংলার ওপর যেভাবে গুলিগোলা চালানো হয়েছে তাতে বাঙালিরা দমে নাই। হাজার হাজার পশ্চিমা হানাদার বাহিনীকে তারা ধ্বংস করে চলেছে। জনতা তাদের সাথে এগিয়ে যাচ্ছে। লাখো-লাখো জনতার কাফেলা আজ মাঠে-ময়দানে ছুটে চলেছে। টিক্কা খানের মার্শাল ল'কে মানে নাই, ইয়াহিয়া খানের মার্শাল ল'কে মানে নাই। ভাইয়েরা আমার, বাঙালি ভাইয়েরা আমার, যদি বাংলাকে বাঁচাতে চান, বাংলার নয়নমণি, বাংলার বঙ্গশার্দুল শেখ মুজিবুর সাহেব আজকে যে (২৬ মার্চ) বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন, সেই স্বাধীনতা যদি রক্ষা করতে চান, যদি স্বাধীন নাগরিকের মতো এই পৃথিবীর বুকে বাঁচতে চান, তাহলে আপনাদের কাছে আমার আকুল আবেদন, বাংলার নয়নমণি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবরের

পক্ষ হয়ে বলছি, আপনাদের কাছে আমার আকুল আবেদন, সর্বাত্মক সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ুন, পশ্চিমা হানাদার বাহিনীদের এদেশ থেকে চিরতরে খতম করে তাদের জীবনে বিষাক্ত লেলিহান এনে দিন। ভাইয়েরা আমার, বাংলায় আজ দুর্ভিক্ষ, অনাহার তবুও বাংলার মানুষ জানে কি করে স্বাধীনতা রক্ষা করতে হয়। বাইরের শান্তিকামী মানুষের প্রতি বিশেষ করে আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রের প্রতি আমাদের আকুল আবেদন, আপনারা মানবতার খাতিরে আমাদের সংগ্রামে নিজেদের একাত্ম করুন। আমাদের বাংলার মানুষকে রক্ষা করুন। আজ আমরা মরিয়া হয়ে এই পৃথিবীর বুকে প্রমাণ দিয়ে যেতে চাই, সারা বাংলাদেশ পৃথিবীর বুকে একটা রেকর্ড স্থাপন করতে চায়। শান্তিকামী পৃথিবীবাসীদের কাছে আমাদের আবেদন, আপনারা এই বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষকে রক্ষা করার জন্য এগিয়ে আসুন এবং ওই পশ্চিমা হানাদার শোষকদের বিরুদ্ধে আপনাদের অস্ত্র তুলে ধরুন। আর মানবতার খাতিরে আপনাদের কাছে আহ্বান জানাই আপনারা এগিয়ে এসে আমাদের এই দেশকে রক্ষা করুন। এই মাত্র তথাকথিত পাকিস্তান রেডিও থেকে নাকি প্রচার করা হয়েছে, শেখ সাহেব এরেস্ট হয়েছেন, এই একটা ডাহা মিথ্যা। শেখ সাহেব এখন আত্মগোপন করে সারা বাংলার মানুষকে পরিচালিত করছেন। আর বাঙালি, ইপিআর, ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট এবং পুলিশ বাহিনী জনতার সাথে একাত্ম হয়ে পশ্চিমা হানাদারদের বুকে মরণ কামড় এনেছে। তারা আজ হাজার হাজার সৈন্য ওই পশ্চিম পাকিস্তানের মানুষকে আমরা রাস্তায় লুটিয়ে দিচ্ছি বুলেটের আঘাতে। ভাইয়েরা আমার, আপনাদেরকে ভয়ভীতি প্রদর্শনের জন্য এইসব নানাভাবে মিথ্যা প্রচারণা করা হচ্ছে। আমরা বাঙালিরা আজ যে সর্বাত্মক সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছি, পৃথিবীর শান্তিকামী মানুষের কাছে আমাদের আবেদন, আপনারা বিশেষ করে আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র আপনারা এগিয়ে আসুন, বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষকে রক্ষা করুন। যদি মানবতায় আপনাদের বিশ্বাস হয়, আপনারাও যদি মানুষ হয়ে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে থাকেন তাহলে এই মানুষকে বাঁচানোর এই নৈতিক দায়িত্ব আজ পৃথিবীর সর্বদেশের শান্তিকামী জনসাধারণের। তাই আমরা যে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছি সেই স্বাধীনতাকে রক্ষা করার জন্য পশ্চিমা হানাদার বাহিনী থেকে বাংলার নিরীহ অস্ত্রবিহীন মানুষকে রক্ষা করার জন্য আপনাদের কাছে আবেদন জানাই। ভাইয়েরা আমার, আজ সারা চট্টগ্রাম, ঢাকা, রাজশাহী, খুলনা ও বাংলাদেশের প্রতিটি ডিস্ট্রিক্টে আজ যেভাবে বাঙালিরা একাত্ম হয়ে ইপিআর এবং পুলিশ বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে পশ্চিমা হানাদার বাহিনীদের ওপর আঘাত হানছে তাতে তারা সহ্য করতে না পেরে এখন লুকিয়ে গেছে। আমরা সবখানে আমাদের কর্তৃত্ব স্থাপন করেছি। আজ বাংলাদেশের স্বাধীন বেতার কেন্দ্র থেকে আপনাদের কাছে এই আহ্বান জানাচ্ছি। এই বেতার কেন্দ্র আপনাদের মাঝে মাঝে খবর দিবে। আপনারা সদাসর্বদা তৈরি থাকবেন কখন এই নির্দেশ আপনাদের প্রতি আসে। বাংলার নয়নমণি, বঙ্গবন্ধু, বঙ্গশার্দুল শেখ মুজিবুর রহমান সাহেবের নির্দেশ যে, বাঙালি উঠ, জাগো, পশ্চিমা হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে তোমরা নিজেদের হাতুড়ি, শাবল, লোহা-লক্কড়, পিস্তল, কামান, বন্দুক যা

আছে ছুটে যাও, স্বাধীনতাকে রক্ষা করো। বাংলা মায়ের সন্তানদের মুখে হাসি ফুটিয়ে তোলার আজকে আমরা যে পণ করেছি, আমাদের সমস্ত রক্তের বিনিময়ে হলেও বাংলার স্বাধীনতাকে আমরা রক্ষা করবোই করবো।

জয় বাংলা, জয় বাংলা, জয় বাংলা।'

গত ১৪ জানুয়ারি দৈনিক রূপালীতে জনাব বেলাল মোহাম্মদের 'হান্নানের কণ্ঠ, জিয়ার কণ্ঠ' শীর্ষক অত্যন্ত মূল্যবান লেখাটির জন্য তাঁকে অনেক ধন্যবাদ। ওপরে উল্লেখিত ভাষণটি পাঠ করে নিশ্চয়ই জনাব বেলাল মোহাম্মদ ও তাঁর সহকর্মীগণ যারা তখন স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্রটির পরিচালনায় ছিলেন তারা সঠিকভাবে বলতে পারবেন ২৬ মার্চ সন্ধ্যার অনুষ্ঠানে এই ভাষণটি কার কণ্ঠে প্রচারিত হয়েছিল। জনাব বেলাল মোহাম্মদ ওই বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত মেজর জিয়ার যে তিনটি ঘোষণার কথা উল্লেখ করেছেন তা সঠিক। তবে মেজর জিয়ার দ্বিতীয় ঘোষণাটি প্রচারিত হয়েছিল তার পক্ষে তৎকালীন লেফটেন্যান্ট শমশের মবিনের কণ্ঠে ২৮ মার্চ মোট তিন বার। সুতরাং এটাকে ঘোষণা না বলে মেজর জিয়ার বাণী হিসেবে আমি উল্লেখ করেছি। অবশ্য অন্য দু'টি ঘোষণা না বলে মেজর জিয়ার বাণী হিসেবে আমি উল্লেখ করেছি। অবশ্য অন্য দু'টি ঘোষণা মেজর জিয়ার স্ব-কণ্ঠেই প্রচারিত হয়েছিল এবং উক্ত তিনটি ঘোষণাই ছিল ইংরেজি ভাষায়। এখন লেফটেন্যান্ট শমশেরের কণ্ঠে ২৮ মার্চ প্রচারিত মেজর জিয়ার ওই বাণীটি (২য় ঘোষণা) হুবহু নিম্নে তুলে দেয়া হলো :

This is Lt. Shamsher of Bengal Liberation Army, I hereby pass a message from Major Ziaur Rahman of the Bengal Liberation Army.

He says, it is reported that more Pakistani Punjabi troops and armament have been brought to Chittagong and Dhaka by the sea and by air. I, therefore, on behalf of the people of Bangladesh request all the peace loving country of the world to give immediate recognition to Swadhin Bangladesh and extend physical assistance of all types to liberate the democratic minded people of Bangladesh. Under the circumstances, I, hereby, declare myself as a provisional head of the Swadhin Bangla Liberation Goverment under the guidance of Sheikh Mujib. I urge upon the people of Bangladesh to continue this freedom movement with increased vigour and intenses of devotion. By the grace of God victory is ours. Joy Bangla.

বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস দিনের পর দিন শুধু বিকৃত হতেই চলেছে। তাই এই সময় জনাব বেলাল মোহাম্মদ, সরদার সিরাজুল ইসলাম, শামসুর রহমান, ড. হারুন-অর-রশিদ, ময়ীন উদ্দীন আহমেদ এবং আলহাজ শামস উল হুদাদের মতো

ব্যক্তিদের কাছ থেকে স্বাধীনতার তথ্য সংবলিত আরও লেখা পাওয়ার আমরা প্রত্যাশী। স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠানমালার উক্ত ক্যাসেটের কপি অতি শীঘ্রই সকলে পেয়ে যাবেন আশা করি। সকলের অবগতির জন্য মেজর জিয়ার স্ব-কণ্ঠে চট্টগ্রামের কালুরঘাটে স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত তার তৃতীয় ঘোষণাটিও নিম্নে হুবহু তুলে দেয়া হলো :

On behalf of Sheikh Mujibur Rahman, Major Zia of swadhin Bangla Liberation army will just speak to you—Major Zia.

All form of relation to the people of Swadhin Bangladesh on behalf of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman for the step resistance to put up against the invading colonial Pakistani army. The Punjabi soldiers have expelled the support to the free people of Swadhin Bangla. With the existing armed forces in Bangladesh has now faced the past 4 (Four) Days started large scale of troops, Naval and Air movements into Bangladesh specially in the area of Chittagong where Swadhin Bangladesh army has given a shattering blow to the fhemous army of Pakistan. On their part, they have moved PNS Babar, the battleship, innumerable ruddership and aircraft including sea one to zero. They have also started landing, from sea and the coastal area to build up their operation. During the past 3 (three) days they have carried out extensive cold blodded murder of millions of men, women and children. They have followed looting of properties of the people and raping the women of Bangladesh. I would like to clarity one point i.e. Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman is alive and keeping good health. On his behalf, I once again do call the united nations and big powers to intervence immediately without further delay and whatever away and extend appropriate and save seven and half crores of people from murder. Bangabandhu heads the government of Swadhin Bangla and further details will be announced shortly. The people of Bangladesh has stood united and victory will be ours. Jou Bangla.

এম এম হোসেন
১০৩ নয়াপল্টন
ঢাকা-১০০০

পরে এক সময় এম এম হোসেন স্বয়ং আমার কাছে আগমন করে ৯০ মিনিট স্থিতিসম্পন্ন একটি ক্যাসেট হস্তান্তর করেন। লেভেলে এই মর্মে রাবার স্ট্যাম্প মুদ্রিত : '১৯৭১ সনের ২৬ মার্চ থেকে ৩০ মার্চ পর্যন্ত চট্টগ্রামের কালুরঘাট স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠানমালার ক্যাসেট। এই ক্যাসেটের সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকারী এম এম হোসেন কর্তৃক সংরক্ষিত'।

ক্যাসেটটি বাজিয়ে শোনার পর আমি লক্ষ্য করেছি, এটি অংশত সরাসরি বাণীবদ্ধকৃত। এতে ২৬ ও ২৭ মার্চের অনুষ্ঠান বিধৃত নেই। ২৭ মার্চ সম্পর্কে এম এম হোসেন জানালেন, সকাল থেকে কোনো অনুষ্ঠান পাওয়া যাচ্ছিল না দেখে তিনি বাড়ির বাইরে চলে যান এবং সন্ধ্যায় বরিশাল শহরের এক চায়ের দোকানে বসে রেডিও টিউন করে মেজর জিয়ার প্রথম ঘোষণা পাঠ শুনতে পান, যখন তা রেকর্ড করার সুযোগ পাওয়া যায়নি। এছাড়া লক্ষ্য করেছি, এম এ হান্নানের ভাষণ হিসাবে টেপের শুরুতে রেকর্ডকৃত কণ্ঠটি এম এ হান্নানের কণ্ঠ নয়, তবে বক্তব্য এম এ হান্নানের বক্তব্যের অনুরূপ বলেই অনুমিত।

বাংলা ও ইংরেজি সংবাদ এবং বিক্ষিপ্ত ঘোষণাবলীতে যথাক্রমে আবুল কাসেম সন্দ্বীপ ও আবদুল্লাহ-আল-ফারুকের কণ্ঠস্বর আমি সঠিকভাবে সনাক্ত করতে পারছি এই টেপ শুনে এবং মেজর জিয়ার কণ্ঠও।

টেপে স্পোকেন ওয়ার্ড আইটেমের মধ্যে মধ্যে সংযোজিত সঙ্গীত/সঙ্গীতাংশ পরবর্তী সময়ে ডাবিংকৃত বলে আমার ধারণা হচ্ছে। যা-ই হোক, এতে ধারণকৃত জেনুইন বিষয়াদি আমাদের জন্যে বিরল প্রামাণ্য উপকরণ। এ নিয়ে আমরা স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের দশজন প্রাথমিক কর্মী ও তৎকালীন সহযোগীদের সমন্বয়ে যৌথ গবেষণায় প্রবৃত্ত হতে পারি।

পরিশিষ্ট—থ

উই রিভোল্ট

—মেজর জিয়াউর রহমান

১৯৭০ সালের সেপ্টেম্বরে আমাকে নিয়োগ করা হলো চট্টগ্রামে। এবার ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অষ্টম ব্যাটালিয়নের সেকেন্ড-ইন কমান্ড। এর কয়েক দিন পর আমাকে ঢাকা যেতে হয়। নির্বাচনের সময়টায় আমি ছিলাম ক্যান্টনমেন্টে। প্রথম থেকেই পাকিস্তানি অফিসারেরা মনে করতো চূড়ান্ত বিজয় তাদেরই হবে। কিন্তু নির্বাচনের দ্বিতীয় দিনেই তাদের মুখে আমি দেখলাম হতাশার সুস্পষ্ট ছাপ। ঢাকায় অবস্থানকারী পাকিস্তানি সিনিয়র অফিসারদের মুখে দেখলাম আমি আতংকের ছবি। তাদের এই আতংকের কারণও আমার অজানা ছিল না। শিগগিরই জনগণ শাসনতন্ত্র ফিরে পাবে, এই আশায় আমরা বাঙালি অফিসাররা তখন আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিলাম।

চট্টগ্রামে আমরা ব্যস্ত ছিলাম অষ্টম ব্যাটালিয়নকে গড়ে তোলার কাজে। এটা ছিল রেজিমেন্টের তরুণতম ব্যাটালিয়ন। এটার ঘাঁটি ছিল ষোলশহর বাজারে। ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসে এই ব্যাটালিয়নকে পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল। এজন্য আমাদের সেখানে পাঠাতে হয়েছিল দু'শ জওয়ানের একটি অগ্রগামী দল। অন্যরা ছিল একেবারেই প্রাথমিক পর্যায়ের সৈনিক। আমাদের তখন যেসব অস্ত্রশস্ত্র দেওয়া হয়েছিল, তার মধ্যে ছিল তিনশ' পুরনো ৩.৩ রাইফেল, চারটা এল-এম-জি ও দুটি তিন ইঞ্চি মর্টার। গোলাবারুদের পরিমাণও ছিল নগণ্য। আমাদের এন্টিট্যাংক বা ভারী মেশিনগান ছিল না।

ফেব্রুয়ারির শেষ দিকে বাংলাদেশে যখন রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিস্ফোরণোন্মুখ হয়ে উঠছিল, তখন আমি একদিন খবর পেলাম, তৃতীয় কমান্ডো ব্যাটালিয়নের সৈনিকরা চট্টগ্রাম শহরে বিভিন্ন এলাকায় ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে বিহারীদের বাড়িতে বাস করতে শুরু করেছে। খবর নিয়ে আমি আরো জানলাম কমান্ডোরা বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র আর গোলাবারুদ বিহারীদের বাড়িতে জমা করেছে এবং রাতের অন্ধকারে বিপুল সংখ্যক তরুণ বিহারীদের সামরিক ট্রেনিং দিচ্ছে। এসব কিছু থেকে এরা ভয়ানক রকমের অশুভ একটা কিছু করবে তার সুস্পষ্ট আভাসই আমরা পেলাম। তারপর এলো ১ মার্চ। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উদাত্ত আহ্বানে সারাদেশে শুরু হলো ব্যাপক অসহযোগ আন্দোলন। এর পরদিন দাঙ্গা হলো। বিহারীরা হামলা করেছিল এক শান্তিপূর্ণ মিছিলে। এর থেকেই ব্যাপক গোলযোগের সূচনা হলো।

এই সময় আমার ব্যাটালিয়নের এনসিওরা আমাকে জানাল, প্রতিদিন সন্ধ্যায় বিংশতিতম বালুচ রেজিমেন্টের জওয়ানরা বেসামরিক পোশাক পরে সামরিক ট্রাকে করে কোথায় যেন যায়। তারা ফিরে আসে আবার শেষ রাতের দিকে। আমি উৎসুক হলাম। লোক লাগালাম খবর নিতে। জানলাম প্রতি রাতেই তারা যায়। কতকগুলো নির্দিষ্ট বাঙালি পাড়ায় নির্বিচারে হত্যা করে সেখানে বাঙালিদের। এই সময় প্রতিদিনই ছুরিকাহত বাঙালিকে হাসপাতালে ভর্তি হতেও শোনা যায়।

এই সময়ে আমাদের কমান্ডিং অফিসার লেফটেন্যান্ট কর্নেল জানজুয়া আমার গতিবিধির ওপর লক্ষ্য রাখার জন্যেও লোক লাগায়। মাঝে মাঝেই তার লোকেরা গিয়ে আমার সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিতে শুরু করে। আমরা তখন আশংকা করছিলাম, আমাদের হয়তো নিরস্ত্র করা হবে। আমি আমার মনোভাব দমন করে কাজ করে যাই এবং তাদের উদ্যোগ ব্যর্থ করে দেয়ার সম্ভাব্য সব ব্যবস্থা গ্রহণ করি। বাঙালি হত্যা ও বাঙালি দোকানপাটে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ক্রমেই বাড়তে থাকে।

আমাদের নিরস্ত্র করার চেষ্টা করা হলে আমি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করবো কর্নেল (তখন মেজর) শওকতও আমার কাছে তা জানতে চান। ক্যাপ্টেন শমসের মবিন এবং মেজর খালেকুজ্জামান আমাকে জানান যে, স্বাধীনতার জন্য আমি যদি অস্ত্র তুলে নিই তাহলে তারাও দেশের মুক্তির জন্য প্রাণ দিতে কুণ্ঠাবোধ করবেন না। ক্যাপ্টেন ওলি আহমদ আমাদের মাঝে খবর আদান-প্রদান করতেন। জেসিও এবং এনসিওরা দলে দলে বিভিন্ন স্থানে জমা হতে থাকলো। তারাও আমাকে জানায় যে কিছু একটা না করলে বাঙালি জাতি চিরদিনের জন্য দাসে পরিণত হবে। আমি নীরবে তাদের কথা শুনতাম। কিন্তু আমি ঠিক করেছিলাম, উপযুক্ত সময় এলেই আমি মুখ খুলবো। সম্ভবত ৪ মার্চ আমি ক্যাপ্টেন ওলি আহমদকে ডেকে নিই। আমাদের ছিল সেটা প্রথম বৈঠক। আমি তাকে সোজাসুজি বললাম সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করার সময় দ্রুত এগিয়ে আসছে। আমাদের সব সময় সতর্ক থাকতে হবে। ক্যাপ্টেন আহমদও আমার সঙ্গে একমত হন। আমরা পরিকল্পনা তৈরি করি এবং প্রতিদিনই আলোচনা বৈঠকে মিলিত হতে শুরু করি।

৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ঘোষণা আমাদের কাছে এক গ্রিন সিগন্যাল বলে মনে হলো। আমরা আমাদের পরিকল্পনাকে চূড়ান্ত রূপ দিলাম। কিন্তু তৃতীয় কোনো ব্যক্তিকে তা জানালাম না। বাঙালি ও পাকিস্তানি সৈনিকদের মাঝেও উত্তেজনা ক্রমেই চরমে উঠেছিল।

১৩ মার্চ শুরু হলো বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে ইয়াহিয়ার আলোচনা। আমরা সবাই ক্ষণিকের জন্য স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। আমরা আশা করলাম পাকিস্তানি নেতারা যুক্তি মানবে এবং পরিস্থিতির উন্নতি হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে পাকিস্তানিদের সামরিক প্রস্তুতি হ্রাস না পেয়ে দিন দিনই বৃদ্ধি পেতে শুরু করলো। প্রতিদিনই পাকিস্তান থেকে সৈন্য আমদানি করা হলো। বিভিন্ন স্থানে জমা হতে থাকলো অস্ত্রশস্ত্র আর গোলাবারুদ। সিনিয়র পাকিস্তানি সামরিক অফিসাররা সন্দেহজনকভাবে বিভিন্ন গ্যারিসনে আসা-যাওয়া শুরু করলো। চট্টগ্রামে নৌবাহিনীরও শক্তি বৃদ্ধি করা হলো।

১৭ মার্চ স্টেডিয়ামে, ইবিআরসির (ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট সেনার সংক্ষিপ্ত রূপ) লে. কর্নেল এম আর চৌধুরী, আমি, ক্যাপ্টেন ওলি আহমদ ও মেজর আমিন চৌধুরী এক গোপন বৈঠকে মিলিত হলাম। এক চূড়ান্ত যুক্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করলাম। লে. কর্নেল চৌধুরীকে অনুরোধ করলাম নেতৃত্ব দিতে।

দু'দিন পর ইপিআর-এর ক্যাপ্টেন (এখন মেজর) রফিক আমার বাসায় গেলেন এবং ইপিআর বাহিনীকে সঙ্গে নেয়ার প্রস্তাব দিলেন। আমরা ইপিআর বাহিনীকে আমাদের পরিকল্পনাভুক্ত করলাম।

এর মধ্যে পাকিস্তানি বাহিনীও সামরিক তৎপরতা শুরু করার চূড়ান্ত প্রস্তুতি গ্রহণ করলো। ২১ মার্চ জেনারেল আব্দুল হামিদ খান গেল চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টে। চট্টগ্রামে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের চূড়ান্ত পরিকল্পনা প্রণয়নই তার এই সফরের উদ্দেশ্য। সেদিন ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট সেন্টারের ভোজ সভায় জেনারেল হামিদ ২০তম বালুচ রেজিমেন্টের কমান্ডিং অফিসার লে. কর্নেল ফাতমীকে বললো -'ফাতমী, সংক্ষেপে ক্ষিপ্রগতিতে আর যত কম সম্ভব লোক ক্ষয় করে কাজ সারতে হবে'। আমি এই কথাগুলো শুনেছিলাম।

২৪ মার্চ ব্রিগেডিয়ার মজুমদার ঢাকা চলে এলেন। সন্ধ্যায় পাকিস্তানি বাহিনী শক্তি প্রয়োগে চট্টগ্রাম বন্দরে যাওয়ার পথ করে নিল। জাহাজ সোয়াত থেকে অস্ত্র নামানোর জন্যই বন্দরের দিকে ছিল তাদের এই অভিযান।

পথে জনতার সঙ্গে ঘটলো তাদের কয়েক দফা সংঘর্ষ। এতে নিহত হলো বিপুল সংখ্যক বাঙালি। সশস্ত্র সংগ্রাম যে কোনো মুহূর্তে শুরু হতে পারে, এ আমরা ধরেই নিয়েছিলাম। মানসিক দিক দিয়ে আমরা ছিলাম প্রস্তুত। পরদিন আমরা পথের ব্যারিকেড অপসারণের কাজে ব্যস্ত ছিলাম।

তারপর এলো সেই কাল রাত। ২৫ ও ২৬ মার্চের মধ্যে কাল রাত। রাত ১১টায় আমার কমান্ডিং অফিসার আমাকে নির্দেশ দিলো নৌবাহিনীর ট্রাকে করে চট্টগ্রাম বন্দরে গিয়ে জেনারেল আনসারীর কাছে রিপোর্ট করতে। আমার সঙ্গে নৌবাহিনীর দু'জন অফিসার (পাকিস্তানি) থাকবে, তাও জানানো হলো। আমি ইচ্ছা করলে আমার সঙ্গে তিনজন লোক নিয়ে যেতে পারি। তবে আমার সঙ্গে আমারই ব্যাটালিয়নের একজন পাকিস্তানি অফিসারও থাকবে। অবশ্য কমান্ডিং অফিসারের মতে সে যাবে আমাকে গার্ড দিতে।

এ আদেশ পালন করা আমার পক্ষে ছিল অসম্ভব। আমি বন্দরে যাচ্ছি কি-না তা দেখার জন্য একজন লোক ছিল। আর বন্দরে শর্বরির মতো প্রতীক্ষায় ছিল জেনারেল আনসারী। হয়তোবাআমাকে চিরকালের মতোই স্বাগত জানাতে।

আমরা বন্দরের পথে বেরুলাম। আগ্রাবাদে আমাদের থামতে হলো। পথে ছিল ব্যারিকেড। এই সময়ে সেখানে এলো মেজর খালেকুজ্জামান চৌধুরী। ক্যাপ্টেন ওলি আহমদের কাছ থেকে এক বার্তা এসেছে। আমি রাস্তায় হাঁটছিলাম। খালেক আমাকে

একটু দূরে নিয়ে গেল। কানে কানে বললো, তারা ক্যান্টনমেন্ট ও শহরে সামরিক তৎপরতা শুরু করেছে। বহু বাঙালিকে ওরা হত্যা করেছে।

এটা ছিল একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণের চূড়ান্ত সময়। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই আমি বললাম 'উই রিভোল্ট'—আমরা বিদ্রোহ করলাম। তুমি ষোলশহর বাজারে যাও। পাকিস্তানি অফিসারদের গ্রেফতার করো। অলি আহমদকে বলো ব্যাটালিয়ন তৈরি রাখতে। আমি আসছি। আমি নৌবাহিনীর ট্রাকের কাছে ফিরে গেলাম। পাকিস্তানি অফিসার, নৌবাহিনীর চীফ পোর্ট অফিসার ও ড্রাইভারকে জানালাম যে, আমাদের আর বন্দরে যাওয়ার দরকার নেই। এতে তাদের মনে কোনো প্রতিক্রিয়া হলো না দেখে আমি পাঞ্জাবি ড্রাইভারকে ট্রাক ঘুরাতে বললাম। ভাগ্য ভালো, সে আমার আদেশ মানলো। আমরা আবার ফিরে চললাম। ষোলশহর বাজারে পৌঁছেই আমি গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে একটা রাইফেল তুলে নিলাম। পাকিস্তানি অফিসারটির দিকে তাক করে বললাম আমি তোমাকে গ্রেফতার করলাম। সে হাত তুলল। নৌবাহিনীর লোকেরা এতে বিভ্রান্ত হয়ে পড়লো। ওই মুহূর্তে আমি নৌবাহিনীর অফিসারের দিকে রাইফেল তাক করলাম—তারা ছিল আটজন। সবাই আমার নির্দেশ মানলো এবং অস্ত্র ফেলে দিল।

আমি কমান্ডিং অফিসারের জীপ নিয়ে তার বাসার দিকে রওয়ানা দিলাম। তার বাসায় পৌঁছে হাত রাখলাম কলিং বেলে। কমান্ডিং অফিসার পাজামা পরেই বেরিয়ে এলো। খুলে দিল দরজা। ক্ষিপ্রগতিতে আমি ঘরে ঢুকে পড়লাম এবং গলাসুদ্ধ তার কলার টেনে ধরলাম।

দ্রুত গতিতে আবার দরজা খুলে কর্নেলকে আমি বাইরে টেনে আনলাম। বললাম, বন্দরে পাঠিয়ে আমাকে মারতে চেয়েছিলে? এই আমি তোমাকে গ্রেফতার করলাম। এখন লক্ষ্মী সোনার মতো আমার সঙ্গে এসো।

সে আমার কথা মানলো। আমি তাকে ব্যাটালিয়নে নিয়ে এলাম। অফিসারদের মেসে যাওয়ার পরে আমি কর্নেল শওকতকে (তখন মেজর) ডাকলাম। তাকে জানালাম—আমরা বিদ্রোহ করছি। শওকত আমার হাতে হাত মিলালো।

ব্যাটালিয়নে ফিরে দেখলাম, সমস্ত পাকিস্তানি অফিসারকে বন্দী করে একটা ঘরে রাখা হয়েছে। আমি অফিসে গেলাম। চেষ্টা করলাম লে. কর্নেল এম.আর. চৌধুরীর সঙ্গে আর মেজর রফিকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে। কিন্তু পারলাম না। সব চেষ্টা ব্যর্থ হলো। তারপর রিং করলাম বেসামরিক বিভাগের টেলিফোন অপারেটরকে। তাকে অনুরোধ জানালাম— ডেপুটি কমিশনার, পুলিশ সুপারিনটেন্ডেন্ট, কমিশনার, ডি আই জি ও আওয়ামী লীগ নেতাদের জানাতে যে, ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অষ্টম ব্যাটালিয়ন বিদ্রোহ করেছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করবে তারা।

তাঁদের সবার সঙ্গেই আমি টেলিফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছি, কিন্তু কাউকেও পাইনি। তাই টেলিফোন অপারেটরের মাধ্যমেই আমি তাঁদের খবর দিতে চেয়েছিলাম। অপারেটর সানন্দে আমার অনুরোধ রক্ষা করতে রাজি হলো।

সময় ছিল অতি মূল্যবান। আমি ব্যাটালিয়নের অফিসার, জেসিও আর জোয়ানদের ডাকলাম। তাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলাম। তারা সবই জানতো। আমি সংক্ষেপে সব বললাম এবং তাদের নির্দেশ দিলাম সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে। তারা সর্বসম্মতিক্রমে হৃষ্টচিত্তে এ আদেশ মেনে নিলো। আমি তাদের একটা সামরিক পরিকল্পনা দিলাম।

তখন রাত ২টা বেজে ১৫ মিনিট। ২৬ মার্চ ১৯৭১ সাল। রক্ত আখরে বাঙালির হৃদয়ে লেখা একটি দিন। বাংলাদেশের জনগণ চিরদিন স্মরণ রাখবে এই দিনটিকে। স্মরণ রাখতে ভালোবাসবে। এই দিনটিকে তারা কোনোদিন ভুলবে না। কোনোদিন না।

[২৬ মার্চ, ১৯৭৪ সাপ্তাহিক 'বিচিত্রা' পত্রিকাতে (অধুনালুপ্ত) বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর তদানীন্তন উপ-প্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান (বীর উত্তম) পরবর্তীকালে মহামান্য রাষ্ট্রপতি 'একটি জাতির জন্ম' শীর্ষক একটি নিবন্ধ লিখেছিলেন। উক্ত নিবন্ধের অংশ বিশেষ 'উই রিভোল্ট' শিরোনামে শামসুল হুদা চৌধুরী রচিত 'একাত্তরের রণাঙ্গন' বইটিতে ছাপা হয়েছিল। সেটি এখানে পত্রস্থ হলো।]

পরিশিষ্ট – দ

রবার্ট পেইন মার্কিন সাংবাদিক। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ তাঁকে গভীরভাবে আলোড়িত করেছিল। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই তিনি বাংলাদেশ ও ভারত সফর করেন; গ্রহণ করেন অজস্র সাক্ষাৎকার। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি, হত্যা ও ধ্বংসের ছবি এঁকেছেন রবার্ট পেইন দক্ষ চিত্রকরের মতো, তথ্যকে জীবন্ত করেছেন তাঁর কল্পনা দিয়ে। গভীর তাঁর ইতিহাস দৃষ্টি, বাংলাদেশের অতীত, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি সম্পর্কে প্রগাঢ় তাঁর ধারণা। বিদেশী পাঠকদের সামনে রেখে লিখেছেন তিনি 'ম্যাসাকার'। তারই নির্বাচিত অংশ—

"নভেম্বরের ছয় তারিখে প্রথম সাবধান বাণী এলো যে বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণিঝড় তৈরি হচ্ছে। আমেরিকার আবহাওয়া উপগ্রহ এ ঘূর্ণিঝড়ের ক্রম পরিণতির কথা ইসলামাবাদকে জানিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু ইসলামাবাদ ঢাকাকে সে অনুযায়ী সাবধান করে দেয়নি। এ ব্যাপারটিকে দু'ভাবে ব্যাখ্যা করা যায়– প্রথমত, তারা হয়তো ভেবেছিল যে এটা তেমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয় যে খবর দিতে হবে বা ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত এ ধরনের রক্ষাকারী তথ্য হয়তো তারা পূর্ব পাকিস্তানকে সরবরাহ করতে অনিচ্ছুক ছিল।"

—রবার্ট পেইন (মার্কিন সাংবাদিক)

১৯৭০ থেকে '৭১-এর আটটি মাসে পূর্ব পাকিস্তানের ওপর নেমে এলো তিনটি প্রচণ্ড খড়্গাঘাত। '৭০-এর আগস্টে প্রথম আঘাত এলো বর্ষা মৌসুমে। প্রচণ্ড বন্যায় লাখ লাখ একর জমি চলে গেল পানির নিচে, ভেসে গেল বহু পুল, কালভার্ট। প্রায় আড়াই লাখ ঘরবাড়ি বন্যায় ধ্বংস হয়ে গেল। বাস, ট্রেন, টেলিযোগাযোগ বন্ধ হলো, ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়ল মহামারী। এ সময় জেনারেল ইয়াহিয়া ঢাকায় গভর্নর হাউজে রিলিফ অপারেশনের হেড কোয়ার্টার স্থাপন করলেন। আদতে তার কোনো ফলাফলই দেখা গেল না। তিনি জাতীয় পার্লামেন্ট নির্বাচন ডিসেম্বর পর্যন্ত স্থগিত করে দিয়ে ইসলামাবাদে চলে গেলেন। এ সিদ্ধান্তের কারণ হিসেবে বলে গেলেন যে পূর্ব পাকিস্তান এ সময়ের মধ্যে বন্যার ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে পারবে। নির্বাচন স্থগিত রেখে মূলত তিনি নিজের অবস্থানকে আরো পাকাপোক্ত করার কাজে সচেষ্ট ছিলেন।

বন্যার পানি নেমে গেলে সাধারণ মানুষ নিজেরাই সেই ধ্বংসস্তূপ থেকে আবার নতুন করে বাঁচার সংগ্রামে নেমে পড়ল। রিলিফের যে পরিমাণ অর্থ আসত সেটাও পকেটস্থ

হতো সরকারি কর্মচারীদের। মানুষ দেখল তাদেরই বিন্দু বিন্দু রক্তে গড়া সরকার, তাদেরকে রক্ষার সামান্যতম কার্যকরী কোনো উদ্যোগ নিচ্ছে না। নভেম্বরের ছয় তারিখে প্রথম সাবধান বাণী এলো যে বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণিঝড় তৈরি হচ্ছে। আমেরিকার আবহাওয়া উপগ্রহ এ ঘূর্ণিঝড়ের ক্রম পরিণতির কথা ইসলামাবাদকে জানিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু ইসলামাবাদ ঢাকাকে সে অনুযায়ী সাবধান করে দেয়নি। এ ব্যাপারটিকে দু'ভাবে ব্যাখ্যা করা যায়– প্রথমত, তারা হয়তো ভেবেছিল যে এটা তেমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয় যে খবর দিতে হবে বা ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত, এ ধরনের রক্ষাকারী তথ্য হয়তো তারা পূর্ব পাকিস্তানকে সরবরাহ করতে অনিচ্ছুক ছিল।

নভেম্বরের দশ তারিখে উত্তর-পশ্চিম দিকে যাওয়া সাইক্লোন হঠাৎ তার দিক পরিবর্তন করল। মারাত্মক আঘাত হানল গঙ্গার ব-দ্বীপে। এ ঝড়ে বাতাসের গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ১৫০ মাইল। ঝড়ের কবলে ধ্বংস হয়েছে সুন্দরবন আর চট্টগ্রামের গুরুত্বপূর্ণ বন্দর। দ্বীপসমূহ প্রায় বিশ ফুট পানির নিচে ডুবে গিয়েছে। ভোলা গঙ্গার ব-দ্বীপগুলোর মধ্যে বৃহত্তম। এর লোকসংখ্যা দশ লাখেরও বেশি। এ দ্বীপটির সম্পূর্ণ দক্ষিণাংশ ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। গঙ্গার মোহনায় ছোট-বড় মিলে প্রায় শ'দুয়েক দ্বীপ রয়েছে– এগুলোতে বাস করতো ক্ষুদে কৃষিজীবীরা। এদের সমস্ত ঘরবাড়ি ভেসে গিয়েছিল জলের প্রচণ্ড তোড়ে। মধ্যরাতের কিছু আগে যে সাইক্লোন শুরু হয়েছিল, তা ভোর হবার আগেই তার সমস্ত ধ্বংসকর্ম শেষ করেছিল।। স্মরণকালের ইতিহাসে এই সাইক্লোন ছিল মারাত্মক। ১৭৩৭ সালের একটি সাইক্লোনের সঙ্গেই এর তুলনা করা যায়। সেই সাইক্লোনে প্রায় ৩,০০,০০০ (তিন লাখ) মানুষ ওই একই এলাকায় মারা গিয়েছিল।

পানি সরে যাবার পর মৃতদেহগুলোকে গণকবর দেয়া হয়েছিল। কর্মকর্তারা লক্ষ করলেন মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৫,০০,০০০ (পাঁচ লাখে) এসে দাঁড়িয়েছে। বাঙালিরা অনুমান করছে এ সংখ্যা দশ লাখের কাছাকাছি। সরকার শেষে ডাক্তার, সরকারি কর্মকর্তা এদের ওপর ভিত্তি করে মৃতের সরকারি হিসাব দেখাল ২,০৭০০০ (দুই লাখ সাত হাজার)। খুব কম সংখ্যক কর্মকর্তাই মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় গিয়েছিলেন। অনেক জায়গায় তারা যায়ইনি। কোথাও কোথাও তারা পৌছবার আগেই লাশ কবর দেয়া হয়ে গিয়েছিল। প্রচুর মৃতদেহ সমুদ্রে ভেসে গিয়েছিল। অবশ্য সাধারণভাবেই এটা বোঝা গেল যে সরকারি হিসাব অসম্পূর্ণ এবং তাদের ওই তথ্যের ওপরই রিলিফ কার্যক্রমের চিন্তা করা হলো।

ইসলামাবাদ সরকার তার কাজ করছিল খুব আস্তে আস্তে। সাইক্লোনের দশদিন পর ২১ নভেম্বর থেকে রিলিফ দেয়া শুরু হলো এবং তারও দু'দিন পরে ঘোষণা দেয়া হলো ৫০ মিলিয়ন রুপির বিশেষ ফান্ডের। তবে ঘোষণায় স্পষ্ট করে বলা হলো না কিছুই, এ ফান্ড কিসের জন্য বা তা কিভাবে ব্যয় করা হবে।

ইয়াহিয়া খান ওই সময় শেষ করলেন তার পিকিং সফর। অত্যন্ত সফল হয়েছিল তার চীন সফর। তিনি চেয়ারম্যান মাও সে তুং-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, একটি চৈনিক মেডেল পান এবং ব্যাপক সামরিক সাহায্যের জন্য একটি চুক্তিও স্বাক্ষর করেছিলেন। পিকিং থেকে ফেরার পথে তিনি ৩ হাজার ফিট ওপর থেকে ধ্বংসপ্রাপ্ত এলাকাগুলো দেখে গেলেন। কিন্তু বাংলায় শতাব্দীর ধ্বংসকারী সাইক্লোন তাকে সামান্যতমও বিচলিত করল না।

সাইক্লোনের ধ্বংসযজ্ঞ হতে কিছুটা দাঁড়িয়ে বাঙালিরা পাকিস্তানিদের ব্যবহারে অপমানিত বোধ করল, তাদের প্রতিটি ব্যবহারেই যেন একটা অদ্ভুত মনোভাব ফুটে ওঠে। তারা লক্ষ করে পাকিস্তানি রিলিফ টিম আসার এক সপ্তাহ আগেই ব্রিটিশ টিম উদ্ধার এবং রিলিফ দেয়ার কাজ শুরু করেছে। বাঙালিরা আরো দেখতে পেল পাকিস্তানি রিলিফ টিম তাদের অধিকাংশ সময় ঢাকাতেই কাটাচ্ছে। অথচ ঢাকার খুব সামান্য অংশই ক্রান্তীয় ঝড় আর বন্যায় আক্রান্ত হয়েছিল।

কিছু একটা বেশ খারাপ অবস্থা চলছে যে তা বুঝতে বাঙালিদের বেগ পেতে হলো না, তবুও আশায় থাকা এজন্যে যে ডিসেম্বরের ৭ তারিখে নির্বাচন। দ্বিতীয় বারের মতো নির্বাচন বাতিল না করায় বাঙালিরা যেন সময়ের জন্য তৈরি হতে থাকে। এ নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ অতি সহজেই এক বিপুল বিজয় লাভ করে। আওয়ামী অর্থ জনসাধারণ। এই আওয়ামী লীগ ছিল মাটি থেকে উঠে আসা (গ্রাস রুট) একটি মৌলিক রাজনৈতিক সংগঠন। এ দলের জন্ম দেশ বিভাগের অল্প পরেই। উদ্দেশ্য ছিলো পশ্চিম পাকিস্তানি ভূমি মালিক এবং সামরিক বাহিনী থেকে ক্ষমতা সংগ্রহ করা। নির্বাচনের চূড়ান্ত ফলাফলে দেখা যায় যে ১৬৯ আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ পেয়েছিল ১৬৭টি আসন। পশ্চিম পাকিস্তানে জুলফিকার আলী ভুট্টোর প্রতিষ্ঠিত নতুন পিপলস পার্টি পেয়েছিল ১৩৮টি আসনের মধ্যে ৮১টি আসন। যুক্তিসঙ্গতভাবেই পাকিস্তানের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানেরই হবার কথা।

শেখ মুজিবুর রহমান এবং জুলফিকার আলী ভুট্টোর মধ্যে বেশ কিছু স্বাভাবিক এবং মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। স্যার শাহনেওয়াজ খান ভুট্টোর ছেলে জুলফিকার আলী ভুট্টোর জন্ম ১৯২৮ সালের ৫ জানুয়ারি। অষ্টাদশ শতাব্দীতে তাদের পূর্বপুরুষরা রাজপুতনা থেকে সিন্ধু অঞ্চলে চলে আসার পর থেকে তারা প্রচুর ভূ-সম্পত্তির মালিক হয়ে ওঠে। স্যার শাহনেওয়াজ ভুট্টো ব্রিটিশদের অধীনে অনেক বছর সম্মানজনক চাকরি করেন এবং বোম্বের এ্যাসেম্বলিতে সিন্ধুর প্রতিনিধি হিসেবে যোগ দেন। দেশ বিভাগের পর জুলফিকার আলী ভুট্টো লস এঞ্জেলসের সাউদার্ন ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে যান। সেখানে তিনি অর্থনীতি, লোক প্রশাসন, ইতিহাস এবং ফরাসি ভাষার ওপর পড়াশোনা করেন। পড়াশোনার ব্যাপারে ভুট্টো খুব একটা মনযোগী ছিলেন না। তবে বিতর্ক প্রতিযোগিতায় তিনি বেশ নাম করেছিলেন। বার্কেলেতে ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়াতে আসার পরের বছরগুলোতে তার পড়াশোনার মান বেড়ে যায়।

১৯৫০-এর শুরুতে তিনি এলেন অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির ক্রাইস্ট চার্চ কলেজে। দু'বছর তিনি জুরিসপ্রুডেন্স-এর এমএ ডিগ্রি লাভ করে বার-এ যোগ দেন। এর পরের অংশটুকু সংক্ষেপে বলতে গেলে, তিনি পরবর্তীতে সাউদাম্পটন ইউনিভার্সিটির আন্তর্জাতিক আইনের লেকচারার হন।

ব্যাপক ভূ-সম্পত্তি এবং নাম করা পারিবারিক ঐতিহ্য নিয়ে ভুট্টো পরিবার পাকিস্তানের বাইশ পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। এই বাইশ পরিবার সমগ্র পাকিস্তানের অর্থনৈতিক জীবন নিয়ন্ত্রণ করতো। এজন্য পাকিস্তানে ফেরার পর ভুট্টোর পক্ষে সরকারি কাজে ঢোকার ব্যাপারে কোনোই সমস্যা হয়নি। তিনি শুরুই করেছিলেন উঁচু পর্যায় থেকে। তিনি তিরিশ বছর বয়সেই পেয়ে যান বাণিজ্য মন্ত্রীর পদ। এর পরবর্তী পাঁচ বছর তিনি সফলতার সঙ্গে পালন করেছেন তার কাশ্মীর বিষয়ক, তথ্য বিষয়ক, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক মন্ত্রিত্বের দায়িত্ব। অবশ্য সম্পূর্ণ তার মন্ত্রিত্বের পর্যায়টিই ছিল আইয়ুব খানের সামরিক একনায়কত্বের অধীনে। সম্ভবত তার সম্পূর্ণ শিক্ষা এবং যোগাযোগের কারণেই জনগণের সঙ্গে তার কোনো সংযোগ ছিল না। তিনি পশ্চিম পাকিস্তানি উর্দু ভাষায় কথা বলতেন, আর চিন্তা করতেন ইংরেজি ভাষায়।

শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম মধ্যবিত্ত পিতামাতার ঘরে। তিনি কলকাতার ইসলামিয়া কলেজ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন কিন্তু কোনো প্রাতিষ্ঠানিক উচ্চ ডিগ্রি পাননি। আওয়ামী লীগকে গঠন প্রক্রিয়ায় এনে তাকে তৈরি করতে শুরু করেন একদম নিচে থেকে এবং তা খুব আস্তে আস্তে। তাঁর পড়ার ঘর ছিল তাঁরই মধ্যবিত্ত শোবার ঘরে। তিনি অসম্ভব ভালো বক্তা, সুদর্শন এবং উদ্যমী ছিলেন। চব্বিশ ঘণ্টাই কাজ করতে পারতেন। বাঙালি কৃষকদের ভাষায় কথা বলতেন এবং প্রায় বিশ রকমের আঞ্চলিক ভাষা জানতেন। তার আক্রমণমুখী রাজনীতির জন্যে তিনি পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকবর্গের রোষানলে পড়ে প্রায় ন'বছর কারাবাস করেন।

আওয়ামী লীগের প্রতীক ছিল ছোট কাঠের নৌকা। এ ধরনের নৌকা দেয়ালে বা পোস্টারে আঁকা হতো, সঙ্গে থাকত ছ'দফা দাবি। এ ছ'দফার মূল কথা ছিল প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকবে শুধু বৈদেশিক নীতি ও সামরিক বাহিনী। ছ'দফায় পরোক্ষভাবে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছিল মার্শাল ল'-র অবলুপ্তি এবং পার্লামেন্টারি সরকারের শাসন। অবশ্য তখনো তা স্পষ্ট করে অর্থাৎ প্রত্যক্ষভাবে বলা হয়নি।

একাত্তরের জানুয়ারি মাসে আওয়ামী লীগের সঙ্গে আলোচনা করার জন্য ইয়াহিয়া খান ঢাকায় এলেন। নির্বাচন তখন হয়ে গিয়েছে। শেখ মুজিবুর রহমান আঞ্চলিক প্রশ্নে ছিলেন অনমনীয়। দু'জন ৭টি বৈঠকে আলোচনা করলেন, যার প্রতিটিতেই ইয়াহিয়া খান সামরিক পোশাকে মেডেল ঝুলিয়ে হাতে ছড়ি নিয়ে যোগ দিয়েছিলেন। বৈঠকে আলোচনার ভাষা ছিল ইংরেজি। বৈঠক হলো ঠিকই কিন্তু কোনো সমাধানে আসা গেল না। প্রেসিডেন্ট বললেন, আপনার হাতে জনরায় থাকলেও আমার হাতেই রয়েছে

ক্ষমতা। অথচ জনরায় অনুযায়ী শেখ মুজিবেরই সেই ক্ষমতায় থাকার কথা। অন্যান্য যে কোনো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে তাঁর ইতোমধ্যেই প্রধানমন্ত্রী হয়ে যাবার কথা। অথচ ইয়াহিয়া খান বললেন, তাঁর ক্ষমতা গ্রহণের আগেই নতুন সংবিধান তৈরি করা হবে। এজন্য মার্চ মাসে ইসলামাবাদে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডাকা হয়েছে এবং সংবিধান প্রশ্নে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নাদির নিরসন করা হবে।

এদিকে জুলফিকার আলী ভুট্টো জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বর্জনের সিদ্ধান্ত জানালেন। জাতীয় নির্বাচনে অপেক্ষাকৃত কম জনপ্রিয়তা দেখালেও পিপলস পার্টির এ সিদ্ধান্ত পুরো পরিস্থিতিকে অচলায়তনে ঠেলে দিল। তার এ সিদ্ধান্ত জটিলতাকে দীর্ঘায়িত করে। তিনি জানতেন প্রেসিডেন্ট এবং অন্যান্য জেনারেলরা আওয়ামী লীগকে ধ্বংস করে দেওয়ার পরিকল্পনা করেছে। জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বর্জনের পর ইয়াহিয়া খান নিশ্চিত ছিলেন যে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আর হবে না।

নির্বাচনে আওয়ামী লীগের অভূতপূর্ব বিজয়ের পর পরই '৭০-এর ডিসেম্বর মাসে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে সামরিক বাহিনী দিয়ে আওয়ামী লীগকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হবে। শেখ মুজিবুর রহমান প্রধানমন্ত্রী হবেন এটা সামরিক আমলাদের কাছে অসহনীয় ছিল। এ কাজে প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক বাহিনীর সদস্য সংখ্যা বাড়ানো হলো। ৩০ হাজার সৈন্য আগেই মোতায়েন ছিল, নতুন করে আরো ৩০ হাজার সৈন্যকে পরবর্তী তিন মাসের মধ্যে জল এবং বিমানপথে পূর্ব পাকিস্তানে নিয়ে আসা হয়। সৈন্যদের হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে যাওয়ার উদ্বুদ্ধকরণ প্রক্রিয়াটি একটি স্বল্পকালীন কোর্সের মাধ্যমে করা হয়। এ কোর্সে বাঙালিদের বিশ্বাসঘাতক হিসেবে চিহ্নিত করে বলা হয় তারা সত্যিকারের মুসলমান নয় এবং পাকিস্তানের চেয়ে তারা ভারতকেই বেশি ভালোবাসে।

ফেব্রুয়ারির ২২ তারিখে (১৯৭১) বিশেষ পাঁচজন ব্যক্তির একটি বৈঠকে পূর্ব পাকিস্তানে ধ্বংযজ্ঞ চালানোর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হলো। এরা হলেন– প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান, চিফ অব স্টাফ জেনারেল পীরজাদা, কমান্ডেন্ট জেনারেল টিক্কা খান, জাতীয় নিরাপত্তা কমিশনের চেয়ারম্যান জেনারেল ওমর খান এবং গোয়েন্দা প্রধান জেনারেল আকবর খান। জুলফিকার আলী ভুট্টোকে শিগগিরই বিষয়টি জানানো হলো এবং আদেশ করা হলো তিনি যেন তার নিজের দায়িত্ব প্রেসিডেন্টের হাতে ন্যস্ত করেন।

আওয়ামী লীগ নেতাদের চোখে ধুলো দেবার জন্যে তাদের দাবি-দাওয়া নিয়ে উপর্যুপরি বৈঠকে বসার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ঠিক করা হলো এ আলোচনা চলবে অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত এবং প্রয়োজন হলে আলোচনা চলাকালীন সময়েই হত্যাযজ্ঞের আদেশ দেয়া হবে। আলোচনার এ পর্যায়টিকে শেখ মুজিব অবিশ্বাস করেও ইয়াহিয়া খানের গোপন দূতের সঙ্গে আলোচনায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন এই আশায় যদি কোনো ফলাফল আসে।

মার্চের ৩ তারিখে চট্টগ্রাম বন্দরে এক রেজিমেন্ট বালুচ সৈন্য এবং প্রচুর গোলাবারুদ নিয়ে এলো 'সোয়াত' নামের জাহাজ। খালাসীরা সে গোলাবারুদ নামাতে অস্বীকার

করল। শুধু তাই নয়, তারা বন্দরের চারদিকে ব্যারিকেডও সৃষ্টি করল যাতে সে অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে যেতে না পারে।

ভারতে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যে অস্ত্রটি ফলপ্রসূ ভূমিকা নিয়েছিল তা হচ্ছে হরতাল। শেখ মুজিব ওই ৩ তারিখেই হরতালের আহ্বান জানালেন। সংবাদপত্র, রেডিও খোলা থাকলেও ব্যাংক ছিল দু'ঘণ্টা খোলা। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকারি অফিস-আদালত, বিমানবন্দর এককথায় সব কিছুকেই বিপর্যস্ত করল। শেখ মুজিবুর রহমান জানিয়ে দেন অগণতান্ত্রিক উপায়ে আসীন সংখ্যালঘুদের কথায় সংখ্যাগুরুদের অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখার প্রক্রিয়া সহ্য করা যায় না।

সারাদেশ প্রতিবাদ প্রতিরোধে দৃপ্ত হয়ে উঠতে শুরু করল। সামরিক বাহিনীর চলাচলে বাধাদানের জন্য সারাদেশের সড়ক-মহাসড়কে ব্যারিকেড দেয়া শুরু হলো। ঢাকাতেও ব্যারিকেডের পর ব্যারিকেড তুলল বিক্ষুব্ধ জনতা। সেনাবাহিনীর গুলিতে নিহত হলো ২০০ জন। হরতালের পর সামরিক বাহিনীর আচরণে অমঙ্গলের সব চিহ্নই ফুটে উঠতে থাকে। হত্যাযজ্ঞের যেন শুধুমাত্র সময়টুকুই বাকি– আর কিছু নয়।

মার্চ ৭, শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকার রেসকোর্সে প্রায় দশ লাখ লোকের জনসভায় ভাষণ দেন। হত্যাকাণ্ডের প্রতি তীব্র ক্ষোভ নিয়ে তিনি বললেন, "যদি আর গুলি চলে তবে প্রতিটি ঘরকে দুর্গ হিসেবে গড়ে তুলুন। তিনি যেখানেই প্রয়োজন রাস্তায় বাধা দেওয়ার জন্য ব্যারিকেড গড়ে তুলতে আহ্বান জানিয়ে বলেন, সামরিক বাহিনীর খাদ্য ও পানি সরবরাহ বন্ধ করতে হবে। বাংলাদেশে সামরিক একনায়কত্বের অবসান ঘটাতে হবে। আমি না থাকলেও যুদ্ধ আপনারা চালিয়ে যাবেন। যদি আমাদেরকে রক্ত দিতেই হয় তবে স্বাধীনতা পর্যন্ত আমরা সে রক্ত দিয়ে যাব। এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাআল্লাহ।"

এদিকে আলোচনা গড়িয়ে চলল দিনের পর দিন। আলোচনায় আশ্বাস, আধা-আশ্বাস সংবিধানের ওপর দীর্ঘ আলোচনা ইত্যাদিসহ সাময়িক কিছু সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। অবশ্য পরবর্তীতে এসব সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করা হয়েছিল। শেখ মুজিবুর রহমানের দাবি ছিল সামরিক শাসনের অবসান, সামরিক বাহিনীর হত্যাকাণ্ডের সরকারি তদন্ত কমিশন গঠন করা, সৈন্যদের ব্যারাকে ফিরিয়ে নেয়া এবং জননির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান কোনো কোনো শর্ত কখনো কখনো মানার ভান করলেন বটে, তবে পরে আবার তা অস্বীকারও করেন। এ রকম পরিস্থিতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণে স্বাভাবিকভাবেই জটিলতা চলে এলো। আসলে তিনি সময় নষ্ট করছিলেন আর এ কাজটা ইয়াহিয়া খান সার্থকভাবেই করতে পারছিলেন। আগেই হত্যাযজ্ঞের দিনক্ষণ ঠিক করে ফেলেছিলেন। পঁচিশে মার্চের বিকেলে তিনি নামমাত্র আলোচনায় উপস্থিত হলেন। সন্ধ্যা সাতটায় তার প্রেসিডেন্সিয়াল বিমানে তিনি ঢাকা ত্যাগ করলেন। যাওয়ার আগেই হত্যাযজ্ঞের চূড়ান্ত আদেশ দিয়ে গেলেন।

রবীন্দ্রনাথের একটি বিখ্যাত কবিতায় বাংলাকে সোনার বাংলা বলা হয়েছিল। ইতিহাসের এই সন্ধিক্ষণে এই বাংলা আর বেশিক্ষণ সোনার বাংলা থাকল না– খুব শিগগিরই এটি হয়ে উঠল মৃতের পাহাড়– সভ্যতার স্খলিত রূপ।

গণহত্যা

২৫ মার্চ ১৯৭১। রাত ১১টা বেজে পঁচিশ মিনিটে শুরু হলো হত্যাযজ্ঞ। এক প্লাটুন পাঞ্জাবি এবং বালুচ সৈন্য চারটি আমেরিকার তৈরি এম-২৪ ট্যাঙ্ককে অনুসরণ করে এসে দাঁড়াল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটো ছাত্রাবাসের সামনে এবং মাত্র পঞ্চাশ গজ দূর থেকে শুরু করল বোমাবর্ষণ। ক্যান্টনমেন্ট থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত আসতে ট্যাঙ্কগুলো তেমন বেশি কোনো শব্দ করেনি, সৈন্যদের ওপরও নির্দেশ ছিল যথাসম্ভব নীরবে চলবার। ওই রাতে যে দু'চারজন পথচারী রাস্তায় ছিল তাদেরও তেমন বেশি কিছু প্রতিক্রিয়া হয়নি। কেননা শহরে গত কয়েক সপ্তাহ ধরেই সৈন্যদের ভয়ানক আনাগোনা চলছিল।

সৈন্যরা ট্যাঙ্কের পেছনে লুকিয়ে ছিল। ভাবটি ছিল এমন যেন ছাত্রাবাসের ছাদ বা জানালা থেকে ভারী গোলাবর্ষণ হচ্ছে বা হতে পারে। ছাত্রদের কেউ কেউ তখন বিছানায় চলে গিয়েছে। কেউ কেউ করছিল ভিন্ন ভিন্ন কাজ। কিছু ছাত্র ছিল আলোচনায় ব্যস্ত। অনিশ্চিত রাজনৈতিক পরিস্থিতির ক্রম উত্তেজনায় তারা ঠিকই বুঝতে পেরেছিল যে, যে কোনো মুহূর্তে অবস্থার চূড়ান্ত অবনতি ঘটতে পারে। তবে তারা কেউই ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারেনি যে এ আক্রমণ ছাত্রাবাসে গুলিবর্ষণের মাঝ দিয়ে শুরু হয়ে সমস্ত ঢাকাকে ধ্বংসযজ্ঞে পরিণত করবে।

ছাত্রাবাস দুটি ছিল ইকবাল হল আর জগন্নাথ হল। বিখ্যাত মুসলমান উর্দু কবি ইকবালের নামানুসারে এ হলের নামকরণ করা হয়। এ হলটিতে মুসলমান ছাত্ররা থাকত। অন্যটি হিন্দু দেবতা জগন্নাথ-এর নামানুসারে নাম রাখা। এ হলে থাকত শুধুমাত্র হিন্দু ছাত্ররা। দুটি হলই ছিল কাছাকাছি। ফলে একই সঙ্গে গোলাবর্ষণ করতে পাকিস্তানি সৈন্যদের সুবিধা হয়েছিল।

একনাগাড়ে পাঁচ মিনিট ধরে চলল প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ। মারা গেল ৩০ (তিরিশ) জন ছাত্র। মৃতদের একজন ছিল চিত্রকর। ইজেলে ক্যানভাস চড়িয়ে সে ছবি আঁকছিল। পরে তার মৃতদেহ পাওয়া গেল তার নিজের রক্তের ক্যানভাসে। খুব অল্পসংখ্যক ছাত্র ছাদে উঠে এগিয়ে আসা পাঞ্জাবি এবং বালুচ সৈন্যদের লক্ষ্য করে পুরনো মডেলের বোল্ট এ্যাকশন দিয়ে কিছু গুলি ছুঁড়তে পেরেছিল। কিন্তু সার্চলাইট জ্বলে উঠতেই তাদের একজন একজন করে গুলি করে মেরে ফেলা হলো। এলোপাতাড়ি গুলি করতে করতে সৈন্যরা সম্পূর্ণ ছাত্রাবাস তছনছ করে ফেলল। আর চিৎকার করে ছাত্রদেরকে মাথার ওপরে হাত তুলে বেরিয়ে আসতে বলল। যাদের বেরুতে একটু দেরি হচ্ছিল তাদেরকে সেখানেই বেয়োনেট দিয়ে খুঁচিয়ে কিংবা গুলি করে মেরে ফেলা হলো। বের করে আনা ছাত্রদেরকে দেয়ালের সঙ্গে দাঁড় করানো হলো। অফিসারের আদেশে একই সঙ্গে মেশিনগান, ট্যাঙ্ক এবং আর্মড কার থেকে গুলি চালিয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করা হলো প্রত্যেককে। এরপরও যেসব ছাত্র বেঁচে ছিল, বেয়োনেটবিদ্ধ করে তাঁদেরও মেরে ফেলা হলো।

মাত্র পনেরো মিনিটের মধ্যে হত্যা করা হলো প্রাণবন্ত ১০৯ জন ছাত্রকে। ইকবাল হলের ছাদে মৃতদেহগুলো যেন শকুনের অপেক্ষায় ফেলে রাখা হলো। হিন্দু ছাত্রদের দেহগুলো রাখা হয়েছিল জ্বালানি কাঠের মতো স্তূপীকৃত করে। রাতে মৃতদেহগুলোকে কবর দেয়ার জন্যে কয়েকজন ছাত্রকে দিয়ে গর্ত খোঁড়ানো হলো, গর্ত করার পর তাদেরকেও গুলি করে গর্তে ফেলে দিল পাক সৈন্যরা।

সৈন্যদের আদেশ দেয়া হয়েছিল দুটো ছাত্রাবাসের একটি প্রাণীও যেন বেঁচে না থাকে এবং ঘটলও তাই। দারোয়ান, সুইপার এবং আবাসিক শিক্ষকদেরও হত্যা করা হলো। ছাত্রদের একটি ক্যান্টিন চালাতেন 'মধু'। সে অপরাধে তাকে তার দু'কন্যা, পুত্র এবং স্ত্রীসহ গুলি করা হলো। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের হত্যার একটি নীলনকশাও তৈরি করা হয়েছিলো ইতিমধ্যে। সৈন্যরা সেই মিশনে গিয়েছিল ৩৪ নম্বর এ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং-এ। ডি-এ্যাপার্টমেন্টে ছিলেন পরিসংখ্যান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মনিরুজ্জামান। তাঁর এক ভাই পূর্ব পাকিস্তান হাইকোর্টের এ্যাডভোকেট, ওই রাতে তিনিও ছিলেন বাসায়। অধ্যাপককে তাঁর ছেলে, ভাই এবং এজকন ভাইপোসহ নিচতলায় দেয়ালের পাশে দাঁড় করিয়ে মেশিনগানের গুলিতে হত্যা করা হলো। সৈন্যরা চলে যাওয়ার পর অধ্যাপকের স্ত্রী লক্ষ করলেন তাঁর স্বামী তখনো বেঁচে রয়েছেন। তাঁকে টেনে তিনি ঘরে নিয়ে এলেন। তিন ঘণ্টা পর সৈন্যরা নতুন নির্দেশ পেয়ে এলো যে মৃতদেহগুলো ওই জায়গা থেকে সরিয়ে কবর দিতে হবে। তারা অধ্যাপক জামানকে পেল তাঁর বেডরুমে। তাকে আবারো টেনে নামিয়ে দেয়ালের পাশে রেখে সৈন্যরা গুলি করল। এবার মাথায়। পরে জানা গিয়েছিল লিস্টে যে নাম ছিল তিনি হলেন বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান।

দর্শন বিভাগের প্রধান ছিলেন ড. গোবিন্দ চন্দ্র দেব। চিরকুমার এই শিক্ষক কখনোই রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন না। গরিব ছাত্রদের তিনি তাঁর বাসায় থাকাখাওয়ার ব্যবস্থা করে দিতেন। ধর্ম আর দর্শনের জ্ঞানে তারা হয়ে উঠছিল ঋদ্ধ। হানাদার সৈন্যরা দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে প্রথমে সব ছাত্রকে হত্যা করল। তারপর ড. দেবকে মাঠে নিয়ে গিয়ে গুলি করল।

অধ্যাপক দেবের হত্যাকাণ্ডকে কোনো যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। সামরিক শাসনের প্রতি সামান্যতম হুমকিও তাঁর কথায় বা আচরণে প্রকাশ করেননি তিনি। তাঁর অপরাধ ছিল তিনি একজন অধ্যাপক এবং একজন হিন্দু। সেদিন রাতে বা তার পরেও যেসব অধ্যাপককে হত্যা করা হয়েছিল তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের। মোট ১১ জন অধ্যাপক এবং প্রভাষককে হত্যা করা হয়েছিল। ইংরেজি বিভাগের ইন্সট্রাক্টর ড. মুনিমকে হত্যা করা হয় ভুলক্রমে। সৈন্যরা বাংলা বিভাগের ড. মনিরকে খুঁজছিল। এ রকমভাবেই অধ্যাপকদের হত্যা করা হয়েছিল।

এভাবেই পাকিস্তানি হানাদাররা তাদের মরণ আঘাত হেনেছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ওপর। আর আশ্চর্যের ব্যাপার হলো এতে ইন্ধন যুগিয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয়েরই প্রায় জনা বারো কর্মচারী এবং শিক্ষক।

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মোঃ নাসের থাকতেন ছাত্রাবাসগুলোর খুব কাছেই। ক'দিন আগেই তিনি একটি ভিডিও ক্যামেরা এনেছিলেন। তাঁর বাসার জানালা থেকে তিনি জগন্নাথ হলের আক্রমণ আর ছাত্র হত্যার ছবি তুলতে পেরেছিলেন। সৈন্যরা যে সার্চলাইট ব্যবহার করেছে তাতেই ভিডিওতে ছবি তোলা সম্ভব হয়। সে ছবিতে দেখা যায়, ছাত্ররা খণ্ড খণ্ড দলে বেরিয়ে আসছে ছাত্রাবাস থেকে। দেয়ালের সঙ্গে লাইন দিয়ে তাদেরকে একদম কাছে গিয়ে যেন পরীক্ষা করলেন তাদের ঠিকভাবে দাঁড় করানো হয়েছে কি-না। তারপর একপাশে দাঁড়িয়ে সে অফিসার আদেশ দিলেন। ছাত্রদের দীর্ঘ লাইন মাটিতে পড়ে গেল। সেই ভৌতিক অবস্থায় নিয়ে আসা হলো আরো একটি লাইন। তারাও গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে গেল। ফিল্মটি এমনভাবে কাঁপছিল যেন তা নির্বাক যুগের চলচ্চিত্র। মূলত ছায়া ছায়া আকৃতিতেই ঘটনাটি দেখা যাচ্ছিল। দেখা যায়, ছায়া আকৃতির সৈন্যরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য প্রামাণ্য হিসেবে রয়ে গেছে এই ফিল্ম, যাতে ধরা আছে পূর্ব পাকিস্তানে পরিকল্পিত হত্যাযজ্ঞের আরম্ভটা। দু'দিন বাদে ছাত্রাবাস দেখতে এলেন একজন বিদেশী সাংবাদিক মিচেল লরেন্ট। প্রায় জনা বিশেক ছাত্র তখনও এখানে-ওখানে পড়ে রয়েছে। আরো অনেককে বিছানায় যে অবস্থায় ছিল সেই অবস্থাতেই দেখতে পেলেন তিনি। চারদিকে ছিল ছোপ ছোপ রক্তের চিহ্ন, শুকনো রক্তের ধারা, ছিল ট্যাঙ্কের মাড়িয়ে যাওয়ার চিহ্ন।

এদেশের শিক্ষিত আর বুদ্ধিজীবীদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার পরিকল্পনার অংশ হিসেবেই ছাত্রাবাসগুলোতে আক্রমণ করা হয়েছিল। কিন্তু ছাত্র শিক্ষক-বুদ্ধিজীবীদের হত্যার মধ্যেই এই হত্যাযজ্ঞ তারা সীমাবদ্ধ রাখেনি। গোঁড়া মুসলমান হিসেবে তারা সংখ্যালঘিষ্ট হিন্দুদের সমূলে ধ্বংস করতে চেয়েছে। তাদের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে যে কেউই কথা বলবে তাদেরকেও তারা হত্যা করবে– এরকম একটা গোঁ নিয়ে প্রতি রাতেই সৈন্যরা অযাচিত হত্যাকাণ্ড চালিয়ে যেতে লাগল। আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে কাজ শেষ করার যে পরিকল্পনায় তারা নেমেছিল তা চলল পরের কয়েক সপ্তাহ ধরে। আসলে তাদের খুব কম উদ্দেশ্যই সফল হয়েছিল, আর পরের আট মাসেও তা আর পূরণ হলো না।

ছাত্রাবাসে যখন গোলাগুলি চলছিল সে সময় শহরের অন্যান্য অংশেও ট্যাঙ্ক, কামান, আর্মড কারের অযাচিত উন্মত্ততা দেখাচ্ছিল পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনী। গত কয়েক সপ্তাহ ধরে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত প্রায় বিশ হাজার সৈন্য নিয়ে আসা হয়েছিল। মিলিটারি অপারেশনে মূলত ঢাকাতে এদেরকেই ব্যবহার করা হয়।

পাকিস্তানি সৈন্যদের আক্রমণের একটি প্রধান লক্ষ্যস্থল ছিল ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস-এর ব্যারাক। বাঙালিদের নিয়েই তৈরি ছিল সীমান্তের শান্তিরক্ষী এই বাহিনী। ছাত্রাবাসগুলোর ব্যাপারে যেমন নির্দেশ ছিল, তেমনি পিলখানায় অবস্থিত এ

ব্যারাকের একটি প্রাণীও যেন বেঁচে না থাকে এমনি নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস-এর কমান্ডেন্ট এ রকম একটি ব্যাপার যে ঘটতে পারে সে ব্যাপারে আগেই সাবধান করে দিয়েছিলেন সবাইকে। ফলে পিলখানা জ্বলে উঠল প্রতিরোধ ঘাঁটি হিসেবে। পাকিস্তানি সৈন্যদল প্রথম ভারী গোলা মেরে বিল্ডিংগুলো গুঁড়িয়ে দিল। এরপর বালুচ আর পাঞ্জাবি সৈন্যরা ভেতরে এগিয়ে গেল যারা তখনো বেঁচে আছে তাদেরকে হত্যা করার জন্য। ছাত্রদের কাছে ছিল কিছু বোল্ট এ্যাকশান রাইফেল, কিন্তু রাইফেলস-এর কাছে ছিল রিকয়েললেস রাইফেল আর মেশিনগান। অবশ্য ফল দাঁড়াল ছাত্রাবাসগুলোর মতোই। ব্যারাকে প্রায় একশ' জনকে হত্যা করা হলো। যারা আত্মসমর্পণ করলেন তাঁদেরকেও বেয়োনেট চার্জে মেরে ফেলা হলো। এ হত্যাযজ্ঞ ছিল জগন্নাথ হলের মতোই গণহত্যাযজ্ঞ। পুরো শহর জুড়েই কালো ধোঁয়ার আড়ালে চলেছে এ রকম হত্যাযজ্ঞ।

পুলিশ স্টেশনেও জ্বলে উঠল হত্যার আগুন। রাজারবাগের পুলিশদের ব্যারাকে ট্যাঙ্ক, বাজুকা আর স্বয়ংক্রিয় রাইফেল দিয়ে আক্রমণ চালানো হলো। পূর্ব সতর্কতার কারণে পুলিশের সদস্যরা নিজেদেরকে রক্ষা করার জন্যে চেষ্টা চালায় অত্যন্ত ঋজুভাবে। পরে পাঞ্জাবি সৈন্যরা বলেছিল ভয়াবহ যুদ্ধ সেই রাতে রাজারবাগেই হয়েছিল। খুব উন্নতমানের অস্ত্র না থাকলেও পুলিশ বাহিনীর সদস্যরা পুরো ছাউনি জ্বলে যাওয়ার পরও শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করেছিল। খুব অল্প কয়েকজন পুলিশ সে রাতে জীবিত ছিলেন। গোলাবারুদ আনা খালি ট্রাকগুলোতে তাদেরকে নিয়ে যাওয়া হয়। তারা আর কোনোদিন ফিরে আসেনি।

ঢাকার ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলের জানালায় দাঁড়িয়ে বিদেশী সাংবাদিকরা দেখলেন পুরো শহর জ্বলছে, জ্বলছে আর আগুনের ফুলকি হয়ে ছুটে যাচ্ছে। অনুমান করা গেল না বাইরে কি ঘটছে, কেননা বাইরে গিয়ে সরেজমিনে প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহ সে মুহূর্তে তাদের জন্য অসম্ভব হয়ে পড়ল। হোটেলের লবিতে একটি ব্ল্যাকবোর্ডে লেখা ছিল 'দয়া করে বাইরে যাবেন না'। শুধু লেখাই ছিল না সঙ্গে কাচের দরজার বাইরেই দাঁড়িয়েছিল একজন সৈন্য– যুদ্ধ পোশাকে ভারী অস্ত্রে সেজে। শুধু তাই-ই নয়। একজন ক্যাপ্টেন রুক্ষ মেজাজে জানিয়ে গেল, যদি কেউ বাইরে যায়, তবে বিনা দ্বিধায় গুলি করা হবে। হোটেলের লবি যেন ফন্টের কমব্যাট নেটের নিচের আশ্রয়ে পরিণত হলো।

ঢাকার দুটি আন্তর্জাতিক মানের হোটেলের এই একটি হলো হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল। এটি সবচেয়ে বিলাসবহুল। প্রায় সব বিদেশী সংবাদদাতাই এখানে থাকেন। প্রায় মাঝরাতে পরিস্থিতি তাদেরকে জানিয়ে দিল যে তাঁরা যুদ্ধের সংবাদদাতা হয়ে গেছেন। তবে যুদ্ধের সঠিক পর্যায় সম্পর্কে সে মুহূর্তে তারা তেমন কিছুই জানতেন না। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সেই সন্ধ্যাতেই করাচি চলে গেছেন। তাই তাঁদের অনেকেই ভাবলেন বুঝিবা ইয়াহিয়া খানের বিরুদ্ধে সামরিক অভ্যুত্থান হয়েছে। খুব কম সংখ্যক সাংবাদিকরাই বুঝতে পেরেছিলেন যে এটা অন্য ধরনের যুদ্ধ।

হোটেলের লবিতে মাঝে মাঝেই সৈন্যদের আনাগোনা হচ্ছিল। শুধু তাই নয়, অনেক আগন্তুককেও এখানে তারা নিয়ে এলো। একজন ব্রিটিশ কূটনীতিবিদ ব্রিটিশ দূতাবাসের একটি পার্টি শেষে ফিরছিলেন। তাঁকে গ্রেফতার করে হোটেল লবিতে নিয়ে আসা হলো। এভাবে সময় যত সরতে লাগল ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলের লবি হয়ে উঠল সব বিদেশীর বন্দিক্ষেত্র। ব্রিটিশ কূটনীতিকের কাছে জানা গেল শহরের পুরো অংশ জুড়েই রোড ব্লক হয়ে আছে। একথা অবশ্য তখন তেমন গুরুত্ব পায়নি সাংবাদিকদের কাছে। তারা টেলিফোনে শহরের বিভিন্ন জায়গায় যোগাযোগ করে সংবাদ সংগ্রহ করতে উদ্যোগী হলেন। অবশ্য সে সময় পর্যন্ত টেলিফোন সচল ছিল। কিন্তু সাংবাদিক পরিচয়ের কথা শুনে যারা টেলিফোন ধরেছিলেন তারা নিঃশব্দে রিসিভার রেখে দিলেন। কেউই কোনো সংবাদ দিতে আগ্রহী হলেন না। একজন বাঙালি সাংবাদিক সংবাদপত্র অফিস থেকে টেলিফোনে বললেন যে শহরের প্রান্তে লোকজন লাঠি আর লোহার রড নিয়ে রাস্তায় দৌড়াচ্ছে। রাত ১টা বেজে ১৫ মিনিটে টেলিফোন এক্সচেঞ্জের চূড়ার লাইটটি নিভে গেলে সেই মুহূর্ত থেকে টেলিফোন অচল হয়ে গেল।

অজস্র চেয়ার আর ফুলের গাছে ভরা আন্তর্জাতিক হোটেলটির লবিতে সাংবাদিকরা ঘোরাফেরা করছিলেন। লবিতে রাখা সুদৃশ্য চীনা মদের পাত্রগুলো যেন বুটিদার কাপড় মুড়ি দিয়ে ঘুমাচ্ছিল। এ ছাড়া সে রাতে অন্য কারো চোখেই ঘুম ছিল না। হোটেলে একজন মানুষ ঘুমোচ্ছিলেন। খানিক পরে জানা গেল তিনি হলেন জুলফিকার আলী ভুট্টো। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের আমন্ত্রণে তিনি এসেছিলেন ২১ মার্চে। টমিগান হাতে দু'জন সৈন্য তার স্যুইট পাহারা দিচ্ছিল। কয়েকজন উৎসাহী সাংবাদিক এগারো তলায় গিয়ে শোনেন তিনি ঘুমোচ্ছেন, তাকে ডিসটার্ব করা যাবে না।

আসলে তিনি ঘুমোচ্ছিলেন না, জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখছিলেন বাইরে সমস্ত ঢাকা জ্বলছে। তিনি অবাক হয়ে দেখছিলেন জ্বলতে জ্বলতে কিভাবে একটি দেশের ভবিষ্যৎ সামরিক বাহিনীর হাতে চলে গেল। 'দি গ্রেট ট্র্যাজেডি' নামে একটি আত্মজীবনীমূলক প্যামফ্লেট-এ তিনি লিখেছিলেন, চোখের সামনে দেখলাম আমার দেশের মানুষের মৃত্যু আর ধ্বংসযজ্ঞ। স্বাভাবিক চিন্তার অবকাশ তখন আর ছিল না; তাই অনেক বিক্ষিপ্ত চিন্তা মাথায় আসতে লাগল। তবে আমরা কি না ফেরার প্রান্তে পৌঁছে গেছি? তিন ঘণ্টা শহরের অগ্নি আর হত্যাযজ্ঞ দেখে তিনি বিছানায় গেলেন। তিনি চাইছিলেন ইয়াহিয়া খানের কাছে পাঠানো খবরের জবাব পাবেন। সকালে লবিতে দাঁড়ানো কোনো সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবই তিনি দিলেন না। দ্রুত বের হয়ে গেলেন হোটেল থেকে। সেই সন্ধ্যাতেই করাচিতে পৌঁছে তিনি ঘোষণা করলেন, "আল্লাহর অশেষ কৃপায় অবশেষে পাকিস্তান রক্ষা পেল।"

সাংবাদিকরা যে মানুষটিকে ২৫ মার্চের রাতে বিশেষভাবে দেখতে চেয়েছিলেন তিনি হচ্ছেন শেখ মুজিবুর রহমান। টেলিফোন লাইন কেটে দেবার আগেই হোটেল থেকে

টেলিফোনে জানা গেল তিনি সুস্থ আছেন, কিন্তু আওয়ামী লীগের তাঁর দু'জন সমর্থক রোড ব্লকে মারা গেছে।

শেখ মুজিবুর রহমান খুব ধৈর্য নিয়ে সে সময় অপেক্ষায় ছিলেন কখন তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। রাত আটটার দিকে একটি রিকশা নাম-ঠিকানাবিহীন একটি চিঠি তাঁর বাসায় দিয়ে যায়। তাতে একটি কথা মাত্র লেখা ছিল, "আজ রাতে আপনার বাড়ি রেইড হবে।" তিনি ভাবতেও পারেননি যে ওই রাতেই হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করা হবে। বিমূঢ় তিনি ভাবছিলেন যে পার্টি লিডারের এ সময় গ্রেফতার হওয়া ছাড়া আর কোনো বিকল্প নেই। কয়েকজন সহকর্মীকে ডেকে তিনি চিঠিটি দেখালেন এবং তাঁদেরকে আত্মগোপন করতে বললেন। পরে তাঁকে যখন জিজ্ঞেস করা হয় ওই পরামর্শ আপনি নিজের জন্যে কেন গ্রহণ করেননি। জবাবে তিনি বলেছিলেন, "জনগণকে বাঁচানোর একটা দায়িত্ব আমার ছিল। ওই মুহূর্তে যদি আমি বাসায় না থাকতাম তবে ইয়াহিয়া খান আমাকে খোঁজার জন্য সম্পূর্ণ ঢাকাকে জ্বালিয়ে ফেলতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করত না।" হানাদারদের উন্মত্ততা সম্পর্কে তাঁর ধারণাই তাঁকে এ রকম কাজে প্রেরণা দিয়েছিল বলা যায়।

তাছাড়া পরিবার নিয়েও সে সময় তাঁর চিন্তার অবকাশ ছিল। তাঁর স্ত্রী ফজিলাতুন্নেসা, দু'মেয়ে এবং তিন ছেলের দু'জনই সে সময় বাসায়। স্ত্রীর আপত্তির কারণে তিনি তাকে কোথাও পাঠাতে পারলেন না। বড় মেয়ে হাসিনার বয়স ২৪ বছর। সে সময় সে অন্তঃসত্ত্বা। রেহানার বয়স তার চেয়ে দশ বছর কম। সে পড়ে ধানমন্ডি গার্লস স্কুলে। তাদের দু'জনকেই শেখ মুজিবের এক বন্ধুর বাসায় নিয়ে যাওয়া হলো। বাসায় রইল দুই ছেলে শেখ জামাল আর শেখ রাসেল। জামালের বয়স ১৭ বছর, রাসেলের ৬ বছর। বড় ছেলে শেখ কামাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিল। তার বয়স ১৯ বছর; সেই সময় শেখ কামাল বাসায় ছিল না, শেখ মুজিবও জানতেন না তার বড় ছেলে সে সময় কোথায় আছে।

স্ত্রী আর দুই পুত্রকে নিয়ে শেখ মুজিব অপেক্ষা করতে লাগলেন ঘটনার জন্যে, তাঁর বুড়ো আঙুলটিকে মাটির দিকে দেখিয়ে তিনি দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, 'আমরা এখানেই থাকব'। শান্ত আসনে তিনি বসেছিলেন। এ সময় তাঁর বন্ধুদের কাছ থেকে অনবরত টেলিফোন আসছিল। তারা তাঁর সংবাদ জানতে চাইলেন উৎকণ্ঠায়। এক পর্যায়ে তিনি অসহিষ্ণু হয়ে বললেন, "ওরা আমায় কি করতে বলে, আমি এখানে আছি, কারণ আমার এ ছাড়া আর কিছুই করার নেই। আমি যদি পালিয়ে যাই তাহলে আমাকে শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ করতে হবে।"

তাঁর এই গ্রেফতারকে তিনি খুব একটা গুরুত্ব দিলেন না। এর আগে তিনি পাঁচ বার গ্রেফতার হয়েছিলেন। নির্যাতনে নির্যাতনে প্রতিবারই তারা চাইত শেখ মুজিবের মেধা, ক্ষমতা এবং সংগ্রামের উদ্দীপনাকে নষ্ট করে দিতে, কিন্তু প্রতিবারই তারা ব্যর্থ হয়েছে।

তাঁর এক বন্ধু তাঁকে একবার জিজ্ঞেস করেছিলেন, "তুমি কি কখনো মৃত্যুর কথা ভাব না?" তিনি বলেছিলেন, "আমি সব সময়ই ভাবি, তাই মৃত্যু আমার কাছে কোনো ভয়ের কিছু নয়।"

তাঁর পাইপে তিনি তখন শান্ত টান দিচ্ছিলেন, এ টানগুলো যেন তার গ্রেফতারের অপেক্ষায় পল-অনুপলের অনুভূতির প্রকাশ করিয়ে দিচ্ছিলা। মাঝরাত নাগাদ তিনি বুঝতে পারলেন পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি হয়েছে। ঘরের টেলিফোন অসহ্যভাবে বেজে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে দেখা যাচ্ছিল দূরে গোলাগুলির আগুনের ফুলকি। তিনি তক্ষুনি জানতেন না যে বিশ্ববিদ্যালয় আক্রমণ করা হয়েছিল। তবে পিলখানা আর রাজারবাগে যে বর্বর আক্রমণ, তা তখনি তিনি জানতে পেরেছিলেন। বাঙালি সামরিক, আধা সামরিক বাহিনীর ওপর এ আক্রমণ তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেবার জন্যই চালানো হয়েছিল। এ কথা বুঝতে পেরে তিনি তাঁর দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিলেন, কেন্দ্রীয় টেলিগ্রাফ অফিসে তাঁর এক বন্ধুকে শেখ মুজিব বললেন, একটি বার্তা যেন সারাদেশে তক্ষুনি প্রচার করে দেয়া হয়; এ বার্তাটি ছিল, "পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনী পিলখানায় পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস-এর সদর দপ্তর আর রাজারবাগে পুলিশ লাইনের ওপর আক্রমণ করেছে। সমস্ত শক্তি জড় করে প্রতিরোধ করুন আর স্বাধীনতার জন্যে প্রস্তুতি নিন।"

খবরটি কিভাবে কোত্থেকে এলো তা ভেবে কেউ বসে থাকল না। সারা পূর্ব পাকিস্তানের শহরে-বন্দরে খবরটি ছড়িয়ে গেল। এটাই ছিল পাকিস্তানি বাহিনীর প্রথম মারাত্মক ভুল যে তারা টেলিফোন এক্সচেঞ্জ দখল না করে পিলখানা আর রাজারবাগে আক্রমণ চালায়।

'সমস্ত শক্তি জড় করে প্রতিরোধ করুন আর স্বাধীনতার জন্যে প্রস্তুত হোন'– এ অমোঘ বাণী যেন সবার মাঝে প্রাণ জাগিয়ে দিয়ে গেল। এ কথা যখন পাকিস্তানি বাহিনী জানল তখন আর করার কিছু নেই। প্রচণ্ড টেনশানের কারণে শেখ মুজিবকে গ্রেফতারের কথাও তারা ভুলে গিয়েছিল। নইলে এ খবর পাঠানোর অপরাধে তার কোর্ট মার্শালে মৃত্যুদণ্ড হতে পারত।

তাঁর স্ত্রী সে রাতের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বললেন, শুরু থেকে গোলাগুলি ক্রমশই বাড়ছিলো, অথচ তিনি ছিলেন ভীষণ শান্ত। সৌম্য একটি ভাব তাকে আচ্ছাদিত করে রেখেছিল। মাঝরাতের পরপরই টেলিগ্রাম অফিসে তিনি বার্তাটি পাঠালেন। রাত ১টা ১৫ মিনিটে টেলিফোন অচল হয়ে যাবার আগ পর্যন্ত তিনি আরো বহু সংবাদ জানালেন। কিন্তু ওইটেই ছিল শেষ নির্দেশ।

শেখ মুজিবের দু'জন দেহরক্ষী সবসময়ই তাঁর পাশে পাশে ছিলো। নিবেদিতপ্রাণ এ দু'জনের একজনের নাম রেজা, অন্যজনের মহিউদ্দীন। তারা ছিল বিশালদেহী ক্ষমতাবান পুরুষ। কিন্তু শেখ মুজিব তাদের অবস্থানকে অহেতুক মনে করলেন। তিনি তাদেরকে চলে যেতে বললে তারা মুজিবকে বুঝিয়ে মত পাল্টানোর চেষ্টা করল। কিন্তু

উচ্চগ্রামে এবং রেগে গিয়ে শেখ মুজিব যখন তাদেরকে চলে যেতে বললেন তখন তারা হতবাক হয়ে যায়।

তাঁর বাসার পঁয়ষট্টি বছরের কাজের মহিলাকেও চলে যাওয়ার জন্যে বললেন। সেও যেতে আপত্তি জানাল। এ মহিলার সঙ্গে শেখ কথায় কখনো পারতেন না, এবারও তিনি হাল ছেড়ে দিলেন, কাজের ছেলেটিও তাঁকে ছেড়ে গেল না।

স্বাধীনতা-উত্তরকালে শেখ মুজিবকে প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়েছে যে কেন তিনি গ্রেফতারের অপেক্ষায় বসে ছিলেন? তিনি জবাবে বলেছিলেন যে, সে সময় তাঁর কিছুই করার ছিল না। সাড়ে সাত কোটি মানুষকে জোর করে যুদ্ধের ভেতরে ফেলে দেয়া হলো। এরকম অবস্থায় বক্তৃতা বা কোনো ঘোষণা দেবার সময় ছিল না। তাই নীরবতাই ছিল সবচে' ভালো।

শেখ মুজিবুর রহমান বই খুব ভালোবাসতেন। ওই সময় তিনি তাঁর ব্যক্তিগত লাইব্রেরিতে চলে গেলেন। বার্নাড 'শ আর বার্ট্রান্ড রাসেলের ওপর তাঁর ভীষণ আগ্রহ ছিল। এ দু'জন আধুনিক লেখকের বইয়েই তাঁর তাক ভরা ছিল। খানিক পড়লেন, তবে যেন মন বসাতে পারলেন না। ডায়েরিটি নিয়ে বসলেন। ডায়েরি লেখার অভ্যেস তাঁর কলেজ জীবন থেকেই ছিল। তবে এ সময় তিনি একটি বড় রকমের ভুল করলেন তাঁর বই আর ডায়েরিগুলোকে কোনো নিরাপদ জায়গায় না রেখে। জেলে থাকার সময়গুলো ছাড়া তিনি কখনোই ডায়েরি না লিখে ঘুমোতেন না। এ বই আর ডায়েরিগুলো আর কখনোই পাওয়া যায়নি।

রাত একটা তিরিশ। ট্যাঙ্ক আর আর্মড কারের প্রচণ্ড শব্দ শোনা গেল বাইরে। দু'তিন ট্রাক সৈন্য পুরো বাড়িটার চারদিকে এলোপাতাড়ি গুলি করতে করতে নেমে এলো। শেখ মুজিব সে সময় বিছানায় বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। গুলির শব্দ শুনে তিনি তাঁর স্ত্রী এবং দু'ছেলেকে বাথরুমে ঠেলে দিলেন। সৈন্যদেরকে বলা হয়েছিল যে শেখ মুজিবের বাড়িটি একটি সামরিক ঘাঁটি– সেজন্য সৈন্যরা গুলি করতে করতে পুরো বাড়িকে ঘিরে পজিশন নেয়।

ছোট এই অরক্ষিত বাড়িটিকে ঘিরে সৈন্যদের এ রকম আস্ফালন শেখ মুজিবের হাস্যকর মনে হয়েছে। তিনি দেখলেন শত শত সৈন্য বাগানে আর রাস্তা জুড়ে রয়েছে।

ইংরেজিতে একজন কম বয়সি ক্যাপ্টেন চিৎকার করে বলে উঠল, "শেখ, এবার আপনি নেমে আসুন।"

পাজামার ওপর একটি মেরুন রঙের ড্রেসিং গাউন চাপিয়ে মুজিব তাঁর প্রশস্ত বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। চিৎকার করে বললেন, প্রয়োজন হলে আমাকে গুলি করো, সাধারণ মানুষকে এরকম কুকুর-বেড়ালের মতো গুলি করো না।

'আপনি নেমে আসুন, প্লিজ' ক্যাপ্টেন আবারো বলল। সৈন্যদের গোলাগুলিতে কিছুটা বিব্রত হলেও সে যথেষ্ট ভদ্রভাবে কথা বলছিল। তার ওপর আদেশ ছিল শেখকে জীবিত ধরে নিয়ে যাওয়ার।

"তোমাদের গুলি করার কোনো দরকার নেই, আমি সম্পূর্ণ তৈরিই আছি। তোমাদের যখন এতই প্রয়োজন, তখন টেলিফোনে ডাকলেই তো আমি চলে যেতাম।"

স্ত্রী, পুত্র আর কাজের লোকদের বিদায় জানিয়ে শেখ নেমে এলেন। তাঁকে কিছুটা ফ্যাকাশে দেখালেও মনে হচ্ছিল বেশ অনমনীয়। অস্ত্রে সাজানো টয়োটা ল্যান্ড ক্রুজারে ওঠার আগে তাঁর মনে হলো তিনি তাঁর ছোট ব্যাগটা উপরে ফেলে এসেছেন। সৈন্যদের বললেন সেটা নিয়ে আসার জন্যে। তাঁর চেহারায় এ সময় ফুটে ওঠে যেন মৃত্যু-পূর্ব অসহায়ত্ব।

ক্যাপ্টেন ভীষণ খুশি হলো, কোনোরকম দুর্ঘটনা ছাড়াই শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করা গিয়েছে। কিন্তু ক্যাপ্টেনের এ ধারণা সম্পূর্ণ সত্য হলো না। একজন পাহারাদার তার একমাত্র বুলেট দিয়ে একজন সৈন্যকে মেরে ফেলল।

শেখ মুজিবুর রহমানকে সামরিক সদর দপ্তরে নিয়ে এলো সৈন্যরা। প্রশ্ন করা হলো বটে তবে কোনো প্রশ্নের তিনি জবাব দিলেন না। কোনো কোর্ট মার্শাল হলো না। আসলে সামরিক কর্তৃপক্ষ তখনো ঠিক করতে পারেনি যে শেখ মুজিবকে কি করা হবে। শুধুমাত্র জিম্মি করে রাখা? অথবা অন্য কিছু? চারদিন পর তাঁকে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হল। একজন ফটোগ্রাফার সে সময় এয়ারপোর্টের বেঞ্চে বসা অবস্থায় শেখ মুজিবের ছবি তুলেছিলেন। সে ছবিতে তাঁকে দেখা গিয়েছিল ভীষণ বিমর্ষ আর অসহায় অবস্থায়।

ঘণ্টা দেড়েক বাদে আবারো একটি আর্মি ট্রাক শেখের বাড়িতে এসে দাঁড়াল। এবার তাঁর স্ত্রী আর সন্তানদের গ্রেফতার করার জন্যেই তারা এলো। কিন্তু তার আগেই শেখ মুজিবের স্ত্রী এবং সন্তানরা প্রতিবেশীর কোনো এক বাড়িতে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে গিয়েছে। তাঁদেরকে বাড়িতে না পেয়ে সৈন্যরা হাতের কাছে যা কিছু পেল তছনছ করতে লাগল। আসবাবগুলো গুঁড়িয়ে দিল, ছুঁড়ে ফেলে দিল বিছানাপত্র, বইয়ের র‍্যাক, মূল্যবান পাণ্ডুলিপি, দেয়ালে যা যা টাঙ্গানো ছিল সবই ভেঙেচুরে একাকার করে দিল। দেয়ালে রুপালি ফ্রেমে মাও সে তুং-এর একটি ছবি টাংগানো ছিল। ধ্বংসের হাত থেকে সেটিও রেহাই পায়নি। ক'দিন বাদে এ্যান্থনি ম্যাসকারেনহাস নামে একজন বিদেশী সাংবাদিক শেখ মুজিবের পরিত্যক্ত বাড়িটি দেখতে এসে স্তম্ভিত হলেন এবং অবাক হলেন মাও সেতুং-এর ছবির ওই করুণ দশা দেখে, মাও সেতুং সে সময় পাকিস্তানকে ট্যাঙ্ক, বন্দুক আর গোলাবারুদ দিয়ে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করেছিলেন। ১৯৫২ সালে শেখ মুজিবুর রহমান সরকারি প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসেবে চীন সফর করেছিলেন। সে সময় তিনি যে শুধুমাত্র ব্যক্তিগতভাবে মাও সে তুং-এর ওপরই শ্রদ্ধাশীল হয়ে পড়েন তাই নয়, চৈনিক কমিউনিজমও তাঁকে ভীষণভাবে আকৃষ্ট করে। সে শ্রদ্ধাবোধেই শেখ মুজিবের দেয়ালে চেয়্যারম্যান মাও সে তুং-এর ছবি লাগানো ছিলো। আহত বাঘ তার শত্রুকে না পেয়ে যেমন গাছের ওপর তার আক্রোশ ঝেড়ে ফেলে, সৈন্যরাও তেমনি সারাটা বাড়ি একটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত করল।

শেখ মুজিবের বাড়িটাকে পুড়িয়ে দেওয়ার আদেশ সৈন্যদের দেয়া হয়নি, সে জন্যে তারা না পুড়িয়ে যতদূর পারা যায় করল। ফেরার সময় শহরের অন্যান্য জায়গায় তারা পোড়াল, লুট করলো, হত্যা করল এমনকি ধর্ষণও করল। দরিদ্র হিন্দুদের বসবাস যেসব এলাকায় সেখানে এ আঘাত ছিল চরম। আগুন লাগানোয় মানুষজন তাদের ঘর থেকে পিঁপড়ের মতো বেরিয়ে আসতে থাকে। আর ঠিক এ সময়ই মানুষের ঝাঁকের মধ্যে মেশিনগানে গুলি করেছে পাকিস্তানি সৈন্যরা পৈশাচিক উল্লাসে। বায়তুল মোকাররমের আশেপাশের বাজারগুলোতে আগুন লাগিয়ে দেয়। পুরো শহর থেকে দেখা গেল শহর পোড়ানোর আগুনে বায়তুল মোকাররম উজ্জ্বলতায় জ্বলজ্বল করছে।

রাত ২টা বেজে ৪৫ মিনিট। ইন্টারকমের জানালা দিয়ে সাংবাদিকরা দেখলেন রমনা পার্কের ভেতর দিয়ে মেশিনগান ফিট করা একটি জিপ ঠিক হোটেলের নিচে এসে দাঁড়াল। জিপের পেছনে পেছনে রকেট নিয়ে একদল সৈন্যও ছিল। এ সময় ময়মনসিংহ রোডে একদল যুবক প্রকাশ্যে শ্লোগান দিতে দিতে এগিয়ে আসছিল। শ্লোগানের শব্দ শুনে জিপ সে দিকে এগিয়ে গেল এবং মুহূর্তেই মেশিনগান থেকে ব্রাশফায়ার করল। স্লোগানরত যুবকরা দৌড়ে আত্মরক্ষা করল, সাংবাদিকদের চোখের সামনেই এসব ঘটেছে। তবে অন্ধকার থাকায় তাঁরা বুঝতে পারেননি যে, কেউ সে গুলিতে মারা গিয়েছে কি-না। এবার জিপকে সামনে রেখে সৈন্যরা এগিয়ে গেল ময়মনসিংহ রোডের ইংরেজি 'দি পিপল্' পত্রিকার অফিসের দিকে। এখানে এ পত্রিকার সম্পাদকীয় অফিস ছিল। পত্রিকাটি শেখ মুজিবুর রহমানের আন্দোলনকে সমর্থন জানাচ্ছিল, শুধু তাই-ই নয় সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে পত্রিকাটি নিয়মিত নিবন্ধও লিখছিল। অন্ধকারে ভৌতিকভাবে ফ্লাডলাইট জ্বালিয়ে কাঁপা কাঁপা আলোতে সৈন্যদল একেবারে পত্রিকা অফিসের সামনে এসে চিৎকার করে ভবনটিতে যারা ছিল তাদেরকে আত্মসমর্পণ করতে বলল। কিন্তু একটি প্রাণীও বেরিয়ে এলো না। প্রথমে একটি রকেট ছুঁড়ল তারা। তারপর জানালা লক্ষ্য করে মেশিনগানের গুলি। কিছুক্ষণের মধ্যেই ভবনটিতে আগুন ধরে গেল। হোটেলের জানালা থেকে বিদেশী সাংবাদিকরা যতদূর দেখলেন তাতে তাঁদের মনে হলো যে কেউই মারা যায়নি। 'দি পিপল্' পত্রিকার অফিস জ্বালিয়ে দিয়ে ফিরে যাওয়ার পথে তারা আরো একটি বাজার জ্বালিয়ে দিল। জ্বালাল বেশ ক'টি বাড়িও।

ভোর চারটা নাগাদ গোলাগুলির আওয়াজ কমে এলো, তবুও মাঝে মাঝে অটোমেটিক রাইফেলের আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। সারারাত বিভিন্ন রকমের বিচিত্র ভৌতিক শব্দে ভরা ছিল। ভোর হতে দেখা গেল ধ্বংসস্তূপ থেকে তখনও কালো ধোঁয়া উঠে আকাশ আচ্ছন্ন করে রেখেছে। ঢাকা যে এক রাতে কতটা বদলে গিয়েছে তা কিন্তু সহজে বোঝা গেল না। বায়তুল মোকাররম এখনো যেন ঢাকার পুরো আকাশ জুড়ে রয়েছে স্বাভাবিকতার প্রহসন করার জন্যে।

সে রাতে ৭০০০ মানুষকে হত্যা করা হয়, গ্রেফতার হলো আরো তিন হাজার। ঢাকায় ঘটনার শুরুমাত্র হয়েছিল। গোটা পূর্ব পাকিস্তান জুড়ে সৈন্যরা বাড়িয়ে চলল মৃতের সংখ্যা, জ্বালাতে শুরু করল ঘর-বাড়ি, দোকান-পাট, লুট আর ধ্বংস তাদের নেশায় পরিণত হলো যেন। রাস্তায় রাস্তায় পড়ে থাকা মৃতদেহগুলো কাক-শেয়ালের খাবারে পরিণত হলো। গোটা বাংলাদেশ হয়ে উঠল শকুনতাড়িত শ্মশানভূমি।

২৬ তারিখ সকালে সব বিদেশী সাংবাদিককে ঢাকা ত্যাগ করতে বলা হলো। কড়া পাহারায় তাঁদেরকে বিমানবন্দরে নিয়ে সেখানে তাঁদের ফিল্ম, নোট বুক সবই বাজেয়াপ্ত করা হলো। এতেও হলো না, সাংবাদিকদের সাবধানও করে দেয়া হলো যে, গত রাতে ঢাকায় যা কিছু তাঁরা দেখেছে সে সম্বন্ধে কোনো কিছু না লেখাই তাদের জন্য মঙ্গলজনক। বেশিরভাগ সাংবাদিকই বিকেলের আগে ঢাকা ছেড়ে চলে গেলেন। তার আগে পর্যন্ত তাঁরা হোটেলে বন্দি অবস্থায় ছিলেন। হোটেলের বাইরে একপা এগুলেই তাদের গুলি করার হুমকি দিয়েছিল পাকস্তানি সৈন্যরা। একজন ক্যাপ্টেন হোটেল লাউ ছেড়ে বেরুবার সময় দু'জন সাহসী সাংবাদিক তার সঙ্গে গেটের বাইরে চলে এলেন কিন্তু শেষরক্ষা হলো না। ক্যাপ্টেন অত্যন্ত রূঢ়ভাবে বলে উঠল, "আপনারা ভেতরে চলে যান, আমরা যদি আমাদের নিজেদের মানুষকে মারতে পারি, তবে আপনাদেরকেও মারতে পারল।"

পাকিস্তানি শাসকরা ভেবেছিল এভাবে কোনো সংবাদ তারা ঢাকার বাইরে যেতে দেবে না। কিন্তু সেটা ছিল তাদের জন্য বড় রকমের ভুল। সাংবাদিকরা ঠিকই জানতেন কেন তাদেরকে দেশ থেকে বের করে দেয়া হচ্ছে। ইতোমধ্যেই আর্মিদের আচরণে চোখে মুখে তাঁরা অনেক কিছু দেখে ফেলেছেন।

বিদেশী সাংবাদিকদের দেশ থেকে বের করে দিয়ে পাকিস্তানি শাসকরা চেয়েছিল পুরো দেশের ওপর একটা আবরণ দিতে, যাতে করে একনায়কত্বের অস্ত্রোপচার সুচারুভাবে করতে পারে। সার্বভৌম একটি দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কোনো দেশেরই কিছু বলার ছিল না। তবে চীন আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছিল একান্ত আপনজনের মতো। তারা সাহায্য করছিলো এরোপ্লেন, ট্যাঙ্ক, অস্ত্রশস্ত্র আর গোলাবারুদ দিয়ে। তাদের অনুমান ছিল– সপ্তাহ দু'একের মধ্যে এ চূড়ান্ত অস্ত্রোপচারের কাজটি শেষ হবে।

মাসের পর মাস পূর্ব পাকিস্তানের সব অঞ্চলেই এই হত্যালীলা চলতে থাকল। অত্যন্ত পরিকল্পিত ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর এ হত্যাযজ্ঞ। নিরীহ মুসলমান কৃষকদের প্রতিনিয়ত হত্যা করে চলছিল এসব মুসলমান সৈন্যরা। প্রতিরোধহীন সব মানুষকে হত্যা করা তাদের সিগারেট-মদ খাবার অভ্যেসের মতো হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যুদ্ধ শেষ হওয়ার আগে পর্যন্ত এই অভ্যেস যে ফলাফল নিয়ে এসেছিল তা হচ্ছে ৩০ লাখ মানুষের মৃত্যু।

'৭১-এর ফেব্রুয়ারিতে এক সামরিক সভায় ইয়াহিয়া খান বলেছিলেন, "লাখ তিরিশেক বাঙালিকে হত্যা করো, দেখবে বাকিরা কেমন তোমাদের হাতের পুতুল হয়ে যায়।"

কোন তিরিশ লাখ মানুষ তাদের শিকার হবে তা কিন্তু তখনো তারা ভাবেনি। একটি জনসংখ্যার সাড়ে চার শতাংশকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার পরিকল্পনা অবাক করে দেয় সভ্যতাকে।

... ইতিহাসই বলে দেয়, স্বদেশ ভূমির জন্যে যুদ্ধ বাঙালিদের ঐতিহ্য। আর এবার এই একাত্তরে তার রূপ চূড়ান্তভাবে প্রকাশ পেয়েছে। ২৫ মার্চের ভয়াবহ রাত যে বাঙালিদেরকে চূড়ান্ত বিজয়ের পথে নামিয়েছে তারা যেন সেটা ভাবতেও পারেনি। পূর্ব পাকিস্তানে যে ধ্বংসলীলা চলেছে তাতে এটা তো স্পষ্টই হয়ে ওঠে যে এদের জন্যে সামান্য চিন্তাও পাকিস্তানের শাসকবর্গ কখনো করেনি। যদি পারতেন ইয়াহিয়া খান হয়তো সব বাঙালিকে সরিয়ে পাকিস্তানের এ অংশটুকু পাঞ্জাবিদের জন্য তৈরি করে দিতেন। আর এটা না পেরে হত্যাযজ্ঞ চলল অবিশ্রাম; যেনবা প্রাণ চলে যাওয়া একটা শরীরের ওপর অবিরাম ছুরির আঘাত করা।

... মনেপ্রাণে মুসলমান এসব বাঙালি ভাবতেও পারেনি যে পাকিস্তানি সৈন্যরা মুসলমান হয়ে মুসলমান মেয়েদেরকে ধর্ষণ করবে। বাচ্চাদের মায়ের কোলেই বেয়োনেট দিয়ে খুঁচিয়ে মেরে ফেলবে। এই নৃশংসতার কোনো জুড়ি নেই। অবাক ব্যাপার হলো, অফিসার তার সৈন্যদেরকে অবলীলায় ধর্ষণ করার অনুমতি দিয়েছিলেন।

পরিশিষ্ট–ধ

‘দে রেইপ অব বাংলাদেশ’ গ্রন্থ থেকে

[মুক্তি সংগ্রামের শুরু এবং তার আগে থেকেই বাংলাদেশের সঙ্গে এ্যান্থনি ম্যাসকারেনহাসের নিবিড় যোগাযোগ। পাকিস্তানে বসবাসকারী দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সাংবাদিক হিসেবে শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, খাঁজা নাজিমউদ্দীন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ দেশের অন্যান্য প্রতিটি উল্লেখযোগ্য নেতার সঙ্গেই ছিল তার ঘনিষ্ট যোগাযোগ। ১৯৭১ সালে এ্যান্থনি ম্যাসকারেনহাসই প্রথম সাংবাদিক যিনি পাকিস্তান থেকে পালিয়ে গিয়ে লন্ডনের দি সানডে টাইমস পত্রিকায় তখনকার বাংলাদেশ ভূখণ্ডে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর নির্মম স্বজন হত্যার কাহিনী সবিস্তারে লিখে বিশ্ব জনমতের সামনে তুলে ধরেন। তার সেই নিবন্ধ এবং পরবর্তী রচনাগ্রন্থ ‘দি রেইপ অব বাংলাদেশ’ বিশ্বব্যাপী শুধু তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করেনি, ব্যাপক স্বীকৃতিও লাভ করেছিল। এমন কি পাকিস্তানেও। যার ফলে বাংলাদেশের অনুকূলে আন্তর্জাতিক বিশ্ব জনমতের জোয়ার ঘোরাতেও সাহায্য করেছিল। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের স্বজন হত্যার সত্যনিষ্ঠ প্রতিবেদনের জন্য এ্যান্থনি মাসকারেনহাস গ্রানাডা টি ভি সংস্থার জেরাল্ড বেরি পুরস্কার এবং ইন্টারন্যাশনাল পাবলিশিং কোম্পানীর বিশেষ পুরস্কার লাভ করেন। লন্ডনের সানডে টাইমস পত্রিকায় সুদীর্ঘ ১৪ বছর সক্রিয় কর্মজীবনের শেষে ফ্রিল্যান্স লেখক হিসেবে কাজ করেছেন দীর্ঘকাল।

এ্যান্থনি ম্যাসকারেনহাস বাংলাদেশের মানুষদের জন্য অসীম ভালোবাসা এবং গভীর অর্ন্তদৃষ্টি সহকারে একটা বিশেষ কর্তৃত্বপূর্ণ ভঙ্গীতে লেখেন। সুপ্রতিষ্ঠিত কর্মজীবন, ঘরবাড়ি, স্ত্রী, পাঁচ ছেলেমেয়ে এমন কি নিজের সোনালি ভবিষ্যতকে জলাঞ্জলি দিয়েছিলেন বাংলাদেশের স্বজন হত্যা বিষয়ে প্রকৃত সত্যকে উদঘাটন করার জন্য। ‘দি রেইপ অব বাংলাদেশ’-এর একটি অংশ–]

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ। রাত আটটা ধানমণ্ডিস্থ ৩২ নং সড়কের প্রবেশমুখে একটি গলিতে একটি পরিচিত রিকশা দ্রুতগতিতে এসে থামল। যে ভবনের বাইরে এসে থেমেছে সে ভবনটি হল শেখ মুজিবুর রহমানের বাসভবন। রিকশাচালক কাশছিল এবং হাঁপাচ্ছিল। সে বলল, “বঙ্গবন্ধুর জন্য একটি জরুরি চিরকুট নিয়ে ক্যান্টনমেন্ট থেকে রিকশা চালিয়ে এসেছি।” বাংলায় লেখা স্বাক্ষরবিহীন চিরকুট বার্তাটি ছিল সংক্ষিপ্ত :

“আপনার বাসভবন আজ রাতে আক্রান্ত হতে যাচ্ছে”

সে সময়ে সেখানে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাদের একজন আমাকে বলেছিলেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আসন্ন হামলার খবর ওই চিরকুটে তাঁরা প্রথমবারের মতো পেয়েছিলেন। সন্ধ্যার কিছুক্ষণ আগে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের অঘোষিত প্রস্থান

আওয়ামী লীগ মহলে বেশ নাড়া দিয়েছিল। তারপরেই যখন সেনাবাহিনীর অশুভ গতিবিধির লক্ষণ দেখা দিল তখন শেখ মুজিব তাঁর সহকর্মীদের সতর্ক করে দিলেন এবং গা ঢাকা দেয়ার প্রস্তুতি নিতে বললেন। বঙ্গবন্ধু নিজে কোনো সতর্কতা অবলম্বন করতে রাজি হলেন না। তিনি বললেন, 'আমার জায়গায়' অর্থাৎ নিজ বাড়িতেই থাকব। তখন থেকেই ক'জন বাঙালি তার খবর রেখেছেন। শেখ মুজিবের বেশ ক'জন অনুসারী আধঘণ্টা পর পর তাঁর বাসায় টেলিফোন করে তাঁর নিরাপত্তা সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিচ্ছিলেন। তাঁর গৃহভৃত্য 'হুঁ', 'হ্যাঁ' ধরনের জবাব দিচ্ছিল। বাতাস উত্তাল। আগুনের চোখ-ধাঁধানো শিখায় রাতের আকাশ যখন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, সে সময় শেখ মুজিবের বাসার টেলিফোনটি স্তব্ধ হয়ে গেল। ভীষণ আতংকের ভেতরে একথা প্রচারিত হলো যে, সেনাবাহিনী বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করেছে।

একজন প্রতিবেশী তিন সপ্তাহ পরে বাড়ির দেয়ালে বুলেটের গর্তের দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করে কীভাবে শেখ মুজিব শান্ত অবস্থায় গ্রেফতারকারীদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন সেদিনের সে ঘটনা স্মরণ করে আমাকে সব বললেন।

তিনি বললেন, রাত দেড়টায় সেনাবাহিনীর দুটি জিপ ও কয়েকটি ট্রাক ৩২ নং সড়কের সদর দরজায় এসে থামল। কয়েক মুহূর্ত পর পাকসেনারা পঙ্গপালের মতো বঙ্গবন্ধুর বাড়ির বাগানে সমবেত হলো। বাড়ির ছাদ ও উপরতলার জানালা লক্ষ্য করে কয়েক রাউন্ড গুলি ছোড়া হলো। সেনাবাহিনীর লোকেরা সরাসরি আক্রমণ করেনি শুধু ভয় দেখাচ্ছিল। তখন এই গোলমালের মধ্যে শেখ মুজিব তাঁর উপরতলার শোবার ঘরে ছিলেন। সেখান থেকে বলতে শোনা গেল, 'তোমরা অমন বর্বরের মতো আচরণ করছ কেন? আমাকে তোমরা ডাকলেই তো আমি তোমাদের কাছে নেমে আসতাম।' পাজামার ওপর তামাটে লাল রঙের গাউন পরিহিত শেখ মুজিব সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এলেন, সেখানে একজন তরুণ ক্যাপ্টেন দাঁড়িয়ে ছিল। আমার সংবাদদাতা আমাকে বলেছেন যে, এই অফিসারটি ছিল বিনয়ী ও নম্র স্বভাবের। সে দৃঢ় ও বিনয়ী কণ্ঠে বলল, আমার সঙ্গে চলে আসুন স্যার। তারপর শেখ মুজিবকে নিয়ে তারা সবাই গাড়িতে উঠে চলে গেল।

বেগম মুজিব ও তাঁদের শিশু পুত্র পাশের বাড়িতে পালিয়ে যাওয়ার এক ঘণ্টা পরে সেনাভর্তি আরেকটি ট্রাক ঘটনাস্থলে এসে দাঁড়াল! এবার পাকসেনারা মোটেই ভদ্র ব্যবহার করল না। তারা নিচের তলার প্রতিটি জানালার কাচ ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো করল। আসবাবপত্র, বিছানাপত্র ও পুস্তক রাখার আলমারিগুলো উল্টিয়ে-পাল্টিয়ে তছনছ করে দিল। দেয়াল থেকে আলোকচিত্র ও তৈলচিত্রগুলো বিচ্ছিন্ন করে ভেঙেচুরে মেঝের ওপর ইতস্তত ছড়িয়ে ফেলল। হালকা রুপালি ফ্রেমে আঁটা চীনের চেয়ারম্যান মাও সে তুং-এর স্বাক্ষরকৃত একটি ছবি তার মধ্যে ছিল। আমি ভেবে বিস্মিত হলাম শেখ মুজিব এ ছবি কি করে পেলেন। পাকসেনারা ঠিক কোনো কিছুর খোঁজ করছিল না। তারা যেন শত্রুকে হাতের মুঠোয় পেয়ে তাকে ছিন্নভিন্ন করছিল যেমন আহত বাঘ বৃক্ষকে আক্রমণ করে।

এপ্রিলের মাঝামাঝি সময়ে আমি যখন শেখ মুজিবের বাড়িতে যাই, তখন এসব কিছুরই প্রমাণ দেখতে পাই। সেখানে প্রাণী বলতে ছিল একটা ধূসর রঙের বড় বিড়াল, বিড়ালটি সেখানে এসে আমাদের দিকে শান্ত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকল। আর ছিল আবর্জনায় ঠোকররত তিনটি মুরগি ও ঘরের পাশে বিভিন্ন ধরনের প্রায় ডজন খানেক কবুতর। বঙ্গবন্ধুর বাসভবনটি পরিত্যক্ত ভুতুড়ে বাড়িতে পরিণত হয়েছিল। ঠিক এমন বাড়ি আমি পূর্ব বাংলার অন্যান্য এলাকায় দেখেছি—সমগ্র গ্রাম ও শহরের সারিসারি বাড়ি শূন্য রেখে জনসাধারণ প্রাণের ভয়ে পালিয়ে গেছে। বাড়িঘর ত্যাগ করার আগে তারা ক্রুদ্ধ সময় দেবতাকে প্রসন্ন করার জন্য সবুজ ও সাদা রঙের হাজার হাজার পাকিস্তানি পতাকা উড়িয়ে রেখে গেছে। বর্বরতার বিরুদ্ধে নিশ্চয়তাস্বরূপ এই পতাকাগুলি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই লোকদের খুব কমই কাজে লেগেছে! তা সত্ত্বেও সেগুলো সোনালি সূর্য কিরণে দুলতে থাকত, জনবিহীন ভৌতিক অবকাশ উদযাপনের মতো।

যারা সৌভাগ্যবান তারা সীমান্তের ওপারে ভারতে চলে যায়। এদের প্রায় সবাই নিয়তি নির্ধারিত ভাগ্য ছাড়া আর কিছুই সঙ্গে নিয়ে যেতে পারেনি। অন্যেরা শেখ মুজিবের মতো ধরা পড়ে। জনগণের দৃষ্টি থেকে অদৃশ্য হয়ে যায় এবং বেয়োনেটের খোঁচায় ও গুলির আঘাতে নিহত বিকৃত দেহগুলো স্ফীত অবস্থায় মাঠে, খানা-খন্দকে ও বাতাসে মৃদুভাবে আন্দোলিত নারকেল গাছপালার মাঝখানে পড়ে থাকতে দেখা যায়।

এপ্রিল মাসে পূর্ব বাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ছিল খুবই আকর্ষণীয়। হাঁটু উঁচু ধানের সবুজ কার্পেটি, মধ্যে মধ্যে কাচ স্বচ্ছ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয়, দিগন্ত বিস্তৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উঁচু কুটিরের সারি শোভা পাচ্ছিল। রাস্তার উভয় পাশে লাল বর্ণের চোখ-ধাঁধানো উজ্জ্বল চিহ্ন দেখে মনে হয় প্রকৃতির সৌন্দর্যে যেন পূর্ণতা লাভ করেছে। আম, কাঁঠালের গাছগুলো ফলভারে নুয়ে পড়ছে। চাঁপা ফুলের মন মাতানো সৌরভে বাতাস পরিপূর্ণ। প্রকৃতির যৌবন যেখানে থরে-বিথরে সাজানো, সেখানে হতভাগ্য কেবল মানুষগুলোই বিসদৃশভাবে ছিন্নবিচ্ছিন্ন।

মার্চের সেই ভয়ংকর রাতে শেখ মুজিবুর রহমানের নিরুপায় নিশ্চেষ্টতা ছিল বিস্ময়কর। এটা সহিংস সুতীব্র রক্তপাত বিরোধী কাজ, যা রাজধানীকে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করেছিল। যে মুহূর্তে পূর্বাঞ্চলীয় সেনানিবাসের প্রধান দপ্তরে খবর পৌঁছল যে, প্রেসিডেন্ট নিরাপদে করাচিতে পৌঁছেছেন, সেই মুহূর্তে পাক-সেনাবাহিনী কাজে লেগে পড়ল। এটা ঘটেছিল রাত সাড়ে এগারোটায়। মাঝরাতের মধ্যেই পাক-সেনাবাহিনীর সব দলই তাদের ভয়াবহ কাজে লেগে গেল। ট্যাঙ্ক, বাজুকা ও স্বয়ংক্রিয় রাইফেলসহ পিলখানায় পূর্ব-পাকিস্তান রাইফেল বাহিনীকে আক্রমণ করলো। একই সময়ে রাজারবাগস্থ পুলিশের প্রধান কার্যালয়ও আক্রান্ত হলো। উভয় স্থানেই অপ্রস্তুত বাঙালিরা যাদের সংখ্যা হবে প্রায় পাঁচ হাজার, শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল বটে, তবে আগে থেকে প্রস্তুত থাকলে তাদের প্রতিরোধ আরো জোরদার হতো। যাহোক এর পরিণাম ছিল সুস্পষ্ট। পাক-সেনাবাহিনীর ছিল আকস্মিক আক্রমণের আয়োজন, আর ছিল অধিক সংখ্যক সেনাবল, উৎকৃষ্টতর অস্ত্র ও গোলাবারুদের সুবিধা। বাঙালি বাহিনীর লোকেরা

মৃত্যুবরণের আগে পাক-সেনাবাহিনীকে জাহান্নামে পাঠিয়ে ছাড়ে। আমরা যখন আক্রান্ত এলাকা দেখতে গিয়েছিলাম তখন আমাদের সাহায্যকারী লোকটি অনিচ্ছা সত্ত্বেও একথা স্বীকার করেছিল!

শহরের অন্যত্র পাক-সেনাবাহিনীর দলগুলো বাজুকা, অগ্নি নিক্ষেপকারী অস্ত্র, মেশিনগান ও স্বয়ংক্রিয় রাইফেল এবং সময় সময় ট্যাঙ্কসহ পূর্ব নির্ধারিত লক্ষ্যস্থলগুলোতে আক্রমণ চালায়! তাদের একটি ইউনিট আওয়ামী লীগপন্থি পত্রিকা 'দি পিপল'-এর অফিসে যায়। অফিসটি ছিল ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলের ছাদে অবস্থানরত দলবদ্ধ ভীত বিদেশী সাংবাদিকদের দৃষ্টি সীমার মধ্যে অবস্থিত। ওই সেনাবাহিনীর লোকেরা সংকীর্ণ গলিতে সরাসরি গুলি ছোড়ে। পত্রিকা অফিসের কর্মচারীগণ পালাতে চেষ্টা করলে তাদের নির্দয়ভাবে হত্যা করা হয়। দালানের যা অবশিষ্ট ছিল তাতে গ্যাসোলিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়। এভাবেই সেনাবাহিনী একটি শত্রু নিধনযজ্ঞ সমাপ্ত করে। (বংশাল রোডস্থ 'সংবাদ' পত্রিকাটিও আক্রান্ত হয়। পত্রিকার ক'জন সাংবাদিকসহ প্রতিষ্ঠানটির সবকিছু পুড়িয়ে দেয়া হয়)।

শহরের অপর প্রান্তে একটি প্রসিদ্ধ বাংলা সংবাদপত্র 'দৈনিক ইত্তেফাক'-এর ভাগ্যেও একই দশা ঘটে। যখন প্রকাশ পেল যে কাজটি ভুলবশত হয়ে গেছে তখন সেনাবাহিনী তা সংশোধন করল। পত্রিকা অফিস পুনর্নির্মিত হলো এবং কোনো এক স্থানের একটি পুরনো ছাপাখানা ধার করে পত্রিকাটি পুনরায় চালু করা হলো।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকদের আবাসগুলোতে নিহত শত শত ছাত্র ও শিক্ষক কিংবা শাঁখারী পট্টি, তাঁতিবাজার অথবা বিরাট রেসকোর্স ময়দানের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা দুটো মন্দিরের চারপাশে অবস্থিত সারি সারি ঘরগুলোতে বসবাসরত হাজার হাজার নিহত হিন্দুদের জন্য কেউ চোখের জল ফেলল না। পাক-সেনাবাহিনীর লোকেরা শাঁখারি পট্টির অপ্রশস্ত রাস্তার উভয় প্রান্ত অবরোধ করে ঘরে ঘরে হানা দিয়ে প্রায় আট হাজার নারী-পুরুষ ও শিশুকে হত্যা করেছে।

টহলরত সেনাবাহিনীর আরেকটি দল নিউ মার্কেটের নিকটবর্তী লেফটেন্যান্ট কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনের বাড়িতে হানা দেয়। তিনি ছিলেন একজন নামি আওয়ামী লীগ কর্মী ও নৌবাহিনীর প্রাক্তন অফিসার। তিনি ১৯৬৮ সালের তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে অভিযুক্ত ছিলেন। এ হতভাগ্য কমান্ডারকে ঘর থেকে টেনে বের করা হয় এবং তার সন্ত্রস্ত স্ত্রীর সামনে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। চলে যাওয়ার নিদর্শনস্বরূপ পাকসেনারা ঘরের বিভিন্ন অংশ লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ে। শহরের বিভিন্ন অংশ থেকে প্রাপ্ত সংবাদ থেকে জানা যায় যে, অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতা এবং ছাত্রনেতাদের ওপর পাকসেনারা শিকারি কুকুরের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে।

সামরিক বাহিনীর আক্রোশের বিশেষ লক্ষ্য ছিল মুসলিম ছাত্রাবাস 'ইকবাল হল' এবং এর নিকটবর্তী হিন্দু ছাত্রাবাস 'জগন্নাথ হল'। পাক-সেনাবাহিনীর লোকেরা দুটো হলই ঘেরাও করে এবং বাজুকা ও স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রাদির সাহায্যে কয়েক মিনিট অফুরন্ত গুলি বর্ষণের পর অবরুদ্ধ হলগুলোতে বসবাসরত ছাত্রদের নির্বিচারে হত্যা করে। নিহত হিন্দু

ছাত্রদের হলের আঙ্গিনার বাইরে তাড়াহুড়ো করে কাটা একটি পরিখায় মাটি চাপা দেয়া হয় কিংবা হল ভবনের ছাদের ওপর পচনের জন্য ফেলে রাখা হয়।

বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মূল অংশ হিসেবে পরিচিত শত শত অধ্যাপক, চিকিৎসক ও শিক্ষককে 'জিজ্ঞাসাবাদের' জন্য ডেকে নিয়ে কীভাবে রাতারাতি চিরতরে শেষ করে দেয়া হয়েছে, দেশ থেকে পলায়নরত বাঙালিরা তার বর্ণনা দিয়েছে। নিরপেক্ষ নির্দলীয় লোকদের কাছ থেকে প্রাপ্ত সাক্ষ্য-প্রমাণাদি তা সমর্থন করেছে। ঠিক একইভাবে সেনাবাহিনী কর্তৃক গৃহীত ভয়ংকর 'শুদ্ধি অভিযানের' মাধ্যমে বাঙালি যুব সম্প্রদায়ের সর্বোৎকৃষ্ট অংশকে তন্ন তন্ন করে খুঁজে বের করে শেষ করে দেয়া হয়েছে।

ঢাকায় ৪৮ ঘণ্টা ধরে রক্তস্নান চলে। ২৬ মার্চের পূর্বাহ্নে প্রকাশ্য দিবালোকে কার্ফ্যু বা সান্ধ্য আইন ভঙ্গের দায়ে কয়েকশ' নিরীহ নিরপরাধ লোককে নির্বিচারে গুলি করে হত্যা করা হয়। অথচ কার্ফ্যু বা সান্ধ্য আইনের কথা ঘোষণার মাধ্যমে জনসাধারণকে আগে জানানো হয়নি। আনুমানিক দশটার মধ্যে যখন এ কাজ চূড়ান্তভাবে সম্পন্ন হলো, তখন পূর্ব নির্ধারিত শিকারদেরকে তাদের নিজ নিজ বাড়িতে আটক করার জন্য সান্ধ্য আইনকে ব্যবহার করা হলো।

প্রায় সেই একই সময়ে পাক-সেনাবাহিনী অন্যদিকে তাদের পৈশাচিক দন্ত দেখাতে লাগল। ভুট্টো সাহেবসহ যেসব রাজনৈতিক নেতা শেখ মুজিবের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করার জন্য ঢাকা এসেছিলেন, তাঁরাও জানতে পারেননি যে, ভুট্টো সাহেব ২৫ মার্চ সকালে চলে যাবেন। প্রকৃতপক্ষে সেদিন সন্ধ্যায় শেখ মুজিবের সঙ্গে তার সাক্ষাৎকারের কথা ছিল। দৃশ্যত ভুট্টো অধিক জরুরি কাজে আটকা পড়ে শেখ মুজিবের কাছে বিকেল ছ'টার দিকে এই মর্মে টেলিফোন করেন যে, তিনি প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করতে চান বলে তাদের মধ্যকার বৈঠক পর দিন পর্যন্ত স্থগিত রাখার প্রস্তাব করেছেন। শেখ মুজিব এর জবাবে তাঁকে বললেন, বৈঠক স্থগিত রাখতে তাঁর আপত্তি নেই কিন্তু তিনি কি করে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সাক্ষাতের আশা করছেন।' কয়েকজন ছাত্র নেতার প্রদত্ত প্রমাণ থেকে জানা যায় যে, ভুট্টো এতে বিস্মিত হন। তিনি প্রেসিডেন্টের ভবনে প্রবেশ করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তাঁকে বলা হয় যে, প্রেসিডেন্ট এখন 'পূর্বাঞ্চলীয় প্রধান সেনানিবাসে ডিনার' খাচ্ছেন। কাজেই এখন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারবেন না। মনে হয় ভুট্টো সংবাদটি পেয়েছিলেন। পরদিন তাঁকে প্রাসঙ্গিক ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়েছে। করাচির উদ্দেশে রওয়ানা দেওয়ার জন্য বিমানে ওঠার আগে তাঁর সামরিক প্রহরীগণ তাঁকে, সেনাবাহিনীর লোকেরা তখনও পর্যন্ত শহরের যেসব এলাকায় নৃশংসতা চালিয়ে যাচ্ছিল সেসব এলাকায় সংক্ষিপ্ত সফরে নিয়ে যায়। ভুট্টোর অনুসারীগণ বলেন, এর কোনো তাৎপর্য ছিল না। কিন্তু অপর একজন রাজনীতিবিদ আমাকে বলেছিলেন, সেনাবাহিনীর উদ্দেশ্যের পরিপন্থী কোনো কাজ করলে, এর পরিণতি কি হবে তার জ্বলন্ত প্রমাণ দেখানোর অভিপ্রায়েই এ ব্যবস্থা করা হয়। উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন, ভুট্টো যা দেখেছেন সে সম্পর্কে তিনি অন্ধ কিংবা অনুভূতিহীন থাকতে পারেননি। করাচি আগমনের পর 'পাকিস্তান রক্ষা পেয়েছে' বলে তিনি যে

প্রকাশ্যে সেনাবাহিনীর নৃশংসতার সমর্থন করেছেন, তা সম্ভবত এই শতাব্দীর একজন জননেতার সবচেয়ে মারাত্মক উক্তি ও ভ্রান্তি। যাহোক, ক্রমে ক্রমে হত্যাযজ্ঞের দৃষ্টান্ত চোখে পড়তে লাগল। ভীতসন্ত্রস্ত বাঙালিরা সহসা বুঝতে পারল, পশ্চিম পাকিস্তানি সেনাবাহিনী পূর্ব বাংলায় গণহত্যা শুরু করেছে।

সারা প্রদেশজুড়ে হত্যাকাণ্ডের সুব্যবস্থার নমুনার সঙ্গে জেনোসাইড বা গণহত্যা শব্দটির আভিধানিক সংজ্ঞার হুবুহু মিল রয়েছে। পরে আমি যখন কুমিল্লাস্থ ১৪ নং ডিভিশনের প্রধান কার্যালয় সফরে যাই, তখন জানতে পারি যে, বর্বরতা ও ব্যাপকতার সঙ্গে ওই অভিযানের জন্য সুপরিকল্পিত পরিকল্পনা গ্রহণ করে তা কার্যকর করা হচ্ছে।

গণহত্যার লক্ষ্যবস্তু ছিল এই—

১. ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙালি সৈনিক, পূর্ব পাকিস্তান রাইফেল বাহিনীর লোক, পুলিশ এবং আধা-সামরিক আনসার ও মুজাহিদ বাহিনীর লোক।

২. হিন্দু সম্প্রদায় "আমরা কেবল হিন্দু পুরুষদেরকে হত্যা করছি, হিন্দু নারী ও শিশুদেরকে ছেড়ে দিচ্ছি। আমরা সৈনিক, নারী শিশুদেরকে হত্যা করার মতো কাপুরুষ আমরা নই"— কুমিল্লায় আমি একথা শুনেছি।

৩. আওয়ামী লীগের লোক—নিম্নতম পদ থেকে নেতৃস্থানীয় পদ পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরের লোক, বিশেষ করে এই দলের কার্যনির্বাহী সংসদের সদস্য ও স্বেচ্ছাসেবকগণ।

৪. ছাত্র– কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত তরুণের দল ও কিছু সংখ্যক ছাত্রী। যাঁরা ছিলেন অধিকতর সংগ্রামী মনোভাবাপন্ন।

৫. অধ্যাপক ও শিক্ষকদের মতো বাঙালি বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় যারা 'সংগ্রামী' বলে সেনাবাহিনী কর্তৃক সব সময় নিন্দিত হতেন।

ঢাকায় এবং প্রদেশের অন্যান্য স্থানে সেনাবাহিনীর লোকেরা যখন তাদের নৃশংসতা চালাত তখন তারা এই হতভাগ্য লোকদের তালিকা সঙ্গে নিয়ে যেত। ২৫ মার্চের আগে সেই অবমাননাকর দিনগুলোতে অর্থাৎ অসহযোগ আন্দোলনের সময় এই হতভাগ্য লোকদের তালিকা তৈরি করা হয়। তারপর সেনাবাহিনীর লোকেরা ভয়ংকর প্রতিশোধ নিতে শুরু করে।

হিন্দুদের খুঁজে খুঁজে বের করা হচ্ছিল। কারণ শাসকগোষ্ঠী তাদেরকে মনে করত 'ভারতের অনুচর', তারা পূর্ব বাংলার মুসলমানদের কলুষিত করে ফেলেছে। বাঙালি সামরিক পুলিশ বাহিনীর লোকদের অনুসন্ধান করার কারণ তারাই একমাত্র শিক্ষাপ্রাপ্ত দল, যারা সেনাবাহিনীকে প্রতিরোধ দিতে সমর্থ। অন্যদেরকে গণহত্যার আওতাভুক্ত করার কারণ তাদের রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে রাষ্ট্রের অখণ্ডতার প্রতি প্রত্যক্ষ হুমকিস্বরূপ মনে করা হচ্ছিল।

আমি চিন্তা করে দেখেছি, গণহত্যা ছিল 'শোধন প্রক্রিয়া', যাকে শাসকগোষ্ঠী রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান বলে মনে করত। সেই সঙ্গে এই বর্বরোচিত উপায়ে প্রদেশটিকে উপনিবেশে পরিণত করাও ছিল এর অন্যতম উদ্দেশ্য।

বিচ্ছিন্নতার হুমকি থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে পূর্ব পাকিস্তানকে চিরদিনের জন্য পবিত্র করতে আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞা। সেজন্য যদি বিশ লাখ লোককে হত্যা করতে হয় এবং প্রদেশটিকে ত্রিশ বছরের জন্য উপনিবেশ হিসাবে শাসন করতে হয়, তবুও। কুমিল্লাস্থ ১৬ নং ডিভিশনের প্রধান কার্যালয়ে অভদ্রভাবে আমাকে একথা বলা হয়।

এই ছিল পূর্ব বাংলার সমস্যা সম্পর্কে সামরিক শাসকগোষ্ঠীর চূড়ান্ত সমাধান। হিটলারের পর থেকে এ পর্যন্ত এমন পৈশাচিক দৃষ্টান্ত আর এই বিশ্বে দেখা যায়নি।

কুমিল্লা অঞ্চলে সেনাবাহিনীর সঙ্গে আমার স্বল্পকালীন অবস্থানকালে হত্যা ও অগ্নিসংযোগ অভিযানের ফলে যে প্রচণ্ড ভীতি দেখা দেয় তা আমি সরাসরি প্রত্যক্ষ করেছি। সেখানে গ্রামে গ্রামে ও ঘরে ঘরে হানা দিয়ে সুপরিকল্পিতভাবে হিন্দু ও যারা সামরিক বাহিনীর চোখে অপরাধী ছিল তাদের ধরে এনে হত্যা করা হতো। আমি দেখেছি একটি পুলের ক্ষতি করা হলে তার প্রতিশোধ নিতে গিয়ে কীভাবে পুরো গ্রাম ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে।

আমি স্থানীয় সামরিক আইন প্রশাসকের হাতে বিস্ময়কর আকস্মিকতার সঙ্গে একটি পেন্সিলের খোঁচায় মৃত্যুদণ্ড দিতে এবং ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আরেকজন হতভাগ্যকে চিহ্নিত করতে দেখেছি রাতে সেনাবাহিনীর মেসে তথাকথিত ইজ্জতশালী ব্যক্তিদের, যারা সবাই ছিল ভালো লোক। দিনের বেলায় যে হত্যাযজ্ঞ তারা চালিয়েছে সে সম্পর্কে রসিকতা করতে এবং কে কত বেশি সংখ্যক বাঙালি হত্যা করেছে সে সম্পর্কে নগ্ন প্রতিযোগিতার আলাপ করতে শুনেছি। আমি ১৯৭১ সালের ১৩ জুন সংখ্যা 'সানডে টাইমস' পত্রিকায় এসব খবর পাঠিয়েছি। তখন থেকেই গণহত্যার বিবরণ আরো অধিক বিস্তারিতভাবে প্রকাশিত হতে থাকে।

সারাবিশ্ব জানে যে, কেন বাংলাদেশের আশি লাখ পুরুষ, নারী ও শিশু সীমান্ত পার হয়ে ভারতে পালিয়েছে? কমপক্ষে পাঁচ লাখ লোক মরেছে? কেন আরো অসংখ্য লোক এখন দুর্ভিক্ষ ও ব্যাধির কারণে সম্ভাব্য মৃত্যুর সম্মুখীন হচ্ছে?

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পাকিস্তান সেনাবাহিনীর গণহত্যা অভিযানে পূর্ব বাংলার হাজার হাজার নিরস্ত্র বাঙালি পুরুষ, নারী ও শিশুর ওপর অবর্ণনীয় নিষ্ঠুরতার কথাও সাধারণভাবে সবার জানা হয়ে গেছে। কিন্তু একথা আমরা জানি যে, বাঙালিদের হত্যা, বলাৎকার এবং নারী ও শিশুদের বিকলাঙ্গকরণের মতো ভয়াবহ কাজগুলো বোধগম্য রূপেই বাংলাদেশের যারা সংবেদনশীল মানুষ, তাদের বিব্রত করেছে। বাঙালিরা জীবনে এমন সত্যকে স্থাপন করেছে, যাকে অবহেলা করা যায় না, এই সত্য হলো বাংলাদেশের মুক্তি।

প্রতিটি হত্যার পোস্টমোর্টেম করা এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু আমি একটি ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দেয়া প্রয়োজন মনে করি, যা আমার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে।

ঘটনাটি ঘটেছিল এপ্রিলের তৃতীয় সপ্তাহে কুমিল্লায়। আমাকে সার্কিট হাউসের সবচেয়ে উপর তলার একটি অতিথি কামরায় থাকতে দেয়া হয়। সেখানে সামরিক আইন প্রশাসকের দপ্তর ছিল। ১৯ এপ্রিলের ভোরে আমি এই মূল্যবান লোকটিকে কুমিল্লা

জেলে আটক তিনজন হিন্দু ও একজন খ্রিস্টান 'চোর'কে আকস্মিকভাবে মৃত্যুদণ্ড দিতে দেখেছি। জানা যায় যে চোরটিকে এক হিন্দুর বাড়ি থেকে তার মালিককে দেয়ার জন্য একটি থলে নিয়ে যাওয়ার সময় হাতেনাতে গ্রেফতার করা হয়। বাড়ির মালিক শহরের অপর প্রান্তে লুকিয়ে ছিল। পেন্সিল দিয়ে চার বার দাগ কেটে সে রাতেই ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে এই লোকগুলোকে নিয়ে আসার জন্য একজন বিহারি দারোগাকে আদেশ দেয়া হলো। আমরা তখন গ্লাস ভর্তি নারকেলের দুধ খাচ্ছিলাম।

সেদিন সন্ধ্যায় আমি জানতে পারলাম 'ব্যবস্থা গ্রহণ' কাকে বলে।

বিকেল ৬টায় সান্ধ্য আইন জারির কিছুক্ষণ আগে একটি দড়ি দিয়ে শিথিলভাবে বেঁধে সেই খ্রিস্টান ও তার তিন সঙ্গীকে রাস্তার ওপর দিয়ে হাঁটিয়ে সার্কিট হাউসের আঙ্গিনায় আনা হলো। কয়েক মিনিট পর আমি তীব্র আর্তনাদ ও হাড়-মাংসের ওপর লাঠির সাহায্যে ক্ষিপ্ত আঘাতের শব্দ শুনতে পেলাম। তারপর আর্তনাদ বন্ধ হলো। যেন সুইচ টিপে তা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। আমার যন্ত্রণাজড়িত কানে আমি শুনতে পেলাম সেই নীরবতা সহসা বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে উচ্চ আওয়াজে পরিণত হলো। সেই আওয়াজ লাখ লাখ বার প্রতিধ্বনিত হয়েছে এবং তা এখনও আমার কানে আঘাত করছে।

অন্ধকার কামরায় আমি তখন তীব্র মানসিক যন্ত্রণায় ছটফট করছিলাম। আধঘণ্টা পরে আমি শুনতে পেলাম জোয়ানরা হৈচৈ করে তাদের রাতের খাবার খাচ্ছে। ব্যালকনির ওপর তাকাতে আমার সাহস হলো না, কেননা সে রাতে মানুষকে দেখার কথা আমার মনেই হয়নি। তখন ম্লান আলোকে পলায়নরত শিয়ালরা এলো, বড় বড় কুৎসিত বাদুড়কে শুক্রবার রাতের ভয়ংকর ছায়াছবির রক্ত শোষক পিশাচের মতো দেখাচ্ছিল, তারা ধীরে ধীরে সার্কিট হাউসের পার্শ্বস্থ ঝিলের (ক্ষুদ্র কৃত্রিম হ্রদ) ওপর দিয়ে উড়ে গেল এবং ডান দিকে ঘুরে সন্নিকটস্থ আমগাছে বিশ্রাম গ্রহণের জন্য ফিরে এলো। আমার মন জানত যে রাতের এই ফলভুক প্রাণীগুলোকে রক্ত শোষক পিশাচের মতো দেখা গেলেও প্রকৃতপক্ষে তারা তা ছিল না। প্রকৃত রক্ত শোষক পিশাচ ও দানবের দল তখন সার্কিট হাউসের অপর পাশে ছিল। এরা পাকিস্তানের বর্বরতম সেনাবাহিনী। আমাকে পালাতে হলো।

এ হলো 'রেইপ অব বাংলাদেশ'-এর বাস্তব ছবি। সমগ্র বিশ্ব জুড়ে যত অপপ্রচারই চালানো হোক না কেন, তা এইসব যথার্থ তথ্যকে গোপন রাখতে পারে না।

পরিশিষ্ট–ন

"বাংলার দরিদ্ররা পশ্চিম পাকিস্তানের দরিদ্রদের থেকেও দরিদ্রতর। পূর্ব পাকিস্তানের ওপর অর্থনৈতিক শোষণ সম্পর্কিত অভিযোগের অর্থ আমার কাছে পরিষ্কার হতে শুরু করল। নিজেকে অপরাধী মনে হলো"

—মেজর সিদ্দিক সালিক

('৭১-এ পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নরের জনসংযোগ অফিসার)

[পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে মেজর পদে উন্নীত হওয়ার পর সিদ্দিক সালিক সাবেক পূর্ব পাকিস্তানে বদলি হয়ে আসেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল সাহেবজাদা ইয়াকুব খানের জনসংযোগ অফিসার হয়ে। পরবর্তীতে ('৭১-এ) তিনি লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খান (গর্ভনর ও সামরিক আইন প্রশাসন, পূর্ব পাকিস্তান) এবং লেফটেন্যান্ট জেনারেল আমীর আবদুল্লাহ খান নিয়াজীর (কমান্ডার, পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ড) জনসংযোগ অফিসারের দায়িত্ব পালন করেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পুরো সময়টা তিনি জেনারেল নিয়াজীর পাশেপাশেই ছিলেন এবং বাংলাদেশের মানুষের বিরুদ্ধে পাক-সামরিক জান্তার চক্রান্ত তাই তিনি খুব কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করার সুযোগ লাভ করেন। তারই বস্তুনিষ্ঠ বিবরণ 'উইটনেস টু সারেন্ডার' (নিয়াজীর আত্মসমর্পণের দলিল)।
সিদ্দিক সালিক সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের ওপর পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণের অভিযোগের সত্যতা অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করেছেন। পাশাপাশি তিনি একজন অনুগত পাকিস্তানি ছিলেন বলে বাংলাদেশের মাটিতে পাক বাহিনীর বিপর্যয়ে এ গ্রন্থে তাঁর আর্তচিৎকার ধ্বনিত হয়েছে। লেখাটি পড়তে হবে এ দৃষ্টিকোণ থেকেই। 'উইটনেস টু সারেন্ডারের' নির্বাচিত অংশ–]

পাকিস্তানের দ্বিতীয় সামরিক শাসন আইন জারির প্রথম বার্ষিকীর দিন ছিল সেটি। শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের একটি মফস্বল শহরে যাচ্ছিলেন নির্বাচনী সমাবেশে বক্তৃতা দিতে। তাঁর গাড়িটি ঘটঘট আওয়াজ তুলতে তুলতে এগিয়ে যাচ্ছিল। গাড়ির পেছনের সিটে বসেছিলেন একজন অবাঙালি সাংবাদিক। তিনি নিজের খবরের কাগজের জন্যে তাঁর নির্বাচনী সফরের সঙ্গী হয়েছিলেন। চলতি কিছু ঘটনার কথা উত্থাপন করে তিনি শেখ মুজিবকে উস্কে দিলেন এবং সংগোপনে নিজের ক্যাসেট রেকর্ডারের বোতাম টিপে দিলেন। পরবর্তীকালে এককভাবে সংগৃহীত নিজের এই মহামূল্যবান সম্পদ তিনি তাঁর বন্ধুদের শোনান। তিনি আমাকেও শুনিয়েছিলেন। মুজিবের বাগ্মীসুলভ কণ্ঠস্বর স্পষ্ট বোধগম্য ছিল। তিনি বলছিলেন, "যেভাবেই হোক আইউব খান আমাকে জনপ্রিয়তার শীর্ষে তুলেছে। এখন আমি যা চাইব তাতে কেউ 'না' করতে পারবে না। এমনকি ইয়াহিয়া খানও আমার দাবি উপেক্ষা করতে পারবেন না।"

তাঁর দাবিগুলো কী ছিল? ইয়াহিয়া খানের গোয়েন্দা বাহিনীর সংগৃহীত আরেকটি টেপ থেকে সূত্রটি পাওয়া গেল। বিষয়টি ছিল লিগ্যাল ফ্রেম ওয়ার্ক অর্ডার (এলএফও) সম্পর্কিত। ১৯৭০ সালের ৩০ মার্চ সরকার এ আদেশটি জারি করেন। এটা ছিল শাসনতন্ত্রের খসড়া চিত্র। এই আদেশ বিখ্যাত ছ'দফা বাস্তবায়নের ব্যাপারে মুজিবের হাত বেঁধে ফেলল। এলএফও'র ওপর তিনি তাঁর মতামত অতি নির্ভরতার সঙ্গে বলছিলেন তাঁর সিনিয়র সহকর্মীদের কাছে। কিন্তু আঁচ করতে পারেননি তাঁর উচ্চারিত বাক্য ইয়াহিয়া খানের শ্রাবকের জন্যে টেপ হয়ে যাচ্ছে। রেকর্ডকৃত টেপে মুজিব বলেন, 'আমার লক্ষ্য হচ্ছে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করা। নির্বাচন শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি এলএফও টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলব। নির্বাচন শেষ হওয়ার পর আমাকে চ্যালে করবে কে?' যখন এই টেপ ইয়াহিয়া খানকে শোনানো হলো, তিনি বললেন, 'যদি সে বিশ্বাসঘাতকতা করে তাহলে আমি তাকে দেখে নেব।'

১৯৭০ সালের জানুয়ারি মাসে হালকা মালপত্র নিয়ে আমি ঢাকায় এলাম। কিন্তু ভাবনায় ছিলাম ভারাক্রান্ত। সম্ভাব্য ভারতীয় আক্রমণের বিষয়ে আমি ভীত ছিলাম না; বরং অভ্যন্তরীণ রাজনীতি আমাকে ভাবিয়ে তুলেছিল। আমাকে বলা হয়েছিল, মুজিবুর রহমানের ছ' দফা হচ্ছে অবগুণ্ঠনের আড়ালে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার একটি পরিকল্পনা মাত্র এবং ১৯৬৮ সালের আগরতলা ষড়যন্ত্র ছিল এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের একটি পদক্ষেপ– আমি এই দুটি অভিযোগের কোনোটারই সত্যতা সম্পর্কে কিছুই জানি না। ভাবলাম, আমার বাঙালি দেশবাসীর সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যমে এ বিষয় সম্পর্কে ব্যাখ্যা নেব।

ঢাকায় যাওয়ার পরে সেখানকার ২৫ হাজার সদস্য সংবলিত শক্তিশালী সেনাবাহিনীর কথা ভাবলাম– যাদের সঙ্গে আমি যুক্ত হতে যাচ্ছি। ভাবলাম, ১৮০০ কিলোমিটারব্যাপী রাষ্ট্রসীমার কথা– যার ওপর দিয়ে উড়ে এসেছি। যদি ভারত কখনও পূর্ব পাকিস্তান আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেয়, তাহলে আমাদের বিচ্ছিন্ন গ্যারিসন সেই অভিযানের জবাব কি দিতে পারবে? আমি পাকিস্তানের একজন অনুগত নাগরিক। সেহেতু এ চিন্তাটা আমার কাছে দারুণ অস্বস্তিকর ছিল। সুতরাং বিষয়টি মন থেকে দূরে সরিয়ে দিয়ে আমি পুরনো দিনের সেই মিষ্টি স্মৃতিচারণের মাঝে আশ্রয় নিলাম। ভাবলাম, নিখিল ভারত মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ঢাকাতে এবং ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন একজন বাঙালিই। অতএব, পাকিস্তানের কোনো বিপদ হতে পারে না।

তেজগাঁও বিমানবন্দরে নামলাম। বিমানবন্দরটি যেন সবুজ শাড়ি পরে আছে; মাথার ওপর সাদা মেঘ। আছে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে। হাস্যোজ্জ্বল সূর্যকে আড়াল করতে পারছিল না। পরিবেশ ছিল শান্ত, স্বস্তিদায়ক। একই বিমানে করে কয়েকজন সামরিক আইন কর্মকর্তাও এসেছিলেন। তারা ভিআইপি রুমে গিয়ে উঠলেন। তাদের মালামাল গভর্নমেন্ট হাউসের রুপালি প্লেট লাগানো গাড়িতে ওঠানো হলো। বাঙালি মুটে ধাক্কাধাক্কি করে তাড়াতাড়ি কাজটি সম্পন্ন করল। অফিসাররা হাওয়ার গতিতে গাড়ি চালিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। ধূলার কুণ্ডলী বাতাসে মিলিয়ে গেল।

আমি বাইরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ক্যান্টনমেন্টে যাওয়ার বাহনের আশায় ছিলাম। অবশেষে সামরিক বাহিনীর একটি গাড়ি আমাকে পৌছে দিতে চাইল। গাড়ির পাশ দিয়ে এক বাঙালি বালক হেঁটে যাচ্ছিল। তাকে ড্রাইভার আদেশ করল আমার স্যুটকেস, জিপে উঠিয়ে দিতে। ছিন্নবস্ত্র পরিহিত বালকটি ড্রাইভারের আদেশ হৃষ্টচিত্তে নিল না; বরং ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তার 'প্রভুর' দিকে তাকাল এবং আদেশ পালন করল। তার সাদা চোখের মণি আমার দিকে ঘুরল। শরীরের কালো রঙের ভেতর সাদা মণির দৃষ্টিকে দারুণ মর্মভেদী মনে হলো। আমি তাকে পয়সা দিতে গেলে ড্রাইভার আর্তচিৎকার করে উঠল, 'করছেন কি? এ হারামজাদাদের আর নষ্ট করবেন না।' বালকটি আরেকবার ঘৃণাসূচক দৃষ্টিতে তাকাল এবং চলে গেল। আমি গাড়িতে উঠে বসলাম। গাড়ি ক্যান্টনমেন্টের পথ ধরল। অর্ধচন্দ্র ও তারকাখচিত জাতীয় পতাকা টার্মিনাল ভবনের শীর্ষে পতপত করে উড়ছিল।

যারা বিমানবন্দরে গিয়ে আমাকে অভ্যর্থনা জানাতে পারেনি তারা সন্ধ্যায় অফিসার্স মেসে হাজির হলো। তারা আমাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাল এবং তাদের অনুপস্থিতির কারণে বিমানবন্দরে যে অসুবিধা আমাকে পোহাতে হয়েছে, তার জন্যে দুঃখ প্রকাশ করল। যখন পূর্ব পাকিস্তানের সবকিছুতেই 'তাপ' সঞ্চারিত হচ্ছে, সে সময় এখানে বদলি হয়ে আসার জন্যে তারা আমার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করল। কেউ কেউ তখনকার সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে আমাকে জ্ঞানদান করল এবং এ রকম উপদেশের মুক্তা ছড়াল— 'মার্শাল ল' এখানে কার্যকর নেই'; 'ঘর-গেরস্থালীর জন্যে বেশি মালসামান কেনার দরকার নেই। কেননা, তুমি তো জানো না, কি অবস্থায় এবং কখন তোমাকে বাক্স-প্যাঁটরা বাঁধতে হবে', 'তোমার ব্যাংক একাউন্ট শহরের কমার্শিয়াল ব্যাংক থেকে ক্যান্টনমেন্টের ন্যাশনাল ব্যাংকে নিয়ে এসো', 'তুমি যার জায়গায় বদলি হয়ে এসেছ তারই ফ্ল্যাটে থাকার চেষ্টা করো। ওই ফ্লাটটি বাক্সের মতোই নিরাপদ, কেউই এর ভেতর বোমা ছুঁড়ে মারতে পারবে না।'

কেন একজন বাঙালি আমার বাড়িতে বোমা মারবে? আমার মনে হলো আমার প্রতি সহানুভূতিশীল ব্যক্তিদের ভীতিটা কল্পনামাত্র। অপ্রত্যাশিত আক্রমণের কোনো চিহ্নই দেখলাম না।

অধিকতর শক্তি সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে পত্নীকে টেলিগ্রাম করলাম চলে আসার জন্যে। অবশ্য আমার বন্ধুরা এটাকে একটি ঝুঁকিবহুল পদক্ষেপ বলে মনে করল। কয়েকদিনের মধ্যেই পত্নী এসে গেলেন এবং সেই বাক্সের মতো ফ্ল্যাটে গিয়ে উঠলাম। অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই একদল বাঙালি আমার বাড়িতে আক্রমণ হানল। কিন্তু তারা বোমা ছুঁড়ে মারা বিচ্ছিন্নতাকামীরা নয়। তারা ছিল কর্ম-প্রত্যাশী আয়ার দল– যারা পশ্চিম পাকিস্তানির বাসায় কাজ করতে অধিকতর আগ্রহী। অনেকটা স্বাধীনতা-পূর্বকালের ভারতীয় চাকররা যেমন ব্রিটিশদের বাড়িতে কাজ পাওয়ার জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরত, তেমনি। পরের দিন জানতে পারলাম, আমার স্ত্রী দুটো আয়া রেখেছেন। এটাকে অমিতব্যয়িতা বলে মনে হলো। দুটো আয়া নিয়োগের কারণ ব্যাখ্যা করলেন। বললেন,

'রাওয়ালপিন্ডিতে একটাকে রাখতে যে বেতন দিতে হতো, এখানে দুটোর জন্যে তার চেয়েও কম বেতন দিতে হবে।'

স্ত্রীর ঢাকায় আসার পর আমি গাড়ি চালিয়ে টঙ্গীতে পাকিস্তান সিরামিক ইন্ডাস্ট্রিতে গেলাম বাসন-কোসন কেনার জন্যে। ঢাকা থেকে টঙ্গীরে দূরত্ব প্রায় চৌদ্দ কিলোমিটার। যাওয়ার পথে বাস্তবতার নতুন মাত্রা আমার মানসপটে প্রতিভাত হয়ে উঠল। এমন ধরনের দারিদ্র্যের দৃশ্য নজরে এলো– যা কাজের খুঁজে আসা আয়াদের ভিড় জমানোর কারণটা আমার কাছে সহজবোধ্য করে তুলল। মেয়েরা তালি দেয়া ময়লা এক চিলতে কাপড় জড়িয়ে আব্রু ঢাকার চেষ্টা করছে। পুরুষ হ্রস্ব শরীরের এবং ক্ষুধার্ত। চলন্ত গাড়িতে বসেও তাদের বুকের কালো চামড়ার পাতলা স্তরে ঢাকা হাঁড়গুলো গোণা যায়। শিশুদের অবস্থা আরো শোচনীয়। তাদের উদর বাইরের দিকে ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। কারো কারো কোমরে ঝুলছে ঘণ্টি বাঁধা খেলনা। এটাই তাদের একমাত্র খেলনার বস্তু। যেখানেই আমি থেমেছি সেখানেই ভিক্ষুকের দল আমাকে মাছির মতো ঘিরে ফেলেছে। আমি সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে, বাংলার দরিদ্ররা পশ্চিম পাকিস্তানের দরিদ্রদের থেকেও দরিদ্রতর। পূর্ব পাকিস্তানের ওপর অর্থনৈতিক শোষণ সম্পর্কিত অভিযোগের অর্থ আমার কাছে পরিষ্কার হতে শুরু করল। নিজেকে অপরাধী মনে হলো।

আমার সেসব বন্ধুর উপদেশের কথা মনে পড়ল যারা এখানকার অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞানদানের চেষ্টা করেছিলেন। এ ক্ষুধার্ত জনতা যদি প্রচণ্ডতা নিয়ে জেগে ওঠে তাহলে তারা দোকানপাট লুণ্ঠন করতে পারে, আঘাত হানতে পারে সেনানিবাসে। এমনকি আমার ফ্ল্যাটেও বোমা ছুঁড়ে মারতে পারে।

গভর্নমেন্ট হাউজ ছেড়ে যাওয়ার আগ মুহূর্তে শেখ মুজিব মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলীকে বললেন, আমার অবস্থা দু'পাশে আগুন মাঝখানে আমি দাঁড়িয়ে। হয় সেনাবাহিনী আমাকে মেরে ফেলবে না হয় আমার দলের ভেতরকার চরমপন্থিরা আমাকে হত্যা করবে। কেন আপনারা আমাকে গ্রেফতার করছেন না? টেলিফোন করলেই আমি চলে আসব।

প্রেসিডেন্টের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার লেফটেন্যান্ট জেনারেল এস জি এম পীরজাদা ফেব্রুয়ারি মাসের ২৮ তারিখে গভর্নর আহসানকে এক অশুভ বার্তা নিয়ে টেলিফোন করলেন। জানান, প্রেসিডেন্ট জাতীয় পরিষদে অধিবেশন স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। পরিষদের বাইরে খসড়া শাসনতন্ত্রের প্রশ্নে রাজনৈতিক দলসমূহ যাতে ঐকমত্যে পৌঁছুতে পারে সে ব্যাপারে সময়দানের উদ্দেশ্যে তিনি এ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

পীরজাদার কথানুযায়ী একই দিন সন্ধ্যা সাতটায় মুজিবকে গভর্নমেন্ট হাউজে ডেকে আনা হলো। বড়-সড় ভূমিকা করে আহসান তাঁকে প্রেসিডেন্টের সিদ্ধান্তের কথা জানালেন। আশ্চর্যজনকভাবে মুজিব শান্ত থাকলেন। মিষ্ট ভাষায় তিনি তাঁর যুক্তিহীনতার ওপর দাঁড়িয়ে থাকলেন এবং বললেন, 'এ নিয়ে আমি কোনো ঘটনা সৃষ্টি করব না যদি আমাকে নতুন কোনো তারিখ দেয়া হয়। যদি নতুন তারিখটি সামনের মাসে (মার্চ) হয়, আমি পরিস্থিতি সামলাতে পারব। এপ্রিলে হলে আমার পক্ষে কষ্টকর হবে। কিন্তু স্থগিতকরণটি যদি অনির্দিষ্টকালের জন্য হয় তাহলে পরিস্থিতিকে সামলানো আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়বে।'

গভর্নমেন্ট হাউজ ছেড়ে যাওয়ার আগ মুহূর্তে তিনি মেজর জেনারেল ফরমানকে বললেন, আমার অবস্থা দু'পাশে আগুন মাঝখানে আমি দাঁড়িয়ে, হয় সেনাবাহিনী আমাকে মেরে ফেলবে না হয় আমার দলের ভেতরকার চরমপন্থীরা আমাকে হত্যা করবে। কেন আপনারা আমাকে গ্রেফতার করছেন না? টেলিফোন করলেই আমি চলে আসব।

একই সন্ধ্যায় মুজিবের প্রতিক্রিয়া জানানো হলো রাওয়ালিপিন্ডিকে। এ সঙ্গে অধিবেশনের নতুন তারিখ ঘোষণার জন্যে রাওয়ালপিন্ডিকে একান্তভাবে অনুরোধ জানানো হলো। প্রতিউত্তরে রাওয়ালপিন্ডি হিমশীতল কণ্ঠে বলল, 'আপনার বার্তা পুরোপুরি অনুধাবন করা গেছে।'

ঢাকা এ বার্তাকে নিজেদের প্রস্তাবের পক্ষে মৌন সম্মতি হিসেবে ব্যাখ্যা করল এবং আশা নিয়ে নতুন তারিখ ঘোষণার অপেক্ষায় রইল। ঘোষণাটি প্রচারিত হলো ১ মার্চ (পূর্ব পাকিস্তান সময়) বেলা ১টা ৫ মিনিটে। প্রচণ্ড আশা আর আবেগ আমাদেরকে রেডিওর সঙ্গে একাকার করে দিল। আমরা শুধু বিস্মিতই হলাম না– ভীতও হলাম। ঘোষণায় নতুন তারিখ সম্পর্কে কিছু বলা হলো না। অগুনতি ভয়াবহ দৃশ্যাবলি আমার

মানসপটে ভেসে উঠল। তারিখ বাদ পড়ার বিষয়টি ছাড়াও আমাকে আরেকটি বিষয় দারুণভাবে বিস্মিত করল। কয়েকটি গুরুত্বহীন বিষয় ঘোষিত হবার আগে যেটা আমাদের শ্রবণ ইন্দ্রিয়কে কয়েকবার ধাক্কা মারল, সেটা ছিল প্রেসিডেন্টের কণ্ঠের অনুপস্থিতি। এর অর্থ কী এই– তিনি ঘোষণা সংক্রান্ত বিষয়ে কেউ নন? এটাই আমাদেরকে বিশ্বাস করাতে চেয়েছেন অধ্যাপক জি ডব্লিউ চৌধুরী। তিনি বলেছেন, 'এ ঘোষণায় ইয়াহিয়া শুধু সই করেছিলেন মাত্র।' এ গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতির সন্ধান নিতে গিয়ে আমি কথা বললাম মেজর জেনারেল 'আই'-এর সঙ্গে। তিনি ইয়াহিয়ার ব্যক্তিগত স্টাফ ছিলেন। বললেন, "ওই সময় প্রেসিডেন্ট করাচিতে ছিলেন। আমরা সবাই নিচের তলায় ছিলাম। মেজর জেনারেল 'এইচ' ও মেজর জেনারেল 'ও' বারবার ওপর-নিচ করছিলেন। তারা প্রেসিডেন্টের কাছে এমন একটি ছবি তুলে ধরেন যে, তাতে তাঁকে খসড়া ঘোষণায় সম্মতি দিতে হয়।" আত্মরক্ষায় জেনারেল ইয়াহিয়ার জন্য এটাই কী যথেষ্ট? ইয়াহিয়া ছিলেন কট্টরপন্থি জেনারেলদের চাপের মাঝে, মুজিব ছিলেন চরমপন্থিদের চাপের মুখে আর ভুট্টো ছিলেন নির্বাচকদের হাতে বাঁধা। তাহলে মুক্ত ছিলেন কে?

অপারেশন সার্চলাইট

পরিকল্পনার ভিত্তি

১. এএল (আওয়ামী লীগ)-এর কার্যকলাপ এবং প্রতিক্রিয়াকে বিদ্রোহাত্মক বলে গণ্য করতে হবে। যারা তাদের সমর্থন করবে অথবা এমএল (মর্শাল ল')-এর কার্যক্রমকে অস্বীকার করবে তাদেরকে শত্রু গণ্য করে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

২. যেহেতু সর্বত্র আওয়ামী লীগের ব্যাপক সমর্থন রয়েছে এমনকি সেনাবাহিনীর মধ্যেও ইপি'র (ইস্ট পাকিস্তান) লোকজন রয়েছে, সে জন্য অপারেশন শুরু করতে হবে অতিশয় চাতুর্যের সঙ্গে। হতবাক করে দিতে হবে, প্রতারণামূলক হতে হবে এবং কার্যক্রমে আতংক সৃষ্টি করতে হবে।

সাফল্যের জন্যে মূল আবশ্যকীয় বিষয়

৩. একই সঙ্গে সারা প্রদেশে অপারেশন আরম্ভ করতে হবে।

৪. সর্বাধিক সংখ্যাক রাজনৈতিক ও ছাত্র নেতা, শিক্ষক সম্প্রদায়ের ভেতরকার এবং সাংস্কৃতিক সংগঠনের মধ্যকার চরমপন্থিদের গ্রেফতার করতে হবে। প্রাথমিক পর্যায়ে উচ্চপর্যায়ের রাজনৈতিক ও ছাত্রনেতাদের গ্রেফতার করতে হবে।

৫. ঢাকার অপারেশনকে শতকরা একশ' ভাগ সাফল্য অর্জন করতে হবে। এজন্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দখল করতে হবে এবং অনুসন্ধান চালাতে হবে।

৬. ক্যান্টনমেন্টের নিরাপত্তাকে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে। ক্যান্টনমেন্ট আক্রমণের চেষ্টা কেউ করলে তার মোকাবেলায় বড় ধরনের এবং মুক্ত হস্তে গুলি চালানো যাবে।

৭. যাবতীয় অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক যোগাযোগ মাধ্যমকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে হবে। টেলিফোন এক্সচেঞ্জ, রেডিও, টিভি, টেলিপ্রিন্টার সার্ভিস, বৈদেশিক কনস্যুলেটসমূহে ট্রান্সমিটার বন্ধ করে দিতে হবে।

৮. ইপি (ইস্ট পাকিস্তান) সৈনিকদের নিরপেক্ষকরণের জন্যে ডব্লিউ পি (পশ্চিম পাকিস্তান) সৈন্যদেরকে কোটস্ এবং অস্ত্রাগার প্রহরায় নিয়োগ করতে হবে এবং তাদেরকে নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করতে হবে। একই ব্যবস্থা অবলম্বিত হবে পিএএফ এবং ইপিআর-এর ক্ষেত্রে।

হতবাককরণ এবং প্রতারণা

৯. উচ্চস্তরে– প্রেসিডেন্টকে সংলাপ চালিয়ে যাওয়ার বাঞ্ছনীয়তা সম্পর্কে বিবেচনা করার জন্যে অনুরোধ জানানো হচ্ছে। যদিও মি. ভুট্টো সম্মত হবেন না তবু মুজিবকে প্রতারণা করার জন্যেই তিনি আওয়ামী লীগের দাবিসমূহের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ, এমন ধরনের ঘোষণা ২৫ মার্চ করবেন।

১০. কৌশলগত স্তর

ক. যেহেতু গোপনীয়তা সর্বোচ্চ পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সে জন্যে নিম্নবর্ণিত সৈনিকদের– যারা ইতিমধ্যে শহরের বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করছে; তাদেরকে প্রাথমিক পর্যায়ের অপারেশন পরিচালিত করতে হবে।

এক. মুজিবের বাড়ি ভেঙে ঢুকতে হবে এবং উপস্থিত সবাইকে গ্রেফতার করতে হবে। বাড়িটিতে শক্ত প্রহরা রয়েছে এবং সুরক্ষিত।

দুই. বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ হলসমূহ ঘেরাও করতে হবে, ইকবাল হল ডি ইউ (ঢাকা ইউনির্ভাসিটি), লিয়াকত হল (প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়)।

তিন. টেলিফোন এক্সচেঞ্জকে অচল করতে হবে।

চার. যেসব বাড়িতে অস্ত্রশস্ত্র জমা করা হয়েছে সেগুলোকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে।

খ. টেলিফোন এক্সচেঞ্জ অচল করে দেয়ার আগ পর্যন্ত ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় সৈন্যদের কোনো কার্যক্রম চলবে না।

গ. অপারেশনের রাতে দশটার পর কাউকেও ক্যান্টনমেন্ট এলাকার বাইরে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হবে না।

ঘ. যে কোনো অজুহাতেই হোক শহরের ভেতর অবস্থানরত সৈন্যদের প্রেসিডেন্ট হাউস, গভর্নর হাউস, এম এন এ হোস্টেল এলাকাসহ রেডিও, টিভি এবং টেলিফোন এক্সচেঞ্জ প্রাঙ্গণে সমাবেশ ঘটাতে হবে।

ঙ. মুজিবের বাড়িতে অপারেশন চালানোর জন্য বেসামরিক গাড়ি ব্যবহার করা যেতে পারে।

কার্যক্রমের পট

১১. ক. আঘাত হানার সময় রাত ১টা।

খ. সৈন্য পরিচালনার সময় কমান্ডো (এক প্লাটুন)– মুজিবের বাড়িতে রাত ১টা, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ বিকল– ১২টা ৫৫ মিনিট, বিশ্ববিদ্যালয় কর্ডন করার জন্য নির্ধারিত সৈনিকদের যাত্রা– ১টা ০৫ মিনিট। রাজারবাগ পুলিশ সদর দফতর ও কাছাকাছি অন্যান্য থানার জন্যে নির্ধারিত সৈনিকদের যাত্রা– ১টা ০৫ মিনিট, নিম্নবর্ণিত স্থানগুলো ঘেরাও করতে হবে– ১টা ০৫ মিনিট।

মিসেস আনোয়ারা বেগমের বাড়ি, রোড নম্বর ২১ এবং বাড়ি নম্বর ১৪৮।

সান্ধ্য আইন জারি করতে হবে রাত ১১টায় সাইরেন বাজিয়ে এবং লাউড স্পিকারের মাধ্যমে। স্থায়িত্ব, প্রাথমিক পর্যায়ে ৩০ ঘণ্টা। প্রাথমিক পর্যায়ে পাস দেয়া যাবে না। মাত্র সন্তান প্রসব এবং মারাত্মক হৃদরোগীর ক্ষেত্রে বিশেষ বিবেচনা করা যেতে পারে। সামরিক বাহিনীই এসব ক্ষেত্রে রোগীকে স্থানান্তর করবে। আরো ঘোষণা করতে হবে যে, পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত কোনো সংবাদপত্র বেরুবে না।

বিশেষ মিশনে নিয়োজিত সৈনিকদেরকে নিজস্ব সেক্টরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করতে হবে রাত ১১টায় (সৈন্যদের মোটা সুতির কাপড়ে নিজেদেরকে আবৃত করতে হবে)। হলগুলো দখল নিতে হবে এবং অনুসন্ধান চালাতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশে সৈনিকরা রওনা হবে ১২টা ০৫ মিনিটে, রাস্তা ও নদীর প্রতিবন্ধকতা সরাতে হবে রাত ৩টায়। দিনের বেলায় ধানমণ্ডির সন্দেহজনক প্রতিটি বাড়িতে অনুসন্ধান চালাতে হবে এবং পুরনো ঢাকার হিন্দু বাড়িগুলোতেও।

সব ছাপাখানা বন্ধ করে দিতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, ফিজিক্যাল ট্রেনিং ইন্সটিটিউট ও টেকনিক্যাল ইন্সটিটিউটের সাইক্লোস্টাইল মেশিন বাজেয়াফত করতে হবে। সান্ধ্য আইন কঠোরভাবে আরোপ করতে হবে।

অন্য নেতাদের গ্রেফতার করতে হবে।

১২. সৈনিকদের বিস্তারিত কর্মধারা ব্রিগেড কমান্ডার কর্তৃক প্রণীত হবে কিন্তু নিম্নবর্ণিত কাজগুলো অবশ্যপালনীয় :

ক. ইপি ইউনিটের অস্ত্রশালা দখল করতে হবে। সিগন্যালসহ প্রশাসনিক ইউনিট দখলে আনতে হবে। পশ্চিম পাকিস্তানি সৈনিকদেরই শুধু অস্ত্র দিতে হবে।

ব্যাখ্যা : আমরা পূর্ব পাকিস্তানি সৈনিকদের বিব্রত করব না এবং এমন কাজে নিয়োগ করব না– যা তাদের অসন্তুষ্টি উৎপাদন করে।

খ. সব থানা নিরস্ত্র করতে হবে।

গ. ডিজি (ডাইরেক্টর জেনারেল) ইপিআর-কে (ইস্ট পাকিস্তান রাইফেল্‌স) তাঁর অস্ত্রশালার নিরাপত্তা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে।

ঙ. সব আনসারের রাইফেল নিয়ে নিতে হবে।

১৩. নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিদের অবস্থান সম্পর্কে জানতে হবে–

মুজিব, নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন, ওসমানী, সিরাজুল আলম, মান্নান, আতাউর রহমান, অধ্যাপক মুজাফ্‌ফর, অলি আহাদ, মিসেস মতিয়া চৌধুরী, ব্যারিস্টার মওদুদ, ফয়জুল হক, তোফায়েল, এন এ সিদ্দিকী, রউফ, মাখন এবং অন্যান্য ছাত্রনেতা।

ক. সব পুলিশ স্টেশন ও রাইফেলসের অবস্থান।

খ. শহরে যেসব অস্ত্রশস্ত্র জমা করা হয়েছে এবং শক্ত কেন্দ্রে পরিণত করা হয়েছে।

গ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোর অবস্থান।

ঘ. যেসব সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে সামরিক প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে, সেগুলোর অবস্থান।

ঙ. যেসব প্রাক্তন সামরিক কর্মচারী বিদ্রোহাত্মক আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করছে, তাদের নাম ও ঠিকানা।

১৪. অধিনায়কত্ব ও নিয়ন্ত্রণ : দুটি অধিনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

ক. ঢাকা অঞ্চল : কমান্ডার : মেজর জেনারেল ফরমান, স্টাফ : পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ড স্টাফ অথবা সামরিক আইন সদর দফতর।

সৈন্য : ঢাকায় অবস্থানরত সৈন্য।

খ. প্রদেশের বাকি অঞ্চলের কমান্ডার : মেজর জেনারেল খাদিম হোসেন রাজা, স্টাফ : সদর দফতর চতুর্দশ ডিভিশন, সৈন্য : ঢাকার প্রয়োজন থেকে বিয়োগকৃত সৈনিক :

ঢাকা– কার্যক্রমের জন্যে সৈন্যের বাটোয়ারা

ঢাকা

কমান্ড এবং কন্ট্রোল : মেজর জেনারেল ফরমান, সামরিক আইন সদর দফতর, জোন-বি, সৈন্য : ৫৭ ব্রিগেডের সদর দফতর, ঢাকায় অবস্থানরত সৈন্যরা অর্থাৎ ১৮ পাঞ্জাব, ৩২ পাঞ্জাব (কমান্ডিং অফিসার পরিবর্তিত হবে) এবং তিনি লেফটেন্যান্ট কর্নেল তাজ জিএসও ১, ২২ বালুচ, ১৩ ফ্রন্টিয়ার ফোর্স, ৩১ ফিল্ড রেজিমেন্ট, ১৩ হালকা অ্যাক-অ্যাক রেজিমেন্ট, ৩ কমান্ডো কোম্পানি (কুমিল্লা) থেকে।

দায়িত্ব : ১. নিরস্ত্রকরণের মাধ্যমে ২ এবং ১০ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস্ সদর দফতর (২৫০০), রাজারবাগের রিজার্ভ পুলিশদের (২০০০) নিরপেক্ষকরণ।

২. টেলিফোন এক্সচেঞ্জ, ট্রান্সমিটার, রেডিও, টিভি, স্টেট ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ।

৩. আওয়ামী লীগ নেতাদের গ্রেফতার করতে হবে, তাদের ঠিকানাসহ তালিকা প্রণয়ন করতে হবে।

৪. বিশ্ববিদ্যালয় হলসমূহ : ইকবাল হল, জগন্নাথ হল, লিয়াকত হল (প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়)।

৫. গাজীপুরের অস্ত্র কারখানা ও রাজেন্দ্রপুরের অস্ত্রাগার রক্ষা করতে হবে।

বাকি অঞ্চল : চতুর্দশ ডিভিশনের সদর দফতর মেজর জেনারেল কে এইচ রাজা এবং চতুর্দশ ডিভিশনের অধীনে।

রাজশাহী

২৫ পাঞ্জাব

১. ডেসপ্যাচ সিও : শাফকাত বালুচ।

২. এক্সচেঞ্জ ও রেডিও স্টেশন।

৩. রিজার্ভ পুলিশ ও ইপিআর-এর সেক্টর সদর দফতরের লোকজনকে নিরস্ত্র করা।

৪. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিক্যাল কলেজের অংশবিশেষ।

৫. আওয়ামী লীগ ও ছাত্রনেতা।

যশোর

সদর দফতর ১০৭ ব্রিগেড, ২৫ বালুচ, ২৪ ফিল্ড রেজিমেন্টের উপকরণ, ৫৫ ফিল্ড রেজিমেন্ট দায়িত্ব :

প্রথম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস্-এর সেক্টর হেড কোয়ার্টার, রিজার্ভ পুলিশ এবং আনসারের নিরস্ত্রীকরণ।

যশোর শহর পুনরুদ্ধার এবং আওয়ামী লীগ ও ছাত্রনেতাদের গ্রেফতার।

টেলিফোন এক্সচেঞ্জ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা দখল।

সেনানিবাসের চারদিকের নিরাপত্তা বিধান এবং যশোর শহর, যশোর-খুলনা সড়ক এবং বিমানবন্দরের নিরাপত্তা বিধান।

কুষ্টিয়ার টেলিফোন এক্সচেঞ্জকে অচল করে দিতে হবে।

যদি প্রয়োজন পড়ে খুলনায় সৈন্য সমাবেশ ঘটাতে হবে।

খুলনা

২২২ ফ্রন্টিয়ার ফোর্স

দায়িত্ব :

খুলনা শহরের নিরাপত্তা।

টেলিফোন এক্সচেঞ্জ ও রেডিও স্টেশন দখল।

পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস্-এর উইং সদর দফতর, রিজার্ভ কোম্পানি এবং রিজার্ভ পুলিশকে নিরস্ত্র করতে হবে।

আওয়ামী লীগ সমর্থক ছাত্র এবং কমিউনিস্ট নেতাদের গ্রেফতার করতে হবে।

রংপুর-সৈয়দপুর

২৩ সদর দফতর ব্রিগেড, ২৯ ক্যাভালরি, ২৬ ফ্রন্টিয়ার ফোর্স, ২৩ ফিল্ড রেজিমেন্ট।

রংপুর-সৈয়দপুর শহরের নিরাপত্তা। সৈয়দপুরস্থ তৃতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের নিরস্ত্রীকরণ।

দিনাজপুরের সেক্টর সদর দফতর এবং রিজার্ভ কোম্পানিকে সীমান্ত ফাঁড়িসমূহে প্রহরারত সৈনিকদের সমাবেশ ঘটিয়ে নিরস্ত্র করতে হবে, যদি সম্ভব হয়।

রংপুরের রেডিও স্টেশন ও টেলিফোন এক্সচেঞ্জ দখল করতে হবে।

রংপুরের আওয়ামী লীগ ও ছাত্রনেতাদের গ্রেফতার করতে হবে। বগুড়ার অস্ত্রশালা দখল করতে হবে।

কুমিল্লা

৫৩ ফিল্ড রেজিমেন্ট, দেড় ইঞ্চি মর্টার ব্যাটারি, স্টেশন ট্রুপস্, তৃতীয় কমান্ডো ব্যাটালিয়ান।

১. ৪ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইপিআর-এর উইং সদর দফতর ও জেলা রিজার্ভ পুলিশকে নিরস্ত্র করা।

সিলেট

৩১ পাঞ্জাব

১. রেডিও স্টেশন, এক্সচেঞ্জ দখল।

২. সুরমার ওপুর কোইনো নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ।

৩. এয়ারফিল্ড দখল।

৪. আওয়ামী লীগ ও ছাত্রনেতাদের গ্রেফতার।

৫. পুলিশ ও ইপিআরকে নিরস্ত্র করা।

চট্টগ্রাম

২০ বালুচ, ৩১ পাঞ্জাব ব্রিগেডিয়ার ইকবাল শফির নেতৃত্বে একটি মোবাইল কলাম কুমিল্লা থেকে চট্টগ্রাম যাবে এবং চূড়ান্ত দিনে মূল বাহিনীকে রাত ১২টায় শক্তিশালী করবে। ইকবাল শফির সঙ্গে থাকবে ২৪ ফ্রন্টিয়ার ফোর্স, হেভি মর্টার, ফিল্ড কোম্পানি ইঞ্জিনিয়ার্স।

১. ৮ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইপিআর ও রিজার্ভ পুলিশকে নিরস্ত্র করা।

২. কেন্দ্রীয় পুলিশ অস্ত্র গুদাম কব্জা করা।

৩. রেডিও স্টেশন ও এক্সচেঞ্জ দখল।

৪. নেভি কমোডর মমতাজ, ৮ ইস্ট বেঙ্গলের কমান্ডিং অফিসার জানাজুয়া ও শায়গিরির সঙ্গে যোগাযোগ।

৫. ব্রিগেডিয়ার মজুমদার ও ইবিআরসি'র সিআই চৌধুরীকে গ্রেফতার।

৬. আওয়ামী লীগের ও ছাত্রনেতাদের গ্রেফতার।

অপারেশন সার্চলাইট : এক

২৫ মার্চ সকাল এগারোটায় মেজর জেনারেল খাদিম হোসেন রাজা যখন রাজনৈতিক আলোচনার সম্ভাব্য পরিণতি নিয়ে গভীর চিন্তামগ্ন ছিলেন, ঠিক সে সময় তার সবুজ টেলিফোনটি বেজে উঠল। অপর প্রান্তে ছিলেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খান। তিনি বললেন, 'খাদিম আজ রাতেই।'

নির্দেশটি খাদিমের মধ্যে কোনোরূপ উত্তেজনার সৃষ্টি করল না। তিনি হাতুড়ির আঘাত পড়ার অপেক্ষাতেই ছিলেন। প্রেসিডেন্টের সিদ্ধান্ত তার ক্ষমতা গ্রহণের সঙ্গে সমান্তরাল রেখা টানল। আদেশ বাস্তবায়নের জন্যে জেনারেল খাদিম বার্তাটি তাঁর স্টাফদের মধ্যে ছড়িয়ে দিলেন। বার্তা যতই নিচের দিকে পৌছতে থাকল, উত্তেজনাও তত বেশি বৃদ্ধি পেল। আমি দেখতে পেলাম, কয়েকজন জুনিয়র অফিসার অতিরিক্ত কিছু রিকয়েলেস রাইফেল জড় করার জন্যে টানাটানি করছে। অতিরিক্ত গোলাবারুদ পাওয়ার জন্যে অনুমতি গ্রহণ করছে। একটি বিকল মর্টার সরিয়ে ফেলা হলো। কয়েকদিন আগে রংপুর থেকে (২৯ ক্যাভালরি) ট্যাংক করে আনা হয়েছিল। রাতে ব্যবহারের জন্যে ট্যাংক চালক মরচেপড়া এম-২৪ কামানে তেল দিতে শুরু করেছে। ঢাকা শহরকে শব্দে প্রকম্পিত করার জন্যে এগুলোই যথেষ্ট।

১৪শ' ডিভিশনের প্রধান স্টাফ অফিসাররা ঢাকার বাইরের গ্যারিসনসমূহকে আঘাত হানার সঠিক সময়টি টেলিফোনের মাধ্যমে জানিয়ে দিল। বার্তা পাঠানোর জন্যে তারা একটি ব্যক্তিগত সাংকেতিক বার্তা তৈরি করেছিল। নির্দেশ হলো, সব গ্যারিসনকে এক সঙ্গেই কাজে নামতে হবে। ২৬ মার্চ রাত ১টায় চূড়ান্ত সময় নির্ধারিত হলো। হিসাব করা হয়েছিল যে, ততক্ষণে প্রেসিডেন্ট নিরাপদে করাচি পৌছে যাবেন।

অপারেশন সার্চলাইট পরিকল্পনায় দুটো সদর দফতর সৃষ্টি পরিকল্পনা আমার দৃষ্টিগোচর হলো। একটি ব্রিগেডিয়ার আরবারের অধীনে ৫৭ ব্রিগেডকে দিয়ে। মেজর জেনারেল ফরমান আলীর ওপর এ ব্রিগেডের অধিনায়কত্বসহ ঢাকা নগরী ও এর উপকণ্ঠে অপারেশনের দায়িত্ব অর্পণ করা হলো। অন্যদিকে মেজর জেনারেল খাদিমকে দেখতে হবে সমগ্র প্রদেশ। এছাড়া লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খান ও তাঁর ব্যক্তিগত স্টাফরা দ্বিতীয় রাজধানীস্থ সামরিক আইন সদর দফতরে রাত্রিযাপন করবেন ঢাকা নগরীর ভেতরে ও বাইরে নেয়া ব্যবস্থাবলির অগ্রগতি লক্ষ করার জন্যে।

যদি খাদিম ও ফরমান হামলায় অংশ নিতে অস্বীকার করেন সেক্ষেত্রে তাঁদের অপসারণ করে স্থান পূরণের জন্যে কয়েকদিন আগে জেনারেল ইয়াহিয়া মেজর জেনারেল ইফতেখার জানজুয়া ও মেজর জেনারেল এ ও মিঠ্ঠিকে ঢাকায় পাঠিয়েছিলেন। সাম্প্রতিক সময়েও তারা দু'জনেই অর্থাৎ জেনারেল খাদিম ও জেনারেল ফরমান

জেনারেল ইয়াকুবের চিন্তাধারাকেই ধারণ করে চলছিলেন। হয়তো এখনও সেই চিন্তার ধারা বহন করে চলছিলেন। তাই হামলায় অংশ নেয়ার ব্যাপারে তাদের মনোভাব জানার জন্যে জেনারেল হামিদ পৃথকভাবে খাদিম ও ফরমানের স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেন। যা হোক শেষ পর্যন্ত দুই জেনারেলই হামিদকে আশ্বাস দেন যে, তাঁরা বিশ্বস্ততার সঙ্গে আদেশ পালন করে যাবেন।

আমার মতো জুনিয়র অফিসারদের সংগ্রহ করে রাত দশটায় 'খ' অঞ্চলের সামরিক আইন প্রশাসকের সদর দফতরে (দ্বিতীয় রাজধানীতে) আনা হলো। তারা লনে সোফা ও আরাম কেদারা টেনে এনে বসল। রাতের শেষ যাম পর্যন্ত যাতে চলে, সেই পরিমাণ চা ও কফির ব্যবস্থা করার কাজে মনোনিবেশ করল। 'একমাত্র উপস্থিতি' ছাড়া আমার বিশেষ কোনো কাজ ছিল না। এ 'আউট ডোর অপারেশন কক্ষের' সামনে বেতার যন্ত্রের সজ্জিত একটি জিপ দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছিল। আকাশে তারার মেলা। শহর গভীর ঘুমে নিমগ্ন। বসন্তের ঢাকার রাত যেমন চমৎকার হয়, তেমনিই ছিল রাতটি, একমাত্র হত্যাকাণ্ড ও ধ্বংসযজ্ঞ সাধন ছাড়া অন্য সবকিছুরই জন্য পরিবেশটা চমৎকারভাবে সাজানো।

সেনাবাহিনী ছাড়া আরেক শ্রেণীর লোক ওই রাতে তৎপর ছিল। তারা আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ এবং তাদের ব্যক্তিগত বাহিনীর বাঙালি সৈনিক, পুলিশ, সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত লোকজন, ছাত্র এবং দলের স্বেচ্ছাসেবকরা। তারা মুজিব, কর্নেল ওসমানী ও গুরুত্বপূর্ণ বাঙালি অফিসারদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলছিল। প্রচণ্ড প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্যে তারা তৈরি হচ্ছিল। ঢাকায় তারা অসংখ্য 'পথ প্রতিবন্ধক' সৃষ্টি করল, যাতে সৈনিকরা শহরের ভেতরে প্রবেশ করতে গিয়ে বাধার সম্মুখীন হয়।

রাত ১১ টাকা ৩০ মিনিটে বেতার যন্ত্র সজ্জিত জিপটি প্রথমবারের মতো তীক্ষ্ণ শব্দে আর্তনাদ করে উঠল। স্থানীয় কমান্ডার (ঢাকার) হামলার নির্ধারিত সময় এগিয়ে আনার জন্যে অনুমতি চাইল। কেননা 'অন্যপক্ষ' প্রবল প্রতিরোধ সৃষ্টির চেষ্টা করছে। সবাই নিজের নিজের ঘড়ির দিকে তাকাল। প্রেসিডেন্ট তখনো কলম্বো (শ্রীলঙ্কা) ও করাচির মাঝপথে রয়েছে। জেনারেল টিক্কা সিদ্ধান্ত দিলেন। বললেন, 'ববিকে (আরবাব) বলো, যতক্ষণ পারে ততক্ষণ যেন ধৈর্য ধরে চুপচাপ থাকে।'

বরাদ্দকৃত সময়ে ব্রিগেডিয়ার আরবাবের ব্রিগেডকে নিম্নলিখিত কার্যাবলি সম্পাদন করতে হবে। পরিকল্পনাটি ছিল এই–

১৩ ফ্রন্টিয়ার ফোর্স রিজার্ভ বাহিনী হিসেবে ক্যান্টনমেন্টে থাকবে। প্রয়োজন পড়লে ক্যান্টনমেন্টকে রক্ষা করতে হবে।

ভারতের ওপর দিয়ে বিমান চলাচল নিষিদ্ধ ঘোষিত হওয়ার পর থেকে বিমানবিধ্বংসী কাজের দায়িত্ব দিয়ে ৪৩ হালকা বিমানবিধ্বংসী রেজিমেন্টকে বিমানবন্দরে নিয়োগ করা হয়েছিল, তারা বিমানবন্দর এলাকা দেখবে।

পিলখানা লাইনে পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলসের সঙ্গে অবস্থানরত ২২ বালুচ রেজিমেন্ট আনুমানিক ৫ হাজার ইপিআর-এর সদস্যকে নিরস্ত্র করবে এবং তাদের বেতার কেন্দ্র

দখল করবে। আওয়ামী লীগের মুখ্য সশস্ত্র জনশক্তির উৎস রাজারবাগ পুলিশ লাইনের ভয়ানক ধরনের উদ্দেশ্যপ্রবণ ১ হাজার পুলিশকে নিরস্ত্র করবে ৩২ পাঞ্জাব। ১৮ পাঞ্জাব নবাবপুর এলাকা ও পুরনো শহরে হামলা চালাবে– যেখানে অনেক হিন্দুর বাড়ি অস্ত্রাগারে পরিণত হয়েছে। ১৮ পাঞ্জাব, ২২ বালুচ ও ৩২ পাঞ্জাবের সমন্বয়ে গঠিত একটি সংযুক্ত দল বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে ধাবিত হবে। বিশেষ করে ইকবাল হল ও জগন্নাথ হলের দিকে এগিয়ে যাবে। এ দুটি হল আওয়ামী লীগ বিদ্রোহীদের শক্ত কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। বিশেষ সার্ভিস গ্রুপের (কমান্ডো) এক প্লাটুন সৈন্য মুজিবের বাড়ি আক্রমণ করবে এবং তাঁকে জীবন্ত পাকড়াও করবে।

ফিল্ড রেজিমেন্ট দ্বিতীয় রাজধানী এবং সংশ্লিষ্ট বিহারি বস্তি (মোহাম্মদপুর ও মিরপুর) নিয়ন্ত্রণ করবে।

শক্তি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে এম-২৪ ট্যাংকের একটি ছোট্ট স্কোয়াড্রন আগেই রাস্তায় হাজির হবে। যদি প্রয়োজন মনে করে তাহলে তারা গোলাবর্ষণ করতে পারবে।

এ সৈনিকরা তাদের জন্যে নির্দিষ্ট এলাকার গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রসমূহ পাহারা দেবে। প্রতিরোধ (যদি আসে) ধ্বংস করবে এবং তালিকাভুক্ত রাজনৈতিক নেতাদের বাড়িতে হানা দিয়ে তাঁদেরকে গ্রেফতার করবে।

উদ্দিষ্ট এলাকায় সৈনিকদের রাত একটার আগে পৌঁছতে হবে। কিন্তু কেউ কেউ মনে করল রাস্তায় দেরি হয়ে যেতে পারে। ফলে ১১টা ৩০ মিনিটে তারা সেনানিবাস থেকে যাত্রা শুরু করল। যারা শহরের ভেতর আগে থেকেই ছিল; পাহারা দিচ্ছিল রেডিও এবং টেলিভিশন কেন্দ্র, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ, বিদ্যুৎ কেন্দ্র, স্টেট ব্যাংক প্রভৃতি, তারা আঘাত হানার নির্দিষ্ট সময়ের আগেই তৈরি হয়ে বসল। ক্যান্টনমেন্ট থেকে বেরিয়ে যাওয়া প্রথম সেনাদলটি ফার্মগেটে বাধার সম্মুখীন হলো। ক্যান্টনমেন্ট থেকে এ জায়গার দূরত্ব প্রায় এক কিলোমিটার। সদ্য কাটা বড় বড় গাছের গুঁড়ি রাস্তায় আড়াআড়িভাবে ফেলে প্রথম দলের গতি থামিয়ে দেয়া হলো। পুরনো গাড়ির খোল এবং অকেজো স্টিম রোলার টেনে এনে পাশের ফাঁক আটকে দেয়া হলো। ব্যারিকেডের অপর পাশে শহরের দিকে আওয়ামী লীগের কয়েকশ' কর্মী দাঁড়িয়ে 'জয় বাংলা' স্লোগানে উচ্চকণ্ঠ ছিল। জেনারেল টিক্কার সদর দপ্তরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আমি তাদের তেজোদ্দীপ্ত বলিষ্ঠ কণ্ঠ শুনতে পাচ্ছিলাম। মুহূর্তে রাইফেলের গুলির কিছু শব্দ 'জয়বাংলা' স্লোগানের সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে গেল। একটু পরেই একটি স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের বিস্ফোরণ বাতাসে তীক্ষ্ণ শব্দ তুলল। পনের মিনিট পর গোলমালের শব্দ কমে এলো এবং স্লোগান ক্ষীণতর হতে হতে এক সময় থেমে গেল। স্পষ্টতই অস্ত্র বিজয়ী হলো। সেনাদল শহরের ভেতর এগিয়ে গেল।

এভাবে নির্দিষ্ট সময়ের আগেই সামরিক কার্যক্রম শুরু হয়ে যায়। এখন আঘাত হানার নির্ধারিত মুহূর্ত (এইচ-আওয়ার) পর্যন্ত স্থির থাকার চিহ্ন বিলুপ্ত হয়ে গেল। নরকের দরজা উন্মুক্ত হয়ে গেল। যখন প্রথম গুলিটি বর্ষিত হলো, ঠিক সেই মুহূর্তে পাকিস্তান

রেডিওর সরকারি তরঙ্গের (ওয়েভ লেংথ) কাছাকাছি একটি তরঙ্গ থেকে শেখ মুজিবুর রহমানের ক্ষীণ কণ্ঠস্বর ভেসে এলো। ওই কণ্ঠের বাণী মনে হলো আগেই রেকর্ড করে রাখা হয়েছিল। তাতে শেখ মুজিব পূর্ব পাকিস্তানকে গণপ্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশ হিসেবে ঘোষণা করলেন।[১] ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত 'বাংলাদেশ ডকুমেন্টস'-এ ওই ঘোষণার পূর্ণ বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল। ঘোষণায় বলা হয়, "এই-ই হয়তো আপনাদের জন্যে আমার শেষ বাণী হতে পারে। আজকে থেকে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন দেশ। আমি আপনাদের আহ্বান জানাচ্ছি– যে যেখানেই থাকুন, যে অবস্থাতেই থাকুন এবং হাতে যার যা আছে তা-ই নিয়ে দখলদার সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলুন। ততদিন পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যান– যতদিন না দখলদার পাকিস্তান বাহিনীর শেষ সৈনিকটি বাংলাদেশের মাটি থেকে বহিষ্কৃত হচ্ছে এবং চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হচ্ছে।"

আমি রেডিওর ওই ঘোষণাটি শুনিনি। শুধু শুনলাম, রকেট ল্যান্সারের গুলির প্রচণ্ড শব্দ। মুজিবের বাসভবন অভিমুখী রাস্তার প্রতিবন্ধক অপসারণ করছে কমান্ডোরা রকেট ল্যান্সার ছুঁড়ে। হামলাকারী প্লাটুনের সঙ্গে ছিলেন কমান্ডিং অফিসার লেফটেন্যান্ট কর্নেল জেড এ খান ও কোম্পানি কমান্ডার মেজর বিল্লাল। কমান্ডোরা মুজিবের বাড়ির কাছাকাছি হলে গেটে অবস্থানরত সশস্ত্র পাহারাদারদের গুলির সম্মুখীন হলো তারা। পাহারাদারদের দ্রুত অকেজো করে ফেলা হলো এবং মুহূর্তে পঞ্চাশ জন শক্তসামর্থ্য সৈন্য দৌড়ে চার ফুট উঁচু বাড়ির চার দেয়াল লাফিয়ে উঠানে নামল। স্টেনগানের ব্রাশ ফায়ারের মাধ্যমে তারা তাদের উপস্থিতি সংবাদ ঘোষণা করল এবং চিৎকার করে শেখ মুজিবকে বেরিয়ে আসার আহ্বান জানাল। কিন্তু কোনো উত্তর এলো না। তারপর দুপদাপ শব্দ তুলে হুড়োহুড়ি করে বারান্দায় উঠল তারা। এরপর দোতলায়। অবশেষে মুজিবের শোবার ঘর খুঁজে বের করল। দরজা বাইরে থেকে তালা মারা ছিল। একটি বুলেট ঝুলন্ত ইস্পাত খণ্ডকে বিদীর্ণ করে। সঙ্গে সঙ্গে সেটা খুলে নিচে পড়ে গেল এবং মুজিব তৎক্ষণাৎ রুম থেকে বেরিয়ে এলেন। গ্রেফতারের জন্যে নিজেকে সোপর্দ করলেন। মনে হলো, তিনি এর জন্যেই অপেক্ষা করছিলেন। হামলাকারী দল বাড়ির সবাইকে গ্রেফতার করল। সেনাবাহিনীর একটি জিপে করে তাদের সবাইকে দ্বিতীয় রাজধানীতে নিয়ে আসা হয়। কয়েক মিনিট পর ৫৭ ব্রিগেডের ব্রিগেড-মেজর জাফরের কণ্ঠ বেতার যন্ত্রে ভেসে উঠলো । আমি তার কাঁপা কাঁপা কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। তিনি বলছেন, 'বড় পাখিটা খাঁচার ভেতর... অন্যগুলো নীড়ে নেই... ওভার'।

বার্তা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাদা শার্ট গায়ে চাপানো 'বড় পাখিটাকে আমি দেখতে পেলাম। নিরাপদ হেফাজতের জন্যে সেনাবাহিনীর একটি জিপে করে তাঁকে ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। একজন জেনারেল টিক্কার কাছে জানতে চাইল যে, তাঁকে তাঁর সামনে আনতে হবে কি-না। তিনি দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, 'আমি তাঁর চেহারা দেখতে চাই না।'

সনাক্তকরণ শেষ হতেই মুজিবের বাড়ির চাকরদের ছেড়ে দেয়া হলো। অন্যদিকে রাতের জন্য তাঁকে নিয়ে যাওয়া হলো আদমজী স্কুলে। পরের দিন তাঁকে ফ্লাগ স্টাফ হাউসে সরিয়ে নেয়া হয়। সেখান থেকে তিনদিন পর তাঁকে করাচিতে নিয়ে যাওয়া হলো। পরবর্তীকালে মুজিবের বিষয়টি চূড়ান্ত নিষ্পত্তিতে যখন জটিলতা দেখা দিল (যেমন তাঁর মুক্তির জন্য আন্তর্জাতিক চাপ), সে সময় আমার বন্ধু মেজর বিল্লালের কাছে জানতে চাইলাম কেন সে উত্তেজনার মুহূর্তে মুজিবকে শেষ করে দিল না। সে বলল, 'মুজিবকে জীবন্ত গ্রেফতারের জন্য জেনারেল মিঠ্ঠি আমাকে ব্যক্তিগতভাবে নির্দেশ দিয়েছিলেন।'

যখন মুজিব আদমজী স্কুলে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন সে সময় ঢাকা নগরী গৃহযুদ্ধের তাণ্ডব যন্ত্রণায় দগ্ধ হচ্ছিল। চার ঘণ্টা যাবৎ বারান্দায় দাঁড়িয়ে আমি সেই হৃদয়বিদারক দৃশ্য দেখলাম। সেই রক্তাক্ত রাতের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো– অগ্নিশিখা আকাশকে বিদ্ধ করছে। একসময় অগ্নিবর্ণের শোকার্ত ধূম্রকুণ্ডলী ছড়িয়ে পড়ল কিন্তু পর মুহূর্তেই সেটাকে ছাপিয়ে উঠল লকলকে অগ্নিশিখা। তারকাপুঞ্জকে স্পর্শ করতে চাইছে। মনুষ্যসৃষ্ট এ অগ্নিকুণ্ডের পাশে চাঁদের উজ্জ্বল আলো আর তারকাপুঞ্জের রক্তিমাভা ম্লান হয়ে গেল। বিশালদেহী ধূম্রকুণ্ডী ও অগ্নিশিখা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর ছাড়িয়ে আকাশে মাথা তুলল। অবশ্য শহরের অন্যান্য অংশ যেমন 'দৈনিক পিপল'-এর চত্বরও এ ভয়াবহ আতসবাজি খেলার শিকারে কোনো অংশে কম নিপতিত হয়নি।

প্রায় রাত দুটোর দিকে জিপের ওপর সজ্জিত বেতার যন্ত্রটি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করল। আমাকে বার্তাটি গ্রহণের আদেশ দেয়া হলো। বেতার যন্ত্রের অপর প্রান্তে ছিল একজন ক্যাপ্টেন। সে জানাল, ইকবাল হল ও জগন্নাথ হলে তাকে প্রচণ্ড রকমের প্রতিরোধের মুখোমুখি হতে হচ্ছে। সে মুহূর্তে একজন সিনিয়র অফিসার আমার হাত থেকে যন্ত্রটি কেড়ে নিলেন এবং মাউথ পিসটা মুখের সামনে এনে চিৎকার করে বললেন, 'লক্ষ্যকে ধ্বংস করতে তোমার কতক্ষণ লাগতে পারে?'

'... চার ঘণ্টা।

'... ননসেন্স ... কি কি অস্ত্র আছে তোমার কাছে?'

'রকেট ল্যান্সার, রিকয়েলেস রাইফেলস্, মর্টার এবং...'

'ঠিক আছে, সবগুলোই ব্যবহার করো। সম্পূর্ণ এলাকাটা দু'ঘণ্টার মধ্যেই দখলের ব্যবস্থা করো।'

বিশ্ববিদ্যালয় ভবন ভোর চারটায় দখলে এলো। বছরের বেশি সময় ধরে বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রচার হয়েছে যেখানে সেটাকে দমন করতে প্রচুর সময় নেবে। সম্ভবত আদর্শ অজেয়।

শহরের বাদবাকি অংশে সৈনিকরা তাদের কাজ ভালোভাবেই সম্পাদন করল। রাজারবাগের পুলিশ বাহিনী এবং পিলখানার পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলসকে নিরস্ত্র করল। ত্রাস সৃষ্টির জন্যে অন্যান্য এলাকায় গোপন স্থান থেকে গুলি ছোঁড়া হয় এবং বিস্ফোরণ

ঘটানো হয়। যেসব বাড়ি বিদ্রোহীরা আশ্রয়স্থল হিসেবে ব্যবহার করে এবং যে বাড়িগুলো অপারেশন পরিকল্পনায় উল্লেখ করা ছিল (রাজনৈতিক নেতাদের গ্রেফতারের জন্য), সেগুলো ছাড়া আর কোনো বাড়িতে তারা প্রবেশ করে না।

২৬ মার্চের সূর্য উদিত হওয়ার আগেই সৈনিকরা তাদের মিশন সমাপ্তির রিপোর্ট প্রদান করল। জেনারেল টিক্কা ভোর পাঁচটায় সোফা ছেড়ে উঠলেন এবং নিজের অফিসে ঢুকলেন। কিছুক্ষণ পর রুমাল দিয়ে চশমার কাচ মুছতে মুছতে বেরিয়ে এলেন। ভালো করে চারদিকে দেখে নিয়ে বললেন, 'একটা মানুষও নেই!' আমি তখন বারান্দায় দাঁড়িয়ে। তাঁর স্বগতোক্তি শুনে নিশ্চিত হবার জন্যে বাইরে দৃষ্টি ফেললাম। একটি মাত্র বেপথো কুকুর দেখতে পেলাম। পেছনের দু'পায়ের মাঝে লেজটি গুটিয়ে চোরের মতো শহরের দিকে যাচ্ছে।

বেলা বাড়তেই ভুট্টোকে তাঁর হোটেল কক্ষ থেকে বের করে আনা হলো এবং সেনাবাহিনীর প্রহরায় বিমানবন্দরে নিয়ে যাওয়া হলো। ভুট্টো প্লেনে ওঠার আগে গত রাতে সেনাবাহিনীর কাজের প্রশংসা করে একটি সাধারণ মন্তব্য করলেন। সশস্ত্র প্রহরীদের প্রধান ব্রিগেডিয়ার আরবাবকে বলেন, 'আল্লাহকে অশেষ ধন্যবাদ, পাকিস্তানকে রক্ষা করা গেছে।' করাচি পৌঁছে তিনি এ উক্তির পুনরাবৃত্তি করেন।

যখন ভুট্টো এ আশাব্যঞ্জক মন্তব্য করেন তখন আমি বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার গণকবরগুলো দেখছিলাম। পাঁচ থেকে পনের ব্যাসার্ধের তিনটি গর্ত দেখতে পেলাম। সেগুলো সদ্য তোলা মাটি দিয়ে ভরাট করা হয়েছে। কোনো অফিসারই মৃতের সংখ্যা প্রকাশ করতে চাইল না। ইকবাল হলো ও জগন্নাথ হলের চারপাশ দিয়ে আমি হাঁটতে শুরু করলাম। দূর থেকে মনে হয়েছিল, হামলার ফলে দুটি ভবনই মাটির সঙ্গে মিশে গেছে আপাতদৃষ্টিতে মনে হলো, ইকবাল হলে মাত্র দুটি এবং জগন্নাথ হলে চারটি রকেট আঘাত হেনেছে। কক্ষগুলো বেশিরভাগই পুড়ে কয়লায় পরিণত হয়েছে কিন্তু দেয়াল অক্ষত আছে। কয়েক ডজন অর্ধদগ্ধ রাইফেল ও কিছু ছড়ানো ছিটানো কাগজ তখনো ধিকিধিকি জ্বলছিল। ক্ষতির পরিমাণ ছিল নিদারুণ কিন্তু জেনারেল টিক্কার সদর দফতরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে যে ভয়াবহ দৃশ্যের প্রেতাত্মা দেখেছিলাম সে রকম নিদারুণ নয়। তার সঙ্গে মিশ খায় না।

বিদেশী সংবাদপত্রগুলো কয়েক হাজার মানুষ হত্যার (বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায়) কাল্পনিক গল্প ফাঁদল। অন্যদিকে সেনাবাহিনীর অফিসাররা একশ'র কথা বলল। সরকারিভাবে চল্লিশজন নিহত হওয়ার খবর স্বীকার করা হলো।

বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা থেকে বেরিয়ে আমি ঢাকা নগরীর প্রধান প্রধান রাজপথ দিয়ে গাড়ি চালিয়ে ঘুরে বেড়ালাম। নজরে এলো বিসদৃশ মৃতদেহসমূহ পড়ে আছে ফুটপাতের ওপর কিংবা কুণ্ডলী পাকানো অবস্থায় রাস্তার কোনে। মৃতদেহের পাহাড় নজরে এলো না। এ ধরনের অভিযোগ পরবর্তীকালে করা হয়। যা হোক, এক অদ্ভুত এবং অশুভ ভাবাবেগ আমাকে গ্রাস করল। আমি এর তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারলাম না। কিন্তু বেশিক্ষণ ভাবাবেগকে ধরেও রাখতে পারলাম না। আমি আরেক এলাকার উদ্দেশে গাড়ি ছেড়ে দিলাম।

পুরনো শহরে দেখলাম, তখনো রাস্তায় কিছু কিছু ব্যারিকেড আছে। পথ প্রতিবন্ধক প্রহরায় কোনো লোক নেই। সবাই ভয়ে নিজ নিজ বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে। একটি রাস্তার এক কোনে একটি আশ্রয়চ্যুত মানুষের ছায়া দেখলাম। দ্রুত পাশের গলির মধ্যে সরে গেল। শহর ঘুরে ফিরে দেখার পর আমি ধানমণ্ডিতে মুজিবের বাড়িতে গেলাম। বাড়িটি সম্পূর্ণভাবে পরিত্যক্ত, জনহীন। জিনিসপত্র ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকাতে মনে হলো– তন্ন তন্ন করে বাড়িতে অনুসন্ধান চালানো হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উল্টে রাখা প্রমাণ সাইজের একটি প্রতিকৃতি ছাড়া তেমন স্মরণযোগ্য কিছুই আমার চোখে পড়ল না। প্রতিকৃতির ফ্রেমটি জায়গায় জায়গায় ফেটে গেছে। কিন্তু ভাবমূর্তি রয়েছে অবিকল।

বাড়ির বাইরের গেটের মূল্যবান ডেকরেশন নষ্ট হয়ে গেছে। মুজিবের শাসনের সময় আওয়ামী লীগাররা পিতলের প্লেটের ওপর ছ'দফার প্রতিরূপ ছয়টি তারকাবিশিষ্ট প্লেট গেটে বসিয়ে দেয়। কিন্তু এখন গেটের কালো রডগুলো আছে মাত্র। রড সন্নিবেশের গর্তগুলোও দৃষ্টিগোচর হলো। যে দ্রুততার সঙ্গে গৌরবোজ্জ্বল দীপ্তির বিকরণ ঘটেছিল তত দ্রুততার সঙ্গে সেটা মিলিয়ে গেল।

দুপুরের খাবার খাওয়ার জন্যে আমি তাড়াতাড়ি ক্যান্টনমেন্টে ফিরে এলাম। এখানকার পরিবেশ সম্পূর্ণ ভিন্নতর দেখলাম। শহরের হৃদয়বিদারক ঘটনা সামরিক বাহিনীর লোকজন এবং তাদের ওপর নির্ভরশীলদের স্নায়বিক অবস্থাকে স্বাভাবিক করে তুলেছে। তাদের অনুভূতি এ রকম– দীর্ঘদিন পর ঝড় থেমেছে এবং দিগন্তকে নির্মল করে অবশেষে বয়ে গেছে। স্বস্তির সঙ্গে গা এলিয়ে দিয়ে অফিসার মেসে অফিসাররা বসে গল্প করছে। কমলা লেবুর খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে ক্যাপ্টেন চৌধুরী বললেন, 'বাঙালিদের ভালো করে এবং ঠিকমত বাছাই করা হয়েছে অন্তত একটি বংশধরের জন্যে তো বটেই।' মেজর মালিক তার সঙ্গে যোগ দিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, ওরা শুধু শক্তির ভাষাকেই চেনে। ওদের ইতিহাসই এ কথা বলে।'

টীকা : ১. ডেভিড লোসাক : পাকিস্তান ক্রাইসিস, লন্ডন।

অপারেশন সার্চ লাইট : দুই

ঢাকাকে এক রাতেই অসাড় করে দেয়া হলো। কিন্তু প্রদেশের বাকি অঞ্চলের অবস্থা অপরিবর্তিত রয়ে গেল। বিশেষ করে চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও পাবনার পরিস্থিতি আমাদেরকে বেশ কয়েকদিন ধরে উদ্বেগের মধ্যে রাখে।

চট্টগ্রামে বাঙালি ও পশ্চিম পাকিস্তানি সৈনিকের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে প্রায় ৫ হাজার ও ৬ শত। বাঙালি সৈনিকদের মধ্যে ছিল ইস্ট বেঙ্গল সেন্টারে নবগঠিত অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল-এর নতুন (২,৫০০) প্রশিক্ষণপ্রাপ্তরা। ছিল ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস-এর উইং ও সেক্টর হেড কোয়ার্টার-এর রাইফেলসরা ও পুলিশ বাহিনী। আমাদের সৈনিকরা ছিল মূলত ২০ বালুচ-এর সৈনিকরাই। এদের অগ্রগামী অংশ পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যায়। চট্টগ্রামে অবাঙালিদের মধ্যে সিনিয়র অফিসার ছিলেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল ফাতেমী। তাকে আদেশ দেয়া হলো কুমিল্লা থেকে অতিরিক্ত সৈনিক না পৌঁছানো পর্যন্ত তিনি যেন পরিস্থিতি নিজের অনুকূলে ধরে রাখার চেষ্টা করেন।

প্রাথমিকভাবে বিদ্রোহীরা সব রকমের সাফল্য নিজেদের হাতের মুঠোয় নিয়ে নেয়। ফেনীর কাছাকাছি শুভপুর ব্রিজ উড়িয়ে দিয়ে কুমিল্লা থেকে আগমনকারী সেনাদলের পথ কার্যকরভাবে বন্ধ করে দেয়। চট্টগ্রাম শহর ও চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টের মূল অংশগুলো তারা নিজেদের নিয়ন্ত্রণে এনে ফেলে। ২০ বালুচের এলাকা ও নৌবাহিনীর ঘাঁটিই শুধু সরকারি কর্তৃত্বাধীনে ছিল। অষ্টম ইস্ট-বেঙ্গলের দ্বিতীয় ব্যক্তি মেজর জিয়াউর রহমান ব্রিগেডিয়ার মজুমদারের অনুপস্থিতিতে (যাকে কয়েকদিন আগে কৌশলে ঢাকায় নিয়ে আসা হয়েছিল) চট্টগ্রামের বিদ্রোহীদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। রেডিও স্টেশন প্রহরারত সরকারি সৈন্যরা সেখানে শক্তভাবেই অবস্থান করছিল। কাপ্তাই রোডে ছিল আলাদা একটা ট্রান্সমিটার। মেজর জিয়া সেটা দখল করে নিলেন এবং বাংলাদেশের 'স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র' প্রচারের জন্যে প্রাপ্ত যাবতীয় যন্ত্রপাতির ব্যবহার করলেন। চট্টগ্রামে যতক্ষণ অতিরিক্ত সৈন্য সমাবেশ ঘটানো না হচ্ছে ততক্ষণ পরিস্থিতিকে উল্টো খাতে প্রবাহিত করানোর ব্যাপারে কিছু করা যাচ্ছে না।

জিওসি মেজর জেনারেল খাদিম হোসেন চট্টগ্রামগামী কুমিল্লা সেনাদলের পথ রোধের সংবাদ শুনলেন চূড়ান্ত বিজয় দিবসের মধ্যরাত পেরিয়ে পনের মিনিটের মাথায়। ব্রিগেডিয়ার ইকবাল শফিকে আদেশ দিলেন, তিনি যেন শত্রুপক্ষের হাতে পুলটা ছেড়ে দেন এবং গিরিখাদ অতিক্রম করে চট্টগ্রামে এগিয়ে যাওয়ার পথ করে নিতে পারলেন না। পরের দিন সকাল দশটায় তিনি পুলটি দখল করেন। অতঃপর সেনাদলটি সামনে এগোতে শুরু করে। কিন্তু পথিমধ্যে চট্টগ্রাম থেকে কুড়ি কিলোমিটার দূরে কুমিল্লায় আবার তারা আক্রান্ত হয়। এতে অগ্রবর্তী কোম্পানির এগারোজন হতাহত হয়। নিহত হয় কোম্পানির কমান্ডিং অফিসার। ব্রিগেড সদর দফতর (কুমিল্লা) ও ডিভিশনাল সদর দফতরের (ঢাকা) সঙ্গে তাদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

যথাযথ সংবাদের অভাবে এ সেনাদলটির ভাগ্য সম্পর্কে ঢাকা উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। সম্ভবত এদের সবাইকে হত্যা করা হয়েছে। তাই যদি হয়, তাহলে চট্টগ্রামের অবস্থা কি দাঁড়াবে? শহরটি কি বিদ্রোহীদের হাতে থেকে যাবে? চট্টগ্রাম যদি শত্রুর নিয়ন্ত্রণে থাকে তাহলে 'অপারেশন সার্চ লাইট'-এর পরিণতি কি দাঁড়াবে?

হারিয়ে যাওয়া সেনাদলটির সন্ধান নিজেই নেবেন বলে জিওসি সিদ্ধান্ত নেন। ঠিক করেন, পরের দিন তিনি একটি হেলিকপ্টার নিয়ে বেরিয়ে পড়বেন। প্রথমে চট্টগ্রামে যাবেন। সেখান থেকে চট্টগ্রাম-কুমিল্লা রোডের ওপর দিয়ে উড়ে যাবেন। যদি ইতিমধ্যে দলটি কোনো রকম অগ্রগতি সাধন করে থাকে তাহলে তাদেরকে চট্টগ্রামের বাইরেই দেখতে পাবেন তিনি। তার হেলিকপ্টারটি ২০ বালুচ-এর এলাকায় নামার জন্যে চট্টগ্রাম পাহাড়ের ওপর এসে যেই মুহূর্তে ডানা ঝাপটাতে শুরু করেছে তখনি সেটাকে লক্ষ্য করে বিদ্রোহীরা হালকা অস্ত্র থেকে গুলিবর্ষণ করে। বিদ্রোহীরা উঁচু জায়গায় অবস্থান নিয়েছিল। গুলি লেগেছিল হেলিকপ্টারে। কিন্তু তেমন কোনো ক্ষতি হয়নি। নিরাপদে ভূমি স্পর্শ করল। জিওসি তাড়াতাড়ি নামলেন। লেফটেন্যান্ট কর্নেল ফাতেমী চট্টগ্রামের পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করলেন। কর্নেল বিজয়ী কণ্ঠে ইস্ট বেঙ্গল সেন্টার দখলের কাহিনী বর্ণনা করলেন। ৫০ জনকে হত্যা করা হয়েছে এবং ৫০০ বিদ্রোহীকে তিনি বন্দি করেছেন। কিন্তু চট্টগ্রামের বাদবাকি অঞ্চল তখনো বিদ্রোহীদের দখলে রয়ে গেছে।

জিওসি তাঁর সন্ধান অভিযাত্রায় রওনা হওয়ার উদ্দেশ্যে হেলিকপ্টারে ওঠার জন্যে কেবল পা বাড়িয়েছেন এ সময় দেখলেন, একটি ভীতি-বিহ্বল স্ত্রীলোক দাঁড়িয়ে আছে কপ্টারের কাছেই। কোলে বাচ্চা। সে একজন পশ্চিম পাকিস্তানি অফিসারের স্ত্রী। ঢাকায় যাওয়ার জন্যে বেপরোয়াভাবে চেষ্টা করছিল। জিওসি তাকে সঙ্গে নিলেন।

হেলিকপ্টারটি চালাচ্ছিলেন একজন সুযোগ্য এবং অভিজ্ঞ পাইলট– নাম মেজর লিয়াকত বোখারী। তাকে সহায়তা করছিলেন মেজর পিটার। তারা জিওসিকে কুমিল্লা বোর্ডের ওপর দিয়ে উড়িয়ে নিয়ে গেলেন। কিন্তু ঘন মেঘ থাকায় কিছু দেখতে পেলেন না তিন। যখন তারা কুমিল্লার প্রায় কাছাকাছি আসেন সে সময় জিওসি নিজের হাঁটুর ওপর ছোট একটা ম্যাপ মেলে ধরেন। বাইরে তাকালেন এবং পাইলটকে মেঘ ভেদ করে নিচে নামাতে বলেন। হেলিকপ্টারটি নিচে নামতেই জিওসি জানালা দিয়ে গলা বাড়িয়ে দেন সেনাদলের খোঁজে। সঙ্গে সঙ্গে একঝাঁক গুলি ভূমি থেকে লাফিরে উঠল। পাইলট মুহূর্তে হেলিকপ্টারকে উপরে উঠিয়ে নিলেন। তথাপি হেলিকপ্টারটির মেশিনে গুলি লাগে। একটি গুলি আঘাত হানল লেজে। অপরটি তেলের ট্যাংকি থেকে কয়েক ইঞ্চি দূরে গিয়ে কপ্টারের পেট বিদ্ধ করে। এ দুর্ঘটনায় মেজর বোখারী মোটেই বিচলিত হলেন না। জিওসিকে বললেন, 'স্যার আমি কি আরেকবার চেষ্টা করব?' 'না সোজা ঢাকায় চলো', জিওসি বললেন। মিশন ব্যর্থ হলো! যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া সেনাদলের খোঁজ মিলল না।

ইতিমধ্যে জেনারেল মিঠ্ঠি একই লক্ষ্যে অর্থাৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া সেনাদলের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে একটি কমান্ডো বাহিনীকে (ইএক্স ৩ কমান্ডো ব্যাটালিয়ন) আকাশপথে ঢাকা-চট্টগ্রামে পাঠালেন। কামান্ডো সেনারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া সেনাদলের অবস্থান কিংবা বিদ্রোহীদের অবস্থানের খবরাখবর সম্পর্কে কিছুই জানত না। তাদেরকে নিজস্ব গোয়েন্দা বিভাগের ওপর নির্ভর করতে হয়েছিল। চট্টগ্রামে রওনা হওয়ার সময় ক্যাপ্টেন হামিদ নামক এক বাঙালি অফিসার হাজির হন। কমান্ডো সেনাদলের অধিনায়ককে তিনি বলেন, 'আমি মারী থেকে এসেছি। চট্টগ্রামে যাচ্ছি আমার মা-বাবাকে দেখতে। আমি ওই এলাকাটি চিনি। গাইড হয়ে কি তোমাদের সঙ্গে আমি যেতে পারি?' তার সহায়তা গ্রহণ করা হলো।

যেদিন কমান্ডোদের (২৭ মার্চ) সন্ধান ও সংযোগ অপারেশনের কার্যক্রমে নামার কথা– সেদিনই জিওসি তাঁর কৌশলগত সদর দফতর চট্টগ্রামে সরিয়ে নেন এবং ২০ বালুচ-এর একটি সেনাদলকে একই লক্ষ্যে ভিন্ন পথে প্রেরণ করেন। এ তিনটি সেনাদলের সংযুক্তির ওপর অপারেশনের সাফল্য নির্ভর করছিল। ২০ বালুচ সেনারা তাদের এলাকা ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্রোহীদের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। কিন্তু কমান্ডোরা বাঙালি অফিসারটিকে সঙ্গে নিয়ে তাদের লক্ষ্যের দিকে ধাবিত হয়। তারা বেশি দূর এগোয়নি– এমন সময় চট্টগ্রাম-কুমিল্লা রাস্তার দু'দিককার পাহাড়ের পার্শ্বদেশ থেকে দ্বিমুখী গুলিবর্ষণের মুখোমুখি হলো। কমান্ডোরা মোট মারা গেল তেরজন। এর মধ্যে কমান্ডিং অফিসার এবং ন'জন ছিল অন্যান্য পদের । এ প্রচেষ্টা শুধু ব্যর্থই প্রমাণিত হলো না– ব্যয়বহুলও হলো বটে।

কুমিল্লার দুর্ঘটনার পর ব্রিগেডিয়ার ইকবাল শফি নিজেই সেনাদলের অধিনায়কত্ব গ্রহণ করেন। তিনি কিছু মর্টার চেয়ে পাঠালেন। ২৭ মার্চ কুমিল্লা থেকে সেগুলো পৌঁছে গেল। ২৮ মার্চ ভোরে তিনি আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিলেন। আক্রমণ সফল হলো। প্রতিরোধ ভেঙে ফেললেন এবং চট্টগ্রাম যাওয়ার রাস্তা পরিষ্কার হয়ে গেল। অবশেষে হাজী ক্যাম্পে এসে তিনি তার উপস্থিতির খবর জানালেন। হাজী ক্যাম্প চট্টগ্রাম শহরের প্রান্তে অবস্থিত। হজযাত্রীরা জাহাজে ওঠার আগে এখানে অবস্থান করেন।

হাজী ক্যাম্পের পরেই ইস্পাহানি জুট মিলস্। আমাদের সেনাদল পৌঁছার আগেই বিদ্রোহীরা এখানে এক রক্তাক্ত তাণ্ডবলীলা সংঘটিত করে। তারা অসহায় অবাঙালি নারী, পুরুষ ও শিশুদের সংগ্রহ করে জড় করে ক্লাবঘরে এবং হত্যা করে। এ ভয়াবহ ট্রাজেডি সৃষ্টি হয় যেখানটায়– কয়েকদিন পর আমি সেখানটায় যাই। দেখতে পেলাম ফ্লোর ও দেয়ালে তখনো রক্তের দাগ রয়েছে। মেয়েদের কাপড়-চোপড় ও বাচ্চাদের খেলনা তখনো জমাট বাঁধা রক্তে চুপসে আছে। লাগোয়া ভবনে ঢুকে দেখলাম, শুকনো রক্তে বেড শিট ও জাজিম শক্ত হয়ে আছে।

যখন এ ঘটনাটি ঘটল তখন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর তিনটি সেনাদল পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় ছিল। সংযুক্ত সাধন সম্ভব হলো ২৯ মার্চ। এ খুশির

সংবাদটি বেতার মারফত ঢাকাকে জানানো হলো। সংবাদ প্রাপ্তিতে অপারেশন কক্ষের অফিসাররা স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়ল। কিন্তু ইস্পাহানি জুট মিলের কসাইখানার শিকারদের জন্যে সেটা অত্যন্ত দেরিই হয়ে গেল।

চট্টগ্রামের একমাত্র সাফল্য হলো জাহাজ থেকে নয় হাজার টন গোলাবারুদ খালাসের ঘটনাটি। জাহাজটিকে আওয়ামী লীগের স্বেচ্ছাসেবকরা মধ্য মার্চ থেকে ঘেরাও করে রাখে। এ কাজ সম্পাদনের জন্যে ব্রিগেডিয়ার আনসারী ঢাকা থেকে যান এবং প্রাপ্ত যাবতীয় উপকরণ জড় করেন। এক প্লাটুন পদাতিক সৈন্য, কিছু মর্টার এবং দুটো ট্যাঙ্ক নিয়ে একটি টাস্কফার্স গঠন করেন। নৌবাহিনী একটি ডেস্ট্রয়ার ও কয়েকটি গানবোট দিয়ে সমর্থন যোগায়। চমৎকার নৈপুণ্যের সঙ্গে তিনি সফলতা অর্জন করেন। পরবর্তীতে একটি অতিরিক্ত ব্যাটালিয়নকে আকাশপথে ঢাকা থেকে চট্টগ্রামে নিয়ে যাওয়া হয়।

যদিও পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রাপ্ত যুদ্ধ উপকরণের ক্ষেত্রে অগ্রগতি সাধন করা গেল তথাপি চট্টগ্রামের মূল লড়াই তখনও শেষ হতে বাকি। সাধারণ গতিতে দখল করার আগে সর্বপ্রথম পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস্ সেক্টর হেড কোয়ার্টার ও জেলা আদালত এলাকার রিজার্ভ পুলিশ লাইনকে (পুলিশ, অবসরপ্রাপ্ত সামরিক বাহিনীর কর্মচারী ও সশস্ত্র স্বেচ্ছাসেবকদের কেন্দ্র ভূমি) উচ্ছেদ করতে হবে।

জেনারেল মিঠ্ঠি প্রথম ব্যক্তি– যিনি বেতার কেন্দ্র অভিমুখে এগিয়ে যান। ভবনটি উড়িয়ে দেওয়ার জন্যে তিনি একটি কমান্ডো বাহিনী পাঠালেন। তাঁর সৈন্যরা নদীপথ ধরে পাহাড়ের পার্শ্বদেশ দিয়ে লক্ষ্যস্থলের দিকে এগোল। নৌকার ভেতর থাকতেই তাদের ওপর গুলি বর্ষণ শুরু হয়। এবার ষোল জন মারা গেল। মিঠ্ঠির দ্বিতীয় প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলো এবং অত্যধিক ব্যয়বহুল প্রমাণিত হলো।

এরপর মেজর জেনারেল খাদিম লেফটেন্যান্ট কর্নেল ফাতেমীর অধিনায়কত্বে ২০ বালুচ-এর একটি সেনাদল পাঠালেন। পথে তিনি বিদ্রোহীদের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন এবং বেতার কেন্দ্রের ধারেকাছেও যেতে পারলেন না। অবশেষে দুটো এফ-৮৬ এস (স্যাবর) জেট ঢাকা থেকে গিয়ে আঘাত হানে। আমি কয়েক দিন পর সেখানে যাই। দেখতে পেলাম, ভবনটিকে পিল বক্স দিয়ে সুরক্ষিত করা হয়েছে। আছে বন্দুক বসানোর জন্যে ফোকরও। অন্যদিকে পরিকল্পিতভাবে তৈরি পরিখার সঙ্গে এটাকে যুক্ত করা হয়েছে। যা হোক, ভবনটি অক্ষত ছিল।

আরেকটি প্রধান লক্ষ্যস্থল ছিল পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস্-এর সদর দফতর। এক হাজার সশস্ত্র বিদ্রোহী সুদৃঢ় পরিখা তৈরি করে সেখানে অবস্থান নেয়। বেশ উঁচু জায়গায় ছিল তাদের অবস্থান। বাঁধের ধার ঘেঁষে অতি কুশলতার সঙ্গে তারা তাদের আত্মরক্ষার পরিকল্পনা রচনা করে। বাঁধের ফোকর ও পলিমাটি হালকা অস্ত্র চালনায় তাদের জন্যে সুবিধাজনক অবস্থার সৃষ্টি করেছিল। আমাদের সৈনিকরা নিজেদের অসুবিধাজনক দিক সম্পর্কে অবহিত ছিল। তাই বিদ্রোহীদের নিঃবীর্য করে দেয়ার লক্ষ্যে বড় ধরনের

আক্রমণ পরিচালনার জন্যে তৈরি হলো। আক্রমণকারী সৈন্যের সংখ্যা ছিল প্রায় এক ব্যাটালিয়ানের কাছাকাছি। এছাড়া একটি ডেস্ট্রয়ার, দু'টি গানবোট, দু'টি ট্যাঙ্ক ও ভারী মর্টারের সমর্থন পেল আক্রমণকারী সেনাদলটি। তিন ঘণ্টা প্রচণ্ড যুদ্ধের পর বিদ্রোহীদের দমন করা গেল। ঘটনাটি ঘটল ৩১ মার্চ; 'অপারেশন সার্চলাইট'-এর ষষ্ঠ দিন।

রিজার্ভ পুলিশ লাইন পরবর্তী লক্ষ্যস্থল হিসেবে নির্ধারিত হলো। খবর আসে, সেখানে ২০ হাজার রাইফেল জড় করা হয়েছে এবং বিদ্রোহীরা সেগুলো ব্যবহার করবে। এক ব্যাটালিয়ান সৈনিকের একটি দল নিয়ে আক্রমণ পরিচালনা করা হলো। কিন্তু প্রতিপক্ষ পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলসের লোকজনদের তুলনায় অনেক কম মনোবলের অধিকারী ছিল। ফলে দ্রুত তারা কাপ্তাই রোডের দিকে পিছু হটতে শুরু করে।

প্রতিরোধের এ মূল কেন্দ্রগুলোকে নিঃবীর্য করে দেয়ার ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা পালন করেন ব্রিগেডিয়ার আনসারী। পরে তাঁর এ সাহসিকতাপূর্ণ কাজের স্বীকৃতি দেয়া হয় হিলাল-ই-জুরাত[২] পুরস্কারে ভূষিত করে। এছাড়া তাঁকে প্রমোশন দিয়ে মেজর জেনারেল করা হয় (অবশ্য আগেও তিনি তাঁর সম্মুখবর্তীকে টপকে প্রমোশন পান)।

মার্চের শেষ দিকে চট্টগ্রামের মূল অপারেশন শেষ হলো। অবশ্য অবশেষটুকু মুছে ফেলার কার্যক্রম চলে এপ্রিল মাসের ৬ তারিখ পর্যন্ত। প্রদেশের যে দুটি শহরে বিদ্রোহীরা প্রাধান্য বিস্তার করে, সে দুটি কুষ্টিয়া ও পাবনা। দেখা যাক, সেখানে আমাদের সৈনিকরা কেমন করেছে।

যশোর থেকে কুষ্টিয়ার দূরত্ব ৯০ কিলোমিটার। একটি গুরুত্বপূর্ণ সড়ক ও রেল সংযোগস্থল। সেখানে আমাদের সৈনিকদের কোনো স্থায়ী ঘাঁটি ছিল না। বিজয়ের দিনে ২৭ বালুচ (যশোর) তার এক কোম্পানি সৈন্য সেখানে পাঠাল– 'শুধু আমাদের উপস্থিতি প্রতিষ্ঠার জন্যে'। সঠিক নির্দেশের অভাবে কোম্পানিটি হালকা অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে সেখানে হাজির হয়। সঙ্গে ছিল কয়েকটি রিকয়েলেস রাইফেলস্ ও সীমিত কিছু গোলাবারুদ। তারা ভেবেছিল, স্বাভাবিক অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তামূলক দায়িত্ব পালনে তারা যাচ্ছে; তাতে ভারী অস্ত্রশস্ত্রের সাধারণত প্রয়োজন পড়ে না। কোম্পানি কমান্ডার তার সৈনিকদের কয়েকটি ছোট দলে ভাগ করে এবং টেলিফোন এক্সচেঞ্জে ও ভিএইচএফ কেন্দ্রে প্রহরায় বসায়। স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতাদের গ্রেফতারের জন্যে একটি ছোট দলও পাঠায়। কিন্তু কাউকেও পাওয়া গেল না। সবাই বাড়ি-ঘর ছেড়ে চলে গেছে। প্রথম দিনে (২৬ মার্চ) কোম্পানি কমান্ডার পাঁচজন বিদ্রোহীকে হত্যা করে নিজের উপস্থিতি প্রতিষ্ঠা করল। এরপর সান্ধ্য আইন জারি করা হলো এবং বেসামরিক লোকজনের কাছ থেকে অস্ত্র সংগ্রহের পালা শুরু হলো। শান্তিতে কাটল দু'দিন।

২৮ মার্চ রাত ৯টা ৩০ মিনিটে স্থানীয় পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট ভীতিবিহ্বল মলিন চেহারায় কোম্পানি কমান্ডার মেজর শোয়েবের সামনে এসে হাজির হলো। জানাল, কুষ্টিয়া থেকে ১৬ কিলোমিটার দূরে সীমান্ত শহর চুয়াডাঙ্গায় বিদ্রোহীরা জড় হয়েছে। রাতেই শহর আক্রমণ করতে পারে। তারা পাক-বাহিনীর 'সহযোগী'দের হত্যার হুমকি

দিয়েছে। কোম্পানি কমান্ডার সৈনিকদের কাছে হুঁশিয়ারি সংকেত পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু সৈনিকরা তেমন গুরুত্ব দিল না। এমনকি পরিখা খননের ব্যাপারেও গা করল না।

প্রচণ্ড মর্টারের গুলিবর্ষণের মধ্য দিয়ে রাত ৩টা ৪৫ মিনিটে (২৯ মার্চ) আক্রমণ শুরু হলো। কাল্পনিক নিরাপত্তার জগৎ থেকে আমাদের সৈনিকরা ধাক্কা খেয়ে মাটিতে আছড়ে পড়লো। তারা দ্রুত অনুধাবন করল যে, আক্রমণকারীরা অন্য কেউ নয়– প্রথম ইস্ট বেঙ্গলের সৈনিকরাই। তাদেরকে যশোর ক্যান্টনমেন্টের বাইরে পাঠানো হয় 'ট্রেনিং-এর জন্যে'। চুয়াডাঙ্গায় গিয়ে ভারতীয় সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনীর (বিসএফ) সঙ্গে মিলিত হয় (যশোরে চারজন ও সিলেটে দু'জন বিএসএফ-এর সৈনিক পরে ধরা পড়ে)।

সকালবেলায় আমাদের সৈনিকরা পুলিশের অস্ত্রাগার দখল করে নেয়। ফলে এ জায়গাটাই যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়। বিদ্রোহীরা স্থানীয় জজের লাল ইটের তিন তলা বাড়ির ছাদে উঠে পড়ে। তারা এ অবস্থানটিকে সুবিধাজনক স্থান হিসেবে ব্যবহার কর। সেখান থেকে তারা পুলিশ ভবনের ভেতর বৃষ্টির মতো গুলিবর্ষণ করে চলল। ভোরের দিকে আমাদের পাঁচজন পুলিশ ভবনের প্রাঙ্গণে প্রাণত্যাগ করে। বেলা ৯টার দিকে আরো ১১ জন প্রাণ হারায়। এরপর আধঘণ্টার মধ্যে আরো ন'জন মারা পড়ে। মাত্র কয়েকজন জীবিত অবস্থায় এক কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে কোম্পানি সদর দফতরে এসে উপস্থিত হয়। গোলাবারুদের অভাব এবং যথাযথ ছত্রছায়ার অভাবে এ বিপর্যয় ঘটে।

কুষ্টিয়া শহরের অন্য দুটি অবস্থান– টেলিফোন এক্সচেঞ্জ ও ভিএইচএফ কেন্দ্র একই সঙ্গে সমান তীব্র আক্রমণের মুখোমুখি হয়। ফলে কোনো অবস্থানই একে-অপরের সাহায্যে এগিয়ে যেতে পারল না। কোম্পানি সদর দফতরে এক জায়গায় মারা পড়ে ১১ জন। অন্য জায়গায় প্রাণ হারায় ১৪ জন। আক্রমণের শুরুতেই ৬০ জনের মধ্যে ২৫ জনকে হত্যা করা হয়। সাহায্যের জন্যে উন্মত্তের মতো বার্তা পাঠানো হয় যশোরে। এমনকি বিমান আক্রমণেরও অনুরোধ জানানো হয়। কিন্তু কুষ্টিয়াতে কিছুই পৌঁছল না। দিনের শেষে প্রাপ্ত শেষ বার্তাটির জবাবে যশোর জানায়, 'সৈন্যরা এদিকে নিয়োজিত। নতুন সমাবেশ পাঠানো সম্ভব নয়। অস্বচ্ছ দৃষ্টিগোচরতার জন্যে বিমান আক্রমণ বাতিল করা হয়েছে... খোদা হাফেজ।'

মেজর শোয়েব পুনঃসংগঠনের জন্যে তাঁর সৈনিকদের জড় করেন। দেখেন, ১৫০ জনের মধ্যে মাত্র ৬৫ জন বেঁচে আছে। তিনি জীবিতদের নিয়ে যশোরে ফিরে যাওয়ার জন্যে কুষ্টিয়া ত্যাগের সিদ্ধান্ত নিলেন। একটা তিন টনী ট্রাক, একটা ডজ গাড়ি ও ৬ টা জিপ লাইন বন্ধ করলেন। সেনাবহর রাতেই শহর ত্যাগ করল। কোম্পানি কমান্ডার সম্মুখস্থ একটি জিপে উঠলেন। বড়জোর ২৫ কিলোমিটার পথ এগিয়েছে তারা, এমনি সময় মেজর শোয়েবকে বহনকারী জিপটিসহ সামনের গাড়িটি একটি কালভার্টে উঠতে গিয়ে ধসে খাদের ভেতর পড়ে গেল। বিদ্রোহীরা কালভার্টটি ভেঙে দিয়েছিল এবং বিভ্রম সৃষ্টির জন্যে মাটি দিয়ে ঢেকে দেয়। গাড়ির বহর যেই মুহূর্তে থেমে গেল সেই মুহূর্তেই

রাস্তার দু'পাশ থেকে প্রচণ্ড আক্রমণ শুরু হলো। আমাদের সৈনিকরা লাফ মেরে গাড়ি থেকে নামল এবং পাল্টা জবাব দিল। কিন্তু শত্রুপক্ষ বৃষ্টির মতো গুলিবর্ষণ করে চলল। ৬৫ জনের মধ্যে মাত্র ৯ জন বুকে হেঁটে গ্রামের ভেতর সরে গেল। তাদের সবাই পরে বিদ্রোহীদের হাতে ধরা পড়ে এবং নির্মম হত্যার শিকারে পরিণত হয়।

পাবনার সঙ্গে কুষ্টিয়ার বিপর্যয়ের কাহিনীর অনেক মিল রয়েছে। এখানে রাজশাহী থেকে ২৫ পাঞ্জাব-এর একটি কোম্পানি পাঠানো হলো 'শুধু আমাদের উপস্থিতি প্রতিষ্ঠার জন্যে'। তারা সঙ্গে তিন দিনের খাদ্য-সম্ভার ও প্রাথমিক পর্যায়ের গোলাবারুদ নিয়ে আসে। পৌঁছেই কোম্পানিটিকে ক্ষুদ্র দলে ভাগ করা হয় এবং অরক্ষিত কেন্দ্রসমূহের প্রহরায় বসিয়ে দেয়া হয়। প্রহরা বসল বিদ্যুৎ কেন্দ্রে; টেলিফোন এক্সচেঞ্জে। তারা স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাদের বাড়িতেও হানা দিল কিন্তু কাউকেও পাওয়া গেল না। কোম্পানি কোনো প্রতিরোধ ছাড়াই তার উপস্থিতি প্রতিষ্ঠা করল। প্রথম ৩৬ ঘণ্টা বেশ শান্তিতে কাটল তাদের। ২৭ মার্চ সন্ধ্যা ৬টায় আক্রমণ শুরু হলো। খাদের অপর পার থেকে তীব্রভাবে গুলিবর্ষণ শুরু হলো। বিদ্রোহী বাহিনী গঠিত হয়েছিল পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস্ (৯০০), পুলিশ (৩০ জন) ও আওয়ামী লীগের স্বেচ্ছাসেবকদের (৪০ জন) সমন্বয়ে। আমাদের শক্তি সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণা ছিল না। অতএব, আমাদের আঘাত না হেনে বেশ দূর থেকে গুলিবর্ষণ করে চলল। আমাদের সৈনিকরাও পাল্টা গুলি চালাল। কিন্তু রসদের স্বল্পতার দরুন মাত্রাতিরিক্ত গুলি চালানোর ব্যাপারে কড়াকড়ি আরোপ করা হলো। প্রাথমিক এ সংঘর্ষে একজন এনসিও এবং সাধারণ শ্রেণীর দু'জন সৈনিক আহত হলো। বিদ্রোহীদের একটি হালকা মেশিনগান ক্যাপ্টেন আসগরকে অনবরত হয়রান করে চলেছিল। তিনি সেটাকে স্তব্ধ করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে তিনি মেশিনগানটার অবস্থানের ওপর চাপ সৃষ্টি করলেন। একটি গ্রেনেড ছুঁড়ে সেটার ওপর আঘাত হানলেন। গ্রেনেডটি অবস্থানের ঠিক মাঝখানে গিয়ে বিস্ফোরিত হয়। একই সময় আরেকটি হালকা মেশিনগানের গুলি ক্যাপ্টেন আসগরকে বিদ্ধ করে। মারাত্মক আঘাত পেলেন তিনি। গেটের থামের আড়ালে যাওয়ার চেষ্টায় এগোন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। আক্রমণ পরিহার করা হলো। আরেকটি প্রচেষ্টা চালালেন লেফটেন্যান্ট রশীদ। কিন্তু তিনিও নিহত হলেন যুদ্ধে।

ইতিমধ্যে অবস্থানগুলোর ক্ষতি সাধন করা হয়ে গেছে। বাকি রয়েছে টেলিফোন এক্সচে টি। বিদ্রোহীরা এখানেও জমা হলো। এরপর সর্বগ্রাসী আক্রমণ শুরু হলো। হালকা অস্ত্রে সজ্জিত আত্মরক্ষাকারী দল তাদের মূর্খতাকে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করল। কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে। এর জন্যে বেশি রকম মূল্য দিতে হলো তাদের। তারা দু'জন অফিসার, তিনজন জুনিয়র কমিশনড্ অফিসার এবং অন্যান্য শ্রেণীর ৮০ জনকে হারাল। এছাড়া একজন অফিসারসহ ৩২ জন আহত হলো। বারবার সাহায্যের অনুরোধ

জানানো হলো। অনুরোধে আহতদের উদ্ধাদের জন্যে একটি হেলিকপ্টারও আসে কিন্তু মাটিতে নামতে পারল না। মেজর আসলাম বহু কষ্টে ১৮ জন সৈনিকসহ একটি রিকয়েলস রাইফেল, একটি মেশিনগান ও কিছু গোলাবারুদ নিয়ে পাবনা শহরে পৌছতে সক্ষম হন এবং জীবিতদের উদ্ধারের ব্যবস্থা করেন। আহতদের একটি ডজ গাড়িতে ওঠালেন। সম্ভাব্য আক্রমণকে এড়াতে গ্রাম্য পথ ধরে তাদেরকে রাজশাহীতে পাঠিয়ে দেন। তিনি নিজে পায়ে হেঁটে রাজশাহী অভিমুখে রওনা হন। পথে লড়াই করে এগিয়ে যাওয়ার জন্যে সঙ্গে নিলেন কিছু শক্তসামর্থ্য সৈনিক। রাস্তায় তারা প্রচণ্ড প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। ফলে গ্রামাভ্যন্তরের রাস্তা ধরল। গ্রামের ভেতর তাদেরকে তিন দিন খাদ্য ও পানীয় ছাড়াই ঘুরে বেড়াতে হয়। ১ এপ্রিল সকাল দশটার সময় তারা রাজশাহী পৌছে। তখন সৈন্য সংখ্যা ছিল মাত্র আঠারো। মেজর আসলামসহ বাদবাকিদের আসার পথেই হত্যা করা হয়।

চট্টগ্রাম, কুষ্টিয়া ও পাবনায় আমরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হই। হতাহতও হয় সবচেয়ে বেশি। চট্টগ্রাম পরিষ্কার করা হলো ৬ এপ্রিলে; কুষ্টিয়া ১৬ এপ্রিলে এবং পাবনা ১০ এপ্রিলে। অন্যান্য এলাকায়– যেখানে আমরা শক্তিশালী ছিলাম, সেসব জায়গা দখলে চলে আসে তেমন কোনো প্রতিরোধ ছাড়াই। বিদ্রোহীরা শুধু পশ্চিম পাকিস্তানি সৈনিকদেরই তাদের হিসেবের খাতায় অন্তর্ভুক্ত করেনি, বেসামরিক লোকজন ও তাদের পরিবার-পরিজনদেরকে একই ধরনের মির্মমতার সঙ্গে হত্যা করে। এখানে সব ঘটনা উল্লেখ করা সম্ভব নয়। আমি সেসব কাহিনীর একটিমাত্র দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি।

দুই ইস্ট বেঙ্গলে ছড়ানো-ছিটানোভাবে পশ্চিম পাকিস্তানি অফিসার, জেসিও এবং কিছু এনসিও (শুধু কারিগরি ক্ষেত্রে) ছিল। ঢাকা থেকে ৩০ কিলোমিটার দূরে জয়দেবপুরের একটি পুরাতন প্রাসাদে এর সদর দফতর। সাধারণ পরিকল্পনার অংশ হিসেবে পশ্চিম পাকিস্তানি ইউনিটের সঙ্গে যাতে সংঘর্ষ এড়ানো সম্ভব হয় সে জন্যে ইস্ট বেঙ্গল ব্যাটালিয়নকে ক্যান্টনমেন্ট থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়। দুই ইস্ট বেঙ্গলের তিনটি কোম্পানিকে 'ট্রেনিং-এর জন্যে' গাজীপুর, টাঙ্গাইল ও ময়মনসিংহে পাঠানো হলো। চতুর্থ কোম্পানিকে জয়দেবপুরের পুরাতন প্রাসাদে ব্যাটালিয়ন হেড কোয়ার্টারে রেখে দেয়া হয়। এই সেই স্থান– যেখানে ১৯৭০ সালে কালার প্রদান অনুষ্ঠানে আমি উপস্থিত ছিলাম।

অন্যান্য বাঙালি ইউনিটের সঙ্গে তথ্য বিনিময়ের মাধ্যমে ব্যাটালিয়নটি বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তারা তাদের আনুগত্যের প্রথম প্রকাশ ঘটাল পশ্চিম পাকিস্তানি সহকর্মী ও তাদের পরিবার-পরিজনদের হত্যার মধ্য দিয়ে। এ ব্যাটালিয়নে কুড়ি বছরের ওপর কাজ করছে এ রকম একজন– নাম সুবেদার আইয়ুব– কোনোরকমে ওই পরিকল্পিত হত্যাকে এড়িয়ে ২৮ মার্চ দুপুরের দিকে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে এসে হাজির হয়। সেই-ই ওই হত্যাকাণ্ডের প্রথম খবর দেয়। সে যখন সদর দফতরে এসে পৌছে তখন আমি তাকে দেখেছিলাম। ভয়ে সাদা হয়ে গিয়েছিল সে। তার শুকনো ঠোঁটের কোণ থুথু জমে সাদা হয়ে গেছে। সবাই তাকে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করছিল। সে এতই ভয়ার্ত ছিল যে,

হাতে চায়ের কাপও ধরে রাখতে পারছিল না। কিংবা কোনোরকম উপদেশও তার কানে প্রবেশ করছিল না। সে সাহায্য চাইল– তাৎক্ষণিক সাহায্য।

পাঞ্জাব রেজিমেন্টের এক কোম্পানি সৈন্য পাঠানো হয়। কয়েকজন তরুণ অফিসার স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে সেনাদলের সঙ্গে যোগ দেয়। ব্যাটালিয়ন সদর দফতরে পৌঁছতেই তারা তাদের জীবনের সবচেয়ে করুণ হৃদয়বিদারক দৃশ্য অবলোকন করল। ময়লা স্তূপের ওপর পাঁচটি শিশু পড়ে আছে। সবাইকে হত্যা করা হয়েছে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে এবং বেয়নেট দিয়ে পেট চিরে ফেলা হয়েছে। এই শিশুগুলোর মায়েরা আরেকটি স্তূপের ওপর পড়ে আছে। তাদেরকে জবাই করা হয়েছে। দেহ বিকৃত করা হয়েছে। এদের ভেতর থেকে সুবেদার আইয়ুব তার পরিবারের সদস্যদের খুঁজে বের করে। শোকে সে উন্মাদ হয়ে গেল– আক্ষরিক অর্থেই উন্মাদ।

প্রাসাদ প্রাঙ্গণের মধ্যে বেতার সরঞ্জাম সজ্জিত একটি জিপ দাঁড়িয়ে ছিল। টায়ার চ্যাপটা হয়ে গেছে। সিট রক্তে ডুবে গেছে। বেতার যন্ত্রটির ওপর কয়েক ফোঁটা রক্ত ছিটে লেগে আছে। ভবনের ভেতরে অনুসন্ধান চালাতে গিয়ে তারা দেখে, গোসলখানার ভেতর রক্তে ভেজা কাপড় পড়ে আছে। এই পোশাকটি গুজরানওয়ালার ক্যাপ্টেন রিয়াজের। পরে এটা নির্ণীত হয়। সাধারণ শ্রেণীর সৈনিকদের কোয়ার্টারে গিয়ে তারা দেখতে পায়, একটি তরুণী মায়ের মৃতদেহ পড়ে আছে। একটি শিশু শুকনো স্তন থেকে দুধ খাওয়ার চেষ্টা করছে। আরেকটি ঘরে গিয়ে দেখে, ধ্বংসস্তূপের ভেতর থেকে চার বছরের একটি ভয়ার্ত শিশু হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বলে ওঠে, 'আমাকে মেরো না। আমার বাবা বাড়িতে ফিরে না আসা পর্যন্ত দয়া করে আমাকে মেরো না।'

অন্যান্য কেন্দ্র থেকে একই ধরনের কাহিনী শোনা গেল। কিছু কিছু কাহিনীতে এত বেশি অতিনাটকীয়তা ছিল যে, তা বিশ্বাস করা ছিল কঠিন। অথচ এগুলো সবই সত্য ঘটনা। কয়েক মাস পর পাকিস্তান সেনাবাহিনীর চিফ অব স্টাফ জেনারেল আবদুল হামিদ আমাকে বলেন, এ দুর্ভোগের জন্যে লেফটেন্যান্ট জেনারেল ইয়াকুবই দায়ী। কেননা, 'মার্চের গোড়ার দিকে এখানে পশ্চিম পাকিস্তানি সৈনিকদের আনার ব্যাপারে তিনি বিরোধিতা করেছিলেন। সময়মত তিনি যদি শক্তি সংগঠনের সুযোগ দিতেন তাহলে প্রতিটি প্রধান শহরে এ হত্যার তাণ্ডবলীলা রোধে পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্য থাকত।'

স্মরণযোগ্য যে, রাজনৈতিক সমঝোতা যখন নাজুক পর্যায়ে উপনীত হয় সেই সময় জেনারেল ইয়াকুব সৈন্য চলাচলে বিরোধিতা করেন। যদি অনিবার্য হামলার বিষয়ে জেনারেল হামিদ ইয়াকুবের কাছে খোলাখুলি হতেন তাহলে আমার বিশ্বাস, জেনারেল ইয়াকুবের প্রতিক্রিয়া ভিন্নতর হতো। এখন যেহেতু জেনারেল ইয়াকুব আর দৃশ্যপটে নেই এবং হামলা সংঘটিত হয়েছে ও এর যাবতীয় প্রতিক্রিয়া এবং প্রতিঘাত আরম্ভ হয়েছে সেহেতু সৈন্য পাঠানোর বিষয়ে আর কোনো নিষেধাজ্ঞা থাকতে পারে না। এভাবে অপারেশন 'গ্রেট ফ্লাই ইন'-ও শুরু হয়ে গেল ২৬ মার্চের (আগে নয়) শুরু থেকে। যেসব সেনাদল পশ্চিম পাকিস্তান থেকে এখানে পৌঁছল তাদেরকে দ্রুত সেসব এলাকায় পাঠিয়ে দেয়া হলো– যেখানটা প্রচণ্ড চাপের মধ্যে ছিল।

প্রধান প্রধান শহরসমূহের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার সঙ্গে সঙ্গে প্রদেশের অন্যান্য শহরগুলোতে শক্তিশালী সেনাদল পাঠানো হয়। ১ এপ্রিল ঢাকা থেকে টাঙ্গাইল গেল একটি সেনা দল। আমিও তাদের সঙ্গে ছিলাম। আমার সেই অভিজ্ঞতার কথা বলতে চাই। প্রধান সেনাদলটি মেশিনগান সজ্জিত ট্রাকে করে যাচ্ছিল। অন্য দুটি কোম্পানি রাস্তা ছেড়ে পাঁচশ' মিটার দূর দিয়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে হাঁটছিল। কোম্পানি দুটি সম্ভাব্য সব রকমের পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য এবং অনুপ্রেরণা সৃষ্টি ও নিস্তেজকরণের রণসজ্জায় ছিল সজ্জিত। তাদের ক্রোধাগ্নি থেকে কিছুই রেহাই পাবে না। পদাতিক সেনাদলের পেছনে ফিল্ডগানধারী গোলন্দাজদের একটি অংশও ছিল। তারা বেশ সময় নিয়ে থেমে থেমে সামনের দিকে লক্ষ্য করে কিছু গোলাবর্ষণ করল। ফিল্ডগানের প্রচণ্ড শব্দ এলাকার বিদ্রোহীদের জন্যে আতংক সৃষ্টিতে যথেষ্ট ছিল।

পদাতিক দল সামান্যতম অজুহাতে কিংবা সন্দেহে গুলিবর্ষণ করে চলল। গাছের পাতা নড়ার শব্দে কিংবা কোনো বাড়ির ভেতর থেকে আসা শব্দে মেশিনগানের ব্রাশ ফায়ার হতে থাকল। যেখানে ব্রাশ ফায়ার হলো না সেখানে অন্তত রাইফেলের গুলি বর্ষণ হলো। টাঙ্গাইল রোডের ওপর করটিয়ার কাছাকাছি ছোট্ট একটি জনপদ ছিল। একটি অখ্যাত জনপদ। সেখানকার ঘটনা আমার মনে আছে। অনুসন্ধানী সৈনিকরা জনপদটির মধ্যদিকে এগিয়ে যাওয়ার সময় সেখানকার কুঁড়েঘরগুলোতে আগুন লাগিয়ে দিল। কাছাকাছি বাঁশঝাড়গুলোও আগুন থেকে রেহাই পেল না। আগুন লাগিয়ে কিছু দূর এগিয়েছে মাত্র– এ সময় আগুনের তাপে প্রচণ্ড শব্দ করে একটি বাঁশ ফাটে। সবাই এ শব্দকে লুকিয়ে থাকা 'দুষ্কৃতকারী'র রাইফেলের গুলি বলে মনে করল। সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র সেনাদলটি তাদের পুরো শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল জনপদটিকে বিদীর্ণ করে ফেলার জন্যে। যাবতীয় অস্ত্র প্রয়োগ করা হলো বাঁশঝাড়টিতে। বিপদের উৎসটিকে নিশ্চিহ্ন করার পর সতর্ক সন্ধানের আদেশ দেয়া হলো। অনুসন্ধানীরা জীবন্ত কিংবা মৃত কোনো মানুষের চিহ্ন দেখতে পেল না। বাঁশ ফাটার শব্দ অগ্রযাত্রাকে পনের মিনিট দেরি করিয়ে দিল।

করটিয়া একটি ছোটখাটো শহর। নাম না জানা নানা বুনো গাছের ঝোপঝাড়ে ঢাকা। একসারি দোকান ঘরের একটি বাজার নিয়ে এ শহরটি। লোকজন আগেই ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গেছে। কোথায় গেল তারা? খুঁজে বের করা সমস্যার ব্যাপার। সেনাদলটি সেখানে থামল। শহরটি ভালো করে খুঁজে দেখল। তারপর বাজারটি জ্বালিয়ে দিল। কয়েকটি কেরোসিনের টিনে আগুন লাগানো হলো। দ্রুত বাজারটি এক অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হলো। ধূম্রকুণ্ডলীসহ আগুন লকলকিয়ে সবুজ গাছ-গাছালি ছাড়িয়ে উপরে উঠল। সৈনিকরা তাদের কাজের ফলাফল দেখার জন্যে দেরি করল না। সামনে এগোতে শুরু করল। আমরা যখন শহরের অপর প্রান্তে পৌঁছলাম তখন খুঁটির সঙ্গে দড়িতে বাঁধা একটি কালো ভেড়া আমার দৃষ্টিগোচর হলো। দেখলাম, ভেড়াটি তার

দগ্ধিভূত ঘরে ফেরার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করছে কিন্তু পারছে না। কেননা, মুক্তির জন্যে টানাটানিতে তার গলায় বাঁধা দড়ির ফাঁস আরো শক্ত করে আটকে যাচ্ছে। মনে হলো, নিশ্চয় শ্বাসরোধে ওটার মৃত্যু ঘটবে।

কয়েক কিলোমিটার এগিয়ে গিয়ে রাস্তার পাশে ইংরেজি 'ভি' অক্ষর সাইজের দুটো পরিখা দেখতে পেলাম আমরা। পরিখা দুটো নতুন খোঁড়া এবং পরিত্যক্ত। সম্ভবত বিদ্রোহীরা আমাদেরকে মোকাবিলার উদ্দেশ্যে অবস্থান নেয়ার জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছিল। কিন্তু আমাদের অস্ত্রের প্রচণ্ড শব্দ শুনে তারা স্থান পরিত্যাগের সিদ্ধান্ত নেয়। ঘটনা যা-ই হোক, এলাকাটার একটা ব্যবস্থা না করে সামনে এগোনো গেল না। তন্ন তন্ন করে খোঁজার জন্যে যখন সৈনিকরা চারদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ল আমি তখন একটি মাটির ঘরের দিকে এগোলাম। কিভাবে লোকজন জীবনযাপন করে, তা দেখার ইচ্ছায়। ঘরের ভেতর মাটি দিয়ে সুন্দর করে লেপা– কিছুটা ধূসর বর্ণ ধারণ করে আছে। সামনের দেয়ালে দুটো শিশুর ছবি বাঁধানো। সম্ভবত দু'ভাই তারা। ঘরের ভেতর আসবাবপত্র বলতে ছিল একটিমাত্র চৌকি এবং খেজুরের পাতার তৈরি একটি মাদুর। মাদুরের ওপরে পড়ে থাকা একটি থালায় কিছু ভাত পড়ে আছে। তাতে শিশুর আঙুলের চিহ্ন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। একটি শিশু খেতে বসেছিল। তারা এখন কোথায়? কেন তারা পালিয়ে গেল?

উচ্চস্বরের কথাবার্তায় আমার ইতস্তত ভাবনার সুতো হঠাৎ করে ছিঁড়ে গেল। বাক-বিনিময় হচ্ছিল একজন সৈনিক ও একজন বৃদ্ধ বেসামরিক বাঙালির মধ্যে। বৃদ্ধকে সৈনিকেরা কলাগাছের ঝোপঝাড়ের মধ্য থেকে খুঁজে বের করে এনেছে। বৃদ্ধটি 'দুষ্কৃতকারী'দের সম্পর্কে কোনো খবর দিতে অক্ষমতা প্রকাশ করল। অন্যদিকে সহযোগিতা না করার অপরাধে সৈনিকরা তাকে মেরে ফেলার হুমকি দিল। কি হচ্ছে– দেখার জন্যে আমি এগিয়ে গেলাম।

বাঙালিটি একটি জীবন্ত কংকালের শামিল। কোমরে একখণ্ড ময়লা সুতি কাপড় জড়িয়ে লজ্জা নিবারণের চেষ্টা করেছে। মুখে দাড়ি। তবু তাঁর চেহারায় আতংকের চিহ্ন স্পষ্ট দেখতে পেলাম। আমি তার অর্ধউলঙ্গ শরীরে দিকে তাকালাম। দৃষ্টি ধীরে ধীরে পায়ের গোছায় নামিয়ে আনলাম। চোখ স্থির হলো ধুলো ভর্তি পায়ের ফোলা ফোলা শিরার ওপর গিয়ে। আমার এ অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে সে আমার দিকে মুখ ফেরাল এবং বলল, 'আমি একজন গরিব মানুষ। আমি বুঝতে পারছি না আমি কি করব। কিছুক্ষণ আগেও তারা (দুষ্কৃতকারীরা) এখানে ছিল। যদি তাদের কারো সম্পর্কে কোনো কিছু বলি তাহলে তারা আমাকে হত্যা করবে বলে হুমকি দিয়ে গেছে। এখন আপনারা আমাকে একই ভয়াবহ পরিণতির মুখে দাঁড় করিয়েছেন। আমি তাদের সম্পর্কে কিছু যদি না বলি আপনারা আমাকে মেরে ফেলার হুমকি দিচ্ছেন।' সাধারণ বাঙালির উভয় সঙ্কটমূলক অবস্থার এ হচ্ছে সার সংক্ষেপ।

সেনাদল অত্যন্ত সতর্ক ও দৃঢ়তার সঙ্গে এগিয়ে চলল। অবশেষে সন্ধ্যায় তারা টাঙ্গাইল শহরে পৌছল। সার্কিট হাউস থেকে বাংলাদেশের পতাকা অপসারণ করে জাতীয়

পতাকা ওঠানো হলো। উপস্থিতির জানান দেয়ার জন্যে আটটি গোলা বর্ষণ করা হলো এবং রাতের মতো অবস্থান নেয়া হলো। আমি ঢাকায় ফিরে এলাম।

কয়েকটি বিদ্বেষপরায়ণ বিশ্ব সংবাদ প্রতিষ্ঠান আগ্রহসহকারে ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের যে সংবাদ ছেপেছিল তা 'অপারেশন সার্চ লাইট'-এর প্রাথমিক পর্যায়ে সংঘটিত হয়নি। পরবর্তী দীর্ঘ গৃহযুদ্ধকালে তা সংঘটিত হয়। কুমিল্লা, যশোর, রংপুর, সিলেট এবং অন্যান্য জায়গা মুক্তকরণের উদ্দেশ্যে পদাতিক সেনাদল পাঠানো হয়। সাধারণত তারা পীচঢালা রাজপথ দিয়ে যেত। ফলে গ্রামাভ্যন্তরে বিদ্রোহীদের পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ থাকত অথবা সীমান্তের দিকে সরে যেত। অবশেষে ভারতীয় পৃষ্ঠপোষকদের কোলে আশ্রয় নিত। সেনাদল ও তাদের সমরসম্ভারে প্রাপ্যতার ওপরই অপারেশনের গতি নির্ভর করত।

২৬ মার্চ থেকে ৬ এপ্রিলের মধ্যে অতিরিক্ত জনবল এবং সমরসম্ভার এসে গেল। এ সময়ের মধ্যে দু'টি ডিভিশনাল সদর দফতর (ডিভিশন-৯ ও ডিভিশন-১৬), পাঁচটি ব্রিগেড হেড কোয়ার্টার, একটি কমান্ডো বাহিনী ও বারটি পদাতিক ব্যাটালিয়ন পৌঁছে গেল। তারা তাদের ভারী অস্ত্র-শস্ত্র পশ্চিম পাকিস্তানে রেখে আসে। কেননা, তারা আসে বিদ্রোহ দমন করতে– প্রকৃত যুদ্ধ করতে নয়। এপ্রিল মাসের ২৪ তারিখে এবং মে মাসের ২ তারিখে আরো দু'টি পদাতিক ব্যাটালিয়ন ও দু'টি মর্টার ইউনিট এসে গেল। ১০ এপ্রিল থেকে ২১ এপ্রিলের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে প্যারা মিলিটারি বাহিনী পাঠানো হলো। সঙ্গে আসে ইস্ট পাকিস্তান সিভিল আমর্ড বাহিনী (ইপিসিএএফ) এবং পশ্চিম পাকিস্তান রেঞ্জারস্ (ডব্লিউপিআর)। এ ছাড়া উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ থেকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক স্কাউটও আসে। তাদেরকে প্রধানত স্বপক্ষত্যাগী রাইফেলস্ ও পুলিশ বাহিনীর লোকজনদের জায়গায় বসানো হলো।

পশ্চিম পাকিস্তান থেকে যত সৈনিক আনা হয় সবাইকে 'অপারেশন সার্চ লাইট' সম্পন্ন করার কাজে নিয়োজিত করা হয়। মূলত আনুষ্ঠানিকভাবে 'অপারেশন সার্চ লাইট' বন্ধ ঘোষিত হয়নি কখনো। কিন্তু ধরে নেয়া হয়, এপ্রিল মাসে মাঝামাঝি চূড়ান্ত সাফল্য অর্জন করা যাবে। কেননা, ততদিন প্রদেশের সব প্রধান শহরগুলো দখলে এসে যাবে।

বর্ণনাকালে জীবনহানির যে সংখ্যা আমি উল্লেখ করেছি সেটা ছাড়া 'অপারেশন সার্চ লাইট'-এ ঠিক কতসংখ্যক হতাহত হয়েছিল; সে তথ্য আমি সংগ্রহ করতে সক্ষম হইনি। কিন্তু আমার হিসেবের পক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ জড়ো করে বলতে পারি, সংঘর্ষে জীবনহানির সংখ্যা বড়জোর চার অংকের কাছাকাছি পৌঁছে। যদি বিদেশী সংবাদপত্র বিশ্বকে বিশ্বাস করাতে সক্ষম হয় যে, লাখ লাখ মানুষ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে সেক্ষেত্রে এ বিশ্বাসের জন্যে দায়িত্ব বর্তায় তাদেরই ওপর– যারা ২৬ মার্চ (সন্ধ্যায়) ঢাকা থেকে বিদেশী সাংবাদিকদের বহিষ্কার করে। এতে ভারতীয় প্রোপাগাণ্ডা কিংবা একপেশে মনোভাবসম্পন্ন ট্যুরিস্টদের মনগড়া কাল্পনিক গল্পের ওপর ভিত্তি করে তারা খবর

পরিবেশন করে। যদি বিদেশী সাংবাদিকদের ২৫ মার্চের পরেও পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থানের অনুমতি দেয়া হতো তাহলে তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পক্ষপাতদুষ্ট ব্যক্তিও বাস্তব অবস্থা স্বচক্ষে দেখে যা লিখত– যদিও ঘটনা দারুণ দুঃখবহ ছিল– তথাপি লেখায় এ সম্পর্কে যে পরিমাণ হৃদয়বিদারকমূলক বর্ণনা এসেছে ততটা আসতে পারত না।[২]

টীকা : ১. পাকিস্তানের দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ বীরত্বের পুরস্কার। ২. প্রধান প্রধান শহরসমূহ দখলে আসে : পাকশী ১০ এপ্রিল, পাবনা ১০ এপ্রিল, সিলেট ১০ এপ্রিল, ঈশ্বরদী ১১ এপ্রিল, নরসিংদী ১২ এপ্রিল, চন্দ্রঘোনা ১৩ এপ্রিল, রাজশাহী ১৫ এপ্রিল, ঠাকুরগাঁও ১৫ এপ্রিল, কুষ্টিয়া ১৬ এপ্রিল, লাকসাম ১৬ এপ্রিল, চুয়াডাঙ্গা ১৭ এপ্রিল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ১৭ এপ্রিল, দর্শনা ১৯ এপ্রিল, হিলি ২১ এপ্রিল, সাতক্ষীরা ২১ এপ্রিল, গোয়ালন্দ ২১ এপ্রিল, দোহাজারী ২২ এপ্রিল, বগুড়া ২৩ এপ্রিল, রংপুর ২৬ এপ্রিল, নোয়াখালী ২৭ এপ্রিল, শান্তাহার ২৭ এপ্রিল, সিরাজগঞ্জ ২৭ এপ্রিল, মৌলভীবাজার ২৭ এপ্রিল, কক্সবাজার ১০ মে ও হাতিয়া ১১ মে।

"এর জন্যে আপনাদের লজ্জিত হওয়া উচিত... আমি খাকি পোশাকের প্রতিটি সুতোকে ঘৃণা করি। প্রতিটি পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যের চেহারায় বর্বরতার দাগ স্পষ্ট... আমি জানি না, আমার স্বামী আপনাকে এখানে কেন এনেছেন। নিশ্চয়ই আপনি সেই পশুদেরই একজন– যারা গত রাতে আমার বোনের বাসায় গিয়েছিল। কথা শেষ হতেই আমি নীরবে উঠে দাঁড়ালাম এবং বেরিয়ে এলাম।"

একজন ধনশালী বাঙালি সম্পাদক তাঁর বাড়িতে যাওয়ার জন্য আমাকে আমন্ত্রণ জানান। চলতি বছরের আগের বছরই তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু তাঁর ব্যক্তিত্বে উঁকি মারার ব্যাপারে কখনো তিনি আমার জন্যে তাঁর বাহ্যিক আনুষ্ঠানিকতাকে ঢিলে করেননি। তিনি এ অজুহাত দেখিয়ে আমাকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে গেলেন যে, আমার বেরিয়ে আসাটা তাঁর পরিবারে সবার জন্যে নৈতিক সাহস সঞ্চয়ের জন্যে সহায়ক হবে। কেননা, সম্প্রতি এক রাতে প্রতিবেশীর ঘরে হামলার ফলে তারা সম্পূর্ণরূপে ভেঙে পড়েছেন। আনুষ্ঠানিকভাবে মা, বিবাহিতা বোন এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার পর তিনি তাঁর শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বৈঠকখানায় সুন্দরী স্ত্রীকে একা রেখে বেরিয়ে গেলেন হোটেল ইন্টারকনের উদ্দেশ্যে। সেখান থেকে একজন অতিথিকে নিয়ে আসবেন। নীরবতা দ্রুত দারুণ ভারী হয়ে চেপে বসল আমাদের ওপর। মার্জিত রুচিসম্পন্না মেজবানের সঙ্গে আলাপ করার জন্যে মুখ খুললাম। বললাম, 'যা ঘটেছে তার জন্যে আমি দুঃখিত কিন্তু...'

তিনি আমার কথা কেড়ে নিলেন। বলেন, "অসংখ্য বাড়িঘর ধ্বংস করে, অসংখ্য মানুষ হত্যা করে, অসংখ্য নারী ধর্ষণ করে আপনি 'এখন' দুঃখিত।" আমি বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলাম। তিনি ফেটে পড়লেন, "এর জন্যে আপনাদের লজ্জিত হওয়া উচিত... আমি খাকি পোশাকের প্রতিটি সুতোকে ঘৃণা করি। প্রতিটি পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যের চেহারায় বর্বরতার দাগ স্পষ্ট... আমি জানি না, আমার স্বামী আপনাকে এখানে কেন এনেছেন। নিশ্চয়ই আপনি সেই পশুদেরই একজন— যারা গত রাতে আমার বোনের বাসায় গিয়েছিল।' কথা শেষ হতেই আমি নীরবে উঠে দাঁড়ালাম এবং বেরিয়ে এলাম।

এ ঘৃণার মূলোৎপাটনের জন্যে কিছুই করা হলো না। রোগীর মনস্তাত্ত্বিক আরোগ্যকরণের জন্যে খাঁটি অর্থে কোনো মনোযোগ দেয়ার প্রয়োজনীয়তা কারো ভেতর অনুভূত হলো না।' যে প্রচেষ্টাই নেয়া হলো তা সীমাবদ্ধ রইল আইন-শৃঙ্খলা পুনরুদ্ধারের মধ্যেই– যেমন, রেললাইনের মেরামত, ফেরি চলাচল, মালামাল পরিবহন এবং অভ্যন্তরীণ রুটে বিমান চলাচলের ব্যবস্থাকরণ ইত্যাদি।

...কাউন্সিল মুসলিম লীগের খাজা খয়ের উদ্দিন, কনভেনশন মুসলিম লীগের ফজলুল কাদের চৌধুরী, কাইয়ুম মুসলিম লীগের খান এ সবুর খান, জামায়াতে ইসলামীর অধ্যাপক গোলাম আযম ও নেজামে ইসলাম পার্টির মৌলভী ফরিদ আহমদ। এদের সবাইকে আওয়ামী লীগ ১৯৭০ সালের নির্বাচনে পরাজিত করে। বাঙালিদের ওপর এদের প্রভাবও ছিল সামান্যতর। সাধারণ মানুষের অনুভূতি ছিল, এরা সবাই অচল মুদ্রা। সেনাবাহিনী কর্তৃক আরেক বার চালু মুদ্রায় পরিণত হয়েছে। সেনাবাহিনীর নিজস্ব প্রয়োজনে তাদের উপস্থিতির গুরুত্ব দিল এবং তাঁদের পরামর্শ অনুসরণ করে চলল। আমি একটি বৈঠকে প্রস্তাব দিলাম যে, এসব 'অচল পয়সা'দের বক্তব্য প্রচারের পরিবর্তে তাঁদের সহযোগিতা কামনা করা শ্রেয়তর– যারা নিজস্ব ক্ষেত্রে মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। যেমন শিক্ষক, আইনজ্ঞ, শিল্পী এবং বুদ্ধিজীবী।

" সেটা আরো মৃত্যু আর ধ্বংসকেই ডেকে আনত। ঢাকার নর্দমা আটকে যেত। রাস্তায় রাস্তায় মৃতদেহের স্তূপ সৃষ্টি হতো। নাগরিক জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ত। প্লেগ এবং অন্যান্য রোগের বিস্তার ঘটত। তথাপি ফলাফল একই হতো। ৯০ হাজার বিধবা এবং পাঁচ লাখ অনাথের মুখোমুখি হওয়ার চেয়ে বরং ৯০ হাজার জীবিত যুদ্ধ বন্দিকে আমি পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাব। আত্মত্যাগটি এর চেয়ে মূল্যবান নয়।"

চাঁদপুর থেকে পালানোর সময় মেজর জেনারেল রহিম সামান্য আহত হয়েছিলেন। প্রাথমিক চিকিৎসার পর তিনি জেনারেল ফরমানের বাসভবনে ছিলেন এবং ক্রমশ সুস্থ হয়ে উঠছিলেন। বাসভবনের একটি নির্জন অংশে তিনি দিনযাপন করছিলেন। দিনটি ছিল ১২ ডিসেম্বর। সর্বাত্মক যুদ্ধের নবম দিন। সেদিন ফরমান তাঁর সঙ্গে ছিলেন। তাদের সমগ্র চেতনা স্বাভাবিকভাবেই সংকটময় দিনের ঘটনার প্রতি নিবিষ্ট ছিল। ঢাকাকে কি রক্ষা করা যাবে? তাদের মধ্যে খোলাখুলি মতবিনিময় হলো। রহিম নিশ্চিত হন যে, যুদ্ধবিরতিই হচ্ছে এর একমাত্র জবাব। রহিমের কাছ থেকে এ পরামর্শ শুনে ফরমান বিস্মিত হলেন। অথচ তিনিই সব সময় ভারতের বিরুদ্ধে দীর্ঘস্থায়ী এবং চূড়ান্ত যুদ্ধের ওকালতি করে এসেছেন। তিনি ব্যঙ্গমিশ্রিত কণ্ঠে বললেন, 'বাছ দানি মুখ গ্যায়ী–ইতনি জলদি!' (এত দ্রুত হীনবল হয়ে পড়লে)! রহিম জোর দিয়ে বললেন ইতিমধ্যে অনেক দেরি হয়ে গেছে।

আলোচনা চলাকালীন সময়েই আহত জেনারেলকে দেখার জন্যে লেফটেন্যান্ট জেনারেল নিয়াজী ও মেজর জেনারেল জামশেদ কক্ষে প্রবেশ করেন। রহিম তার প্রস্তাব নিয়াজীকেও শুনালেন। এতে তাঁর মধ্যে কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না। তখন পর্যন্ত বিদেশী সাহায্যের আশা চূড়ান্তভাবে বিলুপ্ত হয়নি। আলোচনার বিষয়কে এড়ানোর জন্যে ফরমান লাগোয়া কক্ষে সরে পড়েন।

রহিমের সঙ্গে কিছু সময় কাটিয়ে জেনারেল নিয়াজী পায়ে পায়ে ফরমানের কক্ষে ঢুকলেন। বললেন, 'তাহলে রাওয়ালপিন্ডিতে সিগন্যাল পাঠিয়ে দাও'। মনে হলো, তিনি জেনারেল রহিমের উপদেশ মেনে নিয়েছেন, যা তিনি শান্তিরকালে সর্বক্ষণ করতেন। জেনারেল নিয়াজী চাইলেন গভর্নমেন্ট হাউস প্রেসিডেন্টের কাছে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবটি পাঠাক। কিন্তু ফরমান অত্যন্ত নম্রভাবে বলেন যে, প্রয়োজনীয় সংকেত পূর্বাঞ্চলীয়

কমান্ডের সদর দফতর থেকেই যাওয়া উচিত। কিন্তু জেনারেল নিয়াজী চাপাচাপি শুরু করলেন। বললেন, 'সিগন্যাল এখান থেকে যাক বা সেখান থেকে– তাতে তেমন কিছু যায় আসে না। অন্যখানে আমার কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ আছে। তোমরা এখান থেকে পাঠিয়ে দাও।' ফরমানের 'না' বলার আগেই চিফ সেক্রেটারি মুজাফফর হোসেন রুমে প্রবেশ করলেন এবং অলক্ষ্যেই কথাবার্তা শুনে ফেলে নিয়াজীকে বললেন, 'আপনি ঠিকই বলেছেন। বার্তা এখান থেকেও পাঠানো যেতে পারে। বাক-বিতণ্ডার অবসান ঘটল।'

জেনারেল ফরমান যে বিষয়টির বিরোধিতা করেছিলেন, তা যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব সম্পর্কে নয়– এর নির্মাতা কে হবে, তা নিয়ে। একই বিষয়ের ওপর তার আগেরকার বার্তাটি রাওয়ালপিন্ডি প্রত্যাখ্যান করেছে। প্রথম বার তিনি দংশিত হয়েছেন, দ্বিতীয় বারের জন্যে ভীত হয়ে পড়েছেন। জেনারেল নিয়াজী তার জরুরি কাজ সম্পাদনের জন্যে হাওয়া হয়ে গেলেন এবং ঐতিহাসিক লিপিটির খসড়া তৈরি করলেন মুজাফফর হোসেন। ফরমানকে দেখিয়ে গভর্নরের কাছে পেশ করা হলো। তিনি খসড়া অনুমোদন করেন এবং একই সন্ধ্যায় (১২ ডিসেম্বর) প্রেসিডেন্টের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। লিপিতে 'নিরপরাধ মানুষের জীবন রক্ষার জন্যে সম্ভাব্য সবকিছু করতে ইয়াহিয়া খানের প্রতি সনির্বন্ধ অনুরোধ জানানো হলো।'

পরের দিন গভর্নর ও তাঁর মুখ্য পরামর্শকরা প্রেসিডেন্টের আদেশের জন্যে অপেক্ষা করতে থাকেন। কিন্তু মনে হলো, ব্যস্ততার কারণেই প্রেসিডেন্ট সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না। পরের দিন (১৪ ডিসেম্বর) এ বিষয়ের ওপর একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। একদিন সকাল ১১টা ১৫ মিনিটে তিনটি ভারতীয় মিগ গভর্নমেন্ট হাউস আক্রমণ করে প্রধান হলের ভারী ছাদ গুঁড়িয়ে দিল। গভর্নর দ্রুত বিমান আক্রমণ নিরোধক আশ্রয়ে ঢুকে পড়লেন এবং তাড়াহুড়ো করে পদত্যাগপত্র লিখে ফেললেন। ক্ষমতার এ কেন্দ্রবিন্দুর অধিকাংশ বাসিন্দাই আক্রমণ থেকে জীবনে বেঁচে যায়। চমৎকার করে সজ্জিত একটি এ্যাকুইরিয়ামের মাছগুলো শুধু মৃত্যুবরণ করে। ফ্লোরের উত্তপ্ত পাথর খণ্ডের ওপর লাফালাফি করতে করতে সেগুলো এক সময় মারা যায়।

গভর্নর, তাঁর মন্ত্রী এবং পশ্চিম পাকিস্তানি বেসামরিক কর্মচারীরা ১৪ ডিসেম্বর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে গিয়ে ওঠেন আন্তর্জাতিক রেডক্রস হোটেলটিকে 'নিরপেক্ষ জোন'-এ পরিণত করেছিল। পশ্চিম পাকিস্তানি ভিআইপিদের মধ্যে যারা ছিলেন, তারা হলেন চিফ সেক্রেটারি, পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেল, ঢাকার বিভাগীয় কমিশনার, প্রাদেশিক সেক্রেটারিরা এবং অন্যান্য কয়েকজন। 'নিরপেক্ষ জোন'-এ স্থান পাওয়ার জন্যে তারা লিখিতভাবে পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে সম্পর্কচ্যুতি ঘটালেন। কেননা, যুধ্যমান দেশসমূহের কোনো ব্যক্তিই রেডক্রসের আশ্রয়লাভের অধিকারী হতে পারে না।

১৪ ডিসেম্বর ছিল পূর্ব পাকিস্তান সরকারের সর্বশেষ দিন। সরকারের এবং গভর্নমেন্ট হাউসের জঞ্জাল চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে। এখন শত্রুকে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে

বাংলাদেশের জন্মকে সম্পন্ন করার জন্যে নিয়াজী এবং তাঁর বিশৃঙ্খল বাহিনীকে কবজা করতে হবে মাত্র। ইতিমধ্যে জেনারেল নিয়াজীও বিদেশী সাহায্যের আশা পরিত্যাগ করেছেন। তিনি আবার তার সেই বিষণ্নতার মাঝে ডুবে গেলেন এবং তার সুরক্ষিত ঘরের বাইরে কদাচিৎ এলেন। গতি এবং লক্ষ্য নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা ছাড়াই তিনি সময়ের রথে চেপে বসেছেন।

অতএব, তিনি পরিস্থিতির মর্ম প্রেসিডেন্টকে জানালেন (তিনি সর্বাধিনায়কও বটে) এবং তাঁর নির্দেশের আশায় উদগ্রীব অপেক্ষায় টেলিফোন করলেন। বললেন, 'স্যার, আমি প্রেসিডেন্টের কাছে কয়েকটি প্রস্তাব পাঠিয়েছি। আপনি অনুগ্রহ করে কি দেখবেন, সেগুলোর ওপর দ্রুত কোনো ব্যবস্থা নেয়া যায় কি-না।'

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক তার বহুবিধ কাজের ভেতর থেকে সময় বের করলেন এবং গভর্নর ও জেনারেল নিয়াজীকে 'যুদ্ধ বন্ধ ও জীবনহানি' রোধের জন্যে যাবতীয় ব্যবস্থাবলি গ্রহণের আদেশ দিলেন। জেনারেল নিয়াজীর কাছে প্রেরিত সংকেত বার্তায় তিনি বলেন :

'গভর্নর কর্তৃক দ্রুত প্রেরিত বার্তায় উল্লেখিত হয়েছে, প্রচণ্ড রকমের প্রতিকূলতার মধ্যে থেকেও আপনি একটি বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধ লড়েছেন জাতি আপনার জন্যে গর্বিত এবং সারাবিশ্ব আপনার প্রতি শ্রদ্ধাবান। সমস্যার একটি গ্রহণযোগ্য সমাধানের জন্যে একজন মানুষের পক্ষে সম্ভাব্য যা কিছু করার, আমি তার সবই করেছি। আপনি এখন এমন একপর্যায়ে এসে উপনীত হয়েছেন, যেখানে দাঁড়িয়ে প্রতিরোধ চালিয়ে যাওয়া মনুষ্য ক্ষমতায় সম্ভব নয়। অথবা উদ্দেশ্য সাধনে তা ফলপ্রসূও হবে না। এ শুধু আরো জীবনহানি ঘটাবে এবং ধ্বংসের কারণ হবে। আপনি এখন যুদ্ধ বন্ধসহ এবং সশস্ত্র বাহিনীর সব সদস্য সব পশ্চিম পাকিস্তানি এবং সব অনুগত ব্যক্তির জীবন রক্ষার জন্যে যাবতীয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাবলি গ্রহণ করতে পারেন। ইতিমধ্যে আমি জাতিসংঘে অগ্রসর হয়েছি এবং অবিলম্বে পূর্ব পাকিস্তানে যুদ্ধ বন্ধ এবং সশস্ত্র বাহিনীসহ অন্যান্য সবার– যারা দুষ্কৃতকারীদের লক্ষ্য হতে পারে– তাদের জীবনের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদানে ভারতকে অনুরোধ জানাবার জন্যে জাতিসংঘকে বলেছি।'

এ গুরুত্বপূর্ণ টেলিগ্রামটি রাওয়ালপিন্ডিতে তৈরি হয় ১৪ ডিসেম্বর দুপুর ৩টা ৩০ মিনিটে এবং ঢাকায় পৌঁছে (পূর্ব পাকিস্তান স্থানীয় সময়) বিকেল ৫টা ৩০ মিনিটে।

প্রেসিডেন্টের টেলিগ্রামটি কি তাৎপর্য বহন করে? এটা কি জেনারেল নিয়াজীর জন্যে আত্মসমর্পণের আদেশ? অথবা তিনি যদি চান তাহলে কি যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারেন? আমি টেলিগ্রামটির মর্মার্থ উদ্ধারের ব্যাপারটি পাঠকের ওপরই ছেড়ে দিতে চাই এবং পাঠক নিজেই এ থেকে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিন।

একই সন্ধ্যায় যুদ্ধবিরতি অর্জনের জন্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিলেন জেনারেল নিয়াজী। মধ্যস্থ হিসেবে তিনি চৈনিক ও রুশ কূটনীতিকদের কথা ভাবলেন কিন্তু অবশেষে ঢাকাস্থ মার্কিন কন্সাল জেনারেল মি. স্পিভাককে বেছে নিলেন। মি. স্পিভাকের

কাছে যাওয়ার জন্যে জেনারেল নিয়াজী মেজর জেনারেল ফরমানকে তাঁর সঙ্গী হতে বললেন। কেননা, গভর্নরের উপদেষ্টা হিসেবে বিদেশী কূটনীতিকদের সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিল। স্পিভাকের অফিসে পৌছে ফরমান সাক্ষাৎপ্রার্থীদের কক্ষে গিয়ে বসলেন আর নিয়াজী ভেতরে চলে গেলেন। জেনারেল নিয়াজী স্পিভাকের সহানুভূতি আদায়ের চেষ্টা করছিলেন উচ্চকণ্ঠে সরল প্রস্তাব প্রদানের মাধ্যমে। ফরমান তাঁর কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছিলেন। যখন ভাবলেন, 'বন্ধুত্ব' প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে তখনই তিনি আমেরিকান কন্সালকে ভারতীয়দের সঙ্গে যুদ্ধবিরতির শর্তসমূহ নিয়ে তাঁর হয়ে আলাপ-আলোচনা করার জন্যে বললেন। জবাবে মি. স্পিভাক আবেগশূন্য কণ্ঠে প্রচলিত রীতি বজায় রেখে বলেন, 'আমি আপনার হয়ে আলাপ-আলোচনা করতে পারি না। আপনি যদি চান, আমি মাত্র একটি বার্তা পাঠাতে পারি।'

জেনারেল ফরমানকে ভেতরে ডেকে আনা হলো ভারতীয় চিফ অব স্টাফ (সেনাবাহিনী) জেনারেল শ্যাম মানেকশ'র জন্যে বার্তা তৈরি করতে।

পূর্ণ পৃষ্ঠা শ্রুতিলিপি প্রদান করে তিনি অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানালেন এবং লিপিতে এ বিষয়গুলোর নিশ্চয়তা প্রদান করতে বলা হলো– পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনী ও আধা-সামরিক বাহিনীর নিরাপত্তা, মুক্তিবাহিনীর প্রতিশোধপরায়ণতা থেকে অনুগত বেসামরিক জনগণকে রক্ষা, অসুস্থ ও আহতদের চিকিৎসা এবং নিরাপত্তার বিধানকরণ। খসড়া তৈরি শেষ হতেই মি. স্পিভাক বললেন, 'কুড়ি মিনিটের মধ্যেই এটা পাঠিয়ে দেয়া হবে।' জেনারেল নিয়াজী এবং ফরমান পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডে ফিরে এলেন। উত্তরের অপেক্ষায় এইড-দ্য-ক্যাম্প ক্যাপ্টেন নিয়াজীকে বসিয়ে রেখে এলেন। তিনি সেখানে রাত ১০টা পর্যন্ত বসে থাকেন; কিন্তু কিছুই ঘটে না। ঘুমাবার আগে আরেক বার তাকে খোঁজ নিতে বলা হলো। রাতে কোনো জবাব পাওয়া গেল না।

মূলত মি. স্পিভাক বার্তাটি জেনারেল (পরে ফিল্ড মার্শাল হন) মানেকশ'কে পাঠাননি। তিনি সেটা ওয়াশিংটনে পাঠিয়ে দেন– যেখানে মার্কিন সরকার কোনো কার্যক্রম গ্রহণের আগে ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে আলোচনা করার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু ইয়াহিয়া খানকে পাওয়া যায়নি, তিনি অন্য কোথাও ডুবেছিলেন তাঁর বেদনা অপনোদনের জন্যে। পরে আমি জানতে পারি যে, তিনি ৩ ডিসেম্বর-ই যুদ্ধ সম্পর্কে উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন। সাধারণত তার সামরিক সচিব একটি মানচিত্র নিয়ে যেতেন তার কাছে। সেখানে যুদ্ধের সর্বশেষ পরিস্থিতি চিহ্নিত করা থাকত। তিনি একবার মানচিত্রের দিকে দৃকপাত করে মন্তব্য করেন, 'পূর্ব পাকিস্তানের জন্যে আমি কি করতে পারি?'

মানেকশ' ১৫ ডিসেম্বরে লিপির জবাব দেন। বলেন, যুদ্ধবিরতি গ্রহণযোগ্য হতে পারে এবং লিপিতে উল্লেখিত লোকজনদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেয়া যেতে পারে– শর্ত এই যে, পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনীকে 'আমার অগ্রবর্তী সৈনিকদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে'। ভারতীয় পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের সদর দফতর কোলকাতার বেতার তরঙ্গেও জানিয়ে দিলেন তিনি– যাতে তাদের সঙ্গে বিশদ আলোচনার জন্যে যোগাযোগ করা যায়।

মানেকশ'র বার্তা রাওয়ালপিন্ডিতে পাঠানো হলো। ১৫ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনীর চিফ অব স্টাফ জবাবে অন্যান্য কথার মধ্যে বলেন, 'শর্তসমূহ যদি আপনাদের প্রয়োজন মেটায় সেক্ষেত্রে যুদ্ধবিরতি গ্রহণের পরামর্শ দিচ্ছি... যা হোক ব্যবস্থাটি সম্পন্ন হবে স্থানীয়ভাবে– দুই কমান্ডারের মধ্যে। জাতিসংঘে যে সমাধান কামনা করা হয়েছে তার সঙ্গে এর যদি বিরোধ দেখা দেয়, সেক্ষেত্রে এটাকে বাতিল বলে গণ্য করা হবে।'

১৫ ডিসেম্বর বিকেল ৫টা থেকে পরের দিন সকাল ৯টা পর্যন্ত অস্থায়ী যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হলো দু'পক্ষ। পরে ১৬ ডিসেম্বর বিকেল ৩টা পর্যন্ত সময়সীমা বাড়ানো হলো যুদ্ধবিরতির ব্যবস্থাবলি চূড়ান্ত করার জন্যে। জেনারেল হামিদ নিয়াজীকে ইঙ্গিত দিলেন যে, তিনি যুদ্ধবিরতির শর্ত গ্রহণ করছেন এবং নিয়াজী ইঙ্গিতকে অনুমোদন হিসেবে ধরে নিলেন। অতএব, তিনি তার চিফ অব স্টাফ ব্রিগেডিয়ার বকর সিদ্দিকীকে বিভিন্ন স্থাপনায় প্রয়োজনীয় আদেশ পাঠিয়ে দেয়ার জন্যে বললেন। পূর্ণ পৃষ্ঠা বার্তায় সৈন্যদের 'বীরত্বপূর্ণ লড়াই'য়ের প্রশংসা করে স্থানীয় কমান্ডারদেরকে তাদের ভারতীয় পরিপূরক ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করে যুদ্ধবিরতির ব্যবস্থা সম্পন্ন করতে বলা হলো।

বার্তায় 'আত্মসমর্পণ' শব্দটি উল্লেখ করা হলো না। মাত্র এ বাক্যটি উদ্ধৃত করা হলো, 'দুর্ভাগ্যবশত এর সঙ্গে অস্ত্র সংবরণও জড়িত।'

বার্তাটি পাঠালেন রাত মধ্য প্রহর (১৫/১৬ ডিসেম্বর) হয়ে গেল। একই সময়ে চতুর্থ এভিয়েশন স্কোয়াড্রনের কমান্ডিং অফিসার লেফটেন্যান্ট কর্নেল লিয়াকত বোখারীকে ডেকে পাঠানো হলো সর্বশেষ ব্রিফিং দেয়ার জন্যে। সেই রাতেই তাকে আটজন পশ্চিম পাকিস্তানি নার্স এবং আটাশটি পরিবার নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের ওপর দিয়ে উড়ে আকিয়াবে (বার্মা) যেতে বলা হলো। লেফটেন্যান্ট কর্নেল লিয়াকত তার স্বভাবসুলভ ধীর-স্থিরতার সঙ্গে আদেশটি গ্রহণ করলেন– যেমন তাকে গ্রহণ করতে দেখা গেছে সমগ্র যুদ্ধের মধ্যে। সর্বাত্মক যুদ্ধের বারো দিনে পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের জন্যে তাঁর হেলিকপ্টারগুলোই ছিল মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় সেনা, গোলা-বারুদ এবং অস্ত্রশস্ত্র পরিবহনের একমাত্র অবলম্বন। তাদের শৌর্যগাথা এত বেশি উদ্দীপনামূলক যার সংক্ষিপ্তসারও এখানে করা যাবে না।

১৬ ডিসেম্বর ভোর হওয়ার আগেই হেলিকপ্টারগুলো আকাশে উড়ল। তৃতীয়টি পাখা মেলল দিনের বলায়। মেজর জেনারেল রহিম খানসহ আরো কয়েকজন হেলিকপ্টারে উঠলেন। কিন্তু নার্সদের ফেলে রাখা হলো। কেননা, তাদেরকে 'সময়মত তাদের হোস্টেল থেকে সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি'। হেলিকপ্টারগুলো নিরাপদে বার্মায় অবতরণ করে এবং অবশেষে তারা করাচি পৌঁছে যান।

এদিকে ঢাকায় চূড়ান্ত সময় ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে। টাঙ্গাইলের দিক থেকে অগ্রসরমান শত্রুসৈনিক টাঙ্গাইলের কাছাকাছি এলে আমাদের ট্যাংকের গোলার মুখোমুখি হয়। ফলে তারা ধরে নেয়, টঙ্গী-ঢাকা সড়ক দৃঢ়ভাবে সুরক্ষিত। অতএব, ভারতীয়রা মানিকগঞ্জ অভিমুখী একটি অবহেলিত সড়কে নেমে গেল। এ সড়ক আসার অবাধ সুযোগ করে দিল।

ব্রিগেডিয়ার বশীরের ওপর প্রাদেশিক রাজধানী রক্ষার (ক্যান্টনমেন্ট বাদে) দায়িত্ব অর্পিত ছিল। তিনি ১৫ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় জানান যে, মানিকগঞ্জ-ঢাকা সড়ক সম্পূর্ণরূপে অরক্ষিত। ইপিসিএএফ-এর ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা লোকজন একত্র করতে তিনি রাতের প্রথম অর্ধাংশ ব্যয় করেন এবং জোগাড় হলো প্রায় এক কোম্পানির মতো লোকজন। তাদেরকে মেজর সালামতের অধিনায়কত্বে দিয়ে শহরের বাইরে মিরপুর সেতুর কাছে পাঠালেন। মিরপুর সেতুটি প্রহরাবিহীন অবস্থায় পড়ে আছে– খবরটি মুক্তিবাহিনী ভারতীয় কমান্ডো সৈনিকদের জানিয়ে দেয়। এ খবর পেয়ে তারা ১৬ ডিসেম্বর সকাল হওয়ার কিছু আগেই ঢাকা শহরের দিকে এগিয়ে আসতে শুরু করে। কিন্তু মেজর সালামতের লোকজন ততক্ষণে অবস্থান নিয়ে নিয়েছে এবং তারা অন্ধের মতো অগ্রসরমান সৈনিকদের প্রতি গুলি চালাতে শুরু করে। কয়েকজন শত্রু সৈনিককে হত্যা করতে পেরেছে এবং দুটো ভারতীয় জিপ গাড়ি দখল করেছে বলে তারা দাবি করল।

১০১ কমিউনিকেশন জোন-এর মেজর জেনারেল নাগরা অগ্রবর্তী কমান্ডো সৈনিকদের অনুসরণ করে এগিয়ে আসছিলেন। সেতু থেকে বেশ দূরে তিনি অবস্থান নিলেন এবং লেফটেন্যান্ট জেনারেল আমীর আবদুল্লাহ খান নিয়াজীর জন্যে একটি চিরকুট পাঠালেন। চিরকুটে তিনি লেখেন— 'প্রিয় আবদুল্লাহ, আমি এখন মিরপুর সেতুর কাছে। আপনার প্রতিনিধি পাঠান।'

জেনারেল নিয়াজী সকাল ন'টায় চিরকুটটি পেলেন। সে সময় তাঁর পাশে ছিলেন মেজর জেনারেল জামশেদ, মেজর জেনারেল ফরমান ও রিয়ার অ্যাডমিরাল শরীফ। ফরমান– যিনি তখনও 'যুদ্ধ বিরতি আলোচনার' বার্তাটির সঙ্গে সেঁটে আছেন, বললেন, 'তিনিই কি (নাগরা) আলোচক দল?' জেনারেল নিয়াজী কোনো মন্তব্য করলেন না। স্পষ্ট প্রশ্ন এখন এটাই– তাঁকে অভ্যর্থনা জানানো হবে, না মোকাবেলা করা হবে। ইতিমধ্যে নাগরা ঢাকার দোরগোড়ায় এসে গেছেন।

মেজর জেনারেল ফরমান জেনারেল নিয়াজীকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার কোনো রিজার্ভ বাহিনী আছে কি?' জেনারেল নিয়াজী এবারও কিছু বললেন না। রিয়ার অ্যাডমিরাল শরীফ পাঞ্জাবিতে কথাটি অনুবাদ করে বললেন, 'কুছ পাল্লে হ্যায়? (থলেতে কিছু কি আছে?)'। নিয়াজী ঢাকার রক্ষক জামশেদের দিকে তাকালেন। জামশেদ এদিক-ওদিক মাথা নাড়ালেন– যার অর্থ হলো, 'কিছুই নেই, শূন্য'। 'যদি এই-ই হয় তাহলে যান– যা সে (নাগরা) বলে, করেন গিয়ে।' প্রায় একই সঙ্গে ফরমান ও শরীফ বলে ওঠেন।

জেনারেল নিয়াজী নাগরাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্যে মেজর জেনারেল জামশেদকে পাঠালেন। তিনি মিরপুর সেতুতে অবস্থানরত আমাদের সৈনিকদেরকে যুদ্ধ বিরতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং নাগরার নির্বিঘ্ন আগমনের সুযোগ প্রদানের আদেশ দিলেন। ভারতীয় জেনারেল কয়েকজন সৈন্য নিয়ে ঢাকায় প্রবেশ করলেন। কিন্তু ঢুকলেন

গৌরবের শিরোপা ধারণ করে এবং মূলত সেটা ছিল ঢাকার পতন। পতন ঘটল নীরবে– একজন হৃদরোগীর মতো। কোনো অঙ্গচ্ছেদন হলো না কিংবা দেহ দ্বিখণ্ডিতও হলো না। একটি স্বাধীন নগরীর সত্তা বিলুপ্ত হলো মাত্র। সিঙ্গাপুর, প্যারিস অথবা বার্লিন পতনের কাহিনীর পুনরাবৃত্তি হলো না এখানে।

ইতিমধ্যে পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের কৌশলগত সদর দফতরকে নিশ্চিহ্ন করা হলো। সব অপারেশনাল মানচিত্র সরিয়ে ফেলা হলো। প্রধান সদর দফতরটিকে ধূলি-ধূসরিত করা হলো ভারতীয়দের অভ্যর্থনা জানানোর জন্যে। কেননা, ব্রিগেডিয়ার বকর বললেন, 'এটা বেশি রকমের সুসজ্জিত।' লাগোয়া অফিসার্স মেসকে পূর্বাহ্নেই জানিয়ে দেয়া হয়েছিল 'অতিথি'দের জন্যে অতিরিক্ত খাবার তৈরি করতে। প্রশাসনে বকরের দারুণ দক্ষতা!

মধ্যাহ্নের একটু পরেই বকর বিমানবন্দরে গেলেন তার ভারতীয় বিপক্ষ মেজর জেনারেল জ্যাকবকে অভ্যর্থনা জানাতে। ইতিমধে নিয়াজী নাগরাকে তার কৌতুক পরিবেশন করে আমোদিত করতে শুরু করলেন। সেগুলো তুলে ধরতে পারলাম না বলে আমি ক্ষমাপ্রার্থী। কেননা তা ছাপাবার যোগ্য নয়।

মেজর জেনারেল জ্যাকব 'আত্মসমর্পণের দলিল' নিয়ে এলেন। জেনারেল নিয়াজী এবং চিফ অব স্টাফ সেটাকে 'যুদ্ধ বিরতি চুক্তির খসড়া' বলতেই অধিকতর পছন্দ করলেন। জ্যাকব কাগজপত্র বকরের হাতে তুলে দিলেন। তিনি সেটা মেজর জেনারেল ফরমানের সামনে পেশ করলেন। জেনারেল ফরমান 'ভারত-বাংলাদেশ যৌথ কমান্ড' সংবলিত ধারাটির ব্যাপারে আপত্তি জানালেন। জ্যাকব জানালেন, 'কিন্তু এভাবেই বিষয়টি দিল্লি থেকে এসেছে'। ভারতীয় সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের কর্নেল খেরা এক পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। বললেন, 'ওফ, এটা তো ভারত আর বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার। আপনারা তো শুধুমাত্র ভারতীয় সেনাবাহিনীর কাছেই আত্মসমর্পণ করছেন।' দলিলটি নিয়াজীর সামনে দেয়া হলো। তিনি নজর বোলালেন কিন্তু মন্তব্য করলেন না। এরপর তিনি আবার সেটা টেবিলের অপর পাশে ফরমানের দিকে ঠেলে দিলেন। ফরমান বললেন, 'এটা অধিনায়কেরই বিষয় – তিনি গ্রহণ করতে পারেন অথবা বাতিল করতে পারেন।' নিয়াজী কিছুই বললেন না। এ নীরবতাকে তাঁর সম্মতি হিসেবেই গ্রহণ করা হলো।

বিকেলের শুরু হতেই জেনারেল নিয়াজী গাড়ি করে ঢাকা বিমানবন্দরে গেলেন ভারতীয় পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ অরোরাকে অভ্যর্থনা জানানোবার জন্যে। তিনি পত্নীকে সঙ্গে নিয়ে হেলিকপ্টারে করে এলেন। এক বিরাট সংখ্যক বাঙালি জনতা ছুটে গেল তাদের 'মুক্তিদাতা' ও তাঁর পত্নীকে মাল্যভূষিত করতে। নিয়াজী তাঁকে সামরিক কায়দায় স্যালুট দিলেন এবং করমর্দন করলেন। একটি হৃদয়স্পর্শী দৃশ্য। বিজয়ী এবং বিজিত দাঁড়িয়ে আছে প্রকাশ্যে বাঙালিদের সামনে। আর বাঙালিরা অরোরার জন্যে তাদের গভীর ভালোবাসা এবং নিয়াজীর জন্যে তীব্র ঘৃণা প্রকাশে কোনোরূপ গোপনীয়তার আশ্রয় নিচ্ছে না।

উচ্চকণ্ঠে চিৎকার ও স্লোগানের মধ্য দিয়ে তাদের গাড়ি রমনা রেসকোর্স-এ (সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) এলো। আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানের জন্যে মঞ্চ তৈরি করা হয়। বিশাল ময়দানটি বাঙালি জনতার উদ্বেল আবেগে ভাসছিল। তারা প্রকাশ্যে একজন পশ্চিম পাকিস্তানি জেনারেলের দর্পচূর্ণের দৃশ্য দেখার জন্যে উদগ্রীব হয়ে উঠেছিল। এ ঘটনা বাংলাদেশের জন্মের বিন্যাস ঘটাল।

পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একটি সুসজ্জিত দলকে হাজির করা হলো বিজয়ীকে গার্ড অব অনার দেয়ার জন্যে। অন্যদিকে একটি ভারতীয় সেনাদল বিজিতের প্রহরায় নিযুক্ত হলো। প্রায় দশ লাখ বাঙালি এবং কয়েক কুড়ি বিদেশী সংবাদপত্র ও সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের সামনে লেফটেন্যান্ট জেনারেল অরোরা ও লেফটেন্যান্ট জেনারেল নিয়াজী আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর করলেন। ঢাকা দখলের নিদর্শনস্বরূপ জেনারেল নিয়াজী তার রিভলবার বের করে অরোরার হাতে তুলে দিলেন। রিভলবারের সঙ্গে তিনি পূর্ব পাকিস্তানও তুলে দিলেন।

যতক্ষণ নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণের জন্যে যথেষ্ট পরিমাণে ভারতীয় সৈন্য না পাওয়া যাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত ঢাকা গ্যারিসনকে মুক্তিবাহিনীর আক্রোশ থেকে বাঁচার জন্যে ব্যক্তিগত অস্ত্র রাখতে অনুমতি দেয়া হলো। গ্যারিসন আনুষ্ঠানিকভাবে ১৯ ডিসেম্বর বেলা ১১টায় ক্যান্টনমেন্টের গলফ ময়দানে আত্মসমর্পণ করল। ঢাকার বাইরের সৈনিকরা স্থানীয় কমান্ডারদের সুবিধামত ব্যবস্থানুযায়ী ১৬ থেকে ২২ ডিসেম্বরের মধ্যে অস্ত্র সংবরণ করল।

অল ইন্ডিয়া রেডিও আসন্ন আত্মসমর্পণের সংবাদ ১৪ ডিসেম্বরের সকাল থেকেই প্রচার করতে থাকে। এ প্রচার ঢাকাসহ অন্যান্য স্থানের অবাঙালিদের আতংকগ্রস্ত করে তোলে। তাদের অধিকাংশই নিজেদের বাড়িঘর ছেড়ে ক্যান্টনমেন্টের দিকে ছুটতে শুরু করে পাকিস্তানি সৈনিকদের ভাগ্যের সঙ্গে নিজেদের ভাগ্যকে এক সূত্রে গ্রথিত করার জন্যে। পথে তারা মুক্তিবাহিনীর হাতে ধরা পড়ে এবং জীবনলীলা সাঙ্গ হয়। সে নৃশংসতার কাহিনী লোমকূপকে শিহরিত করে। রক্ত শীতল করে দেয়। আর সে কাহিনীর সংখ্যা এত বেশি যে, তার তালিকা প্রণয়নও অসম্ভব। এ নিরপরাধ মানুষদের জীবনরক্ষার সময় ছিল না ভারতীয়দের। বিজয় অর্জিত লুণ্ঠিত দ্রব্য তারা ভারতে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে ছিল ব্যস্ত। সামরিক উপকরণ, খাদ্যবস্তু, শিল্প উৎপাদন, বাড়িঘরের মালমাত্তাসহ রেফ্রিজারেটর, কার্পেট এমনকি টেলিভিশন সেটও পাচার করা হয় রেল ও ট্রাকের বহরে করে। বাংলাদেশের রক্তকে পুরোপুরিভাবে চুষে নেয়া হলো। 'স্বাধীনতা'র ঊষাকে আহ্বান করার জন্যে পড়ে রইল মাত্র একটি কংকাল। এক বছর পর বাঙালিদের মধ্যে এ উপলব্ধির প্রকাশ ঘটতে শুরু করে।

ভারতীয়রা যা পারল– বাংলাদেশের সম্পদ তাদের দেশে নিয়ে গেল। এরপর তারা পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দিদের ভারতীয় যুদ্ধবন্দি ক্যাম্পে (পিওডব্লিউ) নিয়ে যাওয়া শুরু করল।

স্থানান্তরের এই প্রক্রিয়া ১৯৭২ সালের জানুয়ারি মাসের শেষ পর্যন্ত চলল। লেফটেন্যান্ট জেনারেল নিয়াজী, মেজর জেনারেল ফরমান, রিয়ার অ্যাডমিরাল শরীফ ও এয়ার কমোডোর ইনাম-উল-হকসহ অন্যান্য ভিআইপিরা ২০ ডিসেম্বর কোলকাতার উদ্দেশে আকাশে উড়লেন। আমাকেও তাদের সঙ্গে নেয়া হলো।

২০ ডিসেম্বর বেলা সাড়ে তিনটার সময় আমি শেষবারের মতো ঢাকা ত্যাগ করলাম। কিন্তু তফাৎ ছিল সেই সময়ের সঙ্গে– যখন ১৯৭০ সালের জানুয়ারিতে আমি প্রথমবারের মতো এখানে আসি! পাকিস্তানি সৈনিকদের খাকির জায়গায় এসেছে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সবুজ ইউনিফরম। বাঙালিরা তখনও বসে আছে বেড়ার ওপরে। হতভম্বের মতো তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে পটের পরিবর্তন। সম্ভবত তারা হতবুদ্ধি হয়ে গেছে এ পরিবর্তন দেখে যে, হয়তো আরেকটি নতুন এবং সবচেয়ে খারাপ আধিপত্যের সূচনা হতে পারে। তারা কি জোয়ালই বদলাল শুধু?

কোলকাতার ফোর্ট ইউলিয়ামে পৌছানোর সঙ্গে সঙ্গে জেনারেল নিয়াজীর সঙ্গে পেছনে ফেলে আসা যুদ্ধ স্মৃতি সম্পর্কে আলোচনার সুযোগ খুঁজতে লাগলাম। পাকিস্তানে তদন্ত কমিশনের সামনে যুদ্ধ সম্পর্কে নিজের বক্তব্য তৈরির আগেই তাঁর সঙ্গে আমি আলাপ করতে চাইলাম। তিনি খোলা মন নিয়ে বললেন কিন্তু কথায় তিক্ততা ছিল। বিবেকের কোনো তাড়না কিংবা দোদুল্যমানতা দেখা গেল না। পাকিস্তানের অঙ্গচ্ছেদনের কোনো দায়িত্ব নিতে তিনি অস্বীকার করলেন এবং এর জন্যে সরাসরি দায়ী করলেন জেনারেল ইয়াহিয়া খানকে। আমাদের আলাপচারিতার কিছু অংশ এখানে তুলে ধরছি— "আপনি কি কখনো ইয়াহিয়া খান কিংবা হামিদকে বলেছিলেন, যে সমর সম্ভার আপনাকে দেয়া হয়েছে তা আপনার ওপর অর্পিত মিশন সম্পন্নের জন্যে যথেষ্ট নয়?" আমি জিজ্ঞেস করলাম, "তাঁরা কি বেসামরিক ব্যক্তি? তারা কি জানতেন না, মাত্র তিনটি পদাতিক ডিভিশন দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ এবং বহিরাগত বিপদ মোকাবেলা সম্ভব কি-না?" "ব্যাপারটি যা-ই হোক, রণাঙ্গনের অধিনায়ক হিসেবে ঢাকা রক্ষায় আপনার অক্ষমতা একটি লাল কালির দাগ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। যদিও পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে দুর্গ রক্ষাব্যূহ কৌশল সাধ্যায়ত্তই ছিল তথাপি ঢাকাকে আপনি দুর্গ হিসেবে গড়ে তোলেননি। সেখানে সৈন্যও ছিল না।" "এর জন্যে রাওয়ালপিন্ডি দায়ী। তারা আমাকে মধ্য নভেম্বরে আটটি পদাতিক ব্যাটালিয়ন দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয় কিন্তু পাঠায় মাত্র পাঁচটি। বাকি তিনটি তখনও আসেনি অথচ পূর্বাহ্নে আমাকে না জানিয়ে পশ্চিম পাকিস্তান ফ্রন্ট খুলে দেয়া হয়।

আমি বাকি তিনটি ব্যাটালিয়ন ঢাকায় রাখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু ৩ ডিসেম্বরের পর আপনি যখন জানলেন যে, পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আর কিছু আসতে পারবে না তখন নিজস্ব সম্পদ থেকে রিজার্ভ বাহিনী সৃষ্টি করলেন না কেন?" "কেননা, একই সঙ্গে সব সেক্টরে চাপ সৃষ্টি হলো। সৈনিকদের সবখানেই নিয়োজিত রাখতে হচ্ছিল। কাউকেও

অব্যাহতি দেয়া যাচ্ছিল না।” “আপনার কাছে ঢাকায় অল্প পরিমাণ যা-ই ছিল, তা দিয়েই আপনি আরো কয়েক দিনের জন্যে যুদ্ধকে দীর্ঘায়িত করতে পারতেন।” আমি বললাম, “কি জন্যে?” তিনি জবাব দিলেন, “সেটা আরো মৃত্যু আর ধ্বংসকেই ডেকে আনত। ঢাকার নর্দমা আটকে যেত। রাস্তায় রাস্তায় মৃতদেহের স্তূপ হতো। নাগরিক জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ত। প্লেগ এবং অন্যান্য রোগের বিস্তার ঘটত। তথাপি ফলাফল একই হতো। ৯০ হাজার বিধবা এবং পাঁচ লাখ অনাথের মুখোমুখি হওয়ার চেয়ে বরং ৯০ হাজার জীবিত যুদ্ধবন্দিকে আমি পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাব। আত্মত্যাগটি এর চেয়ে মূল্যবান নয়।” “শেষটা একই রকমের হতো। কিন্তু পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ইতিহাস ভিন্নতর হতো। সামরিক অপারেশনের ইতিহাসে সেটা একটি অনুপ্রেরণা সৃষ্টিকারী অধ্যায় হিসেবে লেখা থাকত।” জেনারেল নিয়াজী জবাব দিলেন না।

আত্মসমর্পণের মূল দলিল

The PAKISTAN Eastern Command agree to surrender all PAKISTAN Armed Forces in BANGLADESH to Lieutenant General JAGJIT SINGH AURORA. General Officer Commanding in Chief of the Indian and BANGLADESH Forces in the Eastern Thetare. This surrender includes all PAKISTAN Land. air and naval forces as also all para-military forces and civil armed forces. These forces will lay down their arms and surrender at the places where they are currently located to the nearest regular troops under the comand of Lieutenant General JAGJIT SINGH AURORA.

The PAKISTAN Eastern Command shall come under the orders of Lieutenant-Ganeral JAGJIT SINGH AURORA as soon as this instrument has been signed. Disobedience of orders will be regarded as a breach of the surrender terms and will be dealt with in accordence with the accepted laws and usages of war. The decision of Lieutenant General JAGJIT SINGH AURORA will be final, should any doubt arise as to the meaning or interpretation of the surrender terms.

Lieutenant General JAGJIT SINGH AURORA gives a solemn assurance that personnel who surrender shall be treated with dignity and respect that soldiers are entitled to in accordance with the provisions of the GENEVA Convention and guarantees the safety and well-being of all PAKISTAN military and para-military forces who surrend Protection will be provided to foreign nationals. ethnic minorities and personnel of WEST PAKISTAN origin by the forces under the command of Lieutenant General JAGJIT SINGH AURORA.

Jagjit Singh

(JAGJIT SINGH AURORA)
Lieutenant General
General Officer Commanding in Chief
Indian and Bangladesh Forces in the
Eastern Theatre
16 December 1971

AAK Niazi Lt-G

(AMIR ABDULLAH KHAN NIAZI)
Lieutenant General
Martiel Law Administrator
Zone B and
Commander Saetezn
Command (PAKISTAN)
16 December 1971

"পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় সামরিক কর্তৃপক্ষ পূর্ব রণাঙ্গনে ভারতীয় এবং বাংলাদেশের সশস্ত্রবাহিনীর সর্বাধিনায়ক লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার কাছে বাংলাদেশে পাকিস্তানের সকল সশস্ত্রবাহিনীর আত্মসর্পণে স্বীকৃত হচ্ছেন। এ আত্মসমর্পণ পাকিস্তানের সকল সেনা, বিমান ও নৌবাহিনী এবং আধা-সামরিক ও বেসামরিক সশস্ত্রবাহিনীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এসব বাহিনীর সবাই– যারা যেখানে আছে, সেখানকার নিকটস্থ লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার কর্তৃত্বাধীন নিয়মিত সেনাবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ ও সব অস্ত্র সমর্পণ করবে।

এ দলিল স্বাক্ষরের সময় থেকে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় সামরিক কর্তৃপক্ষ লেফটেন্যান্ট জেনারেল অরোরার নির্দেশের অধীনস্থ বলে বিবেচিত হবে। কোনো প্রকার অবাধ্যতা আত্মসমর্পণের শর্ত ভঙ্গ হিসেবে বিবেচিত হবে এবং যুদ্ধের স্বীকৃত ও প্রচলিত রীতি অনুযায়ী ব্যবস্থা গৃহীত হবে। যদি আত্মসমর্পণের কোনো শর্তের ব্যাখ্যা বা অর্থ সম্পর্কে বিতর্ক দেখা দেয়, সে ক্ষেত্রে লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা এই আশ্বাস প্রদান করেছেন যে, আত্মসমর্পণকারী প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতি জেনেভা কনভেনশনের শর্ত অনুযায়ী একজন সৈনিকের প্রাপ্য মর্যাদা ও সম্মান প্রদর্শন করা হবে এবং আত্মসমর্পণকারী সব সামরিক ও আধা-সামরিক ব্যক্তির নিরাপত্তা ও সুব্যবস্থার অঙ্গীকার প্রদান করছেন। লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার অধীনস্থ সেনাবাহিনীর সব বিদেশী নাগরিক, সংখ্যালঘু জাতিসত্তা ও পশ্চিম পাকিস্তানি ব্যক্তিদের নিরাপত্তা প্রদান করবে।"

(জগজিৎ সিং অরোরা)
লেফটেন্যান্ট জেনারেল
জেনারেল অফিসার কমান্ডিং ইন চিফ
ভারত-বাংলাদেশ বাহিনী, পূর্ব রণাঙ্গন
১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১

(আমীর আবদুল্লাহ্ খান নিয়াজী)
লেফটেন্যান্ট জেনারেল
সামরিক আইন প্রশাসক
জোন-বি এবং কমান্ডার
পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ড (পাকিস্তান)
১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১

পরিশিষ্ট–প

আত্মসমর্পণের জন্য জেনারেল রাও ফরমান আলীর প্রতি আহ্বান

ডিসেম্বর মাসের ৮ তারিখে আকাশবাণী থেকে বাংলা ও হিন্দিতে জেনারেল মানেকশ'র বার্তা প্রচার করা শুরু হলো : 'হাতিয়ার ডাল দো', মিত্র বাহিনী আপনার সৈন্যদের চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে, আপনার বিমান বাহিনী সম্পূর্ণ ধ্বংস। আপনি অস্ত্র সমর্পণ করুন। ঘোষণায় আরও বলা হয়, বিজয়ী সৈন্যের কাছে আত্মসমর্পণে কোনো দোষ বা লজ্জা নেই। ডিসেম্বরের ১৪ তারিখে বিমান থেকেও ওই সম্পর্কে ছাপানো প্রচারপত্র পাকসেনা ছাউনিতেও বিলি করা হয়।

ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রধান স্যাম মানেকশ'র কাছ থেকে জেনারেল রাও ফরমান আলীর প্রতি বার্তা

আমি ইতিমধ্যেই দুটি বার্তা পাঠিয়েছি কিন্তু এ পর্যন্ত আপনার কাছ থেকে কোনো সাড়া পাইনি।

আমি আবার বলছি, আর প্রতিরোধ করে কোনো লাভ হবে না। বরং বিনা কারণে আপনার অভাগা সৈন্যরা প্রাণ হারাবে। আমি আশ্বাস দিচ্ছি, আপনার নিয়মিত এবং অনিয়মিত সৈন্যরা যারা আত্মসমর্পণ করবে জেনেভা চুক্তি অনুযায়ী তাদের নিরাপত্তা বিধান এবং ন্যায়বিচার করা হবে। বাংলাদেশ বাহিনী সম্পর্কে ভয়ের কোনো কারণ নেই, কারণ তাঁরা সম্পূর্ণভাবে আমার নিয়ন্ত্রণে রয়েছে এবং বাংলাদেশ সরকারও জেনেভা চুক্তি মেনে চলার জন্য তাদের প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন।

আমার সেনাবাহিনী ঢাকার কাছাকাছি পৌঁছে গেছে এবং আপনার গ্যারিসন এখন আমার কামানের আওতায়। আমি আমার সৈন্যদেরকে বিদেশী নাগরিক ও বিভিন্ন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকদের সম্পূর্ণ নিরাপত্তা বিধানের জন্য নির্দেশ দিয়েছি।

নিরর্থক রক্তক্ষয় বন্ধ করা সব সেনা নায়কের কর্তব্য এবং এই কারণেই আমি আপনাকে সব সাধারণ বেসামরিক এবং বিদেশী নাগরিককে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নিতে অনুরোধ জানাব। আমি আশা করি, আপনার নিজের লোকদের স্বার্থেই অস্ত্র ব্যবহার করে আপনার গ্যারিসনকে বিচ্ছিন্ন করতে বাধ্য করবেন না।

পরিশিষ্ট–ফ

'অভিশাপ দিচ্ছি'

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের এদেশীয় সহযোগীদের নারকীয় গণহত্যা, নারী নির্যাতন, লুণ্ঠন ও অন্যান্য ধ্বংসযজ্ঞের বিবরণ খুবই বিশ্বস্ত অবয়বে তুলে এনেছেন সাংবাদিক ও মানবাধিকার কর্মী এবং মুক্তিযুদ্ধের বিশিষ্ট গবেষক শাহরিয়ার কবির তার সম্পাদিত 'একাত্তরের দুঃসহ স্মৃতি' গ্রন্থে। আলোচ্য গ্রন্থ থেকে দুটি স্মৃতি কথা–

এক পাঞ্জাবি কুকুর, কুকুরের মতই আমার কোমরের ওপর চড়াও হয়ে আমাকে উপর্যুপরি ধর্ষণ করেছিলো।

—রাবেয়া খাতুন

'৭১-এর ২৫ মার্চের পর রাজারবাগ পুলিশ লাইনে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর গণহত্যা, নারী নির্যাতন ও ধ্বংসযজ্ঞের নারকীয় দৃশ্যাবলি প্রত্যক্ষ করেছেন সেখানকার সুইপার রাবেয়া খাতুন। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নৃশংসতা যে কত ভয়ঙ্কর হতে পারে তার একটি প্রামাণ্য দলিল রাবেয়া খাতুনের এ জবানবন্দি, যা নেয়া হয়েছে 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ও দলিলপত্র : অষ্টম খণ্ড' থেকে। এই খণ্ডে রাজারবাগের রিজার্ভ ইন্সপেক্টর অব পুলিশ আবদুল কুদ্দুস মিয়া এবং আর্মস এস আই বি আর পি সুবেদার খলিলুর রহমানের জবানবন্দিও ছাপা হয়েছে। আমরা এই তিনটি জবানবন্দি মিলিয়ে দেখেছি। রাবেয়া খাতুন নিজে ধর্ষিতা হওয়ার কারণে এবং পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নির্যাতন কাছে থেকে দেখার কারণে তাঁর জবানবন্দি আমরা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করেছি। তিনি এই জবানবন্দি দিয়েছেন '৭৪-এর ১৮ ফেব্রুয়ারি তারিখে।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে হানদার পাঞ্জাবি সেনারা যখন রাজারবাগ পুলিশ লাইনের ওপর অতর্কিতে হামলা চালায় তখন আমি রাজারবাগ পুলিশ লাইনের এস এফ কেন্টিনে ছিলাম। আসন্ন হামলার ভয়ে আমি সারাদিন পুলিশ লাইনের ব্যারাক ঝাড় দিয়ে রাতে ব্যারাকেই ছিলাম। কামান, গোলা, লাইটবোম আর ট্যাঙ্কের অবিরাম কানফাটা গর্জনে আমি ভয়ে ব্যারাকের মধ্যে কাত হয়ে পড়ে থেকে থরথরিয়ে কাঁপছিলাম। ২৬ মার্চ সকালে ওদের কামানের সামনে আমাদের বীর বাঙালি পুলিশ বাহিনী বীরের মত প্রতিরোধ করতে করতে আর টিকে থাকতে পারে নি। সকালে ওরা পলিশ লাইনের এস এফ ব্যারাকের চারদিকে আগুন লাগিয়ে দেয় এবং ব্যারাকের মধ্যে প্রবেশ করে বাঙালি পুলিশদের নাকে, মুখে, সারা দেহে বেয়নেট ও বেটন চার্জ করতে করতে ও বুটের লাথি মারতে মারতে বের করে নিয়ে আসছিলো।

ক্যান্টিনের কামরা থেকে বন্দুকের নলের মুখে আমাকেও বের করে আনা হয়, আমাকে লাথি মেরে মাটিতে ফেলে দেয়া হয় এবং আমার ওপর প্রকাশ্যে পাশবিক অত্যাচার করছিলো আর কুকুরের মত অট্টহাসিতে ফেটে পড়ছিলো। আমার ওপর উপর্যুপরি পাশবিক অত্যাচার করতে করতে যখন আমাকে একেবারে মেরে ফেলে দেয়ার উপক্রম হয় তখন আমার বাঁচবার আর কোনো উপায় না দেখে আমি আমার প্রাণ বাঁচাবার জন্য ওদের কাছে কাতর মিনতি জানাচ্ছিলাম। আমি হাউমাউ করে কাঁদছিলাম, আর বলছিলাম আমাকে মেরো না, আমি সুইপার, আমাকে মেরে ফেললে তোমাদের পায়খানা ও নর্দমা পরিষ্কার করার আর কেউ থাকবে না, তোমাদের পায়ে পড়ি তোমরা আমাকে মেরো না, মেরো না, মেরো না, আমাকে মেরে ফেললে তোমাদের পুলিশ লাইন রক্ত ও লাশের পচা গন্ধে মানুষের বাস করার অযোগ্য হয়ে পড়বে।

তখনও আমার ওপর এক পাঞ্জাবি কুকুর, কুকুরের মতই আমার কোমরের ওপর চড়াও হয়ে আমাকে উপর্যুপরি ধর্ষণ করছিলো। আমাকে এভাবে ধর্ষণ করতে করতে মেরে ফেলে দিলে রাজারবাগ পুলিশ লাইন পরিষ্কার করার জন্য আর কেউ থাকবে না। একথা ভেবে আমাকে এক পাঞ্জাবি সেনা ধমক দিয়ে বলতে থাকে, ঠিক হ্যায়, তোমকো ছোড় দিয়ে যায়েগা জারা বাদ, তোম বাহার নাহি নেকলেগা, হারওয়াকত লাইন পার হাজির রাহেগা। একথা বলে আমাকে ছেড়ে দেয়।

পাঞ্জাবি সেনারা রাজাকার ও দালালদের সাহায্যে রাজধানীর স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকা এবং অভিজাত জনপদ থেকে বহু বাঙালি যুবতী, মেয়ে, রূপসী মহিলা বেং সুন্দরী বালিকাদের জীপে, মিলিটারি ট্রাকে করে পুলিশ লাইনের বিভিন্ন ব্যারাকে জমায়েত করতে থাকে। আমি ক্যান্টিনের ড্রেন পরিষ্কার করছিলাম– দেখলাম আমার সামনে দিয়ে জীপ থেকে আর্মি ট্রাক থেকে লাইন করে বহু বালিকা যুবতী ও মহিলাকে এস এফ ক্যান্টিনের মধ্য দিয়ে ব্যারাকে রাখা হল। বহু মেয়েকে হেডকোয়ার্টার বিল্ডিং-এর ওপর তলায় রুমে নিয়ে যাওয়া হলো, আর অবশিষ্ট মেয়ে যাদেরকে ব্যারাকের ভেতরে যায়গা দেওয়া গেল না তাদের বারান্দায় দাঁড় করিয়ে রাখা হলো। অধিকাংশ মেয়ের হাতে বই ও খাতা দেখলাম, চোখ বেয়ে অঝোরে অশ্রু পড়ছিলো।

এরপরই আরম্ভ হয়ে গেল সেই বাঙালি নারীদের ওপর বীভৎস ধর্ষণ। লাইন থেকে পাঞ্জাবি সেনারা কুকুরের মত জিভ চাটতে চাটতে ব্যারাকের মধ্যে উন্মত্ত অট্টহাসিতে ফেলে দিয়ে বীভৎস ধর্ষণে লেগে গেল। কেউ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই সেই নিরীহ বালিকাদের ওপর ধর্ষণে লেগে গেল, আমি ব্যারাকে ড্রেন পরিষ্কার করার অভিনয় করছিলাম আর ওদের বীভৎস পৈশাচিকতা দেখলাম। ওদের উন্মত্ত উল্লাসের সামনে কোনো মেয়ে কোনো শব্দ পর্যন্তও করে নি, করতে পারে নি। উন্মত্ত পাঞ্জাবি সেনারা এ নিরীহ বাঙালি মেয়েদের শুধুমাত্র ধর্ষণ করেই ছেড়ে দেয় নি– আমি দেখলাম পাক সেনারা সেই মেয়েদের ওপর পাগলের মত উঠে ধর্ষণ করছে আর ধারাল দাঁত বের করে বক্ষের স্তন ও গালের মাংস কামড়াতে কামড়াতে রক্তাক্ত করে দিচ্ছে, ওদের উদ্ধত ও উন্মত্ত কামড়ে অনেক কচি মেয়ের স্তনসহ বক্ষের মাংস উঠে আসছিল, মেয়েদের গাল, পেট, ঘাড়, বক্ষ, পিঠের ও কোমরের অংশ ওদের অবিরাম দংশনে রক্তাক্ত হয়ে গেল।

যে সব বাঙালি যুবতী ওদের প্রমত্ত পাশবিকতার শিকার হতে অস্বীকার করলো দেখলাম তৎক্ষণাৎ পাঞ্জাবি সেনারা ওদেরকে চুল ধরে টেনে এনে স্তন ছো মেরে টেনে ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে ওদের যোনি ও গুহ্যদ্বারের মধ্যে বন্দুকের নল, বেয়নেট ও ধারালো ছুরি ঢুকিয়ে দিয়ে সেই বীরাঙ্গনাদের পবিত্র দেহ ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছিলো। অনেক পশু ছোট ছোট বালিকাদের ওপর পাশবিক অত্যাচার করে ওদের অসার রক্তাক্ত দেহ বাইরে এনে দু'জনে দু' পা' দুদিকে টেনে ধরে চরচড়িয়ে ছিঁড়ে ফেলে দিল। আমি দেখলাম সেখানে বসে বসে, আর ড্রেন পরিষ্কার করছিলাম, পাঞ্জাবির শ্মশানের লাশ যেকোনো কুকুরের মত মদ খেয়ে সব সময় সেখানকার যার যে মেয়ে ইচ্ছা তাকেই ধরে ধর্ষণ করছিলো।

শুধু সাধারণ পাঞ্জাবি সেনারাই এই বীভৎস পাশবিক অত্যাচারে যোগ দেয় নি, সব উচ্চ-পদস্থ পাঞ্জাবি সামরিক অফিসারই মদ খেয়ে হিংস্র বাঘের মত হয়ে দুই হাত বাঘের মত নাচাতে নাচাতে সেই উলঙ্গ বালিকা, যুবতী ও বাঙালি মহিলাদের ওপর সারাক্ষণ পর্যায়ক্রমে ধর্ষণ কাজে লিপ্ত থাকত। কোনো মেয়ে, মহিলা, যুবতীকে এক মুহূর্তের জন্য অবসর দেওয়া হয় নি, ওদের উপর্যুপরি ধর্ষণ ও অবিরাম অত্যাচারে বহু কচি বালিকা সেখানেই রক্তাক্ত দেহে কাতরাতে কাতরাতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে, পরের দিন এ সব মেয়ের লাশ অন্যান্য মেয়েদের সামনে ছুরি দিয়ে কেটে কুচি কুচি করে বস্তার মধ্যে ভরে বাইরে ফেলে দিত। এসব মহিলা, বালিকা ও যুবতীদের নির্মম পরিণতি দেখে অর্ন্যান্য মেয়েরা আরও ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ত এবং স্বেচ্ছায় পশুদের ইচ্ছার সামনে আত্মসমর্পণ করত।

যে সব মেয়ে প্রাণে বাঁচার জন্য ওদের সঙ্গে মিল দিয়ে ওদের অতৃপ্ত যৌন ক্ষুধা চরিতার্থ করার জন্য সর্বতোভাবে সহযোগিতা করে তাদের পেছনে ঘুরে বেড়িয়েছে, তাদের হাসি-তামাশায় দেহ দান করেছে তাদেরকেও ছাড়া হয়নি। পদস্থ সামরিক অফিসাররা সেই সব মেয়েদের ওপর সম্মিলিতভাবে ধর্ষণ করতে করতে হঠাৎ একদিন তাকে ধরে ছুরি দিয়ে তার স্তন কেটে, পাছার মাংস কেটে, যোনি ও গুহ্যদ্বারের মধ্যে সম্পূর্ণ ছুরি চালিয়ে দিয়ে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে ওরা আনন্দ উপভোগ করত।

এর পর উলঙ্গ মেয়েদেরকে গরুর মত লাথি মারতে মারতে, পশুর মত পিটাতে পিটাতে ওপরে হেডকোয়ার্টারে দোতলা, তেতলা ও চার তলায় উলঙ্গ অবস্থায় দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। পাঞ্জাবি সেনারা চলে যাওয়ার সময় মেয়েদেরকে লাথি মেরে আবার কামরার ভেতর ঢুকিয়ে তালা বন্ধ করে চলে যেত। এরপর বহু যুবতী মেয়েকে হেডকোয়ার্টারের ওপর তলায় বারান্দার মোটা লোহার তারের ওপর চুলের সঙ্গে বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা হয়– প্রতিদিন পাঞ্জাবিরা সেখানে যাতায়াত করত। সেই ঝুলন্ত উলঙ্গ যুবতীদের কেউ এসে তাদের উলঙ্গ দেহের কোমরের মাংস বেটন দিয়ে উন্মত্তভাবে আঘাত করতে থাকত, কেউ তাদের বক্ষের স্তন কেটে নিয়ে যেত, কেউ হাসতে হাসতে তাদের যোনিপথে লাঠি ঢুকিয়ে আনন্দ উপভোগ করত, কেউ ধারালো চাকু দিয়ে কোনো যুবতীর পাছার মাংস আস্তে আস্তে কেটে কেটে আনন্দ করত, কেউ উঁচু চেয়ারে দাঁড়িয়ে উন্মুক্ত বক্ষ মেয়েদের স্তনে মুখ লাগিয়ে ধারালো দাঁত দিয়ে স্তনের মাংস তুলে নিয়ে আনন্দে অট্টহাসি করত। কোনো মেয়ে এসব অত্যাচারে কোনো প্রকার চিৎকার করার চেষ্টা করলে তার যোনিপথ দিয়ে লোহার রড ঢুকিয়ে দিয়ে তাকে তৎক্ষণাৎ হত্যা করা হত। প্রতিটি মেয়ের হাত

বাঁধা ছিলো পেছনের দিকে শূন্যে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল। অনেক সময় পাঞ্জাবি সেনারা সেখানে এসে সেই ঝুলন্ত উলঙ্গ মেয়েদের এলোপাথাড়ি বেদম প্রহার করে যেত।

প্রতিদিন এভাবে বিরামহীন প্রহারে মেয়েদের দেহের মাংস ফেটে রক্ত ঝরছিলো, মেয়েদের কারও মুখের সামনের দিকে দাঁত ছিলো না, ঠোঁটের দু'দিকের মাংস কামড়ে, টেনে ছিঁড়ে ফেলা হয়েছিলো, লাঠি ও লোহার রডের অবিরাম পিটুনিতে প্রতিটি মেয়ের আঙুল, হাতের তালু ভেঙে, থেঁতলে ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিলো। এসব অত্যাচারিত ও লাঞ্ছিত মহিলা ও মেয়েদের প্রশ্রাব ও পায়খানা করার জন্য হাতের ও চুলের বাঁধন খুলে দেওয়া হত না এক মুহূর্তের জন্য। হেডকোয়ার্টারের ওপর তলার বারান্দায় এই ঝুলন্ত উলঙ্গ মেয়েরা হাত বাঁধা অবস্থায় লোহার তারে ঝুলে থেকে সেখানে প্রশ্রাব-পায়খানা করত– আমি প্রতিদিন সেখানে গিয়ে এসব প্রশ্রাব-পায়খানা পরিষ্কার করতাম।

আমি স্বচক্ষে দেখেছি, অনেক মেয়ে অবিরাম ধর্ষণের ফলে নির্মমভাবে ঝুলন্ত অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করেছে। প্রতিদিন সকালে গিয়ে সেই বাঁধন থেকে অনেক বাঙালি যুবতীর বীভৎস মৃতদেহ পাঞ্জাবি সেনাদেরকে নামাতে দেখেছি। আমি দিনের বেলায়ও সেখানে সেই সব বন্দী মহিলাদের পুতদগ্ধ, প্রশ্রাব-পায়খানা পরিষ্কার করার জন্য সারাদিন উপস্থিত থাকতাম। প্রতিদিন রাজারবাগ পুলিশ লাইনের ব্যারাক থেকে এবং হেডকোয়ার্টার অফিসের ওপর তলা হতে বহু ধর্ষিতা মেয়ের ক্ষতবিক্ষত বিকৃত লাশ ওরা পায়ে রশি বেঁধে নিয়ে যায় এবং সেই জায়গায় রাজধানী থেকে ধরে আনা নতুন নতুন মেয়েদের চুলের সঙ্গে ঝুলিয়ে বেঁধে নির্মমভাবে ধর্ষণ আরম্ভ করে দেয়। এসব উলঙ্গ নিরীহ বাঙালি যুবতীদের সারাক্ষণ সশস্ত্র পাঞ্জাবি সেনারা প্রহরা দিত। কোনো বাঙালিকেই সেখানে প্রবেশ করতে দেওয়া হত না। আর আমি ছাড়া অন্য কোনো সুইপারকেও সেখানে প্রবেশ করতে দেওয়া হত না।

মেয়েদের হাজারো কাতর-আহাজারিতেও আমি ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও বাঙালি মেয়েদের বাঁচার জন্য কোনো ভূমিকা পালন করতে পারি নি। এপ্রিল মাসের দিকে আমি অন্ধকার পরিষ্কার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খুব ভোরে হেডকোয়ার্টারের ওপর তলায় সারারাত ঝুলন্ত মেয়েদের মলমূত্র পরিষ্কার করছিলাম। এমন সময় সিদ্ধেশ্বরীর ১৩৯ নং বাসার রানু নামে এক কলেজের ছাত্রীর কাতর প্রার্থনায় আমি অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে পড়ি এবং মেথরের কাপড় পরিয়ে কলেজ ছাত্রী রানুকে মুক্ত করে পুলিশ লাইনের বাইরে নিরাপদে দিয়ে আসি। স্বাধীন হওয়ার পর সেই মেয়েকে আর দেখি নি। ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় মিত্রবাহিনী বাংলাদেশ মুক্ত করার আগ পর্যন্ত পাঞ্জাবি সেনারা এসব নিরীহ বাঙালি মহিলা, যুবতী ও বালিকাদের ওপর এভাবে নির্মম পাশবিক অত্যাচার ও বীভৎসভাবে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করে। রাজারবাগ হেডকোয়ার্টার অফিসের ওপর তলায়, সমস্ত কক্ষে, বারান্দায় এই নিরীহ মহিলা ও বালিকাদের তাজা রক্ত জমাট হয়ে ছিলো। ডিসেম্বরে মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনী রাজধানীতে বীর বিক্রমে প্রবেশ করলে রাজারবাগ পুলিশ লাইনের সব পাঞ্জাবি সেনা আত্মসমর্পণ করে।

টিপসহি

রাবেয়া খাতুন

১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪

অনেক মৃত্যু দেখেছি, নারী নির্যাতনের কথা শুনেছি কিন্তু কখনও ভাবিনি আমি তার শিকার হব

—ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণী

বাংলাদেশের বিশিষ্ট ভাস্কর ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণী, যিনি মুক্তিযুদ্ধের ন'মাস খুলনায় ক্রিসেন্ট জুট মিলে কর্মরত অবস্থায় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের সহযোগীদের হাতে কার্যত বন্দি ছিলেন। তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন হানাদার বাহিনীর বর্বর নির্যাতন, গণহত্যা এবং ধ্বংসযজ্ঞ। তিনি দেখেছেন জুট মিলে গিলোটিনের মতো পাট কাটার মেশিনের ব্লেডের নিচে ফেলে কিভাবে বাঙালিদের দেহ দ্বিখণ্ডিত করা হয়েছে। প্রিয়ভাষিণী নিজেও শিকার হয়েছিলেন পৈশাচিক নির্যাতনের। ২৫ সেপ্টেম্বর '৯৯ থেকে ২ নভেম্বর '৯৯ পর্যন্ত সাত দফায় তাঁর জবানবন্দি ধারণ করা হয়েছে।

আমি ফেরদৌসী বেগম। ছোটবেলায় আমার মাতামহ আবদুল হাকিম, যিনি এক সময় পূর্ব পাকিস্তান গণপরিষদের স্পীকার ছিলেন, আদর করে আমার নাম রেখেছিলেন প্রিয়ভাষিণী। আমি একাত্তরের আড়াই লাখ ধর্ষিতা নারীর একজন।

আজ আটাশ বছর পর আমার জীবনের সেই ভয়ঙ্কর দিনগুলোর কথা আপনাদের বলছি এ জন্য যে, একাত্তরে যারা এদেশে তিরিশ লাখ বাঙালিকে হত্যা করেছে, আড়াই লাখ নারীকে ধর্ষণ করেছে, আজও তাদের বিচার হয়নি। আজকের প্রজন্ম ভুলে যেতে বসেছে একাত্তরে কী ভয়ঙ্কর দুঃসময়ের মুখোমুখি আমাদের প্রতিনিয়ত লড়তে হয়েছে। আজ সেই দুঃসময়ের কথা এ কারণেও বলতে চাই– অন্য সব নির্যাতনের কথা বিস্তারিত বলা হলেও নারী নির্যাতনের কথা আমরা খুবই কমই জানি। এর প্রধান কারণ সমাজ ও পরিবারের রক্ষণশীল বৈরী পরিবেশ। আমি আশা করব আমার এ জবানবন্দি অন্য সব নির্যাতিত নারীদের সোচ্চার হতে সাহায্য করবে।

আপনারা একাত্তরের নারী নির্যাতনের কথা 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্রে'র অষ্টম খণ্ডে পড়েছেন। অধ্যাপিকা নীলিমা ইব্রাহিম নাম না বলে কয়েকজন বীরাঙ্গনার কথা তাঁর বইয়ে উল্লেখ করেছেন। কয়েক বছর আগে শহীদ জননী জাহানারা ইমাম ও তাঁর সহযোদ্ধারা যখন গণআদালতে গোলাম আযমের বিচার করেন তখন কুষ্টিয়া থেকে সাহস করে তিনজন বীরাঙ্গনা এসেছিলেন সাক্ষ্য দেয়ার জন্য। পরে তাঁরা গ্রামে গিয়ে কী লাঞ্ছনা ও গঞ্জনার শিকার হয়েছিলেন তাও আমি জানি।

নীলিমা ইব্রাহিম তাঁর অসাধারণ গ্রন্থ 'আমি বীরাঙ্গনা বলছি'তে লিখেছেন কিভাবে মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী স্বাধীন বাংলাদেশের সমাজ তাঁদের অবদান অস্বীকার করেছে। শুধু সমাজ নয়, এ বীরাঙ্গনাদের পরিবারও তাঁদের গ্রহণ করতে রাজি হয়নি। অস্বীকার করেছে পিতা, অস্বীকার করেছে স্বামী। সমাজ ও পরিবারের লাঞ্ছনা-গঞ্জনার হাত থেকে বাঁচার জন্য কয়েকজন বীরাঙ্গনা বর্বর পাকিস্তানি সৈন্যদের সাথে পাকিস্তানে চলে যাওয়া শ্রেয় মনে করেছেন, যদিও তাঁরা জানতেন সেখানে তাঁদের পরিণতি কী হবে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বীরাঙ্গনাদের সম্মানের সঙ্গে পুনর্বাসিত করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু পারেননি। মাঝে মাঝে ভাবি একাত্তরে পাকিস্তানি সৈন্যদের যে নৃশংস পাশবিক চেহারা দেখেছি, আমাদের সমাজেও কি তাদের প্রতিচ্ছায়া নেই? আমাকে যারা পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাতে তুলে দিয়েছিল তারা এদেশেরই মানুষ। একাত্তরে মুক্তিযোদ্ধাদের অনেক বীরত্বের কথা শুনেছি। দেশ হানাদারমুক্ত হওয়ার পর সেই বীরত্ব দেখিনি। তাঁরা কেউ কথিত বীরাঙ্গনাদের পাশে এসে দাঁড়াননি। একাত্তরে যখন নারীরা পাকিস্তানিদের দ্বারা নির্যাতিত হচ্ছিলেন, তখন তাদের পিতা, স্বামী, ভাই কিংবা পরিবারের অন্য পুরুষ সদস্যরা পালিয়ে গিয়েছেন অথবা হানাদার বাহিনীর হাতে জীবন দিয়েছেন। পালিয়ে যাওয়ার পথ জানা ছিল না, কিংবা রক্ষা করার মতো কেউ ছিল না বলেই তখন এত বেশি নারী পাকিস্তানের নৃশংস নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন।

একাত্তরের কথা বলার আগে আমার আগের জীবন সম্পর্কে কিছু বলা দরকার। পিতৃকুল এবং মাতৃকুল উভয় দিক থেকে আমি ছিলাম অত্যন্ত বনেদি ও অভিজাত পরিবারের সন্তান। আট ভাইবোন আমরা। আমার বয়স যখন পনের তখন আমার পিতামাতার বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে। যার কারণে ম্যাট্রিক পরীক্ষার পরই পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য আমাকে চাকরি নিতে হয়।

বাষট্টি সালে আমার বিয়ে হয় ইঞ্জিনিয়ারিং-এ অধ্যয়নরত একজনের সঙ্গে। অথবা তখন এমনই দাঁড়িয়েছিল যে, ছোট ভাইবোনদের পাশাপাশি স্বামীর পড়াশোনা ব্যয়ও আমাকে বহন করতে হয়েছে। চাকরি করার পাশাপাশি আমাকেও পড়াশোনা চালিয়ে যেতে হয়েছে, তবে স্নাতক উত্তীর্ণ হওয়ার পর তা আর সম্ভব হয়নি।

আটষট্টি সালে আমার বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে, যখন আমি তিন পুত্র সন্তানের জননী। আমার ছেলেরা খুলনায় দাদির কাছে থাকত। আমি তখন ক্রিসেন্ট জুট মিলে চাকরি করি। মা আর ছোট ভাইবোনদের সঙ্গে খুলনার খালিশপুরে থাকি।

এই সময়ে আমাদের অসহায় পরিবারটার প্রতি সহানুভূতির হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন আমার এক ঊর্ধ্বতন সহকর্মী, যাঁর নাম আহসান উল্লাহ আহমেদ।

আমি কখনও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিলাম না। তবে পারিবারিক পরিমণ্ডলে ছিল উদার সাংস্কৃতিক পরিবেশ। আমার পিতা প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী বুলবুল চৌধুরীর নৃত্যদলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তাঁর সঙ্গে ইউরোপের বহু দেশ ঘুরেছেন। আমার মা ওস্তাদ মুনসী রইসউদ্দিনের কাছে গান শিখেছিলেন। আমার মামা সদ্যপ্রয়াত নাজিম মাহমুদ এদেশের একজন অগ্রগণ্য সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব। মূলত তাঁর কারণেই খুলনার সন্দীপনের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। নাচ, গান সবই শিখেছিলাম উত্তরাধিকার সূত্রে।

একাত্তরের প্রথম দিকে রাজনৈতিক পরিস্থিতি যখন খুব অনিশ্চিত, তখন আহসানউল্লাহর সঙ্গে আমার বিয়ের কথা হয়। আহসানউল্লাহর পরিবার তিন সন্তানের জননীকে বাড়ির বউ হিসেবে মেনে নিতে রাজি ছিল না। আমি নিজেও সন্তানের ভবিষ্যতের কথা ভেবে এবং আগের বিয়ের তিক্ত অভিজ্ঞতার কারণে এ বিয়েতে প্রথমে রাজি ছিলাম না। আহসানউল্লাহ আমাকে রাজি করাতে না পেরে আমার মামা নাজিম মাহমুদের দ্বারস্থ হন। পরে মামার কথায় আমি এ বিয়েতে সম্মত হই।

বাংলাদেশের অন্য সব জনপদের মতো একাত্তরের মার্চে খুলনার খালিশপুরও ছিল ঘটনাবহুল ও উত্তপ্ত। সংঘর্ষ চলছিল বাঙালি-বিহারীদের মধ্যে। অবস্থা খারপ দেখে ২০ তারিখেই আমাদের বেতন দেয়া হল। আমাদের সবার জন্য এটা ছিল অত্যন্ত আনন্দের দিন। মা আর সাত ভাইবোন ছাড়াও আমার তিন সন্তানের ভরণপোষণের ভার মূলত আমার কাঁধের ওপর। সারা মাস অপেক্ষা করতাম বেতনের দিনটির জন্য।

২৪ তারিখে অফিসে গেলাম, কিন্তু ফিরে এলাম তাড়াতাড়ি। শহরে বাঙালি-বিহারী দাঙ্গা বেঁধেছে। কয়েকটি বাঙালি বাড়িতে আগুনও দিয়েছে বিহারীরা। ইপিআর (ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস্)-এর মধ্যেও অসহযোগিতা শুরু হয়েছে। পরিস্থিতি কোন দিকে মোড় নেবে সেটা তখন নির্ভর করছিলো ২৫ মার্চ ইয়াহিয়ার সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর বৈঠকের ওপর। বয়সের কারণে হোক বা অন্য যে কারণে হোক, আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলাম না পরিস্থিতি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, বা আমি কি করব। সাধারণত হরতাল হয়, মিটিং-মিছিল হয়, দাঙ্গা-হাঙ্গামাও হয়, তারপর আবার সব স্বাভাবিক হয়ে যায়– বিষয়টি ওরকমই মনে হচ্ছিল আমার। মনে হচ্ছিল বঙ্গবন্ধুর দাবি মেনে নেয়া হবে, সব কিছু আবার স্বাভাবিক হয়ে যাবে। তারপরও অফিসের সবার ভেতর উদ্বেগ লক্ষ্য করেছি। সেই উদ্বেগ আমার ভেতরও সঞ্চারিত হচ্ছিল। ভয় ছিল যদি কোনো কারণে অনেক দিন অফিস বন্ধ থাকে তাহলে বেতন পাব না। নিজের সন্তান ও ভাইবোনদের নিয়ে অনাহারে দিন কাটাতে হবে।

পরদিন অফিস করলাম না। ইপিআর রাস্তায় নামল। আমাদের বাসায় এসে পানি চাইল ওদের একটা দল। জিজ্ঞেস করল, 'আপনারা বিহারী, না বাঙালি?'

কী উত্তর দেব বুঝতে পারলাম না। কিছুক্ষণ পর বললাম, 'বাঙালি।'

ওরা বলল, 'তাহলে আমাদের কিছু খেতে দিন।' তারপর আমাদের সতর্ক করে দিল, 'পরিস্থিতি বিশেষ ভালো মনে হচ্ছে না। মনে হয় না আলোচনা ফলপ্রসূ হবে। আপনারা কেউ এখান থেকে যাবেন না।'

২৬ তারিখে দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ল। পরের দু'দিনে তা ভয়াবহ রূপ নিল। যে দিকে তাকাই দাউ দাউ আগুন। ২৯ তারিখ আর্মি নামলো শহরে। আহসানউল্লাহ তখন বার বার আমাদের বাসায় আসছেন, যাচ্ছেন। তাগিদ দিচ্ছেন অন্যত্র চলে যাওয়ার জন্য।

তিনি তখন যশোরের জে জে আই জুট মিলের লেবার অফিসার। ওঁর সঙ্গে তখনও আমার বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা বাকি ছিল। এ জন্য পুরোপুরি প্রটেকশনও দিতে পারছিলেন না। পারিবারিক বন্ধু হিসেবে যতটুকু করার ততটুকু করছিলেন।

৩০ তারিখ দুপুরে ভয়াবহ উত্তেজনার মধ্যে তিনি একটা জীপ নিয়ে এলেন আমাদের নিতে। দূরে কবরস্থানের পাশে রাস্তায় জিপ রেখে বাসায় ঢুকলেন। বললেন, 'রেডি হও। আমি আসছি, নিয়ে যাব।' বলেই আবার বেরুতে উদ্যত হলেন।

ওঁকে বললাম, 'কোথায় নিয়ে যাবে? আমরা এতগুলো ভাইবোন, কে জায়গা দেবে?'

'অত কিছু বোঝার দরকার নেই, বেরিয়ে পড়ো।' বলেই রাস্তার দিকে এগিয়ে গেলেন। একটু পরেই আবার ফিরে এলেন। বললেন, 'আর্মি আর বিহারীরা এদিকে আসছে।'

মা আর ভাইবোনদের নিয়ে হুড়মুড় করে বেরুলাম। দেখি পেছনে বাঙালি বাড়িগুলোতে আগুন জ্বলছে। রাস্তায় মানুষ ছুটছে নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য। মানুষের মাথা ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না। আমাদের জিপে না তুলে কবরস্থানের ওপর দিয়ে যশোর-খুলনা মহাসড়কের দিকে ছুটলেন আহসানউল্লাহ। আমরা জ্ঞানহারার মত তাঁর পেছনে ছুটছি। কবরস্থান পার হওয়ার সময় পায়ের নিচে নরম মত কি যেন ঠেকল। নিচে তাকিয়ে দেখি চারপাশে ছড়িয়ে আছে মানুষের লাশ। এগুলো বিহারীরা মেরে ফেলে রেখেছিল ওই অবস্থায়।

রাস্তা পার হয়ে আমরা কিছুটা পথ হেঁটে পৌঁছলাম গ্রামের এক মাতব্বরের বাড়িতে। লোকটি আমাদের পূর্ব পরিচিত। তিনি আমাদের দেখে বললেন, 'আমাদের এখানে একদিনও থাকা যাবে না। যারা আওয়ামী লীগ করে তাদের আমরা জায়গা দিতে পারব না।' উনি মুসলিম লীগ করতেন।

আমরা অনুনয় করে বললাম, 'এখন তো বিকেল হয়ে গেছে। রাতটুকু থাকি, কাল সকালে একটা ব্যবস্থা করে নেব।'

তখন ওঁর মন একটু নরম হল। বললেন, 'এক রাত থাকতে পারেন। কিন্তু আমি যেহেতু মুসলিম লীগ করি, ইপিআর আক্রমণ করলে আপনাদেরও মরতে হবে।'

মুসলিম লীগের লোক হয়ে ইপিআরের হাতে প্রাণ হারাবার প্রবৃত্তি হল না। মাতব্বরের বাড়িতে রাত কাটাবার চিন্তা বাদ দিতে হল। বিকেলেই আমরা খুলনার নানা বাড়ির পথে রওনা হলাম। গোয়ালখালী গেটের কাছে এসে রিকশা নিলাম। নূরনগর এসে দেখি পাকিস্তানি আর্মিরা পজিশন নিয়ে আছে। তারা একটি বাস ও রিকশায় আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। রিকশার চাকা কোনো কারণে ফেটে গেলে শব্দ শুনে আর্মিরা গুলি করবে– এই ভয়ে রিকশা ছেড়ে দিলাম। পায়ে হেঁটে খুলনা শহরে মুসলিম পাড়ায় নানাবাড়ি পৌঁছুলাম।

কিছুদিন থাকার পর নানা বাড়ির অবস্থাও ভালো লাগল না। এতগুলো মানুষ ওদের ওপর চেপে আছি। ওরাও ভালো চোখে দেখছে না। বিষয়টি আত্মসম্মানে লাগল। মা বললেন, 'চল, আমরা যেখান থেকে এসেছি, ওখানেই ফিরে যাই।'

এ সময় নানা বাড়িতে আরও অনেক লোক আশ্রয় নিয়েছিল। এমন এক অবস্থা যে, কেউ কাউকে দেখতে পারছে না। মাঝে মাঝে আর্মি আসছে। আমরা গোয়ালঘর, ধানক্ষেত বা অন্য কোথাও লুকোচ্ছি।

এ সময় এক মজার ঘটনা ঘটেছিল। পাশে থাকত এক হিন্দু পরিবার। আমরা যখন আর্মির ভয়ে পালাচ্ছি, তখন ওই পরিবারের এক বৃদ্ধা জীবনে আর্মির নাম শোনেননি। বললেন, 'বুবু আম্মি (আর্মি) ভালো, না খারাপ, কও না।' বললাম, 'শোনা দরকার নেই, পালাও।' বৃদ্ধা তখন বললেন, 'আমি পালালে আমার গরু-ছাগলের কী হবে?' দেশের

রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে এই ছিল সাধারণ মানুষের ধারণা। একাত্তরে পাকিস্তানিরা এদেরই হত্যা করেছে নির্বিচারে।

আমরা সেদিন আর্মির ভয়ে একটা বাড়িতে গোয়ালঘরের নিচে শুয়ে কাটিয়েছিলাম। বৃষ্টির মত গুলি হচ্ছিল সারা দিন। কয়েক দিন পর যখন পরস্থিতি একটু শান্ত হল, মাকে বললাম, 'চল খালিশপুর যাই। মরলে ওখানেই মরব।'

আবার খালিশপুর এলাম। দেখলাম বাড়িঘর আগের অবস্থায় নেই– ভাঙাচোরা, লুটপাট করে নিয়ে গেছে সবকিছু। কিছুই করার ছিল না। মা কয়দিনের ময়লা কাপড়-চোপড় ধুয়ে রোদে শুকোতে দিলেন। দূর থেকে কাপড় শুকোনো দেখে আহসানউল্লাহ এলেন। আমাকে বললেন, 'তোমারা কেন ফিরে এসেছ? দেখছ না কিভাবে কিলিং হচ্ছে? আমি আজই পালিয়ে যাচ্ছি। আর্মিরা আমাকে খুঁজছে। আমি ওখানে থাকতে পারব না। মাকেও বললেন, 'এখানে কেন এসেছেন খালাম্মা?'

মা বললেন, 'তুমিই বল বাবা, তাহলে আমরা কোথায় যাব?'

ঠিক এ সময় দেখলাম কয়েক ট্রাক আর্মি বাড়ির পাশে রাস্তায় টহল দিচ্ছে। তক্ষুনি আমরা ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলাম। তারপর জানালাটা একটু ফাঁক করলাম। হঠাৎ এক সঙ্গে অনেকগুলো কণ্ঠের আর্তচিৎকার শুনে চমকে উঠলাম। দেখলাম, রাস্তার ওপারে মুন্সি বাড়ির সামনে একই পরিবারের ১৫/১৬ জনকে ব্রাশ ফায়ার করা হয়েছে। তরতাজা জীবনগুলো লুটিয়ে পড়েছে মাটিতে। ভয়ে আমরা আধমরা হয়ে গেলাম।

আহসানউল্লাহ বললেন, 'আমি এখানে থাকলে আর্মিরা আপনাদেরও মেরে ফেলবে। এরপর এক মুহূর্তও এখানে থাকা সম্ভব নয়।' আহসানউল্লাহ চলে গেলেন।

মা আর ছোট ভাইবোনদের নিয়ে আমি আবার রাস্তায় বেরুলাম। মা বললেন, 'তুই আমাদের রিকশায় তুলে দে। আমি যশোর চলে যাই। কপালে যা থাকে তাই হবে।'

মাকে আমার শেষ সম্বল একশ'টি টাকা দিয়ে বললাম, 'অফিস খুললেই জয়েন করব। তোমাদের সময় মতো টাকা পাঠাব'।

মা বললেন, 'ঠিক আছে, দুঃখ করিস না, বেঁচে থাকলে দেখা হবে।'

আসলে ওই পরিস্থিতিতে মায়ের ওপরও মায়া হচ্ছিল না। বরং তাঁকে একটা বোঝা মনে হচ্ছিল। মাকে বললাম, 'কোনোরকমে চলে যাও। ট্রেন ভাড়া দিও না'। রিকশাওয়ালাকে হাত ধরে বললাম, 'তোমার রিকশা ভাড়া তো আট আনা, পারলে পয়সা নিও না। ওনাকে একটু স্টেশনে পৌঁছে দাও।'

ছোট ভাইবোনদের নিয়ে মা চলে গেলেন। আহসানউল্লাহও চলে গেছেন। আমি একা হয়ে গেলাম। পূর্ব পরিচয়ের সুবাদে একাধিক বাড়িতে গিয়েছিলাম আশ্রয়ের জন্য। সবাই তখন নিজেদের বাঁচাবার জন্য দিশেহারা। কোথাও জায়গা পাইনি। কয়েকদিন ছিলাম এক প্রকৌশলীর বাড়িতে। সেখানেও একই সমস্যা। তাঁর স্ত্রী কিছুতেই আমাকে রাখতে চাইলেন না। বাড়ির কর্তা রাজি হলেও অন্যরা নয়। আমাকে কেন্দ্র করে শুরু

হল পারিবারিক কলহ। ভদ্রলোক বললেন, 'এ অবস্থায় একটা অসহায় মেয়েকে আমি কোথায় বের করে দেব?' স্ত্রী তাঁর কথা শুনতে রাজি নয়।

আমার খুব খারাপ লাগল। রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম। ভাবছি কি করব, কোথায় যাব? চোখ ফেটে কান্না আসছিল। দু'চোখে অন্ধকার দেখিছিলাম। হঠাৎ ওখানে দেখা হল আমার অফিসের অবাঙালি একাউন্ট্যান্ট জাহাঙ্গীর কেরেলার সঙ্গে। আর তখন থেকেই শুরু হলো আমার দুর্দশা আর দুঃস্বপ্নের সময়।

জাহাঙ্গীর আমাকে দেখেই বলল, 'আরে বাজী, এখানে দাঁড়িয়ে কেন?' ও আমাকে 'বাজী' অর্থাৎ বোন বলে ডাকত।

বললাম, 'আমি খুব খারাপ অবস্থায় আছি।' মনে হল অফিস খোলা থাকলে বেতন থেকে কিছু টাকা ধার করতে পারব। জানতে চাইলাম অফিস খোলা কিনা।

সে বলল, 'হ্যাঁ, তুমি কি জয়েন করতে চাও? তাহলে আমার বাইকে ওঠ।'

জাহাঙ্গীরকে বললাম, 'আমি তো বাইকে চড়তে পারি না। তার চেয়ে তুমি আমাকে রিকশায় নিয়ে চল।' সে আমার রিকশার সঙ্গে সঙ্গে এল।

খালিশপুর পার হয়ে সে আমাকে ওয়ারলেস কলোনীর সুন্দর একটা জলপাই রঙের বাড়ির সামনে দাঁড় করাল। ওটা ছিল এক আগাখানির বাড়ি– 'মাসকাট হাউস'। আমাকে সে ঢোকাল ওই বিশাল বাড়িতে। আমি অবাক হয়ে জানতে চইলাম, 'আমাকে এখানে কেন এনেছ?'

ঘরের ভেতর নিয়ে জাহাঙ্গীর আমার সঙ্গে অশোভন আচরণ শুরু করল। যে আমার সঙ্গে আগে চোখ তুলে কথা বলারও সাহস পায়নি, সেই আমাকে ধাক্কা দিয়ে বলল, 'তুমি এখানে বস। সন্ধ্যায় এখানে কিছু আর্মি অফিসার আসবে। তোমার চাকরির ব্যবস্থা হবে।' এই বলে সে বাইরে গেল।

শয়তানটা বেরিয়ে যাওয়ার পর পরই ঠিক করলাম যেভাবে হোক এখান থেকে পালাতে হবে। ঢোকার সময় বাইরে দু'জন দারোয়ান দেখেছি। জানালার ফাঁক দিয়ে দেখলাম ওরা আমার ঘরের দিকে আঙুল দেখিয়ে নিজেদের ভেতর কি যেন বলাবলি করছে। আমি দরজা খুলে বাইরে এলাম। ওদের বললাম, 'একটু চা হবে তোমাদের কাছে?'

'হ্যাঁ। খাবেন?' জানতে চাইল একজন।

ওদের গেট থেকে সরাবার জন্য বললাম, 'হ্যাঁ চা খাব।'

অল্পবয়সী দারোয়ানটা বলল, 'কেতলিতে ঠাণ্ডা চা আছে, খাবেন?'

বললাম, 'তাহলে এক কাপ ঠাণ্ডা চা দাও।'

ছেলেটি চা আনতে গেল। এ সময় অন্যজন মুখে অল্প দাড়ি, আমাকে হাত দিয়ে ইশারা করে চলে যেতে বলল। লোকটাকে মনে হল ফেরেশতা।

যখন রাস্তায় নেমে পড়েছি তখন চা আনতে যাওয়া ছেলেটা ফিরে এল। চিৎকার করে বলল, 'আপনি কোথায় যাচ্ছেন? আপনাকে তো যেতে মানা করেছে সাহেব।'

রিকশায় উঠতে উঠতে বললাম, 'এক্ষুনি আসছি। কাপড়-চোপড় কিছু আনিনি তো, ওগুলো আনতে যাচ্ছি।'

রিকশা থামল মিল গেটে। ভেতরে ঢুকে দেখি আমার অফিসের বয়স্ক জেনারেল ম্যানেজার ফিদাই সাহেব। পাইপ টানছেন। আমাকে দেখে বললেন, 'আরে! তুমি কোত্থেকে?'

তার মনে করুণা জাগাবার জন্য বললাম, 'স্যার, এখানে আমি একা। পরিচিত সবাই মুক্তিযুদ্ধে চলে গেছে। আমি কি করব বুঝতে পারছি না।'

'তুমি কি জয়েন করতে চাও?' জিজ্ঞেস করলেন ফিদাই।

বললাম, 'হ্যাঁ স্যার। কিন্তু আমার তো পায়ে স্যান্ডেল নেই। কাপড়-চোপড়ও তেমন কিছু নেই। কিভাবে অফিস করব?'

উনি একটা চিরকুট লিখে দিলেন। বললেন, 'যাও, চিফ একাউন্ট্যান্ট-এর সঙ্গে দেখা কর।

চিফ একাউন্ট্যান্ট তিনশ' টাকা দিল। আর বলল, 'গাড়ি নিয়ে যাও, কিছু কেনাকাটা কর। আর কাল সকালে তোমাকে আনতে গাড়ি যাবে। তুমি যেন কোথায় থাক?'

আমি ঠিক করেছিলাম বিহারীদের ভেতর খালিশপুর না থেকে পাবলায় পরিচিত এক দারোগা বাড়িতে থাকব। ওদের বাসার ছেলেরা প্রায় সন্ধ্যায় আমাদের বাড়িতে আসত। ওরা ভালো গান গাইতে পারত। ওই বাসাটা ছিল একটু ভেতরে, ঘুরে ঘুরে যেতে হত। বাড়িটা চেনাতে চাইলাম না। একাউন্ট্যান্টকে বললাম, 'আমি যেখানে থাকি ওখানে তো গাড়ি যায় না।'

সে বলল, 'অসুবিধা নেই। ড্রাইভারকে বলে দিও কোথায় দাঁড়াতে হবে। গাড়ি যাবে সাড়ে সাতটায়। তুমি প্রস্তুত থেকো।'

পরদিন গাড়ি এল। আমি ঠিকমত অফিসে এলাম। জয়েন করার আধা ঘণ্টার মধ্যে একজন একাউন্ট্যান্ট সুলতান পাঞ্জোয়ানী নামে এক আগাখানি, যার সঙ্গে আমি আগে কথাও বলতাম না, আমাকে বলল, 'আপনি কেমন আছেন? আপনাকে তো খুব ভালো দেখাচ্ছে,' বলে অশোভন ইঙ্গিত করল। আমি কড়াভাবে তাকালাম তার দিকে।

একটু পর হঠাৎ ফিদাই সাহেব ফোন করলেন। বললেন, 'তুমি লাঞ্চে কোথায় যাবে?'

বললাম, 'এখানেই করব।'

তিনি বললেন, 'না, না, তুমি আমার সঙ্গেই লাঞ্চ কর।'

জিএমকে চটালে ক্ষতি হতে পারে ভেবে লাঞ্চ করতে রাজি হলাম।

লাঞ্চের সময় উনি আমাকে বললেন, 'সন্ধ্যার সময় ক্যাপ্টেন ইশতিয়াক আসবে। তোমাকে সিনেমা দেখাতে নিয়ে যাবে।'

বললাম, 'স্যার, আমি তো সিনেমা দেখি না।'

'তুমি এসব বিষয়ে আপত্তি করবে না। তোমার নামে অনেক অভিযোগ রয়েছে। ওর সঙ্গে যেতে হবে তোমাকে।' কড়া আদেশ দিল ফিদাই।

উনিশ শ' একাত্তরের আগে এই লোকটাকে ফেরেশতার মত মনে হত। দীর্ঘদিন কাজ করেছি তার সঙ্গে। কখনও এতটুকু মনে হয়নি– এ লোকটা খারাপ কাজ করতে পারে বা মানুষকে কষ্ট দিতে পারে। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ শুরুর পর তার চেহারা পুরোটাই পাল্টে গেল– যেন একটা আস্ত শয়তান। ফিদাই বলল, 'তুমি ওপরে এস। আলাপ কর ক্যাপ্টেন ইশতিয়াকের সঙ্গে।'

ওপরে যাওয়ার পর ইশতিয়াক জিজ্ঞেস করল, 'তুমি টিভি কিংবা সিনেমা দেখ না?'

উত্তর দিলাম 'না, দেখি না।'

সে বলল, 'চল, আজকে একটা মুভি দেখে আসি।'

জিএম আদেশ করল, 'বিকেলে তুমি নাস্তা খেয়ে ওর সঙ্গে যাবে।'

বিকেলে ইশতিয়াক এল সিনেমায় নিয়ে যাওয়ার জন্য। অসুস্থতার দোহাই দিয়ে, আরেক দিন যাব বলে সে যাত্রা ওর হাত থেকে রেহাই পেলাম। কিন্তু ফিদাই আমাকে রেহাই দিল না।

অফিস ছুটির পর ফিদাই এসে বলল, 'তোমার সঙ্গে জরুরি কথা আছে। আমার সঙ্গে চল।'

জিএমকে অধস্তন কর্মচারীরা বাঘের মতো ভয় পেত। প্রতিবাদ করার সাধ্য ছিল না। আমাকে নিয়ে গেল ওর খালিশপুরের ফ্ল্যাটে, যেখানে কেউ থাকত না।

নির্জন ফ্ল্যাট দেখে আমি ভীষণ ভয় পেয়েছিলাম। ফিদাই আরও ভয় ধরিয়ে দিয়ে বলল, 'তোমার ভাইরা মুক্তিযুদ্ধে গেছে। তুমি কোনও অবস্থায় আর্মির হাত থেকে রক্ষা পাবে না। এর মাশুল তোমাকে দিতে হবে।'

ফিদাইর কাছে আমি করুণা ভিক্ষা চেয়েছিলাম। বলেছিলাম, 'আপনি আমার বাবার মতো। আপনার কথায় আমি কাজে যোগ দিয়েছি। আপনি আমাকে বাঁচান।'

ফিদাই বলল, 'বাঁচাতে পারি, যদি তুমি আমার সঙ্গে সহযোগিতা কর'। এই বলে সে আমাকে জড়িয়ে ধরতে চাইল।

আতঙ্কে, অপমানে আমি কান্নায় ভেঙে পড়লাম। ফিদাই ধমক দিয়ে বলল, 'চ্যাচামেচি করলে কোনো লাভ হবে না। আর্মিরা তোমাকে পেলে ছিঁড়ে খাবে।'

আর্মিরা ছিঁড়ে খাওয়ার আগে সেই রাতে ফিদাই আমাকে ছিঁড়ে খেতে চেয়েছিল। যতক্ষণ শক্তি ছিল বাধা দিয়েছি। পরে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম।

জ্ঞান ফেরার পর ফিদাই ক্রুদ্ধ গলায় বলল, 'তুমি আমার সঙ্গে সহযোগিতা করনি। এর ফল তোমাকে ভোগ করতে হবে।'

আমি কোনোরকমে বললাম, 'বাড়ি যাব।'

নির্বিকার গলায় ফিদাই বলল, 'চলে যাও।'

বাইরে তখন বেশ অন্ধকার। রাত আটটা-ন'টা হবে। একটা রিকশাওয়ালা বসে ছিল। ওকে নিয়ে আমার কোয়ার্টারে এলাম। শূন্য ঘরে মেঝের ওপর উপুড় হয়ে হাউমাউ করে কাঁদলাম। ফিদাইর কথা মাথার ভেতর হাতুড়ির মতো আঘাত করছিল– আর্মির হাত থেকে রক্ষা পাবে না। আর্মিরা তোমাকে ছিঁড়ে খাবে।

সারারাত এক ফোঁটা ঘুমোতে পারিনি। একবার ভেবেছি আত্মহত্যা করব। আরেকবার ভেবেছি পালিয়ে যাব। যতবার এসব কথা মনে হয়েছে ততবারই বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে আমার তিন শিশু সন্তান, যাদের তখন বয়স চার থেকে সাতের ভেতর আর আমার ছোট ভাইবোনগুলো নয় বছর ধরো যারা বেঁচে আছে মূলত আমার উপার্জনের ওপর।

তখন প্রচণ্ড রাগ হয়েছিল আহসানউল্লাহর ওপর। যদিও আনুষ্ঠানিকতার পর্ব বাকি ছিল তাঁকে আমি মনে মনে স্বামী হিসেবে ভাবতাম। তিনিও ছিলেন আমাদের অভিভাবকের মতো। কেন আমাকে এভাবে ফেলে চলে গেলেন? মেজ ভাই শিবলী যখন যুদ্ধে যায় তখন ওর জন্য কী গর্বই না হয়েছিল! অথচ ওরই জন্য আমার দুর্দশা। ধিক্কার দিয়েছি নিজেকে, ধিক্কার দিয়েছি গোটা পৃথিবীকে। বার বার মনে হয়েছে আমার চেয়ে অসহায় মানুষ দ্বিতীয়টি কোথাও নেই। যদিও অনেক মৃত্যু দেখেছি, নারী নির্যাতনের কথাও শুনেছি, কিন্তু কখনও ভাবিনি আমি তার শিকার হব।

রাত ভোর হল। বাথরুমের শাওয়ার খুলে দাঁড়িয়ে থাকলাম। ঘণ্টা পেরিয়ে গেল। উত্তপ্ত মস্তিষ্ক একসময় শীতল হলো। অফিসে যাওয়ার জন্য তৈরি হলাম। মনে হল কারাগারে ফাঁসির আসামীদের যে রকম একা সেলে রাখা হয় আমি সে রকম এক সেলে বন্দি হয়ে গেছি। এই কারাগার থেকে আমার মুক্তি নেই যতদিন না এ দেশ স্বাধীন হবে। ততদিন আমাকে আর্মিদের ছিঁড়ে খাওয়ার ভয় বুকে চেপে সন্তান আর অসহায় ছোট ভাইবোনদের মুখের অন্ন জোগাতে হবে।

কয়েকদিন ফিদাই আমাকে কিছু বলেনি। ভাবলাম লোকটা বুঝি অনুতপ্ত হয়েছে। আমার ধারণা মিথ্যে করে একদিন ফিদাই আমাকে তার ঘরে ডেকে পাঠাল। গম্ভীর গলায় বলল, 'নেভাল কমান্ডার গুলজারিন তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। তুমি প্রফেসর ভূঁইয়া মার্ডারের দিন স্পটে ছিলে। তোমার বিরুদ্ধে মার্ডার চার্জ আছে।'

বুঝলাম নতুন ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে। প্রফেসর ভূঁইয়া ছিলেন আমার বাবার দৌলতপুর কলেজের কলিগ। তিনি ছিলেন পিস কমিটির নেতা। যেদিন আমি পাবলায় আফিলউদ্দীন সাহেবের বাড়িতে যাই সেদিনই নকশালরা তাকে আমার খুব কাছেই গুলি করে হত্যা করে।

আগে থেকেই গুলজারিনের কথা শুনেছিলাম- ভয়ঙ্কর একজন নারী নির্যাতনকারী। ফিদাইকে অনুনয় করে বললাম, 'আমাকে আপনি চাকরিতে বহাল করলেন, আর আপনিই আমার সঙ্গে এমন করছেন। আমার কেউ নেই স্যার।'

কিছুতেই টলানো গেল না তাকে। বলল, 'আজকেই তোমাকে মিলের বাংলোতে উঠতে হবে।'

বললাম, 'আমার পদমর্যাদা অনুযায়ী আমি এত বড় বাংলো পাই না।'

ওরা জোর করে আমাকে ওখানে ওঠাতে চাইল, 'ওখানে না থাকলে তোমার বিরুদ্ধে মার্ডার চার্জ আনব।'

শেষে আমি বললাম, 'আমি একা ওখানে ভয় পাব- অতবড় বাংলাতে। তার চেয়ে আমাকে একটা ফ্ল্যাট দিন জুনিয়র অফিসার কলোনিতে।'

শেষ পর্যন্ত ফিদাই আমাকে একরকম জোর করেই নেভাল কমান্ডারের কাছে পাঠাল। নেভাল কমান্ডার বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষ। মুখে ভদ্র ব্যবহার কিন্তু চেহারাটা ভয়ংকর। আমাকে দেখেই বলল, 'এসো, এসো, বস।'

ভয়ে আধখানা হয়ে গেছি। কোনোরকমে সোফার এক কোনায় বসলাম।

গুলজারিন আমাকে দেখছিল, মুখে তার শয়তানের হাসি। বলল, 'তুমি আমার কি হতে চাও– বন্ধু হতে চাও, না কন্যা হতে চাও, না কি অন্য কিছু?'

ঢোঁক গিলে ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে বললাম, 'একজন ভদ্রলোক যে ব্যবহার করেন, আমার সঙ্গে সে ব্যবহার করুন।'

গুলজারিন বলল, 'আমি তোমাকে কিছু প্রস্তাব দেব। তুমি সেটা গ্রহণ করতে পার, আবার প্রত্যাখ্যানও করতে পার। আমার সঙ্গে এক মাস থাক। আমি অবশ্য এ জন্য বিশেষ কিছু দিতে পারব না। কিন্তু তুমি থাকলে আমি খুশি হব।' এরপর আমার পিঠে থাবা দিল, কাঁধ ধরে জোরে থাবা দিল, কাঁধ ধরে জোরে ঝাঁকুনি দিল।

আমি বললাম, 'এটা কিভাবে হয় স্যার, আমি কিভাবে এখানে থাকব?'

গুলজারিন বলল, 'কেন থাকতে পারবে না?' আমি তোমাকে প্রচুর পয়সা দেব। তোমার পরিবারের জন্য টাকা পাঠাব।' একটু থেমে আবার বলল, 'তোমার ভাইরা মুক্তিযুদ্ধে গেছে। তোমার নিরাপত্তা দরকার। তুমি থাক আমার সঙ্গে। আমি অনেক ভেবেচিন্তে তোমাকেই নির্বাচন করেছি। আমার তো একটা সেক্রেটারি দরকার। তুমিই এজন্য উপযুক্ত।'

আমি কাঁদতে শুরু করলাম। বার বার বললাম, 'আমাকে যেতে দিন।'

আমি যখন সাংঘাতিক অসহিষ্ণু হয়ে উঠলাম তখন সে বলল, 'তুমি কি জান না কোনও মেয়ে কমান্ডার গুলজারিনের হাতে এসে ফিরে যায় না? তুমি বোধহয় শোননি এটা। কিন্তু তুমি ফিরে যেতে পারবে। উদ্বিগ্ন হয়ো না।'

এ সময় দু'জন অফিসার হ্যা হ্যা করে হাসতে হাসতে ঘরে এসে বলল, 'স্যার, মেয়েটাকে আমাদের হাতে দেন না। একটু ঘুরে আসি।'

গুলজারিন বলল, 'নো নো।' তারপরও ওরা দু'জনে ঠাট্টা করছিল আমাকে নিয়ে।

তখন আমি অবিরাম কাঁদছি। আমার সঙ্গে ওরা যখন অশোভন আচরণ করতে চাইল আমি গুলজারিনকে বললাম, 'আমি মাঝে মাঝে তোমার কাছে আসব। আমার অনেক ভাইবোন। আমি পালিয়ে যেতে পারিনি। এখান থেকে পালাতে পারবও না। এখন আমাকে ছেড়ে দাও।'

এত কিছু বলার পরও গুলজারিন আমাকে ছাড়েনি। তার চেহারাটা ক্রমশ বীভৎস এক পশুর মতো হয়ে উঠল। পশুর মতোই নির্যাতন করেছিলো সে।

বিকালের দিকে আমার কাছ থেকে ও লিখিত বন্ড নিল। আমাকে যখন ডাকা হবে তখনি আসতে হবে। আমি চলে এলাম মিলে।

পরদিন দুপুরে দু'জন অফিসার এল বিরাট গাড়িতে করে। নেভাল ক্যাপ্টেন আসলাম ও ক্যাপ্টেন গণি। আসলামের বয়স কম কিন্তু গণির বেশি। দেখে বোঝা যায় গণি সুবেদার থেকে এই বয়সে এসে ক্যাপ্টেন হয়েছে। ওরা সঙ্গে করে বৃদ্ধ জুট ইন্সপেক্টর ফজলুর রহমানকে এনেছিলো। ওনার বাড়িটাকে তখন বিহারীরা কসাইখানা বানিয়েছে। গণি ওনাকে নিয়ে বাইরে গেল। যাওয়ার সময় রহমান সাহেব মলিন মুখে আমার দিকে তাকালেন। ক্যাপ্টেন আসলাম আমার কাছে পানি চাইল।

আমি কাজে ছিলাম। আমার পিওনকে বললাম, 'পানি দাও'।

ফজলুর রহমানকে নিয়ে বিহারীদের হাতে ছেড়ে দিয়েছিল গণি। কিছুক্ষণ পরে শুনেছি বিহারীরা তাঁকে হত্যা করে টুকরো টুকরো করে 'হুলিয়া' খেলেছে। ওদের ভাষায় ওরা হোলি খেলাকে 'হুলিয়া' বলে। দেখলাম বিহারীরা কেউ কেউ গায়ে, হাতে ফজলুর রহমান সাহেবের রক্ত মেখে এসেছে আসলামকে দেখাতে।

ক্রিসেন্ট জুল মিলের ঠিক পেছন দিক দিয়ে বয়ে গেছে ভৈরব নদী। নদীর তীরে ঘেঁষে মিলের পাট গুদাম। আমার কোয়ার্টার থেকে ওটার দূরত্ব হবে বড় জোর দুশ' ফুট। তখন আমার এক ছোট বোনকে আমার সঙ্গে রেখেছিলাম। একা থাকতে ভয় লাগত বলেই ওকে এনে রেখেছিলাম। একদিন ও আমাকে বলল, 'আপা, ঘুমের মধ্যে আমি কাদের যেন বাঁচাও বাঁচাও বলে চিৎকার করতে শুনি। আমার কেমন লাগছে এখানে থাকতে।'

ওকে আশ্বস্ত করে বললাম, 'ঠিক আছে, আমি জেগে থাকব।'

সারাদিন চাকরি আর বন্দি জীবনের মানসিক ক্লান্তিতে সন্ধ্যায় অবসন্ন হয়ে পড়তাম। রাত জাগতে পারতাম না। তাড়াতাড়িই ঘুমিয়ে পড়তাম। সেদিন ওর কথা শুনে জেগে থাকলাম।

রাত প্রায় তিনটার দিকে নদীর দিকে থেকে অস্পষ্ট শব্দ ভেসে এল– 'বাঁচাও বাঁচাও।'

আমি উঠে বসলাম। জানালা একটু ফাঁক করে দেখি গুদামের কাছে একটা ট্রাক দাঁড়ানো। মুখে কালো কাপড় বাঁধা কয়েকজন মানুষ বিক্ষিপ্ত হাঁটাহাঁটি করছে। হঠাৎ আলোর তীব্রতা কমে গেল। মনে হল একটা ছাড়া বাকি লাইট নিভিয়ে দিয়েছে। আলো-আঁধারির মধ্যে দেখলাম চোখ কালো কাপড়ে বাঁধা একজনকে নামাল ট্রাক থেকে। পাট কাটার মেশিন, যেটা দেখতে অনেকটা গিলোটিনের মতো, ওটার তলায় ফেলে দেহ থেকে মাথা আলাদা করল। একটা, দুইটা, তিনটা– এভাবে চারটা দেখার পর আর পারলাম না। মাথা নামিয়ে নিলাম। ভয়ে সে রাতে আর ঘুম হল না। চোখ বন্ধ করলেই ভেসে উঠছে রক্ত হিম করা সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্য। ট্রাক, স্বল্প আলো, কালো কাপড়, দু'খণ্ড মানুষ, কানে ভেসে আসছে অস্ফুট করুণ আর্তনাদ– 'বাঁচাও বাঁচাও!'

ওই রাতের পর আর কোনোদিন ও ঘরে শুইনি। ওই বীভৎস নারকীয় হত্যার কাহিনী আমার বোনকে বলিনি, পাছে সে ভয়ে চলে যায়।

হঠাৎ এক রাতে আমার বোন বলল, 'আপা আমাদের বাসা আর্মিরা ঘিরে রেখেছে। দেখ, কি অবস্থা!' তাকিয়ে দেখি সত্যিই তাই। ওকে বললাম, ঘরের ভেতর লুকিয়ে থাকতে। একজন আর্মি এসে আমাকে বলল, 'মেজর আলতাফ করিম আপনাকে নিচে ডাকে।'

আমি বললাম, 'আলতাফ করিম কে?'

কথা ঘুরিয়ে সে আবার জিজ্ঞেস করল, 'এখানে ফেরদৌসী কে?'

বললাম, 'সে তো নেই, যশোর গেছে। আমি তার আয়া।'

সে বলল, 'তুমিই ফেরদৌসী। আমরা একটু পরে আসব তোমাকে নিয়ে যাব'।

আমি বললাম, 'কোনো ভদ্রলোক এত রাতে কারও বাড়িতে আসে না। তুমি এক্ষুনি নিচে যাও।' ওই দলে যারা ছিলো তাদের মধ্যে লে. কোরবান, ক্যাপ্টেন খালেক আর ক্যাপ্টেন সুলতানকে আমি চিনেছিলাম।

ওরা জিএম ফিদাইর বাসায় ডিনারে এসেছিলো। ফিদাই ডিনার শেষে আমার বাসা ওদের দেখিয়ে দিয়েছে– এজন্য সবাই এখানে এসেছে। এসময় ওরা এও বলেছে তৎকালীন মিনিস্টার আমজাদ হোসেনের ভাগ্নী, মমতাজও নিচে গাড়িতে আছে। ঠিক তখনই আমার ছোট বোন বলল, 'তোমাকে নিলে– আমি আত্মহত্যা করব।'

আমি ওর মুখে কাপড় ঢুকিয়ে দিলাম। কারণ ওরা যদি টের পায় দু'জনকেই নিয়ে যাবে। ওদের বললাম, 'তোমরা আমাকে আজকে নিও না। আমার ছোট বোন আছে। ওকে মায়ের কাছে রেখে আসি, পরে নিও।' পরে আবার জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমরা আমাকে কি জন্যে নেবে?'

বলল, 'তোমার বিরুদ্ধে মার্ডার চার্জ আছে।'

বললাম, 'যতই মার্ডার চার্জ থাক আমি এখন যাব না, কাল সকালে যাব।'

এই করতে করতে প্রায় সকাল হয়ে গেল। ওরা চলে গেল।

বোনকে বললাম, 'এখানে তো আর থাকা যাবে না। অন্য কোথাও যেতে হবে।'

ওকে মার কাছে পাঠিয়ে দিলাম।

অফিসে গিয়ে জিএমকে ফোন করলাম। রাতের ঘটনা বিস্তারিত বললাম। শয়তানটা বলল, 'হ্যাঁ, আমি সব জানি। তুমি কি তাদের এন্টারটেইন করোনি? তোমাকে তো এ জন্যই রেখেছি।' 'আরো বলল, 'তুমি এখান থেকে যাওয়ার কোনোরকম চেষ্টা করবে না। যদি যাওয়ার চেষ্টা কর তবে তোমাকে হত্যা করা হবে।'

আমি বললাম, 'এ অবস্থায় আমি থাকব কি করে? এটা তো আমাকে হত্যা করারই সামিল।'

সে বিরক্ত হয়ে বলল, 'কর্নেল খটক তোমার সঙ্গে কথা বলবেন। তোমাকে যশোর যেতে হবে। তার লোক এসে তোমাকে নিয়ে যাবে। তুমি আপত্তি করলে তোমাকে কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেয়া হবে, যেখান থেকে প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারবে না।'

রাতে ফিদাইর চিঠি নিয়ে ক্যাপ্টেন সুলতান, লে. কোরবান আর বেঙ্গল ট্রেডার্স-এর অবাঙালি মালিক ইউসুফ এল আমাকে যশোর নিয়ে যেতে। পাষণ্ডরা যশোর যাওয়ার পথে গাড়ির ভেতর আমাকে ধর্ষণ করেছে।

কর্নেল খটকের হাতে তুলে দেয়ার আগে ওরা যশোর ক্যান্টনমেন্টের বিলিয়ার্ড রুমে গিয়ে আবার ধর্ষণ করেছে। সেই সময় আমার মনের অবস্থা কী ছিল কোনও দিন ভাষায় প্রকাশ করা তা সম্ভব হবে না। আমাদের বাড়ির কাছে কবরস্থানে বাঙালিদের হত্যা করে লাশ ফেলে রাখতে দেখেছিলাম আমি। সেই লাশ পচে-গলে যাওয়ার পরও সৎকার হয়নি। নিজের দেহকে নিজের মনে হত না। গলিত কোনও লাশের মতো মনে হত। নির্মম-নৃশংস নির্যাতনের এক পর্যায়ে আমার বোধশক্তি লোপ পেয়েছিলো। কর্নেল খটকের দেখা পাওয়ার আগে আটাশ ঘণ্টা একটানা সংজ্ঞাহীন ছিলাম আমি। কখন ডাক্তার এসেছে, শুশ্রূষা করেছে কিছুই বুঝতে পারিনি।

কর্নেল খটক আর কর্নেল আবেদ আমাকে জেরা করেছে প্রফেসর ভূঁইয়ার হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে। ওরা বার বার বলেছে, 'তোমার ভাইরা মুক্তিবাহিনীতে গেছে। ওদের সঙ্গে তোমার যোগাযোগ আছে।'

আমার ওপর নির্যাতন চালানোর জন্য তাদের অজুহাতের অন্ত ছিল না। যদিও জানি কোনো কারণ না দেখিয়েই ওরা লাখ লাখ নারী-পুরুষের ওপর নির্যাতন চালিয়ে হত্যা করেছে। আমি জানতাম ওদের জেরার জবাব দিয়ে কখনও ওদের সন্তুষ্ট করতে পারব না। ওরা আমাকে রেহাই দেবে না। শেষের দিকে জেরার কোনও জবাব দিতাম না। বলতাম, 'আমাকে তোমরা মেরে ফেল। এভাবে নির্যাতন করো না।'

পাকিস্তানি বর্বরদের হাতে মৃত্যু আমার ভাগ্যে ছিল না। যশোর ক্যান্টনমেন্টে কর্নেল খটক আর কর্নেল আবেদও আমাকে নির্যাতন করেছে। শুধু এরা নয়, যশোর ক্যান্টনমেন্টে কর্নেল আবদুল্লাহ ও কর্নেল জাফরও জেরার নামে আমার ওপর বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন চালিয়েছে। আমার কাকুতি, আমার কান্না, আমার প্রতিরোধ, আমার ঘৃণা– কিছুই নিবৃত্ত করতে পারেনি উচ্চপদস্থ আর্মি অফিসারের ব্যাজধারী পাষণ্ডদের। আমি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নাৎসি সৈন্যদের অত্যাচারের বহু বিবরণ পড়েছি, বহু ছবি দেখেছি। একাত্তরে পাকিস্তানি সৈন্যদের যে নৃশংসতা প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ করেছি বর্বরতার সব ইতিহাসকে তা ম্লান করে দিয়েছে।

আমার ন'মাসের অভিজ্ঞতায় একজন মাত্র পাকিস্তানি আর্মি অফিসারের দেখা আমি পেয়েছিলাম যাকে তুলনামূলকভাবে ভদ্র মনে হয়েছে। যশোর ক্যান্টনমেন্টে এক রাতে সে এসেছিলো। আমাকে দেখে সে অবাক হয়ে বলল, 'এ কী অবস্থা হয়েছে আপনার? আমার কথা কী মনে আছে? আপনার সঙ্গে ক্রিসেন্ট জুট মিলে দেখা হয়েছিল। আমার নাম মেজর আলতাফ করিম। আপনাকে আমার ভালো লেগেছিলো। মনে হয়েছে অত্যন্ত আত্মমর্যাদাসম্পন্ন একজন। এখনও আমি আপনাকে পছন্দ করি। যাহোক, আপনাকে একটা কথা বলি। আমার বাবা একজন এডুকেশনিস্ট, কলেজের প্রিন্সিপাল।

এখানে আমার আসার কোনো ইচ্ছে ছিলো না। বাধ্য হয়ে আমাকে আসতে হয়েছে। আপনাকে কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে নিয়ে যেতে বলা হয়েছে। আপনি কি একটু দেখে আসবেন?'

আজ আমি যেভাবে কনসেনট্রেশন ক্যাম্প বুঝতে পারি তখন অতটা বুঝতাম না। বললাম, 'কোথায় সেটা? ওখানে গেলে কি বাসায় ফেরা যাবে?'

আলতাফ বলল, 'আমার ওপর শুধু অর্ডার কাছে ক্যাম্পটা ঘুরিয়ে দেখানোর। আপনি সব কিছু অস্বীকার করছেন বলেই দেখানো হবে। বাসায় ফেরার ব্যাপারে আমার কোনো হাত নেই।' তারপর জিজ্ঞেস করল, 'রিকশায় যেতে চান না জিপে?'

বললাম, 'আমার হাঁটার ক্ষমতা নেই। জীপেই সুবিধা।'

কনসেনট্রেশন ক্যাম্প ছিল একটা ছোট ব্যারাকের মতো। অনেকগুলো ছোট ছোট রুম। বন্দিদের পেটানোর শব্দ ও প্রচণ্ড চিৎকার শুনতে পাচ্ছিলাম।

আলতাফ জানাল, 'ওটা নির্যাতনের শব্দ।' সে জানতে চাইল বেশি কিছু দেখতে চাই কিনা।

আমার মাথা ঘুরছিলো। দাঁড়াতে পারছিলাম না। কোনওরকমে বললাম, 'আর দেখতে চাই না। আমাকে মুক্তি দাও।'

আলতাফ বলল, 'তুমি তো গুলজারিনের সঙ্গে লিখিত চুক্তি করেছ। ওখানে আমার কোনো হাত নেই। তবে আমি রিপোর্ট দিয়ে ছেড়ে দেব।'

পরে দেখেছি আলতাফ আমাকে অন্যদের সামনে গালাগালি করত। অন্যদের দেখিয়ে ছড়ি ঘুরাত, কিন্তু একান্তে ভদ্র ব্যবহার করত।

এর পরদিন ও আমাকে জিপে করে নিয়ে গেল ব্রিগেডিয়ার হায়াৎ-এর কাছে। সে আমাকে একটা চিঠি দিল এবং বলল, 'তুমি এখন যেখানে আছ, ওখানেই থাকবে। যাতে করে ডাকা মাত্রই পাওয়া যায়। তোমার ব্যাপারে আমাদের ইন্টারোগেশন শেষ হয়নি।'

সেদিনই মেজর একরাম আমাকে জুট মিলে পৌঁছে দিল। মেজর আলতাফের অনুরোধে তার বন্ধু একরাম আমাকে সেদিন খালিশপুর পৌঁছে দিয়েছিলো। একরামকে পরে জেনেছি এক গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভেতর দিয়ে।

একদিন খুলনার আর্মি হেড কোয়ার্টার থেকে একজন অফিসার আমাকে ফোন করে বলল, 'আপনি কি ফরিদ বলে কাউকে চেনেন? পাবলাতে বাড়ি?'

বললাম, 'হ্যাঁ চিনি।' 'ফরিদ সেই দারোগাবাড়ির ছেলে যাদের আশ্রয়ে আমি ছিলাম।

অফিসার বলল, 'সে ধরা পড়েছে। আপনার নাম বলেছে। আপনাকে যোগাযোগ করতে বলেছে।'

প্রথমে মনে হলো এটা কোনও ফাঁদ হতে পারে। পরে মনে হলো ফরিদ যদি সত্যি সত্যি আর্মির হাতে পড়ে ওকে ওরা মেরে ফেলবে, ওর জন্য কিছু করতে হবে। প্রচণ্ড মনোকষ্ট আর হতাশা ঘিরে ধরল। টেলিফোনকারী অফিসারকে শুধু বললাম, 'আজ তো

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। কাল খোঁজ করে দেখব কী করা যায়।'

অফিসার জানাল, 'ফরিদকে গতকাল যশোরে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে।'

মেজর আলতাফ তখন যশোরে। আমি আলতাফকে ফোন করলাম। চেহারার বর্ণনা দিয়ে বললাম, 'আলতাফ এ রকম চেহারার নিরীহ ছেলেকে আর্মিরা ধরে নিয়ে গেছে।'

সে বলল, 'দ্যাখ তোমার ব্যাপারটা ছিলো অন্যরকম– আমি দেখেছি। ওই ছেলেকে মেজর কোরবান পেটাচ্ছে। আমি এ ব্যাপারে কিছু বলতে পারব না।' পরে খোঁজ নিয়ে বলল, 'ওকে ছেড়ে দেয়া সম্ভব হবে না। ওর কাছে মুক্তিবাহিনীর চিঠি পাওয়া গেছে। তুমি যশোর এসে মেজর একরামের সঙ্গে যোগাযোগ কর।'

আমি যশোর এসে আলতাফকে ফোন করলাম। আলতাফের মাধ্যমে জানলাম ফরিদ মেজর একরামের আন্ডারে। মেজর একরামের সঙ্গে দেখা করলাম। আলতাফ আমাকে দেখা করার ব্যবস্থা করল।

আমাকে একরাম জিজ্ঞেস করল, 'তোমার সঙ্গে ওর যোগাযোগ কি করে? ওর কাছে তো মুক্তিযোদ্ধাদের চিঠি পাওয়া গেছে।'

বললাম, 'ষড়যন্ত্র করা হয়েছে। ওর এক সৎ ভাই ওর পকেটে চিঠি রেখে ধরিয়ে দিয়েছে।'

একরাম বলল, 'তিনদিন পর আমার কাছে এসে ফরিদকে বুঝে নিয়ে যেও।'

পরে সে আমাকে ফরিদের সঙ্গে দেখা করার ব্যবস্থা করল। আমাকে দেখে ফরিদ পা জড়িয়ে ধরল। বলল, 'আপা, আমাকে বাঁচান।'

ওকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, 'ভয় পেয়ো না। তোমার কিছু হবে না'।

তিন দিন পর ফরিদকে আনার জন্য আবার যশোর গেলাম। মেজর একরাম খুবই ভদ্র ব্যবহার করল। সম্ভবত আলতাফ ওকে আমার ব্যাপারে কিছু বলেছিল।

এ সময় আমার মেজ ভাই শিবলী এসে দেখা করল। বলল, 'আপা, তুই তো মেজর একরামকে চিনিস। ওর কাছে যশোরের গুরুত্বপূর্ণ কতগুলো জায়গার ম্যাপ আছে। তাছাড়া ওদের কনফারেন্স রুমটাও একটু দেখা দরকার। তুই কি আমাকে একবার ওর কাছে নিয়ে যেতে পারবি?'

প্রথমে ভয় হলো। শিবলী মুক্তিযুদ্ধে গেছে এটা আর্মির অজানা থাকার কথা নয়। পরে মনে হল নাম গোপন করে ছোট ভাই হিসেবে ওর পরিচয় দেয়া যায়। শিবলীর বয়স তখন উনিশ হলেও দেখে পনের-ষোলর বেশি মনে হত না। খুবই নিষ্পাপ চেহারা ছিলো ওর। শিবলীর কথামতো মেজর একরামকে ফোন করলাম। বললাম, 'তুমি আমার এত উপকার করেছ তোমাকে ধন্যবাদ জানাবার জন্য একবার দেখা করতে চাই।'

একরাম বলল, 'কালই চলে এস।'

পরদিন ছিল ছুটির দিন। শিবলীকে নিয়ে একরামের সঙ্গে দেখা করলাম। শিবলীর পরিচয় দিলাম এই বলে– 'আমার ছোট ভাই, সৈয়দ হাসান।'

শিবলী খুব অল্প সময়ে মানুষের সঙ্গে ভাব জমাতে পারত। একরামের সঙ্গে নানা বিষয়ে কথা বলা শুরু করল। একরামের ব্যবহারও আন্তরিক ছিলো। ও বোঝাতে চাইছিল, বাংলাদেশ আলাদা হলে অর্থনৈতিক অবস্থা আরও খারাপ হবে, জিনিসপত্রের দাম বাড়বে– এসব। শিবলীও ওর সঙ্গে তাল দিচ্ছিলো।

দুপুরে খাওয়ার সময় একরাম আমাদের বলল খেয়ে যেতে। আমি বললাম, 'আজ আমাকে অফিসে ওভারটাইম ডিউটি করতে হবে। অন্য একদিন আসব।'

শিবলী একরামকে বলল, 'আপনি তাস খেলতে পারেন?'

একরাম হেসে বলল, 'কেন পারব না? তোমার আপা খেলবেন?'

শিবলী বলল, 'ও খেলতে পারে না। চলুন, আপনাকে কিছু ট্রিকস দেখিয়ে দিই।'

একরাম আমাদের নিয়ে গেল পাশের ঘরে ওর রেস্ট রুমে। একরাম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে থাকলেও ওর জিনিসপত্র খুব গোছানো থাকত না। ওর বিশ্রামের ঘরে টেবিলে অনেক দরকারী কাগজ এলোমেলো ছড়িয়ে ছিলো। তাস নামিয়ে খেলা শুরুর আগে একরাম বলল, 'আমি একটু বাথরুম থেকে আসছি।'

ও বেরিয়ে যেতেই শিবলী ওর কাঙ্ক্ষিত কাগজ খুঁজতে আরম্ভ করল। টেবিলে, ড্রয়ারে কোথাও না পেয়ে বিছানার তোষক উল্টাতেই ওটা পেয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ওটা ভাঁজ করে পিঠের কাছে প্যান্টের ভেতর গুঁজে ফেলল।

একরাম এল। কিছুক্ষণ তাস খেলার পর আমি বললাম, 'আমাকে যেতে হবে। নইলে পরে বাস পেতে অসুবিধে হবে।' শিবলীকে খুব নার্ভাস দেখাচ্ছিলো।

একরাম বলল, 'তোমাদের কোনো অসুবিধে হলে আমাকে জানাবে।'

একরামের অফিস থেকে পাওয়া নকশার কারণেই শিবলীরা যশোরের টেলিফোন টাওয়ারসহ কয়েকটা জায়গায় সফল অপারেশন করতে পেরেছিলো।

সেদিন যশোর থেকে খুলনা ফিরতে বাসে আরেক বিপদ। আমরা বাসে ওঠার পর আমাদের পেছন পেছন বাবড়ি চুল, লম্বা জামা পরা স্থানীয় রাজাকার কমান্ডার সাবদার আলীও উঠল। বন্দুকের বাঁট দিয়ে আমাকে গুঁতো দিয়ে সে বলল, 'নাম কি?'

আমি কড়া গলায় বললাম, 'কেন? নাম দিয়ে কী হবে?'

সে বলল, 'আপনাকে আমি ধরিয়ে দেব। আপনি নকশাল করেন।'

আরও কড়া ভাষায় বললাম, 'আপনি আমাকে কী করবেন?'

রাজাকারটা বলল, 'আমি আপনাকে এ্যারেস্ট করিয়ে দেব।'

আমাকে আবার বন্দুকের বাঁট দিয়ে গুঁতো দিল। বলল, 'এখানে নাম। দেখাচ্ছি কি ক্ষমতা আছে।' এই বলে আমার দিকে বন্দুক তুলল। গুলি করতে চাইল। কিন্তু বাস যাত্রীদের হইচই ও বাধার কারণে রাজাকারটা দমে গেল।

একটু পরে সে অভয়নগর থানায় এসে নেমে গেল। বলল, 'শহীদ মিনারে দুটো মুণ্ড ঝুলিয়েছি, আরও ঝোলাব।'

তাকিয়ে দেখি শহীদ মিনারে সত্যি দুটো মুণ্ড ঝুলছে।

খুলনায় ফেরার কিছুদিন পরের ঘটনা। একদিন অফিসে কাজ করছি। এমন সময় টেলিফোন বাজল। রিসিভার তুলতেই অপর প্রান্ত থেকে বলল, 'আমি ক্যাপ্টেন জাফর বলছি। কয়েকদিন হলো নেভী হেড কোয়ার্টার-এ এসেছি। এ ক'দিনে তোমার অনেক প্রশংসা শুনেছি। আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

ওই দিন আমি প্রত্যাখ্যান করলেও পরে সে মাঝে মাঝে দেখা করত। জাফর-এর সঙ্গে ক্যাপ্টেন জলিলও এসেছিলো পশ্চিম পাকিস্তান থেকে। সেও আমাকে বিরক্ত করত।

জুনিয়র অফিসারদের কারও হাত থেকেই আমি রেহাই পাইনি।

সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে আমি অনুভব করলাম আমার গর্ভে পাকিস্তানি পশুদের বিষাক্ত বীজের স্পন্দন। আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে পড়লাম। রাতের ঘুম হারাম হয়ে গেল। প্রতি মুহূর্তে অনুভব করছিলাম পাকিস্তানি পশুদের কুৎসিৎ স্পর্শ। তখন আমার পাশে এমন কেউ ছিল না যাকে আমার এ মানসিক নির্যাতনের অংশীদার করতে পারি। একাই সিদ্ধান্ত নিলাম গর্ভপাতের।

খুলনার ডা. কাদেরকে আমি চিনতাম। তাঁর কাছে গিয়ে যখন আমার সিদ্ধান্তের কথা জানালাম, তিনি বললেন, 'টাকা জোগাড় করে আনুন, আমি সব ব্যবস্থা করে দেব।'

তখন তিনি আড়াইশ' টাকা চেয়েছিলেন। সাতদিন ঘুরে দুশ' টাকার বেশি জোগাড় করতে পারিনি। ডাক্তার কাদেরের কাছে যাওয়ার পর তিনি বললেন, 'আমি আড়াইশ' টাকার কমে নিই না।'

তাকে অনুরোধ করে বললাম, 'এর বেশি আমার পক্ষে জোগাড় করা সম্ভব নয়।'

তখন তিনি বললেন, 'আপনার স্বামীর সম্মতি লাগবে।'

সেই সময় গর্ভপাতের ব্যবস্থা এখনকার মত তত সহজ ও আধুনিক ছিলো না। স্বামীর বন্ড ছাড়া ডাক্তাররা গর্ভপাত করাতেন না। ডা. কাদেরকে অনুনয় করে বললাম, 'আমার স্বামী এখানে নেই। আমিই আমার অভিভাবক'।

শেষ পর্যন্ত ডা. কাদের রাজি হলেন। আমি ক্লেদমুক্ত হলাম।

এভাবে চলে এল ডিসেম্বর মাস। বিভিন্ন জায়গায় পাকিস্তানি আর্মিদের বিদায় ঘণ্টা বাজতে শুরু করেছে। কিন্তু মিলের ভেতর বা খালিশপুর তখন অন্য চিত্র।

নভেম্বরের শেষ দিকে খালিশপুরে বিহারী ও মিলিটারিরা মিলে ব্যাপক হারে বাঙালি নিধনযজ্ঞ শুরু করেছে। ক্রিসেন্ট জুট মিলের ভেতরে বাইরেও এটা চলছিল। প্রতিদিন শত শত বাঙালি হারিয়ে যাচ্ছে। এ সময় মিলের জেনারেল ম্যানেজার ফিদাইও প্রায়ই পাকিস্তান যাওয়া-আসা করত।

২ ডিসেম্বরে ঘটল আরেক অপ্রীতিকর ঘটনা। আমাকে বিহারী ড্রাইভার রশিদ প্রতিদিন বাসায় পৌঁছে দিত। কিন্তু এদিন মদ্যপ অবস্থায় আমাকে বাসার দিকে না নিয়ে, পাগলের মত মিল গেট দিয়ে বের হয়ে গেল। গাড়ি হাঁকাল নিউজপ্রিন্ট মিলের দিকে, এক অন্ধকার গলিতে। আমি প্রতিবাদ করায় রশিদ উর্দুতে গালাগালি দিচ্ছিল আর অশ্লীল ইঙ্গিত করছিলো। রাগে ভয়ে আমার সমস্ত শরীর কাঁপছিল। পেছন দিক থেকে তার জামার কলার টেনে ধরলাম। নিউজপ্রিন্ট মিল ছাড়িয়ে একটু সামনে যেতেই আমি বাম হাত দিয়ে সজোরে দরজা ধাক্কা দিলাম। তখনও ডান হাতে ওর জামার কলার সিটের সাথে আটকে ধরা। দরজা খুলে আমি ছিটকে পড়লাম মাটিতে। তখনও বুঝতে পারিনি দরজার লকে বাম হাতের অনেকখানি কেটে গেছে। সে কাটা দাগ এখনও আছে আমার হাতে।

পরদিন মিলের সিনিয়র অফিসার ঢাকার নবাববাড়ির খাজা মোহাম্মদ আলী জিজ্ঞেস করলেন রশিদের ঘটনা সম্পর্কে। বললেন, 'আমাকে কেন জানাও নি?'

বললাম, 'স্যার, কাকে কোন কথা বলা যায়, কাকে বিশ্বাস করা যায়– এটা আমি বুঝতে পারিনি।'

৪ ডিসেম্বর অফিসে গিয়ে আহসান উল্লাহর টেলিফোন পেলাম। উনি জানালেন, 'তোমাকে হত্যার ষড়যন্ত্র চলছে। প্রতি মুহূর্তে আমি সংবাদ পাচ্ছি। দেরি না করে তুমি যেভাবে পার এক্ষুনি জে জে আই জুট মিলে চলে এস।' তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি জান না যে মিলের চারটি গেট ইতিমধ্যে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে?'

আহসানউল্লাহর ফোন শেষ হতেই যশোর ক্যান্টনমেন্ট থেকে ফোন করল মেজর আলতাফ করিম। বলল, 'যশোরের অবস্থা খুবই খারাপ। মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে মুখোমুখি লড়তে হচ্ছে। আমি জানি না বাঁচতে পারব কিনা।'

সে আমার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিল এবং বলল, 'তুমি যদি জানতে পার আমি মারা গেছি তবে আমার বাবা-ভাইকে খবরটা পৌঁছে দিও। ওদের বলো তোমার সঙ্গে আমার আজ শেষ কথা হয়েছে'। সে ঠিকানা দিল। সব শেষে বলল, 'জানি, আমি অন্যায়ভাবে পাকিস্তানের পক্ষে লড়াই করছি কিন্তু আমি একজন সৈনিক, আমার করার কিছু নেই।'

আলতাফ একসময় আমাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলো। আমার সন্তানদের ভারও নিতে চেয়েছিলো। বলেছিলো, 'এখানকার অবাঙালিরা জানে আমি তোমাকে পছন্দ করি। আমি না থাকলে ওরা তোমাকে নির্ঘাত হত্যা করবে। তুমি পাকিস্তানে আমার স্ত্রী হিসেবে মর্যাদার সঙ্গে থাকবে। তোমার স্বামী ফিরে এলেও সে তোমাকে গ্রহণ করবে না।' কিন্তু আমি ওর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলাম। বলেছিলাম, 'স্বামী গ্রহণ করবে কি করবে না এ নিয়ে আমি ভাবি না। তুমি একজন ভালো মানুষ। কিন্তু কোনও পাকিস্তানিকে আমি স্বামী হিসেবে ভাবতেও পারি না। কেন, তার কারণও তুমি জান। যতদিন বেঁচে থাকব পাকিস্তানিদের জন্য ঘৃণা আমার এতটুকু কমবে না।'

আলতাফ আর কথা বাড়ায়নি। ওর সঙ্গে আমার শেষ দেখা হয় ডিসেম্বরের চার তারিখে। চেহারা পুড়ে কালো হয়ে গেছে। চেনা যায় না। আমার সঙ্গে কথা হয়নি। গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিলো। আমাকে সেল্যুট দিয়ে চলে যায়। একাত্তরে আলতাফ ছিলো একমাত্র পাকিস্তানি যার ভেতর বিবেকের দংশন আমি লক্ষ্য করেছি। সে জানত পাকিস্তানিরা যা করছে তা ঠিক নয়। এছাড়া পাকিস্তানি আর্মি— সাধারণ সৈন্য থেকে অফিসার পর্যন্ত সবাই ছিল ধর্ষণকামী। নিরীহ মানুষ হত্যা করে, নির্যাতন করে তারা পৈশাচিক আনন্দ পেত।

টেলিফোন শেষ করেই আমি বাসায় গেলাম। একটা কাঠের বাক্সে কাপড় ভরে বেরুনোর চেষ্টা করলাম; পারলাম না। মিল গেটে বিহারীরা আটকাল।

ছোট বোন ও কাজের মেয়ে আলেয়াকে অবশ্য আগেই পাঠিয়ে দিয়েছি। সমস্যা আমার নিজেকে নিয়ে।

পরদিন দুপুরে খাজা মোহাম্মদ আলীর টেলিফোন পেলাম। বললেন, 'মেজর বেলায়েত শাহ্ আজ আমার অফিসে আসবে। ইচ্ছে করলে তুমি তার সঙ্গে বাইরে যেতে পার।'

আগেই উনি আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন বাইরে যেতে চাই কি-না। আমি আমার ইচ্ছার কথা তাকে বলেছিলাম।

প্রথমে রাজি না হলেও পরে নিরুপায় হয়ে মেজরের গাড়িতে চড়লাম। মেজর শাহ্ ছিল সাংঘাতিক নারীলোলুপ। ওই দিনই সে আমাকে অশালীন প্রস্তাব দিয়েছিল।

খুলনার পথে গাড়ি নির্জন অন্ধকারে নিতে চাইল। আমি ভয় দেখালাম, 'ওদিকে মুক্তিবাহিনীর লোক থাকে, তোমাকে মেরে ফেলবে।'

ভয়ে হোক বা যে কারণে হোক, সে আর বেশি দূর এগুলো না। আমি নেমে গেলাম জে জে আই জুট মিল গেটে, আহসানউল্লাহর সঙ্গে দেখা করার জন্য।

কিন্তু ওঁকে দেখে আমার বহু দিনের চেপে থাকা ক্ষোভ ফেটে পড়ল। কেন তিনি আমাকে এভাবে ফেলে চলে গিয়েছিলেন? পাগলের মতো চিৎকার করছিলাম আর হাউমাউ করে কাঁদছিলাম। হঠাৎ কী হল, দুঃখে, রাগে অন্ধ হয়ে আমি সেখান থেকে বেরিয়ে এলাম। সন্ধ্যায় আবার ফিরে গেলাম ক্রিসেন্ট জুট মিলে।

৬ ডিসেম্বর আমি মাত্র তিন মিনিটের ব্যবধানে প্রাণে রক্ষা পেয়েছি। ওই দিন সোয়া দুইটার দিকে বিহারী অফিস ক্লার্ক আক্তার টেলিফোন করল। জানাল, 'আমি তোমাকে অনেক দিন ধরে পছন্দ করি কিন্তু বলতে পারিনি। আজ বলছি। এই মাত্র সংবাদ পেলাম তোমাকে একটু পরেই মেরে ফেলবে। যে অবস্থায় আছ পালাও।'

বেরিয়ে পড়লাম ব্যাগটা হাতে নিয়ে। মিলের মেইন গেট কোয়ার্টার মাইল দূরে। এর মধ্যে ওখানে পৌঁছতে পৌঁছতেই তো মেরে ফেলতে পারে। সাংঘাতিক ভয় পেলাম। এমন ভয় আমি কখনও পাইনি। কাছে রিকশা পেলাম, চড়ে বসলাম। বললাম, 'তাড়াতাড়ি চালাও।'

মাঝপথে দেখা হলো ক্লার্ক আনোয়ারের সঙ্গে। আনোয়ার আমার বিল্ডিং-এ ঠিক উপরে চার তলায় থাকত। সে যাচ্ছিলো ডিউটিতে।

গেটে পৌছুতেই দারোয়ান বলল, 'এই মাত্র আনোয়ারকে অফিসের সামনে মেরে ফেলেছে। এক্ষুনি ভেগে যাও।'

সামনে পেলাম একটা বেবী ট্যাক্সী। তিন গুণ ভাড়া চাইল। চড়ে বসলাম। জে জে আই জুট মিলে পৌছুতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। আহসানউল্লাহ আমাকে পেয়ে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

আহসানউল্লাহ আমার সব কথা শুনেছেন। বলেছেন, 'আমাদের চেয়ে অনেক বড় মুক্তিযোদ্ধা তুমি। পাকিস্তানিরা কী করেছে এ নিয়ে বিন্দুমাত্র ভাববে না। আমার কাছে তুমি যেমন ছিলে তেমনই আছ।'

আহসানউল্লাহদের জে জে আই জুট মিলের জি এম ইদ্রিস সাহেবও ছিলেন অবাঙালি কিন্তু আমাদের জিএম-এর সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁর জন্যই জে জে আই জুট মিলে বাঙালি স্টাফদের কোনও ক্ষতি করতে পারেনি পাকিস্তানিরা। নভেম্বরের দিকে তাঁরই ভরসায় আহসান উল্লাহ কাজে যোগ দিয়েছিলেন।

৬ ডিসেম্বর যশোর ক্যান্টনমেন্ট থেকে ইদ্রিস সাহেবকে জানান হলো, যশোরের পতন হতে চলেছে। তিনি যেন সব অবাঙালি স্টাফ নিয়ে খুলনা চলে যান। বাঙালিদের ব্যবস্থা আর্মি এসে করবে।

ইদ্রিস সাহেব বলেছেন, তিনি বেঁচে থাকতে তাঁর একজন বাঙালি স্টাফের গায়ে কেউ আঁচড় কাটতে পারবে না। তিনি আমাদের সবাইকে নিয়ে খুলনা এলেন। আমরা সবাই সেলিম হোটেলে গিয়ে উঠলাম। হোটেলের খরচ মিলের পক্ষ থেকে বহন করা হয়েছে। এসব ব্যবস্থা ইদ্রিস সাহেবই করেছিলেন। যে কারণে স্বাধীন বাংলাদেশে তিনিই একমাত্র অবাঙালি অফিসার যাকে তাঁর বাঙালি স্টাফরা মাথায় তুলে রেখেছিলো।

১৬ ডিসেম্বর দেশ হানাদারমুক্ত হলো। পরদিন আহসান উল্লাহ্ আমাকে বললেন 'চল তোমাকে এক জায়গায় নিয়ে যাব।'

গাড়িতে করে তিনি আমাকে আনলেন খুলনায় গল্লামারি বধ্যভূমিতে। বিশাল প্রান্তর জুড়ে ছড়িয়ে আছে হাজার হাজার মানুষের লাশ। শুধু প্রান্তরে নয়, আশেপাশে ধান-ক্ষেত ও পাটক্ষেতেও ছড়িয়ে ছিল লাশ। বাতাসে পাট গাছ যখন এলোমেলো হচ্ছে ফাঁক দিয়ে দেখি লাশের স্তূপ। কোনও লাশই তিন-চারদিনের বেশ পুরনো নয়।

চোখের সামনে অসংখ্য লাশ দেখেও সেই মুহূর্তে আমার কোনও অনুভূতি ছিলো না। মনে হচ্ছিলো যে দেহটা আমি বইছি সেটা ওরকমই একটা লাশ।

একাত্তরের সেই ভয়ঙ্কর দিনগুলোর কথা যখন ভাবি, মনে হয় আটাশ বছর ধরে সেই গলিত বিকৃত লাশ আমি কাঁধে নিয়ে ঘুরছি।

পরিশিষ্ট-ব

'আমি বীরাঙ্গনা বলছি'

["১৯৭২ সালে যুদ্ধ জয়ের পর যখন পাকিস্তানি বন্দিরা ভারতের উদ্দেশ্যে এ ভূখণ্ড ত্যাগ করে তখন আমি জানতে পারি প্রায় ত্রিশ-চল্লিশজন ধর্ষিত নারী এ বন্দীদের সঙ্গে দেশ ত্যাগ করছেন। অবিলম্বে আমি ভারতীয় দূতাবাসের সামরিক অফিসার ব্রিগেডিয়ার অশোক ডোরা এবং বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের দায়িত্বে নিয়োজিত মরহুম নুরুল মোমেন খান, যাঁকে আমরা মিহির নামে জানতাম তাঁদের শরণাপন্ন হই। উভয়েই একান্ত সহানুভূতির মনোভাব নিয়ে এসব মেয়েদের সাক্ষাৎকার নেবার সুযোগ আমাদের করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিকা নওসাবা শরাফী, ড. শরীফা খাতুন ও আমি সেনানিবাসে যাই এবং মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা লাভ করি। পরে নারী পুনর্বাসন কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত থেকে নারকীয় বর্বরতার কাহিনী জানতে পারি। সেই থেকে বীরাঙ্গনাদের সম্পর্কে আমার আগ্রহ জন্মে, নানা সময়ে দিনপঞ্জীতে এঁদের কথা লিখে রেখেছিলাম। ইচ্ছা ছিল, জনসমাজে এদের পরিচয় তুলে ধরবো। এ ক্ষুদ্র গ্রন্থ সে আগ্রহেরই প্রকাশ।"
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ভূতপূর্ব চেয়ারম্যান, আলোচিত সাহিত্যিক ও নারী নেত্রী ড. নীলিমা ইব্রাহিমের 'আমি বীরাঙ্গনা বলছি' গ্রন্থ থেকে দু'টি ঘটনা।]

"বঙ্গবন্ধু ফিরে এলেন, চারদিকে স্বাধীনতার উৎসব। শুধু অন্ধকার গুহায় সর্বস্বান্ত আমরা কতজন বন্দিনী নিঃস্ব-রিক্ত। আজ নিজেকে বাঙালি বলে পরিচয় দেবার সম্বলটুকুও আমরা খুইয়ে বসে আছি। কেন এমন হলো। শুধু আমরা নারী বলেই অপবিত্র আর রাজাকার আলবদরেরা পাপ করে আজ সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিত্ব। এ তোমার কেমন বিচার আল্লাহ?"

—বীরাঙ্গনা মেহেরজান

আমি মেহেরজান বলছি। নাম শুনে তো আপনারা আনন্দিত ও পুলকিত হবেন কারণ ভাববেন আমি গওহরজান বা নগরজানের ঘরানার কেউ। দুঃখিত, তাদের সঙ্গে এ জীবনে আমার যোগাযোগের কোনও সূত্র ঘটেনি, তবে ঘটলেও আশ্চর্য হবার কিছু ছিল না। জীবনটা তো সরল সমান্তরাল রেখায় সাজানো নয়। এর অধিকারী আমি সন্দেহ নেই, কিন্তু গতিপথ নিয়ন্ত্রণ করেন — কি বললেন আল্লাহ, পাগল হয়েছেন বাঙালি মেয়ের জীবন পরিচালিত হবে আল্লাহর নির্দেশে! তাহলে এদেশের মওলবী মওলানারা

তো বেকার হয়ে থাকবেন, আর রাজনীতিবিদরাই বা চেঁচাবেন কি উপলক্ষ করে? না এসব আমার নিজস্ব মতামত, অভিযোগের বাঁধা আঁটি নয়।

আমি নিজে সচেতন ও দৃঢ় বিশ্বাসী যে আমি একজন বীরাঙ্গনা। আমার রাষ্ট্র আমাকে স্বীকৃতি দিয়েছে, আমার পিতামাতা হাত বাড়িয়ে আমাকে বুকে নিতে চেয়েছিলেন কিন্তু সমাজের জুলুমবাজির ভয়ে আমি তাদের ঘরে যেতে পারিনি। তবে আপনারা বিশ্বাস করতে পারেন আপনাদের দৃষ্টিতে আমি বীরাঙ্গনা না হলেও নিঃসন্দেহে বারাঙ্গনা নই। এ কথা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছি যে, সব কিছুর ওপরে আমি একজন অঙ্গনা। পুরুষের লালাসিক্ত জান্তব দৃষ্টি আমি দেখেছি, ভর্ৎসনা অত্যাচার সয়েছি আর তাতেই জীবনের দীর্ঘ আট মাস আমি প্রতি মুহূর্তে অনুভব করেছি, উপলব্ধি করেছি, আমি অঙ্গনা এইবা কম কি? নারী জন্ম তো কম কথা নয়, আমরা জীবন সৃষ্টি করতে পারি, স্তন্য দানের ক্ষমতা আমাদের আছে। দশ মাস গর্ভে ধারণের পরও লালনপালনের দায়িত্ব আমাদের। আমিও তাই এক সন্তানের জননী। নাইবা পেলাম স্বামীর সোহাগ, সুখের সংসার, তবুও তো নিজের পায়ে সম্মানের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছি। যেভাবে এখন আপনাদের কাছে কথা বলছি আমি কিন্তু ওরকম অহংকারী নই। আসলে নিজেকে তো প্রকাশ করবার সুযোগ-সুবিধা পাইনি, মাথাটা নিচু করেই সবার দৃষ্টি বাঁচিয়ে সংসারে ন্যূনতম স্থান অধিকার করেই কোনওমতে টিকে ছিলাম। কিন্তু আমার মাতৃতুল্য এক মহিলার মুখে শুনলাম আমি একজন মহীয়সী নারী। যোয়ান অব আর্কের মতো দেহে না দিলেও আমার শ্রেষ্ঠ সম্পদ নারীত্ব আমি দেশের জন্য উৎসর্গ করেছি। তবুও কোনো মিনারে আমাদের নাম কেউ খোদাই করেনি। সম্ভবত লজ্জায়। কারণ রক্ষা তো করতে পারেনি আমাকে সর্বনাশের হাত থেকে, হাততালি দেবে কোন মুখে? আমার অবস্থানের জন্য আমি উপেক্ষিত হয়েছি নির্মম নিষ্ঠুরভাবে কিন্তু জানি না কোন ঐশ্বরিক শক্তির বলে আমিও কখনও মাথা নোয়াইনি।

আমার জন্মস্থান ঢাকা শহরের কাছেই কাপাসিয়া গ্রামে। বাংলার মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ওই গ্রামেরই বীর সন্তান তাজউদ্দীন আহমেদ ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী। এ কারণে ওই গ্রামের সাধারণ মানুষ মুক্তিযুদ্ধের ঘোরতর সমর্থক। স্কুলে পথে ঘাটে আমাদের সবার মুখে 'জয় বাংলা' 'জয় বঙ্গবন্ধু', কিন্তু জয়ের এ জোয়ার বেশিদিন স্থায়ী হল না। এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে বিনামেঘে বজ্রপাত। হঠাৎ নরসিংদী বাজারে প্লেন থেকে গুলিবর্ষণ করে সমস্ত বাজারে আগুন ধরিয়ে দেয়া হল। আমার বাবার ছোট্ট একটি দোকান ছিল ওই বাজারে। বাবা দর্জির কাজ করতেন সঙ্গে ছিলেন দু'জন সহকর্মী। মোটামুটি যে আয় হতো তাতে আমাদের সংসার ভালোভাবেই চলে যাচ্ছিল এবং আমরা চার ভাইবোন সবাই পড়াশুনা করছিলাম। এক ভাই কলেজে পড়ে, থাকে নরসিংদীতে বাবার সঙ্গে। আমি, মা, আমার ছোট দু'ভাই থাকতাম কাপাসিয়া। ধীরে ধীরে পরিবেশ উত্তপ্ত হয়ে উঠতে লাগলো। আহত এবং পলাতক ইপিআর বাহিনীর সদস্যরা এ বাড়ি ও বাড়ি আশ্রয় গ্রহণ করতে থাকে। সম্ভবত এ সংবাদ গোপন ছিল না। তখনও প্রকাশ্যে রাজাকার বাহিনী আত্মপ্রকাশ করেনি।

গোপনে সংবাদ আদান-প্রদান চলছিল। একদিন হঠাৎ বিকেলের দিকে গ্রামে চিৎকার উঠলো মিলিটারি আসছে, মিলিটারির ভয়ে মানুষজন দিশাহারা। সবাই নিজ নিজ বাড়ির উদ্দেশ্যে দৌড়াতে লাগলো। দেখতে দেখতে মনে হলো গ্রামের চারদিকে আগুনে ছেয়ে গেছে। মাঝে মাঝে গুলির শব্দ। বাবা ও বড় ভাই নরসিংদীতে ওই আধপোড়া দোকানের মেরামতের কাজে ব্যস্ত। বাড়িতে আমি, মা ও ছোট দুই ভাই লালু আর মিলু। লালু গিয়েছে স্কুলের মাঠে ফুটবল খেলা দেখতে, এখনও ফেরেনি। মা ঘর বার করছেন, এমন সময় একটা জলপাই রঙ-এর জিপ এসে বাড়ির সামনে বিকট আওয়াজ করে থামলো। মিলুকে বুকে জড়িয়ে ধরে আর আমার হাত ধরে মা শোবার ঘরে ঢুকলেন। কে যেন বাংলা বলছে, হ সাব, এইডাই মেহেরজান গো বাড়ি, বহুত খুব সুরত লেড়কী। আমার দেহ অবশ হয়ে আসছে। এমন সময় দরজায় লাথি। দ্বিতীয় লাথিতেই দরজা ভেঙ্গে পড়লো। কয়েকজন লোক লুঙ্গি পরা ওদের সামনে। আমাদের টেনে বাইরে নিয়ে এল। ক্ষীণ দেহে যথাসাধ্য বাধা দিতে চেষ্টা করলাম। চুল ধরে আমাকে জীপে তোলা হল। মা আর্তনাদ করতেই মাকে ও মিলুকে লক্ষ্য করে ব্রাশ ফায়ার করলো শয়তানরা। আমাকে যখন টানাহেঁচড়া করছে দেখলাম মায়ের দেহটা তখনও থরথর করে কাঁপছে। গাড়ি স্টার্ট দেবার পর দেখলাম মিলুর মাথাটা হঠাৎ কাত হয়ে এক দিকে ঢলে পড়লো। বুঝলাম মা ও মিলু চলে গেল। হঠাৎ করে আর্তনাদ করে উঠতেই ধমক খেলাম। 'চোপ খানকী', বোবা হয়ে গেলাম। আমাকে ওই সম্বোধন করলো কি করে? আমি ভদ্র ঘরের মেয়ে, অষ্টম শ্রেণীতে পড়ি। হঠাৎ কেমন যেন শক্ত কঠিন হয়ে গেলাম। আমার এই মানসিক স্থবিরতা কেটেছে অনেক দিন পরে। সেখান থেকে হাত ও জায়গা বদল হয়ে কখনও একা কখনও আরও মেয়েদের সঙ্গে ঘুরতে লাগলাম। মাঝখানে মনে হতো বাবা আর বড় ভাই বেঁচে আছে কি? লালু? লালু কি পালাতে পেরেছিল? আবার ভাবতাম কে বাবা, কে ভাই, লালুইবা কে আর আমিইবা কে? নিজেকে এটা অশরীরী কঙ্কালসার পেত্নী বলে মনে হতো। কিন্তু তবুও এ দেহেটার অব্যাহতি নেই। মাস দুই পর ওদের নিজেদের প্রয়োজনে আমাদের গোসল করতে দিতো। পরনের জন্য পেতাম লুঙ্গি আর শার্ট কিংবা গেঞ্জি, শাড়ি দেওয়া হতো না। ভাবতাম বাঙালির শাড়িকে ঘৃণা করলে আমাদের তো সালোয়ার কামিজ দিতে পারে। ময়মনসিংহ কলেজের 'এক আপাও ছিলেন আমাদের সঙ্গে, বললেন, তা নয় শাড়ি বা দোপাট্টা জড়িয়ে নাকি কিছু বন্দী মেয়ে আত্মহত্যা করেছে তাই ও দুটোর কোনটাই দেওয়া হবে না। তাছাড়া আমরা তো পোষা প্রাণী। ইচ্ছে হলে একদিন হয়ত এ লুঙ্গি-শার্টও দেবে না। আপা নির্বিকারভাবে কথাগুলো বললেন। দৃষ্টি উপরের দিকে অর্থাৎ ছাদের দিকে। উনি বেশিরভাগ সময়ই একা একা উপরের দিকে তাকিয়ে থাকতেন। মনে হতো যেন বাইরের আলো দেখবার জন্য ছিদ্র খুঁজছেন। ক'দিন পর আপা অসুস্থ হলো। শুয়ে থাকতো, ওকে শাড়ি পরিয়ে বাইরে নিয়ে যাওয়া হল ডাক্তার দেখাবার জন্য। আপা আর ফিরলো না। ভাবলাম আপা বুঝি মুক্তি পেয়েছেন, অথবা হাসপাতালে আছেন। কিন্তু না, আমাদের এখানে একটা বুড়া মতো জমাদারনী ছিল. বলল, আপা গর্ভবতী হয়েছিল তাই ওকে মেরে ফেলা হয়েছে। ভয়ে সমস্ত দেহটা কাঠ

হয়ে গেল। এতে আপার অপরাধ কোথায়? আল্লাহ একি মুসিবতে তুমি আমাদের ফেললে? কি অপরাধ করেছি আমরা? কেন এই জানটা তুমি নিয়ে নিচ্ছো না? এখানেই চিন্তা থেমে যেতো। কেন জানি না মরবার কথা ভাবতাম না। ভাবতাম দেশ স্বাধীন হবে, আবার বাড়ি ফিরে যাবো। বাবা-মা, বড়ভাই লালু-মিলু আবার আমরা হাসবো-খেলবো-গল্প করবো। কিন্তু আমি যে মাকে আর মিলুকে মরতে দেখে এসেছি। কিন্তু এমনও তো হতে পারে মিলিটারি গ্রাম থেকে চলে গেলে মাকে আর মিলুকে গ্রামের লোকে বাঁচিয়ে তুলেছে, বাবাকে খবর দিয়েছে। হতেও তো পারে। ভাবনার আদি-অন্ত ছিল না। দিন রাতের ব্যবধানও ছিল শুধু শারীরিক অবস্থা ভেদে। প্রথম রাত্রি যেতো পশুদের অত্যাচারে, বাকি রাত দুঃখ-কষ্ট, মর্মপীড়া, দেহের যন্ত্রণা এ সব নিয়ে। কতো ডেকেছি আল্লাহকে, হয়তবা সে ডাক তিনি শুনেছেন, না হলে আজও বেঁচে আছি কি করে? মাঝে মাঝে কারও ব্যাধি, মৃত্যু বা শারীরিক লাঞ্ছনা ছাড়া দিন এমনি করেই গড়িয়ে যাচ্ছিল। বন্দীদের ভেতরে নানা বয়সের ও স্বভাবের মেয়ে ছিল। চৌদ্দ-পনেরো বছরের মেয়ে থেকে চল্লিশ বছরের যৌবনোত্তীর্ণ মহিলাও ছিলেন। কেউ প্রায় সব সময়েই কাঁদতো, কখনও নীরবে, কখনও সুর করে, তবে জোরে না। আওয়াজ বাইরে গেলে কঠোর শাস্তি পেতে হতো। কেউ না কেঁদে শুধুই চুপ করে থাকতো। মনে হতো বোবা হয়ে গেছে। কেউ কেউ গল্প করতো, হাসাতোও। নিস্তরঙ্গ জীবনে এমনিই মৃদু কম্পন কখনও কখনও অনুভূত হতো।

খাবার আসতো টিনের বাসনে। বেশিরভাগ সময়েই ডাল-রুটি অথবা তরকারি নামের ঘ্যাট-রুটির সঙ্গে দেওয়া হতো। ভাত কখনও দেয়নি। যে মেয়েলোকটা খাবার দিতো সে বলতো কার কি জাত দেখবে না। তাই গোশতো দেওয়া হয় না। মনে মনে হাসলাম কারণ শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত তো পড়ে ফেলেছি। বিশ বছর ঘর করা সহজ কিন্তু হেঁসেলে ঢুকতে দেওয়া বড় কঠিন কাজ। তাই বিছানায় নিতে বাধা নেই কিন্তু গোমাংসে বোধ হয় বাধা আছে। না, পাকিস্তানিদের যতোটা হৃদয়হীন ভাবতাম ওরা প্রকৃতপক্ষে তা নয়, নইলে এমন করে জাত বাঁচাবার মহানুভবতা দেখানো কি সোজা কথা? যাক, যার যা জাত তা অন্তরে রেখে দাও, দেহ তো মহাজনের ভোগে উৎসর্গ হয়েছে।

প্রথম প্রথম বাইরের কোনও খবর পাইনি। কিন্তু এ জায়গাটায় এসে এমন একটা জমাদারনী পেলাম যে ফিসফিস করে অনেক খবর আমাদের বলতো। প্রথমে জানলাম জায়গাটার নাম ময়মনসিংহ। কাছেই কমলগঞ্জ না কি এক গঞ্জে খুব যুদ্ধ হচ্ছে মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে। যুদ্ধ যে হচ্ছে সেটা টের পেলাম এই শয়তানদের কথাবার্তা থেকে। আমরা যারা প্রথম দিকে একসঙ্গে ছিলাম তারা কিন্তু একসঙ্গে নেই। একেক সময় একজন অথবা একাধিক জনকে বেছে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া হতো। জানতামও না কে কোথায় যাচ্ছি, কেনইবা যাচ্ছি। তবে আজকাল আমাদের ক্যাম্পের থেকেই গোলাগুলির শব্দ শোনা যেতো। ভাবতাম এদিক-ওদিক যা হয় একটা হয়ে গেলেই হয়। হয় বাঁচবো না হয় মরবো, এমনভাবে মরে বেঁচে থাকার যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেলেই বাঁচি। একদিন হঠাৎ করে ভোররাতে সব কিছু ফেলে আমাদের জীপে করে

কোথায় যেন নিয়ে গেল। যেখানে এলাম সেখানে কিছু তাঁবু আর আমাদের জন্য কাঁচা বাঁশ ও দরজার বেড়া দেওয়া একটা বড় ঘর ও সঙ্গে টয়লেট। তবে বেড়ার ফাঁক দিয়ে বেশ আলো দেখা যায়। দিন-রাত বোঝা যায়। চারদিকে নিঝুম মনে হয়, দিনের বেলা এখানে লোকজন প্রায় থাকেই না। কিন্তু রাঁধুনিটা বলল ওসব কথা মাথায় এনে পালাবার চেষ্টা করো না। জান খোয়া যাবে। ওরা একটু দূরেই গাছপালা দিয়ে ঝোপের মতো করে ওখানেই থাকে। ওখান থেকেই তোপ দাগে। ভাবলাম তাহলে কি ওই হেডকোয়ার্টার মুক্তিবাহিনীর দখলে চলে গেছে? আল্লাহ তাই যেন হয়। এখন সকাল-বিকাল বেশ শীত শীত করে, রাতে কম্বল গায়ে দিতে হয়। কখনও কখনও দিনেও ঠাণ্ডা লাগে। তাতে মনে হয় নভেম্বর বা ডিসেম্বর মাস হবে। ইস কতোদিন হয়ে গেল! এসেছি মে মাসে, আর আজ বছরের শেষ। আর কতো? গোলাগুলির শব্দ প্রায় বন্ধ। রোজই রাতে ভারী ট্যাংকের শব্দ পাই। মনে হয় এখান থেকেও জিনিসপত্র সরাচ্ছে। তাহলে যাচ্ছে কোথায়? কিন্তু না, সব আশা ব্যর্থ করে দিয়ে আবার আকাশ থেকে বোমা পড়ার শব্দ! কারা বোমা ফেলছে? এ তো যুদ্ধ নয়, এক পক্ষই বোমা ফেলে চলেছে। কোনও কথাই কোথাও গোপন থাকে না। ফিসফিসানির মাধ্যমে জানলাম ভারতীয়রা বোমা ফেলছে। কিন্তু ওরা কেন? আমরা আবার কার হাতে গিয়ে পড়বো? এ ক্যাম্পে একজন বয়স্ক হাবিলদার ছিল, প্রায় ষাটের কাছে বয়স, জাতিতে পাঠান হলেও লোকটার মনে মায়া-মমতা আছে। আমার সঙ্গে কেন জানি না ভালো ব্যবহার করতো। আমি ভোগ্যপণ্য হলেও এতোদিন আমার জন্য দুঃখপ্রকাশ করেছে। কিন্তু আজ তিন দিন ওকে খুবই গম্ভীর ও ভারাক্রান্ত দেখছি। সাহস করে জিজ্ঞেস করলাম, খান সাহেব তোমার কি হয়েছে? বলল, পিয়ারী যুদ্ধ শেষ হয়ে এসেছে। খুশি হয়ে বললাম, এবারে তাহলে তোমরা দেশে ফিরে যাবে? খুব আনন্দ হচ্ছে না? কিন্তু আমাকে কোথায় ফেলে যাবে? লায়েক খান মাথা নেড়ে জবাব দিলো, না বেগম, দেশে ফিরে যাবো না। তোমার দেশেই আমার কবর হবে। আমরা হেরে গেছি। কয়েক দিনের ভেতর হয় আমাদের মেরে ফেলবে, না হয় বন্দী করবে। মুক্তির হাতে পড়লে বাঁচবার কোনো আশা নেই। আনন্দে উত্তেজিত হলেও বুদ্ধিহারা হলাম না। বললাম, খান সাহেব আমাকে শাদী করো, আমি তোমাকে মুক্তির হাত থেকে বাঁচাবো। লায়েক খান বোকা নয়, মাথা নেড়ে বলল, তা হবে না বিবি। ওরা আমাদের একজনকেও রাখবে না। পাঠান পুত্র বিষাদ ভরা কণ্ঠে বলল, তাছাড়া তুমি বেঁচে যাবে। দেশওয়ালীর সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে, ঘর বসাবে, সুখ থাকবে। তুমি খুব ভালো মেয়ে। দেখো আমার কথা সত্যি হবে। এবার জিদ ধরলাম, না তোমার আমাকে বিয়ে করতে হবে। কারণ জানতাম, এ না হলে আবার না জানি কাদের হাতে গিয়ে পড়বো। আমার সমাজ আমাকে নেবে না এ আমি জানি। কারণ যেদিন ধরে এনেছিল সেদিন যখন কেউ এগিয়ে আসেনি আজও কেউ হাত ধরে নিয়ে যাবে না। কিন্তু বাবা, বড় ভাইয়া, লালু ওরা আসবে না। হঠাৎ দেখি আমার দু'গাল বেয়ে চোখের জলে বন্যা নেমেছে আর পিতৃস্নেহে লায়েক খান আমাকে কাছে নিয়ে চোখের জল মুছিয়ে দিচ্ছে। কাছে নিয়ে বলল, ঠিক আছে, এখন তো যুদ্ধ শেষ। ক্যাম্পের মৌলভী সাহেবকে বলে দেখি যদি রাজি হয়। আর কেউ জানবে না শুধু

তুমি আমি আর মৌলভী সাহেব। ঠিক সন্ধ্যার আগে মৌলভী সাহেব নিকাহ্ পড়িয়ে দিলেন। তিনি এদেশীয় মনে হল। বেশি কিছু পাওয়ায় খুব খুশি হয়েছেন। বললেন, ভালই হল তোর জন্যে, খান সাহেব ভালো মানুষ, তোকে ফেলবে না। পরদিনই ছুটাছুটি-চেঁচামেচি, কিছু গুলির শব্দ। এদিক-ওদিক লোকজন দৌড়াচ্ছে কিন্তু সিপাহীরা যার যার হাতিয়ার নিয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। আমি আমার স্বামীর কোমর ধরে ঝুলছি। কিন্তু কি আশ্চর্য, মানুষটা আমাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল না। কে যেন লাউড স্পীকারে হুকুম দিলো, ওরা সব হাতিয়ার ফেলে দিলো যার যার পায়ের কাছে। কিছু মুক্তিবাহিনীর লোক, কিছু বিদেশী সিপাই মনে হল। কারণ ওরা হিন্দীতে হুকুম করছিল। জানালো বন্দী মেয়েরা মুক্ত। ওদের অভিজ্ঞতা আছে তাই কিছু শাড়ি সঙ্গে এনেছে, সবাই পরে পরে যে যেদিকে পারলো ছুটলো। আমি শাড়ি পরলাম কিন্তু লায়েক খানের হাত ছাড়লাম না। এতোক্ষণে বুঝলাম হিন্দীভাষীরা ভারতীয় সৈন্য। একজন বলল, মা, তোমার ভয় নেই, তুমি বললে তোমাকে তোমার ঘরে পৌঁছে দেবো। আমার স্বামী করুণ নয়নে আমার দিকে তাকালো। আমি বললাম, আমার কোনো ঘর নেই, ইনি আমার স্বামী। আমাদের ধর্মমতে বিয়ে হয়েছে। এঁকে যেখানে নেবেন আমিও সেখানে যাবো। সেপাই হাসলো, পাকিস্তানি জওয়ানদের সঙ্গে আমাকেও বন্দী হিসেবে নিয়ে ট্রাকে তুললো। অফিসার একজনও ছিল না। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে সব পালিয়েছে। অবশ্য পরে শুনেছি পথে অনেকেই মুক্তিবাহিনীর হাতে ধরা পড়ে তাদের কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত করেছে। তারা এই পশুদের কাছ থেকে যে অত্যাচার পেয়েছে তার প্রতিশোধ নিয়েছে নির্মমভাবে। তবে ভারতীয় সৈন্যরা পেলে বন্দী করেছে, মারেনি কারণ যুদ্ধ যখন শেষ হয়ে গেছে অতএব বন্দীকে ওরা মারবে না। এটা নাকি যুদ্ধের নীতিবিরুদ্ধ। জানি না, সবই খানের কাছ থেকে শোনা কথা। এবারে আমাদের গন্তব্য স্থান সোজা ঢাকা সেনানিবাস। পথে আরও ট্রাক, জীপ চললো আমাদের সঙ্গে সঙ্গে। ঢাকায় ব্যারাকে পৌঁছালাম। ওদের অফিসাররা সুন্দর সব বাড়িতেই আছে। আমাদের ব্যারাকেই রাখলো কিন্তু হাবিলদার একটি আলাদা কামরা পেলো তার জরুর জন্য। আমি বেঁচে গেলাম। কেমন করে তাই ভাবছি। লায়েক খানের শোকরানা নামাজ পড়া বেড়ে গেল কারণ ও ভাবতেও পারেনি যে জানে বাঁচবে। শুধু বার বার বলে, আমার তকদীরে ও বেঁচে আছে। আর বেঁচে যখন আছে তখন দেশে একদিন না একদিন ফিরবেই আর বিবিবাচ্চার সঙ্গে দেখা হবেই। সব শুনে থেকে থেকে বুকটা কেঁপে ওঠে। তাহলে আমাকে কোথাও ফেলে দেবে। ও আমাকে আশ্বাস দিলো মোসলমানের বাচ্চা যখন হাত ধরেছে তখন ফেলবে না। এটা তর্কের সময় নয়, কারণ উপস্থিত আমার সমূহ বিপদ। নইলে বলতে ইচ্ছে হচ্ছিল, এ পর্যন্ত তোমরা কতজনের হাত ধরেছো আর ছুঁড়ে ফেলেছো। কিন্তু জিভ, ওষ্ঠ সব আমার এখন বন্ধ।

আমরা পৌঁছবার পরদিনই আমাদের নাম-ঠিকানা লিখে নিয়ে গেল। আমাদের সঙ্গে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও ময়মনসিংহ কলেজের দু'জন উচ্চ শিক্ষিত মহিলা ছিলেন। এখানে প্রায় ত্রিশজন আমরা সব সময়েই একসঙ্গে থাকতাম ও শলাপরামর্শ করতাম।

আপারা বললেন, নাম-ঠিকানা সব ঠিকঠাক মতো দিতে, দেশের লোক জানুক এ পশুরা আমাদের কি করেছে।

চারদিনের দিন বাবা এসে হাজির। আমাকে ডেকে নিয়ে একটা ঘরে বসালো। বাবা এলেন, একি চেহারা হয়েছে বাবার! জীর্ণ-শীর্ণ দেহ, এই ক'মাসে অর্ধেক মাথা সাদা হয়ে গেছে। কয়েক সেকেন্ড দু'জনেই নীরব রইলাম। তারপর ছোটবেলার মতো দৌড়ে বাবার কোলে আছড়ে পড়লাম। কিছুক্ষণ দু'জনেই শুধু কাঁদলাম। তারপর বাবার কাছে শুনলাম আমাকে নিয়ে যাবার প্রায় ঘণ্টা দুই পরে বাবা আসেন। বড় ভাই আর আসেনি, ওখান থেকে মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পে চলে যায়। বাবা এসে লালুকে পাগলের মত কাঁদতে দেখেন। মা ও মিলুকে হাসপাতালে নিয়ে যান। খোদার রহমতে মিলু ধীরে ধীরে ভাল হয়ে ওঠে কিন্তু মা হাসপাতালেই মারা যান। চোখ-মুখে শোক ভুলে বাবাকে উঠে দাঁড়াতে হয়। অন্নের জোগাড় করতে নরসিংদীতেও আসতে হয় দোকান চালাতে। শেষের দিকে দোকান প্রায়ই বন্ধ থাকতো। আমার কথা বলে অনেকে সহানুভূতি দেখাতো, অনেকে টিটকারী দিতো, আমি নাকি ইচ্ছে করে লাফিয়ে জীপে উঠেছি। যারা আমার সন্ধান দিয়েছিল তারাই বাবাকে বেশি নির্যাতন করেছে। কিন্তু ১৬ ডিসেম্বরের মধ্যেই সব পালিয়েছে। বড় ভাই পাগলের মতো ওদের খুঁজে বেড়াচ্ছে। সে আবার কি ঘটায় কে জানে। আমার দু'চোখের পানিতে তখন আমার বুকের শাড়ি ভিজে গেছে। বাবা বললেন, চল মা তোর নিজের ঘরে ফিরে চল। বড় দুর্বল হয়ে পড়লাম। মনে হল বাবার সঙ্গে ছুটে যাই আমাদের সেই আনন্দময় গৃহে যেখানে লালু, মিলু, বড় ভাই আজও আমার পথ চেয়ে আছে। কিন্তু না, এই মানুষটিকে আর আঘাত দিতে আমার মন চাইলো না। বাবাকে বললাম, তুমি ফিরে যাও, আমি এদের সঙ্গে ভালোভাবে কথা বলে দেখি। ওরা আমাদের জন্য কি ব্যবস্থা করবে। বাবা নাছোড়বান্দা; বললেন, আমি কারও কোনো অনুগ্রহ চাই না, তুই আমার মেয়ে, আমার কাছেই থাকবি। যেমন এতো বছর ছিলি। অনেক কষ্টে সেদিন বাবাকে ফিরিয়েছিলাম। আমরা একসঙ্গে বসে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম শুধু পাকিস্তানি দস্যু নয়, নিজেদের দুর্বৃত্তদেরও চিনেছি এ দুর্দিনে। যারা আমাদের জায়গা দেবে তাদের অবস্থা কি দাঁড়াবে? নিজেরা তো মরেছি, ওরা তো এমনিই মরে আছে, ওদের আর মেরে লাভ কি?

তবুও বাড়ি ফেরার লোভটাকে কিছুতেই ছাড়তে পারছিলাম না। সেই শোবার ঘরের কোনের শিউলী গাছটা, মা রোজ সকালে ওজু করে এক বদনা পানি ওর গোড়ায় ঢালতেন। ডিসেম্বর মাস, না ফুল এখনও শেষ হয়নি। পাড়ার মেয়েরা হেনা, রাবু সব আসতো ফুল কুড়াতে। বাবাকে জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেলাম ওরা কি আছে না আমার মতো হারিয়ে গেছে? আর কখনও ওই ফুল ছুঁয়ে দেখবো না। আমি তো আজ সবার কাছে অপবিত্র, অস্পৃশ্য! মনে পড়লো রান্নাঘরের মেঝেতে পিড়ি পেতে রাতে সবাই একসঙ্গে খেতে বসতাম। মা সবাইকে দিয়ে-থুয়ে খেতেন। আমরা খাওয়া হলে উঠে যেতাম পড়াশুনার তাগিদে। মা খেতেন, বাবা বসে বসে মায়ের সঙ্গে গল্প করতেন। কুপির আলো মায়ের মুখের একপাশে এসে পড়তো, আলোর শিখাটা কাঁপতো মায়ের

মুখও যেন কেঁপে কেঁপে উঠতো। হঠাৎ ডুকরে ডুকরে কেঁদে উঠলাম, মা, মাগো— সঙ্গীরা সান্ত্বনা দিতো। তবুও দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সীমা ছিল না।

তারপর একদিন তিনজন আপা এলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমাদের সঙ্গে কথা বলতে, খুঁটে খুঁটে সব শুনে বললেন, কেন, তোমরা পাকিস্তানে চলে যাচ্ছো? দেশ তোমাদের দায়িত্ব নেবে। প্রধানমন্ত্রী তোমাদের বীরাঙ্গনা খেতাব দিয়েছেন শোনোনি? নীরা আপা, সবচেয়ে শিক্ষিত, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষে বর্ষের ছাত্রী ছিলেন। তিনি আপাদের সঙ্গে যথেষ্ট তর্ক-বিতর্ক করলেন। ইতিমধ্যে আগত তিন আপার নাম জেনেছি নওসাবা, শরীফা আর নীলিমা। এরা এসেছে আমাদের ফিরিয়ে নিতে। হঠাৎ করে ওইদিন আবার বাবাও এসে উপস্থিত হয়েছেন। আমাদের ভেতর অধিকাংশই বিবাহিত ছিলেন, তাঁদের স্বামী এসেছে, কথা বলেছেন, কেউ কেউ শাড়ি উপহার দিয়ে গেছেন কিন্তু ফিরিয়ে নিতে পারবেন না একথা অসংকোচে জানিয়ে গেছেন। কারণ তাদের সমাজ আছে, সমাজে আর পাঁচজন আছে। তাদের ভেতর তো এ ভ্রষ্টা কলঙ্কিনীদের নিয়ে তোলা যাবে না। স্বামীর ইচ্ছা আছে তবে উপায় নেই। এ সব মন্তব্য থেকে আমরাও আমাদের অবস্থান জেনে নিয়েছিলাম। স্বামী যখন ঠাঁই দিতে পারেনা তখন কোন রাজপুত্র আমাদের যেচে এসে ঘরে নেবে। সুতরাং না, আমরা আমাদের সিদ্ধান্তে অটল। আমার বয়স ছিল সবচেয়ে কম। আমি বললাম আপনারা যে আমাকে থাকতে বলছেন আমি কোথায় থাকবো। এক আপা বললেন, কেন, তোমার বাবা তোমাকে নিতে এসেছেন। বললাম বাবার ঘাড়ের বোঝা হবো না। এক আপা বললেন, বেশ তো তুমি আমার কাছেই থাকবে। হঠাৎ কেন জানি না আমি জ্বলে উঠলাম, আপনারা কাছে থাকবো? প্রতিদিন চিড়িয়াখানার জীবের মতো আমাদের দেখবার জন্য আপনার বাড়ির দরজায় দর্শনার্থীর ভীড় হবে। আপনি গর্বিত মুখে আমাকে দেখাবেন। কিন্তু তারপর আমার ভবিষ্যৎ কি হবে? ওই আপা আমার আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন, পাকিস্তানে যেতে চাও? ওখানে কি পাবে? ওখানে তো তোমাকে নিয়ে পতিতালয়ে বিক্রি করে দেবে এরা। তাতে তোমার কোনো সুবিধা হবে? সুবিধা এই হবে আপা ওখানে পতিতাবৃত্তিই করি আর রাস্তাই ঝাড় দেই, লোকে আমাকে চিনবে না, স্বামী-সন্তান অন্তত সামনে দাঁড়িয়ে টিটকারী দেবে না। ওরা ক্ষুব্ধ হয়ে চোখ মুছে চলে গেলেন। শুনেছি কলকাতা থাকতেই নীরা আপাকে তাঁর ভাইয়েরা ফিরিয়ে নিয়ে গেছে। জানি না, তিনি কোথায় কতোটা সুখ ও সম্মানের জীবনযাপন করছেন।

বঙ্গবন্ধু ফিরে এলেন। চারদিকে স্বাধীনতার উৎসব। শুধু অন্ধকার গুহায় সর্বস্বান্ত আমরা ক'জন বন্দিনী নিঃস্ব-রিক্ত। আজ নিজেকে বাঙালি বলে পরিচয় দেবার সম্বলটুকুও আমরা খুইয়ে বসে আছি। কেন এমন হল? শুধু আমরা নারী বলেই অপবিত্র আর রাজাকার আলবদরেরা পাপ করেও আজ সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিত্ব। এ তোমার কেমন বিচার আল্লাহ? তবে তোমার কাছে নাকি সব সমান? আল্লাহর কানে শুধু পুরুষের বক্তব্যই পৌঁছায়, দুর্বল ভীরু নারীর কণ্ঠ সেখানে নীরব।

যাক শেষ পর্যন্ত ভারত হয়ে পাকিস্তানে এসে পৌছালাম। এখন লায়েক খানের এক মাসের ছুটি। এরপর সে জানতে পারবে কোথায় সে থাকবে। ইতোমধ্যে আমি বুঝতে পেরেছি আমি সন্তান সম্ভবা। আমার স্বামীও বুঝেছেন। আমাকে অভয় দিয়ে বললেন তার প্রথম স্ত্রী কখনও গাঁয়ের বাইরে আসবে না। তাই ও আমাকে সাথেই কর্মস্থলে রাখতে পারবে। এতোদিন ছিল নিজের চিন্তা, এখন এই ক্ষুদ্র জীবের অস্তিত্ব আমাকে চঞ্চল করে তুললো। আমরা রাওয়ালপিন্ডিতে লায়েকের এক দোস্তের বাড়িতে উঠলাম। ওরা লোক খুব ভালো। আমাকে বেশ আদর করেই গ্রহণ করলেন। কোনও জিজ্ঞাসা, কোনও সন্দেহ বা ইতস্ততভাব ওদের ভেতর দেখলাম না। লায়েক খান ওদের কাছে আমাকে দিন পনেরোর জন্যে রেখে দেশে গেল বিবিবাচ্চাকে দেখতে। আমি মনে মনে প্রমাদ গুনলাম। কিন্তু লাল খানের স্ত্রী আমাকে আশ্বাস দিয়ে বললেন লায়েক খান অত্যন্ত পরহেজগার মানুষ। তাকে অবিশ্বাস করবার কোনও কারণ নেই। তাছাড়া পাঠানেরা কথা দিয়ে কথার খেলাপ খুব কমই করে। ভাষা বুঝি না কারণ ভাঙ্গা ভাঙ্গা উর্দু বুঝলেও পোশতু আমার বোধগম্য হতো না তখন। ইশারা-ইঙ্গিতে লাল খানের স্ত্রীর সঙ্গে আমার বেশ বন্ধুত্ব হয়ে গেল। প্রথম দর্শনেই ও বুঝতে পেরেছে আমি মা হতে চলেছি। বলল, আল্লাহ্ করুক, তোমার একটা মেয়ে হোক। দেখোনা, আমার দুটো ছেলে আমার কাছেও আসে না। বাপের সঙ্গে সঙ্গে অফিসে বাজারে গাঁয়ের খেতি খেলায় সব জায়গায় যায়। একটা মেয়ে থাকলে আমাকে ঘর-গেরস্থালীর কাজে কতো সাহায্য করতে পারতো, আমার সঙ্গে সঙ্গে তো ফিরতো। ভাবলাম নারীর দুর্ভাগ্যের কথা ও জানে না, তাই ও মেয়ে চায়। মেয়ে হলে আমি হয়ত গলা টিপেই মেরে ফেলবো। লায়েক খানের মুখেও শুধু মেয়ে মেয়ে। অবশ্য মেয়ের বিয়েতে ওরা টাকা পয়সা পায়, আর ওদের দেশে মেয়ের সংখ্যা কম তাই এত কন্যাপ্রীতি।

ঠিক সময়মত লায়েক খান ফিরে এলো এবং তদ্বির করেই তার পোস্টিং জোগাড় করলো। থাকতে হবে করাচিতে। লায়েকের কোনও চিন্তা নেই। ওখানেও ওর অনেক পেশোয়ারী দোস্ত আছে। দেখলাম ও বেশ বন্ধুবৎসল। লাল খানের বউকে একটা রুপার হার উপহার দিলো, অবশ্য বন্ধুর হাত দিয়ে। এরা পরস্পরকে ভাইবোনের মতো দেখে, দরজার আড়ালে থেকে কথাও বলে তবে সামনে আসে না। গলাগলি করে হেসে-কেঁদে বিদায় নিলাম।

অতঃপর এলাম করাচিতে। লায়েক খান দেশ থেকে বেশ খোশ মেজাজেই ফিরে এসেছে। বউয়ের কথা অবশ্য আমাকে কিছু বলেনি, কারণ জানে আমার শুনতে ভালো লাগবে না। ওর দুই ছেলে, বড় জনের বয়স ১৭ বছর। আর তার পরের ছেলের বয়স ১৪ বছর। মেয়ে সবচেয়ে ছোট। তার নাম ফাতিমা। এই মেয়ের গল্পই সে সবচেয়ে বেশি করে। আমিও জিজ্ঞেস করি, সেও উত্তর দিয়ে খুশি হয় এবং তার কথাবার্তায় বুঝলাম আমার কথা বিবিজান এখনও জানেন না, জানাবার মতো সাহস এ বৃদ্ধের নেই। মাঝে মাঝে আমারও ভয় হয়, কে জানে জানতে পারলে আমার গলা কাটবে কি-না, তবে ভরসা বিবিজান গাঁয়ের বাইরে আসেন না। শেষ পর্যন্ত ছেলে হল আমার।

দিব্যি স্বাস্থ্যবান আর বাপের মতোই সুপুরুষ। মেয়ে হয়নি বলে খোদার কাছে শুকরিয়া জানালাম। যাক দুর্দিন এলে ছেলেকে বুকে নিয়ে গাছতলাতেও পড়ে থাকতে পারবো।

ধীরে ধীরে আশেপাশের বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ হল। লায়েক খানকে সামরিক বাহিনী থেকে পেনসন দেওয়া হল। ও করাচিতে একজন সামরিক অফিসারের বাড়িতে নাইট গার্ডের চাকরী নিলো। বড় বাড়ি। আউট হাউজের এক পাশে ছোট একটা ঘর, পাকের ঘর ও গোসলখানা তাদের জন্য বরাদ্দ হল। বাড়িতে আরও নোকর-নোকরানী আছে, তাদের সব থাকবার ব্যবস্থা স্বতন্ত্র। স্বামীর কাছে জানতে পারলাম বাড়ির মালকীন বাংলাদেশের মেয়ে। লায়েক খানের কাছ থেকে সব শুনে তিনি আমাকে দেখতে চেয়েছেন। একদিন সাহস সঞ্চয় করে স্বামীর সঙ্গে গেলাম তাঁকে সালাম জানাতে। স্বামী বাইরে দাঁড়িয়ে রইলো, আমি ভেতরে ঢুকলাম। সুন্দর অমায়িক ব্যবহারে সালমা বেগম আমাকে অতি সহজেই আপন করে নিলেন। বাড়িঘরের কথা, বাবা-মার কথা সব জিজ্ঞেস করলেন। ওদের চিঠি লিখতে বললেন তাঁর ঠিকানায়। কতো কথা যে তাঁর অন্তরে জমেছিল তাই ভাবি। শেষ পর্যন্ত আমি ওঁর ঘরে কাজ নিলাম। আমি ওঁর কাজ করবো। ওদের সন্তানাদি নেই। জামা-কাপড় ধোয়া, ইস্তিরি করা, বিছানা করা, ঘর গোছানো, পার্টি হলে তার ব্যবস্থা করা এমনকি মাঝে মাঝে বাংলাদেশের মতো মাছ তরকারীও আমি তাঁকে রান্না করে দিতাম। ওঁর কাছে বাংলা বইও ছিল অনেক। সেগুলোও মাঝে মাঝে চেয়ে নিতাম। আমার জীবনে এক নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলে গেল।

সালমা বেগমের উৎসাহে ও সাহসে দেশে আব্বাকে চিঠি লিখলাম সব কিছু জানিয়ে এবং তাঁদের খবরাখবরও জানতে চাইলাম। ঠিকানা সালমা বেগমের। এক মাসের ভেতর বাবার চিঠির উত্তর পেলাম। তাঁরা ভালো আছেন। নাতিকে দোয়া জানিয়েছেন। দেখতে না পারার জন্য দুঃখ করেছেন। ব্যবসা বড় ভাই ও লালু চালাচ্ছে। আব্বা আর দোকানে যান না। যা জমিজিরাত আছে তাই তদারকি করেন। মিলু এবার ম্যাট্রিক দেবে। এ বছর বড় ভাই বিয়ে করেছেন। তখন আমার ঠিকানা জানলে আমাকে নিশ্চই দাওয়াত পাঠাতেন। তাঁর শরীর ভাল না। তিনি আম্মার কাছে যাবার প্রতীক্ষায় আছেন। সমস্ত চিঠিতে কেমন যেন একটা ক্লান্তি ও শূন্যতার সুর। আমি থাকলে বাবাকে মায়ের জন্য এতো কাতর হতে দিতাম না। কিন্তু কি আশ্চর্য বাবা আমাকে একবারের জন্যও যেতে লেখেননি। ভালো লাগলো দেশের লোকেরা এখনও পাকিস্তানিদের জঘন্য অত্যাচারের কথা মনে রেখেছে ভেবে। আজ অবস্থার প্রেক্ষিতে আমি বৃদ্ধ অশিক্ষিত লায়েক খানের গৃহিণী কিন্তু যদি সুস্থ-স্বাভাবিক পরিবেশে থাকতাম তাহলে সম্ভবত একটা ভদ্র পরিবারে থাকতে পেতাম। না হয় অর্থ সম্পদ নাই পেতাম। তারপর সমুদ্রে ডুবে যাই আমি। তবুও এই বাঙালি মহিলাকে পেয়ে আমি যেনো নতুন আলো পেয়েছি জীবনের।

আমি আবদার ধরলাম ছেলের নামকরণ করবো আমি। স্বামী রাজি হলেন। আকিকায় ছেলের নাম রাখা হল তাজ খান। সবাই খুশি সুন্দর নাম আর আমি মনে মনে স্মরণ করলাম এক পরম সাহসী মহান বাঙালি বীর যোদ্ধাকে। যিনি যুদ্ধজয় করেও, জয়ের গৌরব থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। কে জানে বিধির বিধান বুঝতে পারি না।

দিন দ্রুত কেটে যাচ্ছে। এর ভেতর আমি সেলাই শেখার কেন্দ্র থেকে নানা রকম সূচি শিল্প শিখে ফেলেছি। ঘরে বসেই কাজ করি, বেশ ভাল আয় হয়। সালমা বেগম আমাকে তাঁর পরিচিত মহলে কাজ করার সুযোগ করে দিলেন। লায়েক খান মনে হয় খুশিই হল কিন্তু কোনও দিন আমার কাছ থেকে একটি পয়সাও নেয়নি। দিতে গেলে বলেছে, তোমার খাওয়া-পরার দায়িত্ব আমার। আমি তোমাকে কিছুই দিতে পারিনি। এখন তো ঘাড়ের ওপর দু'সংসার। মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, তোমার জীবনটা আমি বরবাদ করে দিয়েছি। আমি ওর মুখ চেপে ধরতাম, বলতাম তুমি আমাকে উদ্ধার না করলে আমি ভেসে যেতাম। তোমার জন্য আমি স্বামী পেয়েছি, সংসার পেয়েছি, তাজের মতো বুক জুড়ানো সন্তান পেয়েছি। সালমা বেগমের জন্য আমি অর্থ পেয়েছি বাইরে ইজ্জত পেয়েছি। একটা মেয়ে আর কি চায়। তবুও আমার স্বামী একটা কথাই বলতো, তোকে নিয়ে আমি ঘর বসাতে পারলাম না অর্থাৎ নিজের দেশে নিজের সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলো না। আমি ভাবতাম এ আমার শাপে বর হয়েছে। ঘর বসালে তোমার জীবনে ক্ষেতির কাজ আর গম পিষতে পিষতে আমার জীবনটা শেষ হয়ে যেতো। এ তো ভালোই আছি একরকম। তাজের বয়স যখন পাঁচ, স্বামী আবদার জুড়লো ওকে একবার দেশে নিয়ে যাবেন। সালমা বেগমের পরামর্শ চাইলাম, উনি বললেন, যেতে দেন, কি আর হবে, ছেলেই তো, মেয়ে হলে ভয়ের কথা ছিল। দু'সপ্তাহের জন্য তাজ বাপের হাত ধরে মাথায় জরির টুপী পরে সেজেগুঁজে চলে গেল তার নিজের ঠিকানায়। মনকে সান্ত্বনা দিলাম আজ না হলেও দশ বছর পরে তো লায়েক চলে যাবে। তখন তাজ তো, সগর্বে বলবে আমি আগে পাঠান পরে পাকিস্তানি। যেমন একদিন আমরাও সগর্বে বলেছিলাম, আমরা আগে বাঙালি পরে মুসলমান, পাকিস্তানি আর সব। মনে হল লায়েক খানের আমানত যা আমি গর্ভে ধারণ করেছিলাম, এ পাঁচ বছর প্রতি মুহূর্তের স্নেহ দিয়ে বড় করেছি তাকে আজ তার হাতেই ফিরিয়ে দিলাম। কেমন যেন সব কিছুই আমার কাছে শূন্য হয়ে গেল।

আমার সব কথাই সালমা বেগমকে বলতাম কারণ তাঁরও তো ভেতরে একটা গভীর ক্ষত আছে যার রক্তক্ষরণ শুধু আমিই উপলব্ধি করি, তার বংশ নেই। অন্য সময় তো তিনি হাসি-খুশি পতিপরায়ণ স্ত্রী। সন্তান না পাবার দুঃখ সম্পর্কে বলতেন, মেহের আমার খুব বেশি দুঃখ নেইরে, কি হতো সন্তান থাকলে? ওরা তো আমার হতো না, আমার পরিচয় দিতে লজ্জাবোধ করতো, লুকিয়ে থাকতো। ওর এক ভাইয়ের ছেলেকে কাছে রেখেছিলাম। পেটের ছেলে কেমন হয় জানি না কিন্তু সোহেল আমার বুকে জুড়ে ছিল। একদিন টাকা-পয়সার কি ব্যাপার নিয়ে দু'ভাইয়ে মনোমালিন্য হল। আমার জা আর দেওর এসে ছেলেকে কেড়ে নিয়ে গেল। মেহের যাবার সময় তার আর্তচিৎকার আম্মি আম্মি আজও কানে বাজে। এখন সে আমেরিকায় পড়াশুনা করে। চিঠিপত্র লেখে। কিন্তু যে বাঁধন ছিঁড়ে গেছে তাকে আর আমি জোড়া লাগাতে চাই না মেহের। হঠাৎ এমন হল কেন বেগম সাহেবা? মুচকি হাসলেন সালমা বেগম। মেহের দুনিয়াটা বড় রুক্ষ বড় শুকনো। আমি অথবা ওর চাচা মরে গেলে আমাদের সব সম্পত্তিই সোহেল

পেতো তেমন ব্যবস্থা সাহেব করবেন বলেছিলেন। কিন্তু আমার দেওর হঠাৎ একদিন এসে বললো, তোমার পিণ্ডির বাড়িটা সোহেলকে দিয়ে দাও। বাড়িটায় একটা ভালো হোটেল চলছে— ভাড়াও অনেক পাই আমরা। উনি বললেন, হঠাৎ এ কথা কেন? দেওর বললেন, খোদা না খাস্তা তোমার কিছু হলে ভাবীকে বিশ্বাস কি? বাংলা মুলুকের মেয়ে ওর ঈমানের ঠিক আছে? আমার স্বামী হঠাৎ প্রচণ্ড রকম রেগে গেলেন। মানুষটা খুবই শান্ত ও ধীর স্বভাবের। কিন্তু কঠোর ভাষায় ভাইকে বকাবাকি করলেন। ওকে বোবা বানিয়ে দিয়ে ছেলের হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল। ভেতরে এসে আমার হাতটা ধরে বললেন, সালমা, ধৈর্য ধরো, দুঃখ করো না, আমার ঘরে সন্তান নেই। যদি বুক দিয়ে আমরা ভালোবাসতে পারি, তবে সারা পৃথিবীর এতিম আমাদের সন্তান। করাচির দু'তিনটা এতিমখানায় এরপর থেকে উনি নিয়মিত অর্থ সাহায্য করেন। আমি বললাম, বেগম সাহেবা ঈদের দিনে অনেক লোক আসে বাচ্চা নিয়ে ওরা কারা? আরে ওরাই তো এতিমখানার বাচ্চারা। ঈদের সময় তিনদিন পালা করে ওদের খাওয়াই। কাপড়-জামা কিনে দিই। ওটাই আমার সারা জীবনের সবচেয়ে বড় উৎসব। এখন কিন্তু আমার খারাপ লাগে না। মেহের তোকেও বলে রাখি, এমনি করে লায়েক খানও একদিন ওর বাচ্চাকে টেনে নিয়ে যাবে। ওরা সব কিছুর ওপর ওদের কওমের মর্যাদা দেয়। মাথা নিচু করে বললাম, তবুও বেগম সাহেবা আমি অন্তত ওকে লেখাপড়া করাবার চেষ্টা করবো আর আশা করি তাজের আব্বারও ওতে আপত্তি হবে না। না হলেই ভালো, জবাব দিলেন সালমা বেগম।

একদিন কথা প্রসঙ্গে সালমা বেগমকে বললাম, এখানে তো কতো হাউজিং আছে। আমার মতো গরিবরা মাস মাস টাকা দিয়ে ঘর নেয়। আমাকে যদি একটা ব্যবস্থা করে দিতেন। কারণ আমি জানি লায়েক খান আর খুব বেশিদিন এখানে থাকতে চাইবে না। তখন আমার কি উপায় হবে। আমার তো বেশ কিছু টাকা জমেছে। দরকার হলে আমি আরও বেশি করে কাজ করবো। সালমা বেগম চেষ্টা করবেন বললেন এবং মাসখানেক পর সত্যিই খবর আনলেন একটা হাউজিং-এর দু'কামরার ঘর, সঙ্গে ডাইনিং ও ড্রইং রুম এবং পাক ঘর ও বাথরুম। প্রথমে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিতে হবে। পরে কিস্তিতে শোধ দিলে হবে। মোট দাম পড়বে আড়াই লাখ টাকা। সালমা বেগমের কাছে আমি টাকা জমাই। সেখানে চল্লিশ হাজার টাকা জমেছে। আমি ভাবতেও পারিনি আমার এতো টাকা হয়েছে। বললেন, বাড়ি তুমি দেখে এসো, টাকার দায়িত্ব আমি নেবো। তবে একটা কথা, এ বাড়ি নেওয়ার ব্যাপারে তুমি লায়েক খানকে কিছু জানিও না। পুরুষ বড় লোভী আর স্বার্থপর জাত। তাছাড়া ওরা পাঠান, রাগলে না পারে এমন কাজ নেই। সবটুকুই তোমাকে গোপনে করতে হবে। এখন বাড়ি নিয়ে ভাড়া দিয়ে দিও, তার থেকেই তোমার বাকি দেনা শোধ হয়ে যাবে। কথাটা আমার মনে ধরলো। আমি সালমা বেগমের কাছ থেকে ঠিকানা নিয়ে বাড়ি দেখে এলাম। আমার জন্য যথেষ্ট। আর বস্তির মতো নয়। বেশির ভাগই গরিব কেরানী, মাস্টার, সুতরাং পরিবেশ খারাপ নয়। সালমা বেগম দলিল তৈরি, লেখাপড়া, রেজিস্ট্রি ও পরের সব কাজই ওঁর সাহেবের অফিসের

একজন বিশ্বাসী লোক দিয়ে করিয়ে দিলেন। আমি শুধু সঙ্গে সঙ্গে রইলাম এই পর্যন্ত। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, বাড়িটুকু নিয়ে আমার মনে হল আমি শক্ত হয়ে দাঁড়াবার মতো এক টুকরা জমি পেয়েছি। লায়েক খান আজকাল বেশ ঘন ঘন দেশে যায়। বলে, শরীর এখন আর নোক্‌রী করবার মতো নেই। সাহেবকে বলে একটা ব্যবস্থা করতে হবে। বললাম, আমার তাজের কি অবস্থা হবে? নির্লিপ্ত কণ্ঠে জবাব দিলো লায়েক খান, আমি বেগম সাহেবাকে বলে যাবো তোমাকে এখানেই রাখবেন, আমি মাস মাস তোমার খোরাকী পাঠাবো। আর তাজ আমার ছেলে, ওদের ভাইদের সঙ্গে বড় হবে। তাছাড়া ওর আম্মি ওকে খুবই পেয়ার করে। ওর জন্যে ভেবো না। কতো সহজে সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। কিন্তু আমি তাজকে ছেড়ে থাকবো কি করে? তোমাকে থাকতেই হবে কারণ ওকে তো ওর বেরাদরীর সবাইকে জানতে হবে, চিনতে হবে। আমি ওকে কারও বাড়িতে নোক্‌রী করতে দেবো না।

মৃদু কণ্ঠে বললাম, যাবে কবে? এখনও ঠিক করিনি, দু'চার ছ'মাস আরও দেখবো তারপর যাবো। কিন্তু তাজের স্কুলের কি হবে? বলেছি না, ওর ভাইয়েরা আছে, ওর জিম্মাদারী নেবার লোকের অভাব হবে না। আমি পাথর হয়ে গেলাম। ওই শিশুকে আমার বুক থেকে কেড়ে নিয়ে যাবে আর আমার খোরাকী পাঠিয়ে নিজেকে দায়মুক্ত করবে। আমার সাহস থাকলেও প্রকাশের ক্ষমতা নেই। এ বিদেশ বিভুঁইয়ে আমি একটা বাঙালি মেয়ে। বয়স কম সুতরাং উদ্ধত আচরণ করার শক্তি কোথায়? সালমা বেগম অবশ্য এমনি একটা ঘটনার আভাস তাকে বারবার দিয়েছেন। উনি দীর্ঘদিন আছেন। এদের আচার-ব্যবহার-রুচি তাঁর তো কিছুই অজানা নেই। স্বামীর কর্তৃত্ব আমার দেশেও আছে, কিন্তু এমন ভয়ানক ভাবে নয়। একটা পয়সার জিনিস কিনতে হলে স্বামীর অনুমতি লাগবে, ঘর থেকে এক পা বেরুতে হলে স্বামীর হুকুম আবশ্যক। দাসী আর কাকে বলে। নিজেকে সামলাতে দু'একদিন লাগলো। তারপর সালমা বেগমের কাছে গিয়ে একেবারে ভেঙে পড়লাম। উনি সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, এমন যে হবে তা আমি তোমাকে আগেই বলেছি। ওর বয়স হয়েছে, এখন বউয়ের সেবাযত্ন চায়। তাছাড়া তুমি ওরটা যতোই কর ওরও একটা পারিবারিক নিয়মকানুন আছে। তোমার কাছে ও একেবারে খোলামেলা হতে পারে না। ও ভুলতে পারে না তোমার সঙ্গে ওর ব্যবধানটা। সুতরাং শক্ত হও, নিজেকে বাঁচাবার কথা ভাবো। ধীরে ধীরে আমার মানসিক উত্তেজনা কমে এলো। সালমা বেগমের কথার সত্যতা উপলব্ধি করলাম। সত্যিই তো আমার কি হবে? ভেবে আর কি করবো যা হবার তাই তো হবে। জীবনে তো চড়াই-উৎরাই কম হল না। কষ্ট পেয়েছি কিন্তু যেভাবেই হোক প্রতিরোধ করতেও তো সক্ষম হয়েছি।

এরপর স্বামী চুপচাপ। যে যার কাজকর্ম করে চলেছি। দিন দেখতে দেখতে যায়। তাজ দশ বছরে পড়লো। ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ছে। স্কুলের বাস এলে ও যখন ওঠে আমি এক দৃষ্টে চেয়ে থাকি। লায়েক খান কি ভাবে জানি না, তবে আমি তো জানি যে ও আমারই সন্তান। গৌরবর্ণ সুঠাম দেহের বালক রীতিমত বাড়ন্ত গড়ন দেখে মনে হয় তেরো-চৌদ্দ বছর বয়স। লেখাপড়াতেও বেশ ভালো। আমি ওকে পুরোপুরি সাহায্য করতে পারি না

কারণ ও ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ে, তবে যতটুক পারি করি। ও নিজেই খুব মনোযোগী ছাত্র। ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজিতে ও এখনই কথাবার্তা চালিয়ে যেতে পারে। বুকটা কেঁপে ওঠে যখন ভাবি এ সব ফেলে প্রচণ্ড রোদে ও ফসলের ক্ষেতে কাজ করছে। মনটা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে কিন্তু আমার আর উপায় কি? একদিন হঠাৎ তাজের আব্বা বলল, আগামী সপ্তাহে শুক্রবার আমরা যাবো। তাজকে তৈরি করে দিও। আমি মুখে কাপড় চাপা দিয়ে দৌড়ে পাশের ঘরে গেলাম। কানে এলো লায়েক খানের কণ্ঠ, কেঁদে কোনও লাভ নেই, শেরের বাচ্চা, শেরই হবে, কুকুর-বিড়াল হবে না। কথাটা আমার অন্তরে কোথায় যে বিঁধলো ওই মূর্খ তা জানে না। বেশ বুঝলাম আজ নিরাপদ আশ্রয়ে দাঁড়িয়ে ও আমার বাপ-ভাইদের গালাগালি দিলো। একবার ভাবলো না, আমি ইচ্ছে করলে ওকে শিয়াল-কুকুর দিয়ে খাওয়াতে পারতাম। বুঝলাম মানুষের জন্মভূমির টান বড় গভীর তাকে ভুলে থাকলেও ভোলা যায় না। আজ আমার ও লায়েক খানের মধ্যে সেই শেকড়ের দ্বন্দ্ব বেড়েছে। কিন্তু তাজ? দুই নদীর মোহনায় দাঁড়িয়ে সে কি করবে?

তাজ স্কুল থেকে ফিরলে আমি ধীরে ধীরে তাকে সব কথা বললাম। তার আব্বা তাকে আগেই বলেছে সে বয়স্ক মানুষের মতো ভ্রূ কুঁচকালো, কোনও শব্দ করলো না। যাবার আগের দিনে চোখের জলে আমি যখন তার জিনিসপত্র গোছাতে গেছি তাজ রক্তচক্ষু করে আমাকে নির্দেশ দিলো আমার কোনও জিনিস ধরবে না। ওর কাছ থেকে এই আমার প্রথম ধমক; থমকে গেলাম, তারপর আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। যাবার দিনে তাজ যথারীতি তৈরি হল স্কুলে যাবার জন্য, দেশে নয়। ওর আব্বা কি যেন বলল, ছেলে উত্তর দিলো আমার পরীক্ষার পর যখন আমাদের স্কুল বন্ধ হবে তখন যাবো। বড় আম্মাকে আমার সালম পৌঁছে দিও। তারপর জানি না কি দিলো বাপকে, বলল, ফাতিমা বাহিনজিকে আমার কথা বলে দিও, আর আমার সালাম জানিও। লায়েক খান একটা কথাও বলল না, সত্যিই শেরকা বাচ্চা শের আমি সেটুকুই কয়েকবার বুঝলাম। লায়েক খান চলে গেল। আমাকে শুধু বলল, তোমার বেটা লায়েক হয়েছে, সাবধানে রেখো। তুমিও সাবধানে থেকো। ওর স্কুল বন্ধ হলে চিঠি লিখতে বলো আমি এসে ওকে নিয়ে যাবো। চোখের জলে তাকে বিদায় দিলাম। আমি চাইনি সে যায়; কিন্তু তার প্রথম জীবনের প্রেম, বয়স্ক দুই ছেলে, অতি আদরের ফাতিমা— এদের ফেলে সে আর থাকতে পারছিল না, তার সত্যিই কষ্ট হচ্ছিল।

এরপর সালমা বেগমকে জিজ্ঞেস করলাম আমি কি করবো? তিনি পরামর্শ দিলেন আমার নিজের বাড়িতে চলে যেতে। কারণ তাদের নতুন লোককে তো ওই কোয়ার্টার ছেড়ে দিতে হবে। সালমা বেগমই সব বন্দোবস্ত করে দিলেন। তাজ মহাখুশি, তার মায়ের নিজের বাড়ি একথা তো সে ভাবতেই পারেনি। তাজ মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে বলল, আম্মু, আজ আর আমরা কারও বাড়ির নোকরের ঘরের বাসিন্দা নই, আমরা আমাদের নিজেদের মাকানে থাকি, কেরায়া নয়। আমার চোখের পানি বাধা মানলো না। বললাম, আব্বু, এসবই করেছি তোমার জন্য। তোমাকে ও যদি জোর করে নিয়ে যেতো, আমি পাগল হয়ে যেতাম। হয়ত পথে পথে ঘুরতাম। মা-ছেলের চোখের জল এক হয়ে মিশে গেল। সে আনন্দঘন মুহূর্তটির কথা আমি এখনও ভুলতে পারি না।

দিন যায় কিন্তু সব সময়ে যাবার গতি ও রীতি এক হয় না। কখনও দ্রুত লয়ে, কখনও মন্দাক্রান্ত তালে। মার দিন কিন্তু দ্রুতলয়ে কখনও যায়নি। আমার আশ্রয়দাতা স্বামী আমাকে একা ফেলে চলে যাবার পর থেকে কেন যেন একটা আত্ম-প্রত্যয় আমাকে ভর করেছে। ভাবলাম আমি যদি সত্যিই লায়েক খানের স্বাভাবিক বিবাহিতা স্ত্রী হতাম তাহলে ও কি আমাকে এভাবে ফেলে যেতে পারতো? না, সে আমায় বিয়ে করেনি, আমি বোঝা হয়ে তার ঘাড়ে চেপেছিলাম। এতোদিন যে সে আমাকে আশ্রয় দিয়েছে, বিবাহিতা স্ত্রীর সম্মান ও মর্যাদা দিয়েছে সেই তো যথেষ্ট। সবার ওপরে তাজের পিতৃত্ব গ্রহণ করে আমাকে সত্যিই বীরাঙ্গনা করেছে, সবচেয়ে আশ্চর্য ওই লম্বা-চওড়া বয়স্ক পাঠানের মনে কখনও কোনও সন্দেহ উঁকি দেয়নি। অথচ ভয়ে-শংকায় আমি দশ মাস কতো বিনিদ্র রজনী যাপন করেছি। কিন্তু তাজ ভূমিষ্ঠ হবার পর আমার দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সব মুছে গেছে একেবারে লায়েক খানের নাক নকশা।

তাজ লাফিয়ে লাফিয়ে স্কুলের সিঁড়ি ডিঙ্গিয়ে গেল। আমিও সালমা বেগমের সহায়তায় প্রাইভেট পড়ে কলেজে ভর্তি হয়ে ক্লাস না করেও বিএ পাস করে ফেললাম। এদিকে বাড়িতে ছোটখাটো সেলাইয়ের একটা শিক্ষাকেন্দ্র খুলেছিলাম। পরে সেখান থেকে নানা পোশাক-এমব্রয়ডারী, জরির কাজ, লেসের কাজ ইত্যাদি করাই প্রায় দশজন মেয়েকে নিয়ে। ওরা মাসে প্রায় পাঁচশ টাকা করে উপার্জন করে আর আমার পাঁচ-সাত হাজার হয়।

তাজ যখন আইএসসি পরীক্ষা দেবে সেবারের ছুটিতে ওর বাপ এলো না। চিঠি এলো বাপের তবিয়ত খারাপ। তাজ যেন যায়। তাজ বড়মার জন্য কাপড়-জামা, বোনের জন্য পোশাক সব আমাকে দিয়ে কেনালো। আমি ওর বাবাকে একটা কুর্তা আর নিজ হাতে কাজ করা টুপী দিলাম। ছেলে দু'সপ্তাহ থেকে এলো। খুব খুশি। বড়মা কি কি খাইয়েছে, ভাইয়েরা কোথায় কোথায় নিয়ে গেছে, বোন কতো আদর করেছে ওর মুখের কথা যেন আর শেষ হয় না। সব শেষে বলল কুর্তা আর টুপী পেয়ে ওর আব্বা খুব খুশি হয়েছে কিন্তু শরীর খুব খারাপ। বলল, আর হয়ত একা করাচি আসতে পারবে না, তোমার সঙ্গে দেখাও হবে না। তোমার কাছে মাফ চেয়েছে। দেখলাম চোখে পানি। ঠিক বুঝলাম না। শুধু আমাকে বলল বেটা, তোমাকে ফৌজী অফিসার হতে হবে। আমি তো আনপড়া বলে সিপাহী হয়েই জিন্দেগী পার করলাম। কিন্তু তোমাকে বড় হতে হবে। তাজও চোখ মুছল।

ছ'মাসের ভেতরেই লায়েক খান চলে গেল। বড় ছেলে এসে তাজকে নিয়ে গেল। আমি পাথর হয়ে গেলাম। শুধু আমাকে বলল, বড় মা বলেছে আপনি আব্বাকে মাফ করে দেবেন। না হলে তার গোর আজাব হবে। আমি মনে হয় ডুকরে কেঁদে উঠেছিলাম। তাজ জড়িয়ে ধরলো আমাকে, বড় ছেলেও ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো। ছেলেকে বললাম, তোমার আম্মা আমার বড় বোন, তাকে আমার সালাম জানিও। যখনই ইচ্ছে হয়, করাচি বেড়াতে আমার কাছে এসো। ওরা চলে গেল।

লায়েক খান আমাকে চিরমুক্তি দিয়ে গেল। কিন্তু মুক্তি চাইলে কি মুক্তি পাওয়া যায়? ওই যে উপরে একজন বসে আছে স্টিয়ারিং হুইল ধরে তিনি বান্দার জীবনের গতি যে দিকে নিয়ন্ত্রণ করবেন, সেদিকেই যেতে হবে।

বাপের কৃত্য করে তাজ ফিরে এলো। মনে হয় রাতারাতি ওর বয়স অনেক বেড়ে গেছে। আগে রাতদিন ধরে কতো গল্প করতো, কথা যেন আর শেষ হতে চাইতো না। এবার চুপ করে বসে থাকে, আমাকেও তেমন কিছু বলে না। মনে হয় ওর বাপের মৃত্যু ওর আর আমার মাঝখানের ব্যক্তিত্বের ব্যবধান সৃষ্টি করে গেছে। ও ওর শেকড় খুঁজে পেয়েছে।

আজকাল আমার একবার দেশে যেতে খুব ইচ্ছে করে। বাবা নেই, বড় ভাই বিয়ে করেছে। ছোটটাও করবে শিগগির। আমাকে লিখেছে ও আগে থাকতে জানাবে আমি যেন ওর বিয়েতে যাই। আমার কোনো অসুবিধা হবে না। আমাদের এখন দোতলা দালান বাড়ি। নরসিংদীর দোকান এখন অনেক বড় হয়ে গেছে। নদীর ওপর পুল হয়েছে। আধা ঘণ্টায় ঢাকা যাওয়া যায়। কল্পনার চোখ মেলে শীতলক্ষ্যাকে দেখি, নরসিংদীর গাছপালা, নদী, নৌকা, বড় বড় মাছ সবই তো তেমন আছে। শুধু আমি নেই। আমি তো হারিয়ে গেছি, সবাই ভুলে গেছে। কিন্তু আমি ভুলতে পারি না কেন? কেন আমার মাটি আমাকে এমন করে টানে। না, ভাইয়ের বিয়ে নয়, তার আগেই আমাকে একবার যেতেই হবে। অবশ্য তাজের সঙ্গে পরামর্শ করেই যাবো।

তাজ ফৌজীতে যোগ দিলো। ইঞ্জিনিয়ারিং কোরে। আইএসসিতে ভালোই ফল করেছিলো। সহজেই সুযোগ পেয়ে গেল। ট্রেনিং থেকে ছুটিতে যখন আসতো ওর সুন্দর সুঠাম দেহে ইউনিফর্ম পরা ওকে দেখলে সত্যিই লায়েক খানের জন্য আমার দুঃখ হতো। ভঙ্গীও পাকিস্তানিদের মতো দুর্বিনীত। আমার বারবার একাত্তরের কথা মনে হতো, প্রয়োজনে আমার ছেলেও কি অমন বন্য জানোয়ার হবে? না, না, ওর দেহে তো আমার রক্তও আছে, আর ওর বাবা তো সত্যিই পশু প্রকৃতির ছিল না, তাহলে আমাকে ঠাঁই দিয়েছিল কেমন করে? না, তাজকে আমি যে তাজের নামে উৎসর্গ করেছি। ও যেন দেশ ও দশের জন্য নিজেকে উৎসর্গীত করতে পারে।

একদিন কথা প্রসঙ্গে আমি ওকে বাংলাদেশে যাবার ইচ্ছার কথা জানালাম। আশ্চর্য, ও খুব খুশি। বলল, তুমি যাও ঘুরে এসো, আমাকে তো এখন যেতে অনুমতি দেবে না। চাকরিতে যোগ দেবার পর আমি নিশ্চয় চেষ্টা করবো। তুমি ঘুরে এসো। একান্ত সহযোগিতা ও সহমর্মিতার স্পর্শ পেলাম ছেলের কথায়। ভাবতে লাগলাম কেমন করে কি করবো।

এমন সময় সুযোগ জুটে গেল। হঠাৎ সালমা বেগম ফোন করলেন, মেহের দুপুরের পর একবার আসতে পারো? বাংলাদেশ থেকে একটি মহিলা প্রতিনিধি দল এসেছেন এখানে একটা কনফারেন্সে যোগ দিতে। আমি সাত-আট জনকে রাতে খেতে বলেছি। তুমি এলে...। আমি কথা শেষ করতে দিলাম না। আমি নিশ্চই আসবো আপা। উনি বললেন, তাহলে একটা কাজ করো, বাড়িতে ব্যবস্থা করে এসো যেন রাতে ফিরতে না

হয়। তাই-ই হলো। আমি মনে হয় পাখির মতো উড়ে গেলাম। কারা আসছেন জিজ্ঞেস করেও লাভ নেই। আমি ঢাকায় শুধু সুফিয়া কামালের নাম শুনেছি তবে চোখে দেখিনি। আমি সুন্দর করে আমাদের প্রিয় মাছ রান্না করলাম। আমরা তো মাছ ভালোবাসি। আমি এতো দুঃখেও, এক টুকরা মাছ না হলে, ভাত খেতে পারি না।

ওঁরা এলেন ছ'জন আর এখানকার চারজন— মোট দশজন। সালমা বেগম আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন ওর ছোট বোন বলে। প্রতিবাদ করবার সুযোগ পেলাম না। বললেন, কুটির শিল্পের ওপর খুব ভালো কাজ করছি। দশ-বারোজন মেয়ের রুটি-রুজি আমার ওখান থেকে হচ্ছে। সবাই সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে আমাকে দেখলেন। কিন্তু আমার দৃষ্টি আটকে গেল সেই আপার দিকে, যিনি ঢাকা ছাড়বার আগের দিন আমাকে হাতে ধরে বলেছিলেন, তুমি যেয়ো না, আমি রাখবো তোমাকে। সেই স্নেহময় কণ্ঠ আর মিনতিভরা দৃষ্টি আমি আজও ভুলতে পারিনি। এখন বয়স হয়ে গেছে। চুল অনেক সাদা হয়ে গেছে, কিন্তু সেই সৌম্য মুখশ্রী ঠিক তেমনই কোমল ও সতেজ। উনিও বারবার আমার দিকে দেখছেন। হঠাৎ দ্রুত আমার কাছে এসে কানের কাছে মুখ নিয়ে বল্লেন, আপনি মেহেরুন্নেসা? হেসে মাথা নিচু করে বললাম, আপা, সেদিন কিন্তু আদর করে কাছে নিয়ে তুমি সম্বোধন করেছিলেন। বললেন, তোমার সঙ্গে কথা না বলে আমি পাকিস্তান ছাড়বো না। বলেই ত্বরিতগতিতে সরে গেলেন। বুঝলাম, সবাই ওকে খুব শ্রদ্ধার সঙ্গে নিয়েছে। সালমা বেগমের উনি নাকি শিক্ষক, তাই এতো সমাদর। সালমা বেগম আমার কাছে একটা সুতীর কাজ করা শাড়িও চেয়েছেন সন্ধ্যাবেলা। তাহলে সেটা কি ওই আপার জন্য।

খাওয়া-দাওয়া পর্ব চুকলো। কফি খেয়ে প্রায় সাড়ে বারোটায় সবাই হোটেলে ফিরে গেলেন। সালমা বেগমের সঙ্গে আপার কি আলাপ হল জানি না, উনিও আমাকে 'খোদা হাফেজ' বলে সবার মতোই বিদায় জানিয়ে গেলেন। সালমা বেগমের স্বামী হংকং গেছেন কি একটা ব্যবসায়ের কাজে। আমি রাতে ওঁর ঘরের ফ্লোরে শুলাম। উনি অনেক টানাটানি করলেন ওর সঙ্গে খাটে শোবার জন্য। কিন্তু উনি উদারতা দেখালেও আমার তো সীমা লংঘন করা উচিত নয়। বললেন, কাল সকালে আপা পারলো না, দুপুরে আমাদের সঙ্গে খাবেন আর তোমার সঙ্গে কথা বলবেন, ওঁদের সমিতির মেয়েদের তোমার কাছে এসে কাজের ট্রেনিং নিতে পাঠানো যায় কি-না। সবই বুঝলাম। উনি জানতে চান, আমি আত্মপরিচয়ে বেঁচে আছি না মুখোশ পরে চলছি।

পরদিন দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর আমি আপার কাছে সব কাহিনী বললাম। উনি থেকে থেকে আমার হাত দুটো চেপে ধরছিলেন। যখন আমার বলা শেষ হল তখন দু'জনের চোখেই জল। বললেন, মেহের সেদিন তোমার জন্য দুঃখ পেয়েছিলাম। কিন্তু আজ আমি দায়মুক্ত যে বাংলাদেশের মাটিতে আমি তোমার কবর রচনা করিনি। কারণ যুদ্ধে আঘাতপ্রাপ্ত বা লাঞ্ছিত কোনও মেয়েকেই আমরা প্রকাশ্যে সসম্মানে প্রতিষ্ঠিত করতে পারিনি। জানো মেহের, ১৯৭৩ সালে ফ্রান্স থেকে একজন মহিলা স্থপতি এসেছিলেন ঢাকায়। আমার সঙ্গে দীর্ঘ সময় আলাপ করেন। ওদের বিগত মহাসমরে উনি জার্মান

সৈন্যদের হাতে বন্দী হন এবং ওঁর ওপর যে পাশবিক অত্যাচার চলে তার ফলে তিনি মা হবার ক্ষমতাও হারান। পরবর্তীতে অবশ্য উনি বিয়ে করেছেন। স্বামী স্থপতি কিন্তু সব হারানো মেয়েদের দুঃখ ও বেদনা উনি জানেন। তাই আমার দেশের এ ধরনের মেয়েদের কোনওরকম সাহায্য-সহযোগিতা করতে পারলে উনি খুশি হবেন। এতো বছর পর জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েও মাতৃত্বের বঞ্চনায় তিনি মলিন ও বেদনার্ত। কিন্তু আমার দেশে তো প্রকাশ্যে মাথা উঁচু করে তেমন সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় সম্মানের অধিকারী হয়ে কেউ বেঁচে নেই। খুব খুশি হলাম তোমাকে দেখে আর তোমার ভেতরের শক্তির পরিচয় পেয়ে। তুমি ঢাকায় এসো, আমি বিশেষ প্রতিনিধি দলে তোমাকে অন্তর্ভুক্ত করবার জন্যে সালমাকে বলে গেলাম। আপা চলে গেলেন। আমার নিজ হাতে করা একখানা শাড়ি ওঁর হোটেলের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিলাম। উনি ফোনে ধন্যবাদ দিলেন।

চার মাস পর আমাদের যাবার সুযোগ এলো। বড় ভাইকে লিখলাম। উনি খুব খুশি। দিন তারিখ ফ্লাইট নম্বর জানালে উনি এয়ারপোর্টে থাকবেন। না, বিস্তারিত কিছুই আমি ওঁকে জানাইনি।

কিন্তু যাবার আগে আরেক লাঞ্ছিত রমণীর সাক্ষাৎ আমি পেলাম। জানি না আমরা কি শুধু বঞ্চনা সইতেই পৃথিবীতে এসেছি? যাবার দু'দিন আগে সালমা বেগম আমাকে ডেকে পাঠালেন। মুখখানা খুব ম্লান। বললেন, বোন মেহের! ভীতসন্ত্রস্ত কণ্ঠে বললাম, কি হয়েছে আপা? ম্লান হেসে বললেন, কিছু না। বোস, তোমার সঙ্গে কিছু কথা আছে। ইতস্তত করলেন, ঘরের ভেতর কিছুক্ষণ অস্থিরভাবে পায়চারি করে থেমে বললেন, মেহের তোমাকে আমি আজ কিছু কথা বলবো, সম্ভব হলে কারও কাছে প্রকাশ করো না। আমি নিঃশব্দে মাথা নেড়ে সম্মতি জানালাম। আমার পাশে এসে বসলেন, পিঠে হাত রাখলেন, অনুভব করলাম দুর্বল কোমল হাতখানার মৃদু কম্পন। বললেন, মেহের তোমাকে আমি বিনা স্বার্থে বাংলায় পাঠাচ্ছি না। তোমাকে আমি একটা ঠিকানা ও ফোন নম্বর দেবো এক ভদ্রলোকের। তুমি তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করে ওই প্যাকেটটা তাকে দেবে। আর কিছু বললে শুনে আসবে। পারবে? আমি আবেগে কেঁদে ফেললাম, আপা এটা কি কোনও কঠিন কাজ? মেহের ওই যুবক আমার ছেলে— আনন্দ। আমার বয়স যখন ১৭/১৮, কলেজে পড়ি আনন্দের বাবার সঙ্গে খুব ধুমধাম করে আমার বিয়ে হয়। আমার বাবা ছিলেন জেলা জজ, মধ্যবিত্ত বিবেকবান মানুষ, আর ওরা ছিল ধনী ব্যবসায়ী। বাবা এ বিয়েতে রাজি ছিলেন না কিন্তু ঐশ্বর্যে মেয়ে সুখে থাকবে এটা আমার মাকে প্রচণ্ডভাবে উৎসাহিত করে তুলেছিল। ফলে বিয়ে হয়ে গেল। স্বামী রূপবান, ধনী, মার্জিত রুচি। সুতরাং আমার সুখী হবার পথে তিলমাত্র বাধা ছিল না। বছর খানেক সুখেই কাটলো। আনন্দকে আমি গর্ভে ধারণ করলাম। আমার স্বামী এটা পছন্দ করলেন না। প্রথম মৃদু তারপর বেশ কঠিনভাবেই গর্ভপাত করাবার জন্য জিদ করতে লাগলেন এবং আমার প্রতি নীরব তাচ্ছিল্য ও উদাসীনতা প্রকাশ পেতে লাগলো। আমি নিরুপায় হয়ে আমার শাশুড়ীকে জানালাম। তিনি কঠোর ভাষায় ছেলেকে ভর্ৎসনা করলেন। ফল

হল বিপরীত। এক বছরেই স্বামী সোহাগিনীর পাট আমার চুকলো। আনন্দকে বুকে নিয়ে একদিকে মাতৃ কর্তব্য অন্যদিকে নিজের পড়াশোনায় মনোযোগী হলাম। এতোদিনে এ সত্য বুঝেছি যে জীবনে আমাকে একা চলার প্রস্তুতি নিতে হবে।

হায়দার সাহেব ছিলেন আমার স্বামীর ব্যবসায়ের বড় অংশীদার তাই উনি প্রায়ই আমাদের বাড়িতে আসতেন এবং ক্রমে সবই জানতে পারলেন। তিনি ওকে বোঝাতে অনেক চেষ্টা করেন। আমার স্বামী তখন বহুভোগের সন্ধান পেয়েছেন। তারপর ১৯৭০ সালের এক রাতে আনন্দকে আমার শাশুড়ীর বিছানায় রেখে আমি হায়দারের সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানে আসি। হায়দার আমাকে তার বড় বোনের বাড়িতে নিয়ে তোলে। সম্ভবত আগেই তাদের ভেতর কথাবার্তা হয়েছে। আমি এখান থেকেই আমার স্বামীর কাছে তালাক প্রার্থনা করলে আশাতীত দ্রুততার সঙ্গে তালাকনামা এসে যায়। তখন সংগ্রাম তুঙ্গে। হায়দারও আগে থেকেই ব্যবসা গুটিয়ে এনেছিল। সব সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেল। ছ'মাস বাদে আমাদের বিয়ে হয় কিন্তু সন্তান হল না। ১৯৮২ সালে আমি লোক মারফত আনন্দের একটি চিঠি পাই। সম্বোধন 'মা'। চিঠিখানা এনেছিলেন হায়দারের এক বাঙালি বন্ধু। এরপর থেকে তার মাধ্যমে আমাদের চিঠিপত্র, ফটো সব আসে। ঘুরে গিয়ে সামনের টিপয় থেকে এক সুন্দর সুঠামদেহী যুবকের ফটো তিনি আমাকে দেখালেন। এই আনন্দ। একেবারে মায়ের মুখ।

না, ওর বাপ আর বিয়ে করেনি। তাঁর প্রয়োজনও ছিল না। তিনি বেঁচে গেলেন। আমার কলঙ্কে তাঁর সমাজ ছেয়ে গেল। অবশ্য পিতৃকুলের সঙ্গে আমার যোগাযোগ আছে। বাবা নেই, এ ধাক্কা সামলাতে পারেননি। কিন্তু ভাই-বোনেরা সবাই আমার কাছে আসা-যাওয়া করেন। আসেনি শুধু আনন্দ। সে নিজের পায়ে না দাঁড়িয়ে আসবে না। ব্যবসা সে করবে না। মাস্টারি অথবা অন্য কোনও চাকরি করবে, মাকে নিবিড়ভাবে কাছে পেতে চায়।

ভাবছি আমার সান্ত্বনা আমার 'বীরাঙ্গনা'র প্রশংসাপত্র; কিন্তু এই রূপবতী গুণবতী, বিদুষী মহিলার জীবনে কি আছে? হায়দারের প্রেম ও আনন্দের কল্পলোক ছাড়া। হায়দার সম্পর্কে সালমা বেগম বলেন, আমি আমার দুঃখের বোঝা দিয়ে তার জীবন বরবাদ করেছি। মেহের, ও কি কখনও আমাকে ভালবেসেছে? ও দিয়েছে আমাকে করুণা, সহানুভূতি। তবে আমি ওকে ভালবেসেছি। আজ বলতে কোনও দ্বিধা নেই, ওই আমার জীবনে প্রথম ও শেষ ভালোবাসার পুরুষ।

প্যাকেটে কাজ করা একটি মুগার পাঞ্জাবী আর সালমা বেগমের নিজের হাতে বোনা জরদা রং ও গোলাপী মেশানো একটি গরম পুলোভার। গত এক মাস ধরে আমি তাকে এটা অত্যন্ত যত্নে বুনতে দেখেছি। আমি চোখ মুছে তাঁর দেওয়া প্যাকেটটা নিয়ে এলাম।

ঢাকা বিমানবন্দরে পা রাখলাম। এখানে এই আমার প্রথম আসা। বন্দী হিসেবে গিয়েছিলাম বেনাপোলের পথে ট্রাকে করে। অভ্যর্থনা জানাতে মহিলারা বিমানবন্দরে এসেছেন রজনীগন্ধা নিয়ে।

উঠলাম হোটেল শেরাটনে। ঘরে ফিরেই বড় ভাইকে ফোন করলাম ওঁর নরসিংদীর দোকানে। পেয়েও গেলাম। উত্তেজনায় আমার গলা কাঁপছিল। বললাম এখানে দু'দিনের অনুষ্ঠান আছে। তুমি বৃহস্পতিবার সকালে এসো আমি তোমার সঙ্গেই বাড়ি যাবো। শেষ পর্যন্ত গলা কেঁপে মনে হয় কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে গেল। মা নেই, বাবা নেই, এ কোন শূন্যপুরীতে সে যাবার পরিকল্পনা করেছে। সেমিনার হল, রিসেপশন হল, বিভিন্ন বাড়িতেও ডিনার খাওয়া হল। আপার সঙ্গে বারবার দেখা হল, খুশিতে তাঁর বার্ধক্যের মুখখানা যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। ভাবখানা অন্তত একটি মেয়ে তো জয়ী হয়েছে। সে যেভাবেই হোক। তার বীরাঙ্গনা নাম কি সার্থক করতে পারেনি? অবশ্যই পেরেছে। যেখানেই যাই সবার কাছে বলেন, আমার ছাত্রীর ছোট বোন। এতো সমাদার আমার ভাগ্যে ছিল আমি কখনও ভাবিনি। কিন্তু সেই বড় কাঁটাটা যেন আমার মর্মমূলে বিদ্ধ হয়ে নিয়ত আমার হৃদয়ে রক্তক্ষরণ ঘটাচ্ছে। তার থেকে তো আমার মুক্তি কোনও দিনই ঘটবে না। সে আমার ওই পাসপোর্টখানা, ওয়াইফ অব লায়েক খান, জাতীয়তা—পাকিস্তানি। না, না, আর ভাবতে পারি না। আল্লাহ আমি না চাইতে তুমি আমাকে সব কিছু দিয়েছো, কিন্তু যা হারিয়েছি তার কি হবে। আত্মরক্ষার জন্য ছলনা গ্রহণের এই আমার আজীবনের শাস্তি।

পরদিন সকালে আনন্দ এলো। পা ছুঁয়ে সালাম করতেই আমি ওকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরলাম। এ তো আমার তাজ! কতো কথা, কতো স্বপ্ন। ও আগামী মাসে আমেরিকার কেম্ব্রিজে যাচ্ছে অর্থনীতিতে পিএইচডি করতে। ভালো কাজ পেলে মাকে এবং হায়দার আঙ্কেলকে নিয়ে যাবে। আন্টি, আঙ্কেলকে বলবেন আমি তাকে খুব ভালোবাসি, শ্রদ্ধা করি, কারণ তিনি আমার মাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। কার্ডিগানটা মায়ের হাতের করা শুনে বারবার হাত বোলালো। আমিও ওর জন্যে একটা গলা উঁচু পাঞ্জাবী এনেছিলাম। তাজও এগুলো খুব ভালোবাসে। খুব পছন্দ হল আনন্দের। বললো, আন্টি আপনি যাবার দিন আমি এয়ারপোর্টে দেখা করবো। না, না করতেই আমার হাত চেপে ধরলো, কিছু খেলো না, আমাকে খুশি করবার জন্য একটা আপেল তুলে নিয়ে গেল।

নির্ধারিত দিনে বড় ভাই এলো। সেই লুঙ্গি শার্ট পরা বড় ভাই নয়। সুন্দর সাফারী পরা, হাতে সদ্য খোলা রোদ চশমা। দু'জন দু'জনের দিকে তাকিয়ে রইলাম তারপর দু'জন দু'জনকে ধরে কান্নার বেগ সামলাতে পারলাম না। আমি ঠিক করেছিলাম সোজা গাড়ি নিয়ে যাবো কিন্তু বড় ভাই ওর জীপ গাড়ি নিয়ে এসেছে। মনে হচ্ছে সবই স্বপ্ন দেখছি। সকাল ৯টায় বেরুলাম। কি জনাকীর্ণ রাস্তা, বাস, ট্রাক, রিকশা, প্রাইভেট কার, বেবীট্যাক্সীর ভোঁ ভোঁতে কান ঝালাপালা। কতো দ্রুত এগিয়ে এলাম শীতলক্ষ্যার বিরাট ব্রিজে। মুহূর্তে নদী পার হয়ে এলাম। নামলাম গিয়ে বাড়ির সামনে। লালু, মিলু, এবং সঙ্গে ভাবী ও তার বাচ্চা মেয়ে সবাই গেটের কাছে দাঁড়ানো। সে ঘরদুয়ার কিছুই নেই। সুন্দর দোতলা বাড়ি, ছিমছাম, গোছানো। মনে হয় বউ বেশ সংসারী। ঘরে ঢুকে সময় লাগলো স্বাভাবিক হতে। বাবা, মার কথা বলতে পারলাম না। যে জায়গাটায় মা পড়েছিলেন তা আজ বাড়ির নিচে। হঠাৎ দেখা গেল শিউলী গাছটা নেই। বললাম লালু,

ওই কোনের শিউলী গাছটা কই রে? ঝড়ে পড়ে গেছে আপা, অপরাধী কণ্ঠে জবাব দিলো লালু। মনে হল ওরা কেটে ফেলেছে তাই এই কুণ্ঠা। গাছটা আমার খুব প্রিয় ছিল সে কথা মিলুও জানে। ভাইয়ের মেয়েটা খুবই সুন্দর হয়েছে। সবাই বললো দেখতে অনেকটা আমার মতো হয়েছে। ওর জন্য এবং ভাবীর জন্য শাড়ি এবং তিন ভাইয়ের জন্য পাঞ্জাবী এনেছিলাম। বের করে দিলাম। পাড়াপড়শী কারও কথাই আমি জিজ্ঞেস করলাম না, ওরাও গায়ে পড়ে কিছু বললো না। সারাদিনই গেট এবং সামনের ঘরের দরজা বন্ধ রইল। মানে আমার আসবার কথা এরা কাউকে বলেনি। শান্ত, সুন্দর জীবনে কেইবা শুধু শুধু যন্ত্রণার দায় আনতে চায়! লালু, মিলুকে পাকিস্তান যাবার দাওয়াত দিলাম। সন্ধ্যায় বেরুবো। ওরা আমাকে একটা রাত থাকবার জন্য অনুরোধ করেছিল কিন্তু আমি পারলাম না। আমার নিশ্বাস আটকে আসছে। শুধু ভাবছি কেন এলাম এ শ্মশানে, শূন্য ভিটায় নিজের কঙ্কাল দেখতে।

আসবার আগে বড় ভাই আমাকে একটি ছোট্ট লাল রঙের ভেলভেটের বাক্স দিলো। বাবা তাজের জন্য হার রেখে গেছেন। ওটা হাত পেতে নিয়ে মাথায় ছোঁয়ালাম। তারপর দ্রুত হেঁটে এসে জীপে উঠলাম। চারদিকে অন্ধকার নেমে এসেছে। আমি এতোক্ষণে স্বস্তি বোধ করলাম, বুঝলাম এ মাটিতে মুখ দেখাবার মতো শক্তি আমার নেই। আমি জীবনের সব পেয়েছি কিন্তু মাটি হারিয়েছি। মনে মনে বললাম, আর কখনও আসবো না। দূরে চলে যাচ্ছি, সেখানে আমি নামহীন-গোত্রহীন একটি ভেসে আসা, দুস্থ, লাঞ্ছিত রমণী।

হোটেলে ফিরে এসে প্রচুর পানিতে গোসল করে স্থির হলাম। বড় ভাই চোখের জলে বিদায় নিলেন। ভাবী আসবার সময় একটা দামী শাড়ি দিলেন।

কাল সকালে চলে যাবো। এসেছিলাম প্রচণ্ড উত্তেজনা নিয়ে, ফিরে যাচ্ছি শান্ত-সমাহিত হৃদয়ে। মনে হচ্ছে যেন জন্মভূমির সঙ্গে দেনা-পাওনা আমার চুকে গেছে। এয়ারপোর্টে আনন্দ এলো। আমার হাতে দুটো প্যাকেট দিলো-উপরে লেখা মা। বলল, খালাম্মা, মাকে বলবেন এ ঢাকাই শাড়ি আমার নিজের উপার্জনের টাকায় কেনা, একথাটা বলতে ভুলবেন না। দেখা হবে করাচিতে, পা ছুঁয়ে সালাম করে দ্রুত চলে গেল। মনে হল কিছুটা নিজেকে সামলাতে পারলাম। আমি তাকিয়ে রইলাম ওই নিঃস্ব, মাতৃহারা, সব হারানো মানুষটার দিকে।

ফিরে এলাম নিজস্ব বৃত্তে। এই আমার কর্মস্থান, আশ্রয়। তাজ হার পেয়ে মহাখুশি, গলায় পরে বসলো। বললো, নানার সঙ্গে সব সময়ে আমার কোলাকুলি হবে। ওর জন্য আনা পাঞ্জাবী ওকে দিলাম। শুধু শুনতে চায় গল্প কিন্তু আমার সব কথা তো ফুরিয়ে গেছে। সালমা বেগম খুশিতে হাউমাউ করে কেঁদে উঠলেন। হায়দার সাহেবের চোখও শুকনো ছিল না। আমি এখন ছোট বোনের মতো ওঁর সামনে বেরুই। মনে হল এঁদের জন্যে আমার যাওয়াটা সার্থক হয়েছে।

নাইবা পেলাম জাতীয় পতাকা, নাইবা পেলাম আমার সোনার বাংলা কিন্তু আমি জাতির পিতার স্বপ্ন সফল করেছি। একজন যুদ্ধজয়ী বীরাঙ্গনা রূপে বাংলাদেশ ছুঁয়ে এসেছি। এটুকুই আমার জয়, আমার গর্ব, আমার সব পাওয়ার বড় পাওয়া।

"মাঝে মাঝে বুকের ভেতরটা কেমন যেন হাহাকার করে ওঠে। কিসের অভাব আমার, আমি কি চাই? হ্যাঁ, একটা জিনিস একটি মুহূর্তের আশঙ্কা মৃত্যু মুহূর্ত পর্যন্ত রয়ে যাবে। এ প্রজন্মের একটি তরুণ অথবা তরুণী এসে আমার সামনে দাঁড়িয়ে বলবে, বীরাঙ্গনা আমরা তোমাকে প্রণতি করি, হাজার সালাম তোমাকে, তুমি বীর মুক্তিযোদ্ধা, ওই পতাকায় তোমার অংশ আছে। জাতীয় সঙ্গীতে তোমার কণ্ঠ আছে। এদেশের মাটিতে তোমার অগ্রাধিকার, সেই শুভ মুহূর্তের আশায়, বিবেকের জাগরণের মুহূর্তের পথ চেয়ে আমি বেঁচে রইবো।"

— বীরাঙ্গনা রীনা

আমি রীনা বলছি। আশা করি আমার পরিচয় আপনাদের কাছে সবিস্তারে দেবার কিছু নেই। আমাকে নিয়ে আপনারা এতো হৈচৈ করেছিলেন যে ত্রিশ হাজার পাকিস্তানি বন্দী হঠাৎ ভাবলো বাংলাদেশ থেকে কোনো হেলেনকে তারা হরণ করে নিয়ে যাচ্ছে। ভারতীয় কর্তৃপক্ষ অবশ্য খুব বেশি বিস্মিত হননি। কারণ আমার মতো আরও দু'চারজন এ সৌভাগ্যের অধিকারিণী হয়েছিলেন। অবশ্য পাকিস্তানিরা কিন্তু আমাদের জোর করে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল না, আমরা স্বেচ্ছায় ওদের সঙ্গে যাচ্ছিলাম। কারণ বাংকার থেকে আমাকে যখন ভারতীয় বাহিনীর এক সদস্য অর্ধউলঙ্গ এবং অর্ধমৃত অবস্থায় টেনে তোলে তখন আশেপাশের দেশবাসীর চোখে-মুখে যে ঘৃণা ও বঞ্চনা আমি দেখেছিলাম তাতে দ্বিতীয়বার আর চোখ তুলতে পারিনি। জঘন্য ভাষায় যে সব মন্তব্য আমার দিকে তারা ছুড়ে দিচ্ছিল তাতে ভাগ্যিস বিদেশীরা আমাদের সহজ বুলি বুঝতে পারেনি। ওরা খুব সহানুভূতির সঙ্গে আমাকে টেনে তুলে সংশ্লিষ্ট ক্যাম্পে নিয়ে গেল। গোসল করে কাপড় বদলাবার সুযোগ দিলো। জিজ্ঞেস করলো, কিছু খাবো কি-না? মাথা নেড়ে অসম্মতি জানালাম। তারপর ওদের সহায়তায় জীপে উঠলাম। আমি ভালো করে পা ফেলতে পারছিলাম না, পা টলছিল, মাথাও ঘুরছিল। ওরা দ্রুত আমাকে আরও তিনজনের সঙ্গে গাড়িতে তুলে নিলো। ওদের কথায় বুঝলাম আমরা ঢাকা যাচ্ছি। ঠিক বুঝতে পারছিলাম না আমি জীবিত না মৃত? এমন পরিণাম কখনও তো ভাবিনি। ভেবেছিলাম একদিন বাংকারে মরে পড়ে থাকবো আর প্রয়োজনে না লাগলে ওরাই মেরে ফেলে দেবে। লোক সমাজে বেরুবো, এতো ঘৃণা ধিক্কার দেশের লোকের কাছ থেকে পাবো তা তো কল্পনাও করিনি। ভেবেছিলাম যদি মুক্তিবাহিনী আমাদের কখনও পায়, মা-বোনের আদরে মাথায় তুলে নেবে। কারণ আমরা তো স্বেচ্ছায় এ পথে আসিনি। ওরা আমাদের বাড়িতে একা ফেলে দেশের কাজে গিয়েছিল একথা সত্যি; কিন্তু

আমাদের রক্ষা করবার দায়িত্ব দিয়ে গিয়েছিল কার ওপর? একবারও কি আমাদের পরিণামের কথা ভাবেনি? আমরা কেমন করে নিজেকে বাঁচাবো। যুদ্ধের উন্মাদনায় আমাদের কথা তো কেউ মনে রাখেনি। পেছনে পড়েছিল গর্ভবতী স্ত্রী, বিধবা মা, যুবতী ভগ্নী— কারও কথাই সেদিন মনে হয়নি। অথচ তাদের আত্মরক্ষার তো কোনও ব্যবস্থাই ছিল না। বৃদ্ধ পিতা-মাতা মরে বেঁচেছেন, গর্ভবতী পত্নীর সন্তান গর্ভেই নিহত হয়েছে। যুবতী স্ত্রী, তরুণী ভগ্নী পাক দস্যুদের শয্যাশায়িনী হয়েছে। অথচ আজ যখন বিজয়ের লগ্ন এসেছে, মুক্তির মুহূর্ত উপস্থিত হয়েছে তখনও একবুক ঘৃণা নিয়ে তাদের দিকে দৃষ্টিপাত করছে সামাজিক জীবেরা। একটা পথই এসব মেয়েদের জন্যে খোলা ছিল— তা হলো মৃত্যু। নিজেকে যখন রক্ষা করতে পারেনি, তখন মরেনি কেন? সে পথ তো কেউ আটকে রাখেনি। কিন্তু কেন মরবো? সে প্রশ্ন তো আমার আজও। মরিনি বলে আজও আর পাঁচজনের মতো আছি, ভালোই আছি, জাগতিক কোনও সুখেরই অভাব নেই। নেই শুধু বীরাঙ্গনার সম্মান। উপরন্তু গোপনে পাই ঘৃণা, অবজ্ঞা আর ভ্রূ কুঞ্চিত অবমাননা।

সে কবে, কতোদিন আগে? আমার একটা অতীত ছিল, ছিল বাবা মা বড় ভাই আসাদ আর ছোট ভাই আশফাক। বাবা পাকিস্তান সরকারের বড় চাকুরে। কাকাও লাহোর রাওয়ালপিন্ডি কখনও ঢাকায় ভাই বিএ পরীক্ষা দিয়ে আর্মিতে ঢুকলেন বাঙালির প্রতি অবজ্ঞা তিনি ঘোচাবেন। আব্বার ইচ্ছা ছিল না কিন্তু তিনি বাধাও দিলেন না। ট্রেনিং শেষ করে কিছুদিন রইলো শিয়ালকোটে তারপর একেবারে কুমিল্লায়। ততোদিনে আব্বা রিটায়ার করেছেন। আশফাক ইঞ্জিনিয়ারিং দ্বিতীয় বর্ষ আর আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শেষ বর্ষের ছাত্রী। বড় সুখে-আনন্দে কেটে যাচ্ছিল আমাদের দিনগুলো। আতাউরের সঙ্গে কিছুটা মন দেওয়া-নেওয়া যে হয়নি তা নয়, তবে ফাইনাল পরীক্ষার আগে কিছু প্রকাশ করবার সাহস আমার ছিল না। আতাউর ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করে পিএইচডি করবার জন্যে আমেরিকা যাচ্ছে। নিজেরা ঠিক করলাম ও চলে যাক, পরীক্ষার হলে আমারও যাবার ব্যবস্থায় বাধা থাকবে না।

বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা থেকে আমরা বেশ দূরেই থাকতাম। কখনও বাড়ির গাড়ি, কখনওবা বাসে আসা-যাওয়া করতাম। তখনও পথঘাট এমন শ্বাপদসঙ্কুল হয়নি। সন্ধ্যা হলে বাবা ক্লাবে যেতেন। আমি আর মা পড়াশুনা করতাম, টিভি দেখতাম অথবা মেহমান এলে আপ্যায়ন করতাম।

আমি নাকি অসাধারণ সুন্দরী ছিলাম। ঘরে-বাইরে সবাই তাই বলতো। মাঝে মাঝে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দেখেছি, না, খুঁত নেই আমার কোথাও, দীর্ঘ মেদশূন্য দেহ, গৌরবর্ণ, উন্নত নাসিকা, পদ্মপলাশ না হলেও যাকে বলে পটলচেরা চোখ, পাতলা রক্তিম ওষ্ঠ। একেবারে কালিদাসের নায়িকা! নিজের রূপ সম্পর্কে নিজে খুবই সচেতন ছিলাম। একা এক ঘর লোকচক্ষুর সামনে কেমন করে নিজেকে আকর্ষণীয় করে রাখতে হয় তাও জেনে ফেলেছিলাম। যখন যা প্রয়োজন কিনবার জন্যে অর্থের অভাব হতো না। নিজে স্কলারশীপ পেতাম, বড় ভাইও টাকা দিতো, আর মা জননী তো আছেনই।

এমনিই নিস্তরঙ্গ সুখের জীবনে বিক্ষুব্ধ বাতাস বইতে শুরু করলো, ছ'দফা আন্দোলনকে উপলক্ষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে ধীরে ধীরে ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন কর্মতৎপর হয়ে উঠলো। আমি ছাত্র ইউনিয়ন করতাম। কিন্তু ছ'দফায় আমাদের মতভেদ ছিল না। রাজনৈতিক আন্দোলন ছাত্রশক্তির সহায়তায় তীব্রতর হল। শুরু হল আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা। বাবা বড় ভাইয়ের জন্য চিন্তিত হতেন কারণ আগরতলা মামলায় কিছু নৌ-বাহিনীর সদস্য গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। বড় ভাইয়ের জাতীয় চেতনা আব্বার অজ্ঞাত ছিল না। কিন্তু ছাত্র জনতা, রাজনীতিবিদ সবার মিলিত আন্দোলনে আইয়ুবের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়ে গেল। শেখ মুজিব পেলেন জনতার অকুণ্ঠ সমর্থন।

এবারে পট পরিবর্তন। আইয়ুব গেল, ইয়াহিয়া এলো, হলো নির্বাচন। নির্বাচন পূর্ব-পাকিস্তানে আওয়ামী লীগবিরোধী সবাইকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। আমরা ভাবলাম এবারে শেখ মুজিব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু ভুট্টোর মাথায় তখন ষড়যন্ত্রের কুটিল চক্র কাজ করছিল। মদ্যপ দুর্বল ইয়াহিয়াকে হাত করে ভুট্টো পূর্ব পাকিস্তান ধ্বংসের সুযোগ খুঁজতে লাগলো। দুরাত্মার ছলের অভাব হয় না। সুতরাং সংসদ বসলো না। সময় কাটিয়ে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে লাগলো পাকিস্তান। এক মাস বাংলায় চললো অসহযোগ আন্দোলন। সে কি উত্তেজনাকর পরিস্থিতি। তারপর? তারপর ২৫ মার্চ, জাতীয় ইতিহাসের সর্বাধিক কৃষ্ণ রাত্রি। ঢাকার খবর পেলাম। কিন্তু আমরা ঠিক এতোটা বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। আশফাক আব্বাকে আমাদের নিয়ে গ্রামে চলে যেতে বললো। ও ঢাকা থেকেই ফোনে কথা বলছিল। জানালো, ও এক আত্মীয়ের বাড়িতে যাবে, পরে যোগাযোগ করবে। বড় ভাই ভালো আছে। মা আর আমি যতো বিচলিত হলাম আব্বা ততোটা নন। উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী ছিলেন। সবাই তাকে মান্য করে, তার কিসের ভয়? তিনি ভরসা দিলেন কিন্তু মা-মেয়ে ভরসা পেলাম না। পরিচিতরা একে একে চলে যাচ্ছে।

রাহেলার মা অর্থাৎ কাজের মহিলাও চলে গেল। মাফ চেয়ে গেল, বেঁচে থাকলে আবার দেখা হবে। মা কেন জানি না কিছু বেশি করে কাপড়-জামা ওকে দিয়ে দিলেন। দিনটা তবুও নানা কাজে যায় কিন্তু সন্ধ্যা হলেই যেন অন্ধকার গলা টিপে ধরে। আব্বার ক্লাব নেই, ঘরে টিভি খোলা যায় না, শব্দটা যেন আমাদের আরও ভীতসন্ত্রস্ত করে। বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ। হঠাৎ সত্যিই একদিন কৃষ্ণদাসের গরুর পালে বাঘ পড়লো, কিন্তু সে ভরদুপুরে। বেলা ১টা মতো হবে মা আমাদের খাবার ব্যবস্থা করছেন। এমন সময় একটা আর্মি জীপ এসে থামলো। আমার হৃৎপিণ্ডের উত্থান-পতন যেন আমি নিজে শুনতে পাচ্ছি।

বাবা দরজার কাছে এলেন, একজন অফিসার তমিজের সঙ্গে আব্বার সঙ্গে করমর্দন করলো। আব্বা তাদের বসতে বললো. কিন্তু তারা বসলো না। বললো, তোমার ছেলে কোথায়? বাবা বললেন, ও তো তোমাদের মতো আর্মির ক্যাপ্টেন, কুমিল্লায় আছে। বাবাকে কথা শেষ করতে দিলো না, হঠাৎ বাবার গালে একটা প্রচণ্ড চড় কষে দিলো। আব্বা হতভম্ব হয়ে বললেন, তোমরা জানো না আমি কে? আমি... কথা শেষ হল না

'কুত্তার বাচ্চা' সম্বোধনের সঙ্গে লাথি খেয়ে বাবা বারান্দায় পড়ে গেলেন। ছুটে গেলেন মা, মাকে ধাক্কা দিয়ে বললো, হট যাও বুড্ডী। খানসামা আলী এসেছিল, তাকেও টেনে দাঁড় করালো। তারপর স্টেনের আওয়াজ ঠ্যা ঠ্যা ঠ্যা। বাবা, মা, আলীর রক্তাক্ত দেহ মাটিতে পড়ে। হতভম্ব আমি বাইরে বেরিয়ে এলাম, ক্রুদ্ধ মুখগুলো খুশিতে ভরে গেল। আইয়ে আইয়ে করে আমার হাত ধরে ওই জীপে টেনে তুলে নিয়ে গেল। আমি তখন চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছিলাম না। আমি সজ্ঞানে ছিলাম কি-না বলতে পারি না। কিছুক্ষণ পরই একটা ঝাঁকুনী দিয়ে জীপটা থেমে গেল। একজন হাত বাড়িয়ে আমাকে ধরে নামালো। আমি কেঁদে উঠলাম, কারণ ও হাত একটু আগেই আমার বাবা-মাকে হত্যা করে এসেছে। সোহাগ মিশিয়ে খুনী বললো, ভয় পেয়ো না। আমরা তোমাকে যত্ন করেই রাখবো। বুঝলাম আমি নিকটস্থ সেনানিবাসে এসেছি, সুতরাং ইতরামি হয়তো অপেক্ষাকৃত কম হবে। অফিস ঘরে একদিকে একটা সোফাসেট ছিল, আমাকে সেখানে বসিয়ে দিল। বারবার জিজ্ঞেস করতে লাগলো, ঠাণ্ডা-গরম কিছু খাবো নাকি? কে জানে, এই মাত্রই তো বাবা-মাকে খেয়ে এসেছি তবু সমস্ত গলা-বুক শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। কে যেন আদর করে সামনে এক পেয়ালা চা দিলো। কোনোমতে কাপ তুলে এক চুমুক চা খেতেই আমার সমস্ত শরীর গুলিয়ে উঠলো, হড়হড় করে ওদের সুন্দর কার্পেটের ওপর বমি করে দিলাম। এতোক্ষণে সমস্ত শক্তি দিয়ে উচ্চারণ করলাম 'স্যরি'। আমার খেদমতকারীরা কর্তার হুকুমে আমাকে কাছেই একটা ঘরে নিয়ে গেল। একটা ঘরে সম্ভবত একজনকে থাকতে দেওয়া হয়, সঙ্গে বাথমরুম। একটু পরে জমাদারনী শ্রেণীর একজন মধ্যবয়সী এলো একসেট কাপড়-জামা অর্থাৎ সালোয়ার, কামিজ নিয়ে। কারণ বমি করে সব নষ্ট করে ফেলেছি। আমি গোসলখানায় ঢুকলাম। জমাদারনী বারবার বলল আমি যেন দরজা বন্ধ না করি। তখনও আমার মুখে কথা নেই শুধু বোবা দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম। বলল দরজা বন্ধ করে অনেক মেয়ে মরবার চেষ্টা করেছে। তাদের কঠিন সাজা দেওয়া হয়েছে। ভাবলাম দরজা খোলাইবা কি আর বন্ধই বা কি, উলঙ্গকে নাকি স্বয়ং খোদাও ভয় পান। সুতরাং কে আমাকে ভয় দেবে, আমিই পারবো কতজনকে ভয় দিতে। মাথায় প্রচুর পানি ঢেলে নিজেকে আত্মস্থ করতে চেষ্টা করলাম। না, আমি মরবো না, মেরে ফেললে কিছু করবার নেই কিন্তু আত্মহত্যা করবার চেষ্টা করবো না। গোসল সেরে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে বসলাম। মাথা দিয়ে পানি ঝরছে, চিরুনী নেই, হেয়ার ড্রায়ার নেই, একটা শুকনা তোয়ালে দিয়ে চুলগুলো জড়িয়ে রাখলাম। একটু পরে চিরুনী ও আনুষঙ্গিক প্রসাধন সামগ্রীও এলো। বা! অভ্যর্থনা তা ভালোই হল। রাতে আবার ডাক এলো, বুঝলাম এটা অফিসারস মেস। একই টেবিলে আমাকে খেতে দিল দেখে অবাক হলাম। ধীরে ধীরে কথাবার্তা শুরু হল। প্রকৃতপক্ষে জীবন কাটিয়েছি আব্বার সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানে, তাই উর্দু আর ইংরেজি দুটোই আমার আয়ত্তে ছিল। আব্বার পরিচয় নিলো, কিন্তু তাদের বিন্দুমাত্র অনুতপ্ত বলে মনে হল না। বড় ভাইয়ের কথা জিজ্ঞেস করলো। সম্ভবত ছোট ভাইয়ের সংবাদ এরা জানে না। ইউনিভার্সিটির কোন শিক্ষক কোন দল করে, কোন হলে কোন দলের ছাত্র থাকে ইত্যাদি। কি উত্তর দিয়েছিলাম তা আর আজ এতোদিন পর মনে পড়ে না। তবে সবই

যে উল্টাপাল্টা বলেছিলাম এটুকু মনে আছে। কাঁধের দিকে তাকিয়ে বুঝলাম এদের দলপতি একজন লে. কর্নেল বয়স ৪৫ বছরের মতো হবে। সুঠাম দেহ তবে উচ্চারণ শুনে বুঝলাম পাঞ্জাবি। আরেকবার বুকটা কেঁপে উঠলো কারণ এই শ্রেণীকে আব্বা একেবারেই দেখতে পারতেন না। বলতেন অশিক্ষিত, বর্বর, গোঁয়ার। যাই হোক খাবার নিয়ে নাড়াচাড়াই করতে লাগলাম। কিছু কি ভাবছিলাম তাও আজ মনে করতে পারি না। কর্নেল সাহেব আমাকে অভয় দিয়ে বললেন, ভয় পেয়ো না, এখানে আমি তোমার দেখভাল করবো। তবে পালাবার চেষ্টা করলে জানে মেরে ফেলা হবে এটা মনে রেখো। দরজা কখনও বন্ধ করবে না। জমাদারনী রাতে তোমার ঘরে শোবে। আমি কোনও কথারই জবাব দিলাম না বা দিতে পারলাম না। জমাদারনীর সঙ্গে ঘরে ফিরে এলাম। বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়লাম। আজ আমার বলতে লজ্জা নেই সেদিন আমি মড়ার মতো ঘুমিয়েছিলাম। একবারও ভাবতে চেষ্টা করিনি বাবা নেই, মা নেই আমি নিজে অনন্ত দোজখের মুখে এসে দাঁড়িয়েছি। কেন এমন হয়েছিল? মনে হয় আমার বোধশক্তি লোপ পেয়েছিল। আর না হয় সেদিন থেকে নিজেকে নতুন করে ভালবাসতে শুরু করেছিলাম। গায়ে রোদ লাগায় উঠে বসলাম। জমাদারনী একেবারে অনুগত আয়ার মতো নতুন পেস্ট ব্রাশ এগিয়ে দিলো। হাসলাম, এ ধরনের কাজ করবার অভ্যাস তার আছে। মুখ ধুয়ে আসতেই ধূমায়িত চা এলো, বলল সাহেবরা ব্রেকফাস্টে ডাকছে। বললাম, আমার ব্রেকফাস্ট এখানেই নিয়ে এসো। উত্তরে হাসিমুখে সখী বলল, যেমন আপনার মর্জি। কর্নেল সাহেবের নেকনজরে আছেন আপনি, রানীর আরামে থাকবেন। ভাবলাম পরিণাম যখন এক, তখন রানীইবা কি আর জমাদারনীইবা কি! তবুও সুযোগের সদ্ব্যবহার করি। কলম-পেন্সিল খুঁজলাম। এক টুকরা কাগজও ঘরে নেই। সব প্রকার সতর্কতাই গ্রহণ করা হয়েছে। তাছাড়া আমিই তো একমাত্র রাজকীয় মেহমান নই। এর আগেও কতো এসেছে কতো গেছে। আল্লাহ এই ছিল আমার কপালে! জীবন নিয়ে কতো রঙিন স্বপ্ন দেখেছিলাম ক'মাস পরে আমেরিকা যাবো স্বামীর ঘরে। কতো বড় বড় দেশ দেখবো, জীবন উপভোগ করবো, সন্তানের মা হবো। হাসলাম নিজের মনে, এ যুদ্ধ একদিন শেষ হবে। এরা যতো শক্তিমানই হোক জয়ী আমরা হবোই। তখন আমি কোথায় থাকবো? তার অনেক আগেই তো আমি ব্যাধিগ্রস্ত শরীর নিয়ে শেষ হয়ে যাবো। এমন কতো যুদ্ধবন্দীদের কাহিনী পড়েছি, সিনেমা দেখেছি, কিন্তু এমন রানীর আদর, আরাম, আয়েস পেয়েছে ক'জন। সে দিক থেকে আমি ভাগ্যবতী। আমার একমাত্র ঘনিষ্ঠ বান্ধবী জমাদারনী জয়গুন। তাকে বললাম, কর্নেল সাহেব বদলী হয়ে গেলে আমার কি হবে? যে সাহেব আসবে তুমি তার রানী হয়ে থাকবে। কেন আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবে না? ওরে বাপ সাহেবের বেগম সাহেবাকে আমি একবার দেখেছি। সে মারাত্মক। টের পেলে তুমি তো তুমি সাহেবকে গলা টিপে মারবে। বললাম, বেগম সাহেব থাকে কোথায়? জয়গুন বলল, কখনও ঢাকায়, কখনও তার বাপের কাছে ইসলামাবাদে। নিজের অজ্ঞাতে দু'হাত গলায় উঠে থামলো, মনে হল যেন বেগম সাহেবার চাপে ব্যথা পাচ্ছি। একদিন সন্ধ্যায় কর্নেল আমাকে নিয়ে খোলা জীপে

বেড়াতে বেরুলেন। মনে হচ্ছিল পাশে আতাউর, আমি আমেরিকার কোনও শহরে। খুব ভালো লাগছিল, গুনগুন করে গান গাইছিলাম হয়ত। গাড়ি একটা ছোট দোকানের সামনে থামলো, ছোট ছোট ক'টা ছেলে যাদের আমরা ঢাকায় টোকাই বলতাম দাঁড়ানো ছিল, হয়তবা খেলছিল, মিলিটারি দেখে থেমে গেছে। গলা বাড়িয়ে বললাম, কি করছো? ছোট ছেলেটা বলল, বাঙালি, কথা কইস না, হালায় বেবুশ্যে মাগী। কর্নেল তখন বিস্তৃত দন্তপাটি মেলে হাসছে। ছেলেগুলো দৌড় দিলো কিন্তু আমার সর্বদেহে-মনে যে কালি ছিটিয়ে গেল তার থেকে আমি আজও মুক্ত হতে পারিনি। লেডি ম্যাকবেথের মতো আরবের সমস্ত সুগন্ধি ঢেলেও তো আজ তার অন্তর সৌরভ মণ্ডিত হল না। সেই ক্ষুদ্র শিশুর চোখে-মুখে প্রতিফলিত ঘৃণা আমার রানীত্বকে মুহূর্তে পদদলিত করেছিল। কিছুক্ষণ পর কর্নেল সাহেব বুঝলেন কিছু একটা হয়েছে। ছেলেগুলো কিছু একটা বলে দৌড়ে পালিয়েছে। তাদের গমন পথের দিকে তিনি জীপ ঘোরালেন। আমি তাঁর হাত চেপে ধরে গাড়ির মুখ ফিরিয়ে নিলাম। আতাউরকে নিয়ে মুক্তি পাবো এটা ছাড়া আর কখনও স্বপ্ন দেখিনি। কারণ ওই শিশুটিই আমাকে বলেছিল সেটা স্বপ্নই আমার জীবনে তা অলীক। কারণ ওই স্বপ্ন দেখার অধিকার আমি হারিয়ে ফেলেছি।

ওটা কতো তারিখ কোন মাস ছিল মনে নেই। সম্ভবত জুন মাস হবে। দিনটা সত্যিই আমার জন্য অশুভ ছিল। শিস দিতে দিতে কর্নেল সাহেব গাড়ি থেকে নামতেই তাঁর মাথায় বজ্রাঘাত হলো। জিএইচকিউ-এর গাড়ি দাঁড়িয়ে। অতএব হোমড়া-চোমড়া কেউ এসেছেন। আমাকে ইশারায় পেছনের দরজা দিয়ে ভেতরে যাবার নির্দেশ দিলেন। সেই আমার প্রেমিক কর্নেলের সঙ্গে শেষ দেখা এবং প্রেমলীলাও শেষ। হেড কোয়ার্টার থেকে ব্রিগেডিয়ার খান এসেছে। জমাদারনীর সংবাদ। তারপর আমার এ সযত্নে লালিত দেহটাকে নিয়ে সেই উন্মত্ত পশুর তাণ্ডবলীলা ভাবলে এখনও আমার বুক কেঁপে ওঠে। আমাকে কামড়ে-খামচে বন্য পশুর মতো শেষ করেছিল। মনে হয় আমি জ্ঞান হারাবার পর সে আমাকে ছেড়ে গেছে। লোকটাকে এক ঝলক হয়ত ঘরে ঢুকতে দেখেছিলাম তারপর সব অন্ধকার। সকালে মুখ ধুতে গিয়ে দেখলাম আমার সমস্ত শরীরে দাঁতের কামড় ও নখের আঁচড়। কামগ্রস্ত মানুষ যে সত্যিই পশু হয়ে যায় তা আমার জানা ছিল না। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের মুখ দেখে ঝরঝর করে কেঁদে ফেললাম। হঠাৎ মনে হল ওই টোকাইয়ের কথা বেবুশ্যে মাগী। হ্যাঁ সত্যিই আমি তা, আমার মুখে-চোখে-সর্বাঙ্গে তার ছাপ। হ্যাঁ শুরু হল আমার পূর্ণ পতন। এখন সত্যিই আমি এক বীরাঙ্গনা।

ভোরেই ব্রিগেডিয়ার সাহেব চলে গেছেন কর্নেলকে বগলদাবা করে। তাঁর প্রেমলীলার সংবাদ পেয়েই ব্রিগেডিয়ার পরিদর্শনে এসেছিলেন। শ্রমের মূল্য উশুল করেই গেলেন। এরপর থেকে শুরু হলো পালা করে অন্যদের অত্যাচার। কর্নেলের ভয়ে যারা আমাকে রানীর মর্যাদা দিয়েছিল তারা দু'বেলা দু'পায়ে মাড়াতে লাগলো। আমার শরীরে আর

সহ্য হচ্ছিল না। গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লাম। আমাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল। আমি কুমিল্লা মিলিটারি হাসপাতালে গেলাম। তখন প্রায় বেশিরভাগই মেল নার্স। শুধু রোগিনীদের জন্য কয়েকজন মহিলাকে রাখা হয়েছে বা থাকতে বাধ্য করা হয়েছে। আমাকে দেখে তারা কষ্ট পেলেন কিন্তু সহানুভূতি দেখাতে সাহস পেলেন না। অথচ তাঁদের কথাবার্তায় বোঝা যেতো তারা এদের সর্বনাশ প্রতিমুহূর্তে কামনা করছেন। কিন্তু আমার মতো তাদেরও হাত-পা বাঁধা। যন্ত্রের মতো কাজ করে যাচ্ছে। তবে বাঙালি মহিলাদের দেখলাম এমনকি ডাক্তারও। নাম জানবার চেষ্টা করিনি পাছে নিজের নাম প্রচার হয়ে যায়। তবে ডাক্তার ও নার্স সহানুভূতিসম্পন্ন হয়ে আমাকে বেশ কিছুদিন রাখলেন। অক্টোবরের শেষ সপ্তাহে আমাকে ঢাকার কাছাকাছি কোনও একটি ক্যাম্পে নিয়ে এলো। বেঁচে গেলাম যে পুরানো জায়গায় ফেরৎ পাঠালো না। কিন্তু যেখানে এলাম সেখানে প্রায় কুড়িজন মেয়ে একসঙ্গে থাকে। এই বোধহয় সত্যিকার অর্থে দোজখ। হঠাৎ একটি মেয়ে মৃদুকণ্ঠে উচ্চারণ করলো, রীনা আপা, ঘাড় ঘুরিয়ে মেয়েটির দিকে তাকালাম আমি। কৃশ মলিন মুখ, বড় বড় চোখের মেয়েটিকে খুব চেনা চেনা মনে হচ্ছিল। হঠাৎ আমার মুখ দিয়ে বেরুলো, 'বাঁশী'। মেয়েটি ছুটে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরলো। ওর বাবা ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের মালী। বাঁশি প্রায়ই আমাদের ফুল দিতো। আমার বুকের ভেতর মুখ রেখে সে কি কান্না। ছ'মাস পর এই প্রথম আমার চোখেও জল এলো। ওকে রাস্তা থেকে জীপে টেনে তুলে এনেছে। ওদের বাড়ির কেউ জানে না। ভেবেছে বোধহয় মরে গেছে। মরে কেন গেলাম না আপা? চাইলেই কি আর মরা যায় পাগলী। আমিই কি মরতে পেরেছি? অন্যেরা সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। বাঁশি বলল, এখানে কথা বলাও মানা। জমাদারনীও খুব বজ্জাত যখন তখন গায়ে হাত তোলে। শত অত্যাচারের ভেতরও একটা পৃথক ঘরে থাকতে পেয়েছিলাম কিন্তু এ কোন জায়গায় এলাম!

নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে চারদিকে থেকে কেবল গোলাগুলির আওয়াজ শুনি। বাঁশি ফিসফিস করে বলে, আপা, কম জোরেরগুলো মুক্তিবাহিনীর বুঝলেন? অবাক হয়ে বল্লাম মুক্তিবাহিনী? হ্যাঁ, আপা, এখন খুব লাগছে। কোনোদিন যেন আমাদের এইখান থেকে নিয়ে যায়। কিন্তু আমার আরও ঘৃণ্য দৃশ্য দেখার বাকি ছিল। দু'দিন পর দেখলাম ওই ঘরেরই এক পাশে চারপাঁচজন উন্মত্ত পশু একটা মেয়েকে টেনে নিয়ে সবার সামনেই ধর্ষণ করলো। ভয়ে কয়েকজন মুখ লুকিয়ে রইলো, কেউবা হাসছে। মনে হল এদের বোধশক্তি নষ্ট হয়ে গেছে। যুদ্ধের ন'মাসে আমি যতো অত্যাচার দেখেছি এবং সয়েছি এটিই সর্বাধিক বর্বরোচিত ও ন্যক্কারজনক। পশুত্বের এমন তাণ্ডবলীলা আমি আর দেখিনি। এখন চারদিকে কেমন একটা ব্যস্ততা ও সন্ত্রস্ত ভাব। কারণ বুঝি না। এ দিক থেকে গোলাগুলির শব্দ যেন কমে এসেছে। তারপর একদিন হঠাৎ আমাদের সবাইকে ট্রাকে করে নিয়ে চললো ঢাকা। জিজ্ঞাসা করলো কেউ ছুটি পেতে চায় কি-না। কেউ রাজি না। এতোদিনে এরা নিজেদের অবস্থান সম্পর্কে জেনে গেছে সবকিছু। বাঁশি বলল, জানো আপা ফালানী নামে একটা মেয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। মুক্তিরা ওকে চোর মনে

করে গুলি করে মেরে ফেলেছে। কি সাংঘাতিক। বাঁশির অভিজ্ঞতা আমার চেয়ে অনেক বেশি। ও যে কষ্ট পেয়েছে। সবাই মিলে ট্রাকে উঠলাম। বুঝলাম কুর্মিটোলায় এলাম। বড় ভাইয়ের সঙ্গে কতো এসেছি। আজ তার নাম উচ্চারণ করলে আমার জিভ টেনে ছিঁড়ে ফেলবে। অফিসারদের কেমন মুখ শুকনো আর জওয়ানরা রীতিমত ভীত। প্রতিদিন বাইরে থেকে লোক এসে এখানে ভীড় জমাচ্ছে। এমন সময় হঠাৎ ভোররাতে প্রচণ্ড এয়ারক্রাফট-এর শব্দ। কি ব্যাপার। একটু পরেই দ্রুম দ্রাম কোথায় যেন বোমা পড়ছে। সমস্ত শরীর কাঁপছে, সবাই কম্বল জড়িয়ে পরস্পরের গা ঘেঁষে বসে আছি। কিছুক্ষণ পর এ্যান্টি এয়ারক্রাফট-এর দ্রিম দ্রাম শব্দ থামলো। অল ক্লিয়ার সাইরেন বাজালো। আমরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। এখন শুরু হলো আমাদের জল্পনা-কল্পনা। এরা তো পালাবে কিন্তু আমাদের মেরে ফেলবে নিশ্চয়ই, না তা করবে না। আমাদের লাশ দেখলে মুক্তিবাহিনী কি ওদের ছেড়ে দেবে। আমাদের আহার-নিদ্রা ঘুচে গেল। তাহলে কি সত্যিই মুক্তি আসন্ন। আবার বাইরে বেরুবো, বাড়ি যাবো— কিন্তু কোথায় বাড়ি, কোথায় কবর হয়েছিল বাবা, মা ও আলীর। বড় ভাই কি বেঁচে আছে। থাকলে নিশ্চয়ই আমার খোঁজ করবে। আর এই অবস্থা দেখলে, পাগল হয়ে যাবে সে। রীনা যে তার কলিজার টুকরো ছিল। ছোট ভাইবা কোথায়? বেঁচে আছে কি-না তাইবা কে জানে। মুক্তির সময় যতো কাছে আসতে লাগলো আমাদের উত্তেজনা ও উদ্বেগও ততো বাড়তে লাগলো। আল্লাহ ওই শুভদিন আর কতো দূরে। পরপর ক'দিন বোমা পড়লো। প্রথম প্রথম পাকিস্তানি বিমান উড়লো, তারপর সব চুপচাপ। মনে হল এদের আর বিমান নেই। যুদ্ধ শেষ। শুনলাম জেনারেল মানেকশ আত্মসমর্পণের জন্য জেনারেল নিয়াজী ও রাও ফরমান আলীকে নির্দেশ দিচ্ছে। রেডিও থেকে একই কথা ভেসে আসছে। দূরে কামানের শব্দ। ১৬ ডিসেম্বর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে নিয়াজী আত্মসমর্পণ করলো ভারতীয় ও মুক্তিবাহিনীর যৌথ নেতৃত্বের কাছে। আমাদের বলা হল নিজ দায়িত্বে বাড়ি চলে যেতে পারো। বেশ কয়েকজন মেয়ে ওই লুঙ্গি পরা অবস্থাতেই দৌড়ে বেরিয়ে গেল। কিন্তু আমরা প্রায় জনা ত্রিশেক রয়ে গেলাম সেনানিবাসে। কোথায় যাবো? দেখি বড়ভাই থাকলে আমার খোঁজ নিশ্চয়ই করবে। আর যদি না থাকে তাহলে ঘরে ফিরে আমার লাভ কি! বাবা নেই, মা নেই, ভাইয়া নেই, এ মুখ নিয়ে আমি যাবো কোথায়? আত্মসমর্পণের পরও অস্ত্রত্যাগ করতে সময় লাগলো। কারণ ভারতীয় বাহিনী তখনও এসে পৌঁছায়নি। সামান্য হাজার পাঁচেক সৈন্য কয়েকজন অফিসার টাঙ্গাইলের দিক থেকে এসেছেন। মূলধারা এখনও নরসিংদীতে নদীর ওপারে।

ধীরে-সুস্থে ব্যবস্থা হতে লাগলো। আমাদের অনেকের কাছ থেকেই ঠিকানা চেয়ে নিয়ে বাড়িতে খবর দেওয়া হয়। কারও কারও আত্মীয়স্বজন বাপ-ভাই খবর পেয়ে ছুটে এলো। কিন্তু সঙ্গে নিলো না মেয়েদের বেশিরভাগই। বলে গেল পরে এসে নিয়ে যাবে। বাঁশির বাবা এলো, আদর করে বুকে জড়িয়ে বাঁশিকে নিয়ে গেল। যাবার সময় বাঁশি আমাকে সালাম করে বলে গেল। ও গিয়েই আমাদের বাড়িতে খবর দেবে, নিশ্চয়ই তারা খবর পায়নি। ভাবলাম কেউ থাকলে তো খবর পাবে। কেন জানি না আমি

নিঃসন্দেহ হলাম আমার ভাইয়েরা কেউ বেঁচে নেই, সুতরাং পাকিস্তানিদের সঙ্গে চলে যাবার সিদ্ধান্ত নিলাম। হঠাৎ মনে হল সেই পথের পাশের টোকাইয়ের মুখখানা 'মাগী বেবুশ্যে'। যেখানেই যাবো ওই সম্বোধনই শুনতে হবে। তার চেয়ে চলে যাই বিদেশে একটা কিছু করে খাবো ওখানে। আর সহজ পথ তো চিনেই ফেলেছি।

হঠাৎ দুপুরের দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনজন শিক্ষিকা এলেন আমাদের সঙ্গে আলাপ করতে। অর্থাৎ যারা পাকিস্তানে যাচ্ছে ওঁরা তাদের আটকাতে চান। আমাকে অনেক বোঝালেন, আমার কাজের অভাব হবে না, ভাইয়েরা না নিলেও নিজের উপার্জনে নিজে চলতে পারবো। চাকরির দায়িত্ব তাঁরা নেবেন, থাকবার ব্যবস্থাও করবেন। কিন্তু কেমন যেন একটা বিজাতীয় ক্রোধ আমাকে অস্থির করে তুললো। এরা নিরাপদ আশ্রয়ে ছিলেন সুতরাং বড় বড় কথা বলা এঁদের শোভা পায়। পরে অবশ্য ওঁদের সম্পর্কে শুনেছি। ওঁরা অনেক কষ্ট করেছেন, সংগ্রাম করেছেন এবং সফল হয়েছেন। কিন্তু আমি? আমি তো কোনো কিছু করবার সুযোগ পাইনি। এমন কি আত্মহত্যা করবার সুযোগও আমার ছিল না। আমাকে যারা রক্ষা করতে পারেনি আজ কেন তারা আদর দেখাতে আসে। পরে স্থিরভাবে চিন্তা করলাম, না, আমার একটা পরিচয় আছে। বাবা-মা না থাকলেও, ভাইয়েরা না থাকলেও আমি তো পথের ভিখারী না। এখন ফিরে পরিত্যক্ত বাড়িতে উঠলে কেমন হবে। উঠতে পারবো কি, যদি অন্য কেউ দখল করে নিয়ে থাকে তাহলে আমার হয়ে লড়বে কে? না না দেহ-মনের এ অবস্থা নিয়ে আমি ওসব লড়াই-ফ্যাসাদে যেতে পারবো না। তবে নীলিমা আপা আমার নাম-ঠিকানা সব লিখে নিয়েছিলেন। কেন, তা আমি জানি না। অবশ্য সেদিন যদি ওটুকু লিখে না নিতেন তাহলে আমি চিরকালের জন্য হারিয়ে যেতাম। না, আমি ওদের কারও কথাতেই রাজি হলাম না। নওশেবা আপার মধুর ব্যবহার আমি এখনও স্মরণ করি। পরে অনেকবার ভেবেছি ওঁর সঙ্গে দেখা করতে যাবো। কিন্তু কিসের লজ্জা আমাকে বাধা দিয়েছে, দূর থেকে অনেক অনুষ্ঠানে কলিম শরাফীর সঙ্গে ওঁকে দেখেছি কিন্তু আমার বর্তমান চেহারায় আমাকে চিনতে পারা ওঁর পক্ষে সম্ভবপর নয়। যাই হোক ওঁর দুঃখ নিয়ে ফিরে গেলাম আমি অপরিচিত অন্ধকার জীবনের পানে পা বাড়াবার প্রস্তুতি নিলাম। তারপর একদিন শেষ বারের মতো চোখের জলে বুক ভিজিয়ে সোনার বাংলার সীমান্ত, ওই রক্তখচিত পতাকা সব ফেলে চলে এলাম। ওই পতাকা অর্জনে কি আমার বা আমার মতো যেসব মেয়েরা দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে তাদের কোনও অবদান নেই? আজ পথে পথে কতো শহীদ মিনার। কতো পথঘাট কালভার্ট সেতু আজ উৎসর্গিত হচ্ছে শহীদদের নামে। শহীদের পিতা, মাতা, স্ত্রী সন্তানেরা কতো রাষ্ট্রীয় সহায়তা সহানুভূতিই শুধু নয়, সম্মান পাচ্ছে কিন্তু আমরা কোথায়? একজন বীরাঙ্গনার নামে কি একটি সড়কের নামকরণ করা হয়েছে? তারা মরে কি শহীদ হয়নি? তাহলে এ অবিচার কেন? বিদেশে তো কতো যুদ্ধবন্দী মহিলাকে দেখেছি। অনায়াসে তারা তাদের জীবনের কাহিনী বলে গেছেন হাসি অশ্রুর মিশ্রণে। তাহলে আমরা কেন অসম্মানের রজ্জুতে বাঁধা থাকবো? এ কোন মানবাধিকারের মাণদণ্ড? যেদিন আমার নারীত্ব লুণ্ঠিত হয়েছিল

সেদিনও এমন আঘাত পাইনি যে আঘাত পেলাম বাংলাদেশের পতাকাকে পেছনে ফেলে ভারতে ঢুকতে। ওই মুহূর্তে আমার চেতনা হল এ আমি কি করলাম? আজ থেকে আমি পাকিস্তানি নাগরিক! ধিক্কার আমাকে। তিলে তিলে ন'মাস যে নির্যাতন সহ্য করেছি তা সব ধুলোয় লুটিয়ে গেল। না ভারত থেকেই আমাকে একটা ব্যবস্থা করতে হবে। আমি জানি আজ যদি আমি ভারতীয় কর্তৃপক্ষকে বলি এরা আমাকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিয়ে যাচ্ছে তা হলেই তো মুক্তি পাবো। কিন্তু তারপর? সেটা তখন দেখা যাবে।

মহাসমারোহে বন্দী শিবিরে ঢুকলাম। পাকিস্তানিদের সে কি আনন্দ উল্লাস। বুঝলাম এ ওদের প্রাণে বেঁচে যাবার স্ফুর্তি। কই আমাকে তো কেউ বাঁচাতে এগিয়ে এলো না। কুমিল্লা হাসপাতালে বাঙালি অফিসার দেখেছি, তাঁরাও তো কখনও আমাকে জিজ্ঞেস করেনি আমি মুক্তি চাই কি-না। যাক অন্যকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। নিজের ভাগ্য ও অক্ষমতাকেই ধিক্কার দিই। সাত দিন কেটে গেল কেমন একটা আচ্ছন্নতার ভেতর দিয়ে। হঠাৎ একজন লোক এসে বলল, আপনার ভিজিটার এসেছে, আপনাকে ভিজিটারদের রুমে যেতে বলেছে। আমার ভিজিটার? কে হতে পারে? না, না, ভুল আছে কোথাও। লোকটি তাগাদা দিলো, কই চলুন। মাথায়-গায়ে ভালো করে দোপাট্টা জড়িয়ে অনিচ্ছুক মনে ক্লান্ত পা দুটোকে টেনে নিয়ে চললাম। বেশ কিছুটা হেঁটে একটা করিডোরের শেষ মাথায় এসে পর্দা তুলে দাঁড়ালো লোকটি। বলল, যান। পা দুটো আমার মনে হয় মাটির সঙ্গে সিমেন্ট দিয়ে গাঁথা হয়ে গেছে। সামনে এগুবার বা পেছনে ছুটে পালাবার শক্তি আমার নেই। ধীরে ধীরে এগিয়ে এলো, ভাইয়া, আমার হাত দুটো ধরতেই ওর বুকে আমি ঝাঁপিয়ে পড়লাম। ভাইয়া, আমি মরে গেছি, আমি মরে গেছি। ভাইয়া শুধু আস্তে আস্তে আমার পিঠে হাত বুলিয়ে দিলো এবং আমাকে প্রাণভরে কাঁদতে দিলো। তারপর পকেট থেকে রুমাল বের করে আমার চোখ মুছিয়ে দিয়ে পাশে বসলো। বলল, রীনা, তোকে আমি এখন নিয়ে যাবো। তুই তৈরি হয়ে আয়। বলেই অপ্রস্তুত হয়ে বলল, না থাক যাবার পথে নিউ মার্কেট থেকে তোর জন্যে কাপড়-জামা কিনে নিয়ে যাবো। আমাকে কিছু কাগজপত্র এখনই সই করতে হবে। তুই চুপটি করে বোস। ভাইয়া টেবিলে বসে থাকা অফিসারের সঙ্গে কথাবার্তা বলল এবং কি কি সব কাগজে সই করলো। আমার দু'তিনটে কাগজে সই করতে হলো। আমি শুধু ওই ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করলাম, আমি বাংলাদেশের পাসপোর্ট পাবো কি? নিশ্চয়! উইশ ইউ গুড লাক্ এ্যান্ড হ্যাপি লাইফ।

বাইরে বেরিয়ে ট্যাক্সী নিলো ভাইয়া। বললো, নিউমার্কেট। আমি শুধু রাস্তা দেখছি, আর দেখছি অগণিত লোকের হেঁটে যাওয়া। ওরা স্বাধীন। ওদের কেউ ধেরে নেবে না। হঠাৎ ভাইয়াকে জড়িয়ে ধরলাম। ভাইয়া মাথায় হাত দিয়ে বলল, ভয় কি রে? আমি তো এসে গেছি। খোকা (অর্থাৎ ছোট ভাই) তোর জন্যে বাড়ি সাজিয়ে অপেক্ষা করছে। আলী ভাইকে দেখলে চিনতে পারবি না। চমকে উঠলাম, আলী ভাই বেঁচে আছে? আছে, তবে বা পাটা কেটে ফেলেছে। আর কিছু জিজ্ঞেস করতেও ভয় হল। মার্কেটে নেমে ভাইয়া জিজ্ঞেস করলো শাড়ি কিনবি না সালোয়ার কামিজ। স্থির দৃষ্টিতে ভাইয়ার মুখ জরিপ

করে বললাম শাড়ি। শাড়ি, জুতো স্যান্ডেল, প্রসাধনী চিরুনী, ব্রাশ সব কেনা হল তারপর গিয়ে উঠলাম নিউমার্কেটের কাছে একটা হোটেলে। আমরা পরদিন সকালের ফ্লাইটে ঢাকা যাবো। সারাটা দিন ভাইয়ার সঙ্গে ছোটবেলার মতো ঘুরলাম। সিনেমা দেখলাম, প্রচুর গল্প করলাম। ভাইয়া তার যুদ্ধের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করলো, খোকা কেমন করে বেঁচে গেছে অল্পের জন্য তাও বললো। আমি হঠাৎ জিজ্ঞেস করলাম আমি যে এখানে আছি তুমি কি করে জানলে? ভাইয়ার মুখটা ম্লান হয়ে গেল। বললেন, ঢাকায় ভারতীয় মিলিটারির ব্রিগেডিয়ার ভার্মার কাছে গিয়েছিলাম যদি তোর কোনও খবর পাওয়া যায়। ভদ্রলোক অত্যন্ত অমায়িক, ধৈর্য ধরে সব শুনলেন। পরে বললেন, যে সব বাঙালি মহিলা পাকিস্তানি বন্দীদের সঙ্গে গেছে তাদের কিছু হিসাব আছে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা নীলিমা ইব্রাহিমের কাছে। আপনি তার সঙ্গে যোগাযোগ করে দেখতে পারেন। 'গুড্ লাক'। অনেক কষ্টে নীলিমা ইব্রাহিমের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। উনি তোর নাম শুনে খুবই উত্তেজিত হলেন। বললেন, অনেক চেষ্টা করেছিলাম বাবা, কিন্তু কিছুতেই ওকে আটকাতে পারলাম না। সমস্ত দেশের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ক্ষোভ আর অভিমান নিয়ে ও চলে গেল। তুমি অশোকের কাছে যাও আমি ওকে বলে দিচ্ছি। ও তোমার বোনকে খুঁজে দেবে। ব্রিগেডিয়ার ভার্মার নাম অশোক। সত্যিই অশোক তার দিদির নির্দেশে আমার জন্য যা করেছে তা বলে শেষ করতে পারবো না রীনা। উনি না থাকলে আমি হয়তো আর তোকে খুঁজে পেতাম না।

ঢাকাতেও আমরা কোনও আত্মীয়ের বাড়িতে উঠলাম না। এক রাত হোটেলে রইলাম। ভাইয়ার অফিসে যেতে হল ছুটির ব্যবস্থা করতে। তাছাড়া আমার সম্পর্কেও বাংলাদেশ সরকারকে কি কি কাগজপত্র দিতে হল। রাতের ট্রেনে রওনা হলাম। পরদিন নিজেদের বাড়ি। সব কিছুই তেমনি আছে তবে সব মানুষগুলোও জড় পদার্থের মতো হয়ে গেছে। আলী ভাই ক্রাচ্ নিয়ে এসে দাঁড়ালো গামছা দিয়ে চোখ ঢেকে বলল, এ তোমার কি চেহারা হয়েছে আপামণি। কেন? ওর গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে বললাম, আমি তো ভাল আছি। কিন্তু তুমি তো আমার জন্য পা হারালে। আমাকে কথা শেষ করতে দিলো না আলী ভাই মুখ চেপে ধরলো। সবাই মিলে চেষ্টা করে বাড়িটাকে জীবন্ত করে তোলা হল।

আব্বা, আম্মার জন্য মিলাদ পড়ানো হল। অনেকেই এলেন, কেউ কথা বললেন না। সবাই বলতে গেলে স্বাভাবিক ব্যবহার করলেন, আব্বা-আম্মার জন্য দুঃখ করলেন। মহিলারা কেউ কেউ কৌতূহলী হয়ে আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করতে চেয়েছিলেন, তাতে আমি সুযোগ দিলাম না। প্রতিকূল পরিস্থিতির মুখোমুখি যে হতে হবে তা বুঝতে পারলাম।

বিশ্ববিদ্যালয় খুলেছে। ভাইয়া আমাকে যাবার জন্য জিদ্ করলো। বললো তুই স্বাভাবিক না হলে কেউ তোকে স্বাভাবিক হতে দেবে না। আরও যন্ত্রণা বাড়াবে, শেষ পর্যন্ত গেলাম। পুরনো ক্লাসফ্রেন্ড কয়েক জনের সঙ্গে দেখা হল। ওরা মুক্তিযুদ্ধের গল্প করলো। আমাকে বলল, এবার তোর কথা বল? বললাম, আমার কথা? শুনলাম আর সবাই

গিললো; সবার অনাবিল হাসি থমকে আবহাওয়া ঠাণ্ডা শীতল হয়ে গেল। স্যারদের সঙ্গে দেখা করলাম। জুনিয়র স্যার একেবারেই স্বাভাবিক ব্যবহার করলেন। কিন্তু সিনিয়রদের ভেতর দু'একজন বেশ তীর্যক ভঙ্গিতে চাইলেন এবং বাঁকা প্রশ্ন করলেন। চুপ করে গেলাম। ভাবলাম পায়ের নিচের মাটি শক্ত হোক তারপর দেখে নেবো। কিন্তু মাটি কি আজও শক্ত হয়েছে!

গতানুগতিক জীবন কেটে যায়। বাসায় আমি একা, সেই পুরনো মায়ের আমলের বুয়া আর আলী ভাই। আলী ভাই আমাকে সর্বক্ষণ পাহারা দিয়ে রাখে। ও কেন যেন আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে গেছে। ভাইয়া প্রায়ই আসে। কয়েক ঘণ্টার জন্যে হলেও আমাদের দেখে যায়। একদিন সঙ্কোচ ত্যাগ করে বললাম, ভাইয়া তুই বিয়ে কর। ভাবী এলে আমার এতো একা একা লাগবে না। ভাইয়া হেসে বলল, আমি বিয়ে করলে তোর ভাবী এখানে থাকবে? ও আমার সঙ্গে যেতে চাইবে না? চাইলেও... কথাটা শেষ করতে পারলাম না। ভাইয়া বলল, আগে তোর ব্যবস্থা করি তারপর নিজের। আতোয়ারের সঙ্গে কথা হয়েছে ও সামারে আসবে তখন সব কথা হবে।

আপন অলক্ষ্যে আমার ওষ্ঠে ম্লান হাসি দেখে ভাইয়া বলল, না, না তুই ওকে ভুল বুঝিস না। জবাব দিলাম না। আজ প্রায় পাঁচ মাস হল আমি এখানে এসেছি, ভাইয়ার সঙ্গে তার কথাও হয়েছে, অথচ আমাকে একটা ফোন পর্যন্ত করেনি। আমি কিন্তু ওকে চেষ্টা করে ভুলতে বসেছি। কারণ ওকে আমি চিনি। ও ভালো মানুষ কিন্তু ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ নয়। ও আমাকে নিয়ে সমাজের মুখোমুখি দাঁড়াতে পারবে না। তবুও ভাইয়ার স্বপ্নটা ভাঙতে ইচ্ছে হল না। সামনে পরীক্ষা, প্রস্তুতি নিলাম। লাইব্রেরীতে এখন আর খুব বেশি যাই না, ঘরেই পড়াশুনা করি। সহপাঠীদের কেউ কেউ মাঝে মাঝে আসে। তবে আগের মতো কারও সঙ্গেই খোলামেলা মিশি না, একটু দূরত্ব রেখেই চলি। তবে সবচেয়ে আশ্চর্য কোনও মেয়ে আমাদের বাসায় আসে না। ক্লাসে গেলেও ওরা প্রশ্ন করলে উত্তর দিয়েছি কিন্তু গায়ে পড়ে কথা বলেনি। কিন্তু কেন? আমি ওদেরই মতো একজন, আমার মতো দুর্ভাগ্য তো ওদেরও হতে পারতো। কেউ কেউ ফাঁক পেলে প্রচণ্ড কৌতূহল নিয়ে আমার বন্দী জীবনের কথা জানতে চেয়েছে। নিঃসন্দেহে আমি তাদের উপেক্ষা করেছি। এখন আমিও ওদের এড়িয়ে চলি। আমি এমন কোনও কাজ স্বেচ্ছায় করিনি যে ওদের কাছে নতি স্বীকার করে থাকতে হবে। কি আশ্চর্য মানসিকতা। সত্যি লেখাপড়া শিখে বড় চাকরী করা যায় কিন্তু মনের প্রসারতা বাড়াতে গেলে যে মুক্ত উদার পরিবেশ প্রয়োজন ওরা তা থেকে বঞ্চিত। তাই ওদের করুণা করলাম মনে মনে, আর সরে এলাম দূরে।

এরপর এল কঠিন অগ্নিপরীক্ষা। আতোয়ার এলো। ওর আসবার খবর পেয়েছি। ভেবেছিলাম এসেই ছুটে আসবে আমাদের বাড়ি। কিন্তু না, আমার মনের অস্থিরতা আলী ভাই বুঝলো। বলল, আপামণি, আতোয়ার ভাই আসছে। অতোদূর থিকা আসছে তা একটু ঠাণ্ডা হইলেই আমাগো বাড়ি আসবো। হয়ত তাই, আলী ভাইয়ের কথা সত্যি হোক।

তৃতীয় দিন সকালে আতোয়ার এল। আগের থেকে অনেক সুন্দর ও স্মার্ট হয়েছে, সরাসরি ওর সামনে এলাম। আমার জড়তা অনেক কেটে গেছে। ওকে বসতে বললাম। 'কেমন আছ' জিজ্ঞেস করলে ও হ্যাঁ অতি সংক্ষিপ্ত জবাব দিলো। বললাম, কাল আসোনি কেন? বলল, তুমি একা থাকো তাই হুট করে আসাটা ঠিক হবে কি-না ভাবছিলাম। আমি ওর মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকালাম। উত্তর দেওয়াটা ঠিক হবে কি-না বুঝতে পারছি না। আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হয়ে এলো ও। বলল, কই চা খাওয়াবে না? সঙ্গে সঙ্গে পর্দা ঠেলে আলী ভাই ঢুকলো চায়ের সরঞ্জাম ও কিছু নাশ্‌তা নিয়ে। অবশ্য ও দু'হাত ব্যবহার করতে পারে না তাই সঙ্গে বুয়া।

আতোয়ার চমকে উঠলো, এ কি? এ তোমার কি হয়েছে আলী ভাই? এই তো কতো মানুষ দ্যাশের জন্য জান দিচ্ছে আমি একখানা মাত্র পা দিলাম। বেদনায় আতোয়ারের মুখ ম্লান হয়ে উঠলো। আমি দুঃখিত আলী ভাই, তোমাকে আঘাত দিলাম। আতোয়ারের রপ্ত করা বিলাতী ভদ্রতা। আলী ভাই কথা বাড়ালো না। তোমরা খাও বলে ভেতরে চলে গেল। আলী ভাইয়ের পায়ের কথা বললে ওর আব্বা-আম্মার কথা মনে হয় আর ডুকরে ডুকরে কাঁদে। আলী ভাই নিজে ওই বাগানের বেড়ার কাছে কবর দিয়েছে তাদের। এক পা টেনে টেনে গোসল করিয়েছে। কবর খুঁড়বার সময় একজন রিকশাওয়ালা ওকে সাহায্য করেছিল। সে-ই পরে আলী ভাইকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেছে। সব ব্যবস্থা করেছে। তার নাম সালাম। এখনও আসে। ভাইয়া ওকে জামা-কাপড় টাকা-পয়সা যখন যা পারে দেয়। ও কে, চা নাও। দেখো আলী ভাই তোমার প্রিয় পাঁপড় ভাজা দিতেও ভোলেনি। সন্ধ্যাবেলা আতোয়ার উঠে গেল। বলল রীনা নদীর ধারে যাবে? মাথা নেড়ে অসম্মতি জানালাম। কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ। সেই সৌভাগ্য কি আমার সইবে?

না, বীরাঙ্গনার ভাগ্যে বাংলাদেশের কোনো সুখই সয়নি। অন্তত আমার জানামতো না।

দিন সাতেক পর ভাইয়া এলো। সরাসরি আতোয়ারের কাছে বিয়ের প্রস্তাব দিলো। আতোয়ার কিছুদিন সময় চাইতেই ভাই স্পষ্ট জিজ্ঞেস করলো, দেখো আতোয়ার আমি স্পষ্ট জবাব চাই তুমি এ বিয়ে করবে কি-না। কারণ যেভাবেই হোক আমি জেনেছি আমার বোনের ওপর তোমার দুর্বলতা আছে। তুমি ওকে পছন্দ করতে সেটাও আমি জানতাম তাই তোমাকে কষ্ট দেওয়া। না, না, এ আপনি কি বলছেন। আমি আব্বা আম্মার সঙ্গে আলাপ করে আপনাকে জানাবো। আব্বা-আম্মার সঙ্গে আলাপ— ভাইয়া যেন তিক্তভাবে হেসে উঠলেন। বেশ করো কিন্তু আমি চারদিনের বেশি থাকতে পারবো না। যাবার আগে তোমার মতামত জেনে যেতে চাই। ভাইয়া বেরিয়ে গেল। আতোয়ার হঠাৎ ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলল, ভাইয়ার এমনভাবে আমাকে কথা বলাটা কি ঠিক হল? বিয়ে করলে বাবা-মাকে জিজ্ঞেস করবো না! ওঁরা যদি পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আপত্তি করেন, তাহলে কি করবে তুমি সেটাও ভেবে রেখো। অফকোর্স নিশ্চই ভাববো। তবে আজ তোমাকে একটা কথা বলছি আতোয়ার। স্বাধীনতা তোমাদের অনেক দিয়েছে আর ভাইয়া হারিয়েছে অনেক। সেজন্য ওর মেজাজটা সব সময়ে স্বাভাবিক থাকে না। সেটা ঠিক, কিন্তু তোমাদের পরিবারে এ দুঃখ-দুর্দিনের জন্য তো তোমরা আমাকে দায়ী করতে

পারো না? তুমি কি বলছো আতোয়ার, তোমাকে দায়ী করবো কেন, কোনও সৌভাগ্যবানকেই আমরা দায়ী করি না। আমরা সচেতন মন-মানসিকতা নিয়েই এ দুর্যোগে ঝাঁপ দিয়েছি এবং কাটিয়ে উঠবার দায়ও আমাদের তবে ... না ঠিক আছে। আজ এ পর্যন্ত রইল। তুমি যাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করতে চাও, যাঁদের অনুমতি নিতে চাও স্বচ্ছন্দে নিতে পারো। তবে আমি তোমাকে একটা কথা বলে রাখি, আমি তোমার কোনও দায় বা বোঝা নই। আমার ব্যাপারে তোমার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। তাই তুমি ভেবে-চিন্তেই পা ফেলো। শেষ পর্যন্ত আতোয়ার বিয়েতে মত দিলো। ভাইয়া প্রচণ্ড খুশি হয়ে ওকে জড়িয়ে ধরে বারবার অভিনন্দন জানাতে থাকলো। আমার খুব লজ্জা হল। আমি কি এমনই গলগ্রহ? এ কি বোনের বিয়ে, না দায়মুক্তি? না না মনটা আমার খুব ছোট হয়ে গেছে। এসব কি ভাবছি আমি আমার ফেরেশতার মতো ভাইয়া সম্পর্কে?

কিন্তু জীবনে যে জটিলতার গ্রন্থি আমি গলায় পরেছি তার থেকে কি সহজে মুক্তি পাবো? আতোয়ার বলতে গেলে গোপনে বিয়ের প্রস্তাব দিলো। সামান্য ঘরোয়াভাবে আমাদের বাড়িতেই বিয়ে হবে। আমি এখানেই থাকবো। ও গিয়ে কাগজপত্র ঠিক করতে ৬ মাস ৯ মাস যা লাগে তার পর আমি যেতে পারবো ওর কাছে। অবশ্য এ ব্যাপারে আমিও একমত ছিলাম। হৈচৈ, লোক জানাজানি আমরাও ভালো লাগছিল না। তবুও ভাবলাম এ গোপনীয়তা ওদের দিক থেকে কেন? এমন কি ওর আব্বা-আম্মা তখন ঢাকায় যাবেন ওর বোনের বাড়িতে। তাহলে কি সত্যিই এটা দায়সারা। কেমন যেন দোলায়মান হল মনটা। প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটলো ভাইয়াকে যখন এ কথাটা আতোয়ার বলল। চিৎকার করে উঠলেন ভাইয়া, কেন? গোপন কেন? এ আবার কেমন কথা? একদিন তো সেক্রেটারির মেয়েকে বিয়ে করবার জন্য তোমার সমস্ত পরিবারের আগ্রহের সীমা ছিল না। আজ বুঝি তিনি নেই তাই? কি ভেবেছো আমাদের? আমাদের দু'ভাইয়ের পরিচয় নেই? আমি কর্নেল, ছোট ভাই ইঞ্জিনিয়ার। তোমাদের থেকে আমরা কম কিসে? তবে যদি মনে করে থাকো আমার বোন উচ্ছিষ্ট তাহলে তোমাকে আমিই নিষেধ করবো এ বিয়ে তুমি করো না। মন পরিচ্ছন্ন করতে পারলে এসো, না হয় এখানেই শেষ। ভাইয়া দু'হাতে মাথা চেপে সোফায় বসে পড়লো। মনে হচ্ছিল আমি চিৎকার করে কাঁদি। কোন অশুভ লগ্নে আমার জন্ম হয়েছিল। পিতামাতাকে শেষ করলাম, এখন তো ভাইকেও পাগল বানাতে বসেছি। খোকা নিশ্চয় পাথরের মতো ঘরের পর্দা ধরে দাঁড়ালো। আমিই শক্তি সঞ্চয় করলাম। সুষ্ঠু বলিষ্ঠ কণ্ঠে বললাম, আতোয়ার আমি তোমাকে মুক্তি দিলাম। যে পরিবারে আমি জন্মেছি সেখানে অনুদারতা, কাপুরুষতা ঘৃণার বস্তু। আমি তোমায় ঘৃণা করি। হ্যাঁ সমস্ত অন্তর দিয়ে ঘৃণা করি। তুমি যেতে পারো, ভুলেও কখনো আর এ বাড়ির চৌকাঠ মাড়াবে না। ভালো করে শুনে যাও আমি বীরাঙ্গনা, ভীরুর কণ্ঠলগ্না হবো না। যেতে পারো তুমি! পর্দা তুলে পাশের ঘরে গিয়ে বাবার বিছানায় শুয়ে ভেঙে পড়লাম। বাবা, বাবাগো। ভাইয়া এসে আমার মাথায় হাত রেখে বলল, এ তুই কি করলি রীনা? আমিইবা কেন অমন চণ্ডালের মতো রেগে উঠলাম বল তো? তোকে দেশে ফিরিয়ে এনে শেষ পর্যন্ত কি তোর জীবনটা নষ্ট করে দিলাম? ভাইয়া তুমি থামবে, আমি কি কচি খুকি? নিজের দায়িত্ব নেবার মতো বয়স আমার

হয়নি? শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা কি আমি অর্জন করিনি? তুমি আমাকে একটু একা ছেড়ে দাও। নিজের কাঁধের বোঝা একটু হালকা করো তো। আমার বিয়ের প্রয়োজন হলে আমি তোমাকে জানাবো, ফকিরের মতো আমার বর খোঁজার জন্য দরজায় দরজায় হাত পেতো না। ঠিক আছে তাই হবে। বিয়ে প্রসঙ্গ বাদ। এ বাড়িতে স্বইচ্ছায় তুই বিয়ে করবি, তারপরই ছেলেদের বিয়ে হবে, রাজি? হাত বাড়িয়ে ওর হাত চেপে ধরলাম রাজি, রাজি, রাজি। মুখে-চোখে পানি দিয়ে খুশি মনে ও মেজাজে তিন ভাইবোনে চা খেতে বসলাম। মনে হল আলী ভাইও একটু স্বস্তি বোধ করছে।

দিন যায়, থেমে থাকে না। আমাদের দিনও চললো তবে পথটা আর সরল-সহজ রইল না। আমার পরীক্ষার পর এখানে একা বাসায় থাকাটা আর সমীচীন মনে হল না। এক সময়ে আতোয়ারের জন্য একটা টান ছিল আমার, এখন তাও ছিন্ন। অবশ্য আরও দু'চার বার সে এসেছিল কিন্তু মেরুদণ্ডহীন পুরুষের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হওয়া কষ্টকর। অবশ্য পরে আর ওর সঙ্গে যোগাযোগ হয়নি। হয়েছে বহু বছর পর বিদেশের মাটিতে শ্বেতাঙ্গিনী অর্ধাঙ্গিনীসহ। বাড়ি ভাড়া দিয়ে আলী ভাইসহ ঢাকায় ভাইয়ার বাসায় সেনানিবাসে চলে এলাম। বুয়া চোখের জলে বিদায় নিলো। একটা ঘরে বাবা-মার অনেক জিনিসপত্র বন্ধ করে রেখে দেওয়া হল। মায়ের সাধের সংসার আর পুত্রবধূর হাতে তুলে দিয়ে যেতে পারলেন না। পরীক্ষার ফল বেরুলো, মোটামুটি অবস্থান, সেনানিবাসের কাছাকাছি একটা স্কুলে কাজ নিলাম। সকালে ভাইয়া পৌঁছে দেয়, ছুটির পর এক সহকর্মীর সঙ্গে ফিরি। ওরা আমাদের কাছেই থাকে। মিতুও আমারই মতো ভাইয়ের কাছে থাকে তবে ওর মা আছেন তাই সুখের বন্ধন আছে। মাঝে মাঝে আমাকে নিয়ে যায়। ওর মাকে খুব ভাল লাগে। খুব স্নেহ করেন আমাকে। মাকে মনে করে চোখে পানি আসে। খোকা চলে যাচ্ছে জার্মানি, হায়ার স্টাডিজের জন্য অথচ ভাইয়া কতো ব্রিলিয়ান্ট ছিল, আমার জন্য কিছু করতে পারলো না।

মিতুর মেজ ভাই ডাক্তার। সেও আর্মিতে আছে। পোস্টিং যশোরে। মাঝে মাঝে আসে হৈচৈ করে চলে যায়। বিয়ের জন্য ওরা মেয়ে খুঁজছে। ওর মা আভাসে আমাকে বোঝাতে চান। কিন্তু ওরা তো জানে না আমি বীরাঙ্গনা নামক এক অস্পৃশ্য চণ্ডালিনী। আমার সব আছে, নেই শুধু সমাজ আর সংসারের বন্ধন। হঠাৎ একদিন মিতু ওর ছোট ভাই নাসিরকে নিয়ে আমাদের বাড়িতে বেড়াতে এলো। আমি অপ্রস্তুত। বললাম, একটু খবর দিয়ে এলে কি হতো? মিতু বলল, কেন, পোলাও রান্না করতি? সেটা এখনও করতে পারিস মেজ ভাইয়ের হাতে অফুরন্ত সময়। সে কি? ছুটি নিয়েছে নাকি? নাসির হেসে বলল, হ্যাঁ, মায়ের আদেশে আরও দু'দিন ঢাকায় থাকতে হবে। কারা নাকি রংপুর থেকে আমাকে দেখতে আসবে। আমি হাসি চাপতে না পেরে মুখে কাপড় চাপা দিলাম। ও কি হাসছেন যে, বিশ্বাস না হয় মিতুকেই জিজ্ঞেস করুন। মিতু গম্ভীর হয়ে বলল, ঘটনাটা সত্য, কনে পক্ষ জামাই দেখতে আসবে, কানা, খোঁড়া, লুলা, লেংড়া কি-না দেখে তবে ফাইনাল কথা। তাহলে মেয়ে আপনার পছন্দ হয়েছে? জিজ্ঞেস করলাম লজ্জা ত্যাগ করে। কেমন করে শুধু তো বাঁশি শুনেছি। রূপ-গুণের বর্ণনা, বাপের

বিষয়-সম্পত্তির হিসাব ইত্যাদি ইত্যাদি। বলার ভঙ্গীতে তিনজনেই হেসে উঠলাম। চায়ের জন্য ভেতরে যেতেই মিতু বলল, তোকে ভাইয়ার খুব পছন্দ, তুই সম্মতি দিলে আম্মা তোর ভাইয়ার কাছে কথা বলবেন। পাগল হয়েছিস? আমি ওসব ভাবিই না। বললাম আমি দ্রুত। তোর কি মাথা খারাপ, বিয়ে তো করতেই হবে। আমিও শিগগিরই চলে যাবো। তাই আম্মা মেজ ভাইয়ার এখন বিয়ে দিতে চান। মিতু বাগদত্তা। জামাই আবুধাবিতে আছে। তিন মাস পরে এসে রুসমত সেরে ওকে নিয়ে যাবে। বললাম, ব্যস্ত কি? আমায় একটু ভাবতে সময় দে। মিতু গম্ভীর হল। এর চেয়ে ভালো স্বভাবের ছেলে তুই পাবি না, দেখে নিস। বেশ তো, না পেলে তো হাতের পাঁচ রইলই। চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে বাইরের ঘরে এলাম। নাসির ঘুরে ঘুরে সব দেখছে। বাবা-মার ফটো দেখে জিজ্ঞাসু চোখে চাইলো। বললাম আব্বা, আম্মা একাত্তরে শহীদ নিজের ঘরের ভেতরেই। চমকে উঠলো ভাই-বোন। এতো বড় খবরটা ওরা জানতো না। পরিবেশটা কেমন যেন বেদনাতুর হয়ে উঠলো। আমি প্রসঙ্গ যতো চাপা দিতে চেষ্টা করি নাসির ততোই খুঁটে খুঁটে সব জিজ্ঞেস করে। বললাম, আজ নয় নাসির সাহেব, আরেক দিন সময় করে আসুন সব গল্প বলবো আপনাকে, অবশ্য গল্প নয়, আমাদের পারিবারিক ইতিহাস। মিতুরা ভাইবোন চলে গেল। আমি ভাবনার রাজ্যে ডুবে গেলাম। না, পালানো নয়, লুকানো নয়। আমি খোলাখুলি সব বলবো, তারপর? তারপর আর কি? নিজের জীবন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত তো নিয়েই বসেছি। স্বামী, সংসার, সন্তান, সুখের দাম্পত্য জীবন সে তো আতোয়ারের সঙ্গে সঙ্গে আমার ঘরের চৌহদ্দি ছেড়ে পালিয়েছে। দেখাই যাক না নাসির সাহেবের প্রতিক্রিয়া। এখন কিন্তু কষ্ট হয় না। লজ্জা হয় না। অপমান বোধ করি না। উপরন্তু ওই চিকেন হার্টেড আধা অন্ধ মানুষগুলোর ওপর অনুকম্পা জাগে। পরদিন আমাদের ছুটি কি একটা ধর্মীয় পার্বণ উপলক্ষে, ভাইয়া অফিসে। রাস্তার দিকে পীঠ দিয়ে বারান্দায় বসে কাগজের পৃষ্ঠা উল্টাচ্ছিলাম। খুন, জখম, ধর্ষণ, কুপিয়ে স্ত্রী হত্যা, পুড়িয়ে পত্নী হত্যা ইত্যাদি ইত্যাদি। সত্যিই ভয় করে কার ভেতরে কোন পশু জেগে ওঠে বলা যায় না। এর ভেতর রাষ্ট্রীয় পরিবর্তন হয়ে গেছে। যিনি আমাদের 'বীরাঙ্গনা'র সম্মানে ভূষিত করেছিলেন তিনি বীরশ্রেষ্ঠ হয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন। তিন চার মাসের ভেতর নানা রকম পট পরিবর্তন হল। মানুষের লোভ-লালসা শুধু অর্থের প্রতি নয়, ক্ষমতার প্রতিও। সব দেখছি আর ভাবছি এই বানরের পিঠা ভাগের জন্য কি ত্রিশ লাখ শহীদ হয়েছিল এ বাংলার মাটিতে। আমার বাবা ও মাও কি এদের এই বিশ্বাসঘাতকতার উগ্র প্রকাশের জন্য অমন সুন্দর জীবন উৎসর্গ করে গেছেন। এতো অবক্ষয়, এতো তাড়াতাড়ি, অর্থের লোভের চেয়েও ক্ষমতার লোভ আরও বেশি এবং ঘৃণ্য বলে মনে হয়। অনেক সময় আহার্য বা আরামের জন্য মানুষ অর্থলিপ্সু হয় কিন্তু ক্ষমতালিপ্সা তো শুধু দানবশক্তি লাভের জন্য। ছিঃ!

হঠাৎ পেছনে মোটরসাইকেলের শব্দ পেলাম। মুখ ঘুরিয়ে দেখি নাসির। একমুখ হাসি ছড়িয়ে বলল, এসে গেলাম, কাহিনী শুনতে। কাল যে দাওয়াত দিয়েছিলেন মনে আছে? হেসে বললাম, আসুন, দাওয়াত দিয়েছিলাম ঠিকই, কিন্তু যতোদূর মনে পড়ে আজ এবং

সকালেই তা তো মনে পড়ে না। নাসির হেসে বলল, সাধে বলে যে মেয়েদের বারো হাত শাড়িতে ঘোমটা আঁটে না, সময়-তারিখ না থাকলে আমরা ধরে নিই, এনি ডে, এনি টাইম। কি বসতে বলবেন না, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই চলে যাবো? আরে না না বসুন। রীনা বিব্রত বোধ করে। অতোদূর থেকে হোন্ডা চালিয়ে এসেছেন নিশ্চয়ই খুব ক্ষিদে পেয়েছে? চায়ের কথা বলে আসি? বলবেন তবে শুধু চায়ে তো ক্ষিদে নষ্ট হবে, সঙ্গে আর কিছু হবে না, নাসির হাসে। সত্যিই আপনি শুধু বেহায়া না পেটুকও। রীনা ভেতরে চলে গেল। নাসির গুনগুন করে রবীন্দ্র সঙ্গীতের সুর ভাজতে শুরু করলো। রীনা এলো, নিঃশব্দে বসে পড়লো। নাসিরও স্থির হয়ে বসলো। কই বলুন সে সব কথা। নিশ্চই বলবো তবে আগে চা'টা খেয়ে নিন, নইলে হয়ত খাওয়াই হবে না। রীনা চুপ করে রইল। নাসির বলল, দেখুন আমি গোমড়া মুখ দেখতে ভালোবাসি না। প্লিজ একটু হাসুন। রীনা গম্ভীর মুখে বলল, আপনার ভালোবাসা বা ভাললাগার ওপর নির্ভর করে আমাকে চলতে হবে নাকি? হতেও তো পারে, কিছু কি বলা যায়? এবারে রীনা হেসে ফেললো। বুয়া চা নিয়ে এলো না, না ভেতরেই দাও, আসুন নাসির সাহেব চা খেয়ে তারপর এখানে এসে বসবো। হাসি-গল্পে ঠাট্টা-তামাশায় চা পর্ব শেষ হল। মনে হল জীবনের দুঃখকে নাসির ঠাঁই দিতে রাজি না। রীনাও তো একদিন অমনিই ছিল। তারপর কি দিয়ে কি হয়ে গেল। বাইরে এসে বসলো দু'জনে। রীনা শুরু করলো ... সব শেষে বলল নাসির, আমি বীরাঙ্গনা, সেটা আমার লজ্জা না, গর্ব। অন্তত নিজের সম্পর্কে এই আমার অভিমত, বিশ্বাস করুন। ভালো কথা, আগ্রহের সঙ্গে বলল নাসির, আমিও তো মুক্তিযোদ্ধা আর সেটা আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। তাহলে তোমারই বা অহংকার থাকবে না কেন? লজ্জা? কিসের লজ্জা? লজ্জা তাদের যারা দেশের বোনকে রক্ষা করতে পারেনি। শত্রুর হাতে তুলে দিয়েছে। আমাদের এ অপরাধের জন্য আমি সবার পক্ষ থেকে তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি। কি আরও কিছু করতে হবে? নতজানু হয়ে জোড় হাতে দাঁড়ালো নাসির। রীনার দু'চোখের জল গাল বেয়ে নামছে তখন। নাসির তখন গিয়ে ওকে সযত্নে কাছে টেনে নিলো, চোখের জল মুছে দিয়ে বলল, তাহলে মাকে বলি আমাদের প্রস্তাব মঞ্জুর? রীনা ঘাড় নেড়ে সায় দিলো। কিছুক্ষণ পর নাসির চলে গেল। রীনা ওখানে স্থানুর মতো দাঁড়িয়ে রইলো। এ কি সত্যি? তার জীবন এমনভাবে ভরে উঠবে, পূর্ণতা পাবে এও কি সম্ভব! এর পেছনে আব্বা-আম্মার দোয়া আছে, আর আছে আমার ভাইয়ার সাধনা। আকাশটা যেন আজ বড় বেশি উজ্জ্বল, গাছগুলো সবুজের গর্বে বিস্ফোরিত, বাগানের প্রতিটি ফুল হাসছে, রীনা কি করবে এখন? ফোন এলো, মিতু হেসে গড়িয়ে পড়ছে। বলল, ভাবী কনগ্রাচুলেশনস্। ফোন ছাড়তে চায় না, ভাইয়ার সঙ্গে কথা বলতে ওরা কাল আসবে।

বিয়ের পর বাসরঘরে ঢুকে নাসির আমাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে বলল, তোমাকে অভিনন্দন বীরাঙ্গনা! লজ্জায় মুখ তুলতে পারিনি। ভাইয়ার ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছে তার সাধ্যের অতিরিক্ত ব্যয় করে সে বোনের বিয়ে দিয়েছে।

সহজভাবে জীবন চলেছে। আমি নিঃসন্দেহে সুখী। আমাদের তিনটি সন্তান— দুটি ছেলে, একটি মেয়ে। মাঝে নাসির দু'বছরের জন্য ট্রেনিং নিতে আমেরিকা গিয়েছিল। আমিও সঙ্গে ছিলাম। আমাকে চাকরীটা ছাড়তে হয়েছিল কারণ ওর ছিল বদলির চাকরী। এক সময় কুমিল্লাতেও ছিলাম। হাসপাতালটা ঘুরে ঘুরে দেখলাম। নিজে যে ঘরে যে বেডে ছিলাম, হাত বুলিয়ে দেখলাম। সেদিন ছিলাম বন্দী আর আজ স্বাধীন।

একটি মেয়ে তার জীবনের যা কামনা করে তার আমি সব পেয়েছি। তবুও মাঝে মাঝে বুকের ভেতরটা কেমন যেন হাহাকার করে ওঠে। কিসের অভাব আমার, আমি কি চাই? হ্যাঁ একটা জিনিস, একটি মুহূর্তের আশংকা মৃত্যু মুহূর্ত পর্যন্ত বয়ে যাবে। এ প্রজন্মের একটি তরুণ অথবা তরুণী এসে আমার সামনে দাঁড়িয়ে বলবে, বীরাঙ্গনা আমরা তোমাকে প্রণতি করি, হাজার সালাম তোমাকে। তুমি বীর মুক্তিযোদ্ধা, ওই পতাকায় তোমার অংশ আছে। জাতীয় সঙ্গীতে তোমার কণ্ঠ আছে। এদেশের মাটিতে তোমার অগ্রাধিকার। সেই শুভ মুহূর্তের আশায়, বিবেকের জাগরণের মুহূর্তের পথ চেয়ে আমি বেঁচে রইবো।

পরিশিষ্ট–ভ

'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়াজীর জবানবন্দী'

বাংলাদেশের অভ্যুদয় সম্পর্কে দখলদার পাক বাহিনীর সর্বশেষ অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) আমীর আবদুল্লাহ খান নিয়াজীর ব্যক্তিগত মতামত 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়াজীর জবানবন্দী' গ্রন্থ থেকে–

টিক্কা খান ব্যর্থ

জেনারেল টিক্কা খান অন্যান্য সমস্যার সমাধানে ব্যর্থতার ন্যায় আমাদের সৈন্যদের সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারেননি। কেবল নিজেদের সম্পদ ধ্বংস করা এবং নিজেদের জনগণকে হত্যা করার ব্যাপারেই তিনি ছিলেন অত্যন্ত উপযোগী। এ ধরনের কাজ তিনি দু'বার করেছেন। একবার বেলুচিস্তানে এবং দ্বিতীয়বার পূর্ব পাকিস্তানে। এ উভয় স্থানেই তাঁর নাম দেয়া হয়েছে 'কশাই'। তিনি যদি যোগ্যতার অধিকারী হতেন, তাহলে শক্তি প্রয়োগ ছাড়াই সমস্যার সমাধান করতে পারতেন। যদি নিতান্ত অপারগতার ক্ষেত্রে সামরিক শক্তিকে কাজে লাগাতেই হত, তাহলে এত অধিক ধ্বংস ও রক্তপাত ছাড়াই তিনি স্বীয় লক্ষ্য অর্জনে সফলকাম হতেন। সেক্ষেত্রে ভারতও পূর্ব পাকিস্তানের ব্যাপারে এতখানি হস্তক্ষেপের সুযোগ ও অজুহাত কোনোটাই পেত না।

ভুট্টোর ক্ষমতার জন্যে

আমি জানি না যে, বেসামরিক সরকার গঠনের ব্যাপারে ইয়াহিয় খানের চিন্তাভাবনা কি ছিলো। তবে এটা সত্য যে, তাঁর চারপাশে যেসব ক্ষমতালিপ্সু লোক জড়ো হয়েছিলো, তারা এর বিরোধিতা করছিলো। তারা আশঙ্কা করছিলো যে, এতে করে তাদের ইজারাদারী খতম হয়ে যাবে এবং পশ্চিম পাকিস্তানে তারা মি. ভুট্টোকে ক্ষমতায় বসানোর পরিকল্পনা সফল করতে পারবে না। জেনারেল ইয়াকুবের অযোগ্যতা ও নিষ্ক্রিয়তায় উৎসাহিত হয়ে শেখ মুজিব সামরিক সরকারের বিকল্প একটি সরকার গঠন করে ফেলেন। এ কারণে বাঙালিরা সেনাবাহিনীর মোকাবিলা করার জন্যে ময়দানে নেমে আসার সাহস পায়। এরপর জেনারেল টিক্কা খান তাঁর দু'জন ঘনিষ্ঠ সহযোগীর পরামর্শে যে নিষ্ঠুর পন্থায় শক্তি প্রয়োগ করেন, তা বাঙালিদেরকে বহু দূরে ঠেলে দেয় এবং সেখান থেকে তাদের ফিরে আসা আর সম্ভবপর ছিলো না, ফলে স্বভাবতই তারা পশ্চিম পাকিস্তানের শত্রু বনে যায়। এটা ছিলো একটি সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার ফসল। যারা এ ঘৃণ্য অপকর্মের হোতা, তারা ছিলো ভুট্টোর সঙ্গে গোপন চক্রান্তে লিপ্ত। এর একটি বাস্তব প্রমাণ এই যে, ক্ষমতা লাভের পর ভুট্টো এদেরকে বিপুলভাবে পুরস্কৃত করেন।

স্বীয় জনগণের বিরুদ্ধে

পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক কার্যক্রমের সূচনা ঘটে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ। এ কার্যক্রম অত্যন্ত নির্ঝঞ্ঝাট ও নির্বুদ্ধিতাজনক পন্থায় গ্রহণ করা হয়। এর ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিলো নেহাত সন্ত্রাস ও নির্যাতনের ওপর, কোনোরূপ সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের ওপর নয়। বাঙালি সৈন্য ও ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসকে একত্রে নিরস্ত্র করা এবং সেই সঙ্গে আওয়ামী লীগ ও তার সমগোত্রীয় অন্যান্য দলের মূল নায়কদের আয়ত্তাধীনে নেয়ার পরিবর্তে শুধু ঢাকা ও চট্টগ্রামের ন্যায় শহরে নির্দিষ্ট সামরিক কার্যক্রমের সূচনা করা হয়। অন্যান্য যেসব শহরে সামরিক বাহিনীর ছাউনি ছিল, সেখানেও অনুরূপ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। এভাবে স্বীয় জনগণের বিরুদ্ধে ট্যাঙ্ক, মেশিন গান, অটোমেটিক গান, কামান ইত্যাদি পুরোপুরি ও নির্বিচারে ব্যবহার করা হয়। কোনো সরকারের পক্ষে স্বীয় জনগণের বিরুদ্ধে এ ধরনের ধ্বংসাত্মক অস্ত্র ব্যবহারের সম্ভবত এটা সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ দৃষ্টান্ত। সাধারণত নব্য উপনিবেশবাদী শক্তিগুলোই আপন প্রজাদের বিরুদ্ধে এই ধরনের নিষ্ঠুর ও নৃশংস কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে।

এ পরিস্থিতির সমগ্র দায়িত্ব জেনারেল টিক্কা খান ও তাঁর দু'জন ঘনিষ্ঠ সহযোগীর ওপর বর্তায়। শিগগিরই হোক কি বিলম্বে, এ জন্যে তাদেরকে জবাবদিহি করতে হবেই।

স্বদেশে প্রবাসী

১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল আমি যখন পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের দায়িত্ব গ্রহণ করি, তখন আমাদের সামরিক ছাউনিগুলো আশপাশের এলাকায় তৎপর ছিলো। এ ছাউনিগুলোর একটির সঙ্গে অপরটির যোগাযোগ ছিলো একেবারে বিচ্ছিন্ন। শুধুমাত্র বিমান যোগাযোগ ছাড়া বিভিন্ন ছাউনির সঙ্গে ঢাকার আর কোনো যোগাযোগ ছিলো না। ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যকার সীমান্ত সম্পূর্ণ খতম হয়ে গিয়েছিলো। সমগ্র গ্রামাঞ্চলে ছিলো মুক্তিবাহিনীর আধিপত্য। জনগণের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ছিলো আমাদের বিরোধী। জেনারেল টিক্কা খানের চরম, নিষ্ঠুর ও নৃশংস সামরিক কার্যক্রমে জনগণ ছিলো আমাদের প্রতি যারপরনাই বিরূপ। এভাবে স্বদেশেই আমরা প্রবাসী হয়ে রইলাম।

পরিশিষ্ট– ম

'সকল হিংসা, বিভেদ ও হত্যাযজ্ঞের পেছনে কলকাঠি ঘুরিয়েছেন ভুট্টো, আইউব-ইয়াহিয়া ছিলেন ক্রীড়নক মাত্র'– এ অপ্রিয় সত্য কথাটাই নিঃসংকোচে, নির্বিবাদে বলতে পেরেছেন সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের গর্ভনরের উপদেষ্টা জেনারেল রাও ফরমান আলী '৭১ নিয়ে লেখা তার বিশ্বব্যাপী সাড়া জাগানো গ্রন্থ 'ভুট্টো শেখ মুজিব বাংলাদেশ'-এ। আলোচ্য গ্রন্থের চুম্বকাংশ–

পরদিন এগারোটায় প্রেসিডেন্ট হাউজে ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে দেখা হলো। লাউঞ্জে বসে জেনারেল হামিদ, মি. ভুট্টো এবং প্রেসিডেন্ট বসে মদপান করছিলেন। সামনের টেবিলের ওপর ইয়াহিয়া ও হামিদ দু'জনই পা তুলে বসেছিলেন। সহসা আমার মনে হলো, রোম জ্বলছে আর সম্রাট নীরো বাঁশি বাজাচ্ছে

— মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী (পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নরের উপদেষ্টা)

সম্ভবত ফেব্রুয়ারির ৫/৬ তারিখে রাওয়ালপিন্ডি থেকে এক গুরুত্বপূর্ণ পয়গাম এলো, শেখ মুজিবকে পশ্চিম পাকিস্তানে পাঠিয়ে দাও। আমি শেখ সাহেবকে বললাম, প্রেসিডেন্ট আপনাকে স্মরণ করেছেন, দয়া করে আপনি একটু ইসলামাবাদে পদধূলি দেবেন। শেখ সাহেব বললেন, মাত্র তিন সপ্তাহ আগে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আমার সব বিষয়ে খোলাখুলি আলাপ হয়েছে, এখন আর নতুন কি কথা থাকতে পারে? আমি বললাম, নিশ্চয়ই এমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ আলাপ আছে, যে জন্য অপনাকে স্মরণ করেছেন। তিনি একটু চিন্তা করে বললেন, কিন্তু আমি যে আমার বিশেষজ্ঞদের দিয়ে শাসনতন্ত্রের খসড়া তৈরি করছি, আপনি প্রেসিডেন্টকে জানিয়ে দিন, আমি এ সময় আসতে পারব না।

শেখ মুজিবের উক্তি আমি প্রেসিডেন্টকে জানিয়ে দিলাম। এর এক-দু'দিন পরই পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পৃক্ত কতিপয় মন্ত্রী এবং মেজর জেনারেল করিম ঢাকা এলেন। বলাবাহুল্য, জেনারেল করিম ছিলেন বাঙালি। জেনারেল করিম শেখ সাহেবকে নত করার চেষ্টা করেন, আমিও তাকে খুব বোঝালাম। শেষাবধি তিনি রাজি হলেন। তিনি বললেন, শাসনতন্ত্রের খসড়া চূড়ান্ত অনুমোদনের প্রশ্নে আওয়ামী লীগের একজিকিউটিভ কমিটির একটা সভা হচ্ছে, এটা হলেই আমি ১৯ ফেব্রুয়ারি রাওয়ালপিন্ডি যেতে পারি। ইতিমধ্যে ১৮ ফেব্রুয়ারিতে ভুট্টো এক বক্তৃতায় বলে বসলেন, ঢাকা পশ্চিম পাকিস্তানিদের জন্য বধ্যভূমি হবে। শেখ মুজিব আমাকে টেলিফোন করে চরম অস্থিরতা প্রকাশ করে বললেন, ঢাকা যদি ভুট্টোর জন্য বধ্যভূমি হবে, তবে পশ্চিম পাকিস্তান

আমার জন্য হবে 'জবাইখানা'। আমি আর রাওয়ালপিন্ডি যাব কি করে? মুজিবের সহগামী লোকরা এর সঙ্গে যোগ করে বলল, ওরা সোহরাওয়ার্দী সাহেবকে বৈরুতে বিষ খাইয়ে মেরেছে, শেখ মুজিবকেও নিয়ে হোটেল ইন্টারকনে গোপনে হত্যা করার মতলব আঁটছে।

এসব বিবৃতিতে পরিস্থিতি আরো খারাপ হয়ে গেল। এরপর একদিন শেখ মুজিব বলে বসলেন, প্রেসিডেন্টের ঢাকা আসা উচিত, কেননা, ৩ মার্চ জাতীয় পরিষদের বৈঠক বসবে, তখন আমরা তাকে শাসনতন্ত্রের খসড়া দেখাব।

শেখ মুজিব রাওয়ালপিন্ডি যেতে পারবে না বলার পর ২০ ফেব্রুয়ারি আমাকে পিন্ডিতে ডেকে পাঠানো হলো। ২২ তারিখে সব গভর্নর, সামরিক প্রশাসকদের এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হওয়ার কথা। আমি দু'দিন আগে পৌঁছেই প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করলাম। এটা নিঃসন্দেহে একটি ঐতিহাসিক সাক্ষাৎকার ছিল। তাঁকে ভীষণ ক্ষীপ্ত মনে হলো। আমাকে দেখেই বলে উঠলেন, বদমাশটাকে উচিত শিক্ষা দিতে হবে। সে কি মনে করেছে? এখানে না এসে সে আমাকে দারুণ অপমান করেছে, আমার শক্তিকে সে চ্যালেঞ্জ করেছে।

আমি তাঁর কথার প্রতিবাদ করে বললাম, মুজিব সবেমাত্র বিপুল জনসমর্থন নিয়ে ভোটে জয়লাভ করেছে, এখনই বদমাশকে শিক্ষা দেওয়া ঠিক নয়। সামনে এখনও অনেক পর্যায় রয়েছে। প্রথম পর্যায়েই আমি আপনাকে কঠোর পদক্ষেপের সুপারিশ করব না। দ্বিতীয় পর্যায় রয়েছে, শাসনতন্ত্র অনুমোদন-এর সময়। প্রয়োজন হলে এসেমব্লিতে এই শাসনতন্ত্রের যথার্থতা নিয়ে তুমুল বিতর্ক তোলা যায়। এখানেও আপনাকে আমি ধৈর্য ধরার অনুরোধ করব। প্রয়োজন হলে লোকরা এই প্রশ্নে ওয়াক আউট করবে। এরপরও যদি আওয়ামী লীগ গায়ের জোরে শাসনতন্ত্র পাস করিয়ে নিতে চায়, তখন আপনি লিগ্যাল ফ্রেম ওয়ার্ক দিয়ে তা নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করবেন— আমি এখানে এসেও আপনাকে সংযত হওয়ার পরামর্শ দেব। আপনি ক্ষমতা তার কাছে হস্তান্তর করুন, দেখবেন ছ'মাসের মধ্যে তিনি তার জনপ্রিয়তা এবং রাজনৈতিক শক্তি হারাবেন। এ সময় যখনই তিনি পাকিস্তানের অর্থনৈতিক কাঠামো বিনষ্ট করতে চাইবে তখন পাকিস্তানের কমান্ডার-ইন-চিফ যে কোনো পদক্ষেপ নিতে পারবেন। একমাত্র তখনই সেনাবাহিনীর সর্বশক্তি প্রদর্শন সময়োচিত হবে।

ইয়াহিয়া খান আমার কথা ধৈর্যসহকারে শুনছিলেন। শেষে বললেন, আপনার কথায় আমি একমত। কিন্তু আমি শেখ মুজিবের ওপর থেকে সব আস্থা হারিয়েছি। আমি শেষবারের মতো তার বিশ্বস্ততা পরীক্ষা করতে চাই।

আমি ইয়াহিয়া খানকে ইতিপূর্বে এত উত্তেজিত কখনও দেখি নি। মুজিবের ব্যাপারে হঠাৎ এত বেশি উত্তেজিত হওয়ার কি কারণ থাকতে পারে? ইতিপূর্বে তো তার সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে সব বৈঠক সম্পন্ন হয়েছে। আমার হঠাৎ মনে হয়েছে এর পেছনে ভুট্টোর কারসাজি রয়েছে। পরে জাতীয় পরিষদে ভুট্টোর বক্তৃতায় তা প্রকাশও পেয়েছে।

আমি ইয়াহিয়া খানকে বললাম, এখন দেখছি পূর্ব পাকিস্তানে রক্তাক্ত পরিণতি ছাড়া আর কোনো গত্যন্তর নেই। আপনি যদি জাতীয় পরিষদের বৈঠক মুলতবী করতে চান তাহলে যে কোনোরকম বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে। যদি তাই করতে হয় তাহলে সর্বাগ্রে প্রেসের ওপর কঠোর বিধি-নিষেধ আরোপ করতে হবে। ইয়াহিয়া খান বললেন, তাই হবে। জাতীয় পরিষদের বৈঠক মুলতবী হওয়ার ঘোষণা হলো, কিন্তু প্রেসের ওপর বিধি-নিষেধ আরোপ করা হলো না।

প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কথা শেষ করে আমি বেদনাভরা বুক নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। ভাবলাম, অন্য কারো সঙ্গে একটু দেখা করা যাক। জেনারেল ওমরের কাছে গেলাম। তিনি প্রেসিডেন্টের একান্ত বিশ্বস্তদের অন্যতম ছিলেন। এ ব্যাপারে তার সঙ্গে দেড়-দু'ঘণ্টা আলাপ হলো। এছাড়া আরো ক'জন গুরুত্বপূর্ণ লোকদের সঙ্গে আলাপ করি। কিন্তু মুলতবী সিদ্ধান্তের নড়চড় হলো না।

২২ ফেব্রুয়ারি গভর্নর ও এডমিনিস্ট্রেটরদের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হলো। জেনারেল ইয়াকুব আমাকে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন সেখানে কিন্তু পীরজাদা বাদ সাধলেন।

আমি, গভর্নর আহসান ও জেনারেল ইয়াকুব ইস্ট পাকিস্তান হাউজে উঠেছিলাম। জেনারেল ইয়াকুব বৈঠকের বিবরণ শুনাচ্ছিলেন। বললেন, জাতীয় পরিষদের অধিবেশন মুলতবী এক মারাত্মক পদক্ষেপ বলে আমরা তিনজনই মনে করি। রক্তাক্ত সংঘর্ষ এবং মিলিটারি অপারেশন অনিবার্য। মিলিটারি অপারেশন পাকিস্তান ধ্বংসের প্রধান কারণ হবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

আমাদের এই আলোচনার পুরো বৃত্তান্ত একটা কাগজে লিখে নিলাম। তাতে এও বলা হলো, এই পরিস্থিতিতে আমরা ভারতের ব্যাপারেও উদাসীন থাকতে পারি না। আমরা এভাবে ধ্বংসের পরিখায় তলিয়ে যেতে পারি না। এসব লিখে কাগজখানি জেনারেল পরীজাদাকে পাঠিয়ে দেয়া হলো।

আমার ওপর হুকুম হলো, আমি যেন তাড়াতাড়ি ঢাকা চলে যাই। সম্ভবত প্রেসিডেন্ট ও তাঁর উপদেষ্টাদের মতে আমার পিন্ডি অবস্থান সন্তোষজনক ছিল না। আমি ঢাকা চলে এলাম। গভর্নর আহসান ও জেনারেল ইয়াকুবও ঢাকা এলেন ২৬ তারিখে। তারা এসে শোনালেন জাতীয় পরিষদের অধিবেশন মুলতবীর ঘোষণা ২৮ তারিখে হচ্ছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা এ ব্যাপারে নিজেদের মতামত কিছু ব্যক্ত করেন নি? বললেন, অনেক কথা হয়েছে, কিন্তু সিদ্ধান্ত অটল রয়েছে। প্রেসিডেন্ট আমাদের বললেন, আপনাদের কথা যুক্তিযুক্ত এতে কোনো সন্দেহে নেই। কিন্তু আমরা ভুট্টোকেও উপেক্ষা করতে পারি না। তিনি এখানকার সংখ্যাগরিষ্ঠ নেতা এবং সেনাবাহিনীও এখানকার লোক দিয়ে গঠিত।

মি. ভুট্টো এ সময় করাচিতে ছিলেন। আমি এবং জেনারেল ইয়াকুব তার সঙ্গে দেখা করে বললাম, জাতীয় পরিষদের বৈঠক মুলতবী হলে পরিস্থিতি ভীষণ বিগড়ে যাবে, গেরিলা যুদ্ধ হবে, সেনাবাহিনীর বাঙালি সদস্যরা বিদ্রোহ করবে– সর্বোপরি সিভিল

ওয়ার শুরু হবে। মি. ভুট্টো আমাদের কথাবার্তা এবং যুক্তিতর্ক মনোযোগ সহকারে শুনলেন এবং শেষে বলে উঠলেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সেখানে এমন কিছুই হবে না। আওয়ামী লীগ এক বুর্জোয়া পার্টি। তাদের মধ্যে এ ধরনের আন্দোলন বা সেনাবাহিনী মোকাবেলা করার কোনো ক্ষমতা নেই।

ভুট্টোর এ ধারা জবাব শুনে আমি পিন্ডি এলাম এবং প্রেসিডেন্টকে ভুট্টোর উক্তি সম্পর্কে অবহিত করলাম। প্রেসিডেন্ট চিন্তান্বিত হয়ে বললেন, আমি এখন আর কি করতে পারি? মুলতবী সিদ্ধান্ত আর কোনোক্রমেই পাল্টানো সম্ভব নয়।

এরপর আমি নতুন নির্দেশ নিয়ে ঢাকা ফিরে এলাম। নতুন নির্দেশটি ছিল অধিবেশন মুলতবী সিদ্ধান্ত ঘোষণার একদিন আগে শেখ মুজিবকে তা জানিয়ে দিতে হবে।

মি. ভুট্টো ক্ষমতা লাভের জন্য সন্তর্পণে এগোচ্ছিলেন। মুলতবী ঘোষণা ২৮ তারিখে হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু একদিন দেরি হয়ে গেল, যেহেতু ২৮ তারিখে ভুট্টো লাহোরে 'মিনারে পাকিস্তানে'র পদদেশে এক জনসভায় ভাষণ দেন। এ সভায় ভুট্টো অধিবেশন মুলতবীর দাবি তোলেন এবং সবাইকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেন, যদি কোনো সদস্য এখান থেকে ঢাকা যেতে চায় তাহলে তাদের পা ভেঙ্গে দেয়া হবে।

এ রাতেই শেখ মুজিবকে খবরটি পৌঁছানোর কথা ছিল, কিন্তু স্থানীয় প্রশাসন একদিন আগে তা না বলার পক্ষে মত পোষণ করছিলেন। কারণ, এতে আওয়ামী লীগ লোক জড়ো করে হাঙ্গামা শুরু করবে। পিন্ডিতে অবস্থানকারী সেনাধ্যক্ষরা কেন যে একদিন আগে খবরটা জানানোর পক্ষে মত পোষণ করছিলেন, অদ্যাবধি আমার তা বোধগম্য হয়নি।

যাক পরিকল্পনানুযায়ী সন্ধ্যা ৭টায় শেখ মুজিবকে গভর্নর হাউজে ডেকে পাঠানো হলো। গভর্নর আহসান প্রথমে একথা সেকথা বললেন, পরে প্রেসিডেন্টের মুলতবী সিদ্ধান্তটি তাকে জানানোর পর তিনি হঠাৎ ক্ষেপে উঠলেন না। বেশ সংযত হয়েই বললেন, এই সিদ্ধান্ত আমাদের জন্য খুব দুঃখজনক। নিঃসন্দেহে আমাদের সঙ্গে প্রতারণা করা হলো। আমাদের পায়ের নিচের মাটি সরিয়ে ফেলা হলো। শেখ মুজিবের সঙ্গে আরো দু'জন লোক ছিল, তিনি তাদের সরিয়ে দিয়ে একা থেকে গেলেন। পরে বললেন, অধিবেশনের নতুন একটা তারিখ যদি এ মাসেই ঘোষণা করা হয়, তাহলে জনসাধারণকে নিরস্ত করা যাবে। আপনি দয়া করে মুলবতী ঘোষণার পর পরবর্তী একটা তারিখও একসঙ্গে ঘোষণা করার জন্য প্রেসিডেন্টকে বলুন।

এই একটি ঘটনা থেকেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছিলো, শেখ মুজিব পাকিস্তান দ্বিখণ্ডিত করার পক্ষে ছিলেন না। তাঁর যদি মতলব খারাপ থাকতো তাহলে নতুন তারিখ কেন চাইতে যাবেন তিনি?

এডমিরাল আহসান রাত ১০টায় পিন্ডিতে জরুরি সিগন্যাল পাঠালেন। এতে শেখ মুজিবের উক্তি ও নতুন তারিখ ঘোষণার উল্লেখ ছিল। এ সিগন্যালের কোনো জবাব এলো না। বরং পরদিন দুপুর একটায় জাতীয় পরিষদের বৈঠক মুলতবীর ঘোষণা হলো

রেডিওতে। আমরা ভেবে বিস্মিত হলাম, এই ঘোষণাটা ইয়াহিয়া খান নিজের কণ্ঠে কেন করলেন না?

এই ঘোষণা শুনতেই ঢাকাতে ধ্বংসযজ্ঞ বেঁধে গেল। ইডেন বিল্ডিং ও রাস্তাঘাট বিরান মনে হলো। এ সময় ঢাকা স্টেডিয়ামে ক্রিকেট খেলা চলছিল। খেলা রেখে মারপিট শুরু হলো। চেয়ার মারামারি করে বেশ কিছু লোক হতাহত হলো। নবাবপুরের দিকে বাড়ি বাড়ি অগ্নিকাণ্ড চলল। বিহারীদের ওপর হামলা শুরু হলো এবং সন্ধ্যার দিকে পরিস্থিতি আয়ত্তের বাইরে চলে গেল।

শেখ মুজিব সন্ধ্যাতে এক জমকালো সাংবাদিক সম্মেলনে ভাষণ দেন। তিনি বললেন, পূর্ব পাকিস্তানিদের ওপর অসম্ভব বাড়াবাড়ি করা হয়েছে। আমাদেরকে এই অন্যায় রুখে দাঁড়াতে হবে। প্রতিবাদস্বরূপ তিনি ২ মার্চ ঢাকাতে এবং পরদিন সারাদেশে হরতাল আহ্বান করেন। এরপর ৭ মার্চে রেসকোর্সের জনসভায় আগামী কর্মপন্থা ঘোষণা করা হবে বলে জানান।

এরপর তিনি সেনাবাহিনীর লোকদের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য গভর্নমেন্ট হাউজে চলে আসেন। এখানে এসে তিনি বিনীতভাবে বললেন, আজ রাতের মধ্যে যদি পরবর্তী তারিখ ঘোষণা করা হয় তাহলে আমি লোকদের উত্তাল আবেগ আয়ত্তে আনতে পারব, অন্যথায় আমার পক্ষে কিছুই করা সম্ভব হবে না।

আমরা তিনজনই এ নাজুক পরিস্থিতি সামলাবার ব্যাপারে হন্যে হয়ে উঠলাম। অনেক চিন্তাভাবনার পর এডমিরাল আহসান পিন্ডিতে এক তারবার্তা পাঠালেন। তা ছিল নিম্নরূপ :

আইবেগ অফ ইওর এনাউন্স এ নিউ ডেট টুনাইট। টু মরো উইল বি টু লেট।

তারবার্তা পাঠানোর পর টেলিফোনে যোগাযোগের চেষ্টা চলল। কিন্তু কোনোক্রমেই ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে যোগাযোগ হলো না। অবশ্য পীরজাদার সঙ্গে আলাপ হলো। এরপর আমরা জেনারেল হামিদের সঙ্গে শিয়ালকোর্টে যোগাযোগ করলাম, ব্যাপারটি নিয়ে যাতে প্রেসিডেন্টকে বুঝাতে পারে। তিনি আমাদের কথা দিলেন তিনি তা করবেন।

রাত প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। এমন সময় বিশেষ টেলিফোনের ঘন্টি বেজে উঠল। মনে হলো পীরজাদা লাইনে আছেন। জেনারেল ইয়াকুব-এর সঙ্গে কথা বলতে চান। তিনি রিসিভার তুলে নিলেন। পীরজাদা বললেন, এই মুহূর্তে আহসানকে পদচ্যুত করা হলো, তার বদলে আপনাকে গভর্নর করা হলো।

পূর্ব পাকিস্তানের শহরেবন্দরে দাঙ্গাহাঙ্গামা চলছিল। ১২ মার্চ সৈন্য তলব করা হলো। গভর্নর হাউজে মিছিলকারীদের হামলা চলছিল। সৈন্যদের গুলি না চালানোর জন্য কঠোরভাবে নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো। কিন্তু আওয়ামী লীগের গুণ্ডাদের হামলা প্রতিহত করার জন্য বাধ্য হয়ে সৈন্যদের গুলি চালাতে হয়, এতে ৬ জন নাগরিক মারা যায়।

মানুষের এ রুদ্র মূর্তিকে আরো এক ধাপ এগিয়ে দেওয়ার জন্য শেখ মুজিব এখানে সেখানে জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিতে লাগলেন। সংঘর্ষ বেড়েই চলল, রাস্তাঘাটে রক্ত গঙ্গা

বয়ে চলল, শান্তির সব উদ্যোগ ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল।

পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে জেনারেল ইয়াকুব পিন্ডিতে তার পাঠালেন। ধরপাকড়-এর জন্য সেনাবাহিনীকে পুরোপুরি নিয়োজিত করার অনুমতি প্রার্থনা করা হলো। ইয়াহিয়া খান জানালেন, আপনার ওপর সম্পূর্ণ আস্থা আছে আমার। আমার হুকুমের অপেক্ষা না করে প্রয়োজনবোধে আপনি নিজেই সিদ্ধান্ত নিয়ে কর্মপন্থা গ্রহণ করবেন।

এর প্রতিউত্তরে জেনারেল ইয়াকুব পুনরায় তারবার্তা পাঠিয়ে বললেন, আপনি (প্রেসিডেন্ট) ঢাকা আসুন এবং একটা রাজনৈতিক সমাধানের চেষ্টা করুন। পিন্ডি থেকে গোপনে পয়গাম এলো প্রেসিডেন্ট ১০ তারিখে নেতাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার জন্য আসছেন। এ ব্যাপারে শেখ মুজিবের সঙ্গে অগ্রিম খবর দেবার জন্য বলা হলো। শেখ মুজিব এতে সম্মত হলেন। পরে তিনি আবার বললেন, তিনি কোনো রাউন্ড টেবিল কনফারেন্সে বসতে রাজি নন।

সেনাবাহিনী মাত্র ২ দিন শহরে টহল দিয়েছিল। এরপর আওয়ামী লীগের পীড়া-পীড়িতে তাদের ব্যারাকে ফিরিয়ে নেয়া হলো। শেখ মুজিব ঘোষণা করলেন, শান্তি-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি আমি দেখব। আমার স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী ও পুলিশ-আনসার শান্তি-শৃঙ্খলার কাজে নিয়োজিত থাকবে।

মার্চের ৪/৫ তারিখে এডমিরাল আহসান পশ্চিম পাকিস্তানে রওয়ানা হয়ে যান। জেনারেল ইয়াকুব তাকে সংক্ষিপ্তভাবে বিদায় সম্বর্ধনা জানান। এই অনুষ্ঠানে আমি উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় পিন্ডি থেকে পীরজাদার ফোন এলো। আমরা শুধু 'ইয়েস স্যার' শুনলাম। শেষে শুনলাম, যদি তাই হয়, তাহলে আমার পদত্যাগ গ্রহণ করুন। সঙ্গে সঙ্গে আমি এবং জেনারেল খাদেম রাজাও পদত্যাগের কথা বললাম। জেনারেল ইয়াকুব বললেন, আমরা তিনজনই যদি একসঙ্গে পদত্যাগ করার কথা বলি তাহলে বিদ্রোহের অভিযোগে পড়ব।

জেনারেল পরে জানালেন যে, ইয়াহিয়া খান ঢাকাতে আসতে অস্বীকার করেছেন। তিনি বললেন, আমার আসল ভিত্তি হচ্ছে পশ্চিম পাকিস্তান। আমি সেখানকার লোকদের নারাজ করতে পারব না।

আমাদের সবার অভিমত ছিল, প্রেসিডেন্টের এখানে আসার বিশেষ দরকার। আমরা এসব কথাবার্তা বলছিলাম, এমন সময় ফোন এলো এবং বলা হলো, রাও ফরমান আলীকে সত্বর পশ্চিম পাকিস্তানে পাঠিয়ে দাও।

তখন রাতের এগারোটায় করাচিতে শেষ ফ্লাইট যেতো। হাতে তেমন সময় ছিল না। আমি এয়ারপোর্টে খবর পাঠালাম আমার জন্য যেন অপেক্ষা করা হয়। হঠাৎ খেয়াল এলো, যাবার আগে একবার শেখ সাহেবের সঙ্গে দেখা করে গেলে বোধ হয় ভালো হবে। ফোনে যোগাযোগ করা হলে শেখ সাহেব বললেন, এক্ষুনি চলে আসুন। শহরে গুলি চলছিল। হৈচৈ চলছিল, এরি মধ্যে আমি ছোট গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম, শেখ

সাহেবের বাড়িতে ঢুকেই আমি বললাম, পাকিস্তানকে বাঁচানোর জন্য শেষবারের মতো এখনো কোনো তদবির করা যায় কি? তিনি জবাবে বললেন, বাঁচতে পারে। তবে এ ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করার জন্য আমার মানসিক অবস্থা থাকতে হবে তো?

দেখুন, আমার লোকরা পথেঘাটে বেঘোর মারা যাচ্ছে। আমি দু'দিন থেকে বিছানায় পিঠ দিতে পারিনি। আপনার সঙ্গে কথা বলতেও আমার খুব কষ্ট হচ্ছে।

আমি বললাম, শেখ সাহেব, সেনাবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়া খুব ভালো হবে কি? তিনি বললেন, আপনারা যদি আমার কথা মেনে নেন তাহলে আমি নিজে পাকিস্তানি সৈন্যদের গলায় হার পরিয়ে দেব।

আমাদের কথাবার্তা চলছিল এমন সময় তাজউদ্দিন সাহেব ঢুকলেন। শোনা যায়, তার পূর্ব পুরুষ হিন্দু ছিলো। তাছাড়া ভারতের প্রতি তার ভক্তি ছিল অপরিসীম। তিনি ঢুকে কোনো ভূমিকা না করেই বলতে শুরু করলেন, এখন আর এক ছাদের নিচে আমাদের অবস্থান সম্ভব নয়, যেখানে ভুট্টো রয়েছে। সে আমাদের এক নম্বর খুনী, দু'নম্বর খুনী ইয়াহিয়া খান। এখন একটাই মাত্র পথ খোলা রয়েছে, এসেমব্লি দুটো করতে হবে।

আমি দু'জন বাঙালি নেতার মতামত শুনে করাচি রওয়ানা হলাম। প্লেনে উঠে দেখি লে. জেনারেল টিক্কা খানও যাচ্ছেন। তাকেও ইয়াহিয়া খান ডেকে পাঠিয়েছেন। সহসা আমার মনে হলো টিক্কা খানকে গভর্নর করে পূর্ব পাকিস্তানে পাঠানো হচ্ছে না তো?

পরদিন এগারোটায় প্রেসিডেন্ট হাউজে ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে দেখা হলো। লাউঞ্জে বসে জেনারেল হামিদ, মি. ভুট্টো এবং প্রেসিডেন্ট বসে মদপান করছিলেন। সামনের টেবিলের ওপর ইয়াহিয়া ও হামিদ দু'জনই পা তুলে বসেছিলেন। সহসা আমার মনে হলো, রোম জ্বলছে আর সম্রাট নীরো বাঁশী বাজাচ্ছেন।

আমি একটা খালি চেয়ারে বসে পড়লাম। বসেই ইয়াহিয়াকে উদ্দেশ্য করে বললাম, আমার এমন কিছু কথা আছে যা ভুট্টো সাহেবের পক্ষে শোনা সমীচিন হবে না। আমার কথা শেষ না হতেই ভুট্টো হাতের গ্লাসসহ উঠে অন্য কামরায় চলে গেলেন।

প্রথম দিকে ইয়াহিয়া খানকে মদের নেশায় বেশ ক্রুদ্ধ মনে হলো। বললেন, জেনারেল ইয়াকুব তাহলে ইস্তফা দিয়ে চার্জ বুঝিয়ে দিয়েছে আমার অনুমতি ছাড়াই? এসব মোটেই বরদাস্ত করা হবে না, আমি আপনাদের সবাইকে কোর্ট মার্শাল করব। আমি বললাম, জেনারেল ইয়াকুব পদত্যাগ করেছেন কিন্তু চার্জ কাউকে দেননি। তিনি আপনার নির্দেশের অপেক্ষায় আছেন। আমরা সবাই মিলে পরিস্থিতি আয়ত্তে রাখার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছি। কিন্তু আপনি যে ঢাকাতে একটুও যেতে চান না।

এরপর আমি ঢাকার পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোকপাত করলাম। বললাম, পরিস্থিতি এখন ছ'দফাকেও ছাড়িয়ে গেছে। যেখানে ভুট্টো আছে সেই এসেমব্লিতে তারা বসতেও নারাজ। দুই আইন, দুই হাউজ এবং কনফেডারেশন কথা পর্যন্ত উঠেছে।

আমি লক্ষ্য করলাম, ইয়াহিয়া খান এসব কথাগুলোর ঠিক মর্মে পৌছতে চেষ্টা করছেন না। কথার মাঝখানেই তিনি বলে বসলেন, আমি জেনারেল টিক্কা খানকে পাঠাচ্ছি। গভর্নর বদলের পর হয়ত ঘটনাবলীর নতুন মোড় নিতে পারে।

আমি আহত মন নিয়ে সেখান থেকে চলে এলাম। আমার মন সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত। ঢাকাতে রক্তের খেলা চলছে আর এখানে জেনারেল সাহেবরা সুরা সাকী নিয়ে ব্যস্ত। ভুট্টো, ইয়াহিয়া, হামিদ তিনজনই দেশের পরিস্থিতির কথা ভুলে গিয়ে মদে ডুব দিয়েছেন। তাদের ভাবসাব দেখে মনে হলো, আমাদের ধ্বংস আর কেউ ঠেকাতে পারবে না...।

আমার বলতে দ্বিধা নেই, রাজনৈতিক এবং সামাজিক অবস্থার পুনর্নির্মাণের ব্যাপারে আমরা সুস্থ মনের পরিচয় দেইনি। পূর্ব পাকিস্তানিদের আমরা সাধারণভাবে তুচ্ছ দৃষ্টিতে দেখেছি। ভেবেছি এই কালো শীর্ণকায় লোকগুলোর জাতবংশ ভালো হতে পারে না। এরা সারা হাতে মেখে ভাত খায়।

গায়ের রং-এ কি এসে-যায়? মানুষ হিসেবেই তাদের মর্যাদা প্রাপ্য ছিল। তারা আমাদের ভাই, তারা পাকিস্তানি, তাদের সঙ্গে মিমেমিশে আমাদের থাকতে হবে– যথা সময়ে এই মন্ত্রে আমরা উজ্জীবিত হতে পারিনি।

পরিশিষ্ট–য

'লাহোর থেকে কান্দাহার' প্রবাসী লেখক সৈয়দ মবনুর ভ্রমণকাহিনী বিষয়ক গ্রন্থ। তবে মবনুর সন্ধানী চোখ গ্রন্থটিকে কেবল ভ্রমণকাহিনীতেই সীমাবদ্ধ রাখে নি, নিয়ে গেছে অন্য এক উঁচুতে। ভ্রমণের পাশাপাশি সাংবাদিকতাও ছিল তার সঙ্গী। ফলে তৎকালীন আফগানিস্তানের বহুল আলোচিত তালেবান সরকারের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী–কমান্ডার এবং '৭১ নিয়ে পাকিস্তানের আলোচিত-সমালোচিত কয়েকজন রাজনীতিক-বুদ্ধিজীবী এবং অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্মকর্তার নাতিদীর্ঘ সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে এর ভেতরে লিপিবদ্ধ করেছেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়ন উঠে এসেছে তাদের প্রত্যেকের বক্তব্যে।

এরকম চারটি সাক্ষাৎকার নিচে পত্রস্থ হলো–

"বাঙালিরা আমাদেরকে ঘৃণা করে। একাত্তরে আপনাদের সঙ্গে যে অপরাধ করা হয়েছে, তা ক্ষমার অযোগ্য। মবনু সাহাব! অপনারা আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন। আপনারা মজলুম। আমরা জালেম। আপনাদের বদদোয়া আমাদেরকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। আপনি জানেন না, যারা একাত্তরে বাংলায় জুলুম-নির্যাতন করেছে, তাদের বেশিরভাগই আজ পাগল।"

প্রফেসর এহসান ইংল্যান্ডের গ্লাসকো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আন্তর্জাতিক যোগাযোগ বিষয়ে ডিগ্রি নিয়ে বর্তমানে ইসলামাবাদের কায়দে আজম বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রফেসর হিসেবে আছেন। তাছাড়া তিনি জাতিসংঘের আফগান বিষয়ক একজন কর্মকর্তা। ব্যক্তি হিসেবে অত্যন্ত সচেতন ও পরহেজগার। জাতে পাঞ্জাবি। দীর্ঘ আলাপ হলো তাঁর সঙ্গে। একাত্তর সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য আমাকে অবাক করেছে। দীর্ঘ নিশ্বাস নিয়ে বললেন, আমরা ভাই ভাই ছিলাম। আজ পৃথক হয়ে গেছি। যদি সাধারণ নিয়মে পৃথক হতাম তবু কথা ছিলো। বাঙালিরা আমাদেরকে ঘৃণা করে। একাত্তরে আপনাদের সঙ্গে যে অপরাধ করা হয়েছে, তা ক্ষমতার অযোগ্য। মবনু সাহাব! আপনারা আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন। আপনারা মজলুম। আমরা জালেম। আপনাদের বদদোয়া আমাদেরকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। আপনি জানেন না, যারা একাত্তরে বাংলায় জুলুম-নির্যাতন করেছে, তাদের বেশিরভাগই আজ পাগল।" একটি সত্য কথা বলি, যদিও আমি পাঞ্জাবি, তবুও সত্য বলতে কি? পাঞ্জাবিরা বড় অশিক্ষিত জাতি। এ জাতি তাদের অশিক্ষার কারণে সব সময় অন্যের গোলামী করেছে। তারা বড়ই তাঁবেদার গোলাম। তারা গোলামী ছাড়া আর কিছু জানে না। দীর্ঘদিন তারা ব্রিটিশের গোলাম ছিলো।

পাঞ্জাবের শিখ কিংবা মুসলমান উভয়ের ক্ষেত্রে একথা সত্য। মনিব যদি তাদেরকে এমন একটা বস্তি জ্বালাতে বলেন, যেখানে তার মা আছে, তবু জ্বালিয়ে দেবে। এরকম হুকুমের গোলাম বলেই সেনাবাহিনীতে তাদের সুযোগ বেশি। তবে জ্বালানোর পর যদি কেউ বলে, এখানে তোমার মাও ছিলো, তখন কাঁদবে। বিশ্বাস করুন, বাংলার ঘটনার জন্য আজ অনেকেই কাঁদে। আপনারা আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন।

"পাকিস্তানের সংঘাতটা ইসলাম আর নন-ইসলামের ছিলো না। এই সংঘাত ছিলো দুই সেক্যুলার ক্ষমতালোভী নেতার অর্থাৎ শেখ মুজিব আর ভুট্টোর। ইসলাম যদি পাকিস্তানে থাকতো, তবে সমস্যাই আসতো না। ইসলাম জুলুম-নির্যাতনের অনুমতি দেয়া তো দূরের কথা পাকিস্তানিয়াত অর্থাৎ জাতীয়তাবাদের পর্যন্ত অনুমতি দেয় না। দেখ, ক্ষমতা কার হাতে ছিলো। ক্ষমতা তো তার হাতেই ছিলো, যার হাতে যাওয়ার ছিলো না। আইয়ুব, ইয়াহিয়া, ভুট্টো কিংবা শেখ মুজিব ওদের কারোরই উদ্দেশ্য ইসলাম ছিল না। ব্যক্তিগত জীবনেও তারা ইসলামের আশপাশে ছিলো না।"

– মাহমুদ আলী * (পাকিস্তানের প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিক)

'ALI BROTHERS OF SUNAMGONJ' কথাটি ব্রিটিশ শাসিত ভারত বিশেষ করে আসাম প্রদেশে অত্যন্ত পরিচিতি লাভ করেছিলো। মাহফুজ আলী, মোজাহেদ আলী, মছদ্দর আলী ও মনোত্তর আলী তৎকালীন স্থানীয় এবং জাতীয় রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কিত চার ভাই। তাদের পিতা মোশাররফ আলী ছিলেন সুনামগঞ্জের একজন সুপরিচিত আইনজীবী। মাহফুজ আলী স্থানীয় রাজনীতিতেও অত্যন্ত জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। মোজাহেদ আলী রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কিত থাকলেও মূলত তিনি শিক্ষা ও সাহিত্যের সেবায় নিয়োজিত ছিলেন। বিএ পাস করে তিনি সিলেট আলিয়া মাদরাসায় শিক্ষকতা শুরু করেন। 'ঈদুল আজহা' ও 'ঝঙ্কার' নামে তাঁর দুটি বইও প্রকাশিত হয়। মছদ্দর আলী EAC ছিলেন। চাকরিরত অবস্থায়ই মারা যান। ভাইদের মধ্যে মনোত্তর আলী দীর্ঘদিন বেঁচে ছিলেন এবং বিজ্ঞ রাজনীতিবিদ ও অভিজ্ঞ পার্লামেন্টারিয়ান হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। ১৯২১ সালে প্রথমে তিনি সুনামগঞ্জ লোকাল বোর্ডের ভাইস চেয়্যারম্যান এবং পরে মিউনিপ্যালিটির চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। এই সময়েই তিনি আসাম ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হন। বিশের দশকে তিনি খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। পরে তিনি মুসলিম লীগে যোগ দিয়ে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে বিশেষ অবদান রাখেন। সাদুল্লা মন্ত্রী সভায় দুইবার আসামের মন্ত্রী

---

* মাহমুদ আলী '৭১-এর ন'মাস সক্রিয়ভাবে রাজাকারী ভূমিকা পালন করেছেন। তৎকালীন সংবাদপত্রগুলোতে এর ভূরি ভূরি প্রমাণ রয়েছে। তাই আলোচ্য সাক্ষাৎকারে মাহমুদ আলীর '৭১-এর ভূমিকা সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তরগুলো মিথ্যা প্রলাপ হিসেবেই ধরে নিতে হবে। সাক্ষাৎকারের ধারাবাহিকতা রক্ষার্থে এ জাতীয় প্রশ্নগুলো বাদ দেয়া হয়নি। – শাহোশি

ছিলেন। ১৯৪৭ সালে ভারত ভাগ হওয়ার আগ পর্যন্ত তিনি আসাম ব্যবস্থাপনা পরিষদের সদস্য ও মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারি পার্টির সেক্রেটারি ছিলেন। পাকিস্তান হওয়ার পর পূর্ব পাকিস্তান ব্যবস্থাপনা পরিষদের প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। ১৯৫১ সালে তাঁর মৃত্যুর পর পাকিস্তানের রাজনীতির এই শূন্যস্থান পূরণ করতে এগিয়ে আসেন তাঁর আপন ভাই মোজাহেদ আলী মরহুমের ছেলে মাহমুদ আলী।

মাহমুদ আলী অল্প বয়সে পিতৃহারা হওয়ায় বড় হয়েছেন চাচা মনোত্তর আলীর তত্ত্বাবধানে। ফলে, ছোটবেলা থেকেই তিনি রাজনৈতিক দিক থেকে বিজ্ঞ হয়ে ওঠেন। অন্যদিকে তাঁর দেহে ছিল বিদ্যোৎসাহী ও সাহিত্যিক পিতা মোজাহেদ আলীর রক্ত প্রবাহিত। তাই তিনি সাহিত্যের দিকেও মনোযোগী ছিলেন। তাঁর সম্পাদনায়ই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো তৎকালীন 'নও বেলাল' পত্রিকা। বর্তমানে (১৯৯৯ ইং)-ও তিনি পাকিস্তানে নিয়মিত প্রকাশ করেন The concept নামে একটি মাসিক ম্যাগাজিন।

মাহমুদ আলী তাঁর রাজনৈতিক জীবনে খুব ঘনিষ্ঠভাবে সংস্পর্শ পেয়েছেন প্রথমত নিজ চাচা মনোত্তর আলীর। এরপর শেরেবাংলা এ কে এম ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, খাজা নাজিম উদ্দিন, লিয়াকত আলী খান, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী প্রমুখের।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে যুবনেতা হিসেবে তিনি অত্যন্ত সুপরিচিত ছিলেন। আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে যে ন'জন নেতা পত্রিকায় বিবৃতি দিয়েছিলেন, তাদের অন্যতম মাহমুদ আলী। আইয়ুববিরোধী আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্ম হলে মাহমুদ আলী এদিকে অগ্রসর হননি। ফলে একাত্তরে বাংলাদেশের জন্ম হলেও মাহমুদ আলী আর নিজ জন্মভূমিতে ফিরে আসেননি এবং আসতে চেষ্টাও করেননি। আজো তিনি বাংলাদেশকে পূর্ব পাকিস্তান বলেন। স্বপ্ন দেখেন শেরেবাংলার প্রস্তাবিত পাকিস্তানের। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে তেমন ইসলামের ছাপ দেখা না গেলেও মনে-প্রাণে মুসলিম জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী। বয়স অনেক হয়েছে। এখনো পাকিস্তানের রাজনীতিতে সক্রিয়। আজীবন প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদা ছাড়াও মাহমুদ আলী এক সময় পাকিস্তানের পূর্ণ মন্ত্রী ছিলেন।

যদিও মাহমুদ আলী বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে ছিলেন, তবুও অস্বীকার করা যাবে না পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতির ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় তাঁকে বাদ দিয়ে রচনা করা যাবে না। মাহমুদ আলী এক সময় এ গ্রহ ছেড়ে চলে যাবেন। কোনোদিন যদি তাঁকে ইতিহাসের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়, তবে এক পক্ষের জবানবন্দীতেই রায় ঘোষণা করতে হবে। তাঁর ব্যাপারে সঠিক পর্যালোচনা না-ও হতে পারে। আগামী দিনের ইতিহাসের বিচারকদের সাহায্যার্থে রাজনীতিক মাহমুদ আলীর জবানবন্দী সংগ্রহের জন্য ২১ মার্চ ১৯৯৯ সালে বিকাল চারটায় উপস্থিত হলাম তাঁর ইসলামাবাদের পার্ক রোডস্থ বাসায়। আগে যোগাযোগ করা হয়েছিলো বলে তিনি অপেক্ষায় ছিলেন। আমি প্রথমে শুদ্ধ বাংলায় কথা শুরু হলেও যখন তিনি জানতে পারলেন আমি সিলেটের

ছেলে, সঙ্গে সঙ্গে বুকে জড়িয়ে নিলেন। এক হাত দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে জানতে চাইলেন, সিলেট কি কিছু উন্নত হয়েছে? সিলেটের প্রবীণ অনেকের সম্পর্কে জানতে চাইলেন। হাসতে হাসতে বললেন, "আইজ খুব খুশি লাগের অনেক দিন বাদ সিলেটি ভাষায় মাততাম পাররাম করি।" এরপর তিনি উর্দু, বাংলা, ইংরেজি, সিলেটি মিশ্রিত করে আমার বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। প্রথমে আমি জানতে চাইলাম, আপনি কি আর বাংলাদেশে যাবেন না?

চোখের পানি মুছতে মুছতে বললেন, যাওয়ার মতো অবস্থা হলে যাব। অর্থাৎ যে কারণে ছেড়েছি সেই কারণ সংশোধিত হলে যাব।

আমি জানতে চাইলাম : কারণটা কি?

মা. আলী : পাকিস্তান ভেঙ্গে যাওয়া।

– নিজের জন্মভূমি, মাতৃভূমি ত্যাগ করার জন্য এটা কি যথেষ্ট কারণ।

: তোমরা যারা পাকিস্তানের জন্ম দেখনি, তারা বুঝবে না পাকিস্তানের কি প্রয়োজন ছিলো? কেন আমরা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করেছিলাম?

– বিষয়টা একটু খুলে বলবেন কি?

: পেছন থেকে বলতে হয়। ১৭৫৭ সালে ইংরেজ বণিকরা ধোঁকাবাজী, ষড়যন্ত্র ইত্যাদির মাধ্যমে ভারত উপমহাদেশের পূর্বাংশ দখল করে নেয়। সেই সময়ে আজকের বাংলাদেশের মতো এত ছোট বঙ্গদেশ ছিলো না। সিরাজ-উদ-দৌলা যে বাংলার নবাব ছিলেন, তা ছিলো বিশাল। নবাব সিরাজকে ক্ষমতাচ্যুত করতে একদিকে ছিলো ইংরেজদের প্রবঞ্চনা, কূটকৌশল, অন্যদিকে ইংরেজদেরকে হিন্দু বণিকদের সহযোগিতা এবং সর্বশেষে নবাবের সেনাপতি মীর জাফরের বিশ্বাসঘাতকতা। এরপর একশ' বছর চলে যায়। একশ' বছর পরও ১৮৫৭ সালে বাহাদুর শাহ জাফর দিল্লির শাসক ছিলেন। তিনি সর্বশেষ মুসলিম শাসক। তাঁর সঙ্গে ব্রিটিশদের লড়াই হয়। এই একশত বছরের ইতিহাস ধোঁকাবাজী ও বিশ্বাসঘাতকতার ইতিহাস। শেষ পর্যন্ত ইংরেজরা দিল্লির সিংহাসন দখল করে। ১৭৫৭ থেকে ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত বাঙালি মুসলমানরা ইংরেজদেরকে নিস্তার দেয়নি। তারা বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছে। ১৮৫৭ সালে দিল্লির ক্ষমতা হারানোর পর বাকিরা প্রকাশ্যে ময়দানে আসেন। ১৮৮৫ সালে অল ইন্ডিয়া ন্যাশনাল কংগ্রেসের জন্ম হয়। আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা একজন ইংরেজ। দীর্ঘদিন, অর্থাৎ— উনিশ শতকের প্রথম ক' বছর ইংরেজই কংগ্রেসের সভাপতি ছিলো। ইংরেজদের উদ্যোগে যখন হিন্দুদের মধ্যে মুসলমানদের বিকল্প একটি গ্রুপ তৈরি করা হচ্ছিলো, তখন মুসলমানদের মধ্যেও চিন্তা জাগ্রত হলো আমাদেরও কিছু করা প্রয়োজন। ১৯০৬ সালে উপমহাদেশের প্রতিনিধিদের নিয়ে ঢাকায় নবাব সলিমুল্লাহ বাহাদুরের নেতৃত্বে এক বৈঠক হয়। ঢাকায় একটা শাহবাগ হোটেল আছে না? এটাই ছিলো নবাবের গার্ডেন, যেখানে সম্মেলন হয়। সেই সম্মেলন থেকেই অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগের জন্ম। এর মধ্যে অনেক ঘটনা

রয়েছে। কলকাতা অধিবাসী জাস্টিস সৈয়দ আমীর আলী মুসলমানদেরকে সংঘবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে ১৯০৬ সালের পূর্বে মোহামেডান এসোসিয়েশন করেছিলেন। তখনই তিনি অনুভব করেছিলেন, একা বাঙালি মুসলমানরা মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষা করতে পারবে না। মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার্থে সর্বভারতীয় একটি মুসলিম অর্গানাইজেশনের প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যেই মোহামেডানের জন্ম। করাচি, লাহোর, পাঞ্জাবসহ বাংলার বাইরেও অনেক এলাকায় মোহামেডানের শাখা ছিলো। কিন্তু সৈয়দ আমীর আলী প্র্যাকটিস করতে লন্ডন চলে যান। ফলে মোহামেডানের কাজ বন্ধ হয়ে যায়। তবে মোহামেডানের এক্সটেনশন বলা যায় এই অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগকে। নবাব সলিমুল্লাহর নেতৃত্বে যখন মুসলিম লীগের জন্ম হয়, তখন শেরেবাংলা আবুল কাসেম ফজলুল হক যুবক। তিনিই সংগঠনের নীতি-আদর্শের ড্রাফট প্রথম লিখেন। নবাব বিকারুল মুল্ক, নবাব মুহসিনুল মুল্ক প্রমুখ ব্যক্তিও ইউপি, বিহার থেকে উপস্থিত হয়েছিলেন এই সভায়। তখনো কংগ্রেসের সঙ্গে মুসলমানদের ভালো সম্পর্ক ছিল। মাওলানা মোহাম্মদ আলী জওহর, মাওলানা শওকত আলী, কায়েদে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ, আল্লামা ইকবাল প্রমুখ তখনও কংগ্রেসে। মাওলানা মোহাম্মদ আলী খেলাফত আন্দোলন শুরু করলে এতে গান্ধীজীও যোগ দেন। অল ইন্ডিয়া কংগ্রেসের এক অধিবেশনে মাওলানা মোহাম্মদ আলী জওহর সভাপতিত্ব করলেন। তবুও মুসলমানরা যখন দেখলো, হিন্দুরা মুসলমানদের কোনো অধিকার দিতে রাজি নয়। তখন শুরু হয় ভিন্ন চিন্তা। কংগ্রেসের স্টেইজেই আল্লামা ইকবাল বলেছিলেন- "সারে জাহাঁ সে আচ্ছা/ হিন্দুস্তাঁ হামারা/ হাম উস্‌কে বুলবুলি হে/ ও গুলিস্থাঁ হামারা।" এই আল্লামা ইকবাল যখন দেখলেন হিন্দুরা মুসলমানদের সঙ্গে বৈষম্য নীতি অনুসরণ করছে তখন গাইলেন :

"চীন ও আরব হামরা/ হিন্দুস্তাঁ হামরা/ তৌহিদ কী আমানত সীনূ মে হে হামারে।"

এইভাবে ধাপে ধাপে মুসলমানরা অগ্রসর হতে লাগলো। প্রথমে তো শুধু ইংরেজকে শত্রু মনে করা হতো; কিন্তু পরে দেখা গেলো হিন্দুরাও বন্ধু নয়। মাওলানা মোহাম্মদ আলী জওহর বলতেন, "যদি আমি মহানবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর কোনো মানুষকে শ্রদ্ধা করে থাকি, তবে তিনি মহাত্মা গান্ধী।" কিন্তু যে দিন তিনি বুঝলেন, হিন্দুদের ষড়যন্ত্রের কথা উপলব্ধি করলেন, সেদিন নিজেই ঘোষণা করলেন- "গান্ধীরা চায় না ইন্ডিয়া স্বাধীন হোক। তারা চায় মুসলমানদেরকে হিন্দু মহাসভায় গোলাম করে রাখতে।"

এইভাবে পৃথক চিন্তা শুরু হয়। এরপর দীর্ঘ ইতিহাস। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ এক প্লাটফরমেও এসেছিলো। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ কংগ্রেসকে ১৪টি পয়েন্টও দিয়েছিলেন। কিন্তু কংগ্রেস তা গ্রহণ করলো না। এভাবে যেতে যেতে ১৯৪৬ সালে ইংরেজরা কেবিনেট মিশন প্লান দিলো। এতে A, B, C এই তিন গ্রুপের কথা বলা হলো। A আর C গ্রুপে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা আর এক গ্রুপে অর্থাৎ B-তে রেস্ট অফ ইন্ডিয়া। ফলে তারা মেজরিটি হয়ে গেলো। এদিকে যখন ইংরেজ ও হিন্দুরা

কিছুতেই মুসলমানদের দাবিতে কর্ণপাত করছিলো না, তখনই (১৯৪০ সালে) পাকিস্তান প্রস্তাব পাস হয়ে যায় লাহোরের মুসলিম লীগ অধিবেশনে। কিন্তু এরপরও ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত অখণ্ড ভারতের চেষ্টা করা হয়। সে দিনগুলোর প্রায় সব মিটিং-এ আমি উপস্থিত ছিলাম। ১৯৪৬ সালের কেবিনেট মিশন প্লান মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস উভয়ই গ্রহণ করে নেয়। কিন্তু জওহর লাল নেহেরু কংগ্রেস কমিটির মিটিং-এ বলেছিলেন, "মুসলমানদের দাবি সময় সাপেক্ষ বিবেচনা করা হবে।" জিন্নাহ বুঝলেন ওরা মুসলমানদেরকে কিছুই দেবে না। নিজেদের দাবি নিজেদেরই আদায় করতে হবে। যে কোনোভাবে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

– পাকিস্তান প্রস্তাবে তো বাংলাদেশের কথা ছিলো না?

: পাকিস্তান রেজুলেশন পড়লে দেখতে পাবে শেরেবাংলার বক্তব্যে ছিলো— "আমরা ভারত উপমহাদেশে মুসলমানদের একটি শক্তি সঞ্চয় করতে চাই। আর তা তখনই সম্ভব যখন সংঘবদ্ধ হয়ে চেষ্টা করবো। নতুবা সম্ভব হবে না।" শেরেবাংলা অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। গোটা ভারতবর্ষে তাঁর তুল্য উকিল খুব কম ছিলো। যদি হিন্দু ধর্মের মতোই ইসলামেও দেবতা তৈরির বিধান থাকতো, তবে বাঙালি মুসলমানেরা শেরেবাংলাকে দেবতা মানতো। বাঙালি সমাজে তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। সেই লোক বাঙালির স্বার্থের বিরুদ্ধে কোনো কদম উঠাতে পারেন না। উঠানওনি। জীবনে যা করেছেন, বাঙালির জন্যই করেছেন। আর লাহোর প্রস্তাবটাই ছিলো পাকিস্তানের মূল ভিত্তি।

– শেরেবাংলার লাহোর প্রস্তাবানুসারে তো পাকিস্তান হয়নি?

: লাহোর প্রস্তাবানুসারে আন্দোলন শুরু হলে হিন্দুরা প্রশ্ন উপস্থাপন করলো, জিন্নাহ ক'টি পাকিস্তান চায়? এই প্রশ্নের ভেতর ছিলো হিন্দুদের বিরাট ষড়যন্ত্র। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এই ষড়যন্ত্রকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিলেন দিল্লির রেজুলেশন পাস করে। আর সেই অনুসারেই পাকিস্তানের জন্ম।

– দিল্লির রেজুলেশনে কি ছিলো ?

: ব্রিটিশরা ১৯৪৬ সালে সর্বভারতে একটি নির্বাচন দিয়ে বললো, এতে যদি মুসলিম লীগ বিজয়ী হয়, তবে বোঝা যাবে, মুসলমানরা পাকিস্তান চায়। সেই নির্বাচনে যুক্ত বাংলায় মুসলমানদের শতকরা ৯৭টি ভোট মুসলিম লীগের পক্ষে যায়। যে সব এলাকায় মুসলিমরা সংখ্যালঘু, সেখানেও মুসলমানদের প্রায় সব ভোট মুসলিম লীগের পক্ষে আসে। লাহোর প্রস্তাবে বলা হয়েছিলো, ভারত মহাদেশের উত্তর, পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব এলাকায় যেখানে মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে, সেই দু'এলাকা নিয়ে পাকিস্তান হবে। লাহোর প্রস্তাবে ছিলো এই দুই অঞ্চলের পাকিস্তান স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য নিয়ে দাঁড়াবে। শুধু বিশেষ বিষয়ে ঐক্য থাকবে। কিন্তু হিন্দুরা এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করলে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী প্রস্তাব করেন উভয় পাকিস্তানকে এক কেন্দ্রের অধীনে নিতে।

– আমরা জানি পাকিস্তানের স্বপ্নদ্রষ্টা ছিলেন আল্লামা ইকবাল এবং এর নক্সা তৈরি করেছেন চৌধুরী রহমত আলী। স্বপ্ন ও নক্সায় নাকি বাংলাদেশ ছিলো না। আমাদের প্রশ্ন, পরে এই বাংলাদেশ যুক্ত হলো কিভাবে?

: অজ্ঞরাই এসব বাজে কথা বলে। যারা অধ্যয়ন কম করেছে, তারাই এসব বলতে পারে। ১৯২৩ ইংরেজিতে আল্লামা ইকবাল এক ভাষণে 'বাই দ্যা ওয়ে' বলেছিলেন। তা ছিলো শুধু ধারণা। স্পষ্ট কোনো কথা ছিলো না। পাকিস্তান রেজুলেশন পাস হয়েছে ১৯৪০ সালে। চৌধুরী রহমত আলীর নক্সায় ছিলো ভারতবর্ষে তিনটি মুসলিম রাষ্ট্রের কথা : (১) হায়দারাবাদ ইত্যাদি নিয়ে নিজামীস্তান; (২) বাংলা ও আসাম ইত্যাদি নিয়ে বাংগীস্তান এবং (৩) পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচি ইত্যাদি নিয়ে পাকিস্তান।

পাকিস্তানের উল্লেখ লাহোর রেজুলেশনেও ছিলো। এই পাকিস্তান নামের জনপ্রিয়তা তখনই আছে, যখন লাহোর রেজুলেশন পাস হওয়ার পর হিন্দুরা চিৎকার শুরু করলো, "লাহোর রেজুলেশনের অর্থই পাকিস্তান।"

– পাকিস্তান শব্দের ভেতরও তো বাংলা নেই?

: অনেক কিছুই তো নেই। PAKISTAN হলো P দিয়ে পাঞ্জাব, K দিয়ে কাশ্মীর এবং স্তান আনা হয়েছে বেলুচিস্তান থেকে। এখানে সিন্ধের নাম নেই। বিষয়টা তোমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে চৌধুরী রহমত আলীর পাকিস্তান সম্পর্কিত বই পড়লে। দেখ ১৯৪০-এর আগে পর্যন্ত বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কথা এসেছে। কিন্তু এগুলোর কোন অর্থ নেই। মূল কথা হয়েছে ১৯৪০-এর লাহোর অধিবেশনে। তোমরা নিশ্চয় হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর কথা জানো। তিনি কিভাবে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব আবিষ্কার করেছিলেন। সূর্য, চন্দ্র, পাহাড় যা দেখেছেন প্রথমে ওসবকে আল্লাহ্‌ ভেবেছেন। কিন্তু এগুলো যখন মিলিয়ে যেতো, তখন ভাবতেন, না আরো শক্তিশালী কেউ আছেন। এভাবেই তিনি প্রকৃত আল্লাহকে জেনেছিলেন। তেমনি পাকিস্তানও অস্তিত্বে এসেছে খণ্ড খণ্ড ভাবনার ভেতর দিয়ে। প্রকৃত পাকিস্তানের ধারণা এসেছে লাহোর অধিবেশনে। এর ভিত্তিতেই আন্দোলন হয়েছে। ইতোপূর্বে কোনো আন্দোলন হয়নি। ১৯৪০-এর আগে অর্থাৎ ১৯৩৮ সালে আল্লামা ইকবাল দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে চলে গেছেন।

১৯৩৭ সালে জিন্নাহ সাহেব লন্ডনে থাকাকালীন সময়ে আল্লামা ইকবাল চিঠিতে বলেছিলেন, 'আপনি চিন্তা করে দেখুন, বর্তমান ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলন যে ধারায় চলছে, তাতে মুসলমানদের কোনো আগ্রহ নেই এবং থাকতে পারেও না। কারণ মুসলমানরা বিগত দেড়শ' বছর ইংরেজ কর্তৃক শোষিত হওয়ার কারণে অর্থনৈতিকভাবে একেবারে দুর্বল হয়ে পড়েছে। তারা মানুষের মতো জীবনযাপনের উপযোগী হয়নি। তাদেরকে উদ্ধারের যদি কোনো রাস্তা না দেখান, তাহলে তারা স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগ দেবে না। মুসলমানদের অবস্থা উন্নত করা সম্ভব, যদি তাদের জন্য পৃথক কোনো রাষ্ট্র গড়ে সেখানে ইসলামী অর্থনীতি চালু করা হয়। সর্বভারতে তা মোটেও সম্ভব নয়। জওহর লাল নেহেরু সমাজতন্ত্রের কথা বললেও ভারতে তা সম্ভব নয়। কারণ হিন্দু

সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুস্তান বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত। হিন্দু ধর্মশাস্ত্রে মানুষে মানুষে যে ব্যবধানের পদ্ধতি রয়েছে, তা থেকে হিন্দুরা কখনো বেরিয়ে আসতে পারবে না। ফলে ধর্মীয়ভাবেই হিন্দুদের মধ্যে ক্যাপিটেলিজম প্রতিষ্ঠিত। হিন্দুরা এ প্রাচীর কোনোদিন ভাংতে পারবে না। কিন্তু ইসলামী শরিয়ত অনুযায়ী যদি সম্পদের মুনসিফানা বণ্টন হয়, তবে মুসলমানদের আপত্তি করার কথা নয়। তাই আপনি চেষ্টা করতে পারেন, যাতে হিন্দু ও মুসলমানদের পৃথক পৃথক রাষ্ট্র হয়ে যায়। আর এই আন্দোলনের নেতৃত্ব একমাত্র আপনিই দিতে পারেন।"

আল্লামা ইকবাল যে সব চিঠি জিন্নাহর কাছে দিয়েছিলেন, তা প্রকাশিত হয়েছে। বাজারে আছে, পড়ে দেখতে পার। জিন্নাহ সাহেব তখনো কায়েদে আজম হননি। লন্ডন থেকে ফিরে তিনি মুসলিম লীগের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। এরই মধ্যে আল্লামা ইকবাল মারা গেলেন। তাঁর মৃত্যুর দু'বছর পর লাহোর অধিবেশনে পৃথক রাষ্ট্রের রেজুলেশন পাস হলো।

– আপনাদের দাবি ছিলো মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকাসমূহ নিয়ে পাকিস্তান গঠন। আমাদের প্রশ্ন হলো, যে সব এলাকায় মুসলমানরা সংখ্যালঘু, তাদের অবস্থা কি হতো?

: মুসলিম সংখ্যালঘু এলাকার মুসলমানরা জানতো তাদের জন্য পাকিস্তান হবে না; তবে পাকিস্তান তাদের আশ্রয়স্থল হবে।

– পাকিস্তান আন্দোলনে বাঙালিদের ভূমিকা কেমন ছিলো?

: পাকিস্তান আন্দোলনে বাঙালি মুসলমানদের ভূমিকা ছিল সর্বাগ্রে। বাঙালি মুসলমানরা আগ্রহী না হলে সেদিন পাকিস্তানই হতো না। বাঙালি মুসলমানরা যেভাবে পাকিস্তান আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, পশ্চিম পাকিস্তানের মুসলমানরা সেভাবে পারেনি। যার বাস্তব প্রমাণ ১৯৪৭-এর আগে একমাত্র বাংলায়ই মুসলিম লীগের একক মন্ত্রী পরিষদ ছিল। পাকিস্তানের মূল অংশ পাঞ্জাবেও মুসলিম লীগ-কংগ্রেস যৌথ মন্ত্রী পরিষদ ছিল। আসামেও মুসলিম লীগের মন্ত্রী পরিষদ ছিল।

– যে বাঙালি মুসলমান কর্তৃক মুসলিম লীগ ও পাকিস্তানের জন্ম, শেষ পর্যন্ত সেই বাঙালি মুসলমানদের সঙ্গে পাকিস্তানের সংঘাত কেন?

: পাকিস্তানের সংঘাত নয়। সংঘাত শাসক ও নেতাদের। এই সংঘাত শুধু বাঙালি মুসলমানদের সঙ্গে নয়। অন্যদের সঙ্গেও হয়েছে। যেহেতু বাংলা দেড় হাজার মাইল দূরে, তাই তারা এই সংঘাত বেশি উপলব্ধি করেছে।

– পাকিস্তানের উদ্দেশ্য কি ছিলো ?

: এখানে দু'টি দিক ছিল। একটা দিক স্পষ্ট হয়ে উঠেছে আল্লামা ইকবাল যে পত্র জিন্নাহকে দিয়েছিলেন তাতে। অর্থাৎ ইসলামী অর্থনীতির ভিত্তিতে সম্পদের মুনসিফানা বণ্টন। দ্বিতীয়ত, আমরা যারা আন্দোলন করেছি, তাদের স্বপ্ন ছিলো 'খেলাফত আলা মিনহাজিন নুবুওয়াহ' অর্থাৎ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় যে অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি, শিক্ষানীতি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, পাকিস্তানেও তা-ই প্রতিষ্ঠিত করা। মোটকথা এই দুই উদ্দেশ্যেই পাকিস্তানের জন্ম।

– কার্ল মার্ক্স দর্শনের মূল কথা হলো, মানুষের প্রধান সমস্যা হলো অর্থনৈতিক। তাই দেখা যায়, কার্ল মার্ক্সের সব আলোচনা অর্থনৈতিক সীমার ভেতর আবদ্ধ। কম্যুনিস্ট আন্দোলনের মতো কি পাকিস্তান আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য অর্থনৈতিক উন্নয়ন ছিলো?

: না। অন্য বিষয়সমূহও ছিল। কিন্তু মসজিদে যাওয়া, নামাজ পড়া, ইবাদত করার মধ্যে তো কখনো বাধা সৃষ্টি হয়নি। ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষে ইংরেজ ও হিন্দুরা যৌথভাবে মুসলমানদের বেশি ক্ষতি করেছে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে। তাই এটাকে আমরা প্রধান ইস্যু মনে করতাম। অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান একমাত্র ইসলামই দিতে পারে। কার্ল মার্ক্স বা সমাজতন্ত্র মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান দিতে চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছে। ফলে তাদের অস্তিত্ব আজ ধ্বংসপ্রায়।

– পাকিস্তানের সঙ্গে যোগ দেওয়ার ব্যাপারে পূর্ব পাকিস্তানের অন্য কোনো অঞ্চলে গণভোট হলো না, শুধু সিলেট হলো। এখানে স্বাতন্ত্র্যটা কি?

: পাকিস্তান আন্দোলনের কারণে আমি তখন জেলে। মুক্তি পেয়ে শুনলাম সিলেটে গণভোট হবে। চলে আসি সিলেটে। ঘটনা হচ্ছে, ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগ সিলেটে বিজয়ী হয়। কিন্তু জওহর লাল নেহেরু এই বিজয়কে অস্বীকার করলেন।

কোন্ যুক্তিতে?

: মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানীর জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ ছিলো কংগ্রেসের পক্ষে। গোটা সিলেটে তাঁর প্রচুর শিষ্য-ভক্ত রয়েছে। (আমার দিকে ইংগিত করে) তোমাদের গ্রাম সৈয়দপুরেও মাওলানার প্রচুর ভক্ত ছিলো। সিলেটের নয়া সড়কে মাওলানা নামাজ পড়াতেন। ১৯৪৬-এর নির্বাচনে তিনি মুসলিম লীগের মোকাবেলায় প্রত্যেক আসনে প্রার্থী দেন। অবশ্য একটিতেও বিজয়ী হতে পারেননি। তখন নেহেরু দাবি করলেন, যদিও মুসলিম লীগকে বাহ্যত বিজয়ী মনে হচ্ছে, কিন্তু কংগ্রেস ও জমিয়তের ভোট এক করলে ভারতের পক্ষে ভোটের সংখ্যা বেশি হবে। তাই সিলেটকে ভারতের সঙ্গে রাখা হোক। তখন কায়েদে আজম এই বলে চ্যালেঞ্জ করলেন, আচ্ছা এটাই যদি হয় তোমাদের দাবি, তবে গণভোটের মাধ্যমে পরীক্ষা করে দেখ। সত্যিই গণভোট দেওয়া হলো। প্রথমে আমরা যত ভোট পেয়েছিলাম, গণভোটে তা থেকে অনেক বেশি পেলাম।

– লাহোর অধিবেশনে পাকিস্তান রাষ্ট্রের যে ম্যাপের আলোচনা হয়েছিলো, সে অনুযায়ী কি পাকিস্তান হয়েছে?

: না।

– কেন?

: ইংরেজ ও হিন্দুরা যখন বুঝলো মুসলমানরা সত্য সত্য পৃথক রাষ্ট্র চায়, পাকিস্তান চায়, তখন তারা দাবি মেনে নিলো সত্য, কিন্তু ভাগ-বন্টনের সময় ধোঁকাবাজি করল। আমরা লাহোর রেজুলেশনে বলেছিলাম, ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব এলাকার যেখানে মুসলিম মেজরিটি, তা নিয়ে পাকিস্তান হবে। তুমি যদি সে দিনের ম্যাপ দেখ, তবে

বুঝবে। আমরা চেয়েছিলাম সম্পূর্ণ সীমান্ত। সিন্ধু, বেলুচিস্তান, কাশ্মীর, হিন্দুস্তানের উত্তর প্রদেশে একটা অঞ্চল আছে সাহরানপুর— যা পাঞ্জাবের সঙ্গে মুসলিম মেজরিটি হিসেবে ছিল। অন্যদিকে উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে মুসলিম মেজরিটি ছিলো সমস্ত বাংলা, আসাম এবং বিহারের পূর্ণিয়া জেলা, যাদের ভাষাও বাংলা। এই ছিলো আমাদের দাবির পাকিস্তান। কিন্তু হিন্দু আর ইংরেজ মিলে আমাদের দাবি না মেনে কেটে-ছেঁটে একটা বুঝ দিতে চেষ্টা করলো। পাঞ্জাব কেটে অর্ধেক দিলো পাকিস্তানকে, কাশ্মীরে তো একটা সংঘাত স্থায়ীভাবেই সৃষ্টি করে গেলো। সাহরানপুর দিলোই না। তেমনি বাংলাকে ভেঙ্গে এক অংশ ভারতকে দিয়ে দিলো। মুর্শিদাবাদ মুসলিম মেজরিটি, কিন্তু তা পাকিস্তানকে দিলো না। আসামের আড়াই থানা কেটে হিন্দুস্তানকে দিল, শুধু সিলেট দিলো পাকিস্তানকে।

– জিন্নাহ সাহেব তা মানলেন কেন?

: প্রতিবাদ করেছেন। শেষ পর্যন্ত বলেছেন, পাকিস্তান যখন স্বীকার করা হয়েছে, তখন একদিন বাকি অংশগুলো আসবেই।

– আসলো তো না, বরং ভাঙলো।

: পাকিস্তান হওয়ার এক বছরের মধ্যে জিন্নাহ মারা গেলেন। তাঁর পরে পাকিস্তানের নেতৃত্ব দেওয়ার মতো যিনি যোগ্য ছিলেন, সেই কায়েদে মিল্লাত লিয়াকত আলী খানকেও শত্রুরা ১৯৫১ সালে গুলি করে হত্যা করলো। তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছো যে, লিয়াকত আলী খান পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচিত প্রতিনিধি ছিলেন। এরপর প্রধানমন্ত্রী হলেন খাজা নাজিম উদ্দিন। কায়েদে আজমের পর তিনি গভর্নর জেনারেল ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের পর তিনি মুসলিম লীগের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। সেই হিসেবে তিনি দলের পার্লামেন্টারি গ্রুপের নেতা ও প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। সেই সময় গোলাম মোহাম্মদ ছিলেন গভর্নর জেনারেল। সে খাজা নাজিম উদ্দিনের মন্ত্রী পরিষদ ভেঙ্গে দিল। যদিও ভেঙ্গে দেওয়ার কোনো অধিকার তার ছিল না। এই থেকে শুরু হলো সমস্যা। তুমি জানতে চেয়েছিলে বাঙালিদের সঙ্গে সমস্যা হলো কেন। আসলে সমস্যা শুধু বাঙালিদের সঙ্গে নয় বরং সবার সঙ্গে। খাজা সাহেবের এক অবসরপ্রাপ্ত জজ বন্ধু প্রশ্ন করেছিলো :

খাজা সাহেব, আপকে ছাথ এয়ছা কেউ হুয়া?

তিনি বলেছিলেন, "আমি পাকিস্তানকে পিএল ফর এইট্রির গন্ধমের বিনিময় বিক্রি করতে অস্বীকার করেছিলাম। তাই আমাকে বের করে দেওয়া হয়েছে।"

এ কথাটা নোট কর। এটা খাজা সাহেবের নিজের কথা। এখন কথা হলো একজন গণপ্রতিনিধিকে বহিষ্কারের অধিকার তাকে কে দিলো? এটা কোন্ শক্তি? গোলাম মোহাম্মদ পার্লামেন্টের সদস্য পর্যন্ত ছিলো না। সে কোন অধিকারে খাজা সাহেবকে বহিষ্কার করলো? খাজা সাহেবের বক্তব্য থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, গোলাম মোহাম্মদের শক্তির উৎসের কথা। তার শক্তি ছিলো আমেরিকা। পর্দার পেছনে থেকে আমেরিকা কাজ করেছে। তাকে সাহস দিয়েছে আইয়ুব খান। সে ছিলো তখন সেনাবাহিনী প্রধান।

বুঝতে পারছো তুমি ব্যাপারটা? আইয়ুব খানের কাঁধে সোয়ার হয়েছিলো আমেরিকা। আমেরিকা ও আইয়ুব মিলে গোলাম মোহাম্মদকে শক্তি দিয়েছে। তাই আইনত অশুদ্ধ কাজ সে করতে সাহস পেয়েছে।

– যদি তা আইনত অশুদ্ধ হয়, তবে খাজা সাহেব বা তাঁর দল এর বিরুদ্ধে আন্দোলনে গেলেন না কেন?

: খাজা সাহেব অত্যন্ত শরীফ আদমী ছিলেন। সেই সময়ে আমি যুবক। নুরুল আমীন সাহেবরা তখন নেতা। আমি নুরুল আমীন সাহেবকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আপনারা সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকার পরও তা সহ্য করতে গেলেন কেন?

তিনি বললেন, আমরা সহ্য করতে চাইনি। খাজা সাহেব এই বলে আমাদেরকে থামিয়ে দিলেন— "যদি তোমরা এ নিয়ে লড়াই কর, তবে সেনাবাহিনীর শাসন এসে যাবে।"

– গোলাম মোহাম্মদের বেআইনী কাজের বিরুদ্ধে কোনো মামলা হয়েছিলো কি?

: খাজা সাহেব ক্ষমতার লড়াই-এ-কোর্টে যেতে লজ্জাবোধ করলেন। তবে মৌলভী তমিজ উদ্দিন খান চিফ কোর্টে মামলা করেছিলেন। মৌলভী তমিজ উদ্দিন আমাদের লোক ছিলেন। তিনি ব্রিটিশবিরোধী খেলাফত আন্দোলনের সময় এবং পাকিস্তান আন্দোলনের সময় জেলে ছিলেন। অত্যন্ত উঁচু মাপের নেতা ছিলেন। পাকিস্তান গণপরিষদের প্রথম প্রেসিডেন্ট কায়দে আজম এবং দ্বিতীয় প্রেসিডেন্ট মৌলভী তমিজ উদ্দিন খান। চিফ কোর্ট রায় দিল, "গোলাম মোহাম্মদ আইন অশুদ্ধ কাজ করে অন্যায় করেছে। তার সিদ্ধান্তকে বাতিল করা হলো।" এরপর আবার আপীল করা হলো। শেষ পর্যন্ত উচ্চ আদালত বললো— যেহেতু CONSTITUTION ASEMLE বাতিল করা হয়ে গেছে, তাই এটাকে আবার ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়। তাই দ্বিতীয়বার CONSTITUTION ASEMLE গঠন করা হোক। পাকিস্তানে তখনো কোনো সংবিধান ছিলো না। দ্বিতীয় CONSTITUTION ASEMLE-তে শেরেবাংলা এ কে এম ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, আমি ও শেখ মুজিবুর রহমান মেম্বার ছিলাম। এতে একটি আইন পাস হয়েছিলো, যা ১৯৫৬ CONSTITUTION হিসেবে পরিচিত। যা কার্যকর হয়েছিলো ২৩ মার্চ ১৯৫৬ সালে। এই আইনের অধীনে নির্বাচন হওয়ার কথা থাকলেও হয়নি। ফিরোজ খান নুন প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। সোহরাওয়ার্দীও প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। বগুড়ার চৌধুরী মোহাম্মদ আলীও প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। নির্বাচনের তারিখ দেওয়া হলো ১৯৫৯ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারিতে। নির্বাচনের মাধ্যমে সাধারণ জনতার কাছে ক্ষমতা যাবে। এর আগে জনতার হাতে ক্ষমতা যাওয়া সম্ভব ছিলো না। পাকিস্তানের কোনো সংবিধানই ছিলো না। সংবিধান রচনা করার পর নির্বাচনের ঘোষণা দেওয়া হলো।

– সংবিধান কখন রচিত হয়?

: ১৯৫৬ সালের ২৩ মার্চ কার্যকর হয়।

– ১৯৫৬ সালে সংবিধান কার্যকর হলো; অথচ নির্বাচন দেওয়া হলো ১৯৫৯ সালে। ব্যাপার কি?

: ১৯৫৬, '৫৭, '৫৮ যাওয়ার পর আমরা বিষয়টা তাঁর কাছে তুলে ধরলে তিনি বললেন, আমার রিপোর্ট মতে এখন নির্বাচন দিলে খুন-খারাবী হওয়ার সম্ভাবনা আছে। বললাম, আমরা তো খুন-খারাবীর সম্ভাবনা দেখি না। তবু যদি তোমার পর্যবেক্ষণ এমন হয়, তবে সব রাজনৈতিক দলকে ডেকে তাদের সামনে প্রস্তাবটা রাখ।

এরপর ফিরোজ খান নুন সব পার্টির লোককে ডাকলো। ১৯৫৮ সালে সেপ্টেম্বর মাসে করাচির সিন্ধু এসেম্বলি হাউসের বৈঠক থেকে ফিরোজ খানকে সর্বসম্মতিক্রমে বলা হলো, আপনি নির্বাচন দিন বাদ-বাকি দিক আমরা দেখবো। কোনো খুন-খারাবী হবে না।

– সেই সম্মেলনে তখনকার পূর্ব পাকিস্তান অর্থাৎ আজকের বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে কে কে ছিলেন?

: নেতৃত্ব পর্যায়ে ছিলেন শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। ইয়ংদের মধ্যে আমি আর শেখ মুজিব।

– কিন্তু শেষ পর্যন্ত তো নির্বাচন হলো না?

: এই ঘোষণার কয়েকদিন পর ৭ অক্টোবর রাতের অন্ধকারে আইয়ুব খান ক্ষমতা দখল করে সামরিক শাসন জারি করে। ওই যে আমি বলেছিলাম শক্তির কথা, সেই শক্তির কেন্দ্র এই। সামরিক আইনের মধ্য দিয়ে এসেম্বলি, মিনিস্ট্রি সবই ভেঙ্গে দেওয়া হলো। পূর্ব পাকিস্তানে আতাউর রহমান খানের মন্ত্রী পরিষদ ছিলো। তাও ভেঙ্গে দেওয়া হলো। অন্যান্য প্রদেশেরও একই অবস্থা। ফিরোজ খানের কাছ থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়া হলো।

গোলাম মোহাম্মদের মৃত্যুর পর ইসকান্দর মির্জা প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তোমরা হয়তো অনেকেই জানো না যে, ইসকান্দর মির্জা মীর জাফরের বংশের লোক। আইয়ুব খান তার স্বাক্ষর নিয়েই সামরিক শাসন জারি করেছিলো। আর বিশ দিন পর কানে ধরে তাকে বের করে দেয়া হয়েছিল। ১৭৫৭ সালে মীর জাফরের সঙ্গেও ইংরেজরা অনুরূপ কাণ্ড ঘটিয়েছিল। ব্যবধান শুধু মীর জাফরকে ক্লাইভ বের করে দিয়েছিলো তিন মাস পর আর ইসকান্দর মীর্জাকে আইয়ুব খান বের করে দিয়েছে বিশ দিন পর। সামরিক শাসনই পাকিস্তান ভাঙ্গার মূল কারণ।

– তাহলে কি আপনি বলতে চান মূল সমস্যার জন্য দায়ী আইয়ুব খান?

: হ্যাঁ। আমি আজো এদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের জনসভায় বলে থাকি যে, পাকিস্তান ভাঙ্গার জন্য যদি কোনো ব্যক্তিকে দায়ী করতে হয়, তবে সে আইয়ুব খান। হি ইজ দ্যা কালপ্রিট। যদি সে সামরিক শাসন জারি না করতো, তবে এতো সমস্যা হতো না। নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতার পরিবর্তন হতো। ফলে আমরা বাঙালি মুসলমান এতটুকু মনোক্ষুণ্ন হতাম না। পশ্চিম পাকিস্তানের লোকেরাও মনোক্ষুণ্ন হয়েছে, কিন্তু বাঙালিরা দূরত্বের কারণে বেশি হয়েছে। বাঙালিদের মনোক্ষুণ্ন হওয়ার অন্য কারণ হলো অফিস-আদালত ও সেনাবাহিনীতে বেশি ছিলো পশ্চিম পাকিস্তানের লোক। একদিকে

দূরত্বের কারণে বাঙালিরা কেন্দ্রে কম ছিলো, অন্যদিকে পাকিস্তান হওয়ার পর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে উর্দুভাষী যারা এসেছে, তারা অনেকটা যোগ্যতাসম্পন্নও ছিলো। উদাহরণ হিসাবে তোমরা দেখতে পার, পাকিস্তানের জন্মলগ্নে, অর্থাৎ ১৯৪৭-এ আমাদের বাঙালি একজন সিএসপিও ছিলো না। মাত্র একজন আইসিএস ছিলেন। তাও তিনি ছিলেন নমিনেইটেড।

– তাঁর নামটা কি স্মরণ আছে?

: নুরুন নবী চৌধুরী। এই একটি মাত্র লোক ছিলেন বাঙালি। অথচ তখন পশ্চিম পাকিস্তানে শত শত যোগ্য লোক উচ্চপদে ছিলো। সেনাবাহিনীতে কোনো অফিসার ছিলো না আমাদের।

– কারণ কি?

: কারণ একটাই, ইংরেজ ওপরে ওঠার সুযোগ আমাদের দেয়নি।

বাঙালি মুসলমানদেরকে তারা দমন করে রেখেছে। ১৭৫৭-তে ইংরেজরা বাংলার ক্ষমতায় বসে প্রথমে। মুসলমানদেরকে অর্থনৈতিকভাবে তারা পর্যুদস্ত করে।

– মুসলমান ছাড়াও তো বাঙালি ছিলো। শুধু মুসলমানদেরকে তারা দমন করলো কেন?

: বাঙালি মুসলমানদের প্রতি তাদের আক্রোশ ছিলো।

– ভারতবর্ষে বাঙালি মুসলমান ছাড়া তো আরো মুসলমান ছিলো। তাদের প্রতি কেন ইংরেজদের আক্রোশ নেই? বিশেষ করে পাঞ্জাবি?

: হ্যাঁ, ছিলো বটে। কিন্তু তারা ততটা ইংরেজদের বিরোধিতা করেনি, বরং অনেক ক্ষেত্রে সহযোগিতা করেছে। ১৮৫৭ সালে অনেক পাঞ্জাবি ইংরেজদের পক্ষে কাজ করেছে। ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে পাঞ্জাবি মুসলিম ও শিখ ছিলো প্রচুর। সিন্ধের লোক ছিলো না। ফ্রন্টইয়ার থেকেও কিছু কিছু ছিলো। বাঙালিকে সেনাবাহিনীতে ইংরেজরা নিতো না। কারণ বাঙালিরা কখনো ব্রিটিশের সঙ্গে আপোষ করেনি; বরং সর্বদা সংগ্রাম করেছে। তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা, হাজী শরিয়তুল্লাহর ফারায়েজী আন্দোলন, ফকির মজনু শাহর ফকির বিদ্রোহ—এভাবে আন্দোলনের পর আন্দোলন চলেছে। এদিকে ইংরেজরাও ক্ষমতায় বসে বাঙালি মুসলমানদেরকে অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত করে ফেলে। মুসলমানদের যার কাছে যা ছিলো, তা ইংরেজরা কেড়ে নিয়ে তাদের তাঁবেদার হিন্দুদেরকে দিয়ে দিলো। মসলিন কাপড়—যার চল্লিশ গজ এক মুষ্ঠিতে সামলানো যেত—বাঙালি মুসলমানরাই তা তৈরি করত। ইংরেজরা কারিগরদের হাত কেটে দিলো। দু'শ' বছরের শোষণ-নির্যাতনের পর যেদিন স্বাধীন হলাম, সেদিন আমরা পশ্চিম পাকিস্তান থেকে অনেক পেছনে ছিলাম। আমি বললাম না, মাত্র একজন বাঙালি নমিনেইটেড আইসিএস ছিলেন।

১৯৩৭-এর পর শেরেবাংলা প্রধানমন্ত্রী হলে সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমানদের সমান সমান করলেন। এর আগে বাংলার মুসলমানরা সরকারি কোনো চাকরিতে সুযোগ

পেতেন না। ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত এই দশ বছরের সামান্য সময়ে মুসলমানরা শিক্ষার দিকে তেমন অগ্রসর হতে পারেননি। কেরানী, পিয়ন পর্যায়ে কিছু মুসলমান যেতে পেরেছিলেন অবশ্য। সিলেট থেকে যারা কপ করে এসেছে, তারা কিছুটা বাঙালি মুসলমানদের মর্যাদা রেখেছিলেন। কমিশনার, ডেপুটি কমিশনার পর্যায়ে তারা ছিলেন। তেমনি যারা সিপি এবং ইউপি থেকে এসেছে, তারাও উচ্চ পর্যায়ে ছিলেন। যেমন আমাদের প্রথম চিফ সেক্রেটারি আজিজ আহমদ পাঞ্জাব থেকে কপ করে এসে আমাদের জন্য কাজ করেছেন।

কিন্তু তুমি ১৯৪৭ সাল থেকে '৭১ পর্যন্ত চেয়ে দেখ বাঙালি মুসলমানরা পাকিস্তানের পিয়ন থেকে চিফ সেক্রেটারি পর্যন্ত হয়েছেন। অর্থাৎ খুব দ্রুত উন্নতি ঘটেছে। আর তা একমাত্র সম্ভব হয়েছে পাকিস্তান হওয়ার জন্য, নতুবা সম্ভব হতো না।

– আল্লাহর হুকুম হলে হয়তো সম্ভব হতো?

: আল্লাহর হুকুম হলে এ থেকেও বেশি হতো তা অস্বীকার করি না। আমি বলছি অতীতের একশ' বছরে যা সম্ভব হয়নি, তা আল্লাহর হুকুমে পাকিস্তান হওয়ার কিছু দিনের মধ্যে হয়েছে। এটা আল্লাহর রহমত বলতে হবে। পাট কোথায় উৎপাদন হয়? পূর্ব বাংলায়। অথচ সব পাটের কারখানা ছিলো হুগলি ও কলকাতায়। ইংরেজ আর হিন্দু মিলে বাঙালি মুসলমানদেরকে শোষণ করেছে। পাকিস্তান হওয়ার পর আস্তে আস্তে পূর্ব বাংলায় শুরু হলো পাটের কারখানা তৈরি।

– আমরা তো শুনেছি পাকিস্তান হওয়ায় বাঙালি, অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তান বেশি শোষিত-বঞ্চিত হয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানে পাট হতো, কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হতো?

: তখন তো তারা এবং আমরা একই ছিলাম। পাকিস্তান বলতে তো উভয় অংশকেই বোঝাতো। তুমি হিসাব করে দেখ, ১৯৪৭-এর আগে পূর্ব বাংলায় ক'টা জুটমিল ছিলো এবং পাকিস্তান হওয়ার পর ১৯৭১ পর্যন্ত ক'টা হয়েছে? '৪৭-এর আগে পূর্ব বাংলায় একটাও জুটমিল ছিলো না। '৪৭-এর পর একাত্তর পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানে ৮৪টা জুটমিল হলো। যার মধ্যে এমনও একটি জুটমিল ছিলো, যা সমস্ত এশিয়ার মধ্যে বৃহৎ। আদমজী জুটমিল। '৪৭-এর আগে পূর্ব পাকিস্তানে তিনটা মাত্র কাপড়ের কারখানা ছিলো : (১) ঢাকেশ্বরী; (২) লক্ষ্মী নারায়ণ এবং (৩) লক্ষ্মমী নারায়ণ।

তিনটার মালিকই হিন্দু ছিলো। ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানে ৫৬টা টেক্সটাইল মিল হয়। যার মধ্যে ৩২টার মালিক বাঙালি মুসলমান। ১৯৪৭-এর আগ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানে কোন স্টীলমিল ছিলো না। গোটা পাকিস্তানের সর্বপ্রথম যে স্টীলমিল হয়, তা চট্টগ্রামে ছিল। সমস্ত পাকিস্তানের মধ্যে সার কারখানা ছিলো না। পাকিস্তান হওয়ার পর যে তিনটা হলো, তিনটাই পূর্ব পাকিস্তানে। এছাড়াও পাকিস্তান হওয়ার পর পূর্ব পাকিস্তানে ছোট ছোট প্রায় ছ'শ' মিল প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই পাকিস্তান সরকার পূর্ব পাকিস্তানিদের শুধু শোষণ করেছে— একথা সত্য নয়। পাকিস্তান সরকার

তার উভয় অংশে সাধ্যমতো উন্নয়নের চেষ্টা করেছে। কিন্তু প্রধান যে কালপ্রিট আইয়ুব খান, সে সাধারণ মানুষের মধ্যে নৈরাজ্য সৃষ্টি করে। স্বৈরাচার আইয়ুব খানের ব্যবহারে বাংলার মুসলমানরা জেগে ওঠে। তারা ভাবে, যে দেশ আমরা তৈরি করলাম, সে দেশে আমাদের কোনো অধিকার নেই কেন। শুধু বাংলায় নয়, এখানেও মানুষের মধ্যে এ প্রশ্ন ছিল। তাই আমরা যখন আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করলাম, তখন পূর্ব পাকিস্তানে যেমন লাখ লাখ লোক রাজপথে এসেছে, তেমনি পশ্চিম পাকিস্তানেও। আমরা ন'জন নেতা আইয়ু খানের বিরুদ্ধে যে বিবৃতি দিয়েছিলাম, তা আজো ইতিহাসে NINE LEADER STATEMENT বলে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে।

– এই ন'জন কে কে?

: হ্যাঁ আমরা ন'জনই বাঙালি ছিলাম। আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের ফলে অন্য কারো সঙ্গে যোগাযোগ সম্ভব হয়নি। আমাদের বাসার সামনে সব সময় আইয়ুবের পাহারা থাকতো। আমরা একের-অন্যের সঙ্গে চুপিচুপি মসজিদে নামাজের সময় দেখা করে বিবৃতি তৈরি করি। পত্রিকা অফিসে নিজে নিয়ে যাই। তারা অনেকেই বললেন, যদি এই বিবৃতি প্রকাশ করি, তবে পত্রিকা বন্ধ করে দেবে। আমরা বললাম, যদি এক দিনে সবাই প্রকাশ করেন, তবে একসঙ্গে সব পত্রিকা বন্ধের সাহস করবে না। শেষ পর্যন্ত তারা রাজি হলেন। আমি নিজে সংবাদ হিসেবে তা টাইপ করে দিলাম। কারণ অন্য কাউকে দিলে তা জানাজানি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এখানের পত্রিকায় এই বিবৃতি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বেলুচিস্তানের জাফর জামান পত্রিকায় বিবৃতি দিয়ে আমাদের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করলেন।

জাফর জামান পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা আন্দোলনের একজন উল্লেখযোগ্য নেতা ছিলেন। এদিকে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মওলানা ভাসানীসহ বড় বড় নেতাদেরকে গ্রেফতার করা হলো। আমরা চুনোপুঁটিরা কোনোরকম আছি কি নাই অবস্থা। শহীদ সোহরাওয়ার্দী জেল থেকে বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আইয়ুবের চামচারা তাকে বোঝাতে চেষ্টা করলো, নয় নেতা যারা বিবৃতি দিয়েছে ওরা সব চুনোপুঁটি। আপনি অনেক বড় নেতা। ওদের কথা আপনি মানতে যাবেন কেন? তিনি কোনো কথা না বলে পূর্ব পাকিস্তান ফিরে এলেন। বিমানবন্দরেই ঘোষণা দিলেন, "আমি ন'নেতাকে পূর্ণ সমর্থন করি। প্রয়োজনে আমি দশ নম্বর নেতা হতে রাজি।"

তাঁর ছিলো অত্যন্ত প্রশস্ত মন। আমরা সবাই তাকে নেতা মেনে নিলাম। পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র আন্দোলনের প্রস্তুতি শুরু হলো। বড় বড় মিটিং করলাম। মিটিং-মিছিল করে তিনি যখন পশ্চিম পাকিস্তানে আসার প্রস্তুতি নিচ্ছেন, তখন অসুস্থ হয়ে পড়েন। এরপর চিকিৎসার জন্য বিদেশে চলে যান। জীবিত আর ফিরে আসলেন না। ফিরে আসে তাঁর লাশ। বাঙালি জাতি চিরদিনের জন্য এক যোগ্য নেতাকে হারালো।

– এটা কত সালের কথা?

: ১৯৬৩ ইংরেজি।

– আইয়ুব খানের মৌলিক গণতন্ত্র সম্পর্কে কিছু বলবেন কি?

: আন্দোলন সংগ্রামের ফলে ১৯৬২-তে আইয়ুব খান একটা সংবিধান তৈরি করলো। আমরা তা মেনে নিলাম না। স্পষ্ট ভাষায় বলে দিলাম, জনপ্রতিনিধি ছাড়া কোনো ব্যক্তির অধিকার নেই সংবিধান প্রণয়নের। সে কিন্তু আমাদের কথায় কর্ণপাত করলো না, এই সংবিধানের ভিত্তিতে নির্বাচন দিলো। নির্বাচনও আমরা বর্জন করলাম।

সে সেই নির্বাচনের নাম দিয়েছিলো 'মৌলিক গণতন্ত্র'। তার বক্তব্য ছিলো, চল্লিশ হাজার মৌলিক গণতান্ত্রিক পূর্ব পাকিস্তান থেকে এবং চল্লিশ হাজার পশ্চিম পাকিস্তান থেকে নির্বাচিত হবে। এরপর এই আশি হাজারে মিলে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করবে। এটাই ছিলো আইয়ুবী মৌলিক গণতন্ত্র। এভাবে গেলো প্রথম পর্যায়। দ্বিতীয় পর্যায়ে এসে সে যখন আবার নির্বাচন দিতে চাইলো, তখন আমরা তার বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছি। সেই সময় নির্বাচনের বিরুদ্ধে ন্যাশনাল ডেমক্রেটিক ফ্রন্ট গঠন করা হলো। এতে সর্বসম্মতিক্রমে নুরুল আমীন সাহেবকে সভাপতি ও আমাকে সেক্রেটারি করা হলো। আমরা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও মওলানা ভাসানীর সম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নিলাম, গণতন্ত্র ফিরে না আসা পর্যন্ত ন্যাশনাল ডেমক্রেটিক ফ্রন্টের ব্যানারে আন্দোলন চালিয়ে যাব। এর মধ্যে নিজেদের দলীয় কর্মসূচি দিয়ে ঐক্যে ফাটল সৃষ্টি করবো না।

– আমরা তো জানি শেষ পর্যন্ত এই ঐক্য থাকেনি। কেন?

: সোহরাওয়ার্দী সাহেবের মৃত্যুর পর শেখ মুজিব চুক্তি ভঙ্গ করে একলা চলো নীতি অনুসরণ করলেন। মওলানা ভাসানী আমাকে বললেন, শেখ মুজিব যখন ফ্রন্ট থেকে বেরিয়ে গেলো, তাহলে চলো আমরাও ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির পৃথক কর্মসূচি দেই। মওলানা ভাসানী তখন ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সভাপতি এবং আমি সেক্রেটারি। মওলানার কথায় আমি রাজি হলাম না। এরপরও মওলানা চলে গলেন। ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের প্রশ্নে আওয়ামী লীগের আবুল মনসুর আহমদ ও আতাউর রহমান খান এবং ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির আমি ডেমক্রেটিক ফ্রন্টে থেকে গেলাম। আস্তে আস্তে ফ্রন্ট দুর্বল হয়ে যায়।

– ১৯৬২-এর নির্বাচন বর্জন করলেন, কিন্তু আবার ১৯৬৪-তে আইয়ুবের অধীনে নির্বাচন করলেন কেন?

: ১৯৬৪-তে আইয়ুব খান নির্বাচন দিলে আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম, তার বিরুদ্ধে সবাই মিলে একজন প্রার্থী দেব। শেষ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের বিরোধী দলগুলোর প্রস্তাবানুসারে অল পাকিস্তানের বিরোধী দলসমূহ সিদ্ধান্ত নিলো একমাত্র যোগ্য প্রার্থী মুহতারামা ফাতেমা জিন্নাহ। নির্বাচনে ফাতেমা জিন্নাহ পূর্ব পাকিস্তানে বিপুল ভোটে জয়ী হলেও পশ্চিম পাকিস্তানে আইয়ুবী ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে পরাজিত হলেন। পূর্ব পাকিস্তানিরা এতে মনোক্ষুণ্ণ হলো। আসলে পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের কোনো অপরাধ নয়। সব অপরাধ ওই কালপ্রিটের।

– নির্বাচনের পর আপনাদের ভূমিকা কি ছিলো?

: নির্বাচনের পর আমরা প্রথমে পর্যবেক্ষণ করলাম দুর্বলতাটা কোথায়? দেখা গেল অনৈক্যই সব দুর্বলতার মূল। আমরা আবার চাইলাম ফ্রন্ট করতে। কিন্তু জামায়াতসহ অনেকে বিরোধিতা করলো।

– জামায়াত কেন বিরোধিতা করলো?

: তারা বললো আমরা ইসলামী আদর্শে বিশ্বাসী। আমাদের রাজনীতি ইসলামভিত্তিক। আমরা ফ্রন্টে আসতে পারি না।

– শেষ পর্যন্ত কি আর ঐক্য হলো না?

: ফ্রন্ট হয়নি। তবে আন্দোলনের জন্য একে-অন্যের সঙ্গে লিয়াজোঁ ছিলো ডেমোক্রেটিক মুভমেন্টের মাধ্যমে।

– এটা কত সালের কথা? এই মুভমেন্টে আপনার দায়িত্ব কি ছিল?

: আমি তো পাকিস্তান ডেমক্রেটিক মুভমেন্টের সেক্রেটারি জেনারেল ছিলাম। সালটা হবে ১৯৬৫ কিংবা '৬৬ ইংরেজি।

– জামায়াতে ইসলামীও কি ছিলো?

: ছিলো। তবে তারা বলেছিলো যে, আমরা রাজনৈতিক দিক থেকে বেশি গুরুত্ব দেব ধর্মীয় দিক।

– এর পর কি হলো ?

: এর পর আইয়ুবের বিরুদ্ধে শক্তিশালী মুভমেন্ট গড়ে উঠতে চলল। ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত। ১৯৬৭ সালে আবার সবাই পৃথক হতে থাকলে আমরা অল পাকিস্তান ডেমক্রেটিক পার্টি গঠন করি।

– আমরা মানে?

: প্রেসিডেন্ট নুরুল আমীন সাহেব। আমি অন্যতম ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং পাঞ্জাব থেকে সেক্রেটারি।

– আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা সম্পর্কে আপনার মতামত কি?

: আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় এক পর্যায়ে সরকার শেখ মুজিবকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় জড়িত করে। ঘটনার সত্য-মিথ্যা আমি জানি না। মুনায়েম খান তখন গর্ভনর ছিলো। আমরা তাকে বললাম, শেখ মুজিবকে এই মামলায় যুক্ত করলে এর কঠিন রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া হবে। তোমরা এমন করতে যেও না।

– সরকার বা মুনায়েম খান কি আপনাদের কাছে পরামর্শ চেয়েছিলেন?

: না। আমাদের কোনো মতামত চায়নি। আমরা দেশের স্বার্থে পরামর্শ দিয়েছিলাম। কিন্তু সে তা শুনলো না। মুনায়েম খান ভেবেছিলো, "পেয়েছি একটা বিষয়, শেখ মুজিবকে এ দিয়েই শেষ করে দেয়া যাবে।" কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমাদের ধারণা সত্য হলো। আমি, নুরুল আমীন সাহেব ও শাহ আজীজ তখন সংসদ সদস্য। সংসদের ভেতরেও আমরা বলেছি, এ মামলায় শেখ মুজিবকে সংশ্লিষ্ট না করতে। কিন্তু সরকার তা শুনলো না। বিচার চলতে থাকলো। এদিকে বাঙালিদের মনে দৃঢ়বিশ্বাস সৃষ্টি হল, মুজিব বাঙালিদের পক্ষে কথা বলে, তাই তাকে ষড়যন্ত্র মামলায় জড়িত করা হয়েছে। ফলে মুজিবের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেতে লাগলো। এদিকে আমরা পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক

মুভমেন্টকে শক্তিশালী করে মাঠে আইয়ুববিরোধী আন্দোলন শুরু করলাম। আওয়ামী লীগের সোহরাওয়ার্দী গ্রুপ তো আগে থেকেই আমাদের সঙ্গে ছিলো। ১৯৬৮ সালের জানুয়ারি মাসে শেখ মুজিবও এসে যোগ দিলো। আরো কিছু ছোট ছোট দল এসেছিলো। আইয়ুবের বিরুদ্ধে আটদলীয় শক্তিশালী জোট হলো।

– আপনি বলছেন আন্দোলন শক্তিশালী হয়ে ওঠে। কিন্তু এর পরও তো সরকার আপনাদের কথায় কর্ণপাত করলো না।

: একেবারে যে করেনি, তা কিন্তু নয়। যেমন ১৯৬৯-এ আইয়ুব খান আমাকে ডেকে বললো, দেশের অবস্থা খারাপ হতে চলছে এখন কি করবো? আমি বললাম, এ কথা তো আমরা বারবার বলে আসছি— কিন্তু তুমি শুনছো না।

তুমি ১৯৬৬ সালে বলেছিলে, ঢাকার সংসদকে বাজেট প্রণয়ন ও বাতিলের পূর্ণ অধিকার দেবে। আজ (১৯৬৯-এর জানুয়ারি) পর্যন্ত তা কার্যকর হলো না। তাই লোক তোমাকে বিশ্বাস করে না এবং করতেও পারে না।

সে বললো, আমার কি দোষ? অমুক আমাকে ইয়ে বলেছে, অমুক তা করেছে।

আমি বললাম, তোমার দোষ আমি বলছি না। কিন্তু ক্ষমতা তো তোমার হাতে। যে ওয়াদা তুমি করেছিলে, তাও পূর্ণ করনি। মানুষ তোমাকেই অপরাধী বলবে। আমরা কোনো ইনকিলাবী লোক নই। আমরা আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান চাই।

তখন সে বললো, এখন আমি কি করতে পারি? বললাম, যদিও দেরি হয়ে গেছে, তবু সব দলকে ডেকে গোলটেবিল বৈঠক করতে পার।

১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সে সত্যই রাওয়ালপিন্ডিতে বৈঠক ডাকলো।

– সেই বৈঠকে কি আওয়ামী লীগ এসেছিলো?

: শেখ মুজিব জেলে ছিলো। তার পক্ষ থেকে তাজউদ্দিন, সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও কামরুজ্জামান আসে।

– সেই বৈঠকে কি সিদ্ধান্ত হলো?

: দু'তিন দফা বৈঠকের পর তাজউদ্দিনরা বললো শেখ মুজিব ছাড়া আমরা কোনো সিদ্ধান্তে যেতে পারবো না। ফলে নতুন সমস্যা সৃষ্টি হলো। আইয়ুব খান চাইলেই তো মুক্তি দিতে পারে না। আদালত থেকে প্যারোলে তাকে মুক্ত করে আনার সিদ্ধান্ত হলো। সব ব্যবস্থা হওয়ার পরও শেষ পর্যন্ত সে আসলো না।

– কেন?

: প্রকৃত কারণ তো বলা অসম্ভব। হয়তো এখানে কোনো ষড়যন্ত্র ছিলো। নতুবা সব ব্যবস্থা হওয়ার পরও কেন আসবে না। এদিকে আবার কে বা কারা জেলের এক সার্জেন্টকে হত্যা করে বসে। সরকার বলতে লাগলো, মুজিবের লোকেরা তা করেছে। তাজউদ্দিন নতুন করে দাবি করলো, যদি শেখ মুজিবকে নিঃশর্ত মুক্তি না দেওয়া হয়, তবে আওয়ামী লীগ বৈঠক বর্জন করবে। আইয়ুব খান বললো, নিঃশর্ত মুক্তিদানের আইনত বৈধতা আমার নেই। তাজউদ্দিন বললো, যে আইনে গ্রেফতার করা হয়েছে, তা

বাতিল করে দাও। এভাবে অনেক দিন গেলো। শেষ পর্যন্ত মার্চের বৈঠকে শেখ মুজিব যোগদান করে। আইয়ুব খান বললো, আপনাদের ডেমোক্রেটিক এ্যাকশন কমিটি থেকে যে আটটি দাবি উত্থাপন করা হয়েছে, তা আমি সম্পূর্ণ মেনে নিলাম। ১৯৬৯ ইংরেজির ১৩ মার্চের ওই বৈঠকে পূর্ব পাকিস্তান থেকে আমি, শেখ মুজিব ও নুরুল আমীন সাহেব ছিলাম। পশ্চিম পাকিস্তানেরও অনেক নেতা ছিলেন। শেখ মুজিব হঠাৎ দাঁড়িয়ে বললো "আমার আরো দু'টি পয়েন্ট আছে।" কি পয়েন্ট? সে বললো, "পশ্চিম পাকিস্তান যে এক ইউনিট তা ভেঙ্গে দিতে হবে এবং ওয়ান ম্যান ওয়ান ভোট অর্থাৎ জনসংখ্যানুপাতে প্রতিনিধি হতে হবে।" জনসংখ্যানুপাতে প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারটা তোমাদেরকে বলে রাখি— এটা হলো প্যারোটি বিটুউন ইস্ট এন্ড ওয়েস্ট পাকিস্তান। 56 CONSTITUTION তৈরিকালে CONSTITUTION ASSEMBLY-তে এই পয়েন্ট এসেছিলো। কিন্তু সব দিক বিবেচনা করে শেরেবাংলা এ কে এম ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীসহ আমরা সব এসেম্বলি মেম্বার সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে সমান অধিকারের ভিত্তিতে প্রতিনিধি নিয়োগ করা হবে। দেশের স্বার্থে তা সবাই মেনে নিয়েছিলেন। দেখ, শেরেবাংলার মতো লিডার তো শেখ মুজিব কেন আমরা কেউই ছিলাম না। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মতো লিডারও তো আমরা কেউ নই। তারাই বাঙালির পক্ষে সে দিন এই সিদ্ধান্তগুলো নিয়েছিলেন। ফলে ১৯৫৬ ইংরেজিতে CONSTITUTION হয়েছিলো। আর এই প্যারোটিটা আইয়ুব খানও তাজা রেখেছিলো। কিন্তু শেখ মুজিব বললো তা বাতিল করে দিতে হবে। আইয়ুব খান বললো, আমার যা ছিলো, তা তো দিয়ে দিলাম। বাকিগুলো আপনাদের রাজনীতিকদের ব্যাপার। আপনারা ঐক্যবদ্ধভাবে সিদ্ধান্তে আসুন।

গোলটেবিল বৈঠকের মিডিয়া স্পোকস্‌ম্যান হিসেবে তিন পক্ষের তিনজন নিয়ে একটি গ্রুপ করা হয়েছিলো। তাদের কাজ ছিলো বৈঠকের রিপোর্ট মিডিয়ার কাছে বলা।

– এই তিনজন কে কে?

: আওয়ামী লীগের পক্ষে খন্দকার মুশতাক আহমদ, বাকিদের পক্ষে আমি এবং সরকারের পক্ষে এস এম জাফর।

– শেষ পর্যন্ত কি হলো?

: আইয়ুব খান যখন বললো আমাদের রাজনীতিকরা সমাধান করবে, তখন আমি শেখকে বললাম, ভাই সে তো সত্যই বলেছে। এটা তো উভয় পাকিস্তানের রাজনীতিকদের ব্যাপার। চলো আলোচনার মাধ্যমে আমরা এর সমাধান করি। সে রাজি হলো। রাতে মিটিং বসবে। আমি আর নুরুল আমীন সাহেব তৎকালীন ওয়েস্ট পাকিস্তান হাউস অর্থাৎ বর্তমান পাঞ্জাব হাউসে রেস্ট নিচ্ছি। শেখ মুজিব ইস্ট পাকিস্তান হাউসে। ওই খানেই মিটিং-এর ব্যবস্থা করা হলো। সন্ধ্যা ছ'টায় মিটিং বসার কথা। কিন্তু এর আগেই রেডিও পাকিস্তান থেকে সংবাদ প্রচারিত হলো, শেখ মুজিবুর রহমান ডেমক্রেটিক এ্যাকশন কমিটি থেকে ইস্তফা দিয়ে দিয়েছে। ফলে আর কোনো মিটিং বা সিদ্ধান্ত হলো না।

– কেন এই ইস্তফা?

: তা তো বলতে পারি না। যতটুকু জেনেছি, শেখ মুজিবের সঙ্গে ইয়াহিয়া খানের গোপন সম্পর্ক গড়ে উঠে। ইয়াহিয়া খান তখন সেনাবাহিনীর কমান্ডার ইন চিফ। বর্তমানে যেমন সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনীর পৃথক পৃথক প্রধান থাকেন, সে সময় কিন্তু এরকম ছিলো না। তিন বাহিনীর প্রধান একজনই থাকতো। শেখ মুজিব আমাদের সঙ্গে বৈঠক না করে, ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে রাতে গোপনে ডিনার খেলো।

– কত তারিখে, কোথায় হয় এই গোপন ডিনার?

: ১৯৬৯-এর (যতটুকু স্মরণ হয়) ১৪ মার্চ রাওয়ালপিন্ডিতে।

– তাদের মধ্যে কি আলোচনা হয়?

: গোপনে দু'জন কি 'ষড়যন্ত্র' করেছে তা তো জানি না। তবে এই গুরুত্বপূর্ণ ডিনারের সংবাদ পত্রিকায় এসেছে। এরপর সে ঢাকায় উড়ে গেলো।

– আপনারা কি করলেন?

: আমরা একদিন-দু'দিন পর ঢাকায় গেলাম। যাওয়ার কিছু সময় আগে করাচির "কাসে নাজে" (সরকারি গেস্ট হাউস) সাংবাদিকরা এসে বললো, আপনি ঢাকায় যাবেন না।

বললাম, কেন?

—কারণ মুজিবুর রহমান ঢাকায় গিয়ে সাংবাদিকদের বলেছে, "বাঙালিদের জন্য আমি অনেক কিছু করতে পারতাম, কিন্তু প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে মাহমুদ আলী, হামিদুল হক চৌধুরী ও মৌলভী ফরিদ আহমদ।" ঢাকার অবস্থা খারাপ। ঢাকায় যাওয়া আপনাদের জন্য নিরাপদ নয়।

আমি বললাম, ভাই আমার ঘরে আমাকে যেতেই হবে। আমি বলছি না শেখ মুজিব বাঙালিদের স্বার্থ চায় না। কিন্তু চাওয়া আর করার মধ্যে অনেক ব্যবধান আছে। সে চায়, কিন্তু কিভাবে করতে হয় তা জানে না।

আমার এই বক্তব্যও পরদিন পত্রিকায় প্রকাশিত হলো। ঢাকায় পৌঁছে প্লেনে বসেই দেখলাম, বিমানবন্দর লোকে লোকারণ্য। ভাবলাম আর রক্ষা নেই।

– ভয় পেয়েছিলেন কি?

: (হাসলেন) হ্যাঁ কিছুটা পেয়েছিলাম। কিন্তু উপায় নেই। আমাকে নামতেই হবে। তো, খায়ের, আল্লাহ্‌র কি মর্জি, আমি যখন সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে এলাম, তখন লোক ফুলের মালা নিয়ে আমার দিকে এগিয়ে এলো। আমি এই বলে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করলাম, হে আল্লাহ্! তুমি-ই একমাত্র পার মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়ে ফুলের মালা দিতে। এভাবে ওই দিন চলে গেলো।

– এর পর কি শেখ মুজিবের সঙ্গে দেখা হয়েছে?

: আমার বাড়িতে কাজ চলায় আমি তখন ২৭ নম্বর ধানমন্ডির এক বাড়িতে ভাড়া থাকি। শেখ মুজিব থাকতো ৩২ নম্বর ধানমন্ডিতে। আমার ভাড়া বাড়ির টেলিফোন খারাপ

ছিলো। আমার বাড়িতেও একটি ফোন ছিলো। কাজের লোকটি জানালো হামিদুল হক চৌধুরী ফোন করেছেন দু'তিন বার। আমি টেলিফোন করতে আমার বাসায় যাচ্ছি। পেছন থেকে আওয়াজ হলো, আপনার সঙ্গে কথা আছে।

দাঁড়িয়ে দেখলাম অনেক লোক। দু'চারজনকে জানি ওরা আওয়ামী লীগের লোক। জানতে চাইলাম, কি কথা? উত্তেজিত হয়ে বললো, আপনি শেখ সাহেবের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন কেন?

—কি কথা, কোথায় বলেছি?

—কাগজে এসেছে।

—কোন্ কাগজে? নিয়ে এসো। অথবা শেখকে নিয়ে এসো কিংবা আমাকে তার কাছে নিয়ে যাও।

—শেখ সাহেব বাড়িতে নেই। প্রোগ্রামে আছেন উনিশ নম্বর স্ট্রিটে।

—চলো সেখানে যাই।

—ওরা চাইলো গাড়ি নিয়ে আসতে।

বললাম, প্রয়োজন নেই। পায়ে হেঁটে-ই চললাম। দেশের পরিস্থিতি থমথমে। এই সময় স্বশস্ত্র পুলিশ যাচ্ছিলো। অফিসাররা আমাকে চিনতে পেরে নেমে এসে জানতে চাইলো, কোনো সাহায্য লাগবে কি? বললাম, তোমরা তোমাদের কাজে যাও আমার সঙ্গে আল্লাহ আছেন।

এই কথা শুনে একদিকে পুলিশ চলে গেলো অন্যদিকে উপস্থিত আওয়ামী লীগ কর্মীরা দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গেলো। এক গ্রুপ আমাকে গালি দিচ্ছে অন্য গ্রুপ এর প্রতিবাদ করছে। উনিশ নম্বরে উপস্থিত হয়ে দেখি সত্যিই অনুষ্ঠান চলছে। শেখকে স্টেইজে না দেখে বললাম তাকে নিয়ে এসো। তারা বললো, তিনি আসছেন। এদিকে মাইকে আমাকে গালিগালাজ করা হচ্ছে। স্লোগান দেওয়া হচ্ছে, পাকিস্তানের দালাল মাহমুদ আলী হুঁশিয়ার। বেশ সময় অপেক্ষার পর বললাম, ভাই, এখানে যা বলা হচ্ছে, সব এক পক্ষের। উভয় পক্ষের বক্তব্য না শুনলে সত্যতা বোঝা যায় না। আমাকেও কিছু বলতে দাও। কেউ কেউ গর্জে উঠলো, অনেক বক্তৃতা শুনেছি আর শোনার প্রয়োজন নেই। (যদিও আমি স্মরণ থেকে বলছি, তোমরা এসব কথার প্রমাণ পাবে সেই সময়ের পত্রিকা খুলে দেখলে) তারা আমার দিকে কাগজ এগিয়ে দিয়ে বললো, 'লিখে দেন শেখ সাহেবের বিরুদ্ধে যা বলেছি সব মিথ্যা। জীবনে আর বলবো না।'

আমি বললাম, তার বিরুদ্ধে তো আমি কিছুই বলিনি, তবু তোমরা চাইলে লিখে দেব। যাও, যা লেখার লিখে নিয়ে এসো আমি স্বাক্ষর করে দেব। কয়েকজন লেখে নিয়ে আসে। এই সময় একজন স্টেইজের কাছ থেকে চিৎকার দিয়ে বলে, 'লেখার কোনো প্রয়োজন নেই, তাকে স্টেইজে নিয়ে এসো। সে মাইকে বলুক।' এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে আমার প্রতি সাহায্য ছিলো। যেই তারা বলেছে মুহূর্তের মধ্যে আমি মাইকের

কাছে চলে যাই। প্রায় পাঁচ মিনিট কথা বলি। বিশ্বাস করো, বিপুল মানুষ জমা হয়ে যায়। আমি বললাম, আপনারা কি বিশ্বাস করেন মাহমুদ আলী বাঙালির স্বার্থের বিরুদ্ধে কিছু বলতে বা করতে পারে? এরপর বিস্তারিত ঘটনা বললাম। শেখ মুজিবের অন্ধভক্তরা আমার বিরুদ্ধে শ্লোগান দিতে লাগলো। প্রচুর সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন। পরদিন পত্রিকায় ছবিসহ সংবাদ এসেছে।

আমি আমার বক্তব্য শেষ করে দ্রুত বড় রাস্তায় এসে পৌছে যাই। রাস্তায় পুলিশ দাঁড়ানো ছিলো। তারা বললো, স্যার চলেন বাড়িতে দিয়ে আসি। আমি বললাম, কখনো তোমাদের গাড়িতে উঠবো না। একটু অগ্রসর হতেই একটি প্রাইভেট জীপ এসে থামলো। ছদ্মবেশে এক সেনাবাহিনীর অফিসার। সে বললো, স্যার চলেন বাসায় দিয়ে আসি। আমি বললাম, বাসায় যাব না। প্রথমে শেখ মুজিবের বাড়িতে গিয়ে জিজ্ঞেস করবো সে কি চায়? অফিসারটি আমাকে ৩২ নম্বরে নামিয়ে দিলো। সেখানে গিয়ে দেখি লোকে লোকারণ্য। সবাই আমার দলের লোক। তারা সংবাদ পেয়েছে আমাকে হত্যা করা হয়েছে, তাই জমা হয়েছে শেখ মুজিবকে চ্যালেঞ্জ করতে। তারা আমাকে দেখে আশ্চর্য হলো। সবকিছু খুলে বললাম। আমার ইচ্ছে ছিলো শেখের সঙ্গে দেখা করে জিজ্ঞেস করবো, সে গণতন্ত্র চায় না সন্ত্রাস চায়? কিন্তু দলের লোকেরা যেতে দিলো না। তারা আমাকে বাড়িতে নিয়ে গেলো। এখানে এসে দেখি আমেরিকান এক সাংবাদিক অপেক্ষা করছে। ব্যাপার জানতে চাইলে সে বলে, শেখ মুজিবের বাড়িতে বসা ছিলাম। তোমার স্ত্রী সেখানে গিয়ে শেখ মুজিবকে খুব গালি দিলো। আমি বাংলা বুঝি না। তবে তার রাগটা অনুমান করেছি। জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম, শেখ মুজিবের লোকেরা তোমার বাড়ি জ্বালিয়ে দিতে হুমকি দিচ্ছে। তাই তোমার স্ত্রী রাগান্বিত হয়ে এসে বলেছে, "তোমার লোকেরা আমার বাড়ি জ্বালানোর হুমকি দিচ্ছে এতে আমরা ভীত নই। যদি সত্যি তোমরা আমার বাড়ি জ্বালাও, তবে আমিও এক বোতল স্প্রিট জোগাড় করতে পারি তোমার বাড়ি জ্বালানোর জন্য। তাই তোমার সঙ্গে দেখা করতে এলাম।"

যা-ই হোক, আমি মুজিবকে রাওয়ালপিন্ডিতে বলেছিলাম, তুমি যে এত টাইট করছো, তাতে সামরিক শাসন এসে যেতে পারে। সে বললো, আপনি কি আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন? আমি বললাম, না তোমাকে ভয় দেখাচ্ছি না। আমরা নিজেরা ভয় পাচ্ছি। কারণ সামরিক শাসন এলে আমরা সবাই ভুক্তভোগী হব। তাই সামরিক শাসন আসুক, সে অবস্থা সৃষ্টি করা ঠিক নয়। ২৩ মার্চ তার সঙ্গে আমার কথা হলো আর ২৫ মার্চ আইয়ুব খানকে সরিয়ে ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা দখল করে সামরিক আইন জারি করল।

– পাকিস্তান ভাঙ্গার জন্য রাজনৈতিক কারণ ছাড়াও অর্থনৈতিক শোষণও কি অন্যতম বিষয় নয়?

: পূর্ব পাকিস্তানের লোকদের ধারণা ছিলো পশ্চিম পাকিস্তানিরা আমাদেরকে খেয়ে ফেলছে। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের এমন কোনো অঞ্চল নেই, যেখানে আমি যাইনি। আগেও গিয়েছি। এখনো যাই। আমি দেখেছি সব গ্রামের লোকেরাই গরিব। কিন্তু এর

পরও বেলুচিরা ভাবে পাঞ্জাবিরা সুখে, পাঞ্জাবিরা ভাবে বেলুচিরা। এই তো সপ্তাহ হলো আমি সিন্ধু থেকে এসেছি। সেখানের লোকেরা অভিযোগ করলো, সরকার শুধু পাঞ্জাবে সাহায্য করছে। আমি বললাম, তোমরা এখানে বসে তা বললে হবে না। আমার সঙ্গে এসে দেখ গোটা পাকিস্তানের অবস্থা প্রায় এক। প্রকৃতপক্ষে পাকিস্তান যে উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, তা কার্যকর করা হয়নি। সব সমস্যার মূল এখানে।

– কার্যকর না হওয়ার কারণ কি?

: এই যে বললাম না THIS IS BECOUSE OF THIS MAN। ইসলাম বলে সম্পদের মুনসিফানা বণ্টনের কথা। কিন্তু পাকিস্তানে তা হচ্ছে না। কিছুসংখ্যক লোক সম্পদকে কুক্ষিগত করে রেখেছে।

– আপনার বক্তব্য থেকে বোঝা যায়, পাকিস্তানের প্রধান সমস্যা ছিল সঠিক নেতৃত্বের অভাব?

: না, এমন কথা আমি বলছি না। প্রথমে যে নেতৃত্ব ছিলো, তা সঠিক ছিলো। কায়দে আজমের পর লিয়াকত আলী খান বেঁচে থাকলে অনেকটা লক্ষ্য হাসিল হতো। এরপর তো সব দুর্বল হয়ে গেলো। লক্ষ্যে পৌছার আন্দোলনই বর্তমানে করছে 'তাহরীকে তাকমীলে পাকিস্তান'। আমাদের উদ্দেশ্য নওয়াজ শরিফকে সরিয়ে মাহমুদ আলীকে ক্ষমতায় বসানো নয়। আমাদের উদ্দেশ্য ইসলামী শরিয়ত মতো অর্থনীতি সাজানো, যাতে সম্পদ কিছু লোকের হাতে কুক্ষিগত না থাকে। সিন্ধে আজো ৯৫ ভাগ লোকের কোনো জমি নেই। মাত্র পাঁচ ভাগের কাছে জমি কুক্ষিগত। পাঞ্জাবে ৯০ ভাগের কাছে জমি নেই ১০ ভাগের কাছে জমি কুক্ষিগত। পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা ইসলামী উদ্দেশ্যে হলেও এখানে পুঁজিবাদ অগ্রসর হয়ে গেছে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে আমরা শ্লোগান দিতাম 'টাটা আওর বিড়লা কি চঙ্গল মে রহেঙ্গে নেহি'। আজ পাকিস্তানে মুসলমান টাটা ও বিড়লা জন্ম হয়ে গেছে। ওদের বিরুদ্ধে আমরা আন্দোলন করছি। আগেই বলেছি, ১৯৪৭-এর আগে বাংলাদেশে ব্রিটিশ শাসনের দু'শ' বছরে কিছুই হয়নি। অথচ পাকিস্তান আমলে অনেক কিছুই হয়েছে। তোমরা যারা নতুন প্রজন্ম, দয়া করে একটু ইনসাফের সঙ্গে ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখ। তাছাড়া পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানে জায়গা কম, জনসংখ্যা বেশি। বাংলাদেশে তখনও এক এক স্কোয়ার কিলোমিটারে দু' দু'হাজার লোক ছিলো।

– আপনার সব কথাও যদি মেনে নেই, অথবা তাও যদি মেনে নেই যে, দু'শ' বছরের শোষণ, নির্যাতনের শিকার কোনো জাতিকে রাতারাতি উন্নতির চরমে পৌছানো সম্ভব নয়। কিন্তু সত্তরের নির্বাচনে তো শেখ মুজিবুর রহমান সত্যিই বিজয়ী হয়েছিলেন?

: হ্যাঁ, তোমার কথা ধ্রুব সত্য। আমি এই কথাই তোমাকে বলতে চেয়েছিলাম। ইয়াহিয়া খান ক্ষমতায় এসে ঘোষণা দিলো নির্বাচন দেবে। সে আমাদেরকে ডেকে বললো, আমি নির্বাচন দিতে চাই, কি বলেন? আমরা বললাম, বড় বুদ্ধিমানের কথা বলছো তুমি। কিন্তু কোন্ আইনের ভিত্তিতে নির্বাচন দেবে? কারণ সামরিক আইনের

অধীনে নির্বাচন হলেও এর কোনো কার্যকারিতা থাকবে না। কারণ নির্বাচনের পর লোক আশা করবে ক্ষমতার পরিবর্তন। তুমি কোন্ পদ্ধতিতে, কার কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে?

সে বললো, আপনাদের রাজনীতিকদের পরামর্শ কি?

আমরা বললাম, ১৯৫৬-এর আইন জনপ্রতিনিধিরা পাস করেছিলো। আইয়ুব খান তা স্থগিত করেছিল। তা আবার নিয়ে এসো। এরপর নির্বাচন দাও এবং নিজে ঘরে ফিরে যাও। সে তাতে রাজি হলো। কিন্তু মাত্র তিন মাসের মধ্যেই সে 'লিগাল ফ্রেইম অব অর্ডার' নামে এক অধ্যাদেশ জারি করে। এটা ছিলো সামরিক জান্তার নিজস্ব আইন। এতে বলা হলো, নির্বাচন হবে। নির্বাচিত সদস্যদের ১২০ দিনের ভেতর ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পর্কিত আইন তৈরি করতে হবে। যদি সদস্যরা ১২০ দিনের ভেতর তা করতে ব্যর্থ হন, তবে অটোমেটিক ৩শ' আসনের পার্লামেন্ট বাতিল হয়ে যাবে।

'৭০-এর ৬ ডিসেম্বর নির্বাচন হলো। ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১-এ পাকিস্তান ভেঙ্গে গেলো। এই এক বছরে একদিনও পার্লামেন্ট বসতে পারেনি। নির্বাচনের আগে জেনারেল ইয়াহিয়াকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, নির্বাচনের ফলাফল কেউ অমান্য করলে কি করবে? সে হাতের ছড়ি দেখিয়ে বলেছিলো, পিটিয়ে সোজা করে দেব। বিশ্বাস কর, পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের কোনো দোষ নেই। পরিস্থিতি ঘোলাটে করেছে এই আর্মি অফিসার ও রাজনীতিকরা। আজো এখানের মানুষদের বাঙালিদের প্রতি ভালোবাসা রয়েছে। আমি তাদের অনেককে কাঁদতে পর্যন্ত দেখেছি। বিশ্বাস কর, '৭১-এ ইসলামাবাদের গলি দিয়ে সেনাবাহিনীর কেউ ইউনিফর্ম গায়ে দিয়ে বের হতে পারেনি। আমি আগেই বলেছি, আইন ছিলো নির্বাচনের ১২০ দিনের ভেতর ক্ষমতা হস্তান্তরের আইন প্রণয়ন করা। কিন্তু সেই সংসদ একদিনের জন্যও বসতে পারল না। আমি ইয়াহিয়াকে আগেই বলেছি, ক্ষমতা হস্তান্তরের আইন সংশোধন করে নির্বাচন দাও। নতুবা সফল হবে না। সে ভাবলো, কোনো দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা না আসলে সে নিজে ক্ষমতায় থেকে যাবে।

– একাত্তরে জুলফিকার আলী ভুট্টোর ভূমিকা তো ভালো ছিলো না?

: মোটেও ভালো ছিলো না। কেমন করে ভালো নয় দেখ, সে ইয়াহিয়ার সঙ্গে মিলে রাজনীতিতে সেনাবাহিনীকে জড়িত করে সমস্যা বৃদ্ধি করলো। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ ভুট্টো সাহেব আর ইয়াহিয়া মিলে পূর্ব পাকিস্তানে সেনাবাহিনী লেলিয়ে দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তান ফিরে ভুট্টো সাহেব বক্তব্য দিলেন, আল্লাহকে ধন্যবাদ যে, পাকিস্তান রক্ষার জন্য সেনাবাহিনী এগিয়ে এসেছে। আর এটাই শেষ চিকিৎসা। দেখ আমি বলি, এখানে যদি সেনাবাহিনী জড়িত না হতো, তবে ভারত পূর্ব পাকিস্তানে হস্তক্ষেপ করার সুযোগ পেত না।

– পাকিস্তানে অনেকের সঙ্গে আলাপ করেছি একাত্তর নিয়ে। তারা বললেন, '৭১-এ পূর্ব পাকিস্তানে কি হয়েছে, তা আমরা প্রথম দিকে জানতে পারিনি। আমরা যতটুকু জেনেছিলাম, বাঙালিরা হিন্দুদের সঙ্গে মিলে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে লড়াই করছে এবং অসহায় বিহারীদেরকে হত্যা করছে।

: হ্যাঁ। আমি তো এই কথাই বললাম যে, এখানকার জনগণ কিছুই জানত না। পত্র-পত্রিকায় সঠিক সংবাদ তেমন আসত না।

– এখানের পত্র-পত্রিকা '৭১-এ পূর্ব পাকিস্তানের মজলুম মানুষগুলোর বিরুদ্ধে যে ভূমিকা নিয়েছে, তা কি সত্যনিষ্ঠ সাংবাদিকতার পরিপন্থী নয়?

: দেখ, একাত্তরে যা ঘটেছে এর প্রতিটি পদক্ষেপই ছিলো ভুল। ১৯৬২ সালে আইয়ুব খানের তৈরি আইন ছিলো, যদি কোনো কারণবশত প্রেসিডেন্ট কাজ করতে ব্যর্থ হন, তবে স্পিকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন। কিন্তু আইয়ুব খানই তৎকালীন স্পীকার বিচারপতি আব্দুল জব্বার খানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর না করে হস্তান্তর করলো ইয়াহিয়া খানের কাছে। মোটকথা, একের পর এক ভুল হয়েছে। পত্রিকাওয়ালাদের ব্যাপারটাও তাই।

– '৭১-এর নির্বাচনের পর তো ইয়াহিয়া খান শেখ মুজিবের কাছে ক্ষমতা দিয়ে দিলে কোনো সমস্যা হতো না?

: কি করে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে? ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য তো সাংবিধানিক আইন থাকা চাই। সেই আইন তো ছিলো না। এটা তো সংসদে বসে প্রণয়ন করার কথা ছিলো। সংসদই তো বসলো না। আর এই সুযোগে ইয়াহিয়া ভুট্টোকে নিয়ে ইডিয়েটের মতো এ্যাকশনে চলে গেলো। আমাদের সঙ্গে সামান্য আলাপও করলো না।

– আপনি নিজে বলছেন সেবাহিনীর এ্যাকশন সম্পূর্ণ ইডিয়েটি। এরপরও আপনি পাকিস্তানের পক্ষে থাকলেন কেন?

: যা অন্যায় তা অবশ্যই অন্যায়। আমরা অন্যায়কে মেনে নিতে পারি না। শাসকদের ভুলে পাকিস্তানকে ভেঙ্গে দেওয়াও অন্যায়। তাই আমরা সামরিক স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে চেষ্টা করেছি অখণ্ড পাকিস্তান রক্ষার। সত্য কথা হলো, পাকিস্তান উপমহাদেশের মুসলমানদের একটি শক্তির কেন্দ্র ছিল। ছিল প্রেরণার উৎস। শত্রুর মোকাবেলায় অখণ্ড পাকিস্তান ছিল অত্যন্ত জরুরি বিষয়।

– পাকিস্তানি অনেকে মনে করেন ভুট্টো, মুজিব এবং ভারত মিলে পাকিস্তান ভাঙ্গার মাস্টারপ্লান করেছিলেন?

: না, আমি ভুট্টো সম্পর্কে একথা বলবো না। তবে সে ক্ষমতালোভী ছিলো। যেমন সত্তরের নির্বাচনের পর এক সময় সে প্রস্তাব করলো, দেশে দু'জন প্রধানমন্ত্রী হওয়া প্রয়োজন। একজন পূর্ব পাকিস্তানে এবং অন্যজন পশ্চিম পাকিস্তানে। সে সময়ের পত্রিকা খুলে দেখ, একমাত্র আমিই বিবৃতি দিয়ে বলেছিলাম, "এটা কি ধরনের কথা যে, একদেশে দুই প্রধানমন্ত্রী হবে? শেখ মুজিব নির্বাচিত হয়েছে তাকে প্রধানমন্ত্রী করা হোক। এক দেশে দু'জন প্রধানমন্ত্রী হতে পারে না।" মোটকথা, ভুট্টো ছিলো পাওয়ার হেংরি।

– '৭১-এ যে জুলুম বাংলাদেশে হয়েছে, তা বন্ধের জন্য আপনি একজন বাঙালি অথবা একজন মানুষ হিসেবে কি ভূমিকা রেখেছেন?

: তা বন্ধ করার মতো ক্ষমতা আমার হাতে ছিলো না।

– প্রতিবাদের ক্ষমতাও কি ছিলো না?

: করেছি। প্রতিবাদ যেখানে করার করেছি। অনেক মানুষকে পিণ্ডিরা থেকেও বাঁচিয়েছি। যার মধ্যে আওয়ামী লীগেরও লোক ছিলো।

– পিণ্ডিরা কি?

: মিলিটারি কাউকে যদি পিণ্ডিরায় নিয়ে যায় দ্যাজ মিন হিইজ ফিনিস। রাও ফরমান আলী ছিলো গভর্নরের পরামর্শদাতা। তাকে নিয়ে কত মানুষকে বাঁচিয়েছি।

–'৭১-এর ঘটনার তদন্তের জন্য বিচারপতি হামুদুর রহমানের নেতৃত্বে যে কমিশন গঠন করা হয়েছিলো, সেই কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ করা হলো না কেন?

: তোমরা হয়তো জানো না যে, জাস্টিস হামুদুর রহমানও বাঙালি ছিলেন। তিনি যে রিপোর্ট দিয়েছিলেন, তা এখনো প্রকাশ করতে সরকারের সৎ সাহসের অভাব রয়েছে।

– অনেকের ধারণা মি. ভুট্টো সেই রিপোর্ট নষ্ট করে ফেলেছেন?

: না না, তা নষ্ট করা হয়নি। লোকেরা দাবি করছে আজো পাবলিশের জন্য কিন্তু সরকার করছে না।

– কেন করছে না?

: এতে অনেকেরই বিরুদ্ধে কথা আছে তাই। আমি সেই রিপোর্টের একজন সাক্ষী। দীর্ঘ পঞ্চাশ পৃষ্ঠার লিখিত সাক্ষী আমি দিয়েছি। হামিদুর রহমান কমিশন দীর্ঘ আড়াই ঘণ্টা আমার সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক করেছে।

– '৭১-এর ঘটনার জন্য আপনারা আইয়ুব খানকে মূল দায়ী করতে চাচ্ছেন?

: অবশ্যই। দেখতে হবে ঘটনা কোথা থেকে শুরু। যদি সে তার নিজের আইন মতোও স্পীকার জব্বার খানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতো, তবে এমন ঘটনা হয়তো ঘটতো না।

– বিচারপতি আব্দুল জব্বার খানের বাড়ি কোথায়?

: আরে তিনি তো আমাদের বরিশালের লোক। যা-ই হোক, '৭১-এর ঘটনার জন্য প্রকাশ্য দোষী আইয়ুব, ইয়াহিয়া এবং ভুট্টো আর পর্দার আড়ালে প্রকৃত দায়ী আমেরিকা। দেখ, আমেরিকার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট নিক্সন তার এক বই-এ লিখেছেন, আমরা চেয়েছিলাম পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান পৃথক হয়ে যাক। তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী কিসিঞ্জারও একই কথা লিখেছেন।

– তাহলে দেখা যায় পাকিস্তান ভাঙ্গার মূল নায়ক আমেরিকা?

: হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি তো বলেছি যে, পর্দার আড়ালে আমেরিকা দাবা চালিয়েছে। খাজা নাজিম উদ্দিনকে সরিয়ে আমাদের বগুড়ার মোহাম্মদ আলীকে কেন প্রধানমন্ত্রী করা হলো? কারণ খাজা সাহেব আমেরিকার ফ্রি গম গ্রহণে অস্বীকৃতি জানিয়ে ছিলেন। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী যখন যুক্তবাংলার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, তখন মোহাম্মদ আলী ছিলো পার্লামেন্টারি সেক্রেটারি। আর যখন তাকে প্রধানমন্ত্রী করা হয়, তখন সে সংসদ

সদস্যই ছিলো না। সে ছিলো আমেরিকায় পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত। সেখান থেকে এনে তাকে প্রধানমন্ত্রী করা হলো, বিষয়টা স্পষ্ট নয় কি?

– ফ্রি গমের খেলাটা খুলে বলবেন কি?

: আমেরিকা পাকিস্তানকে প্রস্তাব করলো শুধু জাহাজের ভাড়ার বিনিময়ে আমি তোমাকে গম দেব। তুমি তা তোমার জনগণের কাছে বিক্রি করে যা পাবে এর আশি ভাগ তোমার এবং বিশ ভাগ আমেরিকার। এই বিশ ভাগ তুমি স্থানীয় আমেরিকান ব্যাংকে রাখবে, তবে জানতে চাইবে না আমি তা দিয়ে কি করবো।

– এই অর্থ আমেরিকা কি করেছে বলে আপনি মনে করেন?

: সেদিনও বলেছি আজও বলছি, এই বিশ ভাগ যার হিসাব জানার অধিকার পাকিস্তানের ছিলো না, তা আমেরিকা ব্যবহার করেছে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে। আমেরিকা যাদেরকে দিয়েই কাজ করিয়ে থাকুক করেছে। তারা প্রথম পাকিস্তানকে দিয়েছে ফ্রি গম। এরপর ফেরৎ দিতে হবে না এমন ঋণ। তোমরা কি জানো আজ পাকিস্তানের ঋণ কত? এখানের লোকেরাও জানে না। পাকিস্তানের বর্তমান ঋণ চার হাজার দু'শ' কোটি রুপী। আর এই ঋণ বাবদ বাৎসরিক সুদ দিতে হয় একশ' আট চল্লিশ কোটি রুপী। আর পাকিস্তানের আমদানি মাত্র তিনশ' কোটি রুপী। যার মধ্যে একশ' আটচল্লিশ কোটি সুদ বাবদ চলে যায়। আমি প্রায় মিটিং-এ বলি, যদি সুদ ব্যক্তির জন্য হারাম হয়, তবে গোটা দেশের জন্য হালাল হয় কিভাবে? আমেরিকা মূলত চেয়েছিলো পাকিস্তান ভেঙ্গে মুসলমানদেরকে দুর্বল করতে। যদিও সে দিন ভারত আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ভিন্ন ব্লকে ছিলো, তবু মুসলমানদের বিরুদ্ধে তারা সর্বদা এক। পাকিস্তানের উদ্দেশ্যের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে শেরেবাংলা একে ফজলুল হক লাহোর অধিবেশনে বলেছিলেন, "আমরা চাই এদেশে একটি মুসলিম শক্তি তৈরি করতে।"

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী একথাটাই ১৯৪৬-এ দিল্লির অধিবেশনে উচ্চারণ করেছিলেন। আমেরিকা চাইলো এই শক্তিকে দুর্বল করে দিতে। আর সে পথেই তারা ওই বিশ ভাগ খরচ করেছে।

– '৭১-এ যারা পাক সেনাবাহিনীর সমর্থনে রাজাকার কিংবা এই প্রকারের বাহিনী করেছে, তাদের সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কি?

: আমি সেদিনও রাজাকার বাহিনীকে সমর্থন করিনি। আজও না। পাকিস্তানের অখণ্ডতার জন্য নিয়মতান্ত্রিক চেষ্টা করা যেতে পারে, কিন্তু নিজের জনগণের বিরুদ্ধে অস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়া যায় না। সেনাবাহিনীর মতো রাজাকাররাও অপরাধী।

– পাকবাহিনী বাংলায় মুসলমানদেরকে নাকি কাফের হিসেবে হত্যা করেছে?

: দেখ, এক সেনা অফিসার হিন্দুর ঘরে গিয়ে দেখলো, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবি লাগানো। সে এত লম্বা দাড়ি দেখে ভাবলো, নিশ্চয় এই বাড়ি হিন্দু কিংবা কাফেরের নয়। চলে এলো। আবার অনেক দাড়ি ছাড়া মুসলমানকে তারা হিন্দু ভাবলো। মোটকথা, ওরা হিন্দু-মুসলমান কিছুই বুঝতো না। তারা ছিলো হুকুমের গোলাম মাত্র।

আমার তো সহজ কথা, ওদেরকে পাঠানোই ভুল হয়েছে। সেনাবাহিনীর এ্যাকশন অর্থই কিছু অঘটন ঘটে যাওয়া। একাত্তরে আমি যখন ইউরোপ সফরে গিয়েছিলাম, তখন সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলাম, দেখ ইউরোপে অসংখ্য যুদ্ধ হয়েছে। প্রত্যেক যুদ্ধেই সেনাবাহিনী কর্তৃক বহু অঘটন ঘটেছে। প্রকৃত কথা হচ্ছে, নিজের দেশের ভেতর আর্মি ব্যবহারই সম্পূর্ণ অন্যায়। আজও আমি একথা বলছি। প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হককে আমি কয়েকবার বলেছি, ভাই ওরা যে অন্যায় করেছে, তাদেরকে কবর থেকে এনে ফাঁসী দেওয়া প্রয়োজন।

– পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের সংঘাত কি ইসলাম ও কুফরের?

: দেখ মবনু, পাকিস্তানের সংঘাতটা ইসলাম আর নন-ইসলামের ছিলো না। এই সংঘাত ছিলো দুই সেক্যুলার ক্ষমতালোভী নেতার অর্থাৎ শেখ মুজিব আর ভুট্টোর। ইসলাম যদি পাকিস্তানে থাকতো, তবে সমস্যাই আসতো না। ইসলাম জুলুম-নির্যাতনের অনুমতি দেওয়া তো দূরের কথা পাকিস্তানীয়ত অর্থাৎ জাতীয়তাবাদের পর্যন্ত অনুমতি দেয় না। দেখ, ক্ষমতা কার হাতে ছিলো। ক্ষমতা তো তার হাতেই ছিলো, যার হাতে যাওয়ার ছিলো না। আইয়ুব, ইয়াহিয়া, ভুট্টো কিংবা শেখ মুজিব ওদের কারোরই উদ্দেশ্য ইসলাম ছিলো না। ব্যক্তিগত জীবনেও তারা ইসলামের আশপাশেও ছিলো না। তাই আমি বলি যা হওয়ার হয়ে গেছে। এখন সংশোধন হওয়া প্রয়োজন। গোটা মুসলিম উম্মাহর স্বার্থে আমাদের আবার ঐক্যবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন।

– সংশোধনের কথা বলেছেন, কিন্তু তা কি সম্ভব? যারা একাত্তরে প্রাণ হারিয়েছে তাদেরকে ফিরিয়ে দেবে কে?

: দেখ, উভয় পক্ষেই প্রাণ হারিয়েছে। যারা যুদ্ধের ময়দানে প্রাণ হারিয়েছে, ওদের কথা বাদ দাও। কিন্তু যাদেরকে ঘরে ঢুকে বিনা অপরাধে শুধু বাঙালি কিংবা উর্দু ভাষী হওয়ার অপরাধে হত্যা করা হয়েছে, ওদের জন্য উভয় গ্রুপেরই ক্ষমা চাওয়া উচিত এবং আলোচনার মাধ্যমেই সংশোধন করতে হবে। শেখ মুজিবুর রহমান যখন ১৯৭৪-এ পাকিস্তানে ইসলামী সম্মেলনে এসেছিলো, জিজ্ঞেস করেছিলাম, ইসলামাবাদ কবে আসছো? সে বললো, আগামীকাল ঢাকায় চলে যাচ্ছি। আমি বললাম, না না আমি কালকের কথা বলছি না। একেবারে কবে আসছো, সে কথা বলছি। সে বললো, এ কি করে হবে এত খুন-খারাবীর পর? আমি বললাম, যে খুন-খারাবী হয়েছে, এখানে বসে তার বিচার হবে। যে অপরাধী তার উপযুক্ত সাজা হবে। বিচারের জন্য এটাই উত্তম স্থান। এরপর সে চলে গেলো।

আরেকটি ব্যাপার তোমাকে বলি, ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসে ভুট্টো আমার এবং নুরুল আমীন সাহেবের কাছে আজিজ আহমদকে পাঠিয়ে জানতে চাইলো, শেখ মুজিবকে কি ফাঁসী দিয়ে দেব? উত্তরে আমরা বললাম, অসম্ভব, বরং তাকে মুক্তি দিয়ে ভুট্টো সাহেবের পক্ষ থেকে বলা হোক, এই নাও ক্ষমতা। তুমি দেশ চালাও।

আমি ক্ষমতা চাই না। চাই শুধু দেশের ঐক্য। ভুট্টো এর পর কি করেছে, তা আমি জানি না। কারণ, এর পর আমি কায়রোতে এক সম্মেলনে চলে যাই।

– পাকিস্তান আন্দোলনে আসাম থেকে যারা নেতৃত্ব দিয়েছেন, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য আপনাদের পরিবার। বাংলা ও আসামের সিলেট অংশ নিয়ে যে আপনারা ১১শ' মাইলের ব্যবধানে পাকিস্তানের সঙ্গে যোগ দিলেন, তা কোন্ যুক্তিতে। তবু মেনে নেওয়া যেত যদি চারদিকে ইন্ডিয়া না হতো?

: দেখ, আমরা পাকিস্তানের সঙ্গে যোগ দেইনি; বরং আমরা পাকিস্তান সৃষ্টি করেছি। আজকের পাকিস্তান কিন্তু আমাদের লাহোর অধিবেশনের প্রস্তাবিত পাকিস্তান নয়। সেই পাকিস্তানের সীমানা নেপাল পর্যন্ত ছিল। যদি তেমন হতো, তবে নেপাল তাদের স্বার্থে আমাদেরকে পথ দিতো। বিনিময়ে আমরা তাদেরকে করাচি ও চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর ব্যবহার করতে দিতাম। আমাদের দাবির ভেতর সম্পূর্ণ কলিকাতা ও আসাম ছিলো। কিন্তু হিন্দু ও ইংরেজরা ইচ্ছে করে তা দেয়নি, যাতে পাকিস্তান ভেঙ্গে যায়। আসামের সিলেট তো অনেক কষ্ট করে আনতে হয়েছে।

– বুঝলাম ইংরেজ ও হিন্দুরা ষড়যন্ত্র করে দেয়নি। কিন্তু আপনারা মানতে গেলেন কেন?

: সেদিন যদি না মানতাম, তবে ইংরেজরা সম্পূর্ণ ক্ষমতা হিন্দুদের হাতে দিয়ে যেত। ফলে আজ কাশ্মীরে যা হচ্ছে আমাদের সবার অবস্থাও তা-ই হতো। সেদিন তা মেনে নেওয়ায় আজ কমপক্ষে পাকিস্তান কিংবা পূর্ব বাংলায় হিন্দুদের অত্যাচার সহ্য করতে হচ্ছে না। পূর্ব পাকিস্তান পৃথক হয়ে বাংলাদেশ হলেও একথা সত্য যে, আজো ভারত সেদিকে প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ করতে পারছে না পাকিস্তানের ভয়ে। অবশ্য অবৈধ ব্যবসার মাধ্যমে বাংলাদেশ আজ ভারতের বাজারে পরিণত হয়েছে। খবর পাচ্ছি।

– ভারত থেকে পৃথক হয়ে পাকিস্তানের লাভ কি হলো? অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক অবস্থা যেমন ছিলো তেমনই তো আছে। ভারতের কালচার, হিন্দী ছবি ও অবৈধ মাল সবই তো চলছে এখানে?

: তাদের অনেক কিছু আমাদের দেশে চলছে সত্য, কিন্তু নিয়ন্ত্রণটা তাদের হাতে নয়। তাছাড়া ভারতের মার্কেটে গিয়ে দেখ পাকিস্তানের মালও প্রচুর আছে। কিন্তু কথা হলো, এখন তো উপমহাদেশের মুসলমানদের দাঁড়ানোর মতো, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার মতো জায়গা আছে। দেখ, শেখ মুজিব একাত্তরের পর ১৯৭৪-এ প্রথম পাকিস্তান সফর করে। এই সফর ছিলো তার স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলা। ফলে দেশে ফিরে সে ভারতের প্রতি আঙ্গুল উঁচিয়ে বলতে পেরেছে "তোমরা ভুলে যেও না আমরা বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ"- এই সাহসের প্রেরণা সে কোথায় পেলো? পাকিস্তান না থাকলে উপমহাদেশের রাজনীতি একা ভারত এবং হিন্দুদের নিয়ন্ত্রণে থাকতো। আজ ভারত যেমন সুপার পাওয়ার, তেমনি পাকিস্তানও। আজ যদি উভয় পাকিস্তান এক থাকতো, তবে অবস্থা ভিন্ন হতো। একটা বিরাট শক্তি হতো।

– ভারতের বুকে যারা পাকিস্তানের স্বপ্ন দেখতেন, তাদের স্লোগান ছিলো—"পাকিস্তান কা মতলব কেয়া—লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।" এখন কথা হলো, পাকিস্তানে কালেমার শাসন কতটুকু প্রতিষ্ঠিত হয়েছে?

: পাকিস্তানের মূল সমস্যা তো এটাই। যদি 'লা ইলাহার' শাসন হতো, তবে তো সমস্যাই ছিলো না। আজ তো পাকিস্তানে এই দাবিতে আন্দোলন চলছে।

– বর্তমানে তো আন্দোলনের কোনো প্রয়োজন থাকার কথা নয়, যেহেতু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাকারী সংগঠন মুসলিম লীগ ক্ষমতায়?

: ইভেন দ্যান। মুসলিম লীগ সরকার হওয়ার পরও যেটা করা উচিত, নওয়াজ শরীফ সরকার তা করছে না। ফলে আন্দোলন চলছে। এভাবেই যেতে হবে। ইসলামের ইতিহাসে দেখ কোনোদিনই কোনো কিছু হুট করে হয়ে যায়নি। আস্তে আস্তে করতে হবে।

– আফগানিস্তানে বর্তমানে ইসলামী শরিয়তভিত্তিক শাসন চলছে। তাদের পক্ষে অল্প দিনে যা সম্ভব হলো, পাকিস্তানের পক্ষে তা সম্ভব নয় কেন?

: পাকিস্তান দীর্ঘদিন ইংরেজশাসিত ছিলো এবং আমরা তা ইংরেজদের হাত থেকে এনেছি। আফগানিস্তানকে ইংরেজরা শাসন করতে পারেনি। এখন কথা হলো, ইংরেজ শাসনের পরিবর্তন করবে পাকিস্তানিরা। তারা তা করছে না। তাই বলে পাকিস্তানের তো অপরাধ নয়। পিপলস পার্টি ক্ষমতায় থাকতে তাদেরকে সেক্যুলার বলে গালিগালাজ করা যেত, কিন্তু এখন মুসলিম লীগও কিছু করছে না। তাই আন্দোলন করতে হচ্ছে।

– মুসলিম লীগ কেন করছে না?

: পারে না।

– কেন পারে না?

: কারণ তার শিক্ষায়-ই তা নেই। সেও লোভী।

: আপনি কি বলতে চাচ্ছেন যে, ইসলামিক গণতান্ত্রিক পাকিস্তানের শিক্ষা ব্যবস্থা সেক্যুলার বলে ইসলামী আইন কায়েম করা যাচ্ছে না?

: না, এটা কথা নয়। এখানকার শিক্ষা ব্যবস্থায় ইসলাম শিখতে কোনো প্রতিবন্ধকতা নেই। সমস্যা হচ্ছে দেশের পরিচালকরা। এখনো ইংরেজের আইন চলে। ইংরেজি ভাষায় ফাইল চলে। অথচ উর্দু আর বাংলা ভাষা নিয়ে কত আন্দোলন হলো। শোন, যখন বাংলা রাষ্ট্রভাষা হয়ে গেলো, তখন আতাউর রহমান খানের মন্ত্রীসভা। আমি সেখানে প্রথম ব্যক্তি, যে বাংলা ভাষায় ফাইল লেখা শুরু করি। মনোরঞ্জন ধর ছিলো তখন অর্থমন্ত্রী। আমি যখন তাকে বাংলায় টাইপ করে দরখাস্ত দিলাম, সে নামঞ্জুর করে দিলো। ফলে, কেবিনেটে পাস হলো না। অথচ পার্লামেন্ট কর্তৃক স্বীকৃত বাংলা পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা। পূর্ব পাকিস্তানের অফিস-আদালতে এই ভাষা চলবে। অথচ সে আমার দরখাস্তই গ্রহণ করলো না। তেমনি পশ্চিম পাকিস্তানেও কেউ উর্দুতে ফাইল লিখে না। আজো না। তবে আমি লিখি। আমার কাছে কেউ উর্দুতে লিখলে

আমি উর্দুতে লিখি। ইংরেজিতে লিখলে ইংরেজিতে লিখি। দেখো, কোনো জিনিস শুধু সংবিধানে থাকলেই হয় না। আমল করার প্রয়োজন হয়।

– আপনার সঙ্গে দীর্ঘ আলাপ হলো। শেষ পর্যায়ে আপনার ব্যক্তিগত কোনো কথা আছে কি?

: তোমাকে আমি আখেরি কথা বলে দেই যে, এখনো সময় আছে সংশোধনের। ব্যাপার যাই হোক, সঠিক পথে সংশোধন হওয়া প্রয়োজন। কারো ন্যায্য অধিকার হরণ করে নয়। সবার ন্যায্য অধিকারের ভিত্তিতে সমঝোতা প্রয়োজন। ২৭ বছর হয়ে গেলো পৃথকতার। যেভাবেই হোক এ পৃথকতা, আমি বলবো ভারত-আমেরিকা মিলে আমাদেরকে ভেঙ্গে দুর্বল করেছে, আর তোমরা বলবে লিবারেশনের মাধ্যমে স্বাধীন হয়েছো। অথচ স্পষ্ট কথা, ইন্ডিয়ান আর্মি না হলে এই লিবারেশন সম্ভব হতো না।

– আপনি কি বলতে চাচ্ছেন, পাকবাহিনী ভারতের কাছে পরাজিত হয়েছে?

: হ্যাঁ, হ্যাঁ। এটাই বাস্তবতা। নিয়াজী তো কোনো বাঙালির কাছে আত্মসমর্পণ করেনি। মজার ব্যাপার কি জানো? বাংলাদেশী অনেকে বলে, ১৯৭১ সালে বাঙালিরা পাঞ্জাবিদেরকে পরাজিত করেছে। অথচ ওরা জানে না, অরোরা এবং নিয়াজী উভয়ই পাঞ্জাবি। তাই এখানে আমাদের বাঙালিদের গর্ব করার কিছু নেই। বাস্তবতা হচ্ছে পাঞ্জাবির কাছে পাঞ্জাবির আত্মসমর্পণ। অথবা হিন্দু কর্তৃক প্রেরিত শিখ পাঞ্জাবির কাছে মুসলিম পাঞ্জাবির আত্মসমর্পণ।

– জনাব, আপনি যা-ই বলুন, বাস্তবে লড়াইটা করেছে বাঙালিরা। বাঙালিদের লড়াইয়ের কাছেই পাকসেনারা পরাজিত হয়েছে। শেষ পর্যায়ে আমাদের নেতৃত্বের দুর্বলতার সুযোগে গেইমটা ভারত নিয়ে গেলেও সফলতা প্রকৃতপক্ষে আমাদেরই হয়েছে?

: দেখ, আমি বলছি না বাঙালি যুদ্ধ করেনি। আমি বলি, বাঙালি যদি ফ্রন্ট লাইনে না থাকতো, তবে ভারত পাকিস্তানের মাটিতে পা রাখতেই সাহস পেতো না। কিন্তু স্মরণ রেখ, তারা প্রথম থেকেই এর সঙ্গে যুক্ত ছিলো। নক্সা থেকে শুরু করে ট্রেনিং পর্যন্ত তারা দিয়েছে। যাই হোক, তা আজ আর বিষয় নয়। বিদ্রোহ-বিপ্লব অনেক দেশেই হয় তা আবার থেমে যায়। পূর্ব পাকিস্তানেও তেমনি হতো। এখন কথা হলো, যা হবার হয়ে গেছে। বিগত ২৭ বছর থেকে শিক্ষা নেওয়া প্রয়োজন। বাঙালি জাতীয়তাবাদ যদি সত্য হতো, তবে এখনো কেন পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিরা হিন্দু শাসকদের ছেড়ে বাংলাদেশের সঙ্গে মিলিত হচ্ছে না? ওরা আসবে না। কারণ বাংলাদেশের শাসকরা ধর্মীয় বিশ্বাসে মুসলমান। আর ওপারের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণ হিন্দু। এ থেকে প্রমাণিত হয়, ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদ সত্য নয়। ধর্মের একটা ব্যাপার থাকে সর্বদা। তাই আমি বলি— ONE NATION TWO STATE।

– এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য কি?

: অর্থাৎ যদিও বাংলাদেশ-পাকিস্তান দুই দেশ, কিন্তু বাস্তবে আমরা এক জাতি। তাই যার যার দেশের পরিচালনা নিজেরাই করবে। তবে প্রয়োজনে একে-অন্যকে সাহায্য

করবে এবং বহির্বিশ্বের সঙ্গে মোকাবেলায় উভয় এক হয়ে শত্রুকে বুঝিয়ে দেব, আমরা এক জাতি। আমরা মুসলমান। মোটকথা, আমাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য শেরেবাংলার লাহোর প্রস্তাবমতো পাকিস্তান গড়ে তোলা।

– শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ONE NATION ONE STATE নীতিকে গ্রহণ না করে শেরেবাংলার ONE NATION TWO STATE নীতির ভিত্তিতে যদি পাকিস্তান হতো তবে এত সমস্যা হতো না। কিন্তু এখন অনেক পানি প্রবাহিত হয়ে গেছে। এখন আর পেছনে যাওয়ার সুযোগ নেই। তবুও বন্ধুত্বপূর্ণ একটা সম্পর্ক গড়ে উঠতো যদি পাকিস্তান আমাদের ন্যায্য পাওনা দিয়ে দিত। আমাদের হক আত্মসাৎ করে আমাদেরকে ভাই বলবেন তা হয় কিভাবে?

: দেখ, '৭৪-এ একথাই আমি শেখ মুজিবকে বলেছিলাম। এসো বসি, দেখি কার কি ন্যায্য পাওনা। তা ছাড়া আমার ONE NATION ONE STATE- এর সংবিধানেও তা লেখা আছে যে, একসঙ্গে বসে আলোচনা করতে হবে কার কি অধিকার তা নিয়ে। দেখ দু' ভাইয়ের মধ্যে সংঘাত হয় আবার মীমাংসাও হয়। ভারতের সমর্থন নিয়ে সোভিয়েত সৈন্যরা আফগানিস্তানে আক্রমণ করলো, তখন পাকিস্তান আফগানিস্তানের পক্ষ নিলো। অন্যদিকে বাংলাদেশের মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান মুসলিম বিশ্বকে সংঘবদ্ধ করে রাশিয়ার হাত থেকে আফগানিস্তানকে রক্ষার প্রচুর সাহায্য করলো। এ থেকেই প্রমাণিত হয়, বিভিন্ন দেশে বসবাস করে বিভিন্ন ভাষায় কথা বললেও জাতিতে আমরা এক।

– দেখুন, আমরা বাংলার মুসলমানরা সর্বদা মুসলিম উম্মাহ্র ঐক্যের পক্ষে। প্রেসিডেন্ট জিয়ার কথা তো আপনি নিজেই স্বীকার করলেন যে, মুসলিম উম্মাহকে এক প্লাটফরমে আনতে চেষ্টা করেছেন।

: চেষ্টা শুধু নয়। সে নিয়ে এসেছিলো।

– অন্যদিকে এত কিছুর পরও পাকিস্তানের মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক বাংলাদেশে গেলে সাধারণ মানুষ তাকে বিপুল স্বাগত জানায়। তিনি যখন চোখ মুছে মুছে বললেন : "হামারা মুলুক জুদা হো গিয়া লেকিন হামারা খুন জুদা নেহী হোগা।" তখন বাঙালিরা তাকে শ্রদ্ধা জানিয়েছে। জিয়াউল হকের হৃদয়ে যে উদারতা ছিলো, তা যদি একাত্তর-পূর্ব সরকারগুলোর ভেতর থাকতো, তবে কি এত কিছু ঘটতো?

: হ্যাঁ, জিয়াউল হক এক অসাধারণ মানুষ ছিলো। সাইক্লোনের সময় গিয়েছিলো। আমিই তাকে প্রথম বলেছিলাম বাংলাদেশে সাহায্য পাঠানো প্রয়োজন। সে বললো, অবশ্যই প্রয়োজন, কিন্তু টাকা যে নেই। আমি একটা আইডিয়া দিলাম। সে দায়িত্বটা আমাকে দিলো। আমি এক থেকে দশ রূপী পর্যন্ত কুপন ছাপিয়ে সব ব্যাংকে রেখে দিলাম বিক্রির জন্য এবং STATE BANK-M-কে বললাম, তোমরা তদারক কর কোথায় কত জমা হয়। ৪৫ দিন পর STATE BANK জানালো ৪ কোটি ৭২ লাখ

রূপী জমা হয়েছে। আজকের হিসেবে অনেক টাকা। জিয়াউল হক আমায় বললো নিয়ে যেতে। আমি বললাম তা হবে না। তোমরা বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিলেও আমি দেইনি। আমার পাসপোর্টে বাংলাদেশের ভিসা লাগাবো না। তুমি নিয়ে যাও। এরপর সে নিয়ে গেলো। ফিরে এসে খুব খুশি প্রকাশ করলো। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার কি মনে হয়, যারা পাকিস্তানের জনক, তারা কোনোদিন পাকিস্তান ছেড়ে যেতো? কিন্তু ওদেরকে বাধ্য করা হয়েছে। সে বললো, তারা আমায় যেভাবে স্বাগত জানিয়েছে, তাতে তা-ই তো মনে হয়।

– আপনি বাংলাদেশকে স্বীকারই করছেন না; অথচ আপনার দর্শন হচ্ছে ONE NATION TWO STATE। এখানে তো আপনি পৃথক রাষ্ট্রের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিচ্ছেন?

: দেখ, আমেরিকায় ৫২টি স্টেইট আছে। আমি তেমনি বলছি।

– তাহলে কি আপনি কনফেডারেশনের কথা বলছেন?

: না। আমি বলছি আসুন বসে আলোচনার ভিত্তিতে এমন পদ্ধতি গ্রহণ করবো, যা আগামী রাজনীতিতে নতুন সংযুক্তি হিসেবে প্রকাশ পাবে।

– তাহলে আপনার ONE NATION TWO STATE গণতন্ত্রের মতোই একটি ফালতু স্লোগান মাত্র। এখানে কোনো আইডিয়া নেই, আপনাদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে কি হবে?

: ফালতু নয়। কথা হলো আমি যে আইডিয়া দেবো, তা কি তুমি গ্রহণ করবে? তাই বলি, বসে তোমার ও আমার মতামত মতো আইডিয়া তৈরি করা।

– আপনি কি ব্যারিস্টার আজহারদের মতো আজো বাংলাদেশকে পূর্ব পাকিস্তান বলতে চান?

: চা-ই কি শুধু? বলেও থাকি।

– এটা কি পাগলামী নয় যে, ২৭ বছর পরও আপনি সাদাকে কালো বলছেন? তবে স্মরণ রাখবেন, আপনার বলা না বলায় বাংলাদেশের কোনো লাভ-ক্ষতি হবে না। বাংলাদেশ আছে এবং থাকবে।

: আরে মিয়া শোন (কিছুটা রেগে)। আমি অর্ধেক বাংলা নিয়ে বাংলাদেশ বলবো কেন? আমি তো চাই নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার বাংলা। যেদিন বেঙ্গল, আসাম ও পূর্ণিয়া জেলার কিছু অংশ নিয়ে বাংলা হবে, সেদিন মাহমুদ আলী বাংলাদেশ বলবে। আমি চাই পূর্ণ বাংলা।

– পাকিস্তানও যে দাবিমতো হয়নি? তাহলে এটাকে পাকিস্তান না বলে হিন্দুস্তান বলুন।

: আজো পাকিস্তান পূর্ণাঙ্গ হয়নি। আমাদের সংগঠন 'তাহরীকে তাকমীল'-এ পাকিস্তানের অর্থই পূর্ণাঙ্গ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত করা।

– পূর্ণাঙ্গ যখন হয়নি তবে অস্বীকার করুন, যেভাবে বাংলাদেশকে করছেন?

: স্বীকৃতি অন্য ব্যাপার। বাংলাদেশ বলে আরেক দেশের কি প্রয়োজন? নামে তো কোন সমস্যা ছিলো না। পূর্ব পাকিস্তানে যে সমস্যা ছিল, তা কি আজকের বাংলাদেশে নেই? দেখ আসল সমস্যা হলো পূর্ব পাকিস্তানে জায়গা কম, জনসংখ্যা বেশি। যদি প্লান মতো হতো, তবে পূর্ব পাকিস্তানে জনসংখ্যার সমস্যা হতো না।

– দেখুন জনাব, আপনি যে দর্শন বাজারে বিকাতে চাচ্ছেন, তা স্বাধীন বাংলায় চলবে না। কারণ, আপনি সাদাকে কালো দেখেন। অথচ বিলিজের স্পর্শে কালো রং প্রায় ২৭ বছর আগে চলে গেছে। এখন বাংলাদেশই সত্য।

: হা-হা-হা (এক অট্টহাসি)। মবনু মিয়া, আমারে হাসাইলা। কিছুদিন পরে বুঝবে মাহমুদ আলী কি বলতে চেয়েছিলো।

– প্রকৃতপক্ষে আপনি বাস্তবতা অস্বীকার করছেন। ব্যারিস্টার আজহারদের মতো আপনিও পাগলামী করছেন।

: না না, এটা সমস্যা নয়। তুমি স্টেইটের কি ব্যাখ্যা দেবে আমি কি দেব তা ভিন্ন কথা।

: দুধ স্তন থেকে বেরিয়ে গেলে আর ঢুকানো যায় না। শেরেবাংলার কথামতো হয়ে গেলে ছিলো ভিন্ন কথা। কিন্তু সোহরাওয়ার্দীর প্রস্তাবমতো হয়ে ভেঙ্গে যাওয়ার ফলে ভিন্ন অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। তাই বুকে হাত দিয়ে বলতে পারি, আমরা আর পাকিস্তানি হবো না।

: দেখ, একদিন সবাই বলবে মাহমুদ আলী যা বলেছে, তা-ই সত্য। আমি সে দিনের অপেক্ষায় থাকলাম।

– জনাব, আপনার সে দিন কোনো দিন আসবে না। '৪৭-এ যারা আমাদেরকে ছেড়ে ভারতে গেছে, তারা চায় বাংলাদেশ ভারতের সঙ্গে মিশে যাক। আবার '৭১-এ আপনারা যারা পাকিস্তানে এসেছেন, তারা চান বাংলাদেশ আবার পাকিস্তান হয়ে যাক। আর আমরা যারা বাংলাদেশি, তারা বলি, আমরা যেমন '৪৭-এর ভারতীয় নির্যাতনের কথা ভুলিনি, তেমনি '৭১-এর পাকিস্তানি নির্যাতনের কথাও ভুলব না। তাই আমরা দাঁড়িয়ে থাকতে চাই, প্রতিষ্ঠা চাই আমাদের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব নিয়ে। তাই বলছি, আপনার স্বপ্ন কোনোদিন বাস্তবে রূপ নেবে না।

: রূপ নেবে। একদিন নেবে। সোভিয়েতের যে অবস্থা হয়েছে, তা কি কেউ দু'দিন আগেও বুঝতে পেরেছে? জার্মান আবার এক হয়েছে।

– দু' জার্মানের মধ্যে মাত্র এক দেয়ালের ব্যবধান আর পাক-বাংলার মধ্যে ব্যবধান এগারো শ' মাইলের।

: আবার যুক্তরাষ্ট্রের হাওয়াই-এর সঙ্গে আমেরিকার ব্যবধান পাঁচ হাজার মাইলের।

– ওদের মাঝখানে কোনো শত্রু রাষ্ট্র নেই। কিন্তু এখানে পাক-বাংলার মধ্যখানে শত্রু রাষ্ট্র রয়েছে।

: আলাস্কা আর আমেরিকার মধ্যখানে কানাডা। যা পৃথক স্বাধীন একটি দেশ। দু'দেশের মধ্যখানে ভারতের মত দেশের কত উদাহরণ নেবে?

– যুক্তি আর বাস্তবতা এক হয় না অনেক সময়। পাক-বাংলার ব্যাপারেও তাই। মানসিক ও সাংস্কৃতিকভাবেই বাংলাদেশী মুসলমান আর পাকিস্তানি মুসলমান এক নয়। ওরা সামাজিকভাবে একে-অন্যকে হিংসা করে।

: সিলেটি আর নন-সিলেটির মধ্যে হিংসাহিংসি কি নেই? পাকিস্তান হওয়ার সময় সিলেটিরা সবচাইতে এগিয়ে ছিলো শিক্ষা ও অর্থের দিক থেকে। আজও মনে হয় আছে। তাই অন্য জেলার লোকেরা হিংসা করতো। আমি পাকিস্তান ডাক বিভাগের দায়িত্বে থাকাকালীন সময় আমার সেক্রেটারি ছিলো গিয়াস উদ্দিন চৌধুরী। তাঁর ছেলে মুহসিন আলী বর্তমানে পাকিস্তানে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত। সে সিলেটি। এর আগে ছিলো সিলেটের শফি সামী। পাকিস্তান হওয়ার পর ১৭ জন মুন্সেফ নিয়োগ দেয়া হলো। ইন্টারভিউতে ১৭ জনই পাস করলো সিলেটি। অন্য জেলার কেউ পাস করলো না। ফলে ওরা আমাদেরকে হিংসার চোখে দেখতো। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের ব্যাপার অনেকটা সে রকম-ই। আস্তে আস্তে এগুলো দূর হবে।

– আপনি অপেক্ষা করতে থাকুন। আমাদেরকে বিদায় দিন। সময় দেওয়ার জন্য অনেক ধন্যবাদ।

: তোমাকেও ধন্যবাদ।

"পাকিস্তানে ভুট্টো সাহেবরা প্রচার করলেন বাংলাদেশে হিন্দুদের সঙ্গে লড়াই চলছে। ফলে এখানের মানুষের বদ ধারণা সৃষ্টি হলো। অথচ আমি দেখেছি, পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমান পশ্চিম পাকিস্তানের মুসলমান থেকে ধার্মিক। আর ভুট্টো সাহেবরা তো সেক্যুলার ছিলেন"

—মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী ('৭১-এ পূর্ব পাকিস্তানের গর্ভনরের উপদেষ্টা)

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসের সচেতন পাঠকদের কাছে অতি পরিচিত একটি নাম রাও ফরমান আলী। ১৯৬৭ সাল থেকে একাত্তর পর্যন্ত তিনি বাংলাদেশে (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) ছিলেন। প্রথম দুই বছর সেনাবাহিনীর অফিসারের দায়িত্বে থাকার পর ১৯৬৯ সালে তাকে গভর্নরের উপদেষ্টা নিয়োগ করা হয়। পাকবাহিনীর পরাজয়ের পর থেকে ১৯৭৪ সালে পর্যন্ত ভারতের জেলে ছিলেন। সত্তরোধ্ব বৃদ্ধ সাবেক এই সেনা অফিসার বর্তমানে ইসলামাবাদে আছেন। ২২ মার্চ ১৯৯৯ সালের বিকালে উপস্থিত হলাম তার ইসলামাবাদস্থ বাসায়। পরিচিতি পর্ব টেলিফোনে শেষ হয়ে যাওয়ায় তিনি আমাদের অপেক্ষায় ছিলেন। সালাম-কালামের পর জানতে চাইলাম— কেমন আছেন? হাসতে হাসতে বললেন, বৃদ্ধ বয়সে মানুষ যেমন থাকে।

– একাত্তরে পাকিস্তান পক্ষের একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি আপনি। একাত্তর সম্পর্কে কি কিছু বলবেন? আপনার দৃষ্টিতে কে দায়ী?

রাও ফরমান আলী : দেখুন, একাত্তরের ব্যাপারে কোনো এক ব্যক্তি বা গ্রুপকে দোষী হিসেবে চিহ্নিত করা যাবে না। এটা তৈরি হয়েছে সরকার থেকে শুরু করে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের কর্মতৎপরতা থেকে। একাত্তরের সূচনা প্রকৃতপক্ষে পাকিস্তানের জন্মের অনেক আগে। একাত্তরে এসে তার বিস্ফোরণ ঘটেছে। লাহোর প্রস্তাবের পর বাংলার মুসলিম নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী কায়দে আজমের কাছে প্রস্তাব করলেন, চৌধুরী রহমত আলীর প্লান মতো সম্পূর্ণ বাংলা ও আসাম নিয়ে স্বাধীন যুক্ত বাংলা গঠনের। জিন্নাহ বললেন, সামনে অগ্রসর হও। সোহরাওয়ার্দী সাহেব যখন এই পথে অগ্রসর হতে লাগলেন, তখন হিন্দুরা প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ালো। তারা ভাবলো, সম্পূর্ণ বাংলা ও আসাম নিয়ে যদি যুক্ত বাংলা হয়, তবে মুসলমানরা সংখ্যায় বেশি হয়ে যাবে। ক্ষমতা তাদের হাতে থাকবে। কংগ্রেস বললো, আমাদের অসুবিধা নেই যুক্ত বাংলার ব্যাপারে, কিন্তু তা হতে হবে ভারতের অংশ। গান্ধীজীরও মৌন সমর্থন ছিলো তাই। সোহরাওয়ার্দী দেখলেন শেষ পর্যন্ত সব যাবে। তাই তিনি ১৯৪৬ সালের ১০ এপ্রিল মুসলিম লীগের দিল্লীর অধিবেশনে ইউনাইটেড পাকিস্তানের প্রস্তাব করলেন এবং তা পাস হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত এভাবেই পাকিস্তানের আত্মপ্রকাশ ঘটে।

যদি লাহোর প্রস্তাবমতো দুই অংশ পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র হতো, তবে দুঃখ ছিলো না। কিন্তু লজ্জাজনক ঘটনার মধ্য দিয়ে পৃথকতা সত্যই দুঃখজনক। যদিও শেরেবাংলার লাহোর

প্রস্তাবমতো পাকিস্তান না হয়ে সোহরাওয়ার্দীর দিল্লীর প্রস্তাবমতো পাকিস্তান হয়েছে হিন্দুদের প্রতিবন্ধকতার কারণে, কিন্তু তবুও সত্য যে, তাদের ভেতর থেকে তো স্বাতন্ত্র্য যায়নি এবং তা আবার ময়দানে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। আর সেই ধারাবাহিকতায় শেষ পর্যন্ত একাত্তর। এখানে উভয় অঞ্চলের নেতাদেরই ভুল কর্ম জড়িত ছিলো। তবে বিশেষ করে পশ্চিম পাকিস্তানের নেতাদের ভুল ছিলো মারাত্মক। তারা বাংলার সঙ্গে কলোনীর মতো ব্যবহার করেছেন, কোনো ন্যায্য অধিকার দিতে রাজি ছিলেন না। ওরা গণতন্ত্রের কথা বলতেন, আবার ভয় করতেন যদি ক্ষমতা বাংলায় চলে যায়। পূর্ব পাকিস্তান থেকে খাজা নাজিম উদ্দিন, মোহাম্মদ আলী বগুড়া এবং শহীদ সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। কিন্তু সোহরাওয়ার্দী ছাড়া বাকি দু'জনের কোনো জনভিত্তি ছিলো না। আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সোহরাওয়ার্দী, তাই এই দলেই মানুষ বেশি ছিলো। ওরা যখন স্বাধীনতার কথা বলেছে, সবাই তাদের পক্ষ নিয়েছে।

– পাকিস্তানের জন্ম মুসলমানদের স্বাধীনতার জন্য, ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য। কিন্তু তা তো হলো না।

: পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা নেতাদের কেউ ইসলামপন্থী ছিলেন না। পাকিস্তান তৈরির উদ্দেশ্য ছিলো হিন্দুস্তানে মুসলিম শক্তি বৃদ্ধি করা। আমাদের এই অনৈসলামিক নেতৃত্বের ফলে নিজেদের শক্তি নিজেরাই ধ্বংস করে দিলাম।

– এই সেক্যুলার নেতৃত্ব এলো কিভাবে?

: ব্রিটিশ শাসিত হিন্দুস্তানে যারা মুসলিম নেতা ছিলেন, তারা ছিলেন যোগ্যতাসম্পন্ন। গোটা ভারতবর্ষে প্রায় একই অবস্থা ছিল। তারা অনেকেই পাকিস্তানের পক্ষে ছিলেন। কিন্তু পাকিস্তান হওয়ার পর যখন নির্বাচনের ভিত্তিতে নেতৃত্ব আসতে লাগলো, তখন দেখা গেলো যারা আসছে তারা প্রকৃতপক্ষে আঞ্চলিকতার জ্বরে আক্রান্ত। এখানে যোগ্যতার কোনো গুরুত্ব ছিলো না। ফলে আন্তর্জাতিক যোগ্যতাসম্পন্ন নেতারা পেছনে যেতে লাগলেন এবং আঞ্চলিক সংঘাতগুলো জাতীয় রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার করতে লাগলো। গোটা জাতি যখন আঞ্চলিকতায় পরস্পরে প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠলো, তখন নীতি এবং ধার্মিকতার গুরুত্ব কমতে লাগলো। নেতাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হয়ে গেলো যে কোনোভাবে নির্বাচিত হওয়া। ফলে দেখা যায়, অনেক সেক্যুলার নেতাও নির্বাচনের সময় ধর্মের মুখোশ পরে সাধারণ মানুষকে ধোঁকা দিচ্ছে। এভাবেই বাংলা ও পাকিস্তানে সেক্যুলার নেতৃত্ব এসেছে।

– পাকিস্তান যেসব কারণে ভেঙ্গেছে, তার একটি সামরিক শাসন। আপনি তৎকালীন একজন সামরিক অফিসার হিসেবে এর ব্যাখ্যা কিভাবে দিবেন?

: হ্যাঁ, এটা একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ। পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে বাঙালি ছিলো না। আর সামরিক শাসন তো একমাত্র সৈন্যদের শাসন। আইয়ুব খান সব রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ ঘোষণা করলে বাঙালিরা মর্মাহত হলো। প্রথম কারণ, সেনাবাহিনীতে তাদের

লোক নেই। দ্বিতীয় কারণ, রাজনৈতিক অধিকার হরণ। রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ ঘোষিত হওয়ার পর নেতৃত্ব চলে গেলো ছাত্রদের হাতে। ছাত্রদের স্বভাবজাত ধর্ম হলো বড় বড় স্বপ্ন দেখা। পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্ররাও পৃথক হয়ে বড় বড় অফিস, আদালত, সেনাবাহিনী ইত্যাদিতে চাকরির স্বপ্ন দেখতে লাগলো। সেই স্বপ্নই তাদেরকে সামনের দিকে নিয়ে গিয়েছিলো।

– পশ্চিম পাকিস্তান আমাদের চাল-পাট সব শোষণ করে নিয়ে যেত তাই নয় কি?

: উভয়পক্ষ যে সব অপপ্রচার চালিয়েছিল, তা সর্বাংশে সত্য ছিলো না। যেমন মনে কর, বাঙালিরা বলতো, আমাদের চাল-পাট নিয়ে যাচ্ছে। তা কিন্তু সত্য ছিলো না। জনতাকে উত্তেজিত করতে এসব অপপ্রচারের প্রয়োজন ছিলো। তবে আবার কিছু কিছু প্রচার সত্যও ছিলো। যেমন বলা হতো, পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে জিনিসপত্রের মূল্য কম। একথা সত্য ছিলো। তেমনি বলা হতো পূর্ব পাকিস্তানকে শোষণ করে পশ্চিম পাকিস্তান উন্নত করা হচ্ছে। বাস্তবে ইসলামাবাদ ছাড়া পশ্চিম পাকিস্তানের কোনো অঞ্চলই পূর্ব পাকিস্তান থেকে বেশি উন্নত হয়নি। কিন্তু ওখান থেকে যারা আসতো, তারা তো শুধু ইসলামাবাদ দেখেই চলে যেত। তুমি এখনো পাকিস্তানের যে কোনো অঞ্চলের গ্রামে গিয়ে একথার সত্যতা যাচাই করে দেখতে পার।

– একাত্তরে পাকিস্তানিদের ধারণা ছিলো বাংলায় কোনো মুসলমান নেই। সৈন্যরা সেখানে কাফের হত্যা করছে?

: বললাম তো রাজনৈতিক স্বার্থে উভয় পক্ষ থেকেই অপপ্রচার হয়েছে। সবাই একের সঙ্গে তিন যোগ করেছে। পাকিস্তানের ভুট্টো সাহেবরা প্রচার করলেন বাংলাদেশে হিন্দুদের সঙ্গে লড়াই চলছে। ফলে এখানের মানুষের বদ ধারণা সৃষ্টি হলো। অথচ আমি দেখেছি, পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমান পশ্চিম পাকিস্তানের মুসলমান থেকে ধার্মিক। আর ভুট্টো সাহেবরা তো সেক্যুলার ছিলেন।

– এই অপপ্রচারের কারণ কি?

: প্রধান কারণ দূরত্ব। যদি পাশাপাশি হতো, তবে এসব অপপ্রচারে কাজ হতো না। একের সঙ্গে অন্যের বন্ধুত্ব সৃষ্টি হত।

– এই দূরত্বের কথা তো '৪৭-এর আগেও জিন্নাহ সাহেবের সামনে ব্রিটিশরা উপস্থাপন করেছিলো?

: আমি তো বললামই, পাকিস্তান আন্দোলনের প্রথম দাবি ছিলো পূর্ব ও পশ্চিম নিয়ে পৃথক দু'টি রাষ্ট্র গঠন করা। স্বয়ং গান্ধীজী বেঙ্গল ও আসাম নিয়ে পৃথক রাষ্ট্রের বিরোধিতা করলেন। এর পর অনেক আন্দোলনের মাধ্যমে বেঙ্গলের অর্ধেক এবং আসামের কিছু অংশ নিয়ে পূর্ব পাকিস্তান হলো। সোহরাওয়ার্দীর প্রস্তাবে শেষ পর্যন্ত এক পাকিস্তান হলো। সেই সময় সোহরাওয়ার্দীর অনেক ভাষণে এসব কথা বারবার এসেছে। খতিয়ে দেখতে পার, কেন এত দূরত্বের পরও এক পাকিস্তান হলো? তবে বুঝবে, সেদিনের এই সিদ্ধান্ত ভুল ছিলো না। যদি সেদিন সোহরাওয়ার্দী সিদ্ধান্ত নিতে

ভুল করতেন, তবে হয়তো বাংলার অবস্থা কাশ্মীরের মতো হতো। সোহরাওয়ার্দী সুবিজ্ঞ নেতা ছিলেন।

– একাত্তরের ২৫ মার্চ আপনারা যে মিলিটারি এ্যাকশনে গেলেন— এর কারণ কি?

: নির্বাচনে মুজিব বিজয়ী হলেন। ভুট্টো সাহেব দুই মেজরিটি পার্টি দাবি করে সমস্যা সৃষ্টি করলেন। ভুট্টো সাহেবের এই দাবির বিরুদ্ধে আমি প্রেসিডেন্ট সাহেব (ইয়াহিয়া)-কে বলেছি। সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তাব করেছি, শেখ মুজিবকে প্রধানমন্ত্রী করা হোক। সে নির্বাচিত নেতা। এক দেশে তো দুই প্রধানমন্ত্রী হতে পারে না।

– তখন আপনি কোন্ দায়িত্বে ছিলেন?

: গভর্নরের উপদেষ্টা। পূর্ব পাকিস্তানে আমি '৬৭ থেকে '৬৮ এই দু'বছর সেনাবাহিনীর দায়িত্বে ছিলাম। এর পর থেকে '৭১-এর ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত গভর্নরের উপদেষ্টা। এটা বিষহীন সাপের মতো একটা দায়িত্ব। নিজস্ব কোনো অফিস ছিলো না। গভর্নর হাউসেই থাকতাম। নির্বাচনের পর প্রেসিডেন্ট আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, কি করা! বলেছিলাম, নির্বাচিত প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা দেয়া হোক। তা করা হলো না। ২৪ ফেব্রুয়ারি কিংবা ১ মার্চ কেন্দ্র থেকে বলা হলো ৩ মার্চ যে পার্লামেন্ট বৈঠক হওয়ার কথা ছিলো তা হবে না। ফলে পূর্ব পাকিস্তানে প্রতিবাদ আন্দোলন শুরু হলো। শেখ মুজিব ৭ মার্চ পল্টন ময়দানে ঘোষণা দিলেন অসহযোগ আন্দোলনের। ১৬ মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া পূর্ব পাকিস্তান গেলেন। ১৭ ও ১৮ মার্চ দু'দিনের আলোচনার মাধ্যমে উভয়ের মধ্যে সমঝোতা হলো। কিন্তু তা কার্যকর করতে ভুট্টো সাহেবের মতামতের প্রয়োজন ছিলো। ১৯ মার্চ তিনি ঢাকায় পৌঁছেন। প্রেসিডেন্ট বললেন, আমি নির্বাচিত প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে বিদায় নেব। ভুট্টো সাহেব বললেন, আপনি আলোচনা ছাড়া ক্ষমতা হস্তান্তর করতে পারেন না। মুজিব বললেন, জনতার রায়ের পর এ ব্যাপারে আর কোনো আলোচনার প্রয়োজন নেই। এখানে আবার মতানৈক্য দেখা দিলো।

২৩ মার্চ 'ইয়াওমে পাকিস্তান'। মুজিব এই দিন তার বাড়িতে পাকিস্তানের পতাকার পরিবর্তে বাংলাদেশি পতাকা উত্তোলন করলেন। বাংলাদেশি পতাকা গাড়িতে উড়িয়ে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করতে আসেন। অনেকে এর বিরুদ্ধে কথা বললেও প্রেসিডেন্ট ছিলেন নীরব। এদিকে গোটা দেশের সেনাবাহিনী ছিলো অবরোধের মুখে। ২৪ মার্চ প্রেসিডেন্টের নির্দেশে সেনাবাহিনী নিজেদের হাতে ক্ষমতা নিয়ে নেয়। এরপর শুরু হয় এ্যাকশন। এডমিরাল এস এম, আমি এবং সাহেবজাদা ইয়াকুব খান লিখিতভাবে মিলিটারি এ্যাকশনের বিরোধিতা করেছি। আমাদের প্রস্তাব ছিলো রাজনৈতিক আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করা হোক। এটা সম্ভব ছিলো। রাত দশটা-এগারোটার দিকে সেনাবাহিনীর এক ইউনিট ঢাকা থেকে নারায়ণগঞ্জ যেতে চাইলে ছাত্র-জনতার পিকেটিং-এ আটকা পড়ে। এ সময় একদল পুলিশ সেনাবাহিনীর ইউনিটে গুলি চালায়। প্রথম সংঘাতটা এভাবেই শুরু হয়। সেনাবাহিনীর কাছে শক্তিশালী অস্ত্র ছিলো তাই বাঙালিরা বেশি আহত হলো, প্রাণ হারালো।

তোমার প্রশ্ন ছিলো এ্যাকশনের কারণ কি? প্রকৃত কারণ তো ইয়াহিয়া ও ভুট্টো সাহেব বলতে পারবেন। তবে ধারণার ভিত্তিতে আমি দুটো কারণ বলতে পারি।

প্রথমত হতে পারে, সেনাবাহিনীর প্যারালাল সরকার গঠনের লক্ষ্যে এ্যাকশন। দ্বিতীয়ত হতে পারে শেখ মুজিব কর্তৃক সরকার অস্বীকার করায় বাস্তবিক অর্থে পূর্ব পাকিস্তানে কোনো সরকার ছিলো না। তাই নতুন সরকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা।

– একাত্তরে যে রাজাকার বাহিনী গঠন করেছিলেন, তার উদ্দেশ্য কি বাঙালি দিয়ে বাঙালিকে ধ্বংস করা ছিলো?

: না, না। একাত্তরে এ উদ্দেশ্যে রাজাকার বাহিনী গঠন করা হয়নি। মুজাহিদ বাহিনী ও রাজাকার বাহিনী গঠন করা হয়েছিলো হিন্দুস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ সংঘটনের প্রশ্নে। ১৯৬৫ সালের যুদ্ধে বাঙালিরা সাহসী ভূমিকা রেখেছিল।

– অনেকে মনে করেন, আইয়ুব খানের ওপর আমেরিকার ভূত আছর করেছিলো। এশিয়ার রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তারের উদ্দেশ্যে আমেরিকা চায়নি পাকিস্তান শক্তিশালী হোক। তাই আইয়ুব খানকে দিয়ে পাকিস্তান ভাঙ্গার ব্যবস্থা করেছে— তাদের এ তথ্যটি সঠিক?

: আইয়ুব খানের কারণে পাকিস্তান ভেঙ্গেছে, এ কথা সঠিক নয়। সে তো রাজনৈতিকভাবে পূর্ব পাকিস্তানকে প্রাপ্য অধিকার দিতে চেয়েছে। এ নিয়ে আব্দুস সবুর খানের সঙ্গে তার আলাপও হয়েছিলো।

– কি নিয়ে?

: সবুর খানকে সে বলেছিলো, তোমরা পৃথক হয়ে দেশ চালাও। সবুর খান পাকিস্তান ভাঙতে চাননি। আইয়ুব খানের সঙ্গে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট কেনেডির সম্পর্ক তেমন ভালো ছিলো না। আইয়ুব খান অত্যন্ত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোক ছিলেন। তৎকালীন দুনিয়ার শাসকদের মধ্যে চেহারায় ও লম্বায় অত্যন্ত আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন তিনি। আর কিছুর জন্য না হলেও শুধু এই কারণে তিনি বিশ্বে দ্রুত পরিচিতি লাভ করেছিলেন। প্রেসিডেন্ট কেনেডি সাহেবের স্ত্রী আইয়ুবের প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছিলেন। (তুমি এ সব লিখবে না কিন্তু)। তাই একদিন কেনেডি আইয়ুব খানকে বললেন, "তুমি নিজেকে অনেক কিছু ভাবতে শুরু করেছো। তোমার সাইজটা একটু ছোট কর।"

আসলেই আইয়ুব যেমন লম্বা ছিলেন, তেমনি ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ছিলেন। স্বয়ং ভারতের রাজনীতিকরা পর্যন্ত বলতেন, "আমাদের দেশে একজন আইয়ুবের প্রয়োজন।" মোটকথা, তৎকালীন সময় তিনি এশিয়ার টাইগার ছিলেন। তিনি আমেরিকাকে পরিষ্কার বলে দিয়েছিলেন— "পাকিস্তান বন্ধু চায় মাস্টার চায় না।" আজকের মতো সে দিনও আমেরিকা শক্তিশালী ছিলো। তারা চায়নি কেউ মাথা উঁচু করে দাঁড়াক। এদিকে বিবেচনা করলে হয়তবা তুমি বলতে পার, আইয়ুবের প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে পাকিস্তানকে ভেঙ্গে দেয়া হয়েছে। তা ছাড়া আরেকটি কারণে আইয়ুব খানকে দায়ী করা যায়, তা হলো মোনায়েম খানকে গভর্নর নিয়োগ করে দীর্ঘদিন রাখা। মোনায়েম খান সাহেবের বাঙালি জনসাধারণের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক ছিলো না। তিনি সব সময় পশ্চিম

পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন। প্রাদেশিক গভর্নরের দায়িত্ব হয় স্থানীয় জনসাধারণের সঙ্গে কেন্দ্রের যোগাযোগ করা। তিনি এতে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন। তার কারণে স্থানীয় ছাত্র-জনতা, রাজনীতিক, শ্রমিকরা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। সে সময় ব্যক্তিগত সফরে আমি পূর্ব পাকিস্তানে গিয়ে দেখেছি, মানুষ যতটুকু আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে, তা থেকে বেশি মোনায়েম খানের বিরুদ্ধে। মোনায়েম খানকে বাংলার কেউ পছন্দ করতো না। ফলে দেশ বিভক্তির দিকে অগ্রসর হতে থাকে।

– একাত্তরে আপনি ঘটনাস্থলে ছিলেন। যা হয়েছে তা কি আপনি জুলুম মনে করেন?

: এটা অবশ্যই জুলুম। তবে কমবেশি দু'পক্ষই জুলুম করেছে। প্রথম দিকে বাঙালিরা যে এ্যাকশনে গিয়েছিলো, তাও কিন্তু জুলুম ছিলো।

– আপনার কথা আমি বুঝতে পারছি না।

: উর্দুভাষী বলে বাঙালিরা বিহারীদেরকে হত্যা, নির্যাতন করেছে। রংপুর-সৈয়দপুর অঞ্চলে ৭ মার্চ থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত বিহারীদেরকে কতলে আম (গণহত্যা) করা হয়েছে। ময়মনসিংহে চারশ' পশ্চিম পাকিস্তানিকে হত্যা করা হয়েছে। ব্রাহ্মণবাড়ীয়াতে প্রচুর বিহারীকে হত্যা করা হয়েছে। মেজর রহিম যখন ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ক্লিয়ার করেন, তখন প্রচুর পশ্চিম পাকিস্তানি ও বিহারী শিশু ও নারীর লাশ আবিষ্কার করেন। সে সময় রেলওয়েতে প্রায় সব লোক পশ্চিম পাকিস্তানি ছিলো। কেউ বাঁচেনি।

– এই যে বললেন সব কর্মচারী পশ্চিম পাকিস্তানি ছিলো, তাহলে পূর্ব পাকিস্তানে কি চাকরির যোগ্য লোক ছিলো না?

: পাকিস্তান স্বাধীন হয়েছে ব্রিটিশ শাসন থেকে। পূর্ব বাংলার রেলওয়েতে সে সময় যারা ছিলো, পাকিস্তান হওয়ার পর তারাই রয়েছে। ওরা ছিলো বেশিরভাগই কলকাতার লোক। পাকিস্তানে তারা মুহাজির ছিলো। হিজরতের পর তারা পশ্চিম পাকিস্তানে বসতি স্থাপন করেছিলো।

– আপনি যাদের কথা বলছেন, তারা হয়তো রাজাকারদের মতো পাকসেনাদেরকে সাহায্য করেছে?

: দেশের সরকারকে সরকারি কর্মচারীরা সাহায্য করলে নিশ্চয় তা কোনো অন্যায় নয়।

– সরকার যদি অত্যাচারী হয়?

: এ নিয়ে আমি তোমার সঙ্গে তর্কে যেতে চাই না। এতক্ষণ যা বললাম, তা একদিকের। ২৩ ও ২৪ মার্চ পর্যন্ত এই দিকের জুলুম অব্যাহত ছিলো। এরপর শুরু হয় সেনাবাহিনী কর্তৃক জুলুম। মিলিটারি এ্যাকশনে ঢাকায় প্রচুর লোক প্রাণ হারায়। বাঙালিরা অনেক আগেই ভারত থেকে ট্রেনিং নিয়ে এসেছে। উভয় গ্রুপের শক্ত লড়াই শুরু হয়। আস্তে আস্তে মিলিটারি ঢাকা থেকে বের হয়ে গ্রামে-গঞ্জে যেতে শুরু করে। ওরা যেখানেই গেছে সেখানেই বিহারীরা সাহায্য করেছে। ফলে প্রচুর বাঙালি প্রাণ হারিয়েছে। যেসব যুদ্ধে সাধারণ মানুষ জড়িয়ে যায়, সেসব যুদ্ধে প্রাণহানি বেশি ঘটে।

বন্দী অবস্থায় কোনো মানুষকে হত্যা করা হারাম। কিন্তু পাকিস্তানি মিলিটারিরা যশোর-পাবনায় প্রচুর লোককে বন্দী করে হত্যা করেছে। এসব ঘটনা সামনে নিয়ে আমি বলতে পারি, ২৫ মার্চের পর বাঙালিদের ওপর জুলুম করা হয়েছে। তবে বাস্তব কথা হচ্ছে সুযোগ মতো উভয়েই জুলুম করেছে।

– নির্বাচনের ফলাফল শেখ মুজিবের পক্ষে যাওয়ার পরও আপনারা একশনে গেলেনে কেন?

: আমি তো বললামই এই এ্যাকশন সম্পূর্ণ অন্যায়, অযৌক্তিক এবং অপ্রয়োজনীয় ছিলো।

– তবে গেলেন কেন?

: প্রেসিডেন্ট (ইয়াহিয়া) নিজে ঢাকায় বসে নির্দেশ দিয়েছেন। তখন তো সামরিক শাসন ছিলো।

– আপনি এজন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে দায়ী করছেন?

: হ্যাঁ, অবশ্যই। তবে সে একা নয়। মুজিব ও ভুট্টো পরিস্থিতি খারাপ করেছে এবং ইয়াহিয়া পরিস্থিতি মোকাবেলায় সিদ্ধান্ত নিতে ব্যর্থ হয়েছে, সমাধান দিতে পারেনি, অবস্থা নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি। এ জন্য এই তিনজন দায়ী।

– বিচারপতি হামুদুর রহমান কমিশনের রিপোর্ট সম্পর্কে কিছু বলবেন কি?

: এই রিপোর্ট ছিলো অসম্পূর্ণ। তা ছিলো শুধু মিলিটারির বিরুদ্ধে। ফলে এর ভিত্তিতে শুধু মিলিটারির লোকদের শাস্তি হয়েছে। রাজনীতিকদের সম্পর্কে কিছুই ছিলো না। অথচ ঘটনার জন্মদাতা, নির্দেশদাতা তারাই।

– আপনি কি মনে করেন রাজনীতিকদেরও শাস্তি হওয়া প্রয়োজন?

: তাদের অনেকেই এখন আর বেঁচে নেই। বিচার এখন আল্লাহ্ ছাড়া কে করবে?

– হামুদুর রহমান কমিশনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য কি ছিলো?

: এই কমিশনের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য ছিলো একটাই, কেন পূর্ব পাকিস্তানে মিলিটারি পরাজিত হলো? গোটা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা তাদের উদ্দেশ্য ছিলো না। তাই এই কমিশনের ভূমিকা খুব সীমাবদ্ধ ছিলো। আমি বলি, যদি রাজনীতিকরা সমস্যা সৃষ্টি না করতেন এবং এ্যাকশনের নির্দেশ না দিতেন, তাহলে সেনাবাহিনী এ্যাকশনে যেতো না। শেখ মুজিবকে প্রধানমন্ত্রী করলে সেনাবাহিনী কিংবা পাকিস্তানের কোনো অসুবিধা হতো না। অনেকে বলেন, এমন করা হলে তারা সবকিছু নিয়ে যেতো। আমি বলি, পাকিস্তান তো উড়োজাহাজ নয় যে, চালিয়ে নিয়ে যাবে। তাছাড়া শেখ মুজিব সম্পর্কে আমি বলি, আরো কিছুদিন অপেক্ষা করা উচিত ছিলো। সমস্যার সমাধান কিংবা পৃথক হয়ে যাওয়ার বিষয়টা আলোচনার মাধ্যমে সম্ভব ছিলো। শেখ মুজিব প্রকৃতপক্ষে আলোচনার মাধ্যমে সমাধান চাইতেন। সমস্যা ছিলো তাজউদ্দিন আর ভুট্টো। তাদের ভূমিকাই আলোচনার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল। শেখ মুজিবের ভেতরের খবর আমি জানি। সে আমার বন্ধু ছিলো। আমি প্রায়ই তার ঘরে যেতাম। তার সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়

নিয়ে আলাপ হতো। আমি বুকে হাত দিয়ে বলতে পারি, তাকে সংঘাতের দিকে তাজউদ্দিন পুশ করেছে। মুজিব কোনোদিন পাকিস্তান ভাঙতে চায়নি।

– আপনি বলছেন যে, শেখ মুজিব স্বাধীনতা চাইতেন না?

: না প্রথম দিকে তিনি চাইতেন না। একাত্তরের তার সব বক্তব্য যদি তুমি মন দিয়ে শোন, তবে আমার সঙ্গে একমত হবে। ব্যক্তি শেখ মুজিব আর আওয়ামী লীগ এক নয়। আওয়ামী লীগে বিভিন্ন চিন্তার লোক ছিল, বহু গ্রুপ ছিলো। তিনটি গ্রুপ তো প্রকাশ্যই ছিলো। এর মধ্যে এক গ্রুপের নেতা ছিলেন তাজউদ্দিন। এক গ্রুপের নেতা মোস্তাক আহমদ এবং আরেক গ্রুপের নেতা আব্দুস সামাদ আজাদ। তাজউদ্দিন ও আজাদ দু'জনই সেক্যুলার ছিলেন। তবে তাজউদ্দিন ভারতপন্থী থাকায় পাকিস্তান ভাঙ্গার পক্ষে ছিলেন। আর আজাদ সাহেব চাইতেন পাকিস্তানে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে সমস্যার সমাধান করতে। খন্দকার মোস্তাক ছিলেন ডানপন্থী। শেখ মুজিবের মতো তিনিও ভাবতেন আলোচনার মাধ্যমে আওয়ামী লীগের ক্ষমতা গ্রহণ। তবে পৃথকতা নয়। মোস্তাক ও আজাদের নিয়ন্ত্রণে শেখ মুজিব দীর্ঘদিন ছিলেন। কিন্তু পাকিস্তান সরকার যখন দাবি না মানার পক্ষে দৃঢ়তা দেখাতে লাগলো, তখন শেখ মুজিব প্রভাবিত হয়ে যান তাজউদ্দিনের যুক্তিতে। ১৮ মার্চ শেখ মুজিব গভর্নর হাউসে তাজউদ্দিন ও কামাল হোসেনকে সঙ্গে নিয়ে আসেন। আমি তখন সেখানে ছিলাম। আলোচনা শুরু হতে না হতেই তাজউদ্দিন উত্তেজিত হয়ে বলেন— "আমরা শান্তিপূর্ণ সমাধান চাই না। সমাধানের পথ আমরা খুঁজে নিয়েছি। প্রস্তুত হচ্ছি।"

শেখ মুজিব তখন তাজউদ্দিনকে থামিয়ে বললো— আপনি একটু বাইরে যান। তাজউদ্দিন চলে যাওয়ার পর শেখ মুজিব বললেন— দয়া করে আমাকে নতুন একটা তারিখ দিন। আমি সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে নেব। এ কথা বলে তিনি চলে যান। আমি, জেনারেল ইয়াকুব (পরবর্তী সময়ে পাকিস্তানের মন্ত্রী সাহেবজাদা ইয়াকুব) এবং এডমিরাল এস এম গভর্নর হাউস থেকে কেন্দ্রে টেলেক্স পাঠালাম যে, দয়া করে আজ রাতেই নতুন তারিখ দিন। আগামীকাল হবে অনেক দেরি। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, কোনো তারিখ দেওয়া হলো না। যদি এই রাতে তারিখ দেওয়া হতো, তবে হয়তো বিষয়টা এত দূর গড়াত না। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা শেখ মুজিবের ছিলো। নতুন তারিখ দেওয়া হলো না। পুরাতন তারিখ বাতিল করা হলো। এর ওপর আবার ভুট্টো সাহেব ঘোষণা দিলেন— "আমাকে ছাড়া এসেম্বলি বসতে পারবে না। পশ্চিম পাকিস্তানের যে লোক এই এসেম্বলিতে যাবে তার পা ভেঙ্গে দেব।" ফলে পরিস্থিতি খারাপ হতে থাকল। শত্রুরা সুবর্ণ সুযোগ কাজে লাগাল। আসলে পরিস্থিতি খারাপের জন্য ওই রাজনীতিকরাই দায়ী। ভুট্টো দাবি করলো দুই মেজরিটি পার্টির ক্ষমতা ভাগাভাগির। অথচ এক পাকিস্তানে দুই প্রধানমন্ত্রী হয় কিভাবে? শেখ মুজিবের দল মেজরিটি ছিলো, তাকে ক্ষমতা দিলে সমস্যার সমাধান হয়ে যেত। তাছাড়া পাকিস্তানে এই সমস্যা সমাধানের মতো তখন কোনো রাজনীতিক ছিলেন না। ভুট্টো সাহেবরা যখন দেখলেন, মুজিবকে তার দাবি থেকে পিছু হটানো যাবে না, তখন ঢাকায় বসেই মিলিটারির ক্ষমতা গ্রহণের প্লান করেন।

– আপনার বক্তব্য থেকে স্পষ্ট, মুজিব আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের পক্ষে ছিলেন কিন্তু ইয়াহিয়া ও ভুট্টো সেই সুযোগ দেননি?

: যতক্ষণ পর্যন্ত শেখ মুজিবের বিশ্বাস ছিলো তিনি প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন, সেই সময় পর্যন্ত তার পক্ষ থেকে সমস্যা সৃষ্টি হয়নি। কিন্তু যখন ইয়াহিয়া-ভুট্টোর কারণে সমাধানে যেতে পারলেন না, তখন তাজউদ্দিন গ্রুপের ...।

– একাত্তরের পাকবাহিনীর আক্রমণের সঙ্গে ইসলামের কি সম্পর্ক ছিলো। আপনারা কি বাংলার মানুষকে ইসলামের শত্রু ভাবতেন?

: এখানে ইসলাম আসছে কেন? সংঘাত ছিলো দুই সেক্যুলার নেতার মধ্যে। মুজিব কিছুটা মধ্যপন্থী হলেও ভুট্টো সম্পূর্ণ সেক্যুলার ছিলেন। একাত্তরের সংঘাত ধর্ম নিয়ে নয়, শুধু ক্ষমতার মসনদ নিয়ে।

– পাকিস্তানের জন্ম ইসলামের উদ্দেশ্যে। অথচ এখানে ইসলামী হুকুমত নেই?

: তা সত্যিই আশ্চর্যজনক ব্যাপার। যে নেতাকেই জিজ্ঞেস করি, সে বলে আসবে। আমি বলি কিভাবে আসবে? পায়ে হেঁটে না উটে চড়ে। আজো এখানে প্রায় সব দলের নেতাই বক্তৃতায় ইসলাম কায়েম করে থাকেন। কিন্তু বাস্তবে কিছুই নেই। অনেক নেতার তো ব্যক্তি জীবনেও ইসলাম অনুপস্থিত। লিয়াকত আলী খান OBJECTIVE REGULATION পেশ করেছিলেন যে, পাকিস্তান পরিচালিত হবে কোরআন- সুন্নাহর বিধান মতে। তা জাতীয় সংসদে পাস হয়ে যায়, কিন্তু সিনেটে আজো পাস হয়নি।

– মুসলিম লীগকে অনেকে রাজনৈতিক দল হিসেবে অস্বীকার করেন?

: এটা কোনো রাজনৈতিক নিয়মতান্ত্রিক দল ছিলো না। একটা মুভমেন্ট ছিলো মাত্র।

– পাকিস্তান না হলে ভারতবর্ষের মুসলমানদের কি ক্ষতি হত?

: ভারতে ব্রিটিশদের সহযোগিতায় হিন্দুদের আধিপত্য সৃষ্টি হয়েছিলো। ব্রিটিশরা ছেড়ে আসার সময় যে কংগ্রেসের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করছিলো, তারা সেক্যুলার মানসিকতার দাবি করলেও প্রকৃতপক্ষে তারা ছিলো ব্রাহ্মণ্যবাদী। মুসলমানদের প্রতি তারা বৈষম্যমূলক আচরণ করতো। স্বয়ং গান্ধীজীও মাঝে মধ্যে বলতেন, ভারতকে আমি রামরাজ্য করতে চাই। হিন্দু নেতাদের বৈষম্যমূলক আচরণ থেকেই গড়ে উঠে পাকিস্তানের চিন্তা। প্রকৃতপক্ষে পাকিস্তান কোনো দেশের নাম নয়। পাকিস্তান হচ্ছে হিন্দুস্তানের মুসলমানদের মুক্তির স্লোগান।

– পাকিস্তান তো আজো ব্রিটিশ ও হিন্দুদের নিয়মে চলছে বলে আমার ধারণা। তাহলে পাকিস্তান সৃষ্টি করে লাভ হলো কি?

: লাভ অনেক হয়েছে। যখন পাকিস্তান ছিলো না এবং যদি না হতো, তবে মুসলমানরা ভারতে গোলামের মতো থাকতো। বিশ্বাস কর, পাকিস্তান হওয়ার আগে গোটা উপমহাদেশের মুসলমানদের জানাই ছিলো না দেশের সম্পদ কিভাবে আমদানি-রপ্তানি হয়। ব্যাংক, বীমা, ব্যবসা, শিক্ষা, রাজনীতি কিভাবে চলছে। বড় পদে হিন্দুরা ছিলো। দু'শ' বছরের শোষণের ফলে মুসলমানরা সর্বদিকে পেছনে ছিলো। গোটা বাংলায়

মুসলমানদের মধ্যে মাত্র একজন সিএসপি অফিসার ছিলো। চেয়ে দেখ, আজ পাকিস্তান হওয়ার কারণে মুসলমানেরা হিন্দুদের সঙ্গে শুধু প্রতিযোগিতা নয়, অনেক ক্ষেত্রে এগিয়ে গেছে। ব্যাংকিং ব্যবস্থায় আজ মুসলমানরা প্রশংসনীয়ভাবে এগিয়ে আছে। আজকে পাক কিংবা বাংলায় যাদের ধনী দেখছো '৪৭-এর আগে তাদের কোনো অস্তিত্ব ছিলো না। মুসলমানদের মধ্যে বড় বড় ব্যবসায়ীও ছিলো না। গোটা লাহোরে মাত্র দু'একটি মুসলিম দোকান আনারকলিতে ছিলো। হিন্দু ও ইংরেজরা মিলে মুসলমানদেরকে এগিয়ে আসার সুযোগই দেয়নি। পাকিস্তান হওয়ার পর মুসলমানরা স্বাধীনভাবে কিছু করার সুযোগ পাচ্ছে। তুমি জিজ্ঞেস করে দেখ, মুসলমানরা হিন্দুদের সামনে চেয়ারে বসারও সুযোগ পেতো না। অথচ এই মুসলমানরা ব্রিটিশের আগে প্রায় হাজার বছর ভারতবর্ষের শাসন করেছে। ব্রিটিশরা হিন্দুদের হাতে ভারত দিয়ে গেলো। নেহেরু যদিও নিজেকে সেক্যুলার হিসেবে প্রচার করতেন, বাস্তবে তিনি ছিলেন জাত ব্রাহ্মণ। আর যদি সেক্যুলারও হতেন, তবু মুসলমানদের জন্য ক্ষতি ছিলো। রাশিয়ার অবস্থা থেকে আমরা শিক্ষা নিতে পারি। তাই বলি, পাকিস্তান হওয়ায় হিন্দুস্তানের মুসলমানদের উপকার হয়েছে অবশ্যই।

– পাকিস্তান হয়ে যদি লাভ হয়ে থাকে, তবে নিশ্চয় তা ভেঙ্গে ক্ষতিও হয়েছে। আপনি কি তাই মনে করেন?

: পাকিস্তান ভেঙ্গে গেছে তা আমি বলি না। স্মরণ রাখা প্রয়োজন, পাকিস্তান কোনো অঞ্চলের নাম নয়। ভারতবর্ষের যে অঞ্চলের মুসলমানই নিজেদের স্বাধীনতা, স্বাতন্ত্র্যের কথা ভাববে সে-ই পাকিস্তানের চেতনায় উজ্জীবিত। সে-ই ১৯৪০-এর লাহোর প্রস্তাবের বাহক। সে-ই জিন্নাহ, শেরেবাংলা, সোহরাওয়ার্দী, কিংবা স্যার সলিমুল্লাহদের উত্তরসূরী। যারা বলে দ্বিজাতিতত্ত্বের দর্শন ভুল ছিলো, তাদের চিন্তা সঠিক নয়। যদি তা ভুল হতো, তবে পশ্চিম বাংলার হিন্দু জনগোষ্ঠী স্বাধীন বাংলার সঙ্গে মিশে যেত। কিন্তু তারা মিলতে পারছে না বাংলায় সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ মুসলমান হওয়ায়। আবার তারা হিন্দীভাষীদের সঙ্গে থাকতে পারছে, কারণ ওরা হিন্দু।

– ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান নিয়ে কেউ কেউ কনফেডারেশনের কথা বলছেন। এ সম্পর্কে আপনার মতামত কি?

: ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সঙ্গে এ কনফেডারেশনের প্রচুর ব্যবধান রয়েছে। ইউরোপের প্রত্যেক দেশ তাদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখছে। এই রকম করলে তো কোনো বাধা নেই। কিন্তু এর আগে যাদেরকে নিয়ে কনফেডারেশন হবে, তাদের মধ্যকার মতানৈক্য দূর করতে হবে। আমার মতে, ভারত যে কনফেডারেশনের প্রস্তাব করছে, তা হতে পারে যদি কাশ্মীরকে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকার করা হয় এবং আফগানিস্তান ও মালদ্বীপকে সঙ্গে রাখা হয়। অর্থাৎ ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, কাশ্মীর, আফগানিস্তান, মালদ্বীপ, নেপাল, ভুটান, শ্রীলংকা নিয়ে কনফেডারেশন হতে পারে। তবে এর আগে পাকিস্তান ও বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের যে সমস্যা রয়েছে, তার সমাধান হওয়া জরুরি। নতুবা কোনো প্রকার কনফেডারেশন বাতুলতা মাত্র।

– বাংলাদেশে আপনি কতদিন ছিলেন এবং কোন্ কোন্ জেলায় ছিলেন?

: ১৯৬৭ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত ছিলাম। মূলত ঢাকায়ই ছিলাম। তবে প্রায় সব জেলা সফর করেছি।

– কখনো কি সিলেট গেছেন?

: দু'তিন বার গিয়েছি শাহজালালের মাজার ও টি গার্ডেন দেখতে।

– একাত্তরে নিয়াজীর আত্মসমর্পণকালে কোথায় ছিলেন এবং পাকিস্তান কবে ফেরেন?

: ঢাকায় POW তে। ফিরে আসি ১৯৭৪ সালে।

– ১৬ ডিসেম্বরের পর থেকে ১৯৭৪ পর্যন্ত কোথায় ছিলেন?

: ভারতের জেলে।

– সেখানে কি কোনো খারাপ ব্যবহার করা হয়েছে?

: না, ভারতের অনেক সিনিয়র অফিসার ব্রিটিশ আর্মিতে আমার সঙ্গী ছিলো। তারা আমায় শ্রদ্ধা দেখিয়েছে। তবে মেজর প্রকৃতির ছোট অফিসাররা একটু আধটু শয়তানী করেছে।

– আপনি সিনিয়র হিসেবে শ্রদ্ধা পেয়েছেন। বাকিদের অবস্থা কি ছিলো?

: আমার জানা মতে কারো সঙ্গে কোনো বদ ব্যবহার করা হয়নি।

– যুদ্ধকালীন সময়ে আপনি বাংলাদেশে ছিলেন। রাস্তায় রাস্তায় লাশ দেখে আপনার কি অনুভূতি হয়েছিল?

: আমি যে অফিসে ছিলাম, তার অবস্থা ভিন্ন ছিলো। একদিনের ঘটনা বলি। সে দিন আমার কাছে তিন শ্রেণীর লোক আসে। প্রথমত আসে যশোরের ডেপুটি কমিশনারের স্ত্রী। সে বাঙালি। পশ্চিম পাকিস্তানের মিলিটারি তার স্বামীকে হত্যা করেছে। শুনে দুঃখ পেলাম। দ্বিতীয়ত, দশ-বারোজন নারী-পুরুষ ময়মনসিংহ থেকে আসে। তারা জানালো, তাদের সামনেই নিজের আত্মীয়-স্বজনকে হত্যা, ধর্ষণ এবং মাটি চাপা দেওয়া হয়েছে। মর্মাহত হলাম। ওরাও ছিলো বাঙালি।

তৃতীয় ঘটনা : এই দিন বগুড়া থেকে জানানো হলো মিলিটারি ডিপুতে আক্রমণ করে একজন অফিসারকে হত্যা করা হয়েছে। তার গর্ভবতী স্ত্রীকেও মাথায় আঘাত করে হত্যা করা হয়েছে। দুঃখ পেলাম। বাঙালি হোক পাকিস্তানি হোক তারা ছিলো মুসলমান। তারা ছিলো আমার আত্মার অংশ। তাই কষ্ট পেয়েছি।

– আপনার বিরুদ্ধে আমাদের অনেক অভিযোগ আছে। বিশেষ করে আপনার ডাইরীতে লেখা ছিলো, "সবুজ মাটি রক্তে লাল করে দেব"?

: সবই ভুল প্রচার। একাত্তরে আমার কোনো শক্তি ছিলো না। তোমরা হয়তো জানো না, গভর্নরের উপদেষ্টা নামমাত্র একটা পদের নাম। আমাকে সরকার সম্পূর্ণ দুর্বল করে দেয় যখন আমি মিলিটারি এ্যাকশনের বিরুদ্ধে প্রেসিডেন্টকে বলি। এরপর রাজনৈতিক দিকে আমি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠি। কারণ পূর্ব পাকিস্তানের প্রায় বড় বড় সব নেতার সঙ্গে

আমার ভালো সম্পর্ক ছিলো। ফলে বারবার আমাকে মিডিয়ার সামনে দাঁড়াতে হয়েছে। সবুজ মাটি লাল করার ঘোষণা আমার নয়।

প্রকৃত ঘটনা হলো, ঢাকাতে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির মিটিং ছিলো আনুমানিক নির্বাচনের এক বছর আগে। এটা ভাসানীর দল। বাংলাদেশে দু'জন তোয়াহা ছিলো। একজন ইসলামিক এবং অন্যজন সেক্যুলার (নোয়াখালীর)। সেক্যুলার তোয়াহা সেই মিটিং-এ বলেছিলো, "আমি আগে পাকিস্তানের সবুজ মাটি রক্তে লাল করে দেব।" আমাকে কোর হেড কোয়ার্টার থেকে জেনারেল ইয়াকুব তা জানালো। আমি এই কথাটি স্মরণ রাখার জন্য ডাইরীতে লিখে রাখি এবং তোয়াহা-কে খবর দেই। তাদের সঙ্গে আমার এতটুকু বন্ধুত্ব ছিলো যে, আমি যখন বলেছি তোমাকে গ্রেফতার করা হবে না, তখন সে বিশ্বাস করেছে তাই হবে। সে আসে। জিজ্ঞেস করলাম, তুমি এসব কি বলেছো? সে বললো এটা আমার নয়। কাজী জাফরের বক্তব্য। আমি বললাম, এর অর্থ কি? সে বললো, এর অর্থ এদেশে কম্যুনিস্ট মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করা, লাল হচ্ছে কম্যুউনিস্টের প্রতীক। সে চলে গেলো। আমার ডাইরীতে কথাগুলো রয়ে গেলো। গুরুত্ব দেইনি। আমাকে গ্রেফতার করার পর তারা আমার ডাইরী নিয়ে গেলো। প্রচার করলো, জেনারেল ফরমান গোটা বাংলার মানুষকে হত্যা করার প্লান করেছিলো। এ কথা শেখ মুজিবও ভুট্টোকে বলেছিলো। তার দাবি ছিলো, সবাইকে ছেড়ে দিলেও ফরমান আলীকে ছাড়া যাবে না। আন্তর্জাতিক রেডক্রস সোসাইটি আমার কাছে এসেছিলো। আমি বিস্তারিত তাদেরকে বললাম। এরপর তা নিয়ে তদন্ত হয়েছে। এমনকি হামিদুর রহমান কমিশনও আমাকে জিজ্ঞাসা করেছে। আমি বললাম, দেখুন এটা আমার হাতের লেখা সত্য, কিন্তু কথা আমার নয়। একথা ১৯৬৯ সালের ১৬ জুন কাজী জাফর পল্টন ময়দানে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির মিটিং-এ বলেছিলেন। এরপর আমাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। আজো আমি বলছি, ওকথা আমার নয়। কাজী জাফরের কথা।

– আপনারা আমাদের বুদ্ধিজীবীদেরকে হত্যা করালেন কেন?

: ১৬ ডিসেম্বর আমাদের আত্মসমর্পণের পর বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করা হয়েছে। তখন ভারতীয় সৈন্যদের নিয়ন্ত্রণে ঢাকাসহ গোটা পূর্ব পাকিস্তান ছিলো। আমার প্রশ্ন হলো, তাদের নিয়ন্ত্রিত এলাকায় বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করলো কে? আমি মনে করি, এ জন্য যদি কাউকে দায়ী করতে হয়, তবে অবশ্যই ভারতকে।

– নিয়াজী সত্যিই কি বলেছিলো, 'ভূমি চাই মানুষ নয়'?

: শুনেছি সে বলেছিলো। সে অন্য প্রকৃতির মানুষ ছিলো।

– নিয়াজী আত্মসমর্পণের চার ঘণ্টা আগেও না-কি হুংকার দিতো– "যুদ্ধ করবো মরতে দম তক তবু আত্মসমর্পণ করবো না।"

: চার ঘণ্টা নয় চারদিন আগে আমি তাকে বলেছিলাম, জনাব শুধু যদি ভারতের সৈন্য হতো, তবে কথা ছিলো। এই দেশের সাধারণ মানুষ যেখানে অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছে, সেখানে যুদ্ধ করে লাভ নেই।

তখন সে এই উত্তর দিয়েছিলো।

– নিয়াজীর চরিত্র না-কি খুব খারাপ ছিলো?

: শুনেছি, মদ আর নারীর প্রতি তার দুর্বলতা ছিলো। নিয়াজীকে যখন দায়িত্ব দেওয়া হয় পূর্ব পাকিস্তানের, তখন আমি প্রেসিডেন্টকে বিষয়টা বিবেচনার জন্য বলেছিলাম। ইয়াহিয়া ও ভুট্টো জানতো, তারা যা চায় তা নিয়াজী ছাড়া কাউকে দিয়ে করানো অসম্ভব। সে একটা লম্পট ছিলো। প্রায়ই নাকি হুংকার দিতো 'নসল (রক্তধারা) পাল্টিয়ে দাও।" আমি এসব তোমাকে বললাম শুধু তার চরিত্রটা বোঝাতে। তবে তুমি তা লিখতে যেও না।

– আচ্ছা বুদ্ধিজীবী হত্যার সঙ্গে রাজাকার বাহিনী কি জড়িত ছিলো?

: আমি কি বলবো? তবে আমার ধারণা ওরা ছিলো না। কারণ আমাদের আত্মসমর্পণের দু'দিন আগেই ওরা পালাতে শুরু করে। ১৬ ডিসেম্বরের পর ওদের অস্তিত্বই খুঁজে পাওয়া যায়নি। আমরা ফিরে এসেছি পাকিস্তানে। রাজাকারদের অবস্থা না ঘর কা না ঘাট কা। তাদের পক্ষে এত বড় কাজ করার সুযোগই ছিলো না। তাই আমার মনে হয় রাজাকাররা বুদ্ধিজীবীদেরকে হত্যা করেনি।

– তাহলে আপনি বলতে চাচ্ছেন ভারত করেছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো তারা করবে কেন?

: হ্যাঁ, ভারত করতে পারে। আমাদেরকে বা রাজাকারদেরকে যে কারণে সন্দেহ করা হচ্ছে, একই কারণে ভারতও করতে পারে।

– আমি একটা উর্দু ম্যাগাজিনে পড়েছি, জেনারেল ইয়াহিয়ার নাকি সুরা আর সাকী অর্থাৎ মদ আর নারীর নেশা ছিলো প্রচণ্ড এবং যখন পাক সৈন্যরা আত্মসমর্পণ করে, তখন জনৈক অফিসার তাকে জানিয়েছিল, "স্যার কায়েদে অজম কা পাকিস্তান টুট গিয়া।" প্রতি উত্তরে সে বলেছিলো- "টুটনে দে, পহলে নুরজাহান কা গানা শোননে দে।" ওই ম্যাগাজিনে নুরজাহানের সঙ্গে ইয়াহিয়ার ড্যান্স অবস্থার ছবিও প্রকাশ করা হয়েছিলো। আপনি এ সম্পর্কে কিছু জানেন কি?

: আমার মদপানের অভ্যাস নেই বলে তাকে নেশাগ্রস্ত দেখিনি। তবে সে মদপায়ী ছিলো। শুনেছি খুব পান করতো। অনেক খেয়েও নেশাগ্রস্ত হতো না। আমার সঙ্গে তার দেখা হয়েছে অফিস টাইমে। নারীদের সঙ্গে বিশেষ করে নুরজাহানের সঙ্গে সম্পর্কের কথা খুব প্রসিদ্ধি ছিলো। তবে এসব কখনো আমার চোখে পড়েনি। ১৪ ডিসেম্বর আমরা আত্মসমর্পণের নির্দেশ পাই। এই নির্দেশ সত্যই জেনারেল ইয়াহিয়ার কি-না তা জানতে ফোন করেও তাকে পাইনি। তিনি তখন নেশাগ্রস্ত। বাকি কিছু আমার জানা নেই।

– সে যে নেশাগ্রস্ত তা বুঝলেন কিভাবে?

: তার উল্টা-পাল্টা কথা থেকে।

– আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে বাদী পক্ষকে কিছু বলতে চান কি, অর্থাৎ বাংলাদেশের মানুষের প্রতি আপনার কোনো বক্তব্য আছে কি?

: কথা তো একটাই যে, একাত্তরে আমি নিজের জানা মতে বাঙালির কোনো ক্ষতি করিনি। পাকসেনারাও বলতে পারবে না, রাও ফরমান আলী তাদেরকে ক্ষতিকর

কোনো নির্দেশ বা প্লান দিয়েছে। পাকসৈন্যদের অভিযোগ, আমি বাঙালিদের দালাল ছিলাম। আমি অনেক বাঙালিকে পিঞ্জিরা থেকে মুক্ত করেছি। আমি চাইতাম ক্ষমতা বাঙালিদের হাতে দেয়া হোক।

– একাত্তরের ঘটনার জন্য ক্ষমা চাইবেন না?

: বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য উভয়েরই ক্ষমা চাওয়া প্রয়োজন। অন্যায় দু' পক্ষ থেকেই করা হয়েছে। এখন নিজেদের স্বার্থে আত্মসমালোচনা প্রয়োজন। বাস্তবে পাকিস্তান কোনো দেশের নাম নয়। এটা ছিলো হিন্দুস্তানের মুসলমানদের হিন্দুদের নির্যাতন থেকে বাঁচার একটি দর্শন। আর এই স্বার্থেই একে-অন্যের সাহায্য প্রয়োজন।

– বিদায় বেলা বলছি অন্যায় আপনারাই করেছেন। ক্ষমা প্রথমে আপনারাই প্রার্থনা করবেন। ধন্যবাদ সময় দেওয়ার জন্য।

: তোমাকেও ধন্যবাদ।

আমার মতে আল্লাহর আজাবের মধ্যে এটিও একটি যে, পাকিস্তান দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে। একাত্তরে নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ, রক্তপাত হলো। ভাইয়ে-ভাইয়ে শত্রুতা সৃষ্টি হলো। আজো যে দুর্বল পাকিস্তান আছে, যদি এখানে ইসলাম প্রতিষ্ঠা না করা হয়, তবে আরেকটি আজাব অতি নিকটবর্তী

—ডা. ইসরার আহমদ (পাকিস্তানের বিশিষ্ট বাগ্মী, বুদ্ধিজীবী, লেখক এবং রাজনীতিক)

ডা. ইসরার আহমদ পাকিস্তানের বিশিষ্ট বাগ্মী, বুদ্ধিজীবী, লেখক এবং রাজনীতিক ব্যক্তিত্ব। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে প্রথম সারির ছাত্রনেতা হিসাবে তাঁর ভূমিকা অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলো। স্বয়ং জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা মওদুদী তাকে দাওয়াত করে তাদের ছাত্র সংগঠন জমিয়তে তালাবা-এ-ইসলামীতে নিয়ে আসেন। ডা. ইসরার আহমদ মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র অবস্থায় জমিয়তে তালাবার কেন্দ্রীয় সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। ছাত্র জীবন শেষে তিনি জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার সদস্য হিসেবে জাতীয় রাজনীতিতে যোগ দেন। জামায়াতে ইসলামীর নির্বাচনে যাওয়া না যাওয়া নিয়ে এক পর্যায়ে মাওলানা মওদুদীর সঙ্গে তার মতানৈক্য হয়। শূরার বৈঠকে তাকে মত প্রকাশের সুযোগ না দিলে তিনি লিখিতভাবে জানিয়ে দেন, জামায়াতে ইসলামী যে গণতন্ত্রের পথ গ্রহণ করছে, তা দিয়ে প্রকৃত ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব নয়। এ পথ সুন্নতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিপন্থী।

মাওলানা মওদুদী এতে ভীষণ ক্ষুব্ধ হন। এক পর্যায়ে ডা. ইসরার আহমদ জামায়াতে ইসলামী থেকে পদত্যাগ করেন। বর্তমানে 'তাহরীকে খেলাফত' নামে তার একটি সংগঠন রয়েছে। যার উদ্দেশ্য 'খেলাফত আলা মিনহাজিন নুবুওয়াহ' প্রতিষ্ঠা। 'নেদা-এ-খেলাফত' নামে এই সংগঠনের একটি সাপ্তাহিক ম্যাগাজিনও রয়েছে। ইতোমধ্যে তার বেশ কিছু বইও প্রকাশিত হয়েছে। পাঠক হিসেবেই তাঁর সঙ্গে আমার মূল সম্পর্ক। ১৯৯৭ ইংরেজিতে তিনি লন্ডন সফরে আসলে টেলিফোনে দীর্ঘ আলাপ হয়। এই সূত্রে ২৩ মার্চ রাত আটটায় তার অফিসে উপস্থিত হই। প্রাথমিক আলোচনার পর মূল সাক্ষাৎকারে চলে আসি। জানতে চাই, আজকের বিশ্বে মুসলমানরা মজলুমের পর্যায়ে উপনীত হওয়ার কারণ কি?

উত্তরে তিনি বলেন, আমার মতে উম্মতে মুসলিমা বর্তমানে আল্লাহর গজবে নিপতিত। আমি একথা বলছি পবিত্র কোরআনের এই বিধানের ভিত্তিতে, যেখানে বলা হয়েছে, আল্লাহপাক যে উম্মতকে তাঁর কিতাব ও হেদায়াত দান করেন, তারা যদি এর আমানত রক্ষা করে, হক আদায় করে অর্থাৎ আল্লাহর বিধানমতো আমল করে এবং বিশ্ববাসীকে

এদিকে আহ্বান করে, তবে তাদের ওপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হয় আর সাহায্য আসতে থাকে। কিন্তু যদি তারা তা না করে, উল্টো আল্লাহর বিধানের বিরোধিতা করতে থাকে, তবে সেই উম্মতের ওপর আল্লাহর গজব অবতীর্ণ হয়। পবিত্র কোরআনে এর প্রমাণ হিসেবে ইহুদিদের কথা বলা হয়েছে। যেমন— সূরা বাকারাতেই এ সম্পর্কিত দু'টি আয়াত রয়েছে।

এক, 'হে বনী ইসরাঈল! আমার অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর, যা আমি তোমাদেরকে দিয়েছি। আমি তোমাদেরকে বিশ্ববাসীর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি'। -(আয়াত : ১২২)

এই উম্মত সম্পর্কে আবার অন্য আয়াতে বলা হয়েছে— 'আর তাদের ওপর আরোপ করা হলো লাঞ্ছনা ও পরমুখাপেক্ষিতা। তারা আল্লাহ্‌র রোষানলে পতিত হয়ে ঘুরতে থাকলো। এমন হলো এ জন্য যে, তারা আল্লাহর বিধি-বিধান মানতো না।'

-(আয়াত : ৬১)

এসব উম্মতকে লাঞ্ছিত ও পরমুখাপেক্ষী করে তাদের স্থানে মর্যাদাসম্পন্ন করে দেওয়া হলো উম্মতে মোহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে। এই উম্মতকে আল্লাহ পাক কিতাব দেন, দ্বীন দেন এবং দ্বীনকে পরিপূর্ণ করেছেন।

সঙ্গে সঙ্গে বলেছেন— 'এমনিভাবে আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থী সম্প্রদায় করেছি, যাতে করে তোমরা সাক্ষ্যদাতা হও মানবমণ্ডলীর জন্য এবং যাতে রাসূল সাক্ষ্যদাতা হোন তোমাদের জন্য'। -(বাকারা : ১৪৩)

আমরা আজ এই কাজ করছি না বলে আজাবের মধ্যে বন্দী। বিশেষ করে যারা উম্মতে মুসলিমার নিউক্লিয়ার তাদের শ্রেষ্ঠ অংশ হলো আরব। আরবদের ফজিলতের বুনিয়াদ হচ্ছে তাদের ভাষায় হেদায়াতের জন্য তাদেরকে আল্লাহপাক মাধ্যম হিসেবে প্রথমে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু আজ তারা বিশেষ করে কলোনিয়াল রোল থেকে যারা আজাদ হয়েছে, তাদের কেউ ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেনি; বরং সরকারসমূহ উল্টো চলতে লাগলো। তাই বলছিলাম, এই সময় জঘন্য আজাব আরবদের ওপর এসেছে। আজ তাদের বুকের ওপর আল্লাহ কর্তৃক অভিশপ্ত এক জাতি বসে আছে। ওই জাতির সামনে আরব মুসলমানদের আজ কিছু করার সাহস বা শক্তি নেই। কর্মক্ষমতাহীন বেইজ্জতী আর কাকে বলে? প্রথম দিকে ইসরাঈলি প্রতিনিধির সঙ্গে এক রুমে কিংবা এক টেবিলে বসাকেও সহ্য করা হতো না। কিন্তু আজ এক এক করে চুক্তি হচ্ছে, স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে, বন্ধুত্ব করা হচ্ছে। এমনকি উপসাগরীয় যুদ্ধের পর ইহুদিদেরকে নিয়ে মাদ্রিদে আরব শান্তি বৈঠক করা হয়েছে। জাতিসংঘের ইতিহাসে কোনো দিন বৈঠক মাদ্রিদে হয়নি। কিন্তু গালফ যুদ্ধের পর হয়েছে এবং তা এ জন্য করা হয়েছে যে, মুসলমানদেরকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া যে, ১৪৯২ সালে স্পেন থেকে তোমাদেরকে উচ্ছেদ করা হয়েছিলো। ভুলে যেও না, এটা তোমাদের পুরাতন কবরস্থান। এসো, এখানে বসে ইসরাঈলের সঙ্গে চুক্তি করে নতুন কবর তৈরি কর।

আমার মতে, এরপর দ্বিতীয় আজাব আসে পাকিস্তানের ওপর। এ দেশে তৈরি করা হয়েছিলো ইসলামের নামে। কলোনিয়াল রোল থেকে গোটা বিশ্বে আর কোনো দেশ ইসলামের নামে সৃষ্টি হয়নি। তোমরা একে কোরবানি বলো আর যা-ই বলো তবু সত্য হলো, এ দেশের জন্য লাখো মুসলমানের প্রাণ দিতে হয়েছে। প্রচুর সম্পদ লুণ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু আমরা যে ওয়াদা আল্লাহর সঙ্গে করেছিলাম, তা পূর্ণ করিনি। আমার মতে আল্লাহর আজাবের মধ্যেও এটিও একটি যে, পাকিস্তান দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে। একাত্তরে নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ, রক্তপাত হলো। ভাইয়ে-ভাইয়ে শত্রুতা সৃষ্টি হলো। এমনকি একাত্তরের পর ড. কামাল হোসেন বললো— "যদিও এ দেশে মুসলমানরা শক্তিশালী, তবু আমরা পছন্দ করি না বাংলাদেশকে মুসলিম দেশ বলা হোক।"

আমি তাও তোমাকে বলে রাখি, আজো যে দুর্বল পাকিস্তান আছে, যদি এখানে ইসলাম প্রতিষ্ঠা না করা হয়, তবে আরেকটি আজাব অতি নিকটবর্তী।

– অনেকে বলে, একবিংশ শতাব্দীতে ইসলাম ও মুসলমানরা বিশ্বকে নেতৃত্ব দেবে। এ প্রসঙ্গে আপনি কি মনে করেন?

: কারা বলে তা আমি জানি না। তবে আমি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের মর্মার্থে আশাবাদী। বাস্তবে কিন্তু অবস্থা দেখে আশাবাদী হওয়া যায় না। তবুও যেহেতু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী রয়েছে তাই বিশ্বাস করি। হযরত নোমান ইবনে বশির থেকে বর্ণিত এক হাদিস আহমদ ইবনে হাম্বল তাঁর মুসনাদে সংকলন করেছেন, সেই হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী বোঝা যায়, হযরত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সময় থেকে কিয়ামত পর্যন্ত পাঁচ সময়ের কথা বলেছেন। এক. নবুওয়াতের সময়। দুই. খেলাফত আলা মিনহাজি নুবুওয়াহ্-এর সময়। তিন. জালেম বাদশাহদের সময়। চার. গোলামীর শৃঙ্খলে বন্দী শাসকদের সময় এবং পাঁচ. আবার খেলাফত আলা মিনহাজিন নুবুওয়াহ-এর সময়। যেহেতু একথাগুলো হাদিসের তাই এর ওপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখি। তা ছাড়া মুসলিম শরীফে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আরেকটি হাদিস তুলে ধরা হয়েছে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহপাক আমাকে পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত গোটা বিশ্বের জমিন দেখিয়েছেন। স্মরণ রেখ এই সব এলাকায় আমার উম্মতের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়ার পরই দুনিয়াকে ধ্বংস করা হবে।"

এ রকম আরো হাদিস আছে। মোটকথা, এমন হওয়ার ওপর বিশ্বাস রাখা আমাদের ঈমানেরই একটি অংশ। বুনিয়াদীভাবে ঈমান তো গায়েবের বিশ্বাসকেই বলে। সূরা বাকারার প্রথমে মুত্তাকীদের পরিচিতিতে গায়েবের বিশ্বাসের কথা বলা হয়েছে। দুনিয়াতে আবার মুসলমানদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বিশ্বাস গায়েবের বিশ্বাসের মতোই। কারণ হাদিস সহিহ, সনদ শুদ্ধ; তাই একথার ওপর অনড় বিশ্বাস রাখতেই হবে।

– খেলাফত আবার ফিরিয়ে আনতে মুসলমানদের কি করতে হবে?

: এর উত্তরে আমি হযরত আবু বকর (রা.) ও ইমাম মালিক (র.)-এর বর্ণনাকে উল্লেখ করবো। হযরত আবু বকর (রা.) খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পর এক ভাষণে

বলেছিলেন— "এই যে আমাদের খেলাফত, তার প্রথম অংশের মতো শেষ অংশ হবে না।" হযরত আবু বকর (রা.)-এর এই বক্তব্যকে সামনে রেখেই বলতে চাই, তবুও আমাদেরকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম যেভাবে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, সেভাবেই চেষ্টা করতে হবে। ইমাম মালিক (র.) বলেন, মিনহাজে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর সূরা মায়েদায় যে রকম বলা হয়েছে, তেমনি তাওরাতে হযরত মূসা (আ.) ও ইঞ্জিলে হযরত ঈসা (আ.)-কেও বলা হয়েছে। মহানবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উদ্দেশ করে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে :

"আমি তোমাদের প্রত্যেককে একটি আইন ও পথ দিয়েছি।" –(মায়েদা : ৪৮)

আমাদের কাছে একথা স্পষ্ট যে, সব নবী ও রাসূলের দ্বীন একই ছিলো, কিন্তু তাদের শরিয়ত এবং মিনহাজ ভিন্ন ছিলো। হযরত মূসা (আ.)-এর সময়ে যখন তাঁর গোত্র গোলামীতে বন্দী ছিলো, তখন তাঁর শরিয়তে তাদেরকে মুক্ত করা ফরজ করা হয়েছিলো। অন্যদিকে হযরত ঈসা (আ.)-এর সময় ফিলিস্তিন রোমানদের দখলে ছিলো। কিন্তু ঈসা (আ.) তাদেরকে মুক্ত করার পরিবর্তে তাদের মধ্যে ঈমানের আলো জ্বালাতে চেষ্টা করেছেন। এভাবে একেক রাসূলের একেক মিনহাজ ছিলো। বর্তমানে আমাদের লোকেরা বিভিন্ন মিনহাজে কাজ করে যাচ্ছেন। যারা স্বাধীনতার জন্য ময়দানে যুদ্ধ করে যাচ্ছেন, তারা হযরত মূসা (আ.)-এর মিনহাজে কাজ করে যাচ্ছেন। আর যারা শুধু দাওয়াতের কাজ করছেন তারা হযরত ঈসা (আ.)-এর মিনহাজে আছেন। কিন্তু মিনহাজে মোহাম্মদী হলো এক ইনকিলাবী মিনহাজ। প্রথমে দাওয়াতের মাধ্যমে মনে ঈমানী শক্তি সৃষ্টি করা আজো প্রয়োজন আছে। যদিও আমরা মনে করি, আমাদের ঈমান আছে। কিন্তু বাস্তবে যে রকম হওয়া উচিত সে রকম নেই। যা আছে তা হলো উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত এক আকিদা মাত্র।

ঈমান সৃষ্টি হয়ে গেলেও শক্তি সঞ্চিত না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। লোকে তোমার ওপর অত্যাচার করলেও তার প্রতিশোধ নেবে না। যখন শক্তি সঞ্চিত হয়ে যাবে, তখন মদীনার মতো একটি কেন্দ্র স্থাপন করে সশস্ত্র যুদ্ধ করতে হবে। এরপর আল্লাহর সাহায্য আসবে। এই মিনহাজ অনুসরণ ছাড়া খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে না। মোটকথা, খেলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য তিনটি পর্যায় রয়েছে।

এক. দাওয়াতে দ্বীন।

দুই. শক্তি সঞ্চয় না হওয়া পর্যন্ত হযরত বেলাল ও হযরত খাব্বার (রা.)-দের মতো ধৈর্যের সঙ্গে কাজ করে যাওয়া এবং

তিন. শক্তি ও কেন্দ্র হওয়ার পর লড়াই করা।

এই দু'টির মধ্যে যদি একটি হয়ে যায়, তবে অপরটি অর্জনের জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করা। সুন্নতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিনহাজ মতো লড়াইয়ের দুই অবস্থা।

এক. কতল করা। যেমন বদরের যুদ্ধে সত্তরজন কাফেরকে কতল করা হয় এবং

দুই. কতল হওয়া। যেমন ওহুদের যুদ্ধে সত্তরজন সাহাবী শহীদ হয়েছিলেন।

তবে স্মরণ রাখতে হবে, সে সময় আরবে কোনো কেন্দ্রীয় সরকার ছিলো না। আজ সরকার, পুলিশ, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সংগঠিত সৈন্য এবং এয়ারফোর্স সবই রয়েছে। তাই ইজতিহাদ করতে হবে। আমার মতে, বর্তমানের পরিস্থিতিতে ইজতিহাদ দুই প্রকার হতে পারে।

এক. গান্ধী যেমন ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে নন ভায়লেন্স নীতি গ্রহণ করেছিলেন এবং

দুই. ইমাম খোমেনীর বাহিনী যেমন শাহের বিরুদ্ধে অস্ত্রের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

এই দুই প্রকারের জন্য প্রয়োজন রয়েছে দৃঢ় ঈমান, শক্তিশালী সংগঠন, তরবিয়াত ও তাজকিয়াহ। এসব অর্জিত হওয়ার পর প্রচলিত স্রোতের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে। প্রচলিত তাগুতী সমাজ যখন ভাঙ্গা সম্ভব হবে, তখনই খেলাফত আসবে।

– এসব ঝামেলায় না গিয়ে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচনের মাধ্যমে কি ইসলাম বা খেলাফত প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়?

: অনেকে ভাবেন নির্বাচনের মাধ্যমে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা যাবে; এভাবে একদিন কেল্লা ফতে হয়ে যাবে। গত পঞ্চাশ বছর থেকে বলে আসছি গণতন্ত্র বা নির্বাচনের মাধ্যমে কাজ হবে না। অতি নিকটের ঘটনা, আলজেরিয়ায় নির্বাচনে জয়ী হয়েও কাজ হয়নি। তুরস্কেও একই ঘটনা। তবে গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমেও কাজ হবে না। বর্তমান মিসর ও আলজেরিয়া থেকে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা প্রয়োজন। কাজ হবে কেবলমাত্র সেই পদ্ধতিতে। যা সুন্নতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভিত্তিতে আমি ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি।

– আপনি যা বলছেন, এর সঙ্গে ছয় উসুলের ভিত্তিতে পরিচালিত তাবলীগওয়ালাদের পার্থক্য কোথায়? অর্থাৎ তারা বলেন, ছয় উসুল সবাই মেনে নিলে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। তাদের অনেকে জিহাদের প্রয়োজনীয়তাও অস্বীকার করেন। তারা 'আমর বিল মারূফ'-কে-ই শুধু দায়িত্ব মনে করছেন। অথচ 'নাহী আনিল মুনকার' ছাড়া ইসলাম তো হুকুম-আহকাম নিয়ে পূর্ণতা পেতে পারে না।

: তাদের সঙ্গে আমার কথার আকাশ-জমিন পার্থক্য। তাবলীগীরা জিহাদের কথা বলে না, নাহী আনিল মুনকারের ওপর আমল করে না। তারা শুধু মিষ্টি দাওয়াতের কথা বলে, ব্যক্তি সংশোধনের কথা বলে। তারা সমাজ পরিবর্তনের কথা ভাবে না। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইনকিলাবী জীবনের সঙ্গে তারা পরিচিত নয়। তারা শুধু 'ফাজায়েলে আমলের' জ্ঞান চর্চা করে। আর আমি বলছি, দাওয়াত বা তাবলীগের মাধ্যমে এমন একটি গ্রুপ তৈরি করা, যারা কতল হবে এবং কতল করবে। আমি জিহাদকে অস্বীকার কিংবা অপ্রয়োজনীয় মনে করছি না। আমি বলছি শক্তি সঞ্চয়ের পর জিহাদের কথা।

– তালেবান মুভমেন্ট সম্পর্কে আপনার মতামত কি?

: তালেবানকে মুভমেন্ট বলা উচিত নয়। এটা কোনো নিয়মতান্ত্রিক বিপ্লব বা পরিবর্তন নয়। এটা অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিজ থেকে সৃষ্ট একটি বিস্ফোরণ। অর্থাৎ সোভিয়েত

বাহিনীর বিদায়ের পর অন্তর্দ্বন্দ্ব দেশটিকে ধ্বংস করে দিচ্ছিলো। কাবুল চৌদ্দ বছরের সোভিয়েতবিরোধী যুদ্ধে যত ক্ষতি হয়নি, তার দশ গুণ বেশি হয়েছে চার বছরের গৃহযুদ্ধে। দেশের মানুষ নিরাশ ও দিশেহারা হয়ে পড়েছিল। এমনি এক সন্ধিক্ষণে তালেবান দাঁড়িয়ে দেশের মানুষকে বললো, আমাদের কাছে অস্ত্র জমা দাও, আমরা শান্তি এনে দেব। মানুষ তাদের কথা বিশ্বাস করল। দেশের মানুষ তালেবানদের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করলো। এটা হয়েছে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে। লক্ষণীয় বিষয় হলো, হাদিসে উল্লেখিত হয়েছে "আখেরী জামানায় জেরুজালেম রক্ষার জন্য যে বাহিনী তৈরি হবে তারা বের হবে খোরাসান থেকে।"

তোমাদের স্মরণ রাখতে হবে, খোরাসান আফগানিস্তানের একটি এলাকার নাম। আমি মনে করি, সেই প্রস্তুতি চলছে। অনেকে আপত্তি করছেন এই বলে যে, তালেবানদের শাসন ব্যবস্থা, শিক্ষা পদ্ধতি ইত্যাদি অনিয়মতান্ত্রিক। হ্যাঁ, কিছুটা আছে। তবে তা ঠিক হয়ে যাবে। আমার মতে, তালেবানদের আফগানিস্তানের সঙ্গে এশিয়ার মুসলিম দেশগুলোর কনফেডারেশন হওয়া প্রয়োজন।

– আপনি আফগানিস্তানের সঙ্গে কনফেডারেশনের কথা বলছেন, অথচ বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের অনেকে বলছেন ভারতের সঙ্গে কনফেডারেশনের কথা। এ ব্যাপারে আপনার অভিমত কি?

: আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদেরকে যে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে, হতে পারে এটা তারই অংশ। আল্লাহপাকের আজাব সম্পর্কে আমি আপনাকে ইতিপূর্বে বলেছি। পাকিস্তানে এখনো আমরা ইসলামী হুকুমত কায়েম করতে পারিনি। হিন্দুস্তানে যে আইন ছিলো তা আজো চলছে। সুদী ব্যবসা, সুদী ব্যাংকিং পদ্ধতি, মুক্ত অর্থনীতি ইত্যাদি হিন্দুস্তানে যেমন ছিলো আমাদের দেশেও তেমনি চলছে। বরং তারা আমাদের থেকে একদিক থেকে কিছুটা ভালো যে, সেখানে জায়গিরদারী বাতিল করা হয়েছে। আমাদের এখানে এখনো তা চলছে। কালচার, ব্যবহার, বেপর্দা ইত্যাদি তো তাদের মতোই আমাদের এখানেও চলছে। ভাষাগত দিক দিয়ে কিছু কিছু মিল রয়েছে। যেমন এখানেও পাঞ্জাবি চলে, সেখানেও। এই অবস্থায় যদি ইসলাম না থাকে, তবে কিভাবে পাকিস্তান আপন মহিমায় পৃথক সত্তা নিয়ে দাঁড়াবে? আর যদি পৃথক দর্শনের ওপর পাকিস্তানের দাঁড়ানো সম্ভব না হয়, তবে মুসলিম ইন্ডিয়ার শত বছরের ইতিহাস-ঐতিহ্য ধ্বংস হয়ে যাবে।

স্যার সৈয়দ আহমদ খান যে কাজ শুরু করেছিলেন, আলীগড় যে চিন্তায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যে চিন্তার ওপর ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগের জন্ম হল, ১৯৪০-এ শের-এ-বাংলা কর্তৃক মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে পাকিস্তানের রূপরেখা উপস্থাপন করা হল, এর পর পাকিস্তানের জন্ম হল। এসব এখন প্রায় একশ' বছরের কথা। যদি কনফেডারেশন করে পাকিস্তান ধ্বংস করা হয়, তবে একশ' বছরের ত্যাগ-সাধনা সবই বিফলে যাবে। তবে যদি আমাদের এখানে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং এর ভিত্তিতে একটা পদ্ধতি উপস্থাপন করে আমরা তাদেরকে বলতে পারি যে, এটা আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিয়ে গেছেন, যা মানুষের জন্য আল্লাহর

পক্ষ থেকে রহমতস্বরূপ। তখন যদি তারা তা গ্রহণ করে, তবে সেই ভিত্তিতে চুক্তি হতে পারে। নতুবা নয়।

– খেলাফতের সঙ্গে গণতন্ত্রের ব্যবধানটা কি?

: একটা ব্যবধান হলো, গণতন্ত্র যাদেরকে আইন প্রণয়নের অধিকারী মনে করে, কোরআন তাদেরকে আইন প্রণয়নে নিষেধ করেছে।

যদিও এটা বিস্তারিত আলোচনার বিষয়, তবু আপনাকে এ ব্যাপারে সংক্ষেপে দু'-চার কথা বলছি। লাহোরে অবস্থানরত আমেরিকার রাজনৈতিক বিষয়ক অফিসার খেলাফত সম্পর্কে জানার জন্য আমার কাছে এসেছিলো। আমি তাকে বললাম, দেখ, আমেরিকার সংবিধান দুনিয়ার সব গণতান্ত্রিক সংবিধানের মধ্যে উন্নত। তুমি সেই সংবিধান নিয়ে এসো এবং এতে তিনটি কথা যুক্ত করে দাও।

এক. হাকিমিয়ত চলবে আল্লাহ্‌র, মানুষের নয়।

দুই. রাষ্ট্রের আইন প্রণীত হবে কোরআন-হাদীসের ভিত্তিতে। সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়েও কোরআন-সুন্নাহবিরোধী আইন প্রণয়ন করা চলবে না। এই নিয়মে 'আমরুহুম শূরা বাইনাহুম' প্রতিষ্ঠিত হবে এবং

তিন. অমুসলিমরা খেলাফতের অধীনে নিরাপত্তাভিত্তিক এক সংখ্যালঘু জাতি হবে। কারণ খেলাফতের আন্তর্জাতিক নীতি হবে ইসলামের প্রচার ও প্রসার। তবে অমুসলিমদের জান, মাল, উপাসনালয় ইত্যাদির নিরাপত্তা দেওয়া হবে। ধর্মীয় ব্যাপারে তারা সম্পূর্ণ স্বাধীন থাকবে। এমনকি মসজিদ থেকেও বেশি তাদের ধর্মালয়ের নিরাপত্তা দেওয়া হবে। পবিত্র কোরআনের সূরা হজে মসজিদের আগে অমুসলিমদের উপাসনালয়ের কথা বলা হয়েছে। তাদের সব কিছু হবে। এমনকি তাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক সব বিষয়-আশয় যেমন বিয়ে, সম্পত্তি বণ্টন, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি চলবে তাদের আইনে। শুধু উচ্চ পর্যায়ে নীতি নির্ধারণে তারা অংশ নিতে পারবে না। আইন প্রণয়নের তাদের ভূমিকা থাকবে না। তবে তাদের দাবি ও সমস্যার কথা সরকারের কাছে উপস্থাপন করতে পারবে। এ জন্য তাদেরকে পৃথক পার্লামেন্ট তৈরি করে দেওয়া যেতে পারে।

এ তিনটি কথা যুক্ত করার পর পরামর্শের ভিত্তিতে সব কিছু করা যেতে পারে। এ তিনটি কথা সংবিধানে থাকার পর কেউ যদি কোরআন-সুন্নাহবিরোধী আইন প্রণয়ন করে, তখন যে কেউ প্রতিবাদ করলে সরকার সেই আইন বাতিল করতে বাধ্য থাকবে। আর এর নাম-ই খেলাফত। মোটকথা, খেলাফত আর গণতন্ত্রের মধ্যে ব্যবধান হচ্ছে সার্বভৌমত্বের অধিকারীর ব্যবধান। গণতন্ত্রে সব সার্বভৌমত্বের মালিক বলা হয় জনগণকে এবং কোরআন-সুন্নাহ মতে সার্বভৌমত্বের মালিক আল্লাহ্‌।

– অনেকে গণতন্ত্রকে কুফরী মতবাদ বলেন। আবার কেউ একটু অগ্রসর হয়ে গণতন্ত্রীকেও কাফের বলেন। আপনি কি মনে করেন?

: জনগণের সার্বভৌমত্বের এই বিশ্বাস অবশ্যই কুফরী এবং শিরক। যারা গণতন্ত্রী, তাদেরকে আমি পাপিষ্ঠ গোমরাহ মনে করলেও কাফের বলি না। ইসলাম জনগণের সার্বভৌমত্বের কথা স্বীকার করে না। ইসলাম জনগণকে খলিফা মনে করে মাত্র।

– ইসলামপন্থী অনেকেই তো গণতন্ত্রের পথে কাজ করছেন দেখছি। তারা ইসলামী গণতন্ত্রের কথা বলেন। আপনি কি মনে করেন?

: আমার মতে তারা বিভ্রান্ত। তারা সঠিক পথ অনুসরণ করছে না। আমি আজ পর্যন্ত গণতন্ত্রের জন্য এক মিনিটও নষ্ট করিনি। যারা গণতন্ত্রকে পছন্দ করে, তাদের দলেও যোগ দেইনি। দেখ, পাকিস্তানের দ্বীনি সংগঠনগুলো দু'টি ভুল করেছে।

প্রথম ভুল, তারা নির্বাচনের ময়দানে এসে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়েছে। এর ফলে দ্বীন একটা দলীয় ইস্যুতে পরিণত হয়েছে। জনগণের ইস্যু নয়।

দ্বিতীয় ভুল, পাকিস্তানে যখন সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন দ্বীনি সংগঠনগুলো সেক্যুলার সংগঠনগুলোর সঙ্গে এক প্লাটফরমে দাঁড়িয়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করেছে। ফলাফল কি হয়েছে? আইয়ুব খানের শাসন শেষ হয়েছে, এসেছে কে? ভুট্টো সাহেব। বর্তমান পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে একথা মানতেই হবে, আপনি যদি সেক্যুলারদের সঙ্গে মিলে আন্দোলন করেন, তবে সেক্যুলার শাসনই আসবে। পাকিস্তানে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত না হওয়ার জন্য আমি সবচাইতে বেশি দায়ী মনে করি দ্বীনি সংগঠনগুলোর গণতান্ত্রিক পথ অনুসরণ করাকে।

– মাওলানা আবুল আলা মওদূদী সাহেব প্রথম দিকে গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে ছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে তিনি গণতান্ত্রিক পথ অনুসরণ করলেন, নির্বাচনে গেলেন, যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনে ফাতেমা জিন্নাহকে সাহায্য করলেন। এ সম্পর্কে আপনার মন্তব্য কি?

: এসবের বিরুদ্ধে আমি তখন কথা বলেছি। আমি এসব তৎপরতাকে ভুল মনে করি। পাকিস্তানের দ্বীনি সংগঠনগুলোর মধ্যে সর্বপ্রথম নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন মাওলানা মওদুদী। আমার মতে, এটা তাঁর অনেক বড় বিভ্রান্তি। পাকিস্তান হওয়ার পর মাওলানা মওদুদী মূল্যবান একটি কাজ করেছিলেন, যা অত্যন্ত উঁচু পর্যায়ের। তা হলো, তিনি দাবি করেছিলেন, পাকিস্তানের সংবিধান ইসলামী নীতি অনুযায়ী প্রণীত হবে। সে সময় পর্যন্ত জামায়াত কোনো নির্বাচনে অংশ নেয়নি এবং প্রচলিত নিয়মানুসারে তা কোনো তথাকথিত রাজনৈতিক দলও ছিলো না। তখন গোটা জাতি তাদের দাবিতে একমত ছিলো। মাওলানা শাব্বির আহমদ উসমানী (র.)-এর মতো উঁচু পর্যায়ের আলেম ও নেতা যিনি জামায়াতী না হয়েও মওদুদীর এ দাবির সঙ্গে একমত ছিলেন। তাই বলি, পদক্ষেপ শুদ্ধ ছিলো। যদি তা নিয়ে তিনি সামনে অগ্রসর হতেন, তবে 'আমার বিল মারূফ নাহী আনিল মুনকারের নীতিতে' তাদের দাবি পূরণ হত। কিন্তু তিনি পা বাড়ালেন অন্যদিকে; নির্বাচনের ধোঁকায় পড়লেন। যারা বলে, আমি ক্ষমতায় গেলে ইসলাম কায়েম করবো, এ ধরনের কথা অনেক বড় বিভ্রান্তি। ফলে অনেক বড় ক্ষতি হয়ে গেলো। এর পর বাকি দলগুলো তার সঙ্গে থাকলো না। আমার মতে, পাকিস্তানে ইসলামী হুকুমত কায়েম না হওয়ার জন্য সবচাইতে বড় দায়ী মওলানা মওদুদীর এই ভুল সিদ্ধান্ত।

– এক সময় তো আপনি নিজেও মাওলানা মওদুদীর সঙ্গে ছিলেন। জামায়াতের ছাত্র সংগঠন জমিয়তে তালাবার নাজিমে আলা ছিলেন। কিন্তু এর পর জামায়াত ছেড়ে দিলেন কেন?

: দেখ, সে সময় আমি যুবক ছিলাম। পাকিস্তানের জন্মলগ্নে, অর্থাৎ ১৯৪৬ ইংরেজিতে আমি এসএসসি পরীক্ষা দেই। তখন আমার বয়স ১৫ বছর। হাই স্কুলের জীবনে আমি কাজ করেছি মুসলিম স্টুডেন্ট ফেডারেশনে। পাকিস্তান আন্দোলনে আমি পূর্ব পাঞ্জাবের জেলা ফেডারেশনের সেক্রেটারি জেনারেল ছিলাম। পাকিস্তান হওয়ার পর মাওলানা মওদুদী এখানে আসেন। আমাকে এই বলে তার দলে যোগদান করতে বলেন যে, আমরা পাকিস্তানের সংবিধান ইসলামী করার জন্য আন্দোলন করছি। এ আন্দোলনে তোমাদের মত ঈমানদীপ্ত যুবকের প্রয়োজন। আমি তার সঙ্গে একমত হয়ে জমিয়তে তালাবা-এ যোগ দিলাম। তিনি যখন প্রথম নির্বাচনে গেলেন, তখনো আমি বুঝতে পারিনি এটা যে ভুল পদক্ষেপ। তখন আমার তা বোঝারও যোগ্যতা ছিলো না। ১৯৫৪ সালে ছাত্র জীবন শেষে জামায়াতে ইসলামীতে যোগ দিলাম এবং দলের রোকন হয়ে গেলাম। এরপর আমার বুঝে আসে, জামায়াতে ইসলামী ভুল পথে চলছে। দলের নীতিগত পরিবর্তন আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। আমি এমন একটা ধারণা নিয়ে জামায়াতে গিয়েছিলাম যে, তাদের মধ্যে তাকওয়াহ, লিল্লাহিয়ত, আদর্শ থাকবে; আমি তাদের সঙ্গে থাকলে নিজেও এসবের ওপর আমল করতে পারবো। কিন্তু দেখলাম, এসবের কিছুই তাদের মধ্যে নেই।

– কেন নেই?

: নির্বাচনে অংশগ্রহণের আগে জামায়াতে ইসলামী ছিলো একটি আদর্শবান ইসলামী ইনকিলাবী সংগঠন। কিন্তু নির্বাচনে গিয়ে হয়ে গেছে ইসলাম পছন্দ জাতীয়তাবাদী এক রাজনৈতিক দল। আমার এই চিন্তা আমি জামায়াতের বৈঠকে উপস্থাপন করলাম। ১৯৫৫ সালে জামায়াতের বার্ষিক সম্মেলনে তা উপস্থাপনের ইচ্ছে ছিলো। মাওলানা মওদুদী আমাকে সে সুযোগ দিলেন না। তিনি চারজন রোকন পাঠালেন আমার বক্তব্য বোঝার জন্য। আমি তাদের কাছে লিখিত বক্তব্যে উদাহরণসহ বোঝাতে চেষ্টা করলাম যে, জামায়াতে ইসলামীর নীতি পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। এই পরিবর্তনটা এক প্রকারের বিভ্রান্তি। এই বিভ্রান্তির পথে আমরা এখনো তেমন অগ্রসর হইনি বলে ফিরে আসার সুযোগ আছে। আমার অনুরোধ, ফিরে আসুন এবং নির্বাচনের পথ পরিত্যাগ করুন। আমার এই বক্তব্য বই আকারে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু মাওলানা মওদুদীর আত্মবিশ্বাস ছিলো, নির্বাচনের মাধ্যমে উদ্দেশ্য সফল হবে। এই বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভুল ছিলো। ১৯৫৭ সালে আমি যখন দেখলাম, জামায়াতের দ্বারা উদ্দেশ্য সফল হবে না, তখন নিজেই জামায়াত ত্যাগ করলাম। প্রায় ৪২ বছর হয়ে গেলো আমি জামায়াত থেকে বিচ্ছিন্ন।

– পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে আপনাদের শ্লোগান ছিলো "পাকিস্তান কা মতলব কেয়া—লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" কিন্তু আজও তা বাস্তবে রূপ নিলো না। পাকিস্তান আন্দোলনের কর্মী হিসেবে এর কারণ কি মনে করেন?

: প্রথম কারণ হলো, যে মুসলিম লীগের মাধ্যমে পাকিস্তানের জন্ম, তা নিছক একটি মুসলিম জাতীয়তাবাদী সংগঠন ছিলো। এটি আদৌ দ্বীনি সংগঠন ছিলো না। এর নেতৃত্বও কোনো দ্বীনি লোকের দখলে ছিলো না। তাদের প্রায় সবাই ছিল সেক্যুলার প্রকৃতির। তারা আমলী মুসলমান ছিলো না। মুসলমানদের সংগঠন, তাই এর নাম হয়েছে মুসলিম লীগ। বর্তমানে তো অনেক মদপায়ীও মুসলমান আছে। এমনকি মুসলিম লীগ তো কাদিয়ানীদেরকেও মুসলমান মনে করতো। তাই এমন সংগঠনের মাধ্যমে ইসলাম প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন অবাস্তব ছিলো। আমি ইতিপূর্বে বলেছি, এক্ষেত্রে দ্বীনি সংগঠনসমূহ কি ভুল করেছে। মোটকথা, মুসলিম লীগের কাছে তো ইসলাম প্রতিষ্ঠার আশাই করা যায় না। যাদের প্রতি আশা ছিলো, তারা ভুল পথে চললো। পাকিস্তানে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠিত না হওয়ার এটাই কারণ।

– মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর জীবনাচার, স্টাইল এবং নীতি কিছুই তো ইসলামিক ছিলো না। কোনোভাবেই তো তিনি ইসলামী নেতা হওয়ার যোগ্যতা রাখতেন না। এর পরও তিনি হয়েছেন আপনাদের নেতা! কেন, এই সময় কি নেতৃত্বদানের মতো যোগ্য আলেম ভারতবর্ষে ছিলেন না?

: আসলে সে সময় অনেক আলেম চাইতেন হিন্দুদের সঙ্গে থেকে আন্দোলন করে ইংরেজদের গোলামী থেকে মুক্তি পাওয়া। কিন্তু সাধারণ মুসলমান অনুভব করে, তাদের সিদ্ধান্ত ভুল। হিন্দুরা কখনো ইনসাফ করবে না। সুযোগ পেলে আটশ' বছরের গোলামীর প্রতিশোধ নেবে। এ জন্যই সব আলেমের কথা সাধারণ মুসলমানের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়নি। মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী, মওলানা আবুল কালাম আজাদ ছিলেন এই দলে। অন্যদিকে মাওলানা আশরাফ আলী থানবী, মাওলানা শাব্বির আহমদ ওসমানী, মাওলানা জাফর আহমদ ওসমানী প্রমুখ তো অনেক উঁচু পর্যায়ের আলেম ছিলেন। তবু তাঁরা জিন্নাহকে এই বুঝে সমর্থন করলেন যে, যদিও লোকটা দ্বীনদার নয়, তবে আজকের এই পরিস্থিতিতে যে রকম রাজনীতিকের প্রয়োজন, যে যোগ্যতার প্রয়োজন, ইংরেজদের ভাষা ও নীতি বোঝার মতো যে জ্ঞানের প্রয়োজন, তা জিন্নাহর মধ্যে আছে। তাই তাকে গোটা জাতির পক্ষ থেকে আলাদা ভূখণ্ড আদায়ের লক্ষ্যে উকিল নিয়োগ করা যায়।

পাঞ্জাবের জামায়েত আলী শাহ উঁচু পর্যায়ের একজন পীর ছিলেন। তখন তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিলো, কীভাবে আপনি একজন দাড়ি কামানো লোকের হাতে বয়াত হলেন? উত্তরে তিনি বলেছিলেন : "আমি তাকে ইমাম বা আমীর হিসেবে গ্রহণ করিনি। তার কাছে বায়াতও নেইনি। আমাদের মুসলিম জাতির একটা মামলা চলছে হিন্দুদের সঙ্গে। এই মামলায় একজন উকিল প্রয়োজন। এখন উকিল তো তাকেই নিয়োগ করতে হবে, যে আইন জানে এবং সাফল্য অর্জনের যোগ্যতা রাখে। আমরা তো এ প্রসঙ্গে যোগ্য উকিল মনে করি মোহাম্মদ আলী জিন্নাহকে।" পীর সাহেবের এই উত্তর আমার মতে সঠিক ছিলো। পাকিস্তানের পোকায় খাওয়া মানচিত্র যদিও ইংরেজ এবং হিন্দুদের ষড়যন্ত্রের কারণে মানতে হয়েছে, তবু বাস্তবতা হলো যতটুকু হয়েছে তা জিন্নাহর

লড়াইয়ের ফলে। যদিও ইসলামী হুকুমত হয়নি, তবু তো হিন্দুস্তানের ওপর মুসলমানদের দু'টি আজাদ দেশ হয়েছে। যদিও বাংলাদেশ আজ আর পাকিস্তান নয়, তবু সত্য যে, বাংলাদেশও হিন্দুদের গোলামী থেকে মুক্ত একটি স্বাধীন মুসলিম দেশ। এখন এই দুই দেশেই আমাদের সুযোগ আছে, ইচ্ছে করলে ইসলামী শরিয়ত প্রতিষ্ঠিত করতে পারবো।

– একাত্তরে বাংলাদেশে পাকসৈন্য কর্তৃক যে জুলুম-নির্যাতন হয়েছে, সে সম্পর্কে আপনি ১৯৯৬ সালের ডিসেম্বর সংখ্যা 'নেদা-এ-খেলাফত' সাপ্তাহিকীতে লিখেছেন। সেখানে হামিদুর রহমান কমিশনের রিপোর্ট ভুট্টো সাহেব কর্তৃক গায়েব করার কথা উল্লেখ করেছেন। আমি জেনারেল (অব.) রাও ফরমান আলীকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বললেন— "সেই রিপোর্টে রাজনীতিকদের বিরুদ্ধে কিছুই ছিলো না। সবই ছিলো সেনাবাহিনী বিষয়ক। অথচ ঘটনার জন্য প্রকৃত দায়ী রাজনীতিকরা।" এ সম্পর্কে আপনার মতামত কি?

: আমার মতে তো এই ভুলের সূচনা হয়েছে স্বয়ং কায়দে আজম থেকে। কায়দে আজম থেকে বড় দুই ভুল হয়েছে।

এক. তিনি দুনিয়ার সামনে নিজেকে এক সেক্যুলার নেতা হিসেবে প্রকাশ করতে চেয়েছেন। তা এ জন্য করেছেন যে, দুনিয়া যাতে ইসলাম আগমনের ভয়ে আতংকিত না হয়। এ জন্যই এক কাদিয়ানীকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং এক হিন্দুকে আইনমন্ত্রী করলেন।

– এই দুই মন্ত্রীর নাম কি?

: চৌধুরী স্যার জাফর উল্লাহ খান কাদিয়ানী ছিলো। আর হিন্দু মন্ত্রীর নাম জগিন্দ্রনাথ মন্ডল। বাংলার মুসলমান সর্বদা সচেতন ও দ্বীনদার ছিলো। তারা ইসলামের জন্য পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলো। এই ঘটনায় তারা মর্মাহত হয়।

দুই. ভাষার সমস্যাটা কায়দে আজম সঠিকভাবে বুঝতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। হিন্দির মোকাবেলায় উর্দু— এটা ভিন্ন কথা। কিন্তু মাতৃভাষার ব্যাপার তো অনেক গভীরের। পরামর্শদাতারা তাঁকে পরামর্শ দিয়েছিলো বটে, কিন্তু তাতে তিনি কর্ণপাত করলেন না। পাকিস্তান হওয়ার পরই স্যার আগা খান পরামর্শ দিয়েছিলেন, পাকিস্তানের সরকারি ভাষা আরবি করা হোক। আমার এক আত্মীয় জাহিদ হোসেন (পাকিস্তান স্টেট ব্যাংকের তৎকালীন ডাইরেক্টর)-ও কায়দে আজমকে এই পরামর্শ দিয়েছিলেন। সিন্ধীরা বলেছিলো উর্দু না করে যদি আরবিকে সরকারি ভাষা করা হয়, তবে আমরা মেনে নেব। আমার মনে হয়, বাঙালিরাও আপত্তি করতো না। কিন্তু তা করা হলো না। এটা কায়দে আজমের বড় ভুল। তিনি পূর্ব পাকিস্তান গিয়েও বুঝতে পারলেন না এ বিষয়ের গভীরতা। বাঙালিদের ভয় ছিলো যারা বিহার থেকে এসেছে তাদের মাতৃভাষা তো উর্দু। যদি তাদের ভাষাও উর্দু করা হয়, তবে বিহারীরা বাঙালি থেকে এগিয়ে যাবে। এটা যুক্তিসঙ্গত ভয়। এই ভয় সিন্ধীদেরও ছিলো। তাই আমার মতে, উর্দুকে জাতীয় ভাষা করার সিদ্ধান্ত ভুল ছিলো।

ভুল তো সেখান থেকে শুরু হয়েছে। এর পর রাজধানী করাচি থেকে ইসলামাবাদে নিয়ে আসা হলো। এ ছিলো আরেক ভুল। তখনকার বাঙালি নেতারা স্পষ্ট বললেন, এটা হলো সমাপ্তির সূচনা। কারণ পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানের সরাসরি যোগাযোগ ছিল একমাত্র করাচির সমুদ্র বন্দরের সঙ্গে। চট্টগ্রাম থেকে জাহাজে কম ভাড়ায় করাচিতে আসা যেত। রাজধানী পরিবর্তনের ফলে পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে ইসলামাবাদের যোগাযোগ ব্যয়বহুল হয়ে গেলো। এছাড়া আরো অসংখ্য বিষয় রয়েছে। সামরিক শাসন আসার পর বাঙালিদের ধারণা হলো, যেহেতু সেনাবাহিনীতে সবই পাঞ্জাবি তাই এই শাসন পাঞ্জাবিদের শাসন। শুধু পূর্ব পাকিস্তানে নয়, অন্যান্য প্রদেশেরও জনসাধারণের মনে এই ধারণা সৃষ্টি হয়েছিল। পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দু সম্প্রদায় এটাকে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সুবর্ণ সুযোগ হিসেবে ব্যবহার করে। বাঙালি মুসলমানরা চিন্তা করলো সত্যিই তো, পাঞ্জাবিদের গোলামীর জন্য আমরা পাকিস্তানের জন্ম দেইনি। এসব কারণে পূর্ব পাকিস্তানে মুসলিম লীগের পরাজয় ঘটে যুক্তফ্রন্টের কাছে। এসবের রাজনৈতিক সমাধান করা যেত। তা করা হয়নি। শক্তি ব্যবহার করা হয়েছে। মোটকথা ভুলের এক দীর্ঘ তালিকা এখানে রয়েছে।

আমি ১৯৬৯ সালে লিখেছিলাম, পূর্ব পাকিস্তানে গণভোট দেয়া হোক এই প্রশ্নে যে, তারা আমাদের সঙ্গে থাকতে চায় কি-না? কারণ এই সিদ্ধান্ত একমাত্র তারাই নিতে পারে। যদি তারা আমাদের সঙ্গে থাকতে না চায়, তবে দুনিয়ার কোনো শক্তি নেই তাদের ধরে রাখার। যদি তারা পৃথক হতে চায়, তবে ভালো। সংঘাত সৃষ্টির আগে আলোচনার মাধ্যমে ভাই ভাই-এর মতো পৃথক হয়ে যাওয়া ভালো। এটা তো কোনো ব্যাপার নয়। তারা পাকিস্তান থেকে পৃথক হয়ে গেলে তো কাফের হয়ে যাবে না; বরং আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে সঙ্গী আরেকটি মুসলিম দেশ বৃদ্ধি পাবে। আমি এসব কথা সেই সময় লিখেছি। কিন্তু আমাদের এখানে তো ইসলাম কিংবা গণতন্ত্র কোনোটাই ছিলো না। সামরিক শাসন দীর্ঘদিন চেপেছিল আমাদের ওপর। সামরিক লোকেরা সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান থেকে শক্তি প্রয়োগকে বেশি বুঝে। এই শক্তি প্রয়োগের ফলে আমাদের শাস্তি হয়েছে। অনেক বড় শাস্তি।

– একাত্তরের ব্যাপারে আমরা গোটা পাকিস্তানিদেরকে দায়ী মনে করি। এখানে এসে দেখি সাধারণ মানুষ একাত্তরের ব্যাপারে তেমন কিছু জানার সুযোগ পায়নি। বিভিন্ন লোকের সঙ্গে আলাপ করে দেখলাম কেউ দায়ী করছেন আইয়ুব খানকে, কেউ ভুট্টোকে, আবার কেউ ইয়াহিয়াকে, শেখ মুজিবের প্রতিও অনেকের ক্ষোভ রয়েছে। আপনার মতে কে দায়ী?

: এটা দীর্ঘ আলোচনার ব্যাপার। আমি তোমাকে তো বললামই এ সংকটের শুরু হয়েছে স্বয়ং কায়দে আজম থেকে। কায়দে আজম যখন সেক্যুলারদের মতো ঘোষণা দিলেন, "ধর্ম হচ্ছে একজন মানুষের ব্যক্তিগত বিশ্বাস মাত্র।" তখন মুসলমানরা ভাবতে লাগলো, এই যদি হয় পাকিস্তান, তবে হিন্দুস্তানের সঙ্গে পাকিস্তানের ব্যবধান কি? হিন্দুস্তানেও তো মুসলমানদের ব্যক্তিগত ধর্ম পালনে অসুবিধা নেই। ব্যক্তিগত ধর্মীয়

বিশ্বাসের ব্যাপারে ভারতে আজো তো কোনো বাধা নেই। পাকিস্তান তো হয়েছিলো ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার জন্য। পাকিস্তান আন্দোলনের স্লোগান তো ছিলো—"পাকিস্তান কা মতলব কেয়া— লাইলাহা ইল্লাল্লাহ।"

কায়দে আজম যে কোনো কারণেই এই নীতি গ্রহণ করেন না কেন, তা তার ব্যক্তিগত ব্যাপার। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, সাধারণ মুসলমানের ভেতর এর ফলে খারাপ ধারণা সৃষ্টি হয়। ধার্মিকতায় পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমানরা পশ্চিম পাকিস্তানের মুসলমান থেকে এগিয়ে আছে। কায়দে আজমের এই বক্তব্য তাই তাদেরকে বেশি আহত করে। ভাষার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতেও কায়দে আজম ভুল করেছেন। তাঁর এই ভুল দু'টি ছিল অত্যন্ত মারাত্মক। যদিও কায়দে আজম পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা নেতা, তবু স্মরণ রাখতে হবে, তিনি ফেরেস্তা ছিলেন না। ইমাম কিংবা মাসুমও ছিলেন না। তাঁর কাছ থেকেও ভুল হতে পারে এবং হয়েছেও। এরপর ভুলের ওপর ভুল, আসল সামরিক শাসন। সর্বশেষ ভুল প্রধানমন্ত্রিত্বের লড়াই। পূর্ব পাকিস্তানের ছোট ছোট দলগুলোকে সঙ্গে নিয়ে শেখ মুজিব ময়দানে আসলে ভুট্টো সাহেবও পশ্চিম পাকিস্তানের ছোট ছোট দলগুলোকে কলা-কৌশলে তার সঙ্গে নিয়ে নিলেন। উভয় পক্ষেই আঞ্চলিকতা মাথা উঁচু করে দাঁড়ালো। সংখ্যানুপাতে শেখ মুজিব নির্বাচিত হলো ভুট্টো সাহেব প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ালেন। প্রস্তাব করলেন, দুই অংশে দুই প্রধানমন্ত্রী করা হোক। ভুট্টো সাহেবের যদি দেশপ্রেম থাকতো, সঠিক বুঝ থাকতো, তবে বলতেন, ঠিক আছে শিখ মুজিব যখন নির্বাচিত হয়েছে, তাকেই প্রধানমন্ত্রী করা হোক।

– সাপ্তাহিক নেদা-এ-খেলাফত ম্যাগাজিনে আপনি বলেছেন, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় শেখ মুজিবের শাস্তি হওয়া উচিত ছিলো। এটা আপনি কিভাবে বললেন, মামলাটাই তো ছিল সামরিক সরকারের এক ষড়যন্ত্র?

: দেখ, আমি বলেছি এবং আজও বলছি যে, মামলা মধ্যখানে বন্ধ না করে চালিয়ে যাওয়া উচিত ছিলো। শেষ পর্যন্ত যদি প্রমাণিত হতো ষড়যন্ত্র মামলাই একটি ষড়যন্ত্র, তবে সরকারের চরিত্র সাধারণ মানুষের সামনে স্পষ্ট হয়ে যেত। আর যদি প্রমাণিত হতো, শেখ মুজিব দোষী, তবে তার শাস্তি হওয়া প্রয়োজন ছিলো। যে বাঙালি মুসলমানরা পাকিস্তান সৃষ্টি করেছিলো, তারা বুঝতো, শেখ মুজিবের আসল চাবি কোথায়। মধ্যখানে মামলা থামিয়ে ক্ষতি হয়েছে।

– কারা থামালো এই মামলা?

: পাকিস্তানের নেতারা আইয়ুব খানকে প্রেসার দিলেন মামলা প্রত্যাহারের। আইয়ুব খান তাদের কথা শুনলো।

– এতে লাভ হলো না ক্ষতি?

: বলা যাচ্ছে না। তবে আমার ধারণা, মামলা নিয়মতান্ত্রিকভাবে সমাপ্ত হলে ভালো হতো। যদি প্রমাণ হতো শেখ মুজিব ভারতের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে পাকিস্তান ভাঙতে চাচ্ছে, তবে বাংলার মুসলমানরা তা সহ্য করতো না। পাকিস্তানের ব্যাপারে পশ্চিম

পাকিস্তানি থেকে পূর্ব পাকিস্তানিদের মহব্বত বেশি ছিলো। মুসলিম লীগের জন্ম ঢাকায়। বাংলার মুসলমানদের ভোটে পাকিস্তানের জন্ম। ভারতবর্ষে মুসলিম লীগের শাসন সুদূর অতীত থেকেই যুক্ত বাংলায় ছিলো। তাই বলছি, যদি প্রমাণিত হয়ে যেত শেখ মুজিব পাকিস্তান ভাঙ্গার ষড়যন্ত্র করছে, তবে জনগণ তাকে নেতা হিসাবে গ্রহণ করতো না।

– আপনি আপনার 'সুকুতে মাশরেকি পাকিস্তান' প্রবন্ধে লিখেছেন, ১১শ' মাইলের দূরত্বের যে দুই অঞ্চল নিয়ে এক পাকিস্তান হয়েছে, তা ভুল ছিলো। কারণ মধ্যখানে শত্রু দেশ ভারত। প্রশ্ন হলো, ভুলের ওপর যে দেশের জন্ম, তার ঐক্য কিভাবে আশা করেন?

: দেখ আজো বলছি, এটা জিওগ্রাফিক্যাল ভুল ছিলো এবং এই ভুল করেছেন স্বয়ং বাঙালি নেতারা। নতুবা ২৩ মার্চ ১৯৪০-এ লাহোর প্রস্তাবে স্পষ্ট দু'টি স্বাধীন রাষ্ট্রের কথা ছিলো। কিন্তু ১৯৪৬ সালে বাংলার নেতারা বললেন, দুই পৃথক রাষ্ট্রের কথা বাদ দিয়ে এক পাকিস্তান করা হোক। বাংলার মুসলমানেরা অত্যন্ত ইসলামী চেতনাসম্পন্ন।

– পাকিস্তানে ইসলামী হুকুমত বা খেলাফত প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বর্তমানে আপনার ভূমিকা কি?

: আমার সংগঠন তো চেষ্টা করে যাচ্ছে। কিন্তু মানুষ আমাদের দলে বেশি নেই। জামায়াতে ইসলামী এবং অন্যান্য ইসলামী দলে মানুষ আছে। আমি জীবনে অনেক ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যদিয়ে এখানে এসে দাঁড়িয়েছি। যদিও আমাদের দলে মানুষ কম, তবে আমাদের চিন্তাধারা পরিষ্কার। আমরা যোগ্য লোক তৈরি করতে চেষ্টা করছি। স্পষ্ট করে বলা যাচ্ছে না পাকিস্তানে কোন গ্রুপের হাতে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠিত হবে।

– বাঙালি মুসলমানদের প্রতি আপনার কোনো পয়গাম আছে কি?

: কথা তো একটাই। সেখানে আপনারা খেলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য সংঘবদ্ধ হোন। জনতাকে স্পষ্ট খেলাফতের ধারণা দিতে চেষ্টা করুন। খেলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য বাংলাদেশ পাকিস্তান থেকে উপযুক্ত স্থান।

– কিভাবে উপযুক্ত?

: সেখানে ফেরকাবাজী, সিলসিলাবাজী, গোত্রতান্ত্রিকতা তেমন নেই। আমাদের পাকিস্তানে বড় সমস্যা শিয়া-সুন্নির সংঘাত। এই বিষয়টা আমাদের রাজনীতি থেকে শুরু করে সেনাবাহিনী এবং পুলিশেও রয়েছে। আমাদের এখানে দেওবন্দী ও ব্রেলভীর যে সংঘাত, তা বাংলাদেশে ততটা নয়; আমি বরং দেখেছি, সেখানে উভয় পক্ষের বুজুর্গরা বিভিন্ন মৌলিক ব্যাপারে একে-অন্যের সহযোগী হয়। তাই বলছি, খেলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য পাকিস্তান থেকে বেশি উপযুক্ত স্থান বাংলাদেশ। সেখানে শুধু যোগ্য নেতৃত্বের প্রয়োজন।

– আপনার অনেক সময় নষ্ট করলাম। সময় দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ।

: তোমাকেও অনেক ধন্যবাদ।

পরিশিষ্ট–র

বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে ব্রিটিশ সাংবাদিক ডেভিড ফ্রস্টের সাক্ষাৎকার

"ভুট্টোর হাতে ক্ষমতা তুলে দেবার সময় ইয়াহিয়া বলেছিল— মিস্টার ভুট্টো, আমার জীবনের সবচাইতে বড় ভুল হয়েছে, শেখ মুজিবুর রহমানকে ফাঁসি না দেয়া"

ডেভিড ফ্রস্ট : সে রাতের কথা আপনি বলুন। সেই রাত, যে রাতে একদিকে আপনার সঙ্গে যখন চলছিল আলোচনা এবং যখন সেই আলোচনার আড়ালে পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়ার উদ্যোগ নিচ্ছিল, সেই রাতের কথা বলুন। সেই ২৫ মার্চ, রাত আটটা। আপনি আপনার বাড়িতে ছিলেন। সেই বাড়িতেই পাকিস্তান বাহিনী আপনাকে গ্রেপ্তার করেছিল। আমরা শুনেছিলাম, টেলিফোনে আপনাকে সাবধান করা হয়েছিল, সামরিক বাহিনী অগ্রসর হতে শুরু করেছে। কিন্তু তবু আপনি আপনার বাড়ি পরিত্যাগ করলেন না। আপনি গ্রেফতার হলেন। কেন আপনি নিজের বাড়ি ছেড়ে অপর কোথাও গেলেন না এবং গ্রেপ্তার বরণ করলেন? কেন এই সিদ্ধান্ত? তার কথা বলুন।

শেখ মুজিবুর রহমান : হ্যাঁ, সে এক কাহিনী। তা বলা প্রয়োজন। সে সন্ধ্যায় আমার বাড়ি পাকিস্তান সামরিক জান্তার কমান্ডো বাহিনী ঘেরাও করেছিল। ওরা আমাকে হত্যা করতে চেয়েছিল। প্রথমে ওরা ভেবেছিল, আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলে ওরা আমায় হত্যা করবে এবং প্রচার করে দেবে যে, তারা যখন আমার সঙ্গে রাজনৈতিক আপোসের আলোচনা করছিল, তখন বাংলাদেশের চরমপন্থীরাই আমাকে হত্যা করেছে। আমি বাড়ি থেকে বেরুনো না বেরুনো নিয়ে চিন্তা করলাম। আমি জানতাম, পাকিস্তান বাহিনী এক বর্বর বাহিনী। আমি জানতাম, আমি আত্মগোপন করলে, ওরা দেশের সমস্ত মানুষকেই হত্যা করবে। এক হত্যাযজ্ঞ ওরা সমাধা করবে। আমি স্থির করলাম, আমি মরি, তাও ভালো, তবু আমার প্রিয় দেশবাসী রক্ষা পাক।

– আপনি হয়তো কলকাতা চলে যেতে পারতেন।

: আমি ইচ্ছা করলে যে কোনো জায়গায় যেতে পারতাম। কিন্তু আমার দেশবাসীকে পরিত্যাগ করে আমি কেমন করে যাবো? আমি তাদের নেতা। আমি সংগ্রাম করবো। মৃত্যুবরণ করবো। পালিয়ে কেন যাবো? দেশবাসীর কাছে আমার আহ্বান ছিল, তোমরা প্রতিরোধ গড়ে তোলো।

– আপনার সিদ্ধান্ত অবশ্যই সঠিক ছিল। কারণ এই ঘটনাই বিগত নয় মাস ধরে বাংলাদেশের মানুষের কাছে আপনাকে তাদের একটি বিশ্বাসের প্রতীকে পরিণত করেছে। আপনি এখন তাদের কাছে প্রায় ঈশ্বরবৎ।

: আমি তা বলিনে। কিন্তু একথা সত্য, তারা আমাকে ভালবাসে। আমি আমার বাংলার মানুষকে ভালবেসেছিলাম। আমি তাদের জীবনকে রক্ষা করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু হানাদার বর্বর বাহিনী আমাকে সে রাতে আমার বাড়ি থেকে গ্রেফতার করল। ওরা আমার নিজের বাড়ি ধ্বংস করে দিল। আমার গ্রামের বাড়ি, যেখানে ৯০ বছরের বৃদ্ধ পিতা এবং ৮০ বছরের বৃদ্ধ জননী ছিলেন, সে বাড়িও ধ্বংস করে দিল। ওরা গ্রামে ফৌজ পাঠিয়ে আমার বাবা-মাকে বাড়ি থেকে বিতাড়িত করে তাদের চোখের সামনে সে বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিল। বাবা-মার আর কোনো আশ্রয় রইল না। ওরা সব কিছুই জ্বালিয়ে দিয়েছিল। আমি ভেবেছিলাম, আমাকে পেলে ওরা আমার হতভাগ্য মানুষদের হত্যা করবে না। কিন্তু আমি জানতাম, আমাদের সংগঠনের শক্তি আছে। আমি একটি শক্তিশালী সংগঠনকে জীবনব্যাপী গড়ে তুলেছিলাম। জনগণ তার ভিত্তি। আমি জানতাম, তারা শেষ পর্যন্ত লড়াই করবে। আমি তাদের বলেছিলাম, প্রতি ইঞ্চিতে তোমরা লড়াই করবে। আমি বলেছিলাম, হয়তো এটাই আমার শেষ নির্দেশ। কিন্তু মুক্তি অর্জন না করা পর্যন্ত তাদের লড়াই করতে হবে। লড়াই তাদের চালিয়ে যেতে হবে।

– আপনাকে ওরা ঠিক কিভাবে গ্রেপ্তার করেছিল? তখন তো রাত ১-৩০ মিনিট ছিল? তাই নয় কি? তখন কি ঘটলো?

: ওরা প্রথমে আমার বাড়ির ওপর মেশিনগানের গুলি চালিয়েছিল।

– ওরা যখন এলো, তখন আপনি বাড়ির কোনখানটাতে ছিলেন?

: এটা যেটা দেখছেন, এটা আমার শোবার ঘর। আমি এই শোবার ঘরেই তখন বসেছিলাম। এদিক থেকে ওরা মেশিনগান চালাতে আরম্ভ করে। তারপরে এদিক-ওদিক সবদিক থেকে গুলি ছুড়তে আরম্ভ করে। জানালার ওপর গুলি চালায়।

– ওগুলো সব তখন ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল?

: হ্যাঁ, সব ধ্বংস করেছিল। আমি তখন আমার পরিবার-পরিজনদের সঙ্গে ছিলাম। একটা গুলি আমার শোবার ঘরে এসে পড়ে। আমার ছয় বছরের ছোট ছেলেটি বিছানার ওপর তখন শোয়া ছিল। আমার স্ত্রী এই শোবার ঘরে দুটি সন্তান নিয়ে বসেছিলেন।

– পাকিস্তান বাহিনী কোন দিক দিয়ে ঢুকেছিল ?

: সব দিক দিয়ে। ওরা একবার জানালার মধ্য দিয়ে গুলি ছুঁড়তে শুরু করে। আমি আমার স্ত্রীকে দুটি সন্তানকে নিয়ে বসে থাকতে বলি। তারপর তার কাছ থেকে উঠে আমি বাইরে বেরিয়ে আসি।

– আপনার স্ত্রী কিছু বলেছিলেন?

: না, কোনো শব্দ উচ্চারণের তখন অবস্থা নয়। আমি শুধু তাকে একটি বিদায় সম্বোধন জানিয়েছিলাম। আমি দুয়ার খুলে বাইরে বেরিয়ে ওদের গুলি বন্ধ করতে বলেছিলাম। আমি বললাম, 'তোমরা গুলি বন্ধ করো। আমি তো এখানে দাঁড়িয়ে আছি। তোমরা গুলি করছো কেন? কী তোমরা চাও?' তখন চারদিক থেকে ওরা আমার দিকে ছুটে এলো, বেয়নেট উদ্যত করে। ওদের একটা অফিসার আমাকে ধরল। ওই অফিসারই বললো, 'এই! ওকে মেরে ফেলো না'।

– একটা অফিসারই ওদের থামিয়েছিল?

: হ্যাঁ, ওই অফিসারটি থামিয়েছিল। ওরা তখন আমাকে এখান থেকে টেনে নামালো। ওরা পেছন থেকে আমার গায়ে, পায়ে বন্দুকের কুর্দো দিয়ে মারতে লাগল। অফিসারটা আমাকে ধরেছিল। তবু ওরা আমাকে ধাক্কা দিয়ে টেনে নামাতে লাগল। আমি বললাম, 'তোমরা আমাকে টানছ কেন? আমি তো যাচ্ছি।' আমি বললাম, 'আমার তামাকের পাইপটা নিতে দাও।' ওরা একটু থামল। আমি ওপরে গিয়ে আমার তামাকের পাইপটা নিয়ে এলাম। আমার স্ত্রী তখন দুটি ছেলেকে নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। আমাকে কিছু কাপড়-চোপড়সহ একটি ছোট স্যুটকেস দিলেন। তাই নিয়ে আমি নেমে এলাম। চারদিকে তখন আগুন জ্বলছিল। আজ এই যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, এখান থেকে ওরা আমায় নিয়ে গেল।

– আপনার ৩২ নং ধানমণ্ডি বাড়ি থেকে সেদিন যখন আপনি বেরিয়ে এলেন, তখন কি ভেবেছিলেন, আর কোনো দিন আপনি এখানে ফিরে আসতে পারবেন?

: না, আমি তা কল্পনা করতে পারিনি। আমি ভেবেছি, এই-ই শেষ। কিন্তু আমার মনের কথা ছিল, আজ আমি যদি আমার দেশের নেতা হিসেবে মাথা উঁচু রেখে মরতে পারি, তাহলে আমার দেশের মানুষের অন্তত লজ্জার কোনো কারণ থাকবে না। কিন্তু আমি ওদের কাছে আত্মসমর্পণ করলে, আমার দেশবাসী পৃথিবীর সামনে আর মুখ তুলে তাকাতে পারবে না। আমি মরি, তাও ভালো। তবু আমার দেশবাসীর যেন মর্যাদার কোনো হানি না ঘটে।

– শেখ সাহেব, আপনি একবার বলেছিলেন : 'যে-মানুষ মরতে রাজি, তুমি তাকে মারতে পারো না।' কথাটি কি এমনি ছিলো না?

: হ্যাঁ, আমি তাই মনে করি। যে মানুষ মরতে রাজি তাকে কেউ মারতে পারে না। আপনি একজন মানুষকে হত্যা করতে পারেন। সে তো তার দেহ। কিন্তু তার আত্মাকে কি আপনি হত্যা করতে পারেন? না, তা কেউ পারে না। এটাই আমার বিশ্বাস। আমি একজন মুসলমান এবং একজন মুসলমান একবারই মরে, দু'বার নয়। আমি মানুষ। আমি মনুষ্যত্বকে ভালোবাসি। আমি আমার জাতির নেতা। আমি আমার দেশের মানুষকে ভালোবাসি। আজ তাদের কাছে আমার আর কিছু দাবি নেই। তারা আমাকে ভালোবেসেছে। সবকিছুকে বিসর্জন দিয়েছে। কারণ, আমি আমার সবকিছুকে তাদের জন্য দেবার অঙ্গীকার করেছি। আজ আমি তাদের মুখে হাসি দেখতে চাই। আমি যখন আমার প্রতি দেশবাসীর স্নেহ-ভালোবাসার কথা ভাবি, তখন আমি আবেগে আপ্লুত হয়ে যাই।

– পাকিস্তান বাহিনী আপনার বাড়ির সবকিছু লুট করে নিয়েছিল?

: হ্যাঁ, আমার সবকিছুই ওরা লুট করেছে। আমার ঘরের বিছানাপত্র, আলমারি, কাপড়— সবকিছুই লুণ্ঠিত হয়েছে। মি. ফ্রস্ট, আপনি দেখতে পাচ্ছেন, এ বাড়ির কোনো কিছুই আজ নেই।

– আপনার বাড়ি যখন মেরামত হয়, তখন এসব জিনিস লুণ্ঠিত হয়েছে, না পাকিস্তানিরা সব লুণ্ঠন করেছে?

: পাকিস্তানি ফৌজ আমার সবকিছু লুণ্ঠন করেছে। কিন্তু এই বর্বর বাহিনী আমার জীবনের ইতিহাসকে লুণ্ঠন করেছে। আমার ৩৫ বছরের রাজনৈতিক জীবনের দিনলিপি ছিল। আমার একটি সুন্দর লাইব্রেরি ছিল। বর্বররা আমার প্রত্যেকটি বই, আমার মূল্যবান দলিলপত্র লুণ্ঠন করেছে। সবকিছুই পাকিস্তান হানাদার বাহিনী নিয়ে গেছে।

– তাই আবার সেই প্রশ্নটা আমাদের সামনে আসে, কেন ওরা সবকিছু লুণ্ঠন করলো?

: এর কি জবাব দেবো? আসলে ওরা মানুষ নয়। কতগুলো ঠগ, দস্যু, উন্মাদ, অমানুষ আর অসভ্য জানোয়ার। আমার নিজের কথা ছেড়ে দিন। তা নিয়ে আমার কোনো ক্ষোভ নেই। কিন্তু ভেবে দেখুন, ২ বছর, ৫ বছরের শিশু, মেয়েরা– কেউ রেহাই পেলো না। সব নিরীহ মানুষকে ওরা হত্যা করেছে। আমি আপনাকে দেখিয়েছি সব জ্বালিয়ে দেওয়া, পোড়া বাড়ি, বস্তি। একেবারে গরীব, না-খাওয়া মানুষ সব বাস করতো এই বস্তিতে। বস্তির মানুষ জীবন নিয়ে পালাতে চেয়েছে। আর সেইসব মানুষের ওপর চারদিক থেকে মেশিনগান চালিয়ে হত্যা করেছে।

– কি আশ্চর্য! আপনি বলছেন, ওদের ঘরে আগুন দিয়ে ঘর থেকে বের করে, খোলা জায়গায় পলায়মান মানুষকে মেশিনগান চালিয়ে হত্যা করেছে?

: হ্যাঁ, এমনিভাবে গুলি করে তাদের হত্যা করেছে।

– কোনো মানুষকে মারলো, তার কোনো পরোয়া করলো না?

: না, তারা বিন্দুমাত্র পরোয়া করেনি।

– কেবল হত্যা করার জন্য হত্যা– যাকে পেয়েছে, তাকেই হত্যা করেছে?

: হ্যাঁ, যাকে পেয়েছে তাকেই হত্যা করেছে। ওরা ভেবেছে প্রত্যেকেই শেখ মুজিবের মানুষ। তাই প্রত্যেককেই হত্যা করতে হবে।

– আপনি যখন দেখেন, মানুষ মানুষকে এমনিভাবে হত্যা করছে, তখন আপনার কী মনে হয়? আপনি কি মনে করেন মানুষ আসলেই খারাপ?

: ভালো-মন্দ সর্বত্রই আছে। মনুষ্যত্ব আছে, এমন মনুষও আমি দেখেছি। কিন্তু আমি মনে করি, পশ্চিম পাকিস্তানের এই ফৌজ এগুলো মানুষ নয়। এগুলো পশুরও অধম। মানুষের যে পাশবিক চরিত্র না থাকতে পারে, তা নয়। কিন্তু যে মানুষ, সে পশুর অধম হয় কী প্রকারে? কিন্তু এই বাহিনী তো পশুরও অধম। কারণ একটা পশু আক্রান্ত হলেই মাত্র আক্রমণ করে। তা নইলে নয়। পশু যদি মানুষকে আক্রমণ করে মেরে ফেলে, তবু সে তাকে অত্যাচার করে না। কিন্তু এই বর্বরের দল আমার দেশবাসীকে কেবল হত্যা করেনি। দিনের পর দিন বন্দী মানুষ্যকে অত্যাচার করেছে। ৫ দিন, ৭ দিন, ১৫ দিন নির্মম অত্যাচার করেছে, আর হত্যা করেছে।

– পাকিস্তানে বন্দি থাকাকালে ওরা আপনার বিচার করেছিল। সেই বিচার সম্পর্কে কিছু বলুন।

: ওরা একটা কোর্ট মার্শাল তৈরি করেছিল। তাতে পাঁচজন ছিল সামরিক অফিসার। বাকি কয়েকজন বেসামরিক অফিসার।

– আপনার বিরুদ্ধে কী অভিযোগ আনলো ওরা?

: অভিযোগ— রাষ্ট্রদ্রোহিতা, পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, বাংলাদেশকে স্বাধীন করার ষড়যন্ত্র— আরও কতো কি!

– আপনার পক্ষে কোনো আইনজীবী ছিলেন? আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনো উপায় ছিল?

: সরকারের তরফ থেকে গোড়ায় এক উকিল দিয়েছিল। কিন্তু আমি যখন দেখলাম, অবস্থাটা এমনি যে, যুক্তির কোনো দাম নেই; দেখলাম, এ হচ্ছে বিচারের এক প্রহসন মাত্র, তখন আমি কোর্টে নিজে দাঁড়িয়ে বললাম; জনাব বিচারপতি, দয়া করে আমাকে সমর্থকারী উকিল সাহেবদের যেতে বলুন। আপনারা বিলক্ষণ জানেন, এ হচ্ছে এক গোপন বিচার। আমি বেসামরিক লোক। আমি সামরিক কোনো লোক নই। আর এরা করছে আমার কোর্ট মার্শাল। ইয়াহিয়া খান কেবল যে প্রেসিডেন্ট, তাই নয়। তিনি প্রধান সামরিক শাসকও। এ বিচারের রায়কে অনুমোদনের কর্তা তিনি। এই আদালতকে গঠন করেছেন তিনি।

– তার মানে তার হাতেই ছিল সব?

: হ্যাঁ, সেই ছিল দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। তার ইচ্ছাই ইচ্ছা।

– তার মানে, আপনি আদালতে যাওয়া বন্ধ করেছিলেন।

: তার তো কোনো উপায় ছিল না। আমি তো বন্দী।

– হ্যাঁ, তাতো বটেই। আপনার ইচ্ছা-অনিচ্ছায় তো কোনো উপায় ছিল না। ওরা কি বিচার শেষ করে, সরকারিভাবে কোনো রায় তৈরি করেছিল?

: ৪ ডিসেম্বর (১৯৭১) ওরা আদালতের কাজ শেষ করে। সঙ্গে সঙ্গে ইয়াহিয়া খান সব বিচারক, যথা লেফটেন্যান্ট, কর্নেল, বিগ্রেডিয়ার— এদের সব রাওয়ালপিন্ডি ডেকে পাঠালো রায় তৈরি করার জন্য। সেখানে ঠিক করল, ওরা আমাকে ফাঁসি দেবে।

– আর তাই সেলের পাশে কবর খোঁড়া দেখে আপনি বুঝতে পেরেছিলেন, ওরা ওখানেই আপনার কবর দিবে?

: হ্যাঁ, আমি আমার নিজের চোখে দেখলাম ওরা কবর খুঁড়ছে। আমি নিজের কাছে নিজে বললাম— 'আমি জানি, এ কবর আমার কবর। ঠিক আছে। কোনো পরোয়া নেই। আমি তৈরি আছি।'

– ওরা কি আপনাকে বলেছিল 'এ তো তোমার কবর?'

: না, ওরা তা বলেনি।

– কি বলেছিল ওরা?

: ওরা বললো— 'না, না। তোমার কবর নয়। ধর যদি বোম্বিং হয়, তাহলে তুমি এখানে শেলটার নিতে পারবে।'

– সেই সময়ে আপনার মনের চিন্তা কি ছিল? আপনি কি এই সারাটা সময়, ন'মাস নিজের মৃত্যুর কথা চিন্তা করেছেন?

: আমি জানতাম, যে কোনো দিন ওরা আমায় শেষ করে দিতে পারে। কারণ ওরা অসভ্য, বর্বর।

– এমনি অবস্থায় আপনার কেমন করে কাটতো? আপনি প্রার্থনা করতেন?

: এমন অবস্থায় আমার নির্ভর ছিল আমার বিশ্বাস, আমার নীতি, আমার পৌনে আট কোটি মানুষের প্রতি আমার বিশ্বাস। তারা আমায় ভালোবেসেছে— ভাইয়ের মতো, পিতার মতো। আমাকে তাদের নেতা বানিয়েছে।

– আপনি যখন দেখলেন, ওরা কবর খনন করেছে, তখন আপনার মনে কার কথা আগে জাগল? আপনার দেশের কথা? না, আপনার স্ত্রী-পুত্র-পরিজনের কথা?

: আমার প্রথম চিন্তা আমার দেশের জন্য। আমার আত্মীয়-স্বজনদের চাইতেও আমার ভালোবাসা আমার দেশের জন্য। আমার যা কিছু দুঃখভোগ, সে তো আমার দেশেরই জন্য। আপনি তো দেখেছেন, আমাকে তারা কী গভীরভাবে ভালোবাসে।

– হ্যাঁ, এ কথা আমি বুঝি। স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধরত বাংলাদেশের আপনি নেতা। আপনার প্রথম চিন্তা অবশ্যই আপনার দেশের চিন্তা। পারিবারিক চিন্তা পরের চিন্তা।

: হ্যাঁ, জনতার প্রতিই আমার প্রথম ভালোবাসা। আমি তো জানি, আমি অমর নই। আজ, কিংবা কাল, কিংবা পরশু আমাকে মরতে হয়। কাজেই আমার বিশ্বাস, মানুষ মৃত্যুবরণ করবে সাহসের সঙ্গে।

– কিন্তু ওরা তো আপনাকে কবর দিতে পারেনি। কে আপনাকে রক্ষা করেছিল সেদিন আপনার ভবিতব্য থেকে?

: আমার বিশ্বাস সর্বশক্তিমান আল্লাহই আমাকে রক্ষা করেছেন।

– হ্যাঁ আমি একটা বিবরণে দেখলাম, আপনাকে নাকি জেলার এক সময়ে সরিয়ে রেখেছিল। ইয়াহিয়া খান যখন আপনাকে হত্যা করার উদ্যোগ নিয়েছিল, তখন আপনাকে স্থানান্তরে নিয়ে গিয়েছিল। এ কি যথার্থ?

: ওরা জেলখানায় একটা অবস্থা তৈরি করেছিল, মনে হচ্ছিল, কতগুলো কয়েদিকে ওরা সংগঠিত করেছিল, যেন সকালের দিকে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ওরা আমাকে হত্যা করে ফেলতে পারে। আমার মনে হয়, আমাকে তত্ত্বাবধানের ভার যে অফিসারের ওপর পড়েছিল, আমার প্রতি তার কিছুটা সহানুভূতি জেগেছিল। হয়তোবা সে অফিসার এমনও বুঝতে পেরেছিল যে, ইয়াহিয়া খানের দিন শেষ হয়ে আসছে। আমি দেখলাম, হঠাৎ রাত তিনটার সময়ে সে এসে আমাকে সেল থেকে সরিয়ে নিয়ে তার নিজের

বাংলোতে দু'দিন যাবৎ রক্ষা করল। এ দু'দিন আমার ওপর কোনো সামরিক পাহারা ছিল না। দু'দিন পরেই এই অফিসার আমাকে আবার একটা আবাসিক কলোনির নির্জন এলাকায় সরিয়ে নিল। সেখানে আমাকে হয়তো চার-পাঁচ কিংবা ছয় দিন রাখা হয়েছিল। এই সময়টাতে আমার অবস্থান সম্পর্কে নিম্নপদস্থ কিছু অফিসার বাদে আর কেউ জ্ঞাত ছিল না।

– এ তাদের সাহসেরই কাজ। এখন তাদের কী হয়েছে, তাই ভাবছি।

: আমিও জানিনে। ওদের ওপর কোনো আঘাত হানতে ওরা পারবে বলে মনে হয় না। ওদের জন্য যথার্থ শুভ কামনা রয়েছে।

– এমন কি শেষ মুহূর্তে ইয়াহিয়া খান যখন ভুট্টোর হাতে ক্ষমতা তুলে দেয়, তখনো নাকি সে ভুট্টোর কাছে আপনার ফাঁসির কথা বলেছিল? এটা কি ঠিক?

: হ্যাঁ, ঠিক। ভুট্টো আমাকে সে কাহিনীটা বলেছিল। ভুট্টোর হাতে ক্ষমতা তুলে দেবার সময় ইয়াহিয়া বলেছিল, 'মিস্টার ভুট্টো, আমার জীবনের সবচাইতে বড় ভুল হয়েছে, শেখ মুজিবুর রহমানকে ফাঁসি না দেওয়া।'

– ইয়াহিয়া এমন কথা বলেছিল?

: হ্যাঁ, বলেছিল।

– কী বলেছিল ভুট্টো?

: ভুট্টো ইয়াহিয়াকে বলেছিল, 'না, আমি তা হতে দিতে পারি না। তাহলে মারাত্মক প্রতিক্রিয়া ঘটবে। বাংলাদেশে এখন আমাদের এক লাখ তিন হাজার সামরিক বাহিনীর লোক আর বেসামরিক লোক বাংলাদেশ আর ভারতীয় বাহিনীর হাতে বন্দী রয়েছে। তাছাড়া পাঁচ থেকে দশ লাখ অবাঙালি বাংলাদেশে আছে। মিস্টার ইয়াহিয়া এমন অবস্থায় আপনি যদি শেখ মুজিবকে হত্যা করেন আর আমি ক্ষমতা গ্রহণ করি, তাহলে একটি লোকও আর জীবিত অবস্থায় বাংলাদেশ থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে ফেরত আসতে সক্ষম হবে না। তার প্রতিক্রিয়া পশ্চিম পাকিস্তানেও ঘটবে। তখন আমার অবস্থা হবে সংকটজনক।' ভুট্টো একথা আমাকে বলেছিল। ভুট্টোর কাছে আমি অবশ্যই এজন্য কৃতজ্ঞ।

– শেখ সাহেব, আজ যদি ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎ ঘটে, আপনি তাহলে তাকে কী বলবেন?

: ইয়াহিয়া খান একটা জঘন্য খুনী। তার ছবি দেখতেও আমি রাজি নই। তার বর্বর ফৌজ দিয়ে সে আমার ৩০ লাখ বাঙালিকে হত্যা করেছে।

– ভুট্টো এখন তাকে গৃহবন্দি করেছে। ভুট্টো তাকে নিয়ে এখন কী করবে? আপনার কী মনে হয়?

: মিস্টার ফ্রস্ট, আপনি জানেন, আমার বাংলাদেশে কী ঘটেছে? শিশু, মেয়ে, বুদ্ধিজীবী. কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র— সবাইকে ওরা হত্যা করেছে। ৩০ লাখ বাঙালিকে ওরা হত্যা

করেছে। অন্ততপক্ষে ২৫ থেকে ৩০ ভাগ ঘরবাড়ি ওরা জ্বালিয়ে দিয়েছে এবং তারপর সবকিছুকে ওরা লুট করেছে। খাদ্যের গুদামগুলিকে ওরা ধ্বংস করেছে।

– নিহতদের সংখ্যা ৩০ লাখ একথা আপনি সঠিকভাবে জানেন?

: আমার লোকজন তথ্য সংগ্রহ করে চলেছে। এখনও আমরা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসিনি। সংখ্যা হয়তো একেও ছাড়িয়ে যাবে। ত্রিশ লাখের কম তো নয়ই।

– কিন্তু এমন হত্যাকাণ্ড তো নিরর্থক। মানুষকে ঘর থেকে টেনে এনে এনে হত্যা করা।

: হ্যাঁ, কাদের ওরা হত্যা করেছে? একেবারেই নিরীহ শান্তিপ্রিয় মানুষকে। গ্রামের মানুষকে, যে গ্রামের মানুষ পৃথিবীর কথাই হয়তো কিছু জানত না, সে গ্রামে পাকিস্তানি ফৌজ ঢুকে পাখি মারার মতো গুলি করে এই মানুষকে ওরা হত্যা করেছে।

– আমার মনেরও প্রশ্ন: আহা! কেন এমন হলো?

: না, আমিও জানি না। আমিও বুঝি না। এ রকম পৃথিবীতে আর ঘটেছে বলে আমার জানা নেই।

– আর এ তো ছিল মুসলমানের হাতেই মুসলমানের হত্যা?

: ওরা নিজেরা নিজেদের মুসলমান বলে। অথচ ওরা হত্যা করেছে মুসলমান মেয়েদের। আমরা অনেককে উদ্ধার করার চেষ্টা করেছি। আমাদের ত্রাণশিবিরে এখনও অনেকে রয়েছে। এদের স্বামী, পিতা— সবাইকে হত্যা করা হয়েছে। মা আর বাবার সামনে ওরা মেয়েকে ধর্ষণ করেছে। পুত্রের সামনে মাকে ধর্ষণ করেছে। আপনি চিন্তা করুন। আমি এ কথা চিন্তা করে চোখের অশ্রুকে রোধ করতে পারি না। এরা নিজেদের মুসলমান বলে দাবি করে কী ভাবে? এরা তো পশুরও অধম। মনে করুন, আমার বন্ধু মশিউর রহমানের কথা। আমাদের দলের একজন শীর্ষস্থানীয় নেতা ছিলেন তিনি। আমাদের সরকারের একজন প্রাক্তন মন্ত্রী ছিলেন তিনি। তাঁকে নির্যাতন করে হত্যা করা হয়েছে। ২৪ দিন ধরে তার ওপর নির্যাতন চালিয়েছে। প্রথমে তাঁর এক হাত কেটেছে। তারপরে তার আর এক হাত কেটেছে। তারপরে তার একটা কানকে কেটেছে। তারপর পা কেটেছে। ২৪ দিনব্যাপী চলছে এমন নির্যাতন (শেখ মুজিব কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন) কিন্তু এ তো একটা কাহিনী। আমাদের কতো নেতা আর কর্মীকে, বুদ্ধিজীবী আর সরকারি কর্মচারীকে, জেলখানায় আটক করে, সেখান থেকে নিয়ে দিনের পর দিন অত্যাচার করে হত্যা করেছে। এমন অমানুষিক নির্যাতনের কাহিনী আমি ইতিহাসে কোথাও শুনিনি। একটা পশু একটা বাঘও তো মানুষকে হত্যা করলে, এমনভাবে হত্যা করে না।

– ওরা কি চেয়েছিল?

: ওরা চেয়েছিল আমাদের এই বাংলাদেশকে একেবারে উপনিবেশ করে রাখতে। আপনি তো জানেন, মিস্টার ফ্রস্ট, ওরা বাঙালি পুলিশ বাহিনীর লোককে, বাঙালি সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের হত্যা করেছে। ওরা বাঙালি শিক্ষক, অধ্যাপক, ইঞ্জিনিয়ার, বাঙালি ডাক্তার, যুবক, ছাত্র— সবাইকে হত্যা করেছে।

– আমি শুনেছি, যুদ্ধের শেষ অবস্থাতেও ঢাকাতে ওরা ১৩০ জন বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করেছে।

: হ্যাঁ, সারেন্ডারের মাত্র একদিন আগে। কেবল ঢাকাতেই ১৩০ নয়, ৩০০ মানুষকে ওরা হত্যা করেছে। ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে, মেডিক্যাল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটিতে। কারফিউ দিয়ে মানুষকে বাড়ির মধ্যে আটক করেছে। আর তারপর বাড়িতে বাড়িতে হানা দিয়ে এইসব মানুষকে হত্যা করেছে।

– তার মানে, কারফিউ জারি করে সব খবরাখবর বন্ধ করে হত্যা করেছে।

: হ্যাঁ, তাই করেছে।

– শেখ সাহেব, আপনার কি মনে হয়? ইয়াহিয়া খান কি দুর্বল চরিত্রের লোক, যাকে অন্য লোকে খারাপ করেছে, না সে নিজেই একটা দস্তুরমতো খারাপ লোক?

: আমি মনে করি ও নিজেই একটা নরাধম। ও একটা সাংঘাতিক লোক। ইয়াহিয়া খান যখন প্রেসিডেন্ট, তখন আমরা জনসাধারণের নেতা হিসেবে, সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসেবে ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে আলোচনার সময়েই আমি দেখেছি।

– আমাদের আজকের এই আলাপে আপনি নেতা এবং নেতৃত্বের কথা তুলেছেন। যথার্থ নেতৃত্বের আপনি সংজ্ঞা দিবেন?

: আমি বলবো, যথার্থ নেতৃত্ব আসে সংগ্রামের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। কেউ আকস্মিকভাবে একদিনে নেতা হতে পারে না। তাকে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আসতে হবে। তাকে মানুষের মঙ্গলের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করতে হবে। নেতার আদর্শ থাকতে হবে, নীতি থাকতে হবে। এই সব গুণ যার থাকে, সেই মাত্র নেতা হতে পারে।

– ইতিহাসের কোনো নেতাদের আপনি স্মরণ করেন, তাঁদের প্রশংসা করেন?

: অনেকেই স্মরণীয়। বর্তমানের নেতাদের কথা বলছি না।...

– না, বর্তমানের নয়। কিন্তু ইতিহাসের কারা আপনাকে অনুপ্রাণিত করেছে?

: আমি আব্রাহাম লিংকনকে স্মরণ করি। স্মরণ করি মাও সে তুং, লেনিন, চার্চিলকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্ট জন কেনেডিকেও আমি শ্রদ্ধা করতাম...।

– মহাত্মা গান্ধী সম্পর্কে আপনার কী ধারণা?

: মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, সোহরাওয়ার্দী, এ কে ফজলুল হক, কামাল আতাতুর্ক—এঁদের জন্য আমার মনে গভীর শ্রদ্ধাবোধ রয়েছে। আমি ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রামী নেতা ড. সুকর্নকে বিশেষ শ্রদ্ধা করতাম। এ সব নেতাই তো সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নেতা হয়েছিলেন।

– আজ এই মুহূর্তে অতীতের দিকে তাকিয়ে আপনার কোন দিনটিকে আপনার জীবনের সবচাইতে সুখের দিন বলে গণ্য করবেন? কোন মুহূর্তটি আপনাকে সব চাইতে সুখী করেছিল?

: আমি যেদিন শুনলাম, আমার বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে, সে দিনটিই ছিল আমার জীবনের সবচাইতে সুখের দিন।

– আপনার জীবনের সবচাইতে সুখের দিন?

: সমগ্র জীবনের সবচাইতে সুখের দিন।

– এমন দিনের স্বপ্ন আপনি কবে থেকে দেখতে শুরু করেন?

: বহুদিন যাবৎ আমি এই স্বপ্ন দেখে আসছি।

– স্বাধীনতার সংগ্রামে কী করে আপনি প্রথম কারাগারে যান?

: আমার জেল গমন শুরু হয়, বোধ হয়, সেই ১৯৪৮ সনে। আমি তারপরে ১৯৪৯ সনে গ্রেপ্তার হয়ে জেলে যাই এবং ১৯৫২ সাল পর্যন্ত জেলে থাকি। ১৯৫৪ সালে আমি একজন মন্ত্রী হই। আবার ১৯৫৪ সালেই গ্রেপ্তার হই এবং ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত জেলে থাকি। আবার ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান আমাকে জেলে পাঠায় এবং তখন পাঁচ বছর অন্তরীণ থাকি। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাসহ নানা মামলায় আমাকে সরকার পক্ষ বিচার করেছে। ১৯৬৬ সালে আবার আমাকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং ৩ বছর যাবৎ আটক রাখা হয়। তারপর আবার ইয়াহিয়া খান গ্রেপ্তার করে। এমন দীর্ঘ সংগ্রাম কেবল ব্যক্তিগতভাবে আমার নয়, আমার বহু সহকর্মীর জীবনই এই ইতিহাস ...।

– মিস্টার প্রাইম মিনিস্টার, পৃথিবীর মানুষের জন্য কি বাণী আমি আপনার কাছ থেকে বহন করে নিয়ে যেতে পারি?

: আমার একমাত্র প্রার্থনা– বিশ্ব আমার দেশের মানুষের সাহায্যে অগ্রসর হয়ে আসুক। আমার হতভাগ্য দেশবাসীর পাশে এসে বিশ্বের মানুষ দাঁড়াক। আমার দেশের মানুষ স্বাধীনতা লাভের জন্য যেমন দুঃখ ভোগ করেছে, এমন আত্মত্যাগ পৃথিবীর খুব কম দেশের মানুষকেই করতে হয়েছে। মিস্টার ফ্রস্ট, আপনাকে আমি আমার একজন বন্ধু বলে গণ্য করি। আমি আপনাকে বলেছিলাম, আপনি আসুন। নিজের চোখে দেখুন। আপনি নিজের চোখে অনেক দৃশ্য দেখেছেন। আরো দেখুন। আপনি আমার এই বাণী বহন করুন— সবার জন্যই আমার শুভেচ্ছা। আমি বিশ্বাস করি, আমার দেশের কোটি কোটি ক্ষুধার্ত মানুষের পাশে এসে বিশ্ব দাঁড়াবে। আপনি আমার দেশের বন্ধু। আপনাকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আল্লাহ আপনার মঙ্গল করুন। জয় বাংলা।

– জয় বাংলা। আমি বিশ্বাস করি, বিশ্ববাসী আপনাদের পাশে এসে দাঁড়াবে। আপনাদের পাশে এসে আমাদের দাঁড়াতে হবে। নয়তো ঈশ্বর আমাদের কোনো দিন ক্ষমা করবেন না।

[পাকিস্তান থেকে মুক্তি পেয়ে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর ব্রিটিশ সাংবাদিক ডেভিড ফ্রস্ট ঢাকায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের এই সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেন। ১৯৭২ সালের ১৮ জানুয়ারি নিউইয়র্ক টেলিভিশনের 'ডেভিড ফ্রস্ট প্রোগ্রাম ইন বাংলাদেশ' শীর্ষক অনুষ্ঠানে এটি প্রচারিত হয়। জনাব আবদুল মতিন রচিত, 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব : কয়েকটি প্রাসঙ্গিক বিষয়' গ্রন্থ থেকে সাক্ষাৎকারটি উদ্ধৃত।]

পরিশিষ্ট—ল

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনে জর্জটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর এনায়েতুর রহিমের সাক্ষাৎকার

আমেরিকা মুজিবনগর সরকারের মধ্যে 'বিরোধী গ্রুপ' সৃষ্টি করতে চেয়েছিল

প্রফেসর এনায়েতুর রহিম ওয়াশিংটনে জর্জটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও গবেষক। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের সময় মার্কিন প্রশাসনের বিভিন্ন নীতি ও পদক্ষেপ সংক্রান্ত গোপন দলিলপত্র সম্প্রতি সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করা হলে তিনি সেসব দলিলপত্র নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। সেখানে তিনি এ যাবৎ অপ্রকাশিত এক বিশাল তথ্য ভাণ্ডার পান। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত মার্কিন প্রশাসনের নীতি, মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে মোশতাকচক্রের ষড়যন্ত্র, ঢাকা-কলকাতা-ইসলামাবাদ জুড়ে মুক্তিযুদ্ধ-বিরোধীদের নানা তৎপরতা প্রভৃতি বিষয়ে অনেক নতুন তথ্য তিনি উদঘাটন করেন। তিনি তার স্ত্রী জয়েস এল রহিম-এর সহযোগিতায় গবেষণা পরিচালনা করছেন। সম্প্রতি ঢাকা সফরকালে 'প্রথম আলো'র সঙ্গে সাক্ষাৎকারে তিনি এসব বিষয়ে অনেক নতুন তথ্য প্রকাশ করেন। সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেছেন দৈনিক 'প্রথম আলো' পত্রিকার সম্পাদক জনাব মতিউর রহমান। তাঁর সাক্ষাৎকারটি এখানে হুবহু মুদ্রিত হলো:

মতিউর রহমান : আমাদের ইতিহাসের সবচেয়ে মহত্তম অংশ— একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে যে আপনি কাজ করছেন, এর পেছনে আপনার কী উৎসাহ বা উদ্যোগ কাজ করছে?

এনায়েতুর রহিম : দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় আমি নিজেও এর সঙ্গে নানাভাবে জড়িত ছিলাম। যুদ্ধের সময় আমি কলকাতায় গিয়েছি। মুক্তিযুদ্ধের পরিকল্পনায় আমি আগরতলায় গিয়েছি। বেশ কয়েকদিন ছিলামও সেখানে। আমি মুক্তিযুদ্ধও দেখেছি, আবার তারপরে স্বাধীনতার বিরুদ্ধে যে চক্রান্ত ছিল, সেটাও উপলব্ধি করে এসেছি। তাই বিদেশে বসবাস করলেও মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার ব্যাপারে আমার ইচ্ছা বা আগ্রহ রয়েছে। এ ব্যাপারে আমি বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করছি এবং বিশ্লেষণ করছি। এছাড়া কিছু লেখালেখি করেছি এবং কিছু বিষয় প্রমাণ করতেও চাইছি।

মাস ছয়েক আগে নিক্সনের সময়কার হোয়াইট হাউজের কাগজগুলোকে বিশেষ গোপনীয়তা শ্রেণী থেকে অপসারিত করা হলো। আমার এক ছাত্রের কাছ থেকে এ খবরটা পেয়ে আমি ও আমার স্ত্রী দু'জনে গিয়ে দলিলগুলো প্রথমে দেখলাম। দেখা গেলো, সেটা বিরাট এক তথ্যভাণ্ডার। তারপর থেকে আমরা বিভিন্ন তথ্য জোগাড়

করছি ও লিখছি। প্রথমে যেটা আমাকে আকর্ষণ করলো তা হলো খন্দকার মোশতাকের চক্রান্ত। আওয়ামী লীগের মধ্যে যে ছোট একটা চক্রান্ত ছিল, সেটা নিয়ে বিশ্লেষণ শুরু করলাম। এর মধ্যে অনেক দলিল পেয়ে গেলাম যেগুলোতে মোশতাক, জহিরুল কাউয়ুম, নুরুল ইসলাম মঞ্জু এবং আরো কয়েকজনের নাম এসে গেলো। এভাবে ব্যাপারটা শুরু হলো। আস্তে আস্তে আরো অনেক কাগজপত্র আমরা পাচ্ছি, যাতে মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন দিক ফুটে উঠছে। এখানে বলা বা মনে রাখা দরকার, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তাদেরই অফিস থেকে এই কাগজপত্রগুলো তৈরি করা হয়েছিল। সুতরাং তাদের দৃষ্টিভঙ্গিটা এসবের মধ্যে এসে গেছে। তাদের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যেও বিভিন্ন দিক আছে। কেউ মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন করছেন, কেউ করছেন না। তবে স্টেট ডিপার্টমেন্টের বেশিরভাগ লোক মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন করেছেন, যদিও হোয়াইট হাউস মুক্তিযুদ্ধের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে ছিল।

—এই যে মোশতাকের ষড়যন্ত্রের তথ্য পেলেন, আপনি মনে করেন এর পেছনে মোশতাকের নিজের উদ্যোগ ছিল, নাকি পাকিস্তান বা আমেরিকানদের সঙ্গে আগেই ঠিক করা ছিল যে তারা এ ষড়যন্ত্রের পথে যাবেন?

: আপনি যে কয়টি কথা বললেন তার সবগুলোই সত্য। এখন ডিমটা মুরগির আগে না পরে, এটা বলা মুশকিল। প্রথমে থেকেই মোশতাক উৎসাহ প্রকাশ করেছে, চেষ্টা করেছে — জহিরুল কাউয়ুমকে দিয়ে, অন্যান্য লোকজনকে দিয়ে, মাহবুব আলম চাষীকে দিয়েও।

—মাহবুব আলম চাষীর নামও এসেছে?

: হ্যাঁ, অবশ্যই এসেছে। দিল্লিতে রাষ্ট্রদূত কিটিং তার সঙ্গে দেখা করেনি। তবে দিল্লিতে মধ্যম পর্যায়ের মার্কিন কর্মকর্তাদের সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিল। এরা চেষ্টা করেছে প্রথম থেকেই। প্রথম যোগাযোগের জন্য তারা মে মাস থেকে চেষ্টা করেছে। ওদিকে আমেরিকা চেষ্টা করেছে মুজিবনগর সরকারের মধ্যে একটা 'বিরোধী গ্রুপ' সৃষ্টি করতে। তাদের দ্বিধাবিভক্ত করতে পারলে আন্দোলনটা নষ্ট হয়ে যাবে, তাহলে পাকিস্তান একসঙ্গে থাকবে। তাই আমেরিকার একটা আগ্রহ ছিল। আর, পাকিস্তান তো আওয়ামী লীগের সেই ঐক্যবদ্ধ স্বাধীনতা সংগ্রামকে নষ্ট করতেই চেয়েছিল। এতে দোসর হয়েছিল আমেরিকা।

অর্থাৎ তিনটি দলেরই— মোশতাক, পাকিস্তান, আমেরিকা— একটা সংযোগ হয়ে গিয়েছিল। কে প্রথম এগিয়ে এসেছিল সেটা বোধহয় খুব বড় কথা নয়। একটা কথা এখানে আসে। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর পরই আমেরিকা বলেছিল, এটা একটা দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার। সুতরাং আমরা তাতে হস্তক্ষেপ করবো না। একদিকে তারা বাইরে বলেছে এটা অভ্যন্তরীণ ব্যাপার, আবার অন্যদিকে তাদের কূটনৈতিক প্রতিনিধি কলকাতায় মোশতাকের সঙ্গে দেখা করেছে, ইসলামাবাদে মার্কিন রাষ্ট্রদূত জোসেফ ফারল্যান্ডের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে, ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেছে।

এসব লোককে এগিয়ে দেয়ার চেষ্টা তারা করেছে। নূরুল ইসলাম মঞ্জুদের ইসলামাবাদ পাঠানোর ব্যবস্থা করেছে। একটা ফ্রন্টে তারা বলছে, এটা দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক ব্যাপার, এতে আমরা হস্তক্ষেপ করবো না; আবার অন্যদিকে তারা ঠিকই হস্তক্ষেপ করেছে, ষড়যন্ত্র করেছে।

—শেষ পর্যন্ত মোশতাকের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যোগাযোগ বা সমঝোতা কী পর্যায়ে পৌছেছিল?

: সমঝোতা এমন একটা পর্যায়ে গিয়ে পৌছায় যখন জহিরুল কাইয়ুম এবং মোশতাক যুক্তরাষ্ট্রকে বললো, এ ক্ষেত্রে আমি উদ্ধৃত করতে পারি।' ইয়াহিয়া আমার বন্ধু। সে ভালো মানুষ, তার সঙ্গে আমি কথা বলতে পারি।' ইয়াহিয়াও একইভাবে বলেছে যে, মোশতাকের সঙ্গে কথা বলা যায়। আর কাইয়ুম তার আগে থেকে বলে এসেছে যে, আমরা বাংলাদেশে আলাদাভাবে রাষ্ট্রগঠন করতে চাই না, আমরা স্বাধীনতা চাই না। আমরা পাকিস্তানের মধ্যে একটা মীমাংসা করে থাকতে চাই। আলোচনার কোনো পর্যায়েই তারা এতো মানুষের মৃত্যু এবং ক্ষতি নিয়ে কোনো অভিযোগ করেনি। বরং তারা এ পর্যন্ত গিয়েছে যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম বিসর্জন দেয়ার কথা ভেবেছে বা বলেছে।

—আমরা তো এটা শুনি যে, আমেরিকা কলকাতায় মোশতাকের সঙ্গে সব সময় একটা যোগাযোগ রাখতো। এ সম্পর্কে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়?

: তাদের সব আলোচনা সঙ্গে সঙ্গে ইসলামাবাদে আমেরিকান রাষ্ট্রদূত জোসেফ ফারল্যান্ডের কাছে পাঠিয়ে দেয়া হতো। সে গিয়ে প্রতি সন্ধ্যায় বা সকালে ইয়াহিয়াকে তা জানাত। তারা দুজন একসঙ্গে প্রচুর মদপান করতো। বিখ্যাত সাংবাদিক জ্যাক এন্ডারসন তার বইয়ে বলেছেন, এক বোতল স্কচ তারা এক সন্ধ্যায় শেষ করতো। অন্যান্য রাষ্ট্রদূতরা এই অভিযোগ করতো যে, ইয়াহিয়ার সঙ্গে দেখা করা সম্ভব নয়। সে তো ফারল্যান্ডের সঙ্গেই সারা দিন বসে থাকে। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্র জানত এবং যুক্তরাষ্ট্রের মাধ্যমে এ সম্পর্কে জানতো ইয়াহিয়া খান।

—আপনি বলেছেন মঞ্জুর ইসলামাবাদে গেলো। এটা কি জানা যায়, ইসলামাবাদে ওরা কী আলোচনা করলো?

: ওই একই আলোচনা যেটা মোশতাক বলেছিল যে, আমরা স্বাধীনতা চাই না, রাজনৈতিক মীমাংসার মাধ্যমে আমরা পাকিস্তানে একসঙ্গে থাকতে চাই।

—আওয়ামী লীগের নূরুল ইসলাম মঞ্জুরের সঙ্গে ইয়াহিয়ার দেখা হয়েছিল নিশ্চয়ই?

: জোসেফ ফারল্যান্ডের সঙ্গেও দেখা হয়েছিল। গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো, সে গিয়েছিল ঢাকা থেকে।

—আমরা জানি, প্রতিনিধি দল নিয়ে মোশতাকের জাতিসংঘে যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু তাকে বাদ দেয়া হলো, তাই না?

: আমি বিভিন্ন সূত্রে পেয়েছি— ওরা লিখেছে যে, মোশতাক আসতে চায়। কিন্তু তারা বলছে যে, এ পর্যায়ে মোশতাককে আনা বোধহয় ঠিক হবে না। ভারত আসছে,

পাকিস্তান আসছে। তার অবস্থান সম্পর্কে এরা অবহিত। সুতরাং তিনি এসে খুব একটা অবস্থান পাবেন না এবং এর বিরুদ্ধে এক সমস্যা সৃষ্টি হবে। সুতরাং না আনাই ভালো। আমার আসলে যতোদূর মনে হচ্ছে ভিসা কিন্তু ওরা দেয়নি। সে নিয়ে মোশতাক অভিযোগও করেছে পরে।

—আমরা তো এটা জানি যে, মোশতাকের এ যোগাযোগ বা ষড়যন্ত্রটা ভারতীয় সরকার জেনে যায়। তাজউদ্দীনকে এটা তারা জানায়। এর সত্যতা আপনার কাছে আছে?

: হ্যাঁ, বিভিন্ন মার্কিন রিপোর্টে আছে— যখন ইন্দিরা গান্ধী গেলেন তার আগের দিন তারা কতোগুলো কথা লিখেছে, যেমন এ সম্পর্কে তারা মোশতাকের ব্যাপারটা লিখেছে, তারা বলছে— আমরা ইন্দিরা গান্ধীকে বলতে চাই যে ঘটনাটা কিভাবে ঘটেছে। ইন্দিরা গান্ধী নভেম্বর মাসে যখন গেলেন তখন তাকে এটা বলা হলো। তিনি এটিকে বেশি পাত্তা দিলেন না। বললেন যে, প্রবাসী সরকার বা আওয়ামী লীগের মধ্যে কোনোরকম 'বিরোধী গ্রুপের' অস্তিত্ব নেই। ওগুলো বানানো কথা। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের যে প্রধান মঞ্চ এদের সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই। মার্কিন প্রশাসন বলতে চেয়েছিল যে, আলাদা একটা গ্রুপ আছে যারা এটা চায় না। তারা এটাও বলতে চেয়েছিল যে, অর্থাৎ মোশতাকের মতো ডানপন্থী লোকদের নেতৃত্ব না দিলে এটা শেষ পর্যন্ত বামপন্থী আন্দোলনে পরিণত হবে। ভারত নিজেও তখন বিপদের মধ্যে পড়ে যাবে। এ ঘটনাটি তাজউদ্দীন সাহেবকে ব্যক্তিগতভাবে জানানো হয়েছে কি-না আমি তা জানি না। তবে নভেম্বর মাসের পত্রপত্রিকায় এ নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এর ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও তাদের নথিতে একটা সময়ে লিখেই ফেললো যে, এটা প্রকাশিত বা জানাজানি হয়ে গেছে; এখন বোধ হয় এর মূল্য আর ততো বেশি নেই।

—তারা কি এর পর যোগাযোগটা বিচ্ছিন্ন করে ফেললো, নাকি শেষ পর্যন্ত এ যোগাযোগটা ছিল?

: আমার যতদূর বিশ্বাস একাত্তরের নভেম্বর পর্যন্ত এই যোগাযোগ ছিল।

—তবে এ কথা আমরা শুনি যে, এ চক্রান্তটি প্রকাশিত হয়ে যাওয়ার পরে তাজউদ্দীন সাহেব মোশতাককে নিষ্ক্রীয় করে ফেলেছিলেন। এর কি কোনো সত্যতা আছে?

: তিনি পররাষ্ট্রমন্ত্রী তো ছিলেন। মজার ব্যাপার হলো আমাদের হাইকমিশনার হোসেন আলীই আমেরিকার কনসালের সঙ্গে মোশতাকের যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছিলেন। রাতের বেলায় হোসেন আলীর বাড়িতে পর পর তারা এলেন। হোসেন আলী তাদের ভেতরে নিয়ে গেলেন এবং সেখানে কথাবার্তা হলো। হোসেন আলী অবশ্য কথাবার্তার সময় সেখানে ছিলেন না। হোসেন আলীর তো উচিত ছিল মোশতাকের এ ব্যাপারটাকে প্রধানমন্ত্রীকে (তাজউদ্দীন) রিপোর্ট করা। কিন্তু তিনি সেটা করেননি। পরেও হোসেন আলীর সঙ্গে তারা গোপনে কথা বলেছে।

—স্বাধীনতার পরেও কি মোশতাকের সঙ্গে ইয়াহিয়া বা আমেরিকার যোগাযোগ ছিল?

: স্বাধীনতার পর তো সে মন্ত্রী। আমেরিকার সঙ্গে যোগাযোগ তো হবেই। ইয়াহিয়া তখন বাদ পড়ে গেছে। ক্ষমতায় এসেছে ভুট্টো। তবে আরেকটা ডকুমেন্ট আছে। ঢাকার আমেরিকার কনসাল জেনারেলের কাছে গিয়ে মোশতাক বাংলাদেশের প্রশাসনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে। তাকে সে বলেছে, আমাকে পররাষ্ট্র দপ্তর থেকে বাদ দেয়া হয়েছে এবং এজন্য আমি অখুশি। অর্থাৎ যোগাযোগটা বরাবরই ছিল।

— স্বাধীনতার পরেও ছিল?

: স্বাধীনতার পরে তো বৈধভাবে থাকতেই পারে। কৃষি ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ছিল মোশতাক। কাজেই যোগাযোগ তো হবেই। কিন্তু মার্কিন দূতাবাসে গিয়ে সে অভিযোগ করে এসেছে। শেখ সাহেবের নাম বলেছে কি-না জানি না। তবে বলে থাকতেও পারে।

—আমেরিকা কখন বুঝলো যে, স্বাধীনতার বিরুদ্ধে তাদের চক্রান্তটা সফল হবে না? এটার কি কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়?

: নভেম্বর মাসে যখন বিভিন্ন রিপোর্ট আসছে, মুক্তিযুদ্ধের যে প্রচণ্ড প্রচেষ্টা বা প্রবল প্রতিরোধ বাংলাদেশকে স্বাধীন করেছিল, এটাকে কেউ কোনোদিন পিকআপ করেনি যে, বাংলাদেশকে স্বাধীন এককভাবে ভারতও করেনি। বাংলাদেশকে স্বাধীন মুক্তিযোদ্ধারাই করেছিল। নিয়াজীরা যে রিপোর্ট পাঠিয়েছে তাতে বলা হয়েছে যে, দুর্দান্ত মুক্তিবাহিনী। আমার মনে হয় নিক্সন বা কিসিঞ্জারও তার বইতে এ কথা লিখেছে। সুতরাং মুক্তিবাহিনীর লড়াইটা ছিল গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। ভারত অস্ত্র, মালপত্র সরবরাহ বা সাহায্য করেছে। ভেতরে ভেতরে পাকিস্তানি আর্মি প্রত্যাহার শুরু হয় নভেম্বরেই। নভেম্বরের লড়াইয়ের শেষে বা ডিসেম্বরের প্রথম দিকে তারা বুঝতে পারলো যে, আর সম্ভব নয়। তখন তারা ভাবতে শুরু করলো, বাংলাদেশ হলে কী হবে। তখন তারা এ সিদ্ধান্তে আসলো যে, না, অন্তত পশ্চিম পাকিস্তানকে রক্ষা করতে হবে।

তখন ভারতের রাষ্ট্রদূত এল.কে. ঝাকে স্টেট ডিপার্টমেন্টে নিয়ে যাওয়া হলো। তারপরে ভারতের পররাষ্ট্র সচিব টি.এন. কলকে ডাকা হলো কিংবা রাষ্ট্রদূত নিজেই সেখানে গেলেন। মার্কিন প্রশাসন মোটামুটি জোর দিয়ে তাদের বললো, তোমরা (ভারত) আগ্রাসী, তোমরা পাকিস্তানকে ধ্বংস করে ফেলতে চাও ইত্যাদি। পশ্চিম পাকিস্তানে হাত না দেয়ার জন্য তাদের বলা হলো। তবে এ কথা সত্যি যে, যুক্তরাষ্ট্র, চীন, রাশিয়া এদের সবার মধ্যে এক ধরনের একটা বোঝাপড়া ছিল। চীন কতোটুকু পর্যন্ত যাবে আমেরিকা সেটা জানতো। সৈন্য-সামান্ত কিছু পাঠাতে পারে, কিন্তু তার বেশি কিছু নয়। কিছু কাগজপত্রে আমি তা দেখেছি। রাশিয়াও ভারতের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সপ্তম নৌবহর পাঠালো। আমেরিকার উদ্দেশ্য ছিল ইয়াহিয়াকে কিছুটা সময় দেয়া। সময় দেয়ার ফলে কী হলো? আমাদের বিশিষ্ট কিছু লোককে ওরা মেরে ফেললো ওই সময়ের মধ্যে। এ ক'দিনের মধ্যে আরো ক্ষয়ক্ষতি হলো।

—আপনার কি মনে হয় চীন কখনো বলেছিল যে পাকিস্তানের পক্ষে হস্তক্ষেপ করবে?

: এগুলো পাকিস্তানকে শোনানোর জন্য বলেছিল, কিন্তু 'লজিস্টিক্যালি' এ রকম কোনো প্রস্তুতি তাদের ছিল না।

—আর আমেরিকারও কি সপ্তম নৌবহর ব্যবহার করার কোনো চিন্তা ছিল?

: মোটেও না। এটা করা হয়েছিল শুধু ইয়াহিয়াকে সৈন্য প্রত্যাহার করার জন্য সময় বা সুযোগ দেয়ার জন্য। শেষ পর্যন্ত আমেরিকা চেয়েছিল যে, অন্তত পক্ষে পশ্চিম পাকিস্তানকে রক্ষা করতে হবে। আরেকটা কথা কেউ বললো না যে, আমাদের স্বাধীনতাযুদ্ধে যে এতো মানুষ মারা গেলো, রক্তের যে গঙ্গায় হাত রাঙালো ইয়াহিয়া খান, নিক্সন-কিসিঞ্জারদের হাতও সে রক্তে রাঙা। এরা যদি মদদ বা সমর্থন না দিতো, তাহলে অনেক আগে যুদ্ধ থেমে যেতো। এরা যদি নিন্দা করতো — যা কখনো তারা করেনি — তাহলে ইয়াহিয়া এতোটা করতে পারতো না। তবে একটা ব্যাপার সত্য এবং পত্রপত্রিকায়ও এসেছে যে, পূর্ব পাকিস্তানে পাঠানো সেনাবাহিনীর ওপর ইয়াহিয়ার শেষ পর্যন্ত কোনো কর্তৃত্ব ছিল না। তারা কম-বেশি স্বাধীনভাবেই কাজ করছিল।

— আমি এবার একটু পেছনে চলে যাই, মোশতাকের পক্ষের গ্রুপের ঢাকার নেতৃত্বে কি নূরুল ইসলাম মঞ্জুর ছিল?

: হ্যাঁ। আর বরাবরই ছিল নূরুল আমিন। নূরুল আমিন তো যুদ্ধের সময় পাকিস্তানে চলে গেলো, আর কখনো ফিরে আসেনি।

—একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে হোয়াইট হাউস আর স্টেট ডিপার্টমেন্টের মধ্যে মতদ্বৈধ ছিল?

: মতদ্বৈধ বিভিন্ন রকমের ছিল। একটা হলো হোয়াইট হাউস। প্রেসিডেন্ট হলেন চিফ এক্সিকিউটিভ, তিনি যা আদেশ দেবেন স্টেট ডিপার্টমেন্ট পররাষ্ট্রনীতি বা প্রতিরক্ষার ব্যাপারে তাই কার্যকর করবে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে, হোয়াইট হাউস আর কিসিঞ্জার যেন আলাদা আলাদাভাবে পররাষ্ট্রনীতি চালাচ্ছেন। তার কারণ ছিল দুটো। একটা মানবিকতা; পত্রপত্রিকায় যা দেখা যাচ্ছে তা কীভাবে সহ্য করা যায়। আর স্টেট ডিপার্টমেন্টে ইন্ডিয়ান একটা লবি ছিল, চিরকালই ছিল। সেই লবি তাদের সমর্থন করেছিল। ফলে বাংলাদেশকেই তাদের সমর্থন করতে হয়। কিন্তু বড় কথা হলো যে পত্রপত্রিকা, টেলিভিশন, নিউজ মিডিয়া, একাডেমিক প্রতিষ্ঠানগুলো, সাধারণ মানুষ সবাই বাংলাদেশের পক্ষে ছিল। ফলে হোয়াইট হাউস যেন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো। স্বাধীনতার সংগ্রামের সময় যে শেখ সাহেবকে তারা নিন্দা জানিয়েছিল পরে সেই শেখ সাহেবকেই ওয়াশিংটনে আনার জন্য তারা ব্যস্ত হয়ে পড়লো। তারা তখন বললো যে, একমাত্র তিনি দক্ষিণ এশিয়ায় একটা স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনতে পারেন। তারা এ চিন্তা করতে শুরু করলো যে তাঁকে কখন দাওয়াত করবে। আমার কাছে এ সংক্রান্ত ডকুমেন্ট আছে।

১৯৭৩ সালে যখন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কানাডায় কমনওয়েলথ সম্মেলনে গেলেন তখনই তারা তাঁকে নিতে চেয়েছিল। কিন্তু দেখলো যে, সেখানে আরো অনেক সিনিয়র রাষ্ট্রপ্রধান রয়েছেন। ফলে তারা এটা করলো '৭৪ সালে। শেখ সাহেব কিন্তু দাওয়াত পেয়েই হুড়মুড় করে দৌড় দিলেন না। তিনি সময় নিলেন। বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ পেলো। তিনি প্রথম সেখানে বাংলায় বক্তৃতা দিলেন। দাওয়াত পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই হুড়মুড় করে গেলেন না। এটা বলা দরকার, কারণ আমাদের নেতৃত্বটা এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, আমেরিকা বললেই দৌড় দেয় আমেরিকার উদ্দেশে।

—একটা কথা তাহলে ধরা যায় যে, ঢাকা-ওয়াশিংটন-কলকাতা-ইসলামাবাদ এই চারটি জায়গাকে কেন্দ্র করে ষড়যন্ত্রটা ঘুরপাক খাচ্ছিল। যখন দেখা গেলো আর কিছু করা সম্ভব নয়, নভেম্বরের শেষে তখন তা বন্ধ হয়ে গেলো। দেখেন, কলকাতার ওই গ্রুপটার যে ষড়যন্ত্র তা কিন্তু স্বাধীনতার পরও অব্যাহত ছিল এবং ওই গোষ্ঠীটাই কিন্তু বঙ্গবন্ধুকে হত্যার ষড়যন্ত্র করলো। এ সম্পর্কে আপনার মন্তব্য কী?

: একাত্তর সালে কলকাতায় আমি নিজেই মোটামুটি কানাঘুষা শুনে এসেছিলাম। মুক্তিযুদ্ধের সময় আমার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সঙ্গে আমি কয়েকদিন বালুঘাটে ছিলাম। তারা আমাকে বলেছিল, স্যার, আমাদের তো মনে হচ্ছে পাকিস্তানি আর্মিদের বিরুদ্ধে না লড়ে প্রথমে আমরা কলকাতায় গিয়ে মুক্তিযুদ্ধ করে আসি। মোশতাক যে এরকম কিছু একটা করছে, এটা প্রায় সবাই জানতো। মোশতাককে আমি নিজেও জিজ্ঞাসা করেছিলাম। বললো, ভাই, বাজে কথা। তাজউদ্দীন সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, তাই তো শুনছি, এটা চিন্তার বিষয়।

—আপনি তাদের সঙ্গে কথা বলেছিলেন?

: হ্যাঁ, হ্যাঁ। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার, কেউ যেন জানতেও পারেনি মোশতাক কী করছে, অথচ কানাঘুষার মাধ্যমে আমরা ব্যাপারটা জানতাম। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এসে কিছু করলেন না। বরং মোশতাককে করলেন মন্ত্রী, নুরুল ইসলাম মঞ্জুকে প্রতিমন্ত্রী, কাইয়ুমকেও কী জানি করলেন। এটাই অবাক লাগে, এরা কেউই যেন কিছুই টের পেলেন না। জেনেশুনে সবাই সবকিছু উপেক্ষা করলেন। কী এমন অবদান এদের ছিল যে, এদের ছাড়া বাংলাদেশ চলতে পারতো না? এটা আমার একটা বড়ো আক্ষেপ।

—আপনাকে ধন্যবাদ।

: ধন্যবাদ।

সৌজন্যে : দৈনিক 'প্রথম আলো'

পরিশিষ্ট—শ

'ঘাতকের দিনলিপি'

[একাত্তরের গণহত্যা মানবেতিহাসের জঘন্যতম ঘটনার মধ্য অন্যতম। হিটলারের নাৎসি বাহিনীর নির্মমতাকেও হার মানিয়েছে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী। দীর্ঘদিনের আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ব্যাপক জনগোষ্ঠী পাকিস্তান শাসনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়, যোগ দেয় স্বাধীনতা সংগ্রামে। কিন্তু মুষ্টিমেয় সুযোগ সন্ধানী, প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তি-গোষ্ঠী, কয়েকটি ইসলামী রাজনৈতিক সংগঠন প্রত্যক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করে। পাকসেনাবাহিনীর পাশাপাশি গণহত্যায় অংশ নেয়। শান্তি কমিটি, রাজাকার, আল-বদর, আল-শামস্, শান্তি রক্ষীবাহিনী গঠনের মাধ্যমে শহর-গ্রামে-গঞ্জে মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। গ্রামাঞ্চলে ব্যাপকহারে যে লুট, হত্যা, অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে তার জন্য দায়ী এরা।

সাংবাদিক রমেন বিশ্বাস ১৯৯১ সালে অধুনালুপ্ত দৈনিক আজকের কাগজ (নাঈমুল ইসলাম খান সম্পাদিত) তৎকালীন পত্র-পত্রিকার উদ্ধৃতি দিয়ে স্বাধীনতাবিরোধীদের একটি তালিকা তাদের বক্তব্য-বিবৃতিসহ তুলে ধরেন। পরে 'ঘাতকের দিনলিপি' নামে গ্রন্থাকারে তা প্রকাশিত হয়। রমেন বিশ্বাসের গ্রন্থ থেকে ইসলামপন্থীদের (জামায়াত ও নেজামে ইসলাম) বাদ দিয়ে পুরো তালিকাটি হুবহু তুলে ধরা হলো। এ তালিকাটি থেকে পাঠকের ধারণা নিতে সুবিধা হবে যে, একাত্তরে স্বাধীনতাবিরোধীদের মধ্যে কত পার্সেন্ট মোল্লা-মৌলভী ছিলেন আর কত পার্সেন্ট সাধারণ শিক্ষিত ছিলেন।]

২ এপ্রিল, শুক্রবার

দেশের পরিস্থিতির জন্যে ভারতের নিন্দা এবং দুষ্কৃতকারীদের বাধাদানের আহ্বান জানিয়ে বিবৃতি দেন দেশের ৩৯ জন আইনজীবী। এসব আইনজীবীরা হচ্ছেন ঢাকা হাইকোর্টের ফরিদ আহমদ, ফজলুল হক, মইনুল হক, এ ডব্লিউ চৌধুরী, শফিকুর রহমান, আহমেদুর রহমান খান, জুলমত আলী খান, মোদাবর হুসাইন, এ এম এম এ জলিল, নাজিরুদ্দিন, আবদুল ওয়াদুদ মিয়া, ইউসুফ আলী খান, মোঃ গিয়াসুদ্দিন ভূঁইয়া, একে রফিকুল হোসেন, নাসিরুদ্দিন চৌধুরী, নাসিম এ রহমান, মোহিতুর রহমান চৌধুরী, আকরাম হোসেন আমিন, আবু সালেক, আবদুর রশীদ, সৈয়দ মোহম্মদ আলী, মোজাম্মেল হক, মশিহুল ইসলাম, এম এন আলী, মোঃ কোরবান আলী, নূরুল হক, আজিজুর রহমান, নূরুল হুদা খন্দকার, ফজলুল হক, এ কে ফজলুল হক চৌধুরী, আহমদ আলী মন্ডল, মোমতাজ উদ্দিন আহমদ, শামসুল ইসলাম, সিরাজুল ইসলাম, ফরমান উল্লাহ খান, আবু সাঈদ, এইচ কে আবদুল হাই, এম এস ভূঁইয়া, মাহবুবুর রহমান। নিজেরা তো বটেই, জনগণের প্রতি এরা আহ্বান জানান সেনাবাহিনীর পাশে থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের খতম করার।

তথ্য সূত্র : দৈনিক আজাদ ও পাকিস্তান ৩, ৪ ও ৫ এপ্রিল '৭১।

৫ এপ্রিল, সোমবার

পিডিপি প্রধান নুরুল আমিনের বেতার ভাষণ প্রচারিত হয় আজ। ভাষণে তিনি ভারতীয় সংসদে প্রস্তাব গ্রহণের তীব্র সমালোচনা করে বলেন, ভারত অনুপ্রবেশকারী পাঠিয়ে প্রকাশ্যে পূর্ব পাকিস্তানে বিদ্রোহ উস্কে দিচ্ছে। তাছাড়া ভারতের ঘৃণ্য প্রচারণা সীমা ছাড়িয়ে গেছে। এ সব কিছুই প্রমাণ করে ভারতের অন্য দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি ন্যূনতম সম্মানবোধও নেই। তিনি অযথা হস্তক্ষেপ সম্পর্কে ভারতকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেন, দ্বিধাহীন চিত্তে বলতে চাই যে, আমাদের সার্বভৌমত্বের ওপর অন্যকোনো দেশের হস্তক্ষেপ আমরা সহ্য করবো না। পাকিস্তানের মাটিতে যে কোনো ধরনের বহিঃশত্রুর হস্তক্ষেপ সম্মিলিতভাবে প্রতিহত করা হবে।

স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরুদ্ধে বিষোদগার তুলে বিবৃতি দেন পাকিস্তান মুসলিম লীগের (কাইয়ুম) সাবেক সেক্রেটারি জেনারেল খান এ সবুর। তিনি বলেন, এটা এখন একটি প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, শেখ মুজিব এবং তার আওয়ামী লীগের ৬ দফা পূর্ব পাকিস্তানের সরল জনগণকে প্রতারণা করার একটা আবরণ ছিলো মাত্র এবং প্রকৃতপক্ষে তা ছিলো ফ্যাসিবাদী পন্থায় অসাধু নির্বাচনে জয়লাভের মাধ্যমে পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার সূক্ষ্ম চাল।

সবুর খান তার বিবৃতিতে সামরিক বাহিনীর নারকীয় হত্যাযজ্ঞকে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সময়োচিত ব্যবস্থা গ্রহণ বলে উল্লেখ করেন। তিনি জানান, সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপের ফলেই পাকিস্তান রক্ষা পেয়েছে। সেনাবাহিনী হস্তক্ষেপ না করলে দুষ্কৃতকারীরা পাকিস্তান ধ্বংস করে দিতো।

আজ বিবৃতি দেন কাউন্সিল মুসলিম লীগের ১১ জন বিশিষ্ট নেতা। বিবৃতিতে নেতারা পাকিস্তানের অখণ্ডতা ও সংহতি রক্ষায় তাদের দৃঢ় মনোভাব প্রকাশ করেন। তারা জানান, পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই ভারত শত্রুতা করে আসছে। বর্তমানে মিথ্যা প্রচারণা ও পার্লামেন্টে প্রস্তাব গ্রহণ করে পাকিস্তান ধ্বংসের একটি নয়া পদক্ষেপ নিয়েছে। বিবৃতিদাতারা হচ্ছেন দলের সহ-সভাপতি একিউএম শফিকুল ইসলাম, আবুল কাসেম, জেনারেল সেক্রেটারি সৈয়দ খাজা খয়ের উদ্দিন, আতাউল হক খান, আতাউল হক, নুরুল মজুমদার, মোঃ সেরাজুদ্দিন, এ মতিন প্রমুখ। নেতারা দেশদ্রোহী শত্রুদের চক্রান্ত নস্যাৎ করে দেওয়ার জন্যে দেশবাসীর প্রতি জোর আবেদন জানান।

যে কোনো মূল্যে দেশের সংহতি বজায় রাখার ওপর আজ গুরুত্ব আরোপ করেন মুসলিম লীগ প্রধান খান আবদুল কাইয়ুম খান। তিনি জানান, সংহতি বিনষ্ট হলে আমাদের ধ্বংস অনিবার্য। ন্যূনতম সুযোগ পেলেই দুষ্কৃতকারীরা দেশের অখণ্ডতা বিপন্ন করে তুলবে। তাই তিনি সরকার এবং জনগণ উভয়কেই দুষ্কৃতকারীদের প্রতি নজর রাখার আহ্বান জানান।

তথ্য সূত্র : দৈনিক সংগ্রাম ও পূর্বদেশ ৫, ৬ ও ৭ এপ্রিল '৭১।

৬ এপ্রিল, মঙ্গলবার

'মুক্তি সংগ্রামের বিরোধিতা' এ নীতিতে একমত থাকা সত্ত্বেও স্বাধীনতাবিরোধীরা বিভিন্ন দল ও উপদলে বিভক্ত ছিলো। বিভিন্ন দলে বিভক্ত এসব স্বাধীনতাবিরোধীদের মধ্যে সমন্বয়কারীর কাজ করেন সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী হামিদুল হক চৌধুরী।

আজ হামিদুল হক চৌধুরীর নেতৃত্বে বেশ কয়েকজন নেতৃস্থানীয় রাজনীতিক 'খ' অঞ্চলের সামরিক আইন প্রশাসক গভর্নর টিক্কা খানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। টিক্কা খানকে তারা নিশ্চয়তা দিয়ে বলেন যে, দুষ্কৃতকারী দমনে সহায়তা করা তাদের পবিত্র দায়িত্ব।

হামিদুল হক চৌধুরী এক বিবৃতির মাধ্যমে আজ জানান, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ আর যা কিছু চাক না কেন কিছুতেই দেশের ঐক্য বিনষ্ট করতে চায় না, তিনি পাকিস্তানি বর্বর বাহিনী কর্তৃক বাঙালি নিধন এবং বোমা বর্ষণের কথা অস্বীকার করেন বলেন, এ ধরনের আজগুবি খবর প্রচার করে ভারত বাঙালিদের মধ্যে বিভেদ এবং বিশ্বজনমতকে পাকিস্তানের বিপক্ষে নিতে চায়।

তথ্য সূত্র : দৈনিক পূর্বদেশ ও সংগ্রাম ৭, ৮ ও ১২ এপ্রিল '৭১।

৭ এপ্রিল, বুধবার

আজ জাতীয় পরিষদের প্রাক্তন নেতা আবদুল সবুর খান 'খ' অঞ্চলের সামরিক প্রশাসক লে. জেনারেল টিক্কা খানের সঙ্গে তার কয়েকজন সহযোগীসহ সাক্ষাৎ করেন। তিনি তার দলের পক্ষ থেকে জেনারেলকে নিশ্চয়তা দেন সেনাবাহিনীকে পূর্ণ সহযোগিতা করার। টিক্কা খানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ইরান ও ইন্দোনেশিয়ার কনসাল জেনারেল।

প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক এ এন এম ইউসুফ জানান, পূর্ব পাকিস্তানে বাংলাদেশ বলে কোনো সরকারের অস্তিত্ব নেই। অথচ ভারত এ ব্যাপারে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন প্রচারণা চালিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে বিভ্রান্ত করছে। তিনি দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করেন বহুকষ্টে আমরা পাকিস্তান লাভ করেছি। জীবন দিয়ে হলেও আমরা তাকে রক্ষা করবো। আজ ঢাকা শহর মুসলিম ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক কে জি করিম দুষ্কৃতকারী ও ভারতীয় অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে সেনাবাহিনীর পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান।

আঞ্জুমান-ই মোহাজেরিন মাশরেকী পাকিস্তানের সভাপতি দেওয়ান ওয়ারাসাত হোসাইন খান জানান আল্লাহতায়ালা আর একবার পাকিস্তানকে রক্ষা করেছে। তিনি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে নিশ্চয়তা দিয়ে বলেন, পাকিস্তানের নিরাপত্তা ও সংহতির নিশ্চয়তা বিধানের চেয়ে মোহাজেররা আর কিছু বড় মনে করে না। মোহাজেররা পাকিস্তান রক্ষায় যে কোনো ত্যাগ স্বীকার করবে।

তথ্য সূত্র : দৈনিক পাকিস্তান, সংগ্রাম ও পূর্বদেশ ৮ ও ৯ এপ্রিল '৭১।

৮ এপ্রিল, বৃহস্পতিবার

এ সময় মুসলিম লীগ নেতা কাজী আবদুল কাদের পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থান করছিলেন। কাজী কাদের আজ করাচিতে এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের সাম্প্রতিক অরাজকতার জন্যে শেখ মুজিব ও তার বেআইনী ঘোষিত আওয়ামী লীগ দায়ী। তিনি সেনাবাহিনীর সময়োচিত হস্তক্ষেপের প্রশংসা করে বলেন, তারা বিচ্ছিন্নতাবাদীদের হাত থেকে দেশ ও জনগণকে বাঁচিয়েছে।

পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ দেশকে বিচ্ছিন্ন করে ভারতের হাতে তুলে দেবার জন্যে ভোট দেয়নি। কাজী কাদের সমাজবিরোধী দুষ্কৃতকারীদের খতম করে দেশে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে পূর্ব পাকিস্তানি মুসলমানদের সেনাবাহিনীর সঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানান। পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট শামসুল হুদা বলেন, কোনো দেশপ্রেমিক মুসলমান পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে সম্প্রসারণবাদী ভারতের নির্লজ্জ ও অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপে উদ্বিগ্ন না হয়ে পারে না। তিনি আকাশবাণীর প্রচারিত খবরকে সম্পূর্ণ মিথ্যা ও কল্পিত বলে উল্লেখ করেন। তিনি দৃঢ় আস্থা নিয়ে বলেন, কোনো প্রচারণাই দেশপ্রেমিক পাকিস্তানিদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে পারবে না।

ন্যায্য অধিকারকে কেড়ে নিয়ে পাকিস্তানি শাসকচক্র বাঙালিদের ওপর লেলিয়ে দেয় পাক হানাদার বাহিনীকে। অথচ জাতীয় পরিষদের সাবেক ডেপুটি স্পীকার এ টি এম আবদুল মতিন দেশের বর্তমান পরিস্থিতির জন্যে দায়ী করেন ভারতকে। তিনি বলেন, বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সমর্থনে পার্লামেন্টে প্রস্তাব গ্রহণ, অনুপ্রবেশকারী পাঠানো এবং মিথ্যা প্রচারণা চালিয়ে ভারত গোলযোগ বাড়িয়ে চলেছে।

পাক-চীন মৈত্রী সমিতির সভাপতি শেখ মমতাজ আহমদ খানের সভাপতিত্বে আজ সমিতির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বরাবরের মতো এবার পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনাবলীতে প্রকৃত বন্ধুর ন্যায় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্যে গণচীনের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়।

তথ্য সূত্র : দৈনিক পূর্বদেশ ও পাকিস্তান ৯ ও ১০ এপ্রিল '৭১।

৯ এপ্রিল, শুক্রবার

খাজা খয়েরউদ্দীনকে আহ্বায়ক করে আজ ১৪০ সদস্যবিশিষ্ট নাগরিক শান্তি কমিটি গঠন করা হয়। স্বাধীনতাবিরোধীদের কার্যক্রমের মধ্যে এটা একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এর উল্লেখযোগ্য সদস্যরা হচ্ছেন এ কিউ এম শফিকুল ইসলাম, অধ্যাপক গোলাম আযম, মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ মাসুম, আবদুল জব্বার খদ্দর, মাহমুদ আলী, এম এ কে রফিকুল হোসেন, ইউসুফ আলী চৌধুরী, আবুল কাসেম, এম ফরিদ আহমদ, অধ্যাপক গোলাম সারওয়ার, সৈয়দ আজিজুল হক, এ এস এম সোলায়মান, পীর মোহসিন উদ্দিন, এডভোকেট শফিকুর রহমান, মেজর আফসার উদ্দিন, সৈয়দ মোহসেন আলী, এডভোকেট ফজলুল হক চৌধুরী, আলহাজ সিরাজ উদ্দিন, এডভোকেট এ টি সাদী, এডভোকেট আতাউল হক খান, মকবুলুর রহমান, আলহাজ মোহাম্মদ আকিল, অধ্যক্ষ রুহুল কুদ্দুস, ইয়ং পাকিস্তান সম্পাদক নূরুজ্জামান, মাওলানা মিয়া মফিজুল হক, এডভোকেট আবু সালেক, এডভোকেট আবদুল নায়েম প্রমুখ। উক্ত কমিটি একটি কেন্দ্রীয় কমিটির অধীনে কাজ করার সিদ্ধান্ত নেয়। কমিটির সদস্যরা পাকিস্তানের সংহতি বিনষ্টকারীদের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ নেওয়ার শপথ নেয়। কমিটি তার প্রথম কর্মসূচি হিসেবে দুষ্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে ১৪ এপ্রিল প্রকাশ্যে রাস্তায় নামার সিদ্ধান্ত নেয়। যদিও পরবর্তীতে সিদ্ধান্ত নিয়ে তারা ১৪ এপ্রিলের পরিবর্তে ১৩ এপ্রিল ঢাকায় মিছিল করে।

ফজলুল কাদের চৌধুরী এ সময় তার নিজস্ব পেটোয়া বাহিনী ও সামরিক বাহিনীর সাহায্য নিয়ে চট্টগ্রামে নারকীয় অবস্থার সৃষ্টি করে চলছিলো। ফজলুল কাদের চৌধুরী এবং মৌলভী ফরিদ উদ্দিন আহমদ, সুলতান উদ্দিন আহমদসহ বেশ কয়েকজন উল্লেখযোগ্য স্বাধীনতাবিরোধী হানাদারদের আজ আশ্বাস দেন আরো সক্রিয়ভাবে সহায়তা করার।

তথ্যসূত্র : দৈনিক পাকিস্তান, পূর্বদেশ ও সংগ্রাম ১০, ১১ ও ১২ এপ্রিল '৭১।

১০ এপ্রিল, শনিবার

মৌলভী ফরিদ আহমদের নেতৃত্বে আজ পাকিস্তান শান্তি ও জনকল্যাণ পরিষদ নামে আরেকটি কমিটি গঠন করা হয়। স্বাধীনতাবিরোধীদের মধ্যে যথেষ্ট দ্বন্দ্বও ছিলো। হামিদুল হক চৌধুরীর মধ্যস্থতায় সাময়িকভাবে দ্বন্দ্ব দূর হলেও মূল শান্তি কমিটি গঠনের পর তা পুনরায় দেখা দেয়। ১ সদস্যবিশিষ্ট এ স্টিয়ারিং কমিটির সাধারণ সম্পাদক হিসেবে মওলানা নূরুজ্জামানকে সাধারণ সম্পাদক মনোনীত করা হয়। অন্যান্য সদস্যরা হচ্ছে ব্যারিস্টার ওয়াজিওল্লাহ খান, আজিজুর রহমান, মোস্তাফিজুর রহমান, কাজী ফিরোজ সিদ্দিকী, চট্টগ্রামের এডভোকেট এ কে নূরুল করিম, মাহমুদ আলী সরকার, কোরবান আলী বার এট ল'। স্টিয়ারিং কমিটির ঘোষণায় বলা হয়, এই কমিটি পূর্ব পাকিস্তান শান্তি ও কল্যাণ কাউন্সিল গঠন করে প্রতিটি জেলায় এর শাখা প্রতিষ্ঠা করবে। কাউন্সিল সংশ্লিষ্ট এলাকার শান্তি রক্ষা, জনগণের মধ্যে আস্থা ফিরিয়ে আনা, শত্রুদের মোকাবেলা করতে জনগণকে প্রস্তুত করার জন্যে কাজ করবে।

ঢাকা হাইকোর্টের এডভোকেট ও ন্যাশনাল কাউন্সিল অব ইয়ুথের সভাপতি এবং এরশাদ আমলের এককালীন শিক্ষামন্ত্রী মাহবুবর রহমান আজ এক বিবৃতিতে বলেন, ভারত ইতিপূর্বেই যথেষ্ট পরিমাণে উস্কানি দিয়েছে এবং উত্তেজনার সৃষ্টি করেছে, বিশ্ব শান্তির ক্ষেত্রে বিশ্বের জনগণের এটা আর চালিয়ে যেতে দেওয়া উচিত হবে না। ... পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি ভারত যা করেছে তা হালে জাতিসংঘ সনদ ও বান্দুং নীতির খেলাফ এবং সেই সঙ্গে আমাদের সার্বভৌমত্বের ওপর আক্রমণ। ভারতীয় বেতারে আমাদের সম্পর্কে মিথ্যা বিদ্বেষপূর্ণ এবং বিভ্রান্তিকর প্রচারণা বন্ধ করা উচিত। কারণ এটা আমাদের দুর্ভাগ্য ও ক্ষতিই বাড়িয়ে তুলছে। দুষ্কৃতকারী ভারতীয় দালালদের হাত থেকে দেশ রক্ষার আহ্বান জানান সাবেক জাতীয় পরিষদ সদস্য এবং পররাষ্ট্র দফতরের পার্লামেন্টারি সেক্রেটারি আবদুল আউয়াল ভূঁইয়া।

বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামকে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন ও ভারতীয় ষড়যন্ত্র হিসেবে উল্লেখ করে বিবৃতি দেন আবদুল মতিন, মোহাম্মদ ইদরিস, সৈয়দ আলতাফ হোসেন, জালালুদ্দিন আহমদ, কে এ এম তৌফিকুল ইসলাম, ফকরুদ্দিন আহমদ, এম ইকবাল আহমদ, সৈয়দ শহিদুল হক, কলিমুদ্দীন আহমদ, সিরাজুল ইসলাম, শফিকুল ইসলাম, মেসবাহ উদ্দিনসহ ঢাকা জেলা বারের ৪১ জন আইনজীবী।

ঢাকা শহর কনভেনশন মুসলিম লীগ সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদ বলেন, 'পূর্ব পাকিস্তান কখনও পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চায় না। বিভক্ত হওয়ার জন্যে ১৯৪৬ সালের

রেফারেন্ডামে হিন্দুদের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে উপমহাদেশের মুসলমানরা শতকরা একশ'টি ভোট দিয়ে পাকিস্তান অর্জন করেছে।' পাকিস্তান দ্বিখণ্ডিত করার কোনো প্রচেষ্টায় জনগণের সাড়া পাওয়া যাবে না বলে উল্লেখ করেন প্রাক্তন ছাত্রনেতা ও পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগ (কাইয়ুম)-এর যুগ্ম সম্পাদক মাহবুবুল হক দোলন। বাঙালিত্বের নামে কোনো জুলুম পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ সহ্য করবে না বলে জানান পাকিস্তান পার্টির আহ্বায়ক এবং নির্বাচনে শেখ মুজিবের তথাকথিত প্রতিদ্বন্দ্বী মোহাম্মদ আলী সরকার।

পূর্ব পাকিস্তানিরা কিছুতেই তাদের কষ্টার্জিত স্বাধীনতা বিকিয়ে দেবে না বলে ঘোষণা করেন জাতীয় ছাত্র ফেডারেশনের (দোলন গ্রুপ) সভাপতি আমিনুর রহমান জিন্নাহসহ সাধারণ সম্পাদক মাহবুব সিদ্দিক। আজ এক বিবৃতিতে বিচ্ছিন্নতাবাদকে উস্কে দেওয়ার জন্যে ভারত সরকারের সমালোচনা করেন খেলাফতে রব্বানী পার্টির চেয়ারম্যান এ এস এম মোফাখখার। তিনি জানান, ভারত সমর্থন না দিলে প্রেসিডেন্ট যে ব্যবস্থা নিয়েছে তাতে দেশে এতোদিনে পূর্ণ শান্তি ফিরে আসতো।

তথ্য সূত্র : দৈনিক পাকিস্তান, পূর্বদেশ ও সংগ্রাম ১০, ১১, ১২ ও ১৩ এপ্রিল '৭১; একাত্তরের ঘাতক ও দালালরা কে কোথায়।

১১ এপ্রিল, রবিবার

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পুরো ন'মাস বিভিন্ন বিবৃতি-বক্তৃতার মাধ্যমে স্বাধীনতার বিরোধিতা করেন এ কে ফজলুল হকের ছেলে ফয়জুল হক এবং মেয়ে রইসী বেগম।

এ কে ফয়জুল হক পাকিস্তানি ঘাতকদের গণহত্যার সমর্থনে সফর করে বেড়িয়েছেন সারাদেশ। ১১ এপ্রিল তিনি এক বিবৃতিতে বলেন, আমি আমার পূর্ব পাকিস্তানি ভাইদের আমাদের এবং প্রশাসন যন্ত্রের ওপর আস্থা রাখার জন্য আবেদন জানাচ্ছি। যারা এখনো কোনো কারণবশত কিংবা কোনো মোহে পড়ে কাজে যোগদান করেননি, তাদের আমি শুধু বলবো, সময় দ্রুত বয়ে যাচ্ছে এবং আমরা যদি আমাদের নিজেদের সঠিক পথে ফিরে যাই, তাহলে প্রত্যেকটি মিনিটের একটি মূল্য রয়েছে। তিনি বলেন, ঐক্যবদ্ধভাবে একই মানুষ হিসেবে ছ'বছর আগে আমরা যেমন ভারতের নগ্ন আক্রমণকে মোকাবেলার জন্যে আমাদের প্রস্তুত করতে হবে।

আওয়ামী লীগের বর্তমান ভূমিকার সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই বলে উল্লেখ করেন আওয়ামী লীগের পশ্চিম পাকিস্তান শাখার নেতা বি এ সলিমী। তিনি বলেন, দলের বিচ্ছিন্নতাবাদী পরিকল্পনা সম্পর্কে তার কোনো সংযোগ ছিল না। দলের যেসব নেতা-কর্মী বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত নয়, তাদেরকে জাতীয় সংহতি রক্ষায় প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ও ভুট্টোর সহযোগিতা করতে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

এ সময় কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে পাইকারিভাবে পরিবার-পরিজনসহ বাঙালি সৈনিকদের হত্যা করা হয়। আগে ক্যান্টনমেন্ট ছেড়ে পালাতে না পারলেও সুযোগ খুঁজছিলেন তারা বেরিয়ে আসবার। সরকারিভাবে এ খবরের সত্যতা অস্বীকার করে বলা হয়, পূর্ব

পাকিস্তানি সৈন্যরা অন্যদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সমাজবিরোধীদের উৎখাত করে চলেছে। তাদের হত্যা করার খবর বাঙালিদের মধ্যে বিদ্বেষ সৃষ্টি করার কৌশল মাত্র।

তথ্য সূত্র : দৈনিক পাকিস্তান ও সংগ্রাম ১১, ১২, ১৩ ও ১৪ এপ্রিল '৭১।

১২ এপ্রিল, সোমবার

শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক ছিলেন বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা। আজীবন তিনি বাঙালিদের স্বার্থ রক্ষার জন্যে সংগ্রাম করে গেছেন। অথচ তাঁরই মেয়ে রইসি বেগম পাকিস্তান শাসকদের পক্ষ অবলম্বন করে মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন। স্বাধীনতার সূর্যকে ছিনিয়ে আনার জন্যে যারা অকুতোভয়ে অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিলো তাদেরকে তিনি দুষ্কৃতকারী বলে আখ্যা দিয়েছেন। ২৬ মার্চের হানাদার বাহিনীর বর্বরোচিত হামলার দিনকে তিনি পাকিস্তানের মুক্তির দিন বলে উল্লেখ্য করেন। ১২ এপ্রিল দৈনিক পত্রিকাগুলোতে এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনী জঙ্গীবাদী শত্রুদের হাত থেকে পূর্ব পাকিস্তানিদের রক্ষা করেছে। শুধু তাই নয় মুক্তিবাহিনীর বর্তমান তৎপরতার তুলনা দেন ১৯৬৫ সালের ভারত পাকিস্তান যুদ্ধের সঙ্গে।

হানাদার ঘাতকদের সাংগঠনিকভাবে সহযোগিতা করার উদ্দেশ্য নিয়ে ৯ এপ্রিল গঠিত হয় শান্তি কমিটি। ১২ এপ্রিলের দৈনিক পাকিস্তানের সম্পাদকীয় নিবন্ধে শান্তি কমিটি গঠনের ভূয়সী প্রশংসা করা হয়। নিবন্ধে বলা হয়, শান্তি কমিটি গঠন হচ্ছে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মানসিকতার প্রতিফলন। ঢাকার ইউনিয়ন, মহল্লায় শান্তি কমিটি গঠন করে মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে স্থানীয়ভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলার উদ্যোগকেও অভিনন্দন জানানো হয় এ নিবন্ধে।

এদিন বেতার ভাষণে সবুর খান একটুও দয়া না দেখিয়ে মুক্তিযোদ্ধা ও সহযোগিতাকারীদের খতম করার আহ্বান জানান। এমনকি সন্দেহজনক যে কোনো লোকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে বলেন। বেতার ভাষণে তিনি জানান ৭০ সাল থেকে তিনি 'জয়বাংলা' ও বাংলাদেশ শ্লোগানের বিরোধিতা করে আসছেন। পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগ সভাপতি শামসুল হুদার নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল গণহত্যার নায়ক টিক্কা খানের সঙ্গে দেখা করতে যান। দলে সাধারণ সম্পাদক এ এন এম ইউসুফ, লীগ নেতা আবদুল আওয়ালী এবং মোহাম্মদ হোসেন ছিলেন। তারা সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস দেন টিক্কা খানকে। শামসুল হুদা এবং ইউসুফ শান্তি কমিটি গঠন করে সংগঠিত হওয়ার নির্দেশ দেন দলের সব ইউনিটকে। সহায়তাকারী কারও ক্ষতি করা হবে না বলে ঘোষণা করেন টিক্কা খান। প্রেসনোটে বলা হয়, সেনাবাহিনী চাঁদপুরকে শত্রুমুক্ত করেছে। ঢাকা থেকে ঈশ্বরদী হয়ে পাবনা যাওয়ার পথে দুষ্কৃতকারীর চিহ্ন রাখেনি সেনাবাহিনী। ঢাকা শহরে পুরোদমে শুরু হয়ে গেছে শান্তি কমিটির তৎপরতা। ঢাকার নবাবপুর ইউনিয়ন শান্তি কমিটির সভা হয় এদিন।

তথ্য সূত্র : দৈনিক পূর্বদেশ ও পাকিস্তান ১২ ও ১৩ এপ্রিল '৭১।

১৪ এপ্রিল, বুধবার

সেনাবাহিনীর পাশে থেকে পাকিস্তানের শত্রুদের খতম করার আহ্বান জানান সাবেক জাতীয় পরিষদ সদস্য এবং পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ শহিদুল্লা। মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার ডাক দেন ঢাকা মুসলিম লীগের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ডা. নূরুর রহমান, প্রচার সম্পাদক মোবারক হোসেন, জয়েন্ট সেক্রেটারি দেওয়ান আবদুল কাদের, সদস্য সলিম খান, আনোয়ার উদ্দিন, মোহম্মদ ওয়াহিদ উল্লাহ, নূর মোহাম্মদ চৌধুরী, আবদুল মালেক। দেশের অবস্থা স্বাভাবিক রয়েছে, এ কথা বলে দেশ-বিদেশের মানুষকে ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা চালায় হানাদাররা। যদি স্বাভাবিকই থাকতো অবস্থা তাহলে বন্ধ করে দিতে হতো না ঢাকা, কুমিল্লা, যশোর ও রাজশাহী বোর্ডের এসএসসি ও এইসএসসি পরীক্ষা। আগামী ২২ এপ্রিল এসএসসি এবং ২০ মে এইচএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবার কথা ছিলো। ১৪ এপ্রিল এক ঘোষণায় এ পরীক্ষা বাতিল করা হয়।

ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প-কারখানায় উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায় হানাদারদের ভয়ে। লুটতরাজ, অগ্নি সংযোগ ও প্রাণের ভয়ে পালিয়ে যায় ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিরা। কিন্তু হানাদারদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলো কয়েকজন শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী। এরা পুরোদমে ফায়দা লুটেছে হানাদারদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে। এদের মধ্যে আবার ছিলো কিছু পশ্চিম পাকিস্তানি। এরা চুটিয়ে ব্যবসা করার পাশাপাশি সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করেছে ঘাতকদের। দেশে-বিদেশে প্রচারণা চালিয়েছে মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে। এক জনসভায় আজ পাকিস্তানের সংহতির পক্ষে অর্থাৎ হানাদারদের সহযোগিতা করার আহ্বান জানান পাকিস্তান শিল্প ও বণিক সমিতির আঞ্চলিক কমিটির সদস্য আশরাফ আহমদ। অপর এক সভায় মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করার জন্যে নিন্দা করা হয় ভারতের। এ সভায় সভাপতিত্ব করেন ঢাকা শিল্প ও বণিক সমিতির সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট এ সাত্তার কারাওয়ারদিয়ার। স্বাধীনতাবিরোধীদের তৎপরতা ব্যাপকভাবে বেড়ে যায় এ সময়।

তথ্য সূত্র : দৈনিক পাকিস্তান ও সংগ্রাম ১৪ ও ১৫ এপ্রিল '৭১।

১৫ এপ্রিল, বৃহস্পতিবার

মুক্তিযুদ্ধে অগ্রসেনার ভূমিকা পালন করে দেশের ছাত্র সমাজ। কিন্তু হানাদারদের সহযোগিতাও করেছে কেউ কেউ। এদেরই দু'জন রশিদুল কবির ও শামসুল হক। যথাক্রমে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র পরিষদের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক। এরা তাদের সহযোগী ছাত্রদের নির্দেশ দেয় সেনাবাহিনীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে শত্রু খতমের। সেনাবাহিনীর হাতকে শক্তিশালী করার আহ্বান জানান পাকিস্তান জাতীয় লীগের প্রাদেশিক কমিটির সাবেক কোষাধ্যক্ষ ফারুক মাহমুদ।

ভারতের সমর্থনকে ভালো চোখে দেখেনি স্বাধীনতাবিরোধীরা। পাকিস্তান ঘাতকদের বর্বরতার বিরুদ্ধে নিন্দা প্রস্তাব গ্রহণ করে ভারতীয় পার্লামেন্ট। স্বাধীনতাবিরোধীরা ভারতীয় পার্লামেন্টের প্রস্তাব গ্রহণকে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ বলে উল্লেখ করেন। এর নিন্দা জানান পিডিপির পূর্ব পাকিস্তানের চার নেতা। এরা হচ্ছেন

শামসুর রহমান, যুগ্ম সম্পাদক একে রফিকুল হোসেন, সাধারণ সম্পাদক এম এ জলিল, শহর পিডিপির আহ্বায়ক ফজলুল হক। নিন্দা জানান পূর্ব পাকিস্তান সরকারের সাবেক চিফ হুইপ এম এ জাহের ও পিপলস পার্টি পূর্ব পাকিস্তান শাখার যুগ্ম সম্পাদক কামাল হোসেন রিজভী।

তথ্য সূত্র : দৈনিক পাকিস্তান, আজাদ ও সংগ্রাম ১৫, ১৬, ১৭ ও ১৮ এপ্রিল '৭১

১৬ এপ্রিল, শুক্রবার

প্রধান প্রধান স্বাধীনতাবিরোধীরা নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করছিলো সামরিক জান্তার সঙ্গে। স্বাধীনতাবিদ্বেষী এসব দালালরা সামরিক জান্তার পাশে থেকে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। টিক্কা খানের সঙ্গে দেখা করে এরা জানান শত্রু নিধনে সেনাবাহিনীকে সহযোগিতা করবে। দায়িত্ব পালনে নিজেরাও সক্রিয় হবেন। নূরুল আমিনের নেতৃত্বে সাক্ষাৎকারী দলে ছিলেন গোলাম আযম, খাজা খয়ের উদ্দিন, এ কিউ এম শফিকুল ইসলাম, মাহমুদ আলী, মোহন মিয়া, এ এস এম সোলায়মান, আতাউল হক খান।

জামায়াতে ইসলামীর পরেই মুসলিম লীগের দু'টি গ্রুপ সংগঠিতভাবে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করে। দলীয় কর্মীদের নিয়ে পাড়া-মহল্লায় প্রতিরোধ গড়ে তোলে। লুটপাট থেকে শুরু করে নানাভাবে অত্যাচার করেছে জনসাধারণকে। ঢাকা শহর কনভেনশন মুসলিম লীগ এক বৈঠকে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে আনুষ্ঠানিকভাবে শান্তি কমিটির মাধ্যমে কাজ করার। শত্রু নিধনে আত্মনিয়োগ করার নির্দেশ দেয়া হয়। মুসলিম লীগ কর্মীদের বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন ডা. নূরুর রহমান। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন হাকিম ইরতেজুর রহমান আখুনজাদা, আলাউদ্দিন আহমদ, সলিমউল্লাহ সরদার, আবদুর রহিম সরদার, দেওয়ান আবদুল কাদের, সলিম সরদার, আবদুল মান্নান, আবদুল মালেক, আবদুর রহমান, খন্দকার মোজাম্মেল হক, নূর মোহম্মদ চৌধুরী, সলিম খান, ফয়েজ বখস, গোলাম মোরশেদ, খাজা আবদুল্লা, আবদুল গণি, নাসিরুল হক, চাঁদ মিয়া সরদার, আবদুস ছালাম সরদার, তোতা মিয়া সর্দার, ওয়াহেদুল্লাহ, সরফুদ্দিন আহমদ, শাহাবুদ্দীন, আবদুর রব হাজী, সিদ্দিক চৌধুরী, আল্লা রাখা, আনোয়ারুদ্দিন আহমদ।

এ সময় ভৈরব ব্রিজে হানা দিয়ে ঘাতকরা অসংখ্য মুক্তিযোদ্ধাকে হতাহত করে। নিহত ও নির্যাতিত হয় আশেপাশের এলাকার নিরীহ জনসাধারণ। অথচ সেনাবাহিনীর এ বর্বরতাকে অভিনন্দন জানায় দেশীয় দালালরা। মুসলিম লীগ নেতা আবদুল আওয়াল, মোহাম্মদ আলী, মাহতাবউদ্দিন খান, মোহাম্মদ হোসেন, নূরুল ইসলাম, শাজাহান, মঈনউদ্দিন আহমদ সেনাবাহিনীকে ধন্যবাদ দেন ভৈরব ব্রিজে আক্রমণ চালানোর জন্যে।

তথ্যসূত্র : দৈনিক পাকিস্তান ও আজাদ ১৬, ১৭, ১৮ ও ১৯ এপ্রিল '৭১।

১৭ এপ্রিল, শনিবার

হানাদার বাহিনীর নির্যাতনের পাশাপাশি চলছিলো শান্তি কমিটির দালালদের দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠার নামে নিরীহ জনগণের ওপর জুলুম। জনসাধারণের মালামাল লুট করেছে

এরা। বাঙালি মেয়েদের ধরে নিয়ে তুলে দিয়েছে পাকসেনাদের হাতে। ইতিমধ্যেই শান্তি কমিটি সাংগঠনিকভাবে তাদের কাজ শুরু করেছে। জাল বিস্তার করছে গ্রামে-গ। এ দিনের দৈনিক পত্রিকাগুলো শান্তি কমিটির কেন্দ্রীয় সদস্যদের নাম প্রকাশ করে। মুক্তিযুদ্ধের ন'মাস এরা সক্রিয় থেকে কাজ করেছে হানাদারদের পক্ষে। সদস্যরা হচ্ছে খাজা খয়ের উদ্দিন, গোলাম আযম, এ কিউ এম শফিকুল ইসলাম, মাহমুদ আলী, আবদুল জব্বার খদ্দর, সিদ্দিক আহমদ, আবুল কাসেম, সৈয়দ মোহম্মদ, আবদুল মতিন, গোলাম সারোয়ার, ব্যারিস্টার আখতার উদ্দিন, এ এস এম সোলায়মান, রফিকুল ইসলাম, নূরুজ্জামান, আতাউল হক খান, তোহা-বীন-হাবীব, মোহন মিয়া, মেজর আফসার উদ্দিন, দেওয়ান বারাসাত আলী, পীর মোহসেন উদ্দিন, হাকিম ইরতেজুর রহমান। সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানকে কেন্দ্রীয় কমিটির আওতায় এনে জেলা মহকুমা পর্যায়ে ইউনিট গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

তথ্য সূত্র : দৈনিক আজাদ ও পাকিস্তান ১৭ ও ১৮ এপ্রিল '৭১

১৯ এপ্রিল, সোমবার

কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটি ঢাকা শহরের বিভিন্ন ইউনিট ও মহল্লায় শান্তি কমিটি গঠন এবং সেগুলোর আহ্বায়ক মনোনয়নের কথা ঘোষণা করে আজ। কমিটির বিজ্ঞপ্তিতে ইউনিট ও আঞ্চলিক কমিটির তৎপরতা সম্পর্কিত রিপোর্ট ঢাকার মগবাজার এলাকার ৫ নং এলিফ্যান্ট লেনের কেন্দ্রীয় অফিসে পৌঁছে দিতে বলা হয়, কেন্দ্রীয় অফিস ২৪ ঘণ্টা খোলা রেখে অফিস সেক্রেটারি হিসেবে মুসলিম লীগ নেতা এডভোকেট নূরুল হক মজুমদারকে সার্বক্ষণিকভাবে অফিসে মোতায়েন করা হয়। বিভিন্ন স্থানে শান্তি কমিটির ইউনিট গঠনের জন্যে জেলা-মহকুমায় নেতাকর্মীদের পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়। বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়— জনগণের অসুবিধাদি সম্পর্কে তথ্যাদি গ্রহণ এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষ ও আর্মি সেক্টরের সাহায্যে তার প্রতিকার করার জন্যে কমিটির সদস্যদের মধ্য থেকে লিয়াজোঁ অফিসার নিয়োগ করা হয়েছে এবং ইতিমধ্যেই লিয়াজোঁ অফিসাররা কাজ শুরু করেছে। রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় স্বাধীনতাকামী বাঙালিদের চিহ্নিত করে ক্যান্টনমেন্টে পাকবাহিনীর কাছে তাদের নামের তালিকা পৌঁছে দেয়া ছিলো লিয়াজোঁ অফিসগুলোর মূল কাজ। আর্মি সেক্টরের সাহায্যে প্রতিকার করার নামে এরা প্রাণভয়ে লুকিয়ে থাকা অসহায় বাঙালিদের হত্যা করার জন্যে হানাদারদের ডেকে আনে। ২৪ ঘণ্টা খুলে রেখে এসব লিয়াজোঁ অফিসগুলোকে দালালরা নির্যাতন কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করে। বিভিন্ন এলাকার লিয়াজোঁ অফিসাররা হচ্ছে কোতয়ালী থানায় এ আই আহমদ, সাখী সুলতান, লালবাগ থানায় নাজির হোসেন, এস এম হাবিবুল হক, ধানমন্ডি থানায় নোয়াব আলী এডভোকেট, সূত্রাপুর থানায় সিরাজউদ্দিন, মাহতাবুদ্দিন খান, ফজলুল হক, তমিজুদ্দিন, আবদুর রশিদ, তেজগাঁও থানায় ইকবাল ইদ্রিস, মাহবুবুর রহমান গুরহা, এম এস এম হাবিবুল হক, নোয়াব আলী হেডমাস্টার, মিরপুর থানায় লায়েক আহম্মদ সিদ্দিকী, মোহাম্মদপুর থানায় এ এ বাকের, ড. ওসমান, সৈয়দ মোঃ ফারুক, শফিকুর রহমান, আবদুর রহিম চৌধুরী, রমনা থানায় আতাউল হক খান

এডভোকেট, জি এ খান এডভোকেট, অধ্যাপক এ হাসেম, জুলমত আলী খান এডভোকেট, ডা. মোঃ আইয়ুব আলী, এডভোকেট এ ওয়াদুদ মিয়া। এসব লিয়াজোঁ অফিসাররা খান সেনাদের বাঙালিদের বাড়িতে বাড়িতে নিয়ে গেছে।

হানাদার দোসরদের অন্যতম সহযোগী এবং বাঙালিদের মধ্যে গণহত্যায় সাহায্যদানকারীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কনভেনশন মুসলিম লীগের সভাপতি ফজলুল কাদের চৌধুরী এবং দলের সাধারণ সম্পাদক মালিক মোহাম্মদ কাসিম আজ গভর্নর হাউসে টিক্কা খানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ফজলুল কাদের চৌধুরী তার সহযোগীদের নিয়ে সর্বাত্মকভাবে সেনাবাহিনীর পাশে থেকে কাজ করার আশ্বাস দেন। রেডিওতে প্রচারিত টিক্কা খানের কুখ্যাত ভাষণের ভূয়সী প্রশংসা করে আজ মৌলভী ফরিদ আহমদ বলেন, গভর্নরের আশ্বাস থেকে এটা স্পষ্ট যে সেনাবাহিনী দেশের অখণ্ডতা রক্ষায় সদা তৎপর রয়েছে। তিনি জানান, পূর্ব পাকিস্তান থেকে বিশ্বাসঘাতক হিন্দুস্তানি দালাল ও দুষ্কৃতকারীদের নির্মূল করা হয়েছে। তাই এখন ইসলাম ও পাকিস্তানের আদর্শে বিশ্বাসী প্রতিটি মুসলমানের সরকারি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করা কর্তব্য। বিবৃতি প্রচারের মাধ্যমে আজ পাকিস্তানের দুশমনদের চিরতরে উৎখাতের শপথ ঘোষণা করেন মাওলানা নূরুজ্জামান, কৃষক শ্রমিক পার্টির সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট এস এম কে জয়নুল আবেদীন।

ভারতীয় ভূমিকার প্রতিবাদ জানিয়ে আজ পাক সরকার ভারতীয় হাইকমিশনে নোট পাঠায়। হানাদার বাহিনীর কার্যকলাপের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করে পাকিস্তান এসোসিয়েশন অব প্রিন্টিং এণ্ড গ্রাফিক আর্টস ইন্ডাস্ট্রির কতিপয় কর্মকর্তা। সমিতির সহ-সভাপতি এম এ আশরাফের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় এরা সিদ্ধান্ত নেয় সেনাবাহিনীকে সহযোগিতা করার।

তথ্য সূত্র : দৈনিক পূর্বদেশ ও সংগ্রাম ১৯, ২০ ও ২১ এপ্রিল '৭১; একাত্তরের ঘাতক ও দালালরা কে কোথায়।

২০ এপ্রিল, মঙ্গলবার

শান্তি কমিটির দালালরা ব্যাপকভাবে তাদের কার্যক্রম শুরু করে। আজ খাজা খয়ের উদ্দিনের সভাপতিত্বে কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। শান্তি কমিটির নেতারা ভালোভাবেই উপলব্ধি করতে পারে যে, স্বাধীনতা সংগ্রামকে নস্যাৎ করতে হলে দেশের সর্বত্র গ্রামেগঞ্জে দালালদের সংগঠিত করতে হবে। তাই সভায় সিদ্ধান্ত নেয়া হয় সব জায়গায় শান্তি কমিটি গঠনের। এ ব্যাপারে যোগাযোগের জন্যে সবচেয়ে যোগ্য পুরুষ গোলাম আযম, মাহমুদ আলী। এ জে খদ্দর আবুল কাসেমকে দায়িত্ব দেয়া হয়।

শহরে প্রত্যক্ষভাবে বাঙালি হত্যায় সহায়তা করার জন্যে শান্তি কমিটি এলাকায় এলাকায় লিয়াজোঁ অফিসার নিয়োগ করে। লিয়াজোঁ অফিসারদের কাজ ছিলো নিজ নিজ এলাকা থেকে স্বাধীনতাকামীদের বেছে বের করে হত্যা করা এবং সেনাবাহিনীকে খোঁজ দেয়া। আজ লিয়াজোঁ অফিসারদের মধ্যে কিছু রদবদল করে তাদের পরিকল্পনাকে

সার্থকভাবে পরিচালনার জন্যে আরো কয়েকজন যোগ্য ব্যক্তিকে নিয়োগ করা হয়। লালবাগ থানার অন্যতম সংযোগকারী এস হাবিবুল হককে অন্য গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দিয়ে তার জায়গায় মাহবুবুজ্জামানকে নিয়োগ করে। সেই সঙ্গে এখানে লিয়াজোঁ অফিসার হিসেবে মসিহুল ইসলাম ও আবদুল খালেককে নিয়োগ করা হয়। রমনা থানায় কার্যক্রম জোরদার করার জন্যে নিয়োগ করা হয় ফজলুল হক, শাহ মহিউদ্দিন ও আবদুল হাইকে।

তথ্য সূত্র : দৈনিক পাকিস্তান ও পূর্বদেশ ২১, ২২ ও ২৩ এপ্রিল '৭১।

২১ এপ্রিল, বুধবার

পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের পক্ষ থেকে শপথ বাক্য উচ্চারণ করে সাবেক শিক্ষামন্ত্রী ও কাইয়ুম মুসলিম লীগের ভাইস প্রেসিডেন্ট আলহাজ আফাজউদ্দিন আহমদ। তিনি জানান, পূর্ব পাকিস্তানিরা জীবন দিয়ে মাতৃভূমির প্রতি ইঞ্চি মাটি রক্ষা করবে। পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন সাবেক এমপিএ আবদুল মতিন লস্কর, ঢাকা জেলা পিপলস পার্টির ভাইস চেয়ারম্যান সৈয়দ বদরুল হাসান।

ইতিহাসের সবচাইতে পৈশাচিক বর্বরতা চালায় পাকিস্তানি হানাদাররা। অথচ সোহরাওয়ার্দী কন্যা বেগম আখতার সোলায়মান সেনাবাহিনির কার্যক্রমকে অভিনন্দিত করেন। তিনি জানান, দেশ রক্ষার জন্যে সেনাবাহিনী সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। মার্চের প্রথম থেকে পূর্ব পাকিস্তানের তাদের মনোভাব দেশের নিরাপত্তার পক্ষে হুমকি হয়ে ওঠে। সেনাবাহিনী হস্তক্ষেপ করে ভারতীয় এজেন্ট ও চক্রান্তকারীদের দুরভিসন্ধি ব্যর্থ করে দিয়েছে।

তথ্য সূত্র : দৈনিক পূর্বদেশ ও পাকিস্তান ২১, ২২ ও ২৩ এপ্রিল '৭১।

২২ এপ্রিল, বৃহস্পতিবার

শহরের মহল্লায় মহল্লায় শান্তি কমিটির নেতারা স্বাধীনতাবিরোধীদের সংগঠিত করে এলাকা থেকে স্বাধীনতামনাদের নিশ্চিহ্ন করা শুরু করে। এ সময় তাদের শিকার ছিলো অসহায় বাঙালিরা। কারণ এ সময় মুক্তিযোদ্ধারা তেমন একটা ঢাকায় ছিলো না।

শফিকুল ইসলাম, এ জে খদ্দর, দিলকুশা এলাকার আহ্বায়ক মনসুর আলী প্রমুখ আরামবাগ এলাকায় বৈঠক করে দালালদের সক্রিয় করার চেষ্টা চালায়। সাবেক জাতীয় পরিষদ সদস্য আবুল কাসেমের বাসভবনে দেওয়ান বারাসত হোসেনের সভাপতিত্বে লালবাগ মোহাম্মদপুর এলাকার স্বাধীনতাবিরোধীরা মিলিত হয়। তারা বারাসতকে আহ্বায়ক এবং আজিজুল ইসলামকে কোষাধ্যক্ষ করে ৩০ সদস্যবিশিষ্ট শান্তি কমিটি গঠন করে। কমিটি গঠনের বৈঠকেই লালবাগ-মোহাম্মদপুর এলাকার সদস্যরা অঙ্গীকার প্রকাশ করে দুষ্কৃতকারী ও দেশের শত্রুদের খুঁজে বের করার। শান্তি কমিটি গঠিত হয় খিলগাঁও-এ। এখানে ড. এ কে এম আইয়ুব আলীকে আহ্বায়ক করে ১০১ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়। নবগঠিত শান্তি কমিটির ইউনিটগুলো নিয়মিত মিলিত হয়ে তাদের আক্রমণ পদ্ধতি নির্ধারণ করে। আজ ইসলামপুর মডার্ন হোটেলে মোঃ মোবারক হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয় ইসলামপুর ইউনিয়ন শান্তি কমিটির সভা।

তথ্য সূত্র : দৈনিক পাকিস্তান ও পূর্বদেশ ২২ ও ২৩ এপ্রিল '৭১।

২৪ এপ্রিল, শনিবার

স্বাধীনতাবিরোধীরা নিজেদেরকে সংগঠিত করছিলো শান্তি কমিটির মাধ্যমে। পাড়া-মহল্লায় গড়ে তুলছিলো শান্তি কমিটি। আজ গোড়ান ইউনিয়ন অফিসে বেশ কিছু দালাল মিলিত হয়ে সিদ্ধান্ত নেয় গোড়ান, খিলগাঁও, মালিবাগ, শান্তিবাগের মহল্লায় মহল্লায় শান্তি কমিটি গঠনের। শান্তি কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয় ইসলামপুর ও মিরপুরে। ওবায়দুল্লার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ইসলামপুরের সভায় দালালরা দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করে শত্রুদের হাত থেকে পাকিস্তান রক্ষার। তারা জানায়, আমরা সেনাবাহিনীকে সহায়তা করে দেশে শান্তি ফিরিয়ে আনবো। দেওয়ান ওয়ারেসাত হোসেন খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আরেক সভায় মোঃ সামীউদ্দিন খানকে আহ্বায়ক করে ২৫ সদস্য বিশিষ্ট শান্তি কমিটি গঠিত হয়। এ সভায় উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির আবুল কাসেম, মাহমুদ আলী, আবদুল জব্বার খদ্দর, মেজর আফসার উদ্দিন প্রমুখ। নেতারা শান্তি কমিটির কাজকর্ম ব্যাখ্যা করেন।

আজ সিলেটে শান্তি কমিটি আয়োজন করে সমাবেশের। সমাবেশে জেলা শান্তি কমিটির আহ্বায়ক নাজমুল হোসেন উত্তপ্ত বক্তব্য দিয়ে স্বাধীনতাবিরোধীদের মধ্যে জেহাদী মনোভাব জাগিয়ে তোলবার চেষ্টা চালায়। অন্যান্য শান্তি কমিটির নেতারা তাদের বক্তব্যে দেশপ্রেমিক জনগণকে শত্রুদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

তথ্যসূত্র : দৈনিক পাকিস্তান ও পূর্বদেশ ২৫ ও ২৬ এপ্রিল; সংগ্রাম ২ মে '৭১।

২৫ এপ্রিল, রবিবার

ড. আইয়ুব আলীর সভাপতিত্বে খিলগাঁও ইউনিয়ন শান্তি কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় আজ। আইয়ুব আলী দুষ্কৃতকারী ও ভারতীয় চরদের খতম করার যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করেন শান্তি কমিটির সদস্যদের কাছে।

তথ্য সূত্র : দৈনিক পাকিস্তান ও পূর্বদেশ, ২৬ ও ২৭ ও ২৮ এপ্রিল '৭১; একাত্তরের ঘাতক ও দালালরা কে কোথায়।

২৬ এপ্রিল, সোমবার

অত্যন্ত ত্বরিত গতিতে বাস্তবায়িত হচ্ছিলো শান্তি কমিটির কার্যক্রম। দেশের সর্বত্র শান্তি কমিটি ভিজিলেন্স কমিটি গঠন করে স্বাধীনতাবিরোধীদের সংগঠিত করার কাজ অত্যন্ত দ্রুত চালাতে থাকে। আজ থেকেই শান্তি কমিটির কেন্দ্রীয় নেতাদের বিভিন্ন অঞ্চল ভাগ করে কেন্দ্রের বাইরে পাঠানো শুরু হয়। এদের ওপর দায়িত্ব দেয়া হয় জেলা-মহকুমায় শান্তি কমিটি গঠন এবং সেখানে স্বাধীনতাবিরোধীদের মধ্যে বিদ্বেষী মনোভাব জাগিয়ে তোলার। এ কাজ তারা সফলতার সঙ্গেই পালন করে। শান্তি কমিটির তৎপরতার প্রমাণ মেলে আজকের দৈনিক পাকিস্তানে প্রকাশিত ঢাকা ও ঢাকার বাইরে গঠিত কতিপয় শান্তি কমিটি ও নেতৃস্থানীয়দের তালিকা থেকে। যাদের নেতৃত্বে এ সময় শান্তি কমিটি গঠিত হয় তারা হলেন মোঃ ফজলুর রহমান পূর্ব তেজগাঁও ইউনিয়ন কমিটি, এস এম. হাবিবুল হক ধানমন্ডি ইউনিয়ন কমিটি, এ আজিজ সরদার নারায়ণগঞ্জ শহর কমিটি,

মোঃ মনসুর আলী দিলকুশা ইউনিয়ন শান্তি কমিটি ড. মোঃ আইয়ুব আলী খিলগাঁও জি এম খান দিলুরোড, মজিবুর রহমান নিউ ইস্কাটন, এম. এ. খালেক পূর্ব ধানমণ্ডি একে এম আবদুল্লা খান মহাখালী মহল্লা, পেয়ার আলী আহসান দোহার শহর ইউনিয়ন কমিটি, গিয়াসউদ্দিন আহমদ শরাফতগঞ্জ ইউনিয়ন কমিটি, মৌলবী সেকান্দার আলী কুমিল্লার নবীনগর থানা কমিটি, ইদ্রিস বেপারী রেকাবী বাজার ইউনিয়ন কমিটি। ময়মনসিংহের গফরগাঁও থানায় শান্তি কমিটি গঠন করে এ সময় দালালরা মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে নেমে পড়ে। এখানে ডা. খন্দকার আবু সাঈদকে সভাপতি এবং শামসুল হুদাকে সেক্রেটারি করে ১৬৫ সদস্য বিশিষ্ট শান্তি কমিটি গঠিত হয়।

তথ্য সূত্র : দৈনিক পাকিস্তান ও পূর্বদেশ ২৬, ২৭ ও ২৮ এপ্রিল '৭১।

২৭ এপ্রির, মঙ্গলবার

রেডিও পাকিস্তান ঢাকা কেন্দ্রে আজ ফজলুল কাদের চৌধুরী ভাষণ দেন। ভাষণে তিনি জানান, ভারতীয় দালালরা দেশে অরাজকতা সৃষ্টি করছে। লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ, রাস্তাঘাট ধ্বংস করে জনজীবন বিষিয়ে তুলেছে। সবচাইতে বড় কথা ভারতীয় ক্রীড়নকদের চক্রান্ত যদি সফল হয় তবে আমরা চিরদিনের জন্যে ভারতের গোলামে পরিণত হব। পাকিস্তানের জন্ম থেকে শুরু করে ভারত কোনোদিন পাকিস্তানের অস্তিত্বকে মেনে নিতে পারেনি। প্রথম থেকেই শত্রুতা করেছে। ফজলুল কাদের চৌধুরী তার ভাষণে ভারতের চক্রান্ত নস্যাৎ করার জন্যে দুষ্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান দলীয় কর্মী ও দেশেবাসীর প্রতি।

শেরেবাংলার মৃত্যুবার্ষিকীকে কলঙ্কিত করে স্বাধীনতাবিরোধীরা। এটি সাদীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত পাকিস্তান দরদী সংঘের এক আলোচনা অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করে এডভোকেট মোজাফফর হোসেন ও মীর আবুল ফজল। ডাক্তার নূরুর রহমানের সভাপতিত্বে আলোচনা সভা হয় কনেভনশন মুসলিম লীগের। পাকিস্তানের প্রয়োজনীয়তার বিস্তৃত ব্যাখ্যা করা হয় শান্তি ও কল্যাণ পরিষদের আলোচনা সভায়। একে ফজলুল হকের মৃত্যুবার্ষিকীতে পাকিস্তানের সংহতি ও অখণ্ডতা রক্ষার আহ্বান জানিয়ে বিবৃতি দেন কৃষক শ্রমিক পার্টির সহ-সভাপতি এস এম কে জয়নুল আবেদীন। এ এন এম ইউসুফের সভাপতিত্বে আলোচনা হয় মোক্তার বার সমিতির। সভায় বক্তারা ঐক্যবদ্ধভাবে পাকিস্তান রক্ষার আহ্বান জানান।

সিলেটে আজ অনুষ্ঠিত হয় শান্তি কমিটির সভা। শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তি, আলহাজ আবদুস সালামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন নাজমুল হক প্রধান, তারা মিয়াসহ শান্তি কমিটির নেতারা।

তথ্য সূত্র : দৈনিক পাকিস্তান ও সংগ্রাম ২৭, ২৮ ও ২৯ এপ্রিল '৭১।

২৮ এপ্রিল, বুধবার

আজ হানাদার ঘাতকরা মিরপুরে এক পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড চালায়। মার্চের পর এটাই ছিলো ঢাকা শহরে বড় ধরনের হত্যাকাণ্ড। মিরপুরের হত্যাযজ্ঞে হানাদারদের সঙ্গে

সক্রিয়ভাবে অংশ নেয় স্থানীয় বিহারীরা। তাছাড়া মিরপুর থেকে আজ অসংখ্য বাঙালিকে পাকসেনারা ক্যাম্পে ধরে নিয়ে যায়। যাদের অধিকাংশই আর কোনো দিন পৃথিবীর আলো দেখেনি। আজ মিরকাদিমে রিকাবী বাজার ইউনিয়ন শান্তি কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। পাকিস্তান আন্দোলনের প্রবীণ কর্মী আবদুল হাকিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় আশেপাশের তিন-চারটি ইউনিয়নের শান্তি কমিটি নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। সভায় বক্তারা পাকিস্তানের শত্রুদের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্যে জনগণের প্রতি আহ্বান জানান। উপস্থিত শান্তি কমিটির সদস্যরা শপথ নেয় এলাকা থেকে দুষ্কৃতকারীদের উৎখাতের।

একজন সরকারি মুখপাত্র ঘোষণা করে যে, নিউইয়র্কে নিযুক্ত পাকিস্তানের ভাইস কন্সাল মাহমুদ আলীকে বরখাস্ত করা হয়েছে। কারণ তাকে নিয়ে আর সুবিধে হচ্ছিলো না। তিনি পাক সরকারের নির্দেশ পালনে অসম্মতি জানান।

তথ্যসূত্র : দৈনিক পাকিস্তান ২৮, ২৯ ও ৩০ এপ্রিল; সংগ্রাম ২ মে '৭১।

২৯ এপ্রিল, বৃহস্পতিবার

আজ সিলেট বেতার কেন্দ্রে ভাষণ দেন সিলেট শান্তি কমিটির সদস্য খন্দকার আবদুল জলিল। ভাষণে তিনি দেশপ্রেমিক পাকিস্তানীদের প্রতি আহ্বান জানান প্রত্যেক এলাকায় শান্তি কমিটি গঠন করে দুষ্কৃতকারীদের প্রতিহত করার। এপিপি প্রতিনিধি আলতাফ জাওয়ার দেশের পরিস্থিতি বর্ণনা করতে গিয়ে তার পাবনা সফরের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। পাবনা শহর সম্পর্কে তিনি বলেন, পাবনা জেলায় দুষ্কৃতকারীরা হয় নিহত অথবা বন্দি হয়েছে, না হয় হিন্দু মনিবদের কাছে আশ্রয় নেবার জন্যে ভারত গেছে। দুষ্কৃতকারীদের নেতা এমএন এ আমিনুদ্দিন নিহত হয়েছে। ভারতে পালিয়ে গেছে আবদুর রব এম এন এ। সেনাবাহিনী আসার খবর পেয়ে ভয়ে মারা গেছে আমজাদ হোসেন। এদের বাড়িতে ছিলো অস্ত্রের গুদাম। সেনাবাহিনী যেগুলো উদ্ধার করেছে। বর্তমানে বকুল পাবনায় দুষ্কর্মের নেতৃত্ব দিচ্ছে। সে পাবনাবাসীর জীবনকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে। জনগণের মধ্যে প্রচারপত্র বিলি করে বিভ্রান্ত করছে।

তথ্য সূত্র : দৈনিক পাকিস্তান, পূর্বদেশ ও সংগ্রাম ২৯ ও ৩০ এপ্রিল; ২ মে '৭১।

৩০ এপ্রিল, শুক্রবার

কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির অধীনে শান্তি কমিটি গড়ে তোলা হয় দেশের প্রতিটি অঞ্চলে। কেন্দ্রীয় নেতারা তৎপর হয়ে গড়ে তোলেন শান্তি কমিটি। এ দিন খুলনার দৌলতপুরের দিয়ানায় শান্তি কমিটির সভা হয়। এ সভায় সভাপতিত্ব করেন সবুর খান। সবুর খান খুলনাবাসীকে দেশদ্রোহীদের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানান। এ সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সাবেক এম পি এ আবুল হোসেন এবং শান্তি কমিটির নেতা মোহাম্মদ আলী।

প্রতিরোধ তৈরির ডাক দেন কনফেডারেশন অব লেবার পার্টির প্রেসিডেন্ট ডা. এম এ মালিক ও সেক্রেটারি এম এ খতিব। নির্বাচনে জয়লাভ করার পরও আওয়ামী লীগের

হাতে ক্ষমতা ছাড়েনি শাসক চক্র। তখন এ ব্যাপারে কোনো দলই কথা বলেনি। কিন্তু দেশের বর্তমান পরিস্থিতিকে মুসলিম লীগ প্রধান খান আবদুল কাইয়ুম খান শাসনতন্ত্র প্রণয়নের উপযুক্ত সময় বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন দ্বি-জাতিত্ত্বের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের সমাধান রয়েছে।

৩০ এপ্রিল রংপুরের স্বাধীনতাবিরোধীরা আয়োজন করে মিছিলের। মিছিলের নেতৃত্ব দেন জাতীয় পরিষদের সাবেক সদস্য সিরাজুল ইসলাম ও মোহাম্মদ আমিন। দশ দিন আগেও শান্তি কমিটি রংপুরে আরেকটি মিছিল করে।

তথ্য সূত্র : ৩০ এপ্রিল দৈনিক সংগ্রাম ও পাকিস্তান ; ১ ও ২ মে দৈনিক পাকিস্তান, পূর্বদেশ ও আজাদ '৭১।

২ মে, রবিবার

ময়মনসিংহ জেলা থেকে নির্বাচিত সদস্য এবং আওয়ামী লীগ নেতা এস বি জামান দলের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা দেন। এক বিবৃতিতে তিনি আওয়ামী লীগের দেশপ্রেমহীন ব্যক্তিবর্গের 'সাম্প্রতিক ঘৃণ্য কার্যক্রমের' নিন্দা করেন। সেই সঙ্গে দেশপ্রেমিক নাগরিকদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান ইয়াহিয়া ও সেনাবাহিনীর হাতকে শক্তিশালী করতে। ইয়াহিয়া ও টিক্কা খান সময়োচিত ও সঠিক ব্যবস্থা নিয়ে যেভাবে দেশকে শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা করেছেন তাতে তাদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে এবং জাতি চিরদিন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবে বলে তিনি জানান।

সামরিক কর্তৃপক্ষ আজ অভিযোগ উত্থাপন করে ভারতীয় বিমানের আকাশ সীমা লংঘনের। সরকারিভাবে জানানো হয় পূর্ব পাকিস্তানের সবগুলো কেন্দ্র থেকে দেশপ্রেমমূলক অনুষ্ঠান নিয়মিত প্রচারিত হচ্ছে।

আজ দৈনিক সংগ্রামে ফয়জুল হক তার বাবা ফজলুল হকের চিন্তাধারা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, 'বাবা মনে প্রাণে একজন পাকিস্তানি মুসলমান ছিলেন। এর বাইরে তিনি কিছু চিন্তা করে নি।' তিনি জানান, আমি হিন্দু রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থেকে তাদের হীন চরিত্র সম্পর্কে অবগত হয়েছি।

আজ আবুল কাসেমের বাড়িতে লালমাটিয়া-মোহাম্মদপুর এলাকার শান্তি কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন মনিরুদ্দীন আহমদ, সাবির আলী প্রমুখ। নেতারা জনগণের প্রতি আহ্বান জানান, সেনাবাহিনীকে সহায়তা করার। দৈনিক সংগ্রামে প্রকাশিত এক চিঠিতে আরমানিটোলার আবুল কালাম জানান, ঢাকা বেতারের বর্তমান অনুষ্ঠানমালা পাকিস্তানি চেতনার উদ্দীপক এবং ৬৫ সালের মতো এবারো জনগণকে জাগিয়ে তুলবে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, '২৫ মার্চের আগে আমাদের সংস্কৃতিবিরোধী হিন্দু জাতীয় প্রেরণার উৎস মুসলিমবিদ্বেষী হিন্দু জাতীয় কবির ঘুম পাড়ানো গানও আমাদের জাতীয় সঙ্গীতের মর্যাদা দিয়ে শোনানো হচ্ছিলো।' খুলনার সুন্দরবন কলেজে শান্তি কমিটির জনসভা অনুষ্ঠিত হয় আজ। সভায় বক্তব্য রাখেন সবুর খান, আমজাদ হোসেনসহ শান্তি

কমিটির স্থানীয় নেতারা। সবুর খান জেহাদী মনোভাব নিয়ে জনগণকে শত্রু মোকাবেলায় এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

তথ্য সূত্র : দৈনিক পাকিস্তান ও সংগ্রাম ২, ৩, ৪, ও ৬ মে '৭১।

৩ মে, সোমবার

খুলনা শান্তি কমিটির উদ্যোগে এক শ্রমিক সবাবেশ অনুষ্ঠিত হয় আজ। কতিপয় শ্রমিক নেতা ও শান্তি কমিটির নেতারাসহ এ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন মুসলিম লীগ নেতা সবুর খান। সমাবেশে উপস্থিত শ্রমিক ও শান্তি কমিটির সদস্যদের উদ্দেশ্যে সবুর খান বলেন, সেনাবাহিনী দেশব্যাপী দুষ্কৃতকারীদের নির্মূল করে চলেছে। তাদের ধ্বংস অনিবার্য। তারা সব জায়গা থেকে উৎখাত হয়ে যাচ্ছে। দেশপ্রেমিক নাগরিকরাও সর্বত্র সেনাবাহিনীকে সহায়তা করছে। তিনি জানান, কোনো দেশপ্রেমিক নাগরিক দুষ্কৃতকারীদের সঙ্গে নেই। তথাকথিত 'বাংলাদেশ' আন্দোলনকারীরা আমাদের মঙ্গল চায় না। অনেক আগে থেকেই এরা জ্বালাও-পোড়াও রাজনীতি করে পাকিস্তানকে পঙ্গু করে দেওয়ার চেষ্টা চালায়। মার্চের প্রথম থেকে এর চরম বহিঃপ্রকাশ ঘটে। কিন্তু সেনাবাহিনী যথাসময়ে হস্তক্ষেপ করে পাকিস্তানকে রক্ষা করেছে। এজন্যে আমরা সেনাবাহিনীর কাছে কৃতজ্ঞ। তিনি ভারত ও তার দালালদের হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেন, পাকিস্তানীরা তাদের হীন চক্রান্ত বরদাস্ত করবে না। শ্রমিক ও শান্তি কমিটির সদস্যদেরকে তিনি ভারতীয় মিথ্যা প্রচারণায় কান না দিয়ে কলকারখানায় উৎপাদন এবং জনগণের মধ্যে আস্থা ফিরিয়ে আনার আহ্বান জানান। শান্তি কমিটির উদ্যোগে খুলনায় অপর এক সভায় সবুর খান বলেন, কতিপয় ব্যক্তি ব্যতীত 'বাঙালি জাতীয়তাবাদ' পাকিস্তানিরা প্রত্যাখ্যান করেছে। এটা কোনো মতবাদই নয়। বহু ত্যাগ ও রক্তের বিনিময়ে পাকিস্তানের জন্ম হয়েছে। পাকিস্তানকে আমরা ধ্বংস হতে দিতে পারি না। আমরা সবাই পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদের পক্ষে। জীবন দিয়ে হলেও আমরা পাকিস্তানকে রক্ষা করবো। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন প্রাক্তন প্রাদেশিক মন্ত্রী আমজাদ হোসেন খান।

আজ মুক্তিযোদ্ধা ও স্বাধীনতাকামী বাঙালিদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে হানাদার ঘাতকদের পক্ষে বিবৃতি দেন শেরে বাংলার মেয়ে রইসি বেগম। বিবৃতিতে তিনি বলেন, কিছু দুষ্কৃতকারী ও ভারতীয় দালাল আমাদের স্বাধীনতা ও সংহতি বিপন্ন করে তুলেছিলো। কিন্তু আমাদের সেনাবাহিনী শত্রুর সে চেষ্টা সফল হতে দেয়নি। শত্রুরা আমাদের জীবনযাত্রাকে বিপন্ন করে তুলেছিলো। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে জানান আমরা প্রতিশোধ নিতে জানি। শত্রুদের আমরা রুখবোই।

তথ্য সূত্র : দৈনিক পাকিস্তান ও সংগ্রাম ৩, ৪ ও ৫ মে '৭১।

৪ মে, মঙ্গলবার

স্বাধীন বাংলাদেশে যারা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো তাদের মধ্যে শাহ আজিজ অন্যতম। জিয়া সরকারের আমলে তিনি প্রধানমন্ত্রীর পদ অলংকৃত করেছিলেন। ১৯৭১ সালে তার

বক্তৃতা-বিবৃতি এবং কার্যকলাপ ছিলো সম্পূর্ণরূপে স্বাধীনতাবিরোধী। আজ তিনি এক বিবৃতিতে জানান, 'প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া প্রবল উৎকণ্ঠার সঙ্গে রাজনৈতিক দলসমূহকে অধিকতর স্বাধীনতা প্রদানপূর্বক দেশে পূর্ণ এবং বাধাহীন গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেন। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক দল অধুনালুপ্ত আওয়ামী লীগ এই সুযোগের ভুল অর্থ করে বল প্রয়োগ আর শিরোচ্ছেদের মাধ্যমে নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে নিজেদের খেয়ালখুশীতে দেশ শাসন করার দাবি করে এবং এভাবেই অহমিকা, অধৈর্য এবং ঔদ্ধত্যের ফলে নিজেদের ভাসিয়ে দেয়। আমি সাম্রাজ্যবাদী ভারতের দুরভিসন্ধি নস্যাৎ করার উদ্দেশ্যে দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনীকে সাহায্য করার জন্য জনগণের প্রতি আবেদন জানাচ্ছি।'

বৈদ্যেরবাজার শান্তি কমিটি আয়োজিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন এ এস এম সোলায়মান। সোলায়মান তার বক্তব্যে বলেন, হিন্দুদের শোষণের হাত থেকে মুক্ত হওয়ার জন্যে মুসলমানরা পাকিস্তান সৃষ্টি করেছিলো। আমরা আর দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ হতে পারি না। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন বৈদ্যেরবাজার শান্তি কমিটির আহ্বায়ক শামসুল হক।

আজ তেজগাঁও ইউনিয়নের তেজতুরী বাজারে শান্তি কমিটির উদ্যোগে তেজগাঁও পলিটেকনিক প্রাইমারী স্কুলের সভায় বক্তব্য রাখেন মাহবুবুর রহমান গুরহা, এডভোকেট এস এম জহিরুদ্দিন, ড. এ এম খান, ফকির আবদুল মান্নান। আজ শান্তি কমিটির উদ্যোগে চাঁদপুরে স্বাধীনতাবিরোধীরা মিছিল করে। মিছিলে নেতৃত্ব দেন স্থানীয় শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান এম এ সালাম।

তথ্যসূত্র : দৈনিক পাকিস্তান, সংগ্রাম, পূর্বদেশ ৪, ৫, ৬ ও ৮ মে '৭১। একাত্তরের ঘাতক ও দালালরা কে কোথায়।

৫ মে, বুধবার

আজ ধামরাই থানায় শান্তি ও কল্যাণ পরিষদের ইউনিট গঠিত হয়। স্বাধীনতাবিরোধীরা মোজাম্মেল হককে সভাপতি এবং শমসের আলীকে সেক্রেটারি করে ১০৮ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করে। কমিটির সদস্যরা সিদ্ধান্ত নেয় সার্বিকভাবে সেনাবাহিনীকে সহযোগিতা করে এলাকা থেকে দুষ্কৃতকারীদের উৎখাত করার। সোহরাওয়ার্দীর মেয়ে আখতার সোলায়মান আজ ঢাকা আসেন। তিনি ঢাকায় আসেন তার বাবার প্রভাব খাটিয়ে বাঙালিদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে। মূলত তার এ মিশনের উদ্দেশ্য ছিলো দোদুল্যমান আওয়ামী লীগ সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করে আলাদা শক্তি গড়ে তোলা।

তথ্য সূত্র : দৈনিক পাকিস্তান, সংগ্রাম ও আজাদ ৫, ৬ ও ৮ মে '৭১।

৬ মে, বৃহস্পতিবার

দেশের সব জায়গা থেকে বিশেষ করে চট্টগ্রাম থেকে দুষ্কৃতকারীদের উৎখাত করার জন্যে সেনাবাহিনীকে অভিনন্দন জানান চট্টগ্রামের সাবেক স্বতন্ত্র এমপিএ আমিনুল ইসলাম। তিনি জানান দুষ্কৃতকারীরা মার্চের শুরু থেকে জনজীবন অতিষ্ঠ করে

তুলেছিলো। সেনাবাহিনী আমাদেরকে রক্ষা করেছে। দুষ্কৃতকারী দমনে পাকিস্তানপ্রিয় জনগণও সেনাবাহিনীর পাশে থেকেছে। আরো সক্রিয়ভাবে তিনি সেনাবাহিনীকে সহায়তা করার আহ্বান জানান।

আজ বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘের সভাপতি বিশুদ্ধানন্দ মহাথেরো এবং নির্বাহক মি জে আর বড়ুয়া জেনারেল হামিদ ও গভর্নর টিক্কা খানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। বিশুদ্ধানন্দ মহাথেরো বৌদ্ধ পূর্ণিমার পরপরই চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, কুমিল্লা ও পটুয়াখালী এলাকা সফর করে বৌদ্ধ সম্প্রদায়কে সংগঠিত করবে বলে জেনারেল হামিদ ও টিক্কা খানকে জানান।

তথ্য সূত্র : দৈনিক পাকিস্তান ও পূর্বদেশ ৬ ও ৭ মে '৭১।

৭ মে, শুক্রবার

আজ বিশিষ্ট মুসলিম লীগ নেতা ও পূর্ব পাকিস্তানের সাবেক মন্ত্রী খান বাহাদুর সৈয়দ মোহাম্মদ আফজালকে প্রেসিডেন্ট করে পিরোজপুর মহকুমা শান্তি কমিটি গঠন করে পুরোদমে কাজ শুরু করে। ইতিমধ্যেই নবগঠিত শান্তি কমিটির সদস্যরা জনমনে স্বস্তি ফিরিয়ে আনার জন্যে কাজ করেছে বলে প্রচার করা হয়।

তথ্য সূত্র : দৈনিক পাকিস্তান, সংগ্রাম ও পূর্বদেশ ৭, ৮ ও ১০ মে '৭১।

১১ মে, মঙ্গলবার

পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রধান নূরুল আমিন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। নূরুল আমিন প্রেসিডেন্টের প্রতি সবিনয় অনুরোধ জানান পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক তৎপরতা বৃদ্ধি করার। পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট ডা. এম মোফাজ্জল আলী এক বিবৃতিতে বলেন, হিন্দুস্তানি দুষ্কৃতকারীদের সহায়তায় নিষিদ্ধ ঘোষিত আওয়ামী লীগের কতিপয় বিচ্ছিন্নতাবাদী তাদের কুমতলব হাসিলের যে চক্রান্ত শুরু করেছে দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনী ও জনগণ যে কোনো মূল্যে তা বানচাল করবে। তিনি পাকিস্তানপন্থীদের এক কাতারে শামিল হওয়ার আহ্বান জানান।

ইতোমধ্যে দেশের বিভিন্ন জেলায় স্বাধীনতাবিরোধীদের তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছে। কিছু দলছুট সুবিধাবাদী ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে জেলায় জেলায় শান্তি কমিটি গঠিত হয়েছে। জানা যায় আজ কুমিল্লার প্রাক্তন এম এন এ আজিজুর রহমান, খুলনার প্রাক্তন এম এন এ এ কে এম ইউসুফ, যশোরের প্রাক্তন এম পি এ সৈয়দ শামসুর রহমান এবং রংপুরের প্রাক্তন এম এন এ সিরাজুল ইসলামকে আহ্বায়ক করে শান্তি কমিটি গঠিত হয়েছে। আরো জানা যায় ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় অধ্যাপক হাবিবুর রহমান এবং চাঁদপুরের প্রাক্তন এম এন এ আলহাজ্ব এম আবদুস সালামের নেতৃত্বে চাঁদপুর মহকুমা শান্তি কমিটি গঠিত হয়েছে। শান্তি কমিটির এ সব নেতারা পাকিস্তান রক্ষার জন্যে নিজেদেরকে উৎসর্গ করবেন বলে অভিমত প্রকাশ করেন।

শান্তি কমিটির এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে আজ শান্তি কমিটির সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগের জন্য ২৫ ৭৭ ৬৫ ও ২৮ ৩২ ৬৬ এই ফোন নম্বর দুটি ব্যবহার করতে জনগণের প্রতি আহ্বান জানানো হয়।

আজ আরো জানা যায় মওলবী কুছুমুদ্দিনকে সভাপতি ও প্রাক্তন এম পি এ মৌলভী আবদুল সাত্তার খানকে সাধারণ সম্পাদক করে নাটোর মহকুমা শান্তি কমিটি গঠন করা হয়েছে। জানা যায় নবাবগঞ্জ থানায় শান্তি কমিটি গঠিত হয় ড. সফিউদ্দিন আহমদ এম বি বি এসকে আহবায়ক করে, বরিশালে এডভোকেট নূরুল, পটুয়াখালীতে এড. একে ফজলুল হক চৌধুরী, টাঙ্গাইলে এডভোকেট জুলমত আলী খান, ময়মনসিংহে মুজিবুল হক এবং নারায়ণগঞ্জ ও আড়াই হাজার থানার শান্তি কমিটি গঠিত হয়েছে বেনজির আহমদকে আহ্বায়ক করে।

এ দিকে পূর্ব পাকিস্তান মুসলীম লীগের সাধারণ সম্পাদক এ এন এম ইউসুফ ও যুগ্ম সম্পাদক মোহাম্মদ শাহ্জাহান মুন্সীগঞ্জ সফর করেন। তারা বিভিন্ন এলাকায় শান্তি কমিটির স্থানীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে যোগাযোগ করে এবং স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সেনাবাহিনীকে অনুরোধ জানান। নেতৃবৃন্দ শান্তি কমিটি নেতাদের সর্বতোভাবে সেনাবাহিনীকে সহায়তা করতে বলেন। আজ পাকিস্তান তানজিম-ই-মিল্লিয়ার সভাপতি হাসিব হাশমি বলেন, বর্তমান সময়ে ক্ষমতা হস্তান্তর না করে ভারতীয় অনুপ্রবেশকারী ও সমাজবিরোধীদের পরিকল্পনা ব্যর্থ করার জন্যে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা চালানো উচিত। তিনি জোর দিয়ে বলেন, তথাকথিত মুক্তিবাহিনী ধ্বংস হবে এবং পাকিস্তান চিরদিন টিকে থাকবে।

তথ্যসূত্র : দৈনিক পাকিস্তান, আজাদ ও সংগ্রাম ১১, ১২ ও ১৫ মে '৭১।

১২ মে, বুধবার

আজ এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানানো হয় ইতিমধ্যে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ২৫টি শান্তি কমিটি গঠিত হয়েছে। ঢাকায় পুরনো মোগলটুলীতে আবদুর রাজ্জাক, কোন্ডা ইউনিয়নে আবদুল হোসেন, সুভাড্যা ইউনিয়নে হাজী আবদুস সামাদ বেপারী, কালিন্দি ইউনিয়নে আবদুল ওয়াদুদ, যাত্রাবাড়ী আব্বাস উদ্দিন আহমদ, দেওয়ান বাজার ইউনিয়ন মোঃ চান্দামিয়া, সিদ্দিক বাজার মোঃ ইয়াকুব আলী, মৌলভীবাজার ইউনিয়ন মোহাম্মদ ইউনুস, নারিন্দা হাফিজ উদ্দিন আহমদ, জিন্দাবাহার মোহাম্মদ সোফি (সজফী), ফরিদাবাদে খন্দকার হাবিবুর রহমান আজিমপুর হাফিজ আবদুল কাসেম, কাওয়ামদিয়া আজিজুর রহমান, সাভার থানায় আবদুল হালিম, শ্যামপুরে ফজলুল করিম, ওয়ারী ইউনিয়ন এ রহিম, টঙ্গিবাড়ীতে মুজিবুর রহমান মল্লিক, আবদুল্লাহপুর ইউনিয়নে আলহাজ্ব তাহের আহমদ, টঙ্গী ইউনিয়নে আবদুল মজিদ সরকার, টঙ্গীবাড়ী থানায় সিরাজুল ইসলাম, নবাবপুরে সৈয়দ মহসিন আলী, ইসলামপুরে মোঃ মোবারক হোসেন, জিঞ্জিরায় মোহাম্মদ হোসেন, চকবাজার ইউনিয়নে আলহাজ তাহের আহমদ এবং চুড়িহাট্টা মহল্লার হাজী সলিমুল্লাহ মিয়াকে আহবায়ক করে ঢাকা শহর মহল্লা শান্তি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এরা জানপ্রাণ দিয়ে নিজ নিজ এলাকায় কাজ করছে। মুন্সীগঞ্জ শান্তি কমিটি গঠিত হয় আবদুল হালিম বিক্রমপুরীকে আহবায়ক করে।

আজিজ সরদারকে আহ্বায়ক করে ১২৪ সদস্য বিশিষ্ট নারায়ণগঞ্জ শান্তি কমিটি গঠন করে মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে কাজ শুরু করে স্বাধীনতাবিরোধীরা। গোদনাইল ইউসিতে আলতাফ হোসেন, হাজিগঞ্জ ইউসি এম এ বাসেত, খানপুর (পশ্চিম) ইউসি লতিফ সর্দার, খানপুর ইউসি সুলতান খান, চাষাড়া ইউসি গোলাম রব্বানী, দেওভোগ জহির হোসেন, নারায়ণগঞ্জে এস এ হালিম, শীতলক্ষ্যায় লালমিয়া, পাইকপাড়ায় আবদুল জলিল, সোনাকান্দা ইউসি ইসাক মিয়া, বন্দর ইউসিতে মোহাম্মদ আলী, কদমরসুল ইউসিতে আলহাজ্ব এ লতিফ, নবীগঞ্জ ইউসি মহিউদ্দিন আহমদ এবং খানপাড়া ইউনিয়নে আলহাজ্ব আবদুর রফিককে আহবায়ক করে পৌর এলাকা শান্তি কমিটি গঠিত হয়।

তথ্য সূত্র : পূর্বদেশ ও দৈনিক পাকিস্তান ১২, ১৩ ও ১৪ মে '৭১।

১৩ মে, বৃহস্পতিবার

আজ পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ অস্থায়ী সভাপতি রুহুল আমিন খান, পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ সংহতির সাংগঠনিক কমিটির আহ্বায়ক এস জেড এম শরিফুল ইসলাম, মুসলিম ছাত্রলীগের জগন্নাথ কলেজ শাখার সভাপতি মহিউদ্দিন আলমগীর এবং মুসলিম ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির বিশিষ্ট নেতা পিয়ার মোহাম্মদ এক যুক্ত বিবৃতিতে বলেন, ভারত আমাদের শত্রু। তার একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে আমাদের ক্ষতি করা এবং এ ব্যাপারে ভারত সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। অচিরেই দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনী ও জনগণ পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষার জন্যে ভারতীয় শত্রুদের নিশ্চিহ্ন করে দেবে।

পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক এ এন এম ইউসুফ ঢাকা শহর মুসলিম লীগের যুগ্ম সম্পাদক শাহজাহানকে সঙ্গে নিয়ে মুন্সিগঞ্জ সফরে গেলে মুন্সিগঞ্জ মহকুমা শান্তি কমিটির আহ্বায়ক আবদুল হাকিম বিক্রমপুরীসহ অনেকে তাদের অভ্যর্থনা জানান। এ দিন রেকারীবাজার ইউনিয়ন শান্তি কমিটির আহবায়ক আবদুল আজিজ এক সভার আয়োজন করেন। এতে সভাপতিত্ব করেন এ এফ এম আকরাম। সাবেক জাতীয় পরিষদ সদস্য আবদুল মতিন ভারতীয় নেতৃবৃন্দকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ পাকিস্তানকে অটুট রাখার জন্যে ভোট দিয়েছে বিচ্ছিন্ন হওয়ার জন্যে নয়। তিনি ভারতকে চক্রান্তবাদী বলে আখ্যায়িত করেন।

তথ্য সূত্র : দৈনিক পাকিস্তান ও সংগ্রাম ১৩ ১৪ ও ১৫, মে '৭১; একাত্তরের ঘাতক ও দালালরা কে কোথায়।

১৪ মে, শুক্রবার

'যে দল পাকিস্তানের আদর্শ ও সংহতিতে বিশ্বাস করে না তার সঙ্গে যুক্ত থাকা সমূচিত নয়' বক্তব্য দিয়ে কক্সবাজার ভাসানী ন্যাপ-এর বিলুপ্তি ঘোষণা করেন মহকুমা ন্যাপের আহ্বায়ক মাহমুদুল হক চৌধুরী। তিনি বলেন, তথাকথিত স্বায়ত্তশাসনের নামে ভারতীয় আধিপত্যবাদকে প্রশ্রয় দেওয়া দেশদ্রোহীতার নামান্তর। তিনি দলমত নির্বিশেষে সবাইকে পাকিস্তান রক্ষায় ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। বিগত জাতীয় পরিষদের সদস্য ও চট্টগ্রাম শিল্প ও বণিক সমিতির সাবেক প্রেসিডেন্ট আমিনুল ইসলাম চৌধুরী বাংলাদেশের সব ঘটনার জন্যে ভারতকে দায়ী করে বলেন, ভারত আমাদের

ভৌগোলিক, জাতীয় ও আধ্যাত্মিক চেতনাকে ধ্বংস করতে চায়। ভারত চক্রান্ত করে পাকিস্তান ভাঙ্গার পাঁয়তারা করছে এবং আওয়ামী লীগকে অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে দেশকে নৈরাজ্যের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। তিনি পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ত্বরিত ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

তথ্য সূত্র : দৈনিক পাকিস্তান ও আজাদ ১৪, ১৫ ও ১৬, মে '৭১।

১৫ মে, শনিবার

আওয়ামী লীগের টিকিটে নির্বাচিত তিনজন এম পি এ পাকিস্তানের সংহতি ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার প্রয়োজনীয়তার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে বলেন, পাকিস্তান এক ও অবিচ্ছিন্ন। দুষ্কৃতকারীদের জঘন্য অভিসন্ধি কখনো সফল হবে না। তারা হলেন যশোরের এম পি এ মোঃ মইনুদ্দিন নিয়াজী, খুলনার এম পি এ হাবিবুর রহমান খান, খুলনার আরো একজন এম পি এ মোঃ সাঈদ। যশোরের অপর একজন নির্দলীয় নেতা এম এ আজিজও অনুরূপ মত প্রকাশ করেন।

পাকিস্তান শান্তি ও কল্যাণ পরিষদের পক্ষ থেকে ফরিদপুর ও বরিশালে শান্তি কমিটি গঠন করা হয় বলে জানা যায়। আজ ফরিদপুর গোসাইরহাট থানা এম পি এ এবং দাসেরজঙ্গল ইউনিয়নের চেয়ারম্যান এরাজুদ্দীন আহমদকে প্রেসিডেন্ট করে থানা শান্তি কমিটি গঠিত হয়। বাকেরগঞ্জ হিজলা থানায় কাজী আলতাফ হোসেনকে সভাপতি করে থানা কমিটি গঠিত হয়।

তথ্য সূত্র : দৈনিক আজাদ ১৫, ১৩ ও ১৮ মে '৭১।

১৯ মে, বুধবার

রংপুরের আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচিত জাতীয় পরিষদ সদস্য নূরুল হক, আজিজুর রহমান ও ডা. আবু সোলায়মান দলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন বলে জানা যায়।

তথ্য সূত্র : দৈনিক পাকিস্তান ১৯ ও ২০ মে '৭১; বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র।

২০ মে, বৃহস্পতিবার

ঢাকার কেরানীগঞ্জ থানার আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আমজাদ হোসেন এবং টাঙ্গাইলের খোদা বক্স দলত্যাগ করে পাকিস্তানের পক্ষে সংহতি প্রকাশ করে। পৃথক বিবৃতিতে তারা জানায়, আওয়ামী লীগ ও ভারতের দুরভীসন্ধিমূলক আচরণে আমরা হতবাক, এই ধরনের কর্মকাণ্ড দেশের জন্য অমঙ্গলজনক।

তথ্য সূত্র : দৈনিক পাকিস্তান ও সংগ্রাম ২০ ও ২১ মে '৭১।

২১ মে, শুক্রবার

মুক্তিযুদ্ধবিরোধী আরেক ব্যক্তি কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির সদস্য কৃষক শ্রমিক পার্টির সভাপতি এ. এস. এম. সোলায়মান '৭১-এর এই দিনে পিরোজপুরে শান্তি কমিটির সভায় মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে সজাগ দৃষ্টি রাখার আহ্বান জানান।

তথ্য সূত্র : দৈনিক পাকিস্তান ২২ ও ২৪ মে '৭১।

২২ মে, শনিবার

১৯৭১-এর এই দিনে যখন একদিকে সাড়ে সাত কোটি বাঙালির ওপর চলছে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বর্বর আক্রমণ, যখন মুক্তিযোদ্ধারা প্রতিরোধ সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, তখন এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী তাদের ব্যবসায়িক স্বার্থসিদ্ধির জন্যে পাকিস্তানিদের পদলেহনের ঘৃণ্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। ২২ মে মেসার্স হাফিজুর রহমান, কে এম খালেক, কাজী আনোয়ারুল হক ও আমীন আহম্মদকে নিয়ে গঠিত শিল্প প্রতিনিধি দল সামরিক জান্তা কুখ্যাত ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। তাদের উদ্দেশ্য ছিলো, তোষামোদী করে নিজেদের সুবিধা আদায় করা। ১৯৭১ সালে সরকারি ভাষ্য ও প্রচার মাধ্যমগুলোর প্রচারণা ছিলো— দেশ আজ শত্রুমুক্ত, জনগণ সেনাবাহিনীকে সময়োচিত হস্তক্ষেপের জন্য অভিনন্দন জানিয়েছে। যেমন আজকের এই দিনে ১৯৭১-এ বলা হয়েছিলো ময়মনসিংহের জনগণ সামরিক বাহিনীকে অভিনন্দন জানিয়েছে। কেননা সেনাবাহিনী আসায় পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়েছে।

এটা ঠিক যে কেউ কেউ সেদিন অভিনন্দন জানিয়েছিলো। তবে তারা জনগণ নয়। পাকিস্তানি ঘাতক বাহিনীর এদেশীয় দোসর। সেনাবাহিনীর ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞে বিরাট জনবসতির পরিস্থিতি শান্ত থাকারই কথা! সে সময় মুক্তিযোদ্ধারা যেমন আমরণ লড়াইয়ে নিয়োজিত ছিলেন তেমনি সক্রিয় ছিলো পাকিস্তানি দালালেরাও। ২২ মে আবদুর রবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয় বরিশাল শান্তি কমিটির সভা। এ সভায় সেদিন পাকিস্তানি হানাদারদের সপক্ষে বক্তব্য রেখেছিলো শমসের আলী, ইসলাম শিকদার, আবুল হোসেন, গোলাম কুদ্দুস প্রমুখ।

তথ্য সূত্র : দৈনিক পাকিস্তান ২৩ মে '৭১।

২৪ মে, রবিবার

স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলাদেশের ছাত্র সমাজের ভূমিকা ছিলো অগ্রগণ্য। কিন্তু সে সময় এক শ্রেণীর ছাত্র নামধারী পাকিস্তানের দালালও সক্রিয় ছিলো। মুসলিম ছাত্রলীগের সভাপতি মোহাম্মদ আবদুর রহমান এবং সম্পাদক এ কে এম আইয়ুব এদের মধ্যে অন্যতম। ২৪ মে এরা স্বাধীনতা সংগ্রামে ছাত্রসমাজ তথা আপামর জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণকে অস্বীকার করে বলেন, 'এটা আসলে ভারতের চক্রান্ত। ভারত আগেও চক্রান্ত করেছে, এখনো করছে।'

শুধু এরাই নয়, হানাদার বাহিনীর বর্বরতাকে এ দিন অভিনন্দন জানায় মুসলিম লীগ সদস্য হাবিব ফকির। তার মতে, সামরিক বাহিনীর হস্তক্ষেপের জন্যেই দেশ রক্ষা পেয়েছে। হানাদার বাহিনীকে সহায়তা করার জন্যে তিনি জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

স্বাধীনতাবিরোধীরা এ সময় জনগণের ঐক্যবদ্ধতায় ভীত হয়ে তাদের দ্বিধাবিভক্তির জন্যে তৎপর হয়ে ওঠে। ২৪ মে জি এম খানের সভাপতিত্বে দিলু রোডে অনুষ্ঠিত হয় শান্তি কমিটির সভা। সভায় মুক্তিযোদ্ধাদের ধ্বংস করার জন্যে আহ্বান জানানো হয়।

একই দিনে শান্তি কমিটির এক সভা আলহাজ সিরাজউদ্দীনের সভাপতিত্বে রোকনপুরে অনুষ্ঠিত হয়। এখানেও একই রকম পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করা হয়।

তথ্য সূত্র : দৈনিক পাকিস্তান ২৪, ২৫ ও ২৬ মে '৭১।

২৬ মে, বুধবার

পটুয়াখালীতে তখন একদিকে পাকসেনাদের বর্বরতা, অন্যদিকে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিরোধ সংগ্রাম চলছে। অথচ ২৬ মে পটুয়াখালীতে পরিস্থিতি স্বাভাবিক বলে পাকিস্তানিরা তাদের প্রচারমাধ্যম দৈনিক পাকিস্তানে সংবাদ পরিবেশন করে। 'চট্টগ্রামে কোনো উত্তেজনা নেই' বলে মন্তব্য করেন শান্তি কমিটির নেতা আবু সালেক খান চট্টগ্রাম সফর শেষে। তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের ধ্বংস করার দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

তথ্য সূত্র : দৈনিক পাকিস্তান ২৭ মে '৭১।

২৮ মে, শুক্রবার

বাঙালি রাজনীতিকদের মধ্যেও এ সময় কেউ কেউ মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে ভূমিকা রাখে। ২৮ মে চাপড়া শাখা আওয়ামী লীগের ভাইস প্রেসিডেন্ট আবদুল আউয়াল আওয়ামী লীগের সঙ্গে সম্পর্কোচ্ছেদ করেন। তিনি তার সপক্ষ ত্যাগের কারণ হিসেবে উল্লেখ করেন, 'আওয়ামী লীগ তার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে। নির্বাচনের সময় আওয়ামী লীগ অখণ্ড পাকিস্তানের ধারণা প্রচার করেছিলো। জনগণ ইসলামী আদর্শ ও গণতান্ত্রিক সমাজ কায়েমের পক্ষে ভোট দিয়েছিলো। কিন্তু নির্বাচনের পরে ভারতের প্রচারণায় আওয়ামী লীগ দেশ বিভক্ত করতে চায়। একজন দেশপ্রেমিক এবং মুসলমান হিসেবে এটা সমর্থন করতে পারি না।'

স্বাধীনতাবিরোধীরাও সক্রিয় ছিলো পুরোমাত্রায়। ২৮ মে সাইদুল হককে আহ্বায়ক করে গঠিত হয় নোয়াখালী জেলা শান্তি কমিটি। নোয়াখালী মহকুমায় স্বাধীনতাবিরোধীরা এদিন সংগঠিত হয় গোলাম মোস্তফার নেতৃত্বে।

তথ্য সূত্র : দৈনিক পাকিস্তান ২৯ মে '৭১।

২৯ মে, শনিবার

পাকিস্তানি বাহিনীর বর্বরতার প্রথম শিকার ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকেরা। ২৫ মার্চের সেই ভয়াল রাতে যেসব ছাত্র-শিক্ষক প্রাণে বেঁচে যান তারা পালিয়ে যান গ্রামের দিকে। ২৯ মে ঘাতকরা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা পরিস্থিতি 'স্বাভাবিক' দেখানোর জন্যে গঠন করে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. সেয়দ সাজ্জাদ হোসেনকে চেয়ারম্যান করে 'শিক্ষা পুনর্বিন্যাস কমিটি'।

শান্তি কমিটি, রাজাকার বাহিনী গঠন করে পাকিস্তানের দালালেরা এ সময় অপপ্রচার চালায়, নিরীহ জনসাধারণের ওপর অত্যাচার অব্যাহত রাখে। ২৯ মে কোম্পানীগঞ্জে শান্তি কমিটির এক সভায় বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় নেতা এ জে খদ্দর।

তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের সমূলে ধ্বংস করার জন্যে পাকিস্তানি হানাদারদের সর্বাত্মক সহযোগিতা করার আহ্বান জানান স্বাধীনতাবিরোধীদের প্রতি। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বীরগাঁও ইউনিয়নের চেয়ারম্যান এবং পাকিস্তান কাউন্সিল মুসলিম লীগের সদস্য আবু নাসেরের নেতৃত্বে ২৯ মে মুক্তিযোদ্ধাদের কাছ থেকে কেড়ে নেয়া হয় ৬টি রাইফেলসহ বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্র। নির্মমভাবে অত্যাচার করে তাদের। এই মুক্তিযোদ্ধাদের কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি পরে। এই দিন খলিলউদ্দীন শিকদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয় লৌহজং শান্তি কমিটির সভা। পিরোজপুরে দালালদের এক সভায় খান বাহাদুর সৈয়দ মোহাম্মদ মুক্তিযোদ্ধা এবং আওয়ামী লীগকে বিচ্ছিন্নতাবাদী ও বিশ্বাসঘাতক বলে উল্লেখ করেন।

তথ্য সূত্র : দৈনিক পাকিস্তান ৩০ মে '৭১।

৩০ মে, রবিবার

পাকিস্তানিদের পদলেহন ও মনোরঞ্জনের জন্যে ৩০ মে সাত্তার কারোয়ারদিয়ার নেতৃত্বে দেশের একটি ব্যবসায়ী দল করাচিতে যায়। জীবন বাঁচানোর তাগিদে এবং সুবিধাবাদী চরিত্র থাকায় অনেকেই এ সময় হানাদারদের পক্ষে কথা বলা শুরু করে। ৩০ মে বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ নেতা জাতীয় পরিষদ সদস্য নুরুল ইসলাম আওয়ামী লীগের সঙ্গে সম্পর্কোচ্ছেদ করেন। দেশের ওই সময়ের পরিস্থিতি সম্পর্কে তিনি বলেন, 'ভারতীয় চক্রান্তে রাষ্ট্রবিরোধীরা এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে যে একজন দেশপ্রেমিক হিসেবে এর বিরোধিতা না করে পারি না। আমি আওয়ামী লীগের বিচ্ছিন্নতাবাদী পরিকল্পনার ব্যাপারে সচেতন ছিলাম না।'

মুক্তি সংগ্রামকে নস্যাৎ করার জন্যে তৎপর পাকিস্তানের দালালেরাও থেমে ছিলো না। জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্যে এবং স্বাধীনতাবিরোধীদের সংগঠিত করতে তারা সারাদেশে সফর করা অব্যাহত রাখে। শান্তি কমিটির সিনিয়র সদস্য এ জে খদ্দর চট্টগ্রাম-নোয়াখালীসহ দেশের দক্ষিণাঞ্চল সফর করেন। তিনি সেখানকার দালালদের মধ্যে ৩০ মে ঘোষণা করেন, 'এসব এলাকার জনগণ সামরিক বাহিনীর সময়োচিত হস্তক্ষেপে কৃতজ্ঞ ও আনন্দিত।' আসলে জনগণ মোটেও কৃতজ্ঞ ও আনন্দিত ছিলো না তা আজ প্রমাণিত সত্য। প্রকৃতপক্ষে কৃতজ্ঞ ও আনন্দিত ছিলো পাকিস্তানি দালালেরা।

তথ্য সূত্র : দৈনিক আজাদ, দৈনিক পূর্বদেশ ৩১ মে '৭১।

৩১ মে, সোমবার

ভারত লোক পাঠিয়েছে, দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে, আওয়ামী লীগের নেতারা ভারতে বসে রাজকীয় জীবন কাটাচ্ছে আর মাঝে মাঝে কিছু দুষ্কৃতকারী পাঠিয়ে দেশের মানুষের ওপর অত্যাচার করছে— এসব মিথ্যাচার করে '৭১-এর এই দিনে বাঙালিদের বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টা করেন হানাদার বাহিনীর অন্যতম সহযোগী এ এন এম ইউসুফ। সারাদেশের স্বাধীনতাবিরোধী দালালদের সংগঠিত করার জন্যে তিনি ৩১ মে নবাবগঞ্জ, রাজশাহীসহ উত্তরবঙ্গ সফর শেষ করেন। তিনি বলেন, নিজেদের স্বার্থেই আমাদের হানাদার বাহিনীকে আরো ব্যাপকভাবে সহায়তা করতে হবে।

তথ্য সূত্র : দৈনিক পাকিস্তান ১, ২ ও ৩ জুন '৭১।

১ জুন, মঙ্গলবার

পাকিস্তান শান্তি ও কল্যাণ কাউন্সিলের সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা নূরুজ্জামান এদিন ঢাকার দিলকুশায় 'শান্তি কমিটি' গঠন করেন। ৩০ সদস্যবিশিষ্ট এ কমিটির সভাপতি ও সম্পাদক মনোনীত হন জামশেদ আলী ও আমীর বক্‌শ।

তথ্য সূত্র : দৈনিক পাকিস্তান ২ ও ৩ জুন '৭১।

২ জুন, বুধবার

সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে নির্বাচিত আওয়ামী লীগকে বেআইনী ঘোষণা করে, শেখ মুজিবুর রহমানকে জেলে রেখে, বাঙালিদের ওপর হানাদার বাহিনী লেলিয়ে দিয়ে ইয়াহিয়া ভাঁওতাবাজি করতে থাকে ক্ষমতা হস্তান্তরের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে। আর এই বক্তব্যকে স্বাগত জানিয়ে শান্তি কমিটির নেতা মোঃ মনসুর আলী ২ জুন বলেন, 'প্রেসিডেন্ট তার সুবিধাজনক সময়ে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ— এটা জেনে আমি খুবই আনন্দিত।'

প্রতিদিন, প্রতিনিয়ত এই দালালরা সক্রিয় ছিলো মুক্তিযুদ্ধকে ধ্বংস করে দিতে। ২ জুন আলহাজ শামসুদ্দিনকে সভাপতি করে গঠিত হয় পটুয়াখালী শান্তি কমিটি। শামসুদ্দিন তার বক্তব্যে বলেন, সামরিক বাহিনীর সময়োচিত হস্তক্ষেপে দেশ বেঁচেছে। কাজেই তাদের আমাদের অভিনন্দন জানানো এবং সহায়তা করা উচিত।

তথ্য সূত্র : দৈনিক পাকিস্তান ২, ৩ ও ৫ জুন '৭১।

৩ জুন, বৃহস্পতিবার

বাঙালিদের পরাজিত করার জন্যে '৭১-এ সক্রিয় পাকিস্তান পিপল্‌স পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো এবং কৃষক শ্রমিক পাটির এস এম সোলায়মান রুদ্ধদ্বার বৈঠকে মিলিত হন এদিন। বৈঠকশেষে তারা জানান, বিভিন্ন বিষয়ে তাদের মধ্যে মতৈক্য তৈরি হয়েছে। বলাই বাহুল্য, এ বিষয়গুলো ছিলো বাঙালিদের মুক্তিসংগ্রাম স্তব্ধ করার বিভিন্ন অপকৌশল। কেননা উভয়েরই লক্ষ্য ছিলো বাঙালি জাতীয়তাবাদকে স্তব্ধ করা। লজ্জাজনক হলেও সত্য, পরবর্তীতে এই এস এম সোলায়মান রাজনীতিতে পুনর্বাসিত হয়েছেন এবং তার সঙ্গে বৈঠক করেছেন আমাদেরই মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের অনেক বিজ্ঞ রাজনীতিবিদরা।

স্বাধীনতা সংগ্রামের চালিকাশক্তি ছাত্রসমাজ ও বুদ্ধিজীবী শিক্ষকদের ওপর যুদ্ধের শুরুতেই নেমে এসেছিলো নির্যাতন ও বর্বরতা। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো পরিণত হয় ধ্বংসস্তূপে। কিন্তু ৩ জুন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮৩ জন শিক্ষক 'পাকবাহিনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্ষয়ক্ষতি ও অত্যাচার করেছে'— এ সংবাদের প্রতিবাদে বিবৃতি দেন। তারা বলেন, সেনাবাহিনী অত্যন্ত নম্র আচরণ করেছে। বলাবাহুল্য, সেনাবাহিনীর 'এই নম্র আচরণের' কারণেই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. হাবিবুর রহমান, মীর আবদুল কাইয়ুম ও সুখরঞ্জন সমাদ্দারকে জীবন দিতে হয়— যা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের এই দালাল শিক্ষকরা সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন।

তথ্য সূত্র : দৈনিক পাকিস্তান ও ইত্তেফাক ৩, ৪ ও ৫ জুন '৭১।

৪ জুন, শুক্রবার

বাঙালিদের বিভ্রান্ত করার জন্যে হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর কন্যাকে সামনে রেখে এই দিন পাকিস্তানের ঘাতকরা ঘোষণা করে নতুন একটি রাজনৈতিক দল গঠনের কথা। বেগম আখতার সোলায়মান ঢাকায় উপস্থিত থেকে বাঙালিদের প্রতিনিয়ত বিভ্রান্ত করতে থাকেন। তার সভানেত্রীতে অনুষ্ঠিত সভায় পরিকল্পনা নেয়া হয় দল গঠনের। পরিকল্পনাকারীদের মধ্যে ছিলেন আওয়ামী লীগের জহিরুদ্দিন, সারওয়ার, বেগম বদরুন্নেসা আহম্মদ, নূরুল ইসলাম, ফয়জুল হকসহ ১৫ জন নেতা। ৪ জুন জামায়াতে ইসলামীর অস্থায়ী আমীর মিয়া তোফায়েল এবং মৌলভী ফতেহ এলাহী মোহাম্মদ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। আর কাউন্সিল মুসলিম লীগের সহ-সভাপতি ও কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির নেতা এ কিউ এম শফিকুল ইসলাম পাঞ্জাব মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক খাজা মোহাম্মদ সফদরকে নিয়ে ঘুরে বেড়ান দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘাতক দালালদের সংগঠিত করার জন্যে।

দেশের বৌদ্ধ সম্প্রদায়কে বিভ্রান্ত করতে তথাকথিত বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘের নেতা বিশুদ্ধানন্দ মহাথেরো দেশব্যাপী সফর করতে থাকেন আর প্রচারণা চালান হানাদারদের সপক্ষে। দীর্ঘ ১৭ দিন সফর করে এসে তিনি বলেন, 'পাঁচ লাখ বৌদ্ধের প্রিয় মাতৃভূমি পাকিস্তান। চিরদিন পাকিস্তান বৌদ্ধদের পবিত্র স্থান হয়েই থাকবে। বৌদ্ধরা শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে দেশকে দুষ্কৃতকারীদের হাত থেকে রক্ষা করবে।'

তথ্য সূত্র : দৈনিক পাকিস্তান ৫, ৬ ও ৭ জুন '৭১।

৫ জুন, শনিবার

'৭১-এর এই দিনে সোহ্‌রাওয়ার্দী কন্যা বেগম আখতার সোলায়মান টেলিভিশনে সাক্ষাৎকার দেন মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করে। 'গণতন্ত্রের মানসপুত্র' বলে পরিচিত সোহ্‌রাওয়ার্দীর ভাবমূর্তিকে কাজে লাগানোর জন্যে হানাদাররা তাকে ব্যবহার করে। আওয়ামী লীগের সুবিধাবাদী অংশকে সংগঠিত করে বাঙালিদের মধ্যে দ্বিধাবিভক্তি আনার জন্যে এ সময় তিনি ঢাকা অবস্থান করে সক্রিয়ভাবে কাজ করতে থাকেন। '৭০-এর নির্বাচনের মধ্যদিয়ে প্রতিফলিত বাঙালির আশা-আকাঙ্ক্ষাকে উপেক্ষা করে ৫ মে বেগম আখতার সোলায়মান ঢাকায় টেলিভিশনে বলেন, 'অধিকাংশ আওয়ামী লীগের সদস্যরাই আওয়ামী লীগের বিচ্ছিন্নতাবাদী পরিকল্পনার কথা জানতেন না।' তিনি বলেন, 'আমরা জানি জনগণ নির্বাচনের সময় অধিকতর শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ পাকিস্তান গড়ে তোলার লক্ষ্যেই আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়েছিলো।'

ছয় দফার ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, 'ছয় দফা হচ্ছে অধিকতর স্বায়ত্তশাসনের দাবি মাত্র। এ থেকেই আমার বিশ্বাস জন্মেছে যে, জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের অধিকাংশ সদস্য এক ও অখণ্ড পাকিস্তানের বিশ্বাসী'। মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে ভারতের ভূমিকার নিন্দা করে তিনি বলেন, 'ভারত উদ্বাস্তুদের নাম করে বিদেশ থেকে সাহায্য এনে নিজের স্বার্থ উদ্ধার করেছে। অধিকাংশ বাঙালিই দেশে থেকে সেনাবাহিনীকে সহায়তা করছে।

মুষ্টিমেয় লোক দুষ্কৃতকারীদের প্ররোচনায় 'ভারতে' আশ্রয় নিয়েছে। কাজেই উদ্বাস্তুদের হিসেব ঠিক নয়।'

তথ্য সূত্র : দৈনিক পাকিস্তান ৬ ও ৭ জুন '৭১।

৬ জুন, রবিবার

মওদুদীর মতোই পিডিপি আঞ্চলিক শাখার সেক্রেটারি ও কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির সদস্য এডভোকেট জলিল কুমিল্লা সফর শেষে বলেন, 'এ অঞ্চলে ভারতীয় অনুপ্রবেশকারী ও দুষ্কৃতকারীদের অত্যাচারে জনগণের জীবনযাত্রা অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে। তবে সেনাবাহিনীর আগমনে তা অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে এসেছে।'

৬ জুন বরিশালের শান্তি কমিটির দালালদের সঙ্গে যোগাযোগ করে ঢাকা ফিরে আসেন শান্তি কমিটির কেন্দ্রীয় নেতা এ এ কে ফজলুল হক চৌধুরী। অন্যদিকে তিন মুসলিম লীগকে এক করে সংঘবদ্ধভাবে ঘাতকদের দালালি করার জন্যে ৬ সদস্যের একটি কমিটি করা হয়।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বামপন্থীদের একটি অংশও তাদের তথাকথিত ভারত বিরোধিতার নামে পাকিস্তানের দালালি করেছিলেন সেই সময়। হেলসিংকিতে অনুষ্ঠিত তথাকথিত সমাজতন্ত্রীদের 'সোসালিস্ট ইন্টারন্যাশনাল' সম্মেলনে ভারতের সমাজবাদী নেতা শ্রী জয়প্রকাশ নারায়ণকে বক্তব্য দিতে দেয়া হয়নি। কেননা তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষে কথা বলতেন।

তথ্য সূত্র : দৈনিক পাকিস্তান ৬, ৭ ও ৮ জুন '৭১।

৭ জুন, সোমবার

মুক্তিযুদ্ধের তীব্রতায় ভীত দোদুল্যমান সুবিধাবাদী অনেকেই এ সময় পাকিস্তানি হানাদারদের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে। আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচিত এমপি চট্টগ্রামের অধ্যাপক শামসুল হক সপক্ষ ত্যাগ করে হানাদার শিবিরে যোগ দিয়েছিলেন। ৭ জুন তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে আওয়ামী লীগের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। তিনি বলেন, 'নির্বাচনের পর যেসব ঘটনা ঘটেছে তাতে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, শেখ মুজিবসহ বেআইনী ঘোষিত আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার স্বপ্নে বিভোর হয়ে মানুষের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। আগে জানলে আমি এই সব দেশের শত্রুদের সঙ্গে হাত মেলাতাম না।

ঘাতক দালালরা নিজেদের সংগঠিত করার কাজও অব্যাহত রেখেছিলো। কেননা মুক্তিযোদ্ধাদের ক্রমাগত সংঘবদ্ধতায় তারা হয়ে উঠেছিলো আতংকিত। ৭ জুন ডা. হাবিবুর রহমানের সভাপতিত্বে শান্তি কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয় বগুড়া সেন্ট্রাল হাই স্কুল মাঠে। বক্তারা মুক্তিযোদ্ধাদের দুষ্কৃতকারী হিসেবে চিহ্নিত করে এদের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করার আহ্বান জানান।

এই দিনে খান ফজলে রব চৌধুরী, এম এন এ নূরুল ইসলাম সিকদার প্রমুখের নেতৃত্বে সংগঠিত হয় ঝালকাঠির স্বাধীনতাবিরোধীরা। তারা সিদ্ধান্ত নেন 'যারা মুক্তিযুদ্ধের কথা বলবে তাদেরকেই ধরতে হবে।'

তথ্য সূত্র : দৈনিক পূর্বদেশ ও আজাদ ৮, ৯ ও ১১ জুন '৭১।

৮ জুন, মঙ্গলবার

৮ জুন আওয়ামী লীগের বগুড়া থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য হাবিবুর রহমান দল ত্যাগ করে 'একজন খাঁটি মুসলমান ও পাকিস্তানি হিসেবে দেশসেবার' শপথ নেন। তিনি বলেন, মাত্র তিন মাস আগে তিনি রাজনীতি শুরু করেছেন এবং আওয়ামী লীগের বিছিন্নতাবাদী গোপন ষড়যন্ত্র সম্পর্কে তার কোনো ধারণা ছিলো না। ২৫ মার্চের বর্বর হামলা ও তার পরের গণহত্যাকে তিনি 'ইয়াহিয়া খানের নেতৃত্বাধীন সেনাবাহিনীর সময়োচিত হস্তক্ষেপ' বলে উল্লেখ করেন। নারায়ণগঞ্জের মুসলিম লীগ নেতা মোহাম্মদ আলীর সভাপতিত্বে এ দিন তার বাসভবনে অনুষ্ঠিত হয় শান্তি কমিটির সভা। তথাকথিত সমাজকর্মী ফয়জুল হক, হাবিবুর রহমান, ফজলুল হক প্রমুখ এতে বক্তব্য রাখেন। তারা বলেন, ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দুদের ঘৃণ্য কার্যকলাপের বিরুদ্ধে পাকবাহিনীর সময়োপযোগী হস্তক্ষেপের ফলে শত্রুরা চিরতরে বিতাড়িত হয়েছে এবং হিন্দুস্তানের দাসত্ব শৃংখলের অভিশাপ থেকে রক্ষা পেয়েছে। পাড়া-মহল্লায় শান্তি কমিটির বাণী পৌঁছে দেওয়ার জন্যে দুষ্কৃতকারীদের প্রতিরোধ করতেও সভাপতি বিশেষ আহ্বান রাখেন।

তথ্য সূত্র : দৈনিক আজাদ ও পাকিস্তান ৯, ১০ ও ১১ জুন '৭১।

৯ জুন, বুধবার

বাংলাদেশের রাজনীতিতে এখন যেসব রাজাকার, আলবদর ও ঘাতকদের দালালরা পুনর্বাসিত হয়েছেন মুসলিম লীগ নেতা আয়েন উদ্দীন তাদের অন্যতম। '৮৬-র অবৈধ সংসদে মুসলিম লীগের সংসদীয় দলের নেতা ছিলেন তিনি। '৭১-এ উত্তরবঙ্গের ত্রাস হিসেবে পরিচিত আয়েন উদ্দিন শান্তি কমিটির রাজশাহী শাখার অন্যতম নেতা ছিলেন। ৯ জুন আয়েন উদ্দিনের অন্যতম সহযোগী রাজশাহী মুসলিম লীগের (কাউন্সিল) সেক্রেটারি আবদুল মান্নান রাজশাহীর পরিস্থিতি সম্পর্কে বিবৃতি দেন যে, 'দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনীর আগমনের পর এখানকার জনমনে পূর্ণ নিরাপত্তা ফিরে এসেছে।' রাজশাহীতে তখন কি পরিস্থিতি ছিলো তার প্রমাণ পদ্মাপারের বধ্যভূমি আর বিশ্ববিদ্যালয় রেলস্টেশনের কাছের গণকবর।

'৭১-এর মার্চ থেকেই স্বাধীনতাকামী শ্রমিকরা কলকারখানায় অসহযোগ আন্দোলন শুরু করে। মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানিরা চেষ্টা চালায় কলকারখানার পরিস্থিতি স্বাভাবিক দেখানোর। এরই সূত্র ধরে ৯ জুন শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি ঘাতক পাকবাহিনীর সহযোগী সাইফুর রহমান শ্রমিকদের কাজে যোগ দেয়ার নির্দেশ দেন।

একটি শ্রেণী এ সময় 'আওয়ামী এ্যাকশান কমিটি' গঠনের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করে। এ্যাকশান কমিটির সভাপতি মীর ওয়াইজ মোহাম্মদ ফারুক দেশের সার্বিক অবস্থার জন্যে মুক্তিযোদ্ধাদের দায়ী করেন। তাদের চিহ্নিত করেন খুনী, বিচ্ছিন্নতাবাদী, অগ্নিসংযোগকারী হিসেবে।

এইদিন কাজী তসাদ্দক আলী ও এ এফ এম ইসাকের নেতৃত্বে সংগঠিত হয় ময়মনসিংহের নান্দালে স্বাধীনতাবিরোধী চক্র। আর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর

গুণকীর্তন করে বিবৃতি দেন মাগুরা আওয়ামী লীগের ভাইস প্রেসিডেন্ট মীর তয়াদ হোসেন।

দেশের ভেতর তখন বাঙালিরা অসহায় ও গণহত্যার শিকার। অন্যদিকে পাকিস্তানের দালালরা মেতে উঠেছে ক্ষমতা ভাগাভাগির ষড়যন্ত্রে। এদিন খাজা খয়ের উদ্দিন এবং শফিকুল ইসলাম পিন্ডিতে পাকিস্তানের অখণ্ডতা ও আদর্শের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ শাসনতান্ত্রিক ফর্মুলা উদ্ভাবনের উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনার কথা বলেন।

তথ্য সূত্র : দৈনিক পাকিস্তান ও আজাদ ৯, ১০, ১১ ও ১২ জুন '৭১।

১০ জুন, বৃহস্পতিবার

বিভ্রান্ত করার অপকৌশলের পাশাপাশি সারাদেশে দালালরা নিজেদের সংগঠিত করার প্রক্রিয়াও অব্যাহত রাখে। এ সময় সারাদেশে পাকিস্তানের জয়গান গেয়ে বেড়াচ্ছিলেন কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির অফিস সেক্রেটারি নূরুল হক। তিনি ১০ জুন সফর করেন পাবনা ও রাজশাহীতে।

অন্যদিকে কিশোরগঞ্জে অনুষ্ঠিত হয় শান্তি কমিটির সভা। মহকুমা শান্তি কমিটির নেতা মোসলেম উদ্দীন বলেন, 'জনগণ পাকিস্তানের সংহতি ও কল্যাণের জন্যে রক্ত দিয়ে সংগ্রাম করবে।' কিন্তু ইতিহাসে লেখা আছে লাখ লাখ লোকের রক্ত নিয়ে অপচেষ্টা চালানো হয়েছে পাকিস্তানের তথাকথিত সংহতি রক্ষা করার, তবুও জনগণ প্রতিরোধ করেছে বর্বরদের। শান্তি কমিটির অত্যাচারে এ সময় মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে ফরিদপুরের খানখানাপুরে। পাকিস্তানি হানাদারদের এই বর্বর আক্রমণ, গণহত্যা আর নির্যাতনে অসংখ্য বাঙালি প্রতিনিয়ত চলে যাচ্ছিলেন ভারতের দিকে। অথচ সে সময় প্রতিদিন প্রচার করা হতো শরণার্থীদের দেশে ফিরে আসার কথা।

তথ্য সূত্র : দৈনিক আজাদ ১১ ও ১২ জুন '৭১।

১১ জুন, শুক্রবার

সমাজের সর্বস্তর থেকেই পাকিস্তানি ঘাতকদের দালালরা '৭১-এ অপচেষ্টা চালিয়েছিলো বাঙালিদের আরো বেশি করে গণহত্যা আর ধ্বংসযজ্ঞের মধ্যে ঠেলে দিতে। আইনজীবীরা, যারা দেশের সত্য প্রকাশের অধিকারকে শাশ্বত করার দায়িত্বে নিয়োজিত, তাদের একটি অংশও এ সময় পদলেহনে মেতে ওঠে। ১১ জুন আইনজীবী জুলমত আলী বলেন, 'আওয়ামী লীগ জনগণের বিপুল ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছে এটা ঠিক নয়। আওয়ামী লীগ জনগণকে ধোঁকা দিয়ে ভোট নিয়েছে। তারা উস্কানিমূলক বক্তব্য দিয়ে কিছু সংখ্যক বিচ্ছিন্নতাবাদীকে ক্ষেপিয়ে তুলেছে। এসব দুষ্কৃতকারীদের অত্যাচারে জনজীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে।' জুলমত আলী বলেন, 'সেনাবাহিনী ২৫ মার্চ হস্তক্ষেপ না করলে বিশ্বের মানচিত্র থেকে অখণ্ড পাকিস্তানের নাম মুছে যেতো। সেনা বাহিনী হিন্দু ও আওয়ামী বিচ্ছিন্নতাবাদীদের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করেছে।'

যারা মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়কে অংকুরেই বিনষ্ট করতে চেয়েছিলেন, শান্তি কমিটির আহ্বায়ক খাজা খয়েরউদ্দিন ও অন্যতম সংগঠক সফিকুল

ইসলাম তাদের মধ্যে অন্যতম। ১১ জুন এই দু'জন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সঙ্গে দেখা করেন। গণহত্যায় নেতৃত্বদানকারী ইয়াহিয়ার প্রতি পূর্ণ আস্থা প্রকাশ করে তারা বলেন; 'প্রেসিডেন্ট বাঙালিদের সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্তই গ্রহণ করবেন।'

স্বাধীনতাবিরোধীদের মধ্যে পাকিস্তানিবোধ জাগানোর জন্যে পাকিস্তান কল্যাণ ও শান্তি পরিষদ ১৪ আগস্ট থেকে জাতীয় সংহতি, কল্যাণ ও ইসলামী ভ্রাতৃত্ব সপ্তাহ পালনের সিদ্ধান্ত নেয়। এইদিন প্রচার করা হয় আরও শরণার্থী ফিরে আসার মিথ্যা খবর। আর জাতিসংঘের উদ্বাস্তু বিষয়ক কমিশনারকে দেখানোর জন্যে গ্রামের লোকজনকে নিয়ে আসা হয় উদ্বাস্তু হিসেবে। শান্তি কমিটির অব্যাহত প্রক্রিয়া হিসেবে ১১ জুন খলিলুর রহমানের সভাপতিত্বে স্বাধীনতাবিরোধীরা মিলিত হয় খানখানাপুরে। শান্তি কমিটির এ্যাকশনকে আরো বাড়ানোর আহ্বান জানান ফরিদপুর জেলা আহ্বায়ক আফজাল হোসেন।

তথ্য সূত্র : দৈনিক পাকিস্তান ও আজাদ ১২, ১৩ ও ১৪ জুন '৭১।

১২ জুন, শনিবার

'৭১-এর এই সময়ে পাক হানাদার বাহিনীকে সহায়তা করার জন্যে বিভিন্ন রকম অপকৌশল বেছে নিয়েছিলো দালালরা। আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরে ফাটল ধরানোর জন্যে প্রচণ্ড তৎপর হয়ে ওঠেন সোহরাওয়ার্দী কন্যা বেগম আখতার সোলায়মান। কিছু আওয়ামী লীগারকে নিয়ে আলাদা দল গড়ারও উদ্যোগ নেন তিনি। ১২ জুন আক্তার সোলায়মান বক্তব্য রাখেন রেডিও পাকিস্তানে। ভাষণে তিনি প্রাদেশিক ও জাতীয় পরিষদের সদস্যদেরকে নিজ নিজ এলাকায় জনগণের মধ্যে পাকিস্তানের আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা স্থাপনের জন্যে কাজ করার আহ্বান জানান। বাঙালিদের কাছে টিক্কা খান ছিলো আতংকের মূর্ত প্রতীক। টিক্কা খানের নারকীয় অত্যাচার বিশ্ব বিবেককে করেছিলো আতংকিত। অথচ আখতার সোলায়মান এই দিনে "টিক্কা খান দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠায় ঠিক ব্যবস্থা নিয়েছে" বলে উল্লেখ করেন।

ধর্মের নামে রাজনীতি করা দলগুলো ক্রমেই নিজেদের জনবিচ্ছিন্নতা বুঝতে পারছিলো। আর সে কারণে তারা চেষ্টা করেছিলো নিজেদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার। এ সময় কাউন্সিল মুসলিম লীগ প্রধান খাজা খয়েরউদ্দীন অবস্থান করছিলেন পাকিস্তানে। তিনি তার দলের নেতাদের বোঝানোর চেষ্টা করেন যে পাকিস্তানের শত্রুদেরকে ধ্বংস করতে হলে সাচ্চা পাকিস্তানীদের মিলিত হয়ে একসঙ্গে কাজ করা অবশ্যই দরকার।

অত্যাচার, নিপীড়ন আর গণহত্যায় একটুও দমেনি বাঙালিরা। বাঙালিদের এই প্রতিরোধ আর ঐক্যবদ্ধতায় হানাদাররা আরো ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। অত্যাচার চালানোর পথকে আরো প্রশস্ত করার জন্যে ১২ জুন পাকিস্তানি শাসক সহকারী উপ-সামরিক আইন প্রশাসককে পুলিশ ও ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা দিয়ে দেয়। পিডিপি নেতা মোসলেম উদ্দিন স্বাধীনতা সংগ্রামের নয় মাসই ব্যস্ত ছিলেন শান্তি কমিটির কর্মতৎপরতা বাড়ানোর কাজে। তিনি ১২ জুন কিশোরগঞ্জ গিয়ে প্রচার করেন, দেশের জনগণের

দুর্ভোগের জন্যে দায়ী আওয়ামী বিচ্ছিন্নতাবাদীরা। আর পাকিস্তানি প্রচার মাধ্যম সব সময়েই অব্যাহত রেখেছিলো তাদের মিথ্যা প্রচারণা। ১২ জুনেও রেডিওতে প্রচার করা হয় শরণার্থীদের ফিরে আসার মিথ্যে খবর। অথচ বাঙালিরা তখন পালিয়ে যাচ্ছিলো প্রতিদিন জীবনের ভয়ে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ভারতের দিকে মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে মিলিত হতে কিংবা শরণার্থী শিবিরে।

তথ্য সূত্র : দৈনিক পাকিস্তান ও আজাদ ১৩, ১৪ ও ১৫ জুন '৭১।

১৩ জুন, রবিবার

শুধু শান্তি কমিটিই নয় আরো অনেক সংগঠনই হানাদার বাহিনীর ছত্রছায়ায় হত্যা লুণ্ঠনে মেতে ওঠে। ১৩ জুন এমনি একটি সংগঠন 'পাকিস্তান দরদী সংঘের' রংপুর জেলা প্রেসিডেন্ট এস এম আমিন বলেন, 'উদ্বাস্তু শিবিরে নির্যাতনের ফলে পাকিস্তানীরা দেশে ফিরে আসতে চাইছে। কিন্তু ভারত নিজেদের স্বার্থে তাদেরকে ফিরতে দিচ্ছে না। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, ইতিপূর্বে ভারতীয়রা তথাকথিত ৩০০ মুক্তিযোদ্ধাকে হত্যা করেছে।'

তথ্য সূত্র : দৈনিক আজাদ, পূর্বদেশ ও পাকিস্তান ১৪ ও ১৫ জুন '৭১।

১৪ জুন, সোমবার

এইদিন এডভোকেট আবদুল হাফিজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত শান্তি কমিটির সভায় দেশের শত্রুদের ধ্বংসের জন্যে শেষ রক্তবিন্দু দেয়ার প্রতিজ্ঞা নেয়া হয়। এতে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আজমল আলী চৌধুরী, জামায়াত নেতা শামসুল হক, এডভোকেট জালালুদ্দিন প্রমুখ। শান্তি কমিটির তৎপরতা লক্ষ্য করা যায় খান বাহাদুর আফজাল খাঁ'র নেতৃত্বে পিরোজপুরে।

এই দিন মুক্তিযুদ্ধকে ভারতীয় ষড়যন্ত্র হিসেবে চিহ্নিত করে নিন্দা করেন মুন্সীগঞ্জ শান্তি কমিটির নেতা মোঃ আবদুল হাকিম বিক্রমপুরী। জামালপুরে দালালরা সংগঠিত হয়, অধ্যক্ষ আবদুল আজিজ, কবিরাজ মক্তব হোসেন, এস এম ইউসুফ, অধ্যাপক মুহাম্মদ আবদুল গণি, ডা. তানিরউদ্দীন আহম্মদ, মুহাম্মদ মাহবুবুল আলম, আবদুল বারী প্রমুখের নেতৃত্বে।

ঝালকাঠি আওয়ামী লীগের সেক্রেটারি ফজল হক দলের সঙ্গে সম্পর্কোচ্ছেদ করে এদিন বলেন, 'আওয়ামী লীগ ভারতের সঙ্গে আঁতাত করে পাকিস্তানের সংহতি বিনষ্ট করছে'। প্রাদেশিক সদস্য এস বি জামান সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে ময়মনসিংহ কিশোরগঞ্জ সফর করে বলেন, 'দুষ্কৃতকারীরা জনগণকে প্রচণ্ড দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে ফেলেছে।'

তথ্য সূত্র : দৈনিক পূর্বদেশ, আজাদ ও পাকিস্তান ১৬, ১৭ ও ১৯ জুন '৭১।

১৫ জুন, মঙ্গলবার

বাঙালি জাতির ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ সংগ্রামে ছিন্নভিন্ন পাকিস্তানপন্থী রাজনৈতিক দলগুলো ক্রমাগত চেষ্টা চালাতে থাকে জোটবদ্ধ হতে। মুসলিম লীগ তখন বিভক্ত ছিলো ৩

ভাগে। ১৫ জুন কাউন্সিল মুসলিম লীগ প্রধান দৌলতানা দলীয় কর্মীদেরকে দেশের অখণ্ডতা বজায় রাখার স্বার্থে ঐক্যবদ্ধভাবে দুষ্কৃতকারী দমনের নির্দেশ দেন।

দেশীয় দালালরা এ সময় পত্র-পত্রিকায় সক্রিয়ভাবে মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে লেখালেখি করতে থাকে। ১৫ জুন দৈনিক পূর্বদেশের 'অভিমত' কলামে মাহুতটুলির মোঃ রফিক ও মোঃ শফিক লেখেন 'সমাজবিরোধীদের রুখতে হবে'।

তথ্য সূত্র : দৈনিক পূর্বদেশ ও আজাদ ১৭, ১৮ ও ২০ জুন '৭১।

১৬ জুন, রোববার

অনেক বিদেশী রাষ্ট্রও কূটনৈতিক পর্যায়ে এমন ভূমিকা রাখে যা ঘাতক হানাদারদেরই প্রকারান্তরে সহায়তা করে। অনেকেই একে 'পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার' বলে হানাদারদের গণহত্যা আর ধ্বংসযজ্ঞ চালানোর পথকে উৎসাহিত করে। ১৬ জুন ইন্দোনেশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. আদম মালিক বলেন, 'পাকিস্তানে যা ঘটেছে তা সম্পূর্ণ অভ্যন্তরীণ ব্যাপার। এতে নাক গলানো আমাদের ঠিক হবে না।'

ঘাতকদের সঙ্গে মিলে শান্তি বাহিনীর সদস্যরা নির্যাতন অব্যাহত রাখে। ১৬ জুন আবুল হোসেনের সভাপতিত্বে বরিশালের মেহেদীগঞ্জ হাইস্কুল প্রাঙ্গণের সভায় সেনাবাহিনীর উদ্ধার করা শান্তি বজায় রাখার স্বার্থে দুষ্কৃতকারীদের খতম করার নির্দেশ দেয়া হয়। বরিশাল শান্তি কমিটিতে নেতৃত্ব দেন লকিতুল্লাহ, ডক্টর মোশাররফ হোসেন, মওলানা আবদুল মান্নান, তোফাজ্জল হোসেন নিয়াজী। এদের জন্যে বরিশালবাসী নিগৃহীত হয় চরমভাবে।

শান্তি কমিটির ঘাতকরা ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে টঙ্গীবাড়ী, পিরোজপুরে। মহকুমা প্রেসিডেন্ট খান বাহাদুর আফজাল খান, সেক্রেটারী এ. সাত্তার, এডভোকেট এ. মান্নান, সৈয়দ আবদুল বারী, মোহাম্মদ আবদুল গনির অত্যাচারে সবসময় তটস্থ থাকতো পিরোজপুরের মানুষ। আনাড়ীপাড়ার সভায় আফজাল খান দুষ্কৃতকারী ও দেশদ্রোহীদের প্রতি কঠোর হুঁশিয়ারি দেন।

তথ্য সূত্র : দৈনিক পূর্বদেশ ও আজাদ ১৭, ১৮ ও ২০ জুন '৭১।

১৭ জুন, বৃহস্পতিবার

বাঙালিদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার জন্যে ৩ সদস্যের ব্রিটিশ পার্লামেন্টারী দল আসে বাংলাদেশে। হানাদার ঘাতক ও দালালরা এই দলকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রেখে তাদের মধ্যে ভ্রান্ত ধারণার জন্ম দেয়। সফরকারী দলের সদস্য মি. জেমস টিন ১৭ জুন মন্তব্য করেন, 'ব্রিটিশ পত্রিকায় প্রকাশিত খবরের সঙ্গে দেশের অবস্থা সঙ্গতিপূর্ণ নয়। ভারতের একতরফা প্রচারের কারণেই বিদেশী পত্রিকায় সঠিক খবর প্রকাশিত হচ্ছে না।' দলের অন্যান্য সদস্যরা ছিলেন মিসেস জেল নাইট ও জেমস কিল কেডার।

বাঙালির মুক্তিসংগ্রামকে প্রকারান্তরে অস্বীকার করে তারা বলেন, 'উদ্বাস্তুদের প্রত্যাবর্তন ও রাজনৈতিক সমালোচনার মাধ্যমেই উদ্ভূত পরিস্থিতির সমাধান সম্ভব।' চা বাগানের ব্রিটিশ নাগরিক জেমস বয়েড নিহত হয়েছিলেন হানাদারদের হাতে। কিন্তু ঘাতকরা

তাদের জানায়, তাকে তথাকথিত মুক্তিযোদ্ধারা ভারতে নিয়ে গেছে। পরোক্ষভাবে হানাদারদের সমর্থন দিয়ে দলের সদস্যা মিসেস নাইট বলেন, 'পাকিস্তান সেনাবাহিনী দুষ্কৃতকারী দমনে অত্যন্ত দ্রুত ও কঠোর ব্যবস্থা নিয়েছে। তবে এই নির্মমতার দরকার ছিলো।' বাঙালি মুক্তিযোদ্ধাদের সশস্ত্র প্রতিরোধকে অস্বীকার করার অপপ্রয়াসে ১৭ জুন পাকিস্তান সরকার ঘোষণা করেন, "ভারতীয় সেনাবাহিনী আসাম ও পশ্চিমবঙ্গ সীমান্তে বিনা উস্কানিতে মর্টার ও মেশিন গানের গোলাবর্ষণ করে অসংখ্য নিরস্ত্র বেসামরিক লোককে হত্যা করেছে। কুমিল্লা, যশোর, রংপুর, রাজশাহীর সীমান্তবর্তী এলাকায় এসব ঘটনা নিয়মিত ঘটছে।'

তথ্য সূত্র : দৈনিক আজাদ ১৮ ও ২০ জুন '৭১।

১৮ জুন, শুক্রবার

আরো একজন পাক হানাদার বাহিনীর সহযোগী মরহুম খান এ. সবুর। জিয়াউর রহমানের শাসনামলে 'পিপিআর' অধ্যাদেশের জোরে রাজনীতিতে পুনর্বাসিত হন তিনি। ১৮ জুন এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, 'ভারত আমাদের জনগণের একটি অংশকে স্বর্গভোগের আশা দিয়ে সীমান্ত অতিক্রম করতে প্রলুব্ধ করেছে। কিন্তু স্বর্গসুখের আশায় ভারত গমনকারীরা অল্প সময়ের মধ্যেই উপলব্ধি করে যে, তারা নরকে নিপতিত হয়েছে।'

হানাদারদের অত্যাচারে সীমান্ত অতিক্রমকারী বাঙালি ও মুক্তিযোদ্ধাদের স্বাধিকার আন্দোলনের প্রতি সমর্থন আদায়ের উদ্দেশ্যে ইন্দিরা গান্ধী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী শরণ সিংসহ ভারতীয় নেতারা বিশ্ববাসীর কাছে আবেদন জানান। এই দিন সবুর খান বলেন, 'ভারতীয় নেতারা সামরিক শক্তি বাড়ানোর জন্যেই বিদেশ সফর করেছে। তারা বিদেশী রাষ্ট্রের করুণা আদায় করে পাকিস্তানের ওপর চাপ প্রয়োগ করতে চায়। জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের বিরোধিতাকারী এই খান এ. সবুরকে পরে জাতীয় গোরস্থানে সমাহিত করে উপহাস করা হয় মুক্তিযোদ্ধাদের।

১৮ জুন পাকিস্তানের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী হামিদ উল হক চৌধুরী, পিডিপি'র ভাইস প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আলী, বিচারপতি নুরুল ইসলাম সাক্ষাৎ করেন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সঙ্গে। এদের সঙ্গে আরো ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ডঃ সাজ্জাদ হোসেন ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. কাজী দীন মুহম্মদ। পাকিস্তানীদের মনোরঞ্জন করে ফিরে আসা ঢাকা শিল্প ও বণিক সমিতির নেতা সাত্তার কারাওয়াদিয়ার প্রতিনিধি দল এ দিন জানান, তাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিলো, 'যে সব পশ্চিম পাকিস্তানি শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীরা চলে গিয়েছে তাদের পুনরায় ফিরে আসার অনুরোধ জানানো।' হানাদাররা স্বাধীনতার সপক্ষের সব কর্মচারীকে ব্যাংক, সরকারি অফিস থেকে ছাঁটাই করে। কিন্তু ১৮ জুন রেডিও পাকিস্তান সরকারি মুখপাত্রের বরাত দিয়ে তা অস্বীকার করে। একই সঙ্গে প্রচার করে উদ্বাস্তু ফিরে আসার ভুয়া খবর।

তথ্য সূত্র : দৈনিক পাকিস্তান ও আজাদ ১৮, ১৯ ও ২০ জুন '৭১।

১৯ জুন, শনিবার

মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে বিশ্বব্যাপী গণসমর্থনের প্রেক্ষিতে পাকিস্তান সরকার সিদ্ধান্ত নেয় গণহত্যাকে চাপা দেয়ার জন্যে জনমত গঠনের। ১৯ জুন টিক্কা খান জানান, 'ভারতীয় প্রচারণার বিরুদ্ধে প্রচারকার্য চালানোর জন্যে সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী পিডিপি সহ-সভাপতি মাহমুদ আলী, বিচারপতি নুরুল ইসলাম, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সলর ড. সাজ্জাদ হোসেন বিদেশ সফরে যাবেন।' নিপীড়িত বঞ্চিত শ্রমিকরা এ সময় নিজেদের মুক্তির জন্যে শামিল হয়েছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামে। ফলে বন্ধ হয়েছিলো মিল-কারখানা। ১৯ জুন পূর্ব পাকিস্তান ফেডারেশন অব লেবারের সহ-সভাপতি এস এম সোলায়মান নির্দেশ দেন শ্রমিকদের কাজে যোগ দিতে। তার এই আহ্বান কোনো কাজে লাগেনি। কেননা মুক্তি সংগ্রামে নিয়োজিত শ্রমিকরা তখন লড়াইয়ের মাঠে।

আজ দৈনিক আজাদ প্রচার করে রাজশাহীতে অস্ত্র উদ্ধারের সংবাদ। এ অস্ত্র কেড়ে নেয়া হয় মুক্তিযোদ্ধার কাছ থেকে। পুরো রাজশাহী তখন পরিণত হয়েছে ধ্বংসযজ্ঞে। আর এই ধ্বংসযজ্ঞের অন্যতম নেতা ছিলেন শান্তি কমিটির নেতা আয়েনউদ্দিন। হানাদার বাহিনী ও শান্তি কমিটির সংঘবদ্ধ তৎপরতায় এ সময় মুক্তিযোদ্ধারা রাজশাহীতে সাময়িকভাবে পিছু হটে। আর আয়েনউদ্দীন তাঁর বীরত্বের কাহিনী প্রচার করে বলেন, "দুষ্কৃতকারীরা প্রচার করেছে রাজশাহী ধ্বংস হয়ে গেছে। কিন্তু এ প্রচারণা প্রচারণাই, সঠিক নয়। রাজশাহী সম্পূর্ণ স্বাভাবিক আছে।"

তথ্য সূত্র : দৈনিক আজাদ, পাকিস্তান ও পূর্বদেশ ১৯, ২০ ও ২১ জুন '৭১।

২০ জুন, রবিবার

সোহরাওয়ার্দী কন্যা আখতার সোলায়মানও ব্যস্ত ছিলেন গোলাম আযমের মতো। ২০ জুন তিনি সাংবাদিকদের বলেন, 'পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থা স্বাভাবিক হতে আর বিলম্ব নেই। সেনাবাহিনী দ্রুত ব্যবস্থা নিচ্ছে। কাজেই ক্ষমতা হস্তান্তর দেশের উভয় অংশে একই সঙ্গে হওয়া উচিত।'

তথ্য সূত্র : দৈনিক আজাদ, পূর্বদেশ ২১ ও ২২ জুন '৭১।

২১ জুন, সোমবার

২১ জুন শান্তি কমিটির দালালরা ডা. আবদুল মালিক, শাহেদ আলী প্রমুখের নেতৃত্বে একত্রিত হয় সিলেটে। ফরিদপুর ও বাগেরহাটেও সভা করে তারা। ফরিদপুরে নেতৃত্ব দেন এম এ গফুর, আফজাল হোসেন, কারেলউদ্দিন ও হাতিমউদ্দীন। তারা মন্তব্য করেন, আওয়ামী দুষ্কৃতকারীরা দেশকে ছিন্নভিন্ন করতে চায় এবং সেজন্যেই তারা গণ্ডগোল করছে।

তথ্য সূত্র : দৈনিক পূর্বদেশ ও আজাদ ২১, ২২ ও ২৩ জুন '৭১।

২৩ জুন, বুধবার

হানাদারদের সহযোগী সাবেক মন্ত্রী ও শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি ড. এ এস মালেক ২৩ জুন ১০ দিনের সফর শেষ করেন যশোর, কুষ্টিয়া ও খুলনার বিভিন্ন এলাকায়।

মুক্তিযোদ্ধাদের সমূলে ধ্বংস করার জন্যে তিনি শান্তি কমিটি ও সেনাবাহিনীকে সাধুবাদ দেন।

তথ্য সূত্র : দৈনিক আজাদ ও পূর্বদেশ ২৩, ২৪ ও ২৫ জুন '৭১।

২৪ জুন, বৃহস্পতিবার

মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে যারা প্রচারণা চালিয়েছে, প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য এস বি জামান তাদের একজন। এই ব্যক্তিটি দেশের বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে বেড়িয়েছে মুক্তিযুদ্ধবিরোধী প্রচারণায়। ২৪ জুন তিনি বলেন, 'দেশ বিভাগের পরিকল্পনা আগে জানলে জনগণ কখনই আওয়ামী লীগকে ভোট দিতো না।' ক্ষমতা হস্তান্তর প্রসঙ্গেও তিনি প্রেসিডেন্টের আশ্বাসের ওপর তার পূর্ণ আস্থা ব্যক্ত করেন।

শান্তি কমিটির মাধ্যমে স্বাধীনতাবিরোধীদের সংগঠিত করার কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে শান্তি কমিটির অন্যতম প্রধান নেতা খাজা খয়েরউদ্দিন। ঢাকা সদর মহকুমার স্বাধীনতাবিরোধীদের নিয়ে ২৪ জুনও বৈঠকে বসেছে খাজা খয়েরউদ্দিন। ঢাকা জেলা পরিষদ হলে এম এ মতিনের সভাপতিত্বে শান্তি কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয় আজ। এ সভায় মাতৃভূমির স্বাধীনতার বীর সৈনিক মুক্তিযোদ্ধাদের 'দুষ্কৃতকারী' আখ্যা দিয়ে তাদের নির্মূল করার দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করে বক্তব্য রাখে জয়নাল আবেদীন, মাহতাব উদ্দিন প্রমুখ বক্তা।

রাজধানী থেকে সুদূরতম প্রান্তে বরিশালের হিজলার নতুন বাজারেও আজ অধ্যক্ষ মৌলভী নূরবক্সের সভাপতিত্বে মিলিত হয় ঘাতক বাহিনীর একদল দেশীয় দোসর। পাক সামরিক সরকারের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে এ সভায় উপস্থিত ছিলো মহকুমা শান্তি কমিটির সভাপতি আবুল হোসেন, সম্পাদক এম এ খালেক, প্রফেসর মহিউদ্দিন, সাবেক প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য নজিবুল হক, শান্তি কমিটির বরিশাল জেলার সভাপতি আব্দুর রব, আতাউর রহমান প্রমুখ।

তথ্য সূত্র : দৈনিক আজাদ ও পূর্বদেশ ২৫, ২৬ ও ২৭ জুন '৭১।

২৫ জুন, শুক্রবার

পাক হানাদার বাহিনীর নির্মম ছোবলমুক্ত থাকেনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ও। নির্বিচারে হত্যা করা হয় এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং ছাত্রদেরও। কিন্তু হানাদার বাহিনীর এই নৃশংস আক্রমণকে অবলীলায় স্বীকার করে ২৫ জুন বিবৃতি দেয় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের একটি অংশ। সহকর্মী ও ছাত্রদের রক্তের দাগ উপেক্ষা করে বিবৃতিতে বলা হয়, "সেনাবাহিনী বিচ্ছিন্নতাবাদী ও চরমপন্থীদের হাত থেকে বিশ্ববিদ্যালয়কে রক্ষা করেছে।" বিবৃতিদাতা শিক্ষকদের মধ্যে রয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী ভাইস চ্যান্সেলর ইউ এন সিদ্দিকী, ইতিহাস বিভাগের প্রধান ড. আবদুল করিম, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রধান ড. রফিকুল ইসলাম চৌধুরী, সমাজ বিজ্ঞানের প্রধান ড. এস বদরুদ্দোজা, ইসলামিক ইতিহাস বিভাগের এনামুল হক, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের রীডার মোঃ আনিসুর রহমান,

ইংরেজি বিভাগের খন্দকার রেজাউর রহমান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সৈয়দ গোলাম মোস্তাফা, এম এ জিন্নাহ, ইতিহাস বিভাগের রফিকউদ্দিন, হোসেন মোঃ ফজলে দাইয়ান, রীডার মোকাদ্দাসুর রহমান, আহসানুল কবির, রিসার্চ এসিস্টেন্ট আবদুস সাঈদ, মিসেস সুলীনা নিজাম, রীডার ড. আকিউদ্দিন আহমদ, রসায়ন বিভাগের প্রধান আফজাল আহমদ, সমাজ বিজ্ঞানে রুহুল আমিন, বাণিজ্য বিভাগের প্রধান মোহাম্মদ আলী, এমদাদুল করিম খান, বাংলা বিভাগের দেলোয়ার হোসেন, ড. মোঃ আবদুল আউয়াল, মোঃ মনিরুজ্জামান, পরিসংখ্যান বিভাগের আবদুর রশিদ, হাতেম আলী হাওলাদার, অর্থনীতি বিভাগের শাহ মোঃ হুজ্জত আলী, মোঃ মোস্তফা, ইংরেজি বিভাগের মোঃ আলী, পদার্থবিদ্যার ইজাজ আহম্মদ, অংক বিভাগের এস. এম. হোসেন, এইচ এম চৌধুরী ও ফাইন আর্টের আবদুর রশিদ হায়দার।

একই দিন ফরিদপুরের আওয়ামী লীগ নেতা ফিরোজ রহমান আওয়ামী লীগের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে বিবৃতি দেয়।

২৫ জুন মুসলিম লীগ প্রধান খান আবদুল কাইয়ুম খান দলীয় কর্মীদের উদ্দেশে বক্তৃতায় বলেন, "দেশ এক গভীর সংকটের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। কাজেই দ্বিধাবিভক্ত মুসলিম লীগকে এক পতাকাতলে সমবেত হয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে।" পশ্চিম পাকিস্তানের প্রগতিশীল রাজনীতিকদের যে অংশ বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে ছিলেন খান আবদুল কাইয়ুম খান তাদের হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলে, "বাংলাদেশ আন্দোলনের সমর্থকরা বিচ্ছিন্নতাবাদী মুজিবকে পাকিস্তানের সংহতি নষ্টকারী আন্দোলনে সহায়তা করছে।"

তথ্য সূত্র : দৈনিক আজাদ ও পূর্বদেশ ২৬, ২৭ ও ২৮ জুন '৭১।

২৭ জুন, রবিবার

বিশ্বব্যাপী প্রচার মাধ্যমে পাক হানাদার ঘাতকদের নির্যাতনের কাহিনী প্রকাশিত হওয়ার পর দ্বিতীয়বারের মতো ব্রিটিশ প্রতিনিধি দল সরেজমিন সফরে বাংলাদেশে আসেন। ২৭ জুন এই প্রতিনিধি দলটি দু'টি ভাগে বিভক্ত হয়ে সিলেট ও বরিশাল সফর করেন। কিন্তু পরিকল্পনামাফিক শান্তি কমিটির স্থানীয় নেতাদের সঙ্গে তাদের বৈঠকের ব্যবস্থা করা হয়। শান্তি কমিটির এই নেতারা ব্রিটিশ প্রতিনিধি দলের কাছে পাকবাহিনীর পক্ষে সাফাই গেয়ে বক্তব্য রাখে।

এই দিন আওয়ামী লীগের টিকিটে নির্বাচিত জহির উদ্দিন ব্রিটিশ প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে ভোজের আয়োজন করে। বেগম আখতার সোলায়মানের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে আওয়ামী লীগের দোদুল্যমান সদস্যদের নিয়ে নতুন দল গঠনের উদ্যোগ নিয়েছিলো এই নেতা। এই ভোজসভাটি হয়ে উঠেছিলো মুখ্যত স্বাধীনতাবিরোধীদের একটি মিলনক্ষেত্র। অন্যান্যের মধ্যে ভোজসভায় এদিন উপস্থিত ছিলো শাহ্ আজিজ, ইউসুফ আলী চৌধুরী, শান্তি কমিটির প্রধান নেতা এ কিউ এম শফিকুল ইসলাম, সৈয়দ আজিজুল হক, আবদুল হাদী তালুকদার, নুরুল ইসলাম, আবদুল বারেক মিয়া, এস বি জামান, শামসুল হক, বাংলার অবসংবাদিত নেতা এ. কে. ফজলুল হকের পুত্র ফয়জুল হক প্রমুখ।

তথ্য সূত্র : দৈনিক আজাদ ২৮, ২৯ ও ৩০ জুন '৭১।

৩০ জুন, বুধবার

'৭১-এর এই সময়ে ভারতের সাংবাদিক নীরদ চৌধুরী আবারো পাকিস্তানীদের গণহত্যা ও বর্বরতাকে ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করেন। তিনি ব্রিটিশ পত্র-পত্রিকায় বাঙালিদের প্রতি সমবেদনা জানানোর ব্যাপারে হুঁশিয়ার থাকতে বলেন। তিনি বলেন, 'এরা হচ্ছে শকুন। সমস্ত বর্বরতা এরা প্রচার করে থাকে পত্রিকার কাটতি বাড়ানোর জন্যে।' তার মতে, 'ব্রিটিশ নাগরিকরা এশিয়া, আফ্রিকার বীভৎসতা উপভোগ করে থাকে। আর সে কারণেই পত্রিকাগুলো পাকিস্তানে বিভিন্ন বর্বরতা হচ্ছে বলে মিথ্যা অপপ্রচার চালিয়ে পত্রিকার কাটতি বাড়ানোর চেষ্টা করছে।' ৩০ জুনের বিভিন্ন পত্রিকায় এগুলো ছাপানো হয় ফলাও করে।

এ সময় পাকিস্তানে সফরকারী ব্রিটিশ পার্লামেন্টারী সদস্য মি. টিন এ দেশের অবস্থার প্রেক্ষিতে মন্তব্য করেন, 'শেখ মুজিবই দায়ী এই অবস্থার জন্যে।' বিবিসি'র সঙ্গে সাক্ষাৎকারে তিনি জানান, 'হঠকারী রাজনীতিকদের কারণেই কোনো আপোষ হয়নি। ইয়াহিয়াকে এর জন্যে দায়ী করা যায় না।'

৩০ জুনে বিশ্বনাথ থানা শান্তি কমিটির উদ্যোগে চেয়ারম্যান মওলানা ইসহাক আহমদের সভাপতিত্বে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সিলেট জেলা মুসলিম লীগের আহবায়ক ও জেলা শান্তি কমিটির সদস্যরা এতে উপস্থিত ছিলো। এতে বক্তব্য রাখে জেলা শান্তি কমিটির সদস্য মোহম্মদ মোকাম, আরশাদ আলী, আবদুর রকীব প্রমুখ। তারা কথিত দেশের শত্রু মুক্তিযোদ্ধাদের ধ্বংস করার জন্যে সামরিক বাহিনীকে অভিনন্দন জানায়। এছাড়া নাজমুল হোসাইন খান এখানে যুবকদের গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীতে যোগ দেয়ার আহ্বান করেন। সভাশেষে পাকিস্তানের ঐক্য ও অখণ্ডতা বজায় রাখার জন্যে মোনাজাত করা হয়।

তথ্য সূত্র : দৈনিক আজাদ ১ জুলাই '৭১।

১ জুলাই, বৃহস্পতিবার

এদিন হাকিম হাবিবুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ঢাকা জেলা সভায় বক্তব্য রাখেন এডভোকেট আবদুল হাই, প্রফেসর আবদুল খালেক প্রমুখ শান্তি কমিটির নেতা। মুক্তিযোদ্ধারা সে সময় সীমান্ত এলাকার বিভিন্ন সেক্টরে তাদের আক্রমণ আরো তীব্রতর করে তুলেছিলো। কিন্তু পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী এদিন ঘোষণা করে, ভারতই সীমান্ত এলাকায় গোলবর্ষণ করছে। একদিকে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিরোধ সংগ্রাম-এর বিপরীতে হানাদারদের ধ্বংসযজ্ঞে সারাদেশে তখন অস্থিরতা। অথচ খুলনা জেলা শান্তি কমিটির দালাল ও আমলারা এদিন বিবৃতি দেয়, জেলার সবখানে স্বাভাবিক পরিস্থিতি বিরাজ করছে। মুসলিম লীগ (কাইয়ুম)-এর কার্যনির্বাহ কমিটির সদস্য ফিরোজ আহমদ এ সময় সফর করেন টাঙ্গাইল, কালিহাতি, মধুপুর, জামালপুর, শেরপুর প্রভৃতি এলাকা। বাঙালি নিধনযজ্ঞের অংশ হিসেবে এসব এলাকা তখন ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। এলাকা ছেড়ে চলে গেছে জনসাধারণ। আর তিনি সোল্লাসে ঘোষণা করেন, অগ্নিসংযোগ

ও লুটতরাজকারীদের উৎখাত করা হয়েছে। এদেরই আরেক নেতা হাকিম ইরতেজাউর রহমান খান আখুনজাদা এদিন সফর করেন সিলেট। অন্যদিকে প্রেসিডেন্টের ভাষণের প্রতি অভিনন্দনও অব্যাহত থাকে। এ দিন ভাষণকে অভিনন্দন জানিয়ে বিবৃতি দেন পাকিস্তান মুসলিম লীগের (কনভেনশন) প্রেসিডেন্ট ফজলুল কাদের চৌধুরী, কৃষক শ্রমিক পার্টির প্রেসিডেন্ট এ এস এম সোলায়মান, পাবনা শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান ও মুসলিম লীগ নেতা সৈয়দ আজগর হোসেন জায়েদী, চট্টগ্রাম জেলার মোহাম্মদ ইলিয়াস, এম এ সবুর, এস এম মাহমুদুল হক, মাহমুদুন্নবী চৌধুরী, বদরুল আলম, ফরিদপুরের আফজাল হোসেন প্রমুখ।

তথ্য সূত্র : দৈনিক পাকিস্তান ও আজাদ ২ ও ৩ জুলাই '৭১

২ জুলাই, শুক্রবার

সিরাজুল ইসলামের নেতৃত্বে দালালরা মিলিত হয় ময়মনসিংহের নালিতাবাড়িতে। মুক্তিযোদ্ধাদের সন্ত্রাসবাদী আখ্যা দিয়ে দেশের অবস্থার জন্যে এদেরকে তারা দায়ী করে এবং খতম করার শপথ নেয়।

চট্টগ্রাম থেকে নির্বাচিত প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী এদিন আওয়ামী লীগের সঙ্গে সম্পর্কোচ্ছেদ করেন। তিনি বলেন, 'জনগণ দেশ বিভাগের জন্যে ভোট দেয়নি। তারা শান্তি চেয়েছিলো। দেশ ও জনগণের শত্রুরাই দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে।'

তথ্য সূত্র : দৈনিক পাকিস্তান ও পূর্বদেশ ৩ ও ৫ জুলাই '৭১।

৩ জুলাই, শনিবার

স্বাধীনতাবিরোধী দালালরা এ দিন একত্রিত হয় নোয়াখালীতে। তাদের নেতৃত্ব দেন জেলা শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান এডভোকেট সৈয়দুল হক, অধ্যাপক ফজলে আজিজ প্রমুখ। দালালরা মুক্তিযোদ্ধাদের ধ্বংস করার জন্যে হানাদারদের সর্বাত্মক সহায়তা করার সিদ্ধান্ত নেয়।

তথ্য সূত্র : দৈনিক পাকিস্তান ও পূর্বদেশ, ৪ ও ৬ জুলাই '৭১।

৪ জুলাই, রবিবার

রাজাকার বাহিনীকেও সুসংগঠিত করার চেষ্টা করা হয়। পাকিস্তান ও ইসলাম রক্ষার নামে ধর্মপ্রাণদের বিভ্রান্ত করে, একশ্রেণীর গুণ্ডা ও দুষ্কৃতকারীদের নিয়ে এবং গ্রামের অশিক্ষিত দরিদ্র জনগণকে নানা প্রলোভন ও ভয়ভীতি দেখিয়ে গড়ে তোলা হয় রাজাকার বাহিনী। শান্তি কমিটির সহযোগিতা ও হানাদারদের পৃষ্ঠপোষকতায় রাজাকাররা পরিণত হয় আধা-সামরিক বাহিনীতে। কেন্দ্রীয়ভাবে রাজাকাররা প্রশিক্ষণ নিতো ঢাকা বিশ্বাবিদ্যালয়ের কলাভবনের সঙ্গের মাঠটিতে ও ফিজিক্যাল ট্রেনিং কলেজের মাঠে। ৪ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মাঠে প্রশিক্ষণরত রাজাকাররা বন্দুক চালনা প্র্যাকটিস করে।

অন্যদিকে ইরানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জেড হাসান জাহেদী প্রকাশ্যে সমর্থন দেন হানাদারদের। বাঙালি জাতির স্বাধীনতার দাবির প্রতি কোনো গুরুত্ব না দিয়ে তিনি বাঙালিদের ধ্বংস করে, পাকিস্তানের সংহতি ও ঐক্য রক্ষার কাজে পাকিস্তানের পাশে থাকার অঙ্গীকার করেন।

তথ্য সূত্র : দৈনিক আজাদ, পাকিস্তান ও পূর্বদেশ ৪, ৫ ও ৭ জুলাই '৭১।

৫ জুলাই, সোমবার

আওয়ামী লীগের মধ্যকার অনেক নেতার সুবিধাবাদী চরিত্রও এ সময় ধীরে ধীরে প্রকাশ পেতে থাকে। এরা অনেকেই হাত মেলাতে থাকে পাকিস্তানি হানাদারদের সঙ্গে। ৫ জুলাই পটুয়াখালী থেকে নির্বাচিত এমপিএ মজিবর রহমান তালুকদার এবং আওয়ামী লীগের চট্টগ্রাম সদর মহকুমা শাখার ভাইস প্রেসিডেন্ট মোঃ আবুল বাসার দলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন।

তথ্য সূত্র : দৈনিক আজাদ, পাকিস্তান ও পূর্বদেশ ৬ ও ৭ জুলাই '৭১।

৬ জুলাই, মঙ্গলবার

৬ জুলাই সাবেক এমপিএ, পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগের (কাইয়ুম) ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং গাইবান্ধা শান্তি কমিটির সেক্রেটারি সাইদুর রহমান আমেরিকা ও ব্রিটিশ সংবাদপত্র ও কংগ্রেস সদস্যদের পাকিস্তানবিরোধী প্রচারণার নিন্দা করেন এবং এর বিরুদ্ধে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে কঠোর হওয়ার আহ্বান জানান।

সিলেট শান্তি কমিটির নেতা মকবুল আলী চৌধুরী, শাহাবুদ্দিনসহ ৫ সদস্যের একটি দল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির প্রধান নূরুল আমিনের সঙ্গে দেখা করে কর্ম পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করেন।

তথ্য সূত্র : দৈনিক পূর্বদেশ, পাকিস্তান ও আজাদ ৭ ও ৮ জুলাই '৭১।

৭ জুলাই, বুধবার

সোহ্‌রাওয়ার্দী কন্যা বেগম আখতার সোলায়মান তাঁর স্বাধীনতাবিরোধী ভূমিকা অব্যাহত রাখেন। ঢাকায় আওয়ামী লীগের দলবিচ্ছিন্ন কতিপয় দালালকে একত্রিত করার পর তিনি ঢাকা ছেড়ে রওনা হন ইংল্যান্ডের দিকে। ৭ জুলাই বেগম আখতার সোলায়মান বিবিসি'কে দেয়া সাক্ষাৎকারে ইয়াহিয়ার প্রশংসা করে বলেন, 'প্রেসিডেন্ট ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে সত্যিই খুব আন্তরিক।'

পূর্ব পাকিস্তানে তাঁর সফরের সফলতা ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, 'নির্বাচিত সদস্যরা আওয়ামী চক্র থেকে বেরিয়ে এসে শাসনতান্ত্রিক কার্যক্রম শুরু করতে চাচ্ছিলো। আমি তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করি এবং এ কাজে আমি সফল হয়েছি।'

৭ জুলাই সাভারের বিরলিয়া গ্রামে মোঃ এখলাস মিয়ার নেতৃত্বে গঠিত হয় গ্রামরক্ষী দল।

তথ্য সূত্র : দৈনিক পাকিস্তান ও আজাদ ৮ ও ৯ জুলাই '৭১

৮ জুলাই, বৃহস্পতিবার

শান্তি কমিটির দালালরা এদিন সভা করে সাবেক প্রাদেশিক মন্ত্রী দেওয়ান আবদুল বাসিতের সভাপতিত্বে মৌলভীবাজারে। এতে উপস্থিত ছিলেন মহকুমা শান্তি কমিটির আহ্বায়ক মিসিরউল্লা, সিলেট শান্তি কমিটির আহবায়ক সাহেদ আলী প্রমুখ। একই দিনে শান্তি কমিটির দালালরা একত্রিত হয় চট্টগ্রামের ফিরিঙ্গি বাজারে।

তথ্য সূত্র : দৈনিক পাকিস্তান, পূর্বদেশ ও আজাদ ৯, ১০ ও ১২ জুলাই '৭১।

৯ জুলাই, শুক্রবার

পাকিস্তানি হানাদারদের সমর্থনে বুদ্ধিজীবী নামধারী অনেকে তৎপর হয়ে ওঠে এ সময় আরো বেশি করে। বিদেশীদের মধ্যে ভ্রান্ত ধারণা জন্ম দেয়ার জন্যে লন্ডনে গিয়েছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ড. সাজ্জাদ হোসেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের রীডার ড. এম মোহর আলী। তারা বিদেশী পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত খবরের সত্যতা অস্বীকার করে বলেন, 'পত্রিকায় উদ্দেশ্যমূলকভাবে বাঙালিদের ওপর অত্যাচারের কাহিনী প্রচার করা হয়েছে। কোনো বাঙালি বুদ্ধিজীবীকেই সেনাবাহিনী হত্যা করেনি। বরং সেনাবাহিনী আমাদের জীবনের নিশ্চয়তা দিয়েছে।' ২৫ ও ২৬ মার্চে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্বিচারে গুলিবর্ষণ ও ছাত্র-শিক্ষকদের হত্যার কথা অস্বীকার করেন তারা।

হানাদারদের একনিষ্ঠ সহচর পূর্ব পাকিস্তান চাষী কল্যাণ সমিতির সাধারণ সম্পাদক ডা. ময়েজুর রহমান ২০ দিন ধরে স্বাধীনতা যুদ্ধবিরোধী তৎপরতা চালান বগুড়া, রংপুর ও দিনাজপুরে। ৯ জুলাই তিনি গণহত্যার দায় মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর চাপিয়ে দেয়ার অপপ্রয়াসে বলেন, তথাকথিত মুক্তিযোদ্ধারা হাজার হাজার মানুষকে খুন করেছে। তারা লুটপাট, অগ্নিসংযোগ এমনকি মহিলাদের ওপরও নির্মম অত্যাচার চালিয়েছে। তিনি দেশ ও জনগণের দুর্দশার জন্যে দায়ী করেন শেখ মুজিব ও তার দল আওয়ামী লীগকে।

এইদিন হানাদাররা নবাবগঞ্জ থানার তাহের আলী, আমিনুল হক, মোজাম্মেল হক এবং কাপ্তান বাজারের রুস্তুম আলীকে বিস্ফোরক ব্যবহারের কারণে সামরিক আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেন।

তথ্য সূত্র : দৈনিক আজাদ ও পাকিস্তান ৯ ও ১০ জুলাই '৭১।

১১ জুলাই, রবিবার

হানাদার ঘাতকদের দোসররা ঢাকা শহরের ছিন্নমূলদের নানা প্রলোভন ও প্রয়োজনে জীবনের হুমকি দিয়ে মুক্তিযুদ্ধবিরোধী কাজে লাগানোর চেষ্টা করে। দালালরা এসব ছিন্নমূলদের আবাসিক সুবিধা দিয়ে একত্রিত করে মোহাম্মদপুর ও মিরপুরে। এই দিন ডা. নাজির আহমদ মোহাম্মদপুর ও মিরপুরে শিবির পরিদর্শন করে এদের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধবিরোধী আলোচনা করেন। ডা. নাজির ছিন্নমূলদের যথাযথভাবে কাজে লাগানোর জন্যে এর সংগঠকদের পরামর্শ দেন।

স্বাধীনতার চেতনায় উদ্বুদ্ধ মুক্তিযোদ্ধাদের ধ্বংস করার জন্যে হানাদাররা উদ্যোগ নেয় রাজাকার বাহিনীকে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করার। এ সময়ই শুরু হয় ব্যাপকভাবে রাজাকারদের প্রশিক্ষণ দেয়ার কাজ। ১১ জুলাই ঢাকা রেঞ্জের রাজাকাররা অস্ত্র চালনা প্র্যাকটিস করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মাঠে।

পিরোজপুরের স্বাধীনতাবিরোধীরা সার্বক্ষণিকভাবে চেষ্টা চালায় মুক্তিযোদ্ধাদের ধ্বংস করার। প্রতিনিয়ত মিছিল-মিটিং-এর মাধ্যমে এরা জনজীবনে ত্রাস সৃষ্টি করে। ১১ জুলাই পিরোজপুর মহকুমা শান্তি কমিটির প্রেসিডেন্ট সৈয়দ মোঃ আফজাল, মোক্তার বারের সদস্য আব্দুল আজিজ মল্লিক প্রমুখ মিলিত হয়ে দুষ্কৃতকারীদের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। এই দিন হানাদাররা প্রচার করে, ভারত উদ্বাস্তুদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে ব্যবহার করছে এবং উদ্বাস্তু ধুয়ো তুলে বিদেশীদের সহানুভূতি পেতে চাইছে।

তথ্য সূত্র : দৈনিক সংগ্রাম, আজাদ ও পাকিস্তান ১২, ১৩ ও ১৫ জুলাই '৭১।

১২ জুলাই, সোমবার

এদিন সাবেক প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য ও কুমিল্লা উত্তর মহকুমার শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান নূরুল ইসলাম খান প্রাক্তন এমপিএ এবং জেলা শান্তি কমিটির সদস্য সাজ্জাদুল হক প্রমুখ মিলিত হন দেবীদ্বারের জাফরগঞ্জে।

সিলেটে মুক্তিযুদ্ধবিরোধী তৎপরতায় লিপ্ত ছিলেন সিলেট জেলা পাকিস্তান দরদী সংঘের প্রেসিডেন্ট এডভোকেট সাইফুল আলম খান। ১২ জুলাই তিনি সিলেটের অবস্থা সম্পর্কে জানান, 'সিলেটে ৭ হাজার বাস্তুত্যাগী দুর্বিষহ অভিজ্ঞতা নিয়ে ভারত থেকে ফিরে এসেছে। সিলেটের জনসাধারণ দুষ্কৃতকারী দমনে সেনাবাহিনীকে সর্বান্তকরণে সহায়তা করছে।'

এই দিন ঢাকা শহর মুসলিম লীগ নেতা মুরাবিয়া হোসেন পাকিস্তান সফর করে এসে বলেন, 'পাকিস্তানের সংহতি ও অখণ্ডতা রক্ষা করতে হলে দ্বিধাবিভক্ত মুসলিম লীগ একত্রীকরণ করা প্রয়োজন।'

তথ্য সূত্র : দৈনিক পাকিস্তান ও সংগ্রাম ১২, ১৩ ও ১৪ জুলাই '৭১।

১৩ জুলাই, মঙ্গলবার

'৭১-এর মুসলিম লীগ নেতা ফজলুল কাদের চৌধুরী এবং তার দু' পুত্র সংসদ সদস্য সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী ও গিয়াসউদ্দিন কাদের চৌধুরী ছিলেন পাকিস্তানিদের অন্যতম সহযোগী। ফজলুল কাদের চৌধুরী ছিলেন কনভেনশন মুসলিম লীগ প্রধান। চট্টগ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী জহিরুদ্দিন আহমদের দ্বিতীয় পুত্র নিজামুদ্দিন আহমদকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয় ফজলুল কাদের চৌধুরীর নির্যাতন কেন্দ্রে। নিজামুদ্দিন আহমদের ওপর সালাউদ্দিন কাদেরের নেতৃত্বে ৮ দিন ধরে ক্রমাগত নির্যাতন চালানো হয়েছিলো। বিশিষ্ট সাংবাদিক সাহিত্যিক মাহবুব-উল-আলমের 'বাঙালির মুক্তিযুদ্ধের ইতিবৃত্ত' গ্রন্থের 'রক্ত আগুন অশ্রুজল স্বাধীনতা' রচনায় নিজাম উদ্দিনের দেয়া ভাষ্য থেকে এদের স্বরূপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

তিনি লিখেছেন, "আমাকে ফজলুল কাদেরের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে পিঠমোড়া করে বেঁধে ফজলুল কাদেরের পুত্র সালাউদ্দিন, অনুচর খোকা, খলিল ও ইউসুফ বড় লাঠি, বেত প্রভৃতি হাতে আমাকে পিটাতে থাকে। পাঁচ ঘণ্টা মারের চোটে আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ি। ... আমাকে স্টেডিয়ামে চালান দেওয়া হয়। এ পর্যন্ত আমাকে কিছু খেতে দেওয়া হয়নি, পানি পর্যন্ত না। পানি খেতে চাইলেও বলা হয়েছে : তুই শালা হিন্দু হয়ে গেছিস, তোকে পানিও দেওয়া হবে না'। ১৩ জুলাই আমাকে জেলখানায় সোপর্দ করা হয়।" ফজলুল কাদের চৌধুরীর সহযোগীরা পুরো চট্টগ্রামের ওপর তাদের অত্যাচার অব্যাহত রাখে। এ সময় তিনি পশ্চিম পাকিস্তান সফরে যান তিন মুসলিম লীগ একত্রিত করার প্রয়াস নিয়ে। তিনি রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টিকারী খবরাখবরকে গুরুত্ব না দিয়ে যাতে সবাই সম্মিলিতভাবে শত্রুর মোকাবেলা করতে পারে সংবাদপত্রগুলোকে সেভাবে কাজ করার অনুরোধ জানান। তিনি দেশের বর্তমান অবস্থার জন্যে হঠকারী ও ভুঁইফোড় নেতৃত্বকে দায়ী করেন। তিনি বলেন, খুব শিগ্‌গিরই এরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

এ সময় ময়মনসিংহে বিভিন্ন গ্রুপের মুসলিম লীগ কর্মীরা নিজেদের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ভুলে গিয়ে নিজেদের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা করে। ১৩ জুলাই কনভেনশন মুসলিম লীগ নেতা ও সাবেক প্রাদেশিক মন্ত্রী ফকরুদ্দিন আহমদের সভাপতিত্বে ময়মনসিংহে সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় কেন্দ্রীয়ভাবে দেশের স্বার্থে একত্রীকরণের প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানানো হয়। তাছাড়া এইদিন ফকরুদ্দিনকে আহ্বায়ক ও এ. ই. বি. রেজাকে সেক্রেটারি করে গঠিত হয় শহরের নতুন বাজার শান্তি কমিটি। শান্তি কমিটির শাখা গঠিত হয় ময়মনসিংহ দক্ষিণ মহকুমা পাঁচভাগ, রসুলপুর ও লালমাটিয়া এলাকায়। শান্তি কমিটির শাখা গঠিত হয় ময়মনসিংহ উত্তর মহকুমায়। এখানে নেতৃত্ব দেন সাবেক এমপি এ খালেক নেওয়াজ ও হাশমত আলী।

তথ্য সূত্র : দৈনিক সংগ্রাম ও পাকিস্তান ১৪, ১৫ ও ১৬ জুলাই '৭১; একাত্তরের ঘাতক ও দালালরা কে কোথায়।

১৪ জুলাই, বুধবার

পৈশাচিক গণহত্যার পাশাপাশি দেশের অবস্থা স্বাভাবিক দেখানোর উদ্দেশ্যে প্রহসনমূলক পরীক্ষা অনুষ্ঠানের পাঁয়তারা করে পাকিস্তানিরা। স্বতঃস্ফূর্তভাবে ছাত্র-ছাত্রীরা বর্জন করার ঘোষণা করে সেই পরীক্ষা। কাইয়ুম মুসলিম লীগ পূর্ব পাকিস্তান সভাপতি হাশিমুদ্দিন এদিন বলেন, 'পাকিস্তানের ধ্বংসকামী দুষ্কৃতকারীরা পরীক্ষা বাতিলের উদ্দেশ্যে গুজব ছড়াচ্ছে। দেশের শত্রুদের এসব গুজবে কান না দিয়ে তিনি ছাত্রদের পরীক্ষায় অংশগ্রহণের আবেদন জানান।'

১৪ জুলাই কনভেনশন মুসলিম লীগের প্রাদেশিক কমিটির সভাপতি শামসুল হুদা ঢাকা সিটি কমিটি বাতিল করে একে আরো শক্তিশালী ও সক্রিয় করার উদ্দেশ্যে এ এইচ মোহাম্মদ হোসেনকে প্রেসিডেন্ট ও নাসিরউদ্দিনকে সেক্রেটারি করে নতুন কমিটি গঠন

করেন। এই পুনর্গঠিত কমিটিতে যারা অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন তাদের মধ্যে রয়েছেন জাহাঙ্গীর মোঃ আদেল, নূরুল ইসলাম, আলাউদ্দিন আহমদ, মঈনুদ্দিন সরদার, আবদুল ওয়াহেদ, আবদুর রহমান, আবদুল হাকিম, মোঃ শাহাজাহান, মজিবুর রহমান খান, এম এ মতিন, মবিনুল হক, মোজাম্মেল হক।

এদিন মুসলিম লীগের প্রবীণ সদস্য ও সিলেট জেলা শান্তি কমিটির সদস্য নজমুল হোসেন (তারা মিয়া), মোঃ মাখন মিয়া, দেওয়ান আবদুল বাসিত, শহীদ আলী প্রমুখ হানাদারদের দোসররা একত্রিত হয় এবং দুষ্কৃতকারী দমনের জন্যে সব শান্তি কমিটির সদস্যদের সেনাবাহিনীর সঙ্গে সহযোগিতা করার নির্দেশ দেয়। এছাড়া কুষ্টিয়া ইউনাইটেড স্কুল ময়দানে অনুষ্ঠিত হয় রাজাকারদের কুচকাওয়াজ। এখানে ২ হাজার রাজাকারের অভিবাদন নেন জেলা শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান সাদ আহমদ।

সাদ আহমদ রাজাকারদের দুষ্কৃতকারীদের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্যে সর্বান্তঃকরণে চেষ্টা চালানোর আহ্বান জানান। তিনি জানান, রাজাকাররা দুষ্কৃতকারীদের উৎখাত ও জনসাধারণের মধ্যে মনোবল সুদৃঢ় করার কাজ করে যাচ্ছে। বিপুল সংখ্যক দেশপ্রেমিক রাজাকার বাহিনীতে যোগ দিচ্ছে। রাজাকাররা ইতিমধ্যে বহু অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করেছে ও দুষ্কৃতকারী দমন করেছে।

তথ্য সূত্র : দৈনিক আজাদ, পাকিস্তান ১৫, ১৬ ও ১৭ জুলাই '৭১।

১৬ জুলাই, শুক্রবার

গাইবান্ধা শান্তি কমিটির নেতা প্রাক্তন প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য ও কাইয়ুম মুসলিম লীগের প্রাদেশিক ভাইস প্রেসিডেন্ট সাইদুর রহমান এদিন মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের প্রচারণার বিরুদ্ধে কথা বলেন। তিনি বলেন, 'পাকিস্তানি ঐক্য ও সংহতি বিনষ্ট করার জন্যে এসব প্রচারণার সীমা ছাড়িয়ে গেছে।' গাইবান্ধা কলেজের অধ্যাপকসহ বিভিন্নজনকে এ সময় হত্যা করা হয়। কিন্তু এদিন সাইদুর রহমান বলেন, 'গাইবান্ধায় কাউকে হত্যা করা হয়নি বরং কলেজের অধ্যাপকরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সেনাবাহিনীর সঙ্গে কাজ করছে।'

নারায়ণগঞ্জে স্বাধীনতা যুদ্ধবিরোধী তৎপরতা ও গণহত্যার জন্যে প্রতিটি মহল্লায় গড়ে তোলা হয় ত্রাস সৃষ্টিকারী মহল্লা ডিফেন্স কমিটি। দেওভোগে আলমাস আলীর নেতৃত্বে গড়ে ওঠে 'রক্ষিবাহিনী' নামের ঘাতক বাহিনী। এদিন রাজশাহীর গোগরা বিলে রাজাকার ও সশস্ত্র দালালরা মুক্তিযোদ্ধাদের একটি দলের ওপর অতর্কিতে হামলা চালিয়ে ২ জন মুক্তিযোদ্ধাকে খুন করে এবং শামসুল হককে আটক করে তুলে দেয় হানাদারদের হাতে। বহু অস্ত্রও কেড়ে নেয়া হয়। আর নির্মম অত্যাচার চালানো হয় শামসুল হকের ওপর তথ্য সংগ্রহের অপরাধে।

মুসলিম লীগের ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির কার্যনির্বাহক কমিটির সদস্য ব্যারিস্টার আখতারউদ্দিন আহমদ আজ বরিশালে স্বাধীনতাবিরোধীদের সভায় নির্দেশ দেন কঠোর হাতে দুষ্কৃতকারী মুক্তিযোদ্ধাদের দমন করার।

তাছাড়া ফরিদপুর আওয়ামী লীগের কামালউদ্দীন মিয়া, এডভোকেট আবদুস শুকুর মিয়া, আবদুল জলিল মিয়া, খলিলুর রহমান এডভোকেট দলের সঙ্গে সম্পর্কোচ্ছেদ করে।

তথ্য সূত্র :- দৈনিক পাকিস্তান, আজাদ ও পূর্বদেশ ১৬, ১৭ ও ১৮ জুলাই '৭১।

১৭ জুলাই, শনিবার

এ সময় সিলেটের জেলা শান্তি কমিটির আহ্বায়ক শহিদ আলী ছাতকে ঘাতক দালালদের এক সমাবেশে বলেন, 'বহু কষ্টে অর্জিত পাকিস্তানকে কতিপয় দুষ্কৃতকারীরা বিদেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে ধ্বংস করতে চেয়েছিলো। কিন্তু সেনাবাহিনী সঠিক পদক্ষেপ নিয়ে তাদের চক্রান্ত বানচাল করে দিয়েছে। এ অবস্থাকে টিকিয়ে রাখতে হলে আরো যে সব দুষ্কৃতকারী রয়েছে তাদেরকে খুঁজে বের করে খতম করতে হবে।'

তিনি বলেন, 'আওয়ামী লীগের ৬ দফা জনগণের দফা নয়। এটা পাকিস্তানকে বিভক্ত করার দফা। জনগণ পাকিস্তানকে শক্তিশালী করার জন্যে ভোট দিয়েছে। বিভক্ত করার জন্যে নয়।' ছাতকের এই মুক্তিযুদ্ধবিরোধী প্রচারণায় অংশ নেয় এডভোকেট গোলাম জিলানী, আহমদ আলী, এডভোকেট জসিমউদ্দীন, লুৎফর রহমান, ডা. আবদুল মালেক প্রমুখ। এদিন হানাদাররা প্রচার করে 'শক্তি প্রয়োগসহ সব বাধা অতিক্রম করে হাজার হাজার বাস্তুত্যাগী ফিরে আসবার' মিথ্যা খবর। একমাত্র সুনামগঞ্জেই ৩০ হাজার উদ্বাস্তু ফিরে এসেছে বলে জানায় তারা।

তথ্য সূত্র : দৈনিক পাকিস্তান, আজাদ ও সংগ্রাম ১৮, ১৯ ও ২০ জুলাই, '৭১।

১৮ জুলাই, রোববার

রয়টার পরিবেশিত এক খবর থেকে আজ জানা যায়, জাতিসংঘের উদ্বাস্তু বিষয়ক হাই কমিশনার প্রিন্স সদরুদ্দিন আগা খান বলেছেন, 'স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে দেশে ফেরাই উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধান।' পাকিস্তানি হানাদারদের বর্বরতাকে উল্লেখ না করে এবং বাঙালিরা কেনো শরণার্থীর জীবন বেছে নিতে বাধ্য হয়েছেন সে প্রসঙ্গে কোনো কথা উল্লেখ না করেই তিনি বলেন, 'ভারতে উদ্বাস্তুরা অমানবিক জীবনযাপন করছে।' অন্যদিকে মুক্তিযোদ্ধা ও বাঙালিদের ক্রমশ সংহতিতে ভীত হয়ে পড়ে রাজাকাররা। মুসলিম লীগকে এই প্রেক্ষাপটে একত্রিত করার জন্যে যে কোনো ত্যাগ স্বীকারের ঘোষণা দেন ফজলুল কাদের চৌধুরী। তিনি ঘোষণা করেন পাকিস্তানের স্বার্থে তিনি একীভূত মুসলিম লীগের কর্মকর্তার পদ ছেড়ে দেবেন। তিনি বলেন, 'মুসলিম লীগ একত্রীকরণের চূড়ান্ত কাজ অর্থাৎ নয়া কর্মকর্তা নিয়োগের কাজ ঢাকায় হওয়া উচিত। এতে করে পূর্ব পাকিস্তানে আমাদের অনুসারীরা অনুপ্রাণিত হবে।' এই দিন তিনি এ জন্যে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ঢাকায় ফিরে আসেন।

কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির সদস্য হাকিম ইরতেজাউর রহমান এ দিন জানান, ঢাকা পৌরসভায় কর্মচারীর অপ্রতুলতা নেই। আগের মতোই সহযোগিতা করছে সবাই। তিনি "আবর্জনা, ময়লা, মৃত লাশে একাকার হয়ে আছে শহর" এই সংবাদকে ভারতীয় অপপ্রচার বলে উড়িয়ে দেন।

তথ্য সূত্র : দৈনিক পাকিস্তান ও আজাদ ১৯ ও ২২ জুলাই '৭১।

১৯ জুলাই, সোমবার

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ডঃ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন এদিন তার পাকিস্তান প্রীতির পুরস্কার হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরের কার্যভার গ্রহণ করেন।

ফেনীতে হানাদার বাহিনীর দালালদের আয়োজিত সভায় বক্তব্য রাখেন মহকুমা শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান খায়েজ আহমদ এবং কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির নেতা এ জে খদ্দর। তারাও দেশের অখণ্ডতা রক্ষা করার জন্যে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর কাছে। আর রাজাকারদের প্রতি আহ্বান রাখেন সেনাবাহিনীর পদলেহন অব্যাহত রাখার।

তথ্য সূত্র : দৈনিক আজাদ ও পাকিস্তান ১৯, ২০, ২১ ও ২২ জুলাই '৭১।

২১ জুলাই, বুধবার

১০ জুলাই সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত হয় প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য এ. এন. এম. ইউসুফের খুলনা ও সিলেটের বড় লেখায় সফর করার খবর। এসব এলাকায় তিনি শান্তি কমিটির সদস্যদের সঙ্গে মিলিত হন এবং দেশ রক্ষার যে দায়িত্ব তাদের ওপর অর্পিত হয়েছে তা স্মরণ করিয়ে দেন। তিনি কুলাউড়ায় সিলেট জেলা শান্তি কমিটির সদস্য মোঃ খোকন মিয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন। এতে আরো বক্তব্য রাখেন লীগের আহ্বায়ক নজমুল হোসেন খান। এএনএম ইউসুফ দেশের পরিস্থিতির জন্যে আওয়ামী লীগকে দায়ী করেন।

১০ জুলাই ঘোষণা করা হয় শ্রমিকদের কাজে যোগ দেয়ার চূড়ান্ত নোটিশ।

মৌলভীবাজার শান্তি কমিটির নেতা মিসিরুল্লাহর সভাপতিত্বে আনা বাজারে শান্তি কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সাইদউল্লাহ, আজিজুর রহমান প্রমুখ দালাল আওয়ামী লীগের দুষ্কৃতকারীদের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। মৌলভীবাজারের রাজানগর হাইস্কুল মাঠ ও বরিশালের বানারীপাড়া বন্দরেও দালালরা একত্রিত হয়।

তথ্য সূত্র : দৈনিক আজাদ, সংগ্রাম ও পাকিস্তান ১০, ১১, ১২, ২১, ২২, ২৩, ২৫ ও ২৬ জুলাই '৭১।

২২ জুলাই, বৃহস্পতিবার

রাজাকারদের তৎপরতায় অভিনন্দন জানায় ঢাকা পৌরসভার সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান আবদুর রহিম, ইসলামপুর শান্তি কমিটির নেতা মোবারক হোসেন, নবাবপুরের মোঃ রইস উদ্দিন, মৌলভীবাজারের মোহাম্মদ ইউসুফ, দেওয়ান বাজারের চান্দ মিয়া, আগা সাদেক লেনের মোঃ নূরুল্লা, জিন্দাবাহার লেনের নূরুর রহমান, ইসলামপুরের দুলারা মিয়া সরদার, হাজী সিদ্দিক, মকবুল আহমদ, আমজাদ আলী, আজিমপুরের হাজী মোঃ কাসেম প্রমুখ স্বাধীনতাবিরোধীরা।

আজ সাবেক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আজমল আলী চৌধুরী জনগণের প্রতিনিধি সেজে হানাদারদের পক্ষে বিবৃতি দেন। বিবৃতিতে তিনি বলেন, 'শুধু সেনাবাহিনী নয়, দুষ্কৃতকারীদের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্যে আমরা যে কোনো চ্যালেঞ্জ

প্রতিহত করতে প্রস্তুত।' তিনি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বৃটিশ সরকার ও সংবাদপত্রের ভূমিকার নিন্দা করেন।

এইদিন নোয়াখালীর কালিতারা বাজারে জেলা শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান এডভোকেট সায়েদুল হকের সভাপতিত্বে এক সভায় বক্তব্য রাখেন শান্তি কমিটির নেতা মাসউদ মোক্তার, এডভোকেট আতাউর রহমান চৌধুরী, ডাঃ আবদুল জলিল প্রমুখ। বক্তারা 'মুক্তিযোদ্ধা ও দুষ্কৃতকারীদের' হাত থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্যে দৃঢ়তা প্রকাশ করেন।

এ সময় মুক্তিযোদ্ধারা হানাদারদের বিরুদ্ধে কুমিল্লায় তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। অন্যদিকে সশস্ত্র হানাদাররা এইদিন সরকারিভাবে কুমিল্লায় গুলিবর্ষণের বিরুদ্ধে ভারতের কাছে প্রতিবাদ জানায়।

তথ্য সূত্র : দৈনিক পাকিস্তান, আজাদ ২২, ২৩ ও ২৫ জুলাই '৭১।

২৩ জুলাই, শুক্রবার

আজ শান্তি কমিটির দালালরা মিলিত হয় ফরিদপুর জেলা কাউন্সিল হলে। এই সভায় বক্তব্য রাখেন শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান আফজাল হোসেন, সারোয়ার জান মিয়া, এম এন এ আদেল উদ্দিন আহমদ, কাজী খলিলুর রহমান, এডভোকেট আমিরুজ্জামান প্রমুখ। এসব স্বাধীনতাবিরোধী সুযোগ সন্ধানী দালালদের অনেকেই আওয়ামী লীগের সদস্য ছিলেন।

তথ্য সূত্র : দৈনিক পাকিস্তান ও আজাদ, ২৪ ও ২৫ জুলাই '৭১।

২৪ জুলাই, শনিবার

কাউন্সিল মুসলিম লীগের তৎকালীন ভাইস প্রেসিডেন্ট এ কিউ এম শফিকুল ইসলাম আজ মুসলিম লীগ একত্রীকরণের প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, 'দুষ্কৃতকারী ও বিচ্ছিন্নতাবাদীদের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্যে আমাদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করতে হবে। দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ভুলে ঐক্যবদ্ধভাবে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে।'

মির্জাপুর ও টাঙ্গাইলের স্বাধীনতাবিরোধীদের সংগঠিত করার উদ্দেশ্যে এসব এলাকা সফর করেন প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক এ এন এম ইউসুফ।

আজ ঈশ্বরদী থানা শান্তি কমিটির আহ্বায়ক আরিফুদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয় এক সভা। এখানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সাবেক মন্ত্রী ফকরুদ্দীন বলেন, 'দুনিয়ায় এমন কোনো শক্তি নেই যা পাকিস্তানকে ধ্বংস করতে পারে।' তিনি সবাইকে গ্রাম রক্ষীবাহিনীতে যোগ দিতে আহ্বান জানান। সভায় কাউন্সিল মুসলিম লীগের পূর্ব পাকিস্তান শাখার প্রচার সম্পাদক বলেন, 'পাকিস্তান বিভক্ত করার চক্রান্তে লিপ্ত দুষ্কৃতকারী দমনে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ এবং তাদের চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।'

এ দিন জিনাইদহে ঘাতক-দালালদের এক সমাবেশে বক্তব্য রাখেন মহকুমা শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান ও প্রাক্তন মন্ত্রী বি এ মজুমদার, শান্তি কমিটির নেতা সৈয়দ শরিফুল ইসলাম, মতলুবুর রহমান, এম এ মজিদ, জামায়াত নেতা নুরুন্নবী সামদানী প্রমুখ। বক্তব্য রাখতে গিয়ে এরা বলেন, 'কালীগঞ্জ, কোটচাঁদপুর, মহেশপুর এলাকা থেকে

দুষ্কৃতকারী ও সমাজবিরোধীদের তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। এর ফলে এলাকায় পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থা বিরাজ করেছে।'

অন্যদিকে আলী আকবরের নেতৃত্বে কুমিল্লার সাভরাইশের হানাদারদের দোসররা মিলিত হয়ে কৃতজ্ঞতা জানায় সেনাবাহিনীকে।

এ দিন লাকসামের সাবেক এম এল এ সাজেদুল হক, সাবেক এমপি এ আবদুল হাকিম, আবদুস সালাম, হাসমতউল্লাহ খান প্রমুখ এলাকার লোকদের বিরুদ্ধে উস্‌কে দেন দালালদের। লতিফ হোসেন ও তৈয়ব আলীকে চেয়ারম্যান এবং সেক্রেটারি করে গঠিত হয় নবাবগঞ্জ মহকুমা শান্তি কমিটি। এ মহকুমার শিবগঞ্জ, মনাকশাসহ বিভিন্ন এলাকায়ও তৎপরতা চালায় দালালরা।

আজকের সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় দালালদের তৎপরতার খবর। এখানে এক সভায় বক্তব্য রাখেন এ. কিউ. এম. শফিকুল ইসলাম, গোলাম আযম, শান্তি কমিটির সদস্য এ আর মোল্লা, ওবায়দুল্লা, জিল্লুর রহমান। বক্তারা বিদেশী সংবাদ মাধ্যমে পাকিস্তান বিরোধিতার নিন্দা করেন এবং এসব দেশের সঙ্গে সম্পর্কোচ্ছেদের দাবি জানান।

তথ্য সূত্র : দৈনিক পাকিস্তান, পূর্বদেশ ও সংগ্রাম ২৪, ২৫ ও ২৬ জুলাই '৭১।

২৫ জুলাই, রবিবার

হানাদারদের পক্ষ নিয়ে এ সময় দেশের বিভিন্ন স্থানে বারবার সফর করছিলেন আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচিত এমপিএ এস বি জামান। আজ তিনি পশ্চিম পাকিস্তানে সাক্ষাৎ করেন পিপিপি নেতা ভুট্টোর সঙ্গে।

এদিন ময়মনসিংহের ফুলপুর থানা শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান রজব আলী ফকির ভারতীয় অনুপ্রবেশকারী ও দুষ্কৃতকারী দমন করে পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষায় পূর্ণ সহযোগিতা দিতে জনগণের প্রতি আহ্বান জানান। পূর্ব পাকিস্তান সংস্কৃতি সংস্থার প্রেসিডেন্ট আবুল হাসনাত কাদরী চট্টগ্রামে এক সভায় পাকিস্তান রক্ষা করতে নিজেদের কোরবান করার জন্যে প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানান।

আজ খান বাহাদুর হাতেম আলী জমাদারের সভাপতিত্বে পিরোজপুরের মঠবাড়িয়া কমিউনিটি সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয় শান্তি কমিটির সভা। এতে খান বাহাদুর সৈয়দ মোহাম্মদ আফজাল আওয়ামী বিচ্ছিন্নতাবাদীদের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করার আহ্বান জানান। এতে আরো বক্তব্য রাখেন মহকুমা শান্তি কমিটির সহ-সভাপতি এ. জাফর মোল্লা, এস চৌধুরী, এম এ জব্বার প্রমুখ।

ইসলামপুর ইউনিয়নের শান্তি কমিটির দালালরাও মিলিত হয় মোবারক হোসেনের নেতৃত্বে। তারা সিদ্ধান্ত নেয় প্রত্যেক ইউনিট থেকে ২৫ জন করে সদস্য নিয়ে রাজাকার বাহিনী গঠন করার।

আজ সিলেটে শান্তি কমিটির আহ্বায়ক শাহিদ আরী, সদস্য ডা. আবদুল মারিক, আহমদ আলী, গোলাম জিলানী প্রমুখ দালালরা সভা করে সিলেটের গুললি প্রাইমারী স্কুল

প্রাঙ্গণে। এতে শাহিদ আলী বলেন, 'ভারত কোনোদিনই পাকিস্তানকে মেনে নিতে পারেনি। তাই তারা দুষ্কৃতকারী ও বিচ্ছিন্নবাদীদের অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সাহায্য করছে।'

তথ্য সূত্র : দৈনিক পাকিস্তান, পূর্বদেশ ও সংগ্রাম ২৪, ২৫, ২৬, ২৭ ও ২৯ জুলাই '৭১।

২৬ জুলাই, সোমবার

আওয়ামী লীগের টিকিটে নির্বাচিত সংসদ সদস্য এস বি জামান আজ পশ্চিম পাকিস্তানে সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, '৬ দফা বর্তমানে কতিপয় বিচ্ছিন্নতাবাদীর মস্তিষ্কে রয়েছে। অধিকাংশ আওয়ামী লীগ সদস্যেরই মোহমুক্তি ঘটেছে। তারা অযোগ্য ঘোষিত সদস্যদের তালিকা প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে।' তিনি দেশের বর্তমান অবস্থার জন্যে শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগের বিচ্ছিন্নতাবাদী সদস্য এবং ভাসানী, আতাউর রহমান ও অধ্যাপক মোজাফফর আহমদকে দায়ী করেন। তিনি বলেন, 'এরা পাকিস্তানকে বিভক্ত করার জন্যে ষড়যন্ত্র করেছে। নকশালপন্থীরাও এ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত।' তিনি এসব 'তথাকথিত বাংলাদেশ' সমর্থকদের বিচার দাবি করেন।

এস বি জামান জানান বলেন, 'বেআইনী ঘোষিত আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচিত ১০৯ জন এমপিএ এবং ৭০ জন এমএলএ জহিরুদ্দীনের নেতৃত্বে একত্রিত হয়ে একটি নতুন দল গঠন অথবা পিপলস পার্টিতে যোগ দেয়ার চিন্তাভাবনা করছে।' তিনি এই সফরকালে ভুট্টোর সঙ্গে দু'দফা সাক্ষাৎ করেন এবং তাকে জহিরুদ্দীনের একটি পত্র দেন বলে জানান।

তথ্য সূত্র : দৈনিক পাকিস্তান, আজাদ, পূর্বদেশ ও সংগ্রাম ২৬, ২৭ ও ২৮ জুলাই '৭১।

২৭ জুলাই, মঙ্গলবার

রাজাকার আলবদরদের পাশাপাশি পাকিস্তানিদের দালালী করতে মুজাহিদ বাহিনী নামে আরো একটি বাহিনী তৈরি করা হয় এ সময়। আজ কুষ্টিয়ার ইউনাইটেড স্কুলে কুষ্টিয়ার মুজাহিদদের প্রথম দলটি শপথ নেয় আনুষ্ঠানিকভাবে দুষ্কৃতকারীদের খতম করার। কুষ্টিয়া জেলা শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান সৈয়দ আহমদ ও আহমদ আলী মুজাহিদদের বাংলা ও উর্দুতে শপথবাক্য পাঠ করান। আজ মহকুমা আহ্বায়ক আলহাজ এম. এ. সালামের সভাপতিত্বে চাঁদপুরে শান্তি কমিটির দালালরা একত্রিত হয়। এখানে দালালরা শপথ নেয় ভারতীয় গোলাবর্ষণ ও দুষ্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণার। এতে উপস্থিত অন্যরা ছিলেন ইব্রাহিম খলিল, আহমদুল্লা, জি এম চৌধুরী, আবদুর রব, আবদুল মতিন, সেরাজুল হক প্রমুখ। পরে দালালরা শহরে মিছিল করে পোস্টার ও প্ল্যাকার্ড নিয়ে।

তথ্য সূত্র : দৈনিক আজাদ, সংগ্রাম ও পূর্বদেশ ২৮, ২৯ ও ৩১ জুলাই '৭১।

২৮ জুলাই, বুধবার

আওয়ামী লীগের ভেতর থেকেও ঘাতক বাহিনীর দালাল তালিকায় শরিক হওয়ার প্রক্রিয়া অব্যাহত ছিলো এ সময়। আজ মাদারীপুরের আবদুল মন্নান শিকদার, মুন্সীগঞ্জের রেকাবীবাজার ইউনিয়নের সদস্য আবু বকর মৃধা, চট্টগ্রাম শিল্প ও বণিক

সমিতির সিনিয়র সহ-সভাপতি নূরুল ইসলাম, ২২৯ ফিরিঙ্গীবাজারের এম জানে আলম দোভাষ আওয়ামী লীগের সঙ্গে সম্পর্কোচ্ছেদ করে পিডিপিতে যোগ দেন। তারা দেশের সংহতি রক্ষায় সার্বক্ষণিকভাবে কাজ করে যাওয়ার অঙ্গীকার করেন।

আজ প্রচার করা হয় ১ লাখেরও বেশি উদ্বাস্তু ফিরে আসার মিথ্যা খবর।

তথ্য সূত্র : দৈনিক পাকিস্তান ও পূর্বদেশ ২৯ ও ৩০ জুলাই '৭১।

২৯ জুলাই, বৃহস্পতিবার

আজ লাকসাম শান্তি কমিটির নেতারা মিলিত হন মুজাফফরগঞ্জে। এখানে সাবেক এমএলএ ও কুমিল্লা শান্তি কমিটির আহ্বায়ক আজিজুর রহমান এডভোকেট বেআইনী ঘোষিত আওয়ামী লীগের পাকিস্তানকে খণ্ডিত করার 'ষড়যন্ত্রকে' ১৯৫৭ সালের উমিচাঁদ, জগৎশেঠ এবং মীরজাফরের সঙ্গে তুলনা করেন। তিনি এসব ষড়যন্ত্রকারী ও ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত ব্যক্তিদের সমূলে উৎখাতের জন্যে আহ্বান জানান। এখানে উপস্থিত ছিরেন জেলার অন্যতম স্বাধীনতাবিরোধী সাবেক এমএলএ সাজেদুল হক, সাবেক এমপিএ আবদুস সামাদ এবং হাসমত উল্লাহ।

তথ্য সূত্র : দৈনিক পাকিস্তান পূর্বদেশ ৩০ ও ৩১ জুলাই '৭১।

৩০ জুলাই, শুক্রবার

কুমিল্লার হাজীগঞ্জে আলী আহসান ময়দানে শান্তি কমিটির নেতা আনোয়ার হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় দেশের পরিস্থিতির জন্যে সম্পূর্ণরূপে ভারতকে দায়ী করা হয়। এতে বক্তব্য রাখেন আজিজুর রহমান, সাজেদুল হক, আবদুস সালাম, নূরুল ইসলাম খান, আবদুস সামাদ, দলিলুর রহমান প্রমুখ।

সভা হয় চৌমুহনীতেও। এতে নেতৃত্ব দেন শান্তি কমিটির খায়েজ আহমদ। অন্যদিকে চট্টগ্রাম জেলার বোয়ালখালী থানার ৬ জন রাজাকার আজ ছত্রভঙ্গ করে দেয় স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাদের একটি ঘাঁটি। সৈয়দ জামাল আহমদের ছেলে এখলাছ মিয়াকে সেনাবাহিনীর হাতে তুলে দেয় এরা।

শান্তি কমিটির গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যরা ঘাতকদের হাতে তুলে দেয়া বোঙ্গা ও হানুফকে ময়মনসিংহে। পাংশার দালালরা আজ জানায়, রাজাকার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সার্বক্ষণিক তৎপরতার কারণে এলাকায় বিরাজ করছে পূর্ণ শান্তি।

এই দিন ঢাকার জিন্দাবাহার ইউনিয়নের সহ-সভাপতি মোহাম্মদ রফিক সম্পর্ক ছিন্ন করেন আওয়ামী লীগের সঙ্গে।

তথ্য সূত্র : দৈনিক পাকিস্তান, পূর্বদেশ ও ইত্তেফাক ৩১ জুলাই ১ ও ৩ আগস্ট '৭১।

৩১ জুলাই, শনিবার

এদিন কুমিল্লার অহিদুর রহমান, নজির আহমদ, বসরত আলী, শামসুল আলম, কাজী মফিজুল ইসলাম, আবদুল হামিদ, সিদ্দিকুর রহমান, কাজী আবুল বাসার, আবদুল মান্নানকে পাক হানাদারদের উপযুক্ত সহযোগিতা করার জন্যে অস্ত্রশস্ত্র দেয়া হয়।

অন্যদিকে প্রচার করা হয় "মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে সংঘর্ষে ১০০ জনের মতো নিহত হয়েছে।"

এদিন মৌলভীবাজারের মিসিরুল্লাহ, এনামুল্লাহ, জালালউদ্দিন প্রমুখ স্থানীয় দালালরা একত্রিত হয়ে এলাকার ৯ জন করে সদস্য নিয়ে গঠন করে ৩টি সাব-কমিটি। কমিটির কাজ নির্ধারিত হয় শান্তি কমিটির বিস্তৃতি বাড়ানো এবং মুক্তিযোদ্ধাদের ধ্বংস করতে বিভিন্ন এলাকার দালালদের মধ্যে সমন্বয় ও উৎসাহ সৃষ্টি করা।

তথ্য সূত্র : দৈনিক পাকিস্তান, ইত্তেফাক, সংগ্রাম, পূর্বদেশ ও আজাদ ১, ২, ৩ ও ৪ আগস্ট '৭১।

১ আগস্ট, রবিবার

শান্তি কমিটির অন্যতম নেতা এবং কাউন্সিল মুসলিম লীগের সহ-সভাপতি এ কিউ এম শফিকুল ইসলাম আজ আহ্বান জানান পাকিস্তানের আদর্শ ও অখণ্ডতা রক্ষার জন্যে দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় ও সাহসিকতার সঙ্গে সব ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে। তিনি পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করে মুসলিম লীগের সব গ্রুপকে একত্রিত করে একটি প্রকৃত জাতীয় সংস্থা রূপে গড়ে তোলার দৃঢ়সংকল্প ব্যক্ত করেন।

আজ ঢাকা শহর মুসলিম লীগের এক সভায় মুসলিম লীগ সেক্রেটারী এ এন এম ইউসুফ আবারো দেশের অবস্থার জন্যে তার ভাষায় মুক্তিযোদ্ধা নামধারী দুষ্কৃতকারীদের দায়ী করেন। তিনি মুসলিম লীগের প্রতিটি কর্মী ও সদস্যকে নির্দেশ দেন রাজাকার বাহিনীতে যোগ দিয়ে দুষ্কৃতকারী দমন করার।

তথ্য সূত্র : দৈনিক পাকিস্তান ও আজাদ ২ ও ৩ আগস্ট '৭১।

২ আগস্ট, সোমবার

আজ রাজশাহীতে রাজাকার বাহিনীর প্রথম ব্যাচের সশস্ত্র ট্রেনিং শেষ হয়। এ উপলক্ষে স্থানীয় জিন্নাহ ইসলামিক ইনস্টিটিউট হলে মিয়া মোহাম্মদ কাসেমীর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হয় সমাপনী উৎসব। শান্তি কমিটির নেতা আয়েনউদ্দীন এদের উদ্দেশে বলেন, 'দুষ্কৃতকারীদের হাত থেকে পাকিস্তানের আদর্শ, সংহতি ও অখণ্ডতা রক্ষার জন্যে রাজাকার বাহিনী তৈরি করা হচ্ছে।' দেশপ্রেমিক রাজাকাররা জীবন দিয়ে দেশকে রক্ষা করবে বলে তিনি আস্থা প্রকাশ করেন। পরে রাজাকারদের শপথ করানো হয় পবিত্র কোরআন স্পর্শ করিয়ে।

এ সময় আওয়ামী লীগের সঙ্গে সম্পর্কোচ্ছেদ করেন নেত্রকোনা শহর শাখার সহ-সভাপতি আমিনুল ইসলাম এডভোকেট। অন্যদিকে আজ কাইয়ুম মুসলিম লীগ প্রধান কাইয়ুম খান তাঁর বাসায় কর্মীদের উদ্দেশে বলেন, 'আওয়ামী লীগের ১৬৮ জন নির্বাচিত সদস্য রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছে। সুতরাং তাদের আর কোনো অস্তিত্ব নেই।' হানাদারদের অন্যতম দালাল সবুর খান আজ পশ্চিম পাকিস্তান সফর শেষ করে ফিরে আসেন ঢাকায়।

তথ্য সূত্র : দৈনিক পাকিস্তান, পূর্বদেশ, সংগ্রাম ও আজাদ ৩, ৪ ও ৫ আগস্ট '৭১।

৩ আগস্ট, মঙ্গলবার

সিলেটের কানাইক্ষেত্রে দালালদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সাবেক মন্ত্রী আবদুস সালাম। তিনি রাষ্ট্রদ্রোহী ও ধর্মদ্রোহীদের কার্যকলাপ প্রতিরোধের জন্যে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান।

এ সময় প্রচার করা হয় যে, ভারত থেকে ফিরে এসে পাকিস্তানিদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে ফেনী মহকুমার ছাগলনাইয়া-পরশুরাম এলাকা থেকে নির্বাচিত এম. এন. এ. প্রিন্সিপ্যাল ওবায়েদ উল্লাহ মজুমদার।

তথ্য সূত্র : দৈনিক পাকিস্তান ও সংগ্রাম ৪ ও ৫ জুলাই '৭১।

৪ আগস্ট, বুধবার

মুক্তিযুদ্ধের সময় দেশের ভেতরে গণহত্যাকে কেন্দ্র করে আন্তর্জাতিক মহলগুলোর বিরূপ মনোভাব ও বিশ্বজনমত গড়ে উঠতে থাকে। এরই প্রতিক্রিয়া হিসেবে পাকিস্তানি হানাদাররা বিদেশে অবস্থানরত কিছু বাঙালি এবং দেশের কতিপয় তথাকথিত বুদ্ধিজীবীকে দিয়ে মুক্তিযুদ্ধবিরোধী বিশ্বজনমত গড়ে তোলার অপচেষ্টা চালায়। এই দালালরা লন্ডনের একটি দৈনিকে বাঙালিদের প্রতিনিধি সেজে পাকিস্তানি শাসকদের গণহত্যাকে সমর্থন করে প্রথম পাতায় একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশ করে। এ বিজ্ঞাপনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন বলেন, পাকবাহিনীর আক্রমণ ছিলো অনিবার্য। তিনি জানান, কতিপয় বিচ্ছিন্নতাবাদী ও দুষ্কৃতকারী দেশে এমন অরাজকতা সৃষ্টি করেছিলো যে, সেনাবহিনীকে বাধ্য হয়ে হস্তক্ষেপ করতে হয়। সেনাবাহিনীকে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি বলেন, সেনাবাহিনীর কারণেই বহু বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের প্রাণ রক্ষা পেয়েছে। আজ হানাদাররা বাঙালি গণহত্যা অব্যাহত রাখার নতুন কৌশল হিসেবে জারি করে ১৬২ নং সামরিক আদেশ। এই আদেশবলে নতুন করে গঠন করা হয় ৬ নং সামরিক সেক্টর।

আজ রাজাকাররা কুষ্টিয়া সদর মহকুমার কুমারখালী থানার পাল্টি গ্রামে ২ জন মুক্তিযোদ্ধাকে হত্যা এবং ২ জনকে আটক করে। শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান খেলাফত আলী ও তার ছেলে রাজাকারদের সহায়তায় আরো ৬ জনকে হত্যা করে। মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডারকে নিজের হাতে গুলি করে খুন করে চেয়ারম্যানপুত্র শহীদুল ইসলাম।

এদিন খন্দকার আজিজুর রহমান ও রইসউদ্দীনকে যথাক্রমে আহ্বায়ক ও সম্পাদক করে ১৩ সদস্যবিশিষ্ট শান্তি কমিটি পুনর্গঠিত করা হয় গাইবান্ধায়।

তথ্য সূত্র : দৈনিক পাকিস্তান, সংগ্রাম ৫, ৬ ও ৭ আগস্ট '৭১।

৫ আগস্ট, বৃহস্পতিবার

আজ দেশ বিভাগের পর পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম গভর্ণর স্যার ফ্রেডারিক বোর্ন জানান, পাকিস্তানের সংহতির জন্যে প্রয়োজন ছিলো সামরিক হস্তক্ষেপের। তিনি আরো বলেন, "আমি আরও বিশ্বাস করি যে, পাকিস্তানের শত্রুরা আওয়ামী লীগে প্রবেশ করে সরলপ্রাণ লোকদের বিপথে পরিচালিত করে এবং বিদেশী শক্তির ক্রীড়নকে পরিণত হয়।"

তথ্য সূত্র : দৈনিক পাকিস্তান, আজাদ ও সংগ্রাম ৬, ৭ ও ৮ আগস্ট '৭১।

৭ আগস্ট, শনিবার

নেত্রকোনার পল্লীতে বাংলা প্রাইমারী স্কুল প্রাঙ্গণে শান্তি কমিটির নেতা ফারুক আহমদ এক সভায় বলেন, 'পাকিস্তান টিকে না থাকলে মুসলমানদের ধর্ম, কৃষ্টি, তাহজীব-তমদ্দুন, ইজ্জত কিছুই রক্ষা হবে না। ২৪ বছর আগে এ দেশের মুসলমানরা যেমন অধিকারবঞ্চিত ও অবহেলিত ছিলো, ঠিক তেমনি অধিকারহীন হয়ে হিন্দুদের গোলামে পরিণত হবে। আর এ জন্যেই শেখ মুজিব ও তার বাহিনী চক্রান্তে লিপ্ত রয়েছে।

ফারুক আহমদ সেনাবাহিনীর তৎপরতার প্রশংসা করে বলেন, 'আমাদের এবং দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনীর শরীরে একবিন্দু রক্ত থাকতে কোনো শক্তি পাকিস্তানকে ধ্বংস করতে পারবে না।' সভার সভাপতি মঞ্জুরুল হক মুক্তিযোদ্ধাদের 'ডাকাত বাহিনী' আখ্যায়িত করে বলেন, 'এই ডাকাতদল দেশকে মুক্ত করার নামে হিন্দুদের দাসত্বে আবদ্ধ করতে চায়। কাজেই এদেরকে মুক্তিবাহিনী বলা ন্যায়সঙ্গত নয়।'

... আকাশবাণীর জঘন্য মিথ্যা ও ভিত্তিহীন প্রচারণা কোনো মুসলমানেরই শোনা উচিত নয়।'

তথ্য সূত্র : দৈনিক পাকিস্তান, আজাদ ও সংগ্রাম ৮, ৯ ও ১১ আগস্ট '৭১।

৮ আগস্ট, রোববার

কান্দুলিয়া প্রাইমারী স্কুলে শহর শান্তি কমিটির আহ্বায়ক সাবেক এমপিএ আবদুল হাকিম তালুকদারের সভাপতিত্বে সভায় বক্তব্য রাখেন রহমতুল্লা, আবদুল হাই, হাকিম উদ্দিন, আমির আলী ও লাল মিয়া। সভায় হাকিম উদ্দিন, আমির আলী, লাল মিয়া, আবদুর রশীদ, নোয়াব আলী, হেকমত আলী ও ফজর শেখের সমন্বয়ে গঠিত হয় রক্ষীবাহিনী।

শান্তি কমিটির নেতারা মিলিত হয় চল্লিশা ইউনিয়ন কাউন্সিলে। আমজাদ আলী তালুকদার, মকবুল হোসেন, রমজান আলী, আমির উদ্দিন, গোলাম হোসেন, সিরাজ উদ্দিন তালুকদার, কেরামত আলী, মোজাফফর উদ্দিন, এমদাদুল হোসেনের সমন্বয়ে রক্ষীবাহিনী গড়ে তোলা হয় এখানে। এ সময় নেত্রকোনা শহর থেকে দু'মাইল দূরে কৃষ্ণখালি পুলের কাছ থেকে রাজাকাররা আটক করে তিনজন মুক্তিযোদ্ধাকে। খুলনার তেরখাদা থানার রাজাকাররা ২৫ জন মুক্তিযোদ্ধাকে হত্যা ও অনেককে আহত করে। ১ জন মুক্তিযোদ্ধাকে খুন করে সিলেটের গোপালগঞ্জ থানার রাজাকার ও শান্তি কমিটির সদস্যরা।

তথ্য সূত্র : দৈনিক পাকিস্তান, সংগ্রাম ও আজাদ ৯, ১১ ও ১৩ আগস্ট '৭১।

৯ আগস্ট, সোমবার

কনভেশন মুসলিম লীগ সেক্রেটারি জেনারেল মালিক মোহাম্মদ কাসেম আজ তিন মুসলিম লীগকে একত্রীভূত করার লক্ষ্যে আলোচনার জন্যে ঢাকা আসেন। তিনি এখানে ফজলুল কাদের চৌধুরী ও সবুর খানের সঙ্গে আলোচনা করবেন বলে মুসলিম লীগের একটি সূত্র জানায়। অন্যদিকে দুই লীগ নেতা কাইয়ুম খান ও মিয়া মমতাজ দৌলতানা আগামীকাল আলোচনায় বসবেন বলে জানা যায়।

আজ সবুর খান বলেন, 'তিন মুসলিম লীগের একত্রীকরণের কাজ তো প্রায় নিশ্চিত হয়েছেই, এমনকি ভারতীয় দালালদের শত্রুতার মুখে দেশের সব দক্ষিণপন্থী দলগুলো এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানে যোগ দেবে।'

ময়মনসিংহে রাজাকাররা এ সময় ৭০ জন মুক্তিযোদ্ধাকে হত্যা করে। অনেককে আহত করে এবং লুট করে বহু অস্ত্র। আজ মুন্সিগঞ্জের রিকাবীবাজারে কয়েকজন পাকিস্তানপন্থী সিদ্ধান্ত নেয় রাজাকার বাহিনীতে যোগ দেয়ার। আবদুল মাস্টারের নেতৃত্বে সংগঠিত হয়েছিলো এরা।

পাকিস্তান দরদী সংঘের সভাপতি এ টি সাদীও আজাদী দিবসে নতুন করে পাকিস্তানি আদর্শে অনুপ্রাণিত হওয়ার আহ্বান জানান।

তথ্য সূত্র : দৈনিক আজাদ ও সংগ্রাম ১০ ও ১১ আগস্ট '৭১।

১০ আগস্ট, মঙ্গলবার

আজ মুসলিম লীগ প্রধান মিয়া দৌলতানা জানান, ১৪ আগস্ট আজাদী দিবসে ফজলুর কাদের চৌধুরী এবং খান আবদুল কাইয়ুম খানের সঙ্গে এক সভায় বক্তব্য রাখবেন তিনি। তখনই চূড়ান্তভাবে একত্রীকরণের আলোচনা হবে। কাইয়ুম খান সবাইকে পাকিস্তানের আদর্শের প্রতি আস্থাশীল থাকার আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'এই আদর্শের ওপরেই দেশের অস্তিত্ব নির্ভরশীল। দ্বিজাতিতত্ত্বের আদর্শ থেকে বিচ্যুত হলে দেশের জন্যে তা বিপজ্জনক হবে। 'জয়বাংলা' ধ্বনিদানকারীরা এই বিপদকেই ডেকে এনেছে।'

আজ টাঙ্গাইল জেলা শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান হাকিম হাবিবুর রহমানের সভাপতিত্বে একত্রিত হয় বিন্দুবাসিনী স্কুল মাঠে স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি। জেলা শান্তি কমিটির সেক্রেটারি আবদুল খালেক সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে শত্রুর মোকাবেলা করার পরামর্শ দিয়ে এখানে বলেন, ভারতীয় ষড়যন্ত্রের মধ্য দিয়েই পাকিস্তানবিরোধী ধ্বনির উৎপত্তি হয়েছিলো। এই ধ্বনির মাধ্যমেই ভারত এদেশের সরলপ্রাণ জনসাধারণের মধ্যে বিদ্বেষের বীজ বপন করতে চেষ্টা করে। বর্তমানে তারা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ঘৃণ্য প্রচারণায় মেতে উঠেছে।' সেনাবাহিনীর ভূয়সী প্রশংসা করে এতে বক্তব্য রাখেন এডভোকেট সৈয়দ আবদুল্লাহেল ওয়াছেক, এডভোকেট শহীদুল্লা খান ইউসুফজারী, টাঙ্গাইল শহর শান্তি কমিটির সেক্রেটারি ডা. ক্যাপ্টেন আবদুল বাসেদ, অধ্যাপক মওলানা হাকিম ও খন্দকার আসাদুজ্জামান প্রমুখ।

তথ্য সূত্র : দৈনিক পাকিস্তান, আজাদ ও পূর্বদেশ ১১ ও ১২ আগস্ট '৭১।

১১ আগস্ট, বুধবার

আওয়ামী লীগের অনেকেই দলচ্যুত হয়ে এ সময় হাত মেলায় পাকিস্তানিদের সঙ্গে।

আজ ফজলুল কাদের চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন কনভেনশন মুসলিম রীগ নেতারা মিলিত হন দলীয় নীতি নির্ধারণী বৈঠকে। এতে স্বাধীনতা সংগ্রামকারীদের হাত থেকে পাকিস্তানকে রক্ষার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা দিয়ে আলোচনা করেন ফজলুল কাদের চৌধুরী.

রক্ষার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা দিয়ে আলোচনা করেন ফজলুল কাদের চৌধুরী, মালিক মোহাম্মদ কাসেম, শামসুল হুদা, মোহাম্মদ হোসেন প্রমুখ নেতা।

এদিন পিডিপি নেতা নূরুল আমিনের বাসায় পিডিপি নেতারা একত্রিত হয়ে ঠিক করেন তাদের কর্মপন্থা। এ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন পিডিপি'র পশ্চিম পাকিস্তান নেতা নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খান, মিয়া গোলাম দস্তগীর, মোঃ আরশাদ চৌধুরী এবং রফিকুল হোসেনসহ আরো অনেকে।

তথ্য সূত্র : দৈনিক আজাদ ও সংগ্রাম ১২ ও ১৩ আগস্ট '৭১।

১২ আগস্ট, বৃহস্পতিবার

ঢাকা শহর শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান আলহাজ্ব মোহাম্মদ সিরাজউদ্দীন ও সেক্রেটারী মোহাম্মদ মনসুর আলী প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে আজ আহ্বান জানান যথাযথভাবে আজাদী দিবস পালন করার। বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়, 'অবশ্যই আমাদেরকে দুষ্কৃতকারী ও বিচ্ছিন্নতাবাদীদের হাত থেকে দেশের আদর্শ ও অখণ্ডতা রক্ষার জন্যে নতুন করে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে।' তারা আজাদী দিবস উপলক্ষে শান্তি কমিটির ঘোষিত কর্মসূচিতে অংশ নেয়ার জন্যে সবার প্রতি আহ্বান জানান।

তথ্য সূত্র : দৈনিক আজাদ ও সংগ্রাম ১৪ ও ১৭ আগস্ট '৭১; মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্র : ৭ম খণ্ড।

১৩ আগস্ট, শুক্রবার

এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে খাজা খয়েরউদ্দীন বলেন, 'উপমহাদেশে ১২ কোটি মুসলমান তাদের নিজস্ব আবাসভূমি পাকিস্তান অর্জনের জন্যে যে সীমাহীন কোরবানি স্বীকার করেছে, পাকিস্তানের আদর্শ ও একতা বজায় রাখার জন্যে আজও তারা তেমনি কোরবানি দিতে প্রস্তুত রয়েছে। ... দেহের একবিন্দু রক্ত থাকতে প্রিয় পাকিস্তানের এক ইঞ্চি ভূমিও শত্রুর হাতে ছেড়ে দেবে না।'

তথ্য সূত্র : দৈনিক আজাদ ও সংগ্রাম ১৪, ১৭ আগস্ট '৭১; মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্র ৭ম খণ্ড।

১৪ আগস্ট, শনিবার

খুলনার খালিশপুর শিল্প এলাকার সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সবুর খান। বরিশালে সমাবেশ শেষে মিছিল বের হয় এডভোকেট আবুল হোসেনের নেতৃত্বে। রাজশাহীতে শান্তি কমিটি আয়োজিত সিম্পোজিয়ামে বক্তব্য রাখেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ড. এম এ বারী, শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান আয়েনউদ্দিন, আফাজুদ্দিন প্রমুখ। অন্য এক সভায় বক্তব্য রাখেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা বিভাগের ডীন ড. মকবুল হোসনে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ড. ওবায়দুল হক, অর্থনীতি বিভাগের রশিদ খান, আইন বিভাগের ড. জিল্লুর রহমান, রাজশাহী কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ শামসুদ্দিন মিয়া প্রমুখ।

চট্টগ্রামে বক্তব্য রাখেন জেলা শান্তি কমিটির আহ্বায়ক ও প্রাক্তন মন্ত্রী মাহমুদুন্নবী চৌধুরী, সরকারি উচ্চ মাধ্যমিক কলেজের উপাধ্যক্ষ এস এ মান্নান, হাটহাজারী কলেজের অধ্যক্ষ কাজী নাসিরউদ্দিন, সিটি কলেজের অধ্যক্ষ এ এ করিম চৌধুরী,

নিজামপুর কলেজের অধ্যক্ষ শাহ মোহাম্মদ খুরশীদ আলম ও প্রফেসর শামসুল হক এমপিএ।

তথ্য সূত্র : দৈনিক পাকিস্তান ও সংগ্রাম ১৬, ১৭ ও ১৮ আগস্ট '৭১: মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্র : ৮ম খণ্ড।

১৬ আগস্ট, সোমবার

অন্যদিকে আজ সিলেটে জেলা শান্তি কমিটির সদস্য ডা. আবদুল মালেকের বাসায় পাকিস্তানের আদর্শকে পুনরুজ্জীবিত করার উদ্দেশ্যে গঠন করা হয় পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি। এতে এডভোকেট শাহেদ আলীকে চেয়ারম্যান, ডা. আবদুল মালেককে ভাইস চেয়ারম্যান এবং অধ্যাপক আফজাল চৌধুরীকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়।

এদিন সিলেটের গোয়াইনঘাট থানার গুলনিবাগানে থানা শান্তি কমিটির আহ্বায়ক ফকরুল হাসান এডভোকেটের সভাপতিত্বে এক সভা হয়। এতে বক্তব্য রাখেন শামসুল হক, আহমদ আলী, গোলাম জিলানী প্রমুখ।

তথ্য সূত্র : দৈনিক পাকিস্তান, সংগ্রাম ও পূর্বদেশ ১৭, ১৮ ও ১৯ আগস্ট '৭১।

১৭ আগস্ট, মঙ্গলবার

কাউন্সিল মুসলিম লীগের সেক্রেটারি আবুল কাসেম এদিন এক বিবৃতিতে বলেন, '৫৪ সাল থেকেই আওয়ামী লীগ অরাজকতা সৃষ্টির মাধ্যমে পাকিস্তানকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র করছে। মার্চ থেকে এসব সমাজবিরোধীরা চূড়ান্ত আঘাত হানে। সম্মিলিতভাবে আমাদেরকে এসব দুষ্কৃতকারীদের প্রতিহত করে দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

তথ্য সূত্র : দৈনিক আজাদ ও সংগ্রাম ১৮ ও ১৯ আগস্ট '৭১।

১৮ আগস্ট, বুধবার

এদিন বরিশালের পাকিস্তান বাজারের আওয়ামী লীগ কর্মী জালালউদ্দীন আহমদ এবং মিসেস জাহানারা বেগম হাত মেলান পাক শাসকদের সঙ্গে।

তথ্য সূত্র : দৈনিক পাকিস্তান, আজাদ সংগ্রাম ১৮, ১৯ ও ২০ আগস্ট '৭১।

১৯ আগস্ট, বৃহস্পতিবার

লে. জেনারেল টিক্কা খান সামরিক বিধি ও পাকিস্তান দণ্ডবিধি অনুযায়ী অভিযুক্ত করেন ১৩ জন নির্বাচিত জাতীয় পরিষদ সদস্যকে। অভিযুক্তরা হলেন মিসেস নূরজাহান মুর্শেদ, মিজানুর রহমান চৌধুরী, কাজী জহিরুল কাইয়ুম, খন্দকার মুশতাক আহমদ, খুরশীদ আলম, নূরুল ইসলাম চৌধুরী, মোহাম্মদ ইদ্রিস, মুস্তাফিজুর রহমান, খালিদ মোহাম্মদ আলী, খাজা আহমদ, নূরুল হক, মোহাম্মদ হানিফ। রাষ্ট্রবিরোধী তৎপরতা, গুণ্ডাদের নিয়ে দল গঠন, নিরীহ জনসাধারণকে হত্যা, সেতু ও কালভার্ট ধ্বংস, জাতীয় পতাকার প্রতি অবমাননা, কায়েদে আযমের ছবির অমর্যাদাসহ বিভিন্ন অভিযোগে তাদেরকে অভিযুক্ত করা হয়। এর বিপরীতে যারা ঘাতকদের দালালি করছিলো তাদের সদস্যপদ বহাল রাখার হয়। সরকারিভাবে হানাদাররা ৯৪ জন জাতীয় পরিষদ সদস্যের সদস্যপদ বহাল থাকবে বলে ঘোষণা করে।

তথ্য সূত্র : দৈনিক আজাদ ও সংগ্রাম ২০, ২০ আগস্ট '৭১।

২০ আগস্ট, শুক্রবার

হবিগঞ্জের শান্তি কমিটির নেতা সৈয়দ কামরুল আহসান এ দিন ধরে আনেন আওয়ামী লীগ নবীগঞ্জ থানার সভাপতি, সহ-সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকসহ ৪ জনকে। অবর্ণনীয় নির্যাতন চালানো হয় তাদের ওপর। তারপর কোরআন শরীফ ছুঁয়ে শপথ করানো হয় তাদের সপক্ষ ত্যাগের জন্যে। এর আগেও এরকমভাবে ৪০ জনকে সপক্ষ ত্যাগের শপথ করানো হয়।

আজ কুমিল্লার অন্যতম দালাল এম এন এ সাজেদুল হক বিজয়পুরের এক জনসভায় দুষ্কৃতকারী ও ভারতীয় অনুচরদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করার জন্যে জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

তথ্য সূত্র : দৈনিক পাকিস্তান, সংগ্রাম ও আজাদ ২১, ২২ ও ২৩ আগস্ট '৭১; একাত্তরের ঘাতক ও দালালরা কে কোথায়।

২১ আগস্ট, শনিবার

ইসলামিক ডেমোক্রেটিক পার্টির জেনারেল সেক্রেটারি মেজর আফসারউদ্দিন আজ এক বিবৃতি দেন। বিবৃতিতে তিনি সব রাজনৈতিক দল ও নেতাদের প্রতি সম্মিলিত কর্মপন্থা নির্ধারণের লক্ষ্যে একটি জাতীয় সম্মেলনের আহ্বান জানান।

তথ্য সূত্র : দৈনিক পূর্বদেশ, সংগ্রাম ও আজাদ ২২ ও ২৪ আগস্ট '৭১।

২৩ আগস্ট, সোমবার

আজ পিডিপি নেতা মাহমুদ আলী বিশ্ব জনমতকে বিভ্রান্ত করার লক্ষ্যে লন্ডনে জানান, ইউরোপ ও আমেরিকার সংবাদপত্রসমূহ এখানে বসবাসকারী পাকিস্তানিদের বিভ্রান্ত করছে। তিনি বলেন, আমি প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে বলছি, পত্রপত্রিকায় যা প্রকাশিত হয়েছে পরিস্থিতি ঠিক তার বিপরীত। বিচ্ছিন্নতাবাদীরা যে সব প্রশ্ন তুলেছেন তা ঠিক নয়। ২৪ বছরের পাকিস্তানি শাসনে দেশের অনেক উন্নতি হয়েছে। মিল, কল-কারখানা, ডকইয়ার্ড প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পূর্ব পাকিস্তান বাঙালি অফিসারদের দ্বারা পরিচালিত হয়। কেন্দ্রেও বাঙালিরা উচ্চ পদে রয়েছে।

এ সময় লন্ডনে অবস্থানরত বাঙালিদের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধবিরোধী প্রচারণার কাজে নিয়োজিত ছিলেন মাহমুদ আলী জামিল উদ্দিন আলী, ব্যারিস্টার আব্বাস, সোহরাওয়ার্দী কন্যা বেগম আখতার সোলায়মান প্রমুখ। বেগম আখতার সোলায়মান এক সভায় বলেন, 'অতীতে আমরা এক ছিলাম, এখনও আছি, ভবিষ্যতেও থাকবো।'

এদিন সরকারিভাবে হানাদারদের সহযোগী আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচিত এমএনএ এবং এমপিএ'দেরকে পূর্ণ নিরাপত্তার আশ্বাস দেয়া হয়।

তথ্য সূত্র : একাত্তরের ঘাতক ও দালালরা কে কোথায়; দৈনিক আজাদ ও সংগ্রাম ২৪ ও ২৫ আগস্ট '৭১।

২৪ আগস্ট, মঙ্গলবার

শান্তি কমিটির আহ্বায়ক মুসলিম লীগ নেতা খাজা খয়েরউদ্দীন আজ পশ্চিম পাকিস্তানে যান। দলীয় সূত্রে বলা হয়, সেখানে তিনি পাকিস্তানের আদর্শে বিশ্বাসীদের নতুন করে কি করা উচিত সে বিষয়ে আলোচনা করবেন মিয়া মমতাজ দৌলতানাসহ অন্যান্য নেতার সঙ্গে।

এদিন কাইয়ুম মুসলিম লীগের ১৮ জন নেতা-কর্মী এক বিবৃতিতে ঐক্যবদ্ধভাবে দেশের শত্রুদের দমনের আহ্বান জানান। বিবৃতিতে তারা পাকিস্তানের স্বার্থ রক্ষায় সবুর খানের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। পাকিস্তানের আদর্শ ও অখণ্ডতা রক্ষায় সবুর খান যে কোনো ধরনের ত্যাগ স্বীকার ও সঠিক পদক্ষেপ নেবেন— এ রকম বিশ্বাস রয়েছে বলে জানান তারা।

তথ্য সূত্র : দৈনিক পাকিস্তান ও সংগ্রাম ২৪, ২৫ ও ২৬ আগস্ট '৭১।

২৬ আগস্ট, বৃহস্পতিবার

এতো গণহত্যা আর ধ্বংসযজ্ঞও যথেষ্ট মনে হয়নি পূর্ব পাকিস্তান কনভেনশন মুসলিম লীগের সভাপতি শামসুল হুদার কাছে। আর এ জন্যে তিনি আজ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার উদ্দেশে আহ্বান জানান, সরেজমিনে পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থা দেখে 'দুষ্কৃতকারী' দমনে আরও ফলপ্রসূ পদক্ষেপ নেয়ার।

ইব্রাহিম খলিলুর রহমান পাটোয়ারীর সভাপতিত্বে হানাদারদের সহযোগীরা একত্রিত হয় কুমিল্লার মেহেরে। এতে বক্তব্য করেন দলিলুর রহমান এবং বজলুর রহমান।

তথ্য সূত্র : দৈনিক পাকিস্তান ও আজাদ ২৭, ২৮ ও ২৯ আগস্ট '৭১।

২৮ আগস্ট, শনিবার

বিদেশে অবস্থানরত বাঙালিদের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে বিভ্রান্ত সৃষ্টি করতে পিডিপি নেতা মাহমুদ আলী প্রচারণা চালান আড়াই মাস ধরে। তিনি যুক্তরাজ্যের লন্ডন, কেন্ট, লুটন, গ্লাসগো, ম্যানচেস্টার, ব্রাডফোর্ড, হাডার্সফিল্ডসহ সুইজারল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, বেলজিয়াম, হল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডায় সফর করেন।

২৮ আগস্ট প্রচার করা হয় হবিগঞ্জ থেকে নির্বাচিত জাতীয় পরিষদ সদস্য ডা. আবুল হাসিমসহ ৪৮ জন বিদ্রোহী স্থানীয় শান্তি কমিটির কাছে পাকিস্তানের আদর্শ ও অখণ্ডতার প্রতি সমর্থন জানান কোরআন শপথ করে। এদের মধ্যে রয়েছেন হবিগঞ্জ মহকুমার আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং কোষাধ্যক্ষ।

রাজশাহী শান্তি কমিটির সভা হয় আজ আয়েনউদ্দীনের সভাপতিত্বে। সভায় আহ্বান জানানো হয় প্রতিটি শহীদ রাজাকারের পরিবারকে খাসজমি থেকে অথবা পরিত্যক্ত জমি থেকে ১০ বিঘা জমি দেয়ার। শান্তি কমিটি এসব পরিবারকে ৫০০ টাকা ও এক বস্তা চাল দেয়। শান্তি কমিটি স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে যারা কাজ করছে তাদেরকেও ভাতা দেয়।

তথ্য সূত্র : দৈনিক আজাদ ও সংগ্রাম ২৯ ও ৩০ আগস্ট '৭১।

২৯ আগস্ট, রবিবার

এদিন ঢাকা শহর কনভেনশন মুসলিম লীগের এক বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, প্রতিরক্ষা দিবসে বায়তুল মোকাররমে জনসভা অনুষ্ঠিত হবে। সভাশেষে প্রাদেশিক মুসলিম লীগ প্রধান শামসুল হুদার নেতৃত্বে মিছিল বের হয়ে প্রদক্ষিণ করবে শহর। যথাযথভাবে প্রতিরক্ষা দিবস পালনের সিদ্ধান্ত নেয় সিলেটের শান্তি কমিটির দালালরাও।

তথ্য সূত্র : দৈনিক পাকিস্তান, আজাদ সংগ্রাম ২৯, ৩০ ও ৩১ আগস্ট, ১ সেপ্টেম্বর '৭১।

৩০ আগস্ট, সোমবার

কুমিল্লার বুড়িচরং থানা শান্তি কমিটির সভায় কুমিল্লা শান্তি কমিটির আহ্বায়ক প্রাক্তন জাতীয় পরিষদ সদস্য আজিজুর রহমান, সাজেদুল হক, প্রাক্তন প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য আবদুস সামাদ প্রমুখ নেতারা আহ্বান রাখেন দুষ্কৃতকারীদের প্রতিরোধ করতে।

রাজশাহীর গোগরা বিলে আজ রাজাকাররা দু'জন মুক্তিযোদ্ধাকে খুন করে, আটক করে অস্ত্রশস্ত্রসহ ১ জনকে। ৪ জনকে খুন এবং ৩ জন মুক্তিযোদ্ধাকে আটক করে সিলেটের বিয়ানীবাজারে রাজাকাররা। রাজাকাররা ৬ জনকে হত্যা, ২ জনকে আহত এবং ১ জনকে আটক করে কুমারখালীর পাটনী গ্রামে। এতে নেতৃত্ব দেন শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান খেলাফত হোসেনের ছেলে শহীদুল হোসেন আমালপুরের আলবদররা আটক করে ৬ জন মুক্তিযোদ্ধাকে দশটি হ্যান্ডগ্রেন্ডে, দু'টি নডডিনামাইট ও আরো বহু অস্ত্রশস্ত্রসহ।

তথ্য সূত্র : দৈনিক পাকিস্তান, আজাদ. সংগ্রাম ও পূর্বদেশ ৩০ ও ৩১ আগস্ট, ১ সেপ্টেম্বর '৭১; একাত্তরের ঘাতক ও দালালরা কে কোথায়।

১ সেপেম্বর, বুধবার

টিক্কা খান এ সময় কুষ্টিয়া এলাকা সফরে গেলে কাইয়ুম মুসলিম লীগের জয়েন্ট সেক্রেটারি ও জাতীয় পরিষদের সাবেক সদস্য মনসুর আলী অভিনন্দন জানান তাকে। তিনি বলেন, 'দেশের জন্যে কাজ করতে গিয়ে অনেকেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কুষ্টিয়া এলাকার পুনর্গঠনে কমপক্ষে ৫০ হাজার টাকার সাহায্য প্রয়োজন।'

তথ্য সূত্র : দৈনিক পাকিস্তান ও আজাদ ২ ও ৩ সেপ্টেম্বর '৭১।

২ সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার

নতুন গভর্নর ডা. মালিককে অভিনন্দন জানান পিডিপি'র জয়েন্ট সেক্রেটারী ও শান্তি কমিটির নেতা এ কে রফিকুল হোসেন, ফেডারেশন অব লেবার-এর ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট সাইফুর রহমান ও ভাইস প্রেসিডেন্ট এম এ সবুর, খুলনা শিপইয়ার্ড কর্মচারী ইউনিয়নের জেনারেল সেক্রেটারী এস এম সোলেমান, জাতীয় পরিষদ সদস্য মুসলিম লীগ নেতা আবদুল হাকিম বিক্রমপুরী, কনভেনশন লীগের সেক্রেটারি এ এন এম ইউসুফ, বরিশালের সাবেক প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য সুলতান মাহমুদ... ঢাকা শহর কনভেনশন মুসলিম লীগ নেতা এ এইচ মোহাম্মদ হোসেন ও এস এম মবিনুল হক।

এদিন আওয়ামী লীগের হালুয়াঘাট থানার ভাইস প্রেসিডেন্ট এডভোকেট হাকিম আলী বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনে যোগ দিয়ে যারা নিরীহ জনগণের শান্তি ভঙ্গ করছে, তাদের কার্যকলাপের নিন্দা করেন।

তথ্য সূত্র : দৈনিক পাকিস্তান ও সংগ্রাম ৩ ও ৬ সেপ্টেম্বর '৭১।

৬ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার

'শির দেগা, নেহি দেগা আমামা' এই শ্লোগান দিয়ে শুরু হয় পাকিস্তানিদের প্রতিরক্ষা দিবস। এই দিবসকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত হয় বিভিন্ন সভা ও মিছিল। ঢাকা

বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলের সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন খান এ সবুর। বক্তব্য রাখেন শাহ আজিজুর রহমান, ড. মোহর আলী, অধ্যাপক আফসার উদ্দিন, ডঃ হাসানউজ্জামান প্রমুখ।

কনভেনশন মুসলিম লীগ সভা করে বায়তুল মোকাররমে। এতে বক্তব্য রাখেন শামসুল হুদা, সাবেক জাতীয় পরিষদ সদস্য আবদুল আওয়াল, প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক এ এন এম ইউসুফ।

কাউন্সিল মুসলিম লীগের সভায় বক্তব্য রাখেন অবজারভার সম্পাদক আবদুস সালাম, জগন্নাথ কলেজের অধ্যাপক আজহার কাদরী প্রমুখ।

আবদুর রহমান সরদারের সভাপতিত্বে ইসলামপুর ইউনিয়ন পরিষদ অফিসে শান্তি কমিটির দালালরা আয়োজন করে সিম্পোজিয়ামের। পাকিস্তান শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভায় সভাপতিত্ব করেন সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট আবদুস সাত্তার। ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে তথাকথিত উদ্বাস্তু পরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করেন পরিষদের সভাপতি শেখ মনিরুজ্জামান। চট্টগ্রাম জেলা শান্তি কমিটির উদ্যোগে সভায় সভাপতিত্ব করেন শান্তি কমিটির নেতা মাহমুদুন্নবী চৌধুরী। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সিটি কলেজের অধ্যক্ষ রেজাউল করিম।

সিলেটে শান্তি কমিটির আহ্বায়ক শহীদ আলীর নেতৃত্বে এক সভায় ব্রিগেডিয়ার ইফতেখার আহম্মদ রানা প্রশংসনীয় কাজের জন্যে রাজাকার সদস্য আদম মিয়া, ওসমান গণি ও আবদুর রহমানকে টিক্কা খানের দেয়া পদক ও প্রশংসাপত্র দেন।

তথ্য সূত্র : দৈনিক পাকিস্তান ও সংগ্রাম ৬, ৮, ৯ ও ১০ সেপ্টেম্বর '৭১।

৭ সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার

জোহরা ম্যানসনে এদিন পূর্ব পাকিস্তান পিডিপি'র সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আজিজুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয় ঢাকায় অবস্থানরত পিডিপি নেতাদের সভা। এ সময় চাঁদপুর মহকুমা আওয়ামী লীগের প্রাক্তন সভাপতি চাঁদ বখ্শ্ পাটোয়ারী, মহকুমা আওয়ামী লীগের কোষাধ্যক্ষ কফিলউদ্দীন চৌধুরী, মিজানুর রহমান চৌধুরীর ভাই ডা. মজিবুর রহমান ও ফরিদপুরের নূরুল ইসলাম স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করে পাকিস্তানের পক্ষে কাজ করার শপথ নিয়েছেন বলে জানা যায়।

নোয়াখালীতে এদিন পাকিস্তানিদের সহযোগীদের সভায় বক্তব্য রাখেন এডভোকেট রুহুল আমিন, এডভোকেট মোহাম্মদ করিম, এডভোকেট আবদুল ওয়াহাব, আবু সুফিয়ান, মওলানা মকবুল আহমদ প্রমুখ।

এডভোকেট ইদ্রিস আলীর সভাপতিত্বে শান্তি কমিটির সভা হয় মুন্সীগঞ্জে। বক্তব্য রাখেন রামপাল ইউনিয়নের চেয়ারম্যান শফিউল হক ভূঁইয়া, বেতকার চেয়ারম্যান এ. কাইউম। এ রকম আরো একটি সভা হয় কিশোরগঞ্জে।

সিলেটের বড়লেখা থানা শান্তি কমিটির সভায় প্রধান বক্তা গোলাম জিলানী ইন্দিরা সরকারকে পরামর্শ দেন ৬ দফা বাস্তবায়নের। অন্যান্য যারা বক্তব্য রাখেন তারা হলেন হাফেজ লুৎফর রহমান, আবদুল হাদী, শামসুদ্দিন আহমদ, আবদুর রব প্রমুখ।

তথ্য সূত্র : দৈনিক পাকিস্তান, সংগ্রাম ও আজাদ ৮, ৯ ও ১০ সেপ্টেম্বর '৭১।

৮ সেপ্টেম্বর, বুধবার

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে পাকিস্তানের প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব করবেন পিডিপি নেতা মাহমুদ আলী বলে জানা যায় আজ। এ দলে ছিলেন শাহ আজিজুর রহমান, জুলমত আলী খান, ডঃ বেগম এনায়েতউল্লাহ, মিসেস রাজিয়া ফয়েজ, ডঃ ফতিমা সাদিক, এ. টি. সাদীসহ আরও ১৬ জন।

তথ্য সূত্র : দৈনিক সংগ্রাম, পাকিস্তান ও আজাদ ৮, ৯ ও ১০ সেপ্টেম্বর '৭১।

৯ সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার

নেত্রকোনার ৪ জন আওয়ামী লীগ নেতা এ সময় দল ত্যাগ করে পাকিস্তানি হানাদারদের সহযোগীদের খাতায় নাম লেখায়। এরা হলেন নেত্রকোনা থানা আওয়ামী লীগের সভাপতি নূরুল ইসলাম খান, কালিয়ালাত ইউনিয়ন শাখার সেক্রেটারি ডা. গিয়াসউদ্দীন আহমদ, শহর শাখার সদস্য সোহরাব হোসেন ও মহকুমা আওয়ামী লীগের সদস্য এমাদাদুল হক।

তথ্য সূত্র : দৈনিক পাকিস্তান, আজাদ, ও সংগ্রাম ১০ ও ১১ সেপ্টেম্বর।

১০ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার

প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ২১ নং সামরিক আদেশকে পুনর্গঠন করে জারি করেন ২৪ নং সামরিক আদেশ। এদিন আরো জানা যায়, পিপলস পার্টির পার্লামেন্টারি গ্রুপ এবং জহিরুদ্দিনের নেতৃত্বে গঠিত আওয়ামী লীগের সদস্যদের মধ্যে সমঝোতা হয়েছে।

তথ্য সূত্র : দৈনিক পাকিস্তান, আজাদ ও সংগ্রাম ১০, ১২, ১৩ ও ১৪ সেপ্টেম্বর '৭১।

১১ সেপ্টেম্বর, শনিবার

তথাকথিত জাতির পিতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ'র ২৩তম মৃত্যুবার্ষিকী আজ। এ জন্যে এদিনটি ঘোষিত হয় সরকারি ছুটি হিসেবে। এ উপলক্ষে কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটি আলোচনা সভার আয়োজন করে আবদুল জব্বার খদ্দরের সভাপতিত্বে। ঢাকা শহর শান্তি কমিটির সভায় বক্তব্য রাখেন শহর সম্পাদক মোহাম্মদ মনসুর আলী, যুগ্ম সম্পাদক এম রইসউদ্দীন, মোবারক হোসেন, ওয়াহিদুল্লাহ, হাফিজুল হক প্রমুখ।

মইনুদ্দীন চৌধুরী মেমোরিয়াল হলে (লালকুঠি) ঢাকা শহর পিডিপি আয়োজিত সভায় নূরুল আমিন বলেন, 'এটা আমার ঈমান ও বিশ্বাস, কেয়ামত পর্যন্ত পাকিস্তান টিকে থাকবে।' এতে আরো বক্তব্য রাখেন পিডিপি নেতা মাহমুদ আলী, এডভোকেট জুলমত আলী, এ কে রফিকুল হোসেন, শামসুর রহমান, ফজলুল হক চৌধুরীসহ বিভিন্ন ব্যক্তি।

তথ্য সূত্র : দৈনিক পাকিস্তান, আজাদ ও সংগ্রাম ১১, ১২, ১৩ ও ১৪ সেপ্টেম্বর '৭১।

১৩ সেপ্টেম্বর, সোমবার

নবীগঞ্জের জীবনযাত্রা স্বাভাবিক বলে জানানো হয়। ডাঃ নুরুর রহমান, মোবারক হোসেন, মোহাম্মদ মবিনুল হক, আবদুল মান্নান, গোলাম মোর্শেদসহ কনভেনশন মুসলিম লীগের ১৫ জন সদস্য এক যুক্ত বিবৃতিতে জাতিসংঘের অধিবেশনে যোগদানকারী দলকে অভিনন্দন জানান আজ।

হবিগঞ্জের এমপিএ আওয়ামী লীগের ডাঃ আবুল হাসেম এবং টাঙ্গাইলের মোহাম্মদ শামসুদ্দিন আহমদ পাকিস্তানিদের সহযোগী হিসেবে যোগ দেয়ায় তাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়।

তথ্য সূত্র : দৈনিক পাকিস্তান, আজাদ ও সংগ্রাম ১৩, ১৪, ১৫ ও ১৬ সেপ্টেম্বর '৭১।

১৫ সেপ্টেম্বর, বুধবার

নারায়ণগঞ্জে আজ আওয়ামী লীগের সিটি শাখার সাংস্কৃতিক সম্পাদক মকিবুল ইসলাম, মহকুমা নেতা ডা. হারুনর রশীদ, থানা সেক্রেটারি মোহাম্মদ ফিরোজ মিয়া, সদস্য আবদুল জলিল সরদার দলের সঙ্গে সম্পর্কোচ্ছেদ করে সমর্থন জানান হানাদারদের প্রতি।

তথ্য সূত্র : দৈনিক পাকিস্তান, সংগ্রাম ও আজাদ ১৫, ১৬, ১৭ ও ১৮ সেপ্টেম্বর '৭১।

১৬ সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার

লে. জেনারেল নিয়াজী এদিন সফর করেন চট্টগ্রাম এলাকা। পরে তিনি রাঙ্গামাটি যান। এখানে তাকে চাকমা প্রধান এবং নির্বাচিত এমএনএ রাজা ত্রিদিব রায় প্রমুখ অভ্যর্থনা জানান। এখানে স্থানীয় অফিসার নিয়াজীকে জানান, রাজাকারদের তৎপরতায় অনেক কমে গেছে তাদের কাজ। পূর্ব পাকিস্তান কনভেনশন মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক এ. এন. এম. ইউসুফ এদিন বিবৃতি দেন গভর্নরের নীতি-নির্ধারণী ভাষণের প্রশংসা করে। বৌদ্ধ প্রচার সংঘের সভাপতি বিশুদ্ধানন্দ মহাথেরোর নেতৃত্বে ৪ সদস্যবিশিষ্ট একটি বৌদ্ধ প্রতিনিধি দল এদিন দেখা করেন গভর্নর ডাঃ মালিকের সঙ্গে।

সিলেট থেকে নির্বাচিত আওয়ামী লীগ সদস্য ডঃ আবুল হাসেম যোগ দেন এ সময় পিডিপিতে।

তথ্য সূত্র : দৈনিক পাকিস্তান, আজাদ ও সংগ্রাম ১৬, ১৭ ও ১৮ সেপ্টেম্বর '৭১।

১৮ সেপ্টেম্বর, শনিবার

পূর্ব পাকিস্তান কনভেনশন মুসলিম লীগের জেনারেল সেক্রেটারী এ এন এম ইউসুফ গভর্নরের বেতার ভাষণকে অভিনন্দিত করে বলেন, গভর্নর তার ভাষণে দেশের নিরাপত্তার পরিবেশ সৃষ্টির সংকল্প প্রকাশ করেছেন।

তথ্য সূত্র : দৈনিক পাকিস্তান, সংগ্রাম ও আজাদ ১৮, ১৯ ও ২০ সেপ্টেম্বর '৭১।

১৯ সেপ্টেম্বর, রবিবার

খাজা খয়েরউদ্দীনের বাসায় কাউন্সিল মুসলিম লীগের কার্যকরী কমিটির বৈঠক হয় আজ। পূর্ব পাকিস্তান চাষী কল্যাণ সমিতি ঘোষণা করে, আগামী ২৬ সেপ্টেম্বর সিদ্দিকবাজার কাউন্সিল হাউসে অনুষ্ঠিত হবে সমিতির ঢাকা জেলার কর্মী সম্মেলন। হবিগঞ্জ থেকে নির্বাচিত আওয়ামী লীগ সদস্য ডা. আবুল হাসেমের সাক্ষাৎকার প্রচারিত হয় আজ রাতে রেডিও পাকিস্তানে। স্বাধীনতা সংগ্রামের বিপক্ষে বক্তব্য রাখেন তিনি এ সাক্ষাৎকারে।

তথ্য সূত্র : দৈনিক পাকিস্তান, সংগ্রাম ও আজাদ ১৯, ২০ ও ২২ সেপ্টেম্বর '৭১।

২০ সেপ্টেম্বর, সোমবার

সৈয়দ আজিজুর হকের বাসায় আজ পিডিপি'র বিশিষ্ট নেতাদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে উপনির্বাচন পিছিয়ে দেয়ার ব্যাপারে নূরুল আমিনের দেয়া বিবৃতিকে অনুমোদন করা হয়। একই দাবি জানান কাইয়ুম মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক খান এ. সবুর।

তথ্য সূত্র : দৈনিক পাকিস্তান ও আজাদ ২০, ২১ ও ২২ সেপ্টেম্বর '৭১।

২৩ সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার

কাউন্সিল মুসলিম লীগের ভাইস প্রেসিডেন্ট এ কিউ এম শফিকুল ইসলামসহ বেশ কয়েকজন স্বাধীনতাবিরোধী আজ পশ্চিম পাকিস্তানে যান। জানা যায়, তারা কানাডাসহ পাশ্চাত্যের বেশ কয়েকটি দেশ সফর করবেন পাকিস্তানের পক্ষে বিশ্ব জনমত সৃষ্টি করার জন্যে।

অবসরপ্রাপ্ত এয়ার ভাইস মার্শাল আজগর খান শান্তি কমিটি, মন্ত্রিপরিষদ এবং অন্যান্য স্বাধীনতাবিরোধী সংগঠনসমূহের সমালোচনা করেন। এর প্রতিবাদ জানিয়ে বিবৃতি দেন ঢাকা কনভেনশন মুসলিম লীগের নেতা ডা. নুরুর রহমান, মোবারক হোসেন, দেওয়ান এ কাদের, আবদুল হাকিম, জি এম সরদার। বিবৃতিতে তারা বলেন, বিভিন্ন জেলার নেতাদের কর্মকাণ্ডের রেকর্ড দেখেই সরকার মন্ত্রী নিয়োগ করেছে। শান্তি কমিটি সম্পর্কে তারা বলেন, দেশের জন্যে যারা অকাতরে জীবন বিলিয়ে দিচ্ছে তাদের সম্পর্কে কোনো বিভ্রান্তকর বক্তব্য চলতে পারে না।

ঢাকা শহর শান্তি কমিটির সাধারণ সম্পাদক এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মোহাম্মদ মনসুর আলী বেআইনী ঘোষিত আওয়ামী লীগের এমএনএ, এমপিএ এদের সম্পর্কে কিছু না বলে শান্তি কমিটি এবং অন্যান্য দেশপ্রেমিকদের সমালোচনা করার জন্যে মর্মাহত হন। অন্যান্যদের মধ্যে প্রতিবাদ জানান, কনভেনশন মুসলিম লীগের আব্দুল আওয়াল, আয়েন উদ্দিন, আবদুল হান্নান, এস হক, মোহাম্মদ হোসেন, পূর্ব পাকিস্তান জমিয়তে ইত্তেহাদুল ওলামার সাধারণ সম্পাদক মিয়া মফিজুল হক।

আজকের দৈনিক সংগ্রামে ঢাকার মীরহাজিরবাগের সেরাজুল ইসলাম আখতারের একটি চিঠি প্রকাশিত হয়। চিঠিতে তিনি মুক্তিযোদ্ধাদেরকে স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে সরে এসে দালালদের কাতারে দাঁড়ানোর পরামর্শ দেন।

চিঠিতে তিনি স্বাধীনতার নামে যারা দেশে অরাজকতা সৃষ্টি করছে তাদেরকে 'যেমন কুকুর তেমন মুগুর' দিয়ে ঠাণ্ডা করার জন্য রাজাকার বাহিনীকে আরো জোরদার এবং ভারী অস্ত্রশস্ত্র দেয়ার অনুরোধ জানান। রাজশাহীর ঘোষপুরে আজ হানাদাররা আক্রমণ চালায়, হানাদারদের আক্রমণে শহীদ হন ৫৭ জন মুক্তিযোদ্ধা। নির্যাতিত হয় নিরীহ গ্রামবাসীরা। বাড়িতে বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ৪০টি রাইফেল, ৩টি এলএমজি, ২০৭টি হাতবোমা, ১৬টি মাইনসহ প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র আটক করা হয়।

এ সময় নেত্রকোনা থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার আওয়াল ইসলাম আহমদের নেতৃত্বে পুলিশ ও রাজাকাররা হামলা চালায় সান্দকোনা গ্রামের মুক্তিযোদ্ধা নূরুল ইসলামের

বাড়িতে। তারা নূরুল ইসলামকে ধরতে না পারলেও তার বাড়ি চল্লাশি করে ১টি রাইফেল ও গোলাবারুদ বের করে। স্থানীয় দালালদের কাছ থেকে খবর পেয়ে রাজাকার ও পুলিশ তার বাড়িতে হানা দিয়েছিল।

তথ্য সূত্র : দৈনিক পাকিস্তান ও দৈনিক সংগ্রাম ৫ ও ৭ অক্টোবর '৭১।

২৪ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার

এ এস এম সোলায়মান সমাজকল্যাণ ও পরিবার পরিকল্পনা বোর্ডের কর্মকর্তাদের এদিন সকল বাধা অপসারিত করে দেশ গঠনের নির্দেশ দেন। একই দিন তিনি নারায়ণগঞ্জে পাকিস্তানিদের সহযোগীদের সঙ্গে মিলিত হন।

তথ্য সূত্র : দৈনিক সংগ্রাম ও পাকিস্তান ২৪, ২৫ ও ২৬ সেপ্টেম্বর '৭১।

২৫ সেপ্টেম্বর, শনিবার

আজ এক যুব সমাবেশে সবুর খান যুব সমাজকে ভারতীয় প্রচারণায় বিভ্রান্ত না হয়ে বহু কষ্টে অর্জিত পাকিস্তানকে জীবন দিয়ে রক্ষা করার আহ্বান জানান। কনভেনশন মুসলিম লীগ পশ্চিম পাকিস্তান শাখার সাধারণ সম্পাদক মালিক মোহাম্মদ কাসেম ঢাকা আসেন আজ।

তথ্য সূত্র : দৈনিক পাকিস্তান ও সংগ্রাম ২৫, ২৬, ২৮ ও ২৯ সেপ্টেম্বর '৭১।

২৭ সেপ্টেম্বর, সোমবার

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে ভাষণ দিতে গিয়ে এদিন মাহমুদ আলী বলেন, 'পূর্ব পাকিস্তান-ভারত সীমান্তকে ভারত একটি সশস্ত্র সংঘর্ষের ক্ষেত্রে পরিণত করেছে। তারা বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সশস্ত্র ট্রেনিং দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে ধ্বংসাত্মক কাজে পাঠাচ্ছে। শরণ সিং-এর বাংলাদেশ সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, 'বাংলাদেশ হচ্ছে কতিপয় বিচ্ছিন্নতাবাদীর স্বপ্নবিলাস মাত্র।'

তথ্য সূত্র : দৈনিক পাকিস্তান ও সংগ্রাম ২৮ ও ২৯ সেপ্টেম্বর '৭১।

২৮ সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার

তথ্যমন্ত্রী ওবায়দুল্লাহ মজুমদার উদ্বাস্তুদের ফিরে আসার ব্যাপারে ভারতীয় বাধা অপসারণের জন্যে চাপ প্রয়োগের আহ্বান জানান জাতিসংঘের প্রতি। উল্লেখ্য, ওবায়দুল্লাহ মজুমদার আওয়ামী লীগের টিকিটে নির্বাচিত এমএনএ এবং তিনি দু'মাস উদ্বাস্তু শিবিরে অবস্থান করেছেন বলে জানান। তার মতে, উদ্বাস্তুরা দলে দলে ফিরে আসতে চাইছে, কিন্তু ভারতীয় চররা তাদেরকে আটকে রেখেছে। যুবকদেরকে জোর করে অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সীমান্তের এ পাড়ে পাঠানো হচ্ছে।

এ সময় জানা যায়, নভেম্বরের মাঝামাঝি শাসনতন্ত্র ঘোষণা করা হতে পারে। ফজলুল কাদের চৌধুরী আজ শাহবাগের লীগ ভবনে সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন। তিনি দেশে একটি জাতীয় সরকার গঠনের পরামর্শ দেন। তিনি নতুন শাসনতন্ত্রে নিজের কিছু দাবি সংযোজনের সুপারিশ করে প্রেসিডেন্টের নীতিকে স্বাগত জানান।

তথ্য সূত্র : দৈনিক পাকিস্তান ও আজাদ ২৮, ২৯ ও ৩০ সেপ্টেম্বর '৭১।

২৯ সেপ্টেম্বর, বুধবার

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে দ্বিতীবারের মতো ভাষণ দেন মাহমুদ আলী। ভারতীয় প্রতিনিধি শরণ সিং-এর বক্তব্যের প্রতিবাদে তিনি কোনো রাজনৈতিক বিতর্কে না গিয়ে উদ্বাস্তু সমস্যা সমাধানের আহ্বান জানান।

মাহমুদ আলী অধিবেশনে যোগদানকারী আরব গ্রুপের সঙ্গেও পাকিস্তান সংক্রান্ত আলোচনা করেন।

প্রতিনিধি দলের অন্যতম সদস্য শাহ আজিজুর রহমান এ সময় উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের নামে অর্থ সংগ্রহের জন্যে শিকাগোতে যান। সেখানে তিনি পাকিস্তানি ছাত্রদের আয়োজিত ভোজসভায় বলেন, 'ভারত নিজেদের হীনস্বার্থ উদ্ধারের জন্যে উদ্বাস্তুদের ফিরতে দিচ্ছে না।'

সেক্রেটারিয়েটের কেবিনেট কক্ষে আজ ডা. মালিকের সভাপতিত্বে মন্ত্রিপরিষদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এতে মন্ত্রীরা যুদ্ধকালীন কৃচ্ছ্রতা ও দেশপ্রেম দেখাতে তাদের বেতন ৫ থেকে ১০ ভাগ কমানোর সিদ্ধান্ত নেন।

কনভেনশন মুসলিম লীগের আবদুর রহমান, কাউন্সিল মুসলিম লীগের আলহাজ মোহাম্মদ সিরাজ উদ্দীন এবং কাইয়ুম মুসলিম লীগের হাকিম ইরাতজার রহিম খান এক যুক্ত বিবৃতিতে ঢাকার মঈনুদ্দিন চৌধুরী স্মৃতি হলে অনুষ্ঠিতব্য ৩ অক্টোবরের যৌথ কর্মী সম্মেলনে যোগ দিয়ে ৩ মুসলিম লীগ একত্রীকরণের দাবি উত্থাপন করতে বলেন। ঢাকা সফর শেষে আজ করাচিতে ফিরে যান কনভেনশন মুসলিম লীগের সেক্রেটারি জেনারেল মালিক মোহাম্মদ কাসিম। যাত্রার আগে তিনি বলেন, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান একে-অপরকে ছাড়া চলতে পারবে না।

তথ্য সূত্র : দৈনিক পাকিস্তান. সংগ্রাম ও আজাদ ২৯ ও ৩০ সেপ্টেম্বর ও ১ অক্টোবর '৭১।

৩ অক্টোবর, রবিবার

পিডিপি নেতা নূরুল আমিনের বাসায় আজ দলের কার্যকরী কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে দলের সবাইকে দেশগঠনের কাজে এগিয়ে আসার আহ্বান জানানো হয়। সেই সঙ্গে গোলযোগ, ক্ষতিগ্রস্ত অর্থনীতির পুনর্গঠনের দাবি জানান। আজ উপ-নির্বাচন সংক্রান্ত এক সরকারি প্রেসনোট জারি করা হয়। প্রেসনোটে প্রাদেশিক পরিষদের বাকি ৮৮টি শূন্য আসনের তফসিল ঘোষণা করা হয়। আগামী ১৮ ডিসেম্বর থেকে ৭ জানুয়ারির মধ্যে এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। অন্যান্য আসনগুলোর তফসিল আগেই ঘোষণা করা হয়।

চাঁদপুরের ইচলী গেস্ট হাউজে আজ সভা হয় শান্তি কমিটির। বক্তারা বলেন, আওয়ামী লীগ জনগণের সঙ্গে বেঈমানী করেছে। এই বেঈমানদের এমনকি আমাদের বংশধররাও ক্ষমা করবে না। সভায় বক্তব্য রাখেন মওলানা শামসুল হক, আবদুল হামিদ, মজিদ মজুমদার, সিরাজুল ইসলাম, শহিদুল্লাহ, নজরুল ইসলাম প্রমুখ।

তথ্য সূত্র : দৈনিক পাকিস্তান, সংগ্রাম, আজাদ ২১, ২২ ও ২৩ সেপ্টেম্বর '৭১।

৪ অক্টোবর, সোমবার

কৃষক শ্রমিক পার্টির সাধারণ সম্পাদক জনাব এম এ হাই এক বিবৃতিতে আজ পাকিস্তানের দুশমনদের নির্মূল করার জন্যে মুসলমান যুবকদের প্রতি আহ্বান জানান।

এ সময় স্বাধীনতাকামী বাঙালিদের মধ্যে হতাশা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রচার করা হয়, মুক্তিযোদ্ধারা ট্রেনিং শেষে দেশে ফিরে দলে দলে আত্মসমর্পণ করছে। সিলেটে প্রত্যাবর্তনকারী এ এস এম শাহজাহান নামে একজন এক বিবৃতিতে বলেন, "ভারতে অবস্থানরত পাকিস্তানি বিদ্রোহীদের যাদেরকে বাধ্যতামূলকভাবে পূর্ব পাকিস্তানে পাঠানো হচ্ছে তারা একে তাদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের একটা ভালো সুযোগ বলে মনে করছে।"

তথ্য সূত্র : দৈনিক পাকিস্তান ও সংগ্রাম ৫ ও ৭ অক্টোবর '৭১।

৫ অক্টোবর, মঙ্গলবার

পাকিস্তানে সশস্ত্র হস্তক্ষেপের জন্যে আজ ভারতের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়। সেই সঙ্গে ভারতকে তার নীতি থেকে বিরত করানোর জন্যে বিশ্ব সমাজের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। জাতিসংঘে যোগদানকারী প্রতিনিধি মাহমুদ আলী বলেন, 'আমাদের তরফে এইটুকু বলতে পারি যে, ভারতীয় হস্তক্ষেপ প্রতিরোধে আমরা দৃঢ়সংকল্প।'

তথ্য সূত্র : দৈনিক পাকিস্তান, সংগ্রাম ও পূর্বদেশ ২৩, ২৪ ও ২৫ সেপ্টেম্বর '৭১।

৬ অক্টোবর, বুধবার

কাইয়ুম খান, সবুর খানসহ অন্যান্য নেতারা চেষ্টা করছিলেন স্বাধীনতাবিরোধীদের মধ্যে সমঝোতা স্থাপনের। আজ তারা পিডিপি নেতা নূরুল আমিনের সঙ্গে বৈঠক করেন। দেশের সার্বিক পরিস্থিতি এবং করণীয় নিয়ে আলোচনা করেন তারা। এ সময় তাদের সঙ্গে ছিলেন ইউসুফ খাটক, হানিফ খান, এ এস কোরেশী, গোলাম মোহাম্মদ সুন্দখোরসহ বেশ কয়েকজন মুসলিম লীগ নেতা। ফজলুল কাদের চৌধুরী আজ ঢাকা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে যান। তিনি ঐক্যবদ্ধভাবে দেশের শত্রুদের মোকাবেলা করার সুপারিশ করেন। এর জন্যে একটি সর্বদলীয় জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠানের আহ্বান জানান।

তথ্য সূত্র : দৈনিক পাকিস্তান ও আজাদ ৬, ৭ ও ৮ অক্টোবর '৭১।

৮ অক্টোবর, শুক্রবার

গভর্নর হাউজে আজ ডা. মালিক নবনিযুক্ত মন্ত্রীদের শপথ বাক্য পাঠ করান। এরা হলেন ময়মনসিংহ থেকে নির্বাচিত প্রাদেশিক সদস্য পিডিপির এ কে মোশারফ হোসেন, সিলেটের পিডিপি নেতা জসিমউদ্দিন আহমদ এবং কুমিল্লার কাইয়ুম মুসলিম লীগের মুজিবর রহমান এডভোকেট। শপথ অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে প্রাদেশিক মন্ত্রী ওবায়দুল্লাহ মজুমদার, অধ্যাপক শামসুল হক, মাওলানা ইউসুফ, মিঃ অংশু প্রু চৌধুরী এবং জেনারেল রাও ফরমান আলী উপস্থিত ছিলেন।

নূরুল আমিন পিডিআই প্রতিনিধিকে জানান, তিনি জাতিসংঘের অধিবেশনে যোগদানকারী সদস্য মাহমুদ আলীকে ডেকে পাঠিয়েছেন। কারণ আসন্ন নির্বাচনে দলের কর্মসূচি নির্ধারণের জন্যে তার উপস্থিতি দরকার। মাহমুদ আলী ১৩ অক্টোবর ফিরে আসবেন বলে জানা যায়।

লাকসামের পারুলে আজ শান্তি কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। শহিদুল হক চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন সাবেক প্রাদেশিক সদস্য আবদুল হাকিম, দেওয়ান আবদুল মতিন এডভোকেট, আবদুল বারী প্রমুখ।

সিলেট জেলা শান্তি কমিটির আহ্বায়ক শহীদ আলী আজ ছাতক বাজারে অনুষ্ঠিত এক সভায় জাতীয় আদর্শে বিশ্বাসী প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন আহমদ আলী, মওলানা লুৎফর রহমান, আবদুল হাই প্রমুখ।

তথ্য সূত্র : দৈনিক পাকিস্তান ও সংগ্রাম ৮, ৯, ১০ ও ১১ অক্টোবর '৭১।

৯ অক্টোবর, শনিবার

জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে যোগদানকারী প্রতিনিধি দলের অন্যতম সদস্য শাহ আজিজুর রহমান আজ উদ্বাস্তু সংখ্যা সম্পর্কে ভারতীয় বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ করে বলেন, পাকিস্তান সরকার অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে উদ্বাস্তু সংখ্যা হিসেব করেছে। তা ভারতের প্রচারণার ধারেকাছেও নয়। তিনি জানান, উদ্বাস্তুদের ফিরে আসার ব্যাপারে সব ব্যবস্থা নেয়া সত্ত্বেও ভারত রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে তাদের ফিরতে দিচ্ছে না। জাতিসংঘের প্রতিনিধি দলের নেতা মাহমুদ আলী আজ আমেরিকায় বসবাসকারী কতিপয় পাকিস্তানি নাগরিক এবং ছাত্রদের উদ্দেশে বলেন, 'পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণ ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তানে বসবাস করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। ... পাকিস্তানের প্রতিটি মানুষ ঐক্য ও দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েমের জন্যে তাদের জানমাল কোরবান করতে প্রস্তুত রয়েছে।' সভা শেষে মাহমুদ আলী, শাহ আজিজ, এ টি সাদী, আগাশাহী বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন।

কাইয়ুম খান আজ সবুর খানের বাসায় এক সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন। পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থানকালে তিনি পিডিপি'র প্রধান নূরুল আমিন, জামায়াতে ইসলামী, নেজামে ইসলামসহ বিভিন্ন স্বাধীনতাবিরোধীদের সঙ্গে আলোচনায় এই মত প্রকাশ করেন যে, নির্বাচনে গোলমাল ছাড়াই আলোচনার ভিত্তিতে প্রার্থী দাঁড় করানো হবে।

তথ্য সূত্র : দৈনিক পাকিস্তান ও সংগ্রাম ১০ ও ১১ অক্টোবর '৭১।

১০ অক্টোবর, রোববার

কেন্দ্রীয় পর্যায় থেকে শুরু করে জেলা উপজেলা সব পর্যায়েই শান্তি কমিটির দালালরা অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে কাজ করে। এ সময় সিলেটের ছাতক বাজারে অনুষ্ঠিত দালালদের এক সভায় সিলেট জেলা শান্তি কমিটির আহ্বায়ক এবং মুসলিম লীগ নেতা শহীদ আলী বক্তব্য রাখেন। জাতি আজ এক মহাপরীক্ষার সম্মুখীন। দেশকে বাঁচাতে হলে প্রতিটি

দেশপ্রেমিককে সংঘবদ্ধভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। এলাকার শান্তি প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে শান্তি কমিটি এবং রাজাকারদের নিতে হবে। আগামী উপ-নির্বাচনে পাকিস্তানি আদর্শে বিশ্বাসী একজন সাচ্চা দেশপ্রেমিককে নির্বাচিত করার আহ্বান জানান। সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন আহমদ আলী, মওলানা লুৎফর রহমান, আবদুল হাই প্রমুখ।

তথ্য সূত্র : দৈনিক পাকিস্তান ও সংগ্রাম ১০ ও ১১ অক্টোবর '৭১।

১১ অক্টোবর, সোমবার

এ সময় সাতক্ষীরায় শান্তি কমিটির উদ্যোগে শিশু পার্কে স্থানীয় দালালদের সভা হয়। এডভোকেট আবুল খায়েরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় দালালরা দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করে যে, দুনিয়ার এমন কোনো শক্তি নেই পাকিস্তানকে ধ্বংস করতে পারে। সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মহকুমা প্রশাসক এম শাহজাহান আলী, রাজাকার বাহিনী প্রধান আবদুল্লা বাকী এবং মহকুমা শান্তি কমিটির সম্পাদক শামসুর রহমান। রাজাকার প্রধান তার বক্তব্যে বলেন, জীবন দিয়ে হলেও আমরা পাকিস্তানকে রক্ষা করবো। এদিন কুমিল্লা শহরের ওপর নেমে আসে বিভীষিকা। সকাল ১১টায় শহরের ঘনবসতি এলাকাগুলো লক্ষ্য করে কামানের গোলাবর্ষণ করে হানাদাররা। বেপরোয়া গুলিবর্ষণে শহরের বাড়িঘর দালান-কোঠা ধ্বংস হয়ে যায়। অধিকাংশ লোক এলাকা ছেড়ে চলে গেলেও ৫ জন শহরবাসী নিহত এবং ৩৯ জন আহত হয়।

তথ্য সূত্র : দৈনিক পাকিস্তান ও সংগ্রাম ১১, ১২ ও ১৩ অক্টোবর '৭১।

১৩ অক্টোবর, বুধবার

স্বাধীনতাবিরোধী ৬টি রাজনৈতিক দলের নেতারা বৈঠকে মিলিত হয়ে নির্বাচনে সম্মিলিত প্রার্থী দাঁড় করানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে আজ জানা যায়। নূরুল আমিন, জামায়াত প্রধান গোলাম আযম, কাউন্সিল মুসলিম লীগ প্রধান খাজা খয়ের উদ্দিন, কনভেনশন লীগ প্রধান ফজলুল কাদের চৌধুরী, প্রতিনিধি আবদুল মতিন, নেজামে ইসলাম প্রধান মওলানা সিদ্দিক আহমদ এবং কাইয়ুম মুসলিম লীগের সেক্রেটারি সবুর খান। বৈঠকে নেতারা জানান, দেশ ও জাতিকে রক্ষার জন্যে ঐক্যবদ্ধভাবে শান্তি কমিটি গঠন করা হয়েছে। নির্বাচনেও তারা ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত নেবে।

ফজলুল কাদের চেধুরী পশ্চিম পাকিস্তানে এক সংবাদ সম্মেলনে পাকিস্তানের প্রকৃত পরিস্থিতি ও হিন্দু ভারতের হীন ষড়যন্ত্র সম্পর্কে বিশ্ববাসীকে অবহিত করার উদ্দেশে সর্বদলীয়ভাবে বিদেশে একটি প্রতিনিধি দল পাঠানোর পরামর্শ দেন। একই সঙ্গে তিনি পাকিস্তানের আদর্শ ধ্বংসকারীদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান।

পিপলস পার্টির সফরকারী প্রতিনিধি দল আজ জহিরুদ্দিনসহ বেশ কয়েকজন আওয়ামী লীগের নির্বাচিত সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন বলে জানা যায়।

এদিন জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে যোগদানকারী দলের নেতা মাহমুদ আলী আজ করাচি ফিরে আসেন। করাচিতে তিনি সাংবাদিকদের জানান, বিশ্ববাসীর কাছে ভারত ও দালালদের চক্রান্ত ফাঁস হয়ে গেছে।

তথ্য সূত্র : দৈনিক পাকিস্তান ও সংগ্রাম ১৩, ১৪ ও ১৫ অক্টোবর '৭১।

১৪ অক্টোবর, বৃহস্পতিবার

মন্ত্রী অংশু প্রু চৌধুরী চট্টগ্রাম ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল হলে এক সমাবেশে দেশ পুনর্গঠনে দলমত নির্বিশেষে ছাত্র, শিক্ষক, সরকারি কর্মচারী, ব্যবসায়ী, শান্তি কমিটির সদস্য সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। 'দেশের সংখ্যালঘুরা চরমভাবে নির্যাতিত হচ্ছে' এই ভারতীয় প্রচারণাকে ভিত্তিহীন এবং মিথ্যা হিসেবে উল্লেখ করে তিনি বলেন বরং 'সেনাবাহিনী সংখ্যালঘুদের জানমালের নিরাপত্তা বিধান করেছে।'

তথ্য সূত্র : দৈনিক পাকিস্তান ও সংগ্রাম ১৪, ১৫ ও ১৬ অক্টোবর '৭১; বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র অষ্টম খণ্ড।

১৫ অক্টোবর, শুক্রবার

মশিউর রহমান আজ আগামী ১৭ অক্টোবর ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির বৈঠক ডেকে সে বৈঠকে নেতা-কর্মীদের যোগ দেয়ার আহ্বান জানান।

তথ্য সূত্র : দৈনিক পাকিস্তান, সংগ্রাম ১৫, ১৬ ও ১৭, অক্টোবর; '৭১ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ: দলিলপত্র, অষ্টম খণ্ড।

১৬ অক্টোবর, শনিবার

আজ লিয়াকত আলীর বিশতম মৃত্যুবার্ষিকী পালন করা হয়। দৈনিক পয়গম সম্পাদক মুজিবর রহমান খাঁর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন সানাউল্লাহ নূরী। অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ সাফির ফিরোজ।

তথ্য সূত্র : দৈনিক পাকিস্তান ও সংগ্রাম ১৬ ও ১৭ অক্টোবর '৭১।

১৭ অক্টোবর, রোববার

মশিউর রহমান যাদু মিয়ার সভাপতিত্বে আজ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির নেতাকর্মীদের সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচিত সদস্য আসাদুজ্জামান এ সময় আওয়ামী লীগের জাতীয় পরিষদ সদস্যদের নিয়ে দল গঠনের খবর সম্পর্কে অজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি জানান, পিপিপি নেতাদের সঙ্গেও তার কোনো বৈঠক হয়নি। তবে তিনি জানান, জহিরুদ্দিন এবং ফয়জুল হকের বাসায় জহিরুদ্দিন, এ বি এম নূরুল ইসলাম, প্রাদেশিক সদস্য এস বি জামান প্রমুখ নেতার বৈঠক হয়েছে বলে তিনি শুনেছেন।

আজ দৈনিক পাকিস্তান প্রচার করে, আওয়ামী লীগের নেত্রকোনা জেলার নেতা আবদুল আজিজ আহমদ, নেত্রকোনা মহিলা আওয়ামী লীগের সেক্রেটারি শামসুন নাহার, থানা আওয়ামী লীগের সভাপতি নূরুল ইসলাম খান, মোক্তার আবদুল আজিজ তালুকদার, নেত্রকোনা কলেজের ফিজিক্যাল ইনস্ট্রাকটর মুস্তাফা কামাল আজাদ, ধলা মুলগাঁও ইউনিয়ন সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি আরশাদ হোসেন, বাউশী ইউনিয়নের সভাপতি শাহাব উদ্দিন চৌধুরী, নেত্রকোনা থানা আওয়ামী লীগের ভাইস প্রেসিডেন্ট গিয়াসউদ্দিন আহমদ এবং ছাত্রনেতা শামসুল আলম ও জাহাঙ্গীর অস্ত্রসহ আত্মসমর্পণ করেছে।

সংবাদ অনুযায়ী নেত্রকোনায় অস্ত্রসহ আরও আত্মসমর্পণ করেছে আওয়ামী লীগ নেতা ডা. হাফিজ উদ্দিন, ছাত্রলীগ নেতা মতিউর রহমান খান, সেনাবাহিনীর সুরুজ আলী ও শামসুল হুদা।

জানা যায়, কুমিল্লার কথিত ভাষাবিদ এম জামান তার পাকিস্তানপ্রেমের নিদর্শন হিসেবে বাংলা ও উর্দু হরফের মিশ্র এক ফর্মুলা কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করেছেন। তিনি জানান, এতে করে দুই দেশের সমঝোতা বাড়বে।

তথ্য সূত্র : দৈনিক পাকিস্তান ও সংগ্রাম '৭১।

১৮ অক্টোবর, সোমবার

ফারুক আহমদের সভাপতিত্বে শান্তি কমিটির সদস্যরা মিলিত হয় নেত্রকোনার চল্লিশা ইউনিয়ন কাউন্সিল হলে। আবুল খায়েরের নেতৃত্বে নেত্রকোনার পূর্বধলা থানায় আলবদর বাহিনী গঠিত হয় এ সময়। নবগঠিত আলবদরদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখেন মহকুমা আলবদর কমান্ডার চান মিয়া, হুমায়ুন কবির, মহিউদ্দিন প্রমুখ আলবদর ও দালালরা। সভাপতিত্ব করেন ময়মনসিংহ জেলা আলবদর কমান্ডার মোহাম্মদ হোসেন।

সীতাকুণ্ডের সেলিমপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে রাজাকাররা এ সময় ইউনিয়নের দু'জন মুক্তিযোদ্ধার বাড়িতে হামলা চালায়। নাভারনে দালালদের এক সভায় আজ বক্তব্য রাখেন অর্থমন্ত্রী আবুল কাসেম। তিনি বলেন, 'দুষ্কৃতকারীরা যোগাযোগ ব্যবস্থা বিনষ্ট এবং খাদ্যশস্য সরবরাহ বন্ধ করে দিয়ে দেশে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টির অপচেষ্টা চালাচ্ছে।'

তথ্য সূত্র : দৈনিক পাকিস্তান ও সংগ্রাম ১৮, ১৯ ও ২০ অক্টোবর '৭১।

২১ অক্টোবর, বৃহস্পতিবার

আলহাজ্ব এম এ সালাম দেশকে শত্রুর কবল থেকে মুক্ত করার জন্যে সবাইকে বজ্র শপথ নেয়ার আহ্বান জানান।

হবিগঞ্জ মহকুমা শান্তি কমিটির আহ্বায়ক সৈয়দ কামরুল আহসান দৈনিক সংগ্রামকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে আজ জানান, সীমান্তবর্তী এলাকাসমূহে ভারতীয় অনুপ্রবেশকারী ও দুষ্কৃতকারীদের নাশকতামূলক কার্যকলাপে গ্রামবাসীদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। মহকুমার প্রতিটি মানুষ পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষার জন্যে তাদের শেষ রক্ত বিন্দু দিতে প্রস্তুত রয়েছে। তিনি জানান, প্রেসিডেন্টের সাধারণ ক্ষমার আওতায় এ পর্যন্ত বহুলোককে ছেড়ে দেয়া হয়েছে এবং অনেক রাজনৈতিক মামলা বিবেচনাধীন রয়েছে।

তথ্য সূত্র : দৈনিক পাকিস্তান ও সংগ্রাম ২১, ২২ ও ২৩ অক্টোবর '৭১।

২৩ অক্টোবর, শনিবার

জাতিসংঘ পাকিস্তানি প্রতিনিধি দলের অন্যতম সদস্য শাহ আজিজ দেশে ফেরার আগে সাংবাদিকদের তার মিশনকে অত্যন্ত সাফল্যজনক হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, 'বাংলাদেশ' ধাপ্পার স্বরূপ এখন অনেকটা উন্মোচিত হয়েছে।

দৈনিক সংগ্রামে আজ দুষ্কৃতকারীদের দমন সংক্রান্ত বিষয়ে কয়েকটি প্রস্তাব উত্থাপন করে এক দীর্ঘ চিঠি লেখেন বরিশালের এডভোকেট ডি ইউ মাহমুদ। তিনি

দুষ্কৃতকারীদের খুঁজে বের করে কঠোর শাস্তি দেয়ার পরামর্শ দেন এবং এ দায়িত্ব দেশপ্রেমিক দলের কর্মীদের ওপর অর্পণ করার কথা বলেন।

মানিকগঞ্জ শান্তি কমিটি আয়োজিত সভায় মহকুমা শান্তি কমিটির আহ্বায়ক ও কাউন্সিল মুসলিম লীগ নেতা এডভোকেট আফতাবউদ্দিন আহমদ পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষার জন্যে জনগণের প্রতি যে কোনো ত্যাগ স্বীকারের আহ্বান জানান। সভায় জেহাদী মনোভাব নিয়ে দেশ সেবায় এগিয়ে আসার আহ্বান জানান নবগঠিত ছাত্র সংঘ নেতা আবদুর রাজ্জাক।

তথ্য সূত্র : দৈনিক পাকিস্তান ও সংগ্রাম ২৩, ২৪ ও ২৫ অক্টোবর '৭১।

২৪ অক্টোবর, রবিবার

অংশু প্রু চৌধুরী এপিপিকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে আজ দেশের ভবিষ্যৎ উন্নয়নের এক বৃহৎ পরিকল্পনা তুলে ধরেন।

মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালানোর উদ্দেশ্যে আজ বিদেশ সফররত পাকিস্তানি দলের নেতা এ কিউ এম শফিকুল ইসলাম নিউইয়র্ক থেকে ওয়াশিংটন যান। এক সপ্তাহ ধরে নিউইয়র্ক থাকার সময় তিনি জাতিসংঘের অধিবেশনে যোগদানকারী বিদেশী প্রতিনিধি এবং বিভিন্ন সংস্থার কর্মকর্তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে পূর্ব পাকিস্তানের ব্যাপারে পাকিস্তানের মনোভাব তুলে ধরেন। ওয়াশিংটন যাত্রার আগে তিনি এক বিবৃতিতে জানান, পাকিস্তানের বর্তমান সংকটের পেছনে ভারতের হাত রয়েছে, জনগণ এটা ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছে। ভারত পরিকল্পিতভাবে উদ্বাস্তু সমস্যা জিইয়ে রেখেছে। সহযোগিতা করলেই উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধান হয়ে যায়।'

পিডিপি নেতা মাহমুদ আলী আজ পুনরায় বিদেশে মুক্তিযুদ্ধবিরোধী জনমত গড়তে ঢাকা ত্যাগ করেন।

তথ্য সূত্র : দৈনিক পাকিস্তান ও সংগ্রাম ২৪, ২৫ ও ২৬ অক্টোবর '৭১।

২৭ অক্টোবর, বুধবার

এ. এস. এম. সোলায়মান আজ পশ্চিম পাকিস্তানে যান। বেগম আখতার সোলায়মানের উদ্ধৃতি দিয়ে লেবাননের একটি পত্রিকা জানায়, পূর্ব পাকিস্তানের সাড়ে সাত কোটি মানুষ বিচ্ছিন্নতাবিরোধী। তারা সবাই সেনাবাহিনীকে সহযোগিতা করছে। শেখ মুজিব তাঁর ওয়াদা ভঙ্গ করায় জনপ্রিয়তা হারিয়েছেন।

তথ্য সূত্র : দৈনিক পাকিস্তান ও সংগ্রাম ২৭, ২৮ ও ২৯ অক্টোবর '৭১।

৩০ অক্টোবর, শনিবার

বরিশালের রাজাকাররা আজ এক বৈঠকে একত্রিত হয়। এখানে জেলা কমান্ডার আব্বাস উদ্দিন প্রতিটি মহকুমা এবং থানার কমান্ডার নিযুক্ত করে একটি প্রোগ্রামের মাধ্যমে 'দুষ্কৃতকারী' নিধনের পরিকল্পনা দিয়েছিলেন। এই বৈঠকে 'দুষ্কৃতকারী' প্রতিরোধের জন্যে পিরোজপুর কমান্ডার এ কে এম হারুনুর রশীদকে ধন্যবাদ জানানো হয়।

তথ্য সূত্র : দৈনিক পাকিস্তান ও সংগ্রাম ৩০, ৩১ অক্টোবর '৭১

৭ নভেম্বর, রবিবার

দীর্ঘ আড়াই মাস বিদেশ সফর করে বেগম আখতার সোলায়মান আজ সাংবাদিকদের জানান, বিদেশে পাকিস্তানি পররাষ্ট্র মিশনগুলোতে শতকরা ৯৯ জন পূর্ব পাকিস্তানি দেশপ্রেমের মনোভাব নিয়ে কাজ করছে।

তথ্য সূত্র : দৈনিক পাকিস্তান, সংগ্রাম ও পূর্বদেশ ৭, ৮ ও ৯ নভেম্বর '৭১।

১৯ নভেম্বর, শুক্রবার

স্বাধীনতাবিরোধীদের কাছে অত্যন্ত মূল্যবান হয়ে ওঠে আওয়ামী লীগের দালাল সংসদ সদস্যরা। দৈনিক সংগ্রামের রাজনৈতিক ভাষ্যকার বেআইনী আওয়ামী লীগের এই সব 'বৈধ' সদস্যদের জাতীয় পরিষদে ভারসাম্যকারী শক্তি হিসেবে উল্লেখ করেন। ভাষ্যকার মনে করেন এরা যদি জোটের সঙ্গে তাদের শক্তি সংযোজন করে তবে পূর্ব পাকিস্তানিদের অধিকার আদায়ের পথ সুগম হবে।

তথ্য সূত্র : দৈনিক পাকিস্তান ও সংগ্রাম ১৯ ও ২০ নভেম্বর, '৭১

২৫ নভেম্বর, বৃহস্পতিবার

সিলেটেও মিছিল হয়। মিছিলে অংশগ্রহণকারীরা ভারতবিরোধী বিভিন্ন শ্লোগান সহকারে শহর প্রদক্ষিণ করে। মিছিল করে চট্টগ্রাম, খুলনাসহ দেশের সব জায়গার স্বাধীনতাবিরোধীরা। আলবদর কমান্ডার আবদুল মতিনের সভাপতিত্বে গফরগাঁ-এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন আমানুল ইসলাম ঢালী, সাইদুল ইসলাম, আলী আকবর, এম এ মতিন, মোফাজ্জল হোসেন প্রমুখ।

তথ্য সূত্র : দৈনিক পাকিস্তান, সংগ্রাম ও আজাদ ২৫, ২৬ ও ২৭ নভেম্বর '৭১।

২৮ নভেম্বর, রবিবার

কৃষক শ্রমিক পার্টির সহ-সভাপতি জয়নুল আবেদীন, সম্পাদক এম এ হাই, পার্লামেন্টারী পার্টির সেক্রেটারী সাইফুর রহমান এবং সহ-সম্পাদক মহিউদ্দিন এক যুক্ত বিবৃতিতে ঐক্যবদ্ধভাবে ভারতীয় হানাদারদের কবল থেকে দেশ ও জাতিকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসার জন্যে দেশপ্রেমিকদের প্রতি আহ্বান জানান।

তথ্য সূত্র : দৈনিক পাকিস্তান ও সংগ্রাম ২৮, ২৯ ও ৩০ নভেম্বর '৭১; বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র ৮ম খণ্ড।

২৯ নভেম্বর, সোমবার

শান্তি কমিটির সভাপতি মনসুর আলীর সভাপতিত্বে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয় সুনামগঞ্জে।

খুলনা শান্তি কমিটির বিক্ষোভকারীরা ইন্দিরা গান্ধীর কুশপুত্তলিকা দাহ করে। প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য রাখেন খুলনা পিডিপি'র সহ-সভাপতি এডভোকেট আবদুল জলিল, সাবেক শিক্ষামন্ত্রী এস এম আমজাদ হোসেন প্রমুখ। শান্তি কমিটির সভাপতি এডভোকেট গোলামুর রহমান মালিক, সিরাজুল ইসলাম, ডা. মুজিবুল্লাহ ও শেখ

মোহাম্মদ শাহাদাত প্রমুখের নেতৃত্বে মিছিল বের হয় চুয়াডাঙ্গায়। কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা ও দৌলতপুরে আলাদা দু'টি প্রতিবাদ সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা শান্তি কমিটির সভাপতি সাদ আহমদ। বক্তব্য রাখেন নূরুল ইসলাম, ইয়াকুব আলী, মোহাম্মদ হানিফ প্রমুখ। শহীদুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত লাকসামের প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য রাখেন সফিউল্লাহ, শহিদুল্লা, অধ্যাপক মোহাম্মদ আলী, মাহবুবুর রহমান, আবদুল হাকিম। শান্তি কমিটির আহ্বায়ক আজিজুর রহমানের সভাপতিত্বে কুমিল্লার প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য রাখেন নূরুদ্দীন আহমদ, দলিলুর রহমান, হারুন আল রশিদ প্রমুখ। ভারতীয় হামলার প্রতিবাদ জানিয়ে বিবৃতি দেন ময়মনসিংহ বার সমিতির সভাপতি হাশিম উদ্দিন আহমদ।

তথ্য সূত্র : দৈনিক পাকিস্তান ও সংগ্রাম ২৯ ও ৩০ নভেম্বর, ১ ও ২ ডিসেম্বর '৭১।

৩ ডিসেম্বর, শুক্রবার

এ সময় ভারতীয় হামলা এবং দুষ্কৃতকারীদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় কুষ্টিয়া জেলার বিভিন্ন জায়গায়। এসব সমাবেশে বক্তৃতা করেন ইয়াকুব আলী, নূরুল ইসলাম, মোহাম্মদ হানিফ প্রমুখ। জেহাদী উদ্দীপনা নিয়ে মিছিল করে এখানের স্বাধীনতাবিরোধীরা। আজ শাহ আজিজুর রহমানের সভাপতিত্বে ভোলার শান্তি কমিটি আয়োজিত সভায় বক্তৃতা করেন ইলিয়াস মিয়া মাস্টার।

তথ্য সূত্র : দৈনিক পাকিস্তান, ইত্তেফাক ও পূর্বদেশ ৩, ৪ ও ৫ ডিসেম্বর '৭১।

৫ ডিসেম্বর, রোববার

চাঁপাইনবাবগঞ্জে আজ ভারতীয় হামলার প্রতিবাদে এবং পাকিস্তান রক্ষার সংকল্প ঘোষণা করে মিছিল করে স্বাধীনতাবিরোধীরা। মিছিল শেষে লতিফ হোসেনের সভাপতিত্বে এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

তথ্য সূত্র : দৈনিক পাকিস্তান ও আজাদ ৫, ৬, ৭ ও ৮ ডিসেম্বর '৭১।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১. অসহযোগের দিনগুলি, মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি পর্ব : আতিউর রহমান, প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮, সাহিত্য প্রকাশ।

২. ভুলে যাওয়া ইতিহাস (১৭৫৭ - ১৯৪৭) : এস এ সিদ্দিকী, (বার-এট-ল) প্রকাশ : জুলাই ১৯৭৫, চট্টগ্রাম।

৩. নিয়াজীর আত্মসমর্পণের দলিল : মূল : সিদ্দিক সালিক, ভাষান্তর : মাসুদুল হক , প্রকাশ : ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৮, নভেল পাবলিকেশন্স।

৪. বাংলা ও বাঙালি, মুক্তি সংগ্রামের মূলধারা : মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, প্রকাশ : ফাল্গুন ১৩৯৭, সৃজন প্রকাশনী লিমিটেড।

৫. বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ (বঙ্গবন্ধুর নির্বাচিত বক্তৃতা ও বিবৃতি) : রামেন্দু মজুমদার সম্পাদিত, প্রকাশ : ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৯, কথন প্রকাশনী।

৬. জেল হত্যাকাণ্ড : অধ্যাপক আবু সাইয়িদ, প্রকাশ : ৩ নভেম্বর '৯১, জ্ঞানকোষ প্রকাশনী।

৭. বাংলাদেশ জেনোসাইড অ্যান্ড ওয়ার্ল্ড প্রেস : মূল সংগ্রহ ও সম্পাদনা : ফজলুল কাদের কাদেরী, বাংলা অনুবাদ সম্পাদনা, : দাউদ হোসেন, প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০০৩, সংঘ প্রকাশন।

৮. বঙ্গভঙ্গ ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি : বদরুদ্দীন উমর, প্রকাশ : জানুয়ারি ১৯৯১, চলন্তিকা বইঘর।

৯. মুক্তিযুদ্ধের গান : মোবারক হোসেন খান, প্রকাশ : ঢাকা বইমেলা ১৯৯৯ ইং, শোভা প্রকাশ।

১০. ভারতবর্ষে মুসলমানদের অবদান : আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নাদভী, অনুবাদ : অধ্যাপক আ ফ ম খালিদ হোসেন, প্রকাশ : জানুয়ারি ২০০৪, সেন্টার ফর রিসার্চ অন দ্যা কোরআন এন্ড সুন্নাহ।

১১. আজাদী আন্দোলন (১৮৫৭) : মূল : মাওলানা ফজলে হক খায়রাবাদী, অনুবাদ : মুহিউদ্দীন খান : মদীনা পাবলিকেশন্স।

১২. খতিবে আজম হযরত মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ একটি যুগ বিপ্লব উৎস : আ ফ ম খালিদ হোসেন, প্রকাশ : মার্চ ১৯৮৯, চিন্তাধারা প্রকাশন।

১৩. মুজাহিদে আজম আল্লামা শামসুল হক ফরিদপুরী (রহ.) : নাসীম আরাফাত, প্রকাশ : জুলাই ২০০৭, খান প্রকাশনী।

১৪. মুজাদ্দিদে জমান শাহ্ সূফী নেছারুদ্দীন আহমদ (র) একটি জীবন একটি আদর্শ : সংকলক : ড. এ এফ এম আনওয়ারুল হক, প্রকাশ : ২০০৫ ইং, ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত লাইব্রেরী ও রশীদ বুক হাউস।

১৫. আমার ছেলেবেলা : হুমায়ূন আহমেদ, প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৯১ ইং, কাকলি প্রকাশনী।

১৬. আমি বিজয় দেখেছি : এম আর আখতার মুকুল, প্রকাশ : ১৬ ডিসেম্বর ১৯৮৫, সাগর পাবলিশার্স।

১৭. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ : আসাদ চৌধুরী, প্রকাশ : ডিসেম্বর ১৯৮৩, বাংলা একাডেমী।

১৮. চল্লিশ থেকে একাত্তর : এম আর আখতার মুকুল, প্রকাশ : মে ১৯৮৫, হাক্কানী পাবলিশার্স।

১৯. মুক্তিযুদ্ধের অপ্রকাশিত কথা : আতিকুর রহমান, প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৯০, আরামবাগ, ঢাকা।

২০. বেশী দামে কেনা-কম দামে বেচা আমাদের স্বাধীনতা : আবুল মনসুর আহমদ। জানুয়ারি ১৯৮২, আহমদ পাবলিশিং হাউস।

২১. দরবার-ই-জহুর : জহুর হোসেন চৌধুরী, প্রকাশ : মে ১৯৮৫, লালন প্রকাশনী।

২২. ইন্ডিয়ান উইনস ফ্রিডম : মওলানা আবুল কালাম আজাদ, অনুবাদ : আসমা চৌধুরী, লিয়াকত আলি। প্রকাশ : মার্চ ১৯৮৯, সপ্লিল প্রকাশনী।

২৩. বাংলাদেশ রক্তের ঋণ : মূল : এ্যান্থনী ম্যাসকারেনহাস, অনুবাদ : মোহাম্মদ শাহজাহান, প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৮৮, হাক্কানী পাবলিশার্স।

২৪. লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে (এ টেল অব মিলিয়নস) : রফিকুল ইসলাম। অনুবাদ : ভূঁইয়া শাহাবুদ্দিন, প্রকাশ : অক্টোবর ১৯৮১।

২৫. বাংলাদেশ প্রতিরোধের রূপরেখা ও রণনীতির সন্ধানে : মেজর রফিকুল ইসলাম, পিএসসি, প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৯২, অনিন্দ্য প্রকাশন।

২৬. ভাষা আন্দোলন ও অন্যান্য প্রসঙ্গ : বদরুদ্দীন উমর, প্রকাশ : বইমেলা ১৯৯০ ইং, পল্লব পাবলিশার্স।

২৭. দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস : মূল : ডব্লিউ, উব্লিউ হান্টার, অনুবাদ : এম. আনিসুজ্জামান। প্রকাশ : ২০০০ ইং, খোশরোজ কিতাব মহল।

২৮. ভুট্টো, শেখ মুজিব, বাংলাদেশ : রাও ফরমান আলী, অনুবাদ : মোস্তফা হারুন, প্রকাশ : নভেম্বর ১৯৭৮ ইং, সৌখিন প্রকাশনী।

২৯. আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর : আবুল মনসুর আহমদ, প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫, খোশরোজ কিতাব মহল।

৩০. সত্যের পথ সন্ধানে : সত্যরাজ, প্রকাশ : ৭ নভেম্বর ১৯৯৬, স্মৃতিকথা প্রকাশনী।

৩১. পাক ভারত যুদ্ধ কয়েকটি বিশিষ্ট দিক : প্রকাশ : আগস্ট ১৯৬৬, পাকিস্তান পাবলিকেশন্স।

৩২. পলাশী ট্রাজেডীর ২৩৪ বছর পর সিরাজদ্দৌলার মুর্শিদাবাদ : আবদুল হাই শিকদার, প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৯২, ওয়েসিস বুকস।

৩৩. বঙ্গবন্ধু ও ইসলামী মূল্যবোধ : মওলানা আবদুল আউয়াল, প্রকাশ : আগস্ট ১৯৯২, বাংলাদেশ ওলামা পরিষদ।

৩৪. বাহান্নর জবানবন্দী : এম আর আখতার মুকুল। প্রকাশ : ফাল্গুন ১৩৯২, সাগর পাবলিশার্স।

৩৫. প্রত্যক্ষদর্শীর চোখে মুক্তিযুদ্ধ : হারুন হাবীব সম্পাদিত। প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৯১, নওরোজ কিতাবিস্তান।

৩৬. জয় বাংলা : সম্পাদনা : এম আর আখতার মুকুল, প্রকাশ : ডিসেম্বর ১৯৯০ সাগর পাবলিশার্স।

৩৭. পলাশী থেকে পাকিস্তান : আবুল কালাম শামসুদ্দীন, প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০০০, খোশরোজ কিতাব মহল।

৩৮. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়াজীর জবানবন্দী : অনুবাদ ও সম্পাদনা : মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, প্রকাশ : ১ এপ্রিল, ১৯৭৯ কারেন্ট বুকস।

৩৯. মা : আনিসুল হক, প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০০৩, সময় প্রকাশন।

৪০. জোছনা ও জননীর গল্প : হুমায়ূন আহমেদ, প্রকাশ : একুশে বইমেলা ২০০৪, অন্য প্রকাশ।

৪১. স্বাধীনতা সংগ্রামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় : রফিকুল ইসলাম, প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০০৪, ঐতিহ্য।

৪২. ফ্যাক্টস্ এন্ড ডকুমেন্টস (বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড) : অধ্যাপক আবু সাইয়িদ। প্রকাশ : ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৬, কেয়ার পাবলিকেশন।

৪৩. জনযুদ্ধের গণযোদ্ধা : মেজর কামরুল হাসান ভূঁইয়া। প্রকাশক : র‍্যামন পাবলিশার্স।

৪৪. মুক্তিযুদ্ধে মুজিবনগর : শামসুল হুদা চৌধুরী, প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি-১ ১৯৮৫, বিজয় প্রকাশনী।

৪৫. যাঁদের ত্যাগে এদেশ পেলাম, স্বাধীনতা আন্দোলনে ওলামায়ে দেওবন্দ : মূল : মাওলানা এমদাদুল্লাহ সাহেব ভাগলপুরী, অনুবাদ : মাওলানা কারী কেফায়েতুল্লাহ, প্রকাশক : আল-হাসান সাহিত্য প্রকাশনী।

৪৬. জাতীয় রাজনীতি (১৯৪৫ থেকে '৭৫) : অলি আহাদ, প্রকাশ : ১৯৮২ , খোশরোজ কিতাব মহল।

৪৭. আত্মঘাতী রাজনীতির তিনকাল (প্রথম খণ্ড) : সরকার শাহাবুদ্দীন আহমদ, প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০০৪, বুকস ফেয়ার।

৪৮. বৃহত্তর মোমেনশাহী উলামা ও আকাবির : সম্পাদক : মাওলানা আবুল ফাত্তাহ মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া, প্রকাশ : ২৯ সেপ্টেম্বর ২০০৫, নাসিরাবাদ ফাউন্ডেশন মোমেনশাহী।

৪৯. শেরে বাংলা একে ফজলুল হক : সিরাজ উদ্দীন আহমেদ, প্রকাশ : ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩, ভাস্কর প্রকাশনী।

৫০. রাজনীতির তিনকাল : মিজানুর রহমান চৌধুরী, প্রকাশ : জানুয়ারি ২০০১, হাফেজ মাহমুদা ফাউন্ডেশন।

৫১. মুক্তিযুদ্ধে ইতিহাস চর্চা : আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন সম্পাদিত, প্রকাশ : জানুয়ারি ১৯৯৩, অরণি প্রকাশনী।

৫২. শিবিরের তাণ্ডব : সম্পাদনা : আসলাম সানী, প্রকাশ : জুন ১৯৯৯, অক্ষর।

৫৩. মুজিব হত্যার অন্তরালে : ইশতিয়াক হাসান, প্রকাশ : ডিসেম্বর ১৯৮০, নয়াবার্তা প্রকাশনী।

৫৪. জামায়াতের আসল চেহারা : মওলানা আবদুল আউয়াল, প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩, আগামী প্রকাশনী।

৫৫. রক্তের বদলে : মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম, প্রকাশ : রবীন্দ্র-নজরুল জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে '৯০ ইং, সাহিত্যমালা।

৫৬. আমার ফাঁসি চাই : মুক্তিযোদ্ধা মতিয়ুর রহমান রেন্টু, প্রকাশ : স্বাধীনতা দিবস ১৯৯৯ ইং, বনলতা প্রকাশন।

৫৭. ফিরে দেখি ঘাতকের চেহারা : দিপু সারোয়ার, প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি, ২০০৭, র‍্যামন পাবলিশার্স।

৫৮. সেক্টর কমান্ডাররা বলছেন মুক্তিযুদ্ধের স্মরণীয় ঘটনা : শাহরিয়ার কবির সম্পাদিত, প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৯২, মাওলা ব্রাদার্স।

৫৯. রাজনৈতিক চিন্তাধারা : মূল : হযরত আশরাফ আলী থানভী (রহ.), অনুবাদ: শহীদুল ইসলাম, প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০০৪, বাড কম্প্রিট এন্ড পাবলিকেশন্স।

৬০. বাংলাদেশের ইতিহাসে ঘটনাবহুল '৭৫ সাল আগস্ট ও নভেম্বর বিপ্লব : অধ্যাপক গোলাম আযম, প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০০৪, প্রকাশক : কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড।

৬১. হায়েনার খাঁচায় অদম্য জীবন : মন্টু খান, প্রকাশ : ১৯৯০ ইং, উত্তরণ প্রকাশনী।

৬২. ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে মুসলমানদের ভূমিকা : সত্যেন সেন, প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৮৬, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী।

৬৩. ওঙ্কার : আহমদ ছফা, প্রকাশ : মাঘ ১৪০০, স্টুডেন্ট ওয়েজ।

৬৪. বাংলাদেশ সামরিক সম্ভাবনার সুপ্ত আগ্নেয়গিরি : লে. (অব.) আবু রুশ্‌দ, প্রকাশ : ১ সেপ্টেম্বর, রুমী প্রকাশনী।

৬৫. আমি মুক্তিযোদ্ধা ছিলাম : আতোয়ার রহমান সম্পাদিত, প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৯১, নওরোজ কিতাবিস্তান।

৬৬. নন্দিত নরকে : হুমায়ূন আহমেদ, প্রকাশ : শ্রাবণ ১৪০০, খান ব্রাদার্স এ্যান্ড কোম্পানি।

৬৭. ইতিহাসে বাঙালী : এস এম আজিজুল হক শাজাহান, প্রকাশ : ১১ শ্রাবণ ১৪০২, সৈয়দা মোনালিসা হক মনি, ১৬৯ স্বাধীনতা সরণী, উত্তর বাড্ডা, গুলশান, ঢাকা-১০১২।

৬৮. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে পরাশক্তির ভূমিকা : সৈয়দ আনোয়ার হোসেন। প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ১৯৮২, ডানা প্রকাশনী।

৬৯. ভারতে ব্রিটিশ রাজত্বের শেষ অধ্যায় : মূল : লিওনার্দ মোজ্‌লে, অনুবাদ : মোয়াজ্জেম হোসেন, প্রকাশ : আগস্ট ১৯৭৭, বাংলা একাডেমী।

৭০. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নানা প্রসঙ্গ : সম্পাদনা : ড. এ এফ সালাহ্‌উদ্দীন আহমদ, ড. নূরুল ইসলাম মঞ্জুর, আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন, প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬, মুক্তিযুদ্ধ গবেষণা কেন্দ্র।

৭১. আসাদ ও ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান : মেসবাহ কামাল, প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৮৬, বিবর্তন।

৭২. মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী : সিরাজ উদ্‌দীন আহমেদ, প্রকাশ : ২১ ফেব্রুয়ারি ২০০৩, ভাস্কর প্রকাশনী।

৭৩. স্বাধীনতা '৭১ : কাদের সিদ্দিকী বীরোত্তম, প্রকাশ : জানুয়ারি ১৯৮৫, বঙ্গবন্ধু প্রকাশনী।

৭৪. মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানী (প্রথম খণ্ড) : সম্পাদনা : শাহজাহান মন্টু, রবিউল করিম দুলাল, প্রকাশ : জুন ১৯৯২, প্রতীক প্রকাশনী।

৭৫. ঊনসত্তরের গণআন্দোলন ও বঙ্গবন্ধু : তোফায়েল আহমেদ, প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭, আগামী প্রকাশনী।

৭৬. যুদ্ধপূর্ব বাংলাদেশ : বদরুদ্দীন উমর, প্রকাশ : নভেম্বর ১৯৭৬, মুক্তধারা।

৭৭. স্বাধীনতা যুদ্ধ ও আমাদের কিছু কথা : বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল।

৭৮. জয় বাংলার ইতিকথা ও মুজিব আমলের ১৩১২ দিন : খন্দকার আবুল খায়ের, প্রকাশ : কোরআন প্রচার কেন্দ্র।

৭৯. বাংলাদেশের হৃদয় হতে : ওবায়দুল কাদের, প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০০১, আগামী প্রকাশনী।

৮০. মুক্তিযুদ্ধে যুক্তরাজ্যের বাঙালির অবদান : শেখ আবদুল মান্নান, প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি '৯৮, জ্যোৎস্না পাবলিশার্স।

৮১. ম্যাসাকার বাংলাদেশ গণহত্যার ইতিহাসে ভয়ংকর অধ্যায় : মূল : রবার্ট পেইন, ভাষান্তর : গোলাম হিলালী, প্রকাশ : ১৯৮৯, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড।

৮২. সেই রাজাকার : প্রকাশ : জুলাই ২০০১, জনকণ্ঠ প্রকাশনী।

৮৩. যা দেখেছি, যা বুঝেছি, যা করেছি : রাষ্ট্রদূত লে. কর্নেল (অব.) শরিফুল হক ডালিম (বীর উত্তম), প্রকাশ : নব জাগরণ প্রকাশনী।

৮৪. আমাদের সংগ্রাম চলবেই : সম্পাদনা : মোঃ আলী নকী, মোঃ ইমাদ উদ্দিন। প্রকাশ : ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৮, অপরাজেয় সংঘ।

৮৫. আমাদের সংগ্রাম চলবেই (প্রথম খণ্ড দ্বিতীয় পর্ব) : সম্পাদনা : মোঃ আলী নকী, মোঃ ইমাদ উদ্দিন, প্রকাশ : ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৯, : জুয়েল ইন্টারন্যাশনাল।

৮৬. জাহানারা ইমামের শেষ দিনগুলি : শাহরিয়ার কবির, প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫, অনুপম প্রকাশনী।

৮৭. ফ্যাক্টস এন্ড ইউটনেস : আ ফ ম সাঈদ, প্রকাশ : একুশে বইমেলা ২০০৫, উৎস প্রকাশন।

৮৮. ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস কয়েকটি দলিল : বাংলা একাডেমী, প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৮৩ বাংলা একাডেমী।

৮৯. ইসলাম ও বঙ্গবন্ধু : মোঃ শাহজাহান আলম সাজু, মোহাম্মদ আশরাফুল আলম, প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ১৯৯৮, আজিজ সুপার মার্কেট।

৯০. কিশোর মওলানা ভাষানী : আবদুল হাই শিকাদার, প্রকাশ : একুশে বইমেলা ২০০১, জ্ঞান বিতরণী।

৯১. মেজর জলিল রচনাবলী : মাসুদ মজুমদার সম্পাদিত, প্রকাশ : ১৯ নভেম্বর ১৯৯৭, মেজর জলিল পরিষদ।

৯২. ভারতের জাতীয় আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস : অযোধ্যা সিংহ, ভাষান্তর : কমলেশ সেন/আশা সেন, প্রকাশ : বাংলাদেশ সংস্করণ, জানুয়ারি ১৯৯৬, উন্মেষ প্রকাশন।

৯৩. আওয়ামী লীগ ও সশস্ত্র বাহিনী : আবু রুশদ, প্রকাশ : ১ জুন ২০০৪, পানাম প্রেস লিমিটেড।

৯৪. 'স্বাধীনতা সংগ্রাম' ঢাকায় গেরিলা অপারেশন : হেদায়েত হোসাইন মোরশেদ, প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, বাংলা একাডেমী।

৯৫. ভারতের মুক্তি সংগ্রামে মুসলিম অবদান : শান্তিময় রায়, প্রকাশ : জানুয়ারি ১৯৯৪, মল্লিক ব্রাদার্স (কলকাতা)

৯৬. ১৯৭৫ সাল : সৈয়দ আলী আহসান, প্রকাশ : ২৬ মার্চ ২০০২, বাড কম্প্রিন্ট এন্ড পাবলিকেশন্স।

৯৭. 'দলিত দিনের পথিকৃৎ' মৌলভী কাদের বকশ্-এর সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য ও পরিষদ বক্তৃতাবলী : নূরুল হুদা মির্জা, প্রকাশ : আগস্ট ১৯৯৩, উইং কমান্ডার (অবসরপ্রাপ্ত) এস আর মির্জা।

৯৮. সাম্রাজ্যবাদবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে আলিমদের অবদান : ড. মাওলানা মুশতাক আহমদ, প্রকাশ : ৩০.১২.২০০৬ ইং, নাদিয়া বুক কর্ণার।

৯৯. ইতিহাসের আলোকে দেশ বিভাগ ও কায়েদে আযম জিন্নাহ : এম এ মোহাইমেন, প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪, পাইওনিয়ার পাবলিকেশন্স।

১০০. বঙ্গবন্ধু হত্যার দলিল : অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম সম্পাদিত, প্রকাশ : ৩ নভেম্বর ১৯৯৬, সূচয়ন প্রকাশন।

১০১. '৭১ এ কি ঘটেছিল, কারা রাজাকার ছিল : খন্দকার আবুল খায়ের, প্রকাশ : জানুয়ারি ২০০২, খন্দকার প্রকাশনী।

১০২. একাত্তরের গণহত্যা, হামুদুর রহমান কমিশনের রিপোর্ট : অনুবাদ : বশীর আল্‌হেলাল, প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০০১, দিব্য প্রকাশ।

১০৩. একাত্তরের দিনগুলি : জাহানারা ইমাম, প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৮৬, সন্ধানী প্রকাশনী।

১০৪. অধ্যাপক গোলাম আযমের রাজনীতি অর্জন ও ব্যর্থতা : মাওলানা মোহাম্মদ ছমির উদ্দিন গাজীপুরী, প্রকাশ : এপ্রিল ২০০৫, বাংলাদেশ পাঠাগার বিপণী।

১০৫. সাহিত্যে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ : সাহিদা বেগম, প্রকাশ : একুশে বইমেলা ২০০৩, ক্যাবকো।

১০৬. গোলাম আযমের নাগরিকত্ব মামলা : আমান-উদ-দৌলা, প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩, দিব্য প্রকাশ।

১০৭. জিয়া-মঞ্জুর হত্যাকাণ্ড এবং তারপর : এ এস এম সামছুল আরেফিন, প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮, আহমদ পাবলিশিং হাউস।

১০৮. একাত্তরের দুঃসহ স্মৃতি : সম্পাদনা : শাহরিয়ার কবির, প্রকাশ : নভেম্বর ১৯৯৯, একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি।

১০৯. ডেটলাইন একাত্তর : শহিদুল ইসলাম মিন্টু, প্রকাশ : বইমেলা ১৯৯৪, সুধা সৌরভ প্রকাশনী।

১১০. সাপ্তাহিক বাংলাদেশ, মুক্তিযুদ্ধের ৭০ দিন : মিজানুর রহমান সম্পাদিত, প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৯২, ধ্রুপদ প্রকাশন।

১১১. মুক্তিযুদ্ধে দৈনিক সংগ্রামের ভূমিকা : আলী আকবর ঢালী, প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৯২, হালিমুল্লাহ খদ্দর।

১১২. জাহান্নামের আগুনে বসিয়া : আখতার ফারূক, প্রকাশ : দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৯৪, রশীদিয়া প্রকাশনী।

১১৩. জীবনে যা দেখলাম (১–৭ খণ্ড) : অধ্যাপক গোলাম আযম, প্রকাশ : কামিয়াব প্রকাশন।

১১৪. আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম : অধ্যাপক আবদুল গফুর সম্পাদিত, প্রকাশ : ডিসেম্বর ১৯৮৭, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

১১৫. স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র : বেলাল মোহাম্মদ, প্রকাশ : পরিবর্ধিত সংস্করণ ফেব্রুয়ারি ২০০৩, অনুপম প্রকাশনী।

১১৬. একাত্তরের ঘাতক ও দালালরা কে কোথায় : সম্পাদনা : ড. আহমদ শরীফ, কাজী নূর-উজ্জামান, শাহরিয়ার কবির, প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭, মুক্তিযুদ্ধ চেতনা বিকাশ কেন্দ্র।

১১৭. জল্লাদের খাঁচা থেকে মাতৃভূমির রণাঙ্গনে : লে. কের্নেল এস আই এস নূরুন্নবী খান বীর বিক্রম (বরখাস্ত), প্রকাশ : একুশে বইমেলা ২০০০, কলম্বিয়া প্রকাশনী।

১১৮. একাত্তরের ঘাতক জামায়াতে ইসলামীর অতীত ও বর্তমান : শাহরিয়ার কবির সম্পাদিত, প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৮৯, মুক্তিযুদ্ধ চেতনা বিকাশ কেন্দ্র।

১১৯. ঘাতকের দিনলিপি : রমেন বিশ্বাস, প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩, ধ্রুপদ প্রকাশন।

১২০. তিরিশ লাখের তেলেসমাতি : জহুরী, প্রকাশ : জানুয়ারি ১৯৯৩, আশা প্রকাশন।

১২১. রক্তাক্ত বাংলা : প্রকাশ : আগস্ট ১৯৭১, মুক্তধারা (স্বাধীন বাংলা সাহিত্য পরিষদ)

১২২. মুক্তিযুদ্ধের অনন্য শহীদ মাওলানা অলিউর রহমান : জীবন ও সাহিত্য : সম্পাদনা আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী আল-আযহারী, প্রকাশ : জুলাই ১৯৯৮, মহানবী স্মরণিকা পরিষদ।

১২৩. দ্যা রেইপ অব বাংলাদেশ : অ্যান্থনী মাসকারেনহাস, অনুবাদ : রণাত্রি, ইংরেজি সংস্করণ প্রকাশ : অক্টোবর ১৯৭১, বাংলায় : ডিসেম্বর ১৯৮৮, পরমা।

১২৪. স্মৃতি ১৯৭১ (১-১৩ খণ্ড) : সম্পাদনা : রশীদ হায়দার, প্রকাশ : বাংলা একাডেমি।

১২৫. ইতিহাসের ইতিহাস : গোলাম আহমদ মোর্তজা, প্রকাশ : মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ রিসার্চ একাডেমী।

১২৬. চেপে রাখা ইতিহাস : গোলাম আহমদ মোর্তজা, প্রকাশ : মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ রিসার্চ একাডেমি।

১২৭. এ এক অন্য ইতিহাস : গোলাম আহমদ মোর্তজা, প্রকাশ : মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ রিসার্চ একাডেমি।

১২৮. স্বাধীনতার শত্রুমিত্র : পান্না কায়সার, প্রকাশ : আগামী প্রকাশন।

১২৯. সাক্ষাৎকার : বদরুদ্দীন উমর, প্রকাশ : ঐতিহ্য।

১৩০. মৃত্যুর ওপারে : মাওলানা তারিক জামিল, শফিউল্লাহ কুরাইশী, প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ১৯৯৬, পথ প্রকাশ।

১৩১. কালো পঁচিশের আগে ও পরে : আবুল আসাদ, প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৯০, ইতিহাস পরিষদ।

১৩২. পাকিস্তানের কারাগারে বঙ্গবন্ধু : রবার্ট পেইন, ভাবানুবাদ : ওবায়দুল কাদের, প্রকাশ : শিখা প্রকাশনী।

১৩৩. স্মৃতি খণ্ড মুজিবনগর : শওকত ওসমান, প্রকাশ : ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯২, বিউটি বুক হাউস।

১৩৪. মুক্তিযুদ্ধ ইসলাম ও বাংলাদেশ : মোঃ আখতার উদ্দীন হেলালী, প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০০৬, পাঞ্জেরী ইসলামিক পাবলিকেশন্স।

১৩৫. আমি বীরাঙ্গনা বলছি : নীলিমা ইব্রাহিম, প্রকাশ : জানুয়ারি ১৯৯৮, জাগৃতি প্রকাশনী।

১৩৬. বহুমুখী ষড়যন্ত্র : মুহাম্মদ হারুন, প্রকাশ : জুলাই ১৯৯৩, হালিমিয়া কুতুবখানা।

১৩৭. একাত্তরের অসহযোগ আন্দোলনের দিনগুলো : নাজিম উদ্দীন মানিক, প্রকাশ : জুলাই ১৯৯২, ওয়ারী বুক সেন্টার।

১৩৮. যুদ্ধাপরাধীর জবানবন্দি : আব্দুর রহিম, প্রকাশ : ১৯৯৬, র‍্যামন পাবলিশার্স।

১৩৯. স্মৃতি বড় মধুর স্মৃতি বড় বেদনার : শেখ হাসিনা, গ্রন্থনা ও সম্পাদনা : এ এইচ খান, প্রকাশ : একুশে বইমেলা, ২০০৮, বাংলাদেশ কালচারাল ফোরাম।

১৪০. আমার দৃষ্টিতে মওলানা ভাসানী : মাওলানা আব্দুল মতিন, প্রকাশ : জুন ১৯৮৪, ফাহাদ প্রকাশনী।

১৪১. খেলায় খেলায় মুক্তিযুদ্ধ : আহমাদ উল্লাহ, প্রকাশ : অক্টোবর ২০০২, হাসি প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা।

১৪২ স্বাধীনতা সংগ্রামে বাঙ্গালী : আফতাব আহমদ, প্রকাশ : ডিসেম্বর ১৯৯৩, সাগর প্রকাশনী।

১৪৩. ঢাকা ১৯৭১, (ঢাকা নগর জাদুঘর সংগৃহীত স্বাধীনতা যুদ্ধের আলোকচিত্র সংকলন) : সম্পাদনা : আবুল হাসনাত, মুনতাসীর মামুন, প্রকাশ : অগ্রহায়ণ ১৩৯৫, বাংলা একাডেমি।

১৪৪. একটি জীবন একটি আন্দোলন হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত মাওলানা কাসেম নানুতবী (রহ.)-এর জীবন ও কর্ম : মাওলানা নিজাম উদ্দীন আসীর আদরবী, অনুবাদ ও সংকলন : মুফতি জহীর ইবনে মুসলিম, প্রকাশ : নভেম্বর ২০০৬, আল-আবরার প্রকাশনী।

১৪৫. আল্লামা আবুল হাসান যশোরী জীবন ও কর্ম : মুফতি আব্দুল্লাহ ফারুক, প্রকাশ : মার্চ ২০০৫, কোহিনূর লাইব্রেরী।

১৪৬. চেরাগে মুহাম্মদ (কুতুবুল আলম শাইখুল ইসলাম মাওলানা সাইয়েদ হোসাইন আহমদ মাদানী (রহ.)-এর জীবন চরিত : মাওলানা জাহেদ আল-হোসাইনী, অনুবাদ : মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, প্রকাশ : নভেম্বর ১৯৯৮, জামেয়া হোসাইনিয়া ইসলামিয়া আরজাবাদ মিরপুর, ঢাকা।

১৪৭. বৈচিত্র্যের মাঝে ঐক্যের সুর (শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা সায়্যিদ হোসাইন আহমদ মাদানী (রহ.)-এর বৈচিত্র্যময় জীবন চরিত (১ম খণ্ড) মাওলানা কাজি মু'তাসিম বিল্লাহ, প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০০৪, জামিয়া শারইয়্যাহ মালিবাগ, ঢাকা।

১৪৮. ফেদায়ে মিল্লাত হযরত মাওলানা সায়্যিদ আসআদ মাদানী (রহ.) স্মারক গ্রন্থ : সম্পাদনা পরিষদ, প্রকাশ : আগস্ট ২০০৬, জামেয়া হোসাইনিয়া ইসলামিয়া আরজাবাদ, মিরপুর, ঢাকা।

১৪৯. হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী : সিরাজ উদ্‌দীন আহমেদ, প্রকাশ : আগস্ট ১৯৯৬, ভাস্কর প্রকাশনী, শান্তিনগর, ঢাকা।

১৫০. আমরা বাংলাদেশী আমরা বাঙ্গালী : মাহবুব আনাম, প্রকাশ : এপ্রিল ১৯৯৭, খোশরোজ কিতাব মহল।

১৫১. ইতিহাসের স্বীকৃতি বনাম বিকৃতি : মাহবুব আনাম, প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০০০, খোশরোজ কিতাব মহল।

১৫২. বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ আমাদের আত্মপরিচয় : সৈয়দ আলী আহসান, প্রকাশ : ঢাকা বইমেলা ২০০২, বাড কম্প্রিন্ট এন্ড পাবলিকেশন্স।

১৫৩. মুক্তিযুদ্ধ জাতীয় নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষানীতি : মেজর জেনারেল (অব.) ইমাম-উজ-জামান বীর বিক্রম, প্রকাশ : বই মেলা ২০০৪, যোগাযোগ পাবলিশার্স।

১৫৪. মহান জিয়া : মাহমুদ সফিক সম্পাদিত, প্রকাশ : জুন ২০০২, বাড কম্প্রিন্ট এন্ড পাবলিকেশন্স।

১৫৫. আমি মুক্তিযোদ্ধা আমি রাজাকার : আব্দুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী, প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৯০, মুক্তি প্রকাশনী।

১৫৬. তাহরীকে দেওবন্দ (দারুল উলুম দেওবন্দ আন্দোলন : ইতিহাস ঐতিহ্য ও অবদান) : ড. মাওলানা মুশতাক আহমদ, প্রকাশ : জুলাই ১৯৯৮, শান্তিধারা প্রকাশনী।

১৫৭. হাদিয়ে বাঙাল মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (রহ.) : এম ইউ এ কাদের, প্রকাশ : এপ্রিল ২০০৬, পাইওনিয়ার পাবলিকেশন্স।

১৫৮. ফুরফুরা শরীফের পীর মোজাদ্দেদে জমান আমিরুশ শরিয়ত হজরত মাওলানা আবু বকর সিদ্দিকী (রহ.)-এর বিস্তারিত জীবনী : হাফেজুল হাদিস আল্লামা রূহুল আমীন, প্রকাশ : ডিসেম্বর ১৯৯৭, ইশায়াতে ইসলাম কুতুবখানা।

১৫৯. আল্লামা সাঈয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.) জীবন ও কর্ম : মাওলানা মুহাম্মদ সালমান, প্রকাশ : মে ২০০২, আল-ইরফান পাবলিকেশন্স।

১৬০. ইসলামী আন্দোলনে জমিয়তের বৈশিষ্ট্য : মাওলানা হাবীব আহমদ মাছুম, প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ১৯৯৭, ছামারাতুল তারবিয়্যাত ইসলামী সমাজ সেবা সংস্থা, সিলেট।

১৬১. শরীয়তের দৃষ্টিতে ৬ দফা : মাওলানা মুহম্মদ অলিউর রহমান, প্রকাশ : নভেম্বর ১৯৬৯, আরোগ্য কুটির কেরানীগঞ্জ।

১৬২. স্বতন্ত্র ধর্ম দপ্তর : একটি জাতীয় প্রয়োজন, জয় বাংলা ও কয়েকটি শ্লোগান প্রসঙ্গ : মা-ওলানা মুহম্মদ অলিউর রহমান, প্রকাশ : ঐ

১৬৩. শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মারক গ্রন্থ '৯৪ : সিলেট লেখক সমিতি, প্রকাশ : ১৪ ডিসেম্বর '৯৪।

১৬৪. হযরত শাহ হাবিবুর রহমান খোরাসানী (রহ.)-এর আধ্যাত্মিক জীবন : জুনায়েদ খোরাসানী বিএসসি, প্রকাশ : আগস্ট ১৯৯৩, ফরিদা খোরাসানী, সিলেট।

১৬৫. পটিয়ার দশ মনীষী : মাসউদুল কাদির, প্রকাশ : আগস্ট ২০০৬, রামপুরা, ঢাকা।

১৬৬. মাওলানা তর্কবাগীশ জন্মশতবার্ষিকী স্মারক : ইউসুফ শরীফ সম্পাদিত, প্রকাশ : নভেম্বর ২০০০, মাওলানা তর্কবাগীশ জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন কমিটি।

১৬৭. মহীরুহ মহান জাতীয় নেতা মনীষী মাওলানা আব্দুর রশীদ তর্কবাগীশএর ১৬তম মৃত্যুবার্ষিকী স্মারক : আমির হোসাইন সম্পাদিত, প্রকাশ : আগস্ট ২০০৮, বাংলাদেশ গণআজাদী লীগ প্রকাশিত প্রচারিত।

১৬৮. সময়ের দাবি মাওলানা তর্কবাগীশ (ভাষা আন্দোলনের সুবর্ণ জয়ন্তী স্মারক) : শাহ লোকমান হাকিম সম্পাদিত, ফেব্রুয়ারি ২০০২, ভাষা আন্দোলনের সুবর্ণ জয়ন্তী স্মারক।

১৬৯. ঐতিহাসিক সলঙ্গা দিবস স্মরণিকা : প্রধান সম্পাদক : শ্রী কালীপদ কুণ্ডু, প্রকাশ : জানুয়ারি ২০০৫, মাওলানা তর্কবাগীশ পাঠাগার কর্তৃক প্রকাশিত।

১৭০. বাংলাদেশ ও জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ : মোহাম্মদ তাহের, প্রকাশ : ১৯৭২ ইংরেজি, নিউ দিল্লি।

১৭১. মূলধারা-'৭১ : মইদুল হাসান।

১৭২, দুশো ছেষট্টি দিনে স্বাধীনতা : মুহাম্মদ নূরুল কাদির, প্রকাশ : ২৫ মার্চ ১৯৯৭, মুক্ত প্রকাশনী।

১৭৩. স্বাধীনতা ভাসানী ভারত : সাইফুল ইসলাম।

১৭৪. মওলানা ভাসানী : রাজনৈতিক জীবন ও সংগ্রাম : সম্পাদনা শাহরিয়ার কবীর।

১৭৫. ঢাকা-আগরতলা-মুজিব নগর : এমএ মোহাইমেন।

১৭৬. স্বাধীন বাংলার অভ্যুদয় এবং অতঃপর : কামরুদ্দীন আহমদ।

১৭৭. দৈনিক প্রথম আলো : একাধিক সংখ্যা।

১৭৮. দৈনিক যুগান্তর : একাধিক সংখ্যা।

১৭৯. দৈনিক ইনকিলাব : একাধিক সংখ্যা।

১৮০. দৈনিক আমার দেশ : একাধিক সংখ্যা।

১৮১. দৈনিক আমাদের সময় : একাধিক সংখ্যা।

১৮২. দৈনিক যায়যায়দিন : একাধিক সংখ্যা।

১৮৩. দৈনিক সমকাল : একাধিক সংখ্যা।

১৮৪. সাপ্তাহিক ২০০০ : একাধিক সংখ্যা।

আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি

বাংলাদেশ
০ ৩২ ৬৪
কিলোমিটার

পশ্চিম বঙ্গ (ভারত)
মেঘালয় (ভারত)
আসাম (ভারত)
ত্রিপুরা (ভারত)
মায়ানমার (বার্মা)
ব ঙ্গো প সা গ র

ঠাকুরগাঁও
দিনাজপুর
রংপুর
গাইবান্ধা
নওগাঁ
বগুড়া
নবাবগঞ্জ
রাজশাহী
নাটোর
সিরাজগঞ্জ
পাবনা
শেরপুর
জামালপুর
ময়মনসিংহ
নেত্রকোনা
সুনামগঞ্জ
সিলেট
কিশোরগঞ্জ
হবিগঞ্জ
মৌলভীবাজার
টাঙ্গাইল
গাজীপুর
মানিকগঞ্জ
ঢাকা
কুষ্টিয়া
রাজবাড়ী
ঝিনাইদহ
মাগুরা
ফরিদপুর
যশোর
নড়াইল
বরিশাল
খুলনা
বাগেরহাট
পটুয়াখালী
বরগুনা
ভোলা
নোয়াখালী
ফেনী
চট্টগ্রাম

জাতীয় চার নেতা



শেরেবাংলা একে ফজলুল হক

জন্ম : ২৬ অক্টোবর, ১৮৭৩ ■ মৃত্যু : ২৭ এপ্রিল, ১৯৬২



হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী

জন্ম : ৮ সেপ্টেম্বর, ১৮৯২ ■ মৃত্যু : ৫ ডিসেম্বর, ১৯৬৩



মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী

জন্ম : ১২ ডিসেম্বর,১৮৮০ ■ মৃত্যু : ১৬ নভেম্বর, ১৯৭৬



বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

জন্ম : ১৭ মার্চ, ১৯২০ ■ মৃত্যু : ১৫ আগস্ট, ১৯৭৫



গণ-অভ্যুত্থানকালে ১৯৬৮ সালের ৮ ডিসেম্বর পুলিশী জুলুমের মুখোমুখি মওলানা ভাসানী



আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে মুক্তির পর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে মওলানা ভাসানী ও মাওলানা আব্দুর রশীদ তর্কবাগীশের মাঝখানে বসে আছেন বঙ্গবন্ধু

ছবি: আফতাব আহমদ



১৯৭০ সালের ২২ নভেম্বর প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড়ে বাংলাদেশের (তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানের) সহস্র নিহত, আহত ও গৃহহীনদের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের চরম ঔদাস্য সৃষ্টি করেছিল বাংলাদেশের জনমনে তীব্র অসন্তোষ

ছবি : রশীদ তালুকদার



একাত্তরের ৯ জানুয়ারি পল্টন ময়দানে ভাসানীর বিরাট জনসভা।
এ জনসভায় মওলানা ভাসানী শেখ মুজিবকে উদ্দেশ্য করে আবার বলেন,
'আলোচনায় কিচ্ছু হবে না ওদের আস্‌সালামু আলায়কুম জানিয়ে দাও'



পল্টন ময়দানে মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর সেই বিখ্যাত উক্তি : 'ওরা কেউ আসেনি'

ছবি : মনজুর আলম চৌধুরী, দৈনিক পূর্বদেশ



মাটির মানুষ ভাসানী



একাত্তরের ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নবনির্বাচিত এমএনএ ও এমপিএ-দের সমাবেশে স্বাধিকার আন্দোলনে শহীদদের রুহের মাগফেরাত কামনা করে মোনাজাত করা হয়। মোনাজাত পরিচালনা করেন মাওলানা আব্দুর রশীদ তর্কবাগীশ

ছবি : আফতাব আহমদ



স্বাধিকার আন্দোলনে যাঁরা বুকের তাজা খুনে বাংলার মাটি রঞ্জিত করেছে তাঁদের রুহের মাগফেরাত কামনা করে সভা শুরুর আগে বিশেষ মোনাজাত করছেন শহীদ বুদ্ধিজীবী মাওলানা অলিউর রহমান

ছবি : আফতাব আহমদ



‘এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম’ রেসকোর্সে ৭ মার্চে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ

ছবি : রশীদ তালুকদার



৭ মার্চ : রমনা রেসকোর্স ময়দানের জনসভায় মাওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশের পরিচালনায় আন্দোলনে শহীদদের স্মরণে মোনাজাত



চট্টগ্রামের কালুরঘাট স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্রের
এই চেয়ারে বসেই বেতার যন্ত্রটির যাহায্যে ২৭ মার্চ মেজর জিয়া স্বাধীনতার
ঘোষণা পাঠ করেন। এই চেয়ারসহ ট্রান্সমিটারটি
চট্টগ্রাম জিয়া যাদুঘরে সংরক্ষিত আছে



পাকিস্তানি সৈন্যদের দ্বারা ভস্মিভূত একটি বাড়ি



একাত্তরের একটি উদ্বাস্তু শিবির



মুক্তিযদ্ধের সময় মুজিবনগরে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের উপদেষ্টা কমিটির বৈঠক :
সভাপতিত্ব করেন মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী



মানবতার চরম লাঞ্ছনার একটি নিদর্শন
পাকিস্তানি সৈন্যরা এভাবে কাপড় খুলে দেখত কে মুসলমান, আর কে অমুসলমান



পাকিস্তান বাহিনীর হাত থেকে রেহাই পায়নি পবিত্র কোরআন। এখানে দেখা যাচ্ছে অগ্নিদগ্ধ কোরআন শরীফ



পাকিস্তানি মুসলমান সৈন্যদের হাতে ধ্বংসপ্রাপ্ত মসজিদ



নৃশংসতা



পাকিস্তানিদের বোমা হামলায় ভস্মিভূত হয়েছে শত শত জনপদ। অর্ধদগ্ধ একটি বালকের শুশ্রূষার চেষ্টা

অত্যাচারের অভিনবত্ব। ফিলিপনগরের রায়হান উদ্দীন
পাকিস্তানিরা তার পিঠ ছুরি দিয়ে কেটে লবন লাগিয়ে দিয়েছিল



নৃশংসতা!

ছবি : রশীদ তালুকদার



নৃশংসতা



একাত্তরের ন'মাস পাক
জঙ্গিসাহী
র্নিবিচারে মানুষ হত্যা
করে যে
ব্যাপক বীভৎস খেলায়
মেতেছিল
তা নাৎসী নারকীয়তাকে
হার মানায়,
লজ্জা দেয়

ছবি : আফতাব আহমদ



পরিবারের একমাত্র জীবিত সদস্য
নিউজ উইক ২.৮.৭১

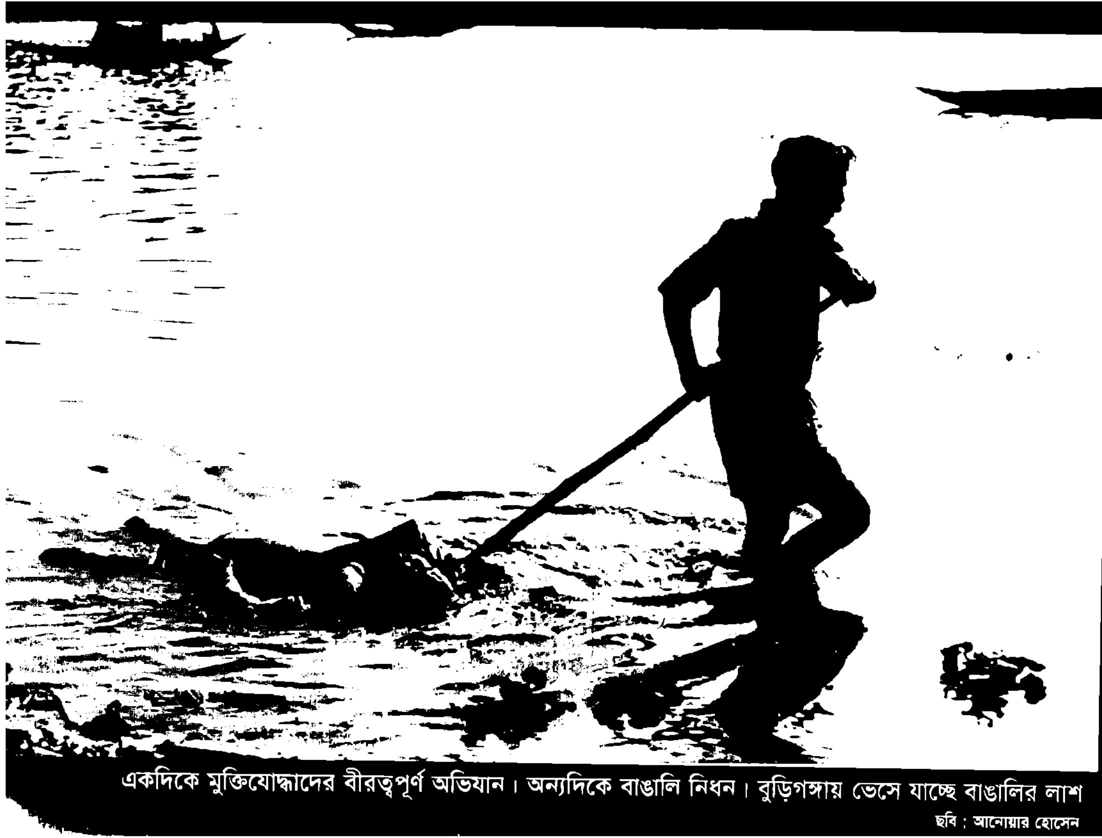


HE SUNDAY TIMES *magazin*

একাত্তরের বাংলাদেশের চিত্র ফুটে উঠেছে টাইম ম্যাগাজিনে



হায় মানবতা!



একদিকে মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বপূর্ণ অভিযান। অন্যদিকে বাঙালি নিধন। বুড়িগঙ্গায় ভেসে যাচ্ছে বাঙালির লাশ

ছবি : আনোয়ার হোসেন



ঢাকায় শহীদ বুদ্ধিজীবীদের মৃতদেহ। তাদের চেনা যাচ্ছিলো না...হাত পেছনে বাঁধা চোখ উপড়ে ফেলা...মানুষ পশুকেও এমন নৃশংসভাবে হত্যা করে না। পাকিস্তানিরা এমনি নৃশংসভাবে বাঙালিদের হত্যা করে (১৪ ডিসেম্বর ১৯৭১)



একাত্তরের নির্মম নৃশংসতা : রায়েরবাজার বধ্যভূমিতে বর্বর পাকিস্তানি বাহিনীর গুলীতে বিদীর্ণ এক তরুণীর লাশ



আত্মসমর্পণ করছে পাকিস্তানি বাহিনী



পাকিস্তানি জেনারেল নিয়াজী আত্মসমর্পণ করে দলিলে স্বাক্ষর করছেন।
ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যান; বিকেল ৪:৩০ মিনিট।
১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ সাল



পাকহানাদার বাহিনীর পতনের সঙ্গে সঙ্গে ঢাকা শহরে পাকিস্তানি পতাকা নামানো শুরু





আল-এছহাক প্রকাশনী

বাংলাবাজার, ঢাকা